সুচিত্রা ভট্টাচার্য

দশটি উপন্যাস

দশটি উপন্যাস

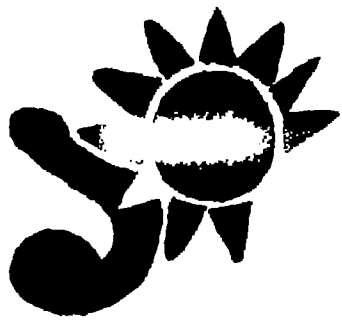

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষের স্মৃতির উদ্দেশে

প্রকাশকের নিবেদন

সাম্প্রতিককালের বাংলা উপন্যাসের জগতে সুচিত্রা ভট্টাচার্য নিঃসন্দেহে অন্যতম জনপ্রিয় নাম। তাঁর কাহিনীকথনের ভঙ্গি এবং চরিত্রসৃষ্টির কুশলতা বহু-প্রশংসিত। আনন্দ পাবলিশার্সের দশটি উপন্যাস গ্রন্থমালায় এবার সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোট-বড় নানা মাপের, নানা স্বাদের দশটি উপন্যাস—আমি রাইকিশোরী, ভাঙনকাল, হলুদ গাঁদার বনে, ধূসর বিষাদ, গভীর অসুখ, ফিরে দেখা, হেমন্তের পাখি, ঢেউ আসে ঢেউ যায়, ভাল মেয়ে খারাপ মেয়ে এবং পরবাস গ্রথিত হল।

সূচিপত্র

আমি রাইকিশোরী ১১
ভাঙনকাল ৮৫
হলুদ গাঁদার বনে ১৮৭
ধূসর বিষাদ ২২১
গভীর অসুখ ২৬৭
ফিরে দেখা ৩৫১
হেমন্তের পাখি ৩৯৯
ঢেউ আসে ঢেউ যায় ৪৯১
ভাল মেয়ে খারাপ মেয়ে ৫৩৯
পরবাস ৫৫৭

গ্রন্থ-পরিচয় ৬৩১

আমি রাইকিশোরী

আমি রাইকিশোরী মিত্র।...মিত্র! নাকি চৌধুরী? উহুঁ, কোনওটাই নয়। আমি রাই, শুধুই রাই...রাইকিশোরী। নামটা শুনেই ভাবতে বসবেন না আমি অপরূপ সুন্দরী, বৃন্দাবনের সেই কৃষ্ণ প্রেমিকাটির মতন। এক্কেবারেই নয়। নেহাতই সাধারণ, সাদাসাপটা চেহারা আমার। টিপিকাল বাঙালি মেয়েদের যেমন হয় আর কী। ফোলা ফোলা ঠোঁট, একটু চাপা গায়ের রং, গালদুটো টোপা টোপা। নাকটাও তেমন ধারালো নয়। তবে চোখ দুটো, বলতে নেই, বেশ সুন্দর। টানা, বড় বড়, চিতল হরিণের যেমন। কথাটা আমার নয়, লোকের। লোকে বলে আমার চোখ নাকি মুখের আগে কথা বলে, কাঁদে, হাসে। হবেও বা। মা বলে, এ চোখ আমি নাকি আমার ঠাকুমার কাছ থেকে পেয়েছি। তার সঙ্গে অবশ্য দেখা হয়নি আমার। আমি জন্মাবার আগেই তিনি চলে গেছেন। ছবি দেখেছি। একটাই। বিয়ের পর পরই বোধহয় তোলা। একগাদা গয়নাগাঁটি পরে দাদুর সঙ্গে। দুজনেরই সে...ই ঐতিহাসিক পোজ। একজন লাজুক চোখে চেয়ারে বসা অধোমুখ নায়িকা, অন্যজন হাতলে ঠেস দিয়ে 'মুক্তি'র প্রমথেশ বড়ুয়া। আহা, কিছু রূপ ছিল বটে ঠাকুমার। তো সেই রূপ তিনি ভাগ করে দিয়েছিলেন নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে। বড়পিসি পেয়েছিল ডালিম ডালিম রং, ছোটপিসি হাত-পায়ের নিটোল গড়ন। বাবা চোখ কপাল আর নাকের খানিকটা। জেঠু ঠোঁট আর চিবুকের ভাগ। বাবা আর জেঠুর চেহারার বাদবাকিটা দাদুর মতন। লম্বা লম্বা হাত পা, লোমশ বুক, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া শরীরে সামান্য কুঁজো ভাব। আমাদের মধ্যে ভাইয়াটা দেখতে হুবহু বাবার মতন হয়েছে। গোঁফ দাড়ি উঠতে না উঠতে বুক জুড়ে কচি নরম ঘাস। দাদা অন্যরকম। ওর চেহারায় মা আর মামার বাড়ির আদল বেশি। গোলগাল, মিষ্টি মিষ্টি। আমারও বেশিটা মার মতন। একমাত্র চোখ দুটোই কীভাবে যেন ঠাকুমা থেকে বাবা হয়ে আমার কাছে চলে এসেছে। এভাবেই বুঝি পূর্ব পুরুষেরা নিজেদের টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে রেখে যায়।

মোট কথা হল, দেখতে আমি মন্দ নয়। চোখ না ফেরাতে পারার মতো না হলেও, লোকে তাকিয়ে দেখে। কোনও কোনও সময় ওই তাকানোটা আমার ভালই লাগে। কখনও কী বিরক্তি, কী বিরক্তি। এখনই যেমন। দেখুন না ঠিক আমার সামনে বসা লোকটাকে। পোশাক-আশাকে দিব্যি ভদ্রলোক। চোখে ফটোসান, কোলে ভি আই পি। দেখুন কেমন ফুক ফুক সিগারেট টানছে আর হ্যাংলা চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। ছেলেদের কোন দৃষ্টির কী মানে আজকাল আমি খুব বুঝতে পারি। লোকটা আসলে আমাকে দেখছে না, একটা মেয়েমানুষ দেখছে। ষোলো থেকে সত্তর সব বয়সের পুরুষ মহিলা দেখলে চোখ দুটোকে বাগে রাখতে পারে না। কেউ ড্যাবড্যাব তাকায়, কেউ আড়ে-ঠারে। পুরুষদের নানান রকম দৃষ্টিতে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি আমি। গর্ত থেকে বাইরের আলোয় বেরিয়ে আসার এই এক বিরাট প্লাস পয়েন্ট। কত কিছু যে জানছি, শিখছি। ছেলেরা চিরকাল মেয়েদের দেখবেই। নানান মন নিয়ে, নানান কামনায়। দেখুক গে যাক। আমার অস্বস্তির জন্য তো আর প্রকৃতির নিয়ম বদলে যেতে পারে না। ওদিকে দেখুন, কম্পার্টমেন্টের ওপাশের ওই লোকটাকে। ধুতি শার্ট পরা, চর্বিসার শরীর, মাথায় অল্প টাক।...ইস, কী লোভী চোখে সামনে বসা বউটাকে গিলছে। ব্লাউজ তুলে কোলের ঘ্যানঘেনে বাচ্চাটাকে বউটি দুধ খাওয়াচ্ছে। আপনিই বলুন, এ সময় কি পুরুষদের চোখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়? বেচারি যতবার আঁচল টেনে ভরাট স্তন ঢাকে, বাচ্চা গুঁতো মেরে সরিয়ে দেয়। দুবার ফটাফট চাঁটিও মারল ছেলের মাথায়। আধা গরিব মতন বউটার গায়ের দুপাশে আরও দুটো। একটা বছর পাঁচেকের, আরেকটা আরও ছোট। দুজনেই লেবু লজেন্সের জন্য সুর ধরেছে। বউটা কোনদিক সামলায়? তিন-তিনটে বাচ্চা, না নিজের লজ্জা? ওর পাশে বসা চোয়াড়ে মার্কা লোকটাকে দেখুন। নির্বিকার ঘুমোচ্ছে। নির্ঘাত স্বামী। মনে হয় কোনও কারখানা টারখানায় কাজ করে। হকারটা কাছে যেতে বউটা তাকে দুবার ডাকলও। আধখানা চোখ খুলে আবার বেমালুম ঢুলছে। বাচ্চা সামলানোর

তার কী দায় বলুন। পর পর তিনটেকে পৃথিবীতে এনে দিয়েছে এই না ঢের। বউ আছে কী জন্য? যাবতীয় ম্যাও সামলাতে...ওমা, কল্যাণী এসে গেল নাকি! কী কাণ্ড, এর মধ্যেই এতটা রাস্তা চলে এলাম! মনের ঝড় সময়কে কেমন উড়িয়ে চলে দেখুন!

কল্যাণীতে মাত্র চার-পাঁচ জন নামল। উঠল জনা দশেক। তার মধ্যে আবার তিনজন হকার। আজকাল লোকাল ট্রেনে প্যাসেঞ্জারের চেয়ে হকার বেশি। ধূপওয়ালা উঠেই একটা মোটা কাঠি জ্বালিয়ে ফেলেছে। আজ কামরায় লোক এত কম কেন বলুন তো? ওহো, আজ যে রবিবার। দ্যাখো কাণ্ড, এত কেন বেখেয়াল হয়ে গেছি? বাড়ি থেকে ওরকম পালিয়ে আসার জন্য কি? পালিয়ে আসাই তো। মাঝে মাঝে কী যে হয়ে যায় আমার! দাদাটা কী ভাবল কে জানে! বাবা মাও ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। অবাক হওয়ারই কথা। আচমকা কাল রাত্তিরে হাজির হয়েই, সন্ধেবেলায় হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এলাম। ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে উলটোপালটা ভাবতে বসে গেছে। এভাবে সকলকে ভাবনায় ফেলার কোনও মানে হয়? নিজের দুগালে থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছে করছে। আমার সমস্যা আমারই। এর জন্য দুনিয়াসুদ্ধ লোককে কষ্ট দেওয়াটা অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়। এখনও হঠাৎ হঠাৎ এমন সব বালিকাসুলভ কাজ করে ফেলি!

কাল অত রাতে আমাকে দেখে বাড়িসুদ্ধ সকলে থতমত। বাবা তো ঘাবড়ে টাবড়ে একশা—'কী রে, তুই? আজ? কী ব্যাপার?'

বোকার মতো হেসেছিলাম—'কেন, আসতে নেই?'

'—তা নয়। এ শনিবার তো তোর আসার কথা নয়...' আগে প্রতি সপ্তাহেই একবার চলে আসতাম। আজকাল পেরে উঠি না। শনিবার রাতে পৌঁছেই সোমবার ভোরে ফের রওনা দেওয়া। অসুবিধে হয়। সকালের লালগোলা শেয়ালদা পৌঁছোতে সেই সাড়ে দশটা। অতএব ভোরের প্রথম কৃষ্ণনগর লোকালই ভরসা। তিনি যদি লেট করেন তো হয়ে গেল। কিছুতেই দশটার মধ্যে অফিসে গিয়ে হাজিরা দেওয়া যায় না। তা ছাড়া একটা দিনের জন্য হুটোপুটি করে ছুটে আসাটাও বড় পরিশ্রমের।

শুধু বাবা নয়, কাল আমাকে দেখে মাও বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। বার বার উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করে,—'তোর মুখটা এত শুকনো লাগছে কেন রে? শরীর ঠিক আছে তো?'

আমার চোখ মুখ কি সত্যিই অন্যরকম লাগছিল? কাছের লোকরা অল্পতে বেশি ঘাবড়ে যায়। তার ওপর আমাকে নিয়ে যখন দুশ্চিন্তা তাদের আছেই। দাদাও আড়চোখে বারবার লক্ষ করছিল আমাকে। ভাবটা এমন, আমার হঠাৎ হাজির হওয়ার কারণটা চোখ দিয়েই বুঝে নেবে। মুখে অবশ্য বলছিল না কিছুই। সারা সকাল টেপে রবীন্দ্রসংগীত বাজাল। হেমন্ত আর দেবব্রত বিশ্বাসের গান। আজ ছুটির দিন। ওর বেলা অবধি ঘুমোনোর কথা। ওমা, কোন ভোরে বিছানা ছেড়েছে। উঠেই হাঁকডাক,—'রাই, শিগগির চা নিয়ে আয়।' মাকে বলল,—'আজ তোমার মেয়ের অনারে একটু ভাল খাওয়া দাওয়া হয়ে যাক। ঘি ভাত আর মাংস...'

ভাইয়া সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠেছে,—'মাংস নয়! চিংড়ি মাছের মালাই কারি। অনেক দিন চিংড়ি খাইনি।'

বাবা ভাইয়াকে বলল,—'তুই থাক বুড়ো। আজ আমি বরং বাজারে যাই।'

এ জন্যই বারবার কৃষ্ণনগরে চলে আসতে ইচ্ছে করে আমার। কী নরম একটা ভালবাসার উত্তাপ ছড়িয়ে থাকে এখানে। আমার বাবা, মা, দাদা, ভাই সবাই যেন শুধু দিতেই ব্যস্ত। কীভাবে যে যত্ন করে...! হোস্টেলের খাবার দাবার বেশ খারাপ। একবেলা মোটা চালের ভাত। আরেক বেলা রুটি। সঙ্গে যাহোক তরকারি, স্বচ্ছ ডালের জল আর ফ্যাসা কিংবা বেলে মাছের ঝাল। কত রকম অদ্ভুত অদ্ভুত মাছ খেতে শিখেছি কলকাতায় গিয়ে। আমাদের হোস্টেলে কদাচিৎ পাকা পোনা বা ইলিশ আসে। মাংস সপ্তাহে একদিন। কী করা যাবে। হোস্টেলের খাওয়া-দাওয়া সর্বত্রই এইরকম। বাড়ির লোকেরা সে কথা জানে। আমি বাড়ি এলেই তাই ভালমন্দ খাওয়ানোর ধুম পড়ে যায়। কী ভাল যে লাগে তখন!

চিংড়ি অবশ্য আজ পাওয়া যায়নি বাজারে। বদলে বাবা ইয়া ইয়া দুটো মুরগি এনে হাজির। আমি

মুরগি ভালবাসি। তো মা রান্নাঘরে মুরগি তোলে না বলে ভেতরের বারান্দায় উনুন বার করা হল। খাবার টেবিল সরিয়ে সেখানেই রান্নাবান্না। গরম গরম মাংসের ঝোল আর ভাত। মার রান্নায় জাদু আছে। দাদা, ভাইয়া গপাগপ খেতে লাগল। আমার ঠিক মন বসছিল না খাওয়ায়। মাথায় তখন একটাই চিন্তা। কেন বোকার মতো চলে এলাম কলকাতা থেকে! এখনও কেন এত বোকা রয়ে গেছি আমি! নিজেকে নিজে প্রাণভরে বকাবকি করছিলাম।

মা জিজ্ঞাসা করল,—'তোর কী হয়েছে বল তো? ভালভাবে খাচ্ছিস না কেন? অফিসে কিছু হয়েছে?'

—'না তো।'

—'তবে?'

—'তবে আবার কী?'

—'হোস্টেলে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে?'

—'উহুঁ।' আমি প্রাণপণে ওদের মধ্যে নিজেকে ফিরিয়ে আনতে চাইলাম।

—'হোস্টেলে আবার কী হবে? ওখানে সবাই যে যার নিজের মনে থাকে মা। খায় দায়, ঘুমোয়, চাকরি বাকরি করে আর মাঝেমধ্যে শিশুদের মতো নিজেরা নিজেরা ঝগড়াঝাঁটি করে।'

—'তোর সঙ্গে কেউ ঝগড়া করেছে?'

—'দুর। আমার সঙ্গে কারুর ভাবই নেই তেমন, তো ঝগড়া।'

বাবা বলল,—'ভাব করিস না কেন? পাঁচজনের সঙ্গে মিশলেও তো মনটা ভাল লাগে।'

এর কী উত্তর দেব? বাবা মা তো আর জানে না আমি এখন আগের থেকে কত বেশি সহজ হয়ে গেছি। ওফ, প্রথম প্রথম হোস্টেলে গিয়ে আমার সে কী ভয়। কলকাতার কিছু চিনি না, কাউকে জানি না, রাস্তায় বেরোলে কেবলই মনে হয় এই বুঝি হারিয়ে গেলাম। হোস্টেল থেকে অফিস, অফিস থেকে হোস্টেল...এইটুকু যাতায়াত করতেই কী ভয়ানক শঙ্কা। অজানা কোথাও যাওয়ার কথা ভাবলেই বুক জুড়ে ডুবডুব ভয়। নিজেকে যে কী একা লাগত তখন। কত রাত নিঃশব্দে হু হু করে শুধু কেঁদেছি। কাঁদতাম আর ভাবতাম, আমার জীবনটাই কেন এরকম হয়ে গেল? এই দেখুন, কথায় কথায় কোথায় চলে যাচ্ছি। আমার এই এক স্বভাব। খালি পেছন ফিরে দেখা। কবে যে শুধুই সামনে তাকাতে শিখব! ট্রেনটা এখন কোথায় থামল দেখুন তো। ও হো, নৈহাটি। গাড়ির আগে সময় ছুটছে দেখি। শিয়ালদা পৌঁছতে আরও ঘণ্টাখানেক। এরকম ফাঁকা ট্রেনে বসে থাকতে দারুণ লাগে, তাই না? হু হু হাওয়া ছুটছে আমাল-দামাল। দুপাশের ঘন অন্ধকার কেটে ট্রেনটা যেন পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। চলো, চলো, চলো। কে কোথায় যাবে চলো। অন্ধকারকে পেছনে ফেলে ঠিক ঠিক আলোর স্টেশনে পৌঁছে দেব তোমাদের। আমার সামনে বসা লোকটা হালিশহরে নেমে গেছে। নিশ্চিন্ত। এ পাশটায় এখন আমি ছাড়া একজন, দুজন... মোট সাতজন। বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে মিলিয়ে একটা গোটা পরিবার উঠেছে। ওইদিকে যেখানে মোটা লোকটা বসে ছিল, সেখানে এখন একজোড়া কপোত কপোতী। ছেলেটা এমনভাবে ঝুঁকে আছে মেয়েটার দিকে যে মেয়েটার মুখ একটুও দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, প্রেম করা ব্যাপারটা কী রকম? কী এত কথা বলে প্রেমিক প্রেমিকারা? হাসছেন? না মশাই, সত্যি বলছি, আমি কেবল মনে মনেই একজনকে...বিশ্বাস করুন, প্রমিস, তাকে খালি স্বপ্নই দেখে গেলাম। আরবি ঘোড়ার সওয়ার হয়ে সে রাজপুত্তুর আমার কাছে এল আর কই! পরিবর্তে...থাক। অনিমেষের কথা ভাবতে আমার একটুও ভাল লাগে না। কার কথা তা হলে ভাবি? নীলাঞ্জন নয়, অনিমেষ নয়, তবে কি সিদ্ধার্থকে ভাবব? ছি, পুরুষের চিন্তা ছাড়া আর কিছু কি ভাবনা থাকতে নেই? আমাদের মতো মেয়েরা, বুঝলেন, এখনও বড্ড পরনির্ভর! কাউকে একটা জড়িয়ে, পরগাছা হয়েই বেঁচে থাকতে ভালবাসে বেশি। বোকার মতো নিজেদের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে...আচ্ছা, আপনার কী মনে হয়? সিদ্ধার্থ হঠাৎ এভাবে আমার পেছনে লেগে গেছে কেন? আমার মতো একটা বিয়ে-ভাঙা মেয়ের জন্য...! কে জানে আমার ইতিহাস জানার পর বোধহয় করুণা জেগেছে মনে। কিংবা নিছক শারীরিক মোহ। অসম্ভব, ওই ফাঁদে আমি আর পা দিচ্ছি না। একবারেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। যা খুশি ভাবুন আপনারা, আমার এখন সব মেঘের রংই সিঁদুরে মনে হয়। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা বড় দুঃসহ। যেরকমই হোক, অনিমেষকে নিয়ে

একটা রঙিন জীবনের কল্পনা তো ছিল। এক সময় যেমন সব মেয়ের থাকে। আসলে কী জানেন, আমাদের মনে ছেলেবেলা থেকে স্বামী, সংসার, প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি সম্পর্কে এক ধরনের ধারণা বুনে দেওয়া হয়। অনেকটা মাকড়সার জাল বোনার মতো। খেলনাবাটি, পুতুল ঘর এ সব থেকেই সেই বুননের শুরু। শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় সূক্ষ্ম জালটা আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চাই আমরা। ভাবি পাতলা সুতোয় ভাসমান এই ঘর গেরস্থালিই বুঝি আমার স্বর্গ। অবশ্য স্বর্গ বলে আদৌ যদি কিছু থাকে। সুতো ছিঁড়লে কে যে কোথায় ছিটকে যায়...না রে ভাই, সে জাল একবার যখন ছিঁড়ে গেছে নতুন করে আর তা বুনতে চাই না। বেশ আছি।

তবু একান্তই যদি নতুন করে শুরু করতে হয় তবে সিদ্ধার্থ কেন? কেন নীলাঞ্জন নয়? যার কথা কোনওদিন কারুকে মুখ ফুটে বলতে পারিনি। যার কাছে কৈশোরের স্বপ্নগুলো মনে মনে গচ্ছিত রেখে একদিন চলে গিয়েছিলাম কৃষ্ণনগর ছেড়ে, অন্য এক নতুন ঠিকানায়! দেখুন, দেখুন কী নির্লজ্জ আমার মনটা দেখুন। পাছে সিদ্ধার্থ প্রেম নিবেদন করে বসে, সেই ভয়ে কাল পালিয়ে গিয়েছিলাম কলকাতা ছেড়ে। আজও কৃষ্ণনগর থেকে ছিটকে এসেছি নীলাঞ্জনের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কায়। তবু লজ্জাহীন ভাবনা জুড়ে সেই সিদ্ধার্থ আর নীলাঞ্জন। নীলাঞ্জন আর সিদ্ধার্থ। আমি আসলে একেবারেই একটা বিশ্রী রকমের নির্বোধ। অনিমেষ অত বড় ধাক্কাটা দেওয়ার পরও যার চৈতন্য ফেরে না...মেয়েরা বোধ হয় এরকমই। জেনে বুঝেও ফাঁদে পা দিতে কী যে আনন্দ মেয়েদের! কোথায় এখন আরও ভাল চাকরির চেষ্টা করব...নিজস্ব নির্ঝঞ্ঝাট শান্ত একটা আস্তানার কথা ভাবব...সুন্দর নিশ্চয়তা আনব জীবনে তা নয় ঘেন্না, ঘেন্না, ঘেন্না এই ভাব ভাবনায়, ধিক্কার আমার মতিগতিকে...।

উহ্, কী কুৎসিত বেসুরো গান ধরেছে অন্ধ ভিখিরিটা শুনুন। প্রতিটি লাইনের শেষে আবার হাড্ডিসার বাচ্চা সঙ্গীটির নাকি গলার দোহারকি। কেত্তনের সঙ্গে নজরুলের রোমান্টিক গান। ভাবা যায়! এ গাইল 'ফোটে যে ফুল আঁধার রা আ আ তে', সঙ্গে সঙ্গে ও পোঁ ধরল, 'রাতে এ এহ্।' অসহ্য। ব্যারাকপুর থেকে আবার একটি ইঁদুর শিকারি উঠেছে। তার সুর আর ভিখিরির সুর মিলেমিশে বিচিত্র সব পঙ্‌ক্তি হয়ে যাচ্ছে দেখুন। অন্ধকারে এসেছিলেম...কেটে দিল, কেটে দিল, সব কিছু কেটে দিল...থাকতে আঁধার যাই চলে...যাবার আগে র‍্যাটোকিল্ নিতে ভুলবেন না...ক্ষণকালের হয়েছিলে...এসেছিল, সে আপনার বিছানায় এসেছিল... চিরকালের নাই হলে...ছারপোকাকে থাকতে দেবেন না...খবরদার। ব্যারাকপুর থেকেই বেশ ভিড় হতে শুরু করেছে কামরায়। এখন বেশ কিছু লোক দাঁড়িয়ে। এক মহিলা আমাদের সিট দুটোর মাঝখানে দিব্যি কায়দা করে জায়গা করে নিয়েছে। ভাগ্যিস জানলার ধারটা একটু আগে পেয়ে গেছি। ভিখিরিটা মহিলাকে ঠেলে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। বাচ্চাটা সামনে এসে কটকটি বাজাল কটাকট কটাকট। সুর, তাল কোনও জ্ঞানই নেই। হাত পেতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। দেব না, দেব না, কিছুতেই আমি ওদের পয়সা দেব না। বাইরের অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে থাকব এখন। শুধু তো আর অন্ধকার নয়। বাইরে কোথাও কোথাও আলোও আছে, আবছা। বেলঘরিয়া দমদমের মাঝখানে, সিগনালে আটকে আমার কৃষ্ণনগর লোকাল। একটু দূরেই সার সার আলো। বাঁদিকের পাগলাগারদ আর কালো ঝুল গাছগাছালিগুলো পেরিয়ে গেলেই ঝলমলে আরেকটা স্টেশন এসে যাবে। তারপর কলকাতা আর কতক্ষণ।

দুই

স্টিফেন হাউসের পেছন দিয়ে বেরিয়ে, ডানদিকে ঘুরলে, সামনে মিশন রো। দুপুর বেলার অফিস পাড়া এখন নিজস্ব নিয়মে ব্যস্ত। উজ্জ্বল রোদে যেমন তেমন সাঁতার কাটছে গাড়িঘোড়া, মানুষজন। আকাশ আজ চকচকে নীল। সি.টি.সি-র সামনে সিঁড়ির ধাপে একমনে লাইটার সারাচ্ছে সেই বুড়ো লোকটা। চোখে পুরনো আমলের গোল চশমা, আধময়লা ধুতি, রংজ্বলা নীল ফুল শার্ট। লোকটার বোধ হয় ওই একসেট জামাকাপড়ই আছে। ম্যাঙ্গো লেনের মুখে খাবারওয়ালারা সার সার দাঁড়িয়ে, বসে। অফিস টাইমে এ সব অঞ্চলে কত রকম যে খাবার পাওয়া যায়। কাটা ফল থেকে শুরু করে ডিম পাঁউরুটি, ইডলি ধোসা ঢাকাই বাখরখানি পর্যন্ত। একেক মানুষের জিভ একেক রকম। ফুটপাথে লোহার

টুকটাক যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে বসেছে একজন। তার পাশে 'হরেক মাল সাড়ে ছ'টাকা।' গোটা কয়েক স্ট্রিট হকারকে পেরিয়ে এসে ডোমা জিজ্ঞাসা করল,—'কোথায় যাবে আজ? সাউথ ইন্ডিয়ান, না চাইনিজ?'

মেয়েটা আজ ওদের তিব্বতি পোশাক পরেছে। কী যেন ছাই নাম এই ড্রেসটার? ডোমা বলেছিল। ভুলে গেছি। প্রায়ই ও অফিসে এই কস্টিউমটা পরে আসে। গাঢ় নীল মোটা কাপড়ে তৈরি গলা থেকে পা অবধি লম্বা এক ধরনের কোট মতন। ওদের দেশের বিবাহিত মহিলারা নাকি এর সঙ্গে কোমরে একটা ছোট্ট অ্যাপ্রনগোছের জড়ায়। ডোমাকে ওর এই দেশীয় পোশাকেই সবথেকে বেশি মিষ্টি লাগে।

ডোমার কথায় ক্রিশ্চিন মাথা দোলাল। ওর আজ ড্রেস প্যাডল পুশার, ব্যাগি শার্ট। নীলচে চোখের এই মেয়েটা মাঝে মাঝে আবার শাড়িও পরে—'অনেক দিন হোল ইন দা ওয়ালে যাওয়া হয়নি। লেটস গো দেয়ার।'

জনের দোকানটার নিজস্ব নামকরণ করে নিয়েছে ক্রিশ্চিন। ম্যাঙ্গো লেনের ডানদিক দিয়ে যে গলিটা ভেতরে ঢুকে গেছে, তার ভেতরে একটা গলি, তারপর আরেকটা। শেষে দু-হাত চওড়া এক গলিতে জনের রেস্তোরাঁ কাম ঘরবাড়ি। দুধারে উঁচু লম্বা পাঁচিল। পেচ্ছাপের গন্ধে পুরো জায়গাটা সারাক্ষণ ঝাঁ ঝাঁ করছে। সেই উৎকট গন্ধ টপকে আমরা পৌঁছে গেছি জনের দরজায়।

বিশাল পাঁচিলের গায়ে ফালি কাঠের এক গরিব দরজা। খোলা থাকলে জায়গাটাকে গর্তের মতোই লাগে। দেওয়ালের মধ্যে গর্ত...সার্থক নামকরণ বটে। মাথা নিচু করে ঢোকার পর ভেতরে মাটির উঠোন। একদল মোরগা মুরগি বাচ্চাদের পল্টন নিয়ে অষ্ট প্রহর প্রভুর উঠোন পাহারা দেয়। তারপর সময় এলে প্রভুই তাদের ছুরির ফলায় তুলে দেয়। দুধাপ দাঁতাল সিঁড়ি ভেঙে বড় মাপের একখানা সাহেবি আমলের ঘর। ঘরের মাঝ বরাবর পর্দা টাঙিয়ে রেস্তোরাঁ আর সংসারকে আলাদা করে নিয়েছে জন। ওপাশের ওইটুকু জায়গায় বউ-বাচ্চা নিয়ে কী করে যে থাকে। রাতে নিশ্চয়ই এদিককার চেয়ার টেবিল সরিয়ে শোওয়ার ব্যবস্থা হয়। কলকাতার ঠিক পাঁজরের খাঁজে, এত অফিস কাছারির মাঝে, মানুষের এরকম বসবাস আছে ভাবাই যায় না। রোজ কতরকম ভাবে যে কলকাতাকে আবিষ্কার করছি!

টিফিনে বেশ কিছু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নারী পুরুষ এখানে লাঞ্চ সারতে আসে। তুলনায় অন্য জাতের মানুষ কম। এ সব জায়গায় আমার নিজেকে কেমন 'হংস মধ্যে বকো যথা' মনে হয়। এদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ সব কিছুর থেকেই আমি কত আলাদা। প্রথম প্রথম বেদম অস্বস্তি হত। ইংরিজি বলতে গিয়ে কথা আটকে যায়, তো তো করি, বারবার তাঁতের শাড়ির আঁচল টেনে বুক ঢাকি! মজা লাগছে শুনতে, তাই না? দেখতাম, জল থেকে তুলে হঠাৎ ডাঙায় ফেলে দিলে আপনার কেমন লাগত! এখন অনেকটাই রপ্ত করে ফেলেছি নিজেকে। প্রিট দিয়ে আঁচলটাকে দিব্যি কাঁধের ওপর সাজিয়ে রাখি। মোটেই বারবার ডান হাতে আঁচল টানি না। গত মাসে একটা সোনালি প্রজাপতি ব্রোচও কিনে ফেলেছি।

ওই যে, কোনার টেবিলে গোটা পাঁচেক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলে হইহই করছে বসে, ওদের দেখে আগে আমার বুক কাঁপত। অনাত্মীয়, অচেনা পরিবেশে কার না বুক ঢিপঢিপ করে? তবে হ্যাটস অফ টু ডোমা, ক্রিশ্চিন অ্যান্ড শার্লি। ওরা আমাকে সহজ করে কাছে টেনে না নিলে, আমি কেঁদেই মরে যেতাম। শার্লিটা আজ অ্যাবসেন্ট। আমরা তিনজন মাঝখানের টেবিলে বসেছি। বাঁ ধারে একা একজন। ঢাউস ব্যাগ নামানো রয়েছে পাশে। আজকাল এদের দেখেই চিনে ফেলতে পারি। নির্ঘাত মেডিকেল কি সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ। ক্ষুধার্ত বালকের মতো এরা খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকে। পাশে দুই মারোয়াড়িতনয় গোগ্রাসে শুয়োর গিলছে। বাজি ধরতে পারি, এদের বাড়িতে আমিষ ঢোকে না। মারোয়াড়িদের নতুন জেনারেশন পুরোপুরি ভোলচাল পালটে ফেলেছে। গদিতে বসা ভুঁড়িওয়ালা লোক মানেই মারোয়াড়ি, এই ধারণা ইদানীং অচল। উড়ুউড়ু চুল টিঙটিঙে রোগা ছেলেদুটো ককটেল সসেজ চিবোচ্ছে। বাহ্, বেশ বেশ। ভুরু কোঁচকাচ্ছেন কেন? ভাবছেন খুব কুসংস্কার আছে আমার? তাই তো? ভুল। এককালে অনেক কিছু মানতাম টানতাম! শৈশব থেকে রক্তের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে! সত্যি সত্যি যুক্তির জোয়ার যখন আসে অর্থহীন শিক্ষা, ভাবনারা খড়কুটোর মতো কোথায় ভেসে যায়। যেতে বাধ্য। এই তো খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেই দেখুন না, আমার আর আজকাল কোনও সংস্কারই নেই। জিভে যা ভাল লাগে, খাই। এর মধ্যে আর কোনও দ্বিতীয় কথা নেই।

তা হলে একটা মজার ঘটনা বলি শুনুন। একদিন অফিসে আমার বান্ধবীরা বাড়ি থেকে টিফিন এনেছে। ভাগাভাগি করে খাওয়া হবে। আমি আর কী করি? বাড়িই নেই তো টিফিন বানানো। বদরিকে দিয়ে কিছু পাকোড়া আনিয়ে নিলাম নীচ থেকে। স্টেনোরুমে গোল হয়ে বসেছি। ক্রিশ্চিন বার করল পরোটা, কাবাব, ডোমা ফ্রেঞ্চ স্যালাড, শার্লি চপসুই। দিব্যি গপগপ পরোটা মাংস গিলে চলেছি। কিছু বুঝতে পারিনি। মাংসের আঁশগুলো সামান্য মোটা লাগল যেন।

ক্রিশ্চিন হি হি হাসতে শুরু করল আমচকা,—'রাই, ডু ইউ নো হোয়াট ইউ হ্যাভ টেকেন জাস্ট নাউ?'

—'কাবাব?'

—'ইয়াহ্। বাট হুইচ কাবাব?' শার্লি চোখ মটকাল।

—'কী?'

ডোমা ঠোঁটে আঙুল চেপে হাসল,—'বিফ, ম্যাডাম, বিফ।'

—'সো হোয়াট?' আমিও স্মার্ট মেমসাহেব তখন,—'ইট ওয়াজ সো ডিলিইশাস।'

তো আমার নতুন বান্ধবীরা হল এরকম। সরল, সাদামাটা। সংস্কার আছে, গোঁড়ামি নেই। মেয়েগুলোর কাছ থেকে আরও কত কিছু যে শেখার আছে আমার। এদের সঙ্গে মেশার জন্যই কি না জানি না, মানুষের গড়া ধর্মীয় গোঁড়ামিগুলো ইদানীং আর আমাকে তেমন স্পর্শ করতে পারে না। বিয়ের সময় যে সুন্দর সুন্দর মন্ত্র পড়া হয়েছিল, দমকা ধাক্কায় তাই কোথায় ছিটকে গেল!

বেঁটেখাটো চেহারার জন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। চিন দেশের এই মানুষটির পাতলা গোঁফে সদাই নরম হাসি।

—'আজ কী দেব তোমাদের?

ডোমা আমার দিকে তাকাল, 'পর্ক চাউমিন?'

আজকাল এদের পাল্লায় পড়ে প্রায়ই পর্ক হ্যাম খাচ্ছি। মা জানলে হার্টফেল করবে। কৃষ্ণনগরেও অবশ্য চাইনিজ ফুড চালু হয়ে গেছে। তবে জনের বউ-এর রান্না তুলনাহীন। দামও সস্তা। পাঁচ টাকায় এক প্লেট চাউমিন। ভাল পেট ভরে যায়।

ডোমা বলল,—'চপস্টিক দিও।'

ক্রিশ্চিন বলল,—'আমাকেও।'

আমি এখনও এদের মতো চপস্টিক দিয়ে খেতে পারি না। জন জানে। সুন্দর করে হাসল তাই,—'অ্যান্ড ইউ ফর্ক অ্যান্ড স্পুন।'

—'রাইট। আই মাইসেলফ ইজ ফর্ক অ্যান্ড স্পুন।'

ডোমা একটা সিনে অ্যাডভান্স খুলে বসেছে। নতুন একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলে এল। পরনে টাইট জিনস, জোব্বা গেঞ্জি। কোনার দিকের টেবিলটার দিকে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল,—'হাই ক্রিশ্চিন।'

—'হাই রিচি। হাউ'জ লাইফ?' ক্রিশ্চিন হাত তুলল। এই ছেলেটির গায়ের রং বেশ কালো। ওদিকের পাঁচজনের মধ্যেও দুজনের মাত্র সাহেব রং, দুজন আধা সাহেব, একজন প্রায় নতুন ছেলেটির মতো।

রিচি বন্ধুদের টেবিলের দিকে এগোল,—'হাউ'জ ম্যাথুজ?'

—'ও ফাইন। হি ইজ লিভিং নেক্সট মানথ।'

—'ইজ ইট?'

ক্রিশ্চিন ঝিকঝিক হাসল।

—'অ্যান্ড ইউ বেবি?'

—'ওয়েল। লেট হিম সেটল ডাউন ফার্স্ট।'

বাবা রে মা, ছেলে মেয়ে দুটো কী তুফানগতিতে ইংরিজি বলে চলেছে। মনে হয় ভার্ব-টার্বগুলোকে টকাটক উড়িয়ে দিচ্ছে। আগে ওদের কথা এক বর্ণ বুঝতে পারতাম না। মনে হত গ্রিক কি হিবরু বলছে বুঝি। মাসখানে স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস করে অনেকটা আয়ত্ত করেছি। তাও মাঝে মাঝে আটকে যায়।

দু-চারটে বাক্যের পর খেই হারিয়ে ফেলি। ঠিক ঠিক শব্দগুলোকে কিছুতেই খুঁজে পাই না। গ্রামার সম্পর্কেও সচেতনতা এসে যায়। তবে এরা আমার ভুল ইংরিজির জন্য হাসাহাসি তো করেই না, বরং প্রায়ই আমার কাছে বাংলা শিখতে চায়। আমার সুবিধের জন্য টেনে টেনে কথা বলে। এমন কী আমার থেকে ভাল হিন্দিও বলতে পারে। আমি একেবারে হিন্দির মা বাপ। ভাবলে এত লজ্জা করে।

ক্রিশ্চিন বন্ধুর সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলেই চলেছে,—'ইউ নো, ডিক অলসো হ্যাড আ লঙ্ ড্রিম ফর সিডনি। ড্যাড ওয়াজ অলসো অন হিজ লেগস। বাট ইউ নো আওয়ার প্রবলেম...'

—'ইওর গ্রানপা?'

—'ইহ, দ্যাট ফুল ওল্ড ম্যান। হি ওন্ট লিভ দিস ডার্টি সিটি। সিম্পলি ক্রেজি...'

ডিক ক্রিশ্চিনের দাদা।

রিচি মুখ দিয়ে কিছু উদ্ভট শব্দ বার করল,—'তা হলে যতদিন না বুড়ো মরে অপেক্ষা করো...'

—'উই'ল হ্যাভ টু।' ক্রিশ্চিন কাঁধ নাচাল,—'দাদুকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না, ওখানে গেলে আমাদের কত সুবিধে। চাকরি, ব্যবসা, জায়গা, জমি...এ দেশ আমাদের কী দিয়েছে? গভর্নমেন্ট তো ফিরেও তাকায় না...'

ক্রিশ্চিনের ফর্সা মুখ উত্তেজনায় টুকটুকে লাল। এ ক্রিশ্চিনকে আমি চিনি না। কী দুঃখ ওদের? কেন ওরা এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায়? ঘৃণা করে শহরটাকে?

ক্রিশ্চিনের কথায় এবার তাল দিচ্ছে রিচির বন্ধুরা,—'রাইট। সমস্ত মাইনরিটি ক্লাসের জন্য গভর্নমেন্টের চিন্তা-ভাবনা আছে। এক্সেপ্টিং আস। কেন থাকব? আমিও চেষ্টা করছি জব ভাউচার পেলেই চলে যাব।'

উত্তেজিত ক্রিশ্চিন বন্ধুদের টেবিলে চলে গেছে। ডোমা আড়চোখে সেদিকে তাকাল।

—'ডোমা, ওরা সবাই অস্ট্রেলিয়ায় চলে যেতে চায় কেন?'

—'গড নোজ।' ডোমা ঠোঁট ওলটাল।

উত্তর কি সত্যি কেউ জানে না? বহু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ইদানীং এদেশ ছেড়ে চলে যেতে চাইছে। কেন? শুধুই কি জমিজমা, চাকরির আশায়? না অন্য কোনও অভিমান আছে?

আবার গলা নিচু করলাম,—'ম্যাথুজ কবে যাচ্ছে?'

—'প্রোবাবলি সেভেনটিন্থ অফ নেক্সট মান্থ। ওর জব ভাউচার এসে গেছে।'

—'তার আগে কি ক্রিশ্চিনকে বিয়ে করবে?'

—'হয়তো। এনগেজমেন্ট যখন হয়ে গেছে...'

মনটা খারাপ হয়ে গেল। ম্যাথুজ গেলে ক্রিশ্চিনও এক সময় না এক সময় চলে যাবে। একটা ভাল বন্ধু হারিয়ে ফেলব...

ডোমা ম্যাগাজিন থেকে মুখ তুলল,—'ওরা কেন চলে যায় জানি না। তবে শার্লিদের দ্যাখো। ওরাও তো এত ঘর চাইনিজ আছে। বাট দে নেভার থিংক অফ গোয়িং ব্যাক টু চায়না। ডুই ইউ নো, হোয়েন ডিড দে কাম?'

—'কবে?'

—'প্রায় আড়াইশো বছর আগে। ওদের প্রথম অ্যানসেস্টর যিনি এসেছিলেন, হি ওয়াজ এ পাইরেট। তার মাথার দাম নাকি তখন ক্যান্টনে ছিল এক লক্ষ ইয়েন।'

—'তাই?'

—'হুঁউ। খান সত্তর নাকি খুন করেছিলেন। হি ওয়াজ এ টেরর ইন সাউথ চায়না সি। ওরা কিন্তু তাঁর জন্য বেশ গর্বিত। ওরকম একটা বীরের বংশধর বলে...'

একটু ডোমার পেছনে লাগি। ঠোঁট কামড়ে হাসলাম,—'ওরা তো বীরের জাত। আর তোমরা? পায়াস...'

—'হেই, ডোন্ট টিজ মি।' ডোমা ছদ্ম ধমক দিল,—'ইউ নো, উই আর অলসো রিফিউজিস। এখানে আমরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়ে তুলেছি। সকলেরই উচিত...'

সত্যি, ভাবলে অবাক হতে হয়, এই শার্লি বা ডোমাদের শিকড় কীভাবে আস্তে আস্তে ভারতের

মাটিতে ছড়িয়ে গেছে। ক্রিশ্চিনরা কোনওদিন শিকড়টাকে ছড়ানোর সুযোগ দিল না। যাদের মূলে প্রাণরস কম, তারা তো চিরকাল নিজেদের অনাদৃত মনে করবেই। আমি যেমন। তবে আমি ক্রিশ্চিনদের মতো পালাব না। আশ্চর্য! কত বদলে গেছি দেখুন। এই আমিই না একদিন চলে যেতে চেয়েছিলাম শিকড়টাকে উপড়ে ফেলে! পৃথিবী থেকেই পালাতে চেয়েছিলাম।

ডোমা অমিতাভ বচ্চনের একটা ফুল বাস্ট মেলে ধরল,—'লুক্, শার্লিজ হিরো। সো রাগেড...'

শার্লি মেয়েটা খুব হিন্দি ফিল্ম দেখে। একটু গোল চেহারা, গায়ের রং কাঁচা হলুদ। বড় বড় ঝুলের স্কার্ট-ব্লাউজ পরে। মাঝে মধ্যে পাজামা-কুর্তা। শার্লির পায়ের কাফ দুটো ভারী সুন্দর। পুরুষ্টু থোড়ের মতন। ক্ষুদি ক্ষুদি চেরা চোখ আর চ্যাপটা নাকে হাসলে মেয়েটাকে এত সুন্দর দেখায়। তবে চেহারা যে তুলনায় ভারী, সেই অনুপাতে বুক দুটো ছোট্ট। কিশোরীর স্তন যেমন। বরং ডোমা, ক্রিশ্চিনের ফিগারে অনেক বেশি যৌবন। তবে যাই বলুন, আমাদের দেশের মেয়েদের মতো শরীর কিংবা বুকের গড়ন তেমন বিশেষ দেখলাম না। না, তর্ক করবেন না। এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত মতামত।

কার কথা বলতে কোথায় চলে যাচ্ছি। শার্লির গল্প বলছিলাম। তো হ্যাঁ, মেয়েটা সব মিলিয়ে ডল-পুতুল ডল-পুতুল। ডোমার মুখেও পুতুল ভাব কিছুটা আছে। তবে ওর মতো নয়। আমাদের পুতুল পুতুল সেই শার্লি হিন্দি সিনেমার পোকা। ইংরিজিরও। সিলভেস্টার স্টালোন আর অমিতাভ বচ্চন ওর স্বপ্ন-প্রেমিক। আরেকজনও আছে। ওর বয়ফ্রেন্ড। চি সান বিং, না ওই ধরনের কী একটা নাম। ওরাও শিগগির বিয়ে করবে।

জন এখনও খাবার দিল না। এদিকে ভাজা খাবারের গন্ধে ম ম চারিদিক। ক্রিশ্চিন এখনও বন্ধুদের টেবিলে। কত সহজেই ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পারে এরা বন্ধুর মতন। আমাদেব কথা ভাবুন। ছেলে মেয়েদের সহজ বন্ধুত্বকে আমরা মেনে নিতে পারি কি? এখনও?

ডোমার হাত থেকে বইটা কেড়ে নিলাম,—'অনেকক্ষণ বচ্চনকে দেখেছ। এবার তোমার কথা বলো।'

—'অ্যাবাউট হোয়াট?'

—'আহা, জানো না যেন। সানি কেমন আছে? অনেকদিন ছুটির পর তোমাকে নিতে আসছে না...।'

ডোমার শুঁয়োপোকা রং হালকা ভুরু জোড়া চওড়া কপালে লাফালাফি করে নিল খানিক। ফোলা গালে লাজুক হাসি,—'থিম্পু গিয়েছিল পেরেন্টসদের কাছে...'

—'সবাই তো বিয়ে করছে। শার্লি, ক্রিশ্চিন। তোমারটা কবে? থিম্পু আর লাসার মিলন?'

ঈষৎ চৌকো তিব্বতি রমণীর মুখে এবার রঙিন আভা।—'নট ডিসাইডেড ইয়েট। তা ছাড়া আর একটু মাইনে কড়ি বাড়ুক। লিভারসে একটা চান্স পেতে পারি...'

—'তুমিও চলে যাবে?' মুহূর্তে আমার মুখ শুকিয়ে গেছে।

—'বাহ্, এখানে আটশো টাকায় পড়ে থাকলে চলবে নাকি? শালিও তো চেষ্টা করছে রেমিংটনে...'

বুকের কাছটা কেমন যেন করছে আমার। শুধু ওরা চলে যাবেই বলে কি? আমি কবে ওদের মতো একটা ভাল চাকরি পাব? এভাবে মাত্র ছশো টাকায়...। আমার সত্যিই একটা ভাল চাকরির খুব দরকার। এই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর বোধটা আরও কয়েকটা বছর আগে যদি আসত। এত দুর্ভোগ হত না তা হলে। স্বাধীনতাতেই বুঝি মানুষের প্রকৃত মুক্তি। উদার আকাশে ডানামেলা সেই মুক্তি কবে পাব আমি? এই মেয়েগুলোকে দেখুন। শিখুন এদের কাছ থেকে কিছু। কত স্বাধীন এই মেয়েগুলো, পাখির মতো, ফুলের মতো। নিজেদের সম্পর্কে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে জানে। নিজস্ব অর্থনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ছাড়া ঘর-সংসার বসানোর কথা এরা ভাবতেও পারে না। বেশির ভাগ বাঙালি মেয়ে যদি এভাবে ভাবতে জানত! আঘাত না পাওয়া পর্যন্ত তারা বুঝতেই পারে না পরগাছা জীবন কত অসহায়।

বাবাঃ, জন এতক্ষণে খাবার দিয়েছে। গরম নুডলস বেয়ে গন্ধ উঠছে ভুরভুর। পেটে যেন বঁড়শির টান পড়ছে। চোখের সামনে খাবার এলে মানুষ খিদের তীব্রতা আরও ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

খেতে খেতে ক্রিশ্চিন জিজ্ঞাসা করল,—'রাই, এত চুপচাপ কেন? কী ভাবছ?'

—'ডোন্ট ডিস্টার্ব হার।' ডোমা ফোড়ন কাটল,—'রাই এখন বয়ফ্রেন্ড-এর কথা ভাবছে। একটু

আগেই আমাকে...'

—'ইজ ইট? কার কথা ভাবছ রাই? সিনহা?'

ধপাস করে পাহাড়চূড়া থেকে কাদায় পড়ে গেলাম। রাম নয়, অর্জুন নয়, কোত্থেকে এক ছাগলকুমার এসে হাজির! হাসতে গিয়ে প্রায় বিষম খেয়ে ফেলি।

—'আর ইউ টকিং অ্যাবাউট দ্যাট স্মল গোট?'

—'ডোন্ট বি সো ক্রুয়েল। আমি দেখেছি ও অফিসের সব কাজ ফেলে শুধু তোমার দিকেই তাকিয়ে থাকে।'

—'সিনহা সেদিন রাই-এর চুলের প্রশংসা করছিল'

—'সিনহা সেদিন রাই-এর ঠোঁটের প্রশংসা করছিল...'

—'লেগ পুলিং হচ্ছে?' চোখ ঘোরালাম,—'আমি একদিন ঠিক তোমাদের সিনহার কান মুলে দেব।'

হালকাভাবে বলছি বটে, তবে ওই অজয় সিনহার বোকা বোকা আচরণ আমার আদৌ পছন্দ নয়। অফিসে জয়েন করার পর থেকেই ওই ব্যক্তিটি আমার পেছনে ঘুর ঘুর করছে। কথায় কথায় রিসেপশন কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ায়। হাসে অবোধের মতো। কিছু লোক আছে, মেয়ে দেখলেই কেমন কাঙাল হয়ে যায়। তবে সিনহা আমার সমস্যা নয়। আমি ঘাবড়ে আছি আরেকজনকে নিয়ে। কীভাবে যে সিদ্ধার্থকে এড়ানো যায়।

ক্রিশ্চিন আচমকা প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা রাই, হোয়াটস দা মিনিং অফ ইওর নেম?'

খাওয়া শেষ করে মুখ মুছলাম,—'রাই মিনস রাধা। শি ওয়াজ ওয়ান অফ আওয়ার রিলিজিয়াস হিরোইনস। মহিলার বড় দুঃখ ছিল । ইউ নো, হার হাজব্যান্ড, আয়ান ঘোষ ওয়াজ অ্যান ইম্পোটেন্ট ওয়ান। কৃষ্ণ নামের এক ভগবানের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়! ডেন্স অ্যান্ড রিয়েল লাভ।'

ডোমা ভুরু নাচাল,—'আই নো সামথিং অ্যাবাউট ইওর লর্ড কৃষ্ণা। হি ওয়াজ এ গ্রেট ফ্লার্ট।'

—'রাইট। কৃষ্ণের হাজার এক প্রেমিকা। তবে রাধা বেচারি তাকে ভালবাসত সব থেকে বেশি। শি ওয়াজ ম্যাড আফটার হিম।'

—'দেন?'

—'তারপর আর কী? রাধাকে ফেলে কৃষ্ণ একদিন রাজা হওয়ার জন্য মথুরা চলে গেল। অ্যান্ড হি নেভার কেম ব্যাক।'

—'রাধার কী হল?'

—'কেঁদে কেঁদেই কাটাল জীবনটা। তার কথা আমাদের রাইটাররা আর কেউ লেখেনি। শেষ পর্যন্ত হয়তো ওই ইম্পোটেন্ট হাজব্যান্ড-এর সঙ্গেই লাইফেব বাকিটা...'

—'কৃষ্ণা ডিডন'ট কাম ব্যাক টু হার?'

—'নেভার। যে রাধাকে সে অত ভালবাসত তার কাছে আর কোনওদিন ফিরে আসেনি। অ্যান্ড দিস ইজ দা অবভিয়াস ফেট অফ আওয়ার হিরোইনস।'

—'স্ট্রেঞ্জ।'

—'আরও স্ট্রেঞ্জ কী জানো? হি হ্যাড সো মেনি ওয়াইভস। বাট হি নেভার থট অফ ম্যারিং রাধা।'

ডোমা আমার কনুই-এ চিমটি কাটল,—'তোমার কৃষ্ণ কোথায়? আছে, না ছেড়ে চলে গেছে?'

হায়রে, তোরা যদি জানতিস, আমার কৃষ্ণ আমার দিকে চোখ তুলে তাকালই না কোনওদিন। কাছেই যে এল না, তার আবার চলে যাওয়া! শুধু নোংরা আয়ান ঘোষটা এসে আমাকে ঘেঁটেঘুঁটে...

ঘড়ির দিকে তাকালাম,—'অফিস ফিরতে হবে না? আড্ডা মারলেই চলবে?'

তিনজন পা চালিয়ে ফিরছি। এখনও সি.টি.সি-র সামনে বসা বুড়োটা লাইটার সারিয়ে চলেছে। জীবনভোর বুঝি ঘসে ঘসে আগুনই জ্বালাতে চায়। কয়েকটা বাঙালি মেয়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করতে করতে হাসিতে ফেটে পড়ল। একটা বাচ্চা ছেলে নীলহাট হাউসের গায়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাটা পেঁপে বিক্রি করছে। ওর পাশে আরেকজন শরীর ভেঙে দাঁড়িয়ে। চেনা চেনা যেন। আমরা কাছাকাছি যেতেই চোখ থেকে সানগ্লাস নামাল। কী ভীষণ শীতল দৃষ্টি। কিছু কিছু মানুষের চোখ এমন আততায়ীর মতো হয়। আমার গোটা শরীর শিরশির করছে। চিনেছি, চিনেছি। লোকটাকে নয়।

দৃষ্টিটাকে। ও চোখ অনিমেষের। ও চোখ আমাকে খুঁড়ে খুঁড়ে রক্তাক্ত করতে চায়।

রিসেপশন কাউন্টারে ঢুকে পড়েও হাঁপাচ্ছি। অনিমেষকে আর মনে করতে চাই না। তবু কেন ও হঠাৎ হঠাৎ এ রকম হিংস্র ছায়া ফেলে আমার ভেতরটায়। আমার ভয় করে। ভীষণ ভয় করে। চোখ ছাপিয়ে কান্না আসতে চায়। একটা শয়তান, লম্পট লোক...

সিনহা এসে যথারীতি দাঁড়িয়েছে সামনে।

—'ম্যাডাম, টিফিন করে ফিরলেন?'

মেজাজটা বিগড়ে গেছে। প্রায় খেঁকিয়েই উঠলাম,

—'আপনার কি মনে হয় নাচতে গিয়েছিলাম?'

লোকটা দাঁত বার করে হাসছে। অপমানও বোঝে না। নিজেকে সামলে নিলাম। এ লোকটার ওপর রাগ করা বোকামি।

—'আপনি আর কিছু বলবেন?'

—'না।' সিনহার চোখ অভ্যাসবশত আমার বুকের দিকে। তবে এ চোখে খিধেটুকুই সার। মুখের কাছে তুলে দিলেও এ চোখ কিছুতেই খেতে পারে না। কেমন যেন নির্জীব, প্রাণহীন। এরা বিপজ্জনক নয়।

—'আপনার একটা ফোন এসেছিল।'

—'কোত্থেকে?'

—'কী যেন, সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী না কী যেন নাম...আপনাকে রিংব্যাক করতে বলেছেন।'

—'ঠিক আছে।'

—'উনি কে হন আপনার? দাদা?'

—'না।'

—'বন্ধু বুঝি?'

—'আপনার জানাটা খুব দরকার?'

—'না...মানে...'

জার্মান স্পিৎজ-এর মতো ধমক খেয়ে লোকটা লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে। আজকের মতো। হাসি পেয়ে গেল। কত রকম মানুষ আছে দুনিয়ায়। পড় না পড়, সিদ্ধার্থর ফোন এরই হাতে!

কিন্তু আমি এখন সিদ্ধার্থকে মোটেই ফোন করছি না। তার থেকে অনেক বেশি জরুরি কাজ জমে আছে হাতে। জি পি ও থেকে আসা চিঠিগুলো সর্ট আউট করে ফেলতে হবে বস লাঞ্চ থেকে ফেরার আগেই।

তিন

পৃথিবীতে যদি অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা থাকে, তবে তার একটা নিশ্চয়ই সন্ধেবেলা আমার হোস্টেলের ছাদ। শান্ত অন্ধকারে হেলান দিয়ে আকাশ এখানে রাজ রাজেশ্বর। সূর্য ডুবে গেলে তখন তিনি সভায় আসেন। কোনওদিন গায়ে আলগা জড়ানো চাঁদনি মসলিন, কোনওদিন শুধুই সহস্র তারার পেশোয়াজ। অফিস থেকে ফিরলেই ওই আকাশরাজ ডাকে আমাকে। পায়ে পায়ে ওপরে উঠে আসি। এ সময় দোতলায় বারান্দা প্রায় নির্জন। অনেক বোর্ডারই দেরিতে ফেরে। বাকিরা হয় অফিসরুমে টিভির সামনে, নয় যে যার কুঠুরিতে। এ বাড়ির ঠিক পেছনে গাছ আর আগাছায় ভরা পোড়ো বাড়ি। ছাদে ওঠার সিঁড়ি থেকে বাউন্ডারিসুদ্ধ পুরো বাড়িটা দেখা যায়। ছমছমে অন্ধকারে ভাঙা প্রাসাদটা ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এত বড় বাড়িতে কোনও জনপ্রাণী নেই। বিশাল বিশাল দরজা জানলাগুলো সবসময় বন্ধ। ইদানীং বন্ধ গেটের গায়ে দু-একটা ঠেলাওয়ালা রিকশাওয়ালা ডেরা বেঁধেছে। কলকাতার এ সব পুরনো অঞ্চলে এখনও এরকম কিছু প্রাসাদ পড়ে আছে, অযত্নে, অবহেলায়। হাইকোর্টে নাকি বহুকাল ধরে শরিকি মামলা চলছে। যে শহরে থাকার জায়গার এত অভাব সেখানে এত বড় একটা বাড়ি শূন্য পড়ে আছে ভাবা যায়! তা যতদিন থাকে থাক। ওদিক থেকে মাঝে

মাঝে ভারী মিষ্টি সব ফুলের গন্ধ আসে।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ওদিকে তাকালেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। কৃষ্ণনগরের বাড়িতেও আমাদের একটা ছোট্ট বাগান ছিল। কতরকম যে ফুলের গাছ ছিল সেখানে। গন্ধরাজ, পারুল, হাসনুহানা। আমার বিয়ের সময় বাবাকে ওদিককার জমিটুকু বিক্রি করতে হয়েছে। হাজার দশেক নগদ দেওয়ার দরকার ছিল। আমাকে অবশ্য তখন সে কথা জানানো হয়নি। পরে জেনেছি। এখন ওখানে দাসবাবু লেদমেশিন বসিয়েছে।

একটা একটা করে করে সিড়ি ভেঙে ছাদে উঠছি। শরীরে আজ বড় ক্লান্তি। বেজায় খাটুনি যাচ্ছে অফিসে। ছ'শো টাকা মাইনের পুরোটা কড়ায় গণ্ডায় উশুল করে নেয় মালিকেরা। রিশেপশনিস্ট কাম টেলিফোন অপারেটর কাম টাইপিস্ট কাম ডেসপ্যাচ ক্লার্ক। তাও এ চাকরি বরাতজোরে জুটেছে। বরাত জোরে? নাকি দয়ার জোরে? মীরাদির সঙ্গে শালিনীর যদি পরিচয় না থাকত, কিংবা শালিনীর মার্গারেটের সঙ্গে, এ চাকরি আমি পেতাম না। মার্গারেট মেমসাহেবের এক কথায় মালহোত্রা সাহেব নিয়েছেন আমাকে। আরেকটাও অবশ্য 'না থাকত' আছে। সেটা আজকাল মনেই থাকে না। মীরাদিই অনেক কাছের মানুষ হয়ে গেছে যে। মীরাদির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আবার মেসোর মাধ্যমে।

ফাল্গুনের বাতাসে টিভির অ্যান্টেনাটা মৃদু দুলছে। এ সময়ে ছাদে বড় একটা কেউ আসে না। ফোলডিং মাদুর পেতে একলা শুয়ে থাকি। শুয়েই থাকি। যতক্ষণ না রাত বাড়ে, যতক্ষণ না নীচে থেকে খেতে যাওয়ার বেল বাজে। আকাশ ছাড়া আমাকে কেউ দেখতে পায় না। পাশের বাড়ির তিনতলা থেকে, যে আধবুড়ো লোকটা সবসময় উঁকিঝুঁকি দেয় এদিকে, সেও না। কোমর-সমান কার্নিশে চারদিক আড়াল। নাগরিক আলোর ঝাঁক ঝাঁক রশ্মিগুলোও সে আড়ালে থমকে যায়। কপাল জুড়ে লেপটে যাওয়া টিপের মতন নরম অন্ধকারে শুধুই তাদের আবছা আভাস। সেই আবছা আলোর পর্দা সরিয়ে বাদশাহি ভঙ্গিতে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় আকাশ।

—'আজ কেমন আছ রাই?'

—'মহারাজ, সিদ্ধার্থকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি।'

—'বিপদের কী আছে? তোমার কথা তুমি তাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দাও।'

—'আমি যে সেটাই পারি না সম্রাট। সিদ্ধার্থ তো ছেলে খারাপ নয়। এত বড় শহরটায় ওই আমার প্রথম বন্ধু। কেন যে হঠাৎ পাগলামিতে পেল ওকে?'

—'নিজের মনকে প্রশ্ন করে দেখেছ?'

—'দেখেছি। অনেকবার দেখেছি। ওকে আমি বন্ধু ছাড়া ভাবতেই পারি না। কেন এমন হল? কেন সিদ্ধার্থও আমাকে শুধুই বন্ধু বলে ভাবতে পারল না?'

—'হয়তো ওর কাছে তুমিই আলাদা আকর্ষণ...'

—'কচু, কচু। কী আছে আমার? কিস্যু নেই। একটা মফস্বলের ক্যাবলা আনস্মার্ট মেয়ে...'

—'না, ওটা আসলে মনভোলানো কথা। তুমি হচ্ছ সুবিধাবাদী। সিদ্ধার্থকে কিছু বলতে পার না কারণ সে মীরাদির ভাই। তুমি ভয় পাও তা হলে হয়তো তোমার কলকাতার মাটিটা...'

সত্যিই কি আমি তাই? স্বার্থপর? সুবিধাবাদী? ঠিক আছে, এরপর সিদ্ধার্থর সঙ্গে দেখা হলে খোলাখুলি কথা বলব। বলে দেব, ভাই, আমাকে মাপ করো। একবার যখন দড়ি ছিঁড়ে মুক্ত হতে পেরেছি, আর সে দড়ি গলায় বাঁধতে চাই না। সে তুমি যতই প্রেম নিয়ে আমার কাছে আসো না কেন।

ভাবছি বটে, সত্যি সত্যি দেখা হলে বলতে পারব তো? যা চাই না, তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার মতো মনের জোর আমার কোনওদিনই নেই। যা চাই, তাই বা মুখ ফুটে বলতে পারলাম কই! মনের কথাগুলো সব আমার মনেই রয়ে যায়।

ছাদের ঠিক মাঝখানে মাদুর পেতে আমি। গলির মোড়ে পাড়ার ছেলেরা যথারীতি গলাফাটানো আড্ডা জমিয়েছে। টুং টুং রিকশা ছুটছে এদিক-ওদিক। প্রপার কলকাতায় কোনও সাইকেল-রিকশার চল নেই। এখানে এখনও মানুষ মানুষকে টানে। পাড়া কাঁপিয়ে একটা লরঝরে টেম্পো লাফাতে লাফাতে চলে গেল ল্যান্সডাউনের দিকে। এ সময় সামনের রাস্তাটা দিয়ে প্রচুর গাড়িঘোড়া চলে। যদুবাজার থেকে পদ্মপুকুর যেতে এটাই সব থেকে শর্টকাট রুট কিনা। আমাদের হোস্টেলের দরজায়

ঢং ঢং বাজাচ্ছে চুরমুরওয়ালা। সব মিলিয়ে নীচে এখন কতরকম শব্দ। ওপর থেকে শোনাচ্ছে ঠিক কনসার্টের মতন। সমস্ত কোলাহল মিলে মিশে কেমন যেন ঝিমঝিম শব্দস্রোত ভাসছে বাতাসে। সেই শব্দ আর আলো পেরিয়ে আকাশ আবার কখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—কী মেয়ে, এত মুখ শুকনো কেন?

—'ভাল লাগছে না। বড্ড টায়ার্ড।'

—'শুধুই টায়ার্ড? দাদার চিঠি পাওনি?'

—'পেয়েছি। এই তো ফিরেই পেলাম।'

—'মন খারাপ হয়ে গেছে তো?'

—'হুঁ।'

—'বাহ্, সেদিন কীরকম মেজাজটা দেখিয়ে চলে এলে। তোমার অভিমান হয়, ব্রতর হতে পারে না?'

—'তাই ওরকম সেন্টিমেন্টাল চিঠি লিখবে?'

—'তোমারও দোষ আছে।'

—'কী দোষ?'

—'নীলাঞ্জন আসবে শুনে পালিয়ে আসতে চাইলে, ভাল কথা...তা বলে বাড়ির সবার সঙ্গে ওরকম ব্যবহারটা করে এলে কেন?'

—'কেন করব না? কেন দাদা ওকে আমার সব খবর বলতে গিয়েছে? আমি কারুর করুণা চাই না। তা ছাড়া আমাদের ফ্যামিলির একটা প্রাইভেসি আছে। কেন দুনিয়ার লোক আমার কথা জানবে?'

—'দুনিয়ার সব লোক আর নীলাঞ্জন কি এক হল রাই?'

—'নিশ্চয়ই। আমার সঙ্গে ওর কীসের সম্পর্ক?'

—'নীলাঞ্জন ব্রতর বন্ধু। খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

—'সেজন্য সব কথা ভ্যাক্‌ভ্যাক্‌ করে বলে দিতে হবে?'

—'আহা, এত রেগে যাচ্ছ কেন? ব্রতর আরও অনেক বন্ধু তোমার কথা জানে। সমীরণ, মুকুল...'

—'ওরা আমাকে নিজের বোনের মতো ভালবাসে। তা ছাড়া ওরা খুব ভাল।'

—'নীলাঞ্জন খারাপ?'

—'তাই বলছি নাকি? আমার কথা কেউ বুঝতে পারে না...'

—'খুব বুঝি রাই...'

—'দাদার মুখে শুনে সে নাকি খুব শক্‌ড্‌। কেন দাদারা অনিমেষকে এমনি এমনি ছেড়ে দিয়েছে...কেন উচিত ব্যবস্থা নেয়নি...'

—'হতেও তো পারে। তোমার শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের কাহিনী শুনলে যে কোনও লোকেরই রাগ হয়, খারাপ লাগে...'

—'কী এসে গেল তাতে? বলছি তো, আমি কারুর সিমপ্যাথি চাই না। কারুর না। নীলাঞ্জনের তো নয়ই...'

—'অথচ তুমি তার কথাই ভাব। বিয়ের পরও তার জন্য মন কেমন করত তোমার। একা থাকলেই...'

—'করত, করত। তার জন্য তুমি আমাকে বাজে মেয়ে বলতে পারো। স্বামী ছাড়াও মনে মনে অন্য আরেকজনকে...'

—'পাগল মেয়ে। আমি কি তাই বলছি নাকি?' আকাশ হঠাৎ নরম হাওয়ার হাত বোলাল মাথায়,—'স্বামী যদি তোমার তেমন হত, কবেই তুমি নীলাঞ্জনকে ভুলে যেতে, যেতেই। কোথাও কোনও ফাঁক না থাকলে মন কখনও অন্যদিকে যায় না।'

—'আমার ভীষণ ওকে দেখতে ইচ্ছে করছে।'

—'এই শনিবার তবে চলে যাও। ও তো এখন বদলি হয়ে কৃষ্ণনগরেই ফিরে এসেছে।'

—'হুঁ। কতদিন যে ওকে দেখিনি...'

—'তবে এবার ব্রতকে সব খুলে বোলো। কখনও যা বলতে পারোনি...'

—'না। যাব না। আমার কান্না পাচ্ছে। যে আমার দিকে কোনওদিন ফিরে তাকাল না পর্যন্ত, জানল না আমার মনের কথা, তার কাছে ভিখিরির মতো...'

আকাশ বুঝি চোখ বুজল। পাতলা সরের মতো কোথা থেকে এক ফালি মেঘ এসে হাজির। ডান দিকের হলুদ তারাটা কুট্ করে শরীর মটকাল। কোনও তারাকে টিপটিপ করতে দেখলেই ছোটবেলায় বন্ধুরা একে অন্যের চোখ চেপে ধরত,—'বল, বল, বল, তোর আমার ক' চোখ?'

—'চার চোখ।'

—'আবার বল।'

—'চার চোখ বাবা, চার চোখ।'

আমাদের ক্লাসের নূপুর খুব দুষ্টু ছিল। কখনও ঠিক উত্তর দিত না। ছোটদের কতরকম মজার মজার সব সংস্কার থাকে। চুলে যদি চুল জড়াল, অমনি তবে দোষ কাটাও। বলো, 'চুল? না ফুল?'

নূপুর বলত,—'চুল।'

—'এই না, হবে না। ঠিক উত্তর দাও। বলো ফুল।'

—'কেন চুলকে ফুল বলব? বলব না।'

—'ভীষণ অসভ্য তুই।'

এভাবেই ঝগড়া করতে করতে নূপুরের সঙ্গে পুরো দু মাস আড়ি। তারপর যেই ভাব, অমনি ডাব ডাব ডাব। শৈশবের দিনগুলো কী যে নির্মল থাকে!

—'তুমি সেই ছোট্ট মেয়েটাকে জানতে আকাশ? সেই যে গো, কথায় কথায় যার ঠোঁট ফুলে কমলার কোয়া আর চোখ টিপলেই পাতি লেবুর জল! জানুয়ারির এক কনকনে ভোরে সে সেজেগুজে তৈরি। প্রথম দিন স্কুলে যাবে। কাছেই একটা নার্সারিতে। তবু মায়ের দুশ্চিন্তা কত। যদি মেয়ে হারিয়ে যায় অনেক মেয়ের মধ্যে? বড় কাগজে গোটা অক্ষরে নাম ঠিকানা লিখে, সেফটিপিন দিয়ে সেঁটে দিল মেয়ের বুকে—রাইকিশোরী চৌধুরী, ষষ্ঠীতলা, কৃষ্ণনগর। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে অবধি মেয়ের কী উৎসাহ। তারপর যেই না এসেছে সিঁড়ির কাছে, অমনি বুক ভর্তি দুকদুক শব্দ, পাখির ছানা প্রথম আকাশে উড়তে যেমন ভয় পায়।...আমি যাব না। কোথথাও যাব না। কাঁদতে কাঁদতে তুলতুলে নীল পাখির বাচ্চাটার গাল ভর্তি কাজল। লাল রিবনের ফুল গোলাপের মতো ফুটে আছে এইটুকুন দুই বিনুনিতে।...কাঁদছিস কেন বোকা মেয়ে? একটু পরেই তো বাড়ি চলে আসবি। স্কুল ছুটি হলেই...মেয়ে তবু কাঁদে আর কাঁদে। বাবা কোলে তুলে নিয়ে চলল পৌঁছে দিতে। এভাবেই তো বাবা মায়েরা একটু একটু করে পথ চিনতে শেখায়।...চল, স্কুলে দেখবি কত বন্ধু, কত খেলনা। ভিতু পাখিটা তবু ছিটকে ছিটকে যায় কোল থেকে। ধুলোটুলো মেখে একশা।...ছি মা, এরকম করে না। স্কুলে না গেলে বড় হবে কী করে? মার মতন? শুনে মেয়ে গুটিশুটি ওঠে। ফের কাঁদতে বসে পা ছড়িয়ে। এভাবেই আশায়, কল্পনায়, ভয়ে, শঙ্কায় রাইকিশোরী শেষে পৌঁছে গেল স্কুলে। তার প্রথম বাইরের জগৎ। তারপর ধাপে ধাপে হাইস্কুল...কলেজ...শ্বশুরবাড়ি...তারপর মহাসাগরের মতন এই বিশাল আরেকটা...। জানো আকাশ মহারাজ, চোখ বুজলেই আমি ছেলেবেলার সব কথা মনে করতে পারি। একেবারে ডিটেলসে...'

—'সবাই পারে।' আকাশ হাসছে ঝিকঝিক,...'জীবনের সবথেকে সুন্দর আর নিশ্চিন্ত দিন যে ওগুলোই।'

—'তারপর কীভাবে হঠাৎ একদিন বড় হয়ে গেলাম...'

—'হুঁ, মেয়েদের বড় হওয়াটা ফুল ফোটার মতো। সবুজ কুঁড়ি ক্রমশ পরিপূর্ণ হতে হতে, চাঁদের কলার মতন, একদিন সব পাপড়ি ছড়িয়ে দেয়। কী মধুর অথচ তীব্র ঘ্রাণ তখন তাদের শরীরে, মনে...'

—'বাজে কাব্য কোরো না তো। মেয়েদের বড় হওয়াটা খুব যন্ত্রণার, খুবই যন্ত্রণার। বিশ্রী কটকটে ব্যথার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ একদিন বড় হওয়া আসে। প্রথম বার আমি কী ভয়ানক ভয় পেয়েছিলাম!...মা, কেন এমন হল?...দূর কাঁদছিস কেন বোকা মেয়ে? সব মেয়েরই হয়। আজ থেকে তুই বড় হয়ে গেলি। চন্দনা বলত, মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই অভিশাপ। আগের জন্মে অনেক পাপ করলে...শরীর জুড়ে

একশো জটিলতা। কতরকম ভয়। এ ছাড়াও আছে হাজার শাসন, অনুশাসন সেই বুড়ি হয়ে না মরে যাওয়া পর্যন্ত। আর পুরুষের ছড়ি ঘোরানো লাল চোখ...বিশ্রী।'

—'তুমি ঠিক বলছ না রাই। নারীজীবনে শুধুই কি দুঃখ? আনন্দ নেই? রোমাঞ্চ? কিশোরী বয়সটাকে মনে করো...'

—'হ্যাঁ ওই বয়সটাই তো শুধু স্বপ্ন দেখার। ঠিক, ঠিক। তখনই তো নীলাঞ্জনকে প্রথম...আসলে ওই চন্দনাটা...নিজে প্রেম করছিল কিনা, সমীরণদার সঙ্গে, তাই আমাকেও খেপাত। নীলাঞ্জনকে দেখলেই খালি চোখ টিপত আমাকে...'

—'তোমারও ভাল লাগত। লাগত না?'

—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কী রোমাঞ্চ ছিল ওকে লুকিয়ে দেখায়। নীলাঞ্জন সত্যিই সুন্দর। ঠিক স্বপ্নের প্রেমিক যেমন।'

—'তারপর?'

—'তারপর আর কী? ও তখন কলেজে, আমি স্কুলে। তারপর দ্যাখ না দ্যাখ, ও ইউনিভারসিটি, আমি কলেজ...'

—'আর?'

—'আর কী? কিছুই না। বড় লাজুক দাদার ওই ভাল ছেলে বন্ধুটা। কোনওদিন চোখ তুলে ভালভাবে কথাই বলল না আমার সঙ্গে। আমিই শুধু মরে রইলাম। প্রথম যৌবনের আবেগ বড় কষ্ট দেয় গো। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে শুনতে চোরা চোখে শুধু দেখি আর দেখি। দাদাকে ডাকতে এলে দেখি। রাস্তায় দেখি। ক্রিকেট মাঠে ছুটে দেখে আসি ওকে। ওর কত কত গুণ। লেখাপড়ায় সেরা, স্পোর্টসে ইউভারসিটির ব্লু। আমি সে তুলনায় নিতান্তই সাধারণ। হায়ার সেকেন্ডারি সেকেন্ড ডিভিসন, পাসে বি এ...

—'ভালবাসার সঙ্গে এ সবের কোনও সম্পর্ক নেই।

—'জানি। তবুও...আসলে ওর চোখদুটো...নিয়তির মতো আকর্ষণ যেন ওর চোখে...'

—'এতই যদি, কেন প্রকাশ করনি নিজেকে? ব্রতকেও তো বলতে পারতে...'

—'হায় রে, সত্যি যদি পারতাম! বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাওয়ার পরও ছুটে গেছি ওদের বাড়িতে। বোকার মতন। কেন যে গিয়েছিলাম? মাসিমা আমাকে দেখে অবাক স্বাভাবিকভাবেই...কী হয়েছে রে রাই? হাঁপাচ্ছিস কেন?

—'আমার তখন যা রাগ হচ্ছে নিজের ওপর কথা খুঁজে পাচ্ছি না যে,...দাদা এসেছে?'

—'না তো। কিছু হয়েছে নাকি তোদের বাড়িতে? তোর মুখচোখ এমন কেন? ভাগ্যিস নীলাঞ্জন তখন বাড়ি ছিল না! ভাগ্যিস মাসিমা কখনও জানতে পারেননি দাদা তখন বাড়িতেই। একটু আগে ফিরেছে শিবপুর থেকে। বাবা আর দাদা। পাকা কথা বলে।'

—'তারপর অনিমেষ।'

—'হ্যাঁ, অনিমেষ। রাইকিশোরীর দুঃস্বপ্ন। রাইকিশোরীর জ্বালা।'

—'আর?'

—'আর রাইকিশোরীর প্রথম পুরুষ। স্বামী, প্রভু...'

—'আর?'

—'আর ঘৃণা।'

—'কেন অমন হল রাই? নীলাঞ্জনের জন্যই কি...'

—'কখ্খনো না। নীলাঞ্জনকে তখন ভুলতেই চেয়েছিলাম। বারবার মনকে বুঝিয়ে...'

—'মন বুঝেছিল?'

—'না বুঝলে বিয়ের দুদিন আগে রাতভোর অচেনা মানুষটাকে স্বপ্ন দেখব কেন? কত কী নতুন নতুন কল্পনা...চন্দনা বলেছিল, তোর বরের ছবিটা কিন্তু বেশ। একটু মোটাসোটা, মন্দ নয় তবু...অনিমেষ তো সুপুরুষই, সুদর্শন, বিরাট ব্যবসার মালিক। আমার আর কীসের অভাব?...ফুলের রথে করে সে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে দূরে, অনেক দূরে যাওয়ার আগে সে কী কান্না, শরীর নিংড়ে, বুক নিংড়ে।

এতদিনের পরিচিত মানুষজন, আপনলোকেরা সব পর হয়ে গেল। দুদিনের মাত্র অনুষ্ঠানে মেয়েরা কোথা থেকে যে কোথায় চলে যায়! সেফটিপিনে সাঁটা ঠিকানাটা বদলে গেল হঠাৎ, শুধুই কটা মন্ত্রের জোরে। আজ থেকে আমি আর কেউ নই কৃষ্ণনগরের। যত ভাবছি চোখ ফেটে জল, জল। চিরকালের মতো কিছু ফেলে যাওয়া যে কী কষ্টের! ছোট মাসি বারবার গালে তুলি টানে,...এই মেয়ে, আর একদম কাঁদবি না বলে দিলাম। তোর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমাদের নিন্দে করবে। বলবে, মেয়েটাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়েও পাঠায়নি।...বলেছিল নাকি সত্যি সত্যি? ওরা কেউ? শাশুড়ি? দুর্গাপুরের ননদ?'

—'ওরা কিন্তু সবাই বলেছিল খাসা বউ হয়েছে।'

—'অস্বীকার করছি নাকি? বলেছিলই তো। পাড়াপ্রতিবেশী, জ্ঞাতিগুষ্টি। নতুন বউ বাড়িতে এলে ওই বাক্যটা সবাই বলে, সামনাসামনি। বলতে হয়।'

—'এটা তোমার রাগের কথা।'

—'না গো না। রাগ নয় গো, অভিমান। যার মুখ থেকে প্রথম ভালবাসার কথা শুনতে চাইলাম...মনে মনে যাকে বারবার বলেছি, নাও আমাকে, নাও, সেই লোকটা...'

—'কী সেই লোকটা...'

—'ভাল্লাগছে না ভাবতে!'

—'তবু?'

—'তবু আর কী? একটা-দুটো কথা ফুলশয্যার খাটে, যেমন—মার সেবা কোরো, কাজকর্ম সব বুঝে নিয়ো...মাঝে মাঝে আমি পার্টি দিই, ব্যবসার খাতিরে। ড্রিংক করতে হয়...আপত্তি নেই তো?—না, আপত্তি কীসের?...তোমাকে যেতে হবে সঙ্গে...বোঝই তো ব্যবসার ব্যাপার...ব্যস, আলো নিভে গেল। টিউবটা। নাইট বালব জ্বলছে। এই আলোতে প্রথম পুরুষ খুঁড়ছে আমাকে...খুঁড়ছে, খুঁড়ছে, শুধুই খুঁড়ছে...মন নয়, শরীর চাই। শরীর দাও...এই তো দিলাম। নাও, যেভাবে তোমার খুশি। তবে প্রথম রাতেই সব খুলে নিও না, দোহাই। কিছু থাকুক। কিছু লজ্জা, কিছু আবেশ—ভাললাগার।—না, আমি দেখব। আজই সব...মনটা দেখবে না?...প্লিজ, শোনো, ও সব ভাষায় নয়, অন্য ভাষা বলো...সবসময় শুধুই?...ওই দ্যাখো, তোমার মা ডাকছে। এ সময় কোনও মা ছেলের ঘরের কড়া নাড়ে?'

—'তবে এই তোমার বিয়ের কথা?'

—'কথা নয়। অভিজ্ঞতা। প্রথম দিন থেকেই।'

—'ভালবাসা তা হলে আসেনি কোনওদিন?'

—'হয়তো এসেছিল। হয়তো আসেনি। বোঝার সময় এল কই? আসলে যদি ওদের বাধ্য থাকতাম সব অন্যায় মেনে নিয়ে, কিছুই হত না, এরকম। ওদের একটা চেনে বাঁধা কুকুরের দরকার ছিল। বউ নয়। কত বলব? বলে বলে শেষ হয় না। ছ মাসেই তখন ছ হাজার বছর কাটিয়ে ফেলেছি, দুঃখে, হতাশায়।'

—'মূল সমস্যাটা ঠিক কী ছিল?'

—'একটা কি আর। লক্ষ লক্ষ, হাজার হাজার। শাশুড়ি বলে, তোমার বাবা এই দেয়নি, ওই দেয়নি।—স্বামী বলে, রঙ্গনাথনের পার্টিতে একটু ড্রিংক করলে কী ক্ষতি হত? জানো রিফিউজ করা অভদ্রতা।...শাশুড়ি বলে, ঘন ঘন অত বাপের বাড়ি যেতে চাও কেন? এ বাড়িতে যখন এসেছ...। স্বামী বলে, তুমি বড় ন্যাকা। চ্যাটার্জির পাশে কিছুক্ষণ বসলে সতীত্ব নষ্ট হত? অত বড় অর্ডারটা... শাশুড়ি বলে....কত বলব? শেষ হবে না যে। বেড়েই যাবে। রবারের মতন।'

—'তারপর সেই রাতটা এল...'

—'হ্যাঁ, শয়তানের রাত। একটু একটু করে গভীর খাদের ভেতর তলিয়ে যাচ্ছি আমি...কী অপমান, কী লজ্জা...তাও সব সহ্য করেছি বাবা মার কথা ভেবে...মারধোর, গালাগালি...সেদিন আর পারছি না। কাকে যে একটু মনের কথা বলি। কেউ নেই। বাবা মা কত কষ্টে ধার দেনা করে বিয়ে দিয়েছে। তাদের বলা যায় না। দাদা ভাইয়াকেও না। ওদের আমি বড় আদরের বোন। কাউকে বলতে পারছি না। শাশুড়ি চিৎকার করছে, কী অবাধ্য বউ দেখেশুনে ঘরে আনলাম! স্বামীর হুকুমে আমরা মুখে জুতো বইতাম...স্বামী বলল, বাইরে লোকের সামনে মুখের ওপর আমাকে তুমি না বললে? এত তেজ?—

তুমি আমাকে অপমান করছ। আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে...আমি মানুষ নই? যেভাবে খুশি ব্যবহার করবে?—ঠিক আছে। কালই তুমি চলে যাবে কৃষ্ণনগরে। তোমাকে আমার দরকার নেই।—যাব না। এখানেই থাকব। তোমাকে শোধরাতে হবে নিজেকে। এটা এখন আমারও ঘরবাড়ি...কীসের ঘরবাড়ি? কীসের ঠিকানা? মেয়েদের কোনওদিন কোনও ঠিকানাই থাকে না। কারুরই কি থাকে?'

—'কেঁদো না রাই। চোখ মোছো।'

—'তুমিই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছ। এক বুক আশা নিয়ে যাওয়া আর এক সমুদ্র হতাশায় ফেরা...আমি কি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেদিন। নাকি সত্যি ওরা খাইয়ে দিয়েছিল কিছু? মনে নেই। কিছু মনে নেই। সব ব্ল্যাঙ্ক তখন, মহাশূন্যের মতো। আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছি, নীচে আরও নীচে। এই জন্যই কি মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম? এই পরিণতির জন্য? নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কে বুঝি ফুসফুস দুটো নিংড়ে নিল, প্রকাণ্ড থাবায় চেপে ধরল হৃৎপিণ্ড। কে যেন বলল, মরে যাও তুমি।...হাসপাতালে পুলিশ অফিসারটা জেরা করেছিল খুব.. কে সেদিন আপনাকে কতগুলো ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল?—কেউ না।...নিজে নিজেই খেয়েছিলেন? হ্যাঁ।—কে খেতে বলেছিল আপনাকে?...কেউ না।...জানেন, আত্মহত্যা করা আইনত অপরাধ?—জানি।—কেন মিথ্যে কথা বলছেন? কাদের বাঁচাতে চাইছেন? ওরা আপনাকে মানুষ বলে গণ্য করত না। অত্যাচার করত আপনার ওপর। অত্যন্ত নীচ।—কী করে জানলেন? কাউকে তো বলিনি! লোক বলেছে?...হতে পারে।...এতদিন তা হলে তারা প্রতিবাদ করেনি কেন? শেষ মজাটা দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল? না, ইন্সপেক্টর, আমি নিজেই খেয়েছিলাম অতগুলো...কী খেয়েছিলাম? জানি না। বাঁচতে আর ভাল লাগছিল না যে...'

—'বাপের বাড়িতে অন্তত সত্যি কথাটা বলতে পারতে রাই।'

—'কী লাভ বলে?'

—'তা হলে এখন বলো। আমাকে। কেউ শুনতে পাবে না...'

—'আমার কিছু মনে পড়ছে না। বিশ্বাস করো আকাশ, আমার ঘুম পাচ্ছে। অবশ হয়ে আসছে শরীর...'

—'রাই, ওঠো। উঠে বোসো। লক্ষ্মী মেয়ে। নইলে আবার আগের মতো তোমার...'

—'আমাকে ঘুমোতে দাও আকাশ, প্লিজ। ঘুম পাচ্ছে আমার। বড্ড ঘুম...ঘুম—ঘুম—ঘু উ উ উ ম—'

চার

কিছু মিশ্র শব্দে হোঁচট খেতে খেতে এভাবেই ঘুম ভাঙে প্রতিদিন। দোতলার বাথরুমে কাপড় আছড়ানোর আওয়াজের সঙ্গে একতলার রেডিয়োতে কান ফাটানো গান। ঝনঝনে, সুবেলা হাসির সঙ্গে তারে শাড়ি মেলা নিয়ে দুই পরিচিত কণ্ঠস্বরের চিল-চিৎকার, ঝাড়ুদারের ঝাঁটাঝংকার। ঘুম ভাঙার পরও চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে থাকি কিছুক্ষণ। উঠে লাভ নেই। ওপরেব বাথরুম খালি পাব না। দরকার তেমন হলে নীচে ঘুরে আসি। তারপর চা খেয়ে শুয়ে থাকা। সাড়ে সাতটার আগে আমার স্নানে যাওয়ার সুযোগ নেই।

আপনি কখনও মেয়েদের হোস্টেলের ভেতরটা দেখেছেন কোনওদিন? একদম ভেতরটা, যাকে বলে অন্দর মহল? যদি না দেখে থাকেন তবে রহস্যময় এক বিচিত্র নারীজগৎ আপনার অজানাই থেকে গেল। হিংসায়, প্রেমে, স্নেহে, স্বার্থপরতায়, ক্রুরতায় ভরা এ এক বর্ণময় পৃথিবী। আমি এখন শুয়েই এ বাড়ির কোথায় কী হচ্ছে তার একটা ছবি আপনাকে দিয়ে দিতে পারি। নীচের ঘুপচি ডাইনিং স্পেসে একটা ষাট পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলে সর্বসময়। এখনও জ্বলছে। সেখানে টানা লম্বা টেবিলে প্রকাণ্ড কেটলি হাতে দাঁড়িয়ে কার্তিক। কেটলি ঘিরে বোর্ডারদের গ্লাস, কাপ। পেছনের রান্নাঘরে জয়রামের মশলা বাটার শব্দ, ঠাকুরের হাতা খুনতি নাড়ানাড়ি। এক নম্বর ঘরের ব্রততী এসময়ে যোগ ব্যায়ামে ব্যস্ত। ব্রততী লেস্‌বিয়ান। সাত অক্ষরের এই ইংরাজি শব্দটিও আমার কলকাতায় এসে শেখা। ব্রততীর দু-তিন জন অনুরক্তাও আছে। তারাও এখন ওর সঙ্গে ধনুরাসন, ময়ূরাসন করে চলেছে। দু নম্বরের

বউদির জলখাবার তৈরি হয়ে এল বোধ হয়। এখনই স্টোভ নেভাবে। এখানে অনেকেই ঘরে টুকটাক খাবার বানায়। সকালে রোজ বউদি কার জন্য অত যত্নে টিফিন কেরিয়ার গোছায় কে জানে! মিস্টার মুখার্জির জন্য কি? এখখুনি ভদ্রলোকের চকোলেট মারুতি বাইরে পিপ্ পিপ্ করবে। ওই তো শব্দ হচ্ছে বোধ হয়। বউদি নিশ্চয়ই ছুটছে হুড়মুড় করে। অফিস ঘরের পার্টিশনের ওপার থেকে সুপারদিদি বেরিয়ে এসেছে বাইরে। পরনে রংজ্বলা সবুজ ছোপ ছোপ হাউস কোট। আহা, পিসিমা পিসিমা চেহারার এই বেঢপ থলথলে মহিলার অঙ্গে মেমসাহেবি পোশাকখানা কী অপরূপ যে লাগে! সকালের প্রথম রোদে শরীর ডুবিয়ে নিশ্চয়ই মিস্টার মুখার্জি গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। গর্বিত মোরগের মতো ঋজু ভঙ্গি। বড়দির সঙ্গে তার একটা-দুটো কথা হবে, সঙ্গে কিছু বিগলিত হাসি বিনিময়। তারপরেই হুশ করে উড়ে যাবে বউদিকে নিয়ে। ডেপুটি সুপার ছোড়দি স্নানটান সেরে এতক্ষণে রান্নাঘরে। অন্তত ঘণ্টাখানেক ঠাকুরের পেছনে খিচখিচ করবে। যত হাত মুখ নাড়ে কানের ঝোলা দুলজোড়া টিকটিক দোলে। পঁয়তাল্লিশ বছরের ছোড়দি পঞ্চান্নর বড়দির তদ্‌গত প্রেমিকা। হাবভাব, পোশাক-আশাকে মহিলা কিছুতেই তিরিশ পার হতে রাজি নন।

ওফ, পারা যায় না। কাকটা কী বিশ্রী চেঁচাচ্ছে দেখুন। ডানদিকে জানলার ধারে জারুল গাছটায় কদিন হল বাসা বেঁধেছে। কেউ কি ওর ছানাপোনাকে আক্রমণ করল নাকি? কই না, বাসাটা তো দিব্যি ফাঁকা। অকারণে এমন চেঁচাচ্ছে যেন তিন নম্বরের বুলবুল। মেয়েটা ঠিক এরকম ক্যাক ক্যাক করে সবসময়, নয় কানে ওয়াকম্যান্ লাগিয়ে মাইকেল জ্যাকসন শোনে। আর কোমর দোলায়। ওদের ঘরের শর্বরী আবার বাংলা আধুনিক গানের ভক্ত। ঘুম থেকে উঠেই ঢুলুঢুলু চোখে টেপ বাজতে শুরু করে...ওগো তুমি যে আমার...ওগো তুমি মম প্রাণ গো...ওগো তোমার বিহনে। সামনের বৈশাখে ওর বিয়ে।

একতলার ঘরগুলোর তুলনায় ওপরকার ঘরগুলো আপাতভাবে শান্ত। এ বাড়ির নীচেটা যদি হয় উদ্দাম স্রোত, তো দোতলা চোরা ঘূর্ণি। ওপরের বাথরুম যথারীতি বহুক্ষণ বন্দনাদির দখলে। মন্দিরাদি মাঝে মধ্যে ধাক্কা দিয়ে আসছে বন্ধ দরজায়। অনেকদিন ধরে দুজনের কথা বন্ধ। চৌকির পাশে আধবালতি জল আর বিছানায় ঢাউস আয়না বসিয়ে সাজগোজ শুরু হয়ে গেছে এ ঘরের শুভ্রার। মুখের মেক আপ শেষ হতে কিছু না হোক পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তারপর চুল সেটিং-এর পালা। রাতে ঘুমোনোর আগেই ডজনখানেক কার্লারে গোল্লা গোল্লা করে চুল পাকিয়ে রাখে। মাথায় ওরকম ধড়াচুড়ো পরে কী করে যে ঘুমোয়! ক্লিপগুলো খোলার পর খুব সাবধানে সামনে পেছনে মোটা ব্রাশ টানে। স্টেপ কাট চুল থাক থাক ঢেউ হয়ে ফুলে ওঠে তখন। কিছুদিন হল গোটা গায়ে মুখে ওয়্যাক্সিং করিয়েছে। ক্রিশ্চিনও মাঝে মাঝে করে, দিব্যি মাখন মাখন ভাব আসে চামড়ায়। ও সব করতে নাকি দারুণ কষ্ট হয়। আচ্ছা বলুন তো, অযথা নিজেকে যন্ত্রণা দিয়ে সুন্দরী হওয়া কেন? শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কোনওদিনই শুভ্রা সকালে স্নান করে না। বালতি থেকে আঁজলা জল তুলে থুপ থুপ থুপে নেয় ঘাড়ে, মুখে গলায়, হাতে, বুকের খাঁজে। তার ওপরে হালকা করে সাবান বোলায়। শেষে ঠিক দাড়ি কামানোর কায়দায় আস্তে আস্তে চেঁছে নেয় জলসাবান। শুভ্রা যখন সাজতে বসে ঠিক তখনই পাশের ঘরে মঞ্জুদির পুজো শুরু হয়। মাটিতে তো জায়গা নেই, তাই চৌকির ওপরই কম্বলের আসন বিছোনো। তার আগে অবশ্য গোটা বিছানায় গঙ্গাজলের ছিটে দেয়। হরলিক্স-এর বোতলে ভরা গঙ্গাজল ভারী যত্নে রাখা থাকে চৌকির নীচে। দেওয়ালে গাঁথা কাঠের র‍্যাকে জনা দশ-বারো ছোট্ট ছোট্ট দেবতার বাস। পুজো মনে হয় শেষের মুখে। ও ঘর থেকে জোর ঘণ্টা নাড়ার শব্দ আসছে। ওই টানা টিং টিং শব্দের ভেতর বসে কী কবে যে কাঁকন নাটকের পার্ট মুখস্থ করে যায়!

এ ছাড়া উপায়ই বা কী? একেক ঘরে বোর্ডার পিছু বরাদ্দ তিরিশ বর্গফুটের মতো জায়গা। তার মধ্যেই চৌকি, বিছানা, ট্রাঙ্ক, বাক্স, বাসন-কোসন নিয়ে প্রত্যেকের আলাদা ঘর-সংসার। মেয়েরা বোধ হয় এক বিঘত জায়গা পেলেও সেখানে সংসার পেতে ফেলতে পারে। ছেলেবেলায় আমরা ঠিক এভাবেই বারান্দায় টুকরো টুকরো পুতুলের ঘরবাড়ি বানাতাম। কোনওটা আমার সংসার। তো কোনওটা চন্দনার, কোনওটা ছোটবুড়ির। ববারের ছেলেমেয়েরা ভাগাভাগি হয়ে একেক দল একেক সংসারে। এখানে সেই পুতুলগুলোরই যা অভাব। সব ঘরেই এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত টানা লম্বা লম্বা

প্লাস্টিক দড়ি। নিজস্ব এলাকার দড়িটুকু দিনে আলনা, রাতে মশারি টাঙানোর খুঁটি। আলাদা আলাদা র‍্যাকগুলো যেন এক একটা ভিন্ন রুচির পৃথিবী।

এইটুকুনি জায়গা পাওয়ার জন্যই যা ছোটাছুটি করতে হয়েছিল। দাদা আর মেসো রাতদিন খুঁজে বেড়ায়। সেই টালা থেকে টালিগঞ্জ। কলকাতায় সরকারি হোস্টেলের সংখ্যা খুব কম। মানে লেডিজ হোস্টেলের। যাও আছে তাতে ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। ভাগ্যিস এরকম কিছু প্রাইভেট আছে, তাই বাঁচোয়া। প্রাইভেট হোস্টেলগুলোও সব কানায় কানায় ভর্তি। একটা সিটের জন্য কুড়িজন আসছে। আমাদের এই 'শান্তি-নীড়ে'র বেনামি মালিক যে বুড়ো ভামের মতো উকিলটা, তার জুনিয়র মেসোর বন্ধু। তাকেই ধরে শেষে...। বুড়ো রোজ সন্ধের পর অফিসে এসে বসে। বড়দি ছোড়দি দুজনেই খুব সাজগোজ করে থাকে তখন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে কত গুজগুজ, ফিসফাস। সে যাই করুক, আমি আদার ব্যাপারি...। বুড়োর কৃপায় আস্তানাটা তো পেয়েছি। আস্তানা বলুন আস্তানা, আশ্রয় বলুন আশ্রয়।

ছোট মাসি বারবার বলেছিল,—'আমরা থাকতে, কেন রাই হোস্টেলে থাকবে? ও আমাদের কাছে থাক। আমার সঙ্গে থাকলে মনটাও ভাল থাকবে। তা ছাড়া ওর মেসোর গাড়িতে অফিস যাতায়াতও করতে পারবে।'

মারও তাই ইচ্ছে। আসলে তখন আমাকে একলা ছেড়ে দিতেই মার ভয়। আবার যদি মেয়ের কিছু হয়ে যায়। বাবার তো একদমই ইচ্ছে ছিল না আমি চাকরি বাকরি করি। কলকাতায় গিয়ে তো নয়ই;—কী দরকার। রাই তো জলে পড়ে নেই। ঈশ্বরের কৃপায় মেয়ে যখন ফিরে পেয়েছি তখন আমাদের কাছেই থাক। পড়াশুনো করুক। গানবাজনা করুক। আমাদের চাট্টি জুটলে ওরও জুটে যাবে।'

দাদা প্রবল আপত্তি জানাল,—'না রাই এখন মোটেই ঘরে বসে থাকবে না। আমার মতো চাকরি বাকরি করতে হবে ওকে।'

মা বলল,—'সেটা কৃষ্ণনগরেই চেষ্টা করে দেখুক না। কলকাতায় কেন?'

—'কলকাতায় যখন একটা পাওয়া গেছে, তখন সেখানেই যাক।'

ছোট মাসি বলল,—'তা বেশ। কিন্তু আমার ওখানে থাকতে আপত্তি কীসের?'

—'না। রাই একাই থাকবে।' ছোট মেসোও সায় দিয়েছিল দাদার কথায়।

আসলে দাদারা চাইছিল আমার নিজের ওপর কনফিডেন্স আসুক। সবসময় ধাক্কা দিচ্ছে,—'শক্ত হ রাই। তোকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। কারুর ওপর ভরসা না করে—।'

শব্দগুলো শুনতে শুনতে একটা শীতল আতঙ্ক ঢুকে পড়ত আমার ভেতরে। এই গোটা পৃথিবীর সামনে আমি একা? আমি? রাইকিশোরী? সম্পূর্ণ অপরিচিত এক জগতে আমি হাঁটছি, ঘুরছি, হাসছি—একা? অফিসে চেয়ার টেবিলের সামনে বসে আমি! একরাশ অদেখা মানুষের দৃষ্টির সামনে আমি! শহরের ভিড়ের মাঝে আমি! জানতামও না সেই ভিড় কেমন হয়! মানুষের? না, বাঘভাল্লুকের? কোনওদিন তো সেরকম ভাবে বাড়ির বাইরে বেরোইনি। বিয়ের আগে ঘাড় নিচু করে কলেজে গিয়েছি, এসেছি। সেও তো দল বেঁধে। সেখানেও আমি 'আমি' নই। একটা সমষ্টির অংশমাত্র। সেখানে আমার দ্বিধা, বিস্ময়, ভয়, রোমাঞ্চ, আনন্দ সবই সেই সমষ্টির টুকরো শুধু। আমারও যে একটা আলাদা অস্তিত্ব থাকতে পারে—একদম স্বতন্ত্র—আমি যে আমিই—রাইকিশোরী—এ কথা তো কোনওদিন ভেবে দেখিনি! ভাবতেই শিখিনি। এখন কী মনে হয় জানেন? সে ছিল এক পরজীবী উদ্ভিদের জীবন। শক্ত গাছের মতো দাঁড়িয়ে আমার বাবা, মা, দাদা। সেই গাছের গুঁড়িকে জড়িয়ে একটু একটু করে বেড়ে উঠেছি আমি। তবে পরগাছাতে কি ফুল আসে না? বন্দাক অর্কিডও ফুলে প্লাবিত হয়। তাই হয়তো প্রেম। তাই নীলাঞ্জনের মতো কেউ—থাক ও সব কথা। সে ভারী গভীর গোপন। আমার নিজস্ব। তারপর শিবপুর। এক গুঁড়ি ছেড়ে আরেক গুঁড়িকে আঁকড়ে ধরা। মেয়েদের জীবনটাই তো এরকম। নতুন গাছটার সঙ্গে মানিয়ে গেল তো ভালই। নইলে প্রাণরসের অভাবে পরভুক লতা শুকিয়ে কালো। তখন কি আর তাতে ফুল ফোটে?

ওই যে, মঞ্জুদিকেই দেখুন না। বিয়ের সময় এক বাক্যে সবাই বলেছিল, মঞ্জুর কী কপাল। কত বড় বংশে বিয়ে হল। সুন্দর স্বামী। বিরাট চাকরি করে। কে স্বপ্নে ভেবেছিল মঞ্জুদির নতুন গাছটাই ফোঁপরা? পতিদেবতা রাতের পর রাত পড়ে থাকে ট্রেনলাইনের ধারে বস্তিতে। সঙ্গে দেশি মদ। ধেনো না চুল্লু কী

যেন বলে? মঞ্জুদি একদিন বলছিল—'ওদের বংশে এটা এমন কিছু নতুন নয় রে রাই। ওনার বাবা যেতেন, ঠাকুরদা যেতেন। তবে কী? না, তারা যেতেন যেমন, ফিরেও আসতেন। শুধু শ্বশুরমশাই মায়ায় পড়ে বাঁধা মেয়েমানুষের জন্য ঘর তুলে দিয়েছিলেন। আমার উনিও যদি সেরকম কিছু করতেন—কী যে মাথায় ঢুকল ওঁর।' বুঝুন অবস্থা। বাড়ির বাইরে বাঁধা মেয়েমানুষ থাকলে আপত্তি নেই, তাকে নিয়ে ফুর্তি-ফার্তা করাতেও আপত্তি নেই। ভাবটা এমন, সোনার আংটি আবার সোজা বাঁকা। ঘরে বাঁধা স্ত্রীটির ভাত কাপড়ের অভাব না হলেই হল। খাওয়া, পরা আর শুধু স্বীকৃতি পাওয়াই তার চরম প্রাপ্তি। মঞ্জুদির স্বামী বাপ ঠাকুরদার মতন ওপর ওপর ভেসে না থেকে একেবারে মজে গেছে। ফিরেও তাকাত না স্ত্রীর দিকে। স্বামীর মতি ফেরাতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি মঞ্জুদি। শেকড়-বাকড়, তাবিজ-কবজ এখনও কত কী যে মঞ্জুদির হাতে বুকে শোভা পায়। শেষ রক্ষা অবশ্য হয়নি। বস্তির মেয়ে স্বয়ং একদিন ঘরে এসে উপস্থিত। সঙ্গে স্বামীর ফরমান—দুজনেই মিলেমিশে, মানিয়ে গুছিয়ে থাকো। তুমি আমার বউ, ঘরের পাখি। ও আমার বনকি চিড়িয়া। ঠোকাঠুকি কোরো না। ঠোকাঠুকি না হলে হয়তো থেকেও যেত মঞ্জুদি। কিন্তু বাহাত্তর ঘণ্টার ভেতর যে গালাগালির হোসপাইপ খুলে দিল নতুন রানি, তার ধাক্কায় মঞ্জুদি সোজা বাপের বাড়ি। সেখানে আবার বাপ দাদার দুশ্চিন্তা। বড় মেয়েকে তার বর তাড়িয়েছে, এতে যদি ছোটর বিয়ের অসুবিধা হয়। তার জন্যও তো একটা সৎবংশজাত সরেস গাছ দরকার। অতএব মঞ্জু সাহার স্থান এই হোস্টেলে। খরচ বাবা, দাদার। মঞ্জুদির বাবার লোহালক্কড়ের ব্যবসা। ইজ্জতের থেকে অর্থ বেশি। বেচারা মঞ্জুদির এখন সারাদিনের কাজ সকালে পুজো, দুপুরে পুজো, সন্ধেয় পুজো। শনিবার মোড়ের শনিতলায় হত্যে দিতে যায়। চওড়া করে সিঁদুর পরে। হাতে গুচ্ছের শাঁখা, লোহা। পুজোর ফাঁকের সময়গুলো মঞ্জুদির কাটে পরনিন্দা, পরচর্চায়। আর শুচিবায়ুতায়। কোনও কিছু কাউকে ছুঁতে দেয় না। মন্দিরাদিও তেমন। ইচ্ছে করে ওর চৌকিতে গিয়ে বসব,—'কী মঞ্জু, তোমার বরের খবর কী?'—ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল। এমন ভয়ংকর চোখে তাকাবে যেন পারলে ছিঁড়ে খায়,—'কেন? তোমার কী দরকার। তুমি এখান থেকে সরে বসো। যত সব হেগো, বাসি কাপড়—।' খাটের তলা থেকে বার হয়ে যাবে হরলিক্স-এর বোতল।

কী, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? হ্যাঁ, ইনি এই শতাব্দীরই মহিলা। ভাল করে তাকালে আপনার আশেপাশেও এরকম মহিলা পেয়ে যাবেন। এরা সব এক ঝাঁক বিষাক্ত বিশ্বাসের শিকার। মঞ্জুদি এখনও আশা করে আছে, একদিন না একদিন, স্বামীর সুমতি হবে। পতিদেবতা ভিন্ন নিজের অস্তিত্বের কথা মঞ্জুদি ভাবতেই পারে না। আমিও তো শিবপুরে থাকতে প্রায় এরকমই একটা অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছিলাম। নইলে কি আর মরার কথা ভাবি?

দেখেছেন কাণ্ড, কাঁকন আবার সিগারেট ধরিয়েছে। মঞ্জুদির সঙ্গে এই নিয়ে এত অশান্তি হয়! কাঁকন অবশ্য পরোয়া করে না,—তুমিও পয়সা দিয়ে থাকো, আমিও পয়সা দিয়ে থাকি। নিজের পয়সায় সিগারেট খাব তাতে কার কী?—মেয়েটা পারেও বটে। সকাল থেকে খালি পেটে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। ওকে একটু বকা দরকার।

নিজের বিছানায়, হাঁটু মুড়ে বসে গভীর মনোযোগে পার্ট মুখস্থ করছে কাঁকন। বিছানা জুড়ে ছড়ানো বই, ম্যাগাজিন। তাকটাও একদম গোছায় না আজকাল। শ্যাম্পু, ডেটল, টুথপেস্ট, তালা সব এক কোণে ডাঁই। পায়ে পায়ে এগোলাম। নাটকের বই-এ এত মগ্ন যে আমার উপস্থিতি টেরই পায়নি। সামনে পেছনে দুলছে অল্প অল্প। বাঁ হাতে বই, ডান হাতে আগুন। পাশের অ্যাশট্রে টইটম্বুর। ছোঁ মেরে বইটা কেড়ে নিলাম হাত থেকে। চমকে তাকিয়েছে,—'কীরে। তোর আজ অফিস নেই?"

—'তুই আগে সিগারেট নেভা। তারপর তোর কথার উত্তর দেব।'

—'মাইরি ঝামেলা করিস না। আজকে ফাইনাল রিহার্সাল। এ জায়গাটা কিছুতেই মুখস্থ হচ্ছে না।'

—'তার জন্য চেন স্মোকিং দরকার? খালি পেটে?'

—'ডেফিনিটলি। কনসেনট্রেশন আনতে গেলে—ও তুই বুঝবি না। পারফর্মিং আর্ট, ক্রিয়েটিভ আর্ট, এ সবে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে হলে চারদিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয়। শম্ভুদা বলতেন, যখন তোমরা কোনও চরিত্রের ভেতরে ঢুকবে—।'

—'আবার? আবার জ্ঞান দিতে শুরু করলি?'

কাঁকন ঠোঁট টিপে হাসল,—'ঠিক আছে বোস। এই জায়গাটা ধর তো। এই যে, আবার বলি

ঔরঙ্গজেব—'

—'এ কী? আবার শাহাজান? আবার জাহানারা? এখনও মুখস্থ হয়নি? গত মাসেও তো করল?'

—'ওরা বেশি পয়সা দেয়নি।' কাঁকন সিগারেট নেভাল,—' প্রম্পট শুনেই ম্যানেজ করেছি। এরা মাইরি মালকড়ি ছাড়বে। ব্যাঙ্ক তো।'

—'কত?'

—'হাজার। তুই ধরবি? না, অফিস যাবি?'

—'অফিস তো যাবই। গতমাসে কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলাম। সাতষট্টি টাকা মাইনে কাটা গেছে।' কোমরে আঁচল গুঁজে নিলাম,—'এবার মন্দিরাদি বেরোলেই ঢুকে পড়ব।'

—'তোর গত মাসের ইন্টারভিউটা কী হল রে?'

—'ওটা হবে না। ভেতরে থেকে লোক ঠিক করা আছে। আরেকটা চেষ্টা করছি। আরও বড় জায়গায়। অ্যালেনবেরিতে।' নিশ্বাসটুকু ধরে রাখতে পারলাম না বুকে,—'মালহোত্রা ব্রাদার্সে পড়ে থাকলে চলবে নারে। একটা বেটার কিছু জোগাড় করতেই হবে। কতদিন আর দাদার ভর্তুকিতে চলব? তা ছাড়া এরা বড্ড খাটাচ্ছে। পয়সাও দেয় না—।'

—'তোর সেই তিব্বতি কলিগের খবর কী?' মাথার ওপর দু হাত ছড়িয়ে হাই তুলল কাঁকন। চাঁপা ফুল রং নাইটিটা ওর গায়ের সঙ্গে ভারী মানায়। রোগা, লম্বাটে গড়ন। মুখ চোখে একটু বেশি কাটা কাটা ভাব। বাঁদিকের চিবুকে ছোট্ট বাদামি তিল।

—'ভালই আছে। ওরও শিগগিরই একটা চান্স পেয়ে যাবার কথা। পেয়েও যাবে। ওরা তো ঠিক আমাদের মতো নয়। অনেক স্ট্রেট ফরোয়ার্ড। আমাদের মতো কোনও ক্যাতকেতে প্রবলেম নেই।'

—'ঠিক বলেছিস। মঞ্জুদি, বউদি টাইপ নয়।' কাঁকন আবার সিগারেট ধরাল,— 'মিস্টার মুখার্জিকে দেখেছিলি আজ? কী দারুণ একটা গ্রে স্যুট পরে এসেছিল? হেভি ইনকাম গ্রুপের লোক তো—'

—'হুঁ। ওদের ব্যাপার আলাদা। টাকা দিয়ে ভদ্রলোক গোটা দুনিয়াটা কিনে নিতে পারে। বউদি, বউদির স্বামী, বড়দি, পাড়ার ছেলে—'

—'কিনেই শুধু নেওয়া যায়। পাওয়া কি আর যায় রে?' কাঁকন আলগা ভাবে হাসল,—'তোর সেই সিদ্ধার্থর খবর কী, সেই গুণ্ডা মতন ছেলেটা?'

—'যাহ, গুণ্ডামতন কেন হবে? ম্যানলি চেহারা বল।'

—'গুণ্ডামতন বললে তোর গায়ে লাগে নাকি?' কাঁকন খিল খিল হেসে উঠল, —'তার মানে তুই প্রেমে পড়েছিস।'

—'কখখনও না। আমি এখন ওকে অ্যাভয়েড করে চলি।'

—'তারও মানে তুই প্রেমে পড়েছিস।' কাঁকন আরও জোরে হাসছে।

—'ইমপসিবল। তোকে এবার পেটাব। আগের ঘাই শুকোল না—'

—'ওই ঘা কি আর শুকোয় রে?' হাসতে হাসতে দুম করে গম্ভীর হয়ে গেল কাঁকন। আস্তে আস্তে একটা কালো ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে ওর মুখ। শরতের উজ্জ্বল আকাশে এভাবেই মেঘ আসে। উদাস চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বাইরের জারুল গাছের দিকে।

—'যা স্নান করতে যা। মন্দিরাটা বেরিয়েছে।'

পেনসিল হিলে খুট খুট শব্দ তুলে বেরিয়ে যাচ্ছে শুভ্রা। সকালে কোনওদিন হোস্টেলের ভাত খায় না। কী একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করে। মন্দিরাদি বলে, খদ্দের ধরার ফার্ম। জানি না বাবা কত রকম যে চরিত্র দেখছি।

কাঁকন জাহানারার ডায়ালগে মুখ ডুবিয়েছে। এখন কথা বললেও উত্তর দেবে না। মেয়েটা এরকমই। কখনও বর্ষার খোড়ো নদী, কখনও বা ঘন শ্যাওলায় ঢাকা স্থির সবুজ দিঘি। একা, বিষণ্ণ। থাক নিজের মনে। নাটকের মধ্যে ডুবে। চৌকাঠ অবধি গিয়ে ফিরে তাকালাম। মাথার পেছনে টাঙানো ওর মা-বাবার ছবিটা ঝকঝক করছে। রোজ মনে করে মালা বদলায়।

তবে ওই ছবিটা ছাড়াও আরেকটা ছবি আছে ওর কাছে। মণীশের। সেটা ও কখনও বার করে না। আমি জানি।

পাঁচ

লোকটা রোজ বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকে কেন বলুন তো? ওই যে ওই লোকটা—রোগা ডিগডিগে চেহারা, বাঁদিকে সিঁথি, চোখে চশমা। বয়স মনে হয় চল্লিশের কাছাকাছি। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা গায়ে মাখিনি। আমি যে বাসে উঠব, সেই বাসটায় ওরও ওঠা চাই। তা উঠতেই পারে। বাস তো আমার নিজের নয়। কিন্তু এখন যেন কেমন গন্ধ পাচ্ছি। চোখাচোখি হলেই লোকটা আজকাল হাসার চেষ্টা করে। কিছু বলতে চায়। হতে পারে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নেই। হতে পারে...। লোকটা অনিমেষের পরিচিত কেউ নয় তো? কাঠপুতুলের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। শিবপুরে দেখেছে আমাকে? কৃষ্ণনগরে? অনেকটা এরকম দেখতে অনিমেষ মিত্রর এক খুড়তুতো ভাই ছিল। সে অবশ্য আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করত। একদিন চুপিচুপি বলেছিল,—'বউদি, আপনি এদের সঙ্গে থাকতে পারবেন না। জেঠিমা আর ফুলদাকে তো হাড়ে হাড়ে চিনি, টাকা আর ধান্দা ছাড়া কিছু ভাবতে জানে না।'

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—'এ কথা আপনারা বিয়ের আগে জানাননি কেন? অন্তত বাবা মাকে একটা পোস্টকার্ড যদি দিতেন...'

—'কী করে জানাব? ওরা আগে কাউকে কিছু জানতে দিয়েছিল? কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে...আমরা তো জানলামই বিয়ের মাত্র কদিন আগে।'

—'এখনও তো প্রতিবাদ করতে পারেন।'

দেওরটি এ কথার উত্তর দেয়নি। অন্যের ব্যাপারে কে আর সহজে নাক গলাতে চায়! বাইরে থেকে দরদ দেখানোতেই আনন্দ বেশি। এতে এক ধরনের আলাদা সুখবোধ আছে।

ওই লোকটাকে তবে অনিমেষই আমার পেছনে লাগায়নি তো? প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য? থানায়, কোর্টে, সর্বত্র বিপর্যস্ত হয়েছে একসময়। অপমানের কথা সহজে কেউ ভোলে না। দূর, অযথা ভয় পাচ্ছি কেন? লোকটা হয়তো পাড়ারই কেউ। কিংবা আশেপাশে থাকে। কোথায় গেল? ওই তো ডানদিকটায়। সিগারেট ধরিয়েছে। চোখোচোখি হতেই সাঁত করে থামের আড়ালে চলে গেছে। ধ্যাৎ, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। উটকো একটা লোককে এত পাত্তা দেওয়ার মানেই হয় না। আসতে চায় আসুক না। যত খুশি পেছন পেছন। অকারণে ভয় পাচ্ছি কেন?

এঃ, দেখুন দেখি, আটটা পঞ্চান্ন হয়ে গেল। সাড়ে নটার মধ্যে অফিস ঢুকতেই হবে। বাস আসছে না কেন? বড় সাহেব ব্যাঙ্গালোর গেছেন, কনফারেন্সে। ভিনোদ মালহোত্রা দিন কয়েকের জন্য সর্বময় কর্তা। এই ছেলেটি একটি চরিত্র বিশেষ। অল্প বয়সে শাসনক্ষমতা হাতে পেয়ে গেলে বোধ হয় এমনই হয়। অহংকারী যুবরাজের মতো হাঁটা চলার ভঙ্গি। কথা বলে চিবিয়ে চিবিয়ে। চ্যাটাং চ্যাটাং হুকুম দেয়। মালিক হওয়ার কায়দাকানুন সব আয়ত্তে। তবে মেয়েদের সম্পর্কে মালিকসুলভ দুর্বলতা নেই কোনও। উলটোটাই বরং। মেয়েদের কাজকর্ম, গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর। সামান্য সুযোগ পেলেই থুতুর মতো বিদ্রূপ ছিটিয়ে দেয়। মিনিট দশেক লেট করার জন্য কদিন আগেও কয়েক কথা শুনিয়েছে আমাকে। সবে পি বি এক্স বোর্ড চালু করছি, বেড়ালের পায়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে সোজা কাউন্টারের সামনে,—'আপনার ঘড়িতে এখন কটা বাজে?'

মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছিলাম,—'সরি স্যার'।

—'অ্যায়সা কিউ হোতা ম্যাডাম? লেডিজ অলওয়েজ গেট লেট। ইজ নট ইট?'

ভাবটা এমন, মেয়েরা ছেলেদের মতো বাহাদুর নয়। কোনও কাজেই। অতএব কোনওভাবেই আজ দেরি হলে চলবে না। ভিনোদ হাতে মাথা কাটবে।

এবড়ো খেবড়ো রাজপথে টলমল দুলতে দুলতে একটা মিনি আসছে। দেখে মনে হয় উত্তাল সমুদ্রে অদৃশ্য ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছে কোনও জেলে নৌকো। মেট্রো রেল চালু হওয়ার পরও এদিককার রাস্তার অবস্থা বেহাল। এখানে ভাঙা, ওখানে গর্ত। কবে যে সারানো হবে। বাসটায় ভাল ভিড় মনে হচ্ছে? অফিস যাওয়ার সময় অবশ্য কবে আর ফাঁকা বাস পাই। আমার কোমর বাঁধা দেখে লোকটাও পায়ে চেপে সিগারেট নেভাল। অর্থাৎ আজও সহযাত্রী হবে। যা খুশি করুক। এ বাসটায় আমি উঠবই।

এক গুজরাটি দম্পতি নামল হাঁসফাঁস করতে করতে। তারপর পাদানি টপকে, কন্ডাক্টরের গায়ের ওপর আমি। পেছনে নীল শার্ট পরা আরেকজন। তার পেছনে লোকটা। বাসের ঠিক মুখটাতে এত ভিড় থাকে! নীল শার্টকে গুঁতিয়ে লোকটা উঠে আসার চেষ্টা করছে। কী করে মানুষের পাঁচিল ভেঙে যে ভেতরে ঢুকি!

আপনি নিশ্চয়ই কলকাতার মিনিবাসের হাল চাল জানেন? কী মনে হয়? হাঁস-মুরগি বোঝাই চটের বস্তা? না টিনের খোল? দম বন্ধ অবস্থায় ছটফট করছে এক ঝাঁক প্রাণী। কোথাও একদানা সরষে ফেলার জায়গা নেই, কন্ডাক্টর তবু চেঁচিয়ে চলেছে—'পেছনে এগিয়ে যান। পেছনে এগিয়ে যান। এই যে, ও কালো চেক বড় ভাই—'

—'পেছনে আবার এগোনো যায় নাকি?' এর মধ্যেই কে একজন সরস মন্তব্য ছুড়ল।

কালো চেক বড় ভাই খিঁচিয়ে উঠল,—'যাব কোথায়? ভেতরে কি খেলার মাঠ? তুমি চলে এসো। তোমার মাথায় দাঁড়াই।'

রাস্তায় বেরোলে কতরকম ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। এই তো দেখুন না, একে রাস্তা খারাপ, তার ওপর দুমদাড়াক্কা ব্রেক চাপছে ড্রাইভার। মানুষের ঘাড়ে ছিটকে পড়ছে মানুষ। একেবারে তালগোল অবস্থা। কোনওরকমে সামনের সিটের রড ধরে নিজেকে সামলালাম। জোর একটা চোট খেয়েছি ঘাড়ে।

—'অ্যাই ড্রাইভার, কী হচ্ছে কী? মানুষকে মানুষ বলে ভাবো না নাকি? ঠিক করে চালাও।'

—'বুঝছেন না দাদা, ব্যাটা বস্তা ঝাঁকাচ্ছে। আরও কিছু পুরতে হবে যে।'

ভিড়ের চাপে ঘাড় ঘোরানো দায়। লোকটা এখন কোথায়? নিশ্চয়ই আশেপাশেই আছে। আড়ষ্ট হয়ে কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছি। আঁচল তুলে কপালের ঘাম মুছব, সে উপায়ও নেই। আরেকটু এগোতে পারলে ভাল হয়। ওই মোটা মতন ভদ্রমহিলা লোয়ার সারকুলার রোডে নামেন। কিন্তু এগোই কী করে? চারদিকে শুধু শরীরে শরীর ঠোকাঠুকি। আমার পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে একজন বুড়ো ভদ্রলোক। হাতের ওপর একটা অপরিচিত হাত। আরে হাতটা যে লোকটারই। সাহস দেখুন, কখন ঠিক সেঁধিয়ে এসেছে পেছনে। বার দুয়েক ঘুরে তাকালাম। ভ্রুক্ষেপ নেই। দৃষ্টি অন্যদিকে উদাস। যত হাত সরাচ্ছি, এগিয়ে আসছে হাত। অন্যমনস্ক ভাবে কীরকম হাতে হাত ঘষছে দেখুন। বলব কিছু? যদি উলটোপালটা বলে দেয়? প্রতিবাদ করতে গেলে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাসে ট্রামে মেয়েদের অপমানিত হতে হয়। কোথায় যে যাই। কী বিশ্রী বলুন তো? কী নোংরা? শরীরটাকে যদি কোনও ম্যাজিকে গুটিয়ে ফেলা যেত। মুখ চোখ কি অন্যরকম হয়ে গেছে আমার? বাঁ পাশের ভদ্রলোক এক স্টেপ সরে দাঁড়ালেন যেন। আমার অস্বস্তি নির্ঘাত লক্ষ করেছেন। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, ভদ্র শিক্ষিত। আসলে দু-একটা কামুক পুরুষের জন্য আর সকলেরও কেমন বদনাম হয়ে যায়, তাই না?

যাক, এবার আর আমাকে ছুঁতে পারছে না। আচ্ছা, লোকটার কী ব্যাপার বলুন তো? জানে কি, শান্তিনীড়ে থাকি? হোস্টেলে থাকা মেয়েদের সম্পর্কে কিছু মানুষের ধারণা মোটেই ভাল নয়। অনেকে ভাবে, যে সব মেয়েরা একা থাকে, তারা সকলেই সহজলভ্য। অভিজ্ঞতার ঝুলিতে কত কী যে জমা হচ্ছে রোজ।

একবার কী হয়েছিল জানেন? তখন প্রথম কলকাতায় এসেছি। মাত্র দেড়-দু মাস। কিছুই চিনি না। হোস্টেল থেকে অফিস যাই। অফিস থেকে হোস্টেল। তাও ভয়, যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলি! যদি ঠিক জায়গায় না পৌঁছতে পারি! মাঝে মাঝে ছোট মাসির বাড়ি যাই। তাও মেসো বা সিদ্ধার্থর সঙ্গে। সিদ্ধার্থই আমাকে একটু একটু করে কলকাতা চিনিয়েছে। কৃষ্ণনগর গেলে ট্রেনে পর্যন্ত তুলে দিয়ে আসত। সেই ভিতু আমি একদিন গ্র্যান্ড হোটেলের নীচে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থর জন্য অপেক্ষা করছি। আমাকে লাইট হাউসে 'বর্ন ফ্রি' দেখাতে নিয়ে যাবে। ছুটির দিন। তবু ভালই ভিড় ছিল রাস্তাঘাটে। পশ্চিমের সূর্য সোজা চোখে পড়ছে বলে ছায়ায় সরে দাঁড়ালাম, বাটার সামনে। হঠাৎ একটা লোক, হাতে ব্রিফ কেস, গলায় টাই, একদম পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটা যে আমাকেই কিছু বলছে বুঝতেই পারিনি। একেবারে কানের কাছে এসে ফিসফিস করতে চমকে তাকিয়েছি।

—যাবে নাকি? লোকটা কায়দা করে হাসছে।

আমি অবাক চোখে এদিক ওদিক তাকাই। আমাকেই বলছে কি? ভাবার আগে একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে লোকটা,—'এসো না, দুটো টিকিট আছে লাইট হাউসে।'

তবু ব্যাপারটা বুঝে উঠতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগেছিল। লোকটা আমাকে কলগার্ল ভেবেছে। ঘৃণায়, অপমানে সঙ্গে সঙ্গে মুচড়ে উঠেছিল শরীর। আমাদের কি স্বাধীনভাবে একা কোথাও দাঁড়িয়ে থাকার অধিকার নেই? ঠোঁট দুটো কাঁপছে ঠকঠক করে। কানে মাথায় হুল ফোটাচ্ছে লক্ষ বোলতা। মানুষ নয় যেন একটা নোংরা পোকা এগিয়ে আসছিল ক্রমশ,—'নতুন নাকি? চিন্তা নেই। পুষিয়ে দেব...'

তাড়া খাওয়া খরগোশের মতন ছুটতে শুরু করলাম আমি। ছুট ছুট। গ্র্যান্ড হোটেল টপকে সুরেন ব্যানার্জির মুখে আসতেই সামনে একটা বাস। ল্যান্সডাউন দিয়ে যায়। কোনওদিকে না তাকিয়ে আমি সোজা সেই বাসের ভিতর। সিদ্ধার্থ চিন্তা করবে। করুক। ওদের কখনও আমাদের মতো গায়ে কাদাজলের ছিটে খেতে হয় না। গা ঘিনঘিন করছে। পদ্মপুকুর না আসা অবধি সারাটা রাস্তা শুধু গা গুলোনো ভাব। হোস্টেলে ফিরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম।

কাঁকন শুনে খুব বকেছিল,—'তুই কিছু বলতে পারলি না? এমনি এমনি ছেড়ে দিলি লোকটাকে? পায়ে চপ্পল ছিল না? কিছু না হোক চেঁচিয়ে লোক জড়ো করতে পারতিস। পাবলিকের হাতে আড়ং ধোলাই খেলে আর কোনওদিন বাছাধন—'

কী করে কাঁকনকে বোঝাই, তখন যে আমাকে বোবায় ধরেছিল। কোনও শব্দই বেরোত না মুখ থেকে।

মন্দিরাদি বলেছিল,—'লোকগুলোর দোষ কী? আজকাল খদ্দের ধরার জন্য মেয়েগুলো যেভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। ও সব অঞ্চলে কোনও ভদ্রমেয়ের পক্ষে একা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সত্যি অস্বস্তিকর।'

সেই থেকে কখনও ওদিকে একা কারুর জন্য অপেক্ষা করি না। তা বলে বাসের ভেতরেও...! তিন নম্বর সিটে একজন হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। যদিও ভেতরটা অসম্ভব গরম, জানলার ধারে বসা মেয়েটির চুলে দিব্যি বসন্তের বাতাস। মিনি বাসে যারা বসতে পায় তারা যেন লটারি পাওয়া মানুষ। অন্তত মুখ চোখ দেখে তাই মনে হয়। ওই ভাগ্যের চেয়ারে পৌঁছনোর জন্য নিরন্তর মিউজিকাল চেয়ারের খেলা চলেছে। লোয়ার সারকুলার রোডেও বসতে পেলাম না। আমি বসতে যাব, তার আগেই বিশাল চেহারার একজন হুমড়ি খেয়ে বসে পড়েছে। শিভালরি শব্দটা এ যুগে অচল। যতই কষ্ট হোক কেউ ইঞ্চি জমি ছাড়বে না আমাকে। এটাই নিয়ম, এ যুগটা শুধুই দখল নেওয়ার। আমি অন্যায় আশা করবই বা কেন?

ড্রাইভারের পাশের সিটের দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে কন্ডাক্টরের কেমন ঝগড়া লেগেছে শুনুন।

—'নোট দেখাবেন না।' কন্ডাক্টর জংলি গলায় খিঁচিয়ে উঠল,—'খুচরো নিয়ে ওঠেন না কেন?'

—'পাব কোত্থেকে? পাড়ব।'

প্রত্যেকটি বাসে রোজ খুচরো নিয়ে এই ঝামেলা। হেল্পারটা একটা অশ্লীল মন্তব্য ছুড়ল। বাজি ধরে বলতে পারি, কন্ডাক্টরের ঝোলায় কম করেও পঞ্চাশ টাকার খুচরো আছে। কী করে এত খুচরো দিয়ে? মিনিবাসের কন্ডাক্টর হেল্পারগুলো এরকম কেন? কেমন যেন উগ্র, উদ্ধত। কোন সমাজ থেকে এরা আসে? এত কেন হিংস্রতা চোখে মুখে? দুনিয়ার তাবৎ মানুষের প্রতি এদের এক ধরনের অবজ্ঞার ভাব। প্যাসেঞ্জারদের কিছুতেই শুয়োর ছাগলের থেকে বেশি মর্যাদা দিতে নারাজ।

এত কথা কাটাকাটি চলছে, তবু লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করে আমাকেই দেখছে দেখুন। কতক্ষণ মুখ ঘুরিয়ে রাখব? কেউ একভাবে তাকিয়ে থাকলে এমনিই তার দিকে চোখ চলে যায়। পার্ক স্ট্রিটে বেশ খালি হয়েছে গাড়ি। ময়দানের সিথি চিরে এখন হই-হই করে ছুটছে।

লোকটা যেন একদম আমার দিকে না আসে। তার থেকে এখন পাশে যে ছেলেটি, লম্বা বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, তার স্পর্শ অনেক ভাল।

ব্যাগ খুলে টিকিটের পয়সা বার করলাম,—'এই যে ভাই, টিকিটটা।'

কন্ডাক্টর ফিরে তাকানোর আগেই, সামনে থেকে ঝুঁকে পড়েছে লোকটা,

—'আপনার টিকিট আমি করে নিয়েছি মিসেস মিত্র।'

একী? লোকটা আমার নাম জানল কী করে? স্পর্ধা দেখুন, টিকিটও কেটেছে। কোনওদিন তো এত

বাড়াবাড়ি করে না!

আজ মতলবটা কী? রাগ থেকে আশঙ্কা, আশঙ্কা থেকে একটা অজানা ভয় কুয়াশার মতো চারিয়ে যাচ্ছে আমার ভেতরে। কী হবে? নিশ্চয়ই তা হলে অনিমেষ...। গ্রেট ইস্টার্নের সামনে বাস থামতেই প্রায় লাফিয়ে নেমে গেলাম। স্টিফেন হাউস অবধি হাঁটতে হবে। বুঝতে পারছি লোকটাও নেমেছে। জোরে, খুব জোরে পা চালালাম।

—'শুনছেন? এই যে এদিকে—'

কিছুতেই আমি দাঁড়াব না। প্রায় ছুটতে শুরু করলাম।

—'এক মিনিট মিসেস মিত্র—' লোকটা আমাকে ধরে ফেলেছে,—'আপনি আমাকে ভুল ভাবছেন...'

মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালাম,—'কে আপনি? আমার নাম জানলেন কী করে?'

—'না, মানে, চন্দনাকে চেনেন? আপনার কৃষ্ণনগরের বান্ধবী?'

—'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

—'চন্দনা আমার শালার বউ। আমি আপনাদের হোস্টেলের কাছেই থাকি। তিনটি বাড়ি পরে। আমার নাম শ্রীকান্ত মজুমদার—'

একটু যেন আশ্বস্ত বোধ করছি। লোকটার একটা পরিচয় তবু পাওয়া গেল। কিন্তু শ্রীকান্ত মজুমদার, তুমি তো সহজ লোক নও। বাসেব ভিড়ে, সুযোগ বুঝে দিব্যি হাতে হাত ঘসছিলে।

—'আমাকে চিনলেন কী করে?'

—'চন্দনার কাছে আপনার ছবি দেখেছি। চন্দনা আপনার সব কথাও বলেছে আমাদের। সত্যি খুব স্যাড ইনসিডেন্ট। ওই বলছিল আপনি শান্তি নীড়ে আছেন। কদিন লক্ষ করে, খোঁজ নিয়ে—'

ব্যাপারটা তা হলে এই? ডিভোর্সি মেয়ের দুঃখে বিগলিত পুরুষ? রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল। কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। হাজার হোক চন্দনার ননদের বর। গলাটা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম,—'আমাকে কিছু বলার আছে আপনার?'

—'না, এমনিই।' শ্রীকান্তবাবু চুলে হাত বোলালেন,—'অনেকদিন থেকেই আপনার সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে। কিন্তু আপনি যা গম্ভীর। অবশ্য এত অল্প বয়সে এরকম একটি মিস্‌হ্যাপ...খুব খারাপ লাগে আপনাকে দেখলে। আপনারও ভীষণ একা লাগে না?'

ধীরে ধীরে শ্রীকান্ত মজুমদার আমার সামনে পুরোপুরি বিকশিত হচ্ছেন। লোকটি আদ্যন্ত চরিত্রহীন। সহানুভূতির মুখোশ পরে একটু গায়ে গা ঘসতে চায় আর কী। এরকম দু-একজন আমি কৃষ্ণনগরেও দেখেছি। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত করলাম,—'আপনার অফিস কোথায়?'

—'এই তো ইউ বি আই...'

—'ও আচ্ছা। আমি সোজা যাব। আমার দেরি হয়ে গেছে।'

—আপনার অফিস ছুটি হয় কটায়?'

উত্তর না দিয়ে দৌড়ে মিশন রো পার হয়ে গেছি। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে। শ্রীকান্ত মজুমদার গ্র্যান্ড হোটেলের নীচের সেই লোকটার থেকেও নোংরা। ঘরে বউ-বাচ্চা আছে, তারপরেও উপরি আমোদ আহ্লাদের শখ। আমাকে নিয়ে। আমি কী? অপমানে মাথার হাজার হাজার কোষ একসঙ্গে দপদপ করছে। অফিসে ঢুকেও হাঁপাচ্ছি। কাউন্টারে ভ্যানিটি ব্যাগ ছুড়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছোট সাহেবের এক্সটেনশন ঝ্যাঁ ঝ্যাঁ বেজে উঠেছে। রিসিভার তুললাম,—'গুড মরনিং স্যার।'

—'ইউ এগেন লেট টুডে।' ও প্রান্তে ভিনোদ মালহোত্রার রাগী কণ্ঠস্বর। বড়সাহেব না থাকলে ছোটটির প্রতাপ আরও বেড়ে যায়। অফিসের ঘড়িতে নটা পঁয়ত্রিশ। খুব একটা দেরি তো করিনি!

—'ইউ শুড ট্রাই টু বি মোর পাঙচুয়াল।' ভিনোদ চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল,—'এনিওয়ে, আপনার টেবিলে কয়েকটা চিঠি রাখা আছে, তাড়াতাড়ি কপি করে দিন।'

আসলে ওই নোংরা লোকটা। ওর জন্যই পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেল। এরপব কোনওদিন কথা বলতে আসুক...। সামান্য দম নিয়ে টাইপ বাইটারের ঢাকা খুললাম। একটু জল খেলে হত। এখনও কান দুটো গরম হয়ে আছে। থাক, জল পরে। আগে ভিনোদের কাজ। বদ্রিও এখখুনি আবার জি পি ও থেকে

ডাক নিয়ে আসবে। এক্সচেঞ্জের রুপোলি দরজা খুলে গেল। বাইরের কল আসছে।

—'গুড মরনিং। মালহোত্রা ব্রাদার্স হিয়ার।'

—'মরনিং রাই...কোনও খবর নেই কেন? কেমন আছ?'

মাথার জমাট বারুদ দাউ দাউ জ্বলে উঠল। সিদ্ধার্থ। ছিটকে উঠে দাঁড়ালাম। তরল সিসের মতো ফুটন্ত ক্রোধ উঠে আসছে ঠোঁটের ডগায়—'কী চান আপনি বলুন তো? কেন আমার পেছনে ঘুরে মরছেন?'

—'কী বলছ রাই? তোমার গলা এত কাঁপছে কেন? কী হয়েছে?'

—'ন্যাকামি করবেন না। ভাবেন কিছু বুঝতে পারি না?' উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি,—'কী মনে করেন আপনারা আমাদের? ডিভোর্সি বলে বেওয়ারিশ? লেবেল আঁটা নেই বলে যে ভাবে খুশি ব্যবহার করবেন?'.. ... ...

—'কখখনও আর ফোন করবেন না, বুঝলে এ এ ন।' রিসিভারটা ক্রেডল-এর ওপর আছড়ে দিয়েছি। ঠকঠক করে হাত পা কাঁপছে। চোখ বন্ধ করলাম। আবার খুললাম। চারদিক কেমন ধোঁয়াটে লাগছে। সামনে বুঝি মেঘের স্তর। আবছাভাবে ফুটে উঠছে কয়েকটা মুখ। আমার সামনে এত লোক কেন? আমি কি খুব জোরে চিৎকার করে ফেলেছি?

শার্লি কাউন্টারের ভেতর ঢুকে এসেছে। আমার কাঁধে হাত।

—'হোয়াটস রং রাই?'

মিস্টার মেনন সামনে ঝুঁকেছেন,—'কার ফোন ছিল? এনি ব্যাড নিউজ?'

ছি, ছি, ছি, ছি। কী হাস্যকর সিন ক্রিয়েট করে ফেলেছি আমি! আমার চিৎকারে এরা সবাই ছুটে এসেছে এখানে? ইশ, মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। এই মুহূর্তে যদি ধুলো বালি হয়ে যেতে পারতাম! দুহাতে মুখ ঢেকে মাথা নাড়ার চেষ্টা করছি,—'নো, নাথিং। ইটস ওকে।'

একে একে সকলে চলে যাচ্ছে কাউন্টারের সামনে থেকে। ডোমা, শার্লি, মিস্টার মেনন, ব্যানার্জিদা। অজয় সিনহাও। প্রতিটি মুখে এখনও বিস্ময়। উঠে টয়লেটে গেলাম। আর পারছি না। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললাম। এত জলও ছিল আমার চোখে!

ছোট সাহেব লাঞ্চে বেরিয়েছে একটু আগে। মিস্টার মেননও উঠে টিফিন রুমে গেলেন। ছ তলার বিশাল হলঘর জুড়ে দুপুরের শুকনো নীরবতা। মাথার ওপর সাবেকি কড়িকাঠ থেকে গোটা দশেক ফ্যান নিঃশব্দে ঘুরে চলেছে। হলের তিনদিকে তিনটে কাচের চেম্বার। একদিকে ক্যাশ, একদিকে মালিকরা। ওপারে, আমার মুখোমুখি চেম্বারে তিনজন স্টেনোগ্রাফার—ডোমা, শার্লি, ক্রিশ্চিন। ক্রিশ্চিন আজ আসেনি নাকি? ওর সিটটা এখান থেকে ভাল দেখা যায় না। অজয় সিনহার মাথা আড়াল করে রাখে। আগে সিনহা বাঁদিকে ক্যাশ চেম্বারের সামনে বসত। কিছুদিন হল ব্যানার্জিদার সিটে এসেছে। ব্যানার্জিদা গেছেন মিস্টার মেননের পাশে। অন্যদের সিট ব্যানার্জিদা আর মিস্টার মেননকে ঘিরে।

মাথাটা আস্তে আস্তে হালকা হচ্ছে। একবার ক্রিশ্চিনের খোঁজ করে আসি। তার আগে টাইপ করা চিঠিগুলো ঠিক মতন পিন করা দরকার। ভুলটুল হয়নি তো? আলগা চোখ বুলিয়ে নিলাম। ইনকামিং চিঠির ফাইল ভিনোদের ঘরে রেখে আসতে হবে। বদ্রি নেই। বাইরে গেছে। কাউন্টার ছেড়ে উঠেছি, ডোমা কাচের দরজা ঠেলে বেরোল। ওরও হাতে টাইপ করা চিঠি। আমাকে দেখে, নরম হেসে, হাত ওঠাল। আমি জানি, মেয়েগুলো আর আমার কাছে এসে কোনও প্রশ্ন করবে না সকালের ঘটনা নিয়ে। এরা কখনও অহেতুক কৌতূহল দেখায় না। তা বলে ভাববেন না যেন মেয়েগুলো আত্মকেন্দ্রিক। এখখুনি যদি ওদের কাছে সাহায্য চাই, ঝাঁপিয়ে পড়বে। আসলে ওরা বুঝে গেছে সকালের ঘটনাটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত। আমি নিজে থেকে এদের কিছু না বললে...। হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে এখানেই ওদের তফাত। কিন্তু ওই সিনহাটাকে দেখুন, এমনভাবে সকাল থেকে আমার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে...। ব্যানার্জিদাও বার কয়েক ঠারেঠোরে প্রশ্ন করে গেছে। মিস্টার মেনন একদম অন্য রকম। মাথাজোড়া টাক, বেঁটেখাটো চেহারার এই দক্ষিণী মানুষটির মধ্যে কেমন যেন বাবা বাবা ভাব।

চোখে মুখে আরেকবার জল দিয়ে এসে ডোমাদের ঘরে ঢুকলাম। বাবা! সবাইকেই আজ কিছু

কাজের বোঝা চাপিয়েছে ভিনোদ। এখনও একমনে টাইপ মেশিনে ঝড় তুলে চলেছে শার্লি। নাহ্, ক্রিশ্চিন আজ আসেনি।

—'তোমরা আজ টিফিন করবে না?'

—'হোয়াটস দা টাইম?' ডোমা ঘড়ি দেখল,—'চলো, নীচে গিয়ে ধোসা খেয়ে আসি।'

—'আজ ক্রিশ্চিনের কী হল?'

—'যাক।' রোলার ঘোরাতে ঘোরাতে হাসছে শার্লি,—'এতক্ষণে তবে তুমি লক্ষ করেছ?'

লজ্জা পেয়ে গেলাম। সত্যি, সকাল থেকে এত বেশি উত্তেজিত হয়ে আছি! ডোমা উঠে গাঢ় লাল স্কার্টটা ঝাড়ছে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট্ট আয়না বার করে টুক করে নিজেকে দেখে নিল। শার্লি দারুণ লেসের কাজ করা একটি মিডি পরেছে। উঠে বয়কাট চুলে ব্রাশ চালাল,—'প্রব্যাবলি ম্যাথুজ ইজ গোয়িং অন সানডে। দ্যাটস হোয়াই ক্রিশ্চিন...'

হাঁ করে ঠোঁটের কোনার লিপস্টিক মুছল ডোমা, হেয়ারব্যান্ড টান টান করল,—'ক্যান উই আস্ক আ কোয়েশ্চেন রাই? ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড?'

—'সিওর।'

—'কোনও সমস্যায় পড়েছ কি? সাহায্য দরকার?'

—'না, না, তেমন কিছু না।' জোরে জোরে মাথা নাড়লাম,—'ইট ওয়াজ আ বোগাস কল। সামবডি ওয়াজ ট্রায়িং...'

—'তোমার চেনা সে?' শার্লির ছোট ছোট চোখ দুটো আরও ছোট হল।

সত্যি কথাটা বলব এদের? থাক। আবার মাথা নাড়লাম,—'চিনিই না লোকটাকে।'

—'বাট ইউ গট সো এক্সসাইটেড। হি মাস্ট বি ইনসান্টিং ইউ। আগে কখনও করেছে? না আজ প্রথম? নাম জানো?'

—'কিছুই জানি না। একেবারে স্ট্রেঞ্জ কল।'

—'ও, হি মাস্ট বি আ বাস্টার্ড। ও কে, এবার যদি কখনও ডিসটার্ব করে, কল মি। আই উইল টিচ দ্যাট সানোভাবিচ।'

প্রাণভরে লোকটাকে গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে শার্লি আর ডোমা। এবার আমার খুব খারাপ লাগছে। বেচারা সিদ্ধার্থ। ওকে আমার ওভাবে বলা মোটেই উচিত হয়নি। কোনওদিন তো আমার কাছে কোনও কুপ্রস্তাব করেনি ও। বরং সাহায্যের হাতই বাড়িয়ে দিয়েছে সবসময়। আমাকে নরমাল করার চেষ্টা করেছে। অত্যন্ত অন্যায় করেছি আমি। ফোন করে ক্ষমা চেয়ে নেব? মীরাদির কথায় সিদ্ধার্থ প্রথমদিনই কত সহজ মনে আমাকে শালিনীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। দুশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তা আর আতঙ্কে কাঠ হয়ে বসে ছিলাম গোটা রাস্তা ট্যাক্সিতে। একটাও কথা বলিনি। শালিনীর অফিস থেকে ছোট মাসির বাড়িতে আমাকে পৌঁছে দিয়ে ও বলল,—'যাই তা হলে।'

লোকটা আমারই কাজে সারাটা দিন ঘুরেছে। কিছুটা কৃতজ্ঞতায়ই বোধ হয় বলে ফেললাম,—'ভেতরে আসবেন না?'

ছোট মাসিও তখন বেরিয়ে এসেছে,—'টুকুনকে আবার আমাদের বাড়ি আসার জন্য বলতে হবে নাকি? আয় টুকুন, চা খেয়ে যা। কাজ হল আজ?'

—'আরেকদিন আসব।' সিদ্ধার্থ চোখ ঘোরাল,—'আপনার এই বোনঝিটির সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকা সেফ নয়।'

—'কেন? কী করেছে রাই?'

—'ওরে বাপ। যা গম্ভীর। আমি বাবা রাগী মহিলাদের ভীষণ ভয় পাই।'

ওর কথা বলার ভঙ্গিতে ছোট মাসি হেসে কুটিপাটি। আমি অপ্রস্তুতের এক শেষ,—'বা, আমি রাগ দেখালাম কোথায়?'

—'একটাও কথা বলেছেন আমার সঙ্গে?'

আমি চুপ।

—'জানো মণিদীপাদি, এতটা রাস্তা এলাম গেলাম, তোমার বোনঝি এমন সিঁটিয়ে বসে রইল

ট্যাক্সিতে যেন আমি জ্যান্ত বাঘ।'

সিদ্ধার্থ এ রকমই। খোলামেলা, সরল, হাসিখুশি। একদিন-দুদিন দেখা হওয়ার পর নিজে থেকেই আপনি থেকে তুমিতে চলে গেছে। এত স্বাভাবিক সেই যাওয়া যে, অস্বস্তি হওয়াব কোনও অবকাশ পাইনি। দ্বিতীয় দিনে বলেছিল,—আপনার যখনই গম্ভীর গম্ভীর ভাব আসবে, আমাকে স্মরণ করবেন। তিন মিনিটে আপনাকে হাসিয়ে দেব।'

আজ বোধ হয় আমার ব্যবহারে হতবাক হয়ে গেছে। প্রথমটা কী যেন বলার চেষ্টা করছিল। ছি, ছি, কী ভাবল আমাকে? না, ফোন নয়। ওদের বাড়িতে যাব। সামনাসামনি ক্ষমা চাওয়া উচিত। একটা ভদ্র ছেলেকে অকারণে অপমান করার কোনও অধিকার নেই আমার।

ছয়

চারদিকের উদ্দাম কলোচ্ছ্বাসের মধ্যে জায়গাটা যেন নির্জন দ্বীপ, একলা, নিশুতি। কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একদিন আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল সিদ্ধার্থ,—'চলো, তোমাকে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

লাল প্রাসাদের মতো সরকারি অফিসবাড়িটা পার হলে একটা টানা লোহার পাঁচিল, খাঁজ কাটা কাটা। মাঝখানে উঁচু গেট। আমি বললাম,—'এটা তো একটা চার্চ।'

—'আরে এসোই না।' সিদ্ধার্থ ভেতরে ঢুকল।

মোরাম বিছানো রাস্তার দুধারে সবুজ ঘাস আর ঘাস। কয়েকটা অশোকগাছ পর পর সেখানে খোঁপা বেঁধে দাঁড়িয়ে। চার্চের পেছনে ছোট্ট এক সমাধি স্থান, ভাঙা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বুনো ঘাস আর আগাছায় ঢাকা জায়গাটার বাঁদিকে কোমর ভাঙা একটা বুড়ো স্তম্ভ। সিদ্ধার্থ সেদিকে আঙুল তুলে বলল,—'চেনো এটাকে? হলওয়েল মনুমেন্ট। সেই যে ফোর্ট উইলিয়ম দখলের সময় কয়েকশো ইংরেজকে অন্ধকূপে নাকি মেরে ফেলেছিল সিরাজ, তারই প্রতিবাদে...'

—'আচ্ছা, এই সেই মনুমেন্ট? ইতিহাসে পড়েছি।'

—'নেতাজি বলেছিলেন হলওয়েলের এই ইতিহাস মিথ্যে। তাঁর আন্দোলনের ফলেই ময়দান থেকে মনুমেন্টকে সরাতে বাধ্য হয়েছিল ইংরেজরা। তারপর থেকে এটা এখানেই।'

আমি অবাক চোখে তাকিয়েছিলাম।

সিদ্ধার্থ ডানদিকে আঙুল তুলেছিল,—'ওটা কী বলো তো? ওই শ্যাওলা ধরা গোল গম্বুজঅলা ঘরটা?'

—'জানি না।'

—'যাও। ওখানেই ভদ্রলোক তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কলকাতায় নতুন এলে ওর সঙ্গে দেখা করে যেতে হয়।'

কথা বলতে বলতে সিদ্ধার্থ ভাঙা ঘরটায় ঢুকে পড়েছে। ঠিক ঘর নয়, ঘরের মতো। কয়েকটা থাম আর সিমেন্টের দেওয়ালে ঘেরা। মাথার খোলাছাতা, ছাদ, প্রাচীন, কালচে। ছাদের নীচে মাকড়সার জাল গাঢ় হতে হতে কোথাও ঘন কালো হয়ে ঝুলছে। ঘরটার পাহারাদার কিছু দামাল ঘাস, বুনো লতা। দেওয়ালের গায়ে রোমান হরফে দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব লেখা।

সিদ্ধার্থ ঠোঁট জড়ো করে হাসল,—'কী হল? সেলাম জানাও।'

—'কাকে?' আমার ভুরু কুঁচকে গেল। ওর রসিকতা তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। সিদ্ধার্থ একটা ইট বার হয়ে যাওয়া থামে হেলান দিল,—'এখানে মাটির নীচে যিনি শুয়ে আছেন, তিনিই তিনশো বছর আগে পত্তন করেছিলেন এই শহরটার। তুমি যে আজ এখানে চাকরি করতে এসেছ...।'

—'জোব চার্নকের সমাধি এটা! তাই!'

—'ইয়েস ম্যাডাম।'

সিদ্ধার্থর সেদিনকার হাসিখুশি মুখটা ভাসছে যেন চোখে। পায়ে পায়ে কখন চার্চের পিঠের দিকে চলে এসেছি। একটা মালীগোছের লোক কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখল আমাকে। তারপর ঢুকে গেল

গির্জায়। কোনও মেয়ে বোধ হয় এসময় একা এখানে আসে না। ঢং ঢং করে বড় ঘড়িতে ছটার ঘণ্টা বাজছে। বাইরের প্রচণ্ড কোলাহলের কাছে এই ঘণ্টাধ্বনি পৌঁছতে পারে না। পাঁচিলের ওপারেই অফিস আদালত ভাঙা উত্তাল জনসমুদ্র। গাড়ি, মিনিবাস ছুটছে এলোপাথাড়ি। এত সব ভিড় আর আওয়াজের মাঝখানে এই ছোট্ট সমাধিস্থানটুকু কী অদ্ভুত রকমের শান্ত। একরাশ ভারী বাতাস বুকে নিয়ে অনন্তকাল ধরে নিঃশব্দে পড়ে আছে। পড়েই আছে।

শেষ ফাল্গুনের অন্ধকার নেমে আসছে ধীরে ধীরে। আলগা বাতাস বইছে। ঠাণ্ডা, নরম, এলোমেলো। নিচু হয়ে একমুঠো ঘাস ছিঁড়লাম। সেদিন এসেছিলাম সিদ্ধার্থর সঙ্গে। আজ একা। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক তার সামনেই এক মিলিটারি কর্নেলের সমাধি। সাদা ফলকের ওপর ম্লান হয়ে আসা জাঁদরেল নামটা আবছা আলোয় ভাল পড়া যাচ্ছে না। কর্নেলের সামান্য তফাতে শুয়ে এক যুবক। জন্ম বারোই জানুয়ারি, সতেরোশো তিন, মৃত্যু আঠাশে এপ্রিল সতেরোশো সাতাশ। যুবকের পাশে এক হতভাগ্য স্বামীর তরুণী স্ত্রী। সাতসমুদ্র পার হয়ে এই ভারতবর্ষে এসে ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়েছিল। আড়াইশো বছর আগে চার বছরের বাচ্চাটা মারা গেছে কলেরায়। এখনও তার স্মৃতিফলকে টলটল করছে বাবা মার চোখের জল। ঠিক সেদিনের মতো গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

সিদ্ধার্থ বলেছিল, 'এখানে এসে মাঝে মধ্যে আমি অতীতের সঙ্গে গল্পগুজব করে যাই। বুড়ো সাহেব ভাল আড্ডা মারতে পারে।'

জোব চার্নকের সমাধির সামনে গিয়ে মাথা নিচু করলাম,—'গুড ইভনিং স্যার।'

—'গুড ইভনিং মাই ডিয়ার লেডি। আজ একা? পার্টনার কোথায়?'

—'পার্টনার নয় স্যার। হি ইজ জাস্ট মাই ফ্রেন্ড। ও কি এর মধ্যে আপনার কাছে এসেছিল?'

—'নোওও।' জোব চার্নক সুর করে মাথা দোলালেন,—'তুমি তাকে খুঁজছ?'

—'ইয়েস স্যার। সেদিন হঠাৎ তাকে অপমান করে ফেলেছি। খুব খারাপ লাগছে।'

—'দেন গো টু হিম অ্যান্ড অ্যাপলোজাইজ।'

—'পারছি না স্যার। কদিন ধরে চেষ্টা করছি। যদি ও অন্য কিছু ভেবে বসে? যদি ধরে নেয় আমারও দুর্বলতা এসেছে? কয়েকবার ডায়ালও করেছি ওর অফিসে। রিং হলেই কেটে দিই। বাড়ি যাব ভাবি, রাস্তায় বেরোলে পা আটকে যায়। কী বলব দেখা হলে?...আমি লজ্জিত?...দুঃখিত?...আমাকে ক্ষমা করে দিন?...না স্যার, আমার ভীষণ আনইজি লাগছে।'

—'গিয়েই দ্যাখো না। ছেলেটা তো ভাল। সুন্দর চেহারা, লাইভলি। মনটাও অনেক পরিষ্কার।'

—'বন্ধু হয়েই থাকুক না। কিন্তু বড় বেশি ও এগিয়ে আসতে চায়। একদম কাছে।'

—'মন্দ কী? তুমি তো জীবনটাকে নতুন করে শুরুই করেছ। আবার নতুন করে একবার...'

সাহেব বলে কী! আবার সেই আগের মতো...!

দুদিকে মাথা নাড়লাম,—'তা হয় না স্যার। আপনি তো সব জানেন। আমার এখন প্রচুর কাজ। পি এস সি-র পরীক্ষায় বসতে হবে...ভালভাবে পেট চালানোর মতো একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে...মানে সেলফ সাফিশিয়েন্ট হতে হবে। এখনও তো নিজেকে খুঁজছি।'

—'পুয়োর চাইল্ড। নিজেকে খোঁজা কি কোনওদিন শেষ হয়? কারুর?'

—তা হয়তো হয় না। কিন্তু একটা গোটা মানুষ হওয়ার জন্য...আমার যে ভেতরে এখনও বড্ড ভয়। কৃষ্ণনগরে চলে আসার পর যে আতঙ্কটাকে ক্রমশ কাটিয়ে উঠতে চাইছি, তা কেন মাঝে মাঝেই ফিরে আসে? কেন চন্দনার ননদাইকে দেখলে আমার পা কাঁপে? কেন সে দিন অনিমেষের দিদিকে রাস্তায় দেখে ওভাবে কুঁকড়ে গিয়েছিলাম? ওর সেই ভাগ্নিটা, ছোট্ট এতটুকুন, বিয়ের পর সারাক্ষণ আমার গায়ে লেপটে থাকত সে যখন আমার দিকে 'নতুন মামি' বলে ঝাঁপিয়ে এল, কেন গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল আমার? মনে হচ্ছে যতটা এগোতে চাই, ততটাই পিছিয়ে যাই বারবার। এত ভয় আর গ্লানি আমার জীবনে।'

—'তুমি কি সিসিফাসের গল্প জানো? সেই গ্রিক ছোকরার? দেবতার অভিশাপে সে জীবনভর একটা ভারী পাথরকে ঠেলে ঠেলে তুলত পাহাড়ের ওপর। কিছুদূর উঠেই পাথরটা গড়িয়ে নেমে যায় নীচে। আবার তখন নতুন করে শুরু হত তার পাথর ঠেলা। কষ্ট হত খুব। দারুণ পরিশ্রম। তবু ঠেলত।'

—'তার ওপর তো অভিশাপ ছিল। কিন্তু আমি কী করেছি?'

—'নো ডিয়ার, অভিশাপটাই বড় কথা নয়। আসলে সব মানুষই হল সিসিফাস। তুমিও। অবশ্য তুমি যদি নিজেকে পুরোপুরি মানুষ বলে ভাবতে চাও।...ওই পাথর ঠেলাটাই জীবন।'

—'আমি অত বুঝি না। আমি শুধু শান্তি চাই।'

—'বেঁচে থাকতে গেলে অশান্তি থাকবেই। ইটস পার্ট অফ লাইফ। মৃত্যুই একমাত্র...'

—'তাই তো আমি মরতে চেয়েছিলাম।'

—'সেটা আরও বোকামি। তোমরা বাঁচতেই জানো না। ফার্স্ট ইউ ট্রাই টু নো হাউ টু লিভ, দেন থিঙ্ক অফ ডেথ। তোমরা মনের দিক দিয়ে এখনও সেই লীলার টাইমেই পড়ে আছ।...তাকাও চারদিকে। গেট ইনভলভড।'

—'আপনি আমার দাদার মতো কথা বলছেন।'

—'রাইট। আমরা তোমাদের রেসকিউ করতে পারি। লীলাকে তুলে আনতে পারি সতীদাহের চিতা থেকে। তারপর এই পৃথিবীতে নিজেদের জায়গা খুঁজে নেওয়ার কাজ তোমাদের। আমাদের নয়।'

বাইরে একটা প্রাইভেট গাড়ির হর্ন আটকে গেছে। তীক্ষ্ণ চিৎকারে ফালা ফালা চারিদিক। চার্নক সাহেব থমকে গেছেন। হয়তো বিরক্তও। এখন আর কোনও কথা বলবেন না। কাঁধের ওপর আঁচল গুছিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। চার্চ কি সন্ধের পর বন্ধ হয়ে যায়? কেউ আসে না? দুজন ফাদার সাদা অ্যাম্বাসাডার চড়ে বেরিয়ে গেলেন। মালীটা আবার বেরিয়ে দূর থেকে দেখছে আমাকে। দিনের বেলা মাঝে মাঝে প্রেমিক-প্রেমিকারা এখানে এসে বসে। এই অন্ধকারে মালী আমাকে পাগল টাগল ভাবছে না তো?

অফিসপাড়া একটু পরেই নাক ডাকাবে। এর মধ্যেই ঝিমুনি নেমে গেছে রাস্তা ঘাটে। চওড়া রাস্তায় লোকজনের সংখ্যা ক্রমশ কম। কেন এসেছিলাম এখানে আমি? সিদ্ধার্থকে খুঁজতে? কেন কদিন ধরে বারবার ওর কথাই ভেবে মরছি? জি পি ও-র দিকে তাড়াতাড়ি পা চালালাম। বাসস্টপে তিনটে ছেলে আমাকে দেখে কী যেন বলাবলি করছে। দুজন জোরে হেসে উঠল। ওরা কি সিদ্ধার্থর সঙ্গে আমাকে দেখেছে কোনওদিন? ধ্যাৎতেরি, কী সিদ্ধার্থ ঢুকে পড়ল মাথায়? ভাবতে হলে নীলাঞ্জন তো...। তিন সপ্তাহ পর পর বাড়ি যাইনি। এ সপ্তাহে যেতে হবে।

আমাদের হোস্টেলের সামনে এত ভিড় কেন? প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে সদর দরজার সামনে। গলির মুখের বাড়ি দুটো থেকে অনেক মুখ উঁকিঝুঁকি মারছে ওদিকে। হলুদ বাড়ির ধ্যাবড়া সিঁদুর পরা বেঁটে বউটা আমাকে দেখে মুখে আঁচল চাপা দিল। আমাদের সঙ্গে কথা বলে না। দোকানটা ছেড়ে কালো মুদিটা বেরিয়ে এসেছে লুঙ্গি গেঞ্জি পরেই। দরজার ঠিক সামনেই একটা ট্যাক্সি। ট্যাক্সির চারপাশে একদল ছেলের জটলা। ট্যাক্সি ড্রাইভার হাত পা ছুড়ে কী বলছে।

কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভেতরে কোনও বিপদ আপদ হয়নি তো? আরেকটু এগোতেই পাঁচিলের ওপার থেকে বড়দির গলা ছিটকে এল,—'এটা ভদ্র মেয়েদের হোস্টেল। ছেনালপনা এখানে চলবে না।'

একটা মুখচেনা ছেলে, বোধ হয় পাড়ারই, টিটকিরি ছুড়ল,—'শালা মেয়েছেলেদের মেস, তার আবার এক নম্বর, দু নম্বর।'

—'আইন করে এইসব প্রাইভেট হোস্টেলগুলো তুলে দেওয়া উচিত।'

ঘটনাটা কী? মাথা নিচু করে ভিড়ের মধ্যে ঢুকেছি। টের পাচ্ছি বেশ কয়েকটা কৌতূহলী চোখ আমার শরীরে গেঁথে গেছে। বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল। কী এমন হয়েছে...? বাঁদিকে অফিসঘরের দরজা জানলায় মেয়েদের ভিড়। ব্রততী, কৃষ্ণা, বুলবুল, মন্দিরা, বন্দনাদি, মধুছন্দা। বউদিদের ঘরে তামিল মেয়েটা ফড়ফড় করে শর্বরীকে কী বোঝাচ্ছে। পেছনের জানলায় কার্তিক জয়রাম। বড়দি আবার চিৎকার করল,—'ডাকি ড্রাইভারকে ভেতরে? কাপড়টা খুলে নিক তোর?'

কাকে বলছে এভাবে? এত বিশ্রী ভাষায়? মহিলার মুখ এমনিতেই আলগা ধরনের। তবে এমন অশ্রাব্য গালিগালাজ আগে তো কখনও শুনিনি! মেয়েরা ছেলেদের থেকেও বেশি মুখ খারাপ করতে

পারে। গোড়ালি উঁচু করেও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সামনে দাঁড়ানো ব্রততীর পিঠে হাত রাখলাম,—'কী হয়েছে গো?'

—'কেলো কেস মাইরি।' ব্রততীর চোখ ভয়ানক উত্তেজিত,—'মাল একেবারে কট। রেড হ্যান্ডেড।'

—'কে?'

—'কাকলি!'

—'কাকলি মানে নতুন মেয়েটা! গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে এল!'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই। পনেরো দিনেই বড়দিকে লাট খাইয়ে ছেড়েছে। দিনের মধ্যে কত লোক যে ফোন করছে ওকে। সবগুলোই নাকি ওর হাজব্যান্ড।'

—'তাইই? আজ কী হয়েছে?'

—'আরও কেলেঙ্কারি। বিকেল থেকে কোন এক চিড়িয়ার সঙ্গে ওই ট্যাক্সিতে করে ঘণ্টা তিনেক উড়েছে। গঙ্গার ধার, ভিক্টোরিয়া, আরও কোথায় কোথায় যেন। তারপর দিদিমণিকে এখানে নামিয়ে দিয়ে মাল সোজা নিউমার্কেটে। সেখানে ড্রাইভারকে দু মিনিট দাঁড়াতে বলে পাখি ভ্যানিশ। ড্রাইভারটাও হাড়ে খচ্চর। সোজা এখানে এসে হল্লা শুরু করেছে। এখ্খুনি তার ভাড়া মেটাতে হবে।'

ব্রততীর সঙ্গিনী মধুছন্দা ফিরে তাকাল,—'এত খিস্তি খাচ্ছে তবু একটা জবাব নেই মেয়েটার। গোরু চোরের মতো ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে দ্যাখো।'

বাইরে ড্রাইভারের চিৎকার,—'কী হল? ভাড়াটা মিটিয়ে দিন।'

ভেতরে ছোড়দির গলা,—'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। টাকা বার করো।'

মেয়েটা কিছু বলল? বোঝা গেল না।

—'নেই বললে হবে কেন? ফুর্তি করার সময় মনে ছিল না?' একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল ভেতরে।

—'কাঁদলেই কি সব চুকে যাবে নাকি? বিরাশি টাকা উঠেছে। বার কর। নয় বালা জোড়া খোল।'

—'ঠিক বলেছ দিদি। বালা দুটো তোমার কাছে জমা রাখো। আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি।'

জয়রাম বুঝি টাকা নিয়েই বেরিয়ে গেল বাইরে। সমস্বরে ছেলেরা কী বলছে। কোনও কথাই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। কর্কশ কিছু পুরুষ কণ্ঠের চেঁচামেচি শুধু। ওর মধ্যে হয়তো ওই লোকটাও আছে! চন্দনার ননদাই। কাল তা হলে দেখতে হবে না। গোটা রাস্তা আমার জীবনটা নরক করে ছাড়বে। মেয়েটাই বা কী? দেখে কিছুই বোঝা যায়নি। কালো, নরম, শান্ত চেহারা, মুখটা দেবী প্রতিমার মতো।

জয়রাম দড়াম করে সদর দরজা বন্ধ করে দিল। ছোড়দি কাকে ফোন করছে। বোধ হয় বুড়ো উকিলবাবুকে।—'হ্যাঁ দাদা, আসতে হবে আপনাকে একবার। আজকেই। হ্যাঁ, একটা ফালতু মেয়ে...'

মেয়েরা অফিস ঘরে ঢুকে পড়েছে। আমিও দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আলমারির কোণে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে কাকলি। দু হাতে মুখ ঢাকা। সেদিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বড়দি চেয়ারে বসল।

—'এই মেয়ে, এ লাইনে কদ্দিন?'

কাকলি ডুকরে উঠল।

—'কেঁদে আমাকে গলানো যায় না। ও সব খানকিপনা আমি অনেক দেখেছি। এই ছোট, ওর লোকাল গার্জেনের নামটা বার কর তো। মাস পোহালেই দূর করে দিতে হবে।'

ছোড়দি চকোলেট রঙের ঢাউস খাতাটা বার করেছে। বুলবুল আচমকা ফুট কেটে উঠল,—'ও সব গার্জেন টার্জেন ঘাঁটা কি ঠিক হবে? তা হলে তো অনেকেই...'

বড়দি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকিয়েছে,—'কী বলতে চাও তুমি? জেনেশুনে একটা বেশ্যাকে থাকতে দেব?'

—'সে যেন আর দ্যান না!' মন্দিরাদিও ঝাঁপিয়ে পড়েছে,—'আমাদের ঘরেই তো একটা স্যাম্পেল রয়েছে।'

—'দেখুন, না জেনে কারুর সম্বন্ধে কথা বলবেন না।'

—'না জেনে বলি না। এত বছর ধরে এখানে কি চোখ বুঁজে আছি? কিছুই নজরে আসে না। সকাল

হলেই হোস্টেলের সামনে গাড়ি। পিপপিপ প্যাপপ্যাপ, হি হি হাসি, হো হো হাসি...'

ছোড়দি কথাগুলো কানেই তুলল না। খাতা খুলে উঁচু করে ধরেছে,—'পেয়েছি দিদি। এই তো, গার্জেনের নাম বিষ্ণুদাস মাইতি, রিলেশনশিপ জ্যাঠামশাই, ঠিকানা...'

—'আমিও তা হলে বলি কটা। লোকাল গার্জেন বার করুন।' মন্দিরাদি কোমর বেঁধে এগিয়ে গেল। এই মহিলা খেপে গেলে থামিয়ে রাখা মুশকিল।

—'সবার এত দরদ উপচে পড়ছে কেন বুঝতে পারছি না।' দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য ছুড়ে দিল বন্দনাদি,—'এটা বেশ্যাবাড়ি নয়। যে এই ধরনের কাজ করবে তাকে হোস্টেল ছাড়তে হবে ব্যস।'

—'ঠিক আছে, উকিলবাবু আসুক। আজ ফয়সালা হয়ে যাক।'

মন্দিরাদিদের দেখাদেখি অনেকেই কথা ছুড়তে শুরু করেছে। ক্যাচক্যাচ কিচমিচ চারিদিকে। কাকলি একভাবে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য! একটাও উত্তর দিল না! ওর কি কিছুই বলার নেই! সত্যিই তা হলে নিজের অপরাধ...

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠছি। ভাল লাগছে না। এই ছ'মাসে অনেকরকম কাণ্ডকারখানা দেখেছি এখানে। এরকম নারকীয় পরিস্থিতি আজ প্রথম। তা হলে কি আমার ছোটমাসির বাড়িতে থাকাটাই উচিত ছিল? দাদারা শুনলে কী ভাববে?

মন্দিরাদি পেছন থেকে গজ গজ করতে করতে আসছে,—'দেখলি তো রাই, সত্যি কথা কেউ কানে তুলতে চায় না। পয়সা খাওয়ালে কী না হয়। তোদের বউদির কথা কাকপক্ষীও জানে। ওই মারুতিঅলা কে হয় ওর? বেহালার বাড়িতে স্বামী রয়েছে, দুটো ছেলেমেয়ে, বুড়ি শাশুড়ি। সব ফেলে এখানে পড়ে থাকে কেন? এটা নোংরামি নয়? নাকি লোকটা দুহাতে পয়সা ছড়ায় বলে...'

ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়লাম,—'আপনার কি মনে হয় সত্যি কাকলি নির্দোষ?'

—'দোষগুণের কথা হচ্ছে না। হতেই পারে মেয়েটা বদ। কিন্তু সবক্ষেত্রে একটাই প্রিন্সিপল থাকা দরকার। একেক জনের বেলায় একেক রকম...নিজেরা কী? যারা শাস্তি দিচ্ছে? তারা কী করে জানি না? দুই ধুমসি মাগি মিলে...'

—'থাক মন্দিরাদি, চুপ করুন।' কানে হাত চাপা দিলাম।

—'কেন চুপ করব? নীচের ব্রততীর দলটা কী? মেয়েরা মেয়েরা ছিঃ...'

বারান্দায় উঠে গেলাম। মন্দিরাদিও উঠে এসেছে,—'একবার একটা মেয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছিল, জানিস। সীতানাথ বলে এক ছোকরা চাকরের সঙ্গে...কী ঘেন্না...শেষে কী হল বল তো? সীতানাথের চাকরি গেল। আর মেয়েটা শুধু টাকা দিয়েই রেহাই পেল না, বড়দি ডাকলেই গিয়ে তার বিছানায় শুতে হত।'

মন্দিরাদিকে আর থামানো যাবে না। এখন রাত অবধি গোটা হোস্টেলের কেচ্ছা গাইবে। ঝগড়া করার সময় ভদ্রমহিলার গোল মুখটা বিকৃত হয়ে যায়। যৌবনকালে মনে হয় সুশ্রী ছিল। শরীর এখন ভারীর দিকে। তবু যখন সোনালি ফ্রেমের চশমা পরে অফিসে বেরোয়, দেখতে ভালই লাগে। এখানে থাকতে থাকতেই কি মুখরা হয়ে গেছে? নাকি ভাইদের গলাধাক্কা খাওয়ার পর থেকে এরকম? ঘরের কারুর সঙ্গে বাক্যালাপ নেই। আমি ছাড়া। বন্দনাদি না, হিরণদি না, শুভ্রা তো নয়ই। বেচারি কষ্ট করে যে ভাইদের মানুষ করল, বিয়ে দিল, তারা সবাই যে যার সংসার পেতে সুখী এখন। দিদিটার আর বিয়ে করাই হল না। বন্দনাদির দুর্ভাগ্যের তো পরিসীমা নেই। অল্প বয়সের বিধবা, সেই জিয়াগঞ্জ না কোথায় বাড়ি। একটা যদি ছেলেপুলেও থাকত বন্দনাদির। সর্বত্র ঠোক্কর খেতে খেতে শেষ আশ্রয় এই হোস্টেল। সম্বল প্রাইমারি স্কুলের টিচারিটা। ইদানীং মঞ্জুদির মতো বন্দনাদিকেও শুচিবায়ুতে ধরছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাথরুমে বসে সাবান ঘসে। জলে জলে হাত পা ভর্তি হাজা। ছুটির দিনে বসে বসে নিজের সব কৌটোবাটা ধোয়। খুচরো পয়সা পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখে সাবান জলে। একদিন মন্দিরাদি টিপ্পনী কেটেছিল,—'ওরে রাই, তোর মাইনের নোটগুলো ধোপার বাড়ি থেকে কাচিয়ে আনিস তো?' শুনে সে কী গালাগালির ফোয়ারা বন্দনাদির ঠোঁটে। ভাবলে অবাক লাগে, দুজনেরই এত সমস্যা, দুঃখ, তবু পরস্পর মুখোমুখি হলেই ঠোকাঠুকি। রাগী বেড়ালের মতো এ ওর দিকে তাকিয়ে গরগর করতে থাকে।

হিরণদি সেজেগুজে ডিউটিতে বেরোচ্ছে। নার্সিংহোমে পৌঁছেই তো মুখের রং সব তুলে ফেলতে হবে। তবু কেন এত সাজে! শুধু এইটুকু রাস্তা যাওয়ার জন্য?

আমাকে দেখে হিরণদি দাঁড়াল.—'নীচের ঝামেলা মিটেছে? যত সব।'

হাসার চেষ্টা করলাম,—'তুমি আজ নাইট করছ যে? ইভনিং ছিল না?'

—'আর বলিস না। দুজন জুনিয়ার নার্স ছুটি নিয়েছে। এদিকে নার্সিংহোম একেবারে রুগিতে রুগিতে থই থই। আমি অবশ্য বলে দিয়েছি, এ সপ্তাহটাই, পরের উইকে কোনও ডিউটি নেব না।'

কথা বলতে বলতে নেমে যাচ্ছে হিরণদি। কাঁকনদের ঘরে উঁকি দিলাম। মঞ্জুদি নেই কেন? এমন একটা সরস দিনে? নির্ঘাত কালীঘাটে গেছে। কাঁকন কপালে হাত রেখে শুয়ে।

—'কী রে এত কাণ্ড হয়ে গেল? নীচে নামিসনি যে বড়?'

কাঁকন চোখ খুলে আবার বন্ধ করল।

—'কী হয়েছে তোর? শরীর খারাপ?'

—'উহুঁ।'

—'নীচের ঘটনা শুনেছিস? কাকলি বলে ওই মেয়েটা...'

—'বাদ দে ও সব কথা। ওতে আমার ইন্টারেস্ট নেই।'

কী হয়েছে কাঁকনের। মেয়েটা তো এরকম নয়। সব ঝামেলার ভেতর আগে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যেন পৃথিবীটাকে উদ্ধারের দায় ওর একার। আমি যখন প্রথম আসি, ও নিজে থেকে এগিয়ে এসেছিল কাছে। আমার ভয়, সংকোচ কাটিয়ে উঠতে কত সাহায্য করেছে সে সময়। শুধু বন্ধু নয়, ও তখন ছিল আমার মা, দিদি, বোন সব কিছু।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম,—'নিশ্চয়ই তোর কিছু হয়েছে। বল আমাকে।'

—'বলছি তো কিছু হয়নি। একতলার ও সব ব্যাপার আমার ভাল লাগে না।'

—'ভাল তো আমারও লাগে না।' একটু থামলাম,—'তবে কী মনে হয় জানিস। আজকের ঘটনাটা কাকলির ইচ্ছাকৃত নয়। মেয়েটাকে দেখে ওরকম মনে হয় না।'

কাঁকন শুনেও শুনল না,—'তোর আজ দেরি হল?'

ও যেন আমার বক্তব্য শুনবেই না ঠিক করেছে। উলটো প্রশ্ন করলাম,—'তুই আজ এত তাড়াতাড়ি যে।'

...'এমনিই। ভাল লাগল না রিহার্সালে যেতে।'

নিজের ঘরে এলাম। দমকা হাওয়ায় জারুল গাছের পাতাগুলো ঝমঝম নাচছে। ফুলে ফুলে ভরে গেছে ডালগুলো। এগিয়ে গিয়ে জানলার পর্দা নামিয়ে দিলাম। কাপড় বদলাব। নীচের তলার গণ্ডগোল থেমে এসেছে। উকিলবাবু এসে গেছে হয়তো। রান্নাঘরে কাঁসার বাসন আছড়ে পড়ল। পাশের বাড়ির টিভিতে হিন্দি সিরিয়াল শুরু হয়েছে। আজ আমাদের নীচের টিভি বন্ধ। কুঁচিটা সবে কোমর থেকে খুলেছি, আচমকা কাধে কাঁকনের হাত,...'ছাদে চল। তোর সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

সাত

আজ আর রাতে ঘুম আসবে না বোধ হয়। মাথার ভেতর কেউ সহস্র ধুনি জ্বালিয়ে দিয়েছে। শরীরের কোষে কোষে অসহ্য জ্বালা। আগেও অনেক রাত জেগেছি। শিবপুরে, কৃষ্ণনগরে। তখন কষ্ট ছিল অন্যরকম। আজ এবা কারা ঢুকে পড়েছে আমার মাথায়? কী করতাম আমি, যদি রাই না হয়ে আমি কাঁকন হতাম? কিংবা কাকলি? কিংবা মঞ্জুদি? বন্দনাদি? মন্দিরাদি? আপনাদের ক্যার্ছে এমন কোনও ছক আছে কি যা মেনে চললে জীবনে শুধুই নিশ্চিন্ত সুখ আসতে থাকে? এমন কোনও নিয়ম আছে, যেগুলো ভাঙলেই শুধু দুঃখ? এই যে মঞ্জুদি, যার কথা শুনলে ঘরে পোষা কুকুর বেড়ালের কথা মনে পড়ে যায়, একটু আলগা সমবেদনাও জাগে, সেও তো একটা পুরোপুরি মানুষ! আমার আপনার মতনই! হয়তো নিজের সম্বন্ধে সচেতন নয়, তবু তো দেখেছি কখনও কখনও মাঝরাতে উঠে বারান্দার থামের পাশে বসে একা একা কাঁদে। অবিরাম। নিঃশব্দে। হয়তো নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য কাঁদে। হয়তো এই বিরাট

পৃথিবীতে নিজেকে খুঁজতে গিয়ে কাঁদে।

কিংবা কাকলির কথাই ধরুন না। মেয়েটা যে সারা সন্ধে একটা লোকের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে কাটাল, সেও তো অপমানের ঝুঁকি নিয়েই? নয় কি? তার কাণ্ডকারখানা দেখে আপনি নাক কুঁচকোতে পারেন কিন্তু কাকলির তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ কাকলির অসহায়তাটা আপনার নাক কুঁচকোনোর থেকে অনেক বেশি তীব্র। খাওয়া দাওয়ার পর মন্দিরাদির কাছে ওর গল্প শুনে আমার গা ছমছম করে উঠেছিল। এমনও হয়? জানেন মেয়েটাকে প্রথম ধর্ষণ করেছিল ওর জাড়তুতো দাদা। ভুরু বেঁকাচ্ছেন কেন? ঘটনাটা সত্যি। তখন নাকি ও পনেরো বছরের। অবশ্য ব্যাপারটাকে ঠিক ধর্ষণ বলা যায় না। কারণ কাকলিও নিষিদ্ধ আনন্দটাকে ভোগ করেছিল তারিয়ে তারিয়ে। বোধহীন জন্তুর মতো। জাড়তুতো দাদা থেকে হাত বদল হয়ে পিসতুতো ভাই। আবাব জাড়তুতো দাদা। তা নিষিদ্ধ প্রেম আর আগুনের ধোঁয়া কি চেপে রাখা যায়! ধরা পড়ল জেঠিমার হাতে। ও, আপনাদের তো বলাই হয়নি। কাকলির মা পালিয়ে গিয়েছিল ওর খুব ছেলেবেলায়, বাবা মারা যাওয়ার পরপরই, এক পাড়াতুতো কাকার সঙ্গে। জেঠিমার গলাধাক্কা খেয়ে কাকলি প্রথমে গিয়েছিল তার সেই মায়ের কাছে। সেখানে মায়ের একগাদা ছেলেমেয়ে। আর অভাব, অশান্তি। তবু জায়গা একটু জুটেছিল। হলে কী হয়, সৎবাবাটি দৃষ্টি দিলেন। মায়ের সংসার থেকে তাড়া খেয়ে আরেক জেঠার দরজায়। লেখাপড়া বেশি দূর শেখেনি। তবে সেলাই-এর ডিপ্লোমা ছিল। তারই জোরে আর জেঠার কৃপায় বহু কষ্টে একটা চাকরি জুটিয়েছে বেহালার দিকে কোন সেলাই স্কুলে। রোজগার খুব বেশি না হওয়াই স্বাভাবিক। তাই মেয়েটা চাকরির সঙ্গে সঙ্গে রোজগারের সবথেকে সহজ রাস্তাটাও বেছে নিয়েছে। মন্দিরাদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—'মেয়েটা আপনাকে নিজে এ সব কথা বলেছে?'

—'বলেছে রে। বলেছে আর কেঁদেছে।'

মন্দিরাদিকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে পারিনি। এই কি সেই মন্দিরাদি যে মেয়েদের নিয়ে মুখরোচক আলোচনা করতে পারলে আর কিছু চায় না। কাকলিকে নাকি বুঝিয়েওছে! বলেছে, ভালভাবে বাঁচার মতো ব্যবস্থা করে দেবে। নানান মহিলা সমিতি-টমিতির সঙ্গে মন্দিরাদির জানাশুনো আছে। ভাল হলেই ভাল। কিন্তু আমার মনে যে একটা সন্দেহ খচখচ করেই যাচ্ছে। ও কি পারবে সঠিক জায়গায় ফিরতে? আপনার কী মনে হয়? আমি হলে কী করতাম? ভাবতে গেলে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। নাহ্, কাকলির জায়গায় নিজেকে বসাতে পারছি না। আমার আর কাকলির সমস্যা এক নয়। আমরা দুজনে এসেছি সমাজের একই অবস্থার দুটো আলাদা বৃত্ত থেকে। আমাদের পারিবারিক সম্পর্কগুলো অনেক বেশি ট্র্যাডিশনাল। কাকলিদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু মুল্যবোধ কোনও কারণে আলগা হয়ে গেছে।

একটু মুখেচোখে জল দেওয়া দরকার। বিছানায় উঠে বসেছি। সামনের মাসে মাইনে পেলে মশারিটা বদলাতে হবে। একদম হাওয়া ঢোকে না। ভাল গরম পড়ে গেছে। ফ্যানটা মন্দিরাদি আর বন্দনাদির মাঝখানে; এখান থেকে বেশ খানিক তফাতে। দুই সিনিয়ার মহিলা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বন্দনাদির শোওয়া ভারী বিশ্রী। কতখানি কাপড় উঠে গেছে। ডেকে তুলব? থাক। মন্দিরাদি জোরে জোরে নাক ডাকাচ্ছে। এই মহিলাকে আজকে বুঝে উঠতে পারিনি। ওপাশে হিরণদি আর শুভ্রার বিছানা খালি। শুভ্রা রাতে ফেবেনি। জানলার একেবারে সোজাসুজি বাইরের লাইটপোস্টটা। শুভ্রার বেডকভার দখল করে এক ঝাঁক আলো ছড়িয়ে পড়তে চাইছে গোটা ঘরে। আস্তে ছিটকিনি নামালাম। পাশে পর পর তিনটে ঘরের দরজা বন্ধ। কাঁকনও কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

অন্ধকার ছাদে আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ কাঁকন দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। গাঢ় নীল আকাশে তখন তারা থই থই। কাঁকনের নীল শাড়ির জরিপাড় চিক চিক করছিল অন্ধকারে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য হলাম আমি,—'কীরে কী বলবি বল।'

ও বুড়ো আঙুলে কপাল চুলকোল। আবার চুপ। আমরা যেদিকটায় দাঁড়িয়ে ঠিক তার সামনেই ভাঙা প্রাসাদটা। অন্ধকার আলো করে ফুটে আছে অমলতাস। অনেক ফুলের গন্ধমাখা মনকেমন করা বাতাস কাঁপছে মৃদু। নীচে খেতে যাওয়ার ফার্স্ট বেল পড়ল। ঘুরে দাঁড়িয়ে কাঁকন আমার হাতদুটো খামচে ধরল আচমকা,—'আমি কি ভুল করছি রাই?'

—'কী করেছিস?'

—'জানি না রে। কী যে হয়ে গেল...' কাঁকনের মুখ আবার তখন ভাঙা বাড়িটার দিকে,—'আবীরের সঙ্গে আমি...বিশ্বাস কর, আমার খুব ভাল লেগেছে...'

—'কোন আবীর? তোদের সঙ্গে যে নাটক করে?'

কাঁকন স্থির।

—'কী করেছিস আবীরের সঙ্গে।'

কাঁকন যেন এখানে নেই। কিছুই শুনছে না। দেখছে না।

—'আমি মণীশকে ভালবাসি রাই।'

—'জানি তো।'

কাঁকন কার্নিশে কনুই রেখে ঝুঁকল। সিগারেট ধরাল অন্যমনস্কভাবে।

—'তুই তো জানিস, আমি অনেক ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করি। জাস্ট মেলামেশা। সেই ছেলেবেলা থেকেই। নাটক করতে করতে কতরকম মানুষের সংস্পর্শে এসেছি...কোনওদিন কিছু মনে হয়নি...তা ছাড়া সেরকম সম্পর্কও তো গড়ে ওঠেনি কারুর সঙ্গে...'

—'কী হয়েছে সব খুলে বল তো।'

কাঁকন এক বুক ধোঁয়া ছড়িয়ে দিল নারকেল গাছগুলোর দিকে,—'তুই তো জানিস আমাদের বাড়িটাই অভিনয়পাগল বাড়ি। বাবা, দাদা, জেঠু সকলেই নাটক ভালবাসে। ছেলেবেলা থেকে সে নেশা আমাকেও ধরেছিল। বালুরঘাটে বাবাদের ক্লাবে প্রথম নাটক করি। একটা বাচ্চা মেয়ের রোল...

—'এ সব কথা তো শুনেছি।'

—'তবু আবার শোন, আমার বলতে ইচ্ছা করছে।'

যেন আমি নয়, নিজেরই মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইছিল কাঁকন। মেয়েটা বড় দুঃখী। অথচ গুণ কত। লেখাপড়ায় ভাল। দারুণ অভিনয় করে, ভাল নাচে। কবিতা লেখে লুকিয়ে লুকিয়ে। এক দিন ওর ডায়েরি আমি দেখেছি।

—'তোকে বালুরঘাটের একটা ঘটনা বলা হয়নি।' কাঁকন মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া চুল সরাল,—'আমার প্রথম সেক্সুয়াল অভিজ্ঞতার কথা...তখন বয়স বারো কি তেরো, একদিন জেঠুদের ক্লাবের পেছনে, সুজনকাকু জোর করে চুমু খেয়েছিল আমাকে, জড়িয়ে ধরেছিল।'

—'সুজনকাকুটা কে?'

—'নতুন কাকুর বন্ধু। সুজনকাকুর মেয়ে আমার ছোটবোনের সঙ্গে পড়ত। বিশ্বাস কর রাই, একটুও ভাল লাগেনি। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। শেষে আমার ফ্রকের বোতাম খুলতে যেতে কেঁদে ফেলেছিলাম ভ্যাঁ করে।'

—'লোকটা মহা পাজি তো।'

—'পাজি কি ভাল জানি না। শুধু মনে আছে ভয় পেয়েছিলাম। অন্য কোনও ফিলিংসই আসেনি। সুজনকাকু আমার কান্না দেখে বলেছিল,—'আজকের কথা কাউকে বোলো না কক্ষনো, তা হলে লোক তোমারই নিন্দে করবে।'

—'তাই তো হয়।' আমার ভুরু কুঁচকে গেছে তখন,—'ছেলেরা ভোগ করে মেয়েদের মুখ পোড়ে।'

কাঁকন ঠোঁট কামড়ে মাথা নাড়ল,...'সেই প্রথম শরীরে কোনও পুরুষের স্পর্শ। জানিস তারপর সুজনকাকু সুযোগ পেলেই ডাকত আমাকে। ছুটে পালাতাম, কী যে আতঙ্ক তখন...'

—'তারপর?'

—'স্কুল পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই জেনে গেলাম। শিখে গেলাম। নিজের শরীর সম্পর্কে কনশাস হলাম বলতে পারিস। আর সুজনকাকুকে দেখে ভয় করে না। লজ্জা লাগে। লজ্জা, লজ্জা...'

'লজ্জা' শব্দটা নিয়ে নিজের মনে খেলতে আরম্ভ করল কাঁকন, যেন কোনও নাটকের সংলাপ। সমস্ত শরীর দিয়ে বুঝি 'লজ্জা'টাকে নানাভাবে অনুভব করতে চায়। আমি হাঁটতে হাঁটতে ছাদের অন্য কোণে চলে গেলাম।

মণীশের সঙ্গে বিয়েটা কাঁকনের জীবনের সবথেকে গভীর লজ্জা। বালুরঘাট থেকে এম.এ. পড়তে কলকাতায় এসেছে। কবি মণীশ সান্যালের সঙ্গে তখনই আলাপ, কফি হাউসে। মণীশের তখন ওঠার

সময়। চুটিয়ে কবিতা লিখছে অজস্র ম্যাগাজিনে। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, এলোমেলো চুল। নেরুদা, রিলকে সবসময় ঠোঁটে। কাঁকনের উপায় কী ছিল প্রেমে পড়া ছাড়া? মণীশের হাত ধরে কাঁকন তখন উড়ছে আর উড়ছে। একপাল অনুরাগিণীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছে মণীশকে, সেই আনন্দটাকেই চাখছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। বছর না ঘুরতে মণীশ চাকরি পেল। এভরি ইন্ডিয়ার সেলস এক্সিকিউটিভ। তার মাস তিনেকের মধ্যে বিয়ে হই হই করে। তারপরই শুরু হল...।

ফুলশয্যার রাতে কাঁকন ঘরে আসার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল মণীশ। এখনও বলতে গেলে কাঁকন উত্তেজিত হয়ে পড়ে,... 'ভাবতে পারিস রাই, ঘুমিয়ে পড়ল। ফুলশয্যার রাতে। টানা একবছর চুটিয়ে প্রেম করার পর...তারপর ভাবলাম সারাদিন ধকল গেছে...আহা ঘুমোক বেচারা। কালকেই তো হনিমুনে যাব দার্জিলিং।'

কাঁকন জানত না দার্জিলিং কী ভয়ানক সংবাদ নিয়ে অপেক্ষা করছিল তার জন্য। তখন সবে শীতের শুরু।

...'পাহাড় ভেঙে ঠাণ্ডা গড়িয়ে আসছে। সন্ধে হতেই মণীশ হুইস্কি খেতে শুরু করল। আমিও অল্প অল্প। ভেতরে ভেতরে ভয়ানক উত্তেজনা। কিছুটা মনে। অনেকটাই শরীরে। ওর কাঁধে মাথা রেখে আধশোয়া আমি। চার-পাঁচ পেগ খাওয়ার পরে মণীশ প্রবলভাবে জড়িয়ে ধরল আমাকে। পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল। কী ভাল যে লাগছিল রাই। মনে হচ্ছিল আমি বুঝি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছি। কতদিন ধরে এই দিনটার প্রতীক্ষায় ছিলাম। সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উজাড় করে দিতে চাইছি। আরও নাও আমাকে। আরও। অনেকক্ষণ আদর করার পর মণীশ আচমকা উঠে দাঁড়াল। টলছে। দুহাতে মুখ ঢেকে বলল,...শুয়ে পড়ো কাঁকন, আমি আজ সারারাত জাগব।

আমি বলেছিলাম,—'আজ তো জেগে থাকারই রাত।'

মণীশ উত্তর দেয়নি। জানলা খুলে বাইরের ঘন কুয়াশার দিকে তাকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ। তারপর আবার হুইস্কি ঢেলেছিল গ্লাসে। আবার। আবার। বারণ করেছিলাম। শোনেনি।

—তখন আমি নির্লজ্জের মতো শুধু চাইছি রে রাই। চাইছি। চাইছি। সম্পূর্ণ মাতাল হওয়ার পর ঘোলাটে চোখে আমাকে দেখল অনেকক্ষণ। দেখলই শুধু। তারপর বিড়বিড় করে কী যেন বলছিল। কবিতা? আমি শুনিনি। আস্তে আস্তে রাগ হচ্ছে তখন। মনে মনে অপমানিতও হচ্ছি যেন। একসময় বিড়বিড় করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়ল মণীশ। আমি জেগে রইলাম। বহুক্ষণ। আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছিস নিশ্চয়ই। শুধু অপমান নয়, শরীর ভেঙে কী এক অজানা যন্ত্রণা তখন...।

ঘুম থেকে উঠে দেখি মণীশ নেই। গত রাত্রের অপমানটা যখন মনের ওপর আবার দখল নিচ্ছে, সে সময় ফিরল। কেমন বিধ্বস্ত। চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে বাথরুমে চলে গেল। তারপর হঠাৎই বেরিয়ে আমার কোলের ওপর পড়ে সে কী কান্না। প্রথমে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তারপর পাগলের মতো,—বিশ্বাস করো। ভেবেছিলাম বিয়ে করলে সব ঠিক হয়ে যাবে...তোমার সর্বনাশ করে দিলাম...আমাকে মেরে ফেলো... আমার মরে যাওয়া উচিত।—এত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, সে মুহূর্তেও বুঝতে পারিনি মণীশ ইম্পোটেন্ট। অনেক পরে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল। ডানা ভেঙে মাটিতে পড়ে গেলাম।'

আবার সিগারেট ধরিয়েছে কাঁকন। প্রথম ধাক্কাটার পর মেয়েটা একটু একটু করে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করেছিল। সান্ত্বনা দিয়েছে মণীশকে। বড় স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে গেছে।

—'বিশ্বাস কর রাই, আমি নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলাম। শারীরিক প্রয়োজনটাই কি সব? আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসি, এটাই কি বড় কথা নয়? মণীশকেও এ কথাই বুঝিয়েছি বার বার। কিন্তু ও যেন ক্রমশ কেমন হয়ে গেল। যেদিন জানতে পারল ওর অসুখটা ভাল হওয়ার নয়, সেদিন থেকে কেমন হিংস্র হয়ে উঠল। আমার পাশে শোয় না, আমাকে সহ্য করতে পারে না। বিশ্রী ব্যবহার করে। ও শুধু নিজের কথাই ভাবত তখন। আমার কথা কোনও সময় ভাবেনি। আমিও যে রক্তমাংসের মানুষ...আমিও যে কী ভয়ানক শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে...'

সব কিছু ভুলে থাকতে কাঁকন নতুন করে ডুবে গেল নাটকে। বাইরের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। পুরনো গ্রুপে জয়েন করল। তারপর যা হয়। শেষের দিকে মণীশ নাকি প্রচণ্ড মারধোরও শুরু করেছিল।

—'তুই ভাবতে পারবি না রাই আমাদের স্বপ্নের সংসারটা কীভাবে একটু একটু করে নরক হয়ে

গেল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ধৈর্য হারালে তার পরিণাম যে কী বিষাক্ত...। শেষে দুজনেই একদিন একসঙ্গে আলিপুর কোর্টে পিটিশন দিলাম। মিউচুয়াল সেপারেশনের।'

কাঁকন থুতনিতে চিবুক রেখে দাঁড়িয়েই ছিল। ওর পিঠে হাত রেখেছিলাম,—'চল, খেয়ে আসি।'

—'তুই যা, আমার ভাল লাগছে না।'

—'পাগলামি করিস না।'

—'তুই বুঝতে পারছিস না রাই আমি যেন...বিশ্বাস কর, আবীরের সামনে মনে হচ্ছিল লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই খিধেটাই বুঝি ঘাপটি মেরে বসেছিল আমার মধ্যে। হয়তো বা সুজনকাকুর সময় থেকে...হয়তো বা মণীশকে বিয়ে করার পর থেকে...আমার কেন এত ভাল লাগল রাই?'

—'লাগতেই পারে। এতে অন্যায় কী আছে? কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা কোনও নিয়ম মেনে চলে না।'

নিজের কথায় নিজেই চমকে উঠেছিলাম। আমিই কি বলছি কথাগুলো? আমি, রাইকিশোরী?

কাঁকন বাচ্চা মেয়ের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরল। কাঁদতে চাইছে। পারছে না।

ওর চুলে হাত বোলালাম। এই প্রথম আমি কাউকে সান্ত্বনা দিচ্ছি,—'তোকে আবীর ভালবাসে?'

—'কে জানে। তবে বিয়ে করতে চায়। আমাকেই।'

—'তা হলে এত ভাবছিস কেন? আরেকবার দ্যাখ না নতুন করে...'

—'বুঝতে পারছি না কী করি।' কাঁকন শেষ পর্যন্ত কেঁদেই ফেলল,—'আবীরের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসার পর ভীষণ অপরাধী লাগছে রে নিজেকে।

যেন একটা চরম নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলেছি। কেন এমন হচ্ছে? কেন মণীশের কাছে করা প্রতিজ্ঞাটা রাখতে পারলাম না?'

—'বোকার মতো কথা বলিস না।' আমি নয়, যেন অন্য কেউ আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছিল কথাগুলো,—'মণীশ এর মধ্যে আসছে কেন? হোয়েন আ চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজড, ইট ইজ ক্লোজড ফর এভার।'

—'সত্যি সত্যি কি ক্লোজড করা যায়?'

—'কেন যাবে না? আমি করছি না? ভুলে যাচ্ছিস কেন তুই আর মণীশের বউ নোস। তা ছাড়া মণীশ তোকে ঠকিয়েছিল। তোর কাছে গোপন করে...'

কাঁকন মাথা নাড়ল,—'হয়তো তুই ঠিকই বলছিস।'

—'বলছি। বলছি।'

কাঁকন আবার ভাবছে,—'তা হলে বলছিস আবীর আমাকে ভালবাসে?'

হেসে ফেললাম,—'এ কথা কখন বললাম? ভালবাসে কি না বুঝবি তো তুই।'

—'রাই, একটা সত্যি কথা বলবি? তোর সেই বদমাইশ স্বামীটার কথা ভাবিস তুই?'

—'কেন?'

—'তার সঙ্গে তো একটা শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল, তার থেকে কোনওদিন কোনও ভালবাসা গ্রো করেনি?'

কাঁকন কি আমাকে পাগল করে দেবে? কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছিল। আবীর কিংবা মণীশের সঙ্গে অনিমেষের কখ্খনও তুলনা করা যায় না। নিজেকে দিয়ে কাঁকন আমার কথা বুঝতেই পারবে না। যেমন আমি কাকলির কথা বুঝতে পারি না।

কাঁকন জিজ্ঞাসা করেছিল,—'উত্তর দিলি না?'

—'কী উত্তর দেব বল। দুটো জন্তুর মধ্যে যে ফিজিকাল সম্পর্ক থাকে, আমাদেরও তাই ছিল। সেই মুহূর্তে হয়তো ভালও লাগত। তার বেশি নয়।'

অনিমেষের কথা ভাবতে গিয়ে আরেক জনের মুখ কেন ভেসে উঠছিল বার বার? সিদ্ধার্থ নয়। আরেক জন। নীলাঞ্জনকে দেখে কি আমার কোনওদিন...এভাবে তো ভেবে দেখিনি। নীলাঞ্জন আর আমি? এক বিছানায়? ধ্যুৎ, ভাবতেই পারি না। তবে কি সেই যে কলেজে পড়েছিলাম—রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়!—ও রকমও কি হয়? তা হলে কাঁকন আবীরের কাছে যায় কেন?

কলসির জল বাষ্প হতে হতে যেমন একসময় তলায় ঠেকে থাকে, কাঁকনেরও হয়তো তাই হয়েছে। আপনি কী বলেন? আমি ঠিক ভাবছি? কাকনের কাছে কোনটা সত্যি? মণীশের ভালবাসার স্মৃতি? না আবীরের বর্তমান...?

দূরে কোথাও একটা মাতাল হল্লা করছে। গাঁজাপার্কের চোলাইখানা বুঝি সারারাত খোলা থাকে। ক্রিশ্চিনটারও কী সব ঝামেলা চলছে ম্যাথুজকে নিয়ে। ডোমা ব্যাপারটা জানে। দু-একদিনের মধ্যে ম্যাথুজ চলে যাবে। এখন কীসের গণ্ডগোল! কী যে হচ্ছে চারদিকে। শার্লি বলে ওদের দেশে বিয়ের সময় একজোড়া লাভবার্ডস উপহার দেওয়া হয় নতুন দম্পতিকে। লাভবার্ডস বুঝছেন তো? সেই পাখিগুলো, যাদের জোড়ার একটা মরে গেলে অন্যটাও না খেয়ে আস্তে আস্তে শুকিয়ে মরে যায়। ওরা হয়তো আশা করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও এরকম হবে। তা কি আর হয়? মানুষ কি পাখি?

মন্দিরাদির টাইমপিসের চোখ জ্বলছে। দুটো দশ। এভাবে সারারাত জেগে থাকব নাকি? এলোমেলো কথা ভেবে? দেখি এক-আধটা ক্যামপোজ ট্যামপোজ পাওয়া যায় নাকি। টিউবের সুইচ অন করলাম। মাথার ভেতর একটানা টাইপরাইটারের খটাখট, খটাখট। বহুকাল পর আজ রাত জাগছি আমি।

আট

অফিসে ঢুকতেই বদ্রি বলল,—'মেমসাব, সাবনে আপকো সালাম দিয়া থা।'

অফিস জুড়ে আজ দারুণ ব্যস্ততা। মালিকরা বোধ হয় ভোর না হতেই চলে এসেছে। কাল থেকে জোর ঝাড়পোঁছ চলছে। এরিয়া ম্যানেজার আসবে। এরিয়া ম্যানেজার মানে রজার দালভি, ব্যাঙ্গালোর মিলের ইস্টার্ন জোনের হর্তাকর্তা। মালহোত্রা ব্রাদার্সের মতো এদিককার অনেক এজেন্টদের প্রভু। মনটা খুশি খুশি হয়ে উঠল। দালভির মতো সুপুরুষ আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি। স্মার্ট অ্যাথলেটদের মতো ফিগার, ছ ফুটের ওপর লম্বা, টকটকে গায়ের রং। গতবার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ছিল। প্রতিবার অফিসে ঢুকেই ইংরিজি ফিল্মের কায়দায় আমাকে বাও করে,—'হাউ'জ লাইফ ম্যাম?'

বদ্রিকে পি বি এক্স বোর্ডে বসিয়ে বড় সাহেবের ঘরের দিকে গেলাম। টু বাই টেন বোর্ড বদ্রি সুন্দর ম্যানেজ করতে পারে। আহা, ওর কেন প্রমোশন হয় না। অবশ্য আমার এই ছোট্ট বাক্সটাকে অফিসের সবাই চালাতে পারে। আমার মতো নির্বোধ মেয়েও একদিনে শিখেছিল।

ব্রাউন পালিশের দরজা আলগা করে ঠেললাম,—'মে আই কাম ইন স্যার?'

—'ইয়েস।'

ছোট সাহেবও বড় সাহেবের ঘরে বসে। আমাকে দেখেই ভিনোদ অভ্যাসবশে নিজের ঘড়ি দেখছে। একটু হতাশ হল মনে হয়। আজ আমি একেবারে পাঙচুয়াল। ঘরটাকে একটু আলাদাভাবে সাজানো হয়েছে। ক্যাবিনেটের মাথায় ফুলদানিতে গুচ্ছ গোলাপ। ফাইলগুলো নিখুঁতভাবে রাখা। ভোর থেকেই বোধ হয় এয়ার কুলার চলছে। ঘর জুড়ে পাহাড়ি ঠাণ্ডা।

বড়সাহেব হলুদ ফাইলটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে,—'এখখুনি ভেতরের নোটটা তিন কপি করে টাইপ করে দাও তো। অ্যান্ড গেট ইউর কাউন্টার ক্লিনড। রজারের সঙ্গে লালওয়ানি আসবে। মিলের ওয়ান অফ দা ডাইরেক্টরস।'

—'রাইট স্যার।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, ভিনোদ ডাকল,—'লিসন, ওরা এলে ঘরে কোনও ফোন দেবেন না। উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ডিসটার্বড।'

আবার ঘাড় নাড়লাম,—রাইট স্যার।'

সবে টাইপ শেষ করে কার্বন খুলছি, অফিসে হালকা গুঞ্জন। রজার ঢুকছে। সঙ্গে একটা বেঁটে মতন ধুতিপরা লোক। তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছি সিট থেকে,—'মরনিং স্যার।'

চোখ থেকে নিজস্ব কায়দায় সানগ্লাস নামাল দালভি,—'ভেরি গুড মরনিং, মে আই মিট দা মালহোত্রাজ?'

হন্তদন্ত হয়ে কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি,—'দে আর ওয়েটিং ফর ইউ স্যার। প্লিজ কাম ইন স্যার, প্লিজ।' আমিও পুরো মেমসাহেবি কায়দায় ওদের রাস্তা দেখাচ্ছি। বদ্রি দৌড়ে গিয়ে বসের দরজা খুলে ধরেছে। আমার সাহেবরাও কেমন ছুটে আসছে দেখুন। ভিনোদ তো আমার থেকেও জোরে লাফিয়ে উঠল চেয়ার থেকে। হিহি, হিহি, এমন মজা লাগছে। অমন প্রতাপশালী ভিনোদসাহেব কেঁচোর মতো গুটিয়ে মুটিয়ে এতটুকু। দালভি একটা স্যুট পরেছে বটে! ঠিক যেন ইমরান খান। পাশের ওই বোকা বোকা লোকটা ডাইরেক্টর। হিহি, হিহি। ওকে দালভির চাকর হলে মানাত বেশি। সিটের দিকে ফিরছি, কাচের ওপার থেকে ডোমা চোখ মারল। না বাবা, ওদের ঘরে এখন ঢুকছি না। বাছুরটাকে সামলাই। আমার পি বি এক্স বোর্ড। ফাইলটা বদ্রির হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব? থাক, দরকার হলে ওরাই চাইবে। বদ্রি ছুটে জেন্টস টয়লেটে ঢুকল। কেন বলুন তো? ওখানে কোল্ডড্রিংকস রাখা আছে সাহেবদের জন্য।

ডোমা খুট খুট করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে,—'য়্যু আর রিয়েলি লাকি রাই...'

ডোমা পেছনে লাগার চেষ্টা করছে। আজ দারুণ সেজেছে। শাহজাদি স্টাইলের সিপিয়া সালোয়ার কামিজ।

—'সেজেছ তো তুমি।' এবার আমি চোখ টিপলাম।

ডোমা ছদ্ম শ্বাস ফেলল,—'তবু তো রজার আমাদের দিকে তাকায় না।'

—'মোস্ট ন্যাচারাল। দারোয়ানের দিকে সবাই আগে তাকায়।'

—'আই উইশ আই উড হ্যাভ বিন এ ডোরকিপার। লাইক ইউ।'

—'ফাজলামি রাখো। ওরা কী করছে? শার্লি, ক্রিশ্চিন?'

ডোমা কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল,—'শার্লির ইন্টারভিউ আছে। রেমিংটনে। বাট রিমেমবার, শি ইজ অন মেডিকেল লিভ টুডে।'

শার্লিরটা এসে গেল। আমার কবে আসবে কে জানে। মার্সনস-এরও খবর নেই। এতগুলো অ্যাপ্লিকেশন ছাড়লাম...। আমার হয়তো ছোটমেসো, মীরাদি ছাড়া গতি নেই।

ইনকামিং কল আসছে। রিসিভার কানে তুললাম,—'মালহোত্রা ব্রাদার্স।'

—'পুট মি টু মিস্টার মেনন প্লিজ।'

এখান থেকে একটু জোরে ডাকলেই মিস্টার মেনন সাড়া দেবেন। তবু রিং বাজালাম। এটাই দস্তুর।

ডোমা টয়লেট থেকে ঘুরে এল,—' ক্রিশ্চিন ভীষণ আপসেট হয়ে রয়েছে বুঝলে।'

—'কেন? ম্যাথুজ কী বলছে?'

—'আরে আমরা জানতামই না ওদের মধ্যে অনেকদিন ধরে টাসল চলছে। ম্যাথুজ চাইছে ক্রিশ্চিনের যখন পাসপোর্ট আছে, এখখুনি বিয়ে করে ওর সঙ্গে চলে যাক। ক্রিশ্চিন রাজি নয়। নিজের জব ভাউচার না পেলে যাবে না। জোর ফাইট চলছে এ নিয়ে। গড ব্লেস, ওদের এনগেজমেন্ট না ভেঙে যায়। ম্যাথুজ যদি যাওয়ার আগে...'

দু নম্বর এক্সচেঞ্জ ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ বাজছে এবার।

—'ইজ অশোক দেয়ার?'

মার্গারেট। সর্বনাশ করেছে। বড় সাহেবের প্রেমিকা, মীরাদির বান্ধবীর বান্ধবী। এর দয়াতেই আমার চাকরি। কী করি এখন? খুব বিনীতভাবে গলা নামালাম,—'বস ইজ এক্সট্রিমলি বিজি ম্যাডাম।'

—'তুমি অশোককে দাও আমাকে।'

আমি কি অশোককে কোলে চাপিয়ে দেব নাকি? এমন আহ্লাদির মতো কথা বলে। সুইচ অফ করে ডোমার দিকে তাকালাম,—'মার্গারেট। কী করি বলো তো? ভিনোদ ঘরে কোনও লাইন দিতে বারণ করেছে।'

—'দেন টেল হার টু রিং লেটার।'

তুই তো বাবা বলেই খালাস। আমি বলি কী ভাবে? মেমসাহেবের যা মেজাজ। চাইলে আমি আজ আছি, কাল নেই। কিন্তু সুইচ তো আমাকে নামাতেই হবে,—'ম্যাডাম যদি কিছু মনে না করেন, ব্যাঙ্গালোর থেকে ডাইরেক্টররা এসেছেন। ওদের সঙ্গে জরুরি মিটিং...'

—'হেল উইথ দেম। তুমি অশোককে বলেছ আমি লাইনে আছি?'

মার্গারেট কিছুটা অধৈর্য যেন। নরিয়া হয়ে বললাম,—'আমি আপনাকে একটু পরে ফোন করছি।'

মেমসাহেবের আদুরে গলা সঙ্গে সঙ্গে হিসহিসিয়ে উঠেছে,—'আমি জিজ্ঞেস করছি তুমি অশোককে বলেছ কি না।'

আমার কী দরকার বাবা পাকামি করার? ওদের ব্যাপার ওরা বুঝুক। মাঝখানে পড়ে আমি...। সুইচ তুলে রিং বাজিয়ে দিলাম। যাক, দুজনে কথা বলছে। ডোমা হাসল,—'ওদের ফোন ট্যাপ করেছ কোনওদিন? এ একবার ডার্লিং বললে, ও দশবার সুইটহার্ট বলে। ওরা লাভ মেকিংটা টেলিফোনেই সেরে নেয়।'

আমি আর ডোমা খুব হাসছি। হঠাৎ ভিনোদ এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই সচকিত।

—'হোয়াটস গোয়িং অন, হিয়ার? এটা কি অফিস? না আড্ডাখানা? হোয়াট ইউ আর ডুয়িং হিয়ার মিস লেপচা?'

ডোমা বড় সাহেবের স্টেনো। ভিনোদকে বিশেষ তোয়াক্কা করে না। সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরে গেছে। কিন্তু আমি যাই কোথায়? ভিনোদ গনগনে চোখে ফিরেছে আমার দিকে,—'আপনাকে ও ঘরে এখন কল দিতে মানা করা হয়েছিল?'

উঠে দাঁড়িয়ে ঢোক গিলছি,—'ম্যাডামের কল ছিল।'

—'ড্যাম ইওর ম্যাডাম। আপনাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলাম ডিসটার্ব না করার...'

—'ম্যাডাম শুনছিলেন না স্যার।'

—'স্টপ ইওর ব্লাডি এক্সকিউজ।'

এক ঘর লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে এদিকে। মিস্টার মেনন, ব্যানার্জিদা, সিনহা, বদ্রিও। কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। শরীরের সব রক্ত বুঝি জড়ো হচ্ছে মুখে। মাথা নিচু করলাম,—'সরি স্যাব। আমি এ ছাড়া কী করতে পারতাম?'

—'কী পারতেন জানেন না যদি, চাকরি করতে এসেছেন কেন? বাড়িতে গিয়ে রান্না-বান্না করুন।'

ছেলেটা আমাকে কী বিশ্রীভাবে অপমান করছে। চাকরি করতে এসেছি বলে কি সব হজম করতে হবে। আমরা ঝি চাকর! ইচ্ছে করছে ওর গালে একটা চড় মেরে চাকরি ছেড়ে চলে যাই। মাইনে যা দেয়, তার তিন ডবল খাটিয়ে নেয়। অ্যাবসেন্ট করলে টাকা কাটে!

চেঁচামেচি শুনে মালহোত্রা সাহেব বেরিয়ে এসেছেন,—'হোয়াটস দ্য ম্যাটার? চেঁচাচ্ছ কেন?'

—'তোমার এইসব স্টাফেরা...'

—'স্টপ ইট। কাম ইনসাইড। দে আর ওয়েটিং ফর ইউ।'

ভিনোদ গজগজ করতে করতে ফিরে গেল। চাই না আমার এ চাকরি। আসব না কাল থেকে।...কিন্তু তারপর? হোস্টেল ফিজ? কৃষ্ণনগরে ফিরে যাব? নিজের ওপর রাগ হচ্ছে। আমার কিছু বলা উচিত ছিল ভিনোদকে। ছেলেটার এত কেন আক্রোশ আমার ওপর? ছোট্ট একটা ব্যাপারে...

চোখ ফেটে জল আসতে চাইছে। ঠকঠক করে কাঁপছি আমি।

দিনটাই আজ তেতো হয়ে গেছে। শ্রীকান্ত মজুমদার যথারীতি মিনিবাসের লাইনে আমার জন্য দাঁড়িয়ে। হতভাগা কিছুতেই আমার পেছন ছাড়বে না। কোনও অপমানই গায়ে মাখতে চায় না। কিছু কিছু মানুষ এমন নির্লজ্জ হয়। ও ঢাকুরিয়ার লাইনে। আমি রানীকুঠির কিউতে দাঁড়ালাম। চৈত্র এসে গেছে। যখন তখন ধুলোর ঝড় কলকাতার রাস্তায়। শ্রীকান্তবাবু ক্যাবলা ক্যাবলা মুখে হাসল। ঘাড় ঘুরিয়ে নিলাম। টেলিফোন ভবন টপকে সূর্যটা নেমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। লালদীঘির জলে তার শেষ আভাস। একটা লম্বা মিছিল টেলিফোন ভবনের সামনে দিয়ে চিৎকার করতে করতে চলে যাচ্ছে আর এন মুখার্জি রোডের দিকে। বোধ হয় এসপ্ল্যানেড ইস্টে যাবে। লাল ফেস্টুন উঁচু করে কী বলছে লোকগুলো বলুন তো?—জুলুমবাজি চলবে না—ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও—আমাদের অফিসে কোনও ইউনিয়ন নেই। তেরোটা লোকের অফিস, তার আবার ইউনিয়ন। থাকলে অবশ্য আমাকে ওইভাবে অসম্মান করতে পারত না ভিনোদ মালহোত্রা। কী বলেন? কপাল, কপাল, কপালটাই আমার

এরকম। সারাটা দিন অফিসে যে কীভাবে কেটেছে। মনে হচ্ছিল কারুর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারব না কোনও দিন। ডোমা ক্রিশ্চিন বারবার বলছিল,—'তুমি ভিনোদের কথা গায়ে মাখছ কেন? ও ওরকমই মিসবিহেভিং। আগের রিসেপশনিস্ট মালা সেনকেও...' বড় সাহেব অবশ্য একবারও খারাপ ব্যবহার করেননি। দালভিরা, চলে যাওয়ার পর ডেকে কাজ দিয়েছেন। উনি কি শুনেছেন ভিনোদ আমাকে কী ভাবে...? বিকেলের দিকে মার্গারেটেরও ফোন এসেছিল। গলায় সেই পুরনো আহ্লাদি ভাব। যেন সকালে ও নয়, অন্য কেউ কথা বলেছিল। অফিসের সকলেও কিছুক্ষণের মধ্যে ভুলে গেল ঘটনাটা। হয়তো ভিনোদও মনে রাখবে না। কিন্তু আমি তো ভুলতে পারছি না। মনে পড়লেই দাউ দাউ জ্বলে উঠছে শরীরটা।

না, হোস্টেল নয়, মীরাদির কাছে যাব এখন। খুলে বলব সব। সিদ্ধার্থর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে? যাক। আজ আমি ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারব।

চণ্ডীতলায় লোডশেডিং। কলকাতার এই এক অসুখ। গরম পড়তে না পড়তে ইলেকট্রিসিটি উধাও। নানুবাবুর বাজার থেকে একটু ডান দিকে হাঁটলেই মীরাদিদের বাড়ি। রাস্তায় এত লোক, তবু কারেন্ট না থাকলে সব কেমন নির্জন নির্জন লাগে। মীরাদিদের পাশের বাড়ির রকে ছেলেরা আড্ডা মারছে। সবুজ দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে আলতো ভাবে কড়া নাড়লাম।

—'আরে রাই। কতদিন পর এলি? কী খবর?'

এক ধাপ উঁচুতে মীরাদি। আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত। থাক থাক কোঁকড়া চুল পিঠের ওপর ফেলা। চওড়া পাড় সাদা শাড়িতে মীরাদিকে একদম অন্যরকম লাগছে। মুখের ভাব সিদ্ধার্থর মতোই। তবে সিদ্ধার্থ যতটা লম্বা চওড়া, মীরাদি ততটা নয়, সিদ্ধার্থ দিদির থেকে ফর্সাও বেশি।

—'শংকর বলছিল তুই নাকি আজকাল বেহালাতেও যাচ্ছিস না। কী ব্যাপার, হোস্টেল এত ভাল লেগে গেল?'

মীরাদি হাত ধরে টানল। এখন আর আমার পা সরছে না। সিদ্ধার্থ বাড়ি আছে কি?

মীরাদি প্রায় আমাকে জড়িয়ে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। সামনেরটা ড্রয়িংরুম। যেখানে আমি প্রথমদিন এসে বসেছিলাম। তারপর সরু প্যাসেজ। একদিকে মীরাদি আর মাসিমার ঘর। উলটোদিকেরটা সিদ্ধার্থর। বাঁচা গেল। সিদ্ধার্থ নেই। বাইরে থেকে ঘরটায় ল্যাচ টানা।

মীরাদি ড্রেসিং টেবিলের ওপর হ্যারিকেন রাখল,—'আবার শুরু হল, বুঝলি। আধ ঘন্টার ওপর গেছে, কখন আসে...'

আমি মীরাদির দিকে তাকিয়েই আছি। এই মহিলার সামনে এলে মনটা কেমন জুড়িয়ে যায়। আপনি আমাকে স্বার্থপর, সুবিধাবাদী যা খুশি ভাবতে পারেন এখন, আমি মীরাদির কাছে আসবই। সিদ্ধার্থর সঙ্গে সম্পর্ক থাকুক, না থাকুক। প্রথম যেদিন এ বাড়িতে এসেছিলাম ছোট মেসোর সঙ্গে, সেদিনই মীরাদি আমাকে জয় করে ফেলেছে। কী শান্ত ব্যক্তিত্ব। সে সময় আমাকে দেখলেই সকলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিয়ে ভাঙার কথা জিজ্ঞাসা করে। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শি সবাই। নতুন পরিচিতরা হাবভাবে কৌতূহল দেখায়। বড় ক্লান্ত বোধ করি। জানেন, এই মহিলাই প্রথম, যিনি আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে একটি প্রশ্নও করেননি।

—'অফিস থেকে আসছিস তো? কী খাবি বল?'

কোনও কথা বলিনি এখনও। কিছু বলতে হয়। হাসলাম মাথা নেড়ে,—'এখন কিছু খাব না।'

খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে আমি। মীরাদি মোড়া টেনে বসল। কী ভাবে শুরু করি বুঝতে পারছি না। মীরাদিই অনুমান করে নিয়েছে,—'কিছু বলবি মনে হচ্ছে?'

—'না, মানে...মীরাদি এই চাকরিটা আমি করব না।'

—'কেন রে? কী হল?'

—'কী অপমানিত হয়েছি আজ...ওই মার্গারেট...আর ওখানকার ভিনোদ মালহোত্রা...এক অফিস লোকের সামনে...কী ইনসাল্ট তুমি ভাবতে পারবে না মীরাদি...'

কথা বলছি আর হাঁপাচ্ছি। মীরাদি ধৈর্য ধরে শুনল সমস্তটা। চুপ করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ,—'দ্যাখ তোকে একটা কথা বলি। চাকরি যদি ছেড়ে দিলি তো, ছেড়েই দিলি। কিন্তু তাতে ভিনোদ

মালহোত্রার এসে যাবে কিছু? না মার্গারেট দুঃখ পাবে? বরং আমি বলি কী নতুন কিছু যতক্ষণ না পাস, দাঁতে দাঁত চেপে...'

—'একটা প্রতিবাদও করব না?' উত্তেজিত হয়ে উঠলাম,—'একজন অন্তত ভিনোদের ব্যাড ম্যানার্স-এর প্রতিবাদ করুক।'

—'কী ভাবে? রেজিগনেশন দিয়ে?' মীরাদি শান্ত হাসছে,—'তাতে ওদের কী এসে যাবে? তোর জায়গায় আরেকটা মেয়ে...'

—'জানি।'

—'তা হলে ছাড়ার কথা ভাবছিস কেন? মাথা ঠাণ্ডা কর। চকরি করতে গেলে এরকম প্রবলেম আসেই। বাবা মারা যাওয়ার পর আমি যে প্রথম প্রাইভেট অফিসটায় ঢুকি, জানিস সেখানকার বস আমাকে কী প্রস্তাব দিয়েছিল? তার তুলনায় তোদের ভিনোদ তো দেবশিশু রে। মাথা গরম, একটু চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে। রাস্তাঘাটে হাঁটতে চলতে গেলে গায়ে ধুলো লাগে না? সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দিবি।'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি। মীরাদি এমন সুন্দর করে বোঝায়, এত ভাল কথা বলে...রাগটা আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে যেন। তবু বললাম,—'যাই বলো মীরাদি, আমার একটা অন্য ভাল চাকরি চাই।' নিজের গলাই কেমন অবোধ, জেদি শিশুর মতো শোনাচ্ছে।

মীরাদি সামান্য গম্ভীর,—'দ্যাখ রাই, যখন কৃষ্ণনগরে ফিরে এসেছিলি তখন তোর পায়ের তলায় কী ছিল? মজা পুকুরে কচুরিপানার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলি। তখন মরে গেলেও মরে যেতিস, বেঁচে গেলেও মরে থাকতিস। আমরা হয়তো তেমন কিছুই পারিনি। কিন্তু একটু জমি তো দিয়েছি। তোর দাদা দিয়েছে সাহস, মাসি মেসো উৎসাহ, আমি ছোট একটা চাকরি...'

—'আমি তো সে কথা অস্বীকার করি না মীরাদি।'

—'অস্বীকার করার কথা নয়। এখন তোমার অর্জন করার পালা। ইউ বেটার আর্ন এ জব। এতে তোর যে আনন্দ হবে...'

হ্যারিকেনের আলো পড়ছে মীরাদির শরীরের বাঁ দিকে। ডানদিকের দেওয়ালে মীরাদির বিশাল ছায়া। সেই ছায়ায় আমি। মীরাদিকে বলব নাকি হোস্টেলের মেয়েদের কথা? কাকলি, মঞ্জুদি, বউদি...।

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ। মীরাদি উঠল,—'বোস্ দেখি কে এল।'

টান টান হয়ে গেছি। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সিদ্ধার্থ! কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে আমার। অফিসের টেনশনের বদলে সিদ্ধার্থ ছড়িয়ে যাচ্ছে ভেতরে। ও কি সেদিনকার কথা বলে দিয়েছে সকলকে?

—'কীরে রাই কখন এলি?'

সিদ্ধার্থ নয়। মাসিমা! ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে আমার,—'এই তো কিছুক্ষণ।'

আমি এদের কেউ নই। অথচ কত সহজে এরা আপন করে নিয়েছে আমাকে। মাসিমার কথার ভেতরে খুব ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। এই ব্যক্তিত্বই বোধ হয় মীরাদির মধ্যে ছড়িয়েছে। আর হাসিখুশি ভাবটা সিদ্ধার্থর ভেতর। এঁর সামনে নিজের ছোটখাটো দুঃখকষ্টের কথা বলতেও লজ্জা হয়।

মাসিমা ঢুকতেই কারেন্ট এসে গেছে।

—'কী, রাইকে খাইয়েছিস কিছু?'

—'না। এই তো গল্প করছিলাম আমরা। বোস রাই, চা করে আনি। কটা পরোটা ভেজে দিই, খাবি?'

অফিসে ভাল করে টিফিন করাও হয়ে ওঠেনি। তবু খিদে পাচ্ছে না আজ,—'আমি শুধু চা খাব।'

—'খেয়ে যেতে পারতিস। তোদের হোস্টেলে যা খাবার দেয়।'

মাসিমা বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, খেয়েই যা। রাই, তুই আজকাল কোথাও যাস না কেন রে! মণিদীপা বলছিল কৃষ্ণনগরেও নাকি মাসখানেক যাসনি। তোর খোঁজে তোর মেসো একদিন গিয়েছিল হোস্টেলে। ছিলি না।'

—'কবে বলুন তো?'

—'গত রোববার বোধ হয়।'

—'ও, সেদিন শার্লির বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল। আমার অফিসের চাইনিজ বন্ধু। ডে-স্পেন্ট করতে গিয়েছিলাম।'

—'কোথায় থাকে? ট্যাংরায়? ওদিকে শুনেছি চিনারা একটা টাউন তৈরি করে নিয়েছে?'

—'না, ওদিকে নয়। বউবাজারের কাছে। ছাতাওয়ালা গলিতে। জানেন মাসিমা কত্তটুকুন জায়গায় কত জন মিলে যে থাকে ওরা। ওর বাবা ডেনটিস্ট। দাদা একটা লন্ড্রি করেছে। মা আর দাদা মিলে সেটা চালায়।'

—'কেমন সুন্দর বল তো,' মীরাদি হ্যারিকেনটা তুলে রাখল,—'আমাদের মা'রা ভাবতে পারে, বাইরে বেরিয়ে লন্ড্রি চালানোর কথা?'

—'ও কথা বলিস না মীরা। যাদের যা, তাদের তা। আমাদের তো ছোটবেলা থেকে সেভাবে বড় করা হয়নি। তা হলে আমরাও পারতাম। এখনকার মেয়েরা ঠিক পারবে। কীরে রাই, পাববি না?'

—'নিশ্চয়ই পারব। কৃষ্ণনগরে আমি তো সবার জামাকাপড় কাচতাম।'

আমি ইয়ার্কি জুড়েছি মাসিমার সঙ্গে। আস্তে আস্তে নিজেকে অনেক বেশি স্বাভাবিক লাগছে। কত দিন পর বুঝি হালকা ভাবে গল্প করছি। সেই কৃষ্ণনগরের বাড়ির মতন। মীরাদি পরোটা নিয়ে এল। সঙ্গে রুই মাছের ভৃন্দালু। মাসিমা এই রান্নাটা দারুণ করেন। তাড়াতাড়ি খেয়ে পালাই বাবা। সিদ্ধার্থ আসার আগেই। যদি হাত থেকে কেড়ে নেয়। পরোটা সবে ছিঁড়েছি, এবার বাইরে কলিং বেল। বেশ জোরে। সত্যি জোরে বাজল কি? নাকি আমার কানেই...। ঢক ঢক করে জল খেয়ে নিলাম। এবার নিশ্চয়ই...।

দরজা খোলার শব্দ। আমার হাত আবার ঘামে ভিজে সপসপ। খাওয়া ফেলেই উঠে দাঁড়িয়েছি। মাসিমা দরজার দিকে তাকিয়ে,—'কে এল রে মীরা?'

—'ও কেউ না। পাড়ার ছেলেরা। শীতলা পুজোর চাঁদা।'

সিদ্ধার্থ কি আমার সঙ্গে এভাবেই লুকোচুরি খেলবে নাকি? আশ্চর্য, মাসিমা কিংবা মীরাদি কেউ একবার ওর প্রসঙ্গ তুলল না পর্যন্ত। হয়তো জানে। হয়তো জানে না। আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে হঠাৎ। কোনওরকমে খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম,—'চলি মাসিমা। মীরাদি...আসি।"

—'একবার কৃষ্ণনগরে ঘুরে আয়। মা বাবা ভাবছেন কত।'

—'যাব। দেখি যদি এ সপ্তাহে পারি...'

মীরাদি দরজা অবধি এল,—'ট্রাম ডিপোতে গিয়ে টিউব রেলে চলে যা। তাড়াতাড়ি হবে।'

এরা কি কিছুতেই সিদ্ধার্থর কথা বলবে না আমাকে? নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না,—'সিদ্ধার্থদা ফিরল না এখনও?'

গলাটা কি কেঁপে গেল আমার? নার্ভাস চোখে তাকিয়ে আছি মীরাদির দিকে।

—'কেন তুই জানিস না? ও তো দু সপ্তাহের অফিস ট্যুরে গেছে। হায়দ্রাবাদে। ওখানে ওদের কী একটা নতুন ব্রাঞ্চ খুলছে...হয়তো ও সেখানেই...'

সিদ্ধার্থ কি অভিমানে কলকাতা ত্যাগ করবে। আমার জন্য। মীরাদি একটু অবাক চোখে দেখছে আমাকে,—'তোর সঙ্গে দেখা হয় না টুকুনের? তোকে বলে যায়নি কিছু?'

অপ্রস্তুতভাবে মাথা নাড়লাম। মীরাদির চোখ এখনও স্থির। রাস্তায় নেমে জোরে হাঁটা শুরু করেছি।

কৃষ্ণনগরে এলে মনটা কেমন অন্যরকম হয়ে যায়। যেন আমার দুটো মন। একটা কলকাতার, একটা কৃষ্ণনগরের। কলকাতার যে মন সবসময় দেখছে, ছুটছে, এখানে এলেই সে মনে কী যে ক্লান্তি। এখানকার মনটাকে নিয়ে আমার বড় ভয় হয়।

কাল হাফডে ছিল। তিনটে নাগাদ হোস্টেলে ফিরে দেখি ভিজিটর্স রুমে ছোট মাসি টুম্পাকে নিয়ে বসে। আমাকে দেখেই পুঁচকে টুম্পা হাততালি দিয়ে উঠল,—'ওই তো দিদি এসে গেছে।'

ছোট মাসি বলল,—'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। তোকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি।'

—'কোথায়?'

—'কোথায় আবার? কৃষ্ণনগরে। কী অসভ্য মেয়েরে তুই। দিদি জামাইবাবু ভেবে মরছে...আমার বাড়িতেও এক যুগ ধরে যাচ্ছিস না,...ব্যাপারটা কী?'

—'কিছুই না।' আমি হেসে ফেলেছিলাম,—'আজই তো সাড়ে ছটার ভাগীরথীতে যাব ঠিক করেছি।'

—'চল। আমিও যাব তোর সঙ্গে।'

ছোট মাসি যেন পারলে আমাকে বেঁধে নিয়ে যায়। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—'মেসো যাবে না?'

—'না। ও আজ ধানবাদ যাচ্ছে। সোমবার ফিরবে।'

—'তাই বলো। আমি ভাবছিলাম তুমি কী করে মেসোকে ছেড়ে...'

—'পাকামি করিস না। তোর মেসো যা তোর ওপরে চটে আছে না। একটা ভাল চাকরির খবর ছিল তোর জন্য...'

—'সে কী?' সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠেছি,—'আমার অফিসে ফোন করেনি কেন? এমা কী হবে?'

ছোট মাসি হেসেছিল অনেকক্ষণ পর,—'বুঝেছি। নিজের দরকার ছাড়া তুমি আমাদের খোঁজ নেবে না। তাই তো?'

তাড়াতাড়ি ঢোক গিলেছিলাম,—'বিশ্বাস করো ছোট মাসি, একদম সময় পাচ্ছি না।...কোথায় চাকরি গো? মেসো আমার অফিসে এসেও তো খবরটা দিয়ে যেতে পারত...'

—'ধীরে বৎস ধীরে, এত উতলা হয়ো না। চাকরিটা এখখুনি হওয়ার চান্স নেই। ওর অফিসের রিসেপশনিস্ট মেয়েটির সামনের মাসে বিয়ে। তার জায়গায় যাতে তোকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, ও সেই চেষ্টাই করছে।'

—'মেয়েটা চাকরি ছেড়ে দেবে?'

—'শুনছি তো তাই।'

আশ্চর্য! এই বাজারে সহজে কেউ চাকরি পায় না। আর মেয়েটা বিয়ে বলে...বলতে গিয়েও সামলে নিয়েছিলাম নিজেকে। ছোট মাসিরা ছকে বাঁধা জীবনের মানুষ। এভাবে ভাবতে জানে কি।

আচ্ছা ছোট মাসি কি খুব সুখী? মেসোকে নিয়ে? টুম্পা আর ঘরসংসার নিয়ে? ট্রেনে আসতে আসতে প্রশ্নটা করেই ফেললাম শেষ পর্যন্ত,—'মাসি, তোমার কখনও নিজেকে মেসোর ওপর ডিপেন্ডেন্ট বলে মনে হয় না?'

ছোট মাসি প্রথমটা বুঝতেই পারেনি আমার কথা। অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল,—'মানে?'

—'ধরো, এই যে তুমি তোমার সমস্ত কাজে মেসোর ওপর নির্ভর করে থাকো...'

—'সে তো তোর মেসোও আমার ওপর নির্ভর করে থাকে। আমাকে ছাড়া একদণ্ডও...'

—'আমি সে নির্ভরতার কথা বলছি না। আজ যদি মেসো তোমাকে ছেড়ে দিতে চায়, ধরো হঠাৎ অন্য কোনও মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল...।'

ছোট মাসির ভুরু কুঁচকে গেল। কয়েক সেকেন্ড যেন ভাবলও কিছু। তারপর হেসে উঠল খিলখিল করে,—'সে মুরোদ তোর মেসোর নেই।'

—'হলে কী হবে?'

—'কী আর হবে? মনে করব সেটাই আমার ভাগ্যে লেখা ছিল। কিন্তু আমাকে তুই এ সব কথা জিজ্ঞাসা করছিস কেন?'

কেন যে করছি তা যদি মাসি বুঝত। আমার মতো গলা ধাক্কা না খেলে কোনও মেয়েই বোধ হয় তা বুঝতে পারে না। কিংবা আমার ধারণা ভুল। হয়তো পরিপূর্ণ ভাবে কারুর ওপর নির্ভর করে থাকাতেও এক ধরনের সুখ আছে। আমি সে জীবনের স্বাদ পাওয়ার সুযোগ পেলাম কই।

দুপুরে সবে খেয়ে উঠেছি, হঠাৎ, পিসি এসে হাজির। বেলঘরিয়াতে নতুন বাড়ি করেছে। আমি কোনওদিন যাই না বলে একগাদা অভিযোগ করল। যাব কী, পিসির প্রশ্নবাণকে আমি যে ভীষণ ভয় পাই। আমার এই লম্বা চওড়া চেহারার লাল টুকটুকে পিসিকে উকিল হলে ভাল মানাত। ছোট মাসি,

মা আর পিসি বড় ঘরে গল্প করতে বসেছে। দাদা গেল মুকুলদাদের বাড়ি ব্রিজ খেলতে। ভাইয়া তো সকাল থেকেই ব্যস্ত পঁচিশে বৈশাখের নাটক নিয়ে। আচ্ছা নাটকপাগল ছেলে হয়েছে। ওকে কাঁকনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হবে। বাবা কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে বারান্দায় বসে ছিল। একটু আগে ছোট ঘরে শুতে গেল। আজকাল বেশি কথাবার্তা বলে না। কেমন মনমরা হয়ে থাকে। দিন দিন শরীর ভাঙছে। মারও আর আগের মতো সুন্দর স্বাস্থ্য নেই। কয়েক বছর আগেও মাথা ভর্তি কালো চুল ছিল। এখন বেশির ভাগই সাদা। মুখ জুড়ে ভাবনার কাটাকুটি। একটামাত্র বিপর্যয় সংসারকে কী প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়ে যায়, টর্নেডোর মতো!

টুম্পা বারান্দায় খেলা করছিল। ছোট মাসি টেনে ঘুম পাড়াতে নিয়ে গেল। এই মেয়েটা যখন বড় হবে, তখনও কি কিছুই পালটাবে না সমাজের? ভাবনা? চিন্তা? নীতি? নিয়ম? দাদা বা ভাইয়ার মেয়ে হলে আমি একদম অন্যরকম ভাবে মানুষ করব তাকে। আর আমার মেয়ে হলে... দূর কী সব হাবিজাবি ভাবছি। রেলিং ধরে ঝুঁকলাম। নীচের তলার বউদি উঠোনে কাপড় মেলছে। মাস তিনেক হল নতুন ভাড়া এসেছে। আমার সঙ্গে তেমন আলাপ নেই? তবে মহিলার কৌতূহল সাংঘাতিক। অবশ্য কৌতূহল কারই বা কম? একবার সিঁদুর পরার পর যে মেয়ে তা মুছে ফেলে, তাকে নিয়ে চর্চা করাটাই সমাজের রীতি।

রেলিং থেকে সরে দাঁড়ালাম। নীচের উঠোনটুকু পেরোলে কাঠের গেট। তারপরে রাস্তা। দুটো বড় রাস্তার মাঝ বরাবর বলে সব সময় এপথ দিয়ে গাড়িঘোড়া চলাচল করে। বেশি যায় সাইকেল রিকশা। দিনরাত ভেঁপু ভেঁপু আওয়াজে পাড়া তোলপাড়। তবে এই মুহূর্তে রাস্তা নির্জন। অলস রোদ গায়ে মেখে শুয়ে আছে ছুটির দুপুর। শুধু ভৌমিকদের ছাদের আলসেতে একটি কাক তারস্বরে ডেকে চলেছে।

জলখাবারের টেবিলে সকালবেলা দাদা তিনটে একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়েছিল,—'নে, রেখে দে। গত মাসে নিসনি। দুমাসেরটা একসঙ্গে দিয়ে দিলাম।'

গত মাসে ইচ্ছে করেই নিইনি। এভাবে বারবার টাকা নিতে আমার খারাপ লাগে। বাবার রিটায়ারমেন্টের পর দাদার মাইনে আর ভাড়ার টাকাতে সংসার চালায় মা। বাবা অবশ্য এক-আধটা টিউশনি করে এখনও। আবার টাকাটা না নিলে আমারই বা চলে কী করে? গত মাসে খুব টানাটানি গেছে।

—'কীরে ধর।'

কী যে হল, বলে ফেললাম,—'রেখে দে। লাগবে না।'

—'কেন তোর মাইনে বেড়ে গেছে নাকি?'

হায়রে মালহোত্রা ব্রাদার্সে আবার মাইনে বাড়া। তাও মাত্র কদিনের চাকরিতে।

—'না, তা নয়। তবে এখন দরকার নেই।'

—'পাকামি করিস না।' দাদার চোখ হাসছিল,—'তুই কি ভাবিস তোকে আমি এমনি এমনি টাকা দিই? একটা ভাল চাকরি পা, সুদে আসলে সব উশুল করে নেব তখন।'

হাত বাড়াতেই হল। যতই দেমাক দেখাই, দাদার এই সাহায্যটা আমার খুবই দরকার। হোস্টেলের ফিজ দেবার পর কটা টাকাই বা থাকে হাতে। ছোটমাসির কাছে থাকলে এ অভাব হয়তো হত না। কিন্তু সেখানে কি আমি নিজেকে...দাদাটা আমার সত্যিই দূরদর্শী। ঠিক বুঝেছিল এই প্রতি মাসে সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারটা আমাকে বিঁধবে। বিঁধবেই। আর ও তো সেটাই চায়।

বারান্দায় কোণে রাখা ইজিচেয়ারটায় বসলাম। আমাদের এই সাবেকি বারান্দায় কতদিন ধরে যে একভাবে পড়ে আছে চেয়ারটা।

একসময় দাদু সারাক্ষণ চুপ করে বসে থাকতেন এখানে। কত দিন ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করেছি,—'দিনভোর ফ্যাল ফ্যাল করে কাকে দেখো দাদু?'

একগাল সাদা দাড়ি আর ফোকলা গালে দাদু ভারী নির্মল হাসতেন,—'পৃথিবীটাকে শেষবারের মতো প্রাণভরে দেখে নিই গো রাইকিশোরী।'

—'কী এত দেখার আছে পৃথিবীতে?'

—'কী নেই গো? সব আছে। সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিচ্ছেদ, আলো-অন্ধকার, দিন-রাত্তির...'

ইজিচেয়ারের হাতলে আলতো হাত বোলালাম। ছেলেবেলা থেকেই এই চেয়ারটার সঙ্গে এক ধরনের আত্মীয়তা হয়ে গেছে। দাদু বলতেন,—'এ চেয়ার কবে আমাদের বাড়িতে এসেছে জানিস? সেই একচল্লিশের ডিসেম্বরে। পার্লহারবারে যেদিন বোমা পড়ল, ঠিক তার পরের দিন।'

ঐতিহাসিক চেয়ারটায় বসার জন্য ছোটবেলায় দাদা ভাইয়ার সঙ্গে মারপিট লেগে যেত আমার। সবার সমান দাবি। শেষে মা ঝগড়া থামাতে গুমাগুম্ কিল মারত তিনজনেরই পিঠে। দাদু মারা যাওয়ার পর চেয়ারটার পেছনের দেওয়ালে একটা সিংহের মুখ আপনা আপনি ফুটে উঠেছিল। অবশ্য আমারই শুধু ওটাকে সিংহ মনে হত। দাদার মনে হত রাজবাড়ির দেউড়ি। ভাইয়ার হাতলঅলা টিউবওয়েল। এ নিয়েও কত তর্ক।

অনেক দিন পর নোনাধরা দেওয়ালের মানচিত্রগুলো খুঁটিয়ে দেখছি। আদ্যিকালের বাড়ি। সেই দাদুর বাবার আমলে তৈরি। বহুদিন ভালমতো সংস্কার হয়নি। আমার বিয়ের সময় শুধু গোটা বাড়িটা আলগাভাবে চুনকাম করা হয়েছিল। তার বেশি করতে অনেক খরচা। ওপর ওপর চুন বোলানোর দরুন চার বছরেই সাদা রং আবার হলুদ। পলেস্তারা খসে ইঁট দাঁত বার করেছে। আগের মতোই স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালের জায়গায় জায়গায় বাঘ, হাতি, ঘোমটাপরা বউ, সার্কাসের জোকার।...চতুর্দোলাটা কোথায় গেল? কোথায় যেন ছিল? দাদার ঘরের দিকটায় না? নাকি বাবা মার ঘরের দিকে? বুক মোচড় দিয়ে উঠল। এতদিন খেয়ালই করিনি আমার বিয়ের পর থেকে ওই ছাপটা একেবারে মুছে গেছে। অথচ কী নিখুঁত ছিল ছবিটা। আমি তখন ছোট। বাবা বলত,—'এটা হল গিয়ে রাই-এর চতুর্দোলা। এটা চেপে রাই শ্বশুরবাড়ি যাবে।' ভাইয়া তখনও হয়নি। বাবার কথা শুনে দাদা উচ্চিংড়ের মতো লাফাত,—'না, এটা চেপে আমি শ্বশুরবাড়ি যাব।'

মা দুলে দুলে গান করত,—'দোল দোল দুলুনি...' দাদা চিৎকার করত,—'বোনের দিকে নয়, আমার দিকে তাকিয়ে গান করো।' আমি বলতাম,—'না, আমার দিকে তাকিয়ে।'

ছেলেবেলায় ভাইবোনেরা তো এরকমই থাকে। দুজনেই সমান সমান। তারপর একটু একটু করে দুজনের জগৎ একেবারে আলাদা হয়ে যায়। ছেলেদের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া আর মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি যাওয়াতে যে কী আকাশ পাতাল তফাত দাদা বুঝত না। আমিও না। কেন যে বুঝতে শিখতে হল। শৈশবের মতো নির্ভার নিশ্চিন্ত জীবনটা যদি...

চেয়ারের কোলে মাথা রাখলাম,—'আমাদের সেই সব দিনগুলোর কথা তোমার মনে আছে চেয়ার?'

চেয়ার নড়েচড়ে বসল যেন,—'খুব মনে আছে। আমার কোলেই তো সব মানুষ হলে তোমরা।'

—'দাদা তোমাকে কীরকম জ্বালাতন করত মনে পড়ে? কাদামাঠে ফুটবল খেলে এসে, হাত পা না ধুয়েই ধপাস করে বসে পড়ত তোমার ওপর। তখন মা এসে দাদাকে...'

—'আর তুমি? স্কুল থেকে ফিরেই আমার কোলে বসে অবিরাম দোল খেতে। মাঝে মাঝে বুড়ো এসে পেছন থেকে বিনুনি ধরে টানত তোমার। তুমি আঁ আঁ চেঁচাতে।'

—'ভাইয়া কেমন তোমার পিঠে চড়ে টিঙটিঙ লাফাত।'

—'হুঁ, সব মনে আছে আমার। আমি কি আর আজকের হে? আমার চোখের সামনে তোমার বাবা তোমার মা-কে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছে। তখন আমার কী পালিশ, কী জেল্লা। তারপর ব্রত হল, তুমি হলে, বুড়ো হল...'

—'তোমার চেহারা কিন্তু হঠাৎ অনেক ঝিরকুটে মেরে গেছে চেয়ার।'

—'হবে না? এতদিন একসঙ্গে আছি, আমারও তো মায়া পড়ে। তোমাদের ভাল হলে আমি মনে মনে চকচকে হই, আর তোমাদের খারাপ হলে...'

—'আমার বিয়ের কথা বলতে চাইছ?'

—'হ্যাঁ, তোমার সেই ভুল বিয়েটা। সেই শিবপুরের বর। ছেলেটাকে বিয়ের দিনই দেখে আমার ভাল লাগেনি। বড় স্বার্থপর, লোভী লোভী চোখ। ওখানে তো তুমি মরতে গিয়েছিলে। ফিরে এসে দিনরাত আমার বুকে শুয়ে কাঁদতে, কখনও বসে থাকতে থম মেরে...'

—'যাক ও সব কথা। পুরনো ঘা কেন খোঁচাচ্ছ? তুমি কি চাও আবার রক্ত পড়ুক?'

—'আমি কেন চাইব? তুমিই তো ভাবো। না হলে এখানে এসে সর্বক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকো কেন? হাসো। কথা বলো। চিয়ার আপ। যাও, মা মাসি গল্প করছে...'

—'ভাল লাগে না। কৃষ্ণনগরে এলে আমার কিছু ভাল লাগে না।' আমি চোখ বুজলাম।

—'কেন রাই, এ শহরটা কী দোষ করল?'

—'জানি না। খালি মনে হয় এখান থেকেই আমার অনেক কিছু পাওয়ার ছিল। শুরু হওয়ার কথা ছিল এখান থেকেই।'

—'কী?'

—'একটা পথ। একটা ঠিকানা। একটা ডেসটিনেশন। যেখানে মানুষ পৌঁছতে চায়। অথচ ঠিক ঠিক শুরু করা গেল না। যেভাবে শুরু করেছিলাম...না, শুরু করেছিলাম বলা যায় না, যেভাবে শুরু হল, কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম রাস্তাটা ভুল। অন্ধগলি। ধাক্কা খেয়ে ফেরত এলাম। তারপরও এখান থেকে তো নতুন কোনও রাস্তা খুলল না আমার জন্য।'

—'এটা খাঁটি কথা হল না রাই। তোমার বাবা মা যদি আদর করে তোমাকে টেনে না নিত, তোমার দাদা যদি ধাক্কা দিয়ে কলকাতায় না পাঠাত, কোথায় যেতে তুমি? বলতে গেলে এই শহরটা থেকেই তো আবার সূত্রপাত।...'

—'তুমি বুঝতে পারছ না চেয়ার। আমি ঠিক এ কথা বলতে চাইছি না। আসলে এখানে এলেই বুকে একটা কষ্ট চিনচিন করতে থাকে। মনে হয় মনের ওপর পাতলা সরের মতো একটা ছায়া এসে পড়ছে। আহত শামুকের মতো খোলের ভেতর ঢুকে পড়ি। চেয়ার, আমি তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারব না...'

—'আমি বুঝতে পারছি। তুমি এখানে এলেই মনে মনে ওই ছেলেটার কথা ভাবো। ব্রতর ওই সুন্দর মতন বন্ধুটার কথা।'

—'হয়তো তাই। হয়তো তাই নয়। আসলে আমার জীবনটা যেভাবে চলছিল...ভেঙে গেল...এখন যেভাবে কাটছে... যেভাবে কাটবে ভেবেছিলাম ছেলেবেলায়... বাবা মার আমাকে নিয়ে চাপা উদ্বেগ... দাদার ফিলিংস...স্বপ্নের নীলাঞ্জন... বাস্তবের অনিমেষ... সব কিছু সেই কষ্টটার মধ্যে মিশে থাকে।'

—'তা হলে বলো এখানে এসে তুমি নিজেকে পুরোপুরি দেখতে পাও।' চেয়ার দুলে উঠল।

—'কলকাতাতেও তো দেখি। তবে সেখানে শুধু ঢেউ আর ঢেউ। সেখানে আমার প্রতিটা মুহূর্ত প্রতি মুহূর্তের সঙ্গে লড়াই করছে। আমার চারপাশের মানুষেরা, আমি, আমার যুদ্ধ, অপমান, গ্লানি, আশা, দ্বন্দ্ব, হয়তো বা একটু একটু রঙিন কল্পনাও—সবই আছে কলকাতায়। এখানে আমার সঙ্গে শুধু আমিই। আমার অতীত। অতীতের সুখ। অতীতের দুঃখ। চোখের সামনে এক অদৃশ্য আয়নায় সব যেন ফুটে উঠতে দেখি।'

—'রাই, এই রা আ আই...'

চেয়ার নয়, আরেকজন কে যেন ডাকছে আমাকে। কে এ এ? অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে কার গলা? ঝাঁক ঝাঁক কুয়াশা সরিয়ে ফিরছি আমি।

—'কীরে, এখানে চোখ বুজে বসে কী বিড়বিড় করছিস নিজের মনে?'

ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। পিসি।

—'ঘুম পেয়ে থাকলে ঘরে গিয়ে ঘুমো না।'

—'না না, ঘুমোইনি।' দুচোখ ঘসে নিচ্ছি ভাল করে,—'এমনি বসে থাকতে থাকতে চোখ জুড়ে গিয়েছিল।'

পিসি বারান্দার ওদিকে গিয়ে পানের পিক ফেলে এল,—'তোদের তো আবার দুপুরে ঘুমের অভ্যেস নেই। চাকরি বাকরি করিস। তা হ্যাঁ রে, কেমন চলছে, চাকরি?'

—'ভালই।'

—'হোস্টেলে নাকি ভাল খাওয়া দাওয়া দেয় না? তোর মাসি বলছিল...'

—'না, না, যা দেয় তাতে পেট ভরে যায়।'

—'অনেক মেয়ে থাকে?'

—'হুঁউউউ।' উঠে দাঁড়ালাম,—'তুমি বোসো।'

ভারী শরীরটাকে ঝপাত করে ইজিচেয়ারে ফেলে দিল পিসি,—'মেয়েগুলো সব কেমন? ভাল? শুনেছি যত সব বিয়েভাঙা মেয়েরাই হোস্টেলে গিয়ে...'

—'তা কেন হবে? কুমারী মেয়েও আছে অনেক। বাইরে থেকে কলকাতায় চাকরি করতে এসেছে। একটা মাদ্রাজি মেয়েও আছে। ভাল বাংলা বলতে পারে।'

—'তা হলে ওখানে ভালই আছিস বল।' ঘাড় ঘুরিয়ে পিসি আপাদমস্তক দেখছে আমায়,—'তোর নতুনদা কদিন আগে তোকে অফিস পাড়ায় দেখেছে বলছিল সকালবেলায়...'

—'এমা, আমাকে ডাকেনি কেন?'

—'তুই একটা লোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে হাঁটছিলি, তাই ডাকেনি।'

প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দাঁতে সুপুরি কাটছে পিসি। একটু ঘাবড়েই গেলাম। কার সঙ্গে দেখেছে নতুনদা? সিদ্ধার্থর সঙ্গে তো বহুদিন দেখা হয় না। অজয় সিনহা অবশ্য অফিস ঢোকার মুখে দেখা হলে কথাবার্তা বলে। সেও তো সেরকম কিছু নয়।

—'কোন সময় দেখেছে বলো তো?'

—'ওই সকালের দিকে, অফিস টাইমে।'

তা হলে বোধ হয় চন্দনার ননদাই। এখনও চিনেজোঁকের মতো লেগে আছে আমার পেছনে। কিছু বলতে পারি না বলে আরও মজা পায়! রোজ সঙ্গে সঙ্গে অফিস পর্যন্ত...কিন্তু পিসিটি তো আমার এত কথা বুঝবে না। সর্বত্র খবর রটিয়ে বেড়াবে এখন। মা মাসি হয়তো জেনেও গেছে, আমাকে ডালহাউসিতে আজকাল সকাল বিকেল একটা ছেলের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করতে দেখা যায়। চিরকালই ছোট্ট ঘটনাটাকে রংচং মাখিয়ে ফুলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পিসির জুড়ি নেই।

রেলিঙের ধারে গিয়ে ঠোঁট ওলটালাম,—'আমার কোনও অফিস কলিগ হবে হয়তো।...তোমাদের খবর বলো। খুকুদির বাচ্চাটা কত বড় হল?'

—'এই তো সামনের বছর স্কুলে ভর্তি হবে।' পিসি কোনওরকমে পাশ কাটিয়েই মূল প্রসঙ্গে ফিরে এসেছে,—'দেখো বাবা, কলকাতা জায়গা খারাপ। আজেবাজে লোকের সঙ্গে মিশো না। এমনিতেই হোস্টেলে থাকা মেয়েরা শুনেছি...'

যাক, আমার উদ্ধারকর্ত্রীরা এসে গেছে বারান্দায়। মা, ছোট মাসি। কথা ঘোরাতে চাইলাম—'চা হচ্ছে না মা?'

—'বসিয়েছি।' মা পিসির দিকে তাকাল,—'তুমি একটু গড়িয়ে নিতে পারতে ঠাকুরঝি। আবার অতটা ফিরবে...আজ বরং থেকেই যাও না।'

—'না আঃ' পিসি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে,—'না ফিরলে বাবুর অসুবিধে হবে। তবে ভাগ্যিস আজ এলাম। রাই-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আজকাল তো একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছে।'

ছোট মাসি চুপচাপ রেলিঙ-এর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মা হাই তুলল,—'তা যা বলেছ। আমরাই এবার কতদিন পর দেখা পেলাম। তাও মণি জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে তাই।'

মার এখনও অভিমান যায়নি। কাল রাত থেকেই ভাল করে কথা বলছে না। বাবারও মুখ ভার হয়েছিল। তবে আমি সামনে দাঁড়াতেই তা কেটে গেছে। মার গলা জড়িয়ে আদর করতে ইচ্ছে করছে। হেসে ফেললাম,—'মোটেই আমাকে ছোট মাসি ধরে আনেনি। আমি তো নিজেই কাল আসছিলাম। আসলে প্রতি সপ্তাহেই কোনও না কোনও ব্যাপারে এমন আটকে যাই...'

—'কলকাতার ওই তো মজা।' পিসি আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল,—'রঙিন নেশা সব পিছুটান ভুলিয়ে দেয়।'

—'সেটা অবশ্য একদিক থেকে ভালই। সব ভুলে ওখানে গিয়ে যদি রাই ভাল থাকে...'

—'ও কথা বললে তো চলবে না বউদি। মেয়ের প্রতি তোমাদেরও কর্তব্য আছে। একবার ভুল হয়ে গেছে বলে সব ছেড়ে বসে থাকাটাও কাজের কথা নয়। বিদেশ বিভুঁই-এ একা একটা মেয়ে পড়ে থাকবে সারাজীবন, এ আবার কেমন? যে কোনও সময় মন চঞ্চল হতে পারে। আমি বলি কী, এবার ওর সম্পর্কে কিছু একটা ভাবা দরকার।'

ধুর। আবার শুরু হল। আমাকে নিয়ে চর্চা কবে শেষ হবে এদের? পিসির মুখের ওপর দু-চার কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমি যে কিছুই বলতে পারি না। ঠিক ঠিক সময়ে আমাকে বোবায় ধরে। ঘরে ঢুকে এলাম। শুনতে পাচ্ছি ছোট মাসি প্রশ্ন করছে,—'আপনি কী বলতে চাইছেন?'

পিসি গলা নামাল,—'আমি আর কী বলব? পাঁচজন পাঁচ কথা বলে তাই...'

—'কী রকম?'

—'বাদ দাও ও সব কথা। আমি গায়ে মাখি না। হাজার হোক রাই আমাদেরই মেয়ে। ওর ব্যাপারে আমাদেরই তো ভাবা উচিত। তাই না?'

কান মাথা গরম হয়ে উঠেছে। কিছুতেই কি এরা আমার মতো করে আমাকে থাকতে দেবে না? মেয়েরাই বোধ হয় মেয়েদের নিশ্চিন্তে বাঁচতে দিতে চায় না। রান্নাঘরে চলে এলাম। দাদা থাকলে বাড়ির কেউ আমাকে নিয়ে আলোচনায় বসার সাহসই পেত না।

চায়ের ট্রে নিয়ে বারান্দায় ফিরছি, মার গলা কানে এল,—'আমি ওকথা তুলতে পারব না ঠাকুরঝি। দরকার হলে তুমিই বলো।'

ছোট মাসি বলল—'আমারও তাই মনে হয়। ব্রত বা জামাইবাবুর সঙ্গে কথা না বলে ওকে কিছু বলা ঠিক হবে না।'

কী বলতে চায় ওরা? পিসি কী পরামর্শ দিল? মা মাসিও বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে?

বারান্দার পাশে রাখা ছোট টুলের ওপর ট্রে রাখলাম। না তাকিয়েও বুঝতে পারছি ওরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। নিজেকে প্রাণপণে শক্ত রাখার চেষ্টা করছি। আমারই মা, পিসি, মাসি আমাকে নিয়ে আলোচনা করছে, হয়তো আমার ভালর জন্যই, তবু কেন এত অপমানিত বোধ করছি? আগে তো এমন হত না।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে পিসি কথা আরম্ভ করল। 'বুঝলি রাই, তোর পিসেমশাই বলছিল, একটা ভাল ছেলে আছে, মনটা খুব উদার, তোর মতোই নামমাত্র বিয়ে হয়েছিল, সে আবার বিয়ে করতে চায়।'

—'ভাল তো।' আমি সহজভাবে বলতে চাইলাম।

—'ডিভোর্স হওয়া মেয়েতেও তার আপত্তি নেই। তোর তুলনায় বয়সটা একটু বেশি। তবে ছেলে একেবারে হিরের টুকরো। তোর যদি মত থাকে তো খোঁজ খবর নিই।'

—'কী করবে খোঁজ নিয়ে?'

—'তোর সঙ্গে বিয়ের ঠিক করব। আমরা চাইছি...'

সোজাসুজি তাকালাম,—'তোমরা চাইলেই আমি আবার বিয়ে করব ভাবছ কী করে?'

—'দ্যাখো, মেয়ের কথা।' পিসির গলায় আহ্লাদি সুর,—'কবে কী হয়েছে, তা ধরে বসে থাকলে মেয়েদের জীবন চলে? তোর ডিভোর্সও তো হয়ে গেছে ধর দেড় বছরের ওপর। তা ছাড়া এই তো খুকুর বর খবর এনেছে অনিমেষ সামনের মাসে ফের বিয়ে করছে। সে যদি করতে পারে, তুই কেন যোগিনী হয়ে থাকবি?'

ব্যাপার তা হলে এই। এতক্ষণে ধোঁয়ার আড়াল থেকে পিসি বেরিয়ে আসছে। অনিমেষের বিয়ের খবর দিতেই এসেছে আজকে। মারও বলিহারি যাই। পিসির কথায় নেচে উঠেছে। মার কি ধারণা আমি অনিমেষের কথা ভেবেই মনমরা হয়ে থাকি? একবার ভেবেও দেখল না অনিমেষের আবার বিয়ে করা না করাটা এখন আমার কাছে কতটা মূল্যহীন। ওই লোকটার সঙ্গে শারীরিক কিছু অভিজ্ঞতা ছাড়া কোনও সুখের স্মৃতিই আমার মনে নেই। ছিলও না কোনওদিন। শান্তভাবে বললাম,—'তুমি ভুল করছ পিসি। তোমার ও খবরে আমার কিছু যায় আসে না।'

মা ঝপ করে বলে উঠল,—কিন্তু তোকেও তো থিতু হতে হবে রাই। এভাবে ভেসে ভেসে মেয়েদের জীবন কাটে না।'

—'মা প্লিজ।' আমার গলা ভেঙে আসছে এবার,—'একবারটি আমাকে আমার মতো জীবনটাকে গড়ে নিতে দাও। দোহাই তোমাদের।'

—'এরকম ছেলে কিন্তু আর পাবে না বউদি।' পিসি তবু গজগজ করছে।

ছোট মাসির দিকে তাকালাম। এখনও আমার হয়ে কিছু বলছে না কেন? তবে কি মাসিও চায় আমি যেমন তেমন ভাবে জড়িয়ে যাই আবার? নতুন কোনও গাছে? মেয়েরা কী? পরজীবী? পরগাছা?

পিসির দিকে কঠিন চোখে তাকালাম।—'দ্যাখো, আমাকে নিয়ে কোনওরকম আলোচনা আমার ভাল লাগে না। তোমরা অন্য কোনও কথা বলো।'

পিসি চোখ ঘোরাচ্ছে,—'শুনলে বউদি? মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলতে দিলে এরকমই কথা শুনতে হয়। তখনই বলেছিলাম, বাইবে চাকরি করতে পাঠিয়ো না। দাদা কি মেয়েকে খাওয়াতে পারত না? না, ও ব্রত বুড়োর কাঁটা হয়ে থাকত? সবাই মিলে চাইলে মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াক। দ্যাখো কেমন দাঁড়িয়েছে।'

বাইরের লোকরা সুযোগ পেলেই আমাকে অপমান করে। নিজের লোকেরা কি তার থেকেও নিষ্ঠুর হয়? নিজের ওপর ঘেন্নায় চোখ ফেটে জল আসতে চাইছে। দেয় না, দেয় না, মেয়েদের কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় না। কেন সেদিন হাসপাতালে মরে যাইনি? কেনই বা জন্মেছিলাম? জন্মালামই যদি দাদার মতো ছেলে হয়ে জন্মাইনি কেন? কেউ তা হলে এত খবরদারি করতে পারত না আমার ওপর। আমাদের পরিবেশে একটা মেয়ে স্বাধীন অস্তিত্বের কথা চিন্তা করলে, সবাই বোধ হয় এভাবেই তাকে পাঁচিলে গেঁথে ফেলতে চায়। আর সেই বর্শার সব থেকে ধারালো ফলা হয় মেয়েরাই। এটাই মেয়েদের জীবনের আখরনি। মা নয়, পিসি নয়, মাসি নয়, নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে আমার।

দশ

কাঁকনকে দেখুন। মেয়েটার খুশি বুঝি আর ধরে রাখা যাবে না। আবার বসন্তের ছোঁয়ায় ফুলের মতো ফুটে উঠছে নিত্যনতুন করে। দিনরাত আবীরের সঙ্গে ঘুরছে। এখান সেখান, দোকান বাজার। আবীরের ছোট্ট ফ্ল্যাটটাকে আরও কত সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা যায়, সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত সারাক্ষণ। সামনের মাসে বালুরঘাটে যাবে। ফিরে আসার পর জুলাই-এ ওদের বিয়ে। সন্ধেবেলা আজকাল আর মেয়েটাকে পাওয়াই যায় না হোস্টেলে। যা একটু দেখা হয় সকালবেলাই। সে সময়ও যেন স্বপ্নের ফেনায় ডুবে থাকে কাঁকন। শুধু আবীর, আবীর আর আবীর। মঞ্জুদির ঘণ্টার শব্দে বিরক্ত হয় না একটুও। শেফালিকে ডেকে ডেকে কথা বলে। এমনকী শুভ্রার ওপরও আর ঘৃণা-বিতৃষ্ণা নেই। আমাকে পেলে একটানা বকবক করে যায়। শুধু আবীরের গল্প আর ভবিষ্যতের হাজার পরিকল্পনার কথা। তার মধ্যেও এক একদিন হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। আমার গলা জড়িয়ে প্রশ্ন করে,—'এবার শাস্তি পাব তো রে রাই?'

জানি না কেন গলার কাছে তখন একটা ব্যথা টনটন করে আমার,—'কেন পাবি না? নিশ্চয় পাবি।'

—'মণীশ যদি আমাকে একটুও বুঝতে পারত, তা হলে হয়তো...'

বুক দুকদুক করে ওঠে। মণীশকে ভুলতে না পারলে কী করে আবীরকে ভালবাসবে কাঁকন? ওর দু হাত চেপে ধরে বলি,—'পুরনো কথা ভুলে যা কাঁকন। তোর সামনে এখন নতুন। সব নতুন।'

—'জানিস আবীর বলেছে এবার থেকে শুধু ব্যবসাতেই মন দেবে। আর আমি নাটক করব প্রাণভরে। কত চরিত্রকে আমার ভেতর দিয়েই ফুটিয়ে তুলব দেখিস।'

—'ভাল তো।'

—'তোকে কিন্তু প্রত্যেক রোববার আমাদের ফ্ল্যাটে যেতে হবে। সারাদিন থাকবি, খাবি, গল্প করবি। আবীরকে তোর খুব ভাল লাগবে দেখিস। ওর হৃদয়টা এত বড়, এত সুন্দর করে কাছে টেনে নেয়...

কথা বলতে বলতে এভাবেই আবার আবীরের মধ্যে ডুবে যেতে চায় কাঁকন। আমি ওকে দেখি। শুধু দেখি। আগের মতো কাঁকন এখন আর আমার কথা শোনার সময় পায় না। আমিও বলি না। কেন মিছিমিছি ওর আনন্দের মুহূর্তগুলোতে আমার হতাশার ছায়া ফেলি! অথচ মন খুলে কারুর সঙ্গে কথা বলতে বড় ইচ্ছে করে। নিজের প্রতিটি অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধির কথা। আরেকটা যদি সত্যিকার বন্ধু থাকত আমার, কাঁকনের মতো! কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে আসার পর থেকে কী যে এক উজান স্রোতে ভাসছি, ভাসছি, ভেসেই চলেছি। দম নেওয়ারও সময় পাচ্ছি না যেন। অ্যালেনবেরি থেকে রিগ্রেট লেটার এসেছে। খবরের কাগজ দেখে অতগুলো যে দরখাস্ত ছেড়েছিলাম, দুটোর উত্তর এসেছে মাত্র।

পরশু একটা ইন্টারভিউও দিয়ে এলাম। তবে ও চাকরিটাও আমার হবে না। একটাই টেলিফোন অপারেটর পোস্টের জন্য চল্লিশ জনকে ডেকেছিল। তাদের মধ্যে অনেকের অভিজ্ঞতাই আমার থেকে বেশি। সাজ-পোশাক চালচলনেও অনেক স্মার্ট। এ কথা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না, বিয়ের বাজারে যেমন, চাকরির বাজারেও সুন্দর মুখের জয় আগে। ও সব বিলিতি কায়দার অফিসে তুলতুলে চেহারার বিল্‌কি-সিলকি মেয়েদের সুযোগ হবে না তো কি আমাদের হবে! না, কাউকে হিংসে করছি না। নিজের অযোগ্যতার কথা বলছি। মন দিয়ে লেখাপড়াটাও যদি করতাম। দাদা বলছিল সন্ধেবেলার ল' ক্লাসে ভর্তি হয়ে যেতে। টাকা পয়সা যা লাগে দিয়ে দেবে। না, আর কারুর সাহায্যে নয়, এবার যা করব নিজে নিজেই করব। পায়ের তলার মাটিটা একটু শক্ত হলেই...। দোসরা জুন আরেকটা ইন্টারভিউ আছে। তার পরের মাসে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা। দেখি একটু বইপত্র উলটে সরকারি অফিসে কেরানির চাকরি একটা জোটানো যায় কি না। মালহোত্রা ব্রাদার্সের ওপর আর নির্ভর করা যাচ্ছে না। অফিসের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়।

গত সোমবার টিফিনের পর মিস্টার মেননের কাছে একটা ফাইল নিয়ে গেছি, দেখি ভদ্রলোক শুকনো মুখে মাথা নিচু করে বসে। আমি যে সামনে দাঁড়িয়ে আছি, খেয়ালই নেই। এত অন্যমনস্ক তো থাকেন না কখনও। রীতিমতো চটপটে কাজপাগলা মানুষ। নিচু হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—'আর ইউ ফিলিং সিক মিস্টার মেনন?'

ভদ্রলোক চমকে তাকালেন,—'ও মিসেস মিত্রা। প্লিজ সিট ডাউন।'

এই মিসেস মিত্র ডাকটা আর পালটানো গেল না। অফিসে সবাই জানে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে অনেকদিন, তবুও...। আসলে দোষটা আমারই। কলকাতায় যখন প্রথম আসি, সিঁদুর পরতাম বোকার মতো। কেন যে পরতাম। অথচ তার প্রায় বছর খানেক আগেই সব চুকে বুকে গেছে। তাও পরতাম। সংস্কার নয়, আমি আসলে মনে মনে তখনও কিছু হীনম্মন্যতায় ভুগছি। চরম অপমানের লজ্জাটাকে বোধ হয় ঢাকা দিতে চাইতাম ওভাবেই। বুঝতে পারিনি, পাঁচজনের কাছে নয়, নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়েছি। কাঁকনই প্রথম আমাব এই জড়তা কাটিয়ে দেয়। যাকগে, মিসেস মিত্রই হই, কি মিস চৌধুরী, ডাকে কী আসে যায়। আমি তো আমিই। তবে এরপর কোথাও চাকরি পেলে কাউকে আর মিসেস মিত্র বলে ডাকার সুযোগ দেব না।

মিস্টার মেনন আমাকে বসতে বলেও কথা বলছেন না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম,—'এনিথিং রং উইথ ইউ? বাড়ির খবর ভাল তো?'

ভদ্রলোক দুদিকে মাথা নাড়লেন। অভ্যাসমতন টাকে হাত বোলালেন বার কয়েক, —'আপনি মিস লেপচার কাছে কিছু শোনেননি?'

—'না তো।'

—'অফিসে বেশি ডিসকাস করবেন না। খবরটা খুব সিক্রেট। ভিনোদের ফ্যামিলির সঙ্গে বসের একটা বড় ক্ল্যাশ চলছে। প্রোব্যাবলি দা কোম্পানি ইজ গোয়িং টু ব্রেক আপ ভেরি সুন।'

মাথা থেকে পা অবধি আচমকা বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, —'সে কী! জানি না তো কিছু!'

—'হ্যাঁ, ম্যাডাম। সেজন্যই দালভি সাহেব আবার এসেছিলেন লাস্ট উইকে। দে হ্যাড আ লঙ সেশন। ভিনোদ চায়...'

বুঝতে পারছিলাম না মিস্টার মেনন আমাকে ভয় দেখাতে চাইছেন, না নিজেকে। ভারী বিমর্ষ দেখাচ্ছিল ভদ্রলোককে, —'এতদিন ধরে এ কোম্পানিতে আছি, সেই লোচনদাস মালহোত্রার আমল থেকে, এখন যদি সব ভেঙেচুরে যায়...'

—'ডোমা সব জানে?'

—'নিশ্চয়ই। তবে মিস লেপচাও তো কোম্পানি ছেড়ে দিচ্ছে।'

শার্লি রেজিগনেশন দিয়েছে জানি। সামনের মাস থেকে রেমিংটনে জয়েন করছে। কিন্তু ডোমা? ডোমা কেন কিছু বলেনি আমাকে? চুপি চুপি কাউকে না জানিয়ে ভাল জায়গায় চলে যেতে চায়। এত স্বার্থপর তো মনে হয়নি মেয়েটাকে। অন্তত আমাকে বলতে পারত। আমি কি ওর ভালটাকে কেড়ে

নিতাম! হায় রে, সে ক্ষমতাও যদি থাকত আমার। আমি বোকা তো বোকাই। আগেই লক্ষ করা উচিত ছিল ডোমা, শার্লি বা ক্রিশ্চিন, অনেক কথা বললেও, নিজেদের কেরিয়ার প্রসঙ্গে একেবারে মুখে কুলুপ এঁটে রাখে। এটাই হয়তো চাকরি জীবনের নিয়ম। কোথাও ইন্টারভিউ দিলেও সহজে কেউ জানাতে চায় না। ক্রিশ্চিনও কি অফিসের গণ্ডগোলের কথা জানে? মেয়েটা তো মাঝে নিজের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

হ্যাঁ, ক্রিশ্চিনের এনগেজমেন্টটা শেষ পর্যন্ত ভেঙেই গেছে। বেশ কিছুদিন হল ম্যাথুজ চলে গেছে সিডনিতে। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে, পরপর তিনদিন ক্রিশ্চিন আসছে না দেখে আমরা গিয়েছিলাম নীলহাট হাউসে খোঁজ নিতে, ওর বোন নীলোফারের কাছে। আচার আচরণ, পোশাক আশাক এমনকী চেহারাতেও দুই বোনে কোনও মিল নেই। ক্রিশ্চিনের মতো চোখ দুটো নীলচে বটে, তবে চুল একেবারে চিকচিকে সোনালি। মনে হয় সোনালি করে নিয়েছে। পরির মতো সেই সোনার চুল নাচিয়ে নীলোফার বলেছিল—'ও গড। দে হ্যাড আ হরিব্‌ল্ ফাইট। আমরা ক্রিশ্চিনকে অনেক বুঝিয়েছিলাম। মা, বাবা, ডিক কারুর পরামর্শ শুনল না। বুদ্ধু মেয়ে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারল।'

ডোমা বলল,—'কিন্তু ও'ও তো অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে আছে।'

—'ছাই। সত্যি যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে জেদ ধরে পড়ে থাকবে কেন? আসলে ওর নেচার একেবারে আমার দাদুর মতন। একগুঁয়ে। ফুলিশ।'

শার্লি বলল—'ম্যাথুজ একটু কনসিডার করতে পারত। জবভাউচার পেলেই তো ক্রিশ্চিন চলে যাবে।'

—'হোয়াই? আফটার অল হি ইজ আ ম্যান।' নীলোফার ফটফট করে উঠল। বোঝাই যাচ্ছিল ক্রিশ্চিনের সিদ্ধান্তে সে একটুও সন্তুষ্ট নয়, —'ম্যাথুজ কিছু অন্যায় দাবি করেনি। ক্রিশ্চিন ওকে বিয়ে করে ওখানে গিয়েও চাকরি জোগাড় করতে পারত। ওদেশে কিছু জোগাড় করা কখনই এখানকার মতো টাফ নয়।'

ডোমাও ওকে সমর্থন করেছিল,—'ক্রিশ্চিনের এত অ্যাডামেন্ট হওয়া ঠিক হয়নি। সত্যি যদি ওরা পরস্পরকে ভালবাসে, তবে এরকম ইগো থাকার কোনও মানেই হয় না।'

শার্লি বলল,—'বোঝাই যাচ্ছে ওদের মধ্যে আণ্ডারস্ট্যান্ডিং-এর অভাব ছিল। ভালই হয়েছে। সঠিক বোঝাপড়া না থাকলে কখনই বিয়ে করা উচিত নয়।'

—'রাইট! লাভ ইজ নাথিং বাট সিম্পলি আ ভেগ টার্ম।' নীলোফার চোখ ঘুরিয়েছিল,—'বাট আই পিটি হার। ইফ মাই ম্যান গেটস আ চান্স লাইক ম্যাথুজ, আ'ইল ব্লাইন্ডলি মুভ উইথ হিম।'

—'ঠিক বলেছ. হাউসওয়াইফ হয়ে কটা দিন কাটানোর মতো সুখ কি আর কিছুতে আছে?'

আমি নীরবে ওদের কথা শুনছিলাম। এ বোধ হয় সেই নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস...। সব জাতের সব মেয়েই একটা জায়গায় তবে মনে মনে এক! হয়তো এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তা যাই হোক, মেয়েগুলোর কাছ থেকে আমি একটা নতুন পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছি বইকী। আর ক্রিশ্চিন? ও তো আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছে আত্মমর্যাদাবোধ কাকে বলে। মনের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে আবার দিব্যি কাজে এসেছে। একেবারে স্বাভাবিক। মনেই হয় না ওর জীবনে ম্যাথুজ বলে কেউ কোনওদিন ছিল। আগের মতোই হাসছে, গল্প করছে। ডোমা বা শার্লি ওকে কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি। ওদের দেখাদেখি আমিও না। অথচ মজা দেখুন, আমার পুরনো বান্ধবীরা এখনও দেখা হলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাঙা বিয়েটার কথা জিজ্ঞাসা করবেই। এই তো কৃষ্ণনগর থেকে আসার দিন ভোরের ট্রেনে নূপুরের সঙ্গে দেখা। নূপুর, আমার সেই স্কুলের বান্ধবী। খুব মোটা হয়েছে। ভরাট মুখে সিঁদুরের চাকা টিপ, সিঁথি লালে লাল, কানে ঝুমকো দুল। গায়ের রং আরও ফর্সা হয়েছে। তার ওপর ফাউন্ডেশনও মেখেছিল খুব। বিয়ের আগে একেবারে উমনো ঝুমনো থাকত।

ছোট মাসি আর টুম্পার কাছ থেকে টানতে টানতে আমাকে নিয়ে গেল ওদের সিটে। বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। এত্তটুকুন ফুটফুটে একটা ছেলেও হয়েছে ওদের।

নূপুর জিজ্ঞাসা করল,—'কলকাতায় তুই কোথায় থাকিস রে এখন?'

—'ওই একটা হোস্টেলে।' আলগা হাসলাম,—'তুই কোথায়? সোদপুরেই?'

—'না রে, কিছুদিন হল কল্যাণীতে কোয়ার্টার পেয়েছি, ওর অফিসের।' নূপুর গলা নামাল,—'ভালই হয়েছে বুঝলি। শাশুড়ির সঙ্গে মোটে বনছিল না। যা একখানা চিজ না।'

নূপুরকে দেখে সেই মুহূর্তে কেমন একটা চাপা হিংসে হচ্ছিল আমার। ওর ফুলের মতো ছেলেটা ত্যা ত্যা করে আবোল তাবোল বকছে। বুকটা হা হা করে উঠেছিল। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আমারও হয়তো ওরকম একটা বাচ্চা থাকত।

নূপুর খুশিতে গলে গলে পড়ছিল,—'উঃ, কী দস্যি যে হয়েছে আমার ছেলেটা। ঠিক ওর বাবার মতন। সারাদিন জ্বালাতন করে মারে।'

কিছুটা ঈর্ষা আর কিছুটা বিস্ময় বুকে নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে নূপুরকে দেখছিলাম। কত বদলে গেছে মেয়েটা। কথাবার্তা, হাবভাবে পুরোদস্তুর গিন্নি। স্কুলে কি গেছোই না ছিল। বিয়ের আগেও তো সারাক্ষণ তিরতির করত ঝরনার মতো। সেই মেয়ে হঠাৎ কেমন ফুলে ফেঁপে উপচে-পড়া নদী। আমার বিয়ের মাস কয়েক আগে ওর বিয়ে হয়েছিল।

—'তুই বেশ আছিস।' নূপুর আমার হাত ধরেছিল,—'দিব্যি কেমন ঝাড়া হাত পা, চাকরি বাকরি করছিস...'

নূপুরের সুখী সুখী চেহারার স্বাস্থ্যবান স্বামীটি বলে উঠেছিল,—'শুধু চাকরি করলেই কি আর সুখে থাকা যায়? জিজ্ঞাসা করো না তোমার বান্ধবীকে, শখ করে কি আর বাইরে বেরিয়েছে।'

নূপুর ঝপ করে বলে বসল,—'ঠিক বলেছ। কী যে বিশ্রী অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল ওর জীবনে। জানিস রাই, আমি সবাইকে তোর কথা বলি। বাবাঃ, ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। হ্যাঁরে, তোর বরটা তোর সঙ্গে আর যোগাযোগ করে না?'

কৃষ্ণনগর থেকেই মনটা তেতো হয়েছিল। একটু রুক্ষভাবেই বলে ফেললাম,—'আমার সঙ্গে অনিমেষের ডিভোর্স হয়ে গেছে।'

—'সে তো জানি। ওফ্, আজকাল কাগজ খুললেই শুধু বধূহত্যা, বধূনির্যাতনের খবর। তোরটাও তো কাগজে দু-চার লাইন বেরিয়েছিল, তাই না?'

আমার উঠে আসতে ইচ্ছে করছিল ওদের কাছ থেকে। মনে মনে বলেছিলাম, হ্যাঁরে, আমার মতো ঘটনা যে কোনও সময়ে, যে কোনও মেয়ের ঘটে যেতে পারে। তোরও। এই যে তুই আহ্লাদে ফুলে ফুলে উঠছিস, সেও তো স্বামী নামক বটগাছটিকে ভালমতো জড়াতে পেরেছিস বলেই না...'

নূপুর বলল,—'অনেকদিন পর তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগল রে রাই।'

আমারও ভাল লাগছিল রে নূপুর। কিন্তু কেন বারবার খোঁচা মারছিলি? এটা কী ধরনের ভদ্রতা? কথা না থাক, বুড়ো আঙুল নাচিয়ে ঝগড়া কর না ছোট্টবেলার মতো—আড়ি আড়ি আড়ি, কাল যাব বাড়ি...'

নূপুর ক্রিশ্চিনের কথা শুনলে কী বলত? এরকমও যে করতে পারে কোনও মেয়ে, নূপুররা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না। আজ বিকেলে ছুটির পর লিফট থেকে নেমেছি, শার্লি চলে গেল ডানদিকে। হেঁটেই ফেরে। স্টিফেন হাউস থেকে ছাতাওয়ালা গলি আর কতটুকু। ডোমাও নেমে ওপারে গেল। মিনিবাস স্ট্যান্ডে সানি অপেক্ষা করছে ওর জন্য স্কুটার নিয়ে। আমি আর ক্রিশ্চিন কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইলাম। কদিন আগেও ম্যাথুজ রোজ নিতে আসত ক্রিশ্চিনকে। এখন কত দূরে চলে গেছে। ক্রিশ্চিনকে একটু যেন মনমরা দেখাল। নিশ্চয়ই ওর মনকেমন করছে। ম্যাথুজেরও কি একবারও মনে পড়ে না ওর কথা? আলগাভাবে মেয়েটার কাঁধে হাত রাখলাম,—'কীসে ফিরবে? লেডির্জ ট্রামে?'

—'বাড়ি ফিরতে ভাল লাগছে না। কোথাও একটা যাওয়া যায় কি না ভাবছি।'

—'আমি তোমাকে একটা সুন্দর জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। জোব চার্নকের সমাধি...এত পিসফুল জায়গাটা...'

—'নাহ্, তুমি যাও। আ'ইল গো অ্যালোন টু এনি ডাম ফ্রেন্ড।'

—'আমি তোমার বন্ধু নই?'

নরম চোখে হাসল ক্রিশ্চিন, —'সিওর। তুমি আমার খুব মিষ্টি বন্ধু।'

—'তা হলে চলো আমার সঙ্গে। একটু ঘুরে বাড়ি ফিরে যাবে।'

—'চলো।' ক্রিশ্চিন আমার আঙুলে আঙুল জড়াল। জনারণ্যের ভেতর দিয়ে আমরা দুজন নিঃশব্দে হেঁটে চলেছি। শেষ বেলার সূর্য হলুদ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে। সেই আলোতে ক্রিশ্চিনের জংলা ছাপ বাসন্তী রং মিডি আরও উজ্জ্বল। সারাদিন গুমোটের পর এলোমেলো বাতাস বইতে শুরু করেছে। হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল যেন সেই মুহূর্তে ডালহাউসি পাড়ায় কেউ নেই। ট্রাম, বাস, মিনিবাস, গাড়ি, এলোপাথাড়ি মানুষজন—কেউ না। কিছু না। কিংবা সবই আছে। চিৎকার। কোলাহল। আমি আর ক্রিশ্চিন শুধু কোনও ম্যাজিকে অদৃশ্য মানুষ হয়ে সমস্ত রকম ভিড় আর শব্দ পার হয়ে চলেছি।

চার্চের পেছনে, সমাধিগুলোর সামনে এসে ক্রিশ্চিনের হাত কপাল ছুঁয়ে বুকে ক্রস্ টানল,—'তোমার এ সব জায়গায় আসতে ভাল লাগে রাই?'

সত্যি কেন যে এখানে বারবার আসি আমি! কাউকে খুঁজতে আসি কি? কোনও বন্ধু? কোনও সমব্যাথী?

ক্রিশ্চিন গোটা জায়গাটা ঘুরে দেখে আবার প্রশ্ন করল,—'হোয়াই রাই? হোয়াই ইউ লাভ দিস প্লেস?'

—'জানি না।' মাথা নাড়লাম,—'আমি বোধ হয় এখানে এসে অতীতকে দেখতে পাই। দেখছ না, এই শহরটার একটা অতীতও কেমন এখানে চুপটি করে শুয়ে আছে।'

ক্রিশ্চিন কী বুঝল কে জানে, নীল চোখ ছড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখল আমাকে। পশ্চিম আকাশ থেকে কয়েক টুকরো রোদ এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে ঘাসের শরীর। হলওয়েল মনুমেন্টের দিকে তাকিয়ে ক্রিশ্চিন বলল,—'বাট আই হেট ইংলিশ পিপল। আই হেট ইন্ডিয়ানস টুউ।'

—'কেন ক্রিশ্চিন?'

—'বিকজ উই আর দেয়ার বাইপ্রডাক্টস। নট ফুললি ইন্ডিয়ান, নট ফুললি ইংলিশ...'

—'এটা তোমার ভুল সেন্টিমেন্ট...'

—'নো।' ক্রিশ্চিনের গলায় ঝাঁঝ, —'আই ওন্ট স্টে হিয়ার। আই মাস্ট গো অ্যাওয়ে ফ্রম ইন্ডিয়া।'

—'তা হলে ম্যাথুজের সঙ্গে চলে গেলে না কেন?'

ক্রিশ্চিন এবার চোয়াল শক্ত করল,—'স্টপ টকিং অ্যাবাউট দ্যাট ম্যান। আই ডোন্ট নিড হিম।'

মেয়েটা নিশ্চয়ই মনের কথা কাউকে বলতে পারেনি। কেউ তো বুঝতেই চায়নি। একা একাই সহ্য করছে মনের ভারটুকু! ওকে হালকা করা দরকার। কাছে এসে আরেকটু খোঁচাতে চাইলাম,—'যাই বলো, অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার একটা সহজ সুযোগ কিন্তু হারালে তুমি।'

—'নো। আ' হ্যাভ মিসড নাথিং। আমি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি। জানো, ম্যাথুজ আমার একটা কথাও বোঝার চেষ্টা করেনি। শেষের দিকে জোর খাটাতে গিয়েছিল। আমি হয়তো ওর প্রস্তাবই মেনে নিতাম। চলে যেতাম ওর সঙ্গেই। পরে ভেবে দেখলাম বিয়ের আগেই যার সঙ্গে মতের মিল হচ্ছে না...দ্যাখো, সম্পর্ক একবার চিড় খেয়ে গেলে তাকে জোর করে জোড়া লাগানোর চেষ্টা না করাই ভাল।'

—'কিন্তু তুমি তো ওকে ভালবাসো?'

—'সো হোয়াট? ভালবাসা মানে আত্মসমর্পণ নয়। সে যদি আমার ইচ্ছেটাকে বুঝতেই না পারল, আমাকে সম্মান করতেই না জানল, আমি কেন তার কাছে হ্যাংলার মতো যাব?'

—'বলতে চাও ম্যাথুজ তোমাকে ভালবাসত না?'

—'পারহ্যাপস নট। হি ওয়ান্টেড টু ডমিনেট মি।' ক্রিশ্চিন দাঁতে দু ঠোঁট চাপল,—'সেটাই আমাকে সবথেকে বেশি আঘাত দিয়েছে রাই।'

আমি চুপ করে রইলাম। ক্রিশ্চিনও মাথা নিচু করে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর যেন নিজের মনেই বলে উঠল,—'দ্যাখো রাই, জীবনটা এত বিশাল, পৃথিবীটা এত সুন্দর, আর বেঁচে থাকাটা এত আনন্দের, আমি তার সব কিছুই উপভোগ করতে চাই। দাসত্ব নয়। অ্যান্ড নো ব্লাডি কমপ্রোমাইজ উইথ এনিবডি হু ডাসন্ট হ্যাভ রেসপেক্ট ফর মি। হি ট্রায়েড টু ফোর্স মি অ্যান্ড গট এভরিবডিজ সিমপ্যাথি অল বিকজ হি ইজ আ ম্যান। আমিও তাকে বলে দিয়েছি, আমি মেয়ে হতে পারি, বাট আয়াম অলসো আ হিউম্যান বিয়িং। নট আ মিয়ার স্টোন অর ট্রি। যে যা বলবে তাই আমাকে মাথা নিচু করে মেনে নিতে হবে, সরি,

আ'য়াম নট দ্যাট টাইপ অফ চিক।'

ক্রিশ্চিন নয়, যেন কোনও সম্রাজ্ঞী ময়ূরপঙ্খি চড়ে ভেসে যাচ্ছিল আমার বুকের ওপর দিয়ে। অনেকক্ষণ তারপর একসঙ্গে ছিলাম আমরা। এসপ্ল্যানেডে এসে খেলাম কিছু। গল্প করলাম অনেক। একেবারে সহজ হয়ে গিয়েছিল ক্রিশ্চিন। অফিসে যেমন থাকে সব সময়। আমিই কেন যে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম বার বার?

ঘণ্টাখানেকের ওপর হোস্টেলে ফিরেছি। তারপর থেকে বারান্দাতে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। শাড়িটাও বদলানো হয়নি এখনও। কী যে হচ্ছে আমার ভেতরটায়। বারবার ক্রিশ্চিন ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাকে। শক্তভাবে নিজের কথাগুলো বলার সময় কেন ক্রিশ্চিনের চোখ ভিজে উঠছিল? হয়তো এটাই স্বাভাবিক। যুক্তি আর হৃদয় দুটো নিয়েই তো মন। শিকড়সুদ্ধ গাছ উপড়ে ফেলা সহজ নয়। যদি বা উপড়ে ফেলাও যায়, মাটিতে দাগ থাকবেই।

এখন দোতলাটা ফাঁকা। একদম শুনশান। আমাদের ঘর ছাড়া আর দুটো ঘর তালাবন্ধ। মঞ্জুদি বোধ হয় মন্দির টন্দিরে গেছে। বন্দনাদি কিছু আগে নীচে গেল টিভি দেখতে। পেছনের ভাঙা বাড়ির গাছগুলো ঝিমঝিম হাওয়ায় ভুতুড়ে ছায়ার মতো দুলে উঠছে। জ্যৈষ্ঠ শুরু না হতেই গরম ভাপ উঠতে শুরু করেছে মাটির শরীর থেকে। সামনের বাড়ির আলোগুলো আজ সব নেভানো। ওদিক থেকে একটা চোরা অন্ধকার যেন গড়িয়ে আসছে এপারে। পাড়ার ছেলেরাও এখনও আড্ডায় বসেনি। চারদিক কেমন অদ্ভুত রকম শব্দহীন। আজকের নির্জন সন্ধেতে আমার একা থাকতে একটুও ভাল লাগছে না। কাঁকন তো নিজেকে নিয়েই মশগুল। সিদ্ধার্থও যদি থাকত। ও বোধ হয় আর আমার সঙ্গে কোনওদিন যোগাযোগ করবে না। কেন যে ওরকম নোংরা ব্যবহার করে ফেললাম সেদিন। আমাকেই যেতে হবে...। বড্ড গরম লাগছে। নীচে গিয়ে গা ধুয়ে এলে ভাল হত। ওপরে এসময়ে অত জল পাওয়া যায় না।

সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ! ঘরে ঢুকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেলাম। মন্দিরাদি ফিরল নাকি! না হিরণদি! কাঁকন বা শুভ্রা এখন নিশ্চয়ই ফিরবে না। যেই আসুক, একটু কথা বলে বাঁচি। নিজেকে বড় একা লাগছে।

—'কী গো রাই, অন্ধকারে কেন?' ব্রততী বোধ হয় ছাদে উঠেছিল, আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

—'এমনিই। তুমি এখন ছাদে যাচ্ছ কী করতে?'

—'আর বোলো না। একে এই গরম, তারপর সবাই মিলে বাংলা সিরিয়াল দেখতে অফিসে জড়ো হয়েছে। যত্ত সব জোলো প্রেমের গল্প।'

—'তাই তুমি হাওয়া খেতে যাচ্ছ?' আমি হাসলাম। আবছা অন্ধকারে ব্রততীর মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। একটু তফাতে শুধু ওর লম্বা ছিপছিপে শরীরের সিল্যুট।

—'তুমিও এসো।' ব্রততী ডাকছে।

—'ভাল্লাগছে না গো ছাদে যেতে। তার থেকে বরং ঘরে এসো। তুমি তো আসই না দোতলায়।'

ব্রততী আমার বিছানায় বসেছে। ছোট আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম,—'তোমার স্কুল কেমন চলছে?'

—'ভালই। আমরা তো ওয়ার্ক এডুকেশনের লোক। স্কুলের ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখি না। স্কুলে যাই, ব্যায়াম শেখাই, চলে আসি। মাঝেমধ্যে অবশ্য দু-একটা ছোটদের ক্লাসও নিতে হয়।'

—'মেয়েরা আজকাল খুব ব্যায়াম করছে?'

—'নিশ্চয়ই। তুমিও করতে পারো। এত সুন্দর ফিগার তোমার। কয়েকটা আসন করলে একেবারে টানটান থাকবে।'

—'যাঃ', একটু লজ্জা পেলাম,—'আমার আবার ফিগার ভাল কোথায়?'

ব্রততী ঝপ করে আমার হাত ধরে টানল,—'নিজের দর বাড়াচ্ছ? তুমি নিজেই জানো না রাই তুমি কী। তোমার চোখ দেখলে যে কেউ পাগল হয়ে যাবে।'

হাতটা শক্ত করে ধরে আছে। ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারলাম না। আস্তে আস্তে চাপ দিচ্ছে তালুতে। মুহূর্তে মন বিষিয়ে গেল। কী চাইছে বুঝতে পারছি। মেয়েতে মেয়েতে শরীরের খেলা! ছিঃ। সাধে কি মন্দিরাদিরা একে দুচক্ষে দেখতে পারে না। মেয়েটাকে ঘরে ডাকাই ভুল হয়েছে।

—'ছাড়ো। চলো ছাদে গিয়ে বসি।'

—'ছাড়তে ইচ্ছে করছে নাগো। তোমার হাতটা কী নরম।' ব্রততীর চোখদুটো অন্যরকম হয়ে গেছে। যেন মানুষের নয়, সাপের চোখ। গা ছমছম করে উঠল। ভয় করছে আমার। হ্যাঁচকা টানে হাত ছাড়িয়ে নিলাম,—'এ সব আমার ভাল লাগে না ব্রততী। বসে গল্প করো না প্লিজ।'

সঙ্গে সঙ্গে সাপের মতো ফুঁসে উঠেছে ব্রততী। গোটা মুখ অপমানে লাল, হিসহিস করছে গলার স্বর—'তবে কি ছেলেরা হাত ধরলে তোমার ভাল লাগে? একবার ঠোক্কর খেয়েও শিক্ষা হয়নি? পুরুষেরা কোনওদিন মেয়েদের ভালবাসতে পারে না। মেয়েরাই মেয়েদের ভালবাসতে জানে।'

—'বাজে কথা। এটা তোমার অসুখ।'

—'চুপ করো। কতটুকু জানো তুমি আমার সম্পর্কে? অনেক পুরুষ ঘেঁটেছি আমি। ওরা মেয়েদের শুধুই ভোগ করতে চায়। শক্তি দিয়ে। মেয়েরাই জানে কীভাবে নরম করে আদর করতে হয়।' ব্রততী আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বুক থেকে আমার আঁচল টেনে ফেলে দিল।

সরে যাওয়ার আগেই সজোরে জাপটে ধরেছে, অজস্র চুমু খেতে শুরু করেছে আমার ঠোঁটে, গালে, কপালে। মাথার ওপর ঘটাং ঘটাং শব্দে ঘুরে চলেছে ফ্যানটা। কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমি যেন প্রতিরোধ হারিয়ে ফেললাম। তারপরই প্রচণ্ড শক্তিতে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ছিটকে এসেছি বারান্দায়,—'তুমি চলে যাও ব্রততী।'

মেয়েটা হনহন করে নেমে যাচ্ছে। ওর দিকে আমার তাকাতেই ইচ্ছে করছে না। প্রবল বিতৃষ্ণায় মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। আমি কখনও ব্রততীর মতো হতে চাই না। রীতা, কৃষ্ণা বা বউদিদের ঘরের মাদ্রাজি মেয়েটার মতোও না। আমি কোনওদিন বড়দি ছোড়দি হব না। ভালভাবে বাঁচতে চাই আমি। স্বাভাবিক মানুষের মতো...

একা একা থরথর করে কাঁপছি। অনেকদিন পরে কেউ ওভাবে শরীর ছুঁল আমার। ব্রততী নীচে নেমে যাওয়ার পর কেমন একটা বিশ্রী কষ্ট হচ্ছে। শরীর ভেঙে হঠাৎ অকারণ ঝড় উঠছে কেন? নিজের এই বিদ্রোহী শরীরকে আমি চিনি না। তবে কি ভেতরে ভেতরে শরীর কারুর স্পর্শ চাইছিল, এরকমই? কে সে? নীলাঞ্জন? সিদ্ধার্থ? জানি না, জানি না, জানি না। এ কী হল আমার?

দুহাতে মুখ ঢেকে বিছানায় আছড়ে পড়েছি। হে ঈশ্বর, এখখুনি যে কেউ একজন এসে পড়ুক ঘরে। মন্দিরাদি, শুভ্রা, হিরণদি যে কেউ...

এগারো

চারদিক ধোঁয়া করে তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। এক হাত দূরের কিছু দেখা যায় কি যায় না। কোটি কোটি ঘষা কাচের টুকরো যেন অবিরাম আছড়ে পড়ছে মাটিতে। আকাশের প্রবল শব্দে স্তব্ধ পৃথিবীর সব কোলাহল। দুরন্ত সেই বৃষ্টি ভেঙে একা একা পথ চলছিল মেয়েটা। ধু ধু মাঠে সে ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই। মাঠের শেষে এক বিশাল কাচের ঘর। ভয়ানক দুর্যোগ পেরিয়ে মেয়েটাকে পৌঁছতেই হবে ওখানে। দূর থেকে ঝাপসা দেখা যায় ঘরটার ভেতর রাজকীয় চেয়ারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে কিছু গোমড়ামুখ মানুষ। তারা কেউ কোনও কথা বলছে না। শুধু বেল বাজাচ্ছে ঘন ঘন। তীক্ষ্ণ সেই ধাতব শব্দ আর মেঘের গর্জন মিলেমিশে একাকার। মেয়েটা আরও তাড়াতাড়ি হাঁটার চেষ্টা করল। ভিজে শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে, কপাল বেয়ে অঝোর বৃষ্টি। তীব্র ঝলক ছিটিয়ে খলখল হেসে উঠল বিদ্যুৎ। মেয়েটা দুহাতে মুখ ঢাকল। কোনওভাবেই কি তবে ওপারে পৌঁছনো যাবে না? সে দৌড়োনোর চেষ্টা করল; ঝড় তাকে আছড়ে ফেলল মাটিতে। চিৎকার করে কাউকে ডাকতে চাইল; কোনও শব্দই বেরোল না গলা থেকে। অন্ধকার মিহি থেকে গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ। আর কোনওদিন বুঝি সূর্য উঠবে না পৃথিবীতে।

—'তুমি বড় প্যান প্যান করে কাঁদো।'

কে বলল কথাটা? চেনা গলা যেন? মেয়েটা চমকে তাকিয়েছে। আরে, মেয়েটা যে আমিই। মুখ থুবড়ে পড়ে আছি কাদায়, আগুন রং বেনারসি কাদা জলে চুপচুপ।

—'কথা না শুনে চললে মুখ ছিঁড়ে নেব তোমার।'

আবার দু হাতে মুখ ঢেকেছি আমি, নোংরা পাঁকে ডুবে আছে শরীর। দূর থেকে আরেকটা শব্দ ভেসে এল। কেউ বুঝি নাম ধরে ডাকছে আমাকে, রাআআই, রাই...। মাথা তুললাম। কাছে আরও কাছে এগিয়ে আসছে সেই অপার্থিব আহ্বান, রিন রিন সুর উঠল বুকে। নিকষ অন্ধকারের দিকে হাত বাড়ালাম,—'কে তুমি? কোথায় তুমি?'

মেঘ কেটে সূর্য ওঠার মতো স্বপ্নের পুরুষ স্পষ্ট হচ্ছে। যেখানে তার পা পড়ে, বৃষ্টি থেমে যায়, আলো ফুটে ওঠে। উঠে দাঁড়াতে গেলাম, গাঁটছড়ায় টান পড়ল। অনিমেষের সিল্কের জোড়ের সঙ্গে বাঁধা চুমকি বসানো ওড়না টান টান। বড় শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে ছোটপিসি।

রহস্যময় পুরুষ সামনে দাঁড়িয়ে। পেছনে অনিমেষের রাগী গলা, —'কোথায় যাচ্ছ? ঘরে এসো বলছি।'

—'যাব না।'

—'তোমাকে যেতেই হবে।'

—'কখ্খনও না।' আমি সামনে হাত বাড়িয়ে দিলাম,—'আমাকে তুমি নিয়ে চলো নীলাঞ্জন।'

নীলাঞ্জনের ঠোঁটে চাপা হাসি, চোখ বেয়ে ঝরছে ভালবাসার ঝরনা। সে আমাকে উঠিয়ে নিল কাদা থেকে। এবার দুধারে শুধু গাঢ় সবুজ বন। হালকা নীল অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে নীলাঞ্জনের বাদামি ঘোড়া। জোরে, আরও জোরে। শক্ত হাতে লাগাম ধরেছে নীলাঞ্জন; গায়ে তার মধ্যযুগের নাইটদের মতো লোহার পোশাক, শিরস্ত্রাণের ফলা ঝলমল। আমি তার চওড়া কাঁধে মাথা রাখলাম,—'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

—'যেখানে তুমি যেতে চাও।'

—'কোথায়?'

—'পাহাড় চূড়ায়।'

—'কী আছে সেখানে?'

—'আকাশ, মেঘ...'

—'আর মাটি নেই? নদী? সবুজ নরম ঘাস?'

নীলাঞ্জন নিঃশব্দে হাসল। ছুটছে, ঘোড়া ছুটছে। জঙ্গল শেষে তিনটে খাড়া পাহাড়। একটা পাহাড় পেরিয়ে গেল। আরেকটাও। এবার তৃতীয় পাহাড়ে উঠছে ঘোড়া, পাকদণ্ডি বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে। পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট একটা বাড়ি। ঘোড়া সেখানে এসে থামল। কিন্তু একী! এ তো আবীরের ফ্ল্যাট! কাঁকনের সঙ্গে এ ফ্ল্যাটে এসেছি আমি। এইমাত্র যে জঙ্গলটা পেরিয়ে এলাম তার ছবি ঝোলানো আছে আবীরেরই ড্রয়িং রুমে। এখানে আমরা কেন? নীলাঞ্জন দরজা খুলে ধরল,—'এসো রাই।'

এতক্ষণে সংবিৎ পেয়েছি, —'না নীলাঞ্জন, আমি যেতে পারি না। আমাকে ফিরতে হবে।'

—'এখানে এলে আর ফেরা যায় না রাই।'

—'আমাকে ফিরতেই হবে। আমার যে আজ ইন্টারভিউ...'

পাগলের মতো এলোপাথাড়ি ছুটছি। নীলাঞ্জন কোথ্থাও নেই। আবার ঝমঝম বৃষ্টি নেমেছে। সেই বৃষ্টিতে আবার অনিমেষের গলা, —'চাকরি তোমার হবে না।'

—'অসম্ভব। আমি পাবই।'

অনিমেষ আমার কাঁধ খামচে ধরল। ঝাঁকাচ্ছে...ঝাঁকাচ্ছে...

—'এই রাই ওঠ, শিগগিরি ওঠ, কাকলিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

চমকে তাকিয়েছি। বন্দনাদি জোরে জোরে ঠেলছে, —'কী ঘুম রে বাবা তোর! গোটা হোস্টেল কখন জেগে গেছে...'

অদ্ভুত স্বপ্নটা এখনও লেগে আছে চোখে। কোনও কথাই মাথায় ঢুকছে না। বন্দনাদি দৌড়ে জানলার কাছে চলে গেল। রাস্তার দিকের তিনটে জানলায় দাঁড়িয়ে আরও অনেকে, মন্দিরাদি, মঞ্জুদি, শেফালি, দীপ্তি...শুভ্রাও। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি। এই বৃষ্টিই...তা হলে এতক্ষণ আমার স্বপ্নের ভেতর...। লাফ দিয়ে সুকৃতির কাঁধের পেছনে পৌঁছে গিয়েছি, —'কী হয়েছে কাকলির?'

বন্দনাদি জানলা থেকে মুখ ফেরাল। উত্তেজনায় ফুটছে, —'উফ, মাঝরাত থেকে নীচে সে কী

হুলুস্থুল কাণ্ড। লুকিয়ে লুকিয়ে কোত্থেকে কাল অ্যাবরশন করিয়ে এসেছিল...ব্যাস, হঠাৎ শুরু হয়ে গেছে ব্লিডিং...'

—'কী রক্ত, কী রক্ত...' দীপ্তির মুখ ভেঙেচুরে গেল,—'আর বোধ হয় একফোঁটা রক্তও নেই মেয়েটার শরীরে...'

—'যন্ত্রণায় কাটা ছাগলের মতো ছটফট করছিল। এই তো ভোর হতে পাড়ার ডাক্তার এল।'

আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ঘরের সকলে কথা বলছে। প্রবল বৃষ্টির শব্দে মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে ওদের গলা। কিছু শুনছি, কিছু শুনছি না। স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছি শুধু। কাকলির জন্য কি তবে এই পরিণতিই অপেক্ষা করছিল?

নীচে ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করার আওয়াজ। ওপরের সকলে আবার হুড়মুড় করে জানলায়। ছোড়দি আর বউদি ধরাধরি করে কাকলিকে পেছনের সিটে তুলছে। বুলবুল ছাতা ধরে আছে পেছন থেকে। থপথপে শরীর নিয়ে বড়দি ভিজে ভিজেই বেরিয়ে এল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। গুমগুম মেঘ ডেকে উঠল। বড়দি ওপর দিকে মুখ তুলে ডাকছে, —'মন্দিরাদি, আপনি যাবেন নাকি? গেলে ভাল হয়।'

মন্দিরাদি জানলা থেকে সরে এল,—'মাথা খারাপ। ওই কেস নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে মরি আর কী! ও সব ঝামেলায় আমি নেই।'

ট্যাক্সির সামনে ছাতার ভিড়। এই বৃষ্টির ভোরে ভাগ্যিস পাড়ার লোকেরা এখনও জাগেনি। কাকলিকে নিয়ে ছোড়দি আর বউদি চলে গেল। ঘন আকাশ মাথায় নিয়ে এই মাত্র গলির মুখ ঘুরে গেল ট্যাক্সি। আর কারুর কি যাওয়ার দরকার ছিল! ইচ্ছে করছে এক ছুটে নীচে নেমে যাই। কী করে যাই? আমার পা দুটো যে নিথর হয়ে গেছে। তা ছাড়া আজই আমার ইন্টারভিউ ক্যামাক স্ট্রিটের অর্জুন ট্রাভেলস-এ। কটা বাজল এখন? বেলা বোঝা যাচ্ছে না। জারুল গাছের মাথায় চড়ে তাণ্ডব নাচ নাচছে আকাশ। শীত করছে আমার। শরীর কাঁপছে অল্প অল্প। ভাল করে আঁচল জড়িয়ে নিজের বিছানায় বসে পড়লাম। চারদিকে জমাট স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা। হাত বাড়িয়ে র‍্যাক থেকে ঘড়ি পাড়লাম। নাহ্, বেলা বেশি হয়নি। সবে ছটা দশ।

শুভ্রা প্রথম ফিরল জানলা থেকে। নিজের মনে বিড়বিড় করছে, —'বোকা, বোকা, রামবোকা মেয়েটা। এমন ভুল কেউ করে! আশ্চর্য!'

হিরণদি বিছানায় গা ছেড়ে দিল,—'আমাকেও যদি বলত...আমাদের নার্সিং হোমে তো আকছার এ ধরনের কেস...'

—'আমাদের নার্সিং হোম আবার এ ব্যাপারে ভীষণ স্ট্রিক্ট। গার্জেনের পারমিশন ছাড়া...'

—'গার্জেন একটা কাউকে সাজিয়ে নেওয়া যায়...মেয়েটা কোথায় কী করাতে গিয়েছিল কে জানে...'

—'বড়দি ঠেলা বুঝবে।' বন্দনাদি হাঁটু মুড়ে চৌকিতে বসল,—'তখনই বলেছিলাম এ সব মেয়েকে হোস্টেলে রাখা উচিত নয়। কেন যে থাকতে দিল!'

—'কাকলির জ্যাঠামশাই যে উকিলবাবুর বন্ধু। উনি নাকি বড়দিকে বলে গিয়েছিলেন মেয়েটার ওপর নজর রাখতে।'

—'আহা মেয়ে যেন কচি খুকি! বড়দি ধমকালেই গর্তে ঢুকবে!'

—'তা কেন? পাঁচজনের সঙ্গে থাকলেও তো নিজেকে সংশোধন করে নেওয়া যায়। আমাদের সবাইকে দেখেও তো ও...'

—'ভুল করছেন। মেয়েটা আসলে বেসিকালি খারাপ।'

—'অথচ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। কী সরল প্রতিমার মতো মুখ...'

মঞ্জুদি ছোঁওয়াছুঁয়ির বাতিক ভুলে হিরণদির বিছানায় বসে পড়েছে। মুখচোখে হায় হায় ভাব, —'এখানে যখন প্রথম এসেছিলাম, কী সুন্দর পরিবেশ ছিল...'

—'যা বলেছেন।' বন্দনাদি চা আনতে যাওয়ার জন্য তাক থেকে কাপ নামাচ্ছে, —'মান বাঁচিয়ে এ হোস্টেলে আর বেশিদিন থাকা যাবে না। অন্য কোথাও...'

—'আমি বাবা গরমেন্ট হসপিটালে চাকরি পেয়ে যাচ্ছি। ভাল কোয়ার্টার পাব।' শেফালি আড়মোড়া

ভেঙে নিজের ঘরে চলে গেল। ও ঘরে আজ কাঁকন নেই। কালই বালুরঘাট গেছে।

—'মেয়েটাকে আর এরপর এখানে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়।'

—'দাঁড়ান, আগে বেঁচে ফিরুক তো।'

কাকলি কি মরে যাবে? সারা শরীর শিরশির করে উঠল আমার। সবাই কত হালকাভাবে কাকলিকে নিয়ে আলোচনা করছে। আমি কেন কিছুতেই পারছি না সহজ হতে? কেন কাকলি সুযোগ পেয়েও ফিরতে পারল না সুস্থ জীবনে? তবে কি ফেরা যায় না? তোলার সময় নীচের বউদি গভীর মমতায় জড়িয়ে ধরেছিল কাকলিকে। ওই মহিলারই বা জীবনের ফাঁক কোথায়? কিংবা শুভ্রার? জানলা থেকে সরে আসার পর শুভ্রা সোজা বাথরুমে চলে গিয়েছিল। তারপর ফিরে আয়না নিয়ে সাজতে বসেছে। এই বৃষ্টিতেও কি আজ বেরিয়ে যাবে শুভ্রা? কোথায় যায়? হয়তো সত্যি অফিসে যায়, আমাদেরই মতন। যতই বৃষ্টি হোক, আমাকেও তো বেরোতে হবে আজ।

মন্দিরাদি চুপচাপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। চা আনতে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি ধরে এলেও অজস্র জলের ধারায় বারান্দা ভাসছে। এলোমেলো জলে টুকরো কাগজ, শুকনো পাতা। নীচের নর্দমা বেয়ে খরস্রোতা কাদাজল। একটু আগে স্বপ্নে ওই কাদাতেই হাবুডুবু খাচ্ছিলাম আমি। নোংরা কাদার দিকে তাকিয়ে মন্দিরাদি কী ভাবছে? কাকলিকে নিয়ে হাসপাতালে যেতেও রাজি হল না, ঘরের মহিলামহলেও নেই, ব্যাপার কী? কারুকে নিয়ে চর্চা চলছে অথচ মন্দিরাদি নেই, এ ভাবাই যায় না।

—'চা খাবেন না?'

মন্দিরাদি ভুরু কুঁচকে তাকাল,—'কাকলির জন্য আমি নারী সেবা সমিতিতে বলে একটা পার্টটাইমের ব্যবস্থা করেছিলাম। গেল না মেয়েটা। ও সব বাজে মেয়েদের জন্য কখ্খনও কিছু করতে নেই।'

কাঁকন থাকলে বলত—ঠিক হয়েছে। উচিত শিক্ষা হয়েছে আপনার। আরও যান পরের ব্যাপারে নাক গলাতে।

—'মেয়েটা কী হাতে পায়ে ধরেছিল একটা কাজ জোগাড় করে দেওয়ার জন্য। তখনই বোঝা উচিত ছিল বাঘিনী কোনওদিন বোষ্টুমী হতে পারে না।'

শুভ্রা প্লাস্টিকের বালতিতে জল আনতে বেরিয়েছে। আমাদের দেখে মুখ বেঁকাল,—'কী রাই, কাকলিকে নিয়ে গবেষণা এখনও শেষ হল না?'

দপ করে মাথা জ্বলে উঠল। কোনওদিন যা করিনি, তাই করে ফেললাম। চিৎকার করে বলে উঠলাম,—'তুমি একটাও কথা বলবে না এর মধ্যে।'

শুভ্রাও সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠেছে, —'কেন? কথা বলার অধিকার শুধু তোমাদেরই আছে নাকি?'

—'হ্যাঁ তাই। তোমার মতো মেয়ের এখানে কথা বলা সাজে না।'

—'যাও, যাও। সবারই সব চরিত্র জানা আছে আমার।'

মন্দিরাদি আমার হাত ধরে টানল,—'চুপ কর রাই। ওর সঙ্গে কথা বলে নিজেকে ছোট করিস না।'

—'কেন চুপ করব? শরীর বেচা ছাড়া আর কোনওভাবে রোজগার করা যায় না? কোনও উপায় না থাকলে, অনেক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আছে, হোম আছে, সেখানে যেতে পারে। নিরাশ্রয় মেয়েদের জন্যও তো...'

—'কে বলেছে আমি নিরাশ্রয়?' শুভ্রার গলা বিকৃত হয়ে গিয়েছে, —'কতটুকু জানো তুমি আমার সম্পর্কে? বড় বড় কথা বোলো না। মেয়েদেরকে তেল নুন সাবানের বেশি কেউ দাম দেয় না, বুঝলে। ছেলেরাও আমাদের এক্সপ্লয়েট করে, আমরাও ছেলেদের এক্সপ্লয়েট করি। বেশ করি।'

—'বা, বা, চমৎকার যুক্তি...'

—'হ্যাঁ তাই, তোমাদের মতো ভাবের ঘোরে চলি না আমি।' শুভ্রা হাঁপাচ্ছে, —'নীচের বউদিকে দ্যাখো না? নিজে অক্ষম বলে স্বামী এক মালদার পার্টির সঙ্গে জুতে দিয়েছে বউকে। তার হুকুমে বউদিকে ছেলে মেয়ে ছেড়ে হোস্টেলে এসে থাকতে হয়। আর কাজকর্ম শেখার কথা বলছিলে না? আমার বাবা চায় আমি আমার বসের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এভাবে তাকে টাকা এনে দিই। তাকে আনন্দে রাখার জন্য এখান সেখান বেড়াতে যাই। কী বুঝলে?'

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে তুমি যাও তোমার কাজে।'

—'যাব তো বটেই। তার আগে আরেকটা কথাও বলে যাই। আমি কেপ্টই হই আর বউই হই, সবসময়ে ভোগেরই বস্তু। অতএব যতদিন বাঁচব, ছেলেদের স্কুইজ করব। করবই।'

সমাজের বিরুদ্ধে এ কী হিংস্র প্রতিবাদ শুভ্রার? আমি পাথর হয়ে গেছি। কোনওদিন কি কোনও ভাল লোক দেখেনি শুভ্রা? কখনও ভালবাসা পায়নি? কত মেয়েকে এরকম ভালবাসাহীন হয়ে বেঁচে থাকতে হয়? শুভ্রাকে করুণা করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। কিছু কিছু মেয়ে কোনওদিনই পৃথিবীর উজ্জ্বল দিকটা দেখতে পায় না।

শুভ্রা গটগট করে ঘরে ঢুকে গেল। চোখ দুটো ভাঁটার মতো জ্বলছে। ওর এত রাগ কার ওপর? কার প্রতি এত ঘৃণা?

দোতলার সব বোর্ডার বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। বন্দনাদি লাফিয়ে আমার কাঁধ চেপে ধরল,—'ঠিক করেছিস রাই। খুব ভাল করেছিস। ওকে এরকম সোজাসুজি বলার দরকার ছিল।'

দু আঙুলে কপাল চেপে ধরলাম। শিরাগুলো সব ছিঁড়ে পড়বে যেন। এ কী করলাম? কারুর সঙ্গে এভাবে ঝগড়া করিনি কোনওদিন।

মঞ্জুদি পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে, —'কিছুতেই হাতেনাতে ধরা যাচ্ছিল না। খালি পিছলে পিছলে যায়। এবার যদি ওকে হোস্টেল থেকে তাড়ানো না হয়...'

—'হ্যাঁ, সবাই মিলে উকিলবাবুর সঙ্গে কথা বলব। আজই সমস্ত নোংরা সাফ করতে হবে এখানকার।'

সবাইকে ছাড়িয়ে নীচে নেমে গেলাম। দম বন্ধ হয়ে আসছে। ছেলেরা নয়, মেয়েরাই মেয়েদের সবথেকে বড় শত্রু। বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দিয়েও আমরা মেয়েরাই আরেকটা মেয়েকে বিচার করতে নারাজ। যুক্তি দিয়ে বোঝার আগে আমরা সমালোচনা করতে শিখি। শিক্ষা না কুশিক্ষা?

খাবার প্যাসেজে চা নিয়ে বসেছি। মাত্র ঘণ্টা খানেক আগে কাকলিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এর মধ্যেই সব রোজকার মতোই স্বাভাবিক। মনেই হয় না, এ বাড়িরই একজন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে এখন। বুলবুল ঘরে টেপ বাজাচ্ছে। গান শুনতে শুনতেই ঝগড়া করছে শর্বরীর জায়গায় আসা নতুন মেয়েটার সঙ্গে। মেয়েটা নাকি রোজ ওর ব্রাশ দিয়ে দাঁত মেজে রাখে। মধুছন্দা আর তামিল মেয়েটা অফিস বেরিয়ে গেল। কৃষ্ণা, মিনতিরাও তৈরি হচ্ছে। দীপ্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেয়েই বেরিয়ে গেল। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ম্যাসাজিং-এর কাজ করে। ব্রততী স্নান সেরে সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়, আমার মুখের কাছে মুখ এনে ফুঁ দিয়ে চলে গেল। চা শেষ না করেই উঠে দাঁড়ালাম। গোটা মুখ বিস্বাদ হয়ে গেছে। নাহ্! কাকলির জন্য কোথাও কিছু থেমে থাকবে না। দুনিয়া তার নিয়মমতোই চলে। আমাকে দশটা নাগাদ বেরোতে হবে। সাড়ে এগারোটায় ইন্টারভিউ।

বৃষ্টি প্রায় থেমে এসেছে। নীরব কান্নার মতো মোটা মোটা দানায় ঝরছে এখন। পেছনের ভাঙা বাড়ির গাছগুলির সবুজ হঠাৎ ভিজে ঝকঝকে। বারান্দায় দু-এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ঘরে এলাম। শুভ্রা বেরিয়ে গেছে। বেচারির আজ আমার জন্য সাজগোজ করা হল না! মন্দিরাদি বাথরুমে। বন্দনাদি খবরের কাগজ পড়ছে আর মঞ্জুদি যথারীতি চৌকিতে পাতা কম্বলের আসনে। বউদি ছোড়দি এখনও ফিরল না কেন? হিরণদিকে প্রশ্নটা করতে যাওয়ার আগেই হিরণদি আমার দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ করে উঠল,—'দেখলে তো রাই, থেমে গেল বৃষ্টিটা। আরেকটু হলে কী ক্ষতি হত?'

—'আপনার ডিউটি নেই?'

—'সেই কথাই তো বলছি! মাঝরাত থেকে জেগে আছি, ভাবলাম বৃষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ডুব মেরে দিই। আকাশ কেমন হতচ্ছাড়া দ্যাখো...'

—'বেরোবেন তা হলে?'

—'দুর, আর গিয়ে কী হবে? মরনিং শিফটের সময় পেরিয়ে গেছে। ভালই হল বুঝলে। কদিন ধরে এক বুড়ো খুব জ্বালাচ্ছে। ইসকিমিয়ার পেশেন্ট, ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি, ঘুমো আরামসে তা নয়, সারাক্ষণ খিচকিচ, বকবক...আগের জন্মে অনেক পাপ করলে এ জন্মে নার্স হতে হয়।'

—'যাঃ, আপনারা কত পুণ্যের কাজ করেন।'

—'পুণ্য না ছাই। রুগি ঘাঁটতে ঘাঁটতে ঘেন্না ধরে গেল। একেকটি পেশেন্ট একেক টাইপ। কত রকম যে বায়নাক্কা...'

—'বারে, অসুস্থ লোক একটু তো অবুঝ হয়ই।' কথাটা বলতে না চেয়েও বলে ফেললাম। আর বাদানুবাদ ভাল লাগছে না। হিরণদি আমার কথা বুঝবে না, আমিও বুঝব না হিরণদিকে। রোগ আব মৃত্যু দেখতে দেখতে ডাক্তার নার্সরা এরকমই মানুষ সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে যায়। এই নিস্পৃহতা মেনে নিতে কষ্ট হয় আমাদের।

চৌকির তলা থেকে সুটকেস বার করলাম। আজ জংলাছাপ পিওর সিল্কটা পরব। সিদ্ধার্থ বলে এই শাড়িটাতে আমাকে নাকি খুব সুন্দর দেখায়।

দিনটাই আজ খারাপ। অর্জুন ট্রাভেলস্-এর পরিবেশ আমার একদম পছন্দ হয়নি। মালহোত্রা ব্রাদার্সের চেয়েও ছোট্ট খুপরি অফিস। মাইনে অবশ্য ওখানকার থেকে কিছু বেশি। মাত্র ছজনকে ডেকেছিল এরা। এত কম প্রতিযোগী এর আগে পাইনি। আচ্ছা, আমার পাশে যে মেয়েটি বসেছিল, নিরীহ চেহারা, ওর কি খুব বেশি দরকার চাকরির? ইন্টারভিউ দিতে ঢোকার আগে ঠকঠক করে কাঁপছিল। আহা, ওরই যেন কাজটা হয়ে যায়। এরা এত কম মেয়েকে ডেকেছিল কেন? নাকি আগে আরও...? যেখানেই কাজের জন্য যাই, থরে থরে তো মেয়ে এসে বসে থাকে! এত মেয়েরও চাকরির দরকার। এই যদি অবস্থা হয়, লক্ষ লক্ষ বেকার ছেলেগুলোর কী হবে! ভাগ্যিস দাদা সময় মতো ব্যাঙ্কে ঢুকতে পেরেছিল, কৃষ্ণনগরেই। ভাইয়ার কপালে কী আছে কে জানে। একদম পড়াশুনোয় মন নেই, দিনরাত নাটক নিয়ে ব্যস্ত! আমার ভাই না হয়ে ওকে কাঁকনের ভাই হলে মানাত ভাল।

ফুটপাথে নেমে ছাতা খুলে নিলাম। আবার টিপটিপ বৃষ্টি নেমেছে। আকাশের গায়ে সিসে রং মেঘ। এতক্ষণ ভেতরে বসে টেরই পাইনি কখন আবার কালো হয়ে এসেছে দিনটা। বেরোনোর মুখে দিব্যি রোদ উঠেছিল। মৌসুমি বায়ু বোধ হয় এবার তাড়াতাড়ি চলে এল। বাস রাস্তায় পৌঁছতে বেশ কিছুটা যেতে হবে। ভেজা রাস্তায় পা টিপে হাঁটছি। ঠিক সাড়ে দশটায় এখানে পৌঁছেছিলাম, এখন একটা পনেরো। আশপাশের অফিস থেকে অনেকে টিফিনে বেরিয়ে পড়েছে। চওড়া রাস্তা বেয়ে হুশহাশ গাড়ি ছুটছে। কতরকম মানুষ আর গাড়ি যে আছে এই শহরটায়। বেজায় চালিয়াত মার্কা একটা মেয়ে আজ এসেছিল ইন্টারভিউ দিতে। যেমন উগ্র সাজপোশাক তেমনই কথা বলার ধরন। ওর যেন একদম চাকরিটা না হয়। কিংবা কে জানে ওকেই হয়তো পছন্দ করবে অর্জুন ট্রাভেলস-এর মালিকরা। লোকগুলো বেশ আজব। আগে কোনও ইন্টারভিউতে কেউ এরকম ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেনি আমাকে। কাজের প্রশ্ন না করে একগাদা শুধু উলটোপালটা কথা জিজ্ঞাসা করে গেল। যিনি মাঝের চেয়ারে বসে ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন মনে হয় উনিই সর্বেসর্বা। ভদ্রলোকের চেহারা হুবহু ইতিহাস বইয়ের নেপোলিয়ানের মতো। গাঁট্টাগোট্টা মুখ, মাথাজোড়া টাক, ঠোঁটের কোণে পাইপ ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন। অন্য দুজন পার্টনার টার্টনার হবে। আর যে ভদ্রলোক নাম ডেকে ডেকে আমাদের ভেতরে পাঠালেন তিনি নির্ঘাত বড়বাবু। ধবধবে সাদা ফুলশার্টের গলার বোতামটা পর্যন্ত আটকে রেখেছিলেন। এই সব মানুষেরা একটু খিটখিটে ধরনের হয়। খয়েরি শাড়ি পরা মেয়েটির সঙ্গে তো জোর একচোট তর্ক করে নিলেন। কিনা পদবির বানান নাকি ঠিক লেখা হয়নি। মেয়েটি অসহায় ভাবে বলল,—'আমরা তো ওই বানানই লিখি স্যার।'

—'ভুল লেখেন, ভট্টাচার্য বানানে সবসময় দুটো ওয়াই হয়।'

—'একটাও তো হয় স্যার।'

এরপর ভদ্রলোক এমন ভাবে তাকালেন যেন ওই অপরাধেই এখখুনি মেয়েটির প্রার্থীপদ বাতিল করে দিতে পারেন, —'দুটো ওয়াই লিখবেন। সেটাই ঠিক।'

কিছু লোক জোর করে এভাবেই নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। ঘুসেদের ঘরে ঢুকলে তাদের রূপ আবার অন্যরকম। ভদ্রলোক আমার ইন্টারভিউ-এর সময় এমন ভাবে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন যেন অফিসের হেডপিয়ন। নাহ্, আজ পরীক্ষা দিতে গিয়ে একটুও ঘাবড়াইনি, অন্যান্যবারের মতন সকালের পর পর ঘটনাগুলো মনকে বড় বেশি ঘিরে রেখেছে। কেমন অবশ হয়ে আছে মাথাটা। চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন,

—'আপনার নাম রাইকিশোরী চৌধুরী?'

—'হ্যাঁ স্যার।'

—'মালহোত্রা ব্রাদার্স ছাড়তে চান কেন?'

চেনা প্রশ্ন। গড়গড় করে প্রতিবারের মতো উত্তর দিলাম,

—'বেটার প্রস্‌পেক্টের জন্য।'

পাশ থেকে একজন প্রশ্ন ছুড়ল,—'আপনি নিশ্চয়ই আনম্যারেড?'

অস্বস্তি বোধ করলাম। এরকম প্রশ্ন কেন? বিবাহিত মেয়েদের কি এরা চাকরি দেবে না? বিজ্ঞাপনে সেরকম তো লেখা ছিল না। ঠোঁটের ডগায় মিথ্যে এলেও বলতে পারলাম না, সোজাসুজি তাকালাম,—'না আমি ডিভোর্সি।'

—'আই সি।' নেপোলিয়ন মাথা নাড়লেন। অন্য দুজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিল।

—'এনি ইস্যু?'

—'না।'

—'একা থাকেন?'

—'না। লেডিজ হোস্টেলে থাকি।'

অত এতাল বেতাল প্রশ্ন করছিল কেন ওরা? চাকরির সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কী?

বাসস্টপে এসে মনস্থির করে ফেললাম। এ চাকরি আমার দরকার নেই। আমার ঠিক সামনেই শেডের নীচে একটা হাঘরে পরিবার সংসার পেতে বসেছে। মা নির্বিকার মুখে পা ছড়িয়ে উকুন বাছছে আর ময়লা ছেঁড়া হাফপ্যান্ট পরা কিশোর ছেলে, ল্যাংটো ভাইকে কোলে নিয়ে, স্টপে দাঁড়ানো মানুষজনের কাছে নীরবে হাত পেতে দাঁড়াচ্ছে। আমার সামনে এসেও ঘাড় কাত করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। এবার ব্যাঙ্কের দেওয়াল থেকে সিনেমার পোস্টার ছেঁড়ায় মগ্ন। রাজীব গান্ধীকে স্কন্ধকাটা করে জ্যোতি বসুর মুণ্ডু ছিঁড়ছে। রাজনৈতিক পোস্টার দুটোর মাথায় হিন্দি ফিল্মের দিগম্বরী নায়িকা। একবার ইন্টারভিউতে জিজ্ঞাসা করেছিল,—'পলিটিকসে আগ্রহ আছে? কোন পার্টিকে সমর্থন করেন?' বলেছিলাম,—'রাজনীতি বুঝি না স্যার।'

—'সেকী দেশের খবর রাখেন না?'

হায়রে, রাজনীতি আর দেশের খবর যদি এক হত! রাজনীতি চলে তার নিজের চালে। দেশ চলে যেমন চলছে। কিন্তু আমি এখন চলি কোথায়? অযথা আবার একটা দিনের মাইনে কাটা গেল। হোস্টেলে ফিরতে ভয় করছে। কী জানি কাকলির কী খবর! তার থেকে বরং একটা দুর্দান্ত সাহসী কাজ করে ফেলি। এতদিন পরে ফোনে আমার গলা পেয়ে ভীষণ অবাক হয়ে যাবে সিদ্ধার্থ। খুব সহজভাবে জিজ্ঞাসা করব—'এখনও রাগ করে আছেন? এত অভিমান আপনার?'

সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই প্রথমটা উত্তর দেবে না। তখন বলব...কী বলব? আমার অন্যায় হয়ে গেছে? না, কোনও পুরনো প্রসঙ্গ নয়, বলব, —'এখ্‌খুনি চলে আসুন রবীন্দ্রসদন স্টেশনের মুখে। আমি অপেক্ষা করে আছি।' তারপর...তারপর।

মনে মনে কথার পর কথা সাজাচ্ছি আর সাজাচ্ছি, হঠাৎ সামনের দিকে চোখ পড়তেই শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। দূর থেকে কে আসছে এদিকে এগিয়ে? মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেল...আবার দেখা যাচ্ছে...আকাশি নীল রঙের শার্ট, সাদা প্যান্ট, হাতে ব্রিফ কেস! লম্বা শরীর সোজা করে রাজপুত্রের মতো হাঁটছে...হাঁটছে...রেশম চুল কাঁপছে বাতাসে। গলা শুকিয়ে গেল। শরীরের সমস্ত গ্রন্থিগুলো বুঝি এখ্‌খুনি টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ে যাবে। নীলাঞ্জন এখানে এল কী করে? এই কলকাতায়? আরও কাছে আসতে নিজের ভেতর থেকেই যেন ছিটকে গেলাম। ভুল, ভুল, ভুল! মানুষটা নীলাঞ্জন নয়, নীলাঞ্জনের মতো। কী বোকা আমি। নীলাঞ্জন এখানে আসবে কেন? যদি বা আসেও এই প্রকাণ্ড শহরে কী করে দুজনের দেখা হবে? হয় না। স্বপ্নের পুরুষ কখনও বাস্তবে নেমে আসে না। সে আসে নীল অন্ধকারে, পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে, বাদামি ঘোড়ায় চেপে।

লোকটা আমাকে পেরিয়ে চলে যেতেই চারদিক যেন একেবারে শূন্য হয়ে গেল। কোথ্‌থাও যাব না আমি, কাউকে ডাকব না। অনেকক্ষণ একা থাকব এখন। একদম একা।

মেট্রো রেলের সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলাম। হোস্টেলেই ফিরছি। দুপুরবেলা শান্তিনীড় ফাঁকা থাকে। সবাই বেরিয়ে গেছে যে যার কাজে। নিরিবিলিতে চুপচাপ শুয়ে থাকব। সমস্ত পারিপার্শ্বিক ভুলে একটু যদি ঘুমিয়ে পড়ি, আরেকবার কি সে আসবে না? আমার স্বপ্নে?

বারো

আমরা পৌঁছনোর আগেই মণীশের মৃতদেহ এসে গেছে শ্মশানে। আবীর ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছে, আলতো করে কাঁকনের হাত ছুঁলাম,—'আয়।' কাঁকন নিস্পন্দ। কাঁকনকে দেখেই বোধ হয় এক ভদ্রলোক এগিয়ে এল। মুখে চাপ দাড়ি, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। আমাকে আর আবীরকে একঝলক দেখে নিয়ে মাথা নাড়ল,—'আমি অরূপ, মণীশের বন্ধু।'

আবার ধকধক করছে বুকটা। কাঁকনকে ডাকতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল।,—'নামবি না?'

বার কয়েক ডাকার পর চোখ খুলল কাঁকন। ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিক দেখছে। আবীরের দিকে তাকালাম। ভীষণ অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরাচ্ছে। মনে হয় সেও যেন এই মুহূর্তগুলোর মধ্যে নেই। সমস্ত কঠিন দায়িত্ব এখন শুধু আমারই। কাঁকনের হাত ধরলাম—'কাঁকন প্লিজ।'

আমার কাঁধে ভর দিয়ে কাঁকন নয়, একটা নির্জীব পুতুল নামছে ধীরে ধীরে। অরূপ ডাকল,—'এসো কঙ্কনা। আমি জানতাম তুমি আসবে।'

কাঁকন শরীরটাকে পুরোপুরি ছেড়ে দিল। নিশ্বাস ভারী। মণীশের মৃত্যু সংবাদ ওকে কি চিরকালের মতো বোবা করে দেবে? খবরটা শোনার পর থেকে এখনও একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি।

পুরনো লোহার গেট পেরিয়ে বাঁধানো রাস্তা ধরে ভেতরে ঢুকছি আমরা। আমি আর কাঁকন আগে, পেছনে আবীর, অরূপ! এই প্রথম আমার কোনও শ্মশানে আসা। যত এগোচ্ছি মৃত্যুর পোড়া গন্ধ ঝাপটা মারছে নাকে। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। বেরোনোর আগে জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। শেষ শ্রাবণের আকাশ তবু ঘন কালো, বাতাস টালমাটাল। একদল লোক দাহ শেষ করে ফিরছে। কৌতূহলী চোখগুলো বার দুয়েক ঘুরে দেখল আমাদের। রাস্তার দুপাশে অসংখ্য ভেজা কাঠের স্তূপ। দুটো লুঙ্গি পরা লোক বিশাল দাঁড়িপাল্লায় কাঠ ওজন করছে। কত কাঠ লাগে একটা মানুষকে পোড়াতে? লোকদুটোও আমাদের আড়চোখে দেখছে। নিশ্চয়ই এখানকার ডোম। পেশিবহুল শরীর, চওড়া কাঁধ, চোখ তেলাকুচোর মতো লাল।

কাঁকনের কাঁধ থেকে আঁচল খসে গেছে। আলগোছে উঠিয়ে দিলাম। এলোমেলো চোখে তাকাল কাঁকন। অরূপ আবীরকে বলল,—'আমরা ইলেকট্রিকেই দিতে চেয়েছিলাম...এই বর্ষায়...দিদি খুব জোর করল...শেষের দিকে কিছুদিন নাকি মণীশ শুধু মৃত্যু আর চিতা নিয়ে কবিতা লিখেছে। কাঠের বিছানায় নিজেকে সাজিয়ে...'

কাঁকনের শরীর ঝাঁকিয়ে বিকট শব্দ ছিটকে এল। এখখুনি বুঝি পড়ে যাবে। পেছন থেকে আবীরের ভাঙা ভাঙা গলা শোনা গেল,—'ও সব কথা এখন থাক না অরূপবাবু।'

অরূপও সচকিত হয়েছে, —'সরি।'

এই ভদ্রলোকই কি আজ ফোন করেছিল হোস্টেলে?

সকালে শাড়ি পরছি অফিস যাব বলে, কাঁকন দোতলার বাথরুমে, নীচ থেকে ছোড়দি ডাকল,—'কাঁকন তোমার টেলিফোন।'

স্নান করতে করতেই চিৎকার করল কাঁকন, —'রাই, আবীর ফোন করছে, একটু ধর না গিয়ে। বলবি আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ছি।'

বালুরঘাট থেকে ফিরে নতুন সংসারের শেষ কেনাকাটাগুলো সারতে আবীর আর কাঁকন দারুণ ব্যস্ত। কাপড়টা তাড়াতাড়ি জড়িয়ে নীচে এলাম। উকিলবাবু তখন অফিসঘরে বসে। আজকাল প্রায়ই সকালের দিকে আসেন। উকিলবাবুর সামনের চেয়ারে হাউসকোট পরা বড়দি। টেবিলের মাঝখানে রাখা রিসিভার কানে তুললাম।

—'কঙ্কনাকে একটু ডেকে দেবেন?'

আবীরের গলা তো এত ভরাট নয়।

—'কাঁকন একটু ব্যস্ত আছে। আমি ওর বন্ধু। কিছু দরকার থাকলে আমাকে বলতে পারেন।'

ও প্রান্ত ক্ষণকাল নীরব।

—'আপনার নম্বরটা বলুন, ওকে পরে রিঙ করতে বলছি।'

—'থাক দরকার নেই,...' গম্ভীর স্বর আবার থমকাল।

—'কঙ্কনাকে জানিয়ে দেবেন মণীশ পরশু রাতে সুইসাইড করেছে।'

খবরটা এতই অপ্রত্যাশিত যে প্রথমটা বুঝতেই পারিনি,

—'কে মণীশ?'

—'কবি মণীশ সান্যাল। ওকে বলবেন, তা হলেই বুঝবে।'

লোকটা ফোন রেখে দিচ্ছে, রিসিভার খামচে ধরলাম, 'এক সেকেন্ড, কীভাবে মারা গেল মণীশ?'

—'বললাম তো সুইসাইড করেছে,' লোকটার গলায় বিরক্তি,—'আজ দুপুরে বডি পাওয়া যাবে। আশা করছি তিনটের মধ্যে শ্মশানে নিয়ে যেতে পারব। ও যদি দেখতে চায়...'

লোকটা কী নির্দয় ভাবে বলে যাচ্ছিল কথাগুলো। একবার মনে হল কেউ বদমাইশি করে ফোন করছে না তো? কিন্তু এরকম সংবাদ...। চোখ বুজে ফেললাম। আমাকেই কেন এ খবর শুনতে হল?

উকিলবাবু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন। বড়দি চোখ থেকে চশমা খুলল,

—'তোমার মুখ এমন সাদা হয়ে গেছে কেন রাই? কে মারা গেছে?'

রিসিভার নামিয়ে সজোরে ঠোঁট কামড়ে ধরেছি।

—'কাঁকনের ফোন ছিল না?'

মাথা নাড়লাম।

—'কে করেছিল? আবীরবাবু?'

আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বেশি না বললেও, এখানকার সবার নাড়িনক্ষত্র বড়দির মুখস্থ।

—'কাঁকনের আগের হাজব্যান্ড মারা গেছে।'

—'কখন?'

—'পরশু।' কথা বলতে বলতেই পরের কর্তব্যগুলো চটপট স্থির করে ফেলছি।—'আমি কি এখান থেকে গোটা দুয়েক কল করতে পারি?'

উকিলবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, —'তুমি কাঁপছ, এখানে বসো।'

ফোনের অনুমতি পাওয়ার পর অন্য চিন্তা মাথায় ঢুকেছে। আবীর কিংবা কাঁকনের শ্যামবাজারের মামা কারুর নম্বরই জানা নেই। কাঁকন বাথরুম থেকে না বেরিয়ে থাকলে ওর ডায়েরি খুঁজে দেখা যায়। বেরোব বলে পেছন ফিরেছি, সামনেই কাঁকন। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

মোট তিনটে চিতা জ্বলছে ভেতরে। চাতালে টুকরো টুকরো মানুষের ভিড়। ডানদিকের উঁচু বেদির একধারে ফুলশয্যায় শুয়ে মণীশ। মণীশকে ঘিরে ছোটখাটো জটলা। অরূপ কাঁকনকে নিয়ে গেল সেদিকে। আমার পাশে দাঁড়ানো আবীর নিশ্চল। খবর দেওয়ার দরকার হয়নি, কাঁকনকে ডাকতে ও নিজেই এসেছিল হোস্টেলে।

মণীশের এক আত্মীয়া ডুকরে উঠল। পাশেই কোনও কারখানায় সাইরেন বাজাচ্ছে। কান্না আর সাইরেনের শব্দ এক হয়ে গেল। গামছা কাঁধে কয়েকটা অল্পবয়স্ক ছেলে বাঁদিকের ধাপে বসে। একজন সামনের চিতায় জ্বলন্ত সিগারেট ছুড়ে দিল। পাঁচিলের দিকের চিতাটা নিভু নিভু। ঘাট থেকে কলসি করে জল এনে ঢালছে শ্মশান বন্ধুরা। একটু পরে মণীশ সান্যালও ওই ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। জীবনের মানে তবে এই? কদিনের জন্য আসা, তারপর ছাই হয়ে মিশে যাওয়া মাটিতে! শরীর মন অসাড় হয়ে আসছে আমার। গলার কাছে অকারণ কান্নার ডেলা। হাত বাড়িয়ে আবীরের শার্টের হাতা খামচে ধরলাম,—'আমি বাইরে যাব।'

আবীরের থমথমে মুখ আমার দিকে ফিরল। মণীশের অতর্কিত মৃত্যু তাকেও যেন নির্বাক করে দিয়েছে।

অরূপ ছুটে এল,—'আপনারা কঙ্কনাকে নিয়ে আসুন।'

আবীর আমার পিঠে হাত রাখল। আমি নয়, আমার হয়ে অন্য কেউ হাঁটছে যেন। কখন কাঁকনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি জানি না। মাথার ওপর চাপা শব্দে মেঘ গুড়গুড় করে উঠল। ভেজা কাঠের ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে। মৃত মানুষেরা শুধুই কালচে ধোঁয়া হয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে, আরও ওপরে। আদি গঙ্গার দিক থেকে আসা কনকনে বাতাস দখল নিতে চাইছে গোটা চত্বরটার। লকলকে শিখা মাতালের মতো দুলছে।

কাঁকন আচমকা ফিসফিস করে উঠল কানের কাছে, —'আমাকে মিথ্যে বলে এনেছে রে। এটা মণীশই নয়।'

ভয়ংকর ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে উঠলাম যেন। কী বলছে কাঁকন? মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

—'কী বলছিস তুই?' চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম। কয়েক হাত তফাতে মণীশের চিতা সাজানো প্রায় শেষ। ঘাটপুরুত কী নির্দেশ দিল। কাঁকন নির্বিকার। মৃতদেহের চারপাশে অবিরাম ঘুরতে শুরু করেছে। তীক্ষ্ণ চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জরিপ করছে মণীশের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

—'দূর, এ মণীশ হতেই পারে না।...শরীরটা মণীশের...কিন্তু নাহ্, এটা মণীশ নয়।'

এবার এক বয়স্ক ভদ্রলোক হনহন করে খাটের সামনে এগিয়ে এলেন—'অনেক ড্রামা হয়েছে। এটা পাবলিক স্টেজ নয়। সরাও একে এখান থেকে। যত্ত সব...'

আত্মীয়া মহিলাটির কান্নাও সঙ্গে সঙ্গে রাগে আছড়ে পড়েছে,—'কে এখানে আসতে বলেছে ওই সর্বনাশীকে? কেন এসেছে ন্যাকামি করতে?'

—'আঃ দীপুদি, চুপ করুন।' একজন মহিলাকে সরিয়ে নিতে চাইল।

—'না, আমি যাব না।...ওই...ওই...ওই মেরেছে আমার ভাইকে। ওর জন্যই মণীশ...তোরা কেন খবর দিয়েছিস ওকে?'

হঠাৎ শুরু হওয়া নাটক দেখতে অনেকে জড়ো হয়েছে বেদির কাছে। হকচকিয়ে পিছিয়ে এলাম। কাঁকন শুনেও শুনছে না। ঘনঘন মাথা নেড়েই চলেছে। হ্যাঁচকা টানে আবীর ওকে বেদি থেকে নামিয়ে নিল। মহিলা চিৎকার করে অভিশাপ দিয়েই যাচ্ছে। রাগ, ঘৃণা আর ক্ষোভ মেশানো কান্না ক্রমশ আরও বিকৃত। সত্যিই তো, কাঁকনকে কেন খবর দেওয়া হয়েছিল? কী দরকার ছিল ওকে জানানোর? কাঁকনই বা কেন এসেছে এখানে? যার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে গেছে...? আমরাই বা কেন ওকে আসতে দিলাম? আবীর না হয় কিছু বলতে পারেনি, আমি কেন বাধা দিইনি? তবে কি আমিও মনে মনে সেই পুরনো সংস্কারের গণ্ডিতেই আটকে আছি? এখনও পিছিয়ে যেতে ভালবাসি? এ কি অযৌক্তিক আবেগ।

বিকট উল্লাসে হরিধ্বনি দিতে দিতে আরেকটা দল শ্মশানে ঢুকছে। দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ভয়ানক ভূমিকম্পে সব ছারখার হয়ে যাওয়ার মতো নিজের ভিতরই নিজে ভাঙছি...ভাঙছি...ভাঙছি...। আবীরকে ছাড়িয়ে কাঁকন আবার জোর করে ভেতরে যেতে চাইছে। পলকে আমি যেন কাঁকন হয়ে গেলাম, কাঁকন আমি। দুহাতে মেয়েটার কাঁধ খামচে ধরেছি,—'কী হচ্ছে কী? আর একদম পাগলামি করবি না। মাথা ঠাণ্ডা কর।'

আবীর হতাশভাবে মাথা নাড়ল—'কাকে বলছেন? ও কি আর নিজের মধ্যে আছে?'

গোটা তিনেক বাচ্চা ছেলে হাঁ করে আমাদের দেখছে। বিনা পয়সায় মজা দেখতে পথচারীও দাঁড়িয়ে গেছে দু-একজন। অচেতন রাইকিশোরীকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখনও নিশ্চয়ই অনেকে এরকম ভিড় করে...। আবীরকে ধমকে উঠলাম,—'এখানে এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?'

বিহ্বল আবীর এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ওরও কি মাথা কাজ করছে না? এবার ধাক্কা দিলাম,—'এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, প্লিজ। আমি কাঁকনকে সামলাচ্ছি। আপনি যান, ওই মোড়ে গিয়ে দেখুন একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় কি না...'

অনেক কষ্টে ঘুম পাড়ানো গেছে কাঁকনকে। ডাক্তার ঘুমের ইন্‌জেকশন দেওয়ার পর আস্তে আস্তে

শান্ত হল। নিজেরই হাতে সাজানো ঘরে, নরম বিছানায় হাঁটু মুড়ে কেমন কাঙালভঙ্গিতে শুয়ে আছে মেয়েটা। আবার নিজেকে ফিরে পাবে তো? শ্মশানে বারবার ওকথা কেন বলছিল। ...ওটা মণীশ নয়...মণীশের শরীর। এ কেমন ভ্রান্তি! নাকি অপরাধবোধ এসেছে মনে। আবীরকে বিয়ে করার সঙ্গে মণীশের মৃত্যুটাকে গুলিয়ে ফেলেছে। মণীশই বা আত্মহত্যা করল কেন? ঠিক কাঁকনের বিয়ের চারদিন আগে? এ কি শুধুই নৈরাশ্য, না তার সঙ্গে মিশে ছিল ঈর্ষা আর প্রতিশোধের বাসনা? কিংবা শুধুই প্রকৃতির ওপর তীব্র অভিমান? হয়তো সবই! ঘুমের ঘোরে কাঁকন কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। ভয়? নাকি লড়াই করছে নিজের সঙ্গে? ভাল করে গায়ে চাদরটা টেনে দিলাম। আমি কিছুতেই এভাবে কাঁকনকে নিঃশেষ হতে দেব না।

দরজার কাছে উঠে গেলাম। ব্যালকনিতে আবীর মূর্তির মতো স্থির। দিন ফুরোবার আগেই আজ অন্ধকার নেমে এসেছে। যখন তখন বৃষ্টি নামতে পারে। আকাশ ফ্যাকাশে লাল।

আবীরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম,—'চা খাবেন একটু? করে দেব?'

আবীর মুখ ফেরাল,—'আপনি বসুন, আমি চা করে আনছি।'

বাধা দিলাম না। একটু নড়াচড়া করুক।

রান্নাঘরে কাপে চামচ নাড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। নিঝুম ফ্ল্যাটে এরকম মৃদু ঠুং ঠাং শব্দ বড় কানে লাগে। দু কাপ চা হাতে নিয়ে চেয়ারে এসে বসল আবীর। নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে, 'আমাদের কি বালুরঘাটে একটা খবর দেওয়া উচিত?'

—'ওর মামাকে কাল জানাতে পারেন। শ্যামবাজারে।' আবীর সামান্য নার্ভাস হল,—'ওঁরা কি কাঁকনকে নিয়ে চলে যাবেন?'

এ কথার আমি কী উত্তর দেব? কোথায় থাকলে ভাল থাকবে কাঁকন? নিজের বাড়িতে, আবীরের ফ্ল্যাটে, নাকি একদম একা?

আবীর চায়ে চুমুক দিল। সামনের রাস্তা থেকে একটা একলা ল্যাম্পপোস্টের আলো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ব্যালকনির দিকে।

সেদিকে ফিরে জোরে জোরে মাথা নাড়ল,—'সব কেমন আপসেট হয়ে গেল। মানুষ ভাবে এক আর হয়...'

—'এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? এটা একটা টেম্পোরারি ফেজ। শরীর সুস্থ হলেই...'

—'আপনার তাই মনে হয়?'

—'নিশ্চয়ই।' পিঠ সোজা করে বসলাম।

আবীর সিগারেট ধরাল, —'আপনিই বলুন তো, আমার কি কাঁকনকে বুঝতে ভুল হয়েছিল?'

—'এ কথা কেন বলছেন? আপনি জানেন না গত কমাস ধরে ও শুধু আপনার কথাই...'

—'আমিও তো তাই ভাবতাম। কিন্তু ওর মনে যে একটা উলটো স্রোতও বইছে, বুঝতেই পারিনি। সবসময় মনে হয়েছে যে জীবনটা ফেলে এসেছে তার প্রতি আর কোনও পিছুটান নেই। অথচ দেখুন মন থেকে এখনও আগের ঘরটাকেই পুরোপুরি ভেঙে ফেলতে পারেনি। এভাবে কি নতুন কিছু শুরু করা যায়? করলেও টেঁকে?'

এক নিশ্বাসে কথা বলে যাচ্ছে আবীর। বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠল। কাঁকনকে আবার পুরনো অন্ধকারে ফেলে আবীর কি চলে যাবে? ছটফট করে উঠলাম,—'আপনি তো কাঁকনকে ভালবাসেন আবীরবাবু।'

—'বাসি। নিশ্চয়ই বাসি।'

—'তা হলে শুরু না করার কথা ভাবছেন কেন? আজকের ঘটনায় কাঁকনই তো কষ্ট পেয়েছে সবথেকে বেশি।'

আবীর চুপ।

মনে মনে কথা গুছিয়ে নিলাম,—'দেখুন, ঘর তো বাঁধি আমরাই, মেয়েরাই। আপনারা সেখানে বাস করেন মাত্র। সেই ঘর একবার যদি ভেঙে যায়, তার যন্ত্রণা যে কী অপরিসীম কিংবা তারও পরে প্রতিটি স্টেপে কী যে হতাশা আর গ্লানি সহ্য করতে হয় মেয়েদের, তা আপনারা বুঝবেন না।'

—'তার সঙ্গে আজকের কী সম্পর্ক?'

আবীরের মুখ অন্ধকারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। ও কি খুবই অপমানিত বোধ করছে? না নিছক অভিমান কাঁকনের ওপর?

—'আজকের কথাটা ভুলে যান। আমি কাঁকনকে জানি। ও খুব শক্ত মেয়ে। ঠিক সামলে উঠবে, দেখবেন। এই কাজে এখন একমাত্র আপনিই পারেন ওকে সাহায্য করতে।'

—'সাহায্য তো আমি করতেই চাই। তাই তো ওকে...কিন্তু আবার যতটা পিছনে চলে গেল...আমি কি পারব সমস্ত বাধা কাটিয়ে নতুন করে?'

মোড়া থেকে উঠে ব্যালকনির ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। নিজের মধ্যে কী হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। একটা দুর্ঘটনায় নিজেকে হারাতে বসেছিলাম, আরেকটা দুর্ঘটনা কি আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিচ্ছে। তবে কি এভাবেই পরিবর্তন আসে! নাকি এ পরিবর্তন এসেছে অনেকদিন ধরে, একটু একটু করে আমার প্রতিটি প্রশ্বাসের মধ্যে দিয়ে। যেমনভাবে ভেতরে অবিরাম চুঁইয়ে পড়া জল আলগা করে দেয় পাহাড়কে, ধস নামে হঠাৎ ঝড়ে। সামনের রাস্তা দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে একটা ট্রাক ছুটে গেল। আবীরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম,—'আমার দাদা প্রায় একটা গল্প বলে জানেন...সিসিফাস নামে এক গ্রিক যুবকের গল্প। সে সকাল থেকে রাত অবধি একটা প্রচণ্ড ভারী পাথরকে ঠেলে ঠেলে তুলত পাহাড়ের ওপরদিকে। কিন্তু কিছুদূর ওঠার পর পাথর গড়িয়ে যেত নীচে। আবার যুবক নতুন করে শুরু করত ঠেলা। খুব কষ্ট হত তার। রোজ একই কাজ, একই কষ্ট। মাঝে মাঝে হতাশায় ভেঙে পড়ত। ভারী পাথরটাকে বুঝি কোনওদিন তোলা যাবে না পাহাড়ের মাথায়। ভাবত আর যন্ত্রণা পেত। তারপর একদিন নিজেই বুঝতে পারল ওই পাথর ঠেলাটাই তার নিয়তি। পাথর কোনওদিনই চূড়ায় পৌঁছবে না তবু এই কাজই তাকে করে যেতে হবে। অনন্তকাল। সে তখন ঠিক করল, না, ভেঙে পড়বে না, পাথর যতবার খুশি নেমে যাক, আবার সে সেটাকে ঠেলে তুলতে চেষ্টা করবে। অবাক কাণ্ড, এরকম একটা অনুভূতি আসার সঙ্গে সঙ্গে সে টের পেল, কাজটা করতে আর তার মোটেই কষ্ট হচ্ছে না। বরং এক ধরনের আনন্দ আছে এই সংগ্রামে।...আমার মনে হয়, আপনার, আমার, কাঁকনের সবার জীবনই সিসিফাসের জীবন। নিজেকে ঠেলে ঠেলে তোলা, আবার গড়িয়ে নেমে আসা, আবার তোলা, আবার নামা, এ ভাবেই...'

আবীর আরেকটা সিগারেট ধরাল। বুঝতে পারছে আমি কী বলতে চাইছি?...এ গল্প আমি বললাম কাকে? আবীরকে? না নিজেকে?

চাপা গোঙানির শব্দ আসছে ঘর থেকে। কাঁকনের ঘুম ভেঙে গেল নাকি? আমি যাওয়ার আগেই আবীর ঝড়ের মতো ছুটে গেছে। গভীর উৎকণ্ঠায় ঝুঁকেছে কাঁকনের মুখের কাছে, —'কী কষ্ট হচ্ছে কাঁকন? জল খাবে?'

কাঁকনের বোবা চোখ খুলেই বুজে গেল। আবার ঘুমিয়ে পড়ল বোধ হয়। কী সুন্দর করে কাঁকনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আবীর। ঘুমের ওষুধের ক্রিয়ায় ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কাঁকনের কপালে আবীরের হাত নরম উত্তাপ পাঠিয়ে দিচ্ছে যেন। এরই নাম তবে ভালবাসা। এরই জন্য একজন পুরুষের একটি নারীকে বা একজন নারীর একটি পুরুষকে প্রয়োজন হয়। চোখ ঝাপসা হয়ে এল। আবীরের সঙ্গে কার মিল...খুব মিল? কে সে? বাইরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। সরে এলাম দরজা থেকে। ঝড় বৃষ্টি আসার আগেই আমাকে ফিরে যেতে হবে।

তেরো

কাকলির জন্য থেমে থাকেনি কিছু, কাঁকনের জন্যও থামল না। হোস্টেল চলছে নিজের মনে। সেই গান, হইহই, চিৎকার ঝগড়াঝাঁটি। তার মধ্যেই যে যার কাজে বেরিয়ে যাওয়া, ফিরে আসা। তার মধ্যেই ব্রততীরা আনন্দ খুঁজছে নিজস্ব কায়দায়, শুভ্রারা আরও হিংস্র হয়ে উঠছে! আর শুধু বেঁচে থাকার জন্যই বেঁচে আছে মন্দিরাদি, বন্দনাদি, হিরণদিরা। জীবনযাপন নয়, যেন কোনওরকমে জীবন ধারণ। বড়দি ছোড়দিই বা কোন ব্যতিক্রম। মাঝে মাঝে হঠাৎ ঝড় তোলে এক-আধজন, তারপর আবার জীবন বৃত্তের

মতো।

কাকলি ফিরল না। হাসপাতাল থেকে ওর জ্যাঠামশাই নিয়ে গেছে ওকে। কোথায়, কীভাবে যে এখন আছে। মেয়েটা এত বোকা। পায়ের তলায় মাটি পাওয়ার সুযোগ পেয়েও স্বেচ্ছায় ছেড়ে তলিয়ে যাচ্ছিল। আর কি সুযোগ পাবে? নাকি শুভ্রার মতোই ক্রমশ জেদি, বেপরোয়া হয়ে যাবে? জানি না। আমার ভাবতে ভয় করে।

অর্জুন ট্রাভেলস পনেরো দিনের মধ্যে জয়েন করতে বলছে আমাকে। চিঠিটা তাকের ওপর পড়েই আছে। শেষে ওই চাকরিটাই পেলাম। আপনারা তো জানেনই ওই অফিসের লোকজন, পরিবেশ, কেতাকায়দা কিছুই আমার ভাল লাগেনি। কিন্তু মাঝে মাঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে কী কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মালহোত্রা ব্রাদার্স এক মাসের নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছে। অফিসের সকলকেই। ভিনোদ হয়তো অন্য এজেন্সি খুলবে। অশোক মালহোত্রা বিয়ে করছে মার্গারেটকে। মালহোত্রা ব্রাদার্স আবার চালু হলে, যার সম্ভাবনা খুবই কম, মার্গারেট হবে নতুন মালকিন। নোটিশ দেওয়ার আগে দুই ভাই একসঙ্গে অফিসের সকলকে ডেকেছিল ঘরে। কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন, ভাই ভাই ভিন্ন হতে চলেছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পৈতৃক প্রতিষ্ঠান, তবু নিজেদের ভিতরকার বিবাদ আমাদের বুঝতে দিতে চায় না। যাদের অনেক টাকা থাকে তারা বোধ হয় এরকমই রঙিন মুখোশে আড়াল করে রাখতে পারে নিজেদের। আমরা, মধ্যবিত্তরা, আবেগ লুকোতে জানলাম কই! মিস্টার মেনন তো একঘর লোকের সামনে চশমা খুলে চোখ মুছতে লাগলেন। এই বয়সে নতুন চাকরির সন্ধান করা...! ব্যানার্জিদা অবশ্য ভাঙলেও মচকাননি। প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি, কমপেনসেশন, সব কিছুরই দাবি জানিয়েছেন জোর গলায়। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নাকি দীর্ঘদিন জমাই দেয়নি কোম্পানি। ব্যানার্জিদা বলেছেন কেস করবেন। কী জানি, শেষ পর্যন্ত হয়তো ফয়সালায় আসতেও পারে মালহোত্রারা। তবে সে সব তো মিস্টার মেনন বা ব্যানার্জিদাদের মতো পুরনো কর্মচারীদের বেলায়, আমাদের কী হবে? আমার, ক্রিশ্চিনের কিংবা অজয় সিনহার? অজয় সিনহার চোখ দুটো সেদিন মরা মাছের মতো নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল। হাঁ করে মেয়েদের দেখার মানসিকতা আর নেই বেচারার। ডোমা, শার্লি নতুন অফিসে জয়েন করে গেছে। রোজ ভাবি ওদের ফোন করব, ডায়াল ঘোরাতে গেলেই অভিমান কামড়ে ধরে হাতটাকে। ওরাই বা একদিনও কেন খোঁজ নিল না আমাদের? নতুন জায়গায় গিয়ে ভুলে গেল? এটা আমার ভুল অভিমান। নতুন থেকে নতুন, আরও নতুনের দিকে এগিয়ে চলার নামই বেঁচে থাকা। থাক তবে, ওরা আমার স্মৃতিতেই থাক প্রথম বাইরের জগতের আলোর প্রতিনিধি হিসেবে।

ক্রিশ্চিন অনর্থক রাগ করে।

—'অল সেলফিশ। প্রতিটি মানুষই স্বার্থপর পৃথিবীতে।' ম্যাথুজের ওপর অভিমান ক্রিশ্চিনের এখনও যায়নি। তবে কিছুদিন হল আরেকটা বন্ধু পেয়েছে, জেমস ডোনাল্ড। অফিসের পর ছেলেটার সঙ্গে মোটর বাইকে করে পাখির মতো উড়ে যায়। রিচির সঙ্গেও ইদানীং খুব ভাব। রোজ টিফিনে আমাকে নিয়ে 'হোল ইন দা ওয়ালে' যেতে চায় মেয়েটা। কী করে বোঝাই প্রতিদিন ওখানে গিয়ে টিফিন করার বিলাসিতা আমার সাজে না। শেষ গিয়েছিলাম গত সপ্তাহে। জন তার স্বাভাবিক হাসিমাখা মুখে কুশল জিজ্ঞাসা করল। ক্রিশ্চিন তখন রিচির সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত। একগাল হাসলাম।

—'ফাইন জন, থ্যাঙ্ক ইউ।' ...ফাইন...ফাইন...শব্দটা কী সুন্দর অথচ নির্মম, তাই না? কত মানুষকে যে ভাল না থেকেও দিনরাত ভাল আছি, ভাল আছি বলে যেতে হয়। মালহোত্রা ব্রাদার্স ছেড়ে কোথায় যাব জানি না, তবে জনের দোকানটা মনে থাকবে চিরদিন। ওটাও তো আমার পৃথিবী দেখার আরেকটা জানলা কিনা। টিফিন থেকে ফিরলে অজয় সিনহা আজকাল আর ছাগলছানার মতো লাফিয়ে কাছে আসে না। কেমন বিমর্ষ সবসময়। মাঝে মাঝে অদ্ভুত আক্ষেপ করে।

—'আপনাদের আর কী। মেয়েদের ঠিক কোনও না কোনও চাকরি জুটে যায়। কিছুদিন বেকার বসে থাকলেও যায় আসে না। আমাদেরই যত...।'

বেশির ভাগ ছেলেরই মেয়েদের চাকরি করা সম্বন্ধে ধারণা এই রকমই। রাগ করি না। সত্যিই তো, এই বেকারির বাজারে সিন্‌হার মতো ছেলেদের আরেকটা চাকরি জোগাড় করা...। এদের মনের জোর বড় কম। এরকম ভিতু ভিতু, লোভী লোভী মানুষেরা দুনিয়াতে থাকবেই। এরাই বুঝি সবথেকে বেশি

হতভাগ্য।

তবে জানেন, শ্রীকান্ত মজুমদারকে আমি ছাড়িনি। গতকাল সন্ধেবেলা হোস্টেলে ফিরছি, হঠাৎ বাসস্ট্যান্ডে দেখা, সঙ্গে বউ মানে চন্দনার ননদ আর দুটো গাবলু গাবলু বাচ্চা। আমাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, নিজেই এগিয়ে গেলাম,

—'কী মশাই, চিনতেই পারছেন না দেখছি।'

শ্রীকান্তবাবু থতমত।

—'না মানে চিনব না কেন? কেমন আছেন? ভাল?'

সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে আমি তখন মরিয়া। লোকটাকে এতদিনে কবজায় পাওয়া গেছে।

—'বা রে, পরশু দিনও দেখা করলেন আমার সঙ্গে। একদিনেই খারাপ থাকব?'

পাশে দাঁড়ানো চন্দনার ননদ গোল গোল চোখে তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে। লোকটা এত অভদ্র যে বউ-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার মতোও সৌজন্যবোধ নেই। ভদ্রমহিলাকে একটা হাসি উপহার দিলাম,—'বুঝলেন ভাই, আপনার কর্তার নামে আমার প্রচুর নালিশ আছে। আমাদের এতদিনের পরিচয়, রোজ কত গল্প করে, এত কাছেও থাকি, তাও একদিন বাড়িতে নেমন্তন্ন করল না...'

—'কোথায় থাকেন?' আমার দিকে নয়, স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ভদ্রমহিলা।

—'এই তো, আপনাদের মাত্র কয়েকটা বাড়ি পরে, শান্তিনীড়ে। আমার কথা হয়তো শুনে থাকবেন, আমি আপনার ভাই-এর বউ চন্দনার ছোটবেলাকার বন্ধু...শ্রীকান্তবাবু তো সেই সূত্রেই...'

পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না শ্রীকান্তবাবু। উড়তে উড়তে হোস্টেলে চলে এলাম। কী হালকা যে লাগছিল নিজেকে। মনে হচ্ছিল নির্ভার জলকন্যার মতো বাতাসের সমুদ্রে ভাসছি। শ্রীকান্তবাবু নির্ঘাত বউকে ঠাণ্ডা করতে অনেক আজেবাজে নোংরা কথা বলবে আমার নামে। বলুক গে যাক, হোস্টেলে ফিরে আমি তো প্রাণ খুলে হেসে নিতে পেরেছি। একা একা আমার হাসি দেখে বন্দনাদি অবাক, —'কীরে রাই, পাগল হয়ে গেলি নাকি?'

—'নাগো না, একটা গিরগিটি রং পালটাবার চেষ্টা করছিল, দিয়েছি তার লেজ মাড়িয়ে...হি হি...হিহি...'

বন্দনাদির ভুরু কুঁচকে গেল,—'কী আবোল তাবোল বকছিস?'

কী করে বোঝাই, নিজেকে অতিক্রম করায় যে কী মুক্তি। বন্দনাদিরা তো ছোট্ট এক ফালি হোস্টেলের সিটকে আঁকড়েই কাটিয়ে দিচ্ছে এবারকার জীবনটা। হয়তো কোনও কোনওদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে বুকটা মুচড়ে ওঠে, মনে হয় কী যেন নেই, মনে হয় কী যেন পাওয়ার ছিল, তারপর সকালে উঠেই নতুন ক্ষুদ্রতম কারণে ঝগড়া শুরু করে কারুর সঙ্গে। আজও সকালে যেমন হিরণদির সঙ্গে করছিল। সামান্য ব্লাউজ শুকোতে দেওয়া, তার জন্যও তারের ওপর কেউ কাউকে এক সেন্টিমিটার জায়গা ছাড়তে রাজি নয়। মঞ্জুদির ঘণ্টা নাড়ার শব্দ প্রবল তখন। মন্দিরাদি নিরাসক্ত মুখে নিজের জামাকাপড় ইস্ত্রি করতে ব্যস্ত। দাদাকে চিঠি লিখতে বসেছিলাম। নিজের সব অনুভূতির কথা জানিয়ে বিরাট লম্বা চিঠি। ওদের চিৎকারে কলম বন্ধ করতে হল। কাঁকন থাকলে ঠিক ধমকে থামিয়ে দিত দুজনকে।

কাঁকনকে মেন্টাল হসপিটালে ভর্তি করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে ওকে দেখতে যাই। কেমন যেন সাদা চোখে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। চিনতেই পারে না। আমার বুক কেঁপে ওঠে, গলার কাছে বাষ্প দানা বাঁধতে থাকে। ডাক্তার অবশ্য বলেছে ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু আবীর কি ততদিন বসে থাকবে ওর জন্য? কেউ কি সত্যি সত্যি অপেক্ষা করে থাকে? থাকে, থাকে।

...কাঁকনের ঘটনার পরদিনই ফোন করেছিলাম সিদ্ধার্থকে। ঠিক নিজে যে করেছিলাম তাও নয়, কে যেন আমার আঙুলগুলোকে চালিয়ে ডায়াল করিয়ে নিল। ও প্রান্তে সিদ্ধার্থ আসতেই জিভ শুকিয়ে গেছে।

—'কে বলছেন?'

সিদ্ধার্থ বার কয়েক হ্যালো হ্যালো করার পর স্বর ফুটল,—'আমি রাই।'

সিদ্ধার্থ সামান্য থমকাল যেন। নাকি আমারই মনের ভুল? আবার বললাম,—'আমি রাই,

রাইকিশোরী।'

—'বলো।'

—'কেমন আছেন আপনি?'

—'ভাল। ভালই।'

—'রাগ করে আছেন এখনও?'

—'নাহ্।'

—'আমার ফোন পেয়ে খুব অবাক হয়ে গেছেন, তাই না?

—'আমি সহজে অবাক হই না রাই।'

—'একটুও অবাক হননি?'

—'একটুও না।'

—'আমার কিছু কথা ছিল আপনার সঙ্গে।'

—'বলে ফ্যালো।'

—'ফোনে নয়। বিকেলে একবার আমার অফিসের সামনে আসবেন?'

টেলিফোনটা রেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। একটু একটু ভাল লাগছিল যেন। সাড়ে পাঁচটায় নীচে নামতে, বহুকাল পর ফুটপাথে সিদ্ধার্থ। নিজেকে তৈরি করে এগিয়ে গেলাম,—'চলুন, একটা জায়গায় যেতে হবে।'

—'চলো।'

সিদ্ধার্থ রীতিমতো গম্ভীর। আগের সেই হাসিখুশি ভাবটাই নেই। আমিই দায়ী এর জন্য। হাসার চেষ্টা করলাম,—'জানতে চাইলেন না কোথায় যাব?'

সিদ্ধার্থ এতক্ষণে সোজাসুজি তাকাল। আমার চোখে কী যেন খুঁজতে চায়, —'জানার দরকার নেই।'

—'আপনি বিরক্ত হচ্ছেন?'

—'না আ।'

—'বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমি অপমান করতে চাইনি।' চোখ বুজে ঝড়ের মতো বলে গেলাম,—'তারপর থেকে আমার এত খারাপ লেগেছে...আসলে সেদিন একটা লোক এমন বিশ্রীভাবে রাস্তায় আমাকে...'

—'থাক রাই, আমি শুনতে চাই না।' সিদ্ধার্থ মুখ ফিরিয়ে নিল—'ট্যাক্সি ধরবে একটা?'

রেড রোড ধরে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি। পথের দুপাশে সবুজের পর সবুজ। তারও ওপাশে উঁচু উঁচু বাড়িগুলো। উজ্জ্বল সবুজের মধ্যে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে বিকেলটা। সিদ্ধার্থকে কেন নিয়ে যাচ্ছি আবীরের ফ্ল্যাটে? কাঁকনের কথা বলতেই কি ওকে ডেকেছি? কাল থেকে প্রাণ খুলে কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। সিদ্ধার্থকেই খুঁজছিলাম আমি? নাকি কাঁকনকে একা দেখতে যেতে সাহস পাচ্ছিলাম না তাই...? বুঝতে পারছি না। ভাবনাগুলো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। উলটোদিকের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সিদ্ধার্থ। বুঝি ঠিক করেই এসেছে নিজে যেচে আমার সঙ্গে একটাও কথা বলবে না। ও কি অনেক বদলে গেছে? আমার কথাগুলোও মন দিয়ে শুনতে চাইছে না? কেন এত নিরাসক্তি? একজনও কি আমাকে বোঝার চেষ্টা করবে না? চোখদুটোকে সামলে রাখতে পারছি না! আঁচলে মুখ ঢাকলাম।

সিদ্ধার্থ চমকে তাকিয়েছে,—'কাঁদছ কেন রাই?'

প্রাণপণে কান্নাটাকে গিলে ফেলতে চাইলাম।

—'প্লিজ রাই।' সিদ্ধার্থ আমার কাঁধে হাত রেখেই সরিয়ে নিল।

ঘষে ঘষে চোখ মুছে নিলাম,—'আমি খুব...খুব...খুব খারাপ মেয়ে।'

নির্জন অন্ধকারে রাত্রিটা বড় সুন্দর। বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চিনচিন করে উঠল বুকটা। বিকেলে ম্যান অফ ওয়ার জেটির পাশে বসে সিদ্ধার্থ আজ জিজ্ঞাসা করেছিল,—'কী ঠিক করলে রাই?'

—'কী ব্যাপারে?'

—'তোমার চাকরির...'

—'জানি না।'

হাওয়ার দিকে পিছন করে সিদ্ধার্থ সিগারেট ধরাল, —'দিদি তোমাকে কালকেই দেখা করতে বলেছে। কোনও চাকরির খোঁজ আছে বোধ হয়।'

সামনের গেরুয়া জলে খেলনার মতো লঞ্চগুলো ছোটাছুটি করছে। মাঝগঙ্গা বেয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে একটা ছোট্ট পালতোলা নৌকো। সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

—'যদি চাও, আজই যেতে পারো আমাদের বাড়ি।'

দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখতে পারলাম না, —'কারুর সাহায্য ছাড়াই এবার কাজ জোগাড় করে নেব ভেবেছিলাম।'

—'সে তো তুমি করেছই। ইচ্ছে করলেই অর্জুন ট্রাভেলস-এ...'

—'ওটা নেব কি না ঠিক করিনি।' হাঁটুতে মুখ রাখলাম,—'ভাবছি কিছু না হলে কৃষ্ণনগরেই না হয়...

সিদ্ধার্থ আচমকা আমার হাত চেপে ধরল, —'না রাই, যেয়ো না, তোমাকে আর আমি হারাতে চাই না।'

প্রথম বর্ষার ফোঁটা পাওয়া বাঁশপাতার মতো কেঁপে উঠল গোটা শরীর। এই স্পর্শের জন্যই কি তবে এতদিন ধরে আমি অপেক্ষা করে ছিলাম? সেই আমার কৈশোর থেকে? এ কার স্পর্শ? অনিমেষ আমাকে ছুঁলেও তো কোনওদিন এত রোমাঞ্চিত হইনি। নিজের মনে বলে উঠলাম,—'আমি আর কোনওদিনই হারাব না।'

পেছনের ভাঙা প্রাসাদ থেকে বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। একটা চোরা স্রোত বয়ে যাচ্ছে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। গলার কাছে নাম না জানা কষ্ট! কে ছুঁয়েছিল আমাকে আজ? গালে গাল রেখেছিল? সিদ্ধার্থ? না নীলাঞ্জন? জংলি মাদল বেজে উঠল রক্তের ভেতর। অন্ধকার ছুঁয়ে প্রশ্ন করলাম,

—'কী চাও রাই?'

—'বুঝতে পারছি না।'

—'আমি বুঝতে পারছি।'

—'কী?'

—'মোটামুটি একটা ভাল চাকরি তো বটেই। নিজের পায়ে দাঁড়ানো, নিজেকে...'

—'তা ছাড়া?'

—'কী তা ছাড়া?'

—'জানো না তুমি? মন্দিরাদির দিকে তাকিয়ে দেখেছ ভাল করে?'

—'হ্যাঁ, বড় নিঃসঙ্গ...'

—'বন্দনাদি মঞ্জুদিকে দেখেছ? কেমন শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে গেছে। কাজের সময়টুকু ছাড়া সারাক্ষণ অন্যের নিন্দে করে বেড়ায়?'

—'না হলে কী নিয়েই বা বাঁচে তারা?'

—'আর হিরণদি? সুখী মুখ দেখেছ কোনওদিন?'

—'আহা, বেচারির যে বড় কষ্ট। একপাল ভাইবোন মানুষ করার জন্য একঘেয়ে কাজ...'

—'তোমার মতো ওরাও তো চাকরিবাকরি করে। পায়ের তলায় মাটিও আছে ওদের। তবু কি খুব ভাল আছে?'

—'আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন? ওরা ছাড়াও অনেকে তো আছে...মীরাদি...'

—'মীরাদিকে তুমি কতটুকু জানো রাই?'

—'তা অবশ্য জানি না। যাদের অত বিশাল ব্যক্তিত্ব থাকে তাদের সহজে বুঝে ওঠা যায় না?'

—'তবে?'

—'তুমি কী বলতে চাইছ?'

—'তুমি ঘাস চাও না রাই?'

—'হ্যাঁ, সবুজ ঘাস।'

—'আর নিজস্ব বনভূমি?'

—'যেখানে একটা ঘর থাকবে। আমার ঘর!'

—'পাশে এক স্বচ্ছ সরোবর...?'

—'হুঁউই। সেখানে আমি রোজ ডুব দেব। সকাল বিকেল জলের আয়নায় দেখব নিজেকে।'

—'সেই সরোবর তো তৈরি হয় ভালবাসার ঝরনা থেকেই। সিদ্ধার্থ তোমাকে ভালবাসে রাই।'

—'জানি, জানি।'

—'তা হলে ভাবছ কেন?'

—'আরেকজনকে মনে পড়ছে যে। সিদ্ধার্থর স্পর্শে...'

—'তুমি ভুল করছ রাই, নীলাঞ্জন চিরকাল থাকবে সে-ই তিনটে পাহাড়ের ওপারে। তুমি শুধু তার ডাক শুনতে পাবে।'

—'তুমি নিষ্ঠুরের মতো কথা বলছ?'

—'না রাই, সিদ্ধার্থই সত্যি। হঠাৎ কোনও রাতে ঘুম ভেঙে গেলে জানলা দিয়ে যে কাঁঠালিচাঁপার গন্ধটা তোমার নাকে এসে ঝাপটা মারে, মন অবশ করে দেয়, সেই ফুলটাই শুধু নীলাঞ্জন।'

নতুন করে কাঁপছি আমি। ওই তো সবুজ বনভূমির পারে সরোবরের জল টলটল। জংলি মাদলের শব্দ কাছে, আরও কাছে। টুকরো টুকরো ভালবাসা হয়ে সিদ্ধার্থ ছড়িয়ে গেল পাঁজরের ফাঁকে ফাঁকে। চোখ বন্ধ করলাম,—তবে সিদ্ধার্থই সত্যি হোক। তুমি স্বপ্নে এসো নীলাঞ্জন।

মণিকা দিন সাতেক হল কাঁকনের সিটে এসেছে। অনেক দূরে বাড়ি। জঙ্গিপুরের কাছে কোন গ্রামে। মেয়েটা ওখান থেকেই পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছে কলকাতা করপোরেশনে। সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকে। চুপচাপ মুখ গুঁজে পড়ে থাকে বিছানায়। শ্বশুরবাড়িতে কী সব ঝামেলা, ওর বর ওকে নেয় না। মাঝে মাঝে মেয়েটার পাশে গিয়ে বসি, কিছু বলার চেষ্টা করি, যেভাবে কাঁকন বোঝাত আমাকে। ঠিক ঠিক ভাষা খুঁজে পাই না সবসময়। কিন্তু আমি জানি ও পারবে...

মণিকার মধ্যে এক বছর আগের রাইকিশোরীকে দেখতে পাচ্ছি আমি।

ভাঙনকাল

পর্দার ফাঁক দিয়ে একদৃষ্টে ছেলেকে দেখছিল অনুরাধা। শুধু ছেলেকে নয়, ছেলেকে নিয়ে গড়ে ওঠা ছোট্ট পরিমণ্ডলটাকেও। ছায়ামাখা হিমহিম ঘর, ঘরের কোণে চেয়ার-টেবিল, টেবিলে কাটগ্লাসের বাতিদান, বাতিদান থেকে বিচ্ছুরিত আলোর বলয়, টেবিলময় স্তূপীকৃত বইখাতা, দেওয়ালে দাঁড়িয়ে থাকা ঝাপসা স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর পায়ের কাছে বই-এ মুখ গুঁজে ধ্যানমগ্ন রাজা। ছেলের এই আত্মস্থ রূপ অনুরাধার ভীষণ প্রিয়। এ সময়ে প্রবল ঝঞ্ঝা এলেও বাইরে তাকাবে না রাজা, ভূমিকম্প হলেও চেয়ার ছেড়ে নড়বে না এতটুকু ; বাড়িতে আগুন লাগলেও বই থেকে মুখ তুলবে না ছেলে। অনুরাধা জানে। এভাবেই রাজাকে গড়ে তুলছে অনুরাধা।

একত্রিশে ডিসেম্বরের রাত। পর পর কদিন আকাশ মেঘলা ছিল, দু-চার ফোঁটা ঝিরঝিরও ঝরেছিল কাল বিকেলে। আজ সকাল থেকে আকাশ একেবারে তকতকে। সূর্য পাটে বসার পর শীত মেজাজে ফিরতে শুরু করেছে। হু হু করে পারা নামছে তাপমাত্রার।

অনুরাধার হঠাৎ নজর পড়ল রাজার ঘরের একটা জানলা হাট করে খোলা। ওফ্, ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা যায় না। এত গরম গরম বাতিক!

—জানলাটা খুলেছিস কেন ?

ধ্যানস্থ রাজা বাঁ করতল কপালে চাপল—সব বন্ধ থাকলে দম আটকে যায়।

রাজার কণ্ঠস্বর এখনও কৈশোরকে পুরোপুরি ছাড়েনি। ঠিক মিষ্টিও নয়, হেঁড়েও নয়, কিছুটা ভাঙাভাঙা। সামনের এপ্রিলে ষোলো পূর্ণ করবে সে। এর মধ্যেই তার হাবভাব বেশ গম্ভীর গম্ভীর। পাকা পাকা। পূর্ণবয়স্কদের মতো।

অনুরাধা স্নিগ্ধ ধমক দিল, হোক দমবন্ধ। ওটা উত্তরের জানলা। ঠাণ্ডা ঢুকছে। শেষে সর্দিকাশি বাঁধিয়ে একটা কেলেঙ্কারি করবে।

—আহ্ মা, যাও তো। আমার ঠাণ্ডা লাগছে না।

—শালটা তা হলে ভাল করে জড়িয়ে নাও। কান ঢাকো।

অনুরাধা পর্দা ছেড়ে রান্নাঘরে গেল। বেশ বড়সড় রান্নাঘর। টানা সিমেন্ট র‍্যাকে পর পর এক জোড়া গ্যাসস্টোভ। র‍্যাকের তলায় সুরক্ষিত সার সার চারটে গ্যাস সিলিন্ডার। ফাঁকা। ভর্তি। সকালের দিকে একসঙ্গে চারটে ওভেন না জ্বললে অনুরাধা সামাল দিতে পারে না। চন্দনের পাঁচবার চা, শাশুড়ির খাওয়ার জন্য উষ্ণ উষ্ণ গরম জল, তার সঙ্গে জলখাবার তৈরি, অফিসের ভাত তো আছেই। তাও রাজার টেস্ট হয়ে গেছে বলে স্কুল এখন বন্ধ, বাথরুমেও নতুন গিজার বসেছে, নইলে চারখানা বানারেও হিমশিম খেতে হয় অনুরাধাকে। রান্নাঘরের অন্য প্রান্তে, তাকে মিক্সারগ্রাইন্ডার, অটোমেটিক টোস্টার, ননস্টিক বাসনসম্ভার। দেওয়ালের খোপে খোপে স্টিলের বাসনকোসন, মশলাপাতি রাখার সুদৃশ্য পলিজার। কোনায় ঢাউস সিঙ্ক। সিঙ্কের পাশে একখানা কিচেন শেল্‌ফ্ কেনা পড়ে আছে, এখনও লাগানো হয়নি।

এত জিনিসে ঠাসা তবু গড়িয়ার বাড়ির দমচাপা ভাবটা এ ঘরে টের পায় না অনুরাধা। কেন যে পায় না! পশ্চিমে অত বড় জানলা আছে বলে! নাকি জানলার ওপারে ফালি উঠোনটুকুর জন্য! নাকি এগজস্ট পাখাটার জন্য!

হয়তো এর কোনওটাই নয়। হয়তো সবটাই অনুরাধার বিভ্রম। গড়িয়ার বাড়ির রান্নাঘর অনেক বড় ছিল। বাড়িটাই একদম পছন্দ ছিল না অনুরাধার। কেমন গ্রাম্য! কলোনিটাইপ! পিছনে নোংরা ডোবা। মশা। ছাইগাদা। কচুবন। বড় কষ্টে অনুরাধা এক যুগ কাটিয়েছে সেখানে। ছেলে নিয়ে। নিজেকে নিয়ে।

অনুরাধা গ্যাসে খানিকটা গরম জল বসাল। আটটা বাজে, এর মধ্যেই শীত বেশ চেপে ধরছে,

একটু কফি খেলে মন্দ হয় না।

রান্নাঘর থেকেই অনুরাধা গলা ওঠাল,—রাজা, কফির জল বসিয়েছি, তুই খাবি ?

রাজা সাড়া দিল না।

অনুরাধা ঠোঁট টিপে হাসল। নিরুত্তর থাকার অর্থ ছেলে কফি খাবে। রাজার জন্য কফিতে দুধ একটু বেশি দিতে হয়, চিনিও। এমনিতে ছেলে দুধ ছোঁবে না কিন্তু চা কফি দুধ ঢেলে সাদা করে দাও, তাতে আপত্তি নেই।

ছেলের সাড়া না পেলেও লাঠির ঠুকঠুক কানে বাজল অনুরাধার। প্রতিভা। কোমর নড়ে না, হাঁটু চলে না, চোখে ছানি কিন্তু কান তীক্ষ্ণ হচ্ছে দিন দিন।

—ও অনু, আমি একটু কফি খাব।

—এমনি তো রাত্তিরে ঘুম হয় না, এখন আটটার সময় কফি খাবেন ?

—খাই। বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। বিকেল থেকে হাঁটু দুটোও জ্বালাচ্ছে।

—ঠিক আছে। ঘরে যান। দিচ্ছি।

প্রতিভা তবু নড়লেন না, জোরে জোরে নাক টানলেন দু-তিন বার, —কী সুন্দর বাস বেরিয়েছে গো।

অনুরাধা হেসে ফেলল। বেকিং ওভেনে কেক করা আছে, এখনও বার করা হয়নি, একবার ঢাকা খুলে দেখেছিল শুধু। ওই খোলাতে যেটুকু গন্ধ বেরিয়েছিল তা প্রায় বাতাসে নেইই আর। বুড়ি তবু ঠিক গন্ধ পেয়ে গেছে !

অনুরাধা বলল, —কেকের গন্ধ। খাবেন ? এখনও গরম আছে।

—না থাক্। ময়দা আছে, ডিম আছে...এখন খেলে আমার হজম হবে না।

—অল্প একটু খান। বচ্ছরকার দিনে করলাম...

—খুব অল্প দিয়ো। এক চিলতে। আঙুল তুলে মাপ দেখালেন প্রতিভা, —রাজা খেয়েছে ?

অনুরাধা বেকিং ওভেন খুলল। প্লেটে একটা ছোট্ট টুকরো তুলে এগিয়ে দিল প্রতিভার দিকে, —আপনার নাতির তাড়নাতেই তো কেক করা। চকোলেট কেক, চকোলেট কেক করে মাথা খেয়ে ফেলছিল আমার।

রান্নাঘরের সামনে লম্বাটে ডাইনিং স্পেস। এক পাশ কাচের শার্শি দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে ডিম্বাকৃতি টেবিল ঘিরে ছখানা চেয়ার। একদম সামনের চেয়ারটায় বসে খুঁটে খুঁটে কেকের টুকরো শেষ করছেন প্রতিভা, —সংক্রান্তির দিন একটু পিঠে পায়েস কোরো তো দেখি। চাঁদু আমার বড় পিঠে খেতে ভালবাসে। সে একবার খুব মজার কাণ্ড হয়েছিল জানো ? চাঁদু তখন ইস্কুলে। লাজু হয়নি। তোমার শ্বশুর গরম গরম খাবেন বলে রাঙালুর পিঠে ভাজছি. ভাজছি আর ছানচা করে তুলে পাশের রসে ফেলছি..ও-ও মা ! কিছুক্ষণ পর দেখি ডেকচির রস যেমন ছিল টলটল করছে, পিঠে প্রায় নেইই ! কী হল ? কী হল ? না ছেলে আমার আসছে যাচ্ছে আর টুকুস করে খাবলা দিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে। বড় হয়েও...সে কথা তো তোমারও মনে আছে ! সেই যে গো যখন মুর্শিদাবাদে পোস্টেড ছিল ! শনি রোববারের ছুটিতে এসে ওর জন্য চোসি রাখা হয়নি বলে সে কী মেজাজ !

প্রতিভার কথায় কান ছিল না অনুরাধার। সে তখন কাচের বাসন রাখার ক্যাবিনেট থেকে নতুন কফিমগ বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। পরশুই লাজু গোটা ছয়েক উপহার দিয়ে গেছে। টুকটুকে লাল রং। এই লালটাই অনুরাধা বেশি ভালবাসে। রাজাও। লাজু জেনেবুঝেই এই রং কিনেছে। বউদিকে তেল মারার চেষ্টা ! সাত্যকির সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে বলেই কি লাজু দাদা বউদির দিকে ঝুঁকতে চাইছে ! ঘাড়ে চেপে বসার আগাম নোটিস ! গতমাসে অনুরাধার জন্য একটা ফোমের ব্যাগ কিনে আনল। কদিন আগে রাজার জন্য টিশার্ট। টিশার্টটা বেশ খেলো। দেখেই বোঝা যায় ফুটপাতের মাল। ব্যাগটাও। পঞ্চাশ-ষাট টাকার বেশি শার্টটার দাম হবে না। ব্যাগটা বড় জোর চল্লিশ। সাত্যকি এখন ভালই কামায়, পকেটে সবসময় কাঁচা টাকা তবু লাজুর রুচির মান বাড়ল না এতটুকু। সারাক্ষণ নজর খালি সস্তাগণ্ডার দিকে। একদম বাবার স্বভাব বসানো ! খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরেই যখন দিব্যি কেটে যাচ্ছে, চটকদারির দরকারটা কী বউমা ! অকারণ

বিলাসিতা জীবনকে লোভী করে তোলে। হুঁহ্, অক্ষমের ফাঁকা বুলি। নিজে জোটাতে পারিনি তাই কাউকেই পেতে দেব না।

প্রতিভাকে কফি দিয়ে অনুরাধা ছেলের ঘরে ঢুকল, —এই নাও তোমার দুধকফি। ঠাণ্ডা কোরো না।

রাজা ঘাড় না তুলেই ফিক করে হাসল, —শুধু কফি দিলে ?

—মিষ্টি খাবি ?

—কী মিষ্টি ?

—ফ্রিজে এক বাক্স সরপুরিয়া রাখা আছে। তোর বাবা কাল এনেছিল।

রাজা নাক কুঁচকোল, —চলবে না। এক পিস্ কেক দিয়ে যাও।

—এখন কেক খেলে রাত্তিরে খেতে পারবি ?

—দশটার আগে তো খাব না।

রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল অনুরাধা, দরজায় বেল শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। চন্দন ফিরল নাকি। নিউইয়ার্স-ইভে এত তাড়াতাড়ি।

দরজা খুলতেই মোড়ের দোতলা বাড়ির টুকুন। রাজার সঙ্গেই মাধ্যমিক দেবে এবার। হুটহাট চলে আসে রাজার পড়ার সময়।

অনুরাধা নকল হাসি ফোটাল মুখে, —কী রে ?

—মাসিমা, রাজা আছে ?

—কেন বল্ তো ?

—রাজার স্যার রাজাকে কয়েকটা জিওমেট্রির এক্সট্রা কষে দিয়ে গেছেন, রাজা আমাকে দেখাবে বলেছিল।

অনুরাধার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হল না, —রাজা তো এখন নেই রে। পিসির বাড়ি গেছে। পরে আসিস্।

ভাগ্যিস রাজার ঘর এখান থেকে দেখা যায় না ! অনুরাধা তড়িঘড়ি দরজা বন্ধ করল। ছেলেটার বদ অভ্যাসগুলো কিছুতেই আর ছাড়ানো গেল না। ছোটবেলা থেকেই দাতা কর্ণ ! অনুরাধা ছেলেকে ভাল ভাল টিফিন দিচ্ছে আর ছেলে সেই চিকেন স্যান্ডুইচ, পেস্ট্রি, আপেল, কমলালেবু দু হাতে বিলি করে যাচ্ছে স্কুলের বন্ধুদের ! বাবা দামি পেনসিল্ বক্স এনে দিল, ছেলে অবলীলায় বান্ধবীকে দান করে এল ! চোরের মার মেরেও রাজাকে শোধরানো যায় না। আরে তুই মোটা টাকা দিয়ে প্রাইভেট টিউটরদের কাছে পড়ছিস্, সেই স্যারেদের দেওয়া নোট তুই বন্ধুদের দিবি কেন ! এই দুনিয়ায় যোগ্যতম হতে গেলে অন্যদের যোগ্যতর হতে না দেওয়াটাও যে কী ভীষণ জরুরি, সে কথা রাজার মাথায় কিছুতেই ঢোকাতে পারল না অনুরাধা !

এক টুকরো কেক নিয়ে অনুরাধা রাজার ঘরে ফিরল। রাজা চেয়ারে বাবু হয়ে বসে ডটপেন চিবোচ্ছে। টুকুনের আবির্ভাব ও প্রস্থান সে টের পায়নি। এ সময় রাজা স্যারেদের দেওয়া মডেল কোয়েশ্চেন পেপার সলভ্ করে। অথবা মাধ্যমিকের টেস্টপেপার। ঘড়ি ধরে উত্তর লেখে। এভাবেই সময় মেপে পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিখতে হবে রাজাকে। তিন তিন জন প্রাইভেট টিউটর দুবার করে আসছেন সপ্তাহে, একজন লাইফসায়েন্স, একজন ইতিহাস ভূগোল, আরেক জন ফিজিকাল সায়েন্স, অঙ্ক। এ ছাড়াও দু দিন বিকেলে ইংরিজি বাংলার টিউটোরিয়াল। এর পরও যদি উত্তর লিখতে গিয়ে থমকে যায় !

অনুরাধা ছেলের খাতার দিকে ঝুঁকল, —কীরে, আটকে যাচ্ছে ?

—কই না তো !

—তা হলে পেন চিবোচ্ছিস যে।

রাজা চমকে মুখ থেকে ডটপেন নামাল, —এমনিই।

ছেলের চমকানিতে মজাই পেল অনুরাধা। রাজা তা হলে এখনও তাকে বেশ ভয় পায়। বছর দুয়েক আগে যা জোর ঘাবড়ে দিয়েছিল একদিন। কোন বেপাড়ায় ক্রিকেট খেলতে গিয়ে সন্ধে পর্যন্ত

বেপাত্তা, অঙ্কের স্যার এসে বসে থেকে থেকে চলে গেলেন, অনুরাধা সেদিন ঠাস করে একটা চড় মেরেছিল রাজাকে। অমন চড় তো কতই মেরেছে কিন্তু সেদিন এক চড়েই দৌড় ছেলে। পাইপাই গৃহত্যাগ। কাঁকুলিয়া থেকে লেকের পাড়। চন্দন আর অনুরাধা রাস্তায় রাস্তায় চরকি মেরে অনেক রাতে উদ্ধার করেছিল ছেলেকে। মাঘের রাত, গায়ে শুধু একখানা হাফসোয়েটার আর শর্টস, লেকের হিমেল হাওয়ায় সিঁটিয়ে গেছে রাজা, তবু কী জেদ! যাব না যাব না যাব না। কিছুতেই বাড়ি যাব না। মা কেন এখনও আমার গায়ে হাত তুলবে? কেন?

পাগল। এক্কেবারে পাগল। অনুরাধা ছেলের মাথায় হাত রাখল। ঝাঁকড়া মোটা মোটা রুক্ষ চুল। চন্দনের মতো। ওই চুলে হাত বোলালে অদ্ভুত এক প্রশান্তি নামে শরীরে।

—কী পেপার সলভ্ করছিস রে?

রাজা মাথা থেকে হাত সরিয়ে দিল, —তখন কে বেল বাজাল?

—ও কেউ না, কেবল্ টিভির লোক। ছেলের মঙ্গলের জন্য মিথ্যে বলতে চোখের পাতাও কাঁপে না অনুরাধার, —কী পেপার করছিস্ বললি না তো?

—নরেন্দ্রপুরের ইংলিশ পেপার। রাজা ঘুরে অনুরাধার কোমর জড়িয়ে ধরল, —মা, আমি খেয়ে উঠে আজ আর পড়ব না। টিভি দেখব।

সাধারণত অনুরাধা ছেলের এই ধরনের আবদারকে প্রশ্রয় দেয় না। সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা, জীবনের মূল সোপান এবারই শুরু। এখন পর পর সিঁড়ি ভাঙতে হবে রাজাকে। ভেঙেই যেতে হবে। ধাপের পর ধাপ। এই সোপানে কোনও চাতাল নেই, জানলা নেই, বাতাস নেই, শুধু ক্ষুরধার খাড়াই। সামান্য অসতর্ক হলেই অনিবার্য পতন। আর সিঁড়ির শেষে এক অবিচ্ছিন্ন মসৃণ জীবন। প্রাচুর্য। আনন্দ। সুখ। অনুরাধার এ জন্মের তৃপ্তি।

না। তৃপ্তি নয়। তৃপ্তি শব্দটাতে এক ধরনের নির্জীবতা আছে। বরং বলা যায় অনুরাধার জীবনের একটা মাইলস্টোন।

অনুরাধা কী ভেবে আজ একটু নরম হল, —সে নয় দেখো। কিন্তু এরকম করলে কি চলবে? আর কদিন বাকি পরীক্ষার?

রাজা মনে মনে হিসেব করছিল, তার আগে অনুরাধাই বলে দিল, —ঊনসত্তর দিন। ঠিক?

রাজা তর্কে গেল না।

অনুরাধা আবার ছেলের মাথায় হাত রাখল, —হ্যাঁরে রাজা, তোর বড় কিছু হতে ইচ্ছে করে না?

—করবে না কেন! নিশ্চয়ই করে।

—কী হতে ইচ্ছে করে?

এ প্রশ্ন অনুরাধা প্রায় রোজই করে ছেলেকে। প্রতিবারই রাজার উত্তর বদলে যায়। আজ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার তো কাল ডাক্তার, পরশুদিন আই এ এস, আই এফ এস্। এর চেয়ে সাধারণ কিছু হওয়ার চিন্তা ছেলেকে করতেই দেয় না অনুরাধা। ছোটবেলায় ছেলে বলত, মিনিবাসের ড্রাইভার হব। এই টিকটিকি, সাইড মার্ সাইড মার্। আরে ও পেরাইভেট্, হঠবি না ভিড়িয়ে দেব? নাতির মুখে অবিকল ড্রাইভারের ভাষা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়তেন অদ্রিনাথ আর প্রতিভা। অনুরাধা চোয়াল শক্ত করে রাগ চাপত। চন্দনকে আড়ালে বলত, এই জন্যই বলি বাড়ি বদলাও। এখানে থাকলে ছেলের নজরটাই নিচু হয়ে যাবে।

চন্দন বলত, ওরে ব্বাস্। এ বাড়ি ছাড়ার কথা বাবাকে কে বলবে? একবার যশোর থেকে শিকড় উপড়ে এখানে এসে বসেছেন, আবার এখান থেকেও?

—বাবা কেন যাবে? তুমি যাবে। তুমি বাবার খাও, না পরো? তুমি যা রোজগার কর তাতে আমরা স্বচ্ছন্দে আলাদা থাকতে পারি।

চন্দন গা করত না। যা যমের মতো ভয় পেত বাবাকে! তিনি মারা যাওয়ার পর তবে ছেলের সাহস হল বাড়ি বদলানোর। রাজার তখন বয়স দশ।

অনুরাধা আবারও ছেলেকে প্রশ্ন করল, বললি না তো কী হবি?

আজ রাজা উত্তরটা যেন ঠিক ভেবে পাচ্ছিল না, খানিকক্ষণ মাথা চুলকে বলল, —উকিল হলে

কেমন হয় মা ? বেশ কালো কোট পরে হাইকোর্টে ঘুরব ! বাড়িতে চেম্বার থাকবে।

অনুরাধার মনঃপূত হল না, —উকিল কেন ? জজ হওয়ার কথা ভাবতে পারিস না ?

—উকিলদের হেভি রোজগার। জজরা সে তুলনায় ভিখিরি মা। দীপের বাবা ক্রিমিনাল লইয়ার। তিন-তিনটে গাড়ি। দুটো মারুতি, একটা কন্‌টেসা। ওদের বাড়ির ইনটিরিয়ার ডেকরেশান দেখলে চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

অনুরাধা বলতে যাচ্ছিল, সে তোর বাবাও করতে পারে। করে না। কিন্তু কেন করে না তা কি ছেলেকে বলা যায় ? চারদিকে এত শকুনের চোখ ! এত গাত্রদাহ !

রাজা বলল, —দীপের পকেটে সবসময় কত টাকা থাকে জানো ? দুশো-পাঁচশো কোনও ব্যাপারই নয়, হাত ঝাড়লে পড়ে যায়।

—সে তো তোমাকেও দেওয়া হয়। একশ-দুশো যখন যা চাইছ। অনুরাধা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ, —উকিল হতে ভাল লাগবে ? দিনরাত চোর গাঁটকাটা খুনি নিয়ে কারবার ! সারাক্ষণ ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলা !

—মিথ্যে কথা বলা দেখিয়ো না মা। পুজোর আগে তোমার ঘাড়ে ব্যথা হল, বড় ডাক্তার ঝাঁ করে বলে দিল স্ক্যান করুন। করে কী পেলে ? লবডঙ্কা। পাঁচ হাজার টাকা ফুঁকে গেল। ডাক্তার কেন স্ক্যান করাতে বলেছিল জানি না ? ওর থেকে তো ডাক্তাররা কমিশন পায়...তাই জেনেশুনে মিথ্যে করে...এই যে গতবার আমরা সাউথ ইন্ডিয়া গেলাম, বাবা তো অসুখ বলে ছুটির দরখাস্ত করেছিল, সেটা মিথ্যে নয় ?

রাজার মুখে ধূর্ত হাসি, অনুরাধা বেজার হল, —ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। উকিলই হয়ো। এখন পড়ো। খাবার দিয়ে ডাকব।

অনুরাধা ড্রয়িংরুমে এল। শব্দ বন্ধ রেখে টিভি চালিয়েছে। এ বছরের সবথেকে জনপ্রিয় সিরিয়াল শুরু হবে। দুই বিত্তশালী পরিবারের সংঘর্ষের কাহিনী। শব্দ না থাকলেও অনুরাধার অসুবিধে হয় না। সে ছবিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে দু বাড়ির আসবাব, শৌখিন বিলাস সামগ্রী, নতুন ধরনের পোশাকআশাক, ক্ষণে ক্ষণে বিজ্ঞাপনের আমন্ত্রণী ঝলক। ইসস, তার আটত্রিশ বছরের জীবনে এখনও কত কিছু পাওয়া বাকি। সব পেতে হবে। সব।

দ্রুত হাতে অন্য চ্যানেলগুলো ঘুরিয়ে দেখে নিল অনুরাধা। সর্বত্রই আজ বর্ষশেষের রংবেরঙি অনুষ্ঠান। অফুরন্ত আনন্দসম্ভার। ছোট্ট শ্বাস ফেলে অনুরাধা সিরিয়ালে ফিরল। এত প্রমোদ, অথচ অনুরাধার চোখ মাত্র দুটো ! কোনটা যে দেখে !

ছোট সোফায় বসল অনুরাধা। এখান থেকে রাজার ঘর স্পষ্ট দেখা যায়। রাজাকেও। ও ঘরে রাজার টেবিল আর এখানে এই ছোট সোফা ওইজন্যই পাতা। সময় কাটানো বলো সময় কাটানো, ছেলের ওপর নজরদারি বলো নজরদারি। রঙিন পর্দায় চোখ রেখেও অনুরাধা দেখতে পাচ্ছিল রাজাকে। অনুরাধার কালো শালে আবৃত রাজার লম্বা বাদামি পিঠ, পিঠের মাঝখানে গভীর খাত, একটু ঠেলে ওঠা কণ্ঠা, ধূসর কালো চোখের মণি, বুকে লোমের আভাস, কচি ঘাসে ভরা রাজার মায়াবী মুখ সবই যেন স্পষ্ট চোখের সামনে। যেন ছেলের শরীরের অংশ নয়, যেন নিজেরই দেহের অন্য ভাগ। নিজের অস্তিত্বের ভিন্ন এক অবয়ব। তাই কি এত মায়া ? এত উদ্বেগ ?

রাত্রি ক্রমশ হিমায়িত হচ্ছিল। শহর জুড়ে আজ এলোমেলো আতসবাজির উচ্ছ্বাস। মহানগরী এখন উৎসবে মাতোয়ারা। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে রাস্তাঘাটে আলোর রোশনাই। জরতী কলকাতা আলোর রুজ লিপস্টিক মেখে ফিরে পেতে চাইছে হারানো যৌবন। আলটপকা বাজির শব্দে চমকে জেগে উঠছে হাজার হাজার ফুটপাথবাসী। পথের শিশু কেঁপে উঠছে ছেঁড়া কাঁথার নীচে। এত আলো এত শব্দেও শীতের কামড় তাদের ছাড়ে না এতটুকু।

রাজা শুয়ে পড়েছে। খেয়ে উঠে টিভির সামনে বসেছিল, বেশিক্ষণ চোখ খুলে রাখতে পারেনি। বর্ষশেষের অনুষ্ঠান দেখার শখ এগারোটার মধ্যেই শেষ।

অনুরাধা টুকটাক হাতের কাজ সারছিল। তরকারির বাটি ফ্রিজে তুলল। মাংসটা তুলতে গিয়েও

কী ভেবে সাজিয়ে রাখল টেবিলে। যদি চন্দন এসে খায়। কেকটা পাতলা কাগজে মুড়ে রাখল ভাল করে। হাতের কাজ সেরে ড্রয়িংরুমে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল অনুরাধা। প্রতিভা বাথরুমে যাচ্ছেন। দেওয়াল ধরে ধরে। সন্তরেই একদম জড়ভরত।

অনুরাধা দু পা এগোল, —একী লাঠি নেননি কেন ? আমি ধরব ?

—না না ঠিক আছে। আমি পারব। প্রতিভা সঙ্কুচিত হলেন, —কবে পূর্ণিমা গো অনু ? ব্যথা এত বাড়ল ?

—ব্যথা বেড়েছে তো বার বার ওঠার কী আছে ? এই তো শোওয়ার আগে বাথরুমে গেলেন।

—আবার পেল যে। প্রতিভা কথা ঘোরাতে চাইলেন, —চাঁদু ফিরেছে ?

অনুরাধা 'না' বলতে গিয়ে চেপে গেল। বুড়ি যদি একবার শোনে ছেলে ফেরেনি, পাঁচ মিনিট অন্তর জ্বালিয়ে মারবে অনুরাধাকে। সে আবার আরেক যন্ত্রণা।

বয়সের তুলনায় প্রতিভার গোলগাল ফর্সা মুখে বলিরেখা কম। ফোলা শরীরে বেঁটে মানুষটাকে আরও ছোটখাটো লাগে। চোখের নীচে সাদা সাদা দুটো চামড়ার থলি। লিভার গেছে। চোখের থলিতে ভাঁজ ফেলে ড্রয়িংরুমের দিকে তাকালেন প্রতিভা, —চাঁদু বুঝি টিভি দেখছে ?

ড্রয়িংরুমে টিভি চলছেই। দু চোখ ভরা ছানি তবু রঙিন আলোর ঝলকানি ঠিক নজরে এসেছে বুড়ির !

অনুরাধা বলল, —টিভি আমি দেখছি। আপনি যান, বাথরুম সেরে শুয়ে পড়ুন।

জবাব নয়, নির্দেশ। প্রতিভা গুটগুট করে বাথরুমে চলে গেলেন।

সোফায় পা তুলে ভাল করে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসল অনুরাধা। এগারোটা চল্লিশ। চন্দন আজ নির্ঘাত পার্ক স্ট্রিটে বসেছে। নয়তো ক্লাবে। অথবা অভিষেকের বাড়িতে। তা বসুক, বাড়িতে হইহল্লা না করলেই হল।

এ বাড়িতে উঠে আসার পর প্রথম প্রথম কয়েকটা আসর বাড়িতেই বসিয়েছিল চন্দন। প্রতিভা নিতান্তই সাধাসিধে মানুষ, ছেলে বাড়িতে মদ্যপান করছে এরকম চিন্তা তাঁর মস্তিষ্কেই আসে না। কোনও সুরার গন্ধই তাঁর চেনা নেই, চেনার সুযোগও হয়নি কখনও। অনুরাধাকেই বন্ধ করতে হয়েছিল ড্রয়িংরুমের আসর। বাধ্য হয়ে।

রাজার তখন ক্লাস ফাইভ। একদিন বাবার বন্ধুরা চলে যাওয়ার পর ক্যাবিনেটের আড়ালে দাঁড়িয়ে গ্লাসের তলানি খাচ্ছিল রাজা। কী লজ্জা ! কী লজ্জা ! যতই হোক ছেলের সামনে বাবাকে বাবা সেজে থাকতে হয়। মাকে মা।

চন্দনও তারপর থেকে যথেষ্ট সতর্ক। সে সহজে মাত্রা ছাড়ায় না, বেহেড তো খুব কমই হয়, বছরে এক-আধদিন। ও সব খেয়ে টেয়ে এলে সাবধানে বেল বাজায়। ভেতরে ঢুকে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে রাজা কী করছে। তারপর সুড়ত করে বাথরুম। জামাকাপড় বদলে পা সোজা রেখে ছেলের দরজায় দাঁড়ায় একবার, ঘড়ঘড়ে কিন্তু স্থির স্বরে প্রশ্ন করে, —হ্যালো প্রিন্স ! কদ্দুর !

চোখ নয়, রাজার মুখ ফেরে বাবার দিকে, লাজুক হাসে, —জগিং বিফোর দা বিগ্ লিপ্।

—এখনও জগিং ? দৌড়োও, দৌড়োও। মাইলস্, টু গো বিফোর ইউ স্লিপ।

রাজা মাথা চুলকোয় ক্ষণকাল, পর মুহূর্তে ডুবে যায় অক্ষরের পৃথিবীতে। চন্দন নিয়ম রাখতে খাবার টেবিলে বসে, একটা কি দুটো রুটি খোঁটে, কি খোঁটে না, চলে যায় বেডরুমে। উহুঁ, একবার থামে। প্রতিভার ঘরের দিকে তাকায়, মা আজ কেমন ? এনি প্রবলেম ? বলেই সোজা ঘর। বিছানা। ঘুম। নাকডাকা। সব মিলিয়ে পনেরো সেকেন্ড।

চন্দন আজ দলে পড়ে বেহেড হয়ে যাবে না তো ? অনুরাধা ত্রস্ত হল। মাতাল হয়ে এলে চন্দনের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। গলা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়বে। দুলে দুলে গান গাইবে, মন যে আমার কেমন কেমন করে। প্রাণেতে সয় না সখি...। অনুরাধাকে চোখ টিপে শোওয়ার ঘরে ডাকবে। কী লজ্জা ! কী লজ্জা ! তারপরই শুরু হবে ভেউ ভেউ কান্না। বমি। অনুরাধা তখন পড়িমরি করে একবার রাজার ঘর বন্ধ করতে ছুটছে ; একবার প্রতিভার দরজা।

টিভিতে নাচগানের খিচুড়ি প্রোগ্রাম চলছে, অনুরাধা উঠে শোওয়ার ঘরে এল। চন্দনের পাজামা

পাঞ্জাবি আগেই বাথরুমে রেখে আসবে। যদি চন্দন আজ সজ্ঞানে না ফেরে !

আলমারি খুলতেই খয়েরি খামটায় চোখ পড়ে গেল অনুরাধার। চন্দন কাল রাত্রে দিয়েছিল, তখন টাকাটা লকারে তোলা হয়নি। মাসে এরকম বিশ-পঁচিশটা খাম আনে চন্দন। আগে খামের মুখ বন্ধ থাকত, আজকাল যারা দেয় তারা আর মুখ আটকানোর প্রয়োজন বোধ করে না। আঠার খরচ বাঁচায়।

খাম খুলে অনুরাধা টাকাগুলো গুনল। নশো। আঠেরোটা পুরনো পুরনো পঞ্চাশ টাকার নোট। নীপা সেদিন বলছিল অভিষেক নাকি মাঝেমধ্যে একটা করে কিউব কিনে রাখছে আজকাল।

অনুরাধা নির্বোধের মতো জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিল, —কীসের কিউব।

—গোল্ড ! পঞ্চাশ গ্রাম। একশো গ্রাম। তোমরা কেনো না ? কেনে অনুরাধাও। গয়না হিসেবে। তবে অত নয়। নীপার কথার ছিরি দেখে গা জ্বলছিল অনুরাধার। নতুন ডিভিশানে পোস্টিং পাওয়ার পর থেকে অভিষেকের খুব রমরমা। ওইটুকু ছেলে, চন্দনের থেকে পাঁচ বছরের জুনিয়ার, তার নাকি জলহস্তীর হাঁ। এই সব ছোটখাটো খাম তার মুখে পড়লে ফুলকপির মতো হারিয়ে যায়। চন্দনের মতো নিয়মমাফিক মাসোহারায় ওই হাঁ বন্ধ হওয়ার নয়। যেখানে সেখানে গুঁতোচ্ছে, যখন তখন খাবলা মেরে পার্টিদের কাছ থেকে টাকা বার করছে ! সে সোনা বানাবে না তো কি চন্দন বানাবে ? নীপাটাও দু কান কাটা। আমার বর ভাই দু হাজার না হলে বাড়িই ফেরে না ! সবার সামনে বলে ' আশ্চর্য ! রাখঢাক গুড়গুড় নেই ' টেরটি পাবে যেদিন ভিজিলেন্স ক্যাঁক করে ধরবে। গত বছরের আগের বছর কী করে যে ভিজিলেন্স সামলেছে চন্দন ! মাত্র দু মাসে চোদ্দো হাজার টাকা জলের মতো গলে গেল। তারপরও কী টেনশান ! তার চেয়ে বাবা বাঁধা পথের মাসিক বন্দোবস্তই ভাল। অথবা অফিসের আনুপাতিক ভাগ।

বাথরুমে জামাকাপড় রেখে বন্ধ কাচের জানলার এপারে এসে দাঁড়াল অনুরাধা। কাচের গায়ে হালকা বাষ্প জমেছে, হাত দিয়ে ভাপটুকু মুছে নিতেই বাইরেটা স্বচ্ছ। জানলার ওপাশে ছোট্ট পাঁচিল, পাঁচিলে বসে একটা বেড়াল জুল জুল করে চারদিক দেখছে, শীতে আশ্রয় খুঁজছে বোধহয়। পাঁচিলের পর রাস্তা। রাস্তার ওপারে এক বিশাল বহুতল হর্ম্য। অনুরাধা তার একতলা থেকে ওপর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ঠাণ্ডায় সব ফ্ল্যাটের জানলাই প্রায় বন্ধ, শুধু ন তলার ব্যালকনি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলোকরশ্মি। আহা, ওরকম উঁচুতে যদি থাকা যেত ! পিছনের উঠোনটুকু হয়তো থাকত না কিন্তু কত উঁচু থেকে দেখা যেত পৃথিবী। পুতুলের মতো ছোট হয়ে যাওয়া মানুষ। বাস। ট্যাক্সি। গাড়ি। মিছিল। পাশের গলি হয়ে যেত সরু সুতো। চওড়া রাস্তা মনে হত শুয়ে থাকা ইস্পাতের পাত।

অনুরাধাদের পাড়াতেই প্রচণ্ড জোরে বোমা ফাটল একটা। উদ্দাম বাজি ফাটা শুরু হয়েছে। দুমদুম দুম দুম। পুরনো বছর শেষ। নতুন বছর শুরু। খিদিরপুর ডকে জাহাজগুলো কি একসঙ্গে ভোঁ বাজাচ্ছে এখন ? ছোটবেলায় জাহাজের ডাক পরিষ্কার শোনা যেত। এখন চারপাশে এত বড় বড বাড়ি ! এত পটকার আওয়াজ !

দরজাতেও বেল বাজছে। চন্দন ফিরল এতক্ষণে। দরজা খুলে অনুরাধা চমকে উঠেছে। চন্দন নয়, চন্দনদের এক পার্টি। নরেন্দ্র শর্মা। এত রাতে এই লোকটা কেন !

—নমস্তে ভাবীজি। আপনাকে একটা খবর দিতে এলাম।

অনুরাধার বুক ধড়াস করে উঠল, কী হয়েছে, কী ব্যাপার ? চন্দন কোথায় ?

—না না, ঘাবড়াবেন না। চন্দনবাবু ঠিক আছেন। লোকটা হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প, চন্দনবাবুকে...একটা জরুরি কাজে..কলকাতাব বাইরে যেতে হয়েছে...হোঁচট খেতে খেতে আচমকাই বাক্যের গতি বাড়াল লোকটা, উনি আজ ফিরতে পারবেন না।

—সেকী ! সকালে তো কিছু বলে যায়নি !

লোকটা যেন চন্দনের হয়ে কৈফিয়ত দিল, —না...মানে...খুব সাডেন তো...

—ফোন করতে পারত !

—চেষ্টা করেছিলেন, লাইন পাননি। তা ছাড়া দুফুর বেলাতেই তাড়াতাড়ি ছুটতে হল তো !

লোকটা ঝট করে অন্যদিকে মুখ ঘোরাল,

—কিচ্ছু ভাববেন না ভাবীজি। দাদা কাল এসে যাবেন।

অনুরাধা আরও কিছু জানার আগেই লোকটা প্রায় দৌড়ে চলে গেছে। গেটের ওপাশে সপাটে একটা গাড়ি বন্ধ করার আওয়াজ হল। ঝড়ের গতিতে স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

দরজা বন্ধ করেও অনুরাধার ঘোর কাটেনি। কী এমন কাজ পড়ল! কোনও বড় রেইড! সদর দপ্তর থেকে টিম এসেছে! আগের বার বার্লিয়া গ্রুপে হানা দেওয়ার খবরটা আগে থেকে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল বলে অগ্রিম সাবধানতা! কিন্তু চন্দন তো কখনও বাড়িতে না বলে যায় না! দুপুরে ফোন করেছিল, পায়নি! অনুরাধা তো আজ সারাদিনই বাড়িতে!

কোনার ঘরের দরজা খুলে গেছে, প্রতিভা পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে, —তাই বলো। চাঁদু তা হলে তখন ফেরেনি?

অনুরাধা শুনতে পেল না। বাইরে একটানা বাজি ফেটেই চলেছে। কলকাতার বাতাস শীতে আর বারুদে মাখামাখি।

নতুন বছর এসেছে।

দুই

—শুনছেন, আমার টাকাটার তা হলে কী হবে?

সাত্যকি নিবিষ্টমনে একটা সাইট প্ল্যান নাড়াচাড়া করছিল। বাইপাসের ধারে তিন বিঘা জমি, ছোট ছোট প্লটে ভাগ করা। কটেজ বানাতে হবে। কুঁড়েঘরের ছদ্মবেশে মধ্যবিত্তের স্বপ্নপুরী।

মুখ তুলে সাত্যকি ভদ্রলোককে দেখল, ঠিক চিনতে পারল না। এই সমস্ত লোক যারা তার অফিসে আসে সবারই প্রায় এক রকম চেহারা। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বয়স। প্রতীক্ষিত মুখচোখ। মাঝে মাঝে স্বপ্নে উদ্ভাসিত, পরক্ষণে ম্লান।

সাত্যকি উদাসভাবে বলল, —আপনার কোনটা বলুন তো?

—বাহ্, তাও ভুলে মেরে দিয়েছেন! মহাবীরতলায় আপনাদের যে ফ্ল্যাট হওয়ার কথা ছিল...আমি থার্ডফ্লোরে ওয়েস্টেরটা বুক করেছিলাম...

সাত্যকির মনে পড়ল গতমাসেও ভদ্রলোক খোঁজ নিতে এসেছিলেন। সম্ভবত স্ত্রীকে নিয়ে। বেচারা! ওই জমিটা নিয়ে এমন আইনি মারপ্যাঁচ শুরু হয়েছে, খুব শীগ্‌গির ওখানে কমপ্লেক্স তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাজল কত নিয়েছিল লোকটার কাছ থেকে? তিরিশ? চল্লিশ? সাত্যকি গলা ওঠাল, —শম্ভু, সাত নম্বর ফাইলটা দিয়ে যা তো।

ম্যাজেনাইন ফ্লোরে ছোট্ট নতুন অফিস। দুটো স্টিলের আলমারি বসিয়ে পার্টিশান করা। একদিকে সাত্যকি কাজল, অন্যদিকে ড্রাফটসম্যান, টাইপিস্ট আর ক্লার্ক কাম আলাদিনের প্রদীপ শম্ভু। সাত্যকিদের জিন। হুকুম করলেই তামিলের জন্য প্রস্তুত।

শম্ভু একটা মোটা গার্ড ফাইল সাত্যকির টেবিলে এনে ফেলল। যে কোনও সমস্যার সময় এই ফাইলটা আনাই দস্তুর। ট্যাক্স রিসিট, বিভিন্ন বিল, টুকিটাকি চিরকুট আর হাবিজাবি কাগজে ঠাসা।

কপট মনোযোগে ফাইল উলটোতে শুরু করল সাত্যকি। টেলিফোনের বিলে এসে থেমে গেল। বাকি পড়ে আছে, দেওয়া হয়নি।

—হুঁ, আপনার প্ল্যানটা তো...করপোরেশানে আটকে আছে বুঝলেন...এত করাপশান। আপনি কত টাকা দিয়েছিলেন যেন? তিরিশ?

—তেতাল্লিশ।

ওরকম একটা বেখাপ্পা অঙ্কের টাকা নিয়েছিল কাজল! বাপের পয়সায় শিকড় গজিয়ে গেছে তবু কাজলটা টাকা পয়সার ব্যাপারে সবসময় এমন উশখুশ করে! কী করে এত টাকা নিয়ে। সাত্যকি পার্টনারের ফাঁকা চেয়ারের দিকে তাকিয়ে নিল, —আপনি তা হলে আর ওয়েট করতে রাজি নন? ফাইনাল?

—হ্যাঁ। আমার টাকাটা দরকার।

—দরকার বললেই কি হয় দাদা! আপনি এক কাজ করুন, একটা অফিশিয়াল চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিন আপনার বুকিং আপনি ক্যানসেল্ করতে চান। আমরাও আপনাকে লিখিত জানিয়ে দেব কবে আপনি ফার্স্ট ইনস্টল্‌মেন্ট পাবেন।

—একী কথা! একবারে দেবেন না! আমার টাকা আগাম গিলে নিয়ে..

পুরনো সাত্যকি হলে এ কথায় খেপে যেত; এই সাত্যকি সহজে রাগে না। হাসতে হাসতে বলল, —আমাদের নিয়ম নেই দাদা। আপনারাও তো দেওয়ার সময় ইনস্টলমেন্টেই দেন, তাই না? তা ছাড়া আমাদের কাছেও কি আর সবসময় ক্যাশ রেডি থাকে? বারোমাস মাল মেটিরিয়ালের পেছনে...এই তো আজ সকালেই তিরিশ হাজার টাকা একটা সিমেন্টের বিল মেটালাম।

সাত্যকি উঠে সাইটপ্ল্যানটা আলমারিতে পুরে রাখল। চাবি আটকে হ্যান্ডেল টেনে দেখল দু বার। নিলামের মাল, সেকেন্ড হ্যান্ড, চাবি ছাড়াই মাঝে মাঝে খুলে যায়।

—চলুন। আমাকে একটু লেকগার্ডেন্সে যেতে হবে। নতুন কনস্ট্রাকশান শুরু হয়েছে, বিকেলের দিকে না গিয়ে দাঁড়ালে স্টকের বড় গণ্ডগোল হয়। সাত্যকি দরজায় দাঁড়াল। রমা মন দিয়ে কী একটা ম্যাগাজিন পড়ছে। টাইপিং ছাড়া সব কাজেই রমার খুব আগ্রহ। পুরনো কমরেডের বোন, কিছু বলাও যায় না। অল্প গলা তুলল সাত্যকি, রমাকে শুনিয়ে বলল, —শম্ভু, রমাদি এখন টেলিফোনের চেকটা টাইপ করে দেবেন, তুই কাল ফার্স্ট আওয়ারেই কাজলকে দিয়ে সই করিয়ে জমা করে দিবি।

নীচে নেমে পানের দোকান থেকে সাত্যকি এক প্যাকেট সিগারেট কিনল। লোকটা এখনও তার সঙ্গ ছাড়েনি, প্যাকেট খুলে সিগারেট বাড়াল লোকটার দিকে, —আরে, এত দুশ্চিন্তা করছেন কেন? টাকা আপনার মার যাবে না। প্ল্যান পাস হলেই কাজ শুরু করে দেব। সাত্যকি যেন খাঁচার টিয়াকে বুলি শেখাচ্ছে, —হয়তো মার্চ। বড়জোর এপ্রিল।

লোকটা তবু নাছোড়বান্দা, —প্লিজ আপনি আমার টাকাটা দেখুন।

লোকটার কাতর চোখের ওপর দিয়ে আরেক জোড়া চোখ মুহূর্তে সরে গেল যেন! দিঘির মতো শান্ত! বরফের মতো ঠাণ্ডা!

সাত্যকি এক ঝটকায় মুখ ঘুরিয়ে নিল, —দিন সাতেক পরে আসুন। দেখি আপনার জন্য কী করা যায়।

হনহন করে হাঁটছে সাত্যকি। ফুটপাথ রাস্তা জুড়ে বৈকালিক বাজার বসেছে। এই এলাকায় উচ্চ মধ্যবিত্ত বাসিন্দা বেশি, এ পাড়ার গিন্নিরা বাজারে না ঢুকে রাস্তা থেকেই কেনাকাটা করতে বেশি ভালবাসেন। সাত্যকি বাজার দোকান পেরিয়ে দেশপ্রিয় পার্কের সামনে এসে দাঁড়াল। আগে কাঁকুলিয়ায় যাবে। লোকটাকে যে কেন মিথ্যে বলল। না চাইলেও এত বেশি মিথ্যে মুখে চলে আসে আজকাল! এটাও কি সাফল্যের শর্ত।

কোথ্‌থেকে এক ফোঁটা জল পড়ল সাত্যকির গায়ে। বৃষ্টি হবে নাকি! বেশ তো দুদিন ধরে হাসছিল আকাশ, হঠাৎ জল কেন! সাত্যকি আকাশের দিকে তাকাল। নাহ্, মেঘ নেই।

রুদ্র আবার কোথ্‌থেকে উদয় হল কলকাতায়!

সাত্যকি পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বার করল। আবার বেশ কয়েকবার মন দিয়ে পড়ল বাক্যগুলো।

শুভ নববর্ষ। আমি এখন কলকাতায়। তোরা কেমন আছিস? রুদ্র।

লম্বাটে ছাঁদের গোটা গোটা অক্ষর। মাত্রাহীন, কিন্তু বিশৃঙ্খল নয়। এই হাতের লেখা এক হাজার বছর পরে দেখলেও চিনে ফেলবে সাত্যকি। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় কত দিন কত রাত একসঙ্গে কাটিয়েছে দুজনে। এক ঘরে। এক বিছানায়। লাজুর সঙ্গেও সাত্যকির প্রথম দেখা ওই রুদ্রর ঘরেই। লাজুর চোখে চোখ রেখে রুদ্র এঙ্গেলসের রচনা থেকে পরিবার প্রথার উৎপত্তি বোঝাচ্ছিল। ...মাতৃ অধিকারের উচ্ছেদ নারীজাতির এক বিশ্বঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালির কর্তৃত্বও দখল করল, নারী হল পদানত, শৃঙ্খলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তান সৃষ্টির যন্ত্র মাত্র।

নারীর এই অবনত অবস্থা যা বিশেষ ভাবে বীর যুগের এবং ততোধিক চিরায়ত যুগের গ্রীকদের মধ্যে পরিস্ফুট, তাই ক্রমে পালিশ এবং আংশিক রূপান্তরণে মোলায়েম হয়েছে, কিন্তু মোটেই লুপ্ত হয়নি। ...

লাজু তন্ময়। রুদ্র অভিনিবিষ্ট। সাত্যকি যে দশ মিনিট ধরে দরজায় দাঁড়িয়ে, কারও খেয়াল নেই।

বেশ খানিকক্ষণ পর রুদ্র দেখতে পেয়েছে, —আরে, তুই কতক্ষণ ? আয়, আয়, ভেতরে আয়, আলাপ করিয়ে দিই। এ হল লাজবন্তী। আমাদের লজ্জা। লাজু। অদ্রিনাথ স্যারের মেয়ে। ...আর এ হল সাত্যকি। আমার মতো বক্তিয়ার নয়, কাজের ছেলে। একা তিনটে নাইট স্কুল চালায়। ইউনিভার্সিটিতে টানা তিন বছর স্টুডেন্ট ইউনিয়নের এক্সিকিউটিভ্ কমিটির মেম্বার।

সাত্যকি রুদ্রর কথা শুনছিল না, তার নিয়তিকে দেখছিল। মাঠের পর মাঠ ভাঙা ধানখেতে স্নিগ্ধ চাঁদের কিরণ যেন। একটু চাপা গায়ের রং। অসম্ভব শান্ত চোখ। গভীর কালো মণি। জোড়া ভুরু। চিবুকে ছোট্ট খাঁজ। কোমর পর্যন্ত লতানো বেণী। ছিপছিপে লম্বা শরীর থেকে অদ্ভুত মোহময় দীপ্তি যেন ছড়িয়ে পড়েছে রুদ্রর ঘরে। সাত্যকির বুক টনটন। পরদিনই নিয়তির টানে ছুটে গেছে অদ্রিনাথ স্যারের বাড়ি। লাজু তাকে দেখে খুশি, খুব খুশি, তবু যেন তার চোখ আরও কাউকে খুঁজছিল পিছনে।

সাত্যকি জুতোর চাপে ঘষে ঘষে সিগারেট নেভাল। রুদ্র বাড়িতে না গিয়ে অফিসে এল কেন ? এলই যদি, পাঁচ মিনিটও কেন অপেক্ষা করল না ? এতদিন পর এসে শুধু একটা চিরকুট রেখে চলে গেল ?

বছর সাতেক আগে রুদ্র একদিন আচমকাই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। প্রথম তার খোঁজ মিলল চার বছর পরে। মধ্যপ্রদেশের বয়লাডিলায় একটা কারখানায় কাজ করছে। সাধারণ চাকরি। ব্যাস, তারপর আর কোনও খবর নেই। খবর নেই ? না খবর নেয়নি সাত্যকি ? ইচ্ছে করে ?

দেড় বছর আগে হঠাৎ একদিন খবরের কাগজের শিরোনাম রুদ্র। শ্রমিকনেতা রুদ্র দাশগুপ্ত মজুরদের মদ খাওয়া ছাড়িয়ে সেই পয়সায় গড়ে তুলছে ছোট্ট হাসপাতাল। শ্রমিকদের জন্য স্কুল তৈরি করেছে। লাজুই ঘুম থেকে তুলে খবরটা দেখিয়েছিল সাত্যকিকে। সকালের প্রথম রোদ্দুর ফেটে পড়ছিল লাজুর চোখমুখে, —আমি জানতাম। আমি জানতাম রুদ্রদা একদিন উঠবেই।

পলকে সাত্যকি বিবর্ণ, —আমারও কাগজে নাম ওঠে। আমিও কিছু কাজ করি।

—এ মা, তুমি তুলনা করছ কেন ?

কেন যে তুলনা তা যদি লাজু বুঝত !

সাত্যকি কুটিকুটি করে ছিঁড়ল চিরকুটটা। দলা পাকিয়ে ছুড়ে দিল জঞ্জালের দিকে। আদর্শ। শোষণমুক্তি। সাম্য ! সব সব দেখা হয়ে গেছে সাত্যকির। রুদ্র যদি এখনও পুঁথির জগতে পড়ে থাকতে চায় থাক, সাত্যকি কেন থাকবে ? সে যা পরিশ্রম করেছে তার বিনিময়ে এটুকু ক্ষমতার মাংস কি তার প্রাপ্য নয় ?

সাত্যকি বাসে উঠতে গিয়েও উঠল না। সুকুমার অফিসে ফোন করেছিল। একটা এইট্টিটুর মডেল এসেছে। অ্যাম্বাসাডর। গাড়িটা আজই দেখতে হবে। আজই।

সুকুমার গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, সাত্যকিকে দেখে তাড়াতাড়ি বিড়ি নেভাল। আঙুল তুলে বলল, —ওই পেছনেরটা স্যার। সবে বডির কাজ হয়েছে। তিনটে টায়ার ব্র্যান্ড নিউ। রংটা কী সুন্দর হয়েছে দেখেছেন ? সি গ্রিন্। তাকালেই চোখের আরাম হবে।

সমুদ্রনীল কাকে বলে সাত্যকি জানে না। সে বর্ণান্ধ। এই পৃথিবীর কোনও রংই সঠিক ভাবে চিনতে পারে না সে। লাল না। সবুজ না। নীল না। ডাক্তার বলেছিল জিনের ত্রুটি। কোনও ওষুধেই সাত্যকি লাল আর সবুজকে পৃথক করতে পারবে না। দৃষ্টির এই দুর্বলতার কথা কাউকে বলেনি সাত্যকি। লাজুকেও না। তার কাছে রং মাত্র দুটো। সাদা আর কালো। না, আরেকটা আছে। ধূসর।

সাত্যকি গাড়িটায় বেশ খানিকক্ষণ চোখ বোলাল, —কত চাইছে ?

—বলছে ষাট। দেখুন না আপনার চয়েস হলে দু-চার হাজার টাকার জন্য আটকাবে না।

সাত্যকি ভেতরে ভেতরে অসহায় বোধ করছিল। গাড়িরও সে কিস্যু বোঝে না। কিন্তু এ কথা তো সুকুমারকে বুঝতে দেওয়া যায় না। ওস্তাদ জহুরির মতো বলল, —বাইরে থেকে দেখে কি আর হালত বোঝা যায় সুকুমার ? বাজিয়ে দেখতে হয়। আমি বরং কাল-পরশু একবার এসে একটা চক্কর মেরে যাব।

—কাল কেন স্যার ? এখনই ঘুরে আসুন। আজ শুভ দিন ! বছর শুরু হচ্ছে !

সাত্যকি ঘড়ি দেখল। ছটা পঁচিশ। চন্দনদার বাড়ি হয়ে একবার লোকাল কমিটির অফিসে যেতে হবে। অমরদা টাইম দিয়েছে, ঠিক আটটায় আসবে।

—না থাক। আমার হাতে আজ অনেক কাজ।

—কোথায় কাজ ? কদ্দুর ?

—আগে একটু কাঁকুলিয়ায় যাব। তারপর সেখান থেকে..

—আসুন না স্যার, আপনাকে কাঁকুলিয়ায় পৌঁছে দিয়ে আসি। আপনার সময় বেঁচে যাবে, গাড়িটাও দেখে নেবেন।

সাত্যকি জোর করে না বলতে পারল না। গাড়িতে বসে সিগারেট ধরাল।

স্টার্ট দিয়ে সুকুমার নিজেই উল্লসিত, —সেলফটা দেখলেন স্যার ? চাবি ছোঁওয়াতেই স্টার্ট। গিয়ার দেখুন। পালক।

ঝট করে গাড়ির স্পিড বাড়াল সুকুমার, —এই হল পিক্‌আপ। পক্ষীরাজ। বলুন, কোন রাস্তা দিয়ে যাব ? পূর্ণদাস ? না সাদার্ন অ্যাভেনিউ ?

টিপিকাল দালাল ! সাত্যকি মনে মনে হাসল, মুখে বলল, —সাদার্ন অ্যাভেনিউ ধরো।

লেকের ধারে এসে সুকুমার আরও স্পিড তুলেছে, —চলছে কোনও শব্দ পাচ্ছেন ইঞ্জিনের ? গরগর নেই, ঢ্যাঢ্যা নেই, এক্কেবারে মাখন। প্রচুর খরচ করেছে স্যার। বুশ নতুন। সাস্‌পেনশনে কাজ হয়েছে। এখন আপনি আঠেরোটা মানুষ, একটা ছাগল, তারপর দুটো পানের বস্তা সব তুলে ফেলুন, গাড়ি একটুও বসবে না।

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসছে সুকুমার। সাত্যকি দূরমনস্ক। শব্দহীন মসৃণ চলা মানেই কি ইঞ্জিন খুব ভাল ? তার আর লাজুর মাঝে তো কোন গরগর ঢ্যাঢ্যা নেই, একদিনও উচ্চগ্রামে তর্ক ঝগড়া করেনি তারা। তবু সম্পর্ক মসৃণ কই ! নৈঃশব্দ্যের মধ্যেই হয়তো আরও গভীর অসুখ লুকিয়ে থাকে।

ফাঁকা রাস্তায় অকারণে দু-তিন বার ব্রেক চাপল সুকুমার। সাত্যকি সামনে মুখ থুবড়ে পড়ছিল, কোনওক্রমে সামলাল নিজেকে। সুকুমারের ভ্রূক্ষেপ নেই, —আঃ। কী ব্রেকশু ! আমি গ্যারান্টি দিতে পারি স্যার, এ মল্লিকবাজারের মাল নয়, খোদ কোম্পানির মাল। বলেই সুকুমার স্টিয়ারিং থেকে হাত ছেড়ে দিল। সাত্যকি হাঁহাঁ করে উঠতে যাচ্ছিল, সুকুমার চেপে বসিয়ে দিয়েছে তাকে, —সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকুন। গাড়ি একটু বাঁদিকে বা ডানদিকে টাল খেলে আমাকে জুতোপেটা করবেন।

সুকুমার নিজের খেয়ালে ক্লাচ ব্রেক গিয়ার স্টিয়ারিং-এর খেলা দেখিয়ে চলেছে। সাত্যকি হাল ছেড়ে বসে ছিল, গোলপার্কে এসে চেঁচিয়ে উঠল, —এই দাঁড়াও দাঁড়াও। বাঁদিকে সাইড করো।

এক ভিডিও পার্লারের সামনে রাজা। সঙ্গে দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। উত্তেজিত ভাবে হাত পা নেড়ে কথা বলছে চারজন। যখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে থাকে ছেলেটার মূর্তি একেবারে অন্যরকম, অথচ বাড়িতে কী নিরীহ ! এসপ্ল্যানেডের সিনেমা হলের সামনে কদিন আগে রাজাকে দেখেছিল সাত্যকি, ইংরিজি বই দেখে বেরোচ্ছিল রাজা। ভিড়ের মধ্যে তিন-চার জন বন্ধু মিলে অশালীন হাসিতে ফেটে পড়ছিল বার বার। সেদিন সাত্যকি লুকিয়ে পড়েছিল, আজ এগিয়ে গেল। রাজাও দেখেছে সাত্যকিকে। বন্ধুদের দিকে ফিরে বিচিত্র ভঙ্গিতে বলল, —চাম্মাও। টিল ডে আফটার টুমরো।

সাত্যকি রাজার কাঁধে হাত রাখল, —হ্যাপি নিউইয়ার। খুব আড্ডা হচ্ছিল আঁ ? আমার জন্য

ভেস্তে গেল তো ?

—আর আড্ডা। রাজা হাত ওলটাল —নিউইয়ার মানেই তো এগজামের খাঁড়া।

—হাইকমান্ড অর্ডার ঝুলিয়ে দিয়েছে বুঝি ?

—আজকে একটু ছাড় ছিল। নতুন বছর বলে।

রাজার হাত ধরে গাড়ির দিকে টানল সাত্যকি, —বোসো। সামনের দোকান থেকে একটু মিষ্টি কিনে আনছি। তোমাদের বাড়িই যাব।

সাত্যকি যখন ফিরল তখনও রাজা জরিপ করছে গাড়িটাকে। পিছনের সিটে বসে শরীর ছেড়ে দিল, —তুমি কিনলে নাকি পিসেমশাই ?

—ভাবছি। কেমন দেখছ ? কিনে ফেলব ?

—কিনতে পারো। রাজা ঠোঁট কুঁচকোল, —বাট নাথিং লাইক মারুতি। অ্যাম্বাসাডার কেমন ঢ্যাপড্যাপে। বুড়োটে।

সুকুমারের আঁতে লাগল, —কিন্তু জানটা তো কড়া ভাই।

—আপনারা জান নিয়েই থাকুন। উই নিড স্পিড। স্পিড। মোর স্পিড। রাজা যেন গাড়িতে বসে বসেই ছুটছে, —তারপর পিসেমশাই, তোমার কী খবর ?

—কী খবর জানতে চাও ?

—আরও কটা প্যালেস বানালে ? পিসিমণি তো বলে তুমি এখন শুটিংস্টার। উঠছ। ওঠাচ্ছ।

সাত্যকি মৃদু হাসল। শুটিংস্টার যেমন হুহু করে ওঠে, নিভেও যায় ঝটপট। লাজু কি সেরকমই ইঙ্গিত দিতে চায় !

গাড়ি থেকে নেমে সাত্যকি সুকুমারকে ছেড়ে দিল। অনুরাধা দরজা খুলতে রাজা সাঁ করে ভেতরে ঢুকে গেছে। নিজের ঘরে একবার ঢুকেই বেরিয়ে এল,—পিসেমশাই গাড়ি কিনছে মা। অ্যাম্বাসাডর।

অনুরাধা মিষ্টির বাক্স ডাইনিংটেবিলে রাখছিল। আলগাভাবে বলল, —তাই। ভাল তো।

অন্য দিন সাত্যকিকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে অনুরাধা, আজ সে কেমন অন্যমনস্ক। নিষ্প্রাণভাবে বলল, —তুমি চা খাবে তো ভাই ?

—আপনার হাতের চায়ে আমার তো কখনও না নেই বউদি। সাত্যকি মিটিমিটি হাসছিল, —মা কোথায় ?

—ঘরে। যাও না। অনুরাধা উঠে গেল।

প্রতিভার হাতে তুলসীমালা, বিড়বিড় করে জপ করছেন। সাত্যকির গলা পেয়ে ভীষণ খুশি, —তুমি একা এলে নাকি ? লাজু আসেনি ?

—আমি তো অফিস থেকে আসছি।

—লাজু ভাল আছে তো বাবা ? ঠাণ্ডার সময় ওর আবার সর্দিকাশিটা বাড়ে। একেবারে বাপের ধাত পেয়েছে মেয়ে। হাঁপটাপ ওঠেনি তো ?

—না। এখন ঠিক আছে। সাত্যকি টুল টেনে বসল, —আমি আপনাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছি। দশ তারিখে মার বাৎসরিক, সবাইকে যেতে হবে। আপনাকেও।

—ও মা, দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেল ! প্রতিভা ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন, —দিন যায়, না ঝড় যায় ! তোমার বাবার শরীর ঠিক আছে তো বাবা ?

—ওই একরকম। বাবা পরশু বহরমপুর গেছেন। মামার বাড়িতে। ভাবছি মার কাজ হয়ে গেলে বাবাকে কদিন ব্যাঙ্গালোরে পাঠিয়ে দেব। ভাইয়ার সঙ্গে।

—তোমার ভাই এসে এবার থাকছে তো কদিন ?

—কই আর। বলে অফিসে একদম ছুটি নেই। গত বছর পুরো দেড়মাস ছুটি নিয়ে ফেলেছে। মার অসুখের সময়...

—ছেলেটার বিয়ে দাও এবার। দূর বিদেশে একা একা থাকে... চাকরিও তো বেশ ভালই পেয়েছে।

—কম্পিউটারের চাকরি। ওদেরই তো যুগ এখন। ও তো খুব জেদ করছে বাবাকে কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে রাখবে বলে।

—তা কেন ? দুই ছেলের কাছেই বাবা ভাগাভাগি করে থাকুন। লাজুও তো দেখি খুব বাবা বাবা করে। ওর অবশ্য দেওরের ওপরেও টান খুব।

সাত্যকি চাপা শ্বাস ফেলল। সকলের ওপরই লাজুর খুব টান, এক সাত্যকি ছাড়া।

অনুরাধা খাবার টেবিলে ডাকছে সাত্যকিকে, —এসো ভাই।

সাত্যকি প্রতিভার ঘর আড়াল করে সিগারেট ধরাল, —আপনি কিন্তু অবশ্যই যাবেন বউদি। চন্দনদাকেও বলবেন। রাজা, তুমিও কিন্তু...

—ওকে বাদ দাও। অনুরাধা চা এগিয়ে দিল, —আজ বাদে কাল পরীক্ষা।

—পরীক্ষা তো থাকবেই বউদি, তা বলে আত্মীয়স্বজনের কাজেকর্মে দাঁড়াবে না ?

অনুরাধা অল্প সহজ হয়েছে, —তুমি তো ভাই পার্টিটার্টি করো, আগে তো এ সব আচার আচরণ, ঠাকুরদেবতা কিছু মানতে না ? এখন বুঝি খুব ভক্তি এসেছে ? অফিসে গণেশলক্ষ্মী রেখেছ ?

কী যে মানে, আর কী যে মানে না, তা যদি সাত্যকি জানত ! কোনও মানুষই কি জানে ! আচরণের জন্য বিশ্বাস ? না বিশ্বাসের জন্য আচরণ ? নাকি প্রকৃত জীবনে বিশ্বাস আচরণ দুটোই সমান মূল্যহীন ?

সাত্যকি আমতা আমতা করল, —বোঝেনই তো বাবার সেন্টিমেন্ট,...বুড়ো মানুষ, আজ আছে কাল নেই...চা শেষ করে সাত্যকি কাপ নামিয়ে রাখল, —চন্দনদা কখন ফিরবেন বউদি ? রাত হবে ?

একটা পলকা ছায়া পড়েই নিমেষে মিলিয়ে গেল অনুরাধার মুখ থেকে, —ও তো ভাই কাল দুপুরে অফিসের কাজে বাইরে গেছে।

—কাল দুপুরে ! সাত্যকি হাঁ, —আমি যে চন্দনদাকে কাল রাত্তিরেও দেখলাম পার্ক স্ট্রিটে। ...হ্যাঁ, কালই তো। সঙ্গে দুজন লোক ছিল।

সহসা অনুরাধার মুখ থেকে যেন রক্ত শুষে নিল কেউ। ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে আছে সাত্যকির দিকে, — তুমি ভুল দেখেছ।

—আমি ভুল দেখলাম ! চন্দনদা একটা ডিপ কালারের ফুলস্লিভ সোয়েটার পরে ছিল ! সেই যে লাজুর বোনা ! কটা হবে তখন ? সাড়ে নটা, দশটা ! চন্দনদা...সাত্যকি আচম্বিতে সামলে নিল নিজেকে। কাল যে অবস্থায় চন্দনকে দেখেছে, তা কি অনুরাধাকে বলা উচিত ? বার থেকে বেরিয়ে টলমল পায়ে হাঁটছিল, হাঁটতে হাঁটতে তিন মক্কেল একটা ফিয়াটে উঠল। মাত্র দু পা দূরে সাত্যকি দাঁড়িয়ে, তাকে দেখতে পর্যন্ত পেল না।

রাজা টেবিলে বসে কথা গিলছিল, বলল, —তুমিও পার্ক স্ট্রিটে ! ওযাও ! খুব নিউইয়ার্স ইভের পার্টি হচ্ছিল।

সাত্যকি গালে হাসি ফোটাল, —দুই চাইকে ডিনার খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। করপোরেশানের।

সাত্যকি লক্ষ করছিল অনুরাধা তাদের কথা একদমই শুনছে না। ভীষণ চিন্তিত। বিড়বিড় করে বলল, —সত্যিই তুমি ওকে কাল দেখেছ ? চোখের ভুল নয় ?

রাজা মুচকি হাসল, —নিউইয়ার্স ইভে পার্ক স্ট্রিট সন্ধে থেকে দোলে মা। আর রাত বাড়লে তো গোটা এলাকা জল পুলিশের আন্ডারে চলে যায়। নিজেকেই তখন অন্য লোক বলে ভুল হয়, তাই না পিসেমশাই ?

সিগারেট ছাড়া সাত্যকির কোনও নেশা নেই। কদাচিৎ মদ স্পর্শ করেছে সে। তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে ওইটুকু বাচ্চা ছেলে ! অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে বিরক্তিটা হজম করল সাত্যকি, —তাই হবে বউদি। আমি বোধহয় ভুলই দেখেছি। আসি।

সাত্যকির পিছন পিছন অনুরাধাও বাইরে বেরিয়ে এসেছে। দরজা থেকে বাড়ির ভেতরটা সন্তর্পণে দেখে নিল। অকস্মাৎ সাত্যকির হাত চেপে ধরেছে, —তুমি সত্যি কাল রাতে ওকে দেখেছিলে ?

রাজনীতি সাত্যকিকে অনেক কিছুই শিখিয়েছে। কোথায় বিপদের গন্ধ, কোথায় বা রহস্যের সবই অগ্রিম আঁচ করতে পাবে সে। সাত্যকি অনুরাধার চোখে চোখ রাখল, —কী ব্যাপার বলুন তো বউদি ? আপনি কি কিছু আশঙ্কা করছেন ?

অনুরাধা ফিসফিস করে বলল, —কাল ও মেরুন সোয়েটারটাই পরেছিল। তারপর লোকটা এসে রাত্তিরে খবর দিয়ে গেল...

—কে লোক ? কীরকম দেখতে ?

—ওদের এক পার্টি। শর্মা। মাঝারি হাইট। মোটাসোটা।

—নরেন্দ্র শর্মা ? কী বলে গেছে ?

—বলল তো অফিসট্যুরে দুপুরবেলাই নাকি...

—তা হলে চিন্তা করছেন কেন ? আমার মনে হচ্ছে আমি ভুলই দেখেছি।

—তুমি আমাকে ভোলাতে চাইছ ভাই। আজ সন্ধেবেলা ওর অফিসের এক কলিগ এসেছিল, খুঁজছিল ওকে।

—রাজনীতির শিক্ষা প্রয়োগ করছিল সাত্যকি। খুঁটিয়ে খুটিয়ে সব কথা জানতে হবে। অতি সতর্কভাবে। গলার স্বর তরল করল, অফিসের কে ? কী নাম বলুন তো ?

— অভিষেক। তুমি বোধহয় চেনো। অভিষেক দত্ত। আগের বছর রাজার জন্মদিনে দেখেছ।

— অ। সেই মাল ? সন্ধের পর যার চা কফি চলে না ? সাত্যকি কুশলী অভিনেতার মতো হাসল, লোকটা যখন এসেছিল, সেঙ্গে ছিল তো ? চন্দনদা বলছিল ও নাকি অফিসেও টঙ হয়ে থাকে ? ওর কথা ধরে আপনি....

— না ভাই। আমার যেন কীরকম লাগছে। আজও তো এখনও ফিরল না ! অনুরাধার গলা কাঁপছে, তুমি ভাই কাল একটু খোঁজ নেবে ?

— নেবখন। অভয় দিতে গিয়ে সাত্যকি এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করছিল। জোরে শ্বাস টানল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বউদি। আমি ভুলই দেখেছি। যাকে দেখেছি সে লোকটা বেশ লম্বা, চন্দনদা অত লম্বা নয়।

পার্টি অফিস ঘুরে বাড়ি ফিরতে সাত্যকির রাত হল। বেল বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে লাজুই দরজা খুলেছে।

— সরি। সাত্যকি কাঁধ ঝাঁকাল, অমরদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল। পঙ্কজ ঘুমিয়ে পড়েছে ?

— হুঁ। লাজু যথারীতি ভাবলেশহীন, তোমাদের পুরুত এসেছিল। কাল সকালে আসবে আবার।

— কটায় আসবে ?

— বলল তো অফিস যাওয়ার পথে ঘুরে যাবে।

লাজু ঘরে চলে গেল। ঘর থেকেই বলল, টেবিলে তোমার খাবার ঢাকা আছে, গরম করে দেব ?

—দরকার নেই। সাত্যকি বিষণ্ণ মুখে জুতো খুলছিল। লাজুর কর্তব্যে কোথাও ত্রুটি নেই। সকাল থেকে নীরবে সমস্ত কাজ করে যায়। চা জলখাবার, রান্না, ঘর পরিষ্কার, শ্বশুরসেবা। দুপুরে ন্যাশনাল লাইব্রেরি। বিকেল সন্ধেয় টিউশনি। নিয়মিত বস্তির বাচ্চাদের নিয়ে পাঠশালাও বসায় এর মধ্যেই। সব নিখুঁত। শুধু তার কাছেই এত শীতল ! এত নিষ্প্রাণ !

ঘাড় গুঁজে সাত্যকি খেয়ে নিল। বাথরুমে যাওয়ার সময় আড়চোখে দেখল পঙ্কজকে। রান্নাঘরের সামনে ক্যাম্পখাট পেতে পরিপাটি বিছানায় মশারি খাটিয়ে ঘুমোচ্ছে বাচ্চাটা। গায়ে ওয়াড় পরানো লেপ। বাড়ির কাজকর্ম করার জন্য দাসপুর থেকে ছেলেটাকে আনিয়েছিল সাত্যকি। কাজে তো অষ্টরম্ভা, ইনি এখন লাজুর পোষ্যপুত্র হয়েছেন। সকাল বিকেল বই নিয়ে পড়তে বসছে, সাত্যকি সিগারেট আনতে বললেও লাজুর মুখের দিকে অনুমতির জন্য তাকায় ! কী স্পর্ধা !

সাত্যকি শুতে এসে দেখল লাজু মশারির ভেতর বুক অব্দি লেপ টেনে পড়ছে। এভাবেই অর্ধেক

শুয়ে বই পড়া লাজুর পছন্দের অভ্যাস। বিয়ের পর কত রাত ওই ভঙ্গিতে বই পড়েছে লাজু, সাত্যকি তাকে জড়িয়ে ধরে আলো নিভিয়ে দিয়েছে। আজ কেন পারে না!

সাত্যকি ইজিচেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল, আজ একটা অ্যাম্বাসাডার দেখে এলাম, সেকেন্ডহ্যান্ড, কিন্তু বেশ ভাল।

লাজু কথা বলল না।

— আমি ভাবছি মারুতি নেব। আই ওয়ান্ট স্পিড। স্পিড। মোর স্পিড। রাজার মতো করে বলতে গিয়ে গলাটা কেমন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল সাত্যকির।

লাজু নিঃশব্দে বই-এর পাতা ওলটাল, পুরুতমশাই ফর্দ দিয়ে গেছে। আমি কিনে আনব? না বাবা বহরমপুর থেকে ফিরে কিনবেন?

জানলার ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার সরু স্রোত আসছিল একটা, সাত্যকি উঠে টেনে বন্ধ করল জানলাটা। ছিটকিনি আটকে পর্দা টেনে দিল, যা হয় কোরো। আমি টাকা রেখে যাব। বলেই হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে এমনভাবে বলে উঠল,—ওহো, তোমাকে তো কথাটা বলাই হয়নি। দারুণ এক্সাইটিং নিউজ। তুমি শুনলে চমকে উঠবে।

লাজু ঘাড় ঘোরাল।

—রুদ্র এসেছে বুঝলে। রুদ্র এসেছে কলকাতায়।

দমদেওয়া পুতুলের চোখে আলো ঠিকরে উঠল,— তাই! কবে। বলেই দপ করে নিভে গেছে লাজু।

সাত্যকি ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় চোখ রাখল। লাজু কি কখনও ভালবেসেছিল সাত্যকিকে! নাকি রুদ্রর হুকুমে ঘর বসিয়েছে শুধু! সাত্যকির বুকে একটা কষ্ট হচ্ছিল। এই মুহূর্তে ওই পুতুলটাকে যদি ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখা যেত। বহু কষ্টে আদিম রিপুকে সংযত করল সাত্যকি। চিবিয়ে চিবিয়ে গুঁড়ো করল ক্রোধটাকে। সিগারেট শেষ করে বিছানায় ঢুকল। লাজুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, তোমার বউদিটা এক নম্বরের মিথ্যেবাদী।

লাজু বই পাশে রাখল,—কেন?

— বেমালুম বলে দিল তোমার দাদা কাল দুপুরে অফিসের কাজে বাইরে গেছে!

— যেতেই পারে। যায় তো।

— না পারে না। আমি কাল রাত দশটায় তোমার দাদাকে স্বচক্ষে দেখেছি। পার্ক স্ট্রিটে মাল খেয়ে গড়াচ্ছিল।

লাজু নীরব।

সাত্যকি নতুন খোঁচা দিল, তোমার ভাইপোটিও বেশ হেক্কড় হয়েছে। বাপের ঘুষের পয়সা দুহাতে ওড়াচ্ছে। ওইটুকু কড়ে আঙুলের ছেলে, গোঁফ ওঠার আগেই পেকে ঝুনো। তোমার বউদিও লাই দিয়ে দিয়ে তাকে মাথায় তুলছে। বুঝবে পরে।

সত্যি মিথ্যে মিলিয়ে হিংস্র আক্রমণও রাজনীতিরই শিক্ষা। তবু কেমন অসহায় বোধ করছিল সাত্যকি। মাত্র এক হাত দূরে তার প্রিয় নারী, তবু যেন লক্ষ যোজন ব্যবধান।

লাজু বরফ চোখে সাত্যকিকে দেখছিল। ওই দৃষ্টি এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারে না সাত্যকি। ভেতরের গুঁড়ো গুঁড়ো ক্রোধ সাত্যকি থুথু করে ছিটোল, তোমার পেয়ারের দাদা কোথায় গিয়ে ফুর্তি মেরে বেড়াচ্ছে কে জানে। এক নম্বরের তিলে খচ্চর।

— রতনে রতন চেনে। লাজু বেডসুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল।

তিন

বাতাস নেহাতই এক নিরীহ গ্যাসীয় পদার্থ। গরম বাতাস হালকা হয়ে ওপরে ওঠে, তার জায়গা নিতে ছুটে আসে শীতলতর বাতাস। কোথাও বাতাস সামান্য কেঁপে উঠলে সেই কম্পন একটু একটু করে বাড়তে থাকে, ছড়িয়ে যায় স্তর থেকে স্তরান্তরে। ভূমধ্যসাগরের ওপারে একটা মথের ডানা

ঝাপটানি বদলে দিতে পারে ভারতে মৌসুমী বায়ুর গতিপ্রকৃতি। অথচ দুদিন ধরে একটা সাড়েনশো স্কোয়্যার ফিট বাড়ির বাতাস কখনও তপ্ত হচ্ছে, কখনও শীতল, তবু নড়ছে না এতটুকু! এই বদ্ধ ভ্যাপসা ভাবের উৎস কোথায়?

রাজা মনে মনে উত্তর খুঁজছিল। বাতাসের উপাদান, বাতাসে নাইট্রোজেন অক্সিজেনের অনুপাত, সেই অক্সিজেন কখন বাড়ে কমে, কোথায় বাড়ে কমে সবই তার মুখস্থ। কিন্তু নিজের বাড়ির ওই নিথর বাতাসের চরিত্র সে চেনে না। শুধু একটা সুপ্ত সংশয় ডেয়ো পিঁপড়ের মতো ঘুরছে তার স্নায়ুতন্ত্রীতে।

বাবা কি তা হলে সত্যিই অফিসট্যুরে যায়নি!

তিতির একটা গাড়ির বনেটে উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙল, এই সৌভিক, দ্যাখ্ না এখনও তিনটের শিফট্ শেষ হল না কেন!

অন্য দিন রাজাই এসময় বেশি ছটফট করে, আজ সে উৎসাহ পাচ্ছিল না। দায়সারা উত্তর দিল, ভগবান জানে।

মৌচাকের চারপাশে উড়তে থাকা মৌমাছির মতো বিনবিন করছে এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে। সরু গলি জুড়ে। কথা বলছে। হাসছে। তর্ক করছে। আগতপ্রায় পরীক্ষা নিয়েও আলোচনাতে ব্যস্ত কেউ কেউ। সামনেই দোতলায় আধুনিক চতুষ্পাঠী। আড়াই হাজার টাকায় ভাড়া নেওয়া থ্রিরুম ফ্ল্যাট। সকালে অঙ্ক বিজ্ঞান, বিকেলে ইংরিজি বাংলা। দুই শিক্ষক এভাবেই ভাগ করে নিয়েছেন সময়কে। ভাড়াটাও। তিন ঘরে একই সঙ্গে তিনটে ক্লাস নেন তাঁরা। ব্যাচ অনুযায়ী। শিফ্‌টে শিফ্‌টে। অনেকটা মাইকেল মধুসূদনের মতো একসঙ্গে একাধিক কাব্যের ডিক্‌টেশান দেওয়ার পেশাদারি দক্ষতায়।

কণাদ হিড়হিড় করে বনেট থেকে টেনে নামাল তিতিরকে, কী হচ্ছে কী অ্যাঁ? অন্যের গাড়ির ওপর উঠে?

তিতির সভয়ে এদিক ওদিক তাকাল, গাড়িঅলা দেখছে নাকি?

— যেদিন দেখবে, এসে রগড়ে কান লাল করে দিয়ে যাবে।

— ইশশ্, অত সস্তারে! তিতির কানের পোড়ামাটির দুলে হাত বোলাল,— এই, আমরা খুব পাবলিক নুইসেন্স হয়ে যাচ্ছি নারে?

— যে কোনও দিন এ পাড়ার লোক আমাদের নামে কেস ঠুকে দেবে। বলবে শব্দদূষণ হচ্ছে।

তিতির তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল, আমাদের এগেনস্টে কেন কেস করবে? কারখানার মালিকদের এগেনস্টে করুক! স্যারেদের নামে করুক! শিফ্‌টের পর শিফ্‌ট চলবে, নো সাউন্ড, নো ধোঁয়া, তা কি হয়? আমরা তো শুধুই রমেটিরিয়াল।

সাগ্নিক আর অয়ন এক পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, অয়ন তিতিরকে শুধরে দিল,— একদম কাঁচামাল নয়, অলমোস্ট ফিনিশ্‌ড্ প্রোডাক্ট। লাস্ট পলিশিং চলছে।

— পলিশিং বলে পলিশিং? সাগ্নিক গজগজ করছে,— সকাল থেকে রাত্তির শুধু ঘষা আর ঘষা। কবে যে পরীক্ষাটা শেষ হবে!

কণাদ জিজ্ঞাসা করল, তোর ওয়ার্ক এডুকেশান কদ্দুর? সেই ট্রানজিস্টার?

— আমি এখন ও সবে হাত লাগাব না। দাদার এক বন্ধু আছে, ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, ওর এ সব রেডিয়ো টিভিতে হেভি ফান্ডা, ওই বানিয়ে দেবে বলেছে।

দেবলীনা কাঁধের ব্যাগ বনেটে রাখল, নিজেরা করতে পারিস না এমন প্রোজেক্ট নিস কেন রে? অয়ন তো নিজে নিজে টেবিলল্যাম্প বানাচ্ছে, তুইও তাই করতে পারতিস্।

— বকিস না তো। মেয়ে মেয়ের মতো থাক। তোদের তো শুধু স্টিচিং আর নিটিং! মোজা বানানো আর টুপি বানানো! তোরা এ সব কি বুঝবি রে?

— না বোঝার কী আছে। বাজার থেকে পার্টস কিনে এনে শুধু সোল্ডারিং, ও তো শিশুদের কাজ। দেবলীনাও দমবার পাত্রী নয়,— পাঞ্চালী তো নিজে নিজেই একটা রেডিয়ো বানিয়েছে। ওয়ার্ক এডুকেশনের জন্য নয়, এমনিই।

তিতির দেবলীনার সমর্থনে এগিয়ে এল, রাইট, ছেলেদের সব কাজই আমরা করতে পারি। তোরা কেউ উলের কাঁটা ধরতে পারবি ? একটা সোজা একটা জোড়া বুনে পেছনের ঘর সামনে দিয়ে ফেলতে পারবি ? উলটো বুনতে গেলে ডানহাতের কাঁটা কোন দিকে আসবে ? সামনে ? না পেছনে ?

— একী রে ! এ যে ধাঁধা দিচ্ছে রে। অয়ন চাঁটি মারল তিতিরকে, — তোরা ছেলে হয়ে যাচ্ছিস বলে আমরাও মেয়ে হয়ে যাব নাকি !

কণাদ ধনুকের মতো শরীরটাকে বাঁকাচ্ছিল। মাথা পিছনে হেলিয়ে হাতের আঙুল দিয়ে ছোঁওয়ার চেষ্টা করছে গোড়ালি। তার চেহারা বেশ নাদুসনুদুস, মাথা পিছনে ঝোঁকালেই গোটা শরীর পাক খেয়ে যায় তার।

দেবলীনা হিহি করে হেসে উঠল, এই কণাদ, হঠাৎ জোকারের খেলা দেখাতে শুরু করলি কেন ?

কণাদের মুখচোখ চকিতে গম্ভীর, না রে, আমার একটা আসনও ঠিক হয় না। আমি পিটিতে গোল্লা পাব।

— খুউব ভাল হবে। তখন তোর বাবা তোকে পিটিয়ে রোগা করে দেবে। নেক্সট্ বার যখন মাধ্যমিকে বসবি তখন তোর শরীর একদম সাঁই সাঁই করে চলবে।

কণাদ কটমট করে দেবলীনার দিকে তাকাল, তুই কটা আসন করেছিস ?

দেবলীনা তিতির দুজনেরই ছোট্টখাট্টো লিকলিকে চেহারা। দুজনে কণাদের দুটো গাল টিপে দিল, তারপর কোরাসে বলল, আমাদের নটা আসন রেডি। মৎস্যাসন, কূর্মাসন, অর্ধধনুরাসন, ভুজঙ্গাসন, ময়ূরাসন, উষ্ট্রাসন. ....

— ব্যস ব্যস, তোরা তিরিশে তিরিশ। অয়ন কোনওক্রমে থামল দুজনকে,—কণাদকে নিয়ে ঠাট্টা হচ্ছে, না ? ওরও একটা আসন রেডি আছে। শবাসন। কণাদ, করে দেখিয়ে দে তো।

কণাদ আরও চটে যাচ্ছিল, কী ভেবে রাজার দিকে ঘুরল,—কীরে সৌভিক, তোর আজ ব্যাটারি ডাউন কেন ?

রাজা উত্তর দিল না। এই অবিরাম কথার পর কথা, শব্দের পর শব্দ, বাক্যের পর বাক্য, হাসির পর হাসি, সবই যেন অর্থহীন ফুলঝুরি। ভাল লাগছে না। কিচ্ছু ভাল লাগছে না রাজার।

বাবা যদি অফিসট্যারে না'ই গিয়ে থাকে, গেল কোথায় ? শর্মা নামের লোকটা তবে কেন বলে গেল অফিসের কাজে গেছে বাবা ? পরশুদিন আবার পিসেমশাই কীসব পার্ক স্ট্রিট ও ফার্ক স্ট্রিটের গল্প শুনিয়ে গেল। তখনও ব্যাপারটাকে রাজা পাত্তা দেয়নি। আরে বাবা, কাকে কান নিয়ে গেল শুনেই কাকের পিছনে দৌড়তে হবে ? পিসেমশাই ভুল দেখতে পারে। পিসিমণি তো বলেই লোকটা বহুত ঢপ মারে। তাও মা গুম। রাত্তিরে হাংগার স্ট্রাইক। নো ছেলের ঘরে আসাআসি। নো কৌতূহল। ঠায় সোফায় বসে আছে তো বসেই আছে। বাবার জন্য মা'র মন কেমন ! হাহ্ ! কবে থেকে এত টান ! সামনে বোবা টিভি ঝিরঝির করছে, সব প্রোগ্রাম শেষ তবু মা ফ্যালফাল তাকিয়ে আছে।

— মা, তুমি কি আজকাল তাকিয়ে তাকিয়ে ঘুমোনো প্র্যাকটিস করছ নাকি ? বারোটা বেজে গেছে, এবার শুয়ে পড়ো।

— তুই যা। আমি শুচ্ছি।

তারপরও অন্তত দশ মিনিট আলো জ্বলল ড্রয়িংরুমে। সকাল ছটা বাজতে না বাজতে যে মা নিজেই ঘড়ির অ্যালার্ম হয়ে পিপ্ পিপ্ করতে থাকে, সে ছেলেকে না জাগিয়েই সাতসকালে বাড়ি থেকে হাওয়া !

— মা কোথায় বেরিয়েছে গো বড়মা ?

— কী জানি ! আমি ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গেলাম তখনও তো ছিল।

বুড়িটা একেবারে ন্যাদোস্। কোনও খবর রাখে না। বাবা যে দু রাত্তির ফিরছে না, তাতে কি কোনও তাপউত্তাপ আছে ? মনে হয় না। পুরো ভীমরতি। তখনই রাজার কেমন কেমন ঠেকছিল। বেলা দশটায় আবাব পিসিমণির ফোন।

— মা নেই। ভোরবেলায় কোথায় বেরিয়েছে। কিছু বলতে হবে ?

— দাদা ট্যুর থেকে ফিরেছে ?

রাজা প্যাঁচ কষেছিল,— পিসেমশাই কিছু বলেনি তোমায় ?

— না তো !

ঘোরতর সন্দেহজনক ! পিসেমশাই না বললে পিসিমণি ট্যুরের কথা জানবে কী করে ! আর পিসেমশাই যদি বলেই থাকে পিসিমণি চেপে গেল কেন ? ডাল মে জরুর কুছ কালা হ্যায়। মা দুপুরে ফিরল না, বিকেলে ফিরল না, ফিরল সেই রাত্রে ! পুরো ঝোড়োকাক হয়ে ! ফিরেই আবার ঢপ, —কোথ্থাও যাইনি বাবা। তোমার দিদার শরীরটা ভাল নেই তো, সারাদিন ওখানেই.....

অদ্ভুত ! রাজা যেন দুধের খোকা ! যা বোঝাবে তাই বুঝে যাবে ! ফোন এলেই চমকে চমকে উঠছে ! কলিং বেল বাজলে দৌড়ে যাচ্ছে আগে। বড়মার সঙ্গে ওগো আহা ছাড়া কথা বলছে না ! অ্যান্ড সবার ওপরে পড়া নিয়ে একবারও চেপে বসছে না রাজার ঘাড়ে !

অয়ন দেবলীনারা অবিশ্রান্ত খুনসুটি করে চলেছে কণাদের সঙ্গে। রাজা ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল। দিব্যি ঝকঝকে দিন, এত আমেজ ভরা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, সবাই কেমন হাসিখুশি, এক রাজাই শুধু.....। রাজা অন্যমনস্কভাবে বলল, আচ্ছা, এত লোক যে হারিয়ে যায়, কাগজে ছবি বেরোয়, টিভিতে ছবি বেরোয়, তারা সব যায় কোথায় রে ?

— এই দ্যাখ্ দ্যাখ্ সৌভিক মৌনী নেয়নি ! সাগ্নিক সবাইকে ডেকে হ্যা হ্যা করে হাসছে। হাসতে হাসতেই রাজাকে বলল, বোধহয় ধাপার মাঠে। পরে ফুলকপি হয়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসে।

তিতির ভুরু কুঁচকে তাকাল, এই সৌভিক, তুই কি হারিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করছিস নাকি ? কোনও লাভ নেই, পুলিশ ঠিক ঘেঁটি ধরে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাবে। পরীক্ষায় তোকে বসতেই হবে।

রাজা শুকনো হাসল — দেয়া আজ এল না কেন রে ?

—কে জানে ! যা দুব্লা, হয়তো ঠাণ্ডায় ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। দ্যাখ গিয়ে...

অয়নের কথা শেষ হওয়ার আগেই কণাদ চাপা গলায় বলে উঠল, —অ্যাই, ছেড়েছে রে ছেড়েছে। ওদের ছেড়েছে এতক্ষণে।

জনা বিশেক ছেলেমেয়ে কিচমিচ করতে করতে বেরিয়ে আসছে, দেবলীনা ঘড়ি দেখল, ওদের চল্লিশ মিনিট পরে ছেড়েছে, আমরাও কিন্তু চল্লিশ মিনিট পরে বেরোব।

সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠে পর পর দশ বাই বারো তিনটে ঘর। প্রতিটি ঘর ব্ল্যাকবোর্ড, চেয়ার টেবিল, বেঞ্চি, হাইবেঞ্চিতে পরিপূর্ণ, নড়াচড়ার জায়গা বিশেষ নেই। এক বেঞ্চে পাঁচজন করে তিন পাঁচে পনেরো, তাতেই ঘরের চেহারা হট্টমেলা। এর মধ্যে দু-একজন অতিরিক্তও ঢোকে মাঝে মাঝে। ফ্ল্যাটের রান্নাঘর মাস্টারমশাইদের প্রাইভেট চেম্বার কাম টেক্সট বই, নোট ইত্যাদির স্টোররুম কাম মিনি লাইব্রেরী। সব মিলিয়ে স্কুলের পকেট সংস্করণ। সঙ্গে উপরি পাওনা আশপাশের বাড়ির গিন্নিদের দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রম্ভালাপ। ঝিয়েদের ঝগড়া। সদ্যোজাত শিশুর ট্যাঁ ট্যাঁ। টিভির সংলাপ গান বাজনা। বাচ্চাদের চিলচিৎকার। এর মধ্যেই ছেলেমেয়েরা বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করে যায়।

রাজার কিছুতেই মন বসছিল না। নামকরা বাঙালি বিজ্ঞানীদের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠান চলছে চারদিকে। তাঁদের জীবনী এবার পরীক্ষায় রচনা হিসেবে আসার সম্ভাবনা প্রবল। মাস্টারমশাই বিজ্ঞানীদের জন্মতারিখ, জন্মস্থান, তাঁদের বাবার নাম, মার নাম, তাঁদের শৈশব শিক্ষা কর্মজীবন সবকিছুই গল্প করে করে বলে যাচ্ছেন, রাজা গুরুবাক্য যন্ত্রের মতো টুকে নিতে চেষ্টা করছিল, বার বার তবু ভুল হয়ে যাচ্ছে। বাবার কিছু দুর্ঘটনা ঘটেনি তো ! ধুস্, দুর্ঘটনা ঘটলে মা কি গুম মেরে থাকত ! অন্য কিছু হয়েছে। অন্য কিছু। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বাবাকে।

—অ্যাই, সত্যেন্দ্রনাথ বানানটা কী লিখেছিস ? ত-য়ে যফলা দিস্নি কেন ?

কণাদের খোঁচা খেয়ে সংবিতে ফিরল রাজা। আবার একাগ্র মনে ডুবতে চাইল বিজ্ঞানীদের জীবনে। পারছে না। হাল ছেড়ে দিয়ে খাতায় গোল গোল করে লিখল, দূর শালা। তারপর

ডটপেন বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল বাকি ক্লাসটা।

নীচে নেমে কলকল করছিল তিতির, স্যার কোচিং-এ এত সুন্দর নোট দেন, ক্লাসে দেন না কেন রে ?

সাত্ত্বিক বলল, সাধে কি মেয়েদের গাড়ল বলে। যদি স্যার ওই নোট ক্লাসে দিতেন, তুই তা হলে এখানে পড়তে আসতিস ?

—আরে বিজনেস করতে গেলে কিছু মাল আলাদা স্টকে রাখতে হয়।

টুকরো টুকরো কথার মাঝেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল বন্ধুরা। রাজারও বাড়ি ফেরার সময় বাঁধা। ক্লাস শেষ হলে পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি সে কখনও দাঁড়ায় না। আজ বাড়ি ফিরতে পা সরছিল না তার। মন একটু টাটকা হাওয়া চাইছে। অলসভাবে তিতিরকে বলল— চল না, দেয়ার বাড়ি যাই। খবর নিয়ে আসি ওর কী হল।

তিতির বলল, নারে, আজ তাড়াতাড়ি ফিরতেই হবে। মা কোথায় বেরোবে, তার আগে বাড়িতে ঢুকতে বলেছে।

তিতিরও চলে গেল। রাজা বিষণ্ণ মনে হাঁটছিল একা একা। অন্ধকার নেমেছে। লেকের খোলা বুকে পৌষ বাতাসের সরসর। রাজার পায়ের নীচে শুকনো পাতারা মড়মড় করে ভাঙছিল।

লেকের পাড় ধরে, কাঁচা অন্ধকার ভেঙে রাজা চলে গেল বহুদূর।

দেয়াসিনী রাজাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, কী দারুণ একটা জায়গায় আজ গিয়েছিলাম রে সৌভিক ! এইই ফিরছি। একটু আগে এলে আমাদের দেখা পেতিস না।

রাজা আলতো হাসল, কোথায় গেছিলি ?

—সে অনেক দূর। এখান থেকে ট্রেনে ক্যানিং। সেখান থেকে ফেরি পার হয়ে ডকের খেয়া। সেখান থেকে ভ্যান রিকশায় সোনাখালি। সোনাখালিতে একটা খাল আছে, কী যেন খালটার নাম মা ?

শিপ্রা মেয়েকে খেই ধরিয়ে দিল, পুরন্দর।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুরন্দর। সেটা পার হয়ে বাসন্তী। হাঁটতে হাঁটতে একটা পর্তুগিজ চার্চে গেলাম। কী সুন্দর চার্চ রে ! নিরিবিলি। শান্ত। ভেতরে একটা ছোট্ট লেক...

শিপ্রা বলল, দেয়া, ওটা লেক নয়, পুকুর।

— ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। পুকুর। ওই পুকুরের ধারে বসে থাকলে... কী সুন্দর সবুজ ছায়া পড়ে জলটায়... টলটল কালো জল...

শিপ্রা বলল, ওকে বলে কাকচক্ষু জল।

দেয়া রাজার ভীষণ প্রিয় বন্ধু। সেই নার্সারি থেকে এক ক্লাসে, এক সেকশানে পড়ছে তারা। যে কোনও আনন্দের খবর পরস্পরকে না দিতে পারলে দুজনেরই পেট ফুলতে থাকে। দেয়ার মা বাবাও রাজাকে ভালবাসে খুব। সেই রাজার শৈশব থেকেই। শিপ্রা আর প্রতীপ দুজনেই কলেজে পড়ায়। একজন দর্শন। একজন ইতিহাস। ছেলেমেয়ে যখন ছোট ছিল, শিপ্রা অনুরাধাতেও যথেষ্ট ভাব ছিল। এখন দেখাসাক্ষাৎ প্রায় নেইই।

রাজা খানিকটা অভিমানের সুরে বলল, পরশুই তো তোর সঙ্গে দেখা হল, তখন বললি না তো আজ বেড়াতে যাবি ?

—আমাদেরই কি যাওয়ার ঠিক ছিল নাকি ? দেয়ার গলায় সান্ত্বনা, বাবা কাল রাত্রে হঠাৎ প্ল্যান করল, বলল কলেজ ডুব মেরে আজ সারাদিন আউটিং করতে যাব।

শিপ্রা আবারও সংশোধন করে দিল মেয়েকে— কলেজ ডুব দিয়ে নয়, বলো সি এল নিয়ে।

দেয়া মা-র দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল,— আচ্ছা বাবা তাই। তারপর কী হল জানিস ? আমরা একটা অদ্ভুত পাখির মাংস খেলাম। ওই যে রে, নদীর চরে থাকে... মেরে বাঁশে ঝুলিয়ে গ্রাম থেকে লোকরা বিক্রি করতে আসে... কাদাগোলা পাখি না কী যেন বলে...

—কাদাগোলা নয় দেয়া, বলো কাদাখোঁচা।

রাজা জিজ্ঞাসা করল, মাসি, তুমিও আজ কলেজ যাওনি ? সি এল নিয়েছ ?

শিপ্রা বলল, নাহ্, আমার আজ অফ ডে। আমি তোর মেসোর মতো বছরের প্রথমে সি এল খরচা করি না। আমি সি এল জমিয়ে রাখি। তোর মেসোর সব শেষ হয়ে গেলে তবে আমি নিই।

কয়েক মুহূর্তের জন্য রাজা বাড়ির কথা ভুলে গিয়েছিল। দেয়াদের বাড়ির পরিবেশটা একটু অন্যরকম। কিছুটা খোলামেলা। যদিও দেয়ার মা খুব হিসাবি, খুঁতখুঁতে, তবে দিনরাত কানের কাছে পড়া নিয়ে ট্যাকট্যাক করে না। দেয়ার বাবা বেশিরভাগ সময় টিউশনি করে না, মাঝেমধ্যে দু-একটা ভাল ছাত্রছাত্রী পেলে পড়ায় শুধু। টাকার প্রতি স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই সাংঘাতিক কিছু আসক্তি নেই। দেয়া অবশ্য নিজেই লেখাপড়ায় ভাল, কিন্তু দিনরাত বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকার অভ্যাস তারও নেই।

শিপ্রা উঠে যাওয়ার পর দেয়া সবিস্তারে বর্ণনা করছিল আজকের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা। ভ্যানরিকশার পিছনে পা ঝুলিয়ে বসার মজা। নৌকোতে পা দেওয়া মাত্রই টলমল দুলে ওঠা। নদীর কোমর জলে ডুবে বালক-বালিকার চিংড়িপোনা সংগ্রহের গল্প। গল্প বলতে বলতে দেয়া হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল— এই, তুই কিছু শুনছিস না কেন রে ?

রাজা বলল, কই না। শুনছি তো। তারপর ?

—দ্যাখ, তুই আমার সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা করিস না। তুই আমাদের বাড়িতে এসেই প্রথম খোঁজ করিস কী খাবার দাবার আছে, আজ করলি না ! আমার ঘরে ঢুকেই বইখাতা ঘাঁটতে আরম্ভ করিস, আজ টিউটোরিয়ালে কী পড়ানো হয়েছে সেটা পর্যন্ত তুই... !

রাজা কেঠো হাসি হাসল, বলব কী করে ? আসার পর থেকে তুই একাই তো বকবক করে যাচ্ছিস।

—উঁহু, তোর মুখটাও আজ কেমন শুকনো ! মনমরা মনমরা !

রাজা মুখ নামিয়ে নিল।

স্টেপকাট চুল নাচিয়ে দেয়া রাজার পাশে এসে দাঁড়াল। কাঁধে নরম হাত রেখে বলল, কী কথা তুই আমাকেও বলবি না ?

আচম্বিতে রাজার মনে হল এই দেয়াসিনী যেন তার সমবয়সি নয়। যদিও হিসাব মতো দেয়া তার থেকে এক মাস পাঁচ দিনের ছোট। একই সঙ্গে পাশাপাশি বড় হয়েও কখন যে দেয়া অনেকটা আগে টপকে গেছে রাজাকে ! শরীরে। মনেও।

রাজা দেয়ার হাত চেপে ধরল, তুই কাউকে বলবি না বল ? প্রমিস্।

—কাউকে মানে ?

—বন্ধুদের। বল তুই বলবি না ?

—হেঁয়ালি করিস না। বলার মতো কথা না হলে কেন ঢাক পেটাতে যাব !

দু-তিন বার ঢোক গিলে রাজা মরিয়া হয়ে বলে ফেলল, বাবা বাড়ি ফিরছে না। কী করি বল তো !

—ফিরছে না !

—মানে... একত্রিশ তারিখ থেকে ফেরেনি। রাজা সামান্য স্বাভাবিক হল যেন,— থার্টি ফার্স্ট রাত্তিরে একটা লোক নাকি এসে মাকে খবর দিয়ে গেছিল বাবা হঠাৎ অফিসট্যুরে গেছে।

—তাতে প্রবলেমটা কী ?

—ওই ট্যুরে যাওয়াটাই তো রহস্য। লোকটা খবর দিয়ে গেল দুপুরে অফিসট্যুরে গেছে, অথচ পিসেমশাই বাবাকে রাত দশটায় পার্কস্ট্রিটে দেখেছে ! তারপর মা বোধহয় বাবার অফিস-টফিসে খোঁজ নিয়েছিল, সেখান থেকেও রিপ্লাই নেগেটিভ।

—কী করে জানলি ? মাসি তোকে বলেছে ?

রাজা মুখে বিচিত্র ভঙ্গি করল, আমি আমার মার মুখ দেখে সব বুঝতে পারি। এমন মুখ করে সকাল থেকে বসে আছে... মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। ... একটা মানুষ পুরো লাপাতা !

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? দেয়া গম্ভীর মুখে সোফায় পা তুলে বসল, কিছু মনে করবি না ?

—কী ?

—মাসি মেসোর রিলেশান কীরকম ?

—নরমাল। যেমন সব বাড়িতে থাকে। মা একটু বেশি ছেলে ছেলে করে। বাবা একটু বেশি অফিস অফিস।

—রিসেন্টলি কোনও ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল ?

রাজা মনে করার চেষ্টা করল, উঁহু। ... একদিন পিসিমণিকে নিয়ে কী যেন টুকটাক কথা কাটাকাটি হচ্ছিল, সে-ও তো প্রায় বারো-তেরো দিন হবে।

—ওরকম নয়। ওরকম ঝগড়া তো আমার মা বাবারও হয়। সিরিয়াস ঝগড়া ? ফাটাফাটি ?

—ধুস্। বাবা অত ঝগড়াঝাঁটি করার লোকই না। দিব্যি খাচ্ছেদাচ্ছে, অফিস করছে, ক্লাব করছে... মাঝে মাঝে একটু শুধু... রাজা আর এগোল না। বাবা যে মদ খায় সে কথাটা দেয়াকে বলা বোধহয় সমীচীন হবে না। সব পরিবারেরই নিজস্ব কিছু কথা থাকে যা প্রিয় বন্ধুকেও বলা যায় না। রাজা আনমনে মাথা ঝাঁকাল, ভেবেছিলাম আজ বেরোবই না, টিউটোরিয়ালেও যাব না। মাকে বলতেই মা এমন ফোঁচ করে কেঁদে ফেলল ! সে কী অড় সিন্ !

দেয়া জীবনের সর্ব অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ নারীর মতো ভুরুতে ভাঁজ ফেলল, ইন্দ্রনীলের বাবার মতো কেস নয় তো ? অন্য কারও সঙ্গে অ্যাফেয়ার ট্যাফেয়ার ! হয়তো মাসি জানতে পেরে গেছে ! হয়তো মেসো ! ইন্দ্রনীলের বাবা তো হঠাৎই একদিন ইন্দ্রনীলদের ছেড়ে চলে গেলেন।

রাজা একটু ধন্দে পড়ল। মিনিট খানেক ভেবেও কিছু কূলকিনারা পেল না।

দেয়া হঠাৎ বলল, একটু বোস। আমি আসছি।

দেয়া তিন মিনিটের মধ্যে ফিরে এসেছে। সঙ্গে প্রতীপ আর শিপ্রা। দুজনেরই মুখচোখ ভীষণ করুণ। যেন রাজা নয়, এই মুহূর্তে তাদের সামনে এক অনাথ বালক দাঁড়িয়ে আছে।

প্রতীপ বলল, তুমি একটুও চিন্তা কোরো না সৌভিক, আমি খোঁজ করছি।

শিপ্রা উদ্বিগ্ন মুখে বলল, তোমার সুভাষদাকে একটা ফোন করো না।

দেয়ার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল,— হ্যাঁ, সুভাষজেঠু তো ডি আই জি ! জেঠু নিশ্চয়ই...

শিপ্রা বাধা দিল মেয়েকে, সুভাষদা ডি আই জি নন। ডেপুটি কমিশনার। ডিসি।

প্রতীপ আন্তরিক সুরে বলল, পার্কস্ট্রিট অঞ্চলে লাস্ট দেখা গেছে, তাই তো ?

রাজা ঘাড় নাড়ল।

—পুরো নাম চন্দনকুমার রায়চৌধুরী ?

—হুঁ।

—একটু বোসো। আমি এক্ষুনি দোতলা থেকে সুভাষদাকে ফোন করছি।

শিপ্রা বলল, আমাদের ফোনটা যে কবে আসবে ! পাঁচ বছর আগে দরখাস্ত করেছি। আমাদের দেশের সমস্ত সরকারি সিস্টেমগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। একটা লোকও কাজ করে না ! কারও মধ্যে কোনও দায়িত্বজ্ঞান নেই।

শিপ্রা একমনে সরকারি পরিচালন ব্যবস্থার নিন্দা করে চলেছে, দেয়া আঙুল কামড়াচ্ছে উত্তেজনায়, রাজা কারও দিকেই তাকাচ্ছিল না। সে প্রতীপের পদধ্বনির অপেক্ষায় স্থাণুবৎ। প্রতিটি সেকেন্ডই এখন অনন্তকাল।

প্রতীপ তাড়াতাড়িই ফিরল। ঘরে এসে রাজার কাঁধে হাত রেখেছে, ডোন্ট গেট নার্ভাস্। আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। ফ্যাটাল কিছু হয়নি, হসপিটালাইজডও হননি, তা হলে ঠিক বাড়িতে খবর চলে আসত। সুভাষদা নিজে খোঁজ করছেন। আশা করছি কালকের মধ্যেই কিছু একটা... তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাও।

বাড়ির দরজায় পৌঁছেও বুক গুড়গুড় করছিল রাজার। গলাবন্ধ পুলওভারে দম যেন আটকে আসছে। সোয়েটার খুলে কাঁধে রাখল।

বিচিত্র এক সমবেত ধ্বনি ভেসে আসছিল। নতুন জুডো ক্যারাটের ক্লাব হয়েছে পাড়ায়। সকাল সন্ধে লড়াই-এর মহড়া চলে সেখানে। কোরাসে গর্জন তুলছিল কিশোর-কিশোরীর দল। হুহ্ হাহ্।

হুহ্ হাহ ।

রাজা কলিংবেলে হাত রাখল ।

রতনের মা দরজা খুলেই চোখ ঘুরিয়েছে, দাদাবাবু এসে গেছে ।

রাজার হৃৎপিণ্ড ছিটকে উঠল,— কখন !

—এই তো খানিক আগে । বউদি খুব চেঁচামেচি করছিল, মা এসে থামাল । তোমার ওপরও বউদি রেগে আগুন হয়ে আছে । ফিরতে দেরি করছ বলে...

রতনের মা সব তথ্য ফাঁসের সময় পেল না, হুড়মুড় করে অনুরাধা বেরিয়ে এসেছে,— ভেবেছিসটা কী আঁ ? বাপ ছেলে দুজনে মিলে আমাকে জ্বালিয়ে মারবি ? কোন ভাগাড়ে পড়েছিলি এতক্ষণ ?

রাজা হঠাৎই অসম্ভব শান্ত । ধীরেসুস্থে পা থেকে স্নিকার খুলছে । নিজের ঘরে গিয়ে পুলওভার ওয়াড্রোবে ঢোকাল, দরজা বন্ধ করে বদলাল শার্টপ্যান্ট । বিছানায় পড়ে থাকা অনুরাধার শাল গায়ে জড়িয়ে নিল । ঘর থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে বাবার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে । আস্তে করে সরাল ভারী পর্দা ।

চন্দন বিছানায় শুয়ে । বিছানার এক প্রান্তে প্রতিভা ।

বাবা দেরি করে ফিরলে ছোট্ট রাজা রাইমসের সুরে প্রশ্ন করত, ডিয়ার ড্যাড, ডিয়ার ড্যাড, হোয়্যার হ্যাড ইউ বিন্ ?

চন্দন রাজাকে কোলে নিয়ে ঘুরত বনবন । একই সুরে বলত,— আই হ্যাভ বিন টু লন্ডন টু সি দা কুইন ।

রাজা ডেকে ফেলল,— বাবা ।

অনুরাধা পিছনে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করছিল ছেলেকে ।

রাজা নিষ্পলক চোখে চন্দনকে দেখছিল । চন্দনের চোখ বসা । চোখের নীচে ঘন মসিরেখা । কোলেস্টেরলের সাদা বিন্দুরা সেই কালিমায় প্রকট । মুখ শুকিয়ে ছোট্ট এতটুকুন ।

শান্ত রাজার কণ্ঠ অকস্মাৎ রুক্ষ হল, হোয়্যার হ্যাড ইউ বিন ? এই কদিন কোথায় ছিলে তুমি ?

চার

—মার শালাকে তিন লাথি । নেশা ছুটিয়ে দে বেজন্মার ।

মোটা পুলিশি রুল গোঁত্তা মারল পেটে,—ওঠ্ শালা ওঠ্ । অনেক ফূর্তি মেরেছিস্ । উঠে দাঁড়া ।

ঝটিকা আক্রমণে মৌতাত ছুটে গেছে, তবু চোখের সামনে কেন এত ধোঁয়া ! ছেঁড়া ছেঁড়া ! পাতলা পাতলা !

এক পাতি কনস্টেবল্ লাঠির ডগায় করে প্যান্টশার্ট ছুড়ে দিল,—তিন গোনার মধ্যে পরে নে । নইলে অ্যামন ক্যালাব...

চন্দন দু হাতে নিজের চুল খামচে ধরল । দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজকর্মচারী চন্দন রায়চৌধুরীর কী বেমক্কা অবস্থা ! সাধারণ এক কনস্টেবলও তাকে অবলীলায় বেইজ্জত করছে ! ওফফ্ ।

ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে বড় হলঘর পার করাচ্ছে কনস্টেবল । কলার ধরে হিঁচড়ে নামাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে । ফুটপাথে নেমে চন্দন বারেকের জন্য তড়পাল,—ডু ইউ নো হু অ্যাম আই ? জানেন আমি একজন রেস্পেক্টবল্ ভদ্রলোক ?

—চোপ্ । প্যান্টের জিপার ঠিক করে লাগা । হুঁহ্ ! ভদ্রলোক ! চল তোর ভদ্দরলোকি দেখছি !

এক গুঁতোয় চন্দন ভ্যানের ভেতর । মেজাজ এক্কেবারে মরে কাদা,—বিলিভ মি, আমি ভদ্রলোক । রিয়েল ভদ্রলোক ।

হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা । খ্যাক খ্যাক খ্যাক খ্যাক ।

তারজাল ঘেরা অন্ধকার পুলিশ ভ্যানে কারও মুখই পরিষ্কার দেখা যায় না, তবু মুখ ঢেকেছে চন্দন ।

তনুময় চ্যাটার্জি কানের কাছে ফিস ফিস করল,—কথা বলবেন না রায়চৌধুরী। আরও বিপদে জড়িয়ে পড়বেন। কোনওভাবেই অফিসিয়াল আইডেন্টিটি ডিসক্লোজ করবেন না। ঠোঁটে সিল মেরে বসে থাকুন। থানায় সব ম্যানেজ হয়ে যাবে।

চন্দনের হাঁটুতে হাঁটুতে ডুগডুগি বাজছে,—কী হবে চ্যাটার্জি ? থানায় গেলে তো সব জানাজানি হয়ে যাবে ! আমার বউ ! আমার ছেলে ! আমার মা ! আমার বুড়ো মা ! আমি মবে যাব চ্যাটার্জি !

—আহ্, চুপ করুন। শর্মা কেটে গেছে। ও খুব চালু মাল। সব দিক সামলে নেবে। কাকপক্ষী টের পাবে না।

চন্দন লাথি মেরে গা থেকে লেপ ফেলে দিল। জানুয়ারির শীতেও কুলকুল ঘামছে। এখনও এত কীসের ভয় ! সে তো আবার এখন নিরাপদ খাঁচায় !

ছোটবেলায় ভয়ের একটাই ছবি ছিল চন্দনের কাছে। স্কুল যাওয়ার পথে বালক চন্দন পুকুরধার ধরে ছুটছে। পুকুর আর রাস্তার মাঝে স্টোনচিপসের পাহাড়। চন্দন দৌড়ে স্টোনচিপসের পাহাড়ে উঠল। নামতে গিয়ে সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। সামনেই এক শঙ্খচূড়। চন্দনেব থেকে মাত্র দু হাত তফাতে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। উজ্জ্বল রোদে দুলছে মৃদু। চন্দনের পায়ের তলা থেকে পাথরকুচি সরে যাচ্ছিল, আতঙ্কে তালু শুকনো। মাত্র দশ হাত দূরে কাঁচামাটির পথ, অবিরাম পথচারীদের আনাগোনা সেখানে, কিন্তু কিছুতেই তাদের ডাকতে পারছিল না চন্দন। চিৎকার করতে চাইছে, একটি শব্দও ফুটছে না গলায়। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শরীর বিবশ। দশ সেকেন্ড। কুড়ি সেকেন্ড। হঠাৎই সাপ নিতান্ত অবহেলায় পথ ছেড়ে দিল চন্দনকে, মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

স্কুলে সারা দিন চন্দন কথা বলতে পারেনি। বাড়ি ফিরে জ্বরে বেহুঁশ। জ্বরের ঘোরে অদ্রিনাথকে সাপটার কথা বলেছিল চন্দন। অদ্রিনাথ আশ্বস্ত করেছিলেন,—দূর বোকা, সাপকে অত ভয় পাওয়ার কী আছে ?

—ভয় পাব না ! ছোবল মারলে মরে যেতাম যে !

—কাপুরুষরা ছোবল খেয়ে মরে না, ছোবলের ভয়েই মরে যায়।

চকিত ঝটকায় মশারি সরিয়ে চন্দন বিছানা থেকে নামল। অভ্যাসের আন্দাজে হাত বাড়াল ড্রেসিংটেবিলের দিকে। রোজকার মতোই অনুরাধা টেবিলে রাতেব গ্লাস জগ সাজিয়ে রেখে গেছে। পুরো জগের জল নিমেষে নিঃশেষ। হাত দুটো কী অসম্ভব কাঁপছে !

চন্দন রায়চৌধুরী হাউ হাউ করে কাঁদছে, পুলিশভ্যানে বসে,—আমাকে ছেড়ে দিন স্যার। আমাকে ছেড়ে দিন।

আবার হাসি। এবার মেয়েরা। কেউ একজন শব্দ তুলল মুখে। চুকচুক চুকচুক।

জীবনে আরেকবার পুলিশ অফিসারের পা জড়িয়ে ধরেছিল চন্দন। কলেজ লাইফে।

হিন্দু হোস্টেলে চন্দনের বেশ কয়েকজন বন্ধু ছিল। তখন উত্তাল রাজনীতির যুগ। চন্দন কখনও রাজনীতিতে জড়ায়নি। মাঝে মাঝে নিছক আড্ডা দিতে যেত বন্ধুদের হোস্টেলে। সমীরণ বলে এক বন্ধু সে সময় প্রথম বোমা দেখিয়েছিল তাকে, ছ'ঘরা রিভলভারও। তোশকের নীচে রিভলভার রেখে শুত সমীরণ। রিভলভার হাতে নিয়ে দেখতে গিয়ে চন্দন ঠক ঠক করে কেঁপেছিল। পুলিশ বোধহয নজরে রাখছিল তাকে। একদিন বউবাজারের মোড়ে ধরল। সাদা পোশাকের পুলিশ কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে কথা বলছে,—তুমি তো ভাই লক্ষ্মী ছেলে, গুলি বোমার রাজনীতি কি তোমাকে মানায় ?

—আমি জানি না স্যার, কিচ্ছু জানি না। বিশ্বাস করুন...

—কেন মিছিমিছি জড়িয়ে পড়ছ ভাই ? একবার তুলে নিয়ে গেলে কোত্থেকে কী হয়ে যাবে...।

চন্দন ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল,—আমাকে ছেড়ে দিন স্যার। আমি...আমি...

সেই সাপটাকে দেখতে পাচ্ছিল চন্দন। চাপের মুখে উগড়ে দিল বন্ধুর নাম। কী অস্ত্রশস্ত্র দেখেছে। কোথায় দেখেছে।

এক সপ্তাহ পরে দক্ষিণেশ্বরে লাশ পাওয়া গিয়েছিল সমীরণের। তার পর বহু দিন চন্দন কলেজ স্ট্রিট মাড়ায়নি। ভয়ে ? না প্রতিহিংসার আতঙ্কে ? না আত্মধিক্কারে ? হিন্দু হোস্টেলেও আর পা

রাখেনি কোনও দিন।

ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় চন্দন চোখ রাখল। ছমছম আলো আঁধারে কিছুই স্পষ্ট নয়, নিজের মুখও নিজের কাছে ভূতের মুখোশ। কম্পিত হাতে সিগারেট ধরাল একটা। রাজা কী গনগনে চোখে তাকে দেখছিল!

—সত্যি কথা বলছ বাবা?

—ব্যাপার কী বল তো? এভাবে কথা বলছিস কেন? বললাম তো একটা সিক্রেট কাজ ছিল।

—তোমার মুখচোখ এ রকম কালো লাগছে কেন?

—হবে না! কদিন ধরে ঘুম নেই...বিশ্রাম নেই...

ভাগ্যিস কথা বলার সময় বিন্দুমাত্র গলা কাঁপেনি চন্দনের! অনুরাধার সামনেও না।

—কোথায় ছিলে তুমি?

—কেন শর্মা খবর দেয়নি?

—সত্যিই কাজে গেছিলে?

—আশ্চর্য! মিথ্যে বলব কেন! ভয় কাটাতে রাগ আনছিল চন্দন,—আমি জানতে চাই এত জেরার মানে কী, অ্যাঁ?

প্রতিভা ছেলের বুকে হাত রেখেছিলেন,—রাগ করছিস কেন বাবা? তুই বাড়ি না ফিরলে অনুর চিন্তা হবে না?

—চিন্তা নয় মা, একে বলে সন্দেহ। অনুর মন দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে।

—ও, আমার মন ছোট? তুমি বুঝি মহামানব?

—আহ্, অনু, আস্তে। প্রতিভা প্রাণপণে থামিয়েছিলেন দুজনকে, রতনের মা রয়েছে, পাড়াপ্রতিবেশী রয়েছে, চেঁচামেচি করে আর লোক হাসিও না।

ড্রয়িংরুমে আলো জ্বলছে। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে দু-চারটে আলোর কণা বেয়াড়া টিটকিরির মতো উঁকি দিচ্ছে ঘরে। বন্ধ শার্শির বুকে লেপটে আছে রাস্তার ঢলানি বাতি। নাইটল্যাম্পের মিনমিনে অনুনয় তার বিদ্রূপে মলিন।

চাকরি পাওয়ার ছ' মাসের মাথায় চন্দন প্রতিভার জন্য নামী কোম্পানির রেকর্ডপ্লেয়ার কিনে এনেছে, সঙ্গে শচীন দেববর্মনের লণ্ডপ্লেয়িং রেকর্ড। মা শচীনদেবের গান খুব ভালবাসেন। বাবাও। তাঁদের জন্য অসৎ পথের টাকার প্রথম অর্ঘ্য। অদ্রিনাথ কটমট চোখে দেখলেন যন্ত্রটাকে,—হঠাৎ এ সবের মানে কী চাঁদু? বাড়িতে তো রেডিয়ো রয়েছে!

—মা এত গান ভালবাসে...। রেকর্ডটা দ্যাখো, কী ভাল ভাল গান আছে!

—থাক। কত পড়ল?

—ন'শো।

—নঅঅশো! তুই এত টাকা কোত্থেকে পেলি?

চন্দন ঢোক গিলে তর্ক জুড়েছিল,—বারে, আমি মাসে মাসে জমাতে পারি না?

ছেলেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন অদ্রিনাথ,—এই কদিনে এত টাকা জমালে? আশ্চর্য! বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

চন্দন রেগে আগুন,—বাবার সবকিছুতেই বড় বেশি সন্দেহ মা। আমাকে কী ভাবে বলো তো, অ্যাঁ?

চন্দন বিছানায় ফিরল। অসত্য ভাষণ অন্যের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারে, কিন্তু নিজের কাছে? চোখ চেপে বন্ধ করে শুয়েও চন্দন নিজের কাছ থেকে পালাতে পারছে কই?

লাল শিফন কি ভ্যানে ছিল সে দিন! শীলা সেন বলেছিল,—আজ আপনাকে একদম ফ্রেশ দেব। গার্ডেন ফ্রেশ। ভারজিন। ভাল বাড়ির মেয়ে। লেখাপড়া জানে।

সন্ধে থেকে ক পেগ খাওয়া হয়েছিল সে দিন? পাঁচ? ছয়? বারে বসেই তো যা...। তারপর?...তারপর? শীলা সেনের ফ্ল্যাটে সবে তো তখন গ্লাস বোতল সাজিয়েছে মেয়েটা। সঙ্গে ঝাল মাছভাজা। পোট্যাটো চিপস্।

—আমি চিপস্ চাই না। মাছভাজা খাব। টাটকা টাটকা। ঝাল ঝাল। তুমি নাকি টিনএজার ?

—হি হি হি হি। কী নেবেন সঙ্গে ? স্কচ ?

—নেব। তার আগে এসো, আমার মাছভাজাটাকে চাখি একটু।

একটু। হ্যাঁ একটুই। তারপরেই তো দরজা হাট। আচমকাই।

চ্যাটার্জি ! শালা চ্যাটার্জিই সে দিনের ঘটনার জন্য একমাত্র দায়ী। শর্মা পই পই করে বারণ করেছিল, দিনটা আজ ভাল নয় দাদা। রাহু আজ শনিতে ঢুকছে। সন্ধেবেলা গাড়ির নতুন টায়ার পাংচার হল। অত দিনের নীলার আংটি হারিয়ে গেল বারের টয়লেটে। দু দুবার বেড়াল রাস্তা কাটল। আই সোয়্যার দাদা, এ সবই অশুভ লক্ষণ। শীলা সেন আজ বাদ দিন। তার চেয়ে চলুন আমার নিউআলিপুরের ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাট বিলকুল ফাঁকা। যদি বলেন তো হোল নাইট ঝুম বরাবর ঝুম শরাবি। শর্মার কথাই শোনা উচিত ছিল। চ্যাটার্জি হারামজাদা নাস্তিকের ডিম ! বলে মেয়েছেলে ঘাঁটার জন্যও পাঁজি দেখবেন শর্মা।

চন্দনের গা গুলিয়ে উঠল। নোংরা বেঁটকা গন্ধটা তার ঘরেও ঢুকে পড়েছে যেন। পেচ্ছাপ পায়খানা তাড়ি ধেনোর অসহ্য উৎকট মিশ্রণ। তার সঙ্গে চ্যাটার্জির ভাঙা রেকর্ড। কোথায় চাকরি করেন বলবেন না। কোথায় চাকরি করেন বলবেন না।

কালিঝুলি মাখা দেশলাই-এর খোলের মতো ঘরে একটা আধমরা হলদেটে বালব। দেওয়ালে টাল খেয়ে এক বদখত লোকের গায়ে উপুড় হয়ে পড়ল চন্দন, লোকটা সঙ্গে সঙ্গে অন্য পায়ে লাথি চালিয়েছে। চন্দন আবারও হুমড়ি খেয়ে নিজেকে সামলাল।

তনুময় চ্যাটার্জি চেঁচাচ্ছে,—বুলাও অফিসার কো।

তারজালের ওপারে টুলে উপবিষ্ট কনস্টেবল নির্বিকার। বাঁ হাতের তেলোয় খৈনি রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুলে আয়েশ করে পিষছে,—কা হ্যায় ?

—তোমাদের ওসিকে ডাকো।

লোকটা জিভের তলায় খৈনি রেখে থুতু ছেটাল,—সার এখুন বিজি।

—হ্যাঙ ইওর বিজিনেস। যা মাল চায় পাবে। অত রোয়াব কীসের, অ্যাঁ ?

ভিতরের গুণ্ডা মতন একজন ঘেঁটি ধরে বসিয়ে দিল চ্যাটার্জিকে,—হুইই, রাত্তিরে আমার ঘুমের ডিশটাপ্ ভাল লাগে না।

দুটো পকেটমার শেয়ালের মতো হেসে উঠল,—বিলিতি টেনে বাবুরা পাত্তি নাচাচ্ছে রে। সোহাগ চাঁদবদনী পাত্তি নাচো তো দেখি।

এক লুঙ্গি পরা আধবুড়ো ছোটলোক দেওয়ালে হেলান দিয়ে মৌজ করে বিড়ি টানছিল, মুখের ওপর কটু ধোঁয়া ছাড়ল, কী ওস্তাদ, বছরটা পড়বার আগেই রডের কেসে ফেঁসে গেলে।

গ্রহ। গ্রহই। চ্যাটার্জিটাই জ্যান্ত অলম্বুষ। পারলি তুই গ্রহ বাঁচাতে ? থানায় গিয়ে খুব তো কেরদানি দেখালি ! হুল্লা ! গালিগালাজ। তড়পানি। শাসানি ! মাঝখান থেকে কেস পুরো হাতের বাইরে। ওসি খেপে টং। মুঠো মুঠো টাকা দেখিয়েও শর্মা ফেল। শর্মার উকিল ফেল। কোনও এক কেষ্টবিষ্টুর নাকি গুরুতর কমপ্লেন আছে, শীলা সেনের কোনও মক্কেলেরই থানা থেকে বেল হবে না। মেয়েছেলেগুলো সব মেয়ে-পুলিশের হাত ধরে লালবাজার লকআপে। চ্যাটার্জি আর চন্দনরা রাতভর থানার লালভক্ষ নরকে।

চন্দন সজোরে মাথা ঝাঁকাল। পূতিগন্ধময় দৃশ্যটাকে চোখ থেকে মুছে ফেলতে চাইছে। তবু কেন হিংস্র হায়নার মতো দৃশ্যরা টুঁটি চেপে ধরে বার বার !

এক পাল বেশ্যা আর ছোটলোকদের সঙ্গে কাঠগড়ায় উঠছে চন্দন। রুমালে মুখ ঢেকেও রেহাই নেই, কোর্টসুদ্ধ লোক যেন চন্দনের দিকেই আঙুল তুলে দেখাচ্ছে, ওই দ্যাখ ওটা সরকারি অফিসার চন্দন রায়চৌধুরী। গেজেটেড র‍্যাঙ্ক। গড়িয়ার ভবতারণ স্কুলের নীতিবাগীশ বাংলার শিক্ষক অদ্রিনাথ স্যারের একমাত্র ছেলে। ফ্যামিলিম্যান। মাতাল। ঘুষখোর। অফিসার। দুশ্চরিত্র। ভদ্রলোক।

কোর্টেও শর্মা শেষরক্ষা করতে পারল না।... যে হিলার ফ্ল্যাট থেকে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা

হয়েছে সেই ফ্ল্যাটের নীচে একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুল আছে। ওই স্থানে এরকম কার্যকলাপ শুধু অনৈতিকই নয়, চরম সামাজিক পরিবেশদূষণও বটে। এ ছাড়া শ্রীমতী শীলার সেনের নামে নারী পাচারের লিখিত অভিযোগ আছে। এক্ষেত্রে তাঁর ফ্ল্যাটে কারা আসে, কেন আসে এ সম্পর্কে বিস্তৃত তদন্ত প্রয়োজন। এমতাবস্থায় আদালত অভিযুক্তদের জামিন নামঞ্জুর করে আরও সাত দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার আদেশ দিচ্ছেন।

ভাগ্যিস সাত্যকি কাল দেবদূত হয়ে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল, কিচ্ছু চিন্তা করবেন না চন্দনদা। আমি এসে গেছি। লোয়ার কোর্টে বেল্ হয়নি তো কী আছে, আমরা আজই হাইকোর্ট মুভ করছি। আজ কালের মধ্যেই কেস্ ক্লিয়ার করে দেব। নরেন্দ্র শর্মার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে, শর্মা আপনার অফিসকে তাপ্পি পরিয়ে দিয়েছে। ওসিও পকেটে। কেউ কিছু জানেনি এখনও। বউদিও না।

চন্দন অনেকক্ষণ পর অনুরাধার গলা শুনতে পেল। ড্রয়িংরুম থেকে অনুরাধা রাজাকে বলছে,—ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়েছিস্ ? না আমি দিয়ে দেব ?

—দিয়ে দাও। আমি বাথরুম থেকে এসে শুয়ে পড়ছি।

অনুরাধা ঘরে এসেছে। চন্দন তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরল। চোখ বুজেই টের পাচ্ছে অনুরাধা আলো জ্বালাল ঘরের। জলের জগ নিয়ে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। ফিরল। দুটো স্টিলের গ্লাসে জল ভরে ঢাকা দিল। আলো নিভিয়ে বিছানায় এসেছে।

অনুরাধার নিশ্বাসের আসাযাওয়া শুনতে পাচ্ছিল চন্দন। একই বিরতির পর ঈষৎ উষ্ণ বাতাস ঘাড়ে এসে ঠেকছে। এই শব্দ, এই উষ্ণতা ক্রমশ নির্জীব করে তুলছিল চন্দনকে।

হঠাৎ অনুরাধা বলে উঠল, —তুমি মিথ্যেবাদী।

কথাটায় কোনও প্রশ্ন নেই, উত্তরের অপেক্ষা নেই, যেন শুধু এক সত্যঘোষণা।

সবুজ অন্ধকারে অনুরাধা ঠেলল চন্দনকে,—শুনছ ? আমি জানি তুমি ঘুমোওনি। মটকা মেরে পড়ে আছ। তুমি একটা মিথ্যেবাদী।

চন্দন চিত হল। খানিকটা ক্ষুব্ধ ভাব আনল গলায়,—মিথ্যেবাদী বলছ কেন ?

—আমি তোমাব অফিসে গেছিলাম। সরকার, মণ্ডলবাবু সকলের কাছে খোঁজ করেছি। অভিষেকও এসেছিল বাড়িতে।

চন্দন পলকে কাঁটা হয়ে গেল, তারা কী বলেছে ?

—তুমি অফিসের কাজে যাওনি।

ফুসফুসের বায়ুটাকে প্রাণপণে চেপে কয়েক সেকেন্ড কাঠের মতো শুয়ে রইল চন্দন। চাপ বাড়তে বাড়তে ফুসফুস ফাটিয়ে দিচ্ছে। দু হাতের মুঠো শক্ত রেখে চন্দন খুব ধীরে, একটু একটু করে, বুক থেকে বার করল বাতাসটাকে। এত ধীরে যেন সে নিজেও শব্দ না পায় নির্গমনের। যেন সামান্যতম হাওয়ার স্পন্দনেই সব মিথ্যেটুকু ধরে ফেলবে অনুরাধা।

—মড়ার মতো পড়ে থেকো না। এ খাটে আমি আঠেরো বছর ধরে শুচ্ছি, তোমার কোনও ছলচাতুরি বুঝতে আমার বাকি নেই। সত্যি করে বলো কোথায় গেছিলে ?

চন্দন শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় বলল, সত্যি কথা বললে কি তুমি বিশ্বাস করবে ?

—তবু বলো। শুনি।

চন্দনকে যেন ভূতে পেয়েছে। বিড়বিড় করে বলতে শুরু করল,—সেদিন রাত্রে ফেরার জন্য ট্যাক্সি খুঁজছি, হঠাৎ চ্যাটার্জি বলল রায়চৌধুরী আজ আর বাড়ি ফিরতে ভাল লাগছে না। বউ ছেলেমেয়ে শিলিগুড়ি গেছে, কেউ ঝামেলা করার নেই, চলুন আজ আমরা একটু বোহেমিয়ান হই। শর্মা রাজি হল না। আমিও প্রথমটা কিন্তু কিন্তু করছিলাম, তারপর চ্যাটার্জি আমাকে এমন সব কথা বলল ! বলল আমি নাকি হেনপেকড্। ছেলের পোঁধরা। মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ। আমারও কেমন রাগ হয়ে গেল, আমিও বললাম চলুন, বাড়ি ফিরে নয় সকালে বউ-এর একটু বকুনিই খাব। তখনও কি ছাই জানি এভাবে ফেঁসে যাব। শর্মা ফিরে গেল, আমরা ট্যাক্সি ধরে সোজা ডায়মন্ডহারবার। ওখানে নদীর ধারে বসে রাত দুটোর সময় মাছভাজা খাচ্ছি, দুম করে চ্যাটার্জি বমি শুরু করল। তার

সঙ্গে অসাড়ে পায়খানা। ফুড পয়জনিং। হাসপাতালে ভর্তি করতে হল। সে প্রায় যায় যায় অবস্থা। স্যালাইন চলছে। আমি গেলাম ফেঁসে। এক মুহূর্ত হাসপাতাল থেকে নড়তে পারিনি। এই তো চ্যাটার্জিকে বিকেলে কোনওভাবে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে··· বিশ্বাস না হয় তুমি চ্যাটার্জিকে ফোন করে দ্যাখো।

একদমে কথাগুলো শেষ করেই চন্দনের হুঁশ ফিরল। এ কী বিটকেল গাঁজাখুরি গল্প ফাঁদল সে! তার কি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে! এরকম আষাঢ়ে গল্প কোনও বউ বিশ্বাস করতে পারে! তাও আবার নতুন বউ নয়, দেড় যুগ ধরে স্বামীঘাঁটা বউ!

চন্দন পল গুনছে। অনুপল গুনছে। এক্ষুনি ভেঙে পড়বে তার জলের প্রাসাদ। এখনও চুপ করে আছে কেন অনুরাধা! কেন রান্নাঘর থেকে বঁটি এনে কোপ মারছে না তার গলায়? কেন ছিঁড়ে নিচ্ছে না তার জিভ?

চন্দনকে স্তম্ভিত করে অনুরাধা আচমকাই নরম অনেক, শর্মা কেন তা হলে বলে গেল তুমি অফিসের কাজে গেছ?

আআআহ্! মিথ্যে কী মহান শক্তিদাতা! জঠরের অন্ধকার থেকে সহস্র নাড়ি ছিঁড়ে বুঝি এই প্রথম পৃথিবীতে নিশ্বাস নিল চন্দন। এখন শুধু কথার পিঠে কথা সাজিয়ে যাওয়া।

—শর্মাকে আমিই বারণ করেছিলাম বলতে। ছেলেটার সামনে পরীক্ষা, তার আগে আমি হুট করে বেড়াতে চলে যাব? নিজেকেই কেমন অপরাধী লাগছিল। তোমার যখন সন্দেহ হচ্ছিল তুমি শর্মাকে ভাল করে জিজ্ঞেস করতে পারতে। শর্মাকে ফোন করতে পারতে। শর্মার বাড়িতে যেতে পারতে।

—গিয়েছিলাম কাল। তোমাদের শর্মাকে বাড়িতে পাইনি। ওর বউ বলল ভোরবেলায় কোন প্রোমোটারের সঙ্গে নাকি বেরিয়ে গেছে।

চন্দন ছোট্ট হোঁচট খেল। এ তথ্যটা তার জানা ছিল না। আরেকটু সাধু সাজার চেষ্টা করল,—আমার তো আগে থেকে কোনও প্ল্যান ছিল না, তা হলে তো সাত্যকিকেই পার্কস্ট্রিটে বলে দিতে পারতাম।

—সাত্যকি তা হলে ঠিকই বলেছিল! তুমি সাত্যকিকে দেখতে পেয়েছিলে?

—না দেখার কী আছে! সাত্যকি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে দুটো লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। সিগারেট ধরাল···

অনুরাধা চুপ হয়ে গেল। একেবারে নিঝুম। কী যেন ভাবছে। বেশ খানিকক্ষণ নীরব থেকে প্রশ্ন করল,—তুমি যখন আটকেই গেলে, ডায়মন্ডহারবার থেকে একটা ফোন করতে পারতে!

—কী করে করব? চোখের সামনে একটা লোক মরোমরো, তখন কি মাথার ঠিক থাকে? তা ছাড়া তুমি তো জান আমি অফিসট্যুরে গেছি, অফিসট্যুরে গেলে কখনও দরকার ছাড়া ফোন করি? তিনদিনের জন্য গেছি··· যেতেই পারি। আমি কী করে ভাবব তুমি আমার অফিসে গিয়ে···। অফিসের লোকরা কী ভাবল বলো তো? তোমার জন্য অফিসেও আমার মানসম্মান···

চন্দনের মুখে হাত চাপা দিল অনুরাধা,—তুমি আমাকে ছুঁয়ে বলো সব সত্যি বলছ?

—মিথ্যে কেন বলব! তোমরাই উলটোপালটা ভাবছ। যাদের জন্য জীবন পাত করি, তারাই···

—না। তুমি ছেলের দিব্যি দিয়ে বলো সত্যি বলছ।

—বলছি। বলছি। বলছি। ছেলের দিব্যি।

অনুরাধা কয়েক মুহূর্ত নিঃসাড়। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,—আমাদের মরা মেয়ের দিব্যি দাও।

চন্দনকে যেন পাহাড় থেকে ঠেলে দিল কেউ। শূন্যে ভাসতে ভাসতে খাদে পড়ছে চন্দন। নীচে। বহু নীচে।

রাজার ঠিক পরপরই এসেছিল মেয়েটা। দেড় বছরের বেশি থাকেনি। আধো আধো বুলি ফুটেছিল মুখে। বাব্বা। দাদ্দা। রাগকে বলত দাগ। জলকে বলত দদল। চন্দন ফিরলেই ঝাঁপিয়ে আসত কোলে। নিজস্ব দুর্বোধ্য ভাষায় কত কী যে বলতে চাইত বাবাকে। কুলকুল হেসে

উঠত। কারণে। অকারণে। একটা চুমু খেলে দশটা চুমু ফিরিয়ে দিত। সেই মেয়ে দুম করে মেনিনজাইটিসে···।

আজ এই অলীক রজনীতে বুবুনের কথা কি না মনে করিয়ে দিলেই চলছিল না অনুরাধার !

গলার কাছে জমাট ডেলা গিলে নিল চন্দন,—তার দিব্যি দিলেই কি তুমি সন্তুষ্ট হবে ?

—না। থাক। অনুরাধার শ্বাস ভিজে গেছে,—তুমি ঘুমোও।

পাঁচ

বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে আরেকবার দরখাস্তগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিল লাজু। খবরের কাগজের কাটিং-এর সঙ্গে ঠিকানা পোস্টবক্স মিলিয়ে দেখল। দুটো আবেদন ছোট প্রাইভেট কোম্পানির কেরানি পদের জন্য। ওগুলো হবে না, লাজুও জানে। সব জায়গায় আজকাল কম্পিউটার জানা লোক চায়, লাজু কোনও কম্পিউটার কোর্স করেনি। একটা দরখাস্ত আছে নার্সারি স্কুলের জন্য। শিক্ষিকার। আরেকটা এক ট্রাভেল এজেন্সিতে রিসেপশনিস্ট। এরা হয়তো ইন্টারভিউতে ডাকলেও ডাকতে পারে।

পাঁচ দিন ধরে বাড়ি একদম ফাঁকা। নীলিমার বাৎসরিক কাজে যাঁরা এসেছিলেন সবাই চলে গেছেন একে একে। সাত্যকির মামা মামি। পিসিমা। পরশু ইন্দুভূষণও ছোট ছেলের সঙ্গে বাঙ্গালোর পাড়ি দিয়েছেন। মাস দুয়েক থাকবেন ওখানে। লাজু সাত্যকি বেরিয়ে গেলে দশ বছরের পঙ্কজই এখন দুর্গের প্রহরী।

চিঠিগুলো ব্যাগে পুরে পঙ্কজকে ডাকল লাজু,—কী করছিস ?

পঙ্কজের দু হাত মাটিতে মাখামাখি,—গোলাপ গাছটা কী রকম শুকিয়ে যাচ্ছে মামি, তাই একটু মাটিটা খুঁড়ে...এখানে গোবর পাওয়া যায় না, না মামি ?

গাছগাছালিতে পঙ্কজের উৎসাহ খুব। ইন্দুভূষণেরও। মাঝে মাঝেই বাজার থেকে ফুলের চারা কিনে আনেন তিনি। পুরনো আমলের বাড়িটার পিছনে ছোট্ট কাঁচা উঠোন আছে, সেখানেই শুরু হয় দুজনের ফুলের পরিচর্যা। এবারে বেশ কয়েকটা বড় ডালিয়া হয়েছে। চন্দ্রমল্লিকাও। এখন গোলাপ ফুটলেই শান্তি পাবে পঙ্কজ।

লাজু মৃদু ধমক দিল,—আর কী ! রাস্তায় বেরিয়ে গোরুর পেছন পেছন দৌড়োও। অঙ্কগুলো হয়েছে ? আজ যদি বিয়োগ ভুল হয়...

যোগ আর গুণে পঙ্কজ বেশ দক্ষ। বিয়োগ আর ভাগে তার প্রবল অনীহা। সেয়ানা ভঙ্গিতে পঙ্কজ প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইল,—তুমি বেরোচ্ছ মামি ? কখন ফিরবে ?

—আমার ফিরতে সন্ধে হবে। তার মধ্যে অঙ্কগুলো যেন হয়ে যায়। আর শোনো, কেউ বেল মারলেই দরজা খুলবে না। দাদুর জানলা দিয়ে আগে উঁকি মেরে দেখে নেবে। মামা ভোরে বেরিয়েছে, হয়তো দুপুরে খেতে আসবে, যত্ন করে ভাত বেড়ে দেবে। দরজার কাছে গিয়ে আরেক বার থামল লাজু,—বেস্পতি ভারতীরা বিকেলে পড়তে আসবে, দেখবি ওরা যেন জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি না করে। মামার কাগজপত্রে হাত দিলে মামা কিন্তু রেগে যাবে।

—ও তুমি কিছু ভেবো না মামি। পঙ্কজ ওস্তাদের মতো বলল,—ওরা আমাকেও খুব ভয় পায়।

মাত্র ছ মাসেই মুখচোরা ভাব কেটে গেছে ছেলেটার। লাজু পঙ্কজের চুল ঘেঁটে দিল,—বুঝেছি। তোমার খুব দাপট হয়েছে।

মোড়ের লেটার বক্সে চিঠি ফেলে বাসস্টপে এসে দাঁড়াল লাজু। একটা বেজে গেছে। মিনিবাসে এখন ভিড় কম। ন্যাশনাল লাইব্রেরির টিকিট কাটতে গিয়ে লাজু হঠাৎই মত বদলাল। বিদিশা তিন-চার দিন ফোন করেছে, আজও সকালে একবার করেছিল,—কবে আসছিস তুই ? তাড়াতাড়ি আয়। জরুরি দরকার।

লাজু অবশ্য বলেছিল কাল যাবে। থাক, আজকেই নয় ঘুরে আসা যাক। যদিও বিদিশার জরুরি দরকার মানে হাস্যকর কোনও ব্যাপার। জানিস আমার জা আমাদের দরজায় আড়ি পাতছে ! জানিস

রুন্টুর মাস্টারমশাই আমার দিকে কীরকম আড়চোখে তাকাচ্ছিল ! কী করি বল তো ! অথবা আমার আর একটা পাকা চুল বেরিয়েছে, জানিস ! তাপস সেটা দেখেও ফেলেছে ! আমাব কী হবে রে ! এমনিতে হয়তো তিন-চার মাস কোনও খবরই নেই, কিন্তু বিদিশা একবার ফোন করতে শুরু করলে উদ্ভ্রান্ত করে ছাড়বে লাজুকে। ফোনে বলা যাবে না। চলে আয়। আজ গেলে তাও কালকের ফোনের হাত থেকে রক্ষে।

ডালহৌসি পাড়ায় একটা সরু গলিতে বিদিশার অফিস। ব্রিটিশ আমলের বাড়ির দোতলায় তিনখানা ঢাউস ঢাউস কামরা। ঢুকলেই ভিক্টোরিয়ান গন্ধ ঝাপটা মারে নাকে। অফিসটা চালায় এক বিদেশি চার্চ। গ্রামেগঞ্জে তাদের নানান সেবামূলক প্রকল্প আছে। প্রকল্পগুলোর দেখাশুনো, তাদের নতুন নতুন ভাবে সাজানো, নতুন পরিকল্পনা তৈরি করা এই অফিসের কাজ।

বিদিশা নিজের কিউবিকল-এর বাইরে দাঁড়িয়ে এক অবাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলছিল, লাজু কাছে যেতে চাপা স্বরে বলল, আমার ঘরে গিয়ে বোস। আমি আসছি।

বিদিশার মুখচোখ বেশ থমথমে। লাজু মিনমিন করে বলল, তুই কি খুব টেনশানে আছিস ? আমি তা হলে আজ...

—আহ্, যা বলছি কর। বিদিশা স্বর আরও নামাল, কথা আছে।

বিদিশার ঘরে আসবাব বলতে একটা বড় কাচ-ঢাকা টেবিল, খানচারেক ফোমে মোড়া চেয়ার, ছোট ক্যাবিনেট। টেবিলটা বেশ অগোছালো। কাটগ্লাসের ট্রেতে রাশিকৃত কাগজ দুটো ছোট ছোট লোহার চাকা দিয়ে ঢাকা।

লাজু আলতোভাবে একটা লোহার চাকা গড়িয়ে দিল, ধরে নিল অন্য হাতে। কাচের ওপর অনেকগুলো ভিজিটিং কার্ড পড়ে আছে, একটা টেবিল-ক্যালেন্ডার।

একটা কার্ড হাতে তুলে দেখছিল লাজু। বিদিশা সাহা। বি-এসসি। এম-এ। এলএলবি। ডিপ্লোমা ইন মাস কমিউনিকেশান। ডিপ্লোমা ইন পাবলিক রিলেশানস। ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি সায়েন্স। ওফ, বিদিশা পারেও বটে। আর কিছু ছিল না ? মাধ্যমিক ! উচ্চ মাধ্যমিক ! শুধু এই কার্ড দেখেই বিদিশার জীবনী লিখে ফেলা যায়। কেমন হবে জীবনীটা ?

অর্থবান অ্যাডভোকেট সুধন্য ভাদুড়ির একমাত্র মেয়ে। স্কুল থেকেই লেখাপড়ায় ভাল। অসম্ভব স্মৃতিশক্তি। একটু খ্যাপাটে ধরনের। স্কুল ছুটির পর মাথায় বইখাতার ভারী ব্যাগ ব্যালেন্স করতে করতে বাড়ি ফিরত। প্রথম প্রেম ক্লাস এইটে। প্রেমিককে চিঠিতে লিখল, তোমার বুকের খাঁচা বড় সরু, ভোরে উঠে ডনবৈঠক করতে পার না ? সে প্রেমিক ভোরবেলা উঠতেও পারল না, টিকলও না। দ্বিতীয় প্রেম ক্লাস ইলেভেনে। সে প্রেমিকের স্কুটার ছিল, যখন তখন রাস্তায় বিগড়ে যেত স্কুটারটা, স্টার্ট নিত না। একদিন রেড রোডে স্কুটার গোঁয়ার্তুমি করল, ঠেলতে ঠেলতে ফোর্ট উইলিয়াম অব্দি এসে বিদিশা বাসে উঠে পড়ল। বিদায় বঁধুয়া। তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম...। তাপস তার তৃতীয় এবং সম্ভবত শেষ প্রেমিক। বি-এসসি পাশ করার পর পরই বাড়ি থেকে পালিয়ে তাপসকে বিয়ে করে ফেলল বিদিশা। তাপস উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির ছেলে, বিশাল একান্নবর্তী পরিবার, বাবার কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে বাবুআমলের বাড়ির বিবি হল বিদিশা। শ্বশুরবাড়িতে দিনরাত বনেদিসুলভ স্বার্থপরতা, খেয়োখেয়ি, নীচতা। ওই পরিবারের কড়াইতে হাবুডুবু খেতে খেতে এই কার্ডভর্তি ডিগ্রি ডিপ্লোমা জুটিয়ে ফেলেছে বিদিশা। চাকরিটাও। দুটো বাচ্চাও হয়েছে। আর কী ? আর ?...আর... ?

বিদিশা চেম্বারে এসে সশব্দে দরজা বন্ধ করল। নিজের চেয়ার অব্দি গিয়েও ফিরল দরজায়। অল্প ফাঁক করে কী দেখছে বাইরে। তালুতে তালু ঘষছে।

লাজু জিজ্ঞাসা করল,—এ রকম করছিস কেন !

বিদিশা চেয়ারে এসে ঠোঁটে আঙুল চাপল,—আস্তে। শুনতে পাবে।

—কে শুনতে পাবে ?

—সামওয়ান। যে আমার বিরুদ্ধে কন্সপিরেসি করছে।

—অফিসে !

—হ্যাঁ।

—কীসের চক্রান্ত ?

—রায়চকে আমাদের একটা সাক্ষরতা ক্যাম্পেন শুরু হচ্ছে, তার ফান্ড আমার কন্ট্রোলে। তাই নিয়ে অনেকেই জেলাস।

নতুন খ্যাপামি। লাজু বিদিশার দিকে তাকিয়ে হাসল,—বুঝেছি। কী কথা আছে বলছিলি ?

—তাড়া কীসের ? চা খা। কফি খা। এই, ফ্রুটজুস খাবি ? নীচে খুব ভাল ফ্রুটজুস বানায়। লাজু হ্যাঁ না বলার আগেই বিদিশা বেল টিপল। বেয়ারা ঢুকেছে।—দো ফ্রুট জুস। পাইনঅ্যাপেল।

বেয়ারা নড়ছে না দেখে বিদিশার ভুরু জড়ো হল, আমাকে ডিফাই করছ কেন ? যাও।

—ম্যাডাম পয়সাটা...

—ও। কত ?

—সাত টাকা।

বিদিশা পার্স থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে দিল।

ছেলেটা চলে যাওয়ার পর বিদিশা বলল,—দেখেছিস ! কেমন ডিফাই করার টেন্ডেসি ? এই জন্যই আমার তোকে দরকার। আই নিড ইউ লাজবন্তী।

—মানে।

—আমি এ অফিসে একজন নিজের লোক চাই। পরশু এসে দেখি আমার ঘরের আলমারি অন্য ডেভেলপমেন্ট অফিসারের ঘরে চলে গেছে। কাল আমার স্টিলর‍্যাকটাও চলে গেল। বলছে নতুন অ্যারেঞ্জ করে দেবে, কিন্তু এখনও দেয়নি। দ্যাখ, পেপারওয়েটগুলো পর্যন্ত নিয়ে চলে গেছে।

—আমি এতে কী করব !

—সাত্যকি বলছিল তুই নাকি চাকরি খুঁজছিস। তুই এখানে চাকরি করবি। আমার আন্ডারে একটা প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর পোস্ট খালি হয়েছে। আমি তোকে নেব। তোর কাজ হবে শুধু গোটা অফিসটা ওয়াচ করে যাওয়া। স্পেশালি ভারগিজ, ভেঙ্কট আর পাইনকে। ওরা কী আলোচনা করে, কখন ডিরেক্টরের ঘরে যায়, টাইম টু টাইম আমাকে রিপোর্ট করে যাবি। স্টার্টিং দু হাজার। এগ্রিড ?

লাজু সব কথা শুনছিল না, গম্ভীরভাবে বলল,—সাত্যকি তোকে কবে বলল আমার চাকরির দরকার ! সাত্যকিও কি তোর অফিসে টুঁ মারে ?

—এখানে আসবে কেন ? বাড়িতে আসে। ও তো এখন তাপসের গ্রেট প্যাল।

লাজু আজকাল সাত্যকির কোনও কার্যকলাপেই চমকায় না। তবু এটা যেন একটু বেশি। সাত্যকি তাপসকে বলত লুম্পেন বুর্জোয়া। লক্কা পায়রা। তিন পুরুষের ব্যবসার তলানি ওড়াচ্ছে। বিদিশার বাড়ি লাজু যেত বলে কত আপত্তি করেছে এক সময়।

লাজু তর্ক করত, তাপসের সঙ্গে আমার কী ! বিদিশা আমার স্কুলের বন্ধু, সে কী দোষ করল যে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারব না।

—তাপসকে বিয়ে করাটাই ক্রাইম। তুমি দেখে নিয়ো ওই তাপস একদিন নিজের বাড়ির টাইলস খুলে খুলে বেচবে। শেষে হয়তো বউকেই...

সেই তাপস এখন সাত্যকির প্যাল।

লাজু প্রশ্ন করল,—সাত্যকি তোদের বাড়িতে যায় ! কবে থেকে !

—তা মাস তিনেক হবে। এই নভেম্বরে সন্দেশখালি প্রোজেক্টে গিয়েছিলাম, ফেরার পর থেকেই তো দেখি সাত্যকি আর তাপস খুব জমেছে। আমার শ্বশুর দেওর মা ভাশুর সবার সঙ্গে হেভি খাতির। এলেই আমাদের বাড়ি ভাঙা নিয়ে আলোচনা চলছে। পরশু দুপুরে নাকি টাইলস আর দরজা জানালাগুলোর জন্য পার্টি নিয়ে এসেছিল। ভাল দাম দিচ্ছে রে। দেবে না'ই বা কেন ? ইটালিয়ান মার্বেল, বার্মা টিকের দরজা জানালা।

লাজুর ঠোঁটের কোণে বিদ্যুতের মতো হাসি খেলে গেল। লুম্পেন বুর্জোয়ারাই তো এখন

সাত্যকির সম্পদ।

বেয়ারা দু গেলাস ট্যালটেলে হলুদ ফলের রস নিয়ে এসেছে। টেবিলে রাখার আগেই বিদিশা হাত বাড়াল,—চেঞ্জ ?

একটা কালচে দু টাকার নোট আর একটা কয়েন পকেট থেকে বার করে দিল ছেলেটা। বেজার মুখে বলল, গেলাস তাড়াতাড়ি ফেরত দিতে বলেছে।

দু টাকার নোটটা অনেকক্ষণ ধরে পরখ করল বিদিশা, এটা চলবে না। পালটে নিয়ে এসো।

—গেলাস দেওয়ার সময় নিয়ে যাব।

—ঠিক আছে যাও। শেষ হলে ডাকব। বেল না দিলে আসবে না।

বিদিশার আদেশের ভঙ্গি দেখে লাজু হাসি চাপতে পারছিল না। বিদিশা লাজুর দিকে কটমট করে তাকাল, তুই হাসছিস কেন ? মনে রাখিস তুই আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হচ্ছিস।

লাজু বিনরিন করে হেসে উঠল, এখনও হইনি। তারপর তোর তাপসের খবর কী ? সেইই ন'টার সময় ঘুম থেকে উঠছে ?

—হুঁহ্, তার আর কাজ কী ! দয়া করে ঘুম থেকে উঠে এগারোটায় জলখাবার খাওয়া। তিনটেয় ভাত। আর সন্ধেবেলা সেন্টফেন্ট মেখে ফুলবাবুটি।

—মাঝে কদিন বাজারে বসছিল না ? তোর শ্বশুরবাড়ির সেই মার্কেট থেকে ডেলি ভাড়া কালেকশান ?

—ও এখন বড় ভাশুর যায়। রোজ কাঁড়ি কাঁড়ি কুপন কাটা, পাহাড়প্রমাণ রেজগি গোনা, যে দোকানদার ভাড়া মারছে তার তত্ত্বতালাশ করা, এ সব কি আমার বরের পোষায় ? তার ওপর ওই কালেকশান আবার রোজকার রোজ ভাগ হয়। ছ' ছ'টা শরিক। এখন ওই যা শেয়ারের ডিভিডেন্ড আসে। বাড়ির কমন ফান্ড থেকে দু বেলা খাওয়া জুটে যায়। দিব্যি আছে।

লাজু গ্লাসে চুমুক দিল,—ইশশ, এটা তুই ভাল বলেছিলি ! এ তো একদম বিস্বাদ রে।

—ভাল লাগছে না ? আমার তো বেশ লাগে। একটু লাইট কিন্তু রংটা দারুণ না ? সোনার মতো ?

বিদিশার ওপর মায়া হচ্ছিল লাজুর। কলেজে পড়ার সময় প্যারাগনেব বাদামের শরবত পাতলা হয়েছিল বলে থু-থু করে ফেলে দিয়েছিল। আহারে, এখন শরবত সোনা রঙের হলেই খুশি !

লাজু ব্যাগ কাঁধে ঝোলাল। সঙ্গে সঙ্গে বিদিশা হাঁ-হাঁ করে উঠেছে, যাচ্ছিস কোথায় ! তিন মাস পরে দেখা হল, এত তাড়াতাড়ি চলে যাবি ?

লাজু ভয় দেখানো মুখ করে ঠাট্টা করল, তোর বিরুদ্ধে তো অফিসে চক্রান্ত চলছে, এতক্ষণ বাইরের লোক বসে থাকলে তোর বিপদ হবে না ?

ক্ষণিকের জন্য থমকাল বিদিশা। চিন্তা করল কিছু। তারপর ঠোঁট ওলটাল, কী আবার হবে ! আমি তো তোর ইন্টারভিউ নিচ্ছি।

লাজু ব্যাগ নামিয়ে রাখল, ও, তোকে একটা খবর দেওয়া হয়নি। রুদ্রদা কলকাতায় এসেছে।

—ওল্ড নিউজ। বিদিশা সামনের ফাইলের পাতা ওলটাল, গত সপ্তাহে এখানে এসেছিল। দেখা করে গেছে।

—তোর অফিসে !

—হুঁউ। তোদের কথা জিজ্ঞাসা করল। আমাদের গড়িয়ার রাহুল তপন কৃষ্ণাদের খবর নিল। ওর বয়লাডিলার কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শোনাল। ওদের লেবারদের বউরা কীভাবে বরদের কাছ থেকে মদের টাকা কেড়ে নেয়...ভাটিখানার দরজায় পালা করে পাহারা দেয়...হাসপাতালের জমি নিয়ে কী রকম গণ্ডগোল হয়েছিল...গভর্নমেন্ট লেভেলে...পলিটিকাল লেভেলে...

একটা শিরশিরে চোরা বাতাস লাজুর শিরদাঁড়া ছুঁয়ে যাচ্ছিল। হিমালয় যে খুব কাছ থেকে দেখেছে সেই জানে হিমালয়ের টান কী দুর্নিবার।

খবরের কাগজে যে দিন রুদ্রর ছবি বেরোল, সে দিনই পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল লাজুর। বাথরুমে আছাড় খেয়ে। সাত্যকি বলে ফেলেছিল রুদ্রর ছবি দেখেই লাজুর এই পতন।

সাত্যকির সন্তান ধারণ করতে চায় না লাজু !

সাত্যকি চতুর, কিন্তু নির্বোধ। সাত্যকি জানে না হিমালয়ের টানে ছুটে গেলেও হিমালয়কে আঁকড়ে ধরা যায় না। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নেশা ধরে যায়, শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। সে ভয়ংকর সুন্দর।

লাজু একটি কথাও বলেনি সাত্যকিকে। সামান্যতম প্রতিবাদও নয়। চামড়ার ওপর বিঁধে থাকা কাঁটা উপড়ে ফেলা যায়, কিন্তু যে কাঁটা মনের গভীর গোপনে অসাড়ে রক্তক্ষরণ করে চলেছে তাকে সে তুলবে কেমন করে ?

লাজু উদাসভাবে বলল,—আমাদের বাড়ি যায়নি। কেমন চেহারা হয়েছে রে রুদ্রদার ?

—স্বাস্থ্যটা ফিরেছে। রং অনেক কালো হয়ে গেছে, কিন্তু চোখদুটো কী উজ্জ্বল। বিদিশা বেল টিপল,—গ্লাস নিয়ে যাও। বোলো আজ ফ্রুটজুস ভাল হয়নি। টাকাটাও দিলে এনো।

বিদিশার ওপর একটু একটু রাগ হচ্ছিল লাজুর। একই সঙ্গে রুদ্র আর নোংরা টাকা বদলানোর কথা উচ্চারণ করছে বিদিশা, এ কী বেয়াদবি।

বিদিশার ভ্রূক্ষেপ নেই, কথার পর কথা বলেই চলেছে,—যাই বলিস, সাত্যকির কিন্তু এলেম আছে। আমার ভাশুর তো কিছুতেই পৈতৃক বাড়ি ভাঙায় রাজি ছিল না, সাত্যকি কী ভুজুং ভুজুং দিল, এখন সেই মক্কেলই ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট করে লাফাচ্ছে। বলতে বলতে হঠাৎ যেন মিলিটারি সিক্রেট ফাঁস করছে এভাবে গলা নামাল বিদিশা,—আমাদের বলেছে আমাদের ফ্ল্যাটটা এদিক ওদিক থেকে কেটে একটু বড় করে দেবে। অন্য কেউ টের পাবে না।

এ তো জানা কথাই। সাত্যকি জানে কোন মাছের জন্য কখন কী চার দরকার। বাড়িওয়ালা ভাড়াটের ঝামেলা মেটাতে কখন গুণ্ডা লাগাতে হবে, কখন টাকা। যে বিধবা মহিলা জমি হারিয়ে বাড়ির দরজায় এসে অভিসম্পাত করছিলেন, তাঁকে না চাইতেই কত টাকা জুগিয়ে গেল সাত্যকি। নিজের টাকা নয় অবশ্য, কাজলের টাকা। বিনিময়ে নিজের নাম করে পুরো জমি হাতিয়ে নিল। টাকা কাজলের। মাথা সাত্যকির। ক্ষমতা সাত্যকির। যোগাযোগ সাত্যকির। একেই তো এলেম বলে !

লাজু উঠে দাঁড়াল,—আজ চলি রে।

—তা হলে কবে জয়েন করছিস ? নেক্সট বুধবার জয়েন কর। ভাল দিন। মঙ্গলে উষা বুধে পা।

—ভেবে দেখি। লাজু ঘুরিয়ে অসম্মতি জানাল,—ভাবছি এবার প্রাইভেটে এম-এ'টা দেব। পড়াশুনোও শুরু করেছি।

—তা হলে যে সাত্যকি বলল তুই খুব চাকরি খুঁজছিস ?

—খুঁজছি। ঠিক আছে, তোকে জানিয়ে দেব।

—তাড়াতাড়ি জানাস। দেরি করিস না। বিদিশাও উঠে দাঁড়িয়েছে,—এই শোন, চন্দনদা এখন কেমন আছে রে ?

লাজু বিস্মিত হল,—কেন ! দাদার কী হয়েছে।

—ও, তার মানে এখন সুস্থ ?

—তুই আবার কবে অসুস্থ দেখলি ? এই তো দশ তারিখেও আমার শাশুড়ির বাৎসরিকে এল...খাওয়াদাওয়া করল !

—না না, তার কয়েকদিন আগে। বলছি কবে দাঁড়া। বিদিশা টেবিল ক্যালেন্ডারে চোখ রাখল,—মাসের একদম প্রথম দিকে। এই ধর, এক তারিখ আমাদের ছুটি ছিল। দু তারিখ অফিস থেকে বেরোইনি। হ্যাঁ তিন তারিখই হবে। তিন তারিখ বম্বে থেকে মাইকেল এসেছিল, ওর সঙ্গে অ্যাসেম্বলি অফ গর্ড চার্চে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে পার্ক স্ট্রিটে...। চন্দনদা ট্যাক্সির সিটে নেতিয়ে পড়ে ছিল, একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দেখে মনে হয় রাস্তায় কোথাও পড়ে-ফড়ে গিয়েছিল ! সঙ্গে সাত্যকি। সাত্যকির কাঁধে চন্দনদার মাথা।

—সাত্যকি !

—হ্যাঁ। সাত্যকি। আমি তো দেখে হাঁ। সাত্যকি বলল চন্দনদার নাকি সে দিন মাথা ঘুরে গিয়েছিল ! হাইপ্রেশার ! ডাক্তার বেডরেস্ট বলেছে ! বিদিশা আলতো হাসল,—তা হলে বোধহয় তুই ঘাবড়ে যাবি বলে তোকে কিছু বলেনি। অবশ্য বলছিস যখন তোর শাশুড়ির বাৎসরিকে এসেছে... ! যাক গে আমি তোকে বলে ফেলেছি সেটা যেন আবার সাত্যকিকে বলিস না।

লাজু ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিল না ব্যাপারটা। বউদি বলল দাদা একত্রিশ তারিখে অফিসট্যুরে গেছে। পয়লা তারিখে সাত্যকি বলল দাদাকে নাকি একত্রিশ তারিখ রাত্তিরে পার্ক স্ট্রিটে দেখেছে। তিন তারিখ সন্ধেবেলা সুস্থ দাদা বাড়ি ফিরেছে ! তিন তারিখ বিকেলবেলা পার্ক স্ট্রিটে ট্যাক্সিতে অসুস্থ দাদা ! পাশে সাত্যকি ! এই কদিনে একবারও কেউ বলেনি দাদার অসুস্থতার কথা ! সাত্যকি তো না'ই ! কোথাও একটা বড় ফাঁক আছে ! সেই ফাঁকটার কথা সাত্যকিই জানে।

বিদিশার অফিস থেকে বেরিয়ে মিনিবাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল লাজু। সূর্য টেলিফোন ভবনের পিছনে মুখ লুকোচ্ছে। বেলা ফুরিয়ে এল। লালদীঘির জলে ছোট ছোট ঢেউ। মিনিবাসের লাইন ক্রমশ সর্পিল। অফিসপাড়া ভাঙছিল।

লাজু হঠাৎ দেখতে পেল তার পাশের লাইনে ছোটকু দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য আগে। একটা স্ট্রাইপড টিশার্টে আরও বেশি রোগা দেখাচ্ছে ছোটকুকে। দাদার বিয়ের সময় ছেলেটা কী মোটাই না ছিল ! দাদা আদর করে বলত, শালা আমার কুমড়োপটাস। কতই বা তখন বয়স তাদের ! বছর দশেক ! দাদার দেখাদেখি সমবয়সি ছোটকুকে লাজুও একদিন বলেছিল, কুমড়োপটাস। টেনে এক চড় মেরেছিল ছোটকু। বাবারে, তখন ছোটকুর গায়ে কী জোর !

লাজু ছোটকুকে না দেখার ভান করলেও ছোটকু দেখে ফেলেছে, কী ব্যাপার ? এদিকে কোথায় ?

—এক বন্ধুর কাছে এসেছিলাম। লাজু হাসল, তোমার গুঁড়োসাবানের ব্যবসা কেমন চলছে ? আর তো কই আমাদের তোমার সাবান দিতে আস না ?

—দূর দূর। লাটে উঠেছে। ও সব ব্যবসা আমাদের জন্য নয়। অত ক্যাপিটাল কোথায় ? সকালসন্ধে টিভিতে অ্যাড মারো, সুন্দরী মেয়েরা হেসে হেসে লাল নীল কাপড় কাচুক, সাবান বাজারে পড়তে পাবে না। এখন যুগটাই চেকনাইয়ের। তবে সবথেকে ত্যাঁদোড় হল ডিস্ট্রিবিউটারগুলো। চশমখোর। আমাদের মতো স্মল স্কেলের পার্টি পেলে পুরো চুষে ছিবড়ে করে ছেড়ে দিচ্ছে ! মালের পর মাল গিলে অজগর হয়ে বসে আছে, টাকা চাইতে গেলেই খঞ্জনী বাজিয়ে দিচ্ছে, আজ হবে না। আজ হবে না। এদিকে গিয়ে শালার স্টক দ্যাখো, একটা মালও পড়ে নেই।

—তোমার কিন্তু সাবানের কোয়ালিটিটা ভাল ছিল।

—কোয়ালিটি দিয়ে কিস্যু হবে নারে ভাই। বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে ফেলবেই। ছোটকু অনাবিল হাসল, তোমার বরেরও তো ব্যবসার খুব রমরমা, তাই না ?

—হুঁউ।

—ওই একটা লাইন। পুরো মাছের তেলে মাছ ভাজা।

লাজুকে একটুও বিঁধল না কথাটা, উলটে মজাই পেল, বুদ্ধিমান লোকেরা সব লাইনেই মাছের তেলে মাছ ভাজতে জানে। তোমার মোটা বুদ্ধি।

—আগে এত মোটা ছিল না, জানো। অসুখটার পর থেকে...

—কী অসুখ করেছিল ?

ছোটকু লাইন ছেড়ে লাজুর পাশে চলে এল। করুণ মুখে ফিসফিস করে বলল, করেছিল নয়, করেছে। এইডস।

—যাহ ! কী বলছ তুমি ?

—হ্যাঁগো। সত্যি এইডস। এ আই ডি এস। অ্যাকিউট ইনকাম ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম। এ অসুখে মরে না, বেশি দিন ভুগলে স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। বুদ্ধি ভোঁতা হতে থাকে।

লাজু ছোট্ট চাঁটি মারল, তুমি দিন দিন আরও ফাজিল হচ্ছ।

—ফাজলামি নয়, সিরিয়াস। তোমার বরকে বলো না একটা যাহোক কিছু চাকরি জুটিয়ে দিতে।

রিসেন্টলি আরেকটা ডিজিজও ধরেছে।

—সেটা কী ?

—আছে। এক দিন তোমার বাড়িতে যাব। গিয়ে বলব। ছোটকু চোখ টিপল, তোমার সঙ্গে অন্য একটা দরকারও আছে। একটা বিজনেসের প্ল্যান এসেছে মাথায়। তুমি যদি সাহায্য করো তো এগোতে পারি।

—কী রকম ?

—বসে ডিটেলে বলতে হবে। তুমি কখন বাড়ি থাক ?

—সন্ধের দিকে এসো।

পর পর দুটো বেহালার মিনি এসেছে। লাজু জানলার ধারে সিট পেয়ে গেল। কাচ বন্ধ, তবু লাল-কালো গুজরাটি শাল ভাল করে জড়িয়ে নিল মাথায়। শাশুড়ির বাৎসরিকের দিন ঠাণ্ডা লেগে দু দিন বেশ শ্বাসকষ্ট হয়েছিল তার। ছোটবেলার অসুখ। বিয়ের পর অনেক কমে গিয়েছিল, বাচ্চাটা নষ্ট হওয়ার পর নতুন করে ফিরে এল কষ্টটা। লাজু আনমনে শ্বাস ফেলল। সাত্যকি বুঝল না। মানুষ তো তাকেই ভালবাসে যাকে স্পর্শ করা যায়, যাকে জড়িয়ে ধরে পাগল হওয়া যায়, যাকে চুম্বন করলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শিহরিত হয়।

সাত্যকি বদলে গেল।

শুধু কি রুদ্রকে ঈর্ষা করেই সাত্যকির এই পরিবর্তন ? নাকি সাত্যকির অন্তরেই লুকিয়ে ছিল লোভের বীজ ? ক্যানসারের অনকো জিনের মতো ? কোথায় যেন পড়েছিল যে কোনও সুস্থ মানুষের কোষেই এই জিন ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে। সামান্য উসকানি পেলেই বিদীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কোষ থেকে কোষে। এক দিন পচে যায় দেহ।

সাত্যকিরও কি আত্মায় পচন ধরেছে ?

ময়দানের কলজে মাড়িয়ে হিংস্র উল্লাসে ছুটছে মিনিবাস। হাওয়াকে ভেঙেচুরে। প্রান্তরে নেমেছে প্রথম মাঘের ধোঁয়াশা। রেসকোর্সের লোহার বেড়া অপার্থিব গরাদের মতো স্থির। বেড়ার ওপারে যেন এক শূন্য পৃথিবী। ছুটন্ত। কিন্তু ফাঁপা। বিলীয়মান।

চিড়িয়াখানার সামনে এসে দাঁড়াল বাস। পশুশালার মরশুমি দর্শকরা কলরোল তুলে ফিরছে। ভিড়ে মিনিবাস উপচে গেল।

অসংখ্য শিশু বৃদ্ধ নর নারীর নিশ্বাসের ভাপে কষ্ট হচ্ছিল লাজুর। মুহূর্তের জন্য সে জানালার নীল কাচ সরাল। একটু তাজা বাতাসের আশায়। সহসা চোখ রাস্তায় আটকে গেছে।

ওপাশের ফুটপাথে সাত্যকি না !

সাত্যকিই তো। লাজু জানলার রডে থুতনি চাপল। সাত্যকি অন্ধকার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। একা একা। ন্যাশনাল লাইব্রেরির গেটের দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। অন্যমনস্কভাবে বাসের দিকেও একবার তাকাল। আবার চোখ ঘুরেছে লাইব্রেরির গেটে।

লাজুর নিশ্বাসের কষ্টটা বাড়ছিল। সাত্যকি লাজুকে দেখতে পেল না।

বাড়ি ফেরার পর বেশ ভাল টান উঠছিল লাজুর। বাইরের ঘরে শিশুরা কলকল করছে, শোওয়ার ঘরে বুকে বালিশ চেপে লাজু বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বাইরের ঘরে এসে বলল, ভারতী বেস্পতি, আজ তোদের ছুটি। বাড়ি যা।

মুখ দেখেই অনেক কিছু পড়তে পারে শিশুরা। ভারতী বলল, তোমার কি অসুখ করেছে মাসি ?

—এ-একটু। আঙুল টিপে দেখাল লাজু, তোর মা কেমন আছে রে ? জ্বর সেরেছে ?

—মা তো আজ কাজে বেরিয়েছে।

—বুঝেছি। ভাল মতো বাধাবে। লাজু দরজা খুলে দিল, তোরা কাল আসিস।

ভেতরে ফিবতে গিয়ে লাজু কী ভেবে দাঁড়াল। টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাল,

—বউদি, দাদার কি মাঝে অসুখ করেছিল ? প্রেশার বেড়েছিল ? যে দিন ট্যুর থেকে ফিরল... !

—কই না তো ! কে বলল তোকে ?

—কেউ না। এমনিই আমার মনে হল। সে দিন তেমন কিছু খেল না...মা ভাল আছে ? লাজু

দুটো এলোমেলো কথা বলে লাইন ছেড়ে দিল। নিজের মনে বলল, আমি জানতাম। আমি জানতাম।

ছয়

ব্রততী আর রুমা সমস্বরে বলে উঠল, ওমা ! কী সুন্দর ! কোত্থেকে কিনলে গো দিদি ?

খাটের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে শাড়িটা। স্বর্ণাভ জমির ওপর সোনালি সুতোর ধানছড়া। সোনারং জরি। আঁচল চোখ ধাঁধানো রকমের জমকালো।

সরস্বতী পুজোর পর অনুরাধা আজ প্রথম বাপের বাড়ি এসেছে। রাজার পরীক্ষার মাত্র পাঁচ সপ্তাহ বাকি, এখন অনুরাধা পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরোয় না। দিবারাত্রি ছেলের সঙ্গে এক তানে বেঁধে রাখতে হয় নিজেকে। আজই শুধু শাড়ি কেনার তৃষ্ণায় বেরিয়েছিল একটু। একটা ঢাকাই জামদানি প্রদর্শনীর আজই ছিল শেষ দিন।

অনুরাধা ভাই-এর বউদের মুগ্ধ দৃষ্টি উপভোগ করছিল। তার হৃদয় এখন আবার সেই বদ্ধ পানাপুকুরের মতো আলোড়নহীন। মাঝে একটা উদ্বেগের ঢিল পড়ে কদিনের জন্য লন্ডভন্ড হয়েছিল ডোবা, চন্দনের স্তোক নতুন করে পানায় ঢেকে দিয়েছে তার উপরিতল।

রাজেন্দ্রাণীর গরিমায় শাড়িটা ছুঁল অনুরাধা, ম্যান্ডেভিল্ গার্ডেনস্-এর মিসেস মজুমদারের বুটিক থেকে কিনলাম। বাংলাদেশ থেকে আনা। দেখে মনে হয় না সোনা বিছোনো আছে ?

ব্রততী রুমা মেয়ে খারাপ নয়। ননদ বাড়িতে এলে দুজনেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। যদিও দুই জায়ে সম্পর্ক বেশ তিক্ত। প্রচুর রেষারেষি খটাখটির পর হাঁড়ি আলাদা হয়েছে দুজনের। দুজনের বরই সাধারণ চাকুরে এবং যে যার নিজস্ব শিবিরের একনিষ্ঠ যোদ্ধা। মাঝখানে বাবা-মা যুদ্ধক্ষেত্রের নিরপেক্ষ এলাকা। ছোটকু দুশিবিরেরই ভাড়াটে সৈনিক।

ব্রততী অপ্রিয় প্রসঙ্গটা তুলল, দাম কত পড়ল গো দিদি ?

রুমা বলল, আমি আন্দাজ করব ? দুহাজার ?

অনুরাধা মনে মনে হাসল। সত্যিকারের দাম শুনলে দুটো বউই ভিরমি খাবে। এক্ষুনি কড়কড়ে সাড়ে চার হাজার টাকা গুনে দিয়ে এসেছে। কিন্তু প্রকৃত দাম এদের সে মোটেই বলবে না। বললেই বা কেন ? দুজনেই আড়ালে চন্দনের রোজগার নিয়ে অনেক টিকাটিপ্পনী কাটে। সব কানে আসে অনুরাধার। ব্রততীর কথা রুমা পৌঁছে দেয়। রুমার মন্তব্য ব্রততী।

অনুরাধা ঠোঁট টিপে বলল, বাইশশো। বেশ সস্তা নারে ? তিনটে ইনস্টলমেন্টে দেব।

সুরমা চুপচাপ মেয়ে বউদের কথা শুনছিলেন, অনুরাধাকে বললেন, ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসিসনি তো ? কড়াইশুটির পুর করা আছে, কটা কচুরি ভাজছি, খেয়ে যা।

অনুরাধা ঘড়ি দেখল, কতক্ষণ লাগবে ? আমার কিন্তু সাতটার আগে ফিরতেই হবে।

—বোস্। সাতটা বাজতে তো দেরি আছে। কটা বেশি করে ভেজে দিই, বাড়ির জন্যও নিয়ে যা। চন্দন কচুরি ভালবাসে...

—ঝটপট করো। ঝটপট করো। আমি আগেই উঠব। ঠিক ছটায়। রাজা ছটায় টিউটোরিয়াল থেকে ফিরবে। রতনের মা যদি জলখাবার না দিয়ে চলে যায়, ছেলের মুখ হাঁড়ি হয়ে যাবে। পড়ায় মন বসবে না।

—সবসময় অত ছেলে ছেলে করিস না তো। ছেলে তোর আর সেই ছোট্টটি নেই। পরীক্ষা এসে গেছে, ওকে একটু নিজের মতো করে শান্তিতে পড়তে দে। সুরমা লঘু ধমক দিলেন মেয়েকে, তুই ছেলে মানুষ করা দেখালি বটে ! তাও আমার মতো এক গণ্ডা নয়, একটা।

অনুরাধা চুপ করে গেল। মাকে বলে লাভ নেই এ যুগে মায়েদের মতো করে আর ছেলে মানুষ করা চলে না। যুগটা এখন গতির যুগ, ল্যাঙ মারামারির যুগ, গোটা পৃথিবী এখন বিশাল রণভূমি। ডিগ্রি সার্টিফিকেট যত বেশি লম্বা হবে, তত ক্ষুরধার হবে হাতিয়ার। কেউ দাঁড়াতে পারবে না আশেপাশে। তা ছাড়া মার হাতে মানুষ হয়ে কীই বা এমন তৈরি হয়েছে মার ছেলেরা ? ডাইনে

আনতে বাঁয়ে কুলোয় না ! দিনরাত একে অন্যকে হিংসে করছে ! ছোটজন তো এখনও টোটো কোম্পানিব ম্যানেজার।

ব্রততী প্রশ্ন করল, রাজা মাধ্যমিক পাশ করে সায়েন্স পড়বে তো ?

—এটা একটা প্রশ্ন হল ! রুমাই অনুরাধার হয়ে উত্তর দিল, সায়েন্স তো পড়বেই। যা ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ! ওর খুব ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে, তাই না দিদি ? রাজা ডাক্তার হলে আমাদেরও কত ভাল হয়। বাড়িতে হাতের কাছে একটা ডাক্তার থাকে।

ব্রততী ঝাপটা মেরে উঠল, না না ডাক্তার ভাল না। ডাক্তারদের কোনও ব্যক্তিগত জীবন থাকে না। তার থেকে বরং কমার্স পড়ুক। তোমার ভাই বলছিল এখন নাকি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের খুব ডিমান্ড। যদি একটা ফার্ম খুলে ফেলতে পারে কত লাখ লাখ টাকা রোজগার !

—ডাক্তারদের রোজগার কম নাকি ? যদি কোনওভাবে বাইরে চলে যেতে পারে তো... আমার রাঙাপিসির দেওরের ছেলে তো আমেরিকাতেই সেটল্ করে গেল। সাজ্জাতিক ভীষণ নামডাক। মাসে মাসে বাবা-মাকে ডলার পাঠায়।

—আমার মেজোজ্যাঠার ছেলে চার্টার্ড হয়ে দুবাইতে পাঁচ বছর ছিল। ষাটলাখ টাকা পকেটে নিয়ে ফিরেছে।

দুই ভাজের চাপান-উতোর শুনতে শুনতে অভিভূত হচ্ছিল অনুরাধা। রাজার সম্পর্কে সবার যা প্রত্যাশা সে তো অনুরাধারই পরিশ্রমের ফল। তবু ঝগড়া যাতে উচ্চগ্রামে না উঠে যায় তাই দুজনেরই মন রেখে বলল, রুমা ভুল বলেনি রে। ডাক্তারদের রোজগার অঢেল। চার্টার্ডদেরও বাজার ভাল। তবে আমার ইচ্ছে রাজাকে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়ে এম বি এ করাব। রাজার বাবারও অবশ্য ইচ্ছে ছেলে ডাক্তারই হোক। কিন্তু ওই মড়াঘাঁটা কাজ ! ভাবলেই গা ঘিনঘিন করে।

রুমা একটু যেন ম্রিয়মাণ হল। ব্রততীও খুশি নয়। অনুরাধা তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে দুটো ছোট ছোট বিদেশি পারফিউম বার করল, এই নে, তোদের চন্দনদা তোদের জন্য সেই কবে নিয়ে এসেছিল, আমি দিতে একদম ভুলে গিয়েছিলাম। শুঁকে দ্যাখ, কী সুন্দর জংলি ফুলের গন্ধ !

তৎক্ষণাৎ রুমা ব্রততীর চোখ চকচক। অনুরাধা মাঝে মাঝেই দুই ভাইয়ের বউকে এরকম এটাসেটা উপহার ছুড়ে দেয়। এ ধরনের দানে একটা আলাদা সুখ আছে। মোসাহেবদের দিকে রাজারাজড়ার আংটি বোতাম ছোড়ার আত্মপুলক।

সুরমা প্লেটে চারটে কচুরি সাজিয়ে ঢুকেছেন, ছোটকু বলছিল একদিন তোর বাড়ি যাবে, কী দরকার আছে।

—একদিন নয়, আজই যাবে। ওর সেই অশোক বলে বন্ধু আছে, বাড়ির প্ল্যানট্যান করে, তাকে নিয়ে। ওদেরই সাতটায় আসার কথা।

রুমা কৌতূহলী হল, তুমি কি বাড়ি শুরু করছ নাকি দিদি ?

—ইচ্ছে তো ছিল আর কিছুদিন পরে করব। আরেকটু টাকাপয়সা জমিয়ে নিয়ে। কিন্তু সল্টলেকে নাকি আর জমি ফেলে রাখতে দেবে না।

সুরমা বললেন, কর, কর, তবু আমার ছেলেমেয়ের মধ্যে একজনেরও তো নিজের বাড়ি হবে। তোর বাবা তো ও সব নিয়ে ভাবলই না কোনওদিন। এই বয়সেও এখনও দিনরাত শুধু ক্লাব ক্লাব আর ক্লাব।

অবিনাশ এককালের নামকরা রেফারি। সত্তরের দশকে বেশ কয়েকটা আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। তারও অনেক আগে থেকে তিনি ময়দানের এক মাঝারি ক্লাবের কর্মকর্তা। নিজের ক্লাবে গিয়ে ঘণ্টা তিন-চার না কাটাতে পারলে ডাঙার মাছের মতো অবস্থা হয় তাঁর। রেলের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর দুপুরে খেয়ে উঠেই মাঠে চলে যান। সংসারের কোনও অভাব অশান্তি তাঁকে ছুঁতে পারে না। তিনিই এ বাড়ির একমাত্র সুখী মানুষ।

রুমা লম্বা একটা শ্বাস ফেলল, হ্যাঁ দিদি, বাড়িটা করেই ফ্যালো। বেশ একতলা কটেজ প্যাটার্নের বাড়ি করবে, সামনে ফুলের বাগান, গেটের দুপাশে পামগাছ ঝাউগাছ।

ব্রততী বলল, —দূর, একতলা বাড়িতে বড্ড মশা হয়। একতলায় শুধু বড় ড্রয়িং ডাইনিং থাকবে,

বাইরের লোকদের থাকার জায়গা, আর চাকরবাকরদের ঘর। দোতলা হবে পুরো নিজস্ব।

অনুরাধারও সেইরকম ইচ্ছে। চন্দনও একবারে গোটা বাড়ি শেষ করে ফেলতে চায়। তবু অনুরাধা বিনয়ের ভনিতা করল, দেখি ঠাকুরের কৃপায় কদ্দুর কী করতে পারি। মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে এই যথেষ্ট।

সুরমা টিফিনকৌটো প্লাস্টিকে মুড়ে অনুরাধার হাতে দিলেন, তোর শাশুড়ি এখন কেমন আছেন রে ?

—আর বোলো না, ব্যথা রোজই বাড়ছে। তোমার জামাই কত বার করে অপারেশান করার কথা বলল, কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না। এখন বোধহয় হোমিওপ্যাথি হবে। ও বলছিল কে এক ভাল ডাক্তার আছে মৌলালিতে, সে নাকি এ সব ব্যথাবেদনার চিকিৎসায় ধন্বন্তরী। তাকে দেখিয়ে যদি কিছু উন্নতি হয়।

—নামটা এনে দিস তো। ছোটকুকে বলব আমাকেও একদিন নিয়ে যেতে। আমারও কোমরটা বড় জ্বালাচ্ছে।

অনুরাধা মাকে ইশারায় ভেতরের বারান্দায় নিয়ে গেল। বউদের আড়াল করে টাকা বার করল ব্যাগ থেকে। — রাখো। পাঁচশো আছে।

সুরমা টাকাটা মুঠোয় নিয়ে অপ্রস্তুত মুখে হাসলেন, প্রতি মাসে দেওয়ার কী দরকার ! আমার বড় লজ্জা লাগে। জামাই-এর খাটুনির টাকা...

—জামাই-এর টাকা আবার কী ! জামাইয়ের টাকা মানে মেয়েরও টাকা। আমি ও বাড়ির মালকিন। আমার যাকে যা ইচ্ছে হয় দেব। তোমার জামাই নাকও গলাতে আসবে না কখনও। অনুরাধা খুনসুটি করে মার থুতনি নেড়ে দিল, চশমার ফ্রেমটা এবার বদলাও। ডাঁটি ঝুলছে যে। আর এ মাস থেকে বাবার জন্য হাফ লিটার করে আলাদা দুধ নাও।

মেয়েকে এ সব মুহূর্তে রূপকথার রানি মনে হয় সুরমার। তাঁর নিজের সারাজীবনের কষ্ট আজ সার্থক। ঘর বর ছেলে নিয়ে মেয়ে তাঁর বড় সুখী।

বেরোনোর সময় ভাইপো ভাইঝিদের আলগা আদর করল অনুরাধা। বড়র দুটি। ছোটর এক। তিনটে ফুলের মতো ফুটফুটে শিশু। তিনজনে ভাবও খুব। বড়দের কূটকচালি এখনও বিষ ঢালতে পারেনি এদের ওপর।

মান্ধাতা আমলের বাড়ির গেটের কাছে ব্রততী দৌড়ে এসে ধরল অনুরাধাকে, তোমার ছোট ভাইয়ের কীর্তি শুনেছ ?

—কী !

—মা তো তোমায় বলল না, চেপে গেল। বাড়িঅলার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে ছোটকু। পরশু নাকি ছোটকুকে রাস্তায় ধরে সোমেশ্বরবাবু যাচ্ছেতাই গালাগাল করেছেন। সিকি ভাড়া দিয়ে সারাজীবন পরের বাড়িতে কাটিয়ে যাচ্ছিস !... নিজের এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই !... বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর স্পর্ধা !... তোমার বড় ভাই তো শুনে অব্দি ফায়ার হয়ে আছে। ... কেন রে বাবা, আর কোনও মেয়ে পেলি না তুই ! বিশ বছর ধরে যারা তোদের ওঠাবার জন্যে আদাজল খেয়ে লেগে আছে...

—বাবা জানে ?

—ঠিক জেনে যাবেন। পাড়ার সবাই যখন জানে, কেউ না কেউ ঠিক এসে চুকলি খেয়ে যাবে। ব্রততীর চোখ বড় হল, কিছু মনে কোরো না দিদি, তোমার ছোট ভাইয়ের রুচিটাও ভাল না। ওই তো মেয়ে ! রূপের ধুচুনি। বস্তিমার্কা সাজপোশাক করে। তুমি ওকে একটু বুঝিয়ো। দাদার কথা তো এ কান দিয়ে ঢুকিয়ে ও কান দিয়ে বার করে দেয়, তোমাকেই যা একটু মানে টানে। আগে কিছু রোজগারপাতির ব্যবস্থা করো, টাকা থাকলে তানিয়ার মতো অনেক মেয়ে আসবে জীবনে। তা না, যত সব... এখন তো আবার কীসব শিকড়-বাকড়ের ব্যবসা মাথায় ঢুকেছে।

অনুরাধা ম্লান হয়ে গেল। দশ বছরের ছোট ভাইটির সম্পর্কে তার একটু বিশেষ দুর্বলতা আছে, সেটা জানে বলেই কি ব্রততী খুঁচিয়ে নিচ্ছে তাকে ? নাহ্, ছোটকুর একটা চাকরি দরকার। খুব

তাড়াতাড়ি। চন্দনকে বলতে হবে।

মাঘ শেষ হতে এখনও কদিন বাকি। শীত এখনই ফুরোবার কথা নয়, তবু বাতাসে অকালবসন্তের ছোঁয়া। এলোমেলো হাওয়া ছাড়ছে হঠাৎ হঠাৎ, হাওয়াতে ঠাণ্ডা নেই তেমন। দুই ঋতুর মধ্যবর্তী এ সময়টা ভাল নয়।

গড়িয়াহাট থেকে টুকটাক কিছু বাজার সারল অনুরাধা। রাজার জন্য চিজ কিনল এক কৌটো। কফি ফুরিয়ে এসেছে, এক প্যাকেট কফিও কিনল। চন্দনের জন্য নাকের ড্রপ। লাজুর মতো অত না হলেও চন্দনেরও বেশ সর্দিকাশির ধাত। শাশুড়ির জন্য ক্রেপ ব্যান্ডেজ নিল একটা। ওয়াশিং মেশিনের জন্য ফেনাবিহীন গুঁড়ো সাবানের প্যাকেট। কড়া মাজার জন্য স্টিলউল। ছোট্ট এক শিশি মশানিধনী সুগন্ধী তরল। ঠাণ্ডা অনেক কমে যাওয়াতে হঠাৎ খুব মশা বেড়েছে বাড়িতে। ঘরে মশানিবারক যন্ত্র অবিরাম জ্বালিয়ে না রাখলে রাজার লেখাপড়া করতে বড় কষ্ট হয়।

সান্ধ্য ভিড়ে হাঁটতে হাঁটতে অনুরাধা বিউটিপার্লারের সামনেও দাঁড়াল একবার। অনেকদিন ফেশিয়াল করা হয়নি, ভুরুর নীচটাও এবড়ো খেবড়ো কালো হয়ে গেছে। আগে ছেলে স্কুল গেলে দুপুরবেলাটা অনুরাধা নিজের পরিচর্যার সময় পেত, রাজার টেস্ট হয়ে যাওয়ার পর থেকে পার্লারে আসা প্রায় ভুলে যাওয়ার জোগাড়। আটত্রিশ বছর বয়সেও অনুরাধা যথেষ্ট লাবণ্যময়ী, শরীরের গড়নও তার বেশ আঁটোসাঁটো। পেটে সামান্য চর্বি ছাড়া আর কোথাও বয়স তেমন ঘাঁটি গাড়তে পারেনি। তবু এই বয়সেই দেহ কিছু বাড়তি যত্ন চায়। চন্দনও খুব পছন্দ করে তার ঝকঝকে চেহারা। কিন্তু আজ অনুরাধার সময় নেই একটুও।

কেনা জিনিসপত্র ভাল করে কাঁধে ঝুলিয়ে নেওয়ার সময় ভ্যানিটি ব্যাগ আরেকবার খুলল অনুরাধা। ব্যাগের ভেতরটাকে অনুভব করল মনে মনে। একশো টাকার নোট, পঞ্চাশ টাকা, দশ টাকা, পাঁচ টাকা, খুচরো পয়সা যেমন তেমন ছড়িয়ে আছে ব্যাগের তলদেশে। গাছের নীচে ঝরাপাতা, পাথরকুচির মতন। এভাবে অবহেলায় টাকা ছড়িয়ে রাখতে ভারী তৃপ্তি পায় অনুরাধা। তাদের কলেজের সহপাঠী, ডাক্তারের মেয়ে মন্দিরা ঠিক এভাবেই প্রচুর টাকা ছড়িয়ে রাখত ব্যাগে। রেস্টুরেন্টে বন্ধুদের বিল দিতে দিতে না, মুঠো করে টাকা তুলে বেয়ারাকে বলত,—কত ? অনুরাধার সেসময় সাপ্তাহিক বরাদ্দ তিন টাকা। তার তৃষ্ণার্ত চোখ গেঁথে থাকত মন্দিরার ব্যাগে। এখন অনুরাধারও ওইভাবে টাকা ছড়িয়ে রাখার ক্ষমতা হয়েছে। এ যে কী সুখ।

অনুরাধা ব্যাগটা বুকে চাপল। যদি মন্দিরা তার বন্ধু না হত তা হলে কি একটু অন্যরকম হত জীবনটা !

—ছোটকু আসেনি তোমার সঙ্গে ?

অশোক ছেলেটি তেমন সপ্রতিভ নয়, অনুরাধার প্রশ্নে আড়ষ্ট হয়ে গেল,—ওর তো আমার বাড়িতে আসার কথা ছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, এল না। আপনাকে টাইম দেওয়া আছে, তাই নিজেই চলে এলাম।

—ভালই করেছ। বোসো। জিনিসগুলো রেখে আসি।

অনুরাধা ভেতরে চলে গেল। প্রতিভা ছেলেটির সঙ্গে কথা বলছিলেন, ফিরে এসে অনুরাধা উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করল, মা, রাজা এখনও ফেরেনি ?

—ফিরেছিল তো। এসে একবার তোমার খোঁজ করল, তারপর হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল।

—কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করেননি ?

—না তো। একদম ভুলে গেছি।

কোনও কাজে যদি আসে বুড়ি ! অনুরাধা ঢোক গিলে বিরক্তি চাপল, একে চা টা দিয়েছেন ?

অশোক লজ্জা পেল, না না, উনি বলেছিলেন। আমি চা খাই না।

অনুরাধা সোফার হাতলে হাত ছড়িয়ে দিল, ছোটকু তোমায় জমিটা দেখিয়েছে ?

—হ্যাঁ। আপনাদের ফ্রন্টেজটা তো ভালই। আর একদম স্কোয়্যার প্লট। ওরকম জমিতে প্ল্যান করতে কোনও অসুবিধে হয় না।

চন্দন অফিস থেকেই জমিটা কেনার সুযোগ পেয়েছিল। অনুরাধাকে বিয়ে করার পর পরই। দুই থেকে তিন কাঠার প্লট। গোটা পনেরো প্লট এসেছিল। জলের দরে। নামকাওয়াস্তে লটারিও হয়েছিল একটা। অর্ধেক নগদ, বাকিটা মাইনে থেকে কেটেছে মাসে মাসে। অদ্রিনাথের একটুও পছন্দ ছিল না জায়গাটা। এক সময়কার মেছো ভেড়ি। ড্যাম্প হবে। লোকালয় নেই। বাবার অমতেই গোপনে জমিটা কিনে ফেলেছিল চন্দন। অনুরাধার চাপে। অনুরাধা লুকিয়ে লুকিয়ে আটগাছা চুড়ি বেচেছিল, এক জোড়া মকরমুখী বালাও। চুড়ি বালা চতুর্গুণ হয়ে ফিরে এসেছে ব্যাঙ্কের লকারে। জমিটা এখন ফাউ।

অনুরাধা বলল, প্ল্যান নিয়ে এসেছ ?

—রাফ দু-তিনটে করেছি। যদি আপনাদের পছন্দ হয়, ডেভেলাপ করব।

ফোলিও ব্যাগ থেকে কয়েকটা কাগজ বার করল অশোক। এক একটা কাগজে বাড়ির এক একরকম চেহারা। বাইরের আদল স্পষ্ট করে আঁকা, কিন্তু অন্দর এলোমেলো।

একটা বাড়ি অনুরাধার বেশ মনঃপুত হল। দোতলায় গোল বারান্দা, মোটা মোটা থামের রেলিং, একতলার ড্রয়িংরুম থেকে ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়, পাশের ড্রয়িং-এ ফ্রন্ট এলিভেশান, সাইড এলিভেশান আরও কী সব লেখা।

অনুরাধা জিজ্ঞাসা করল,—এ সব কী ?

শ্যামবর্ণ লাজুক অশোক অনেক সপ্রতিভ এখন,—ও সব টেকনিকাল্ ব্যাপার দিদি। এই যে এখানটায়··· ছেলেটা কাগজে ঝুঁকল,—ড্রয়িংরুম থেকে তিন ধাপ ওপরে, এইখানে হবে আপনাদের খাবার জায়গা। ডানপাশের সিঁড়ি দিয়ে নামলে কাজের লোকের ঘর, একটা বাথরুম। আর ওপাশে কিচেন। পেছনে একটা বারান্দাও থাকবে। ছোট। একটু কোর্টইয়ার্ডও।

প্রতিভা চুপ করে শুনছিলেন, হঠাৎ বললেন, কাজের লোকেরও ঘর থাকবে ? তোমরা তা হলে বেশ বড় বাড়ি করছ অনু ?

অশোক উত্তর দিল, বড় তো বটে। বড়ই। দুটো তলা মিলিয়ে আড়াই হাজার স্কোয়্যার ফিট জায়গা পাবেন।

—একবারে দোতলা উঠবে ? প্রতিভার চোখ গোল গোল, সে তো অনেক টাকার ধাক্কা !

অনুরাধা হালকা হাসল,—আপনার ছেলের একবারেই দোতলা তোলার ইচ্ছে। তাতে খরচ কম পড়ে। আচ্ছা অশোক, তুমি দু-একটা ফরেন জার্নাল আনতে পারলে না ? ওতে আরও ভাল ভাল ডিজাইন থাকে।

অশোক হেসে ফেলল,—এ এক অদ্ভুত খ্যাঁচাকল হয়েছে দিদি। যে বাড়িতেই প্ল্যান নিয়ে যাই, তারা বিদেশি বাড়ির মডেল চায়।

অনুরাধা ভুরু কুঁচকোল,—এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে ! এটাই তো স্বাভাবিক। ওদের চিন্তাভাবনা কত আধুনিক ! কত কম্প্যাক্ট ! অথচ অসাধারণ সব বাড়িঘর !

—কিন্তু দিদি, এটা তো ইংল্যান্ড আমেরিকা নয়। ওদের আলো হাওয়া একরকম, বৃষ্টি বাদলার নেচারও আলাদা, বেসিকালি ওগুলো সব শীতপ্রধান দেশ, ওদের বাড়ির স্টাইলে এ দেশে বাড়ি করলে স্বাস্থ্যকর হবে কেন ? তা ছাড়া আপনার বাড়ি অন্যের মতো হবেই বা কেন ? আপনি যে বাড়িটা করবেন, পৃথিবীতে ওরকম বাড়ি একটাই থাকবে, সেটাই কি গর্বের নয় ?

বাহ্, বেশ ভাল কথা বলেছে তো অশোক ! অনুরাধার সবকিছু পৃথিবীতে একটা করে থাকাই তো সঙ্গত। একক সুখের মতো।

অনুরাধা আবিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করল—কীরকম পড়বে স্কোয়্যারফিট ?

—যদি আমাকে করতে দ্যান স্কোয়্যারফিট তিনশোতে নামিয়ে দেব। আরও কমে হয়ে যেত, কিন্তু মেটিরিয়ালের দাম রোজ যেভাবে বাড়ছে।

—তুমি আগে কটা বাড়ি করেছ ?

—আগে করিনি। করলে এই প্রথম করব। তবে দেখবেন প্রাণ ঢেলে করব।

অনুরাধা অশোককে আরেকবার ভাল করে দেখল। আশায় উজ্জ্বল মুখ। উত্তেজনায় নাকের

পাটা ঘামছে ছেলেটার। বয়স কতই বা হবে, ছোটকুর চেয়ে ছোটই মনে হয়। ছোটকু বলছিল ছেলেটা খুব সিনসিয়ার। সিভিলে ডিপ্লোমা নিয়ে পাশ করার পর দু-একটা কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে কাজ করেছে। মালমশলার গুণগত মান নিয়ে খুঁতখুঁতে বলে কোনও কন্ট্রাক্টর নাকি পছন্দ করে না ছেলেটাকে।

অনুরাধা কৌতুকের স্বরে বলল, তা হলে সাত-আট লাখ টাকার গাড্ডায় নামিয়ে দেবে বলছ ?

—দিদি, টাকা মাটি, মাটি টাকা। আপনারা টাকার ভাবনায় পিছিয়ে গেলে···। আপনি জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখবেন, অন্য কন্ট্রাক্টর মিনিমাম দশ চাইবে।

কথার মাঝখানে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে রাজা। মার কটমট চোখ অগ্রাহ্য করে সোফায় বসে পড়ল। তার উৎসুক চোখ গিলছে অশোক আর অনুরাধার আলোচনা।

অশোক উঠে যাওয়া পর্যন্ত রাজা কোনওরকমে নিজেকে সংবরণ করে ছিল, দরজা বন্ধ হতেই খুশিতে লাফিয়ে উঠেছে, বাড়ি তা হলে স্টার্ট !

অনুরাধা নিজের ঘরে গিয়ে কাপড় বদলাচ্ছিল, সেখান থেকেই বলল, এক্ষুনি নয়। শুরু হতে হতে পয়লা বৈশাখ। তোমার পরীক্ষার পর।

—কদিন লাগবে শেষ হতে ?

—আমার প্ল্যান আছে পুজোর আগে ঢুকে যাব।

—ওয়াও ! কী রং হবে মা বাড়িটার ?

—তোর কী রং পছন্দ ?

—সাদা।

—আমারও সাদা। কার্নিশে মেরুন বর্ডার।

—না মা, মেরুন না। নেভিব্লু। রাজা অনুনয় জুড়ল, ছাদে আমার জন্য একটা কাচের ঘর করে দেবে ?

অনুরাধা চিজের কৌটো রাখছিল ফ্রিজে, ছেলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্রয়ের হাসি হাসল, কাচের ঘরে কী করবি ?

—কিছু একটা করব। কাচের ঘর সব বড়লোকদের বাড়িতে থাকে।

—ছাদে একটা অর্কিড হাউস করলে কেমন হয় রে ?

—গ্র্যান্ড আইডিয়া। কণাদদের বাড়িতে অনেক রেয়ার অর্কিড আছে। ওর কাছ থেকে আমি···

—লোকের কাছ থেকে নেব কেন ? আমরা কিনে নেব।

অনুরাধা চোখের সামনে দোতলার গোল বারান্দাটাও দেখতে পাচ্ছিল। ইজিচেয়ারে বসে আছে অনুরাধা, ডোবার আগে সূর্য তার শেষ লালটুকু অনুরাধার পায়ে লুটিয়ে দিয়েছে। দখিনা বাতাসে উড়ছে অনুরাধার চুল। অন্তরাগে বাড়িটা সাদা থেকে সোনালি। সোনালি থেকে গোলাপি। গোলাপি থেকে কুসুমলাল। অনুরাধা ছেলের চোখে স্বপ্নটাকে বুনে দিতে চাইল,—বুঝলি রাজা, দোতলার বারান্দায়, সামনে বেলিঙ থাকবে। রেলিঙের গায়ে সার সার টব। চন্দ্রমল্লিকা। গোলাপ। ডালিয়া। জিনিয়া। নীচের মাটি থেকে একটা জুঁইগাছ বারান্দা অব্দি উঠিয়ে নেব। বর্ষাকালে ফুলে ফুলে ভরে থাকবে গাছ। গন্ধে ম ম করবে চারদিক।

—গেটের সামনেটা ফাঁকা থাকবে নাকি ?

—সে ঝাউফাউ লাগানো যাবে। একটা মেক্সিকান ঘাসের লন করলেও মন্দ হয় না, কী বল ? ফোলা ফোলা ! নরম নরম ! বিকেলে সবুজ ঘাসের গালচে মাড়িয়ে হাঁটব আমরা। ভাবছি তোর পরীক্ষা শেষ হলে কিছু অ্যান্টিক কালেকশান করব। পার্ক স্ট্রিটের নিলামের দোকানগুলোতে কী অপূর্ব সব জিনিস আসে ! একবার একটা ঝাড়লণ্ঠন দেখেছিলাম, তার যে কত শাখা ! একটু হাওয়া দিলেই টুংটাং করে বাজে।

প্রতিভা পাথরের মতো সোফায় বসেছিলেন, ডাকলেন, অনু।

অনুরাধার ঘোর কাটল না।

প্রতিভা আবার ডাকলেন,—ও অনু !

—কী হলটা কী আপনার ? রাত্রে কী খাবেন, তাই তো ? আজ আপনার খই দুধ।

প্রতিভার যেন কানেই গেল না কথা, আপন মনে বিড়বিড় করে বললেন,—ও অনু, অত লাখ লাখ টাকা আমার চাঁদু পাবে কোত্থেকে ?

—নতুন ক্রেপ ব্যান্ডেজ এনেছি, ঘরে গিয়ে ভাল করে বেঁধে নিন। বাস্তবে ফিরে অনুরাধা কর্কশ, ছেলে কোত্থেকে টাকা পাবে তাতে আপনার কী দরকার ?

অনুরাধা চন্দনকে ঠেলল, ঘুমোলে ?

আজকাল প্রায়শই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে চন্দন। নেশার মাত্রাও কমেছে অনেকটা। ঘুমও কমেছে তার। বিছানায় শুলেই মাথার পিছনটা দপদপ করে। রক্তচাপ ? না দংশন ?

চন্দন সোজা হয়ে শুল,—রাজা শুয়ে পড়েছে ? কটা বাজে ?

—একটা। অনুরাধা পাশ ফিরল,— জানো, আজ ছেলেটা এসেছিল।

—কোন ছেলেটা ?

—ছোটকুর সেই বন্ধু। অশোক। বাড়ির প্ল্যান দিয়ে গেছে একটা।

—খাওয়ার সময় তো কিছু বললে না ?

—বলব কী করে ! তোমার ছেলে, তোমার মা সকলের ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে অত মনে থাকে ?

—ও সব আলতু ফালতু ছেলেকে দিয়ে আমি বাড়ি করাব না। আমার সাত্যকির সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। ওই যা করার করবে।

অনুরাধা অল্প দমে গেল, ছেলেটার প্ল্যানটা তো দ্যাখো। যদি পছন্দ না হয় তখন···

—পছন্দ ফছন্দের কিছু নেই। প্ল্যান ট্যান যা করার সব সাত্যকিই করবে।

—সাত্যকি সাত্যকি করছ, আত্মীয়স্বজনকে দিয়ে করানোর বিপদ জানো ? পরে কিছু বলতে পারবে না, মালমশলা খারাপ দিলেও হজম করতে হবে।

—ছোটকুর বন্ধু বাজে কাজ করলে কাকে শোনাবে ? ছোটকুকে ? তোমার ওই অপোগণ্ড ভাইটাকে ?

—অপোগণ্ড বলছ কেন ? কোলপোঁছা ছেলে, সবার ছোট, একটু বেশি আদর পেয়েছে। ও কি কিছু চেষ্টা করছে না ? ব্যবসাটাও ঠিক ধরল না···

—তোমার ভাই-এর জন্যই ব্যবসা লাটে উঠেছে। ওরকম উড়ু উড়ু চেহারা নিয়ে সাবান বেচা যায় না। কলকাতার পথেঘাটে টাকা উড়ছে, কিন্তু কামানোর জন্য অনেক ড্যাশিপুশি হতে হয়।

—কী যে হবে ছেলেটার। আবার শুনছি প্রেম করছে।

—ওটাই ওর যোগ্য কাজ। চন্দন খিকখিক করে হাসল, ভিক্টোরিয়ায় বসে জলে চাঁদের ছায়া দেখবে আর ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। এই তো অ্যাভারেজ বাঙালি ছেলের অবস্থা !

—তোমার তো এত চেনাশুনো, দ্যাখো না ছোটকুর জন্য কোথাও যদি কিছু করে দেওয়া যায়। অনুরাধা চন্দনের কাঁধ ছুঁল, ছোটখাটো যা হোক একটা চাকরি···

—আমি কী ভাবে করব ?

—বারে, তোমাকে কোম্পানিগুলো এত ভয় পায় ! যারা তোমাদের কাছে আসে তাদেরই তো বলতে পারো।

—ভয় পায় বলেই ঘরে অতগুলো করে টাকা আসে। এত ভয় কি পায় যে আমার ওই শালাকেও পুষবে ? তা ছাড়া মালকড়িও নেব, শালাকেও ঢোকাব, দুটো একসঙ্গে হয় না।

—তবু একবার বলে দেখতে দোষ কী ?

—অসম্ভব। মুখের ওপর না বলে দিলে আমার সম্মান থাকবে ?

অনুরাধা হাত সরিয়ে নিল। বন্ধ কাচের শার্শি ভেদ করে রাস্তার আলো ঢুকতে চাইছে ঘরে। টানা ভারী পর্দা শাস্ত্রী হয়ে কড়া পাহারায় দাঁড়িয়ে।

অনুরাধা বলল, আমার ভাইয়ের জন্য করবে কেন ? নিজের বোন ভগ্নীপতি হলে··· এত যে

সাত্যকি সাত্যকি করো, সাত্যকি তোমার কথা কতটা ভাবে ? একের নম্বরের চালিয়াত।

—কেন ? সে আবার তোমার কোন পাকা ধানে মই দিল ?

—কাজের কাজ কিছু নেই, লোককে খালি ভয় দেখিয়ে বেড়ায়। কত বার করে বললাম তুমি ফিরছ না, তোমার একটু খোঁজখবর করতে, একটি বার টিকিও দেখা গেল না তখন !

চন্দন নীরব।

—কদিন আগেও তা সাত্যকিকে সহ্য করতে পারছিলে না ! বোনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে ! পার্টির জোরে কব্জি ঘোরায় ! হঠাৎ যে তোমাকে কী জাদু করল !

—বুঝতে ভুল হয়েছিল। সাত্যকির মতো ছেলে কটা আছে ! সেলফ্‌মেড ম্যান....

—হাতি। লাজু তো বলে চিটিংবাজির পয়সা। ওই জন্যই তো লাজুর সঙ্গে বনছে না।

—ও কিছু নয়। স্বামী স্ত্রীতে একটু আধটু খটাখটি হয়ই। তেমন বাড়াবাড়ি দেখলে আমি লাজুকে ধমকে দেব।

—হুঁহ ! তুমি ধমকাবে, আর লাজু সুড়সুড় করে গর্তে ঢুকবে। কত যে তোমায় কেয়ার করে।

—আমি বুঝিয়ে বললে ও নিশ্চয়ই শুনবে। ও আমার বোন।

অনুরাধা মুখ বেঁকাল, তুমিই বোন বোন করে মরো। সে তোমায় কত ভক্তিশ্রদ্ধা করে তা আমার জানা আছে।

চন্দন নিঃশব্দে উলটো দিকে ফিরে শুল।

অনুরাধা আরেকটু হুল ফোটাল, দাদার খোঁজ নেওয়ার কী বহর। দাদার কি প্রেশার বেড়েছিল বউদি ?

—আমার শরীরের কথা উঠল কীসে ?

—কেন উঠল তোমার বোনই জানে ! কথার কী কায়দা। যেদিন ট্যুর থেকে ফিরল, সেদিন কি দাদা অসুস্থ ছিল বউদি ?

চন্দন নিম্ন স্বরে বলল, তুমি কী বললে ?

—বললাম, বাজে কথা। তুমি সুস্থ। এ সব আলগা পিরিত যে কেন দেখায়।

চন্দন লম্বা নিশ্বাস ফেলল। ধীরে ধীরে। একটু সময় নিয়ে বলল, ওভাবে বলছ কেন ? দুশ্চিন্তা হয়েছে বলেই না জানতে চেয়েছে !

বিছানা থেকে নামল চন্দন। ছোট্ট উঠোনটা সমকোণ ছাঁদের বাড়ির ঠিক মাঝখানে। মধ্যনিশীথে চাঁদ মোহ বিছিয়েছে সেখানে। বড় নির্জন, বড় মায়াময় এ সময়। কয়েক মুহূর্ত বিজন দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থাকল চন্দন। তারপর ঘরের আলো জ্বালল। ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ার টেনে খুটখাট খুঁজছে কিছু।

অনুরাধা চোখ কুঁচকে তাকাল, কী খুঁজছ ? নাকের ড্রপ ? এখানে আছে। তোমার বালিশের নীচে।

—না। দেশলাই।

—এখন সিগারেট খাবে নাকি ? আলোটা নিভিয়ে দাও।

আলো নিভিয়ে সিগারেট ধরাল চন্দন, জানলা অল্প খুলে কাঠি বাইরে ফেলল। তার হাত কাঁপছিল। অনুচ্চস্বরে বলে উঠল,

—তুমি আমাকে বিশ্বাস কর অনু ?

চন্দনের গলায় এমন কিছু ছিল, অনুরাধার বুক কেঁপে গেল।

—এত দিন আমরা একসঙ্গে আছি, আমাদের সম্পর্কের ভিতটাই তো বিশ্বাস, তাই না ?

মশারির ওপারে চন্দন, ভেতরে অনুরাধা। দুজনের মাঝে এক ভৌতিক জালের ব্যবধান।

অনুরাধা উঠে বসল, তোমার হঠাৎ কী হল ? রাত দুপুরে আবোল তাবোল বকছ কেন ?

চন্দন নিঝুম।

—এসো, ভেতরে এসো। শুয়ে পড়ো।

বাধ্য বালকের মতো চন্দন বিছানায় এল। পাশাপাশি শুয়েছে দুজনে। অনুরাধা হাত রাখল

চন্দনের বুকে, হলটা কী ?

—আমি শালা এক জালি লোক। দুনম্বরি। আমার কোনও চরিত্র নেই।

পলকের জন্য স্থাণু অনুরাধা। তারপর চন্দনের গায়ে ভাল করে টেনে দিচ্ছে লেপটা, এতদিন পর এ সব কথা উঠছে কেন ? অনুরাধা চন্দনের চুলে আঙুল ডোবাল। এই চুল পেয়েছে তার ছেলে। মোটা। রুক্ষ। শিশুকে ভোলানোর ভঙ্গিতে বলল, তুমি তো অন্য কাউকে ঠকাওনি। বঞ্চিত করোনি। অন্যের টাকা ভুলিয়ে ভালিয়ে কেড়ে নাওনি। যারা অন্যায় করে তারাই চুরি ঢাকতে তোমাকে টাকা দেয়।

—ঠিক। ঠিক। যে যেখান থেকে পারছে লুটে পুটে খাচ্ছে। একজনও শালা ঠিক নেই। আমি একা বউ বাচ্চা নিয়ে আঙুল চুষব ? আমাদের কলেজের সুখময় কেঁদেকেটে ফরটি পারসেন্ট পেয়েছিল। সে এখন তিনটে গাড়ির মালিক। ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের ব্যবসা করে অট্টালিকা হাঁকিয়েছে। আমাদের স্কুলের রাঘব, ফালতু ছেলে, বাপের পয়সায় আমেরিকা ঘুরে এসে এখন কম্পিউটার এক্সপার্ট। বছরে ছ লাখ টাকা মাইনে ! আমি তাদের থেকে কীসে কম ছিলাম ? আমি কেন তাদের মতো করে বাঁচতে পারব না ? চন্দনের স্বর গমগম করছে, সবাই দুনম্বরি। মন্ত্রী আমলা নেতা বিজনেসম্যান থেকে সাধুসন্ন্যাসীরা পর্যন্ত। ভগবান যে ভগবান সেও শালা ঘুষ খায়। মালদার ভক্ত দেখলে তারও লাল পড়ে। তা হলে আমি খেলে দোষ কী ?

—সবই যখন বোঝ, এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ?

—প্রথম প্রথম টাকা দেখে তুমিও তো বুলি ঝাড়তে। পাপ লাগবে ! কী হয়েছে আমাদের ? কেউ চুলের ডগাও ছুঁতে পেরেছে ? বিপদ এসেছে, সে তো পুণ্যবানদেরও আসে ! আমার বাবার আসেনি ? যাই হোক, সব বিপদ থেকে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে তো পেরেছি ! ওই যে ওই ঘরে শুয়ে আমাদের ছেলে, ওর জন্য এতগুলো মাস্টার লাগিয়েছি, দেখো ও ঠিক মাধ্যমিকে স্টার পাবে। উচ্চ মাধ্যমিকেও ভাল রেজাল্ট করবে। করিয়ে ছাড়ব। দশজনকে দেখিয়ে দেব ছেলে মানুষ করা কাকে বলে ! ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কিছু একটা হবে, ঘ্যামা চাকরি করবে, অঢেল টাকা কামাবে, আর আমরা বুড়োবুড়ি পায়ের ওপর পা তুলে...

—অনেক দূর ভেবে ফেলেছ। এবার থামো। অনুরাধা রাতচরা পাখির মতো হেসে উঠল। আরেকটু ঘন হল চন্দনের ; —আমি কিন্তু মাকে বলেছি আমরা শিগগিরই বাড়ি শুরু করছি।

—আলবত করব। চন্দন অনুরাধাকে জড়িয়ে ধরল ; বৈশাখে শুরু করে বর্ষার আগে ছাদ ঢেলে দেব। পুজোর আগে ঢুকে যাব নিজের বাড়িতে।

—কত টাকা লাগবে খেয়াল আছে ? ছ-সাত লাখ। অনুরাধা একটু কমিয়ে বলল।

—হয়ে যাবে। চন্দন অনুরাধাকে টেনে নিয়ে গালে গাল ঘষল। বেশ অনেকদিন পর শরীরে শরীর মিলছে আজ। অভ্যস্ত দুই চেনা দেহে বুনো নবীন ঘ্রাণ।

ক্লান্ত চন্দন চোখ বুজে শুয়ে আছে, অনুরাধা ফিসফিস করে বলল, ছোটকুর বন্ধুর প্ল্যানটা একবার দেখলে পারতে। বেশ ভাল করেছে।

—দিও। দেখব।

ভেতরের উঠোনে শব্দ হচ্ছিল। নিষ্ফলা পেঁপে গাছে বাতাস বাজছে। বাতাসকে টোকা দিয়ে কোনার ঘরের ছিটকিনি নামল। প্রতিভা বাথরুমে যাচ্ছেন। তাঁর পা ঘষে ঘষে চলার শব্দ, একা একা দেওয়ালে হাত রাখার আওয়াজ, এমনকী নিশ্বাসের ধ্বনিও স্পষ্ট ভেসে আসছিল ঘরে।

চন্দন কান পেতে শব্দ শুনছিল। অনুরাধা ঘুমিয়ে পড়েছে।

সাত

আজকাল যখন তখন দৃশ্যগুলো চন্দনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দৃশ্য নয়, বিভীষিকা। শীলা সেনের ফ্ল্যাট। অনুরাধা। থানার লকআপ। রাজা। কাঠগড়া। চন্দনের কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই আর। তবুও। কেন এমন হয় ?

চন্দন একগোছা রিটার্নে মুখ গুঁজে দিল। খুব একটা কিছু দেখার নেই, সব কোম্পানিই এখন মাথাঅলা অ্যাকাউন্টেন্ট পোষে। মাসিক হিসাবে কতটা দুধে কতটা জল মেশাতে হবে তারাই স্থির করে দেয়। যেটুকু তারা পারে না, তার জন্য কম্পিউটার আছে। বিজ্ঞান এখন লুণ্ঠনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

তবু কোথায় দুধ, কোথায় জল তা ঠিক ধরে ফেলে চন্দন। বাজপাখির দৃষ্টি তার! চন্দন একটা রিটার্নে এসে থামল। মেসার্স অ্যাপেক্স কেমিকালস। তরুণ পঞ্জাবি ইঞ্জিনিয়ারের কোম্পানি। বছর দুয়েক ধরে কপার ওয়্যার নিয়ে জোর লড়ছে ছেলেটা। সরকারি কাগজপত্র সব ঠিকঠাক রাখার চেষ্টা করে। ভেজাল না মিশিয়ে। কালও পরমজিৎ অফিসে এসেছিল। ট্যাক্সের বহর দেখে খেপে কাঁই। একটুও আঙুলে ঘি লাগাতে রাজি নয় ছেলেটা। এবার ওকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। আরে তুই চুরি করিস আর না করিস, আমার যে তোকে বিপদে ফেলার ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতাটাকে সম্মান জানাবি না তুই!

পেল্লাই হলঘরের এক ধারে টানা কিউবিক্‌ল্‌-এর সারি। প্লাইউডের পার্টিশন। সুয়িংডোর। দরজায় দরজায় নেমপ্লেট। আশি-নব্বই বর্গফুট আয়তক্ষেত্রের ছোট ছোট সাম্রাজ্য। পৃথক পৃথক শাসনকক্ষ। প্রতিটি ঘরে কাঠের র‍্যাকে ডাঁই কাগজের স্তূপ, ফাইল, খাতাপত্র। সাম্রাজ্যের দলিল দস্তাবেজ। এত ধুলো সেখানে, যে আরশোলা মাকড়সারাও ঘোরাফেরা করতে বিরক্তি বোধ করে। কেবল ইঁদুরদেরই এখানে অবাধ প্রবেশাধিকার। নির্দিষ্ট কাগজ, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট প্রয়োজনে নির্বিবাদে খেয়ে চলে যায় তারা। হলঘরের বাকি অংশ একটি আধুনিক গ্রাম্য হাট। মাত্র তিন বছর বয়স হয়েছে ভবনটির, এর মধ্যেই প্রত্যেকটি দেওয়াল পানের পিক, কফ, নানারকম রহস্যময় দাগে আকীর্ণ। নিষ্প্রভ। সিলিং-এর ঝুলন্ত কালো জটা অফিসের মহিমা বাড়িয়েছে। বাথরুমে উগ্র অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝ এই দেওয়ান-ই-আমের পবিত্র সৌরভ।

শুদ্ধশীল ভট্টাচার্য চন্দনের দোলদরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল, রায়চৌধুরী, তোমার ইনকাম ট্যাক্সের অ্যানুয়াল রিটার্ন হয়ে গেছে?

অফিস কলিগদের সামনে অফিসের কাজ করে না চন্দন। সে ডটপেন বন্ধ করল, আমি তো জমা দিয়ে দিয়েছি।

—কপি আছে?

—তোমার চাই? চন্দন ড্রয়ার খুলে গার্ডার মোড়া একটা কাগজ বার করল, আমি এ মাসে বারোশো কাটিয়ে দিচ্ছি।

শুদ্ধশীল চন্দনের ব্যাচমেট। ছোটখাটো ফরসা চেহারা। সর্বদা টিপটপ থাকতে ভালবাসে। ইকনমিক্সে এম.এ.। এই চাকরি পাওয়ার পরেই কলেজে প্রফেসরি পেয়েছিল। যায়নি। লোককে বলে, যেতে পারিনি। যদি যেতে পারতাম, এতদিনে রিডার হয়ে যেতাম।

শুদ্ধশীল সামনে এসে বসল, তুমি তো মাসে মাসে কাটাও, তাও এত ট্যাক্স?

প্রতি বছর কতটা ট্যাক্স দেবে চন্দন গোড়া থেকেই হিসাব করে রাখে। মাসে একশো, বছরের শেষে থোক হাজারখানেক। সেই অনুযায়ী বউ ছেলের নামে জীবনবীমা করা আছে। নিজের নামেও। কোনওটারই প্রিমিয়াম এত বেশি নয় যাতে অফিসে কারুর শ্যেনদৃষ্টি পড়ে। পলিসিগুলোর মেয়াদও মাপা। রিটায়ারমেন্টের আগে হাতে আসবে একে একে। এ ছাড়াও দরকার হলে চন্দন অল্পস্বল্প কর বাঁচানোর সার্টিফিকেট কেনে।

শুদ্ধশীল মনোযোগ দিয়ে কাগজটা দেখছিল, চন্দন বলল— অত দেখে কী হবে ভট্টাচায্যি? সব টাকা কি আলমারিতে পুরলে হবে? কিছু অন্তত সরকারকে দাও।

—সে তো দিচ্ছিই। ডি এ-র এক কাঁড়ি টাকা পি এফ-এ নিচ্ছে না গভর্নমেন্ট? খাটাচ্ছে না?

—কায়দা মেরো না, তুমি হেভি চিপ্পুস আছ। শোনো, থার্টি পারসেন্টের বেশি সেভিংস দেখিও না। গাড্ডায় পড়ে যাবে।

—তোমাদের মালিনী তো অর্ধেকের ওপর সেভিংস দেখায়।

—মিসেস ঘোষের সুবিধে আছে। কর্তা গিন্নি দুজনের রোজগার থাকলে অনেক মারপ্যাঁচ করা

যায়। ওকে তো আর অ্যাসেটে হাজব্যান্ডের ইনকাম দেখাতে হয় না !

—শালা পরের জন্মে যেন মেয়েছেলে হয়ে জন্মাই। আমরা খেটে মরব, বাটপাড়ি করে পাপী হয়ে থাকব, ওঁরা শুধু পায়ের ওপর পা তুলে ভোগ করে যাবেন। আর একটু এদিক-ওদিক হলেই মেজাজ। অফিসে চাকরি করলে তো কথাই নেই, এই তোমার মালিনী ঘোষদের মতো। ডুব জলে ডানা মেলে হাঁসের মতো টাকা খিঁচে যাবে, স্লাইট্ গা-ও ভিজবে না। কলকাতায় ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে তো আছেই। আর দ্যাখো, দিব্য ছেলেটা এত অনেস্ট, এত আপরাইট, সে বেচারাকে নর্থ-বেঙ্গলে পচতে হচ্ছে। মার ক্যানসার হয়েছে বলে এদিকে আসার প্রেয়ার করল, পুরো কেসটাই ধামাচাপা !

—এ ভাই নারী প্রগতির যুগ। আমাদের দেখাদেখি ওরাও যদি মাল না খিঁচতে পারে, সমান হবে কী করে ? পার্টিরাই বা পাত্তা দেবে কেন ? চন্দন সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেট বাড়িয়ে দিল, নেবে নাকি ?

—নাহ, ছেড়ে দিচ্ছি। সকালে একটা, রাত্তিরে একটা।

—চা ?

—না। অফিসের চায়ে বড় মিষ্টি দেয়। সুগারটা বাড়ছে। এখানে আর চা খাব না।

তা খাবে কেন ব্যাটা মক্ষিচুষ ! প্যাকেট ড্রয়ারে রেখে শব্দ করে ড্রয়ার বন্ধ করল চন্দন। পার্টিরা ফরেন সিগারেটের কার্টন দিয়ে যাচ্ছে, গোটা কার্টনই চালান হয়ে যাচ্ছে পাশের দোকানে। হাফ দাম, হাফ দামই সই। পেচ্ছাপে চিনি বজবজ করছে, ওদিকে পার্টি মিষ্টির প্যাকেট আনলে না নেই মুখে। নিজে খেতে পাবে না তো কী আছে ? বেড়াল খাবে। শালা ভটচাজের মিষ্টি খেয়ে খেয়ে অফিসের বেড়ালগুলোর পর্যন্ত ডায়াবেটিস হয়ে গেল। কেঁদো কেঁদো রয়াল বেঙ্গলের মিনি এডিশনের মতো চেহারা সব কটার, অথচ কেমন ম্যাদা ম্যাদা ! দিনরাত লাইন দিয়ে ঝিমোচ্ছে। হুঁহ্। বাবুর এখন দিব্যর জন্য দরদে প্রাণ ফেটে পড়ল !

চন্দন সিগারেটে জোর টান দিল, যাই বলো ভটচাজ, তোমাদের দিব্যর আবার বড় বেশি ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ভাব। পার্টি প্রেমিসেসে চা খাব না, কোল্ড ড্রিঙ্কস্ খাব না। আরে মন্ত্রীরা সব মালিকদের সঙ্গে হোটেলে বসে ব্যাঙ্কোয়েটে লড়াচ্ছে, তুই কোথাকার কোন হরিদাস পাল এত সতীপনার ফুটুনি মারিস ? চোখ ছোট করে চন্দন সামনে ঝুঁকল। ঈষৎ নিচু স্বরে বলল, আমার মনে হয় ব্যাটা নপুংসক। মরদের বাচ্চা মরদের মতো থাকবি, রগড়ে পার্টিদের শুইয়ে দিবি, পায়ের কাছে কেঁউ কেঁউ করবে সকলে, তবে না চাকরির দাপট !

—এসে যাবে। ঠিক লাইনে এসে যাবে। শুদ্ধশীল খিকখিক করে হাসল, বিয়ে থা হোক, একটু রক্তের জোশটা মরুক...

—অত দূর যেতে হবে না। দ্যাখো না মার ক্যানসারেই রস কতটা মরে। কথাটা বলেও ঠিক তৃপ্তি হল না চন্দনের। সে কি দিব্যর মতো ছিল কোনওদিন ? তার বাবার অসুখে... ! বাবার হার্টের প্রবলেম হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ওই বয়সে বাইপাস করলে কি বাবা বাঁচত ! তবু তো চন্দন মুখ ফুটে অপারেশানের কথা বলেছিল। বাবা নিজেই বলল, সত্তর বছরের হৃদয়টাকে আর কাটাছেঁড়া করব নারে। খাঁচা পুরনো হয়েছে, শিকলেও মরচে ধরেছে। পাখি এবার উড়ে যাবে। দুদিন আগে। নয় দুদিন পরে। মিছিমিছি একগাদা টাকা গচ্ছা ! হয়তো বা বাবা দুদিন পরেই যেত। লাজুর বিয়ের ধাক্কাটাই শেষ করে দিল লোকটাকে, চন্দন কী করবে ! বাবারও বাড়াবাড়ি ছিল। সাত্যকির মতো ছেলেকেও পছন্দ নয় ! কারণ কী ? না সাত্যকির চোখ নাকি পরিষ্কার নয় ! উদ্ভট বিটকেল সব ধারণা !

একজন উর্দিপরা বয়স্ক লোক উঁকি দিল ঘরে— স্যার, আপনার গাড়ি এসে গেছে।

—তুমি বেরোচ্ছ নাকি রায়চৌধুরী ?

—হুঁ। ডিউটি আছে। পারিবারিক ডিউটি। মাকে নিয়ে ডাক্তার। চন্দন সিগারেট নেভাল, মার হাঁটুটা খুব বখেড়া করছে। অর্থোপেডিক দেখালাম, তিন তিনজন স্পেশালিস্ট, তিনজনেরই এক মত। অপারেশান। মার আবার অপারেশানে হেভি আতঙ্ক। আজ একটা ভাল হোমিওপ্যাথের

কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

—হোমিওপ্যাথ! তুমি যে এবারে ঠিকুজি কুষ্ঠি মানতে শুরু করবে হে!

—ইয়ার্কি মেরো না। তিনশো টাকা ফি। বাড়ি আসে না, পেশেন্ট নিয়ে যেতে হয়। চার-ছমাসের আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় না। কর্ড লাইন ধরে তাড়াতাড়ি ডেট পেয়েছি। তাও দুসপ্তাহ পর।

শুদ্ধশীলের চোখে ভক্তি নেমেছে এবার, শুনে তো ভালই মনে হচ্ছে। তোমার মার যদি উপকার হয়, আমার পিসিমাকেও নিয়ে যাব। পিসতুতো বোনটা মাঝেমাঝেই এসে ঘ্যানঘ্যান করে, দাদা তোমার এত ক্ষমতা, মাকে একটা ভাল ডাক্তার দেখিয়ে দাও না।

চন্দন ব্রিফকেস গুছিয়ে উঠে পড়ল— কাগজটা সাবধানে রেখো। ফেরত এনো। এটা আমার পারসোনাল কপি।

শুদ্ধশীল উঠে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, মেটালিক্সের কেসটার খবর কী হে? সেই সত্তর লাখ টাকার ডিসপিউট?

—চলছে চলবে অবস্থা। থাকুক কোল্ডস্টোরেজে কদিন।

—আমার একটা বুদ্ধি নাও। তুমি এই কেসটা থেকে হাত ধুয়ে ফেলো।

চন্দনের ভুরু কুঁচকে গেল, কেন?

—আমার কাছে ইনফরমেশন আছে। ওদের চেয়ারম্যান আমাদের কমিশনারের সঙ্গে খুব বাতচিত চালাচ্ছে। মিনিস্ট্রিতে নাকি ওর পঁহুছ আছে। অযথা গোঁয়ার্তুমি কোরো না।

নাহ্, সত্যিই চন্দনের সময় ভাল যাচ্ছে না। শর্মার ভাষায় রাহু কেতুর দশা। অনুরাধা বাড়ি বাড়ি করে রোজ জ্বালিয়ে মারছে। এই কেসটা ঠিকমতো ভাসিয়ে তুলতে পারলে কিছু মোটা ক্যাশ আসত। ঠিক আছে। এক মাঘে শীত যায় না। আবার আসিব ফিরে, ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে। চিল হয়ে। বক হয়ে। কাক হয়ে।

চন্দন সদর্পে গাড়িতে উঠল। পবন মালহোত্রা দারুণ সাজিয়েছে গাড়িটাকে। সিটে বসলেই শরীর ডুবে যায়। হরিণের চামড়া হেন সিটকভার। স্টিরিও, কোয়ার্টজ ঘড়ি, এয়ারকন্ডিশনার কী নেই! সামনে টসটসে পাকা আঙুরের থোকা। মোমের। দুলছে।

গাড়ি কার্জন পার্কে এসে যানজটে আটকে গেল। এসপ্ল্যানেড ইস্টে জোর সমাবেশ। স্লোগান চলছে। চন্দন নিমেষে অধৈর্য হয়ে উঠল। দুটো পাঁচ। দুটো পাঁচ। ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চারটেয়। এখান থেকে কাঁকুলিয়া গিয়ে আবার মৌলালি আসা...! নিজেদের কাজকর্ম নেই! কাউকে কাজ করতে দেবে না! কী যে হচ্ছে দেশটার! দিনরাত শুধু চলবে না। চলবে না। এই করে দেশ এগোবে? ওয়ার্ক কালচার ছাড়া?

কলেজে পড়ার সময় অদ্ভুত এক মিছিল দেখেছিল চন্দন। ধর্মতলা স্ট্রিটে। বন্ধ কোনও কারখানার শ্রমিকরা যাচ্ছিল সারে সারে। মিছিলের সামনের লোক দুটোর হাতের ফেস্টুনে চোখ পড়েছিল হঠাৎ। লা লি চ ল বে না। চোখ রগড়ে ভাল করে দেখে বুঝেছিল— দালালি চলবে না-র দা ফেস্টুন থেকে মুছে গেছে, সেই ফেস্টুনের দিকে তাকিয়েই একটা লোক স্লোগান মেরে চলেছে, লালিচ লবে না। লালিচ লবে না। দেখাদেখি পিছনের লোকরাও হেঁকে উঠছে, লালিচ লবে না। এই তো দেশের অবস্থা! যে বলছে সে-ও জানে না কী বলছে। যারা পিছনে হুক্কাহুয়া করছে তারাও। এ সব দেশে কি রাজনীতি চলে? চাই মিলিটারি রুল। ডিক্টেটারশিপ। তবে যদি সিধে হয় লোকজন।

বাড়ি পৌঁছে বিরক্তিটা বেড়ে গেল চন্দনের। ঢুকতেই কানের কাছে অনুরাধার ফুসফুস, মা তো কিছুতেই ডাক্তারের কাছে যেতে চাইছে না। কখন থেকে বলছি তুমি এসে যাবে, আপনি রেডি হয়ে নিন...

—কেন? তোমার সঙ্গে কিছু খ্যাচাখেচি হয়েছে নাকি? যা মুখ হয়েছে তোমার।

অনুরাধাও চটে গেল, হ্যাঁ, আমিই তো শুধু মুখ করি। এ বাড়িতে আর সব ভিজে বেড়াল! যাও না, গিয়ে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো, আমি কী বলেছি।

প্রতিভা বিছানায় শুয়ে ছিলেন, ছেলেকে দেখেও উঠলেন না। চন্দন বলল, হল কী তোমার ? যাও। কাপড় পরে নাও। চারটেয় টাইম। তিনটে বেজে গেছে।

প্রতিভা শুয়ে শুয়েই বললেন, আমাকে ছেড়ে দে চাঁদু। আমার ব্যথা অনেক কমে গেছে।

—বাজে বোকো না। কালও তুমি বাথরুমে যাওয়ার সময় কোঁকাচ্ছিলে। তোমার জন্য কত খেটেখুটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম... ! ডাক্তারের ফি-ও অ্যাডভান্স জমা করা আছে।

প্রতিভা খাটে ভর দিয়ে উঠলেন, যেটুকু ব্যথা আছে ও আর সারে না রে।

—সারে কি না সারে ডাক্তার বুঝবে। তুমি চলো। তিন-তিনশো টাকা জলে চলে যাবে ?

প্রতিভা আর কথা বাড়ালেন না। নীরবে তৈরি হলেন। সরু কালো পাড় ধবধবে সাদা শাড়ি সাদাসিধে করে পরেছেন। বেরোনোর আগে মাথায় আঁচল টেনে নিলেন। লাঠি ডানহাতে শক্ত করে ধরা।

অনুরাধা জিজ্ঞাসা করল, তুমি ফিরছ তো ?

চন্দন আজ একবার অফিসক্লাবে যাবে ভেবেছিল। মেটালিক্সের কেসটা নিয়ে চ্যাটার্জির সঙ্গে একটু আলোচনা করা দরকার। শুদ্ধশীল যতই ব্যাচমেট হোক, ওর কলজের জোর কম। তনুময় চ্যাটার্জিই তার বিপদের বন্ধু। চাণক্যের শ্লোকটা যেন কী ছিল ? রাজদ্বারে, শ্মশানে যে সঙ্গে থাকে, সেই প্রকৃত দোসর ! রাজদ্বার কি জেলহাজত ?

চন্দন কী ভেবে মত বদলাল, নাহ্, মার সঙ্গেই ফিরব। ফিরে বেরোতে পারি। রাজার আজ লাইফসায়েন্সের মাস্টারমশাই আসবেন না ?

—আসবেন। আজ একটু দেরিতে আসবেন। রাজা তো ওঁর টাস্কই করছে বসে। অনুরাধা গলা নামাল, কী সুন্দর ছবি আঁকছে গো রাজা !

ছেলের ঘরের পর্দা বাতাসে উড়ছে। চন্দনের চোখ পড়তেই লম্বা ডোরাকাটা পর্দা নিমেষে গরাদ হয়ে গেল। উফ, আবার সেই বিভীষিকা !

মার্বেল পাথরের চৌকো চাতাল ঘিরে খাড়া উঠে গেছে বাড়িটা। ছতলা। প্রতিটি তলার টানা বারান্দা বর্গক্ষেত্রের সীমানার আকার নিয়েছে। বারান্দার কোলে সার সার ঘর। ছোটখাটো অফিস। ডাক্তারের চেম্বার। প্রেস। এক্সরে ক্লিনিক। গৃহস্থের ঘরবাড়িও। শতাব্দী প্রাচীন বাড়ির সর্বাঙ্গ জরাজীর্ণ। নোনায় খাওয়া। শ্যাওলা ধরা। এর মধ্যেই কোথাও কোথাও নতুন রঙের প্রলেপ আরও কুৎসিত করে তুলেছে বাড়িটাকে।

চন্দন প্রতিভাকে নিয়ে লিফটে উঠতে যাচ্ছিল, ধুতি পাঞ্জাবি পরা তাগড়াই দারোয়ান আটকাল তাদের, ইয়ে পেরাইভেট লিফট আছে। আপলোগকো লিয়ে নেহি।

—চারতলায় ডাক্তারবাবুর কাছে যাব। সঙ্গে পেশেন্ট আছে। ইনি হাঁটতে পারেন না।

—তো কেয়া ? সিঁড়িসে চড়ুন। আহিস্তা আহিস্তা।

—চড়ুন বললেই হল ? বলছি না ওঁর হাঁটুতে ব্যথা।

লোকটা চন্দনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অন্য দিকে তাকাল। একটু দূরে এক ঝাড়ুদারনি চাতালে জল ঢালছে, তার সঙ্গে গলা ছেড়ে রসিকতা জুড়েছে লোকটা।

অবিকল সেদিনের কনস্টেবলটার মতো নির্বিকল্প হাবভাব। চন্দনের কি এখন শুধু অপমানিত হওয়ার কপাল চলছে ! কনস্টেবলের হাতে ! চোরছ্যাঁচোড় পকেটমারের হাতে ! দারোয়ানের হাতে !

গাড়িতে গোটা পথ নিজে থেকে একটাও কথা বলেননি প্রতিভা। জোর করে আনার জন্য একটু যেন অভিমানের ভাব লেপটে আছে তাঁর মুখমণ্ডলে। লাঠি হাতে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে তিনি ডাকলেন ছেলেকে, চলে আয়। আমি হেঁটে উঠতে পারব।

—থামো তো। চন্দন রায়চৌধুরী আর নতুন করে হারতে রাজি নয়। ফস করে পার্স থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করেছে। দারোয়ানকে টাকাটা দেখিয়ে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসল, এবার যাবে তো ?

—আইন নেই বাবু। মালিক জানলে বহুত গুসসা করবেন। নোট দুটো পকেটে পুরল লোকটা,

আসুন। মাইজির যখন তকলিফ হচ্ছে, কী কোরা যাবে!

লিফ্‌ট্‌ থেকে বেরোনোর সময়ে চন্দন আদেশের সুরে বলল, আমার কিন্তু তোমাকে আরেকবার লাগবে। নামার সময়ে।

— কোই বাত নেই। আপনি স্যার একবার হাঁক দিবেন, আমি এসে যাব।

ডাক্তারের ঘরে ঢুকে আরাম করে সোফায় হেলান দিল চন্দন। বিরক্তির ভাব কাটছে ধীরে ধীরে। পাশে প্রতিভা। তাঁর চক্ষু দুটি বোজা।

দুখানা বড় ঘরের একটাতে ডাক্তার বসেন, অন্যটায় অপেক্ষমাণ রুগি, রুগির সঙ্গীসাথী। দুটো ঘরই আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত। গোটা তিনেক কাচের আলমারি ভর্তি অজস্র ফাইল। সানমাইকা বসানো সেন্টার টেবিলের ফুলদানিতে দুটো টাটকা গোলাপ। টেবিলের তাকে কয়েকটা পুরনো ইংরিজি বাংলা ম্যাগাজিন। দেওয়ালে বড় অক্ষরের এক পাতার ক্যালেন্ডার। লাগোয়া খুপরিতে এক যুবক নিষ্ঠাভরে ওষুধ বানিয়ে চলেছে। কাজ করতে করতেই সে চন্দনের দিকে তাকাল, —আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

—হুঁ। প্রতিভা রায়চৌধুরী।

লম্বা খাতা খুলে দেখল ছেলেটা, চারটেয়?

—হ্যাঁ।

—বসুন। ডাক্তারবাবু নিজেই ডাকবেন।

চন্দনরা ছাড়াও বেশ কয়েক জন বসে আছে সোফায়। চেয়ারে। প্রতিভা অনেকক্ষণ পর কথা বললেন। ছেলেকে ডাকলেন, চাঁদু....

—কী হল? জল খাবে? বসতে অসুবিধে হচ্ছে?

প্রতিভা চোখ খুললেন না। সোফায় হেলান দিয়ে দু দিকে মাথা নাড়ালেন, চাঁদু তোর মনে আছে?

—কী?

—সেই একবার আমরা হরিদ্বার বেড়াতে গিয়েছিলাম। তুই তখন খুব ছোট। সাত আট হবি। আমরা দুজনে মনসা পাহাড়ে উঠলাম.... কী খাড়া খাড়া সিঁড়ি পাহাড়টার!

চন্দন অবাক হল, তোমার মনে আছে!

উদাস বাতাসের মতো হাসলেন প্রতিভা, তোর বাবা উঠল না। গঙ্গার ধারেই বসে রইল। তার অত দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল না। আমি আর তুই শেষে... চাঁদু তোর মনে পড়ছে?

মনে পড়ছে। মনে পড়ছে চন্দনের। দু পাশে ঘন জঙ্গল, তার ফাঁক দিয়ে মন্দির প্রায় দেখাই যায় না, তবু কী অদম্য টানে উঠছেন প্রতিভা। পরনে লাল পাড় গরদ, কপালে সিঁদুরের চাকা টিপ। —আরেকটু বাবা, আরেকটু চল্‌।

সস্তার ঢলঢলে হাফপ্যান্ট পরা চন্দন জুতো খপ্‌খপ্‌ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে, আমি আর যেতে পারছি না। তুমি যাও।

—এত কাছে এলি, ঠাকুর দর্শন করবি না?

—আমার পা ব্যথা করছে যে।

—পুণ্যি করতে হলে কষ্ট সহ্য করতে হয় বাবা।

চন্দনের বুকে কেউ যেন ছোট্ট চিমটি কাটল। অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য একটা ফিল্ম ম্যাগাজিন খুলল।

প্রতিভা বললেন, আজও তুই কষ্ট করতে শিখলি নারে চাঁদু?

চন্দন কান বন্ধ করে রইল। সুদর্শন নায়ক অবলীলায় নিজের অবৈধ প্রেমের কাহিনী শোনাচ্ছে। নায়কের স্ত্রীরও ইন্টারভিউ আছে সঙ্গে। সে স্বামীর নতুন সম্পর্ক নিয়ে তেমন ভাবিত নয়, তার মতে কেরিয়ার গড়তে গেলে এরকম ছোটখাটো ঘটনা ঘটবেই। শরীরী প্রেম তো মোটেই বিচিত্র নয়। তবু এত কিছুর পরও, তার স্বামীর ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু যে সে নিজেই, তাতে তার তিলমাত্র সংশয় নেই।

চন্দনের ঠোঁটে টেরচা হাসি ফুটল। অনুরাধা কি এ সব গপ্পো পড়ে! না হলে কী করে মেনে নিল সেদিনের আষাঢ়ে কাহিনী! নাহ, গুলটা সেদিন একটু হেভি ডোজ হয়ে গিয়েছিল। অথচ ওই মিথ্যেটা অফিসেও তো সত্যি হয়ে গেল! তনুময় এমন নিখুত পেটখারাপের বর্ণনা দিচ্ছিল, চন্দনের নিজেরই মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল সত্যি বোধহয় চাটার্জির ফুড পয়জনিং হয়েছিল সেদিন। পাকে চক্রে চাটার্জির বউ ছেলেমেয়েও সেসময় শিলিগুড়িতেই।

চন্দন ম্যাগাজিন রেখে বারান্দায় এসে সিগারেট ধরাল। সাড়ে চারটে বাজে, এখনও ডাক এল না প্রতিভার। ডাক্তারবা কেন যে টাইম ধরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়! আজ পর্যন্ত কোনও ডাক্তারকে ঘড়ি ধরে রুগি ডাকতে দেখল না চন্দন।

আকাশে হঠাৎ মেঘ জমছে। কাল মাঘের শেষ। দিন এখন আব ছোট্টটি নেই, তবু এর মধ্যেই আলো বেশ কমে এসেছে। নীচের চাতাল এখন আবছা গহ্বর যেন। সেদিকে তাকাতেই মাথাটা কেমন দুলে গেল চন্দনের। অনেক উঁচু থেকে নীচে তাকিয়ে থাকলে হঠাৎ হঠাৎ কেন যে ঝাঁপ মারতে ইচ্ছে হয়। ছুঁতে ইচ্ছে করে নীচটাকে!

ডাক্তারের ঘরে ঢুকে চন্দন খানিকটা আশ্বস্ত হল। ডাক্তারটি বেশ সৌম্যকান্তি। বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন। কণ্ঠস্বর সহৃদয়। কাগজ কলম টেনে কেসহিস্ট্রি লিখতে শুরু করলেন তিনি, মা, আপনার বয়স কত?

—সত্তর। না একাত্তর।

—ছেলেমেয়ে কটি?

—এই এক ছেলে। আর এক মেয়ে আছে।

—ব্যাস?

—না....মানে আরও দুজন এসেছিল। প্রতিভা অল্প ইতস্তত করলেন। মুখে আলগা ছায়া পড়ল যেন, দুটো ছেলে হয়েছিল। জন্মেই মরে গেছে। এই ছেলে হওয়ার আগে। লোকে বলত মড়ুঞ্চে পোয়াতি। আসে, কিন্তু থাকে না।

চন্দন বিস্মিত মুখে প্রতিভার দিকে তাকাল। এ ঘটনা তার জানা ছিল না। ছোটবেলায় শুনেছে মা কোনও এক চন্দনেশ্বরের মন্দিরে মানত করার পর সে হয়েছিল। বাবা কথায় কথায় বলত, চন্দন তো তোমার মানতের ছেলে। বাবা কি ব্যঙ্গ করত মাকে? নইলে চন্দন জন্মানোর পনেরো বছর পর, প্রায় বৃদ্ধ বয়সে লাজু হতেই পাগলের মতো আত্মহারা হয়েছিল কেন! মা অত লজ্জা পাওয়া সত্ত্বেও!

ডাক্তারবাবু ঝুঁকেছেন প্রতিভার দিকে, তারপর বলুন। আপনার প্রবলেমটা কী?

চন্দন বলে উঠল—হাঁটু। তিন-চার বছর ধরে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন।

—এই বয়সেই হাঁটুর ব্যথা ধরিয়ে ফেললেন? আমার মা তো আশিতেও ফিট। শুধু নাচতে পারে না, এই যা।

প্রতিভা ছেলের মুখের দিকে তাকালেন, উনি ছ বছর আগে চলে গেলেন; আমার পায়ের জোরও চলে গেল। তখন থেকে ব্যথা বাড়ছে তো বাড়ছেই।

কথাটা চন্দনের বুকে বাজল। মা কি বলতে চায় ছেলে ছেলের বউ মা'র যত্ন করে না? এস্বরে প্লেটের বিশাল খামগুলো টেবিলে রাখল। পুরনো প্রেসক্রিপশনও। কপাল কুঁচকে বলল, অনেক চেষ্টা করেছি। সব ডাক্তারই বলছেন অপারেশন করতে হবে। মা রাজি নন।

ডাক্তার একবার শুধু তাকালেন কাগজগুলোর দিকে, কাটাছেঁড়া না করে ভালই করেছেন। ওতে অনেক সমস্যা আসতে পারে। শরীরের স্বাভাবিক সাম্য বিঘ্নিত হয়। শরীর হল ফ্যামিলির মতো। হাত পা নাক চোখ সব এর মেম্বার। ফ্যামিলির একজন কেউ বিগড়ে গেলে আপনি তার ওপর লাঠিসোঁটা ছুরি চালাবেন? বুঝিয়ে শুনিয়ে পথে আনতে হবে।

প্রতিভা চোখ পিটপিট করলেন, তাতেও যদি না শোনে?

—শুনবে না কেন? নিশ্চয়ই শুনবে। না শুনলে গোটা ফ্যামিলিকেই কষ্ট ভোগ করতে হবে। ডাক্তারও হাসছেন, ছোটবেলায় কী কী অসুখ হয়েছিল?

—তেমন বড় অসুখ হয়নি। একবাব শুধু জলবসন্ত...

—খুব ছোটতে হাম হয়নি ?

—সে তো সকলের হয় ।

—ফেনিনজাইটিস ? ল্যারিংজাইটিস ? টাইফয়েড ? মেনিনজাইটিস ? ডিপথেরিয়া ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মেনিনজাইটিস হয়েছিল । প্রতিভা সমুদ্রের তলা থেকে যেন কুড়িয়ে পেয়েছেন হারানো পাথর, শুনেছি নাকি এখন-তখন অবস্থা হয়েছিল । কতদিন হাঁটতে চলতে পারিনি ।

—ঠিক ধরেছি । তারপর ছেলেমেয়ে হওয়ার সময় অ্যানিমিয়া হয়নি ? বিকোলাই ?

চন্দন ডাক্তারের ঠোঁট নড়া দেখছিল শুধু । মেনিনজাইটিস শব্দটা বুকে টোকা মারছে তার । এখন-তখন অবস্থা থেকে বেঁচে উঠে প্রতিভা সন্তানের মা হয়েছেন, নতুন শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীতে । অথচ বুবুন মরে গেল । বুবুনের থেকেও আরেকটা ধারা তো শুরু হতে পারত পৃথিবীতে ! প্রতিভা যদি না বাঁচতেন, চন্দনের অস্তিত্ব কি থাকত কোথাও ! অথচ চন্দন আছে । ভীষণভাবে আছে । জীবন মৃত্যুর এক চুল ব্যবধানের জন্য !

ডাক্তারের চেম্বার থেকে ওষুধ নিয়ে বেরোতে বেরোতে আঁধার নেমে গেল । পেট্রল আর ডিজেলের ধোঁয়ায় মহানগরীর দেহে কৃত্রিম কুয়াশার আবরণ । আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে । মেঘ, মানুষ আর গাড়িঘোড়ার জঙ্গলে বাতাস নিথর । বৃষ্টি নামছিল ।

জানলার কাচ নামিয়ে চন্দন সিগারেট ধরাল, গরম লাগছে ? তোমার কাচটা নামিয়ে দেব ?

—দে ।

কাচ নামাতে জোরে জোরে নিশ্বাস নিলেন প্রতিভা । তারপর হঠাৎই ঘুরে তাকালেন ছেলের দিকে, ওই লিফটের দারোয়ানটাকে তখন কত টাকা দিলি তুই ?

চন্দন কিছু না ভেবেই বলল, যাতায়াতের জন্য মোট তিরিশ ।

—লোকটাকে টাকা দিতে তোর হাত কাঁপল না ?

—কেন ! হাত কাঁপবে কেন !

প্রতিভা সিটে হেলান দিয়ে নিজের মনে বলে উঠলেন, অন্যকে অন্যায় টাকা দিতে যার বাধে না, অন্যায় টাকা নিতেও কি তার বাধে ?

গাড়ির আয়নায় মালহোত্রার ড্রাইভারকে একপলক দেখে নিল চন্দন, আজ তুমি ভীষণ বকবক করছ মা । ডাক্তার কী জিজ্ঞেস করছে না শুনেই হুড়হুড় করে নিজের কথা সাতকাহন করে বলে যাচ্ছিলে ! তোমার স্কুল পাঠশালার গল্প শুনে ডাক্তারের কী হবে ?

প্রতিভার যেন ভর হয়েছে, বিড়বিড় করে আবারও বললেন, সারা জীবনই তো চুপ করে আছি, একদিন নয় বললামই ।

—হয়েছে । এবার চুপ থাকো ।

সার্কুলার রোড ধরে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে এগোচ্ছে গাড়ি । পার্ক স্ট্রিটের মুখে এসে ট্রাফিকে আটকাল । জানলায় এক শীর্ণ ভিখারিনি ঘ্যান ঘ্যান করছে । কোলে শীর্ণতর শিশু,ভগবান তোমাকে রাজা করে দেবে বাবু । ছেলেমেয়ে তোমার সুখে থাকবে ।

চন্দন হাত নাচাল, ভাগো ভাগো ।

গাড়ি স্টার্ট নিতে প্রতিভা পিছন ফিরে ভিখারিনীকে দেখলেন একবার । তারপর সোজাসুজি ছেলের দিকে, এই গাড়িটা কার রে চাঁদু ?

—আমাদের অফিসের একজনের ।

—তোর সঙ্গে কাজ করে ?

—ওই আর কী । চন্দনের স্বরে রাগ ফিরল, এত জেরা করছ কেন ?

প্রতিভা ম্লান হাসলেন, তুই তো এখন বড়লোক । রাজা । কত লাখ লাখ টাকা দিয়ে বাড়ি বানাচ্ছিস । তুই নিজে গাড়ি কিনিসনি কেন ?

—কে বলল তোমায় আমি লাখ লাখ টাকা দিয়ে বাড়ি বানাচ্ছি ? অনু বলেছে বুঝি ?

প্রতিভা জবাব দিলেন না ।

চন্দন গলা নরম করল, তোমার ছেলে যথেষ্ট বড় চাকরি করে মা ।

—সে তো করিসই। তবু কেমন ধন্দ লাগে। 'আট-দশ লাখ টাকা জমাতে...মাসে মাসে কত বাঁচালে তবে... ! তোর বাবা সারা জীবনে দশ হাজার টাকাও সঞ্চয় করতে পারেনি।

—আজকালকার ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর দাম দেখেছ ? গভর্নমেন্টের তৈরি ফ্ল্যাট ? আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের জন্য ? সেগুলোরই পাঁচ-ছ লাখ টাকা দাম। আমাদের মতো মানুষরা যদি জমাতেই না পারে, সরকার অত দাম করে ?

—আমি অত বুঝি না রে চাঁদু। খালি ভাবি কত টাকা মাইনে পাস তুই ? সাত হাজার ? আট হাজার ? দশ হাজার ? বারো হাজার ? যেরকম ঠাটবাটে থাকিস, রাজার পেছনে খরচাপাতি করিস, তাতে জমে কত ? তোর তো বাড়ি ভাড়াই সাড়ে তিন হাজার রে !

—তুমি তো সুবিধের লোক নও মা। চন্দন ঠাট্টা করতে গিয়েও রুক্ষ হয়ে গেল, —পষ্ট করে বলো তো কী বলতে চাও তুমি ? তুমি কি বলতে চাও তোমার ছেলে চুরিডাকাতি করে ?

প্রতিভা ছানিপড়া চোখ বাইরে মেললেন। একটু ফাঁকা পেয়েই হু হু করে ছুটছে গাড়ি। টুকরো টুকরো বৃষ্টির দানা ধেয়ে এল ভেতরে।

—কোন ছোট্টটি থেকে তোকে দেখছি রে চাঁদু। মিছে কথা বলে ধরা পড়লেই গলা বাজাতে শুরু করতিস তুই। অফিসের নাম করে দুদিন ফিরলি না, ফিরে এসে অনু কথা বলতেই চোটপাট। আমি কি কিছুই বুঝি নারে ?

চন্দনের শিরদাঁড়ায় কেউ বুঝি ব্লেড টেনে দিল, কী বুঝেছ তুমি ?

এক দানা বৃষ্টি যেন ছিটকে এসেছে প্রতিভার চোখে, তোকে কত যত্ন করে মানুষ করেছিলাম আমরা। সে তুলনায় লাজু তো হেলাফেলায় বড় হল। তবু লাজু একরকম হল আর তুই একদম অন্যরকম।

চন্দনের জিভ শুকিয়ে গেল, আমি কীরকম হয়েছি ?

—সে আমি কী বলব ? তুই নিজেকে প্রশ্ন কর।

চন্দনের হঠাৎ শীত করছিল। কাঁপা কাঁপা হাতে জানলার কাচ তুলে দিল। সিগারেটের প্যাকেট পায়ের কাছে পড়ে গেছে। নিচু হয়ে প্যাকেটটা খুঁজছিল চন্দন, পাচ্ছিল না।

প্রতিভা বললেন, বউ ছেলেকেও মিথ্যে বলিস তুই ? কী পাপ যে করে চলেছিস বাবা...

—কী পাপ পাপ করছ ? ড্রাইভারের উপস্থিতি ভুলে চন্দন গলা চড়িয়ে ফেলল এবার, পাপ যদি করেই থাকি, সেই পাপের অন্ন তো তোমরা সকলে ভোগ করছ। কারুর তো সুখের কমতি দেখি না।

প্রতিভা আঁচলের খুঁটে চোখের কোণ মুছলেন।

চন্দন চিত্রার্পিতের মতো মাকে দেখছিল। মা'র নিরীহ শান্ত চেহারার পিছনে এত দক্ষ এক শল্য চিকিৎসক কোথায় লুকিয়েছিল এতদিন ! চন্দন প্রাণপণে প্রার্থনা করছিল মা যেন আর একটাও কথা না বলে।

প্রতিভা ছেলের প্রার্থনা উপেক্ষা করলেন, মনে আছে চাঁদু তোর বাবাকে এক ছাত্র একবার ভিড় বাসে মদের বোতল ধরতে দিয়েছিল। বুঝতে পেরে তোর বাবা জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল বোতলটা। তোর বাবা অন্যের কোনও অন্যায় কাজেরই দায় নিতে রাজি হয়নি কখনও। তাই তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। অসহায় হওয়ার আগে। আমি মা। আমি কি তা পারি ?

চন্দন প্রতিভাকে থামাতে চাইল, স্বর ফুটল না গলায়।

ছেলেব গায়েপিঠে হাত বোলাচ্ছেন প্রতিভা, তুই যেমনভাবে চাস তেমনভাবেই বাঁচ বাবা। তোর পাপ আমি আমার শরীরে ধারণ করে নেব। যতটা পারি। ওই বিষ আরও যন্ত্রণা হয়ে ফুটে বেরোবে দিনদিন। বৃথা ডাক্তার দেখিয়ে কী লাভ।

চন্দনের চোখে জল ছিল না। তবু চন্দন কাঁদছিল। নিঃশব্দে।

আট

যুদ্ধ ! যুদ্ধ ! যুদ্ধ !

ঝাঁক ঝাঁক বোমারু বিমান ঢুকছে শত্রুপক্ষের এলাকায়। স্থলপথে ধেয়ে এল পাল পাল দুর্দমগতি ট্যাঙ্ক। সমুদ্রের নীল জলে ফ্রিগেট, সাবমেরিন। মিলিটারি প্লেন উগরে দিচ্ছে পিলপিল প্যারাট্রুপার। এক। দুই। তিন। চার। অসংখ্য। বর্ণহীন বায়ুস্তর কালো বিন্দুতে ছেয়ে গেল। রাইফেল স্টেনগান গ্রেনেডে সজ্জিত সৈনিক আক্রমণ হানছে অবিরাম। কামান মর্টারের গোলা আছড়ে পড়ল শত্রুভূমিতে। বুম বুম। বুম বুম।

পালটা গুলিবর্ষণ শুরু হল এবার। আগুন জ্বেলে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে বিমান ট্যাঙ্ক সাবমেরিন। প্যারাট্রুপাররা শূন্যেই ধ্বংস হয়ে চলেছে। সৈনিকদের দেহ ছিন্নভিন্ন। ভূলুণ্ঠিত।

রাজার চোখ বিস্ফারিত। আরও বিস্ফারিত। দাঁতে দাঁত চেপে বাটন্ টিপছে, স্টিলের হাতল ঘুরিয়ে চলেছে ক্ষিপ্র গতিতে। হাতল ওপরে ওঠাল, দুটো প্যারাট্রুপার মরল। একটু কোনাকুনি নামাল, দপ করে জ্বলে গেল বোমারু বিমান। পাশে আরেকটু চাপ, সাবমেরিন গেল। হাতল নীচে, ট্যাঙ্ক খতম।

পর্দার এক কোণে হু-হু করে পয়েন্ট উঠছে রাজার। পাঁচশো। হাজার। দশ হাজার। বিশ হাজার। পঞ্চাশ হাজার। লাখ।

সময় শেষ। রণাঙ্গন শান্ত। এক লাখ চল্লিশ হাজার ন'শোতে রাজাকে থামতে হল। যন্ত্রের প্রান্তদেশে আজকের সর্বোচ্চ স্কোর জ্বলজ্বল করছে। দু লাখ এগারো হাজার। রাজা মুষ্টিবদ্ধ দু হাত অধৈর্যভাবে ঝাঁকাল। আবার খেলতে হবে। আরও বেশি ধ্বংস করে পেতেই হবে সর্বোচ্চ পয়েন্ট। এক্ষুনি কয়েন চাই কয়েকটা। এক্ষুনি।

রাজা পকেটে হাত দিল। ধ্যাৎতেরি, শুধু একটা পঞ্চাশ টাকার নোট। মা ওষুধ কেনার জন্য দিয়েছে। কাশির ওষুধ। জোর সর্দিকাশি লেগেছে মা'র। রাজা ভিডিও পার্লারের তরুণ মালিকের দিকে তাকাল, —দুটো কয়েন হবে বাবলুদা ? একদম খুচরো নেই।

—খেল না। কটা কয়েন চাই ?

দুটো কয়েন ফেলে আবার যুদ্ধে নামল রাজা। হল না। দেড় লাখে আটকে গেছে।

আবার দুটো কয়েন ফেলল। এবার দেড় লাখেরও কম।

আবার দুটো কয়েন। এক লাখ সত্তর হাজার তিনশো। রাজার জেদ চেপে যাচ্ছিল। গোটা চোদ্দো কয়েন খসিয়েও কিছুতেই দু লাখে পৌঁছতে পারল না। নোট ভাঙিয়ে রাজা হতাশ মুখে বেরিয়ে এল পার্লার থেকে। না, এই গেমটা বড় টাফ্। কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না !

ফাল্গুনের বিকেল, তবু বসন্ত শহর থেকে গা ঢাকা দিয়েছে। মাঝে কদিন বেশ গরম পড়েছিল, মাঘ মাসের শেষ দু দিন ভারী বৃষ্টি হয়ে বদলে গেছে আবহাওয়া। গুটিগুটি পায়ে শীত ফিরেছে নতুন করে। শেষ কামড় বসাতে। ঘরে ঘরে সর্দিকাশির প্রকোপ বাড়ছে। জ্বরজারিও।

মোড়ের বড় ওষুধের দোকানে অনেক ক্রেতার ভিড়। রাজা কিছুতেই কাউন্টারে পৌঁছতে পারছিল না। দুই বয়স্ক লোকের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে চেষ্টা করল।

—একী ! গোঁতাচ্ছ কেন খোকা।

—কই গোঁতালাম ! কাউন্টারে যাব না ?

—যাবে বইকী। নিশ্চয়ই যাবে। পরপর এসো। আগে আমার হোক।

রাজা ভদ্রলোকের পরোয়া করল না, কাউন্টারের লোকটিকে উচ্চৈঃস্বরে নার্ম বলল সিরাপের। লোকটির ভ্রূক্ষেপ নেই, সে ঠাণ্ডা মাথায় ক্যাশমেমো লিখে চলেছে। ওষুধের ফাইল ধরে ধরে নাম, ব্যাচ নাম্বার, রিটেল প্রাইস। একবারে হল না, আবার প্রেসক্রিপশন ধরে মেলাচ্ছে, ক্যালকুলেটার টিপে চলেছে টকটক।

রাজা উশখুশ করল, কী হল ? আমারটা দিন।

—হচ্ছে। হচ্ছে। কথা বোলো না। বিলে ভুল হয়ে যাবে।

—আমার পরে এসে সব আগে নিয়ে চলে যাচ্ছে, আমার বেলায় যত দেরি !

—কেউ তোমার আগে নেয়নি। লোকটা বিকারহীন মুখে তাক থেকে অন্য একটা ওষুধ নামাচ্ছে, —কেন যে এই বাচ্চা ছেলেদের ওষুধ কিনতে পাঠায় ? এতটুকু তর সয় না !

রাজা তপ্ত হল, —ফালতু কথা বলছেন কেন ? আপনার ওষুধ দিতে দিতে রুগি তো মরে ঢোল হয়ে যাবে।

দোকানদারও ধৈর্য হারাল, —নেবে তো কাশির সিরাপ, তার আবার কত কথার কায়দা !

—কাশির ওষুধ কি ওষুধ নয় ! নাকি আমি ওষুধ মাগ্‌না নিতে এসেছি ! পয়সা ফেলে ওষুধ নেব। বিশটা দোকান পড়ে আছে...

রাজা গটগট করে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি থেকেই দোকানদারের মন্তব্য শুনতে পাচ্ছিল সে।

—দেখলেন কথার ছিরি। কী যে সব তৈরি হচ্ছে আজকাল। মাঝবয়সি এক টেকো লোক ফুট কাটল, —সময় নেই, এদের একদম সময় নেই। মাববে তো গিয়ে আড্ডা। নয়তো টিভির সামনে বসে খেমটা নাচ দেখবে !

রাজা ঘুরে আগুন চোখে লোকগুলোর দিকে তাকাল। দেখলে দেখব, তাতে তোর কীরে বুড়ো ভাম ! ওষুধের দোকানে লাইন মেরে মেরেই তো মাথা পাকা বেল করে ফেললি ! তোর মতো তীর্থের কাক হয়ে লাইন মারার জন্য জন্ম হয়নি রাজার। সময়ের মর্যাদা কাকে বলে বুঝিস !

গোলপার্কের কাছে এসে রাজা অন্য দোকান থেকে ওষুধটা কিনল। একটু এগোলেই বাঁদিকে আরেক ভিডিও গেমসের পার্লার। নতুন দোকান খুলেছে বলে দশ টাকার খেললে ছোটখাটো গিফট্ দেয়। খেলাগুলো এমন কিছু নতুন নয়। বেশির ভাগই মোটর সাইকেল আর কার রেস। তবু রাজার হাত নিশপিশ করছিল। একটু ঢুকলে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মার মুখ মনে পড়ে গেল। মার মুখ নয়, বাঘিনির মুখ যেন। বাঘিনী আজ বেশ কাদায় পড়েছে। কাল রাতে অল্প অল্প কাশছিল, আজ সকাল থেকে কেশে গলা চোট। ফ্যাঁসফ্যাঁসে স্বর বেরোচ্ছে, কি বেরোচ্ছে না ! দেরি করিস না রাজা। ওষুধটা খেয়ে একটু শোব ভাবছি। জ্বর আসছে বোধহয়।

বাঁচা যায়। কদিন বিছানায় লেটে থাকলে যদি ট্যাকট্যাকানি কমে ! পরীক্ষার যে ঠিক দু সপ্তাহ বাকি, তা কি রাজা জানে না ! না রাজার কোনও ভাবনা চিন্তা নেই ! রাজা যথেষ্ট সিরিয়াস। তা বলে কি সারা দিনে দু সেকেন্ডও মাথা ছাড়ানো যাবে না !

রাজা ওষুধের শিশি দু হাতের তেলোয় পাক খাওয়াল। দোকানদারের ইঙ্গিত খুব ভুল নয়। কাশির ওষুধ দু ঘণ্টা পরে খেলে কেউ মারা যায় না। নয় মা কিছুক্ষণ কাশলই। ওষুধ যখন পড়ার ঠিক পড়বে।

...ক্লাস ফোরের রাজা পাবলিক বাসে স্কুল থেকে ফিরছে। গড়িয়ামুখী বাসে সর্ষে রাখার স্থান নেই। একটা লেডিজ সিট খালি হতেই চতুর মাজারীর তৎপরতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল অনুরাধা। তিন-চার জন মহিলাকে কনুই-এর ঠোক্করে টপকে সিটের দখল নিয়েছে। চেঁচাচ্ছে, —রাজা আয় আয়। বসবি আয়।

রাজা সামনের বৃদ্ধার পা মাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

বৃদ্ধা হাউমাউ করে উঠলেন, —ও বাবারে, গেলাম রে...

সঙ্গে সঙ্গে অনুরাধা ঝাপটে উঠেছে, —ওইটুকু বাচ্চা একটু পা মাড়িয়ে ফেলেছে তার জন্য এত চেঁচাচ্ছেন কেন ?

বৃদ্ধা তখনও কাতরাচ্ছেন, —নামেই ওইটুকুন। ওজন তো কম নয় বাবা।

—আশ্চর্য ! আপনি একটা নাতির বয়সি ছেলেকে নজর দিচ্ছেন ? অনুরাধা ছেলেকে টেনে নিল, —বোস। এখানে বোস।

গাবলুগুবলু রাজা সিটে বসে মাকে বলল, —আমাকে ব্যাগটা দাও।

—না না, তুই বোস ভাল করে। ছেলেকে বসিয়ে অনুরাধা ভিড়ে টাল সামলাচ্ছে, কাঁধে ছেলের দুমনি বোঝা। ঝুঁকে জানলার রড ধরে দেহের ভারসাম্য ঠিক রাখার চেষ্টা করছে।

এক ভদ্রলোক বললেন, —দিদি, ব্যাগটা ছেলেকে দিয়ে দিন না।

ঘামভেজা মুখে অনুরাধার উত্তর, —থাক, সেই নটা থেকেই তো এই বোঝা বইছে। বলতে বলতে কসরত করে ছেলের টিফিনকৌটো বার করে ফেলেছে ব্যাগ থেকে, —একী ! আঙুরগুলো খাসনি কেন ! সব পড়ে আছে !

জানলার ধারে বসে আঙুর খাচ্ছে রাজা। আরামে জুড়িয়ে যাচ্ছে তার মুখ চোখ। অনুরাধা ভিড়ের চাপে... ।

এ সব ঘটনা রাজার কিচ্ছু মনে নেই ! মনে রাখার দায়ও নেই !

রাজা টাকা গুনল। উনিশ টাকা সত্তর। পার্লারে ঢুকবে, কি ঢুকবে না ! মা হিসেব চাইবেই। কিছু ফেরত না দিতে পারলে...

—কী হিসেব করছিস রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ?

রাজা কাঁধে থাপ্পড় খেয়ে পিছন ঘুরে দেখল। টুকুন। টুকুনের হাতে প্রকাণ্ড মিষ্টির হাঁড়ি।

—তেমন কিছু না। এই একটু খেলব কি না ভাবছিলাম। রাজা অপ্রতিভ মুখে হাসল। হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে চোখ নাচাল, বাড়িতে প্রচুর গেস্ট এসেছে বুঝি ?

—গেস্ট বলে গেস্ট্। পঙ্গপাল। হবু বর, তার বাপ মা, দিদি, দিদির দুটো গেঁড়ি গেঁড়ি, মামা মামি...

—রুমদির বিয়ে ফিক্সড ?

—বড়দিভাই-এর না, ছোড়দিভাই-এর। পুজোর পর বরের বাবা মা দেখে পছন্দ করে গিয়েছিল। বর গত সপ্তাহে দিল্লি থেকে এসেছে। ছোড়দিভাইকে দেখে সে একেবারে থ্রিলড। আজ আশীর্বাদ।

—বিয়ে কবে ?

—ওদের তো মার্চেই ইচ্ছে ছিল, আমার পরীক্ষা বলে বৈশাখে পিছিয়ে গেল।

—রুমদির আগে ঝুমদির বিয়ে হয়ে যাবে ?

টুকুন চোখ টিপল। —এক মাস পিছোনোর সেটাও একটা কারণ। বড়দিভাই-এরও জোর দেখাশুনো চলছে, এর মধ্যে যদি লেগে যায় ! আসল ব্যাপারটা হল কপাল। ছোড়দিভাই-এর লাক ভাল। এ ছাড়া নিজেও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। মালটিন্যাশনালে ঘ্যামচ্যাক চাকরি করছে। বিয়ের বাজারে এক সিটিং-এ বেরিয়ে গেল। বড়দিভাইটা যদি চাকরি বাকরি করত... তুই-ই বল বড়দিভাই বেশি ফর্সা না ?

—শুধু ফর্সা কেন, রুমদির মুখটাও কত সুন্দর ! সরস্বতী ঠাকুরের মতো। রাজা পলকা কৌতূহল ছুড়ল, —ঝুমদির বর করে কী ?

—পুষ্পলদাও ইঞ্জিনিয়ার। মেকানিকাল। তবে ছোড়দিভাই-এর মতো অত ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট নয়। চাকরি অবশ্য ভালই করে। ভাল ফার্ম। ফরিদাবাদে কোয়ার্টার পেয়েছে...

—বিয়ের পর কী হবে ! ঝুমদির চাকরি তো জামশেদপুর ! দিল্লি জামশেদপুর করে বেড়াবে !

—তা কেন ! ছোড়দিভাইদের দিল্লিতেও অফিস আছে। ট্রান্সফার নেওয়ার চেষ্টা করবে। না হলে চাকরি ছেড়ে দেবে।

—অত বড় চাকরি ছেড়ে দেবে !

—উপায় কী। ঘরসংসার তো করতে হবে। টুকুন অবিকল প্রবীণদের মতো কথা বলছে, —মেয়েদের আগে বর, পরে চাকরি।

—আমার এক মাসিরও সেম প্রবলেম চলছে। মার খুড়তুতো বোন। মাসি গোঁ ধরে আছে চাকরি ছাড়বে না, ওদিকে মেসো একা একা আগরতলায় পচছে। রিস্পেক্টলি দুজনের হেভি ফাইটিং হয়েছে।

—হুঁ, মেয়েদের এ সব কেসে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়াই উচিত। ছোড়দিভাই ঠিক করে নেবে। টুকুনের গলা ভারিক্কি আরও, —তুই ফিরবি ? না খেলবি এখন ?

—আজ থাক। খেলব না।

রাজা দু-চার পা এগিয়েও থেমে গেল। কাল টিউটোরিয়ালে সাগ্নিক বলছিল দেয়ার বাবা নাকি একটা দারুণ হিস্ট্রির সাজেশান তৈরি করেছে। দেয়া নিজে অবশ্য রাজাকে বলেনি। আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছে দেয়াটা! আগে টিউটোরিয়াল শেষ হওয়ার পর দু-পাঁচ মিনিট দাঁড়াত, রাজার সঙ্গে ফিরত গল্প করতে করতে ; আজকাল টিউটোরিয়াল শেষ হলেই ভ্যানিশ। এমনিতে রাজার সঙ্গে কথা বলছে, হাসছে, সবই ঠিক আছে, তবু কেমন ছাড়া ছাড়া ভাব। রাজা সেদিন ওদের বাড়ি যেতে চাইল, মুখের ওপর বলে দিল, আজ নয়রে। আজ আমি গিয়েই পড়তে বসব। হঠাৎ এমন ভাব করছে যেন ও একাই মাধ্যমিক দেবে! রাজারা সব এলেবেলে! একবার গিয়ে দেখলে হয় কী এত মন দিয়ে পড়ছে দেয়া!

টুকুন রাজাকে টানল, —কী হল রে তোর? স্টিল হয়ে গেলি কেন?

—তুই এগো। আমি একটা বন্ধুর বাড়ি যাব। হিস্ট্রির সাজেশান আনতে হবে।

—ভাল সাজেশান?

—ভাল তো বটেই। বন্ধুর বাবা হিস্ট্রির প্রফেসার। তুই কাল সকালে আমার বাড়ি আয়, তোকেও দিয়ে দেব।

—উরেব্বাস্। টুকুন আঁতকে ওঠার অভিনয় করল, —আমি বাবা আর তোমার বাড়ি যাচ্ছি না। মাসিমা এমন চোখ পাকিয়ে তাকান...! গিয়েই বা কী লাভ! তুই তো নাকি কোনও সময়েই বাড়ি থাকিস না। আজ পিসিমণির বাড়ি। কাল মামার বাড়ি! আরও যেন কার কার নাম বলেন মাসিমা! হিহি। হিহি।

টুকুনের হাসিতে অস্বস্তি হচ্ছিল রাজার। মা'টা যেন কী! গুল মারতে হয় মারো, লিমিট রেখে মারো! রাজাকে বেইজ্জত করা কেন!

রাজা লজ্জা লজ্জা মুখে বলল, —কাল আয় না। আমি তো বলছি আমি দেব।

হাঁটতে হাঁটতে আনমনে আকাশ দেখছে রাজা। আকাশ বহু ওপরে আজ। দূর নীলে পাতলা পাতলা সাদা মেঘ। এ মেঘে বৃষ্টি হয় না। রাজা জানে। এ মেঘ আকাশের বাহার। কী যেন নাম এই মেঘের? নিমবাস? না সিরাস? নিম্বাস্ তো বৃষ্টির মেঘ? নাকি সিরাসেই বৃষ্টি হয়? বই-এর ছবিটা মনে করতে চাইল রাজা। গুলিয়ে যাচ্ছে। ভূগোল বড় ঝামেলার সাবজেক্ট। কোনও বাঁধা ছক নেই, কিছুতেই মুখস্থ রাখা যায় না। ভাবতে ভাবতে হঠাৎই রাজার হাসি পেয়ে গেল। গড়িয়ার বাড়িতে বড়মা কীসব অদ্ভুত অদ্ভুত মেঘেদের নাম বলত! কুণ্ডল মেঘ! কোদালে মেঘ! হাঁড়িয়া মেঘ! কুড়ুলে মেঘ! বড়মা রাজাকে দু-একটা মেঘ চেনাবার চেষ্টাও করেছিল সেসময়। দূর দূর, কী হবে জেনে! পরীক্ষায় যদি না'ই আসে, খামোকা মেঘ চিনে রাজা কেন সময় নষ্ট করবে!

রাস্তা দিয়ে রাজার একা একা হাঁটার দৃশ্যটি ভারী মনোরম। তার চোখের সামনে তখন একটার পর একটা ছবি ফুটে ওঠে। আর ঈষৎ দুলে দুলে হেঁটে চলে রাজা। ছবিগুলোকে চোখে রেখে। এই একলা চলার সময় সে পথচারীদের উপস্থিতি মনে রাখে না, বাস-ট্যাক্সি গাড়ি মিনির নির্ভীক বিচরণভূমি গোচরে আসে না তার।

রাজার ছবিরা অবশ্য সংখ্যায় খুব বেশি নয়। রঙিন পর্দার ভিডিও গেমের খেলারাই তার একান্ত ছবি। চলমান রাজা কাল্পনিক রিমোট কন্ট্রোলে চাপ দেয়। হু-হু করে উলটো দিক থেকে ছুটে আসে গাড়িরা। তাদের ক্রমাগত কাটাতে কাটাতে রাজার গাড়ি এগিয়ে চলে। চকিত ধাক্কায় লেন্ থেকে ছিটকে যায় মাঝে মাঝে। রাজা দ্রুত হাতল ঘুরিয়ে আবার পথে নিয়ে আসে তাকে। গাড়িরা বদলে কখনও মোটরসাইকেল হয়ে যায়, কখনও বা স্পিডবোট। কিন্তু ছবির চরিত্র, মাত্রা, রং, ঘনত্ব বদলায় না খুব একটা। ইদানীং যুদ্ধের মহড়াটাই বেশি আসছে চোখের সামনে। ধূমকেতুর মতো মিসাইল ছুটে বেড়াচ্ছে চারদিকে। স্কাড আর টোমাহকের মারণলড়াই দেখতে দেখতে রাজা পা চালায়। এ সময়ে দৃশ্যত তাকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না, তার হাঁটার ছন্দেও পরিবর্তন ঘটে না তেমন। শুধু হঠাৎ হঠাৎ ঠিকরে ওঠে রাজার চোখের মণি, কখনও বা তা নিষ্প্রাণ। বছর কয়েক আগেও স্পাইডারম্যান সুপারম্যানরা ছিল তার ছবির তালিকায়। এখন তারা উধাও হয়ে গেছে মহাশূন্যে।

কিছুদিন ধরে আরেকটা ছবিও আসতে শুরু করেছে। ছবিটা এখনও তেমন স্পষ্ট নয়, এসেই

মিলিয়ে যায়। এই ছবি রাজার মনে তার মা বুনে দিয়েছে। তাদের আগামী বাড়ি।

গড়িয়ার বাড়ি থেকে কাঁকুলিয়ায় এসে ভীষণ মুগ্ধ হয়েছিল রাজা, —মা কী দারুণ বাড়ি গো! চকচক করছে মেজেটা! ঠিক বড়লোকদের বাড়ির মতো। আমরা কি বড়লোক হয়ে গেছি মা।

অনুরাধা ছেলের গাল টিপে দিয়েছিল, —দূর বোকা, বড়লোকদের তো নিজের বাড়ি থাকে। ইয়া বড়। প্রাসাদের মতো। এটা তো ভাড়া বাড়ি।

সেই প্রাসাদই তৈরি হবে এবার। কাচের ঘর, অর্কিড হাউস, মোটা মোটা নরম ঘাসের সবুজে লন, এ সব তো থাকবেই। তার সঙ্গে আরও একটা অনুষঙ্গ যোগ করে নিয়েছে রাজা। মনে মনে। অ্যাকোয়ারিয়াম। রাজার নিজস্ব ঘরে। গোটা দেওয়াল জুড়ে। কালো হলুদ লাল সোনালি হরেক রঙের মাছ তিরতির সাঁতার কাটবে নীলচে জলে। রাজা যখন ছোট, প্রচণ্ড বৃষ্টিতে মাঝে মাঝেই উপচে যেত তাদের গড়িয়ার বাড়ির পাশের পুকুরটা। খলসে পুঁটি চ্যাঙ-মৌরলা জলের সঙ্গে ঢুকে পড়ত উঠোনে। কিলবিল খেলা করত। দাদু নাতি গামছা ফেলে মাছ ধরত। তখন থেকেই কি মাছেরা...! কাচের মৎস্যাধার ভরে থাকবে নুড়িপাথর আর জলজ লতায়, বাতাস বুদবুদ কাটবে অবিরল। দীপেদের এখানে যেরকম আছে ঠিক সেইরকম। চঞ্চল মাছেদের দেখতে দেখতে রাজার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসবে। ঘুম। ঘুম। স্বপ্নমাখা ঘুম।

নাহ্, স্বপ্নজড়ানো ঘুম আর কোথায় রাজার! অনেক দিন হয়ে গেল তার ঘুমে কোনও স্বপ্ন আসে না। সে এখন জন্তুদের মতোই স্বপ্নহীন। ছোটবেলায় তার ঘুমে পরিরা আসত। পক্ষীরাজে চড়ে রাজপুত্র। সোনার কাঠি রুপোর কাঠি। প্রতিভার গল্প বেয়ে। তারা যে কবে হারিয়ে গেল! তারপর এল ফ্লাইংসসার। ইউ এফ ও। তারাও আর নেই। এখন রাজার শুলেই ঘুম। মড়ার মতো ঘুম। স্বপ্নের ভিডিও যদি কখনও চলতে চায়, অসহ্য এক চাপ অনুভব করে রাজা। বুকের ভেতর। বই খাতা পেনসিল কলম, জিওমেট্রি বক্স, টিফিনবক্স ভর্তি ব্যাগের চাপ। সুপ্ত রাজা সেই চাপে ক্রমশ বেঁকে যেতে থাকে বিছানায়। নুয়েপড়া শিরদাঁড়া ঋজু রাখতে চেষ্টা করে আপ্রাণ, পারে না। কোথা থেকে ঝাঁক ঝাঁক গুলির শব্দ আছড়ে পড়ে রাজার কানে। ঘুম শেষ।

দিন আর রাতের মাঝে, আলো আর আঁধারের মাঝে, পূর্ণ জাগরণ আর গাঢ় নিদ্রার মধ্যিখানে আরও একটা সময় আছে রাজার। সেই সময়টুকুই রাজার গোপন সুখ। রাজার দেওয়াল তখন ভরে ওঠে অশুস্তি কল্পচিত্রে। নাম না জানা, চেনা, অচেনা, নানান নারীদের শরীর জ্যামিতিক নকশার মতো ফুটে ওঠে, বদলাতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে। এ দৃশ্য এত গোপন, এত নিষিদ্ধ যে রাজা দিনের আলোয় তাদের দেখতে সাহস পায় না। ভুলে থাকে। থাকতে চায়।

আজও রাজা চোখ রেখেছিল যুদ্ধে। দেয়াসিনীদের বাড়ি পৌঁছে হুঁশ ফিরল। দরজার সামনে এসে রিমোট টিপে অফ করে দিল যুদ্ধের ছবি।

দেয়াসিনীকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। কোমল গোলাপি নাইটির অন্তরালে প্রস্ফুটিত দেয়ার নতুন যৌবন। চুলের তরঙ্গে, ভ্রূপল্লবে কী তীব্র চোরা আকর্ষণ! অপূর্ব এক সুরভি ক্ষণেকের জন্য সম্মোহিত করে ফেলেছিল রাজাকে, রাজা চোখ বন্ধ করে চোখ খুলল, —পড়ছিলি নাকি?

দেয়া পাশ কাটানোর ভঙ্গিতে বলল, —এটা তো পড়ারই সময়।

রাজা ওষুধের শিশিটা তুলে দেখাল, —মার ওষুধ কিনতে বেরিয়েছিলাম। ভাবলাম অনেকদিন তোর বাড়ি টু মারা হয়নি, আজ তোকে একটু ডিসটার্ব করে যাই।

দেয়া বাড়ির ভেতরটা টুক করে দেখে নিল, —আয়।

দেয়ার পড়ার টেবিল সুবিন্যস্ত। দেখলেই বোঝা যায় এখন দেয়া মোটেই পড়াশুনা করছিল না।

রাজা মোড়া টেনে বসল, —তুই কবে থেকে বিকেলে পড়া শুরু করলি?

—পড়ছি। তোর প্রিপারেশন শেষ?

পলকের জন্য আকাশের পেঁজা পেঁজা মেঘটাকে দেখতে পেল রাজা— জিওগ্রাফিটা ঠিক গ্রিপে আসছে না। হিস্ট্রিটাও। কিছুতেই সাল তারিখ মনে থাকে না। রাজা দেয়ার চোখে চোখ রাখল,— মেসো কী সাজেশান তৈরি করে দিয়েছেন শুনলাম?

—তুই নিবি?

—দে। জেরক্স করে ফেরত দিয়ে যাচ্ছি।

দেয়া বইখাতা সরিয়ে সাজেশান খুঁজছিল, রাজা জিজ্ঞাসা করল,— অ্যাডমিট কার্ড কবে আসবে শুনেছিস ?

—পাঞ্চালীর মা কাল এসেছিলেন। পাঞ্চালীকে নাকি স্কুল থেকে বলেছে কামিং উইকে আসবে। সোমবার, কি মঙ্গলবার। নিজেদের সই করে নিয়ে আসতে হবে।

শিপ্রা পাশের ঘর থেকে চেঁচাল,— কে এসেছে রে দেয়া ? কার সঙ্গে কথা বলছিস ?

নিমেষে দেয়ার মুখ সাদা,—সৌভিক এসেছে মা।

শিপ্রা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পক্ষীমাতার মতো উড়ে এসেছে ঘরে। রাজাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মেয়েকে বলল,— তুমি আজকাল ভীষণ অবাধ্য হয়ে গেছ দেয়া। কত বার বলেছি পরীক্ষার আগে আড্ডা মারবে না।

রাজা থতমত খেয়ে গেল— না মাসি, আমি ঠিক আড্ডা মারতে আসিনি।

—ঠিক আছে ঠিক আছে। যা কাজ আছে তাড়াতাড়ি সেরে চলে যাও। দুদিন পরে পরীক্ষা... !

রাজা শিপ্রার আচরণের মাথামুণ্ড বুঝতে পারছিল না। মাসির কি আজ মেজাজ ফেজাজ খারাপ নাকি ! কাজের লোক আসেনি ! মেসোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে !

সাজেশান না নিয়ে ক্ষুণ্ণ মুখে উঠে দাঁড়াল রাজা। শিপ্রা চলে যেতে গিয়েও আচমকা দাঁড়িয়ে পড়েছে— সৌভিক, তুমি যে আগের দিন আমাদের এখানে এসেছিলে, সেদিনই তো তোমার বাবা বাড়ি ফিরে এসেছিলেন, তাই না ?

রাজা কথাটা ভুলেই গিয়েছিল। অত তুচ্ছ কথা এতদিন মনে থাকে ! পরক্ষণেই মনে হল সত্যিই তো সেদিনের পর আর আসা হয়নি। বাবার খবরটা রাজা দিয়ে যায়নি বলেই কি চটে আছে মাসি ! রাজা লজ্জিতভাবে বলল, — হ্যাঁ মাসি। দেয়াকে তো আমি বলে দিয়েছিলাম ! অবশ্য আমার নিজেরই তোমাদের খবর দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

শিপ্রা রাজার কথা শুনলই না, খানিকটা বিদ্রূপের ঢঙে বলল, তিনি এখন আছেন কেমন ?

—বাবা ! রাজা ভীষণ অবাক,— বাবা যেমন থাকে তেমনই আছে। ভালই আছে।

—হুঁ। ভাল থাকলেই ভাল। সংসারের মঙ্গল। বাঁকাভাবে শব্দ কটা ছুড়ে দিয়ে চলে গেল শিপ্রা।

দেয়া একরকম রাজাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে,— একটা কথা বলব, প্লিজ কিছু মনে করবি না ?

—কী ?

—তুই প্লিজ আমাদের বাড়ি এখন আসিস না। আমি তোর সঙ্গে বাইরে কথা বলব।

রাজা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল,— কেন ?

—জানতে চাস না। প্লিজ।

—জানতে তো চাইবই। মাসি আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলল কেন রে ? আমি কি মাসিকে কোনওভাবে অপমান করেছি ?

—তা না। দেয়া থুতু গিলছে, —তুই যে সেদিন এসে বললি মেসোমশাইকে পাওয়া যাচ্ছে না, তার পরদিন থেকে মা তোর ওপর ভীষণ খেপে আছে।

রাজার অভিমান হল, আমি কি মিথ্যে বলেছিলাম ! সত্যিই তো আমার বাবা দুদিন ফেরেনি ! আমি জানব কী করে বাবা সেদিনই অফিসের কাজ সেরে ফিরে আসবে !

—সেখানেই তো গণ্ডগোল। সুভাষজেঠু এসেছিল। পরদিনই। মাকে বাপিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কীসব বলল। তোর বাবাকে নিয়েই কথা হচ্ছিল। আমি শুনেছি।

—কী কথা ?

—সব কথা কি শুনতে পেয়েছি নাকি ? ঘরের সামনে ঘুরঘুর করছিলাম বলে মা কী বকা লাগাল আমাকে। দেয়া আঙুলে চুল পাকাল, —যত দূর মনে হয়, তোর বাবা অফিসের কাজে যাননি।

—যাহ্। হতেই পারে না।

—হ্যাঁ রে। বিলিভ মি। কীসব পার্ক স্ট্রিট থানা, হাইকোর্ট, বেল এ সব নিয়ে বলাবলি করছিল। একটু থেমে দেয়া নিম্ন স্বরে বলল, তোর বাবা কি কোনও অফিসের ঝামেলায় অ্যারেস্ট ফ্যারেস্ট হয়েছিলেন ?

হাঁটুর জোর কমে যাচ্ছিল রাজার। তার বাবা, অত সুন্দর একজন স্বাস্থ্যবান স্নেহশীল মানুষ, এত ভালবাসে রাজাকে, সে কেন গ্রেপ্তার হতে যাবে ! হ্যাঁ, রাজা অবশ্য জানে বাবা সাংঘাতিক বড় কিছু চাকরি করে না, গভর্নমেন্টের মাঝারি মাপের অফিসার, সে তুলনায় বাবার হাতে অনেক বেশি টাকা। মা দামি দামি শাড়ি কিনছে, বাড়ি ভর্তি শৌখিন জিনিস, রাজা একবার মুখ ফুটে বলতেই ভি সি আর চলে এল, টেপডেকও। রাজার এইটিন্থ বার্থডেতে মোটরসাইকেল কিনে দেবে বলেছে, তারও দাম কম নয়। বাইরে বেড়াতে গেলে হোটেলে কী জলের মতো পয়সা খরচ করে বাবা। এ সি রুম। ভাল ভাল খাওয়াদাওয়া। সাধ্যের অতিরিক্ত কবে বাবা আরাম কিনে দিচ্ছে রাজাদের। হ্যাঁ বাবা মাঝে মাঝে মদ খায়, রেসের মাঠে যায়। যায় ! রাজাদের লুকিয়ে তো কিছু করে না। এর জন্য হয়তো কিছু উপরি টাকাও... ! রাজা চিন্তাটাকে ধমকে থামাল,—অসম্ভব। আমার বাবা অফিসের কাজে গিয়েছিল।

—জানি না বাবা। দেয়া ঠোঁট ওলটাল,— সুভাষজেঠু বাবা মাকে সব বলেছে। ডিটেলে।

রাজার চড়াং করে রক্ত উঠে গেল মাথায়, আমার বাবার নামে উলটোপালটা বলছিস কেন রে ?

—আমি কেন বলব ! সুভাষজেঠু বলেছে। সুভাষজেঠু সব খবর রাখে।

—তোর সুভাষজেঠু কি ভগবান নাকি ? পুলিশের লোকেরা কী আমার জানা আছে। ঝাড়েবংশে মিথ্যেবাদী।

—এই, মুখ সামলে সৌভিক। সুভাষজেঠু মোটেই অন্য পুলিশদের মতো নয়। ভীষণ অনেস্ট।

—ছাড় ছাড়। কত সাধুসন্ত সব জানা আছে।

দেয়াও ভদ্রতা হারাল,— সুভাষজেঠু মিছিমিছি তোর বাবার নামে বলতে যাবে কেন ? নিশ্চয়ই তোর বাবা এমন কিছু কেচ্ছা করেছেন .... মা তো কাল পাঞ্চালীর মাকেও বলছিল।

— কী বলছিল সাফ্ সাফ্ বল্। প্যাঁচ মারিস না।

—তোকে এত কৈফিয়ত দিতে যাব কেন রে ? তুই শুনে রাখ তোর বাবা এমন কিছু খারাপ কাজ করেছিলেন, যেটা বাবা মা আমাদের কাছে বলতে পারছে না। তোর সঙ্গে মিশতে বারণ করছে। বিশ্বাস না হয়, পাঞ্চালীকে জিজ্ঞাসা করে দেখিস।

রাজা অপমানে মাটিতে মিশে গেল। ঘাস বালি পাথর হয়ে গেল যেন। পরমুহূর্তেই অন্ধ ক্রোধে দু হাতে খামচে ধরেছে দেয়ার কাঁধ। এত জোরে যে কঁকিয়ে উঠেছে দেয়া, ছাড় আমাকে। ছাড় বলছি।

শিপ্রা মেয়ের আর্তনাদ শুনে ছুটে এসেছে বাইরে। এক হেঁচকায় ছাড়িয়ে নিয়েছে দেয়াকে। লাল চোখে তাকিয়ে রইল রাজার দিকে, তারপর নিষ্ঠুর মুখে হাসল, বাহ্ চমৎকার ! যেমন বাপ, তেমনি ছেলে। মেয়ে দেখলে দুজনেরই কোনও জ্ঞান থাকে না, না ? রক্তের ধারা যাবে কোথায় ?

রাজা তখনও ফুঁসছে।

শিপ্রা রাজাকে ধাক্কা দিল, বেরিয়ে যাও। তুমি আর কক্ষনও এ বাড়িতে পা দেবে না।

শূন্য মস্তিষ্কে বুনো ষাঁড়ের মতো ফিরছে রাজা। লোকের সঙ্গে রাস্তায় ধাক্কা লাগছে, ভ্রূক্ষেপ নেই, এলোপাথাড়ি হাত ছুড়ে সরিয়ে দিচ্ছে পথচারীদের। নিজেই জানে না চোখের কোলে বাষ্প জমেছে কখন। কখনই বা নাগরিক সন্ধ্যা ঢেকে গেছে গাঢ় কুয়াশায়।

অনুরাধা ছেলেকে বকতে গিয়ে চমকে উঠল, —হাঁপাচ্ছিস কেন রে ! মুখ চোখ এরকম লাগছে কেন ! রাস্তায় কারও সঙ্গে মারপিট করেছিস নাকি !

রাজা মার দিকে তাকাল না।

—ছিলি কোথায় এতক্ষণ ? তোর ছোটমামা কতক্ষণ এসে বসে রইল, দেখা হল না তোর সঙ্গে ?

রাজার প্রতিক্রিয়া নেই।

—ওষুধ এনেছিস আমার ?

রাজা পকেট থেকে শিশি আর টাকা বার করে খাবার টেবিলে রাখল। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে অনুরাধার মুখের ওপর।

রাত গভীর। রাজার কক্ষে আঁধার নেমেছে। নির্জন রাত্রিতে জেগে আছে শুধু দুটি চোখ। শুকনো। জ্বলছে। শিপ্রার কথাগুলো এখনও তপ্ত শলাকার মতো বিঁধছে রাজাকে। রক্তের ধারা! রক্তের ধারা!

রাজার ভেতরে একটা গর্জন জমাট বাঁধছিল।

চুলোয় যাক বাবা মা। ধ্বংস হয়ে যাক বাড়িঘরদোর। আজ রাত্রেই অ্যাটমবোমায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক পৃথিবী।

নয়

প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশে পার্টি নেতাদের দুর্নীতি, স্বজনপোষণ নিয়ে দীর্ঘ এক প্রবন্ধ বেরিয়েছে কাগজে। যাদের সম্পর্কে রাষ্ট্রযন্ত্রের সামান্যতম সংশয় ছিল, কী ভাবে তাদের জেলে পচতে হয়েছে তারই আনুপূর্বিক বিবরণ। কোথাও কোথাও কিছুটা অতিরঞ্জিত, বিকৃত। তবু সত্যটুকু চিনে নেওয়া যায় সহজেই। এখনকার হতদরিদ্র অবস্থার কারণগুলোও ফুটে উঠেছে লেখায়।

সাত্যকি মন দিয়ে খানিকটা পড়ে কাগজ বালিশের পাশে মুড়ে রাখল। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। কাল রাতে বিদিশাদের বাড়ির থেকে ফেরার সময়ই মাথা বেশ দপদপ করছিল, ভেতরে ভেতরে কেমন একটা চোরা কাঁপুনির ভাব। ঘুমেও থেকে থেকে জানান দিয়েছে যন্ত্রণাটা। এখন মনে হচ্ছে ভালই জ্বর এসেছে। মুখ হাকুচ তেতো। বিস্বাদ। বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

নতুন করে সাত্যকি সুজনিতে আপাদমস্তক ঢেকে নিল। মার্চের শুরুতেই শীতে কুঁকড়ে যাচ্ছে। গরম এক কাপ চা দরকার।

লাজু অনেকক্ষণ উঠে গেছে, রোজ যেমন যায়। ভোর ভোর উঠে স্নান সেরে ফেলে লাজু। শীত গ্রীষ্ম বারোমাস। তারপর সোজা চলে যায় রান্নাঘরে। সাত্যকির সঙ্গে সকালে তার কথাবার্তা প্রায় হয়ই না। হুঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এইরকম গোটা তিন-চার শব্দ, ব্যাস্। সাত্যকিরও অবশ্য সকালে লাজুর দিকে তাকানোর সময় নেই। রাতে সে দেরি করে শোয়, ওঠেও একটু বেলা করে। উঠেই টগবগ টগবগ। এই বেরিয়ে গেল, এই বসছে, এই ছুটল মোড়ে। অবিরাম ব্যস্ততা। একের পর এক লোক দেখা করতে আসছে। পাড়ার ছেলেরা। ক্লাবের ছেলেরা। নাগরিক কমিটির লোকজন। জমির দালাল। আগে ফ্ল্যাটের খরিদ্দাররাও ভিড় জমাত, লেক মার্কেটে অফিস খোলার পর বাড়িতে তাদের উৎপাত কম এখন। এর সঙ্গে পার্টির লোকজন তো আছেই। তাদের সময় অসময় নেই। তারা ভোরেও আসতে পারে। রাতদুপুরেও।

আজ যদি সব কাজ থেকে ছুটি পাওয়া যেত!

আজ যদি লাজু সারাদিন বসে থাকত মাথার কাছে।

সাত্যকি শুয়ে শুয়েই টের পাচ্ছিল পঙ্কজ ঘরে ঢুকেছে। খুটখাট করছে কীসব। কলিংবেলের শব্দে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। আবার ঢুকেছে, মামা, কাজলমামারা এসেছে।

সাত্যকির জিভ আরও তেতো হয়ে গেল। কাজলের আসার কথা ছিল বটে। পার্টির কয়েকটা ছেলেকে নিয়ে। কাজলের বাবা এবার মিউনিসিপাল ইলেক্শানে দাঁড়িয়েছেন। দাঁড়ানোর মূলে সাত্যকির অবদান কম নয়। লোকাল অফিসে অনেক দড়ি টানাটানির খেলা খেলতে হয়েছে সাত্যকিকে। চেষ্টা করলে নিজেও নমিনেশান পেতে পারত, কিন্তু কেমন একটা ভয় ঢুকে গেছে তার। ভয়টা যে কীসের, কিছুতেই বুঝতে পারে না সাত্যকি। কেবলই মনে হয় কোনও এক

অজানা আক্রমণে তছনছ হয়ে যাবে সাত্যকির জীবন। তবে কাজলের বাবার জন্য যতটা লড়েছে সাত্যকি, নিজের জন্য হলেও অতটা লড়ত না। তার অবশ্য আরেকটা কারণও আছে। সে এখন টাকার গন্ধ পেয়েছে।

সুজনি থেকে মাথা বার না করেই সাত্যকি বলল, বাইরের ঘরে বসা। আমি আসছি।

বার কয়েক মাথা তুলেও সাত্যকি শুয়ে রইল। ভার ভার গলায় পঙ্কজকে ডাকল, —আমাকে ঘরে এক কাপ চা দিয়ে যা তো আগে।

সাত্যকি খুব আশা করেছিল চা নিয়ে লাজু আসুক ঘরে, পঙ্কজ নয়। বিয়ের পর পর লাজুই চা এনে তার ঘুম ভাঙাত, —কী পড়ে পড়ে বেলা অব্দি ঘুমোচ্ছ ! ওঠো, স্কুলের দেরি হয়ে যাবে যে।

তখনও সাত্যকি করপোরেশান স্কুলের মাস্টার। বেশির ভাগই গরিব ছাত্র। একেবারেই নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের। বস্তি থেকেও পড়তে আসত কেউ কেউ। অনেকেই অপুষ্টিতে ভোগে, পড়াশুনা করতে চায় না, স্কুল ফাঁকি দেয়, তবু তার মধ্যেই দু-চারজনের চোখে কী বুদ্ধির ঝলক ! সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিলে আচ্ছা আচ্ছা নামী দামি স্কুলের রেজাল্টকে টেক্কা দিতে পারে। সাত্যকি তাদের জন্য আলাদা সময় দিত। সন্ধেবেলায়। লাজুও আদাজল খেয়ে লেগে পড়ত ছেলেমেয়েগুলোর পিছনে। নিজের টিউশনির টাকা থেকে তাদের নতুন নতুন বই কিনে দিচ্ছে, রুটি সুজি ঘুগনি জলখাবার বানাচ্ছে তাদের জন্য। সাত্যকির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সাত্যকির থেকেও লাজুর ভাবনা বেশি।

সাত্যকি মজা করে বলত, আজ থাক। আজ একটা সি এল নিই।

—কেন ?

—বারে, নতুন বিয়ে হয়েছে, সামনে এমন টসটসে মিষ্টি বউ, একদিন বুঝি পাওনা ছুটি নিতে নেই ?

লাজু দুহাতে তার চুলের মুঠি ধরে টানত, ওঠো বলছি শিগগির। ওঠো। আলসের ডিম কোথাকার।

সাত্যকি হেঁচকা টানে লাজুকে কাছে টেনে নিত, তুমি দায়ী। তোমার জন্যই আমি অলস হয়ে গেলাম। নইলে এ শর্মাকে কোনওদিন শুয়ে বসে থাকতে দেখেছ ?

—হয়েছে। আর নিজের বড়াই করতে হবে না। না উঠলে এবার গায়ে জল ঢেলে দেব। বলতে বলতে লাজু নিজেও ডুবে যেত সাত্যকির শরীরে, চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিত সাত্যকিকে।

কত দিন যে লাজু আর কাছে আসে না !

কবে থেকে আসা বন্ধ করল লাজু ! স্কুলের চাকরি ছেড়ে সাত্যকি ব্যবসা ধরার পর ! উঁহু, তার পরও তো একটা সম্পর্ক ছিল দুজনের ! দুদিক থেকে টান পড়ছে রবারে, মোটা ব্যাস বিপরীতমুখী টানে ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর, যে কোনও মুহূর্তে ছিঁড়ে ছিটকে যাবে কোথায়, তবু তো ছিল ! কবে থেকে যে এমন নিষ্ঠুর হল লাজু। গর্ভ যেদিন নষ্ট হল, সেদিন থেকেই কি ? তার ঈর্ষার সন্ধান পেয়ে কি তাকে চাবুক মারছে লাজু ? নাকি এটা লাজুরই এক ধরনের আত্মনিপীড়ন ?

লাজু এল না, পঙ্কজই চা এনেছে। গরম চা খেয়ে একটু চাঙ্গা হল শরীর। নিজেকে আলোয়ানে মুড়ে প্যাসেজ দিয়ে যাওয়ার সময় সাত্যকি লাজুকে খুঁজল একবার। দেখতে পেল না। গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এই পঙ্কজ, বাইরে চা দিয়েছিস তো ?

কাজলরা সাত্যকিকে দেখে অবাক।

কাজল বলল, তোর জ্বর হয়েছে নাকি ?

লম্বা বেতের সোফায় সমীর পার্থ। কাজলের পাশে জাপান। বাপি আলাদা। মোড়ায়। বাপি ছেলেটার সম্প্রতি খুব রমরমা। এলাকার সকলে সমঝে চলে ছেলেটাকে।

সাত্যকি সবাইকেই এক ঝলক দেখে নিল, শরীরটা বড় বেয়াদপি করছে।

কাজল বলল, সাবধানে থাকিস। সিজন চেঞ্জের সময়, এখন খুব পক্সফক্স হচ্ছে। ইলেকশানের আগে বিছানা নিস না।

বেলা আটটাতেই সূর্য বেশ উষ্ণ, তবু শীত ভাব যাচ্ছিল না সাত্যকির।

জাপান প্রশ্ন করল, আমরা তা হলে কাল কোথ্থেকে কাজ শুরু করব ?

পার্টি অফিসেই এ সব স্থির হওয়ার কথা, তবে সাত্যকি বাড়িতেই প্ল্যান প্রোগ্রাম ছকে রাখে কিছুটা, বলল, আমার মনে হয় তিন নম্বর বস্তি থেকে শুরু করা উচিত। ওখানেই আমাদের মার্জিনটা বাড়াতে হবে।

পার্থ বলল, ও বস্তিটা তো আমাদেরই ছিল, কিন্তু একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। গত বছর চারটে টিউবওয়েল বসানো হল, তিনটে খারাপ। গোদের ওপর বিষফোঁড়া, রাস্তা চওড়া করার নোটিস হয়েছে, ম্যাপে বস্তিটাও আছে।

সাত্যকি হাসল, সে রাস্তা চওড়া করার কাজ নয় পিছিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু পার্টি অফিসে বসে দিনরাত করিস কী তোরা ? শতদলবাবুকে দিয়ে টিউবওয়েল ঠিক করাতে পারছিস না ?

—ঠিক করিয়ে দিয়েছি তাও লোকগুলোর রাগ পড়েনি এখনও। তুমি চলো না একদিন সাত্যকিদা, ওই বস্তিতে এখনও তোমার ভাল হোল্ড আছে।

—দূর, আমি কি আর এ সবের মধ্যে সেভাবে থাকি আজকাল ? বিনয়ের ভান করলেও সাত্যকি যথারীতি কৌতূহলী, আমার হোল্ড আছে কী করে বুঝলি ?

—তোমার কিছু পুরনো ছাত্র আছে না ওখানে ? ওরাই তো এখন বস্তির হেক্কড়। তুমি বললে কাজ হবে।

সাত্যকি আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিল। উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বে কতভাবে দেখা হয়েছে পুঁজিকে ! এক সময়ের নিষ্ঠাও যে অন্য সময়ের পুঁজি হয়ে যায়, এ কথা কি জানত দাড়িঅলা সাহেবটা ! একবার সাত্যকি ভাবল ঘুরে আসবে বস্তিটা, তবু মনে কোথাও একটা কাঁটা খিচখিচ করছে। সাত্যকি ভাল করে গায়ে আলোয়ান টেনে নিল, দেখি, যদি পারি তো যাব।

সাত্যকি জাপানের দিকে ফিরল, রবার কারখানার দেওয়ালটা ওরকম হাফ আঁকা অবস্থায় ফেলে রেখেছিস কেন রে ? ওয়ালিংগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেল।

জাপান বলল, ছেলেটা আজ সকালেই কাজে লেগে যাবে। কালকের মধ্যে ফিনিশ করে দেব।

পার্থ বলল, সাত্যকিদা, লিফলেটগুলো নিয়ে খুব প্রবলেম হচ্ছে। সুধীরদা ভীষণ ভ্যানতারা করছে। আমাদেব আগে একটা বুলেটিন বেরিয়েছিল, তার পয়সা পায়নি... বলছে মেয়ের বিয়ে গেল, প্রচুর খরচা হয়েছে... বিলটা না দিলে...

বাপি মোলায়েম স্বরে বলল, সুধীরদার সঙ্গে কথা বলতে হবে ? আমি আজই বলছি।

সাত্যকি হাত তুলল, না। তুই সুধীরদার সঙ্গে কথা বলবি না। যা বলার আমি বলব। সবার সঙ্গে এক টেকনিক চলে না।

কাজল বলল, অত কথা বলাবলির দরকার কী ? পেন্ডিং বিল সব নিয়ে আসিস, আমি পেমেন্ট করে দেব। বাবা বলে দিয়েছে এ সময়ে কোনওভাবেই পার্টির ভাবমূর্তি যেন নষ্ট না হয়।

ভাবমূর্তি সমাস ভাঙলে কী হয় ? ভাবের মূর্তি ? ভাব রূপ মূর্তি ? যেমন ভাব, তেমন মূর্তি ? ভাব দেখানো মূর্তি ?

সাত্যকি কাজলকে বলল, মেসোমশাইয়ের প্রেশার রেগুলার চেক করাচ্ছিস তো ? বেশি দুশ্চিন্তা করতে বারণ করিস।

—সে নয় করলাম। ওদিকে শতদলবাবু যে তলায় তলায় করাত চালাচ্ছে, তার কী হবে ? ওর ছেলেগুলো তো সব বসে গেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে, তবু পোস্টারে হাত লাগাচ্ছে না।

এতাবৎকাল শতদল বসুই পার্টির নমিনেশন পেয়ে জিতে আসছিল এখানে। এবার পার্টি বয়সের অজুহাতে তাকে বসিয়ে দিয়েছে। সাত্যকিদের পার্টিতে এ সব নিয়ে বিরোধের প্রচলন ছিল না এতদিন। সিংহাসন অনেক রীতিকেই বদলে দেয়।

কাজল বলল, শতদলবাবুর যত খার এখন আমার ওপর। দেখলি না খাটালের জমিটায় ইনজাংশন করিয়ে দিল !

—ও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঝাঁকাতে গিয়ে সাত্যকির মাথা জোর চক্কর দিয়ে উঠেছে। দু আঙুলে

কপাল টিপে চুপ করে থাকল কয়েক সেকেন্ড। মহাবীরতলার ঝামেলাটা আগে ফয়সালা হওয়া দরকার। সেই লোকটা আবার এসেছিল অফিসে। একবারে সব টাকা না পেলে প্রেসকে খবর দেবে বলে শাসাচ্ছে। প্রেসকে সাত্যকি ভয় পায় না, তবে এই মুহূর্তে গুডউইলে হাত না পড়াই ভাল।

সাত্যকি অন্যের কান বাঁচিয়ে কাজলকে বলল, একবার করপোরেশানে যাস্ তো। বীরেন রায়ের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসিস।

কাজল গাঁক গাঁক করে চেঁচাল, ওর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। ওই লোকটা পুকুর বোজানোর ব্যাপারে হেভি অ্যাডামেন্ট। কীসব প্রকৃতিপ্রেমিক ক্লাব হয়েছে, লোকটা তার বড় পাণ্ডা।

সমীর বলল, লোকটা শুনেছি খুব অনেস্ট। টেঁটিয়া।

জাপান মুখ বেঁকাল, কত টাকার অনেস্ট ? দু হাজারের ? না দুলাখের ?

কাজল হো হো হেসে উঠেছে, সামনে ইলেকশান বলে চুপ মেরে থাকতে হচ্ছে, নইলে কবে সাত্যকি ফিট করে ফেলত।

ব্যবসা নিয়ে সকলের সামনে আলোচনা সাত্যকির পছন্দ নয়। কাজলটার এখনও জ্ঞানগম্যি হল না। বয়স তো কম হয়নি, সাত্যকিরই বয়সি, যদিও ফেল মেরে মেরে বছর তিনেকের জুনিয়ার ছিল স্কুলে। আরে বোকা, যতই এদের সঙ্গে রাজনীতি কর, মনে রাখিস এটা তোর খোলস। শীতে ছেড়ে রেখে গর্তে ঢুকে যাবি, গরম পড়লে নতুন খোলস এসে যাবে গায়ে।

কাজলরা উঠে যাচ্ছিল, বাপিকে আলাদা করে ডাকল সাত্যকি, নিচু গলায় বলল, ওরা যেদিন বনধ্ ডেকেছিল, সেদিন তুই দোকান খোলা রাখার জন্য ফোর্স করেছিলি ?

—কেন ? কী হয়েছে তাতে ?

—কাজটা ভাল করিসনি। ব্যবসায়ী সমিতি ঘোঁট পাকাচ্ছে।

—ওটা ব্যবসায়ীদের স্বভাব। দরকার হলে চুমু খাবে, খোঁচা খেলে লাঠি তুলবে। দেব নাকি কড়কে ? অমরদা বলেছে এ সব অবাধ্যতা শুরুতেই নির্মূল করে দিতে।

সাত্যকি জোর করে প্রতিবাদ করতে পারল না। গণতন্ত্রের ছাতা মেলে রাখতে হলে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকাই বুদ্ধিমানের ধর্ম। ক্ষমতার মুঠি একটু আলগা হলে কী হয়ে যায় কে বলতে পারে !

সাত্যকি দরজা বন্ধ করে ঘুরতেই লাজুর সঙ্গে চোখাচোখি। লাজু বাইরের ঘরে এসে বসেছে। বলল, তোমাদের সঙ্গে জার্মান নাজিদের এখন তফাত কোথায় বলতে পারো ?

সাত্যকি গোমড়া মুখে সিগারেট ধরাল, তুমি কি আজ সকাল থেকেই টিজ্ শুরু করবে ?

—টিজ কেন ? জানতে চাইছি।

—অনেক তফাত। আমাদের আদর্শ আলাদা। লক্ষ্য আলাদা।

—তাই ? লাজু ফিক করে হাসল, —বেশ। একদিন নয় তোমার আদর্শ লক্ষ্যদের একটু ছুটি দাও। তোমার মুখচোখ ভাল লাগছে না। আজ বেরিও না।

সাত্যকিরও তাই ইচ্ছে। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। শুয়ে শুয়েই হুকুম করল, পঙ্কজ, আমাকে আরেক কাপ গরম চা খাওয়া তো দেখি।

জানলার ঠিক বাইরে শিমুল গাছে পাতা নেই একটাও। তবু ফুলে ফুলে ভরে আছে গাছ। লাল ফুল। রক্তলাল।

না চিনে, শুধু নাম জেনেই কি অজস্র রং দেখার অনুভূতি জাগে মনে ! রক্তলাল রংটাকে তো শুধু শব্দেই চেনে সাত্যকি। তার মতো রংকানার কাছে লাল নীল হলুদ সবুজে তারতম্যই বা কোথায় ! হায়রে !

ব্যাঙ্গালোর থেকে ইন্দুভূষণের চিঠি এসেছে। ওখানে তাঁর ভালই কাটছে। আশপাশের কোয়ার্টার থেকে বাঙালি অবাঙালি সঙ্গীও জুটিয়ে ফেলেছেন, কলকাতার মতো সেখানেও জোর তাসের আড্ডা বসছে। চিঠিতে নিজের আর নিজের ছোট ছেলের কথাই বেশি। লাজুর সম্পর্কেও খোঁজখবর নিয়েছেন বার বার। এ বাড়ির ফুলগাছদের খবরও। একেবারে শেষে সাত্যকির উদ্দেশে দুটো মাত্র শব্দ। ভাল থেকো।

সাত্যকি চিঠি শেষ করে লাজুর দিকে তাকাল। ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসে লাজু সাজছে। তার চুল এখনও বেশ লম্বা, অনেকক্ষণ ধরে জট ছাড়াতে হয়। সামনের চুল উলটে বিনুনি বাঁধল। ঘন ভুরুর মাঝে ছোট্ট টিপ। চোখে কাজলের আলতো রূপটান। পাঁচ মিনিটের মধ্যে লাজু ভরা বর্ষার দিঘি হয়ে গেল।

জ্বর মাথাব্যথার ট্যাবলেট খেয়ে সাত্যকির শরীর এখন কিছুটা ঝরঝরে, স্নায়ু জুড়ে ঝিমঝিম আরামভাব। লাজু আজ অনেকদিন পর নিজের হাতে গরম গরম রুটি তৈরি করে খাইয়েছে সাত্যকিকে। সামনে বসে। সাত্যকির মেজাজও তাই তুলোর মতো হালকা।

লাজুর সঙ্গে কথা বলার জন্যই কথা শুরু করল সাত্যকি, কোথায় বেরোচ্ছ ?

—ন্যাশনাল লাইব্রেরি।

—কখন ফিরবে ?

—দেখি।

—তাড়াতাড়ি ফিরো।

—কেন ?

এ প্রশ্ন করার কোনও মানে হয় ? যে কোনও অসুস্থ মানুষেরই তো ইচ্ছে করে তার পাশে প্রিয়জন বসে থাকুক। লাজু না হয় আজকের দিনটা নাই বেরোল !

লাজু বিছানার ধারে এসে সাত্যকির কপাল ছুঁল, জ্বর তো নেই !

সাত্যকি মনে মনে বলল, আসতে পারে তো।

—শরীর বেশি খারাপ লাগলে সন্ধেবেলা গোস্বামী ডাক্তারকে দেখিয়ে এসো।

লাজু ফিরে গেছে। আলমারি খুলে শাড়ি বার করল। সাদা। আজকাল রঙিন শাড়ি পরা লাজু ছেড়েই দিয়েছে। তিরিশে পৌঁছবার আগেই যোগিনী যেন। লাজু কি সাত্যকির রং না চেনার গোপন দুর্বলতা জেনে গেছে !

ব্লাউজ হাতে পাশের ঘরে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল লাজু, ছোটকু কাল একটা মজার ব্যবসার কথা বলছিল। আমাকে পার্টনার করতে চাইছে।

ছোটকুকে সাত্যকিরও বেশ পছন্দ। হাসিখুশি দিলখোলা ছেলে, মনে মারপ্যাঁচ নেই। একটু বেশি বকবক করে এই যা।

সাত্যকি প্রসন্ন মনে বলল, কাল সেই জন্যই এসেছিল বুঝি ? কী বলে পাগলা ?

—ওর স্কিম খুব প্লেন আর সিম্পল। পাইকারি হারে প্রচুর মাদুলি কিনে ভেতরে শুকনো ঘাসপাতা শিকড়বাকড় পুরে দেবে।

—মাদুলি বিক্রির ব্যবসা পুরনো হয়ে গেছে।

—বিক্রি করবে কেন ? ট্রেনে বাসে ঘুরে ঘুরে বিনে পয়সায় বিলি করবে। সঙ্গে একটা করে হ্যান্ডবিল। মনস্কামনা পূর্ণ হলে অমুক ঠিকানায় সিদ্ধাই মাকে পুজো পাঠান। দশ টাকা, বিশ টাকা, যা আপনার সাধ্য।

—কচু পাঠাবে। লোক এখন আর অত বোকা নেই।

—তোমরা লোকজনকে চালাক করে দিয়েছ বুঝি ? লাজু চপল হাসিতে ভেঙে পড়ল, লোকজন বোকাই আছে, বোকাই থাকতে চায়। ধরো, প্রতি একশো জনের মধ্যে পাঁচ জনের তো মনস্কামনা পূর্ণ হবেই। এমনিই হবে। তারা ভয়ভক্তিতে টাকা পাঠাবে। দশ জন হলেও হতে পারে এই আশাতে টাকা পাঠাবে। মানুষ তো আর জানে না মানুষ ঠিক কী চায়। মনস্কামনা পূর্ণ করার ব্যবসাটাই এখন সবথেকে বেশি প্রফিটেবল, তাই না ?

সাত্যকি চকিতে গম্ভীর, সিদ্ধাই মা-টি কে হবে ? তুমি ?

—হয়ে গেলে মন্দ হয় না, কী বলো ? লাজু হাসতে হাসতেই বলল, তোমাকেও ছোটকু একটা নাম দিয়েছে। ডাইনোসর। তুমি দিন দিন যেভাবে প্রকাণ্ড হচ্ছ, এ ছাড়া নাকি অন্য কোনও নামে তোমায় ডাকাই যায় না। আমি অবশ্য বলতে পারতাম আজকাল ডাইনোসরদের যত বড় করে দেখানো হয়, অত বড় তারা নয়,. সব বিজ্ঞানের ট্রিক্। ভোজবাজি। ছোট্ট জিনিসকে ফুলিয়ে

ফাঁপিয়ে ভয়ভক্তি জাগানোর চেষ্টা।

—বললেই পারতে। কী আর বাকি রাখো। তা ওই ছোটকুর ভরসাতেই কি বিদিশার চাকরিটা নিলে না ?

বাতাস গরম হয়ে উঠছে। তপ্ত হাওয়ার ঝলক ঘরে ঝাঁপিয়ে এল। সাত্যকি আর লাজুকে ছুঁয়ে থমকে দাঁড়াল এক পাশে।

লাজুর হাসি মুছে গেল, কেন চাকরিটা নেব না তা তো তুমি জানোই।

—না, জানি না। সাত্যকির স্বর তেতো আরও, —তোমার বন্ধুর অফিসের চাকরি কেন এত অচ্ছুত আমি কী করে বলব ?

লাজু উত্তর না দিয়ে চলে গেল। ব্লাউজ বদলে ফিরেছে ঘরে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ির কুঁচি ঠিক করছে।

সাত্যকির মাথার যন্ত্রণাটা ফিরে আসছিল। গলা ওঠাতে গিয়েও সামলে নিল, আজকাল কি তুমি আমার কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ কর না ?

—কী উত্তর দেব ? তোমার দেওয়া চাকরি আমি নেব না, এ কথা কি এখনও স্পষ্ট করে বলা দরকার ?

—আমার দেওয়া কেন হবে ? তোমারই বন্ধু অফার দিয়েছে।

—তার বিনিময়ে তুমি ওকে ফ্ল্যাটের সাইজ বাড়িয়ে দেওয়ার টোপ দিয়েছ।

—এর সঙ্গে চাকরির কী সম্পর্ক ?

—সম্পর্ক আছে। লাজুর স্বর অসম্ভব শান্ত। প্রতিটি কথা সে বলছে কেটে কেটে, পরিষ্কার উচ্চারণ করে, বিদিশার ওখানে চাকরি করলে তোমার নজরদারির সুবিধে হয়, তাই না ?

সাত্যকি ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল। লাজুর কাছে কি কিছুই অজানা থাকে না ? থতমত মুখে বলল, আমার কোনও কাজই কি তুমি ভাল মনে নিতে পারো না ?

—ভাল মনে নেওয়ার মতো একটা কাজও কি তুমি কর ? লাজুর গলা বরফের ছুরি, ন্যাশনাল লাইব্রেরির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক কেন ? তোমার কি ধারণা রুদ্রদা ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে ?

ধরা পড়ে গিয়ে সাত্যকি একেবারে ক্ষুদ্র হয়ে গেল যেন, তবু দমল না, তুমি কি বলতে চাও, তুমি রুদ্রর সঙ্গে যোগাযোগ করোনি ?

লাজুর মুখমণ্ডল রক্তিম। উত্তেজনায় ওঠানামা করছে নিশ্বাস, —তোমাকে কেন বলব ?

—সে তো বটেই। বললে তো মিথ্যে কথা বলতে হবে।

—আমি মিথ্যে কথা বলি না। মিথ্যে বলো তুমি। দিনরাত মিথ্যের ব্যবসা করে চলেছ। আদর্শের ভাওতা দিয়ে আমাকে বিয়ে করেছিলে, আদর্শের দড়ি ধরে নিজের আখের গোছাচ্ছ...

—ব্যাস ব্যাস থামো। লেকচার মেরো না। মিথ্যের মুখোশ তুমিই পরে আছ। প্রথম দিন থেকে। একজন পুরুষের সঙ্গে শুয়ে অন্য পুরুষের চিন্তায় বিভোর থাক, লজ্জা করে না তোমার ? আমি যদি মিথ্যেবাদী হই, তুমি কী জানো ? দ্বিচারিণী। স্বৈরিণী।

—বাহ্ চমৎকার। বিদ্রূপে লাজুর মুখ বিকৃত হল, —তোমার আত্মপক্ষ সমর্থনের হাতিয়ারগুলো বেশ ভালভাবেই শাণাতে শিখে গেছ। অত্যন্ত নীচ তুমি। ছোটলোক। তোমার প্রতিটি অন্যায়, অপকীর্তি চোখের সামনে সহ্য করেও আমি তোমার সঙ্গে এতদিন থেকেছি। আশা ছিল তুমি হয়তো ফিরবে কোনওদিন। না। তুমি সে লোক নও। তোমাতে আর রুদ্রদাতে স্বর্গ নরকের তফাত। তুমি বেসিকালি একটা নোংরা লোক। ঠগ। জোচ্চোর। আমার বাবা তোমাকে প্রথম দিন দেখেই চিনেছিলেন।

লাজুর গালাগাল নয়, রুদ্রর নামটাই দাবানল জাগিয়ে দিল সাত্যকির বুকে। বিছানা ছেড়ে তীব্র বেগে ছুটে গেছে লাজুর দিকে। হিংস্র হানায় লাজুর শুভ্র আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। লাজু কখনও যা করে না, তাই করল আজ। তার শরীরের ভোক্তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছে। সাত্যকি টলতে টলতে আবার এগিয়ে এল। লাজুর দুহাত মুচড়ে ধরে কামড় বসাল লাজুর ঠোঁটে।

এত দিনের অতৃপ্ত কামনা আগুনের হল্কা হয়ে বেরিয়ে আসছে রোমকূপ দিয়ে। লুকোনো নখ দাঁত সব বেরিয়ে গেল। উন্মত্ত সাত্যকি লাজুর ঠোঁট ছেড়ে থু থু করে লাজুর মুখে থুতু ছোটাচ্ছে। হিসহিসিয়ে ফণা তুলল, —আমি নোংরা, না ? ঠগ ? জোচ্চোর ? তোমার ভদ্রলোক বাবার পুত্রটি কী ? ঘুষখোর। লম্পট। মাতাল। কোথায় কোথায় মেয়েমানুষের ঘরে গিয়ে পড়ে থাকে তার ঠিক নেই। যাও। তোমার পিরিতের দাদাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো একত্রিশে ডিসেম্বর রাতে কোথায় পড়ে ছিলেন তিনি ! কোন মেয়েছেলের ঘরে ফুর্তি লুঠতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল ! যখন পুলিশ হাজতে কুঁই কুঁই করছিল, কে গিয়ে উদ্ধার করেছিল তাকে ! কে তোমার ফ্যামিলির মান বাঁচিয়েছিল !

লাজুর পাংশু মুখ অসহ্য যন্ত্রণায় কালো হয়ে গেছে। যেন কোটি কোটি সূচ তার দেহে বিঁধিয়ে দিয়েছে সাত্যকি। তার মাথা ক্লেদাক্ত নর্দমায় চেপে ঘষে দিচ্ছে।

তোড়ের মাথায় কথাগুলো বলে সাত্যকিও হাঁপাচ্ছিল, তবু লাজুর শীতলতা আজ সে ভাঙবেই, সবাই দেবচরিত্র, অ্যাঁ ? আমি ছাড়া ? তোমার বাবা ? তোমার দাদা ? তোমার রুদ্রদা ?

লাজু মাটি থেকে আঁচল কুড়িয়ে নিল, আমি এক্ষুনি চলে যাব। তোমার সঙ্গে আর এক মুহূর্তও থাকব না।

—সে তো এখন যাবেই। রুদ্র তো এসে গেছে তোমাকে নিতে। ওর অপেক্ষাতেই তো আমার সঙ্গে ঘর করার নাটক চালিয়েছ এতদিন।

পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছিল পঙ্কজ। লাজু হনহন করে বেরোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা গলায় পঙ্কজকে ডাকল, আয়। চলে আয় আমার সঙ্গে।

সকালে ফোন এসেছিল সাত্যকির। ফোন অনুবাধা ধরেছিল। অনুরাধা নয়, সাত্যকি চন্দনকেই চায়।

চন্দন তখনও বাজারে।

কাঁকুলিয়ায় উঠে আসার পর থেকে বাড়ির কাঁচা বাজার চন্দন নিজের হাতেই করে। সপ্তাহে সে দু দিন বাজারে যায়। বৃহস্পতিবার আর রবিবার। মাছ মাংস শাক সবজি তোলা থাকে ঢাউস ফ্রিজে, পছন্দ অনুযায়ী দিনের দিন বেরোয়। সংসারের টুকিটাকি, মাসকাবারি আনার জন্য রতনের মা আছে, অথবা অনুরাধা নিজেই।

চন্দনের বাজার করা বেশ দর্শনীয় ব্যাপার। সে একসঙ্গে অন্তত তিন রকমের মাছ কেনে। তার মধ্যে একটা অবশ্যই পাকা রুই অথবা কাতলা। রাজার ভাষায় কাটাপোনা। এর সঙ্গে মরশুমি মাছ, শীতকালে চিংড়ি বা কই, গ্রীষ্ম বর্ষায় ইলিশ। মুখ বদলানোর জন্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিতল ভেটকি পারশে আড় পাবদা। চন্দন বড়ই মৎস্যবিলাসী। বাজারে সে কখনও মাছের দাম জিজ্ঞাসা করে না। দরাদরি নয়, ব্যাগে তুলে দাও। কেটেকুটে। ধুয়ে। সব থেকে ভালটা। টাটকাটা। চন্দনের ধারণা দরদাম করলে মাছের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। রাজা কাটাপোনা আর চিংড়ি ছাড়া অন্য মাছ ছোঁয় না, তাই অনেকটা মাংসও নিতে হয় চন্দনকে। বৃহস্পতিবার মুরগি, রবিবার মাটন। আজ তার মুরগির দিন।

শাকসবজির বাজারে চন্দনের সময় বেশি লাগে না। দু-তিন রকমের শাক, সময়ের সবজি টোম্যাটো গাজর বিন ঢ্যাঁড়শ কপি পটল। চন্দন অনুরাধা বা রাজা কেউই বিশেষ শাকপাতার ভক্ত নয়, তবু প্রতিভার জন্য এ সব নিতেই হয়। অদ্রিনাথের কোনও গাছপালাতেই অনাসক্তি ছিল না, চন্দনও প্রচুর শাকসবজি খেয়েছে ছোটবেলায়। এখন সে শুধু প্রোটিন চায়। এ ছাড়া প্রভূত পরিমাণে আলু কেনে সে। রাজা আলু খাওয়ার রাক্ষস।

গোটা চারেক বড় থলিভর্তি বাজার নিয়ে চেনা রিকশাঅলাকে ডাকে চন্দন। রিকশায় বসে হাত পা মেলে দেয়। মৌজ করে বিলিতি সিগারেট ধরায় একটা। আহ্ কী আরাম ! সে এখন বাদশা !

তবু চন্দনের আফসোস যেন যায় না। একটা মাত্র পেট তার, শরীরও পুরো আয়ত্তে নেই আজকাল, প্রেশার কোলেস্টেরল সব কিছু মিলিয়ে খাওয়া দাওয়া কমে গেছে বেশ। ঈশ্বর যে কেন চার-পাঁচটা পেট, গোটা তিন-চার শরীর দিলেন না তাকে!

বাজার থেকে ফিরতেই অনুরাধা বলল, একবার থলি হাতে বেরোলে আর জ্ঞান থাকে না! কটা বাজে খেয়াল আছে?

—আর বোলো না, পেছনের বাড়ির দীপ্তেন রাহার পাল্লায় পড়েছিলাম। ওর ছেলেটা জি আর ই টোয়েফল্ দিয়ে শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে, তারই গপ্পো। ছেলে কত স্কোর করেছে, কীরকম স্কলারশিপ পাবে...

—কত টাকা খরচ করে পাঠাচ্ছে, সেটা শোনায়নি?

—হুঁ, বলেছে। আশি হাজার।

অনুরাধার ভুরু জড়ো হল, আমাকে যে ওর বউ বলল দেড় লাখ! এত বাড়িয়ে বলে ভদ্রমহিলা...!

চন্দন হা হা করে হাসল, হয়তো বউই ঠিক বলেছে, দীপ্তেনবাবু কমিয়ে বলল। অত বড় কোম্পানির পারচেজ অফিসার, ডাইনে বাঁয়ে পয়সা...! যদি আমাদের চোখ টাটায়!

—দীপু তো যাচ্ছে এম এস সি করে। আমি রাজাকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পর পাঠাব। এম বি এ করতে। অনুরাধা থলিগুলো রান্নাঘরে নিয়ে গেল, ওহ্‌হো, ভুলে যাচ্ছিলাম। সাত্যকির ফোন এসেছিল।

—কখন?

—কিছুক্ষণ আগে। তোমার সঙ্গে কী দরকারি কথা আছে।

সাত্যকি সাধারণত এ সময়ে ফোন করে না। চন্দন সামান্য অবাক হল, কী ব্যাপারে?

—আমাকে বলল না। তোমাকেই বলবে। গলাটা কেমন উত্তেজিত শোনাচ্ছিল।

এক সেকেন্ডের কম সময়ের জন্য বুকটা ছ্যাঁত করে উঠেছিল চন্দনের, সেকেন্ডের মধ্যে স্বাভাবিক। ধুস্, ওই কেস তো কবে মিটে গেছে।

ফোনে সাত্যকির সঙ্গে কথা বলতে বলতে কপাল কুঁচকে গেল চন্দনের। মুখটা কেমন মলিন হয়ে গেল ধীরে ধীরে। টেলিফোন রেখে থম মেরে বসে রইল চেয়ারে। দু হাতে কপালের রগ টিপে ধরল।

অনুরাধা এ সময়ে খুব ব্যস্ত থাকে। এক্ষুনি ঝটপট চন্দনের মাছের ঝাল আর একটা তরকারি রেঁধে ফেলতে হবে। চন্দন ঠিক দশটায় খেতে বসবে। তার আগে হাতের কাছে দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম চাই, চা খায় একবার, প্যান্টশার্ট বিছানার ওপর রেডি থাকা চাই। প্রতিভা পুজো সেরে উঠবেন, তাঁকে কিছু জলখাবার দিতে হবে এখন। কদিন ধরে রাজার কী হয়েছে, একদম খাওয়াদাওয়ায় মন নেই, এক কাপ দুধসাদা চা দিলে হয়তো একটু ভাল লাগবে ছেলের। রতনের মা কাজকর্মে বেশ ঢিলে, তার পিছনেও অনবরত ট্যাকট্যাক করতে হয় অনুরাধাকে।

রাজাকে চা দিয়ে চন্দনের সামনে অন্য কাপটা রাখল অনুরাধা, —কদিন ধরে লক্ষ করেছ ছেলেকে? কীরকম সিরিয়াস হয়ে গেছে?

চন্দন কপাল থেকে হাত নামাল।

অনুরাধা নিজের খেয়ালেই বলল, বইখাতা ছেড়ে উঠছে না একবারও। বাড়ির বাইরে যাচ্ছে না, টেপ চালাচ্ছে না, টিভি খুললেও সামনে বসছে না। ঘর বন্ধ করে সারাক্ষণ শুধু পড়ছে। আমার সঙ্গে পর্যন্ত কথা বলার সময় নেই বাবুর! যেটুকুও বা বলে, তাও কেমন গম্ভীর গম্ভীর। পরীক্ষার মুখে ও যেন ঝপ করে বড় হয়ে গেল!

—তাই বুঝি? চন্দন অন্যমনস্কভাবে একটা নিশ্বাস ছাড়ল, একটা খারাপ খবর আছে। লাজু চলে গেছে।

—লাজু চলে গেছে। কোথায়! কবে! কেন।

—সাত্যকির সঙ্গে পরশু দুপুরে ঝগড়া হয়েছিল, তখনই বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। পঙ্কজকে

নিয়ে। কোথায় গেছে সাত্যকি জানে না।

—ও, তাই কায়দা করে জিজ্ঞেস করছিল বাড়ির সব কে কী করছে!

—নাহ্, লাজু যে এখানে আসেনি, সেটা ও জানে। ও খালি আমাকে খবরটা দিয়ে দিল। চন্দনের কপালে ঘাম জমছিল, কিন্তু আমি এখন কী করি বলো তো? কোথায় খুঁজব লাজুকে?

এরকম আশঙ্কাই অনুরাধা করছিল এতদিন। অত একগুঁয়ে মেয়েকে কত দিন স্বামী সহ্য করবে! তাও সাত্যকির মতো ছেলে বলে ছ বছর ধৈর্য ধরে ছিল। যখন সাত্যকির প্রেমে পাগল হয়েছিলি, তখন তো বাপকেও গ্রাহ্য করিসনি। বাবা সাত্যকিকে পছন্দ করে না, থোড়াই কেয়ার! মহারানি রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে ফেললেন! দাদার বোনের জন্য প্রাণ কেঁদে উঠল, তিনিও বিয়ের সাক্ষী হতে ছুটলেন! বোনের জন্য বাবার অপ্রিয় হওয়া! সেও দাদা! এখন বিয়ে ভাঙতে বসেছে, দাদা দৌড়োক মিটমাট করতে! মেয়ের প্রেমেরও বলিহারি! যখন বরের হাভাতে অবস্থা, চারদিকে শুধু ফাঁপা বুলি কপচে বেড়ায়, পকেট ঢনঢন, তখন তো ভালবাসা উথলে পড়েছে। দেখা হলেই অবিরাম সাত্যকির কাহিনী। আজ সাত্যকির নাইটস্কুলের গল্প! কাল সাত্যকির মিটিং মিছিলের গল্প! মেদিনীপুরের কোন বন্যায় সাত্যকি গিয়ে মানুষের সেবায় নেমেছে, কোথায় ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছে, সাতকাহন করে শোনাতে গিয়ে ওই চাপা মেয়ের মুখেই খই ফুটছে! আর যেই ছেলের মতি ফিরল, দুটো পয়সার মুখ দেখতে শুরু করেছে, অমনি তাকে কী হতচ্ছেদ্দ!

অনুরাধা কটু গলায় বলল, তুমি আবার কোথায় খুঁজবে! তোমার বোন সহজে হারাবে না। নিজের ভালমন্দ সে যথেষ্ট বোঝে। খুঁজতে হলে তার বর খুঁজুক। এমন কিছু ছোট্টটিও নেই বোন। আমার ওই বয়সে রাজা স্কুলে পড়ছে।

—একী বলছ? বোন আমার রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে, আর আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকব? বড় দাদা হয়ে? মা শুনলেই বা কী ভাববে?

—মাকে এখনই বলার দরকার কী?

বাক্যটা বলেই অনুরাধা থমকে গেল। এটা তো ঠিকই, মেয়েটা নির্বিবাদে দাদার ঘাড়ে এসে বসতে পারত, দাদাও কিছুই বলত না আদরের বোনকে, কিন্তু সে এখানে আসেনি! এও আরেক গোঁয়ার্তুমি। চিরটাকাল দাদা বউদিকে শুধু হেনস্থা করে যাচ্ছে। দাদা বিলিতি পারফিউম এনে দিল বোনকে, বোন মাখলই না। অনুরাধা নিজের চোখে দেখে এসেছে তাদের দেওয়া দামি দামি শাড়ি কসমেটিকস্ লাজু অবহেলায় ফেলে রেখেছে আলমারিতে, একটাও খোলেনি! অথচ এই দাদাবউদি কী না করেছে তোর জন্য! তোর সঙ্গে তোর ওই বদরাগী বাবার আবার মিলন করিয়ে দিল কে! অথচ দাদার গুরুদশার সময়ে তাকে তুই দিব্যি বলে দিলি, দাদা বাইপাসটা করাতে পারলে বাবা হয়তো আরও কিছুদিন বাঁচত রে। যতই লাজু মিহি সুরে বলুক, অনুরাধা কি বোঝে না কার দিকে আঙুল দেখাচ্ছিল লাজু!

এখনই বা লাজু কতটুকু কথা বলে অনুরাধার সঙ্গে! বাপের বাড়ি এলে সারাক্ষণ তো মার ঘরে বসেই গুজগুজ ফুশফুশ। আর যাওয়ার সময় অনুরাধার সঙ্গে নিয়ম রাখতে বাক্যচয়ন! মাঝে মাঝে প্রতিদান হিসেবে সস্তা দামের জিনিসপত্র! ভাইপোকে আলগা আদর!

একমুখ ভাবনা নিয়ে বসে আছে চন্দন, অনুরাধা ভারী স্বরে বলল, দ্যাখো, যা ভাল বোঝ করো। অফিস যাবে তো? তা হলে রান্নাটা চড়িয়ে দিই।

রান্নাঘর থেকেই অনুরাধা টের পাচ্ছিল, প্রতিভা বেরিয়েছেন ঘর থেকে, ছেলের সঙ্গে কথা বলছেন।

—তোর মুখ এমন থমথম করছে কেন রে? কী হয়েছে?

—কই, কিছু না তো।

—সাতসকালে গাল ফুলিয়ে বসে আছিস কেন? অফিস যাবি না?

—যাব। ছেলে কথা ঘোরাচ্ছে, তুমি তো আজ বেশ সোজা হয়ে হাঁটছ!

—হুঁ। ব্যথা আজ কম।

—ওষুধ তা হলে কাজ করছে বলো?

— তা করছে।

—দেখেছ তো তুমি বলেছিলে ব্যথা সারবে না। আমি তোমার ব্যথা সারিয়ে ছাড়ব। তুমি শুধু ডাক্তারকে ফলো করে যাও।

—সাত্যকি ফোন করেছিল কেন রে? লাজুর শরীর খারাপ? মেয়েটা কদিন আসছে না, মনটা বড় আনচান করে।

বুড়ির কান তো নয়, ডিশ অ্যান্টেনা! সিগনাল পেলেই চ্যানেল ধরে নিচ্ছে! অনুরাধা প্রায় ঝাপটে এসে চন্দনকে ওঠাল, এখনও দাড়ি কামাতে গেলে না? এরপর তো বলবে আমরাই তোমার অফিসের দেরি করিয়ে দিই!

চন্দন কৃতজ্ঞ চোখে অনুরাধার দিকে তাকাল। তারপর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম নিয়ে চলে গেল বাথরুমে।

বিকেলের দিকে চন্দনের ফোন পেল অনুরাধা। লাজুর সন্ধান পাওয়া গেছে। সন্তোষপুরে আছে লাজু। স্কুলের বন্ধু কৃষ্ণার বাড়িতে। চন্দন অফিসফেরত বোনের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে পাঠানো যায় সাত্যকির কাছে।

কৃষ্ণা অনুরাধার অপরিচিত নয়, গড়িয়ার বাড়িতে মেয়েটাকে দেখেছে অনেকবার। এ বাড়িতেও এসেছিল একদিন। বছরখানেক আগে। প্রতিভার সঙ্গে দেখা করতে। ভীষণ জোরে জোরে চেঁচায়, হা হা করে হাসে। বিশাল লম্বাচওড়া। হাঁটাচলা কথাবার্তায় রুক্ষ পুরুষালি ভাব। গায়ের রং খসখসে কালো। বাবা নেই। মাকে নিয়ে কৃষ্ণা একাই থাকে।

এখানে না এসে বান্ধবীর বাড়িতে কেন উঠল লাজু!

অনুরাধা মনে মনে একটু অসহায় বোধ করছিল। তার অন্তরে এক সূক্ষ্ম কামনা ছিল লাজু সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তার দরজাতেই এসে দাঁড়াক। দশ বছরের ছোট ননদটিকে কোনওদিন ঠিক হাতের মুঠোয় পায়নি অনুরাধা। গড়িয়ার বাড়িতে অদ্রিনাথের ছায়ায় মেয়েটা কেমন যেন পিছলে পিছলে থাকত। তারপর তো চলেই গেল সাত্যকির সঙ্গে। এ বাড়িতে চলে এলে অনুরাধা কি তার অযত্ন করত? মোটেই না। খাওয়া পরা থাকা সব দিকেই ভরিয়ে রাখত মেয়েটাকে। সঙ্গে সঙ্গে পরখ করেও দেখত একটু। আঠেরো বছর হল অনুরাধা এ বাড়িতে বউ হয়ে এসেছে, কিন্তু এক দিনের জন্যও লাজু তাকে আপন ভাবল না। মনের কোনও গোপন কথা অনুরাধাকে বলেনি কখনও। লাজুর বয়সি অন্য মেয়েরা প্রেম করলে প্রথম বউদিকেই চুপিচুপি নতুন রোমাঞ্চের গল্প শোনায়, লাজু জানায়নি। চন্দনের মুখ থেকে প্রথম সাত্যকির সঙ্গে লাজুর সম্পর্কের কথা জেনেছিল অনুরাধা। লাজুর গর্ভ নষ্ট হওয়ার খবরও। খবরটা অবশ্য সাত্যকিই চন্দনকে জানিয়েছিল, লাজু নয়। গর্ভপাত দূরে থাক, গর্ভধারণের খবরই কি জানত কেউ? নিজের মাকে পর্যন্ত লাজু বলেনি কিছু। বড় বেশি চাপা মেয়েটা। বেশি অন্তর্মুখী।

লাজুর কথা মনে পড়লেই আরেকটা ছবি ভেসে ওঠে অনুরাধার মনে। গড়িয়ার বাড়িতে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেছে অনুরাধার, বাইরে হঠাৎই কীসের যেন শব্দ! চুপিসারে বাইরে এসে অনুরাধা হতবাক। উঠোনের দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে লাজু! অন্ধকার মাড়িয়ে পুকুরপাড়ে চলে গেল। ঘাটের ভাঙা সিঁড়িতে গিয়ে বসেছে। বসেই আছে। পাঁচ মিনিট। দশ মিনিট। গরম কাল, মাঝে মাঝে সাপখোপও বেরোয়, লাজুর হুঁশই নেই! আঁধার রাত, আকাশে তারারা টিপটিপ করছে, নারকেল গাছে হাওয়া বাজছে সরসর, লাজু যেন সেখানে এক অপ্রাকৃত ছায়া। রহস্যময়ী। কতই বা তখন বয়স মেয়েটার? বড় জোর ষোলো। ওইটুকুনি মেয়েকেও সেদিন ডাকতে সাহস হয়নি অনুরাধার।

কেন যে শুধু ঘুরে ফিরে ওই ছবিটাই মনে আসে অনুরাধার!

দুপুরবেলা আজ বেশ তাপ ছিল, বিকেল থেকে ফুরফুরে বাতাস বইছে। দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে বাতাস দোল খাচ্ছে ঘরে। সন্ধে হতেই তারায় তারায় আকাশ ভরে গেল।

অনুরাধা আকাশ দেখছিল। জানলা দিয়ে যতটুকু আকাশ দেখা যায় ততটুকুনি। এত তারা তবু আকাশ তেমন দীপ্তিময়ী নয়। মহানগরের নিওন ফ্লোরেসেন্টের দ্যুতিতে ঈষৎ নিষ্প্রভ যেন। ওই

আকাশ, ওই কোটি কোটি মাইল দূরের তারারা অনুরাধাকে অত টানে না, যত টানে মাত্র দশ হাত দূরের ষোলো বছরের কিশোর। তবে সে ঘরের দরজা আজ বন্ধ। রাজা আজকাল ঘরের দরজা খোলা রাখছে না। মাঝে মাঝে দরজা ঠেলে উঁকি দিয়েছে অনুরাধা, ছেলেকে বই খাতার সামনে ধ্যানস্থই মনে হয়েছে সেসময়। অনুরাধা তাতেই খুশি। নজরদারিতে কিছুটা বাধা পড়া সত্ত্বেও।

আকাশ দেখতে দেখতে অনেক দিন পর অনুরাধার আজ বড় নিঃসঙ্গ লাগছিল নিজেকে। বিশ্বসংসারের সবাই কোনও না কোনও কাজে মগ্ন এখন, শুধু অনুরাধারই সময় নিশ্চল।

জানলা ছেড়ে অনুরাধা এলোমেলো ঘুরল খানিকক্ষণ। এ ঘর থেকে ওঘর। রান্নাঘর। স্টোররুম। প্রতিভার ঘরেরও পর্দা সরিয়েছে।

ছানি পড়া চোখেই একমনে আসন বুনে চলেছেন প্রতিভা। অনেকটা অভ্যাসের মতো।

অনুরাধা মৃদু ধমক দিল, সন্ধেবেলা আবার আপনি ছুঁচসুতো নিয়ে বসেছেন ?

প্রতিভা নির্মল হাসলেন, লাজুকে করে দেব বলেছি, শেষ আর হচ্ছে না। আন্দাজে আন্দাজে যতটা পারি এগিয়ে রাখছিলাম।

অনুরাধা সামান্য দ্বিধা করে আচমকা বলে ফেলল, লাজুর সঙ্গে সাত্যকির খুব ঝগড়া হয়েছে। লাজু ও বাড়ি থেকে চলে গেছে।

কথাটা বলেই অনুরাধার খুব আফসোস হল। কেন বলল ? এই সন্ধের নির্জন সময়টাই কি তাকে ঠেলে দিল বলতে ?

প্রতিভার হাত থেমেছে। ফোলা ফোলা চোখ অপলক অনুরাধার দিকে, কবে গেছে ?

—কাল দুপুরে। অনুরাধা শাশুড়িকে সান্ত্বনা দিতে চাইল,—চিন্তা করবেন না, ওর বন্ধু কৃষ্ণা, তাদের বাড়িতে আছে। আপনার ছেলে আজ দেখা করতে গেছে।

প্রতিভা স্থির। প্রশ্নহীন। তবু এক নিবিড় যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে চোখে। সূচ গেঁথে আসন আলগোছে সরিয়ে রাখলেন। নিচু স্বরে বিড়বিড় করছেন, লাজুটার বড় কষ্ট। মেয়েটাকে কেউ বুঝল না।

—কষ্ট তো আমাদেরও এসে বলতে পারে। আমরা কি লাজুর পর ? অনুরাধা গলা নরম করল, বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার কী দরকার ছিল ? আমাদের এখানেই চলে আসতে পারত।

প্রতিভা উত্তর দিলেন না। আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছছেন।

অনুরাধার শাশুড়ির পাশে একটু বসতে ইচ্ছে করছিল, পারল না। ঝনঝন করে কলিংবেল বেজে উঠেছে।

মেঘলা আকাশে এক ফালি সূর্যর মতো ছোটকু ঢুকল ভেতরে, রাজামশাই কোথায় ? রাজামশাই ? ওকে আমি উইশ করতে এসেছি।

ছোটকুর চোখমুখ যথারীতি চঞ্চল। রুক্ষ চুল ঝাইঝাপুর। চটি পরা পায়ে এক পুরু ধুলো। অনুরাধা হেসে ফেলল, দিলি তো কার্পেটটা ধুলো মাখামাখি করে ! যা, রাজাকে ডাকার আগে পা ধুয়ে আয়।

—না, না, আমার অত সময় নেই। আমার বলে এখন কত কাজ ! ডাক না রাজাকে, কথা বলেই চলে যাব।

অনুরাধা চোখে পলকা ইঙ্গিত করল, বাবু এখন ঘর থেকেই আর বেরোচ্ছেন না। বেশ নার্ভাস হয়েছে। বাড়িতে কারও সঙ্গে ভাল করে কথাও বলছে না। পরশু স্কুলে অ্যাডমিট কার্ড দিচ্ছিল, অন্য সময়ে বন্ধুদের দেখলে ছেলের জ্ঞান থাকে না, সেদিন শুধু গেল আর এল। এসেই আবার নিজের গর্তে। যা না, দেখে আয়।

ছোটকু নড়ল না, সোফায় হেলান দিয়ে হাঁক মারল, ম্যাজিশিয়ান, বেরিয়ে এসো।

ছোটকুকে দেখলেই উচ্ছ্বাস বেড়ে যায় রাজার, আজ সে অত্যন্ত গম্ভীর। ভাবহীন মুখে প্রশ্ন করল, কী বলো।

—সত্যিই তো রে দিদি ! এ তো একেবারে ব্যোম্ মেরে গেছে ! ছোটকু উঠে রাজাকে ঝাঁকাচ্ছে, দশ দিনের জন্য কাল বাইরে যাচ্ছি, যাওয়ার আগেই তাই উইশ করতে এলাম তোকে।

—থ্যাংক ইউ।

—নো কায়দা। ওরকম ধুন্দ্ মেরে গেলে পরীক্ষা ভাল হয় না। টেক্ ইট ইজি ম্যান। চিয়ার আপ।

রাজা একবার অনুরাধার দিকে তাকাল, একবার ছোটকুর দিকে। দুজনকে এক কুচি বাঁকা হাসি উপহার দিয়ে চলে গেল ঘরে।

ছোটকুর চিৎকারের বিরাম নেই, তোমার সৌভিক নামটা কিন্তু সার্থক করতে হবে বস্। পরীক্ষায় একটা দারুণ ভেল্‌কি দেখিয়ে দাও তো দেখি। আমরা একদিন কবজি ডুবিয়ে সাঁটাই।

—তোকে বুঝি খাওয়াই না? অনুরাধার চোখে ছদ্ম কোপ, তা বিশ্ব বখাটের যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

—গোমিয়া। চন্দ্রপুরা। বোকারো। বরকাখানা। সে বলতে গেলে একটা মালগাড়ি হয়ে যাবে। ভাবছি চান্স পেলে ম্যাক্‌ল্যাক্‌সিগঞ্জেও টুঁ মেরে আসব! মার্কেট স্টাডি করতে হবে।

—কীসের? তোর সেই মাদুলির?

—দূর, ওটা হবে না। লাজুকে এত করে বললাম পার্টনার হতে! বড় বড় চোখ আছে, মুখটাও সুইট, গেরুয়া পরিয়ে দিলে ওকে সিদ্ধাইমা দারুণ মানাত। তোর ননদটা আমাকে পাত্তাই দিল না।

লাজুর প্রসঙ্গে সামান্য আড়ষ্ট হল অনুরাধা। দিদি দিদি ভঙ্গিতে কথা ঘোরাল, তুই তানিয়ার সঙ্গে এখনও দেখা করছিস?

ছোটকু মাথা চুলকোল, কই আর। সোমেশ্বরবাবু যা কড়া পাহারায় রেখেছেন! মেয়েরাও বুঝলি দিদি... পুরো বাবুই পাখির কেস। আমরা বাসা বানিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, ওরা ঠোক্কর মেরে দেখে নেবে বাসাটা পোক্ত কি না।

—মেয়েরা তা হলে খুব সেয়ানা হয়েছে বল্!

—হেব্বি সেয়ানা। ওই একটু চাঁদ ফুল তারা ব্যাস্। কোন বাসাতে যে আসলে ঢুকবে দেবা না জানন্তি।

—তুই এখন নারীচরিত্র নিয়ে গবেষণা করছিস বুঝি?

—নারে, ঠেকে শিখছি। ছোটকু অকস্মাৎ গোমড়া, যতই শিক্ষিত হোক, যতই অ্যাডভান্সড়, মেয়েদের আলটিমেট গোল হাঁড়ি বাড়ি শাড়ি।

অনুরাধার মজা লাগছিল শুনতে। এই সেদিন হামা টানত ছোটকু, এখন কেমন বিজ্ঞের মতো জীবনদর্শন আওড়াচ্ছে। প্রতিভা মাঝে মাঝেই বলেন, সময় যায়, না ঝড় যায়! সত্যিই তাই।

ওঠার আগে ছোটকু বলল, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা। অশোকের ফাইনাল প্ল্যান রেডি হয়ে গেছে। কাল সন্ধেবেলা তোর কাছে নিয়ে আসবে। জামাইবাবু যদি থাকে তো ভাল হয়। যদি জামাইবাবু ওকে করে দেয়, তা হলে পরশুই ও করপোরেশানে কথা বলবে। প্ল্যান সেকশানে ওর এক বন্ধু আছে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে প্ল্যানটা। টাকাও বেশি খাবে না। দু-তিনশোতে হয়ে যাবে।

অনুরাধা ইতস্তত করল, প্ল্যান করে ফেলেছে? তোর জামাইবাবুর খুব ইচ্ছা লাজুর বর করে বাড়িটা।

—এটা কিন্তু অশোকের ওপর খুব অবিচার হবে দিদি। আমার মতো অগাবগা ভ্যাগাবন্ড নয়, সিন্‌সিয়ার ছেলে, তাকে একটা চান্স দিবি না? সাত্যকিদার তো হাইফাই ব্যাপার। এই অ্যাপার্টমেন্ট করছে, ওই কমপ্লেক্স করছে! ...লাজু বলছিল এখন চেতলায় যে বাড়ি তুলছে, সেখানে নিজের জন্যও একটা ফ্ল্যাট রাখছে সাত্যকিদা! সে তোর বাড়ি করতে পেল, কি না পেল, তাতে কী এসে যায়? কিন্তু ভেবে দ্যাখ্, অশোক যদি একটা সুযোগ পায় হয়তো ছেলেটা দাঁড়িয়ে যাবে।

অনুরাধা চাপে পড়ে গেল। অশোককে তারও ভাল লেগেছে। কিন্তু চন্দন...? দ্বিধান্বিতভাবে অনুরাধা বলল, দেখি। প্ল্যানটা তো আনুক। যদি অশোক বাড়ি নাও করে প্ল্যানের জন্য ওকে আমি...

—নানাহ্। অশোকই করবে। সাত্যকিকে হাটা। তুই জামাইবাবুকে ফোর্স কর।

তা করা যায়। অনুরাধা চন্দনকে নিমরাজি করে এনেছে। তবু ভাইকে পাকা কথা দিতে পারছিল না অনুরাধা।

নটা নাগাদ চন্দন ফিরল। প্রতিভা ছেলের গলা পেয়েই বেরিয়ে এসেছেন, দেখা হল লাজুর সঙ্গে ? কী বলল ? ভাল আছে তো ?

—ভালই আছে। অনুরাধাকে দেখে নিল চন্দন। চন্দনের মুখ আষাঢ়ে মেঘের মতো গম্ভীর। থমথমে।

অনুরাধা বলল, এখানে ধরে নিয়ে এলে না কেন ?

চন্দন দায়সারা জবাব দিল, ওখানে ঠিকই আছে।

হাজার খুঁচিয়েও চন্দনের মুখ খোলাতে পারছিল না অনুরাধা। পরিষ্কার বোঝা যায় চন্দন কিছু লুকোতে চাইছে।

অনুরাধা বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি বলতে চাও লাজু তোমাকে বলেনি কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছে সাত্যকির সঙ্গে ?

—আমি অত খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করিনি।

—সেটাই তো আশ্চর্য লাগছে। কেন তুমি জিজ্ঞাসা করোনি ?

চন্দন একটু চুপ থেকে বলল, হাঁটুর বয়সি ছোট বোনের পারসোনাল লাইফ নিয়ে কৌতূহল দেখানো আমার পোষায় না।

—সাত্যকি কি লাজুর গায়ে হাত তুলেছিল ?

—সাত্যকি গায়ে হাত তোলার ছেলে নয়।

—তুমি সাত্যকিব সঙ্গে দেখা করে আসতে পারতে ?

—পারলে যাব।

—কী মনে হল লাজুব কথা শুনে ? ফিরবে ?

—জানি না। কিচ্ছু জানি না। সারাদিন পর...। আমার আর বকবক করতে ভাল লাগছে না। খেতে দাও। রাজার খাওয়া হয়েছে ?

—না, একসঙ্গে বসব সকলে।

চারজন মানুষ নির্বাক খাচ্ছে। রাজা তার ঘোরে বিভোর। থালার সঙ্গে মাথা সেঁটে আছে প্রায়। অনুরাধা আজ তার জন্য পরোটা করেছিল, রাজা রুটির থেকে পরোটা বেশি ভালবাসে। দুটো পরোটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ল রাজা, দু-চার টুকরো খেল, কি খেল না। মাংসর বাটিতে আঙুল ডুবিয়েও তুলে নিয়েছে। অনুরাধা ছেলের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট শ্বাস ফেলল।

প্রতিভা চামচ দিয়ে দুধটাই ঘাঁটছেন। চন্দন নিঝুম।

নীরবতা ভেঙে প্রতিভা বলে উঠলেন, আমাকে কাল একবার লাজুর কাছে নিয়ে যাবি চাঁদু ?

চন্দন জল খেয়ে গ্লাস নামাল, কাল আমাকে তাড়াতাড়ি অফিস বেরোতে হবে। কাল হবে না।

রাজা উঠে বেসিনে মুখ ধুচ্ছিল, হঠাৎ ঘুরে তাকাল, — বাবা তোমাকে নিয়ে যাবে না বড়মা। ঠিকানাটা নিয়ে নাও, আমি কাল সকালে নিয়ে যাব।

রাজার স্বর এমন কঠিন, অনুরাধা চন্দন দুজনেই চমকে উঠল। রাজা তা হলে সব শুনেছে ! বইখাতায় ডুবে থেকেও।

অনুরাধা তিরস্কারের দৃষ্টিতে চন্দনের দিকে তাকাল একবার, কোমল স্বরে রাজাকে বলল, তুই এখন কী করে যাবি ? আমি দরকার হলে তোর বড়মাকে নিয়ে যাব।

রাজার ঠোঁটে বিদ্রুপের ঝিলিক, তুমি আমাকে ছেড়ে নড়বে ?

অনুরাধা রাজার শ্লেষ উপেক্ষা করল, প্রতিভাকে বলল, পরশু ভোরবেলা আমি রাজার জন্য পুজো দিতে বেরোব মা। আপনার ছেলে গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ডাকাতে কালী, কালীঘাট, ফিরিঙ্গি কালী দক্ষিণেশ্বর সব জায়গাতেই যাব। আপনিও চলুন আমার সঙ্গে। পুজোগুলো সেরে আমিও একবার লাজুর সঙ্গে দেখা করে আসব।

প্রতিভা অনুরাধার দিকে তাকালেন না, চন্দনের দিকে তাঁর চোখ স্থির, বেশ। যা ভাল বোঝ

তোমরা।

সেই রাতে অনুরাধা এক উৎকট স্বপ্ন দেখল। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটছে অনুরাধা আর চন্দন। তাদের মাঝখানে ছোট্ট রাস্তা। যত ছুটছে বৃক্ষরাজি দীর্ঘ হচ্ছে ক্রমশ। জঙ্গলের আলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। আস্তে আস্তে আলো থেকে অন্ধকারের সুড়ঙ্গে ঢুকল তিনজন। নীলচে আঁধারে টিলটিল এক হ্রদ। হ্রদের মাঝখান থেকে খাড়া পাঁচিল উঠে গেছে আকাশে। যত ওপরে তাকায়, পাঁচিল আরও উঁচুতে ওঠে। আকাশের নীলে আটকে যায় পাঁচিল। সব কালো। মিশমিশে কালো।

এগারো

কৃষ্ণা খবর এনেছে রুদ্র ফিরে গেছে বয়লাডিলায়। গত সপ্তাহে। ভাগ্যিস লাজু সেদিন রুদ্রর খোঁজে যায়নি!

লাজু ছোট্ট শ্বাস ফেলল। রুদ্র এল, চলেও গেল। দেখা করল না, শুধু দূর থেকে উত্তাপ ছড়িয়ে জ্বালিয়ে দিল সাত্যকির সঙ্গে সম্পর্কের আধছেঁড়া সুতোটাকে। আগের বার রুদ্রর সংবাদে নষ্ট হয়েছিল সাত্যকির সন্তান। দুটো ঘটনাই কি কাকতালীয়? রুদ্র কে তার?

কৃষ্ণা হাসতে হাসতে লাজুকে ঠেলল, কী এত ভাবছিস রে? নদীর ওপারের কথা?

—উহুঁ, এপারের কথা। লাজু চেতনায় ফিরল, এত ঝামেলা নিয়েও কী করে এত হাসিখুশি থাকিস তুই!

—হাসতে না পারলে কবেই মরে যেতাম। হাসি কি আর যে সে জিনিস রে? হাসি হল বিধাতার শ্রেষ্ঠ টনিক।

কৃষ্ণাকে যত দেখছে মুগ্ধ হচ্ছে লাজু। স্কুলে কৃষ্ণা লেখাপড়ায় নেহাতই মাঝারি ছিল, কোনওক্রমে খেটেখুটে বিএ পাশ করেছে। দু-তিন বার পরীক্ষা দিয়ে ঘষটে ঘষটে এখন এক অতি সাধারণ কেরানি। তার দুই দাদা আর ভাই তিনজনই মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। বড়দা ইনশিওরেন্সে চাকরি করে, মেজদা ব্যাঙ্কে। ভাই ডাক্তারি পাশ করে সম্প্রতি বর্ধমানের ভাতারে এক হেলথ সেন্টারে পোস্টেড। দুই দাদাই আপন আপন বৃত্তে সচেতন সংসারী। ভাই ব্যস্ত তার নতুন চাকরি নিয়ে। কৃষ্ণার মা ঘোরতর শয্যাশায়ী, বছর তিনেক আগে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে তাঁর বাম অঙ্গ পড়ে গেছে। তাঁর মুখের কথাও বেশ জড়ানো। অসংলগ্ন। প্রায়শই চেনা লোককে চিনতে পারেন না তিনি। কৃষ্ণা সারাদিন অফিস করে, সারারাত মায়ের সেবা। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা, বারো ঘণ্টার জন্য এক আয়া আছে, তার পিছনে আট-নশো টাকা খরচ হয়। বাড়িভাড়া বারোশো। শত কষ্টে থেকেও কখনও অভাবের কথা বলে না কৃষ্ণা। তার মুখের হাসিটি সদা অমলিন।

কোথা থেকে যে এত শক্তি পেল কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা লাজুর সামনে বসে পা দোলাচ্ছিল, তুই যাই বল লাজু, আমি দাদাদের দোষ দিতে পারি না। ওদের মতো অবস্থায় থাকলে আমিও হয়তো এরকমই করতাম।

—বাহ্! মাসিমা ওদের মা নয়? ওরা কেউ নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারে না?

—বড়দা রেখেছিল তো। কিন্তু ওখানে কে দেখবে বল? বউদিও অফিস বেরিয়ে যায়। বাচ্চা রাখতে আয়া আছে, সেও তো ওই অসুস্থ মানুষের সেবা করবে না! মার জন্য আলাদা লোক রাখতে হলে....ওরা নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে, কত টাকা করে কাটছে মাসে মাসে!

—আর তোর মেজদা? মেজবউদি তো আর চাকরি করে না?

—মেজদার বাড়ি ছোট, জায়গা নেই। তা ছাড়া মেজবউদিকে তো তুই দেখিসনি, ভীষণ নার্ভাসটাইপ। অসুস্থ মাকে দেখতে হলে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর বাবুন ভাতারে একা থাকে, ওর কাছে মাকে পাঠাই কোন ভরসায়? তাকে কে দেখে তার ঠিক নেই।

—তা হলে আর কী। লাজু হাত ওলটাল, মা তা হলে তোর একার! কারও আর কোনও দায়িত্ব নেই!

—দায়িত্ব ভাবলে আছে, না ভাবলে নেই। ওরা তো মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠায়। যে যেমন পারে। দুশো-পাঁচশো।

—ব্যাস ? আর মানুষটার দেখাশুনো করা, ঝক্কি সামলানো...তুইও তো চাকরি করিস !

—চুপ কর তো। আমার এমন কিছু কষ্ট হয় না। আলগা ধমক দিতে গিয়ে কৃষ্ণা হেসে ফেলল, সেই যে সিন্দবাদ নাবিকের গল্প আছে... ! লোকটা কাঁধে করে মানুষদের নদী পার করে দিত আর ছটফট করত তার মুক্তি নেই বলে... ! লোকটা কীভাবে মুক্তি পেয়েছিল জানিস তো ?

—কী করে ?

—তা জানবি কেন ? যত সব ভারী ভারী বই দিয়ে মাথা ঠেসে রেখেছিস। লোকটা একদিন মাঝনদীতে মানুষটাকে ফেলে দিয়ে দৌড়ে নদী পার হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে পরের মানুষটা টানছে, যতক্ষণ না আরেকজনকে সে কাঁধ থেকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে। কৃষ্ণা হাসিতে ভেঙে পড়ল, কাউকে না কাউকে তো নদীতে থাকতেই হবে রে ভাই। নইলে লোকজন পার হবে কী করে ! যে বইছে সে যদি কষ্টটাকে কষ্ট না মনে করে, তা হলেই খেল খতম।

একেই কি মোটা বুদ্ধি বলে ? এর জন্যই কি স্কুলে থাকতে কৃষ্ণাকে অনুকম্পা করত লাজুরা ?

সেদিন পঙ্কজের হাত ধরে রাস্তায় বেরিয়ে লাজু প্রথমটা কেমন দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। কী করবে ? কোথায় যাবে সে ? মাথার ওপর অনন্ত আকাশ, পায়ের নীচে অসীম পৃথিবী, শুধু লাজুরই কোথাও হাত পা ছড়িয়ে থাকার ঠাঁই নেই ! দাদার বাড়িতে ওঠার প্রশ্নই আসে না। যে যে অপরাধের জন্য সাত্যকিকে লাজু মনে প্রাণে ঘৃণা করে, সেই সব অপরাধই আরও কুৎসিতভাবে করে চলেছে তার দাদা। যেন ষড়রিপুর বিকাশই জীবনধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য। সাত্যকিকে যদি লাজু ছেড়ে আসতে পারে, দাদার কাছেই বা সে কেন যাবে ? ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দেখেছিল, মাত্র একশো সতেরো টাকা পড়ে আছে। এই টাকা নিয়ে কোনও হোস্টেলের দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো যায় না। তা ছাড়া পঙ্কজ সঙ্গে রয়েছে, তাকে নিয়ে হোস্টেলে যাবেই বা কী করে। বন্ধুদের মধ্যে বিদিশার বাড়ি যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সীমা মনীষার সঙ্গে তার ভালই যোগাযোগ আছে, কিন্তু তারা দুজনেই এমন সংসার পাগল। লাজু একবার চোখ কান বুজে রুদ্রর কাছে যাওয়ার কথাও ভেবেছিল। রুদ্র নিশ্চয়ই কলকাতায় তাদের গড়িয়ার বাড়িতেই উঠেছে। রুদ্রই কি লাজুর নিরাপদ আশ্রয় !

রুদ্রর কথা ভাবতেই লাজুর মাথা ঝিমঝিম। রুদ্র বলত, সাত্যকি আমাদের পূর্ণবয়স্ক নাবালক। বয়স যত বাড়ছে ও ক্রমশ ছোট হতে থাকবে। তিরিশে দৌড়বে, চল্লিশে টলমল পায়ে হাঁটবে, পঞ্চাশে হামা টানবে, ষাটে কোলে। তুই তখন ওকে সামলাতে পারবি তো লজ্জা ?

লাজু পারেনি। রুদ্রর সামনে সে দাঁড়াবে কোন মুখে ? দ্বিতীয়ত রুদ্র কলকাতায় এসে বিদিশার সঙ্গেও দেখা করেছে, লাজুর কাছে আসেনি ! আসেনি, না ইচ্ছে করে আসতে চায়নি ? লাজুর হৃৎস্পন্দন বাড়ছিল। সে যাবে না, কখনও রুদ্রর কাছে যাবে না। প্রাণ থাকতে না।

বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তখনই হঠাৎ কৃষ্ণার নামটা মাথায় এসেছিল লাজুর। রুদ্র কৃষ্ণাদের পাশের বাড়িতে থাকত বলেই কি ? হয়তো তাই। মনের যে কখন কাকে মনে পড়ে যায় ! দশ বিলিয়ান স্মৃতিকোষের একটাতে ক্ষণিক স্ফুলিঙ্গ....একবার গিয়েছিল কৃষ্ণার বাড়ি...মা ছাড়া কেউ সঙ্গে থাকে না কৃষ্ণার,...গেলে ভীষণ খুশি হয় মেয়েটা,...যাবে নাকি লাজু সেখানে ?

একটা স্ফুলিঙ্গই শেষে পথ দেখাল।

কৃষ্ণা তখন বাড়িতে ছিল না। নির্মলা লাজুকে চিনতেই পারেননি। লাজু বলেছিল, —আমি লাজবন্তী মাসিমা। লাজু। কৃষ্ণার বন্ধু। গড়িয়ায় সেই পুকুরপাড়ের বাড়িটাতে থাকতাম।

নির্মলা অস্ফুটে কী বললেন লাজু বুঝতে পারল না।

—আমি আগে একদিন এখানে এসেছিলাম, মনে আছে ?

হাসতে গিয়ে মুখটা কেমন বিকৃত হয়ে গেল নির্মলার। চোখ জলে পূর্ণ হয়ে গেল।

আয়া বলল, চিনতে পেরেছে আপনাকে।

লাজু আয়াকে জিজ্ঞেস করল —কৃষ্ণা ফেরে কখন ?

—সন্ধে সন্ধেই ফিরে আসেন। আপনারা বসুন না। ছটার মধ্যেই ফিরবেন।

লাজু কাঠ হয়ে বসে ছিল। কৃষ্ণাদের বাড়ি সন্তোষপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে। বাস থেকে নেমে মিনিট পাঁচেক হাঁটতে হয়। দোতলা বাড়ির একতলার একটা ভাগ কৃষ্ণা ভাড়া নিয়েছে। দুটো খুপরি খুপরি ঘর, এক চিলতে গ্রিলঘেরা বারান্দা, রান্নাঘর, বাথরুম, এর ভাড়াই নাকি বারোশো। লাজু আগে যেদিন এসেছিল, সেদিন এত ছোট লাগেনি বাড়িটাকে।

—কৃষ্ণা অফিস থেকে ফিরে লাজুকে দেখে ভীষণ খুশি কার মুখ দেখে উঠেছিলাম রে আজ! কতক্ষণ এসেছিস? বলতে বলতে পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপেছে, এটি কে? তোর বডিগার্ড?

লাজু হেসেছিল, চামচেও বলতে পারিস। সাত্যকি মেদিনীপুর থেকে তুলে এনেছিল। আমার হেল্পার করার জন্যে। আমিই এখন ওর হেল্পার হয়ে গেছি। মা নেই, মরে গেছে। বাপটা আবার বিয়ে করে...এই পঙ্কজ, তোর নাম বল্।

কৃষ্ণা হো হো করে হেসে উঠল, তুমহারা নাম কেয়া হ্যায় বাসন্তী...সরি, পঙ্কজ?

পঙ্কজ দারুণ সপ্রতিভ, আমার নাম শ্রীমান পঙ্কজ কুমার বেরা।

— কী কী করতে পারিস?

—চা করতে পারি। যোগ করতে পারি। রুটি বেলতে পারি। এবিসিডি পড়তে পারি। ঘর ঝাড়পোঁছ করতে পারি। বাসন মাজতে পারি।

—থাক। আর দরকার নেই। অনেক গুণপনা জাহির হয়েছে। লাজুর মুখে হাসি, যাও তো, ওঘরে দিদার কাছে গিয়ে একটু বোসো। আমি মাসির সঙ্গে কথা বলব।

সব কথা শুনে কৃষ্ণা মুহূর্তের জন্য গম্ভীর, তারপর সজোরে একটা থাপ্পড় লাজুর কাঁধে, —ঠিক করেছিস। বেশ করেছিস। রুদ্রদার ওই স্যাঙাতটিকে আমার কোনওদিনই সুবিধের মনে হয়নি।

লাজু কী বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করেছিল, তোর এখন সমস্যাটা কী? কোথায় থাকবি?

লাজু নিরুত্তর।

—দাদা বউদির গলগ্রহ হতে চাস না, তাই তো? তুই এখানে থেকে যা।

—তোর অসুবিধে হবে। একে এই ছোট জায়গা, তার ওপর মাসিমার ওই অবস্থা. আগের বারও মাসিমাকে এতটা খারাপ দেখিনি।

—মা আর ভাল হবে না। তুই মাকে নিয়ে চিন্তা করিস না। আমাদের দুজনের যখন এ বাড়িতে জায়গা হয়, চারজনেরও হয়ে যাবে। সেই দাদুর দস্তানার মতো থাকব আমরা। তবে হ্যাঁ, তোর রাত্তিরে একটু অসুবিধা হবে। মা সারারাত জ্বালাবে। কথা বলতে পারে না তো, কিছু দরকার হলে বিচ্ছিরি গর্গ আওয়াজ করে মুখ দিয়ে। ঘুম ভেঙে যাবে বার বার।

লাজু বলেছিল, বোকার মতো কথা বলিস না। সে নয় আমি জাগব।

—একা জাগবি কেন? আমি প্রথম রাতটা জেগে মাকে দেখব, তুই শেষ রাত্তির। রাজি?

—সেটা কথা নয়। তোর বিশ্রাম হয় না। আমি নয় সারারাতই মাসিমাকে দেখব।

—ওটি হবে না। কৃষ্ণা চোখ পাকাল, এ বাড়িতে ও সব চ্যারিটি চলবে না। গিভ অ্যান্ড টেক্ পলিসিতে চলো। তোমার এখন চাকরি নেই, আমি সপ্তাহে তিন দিন আয়া রাখব, সে কদিন তুমি চাকরির খোঁজে ঘুরতে পারবে। অন্য তিন দিন তুমি আমার মাকে দিনে দেখবে। রোববার আমি। রাত সিক্সটি ফরটি। ভোরের দিকে আমার মাইরি বড্ড ঘুম পায়। না ঘুমোলে অফিসে এত চুলুনি আসে! চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত তোমার খাওয়া থাকা ফ্রি।

—ফ্রি কেন? লাজু বলে ফেলেছিল, আমি তো টিউশনি করি। ছশো টাকার।

—দিস তা হলে দু-একশো। আর তোর চামচেকে বলিস কিছু কাজকর্ম করে দিতে। ব্যাটা খায় কেমন? প্রচুর টানে?

লাজু দুশ্চিন্তা ভুলে হিহি করে হেসে ফেলেছিল, —সত্যিরে, গোড়ার দিকে রাক্ষসের মতো খেত। এখন শহরের হাওয়া লেগে গেছে। খুব বাধ্য। ওকে যদি বলিস মাসিমার পাশে সারাদিন বসে থাকতে, ও ক্যাসাবিয়াঙ্কার মতো বসে থাকবে।

—মা মরে কাঠ হয়ে গেলেও নড়বে না বলছিস ? বলেই হাসিতে ফেটে পড়েছে কৃষ্ণা। হাসতে হাসতে ছুটেছে মাকে বেডপ্যান দিতে।

এ বাড়িতে প্রথম রাত্রিটা লাজুর ভারী অদ্ভুত কেটেছিল। সাত্যকির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকুক, একটা নিয়মের মতো একসঙ্গে ছিল তো এতদিন ! রাতভর পাশে পরিচিত নিশ্বাসের শব্দ নেই, অভ্যস্ত পুরুষের ঘ্রাণ নেই, সবটাই কেমন যেন অবাস্তব। লাজু বুঝতে পারছিল সম্পর্ক ছিঁড়ে গেলেও তার রেশ অদৃশ্য সুতোর মতো থেকে যাবে বহুদিন। হয়তো বা আমৃত্যু।

পরদিন থেকে লাজু অবশ্য অনেক স্বাভাবিক। তবে লাজুর থেকে পঙ্কজ যেন আরও বেশি স্বচ্ছন্দ। মুমূর্ষু বৃদ্ধাকে দেখে সে এতটুকু ঘাবড়ায়নি। দারিদ্র্যের এক তরল রূপ আছে। যে কোনও আধারেই সে খাপ খেয়ে যায়। মাত্র তিন দিনে পঙ্কজ পুরোপুরি এ বাড়ির মানুষ।

লাজু এক বস্ত্রে বাড়ি ছেড়েছে। ব্যাঙ্কের পাশবই চেকবই সঙ্গে আনার তো প্রশ্নই ওঠে না। কৃষ্ণার শাড়ি পরে তাও চালানো যায়, কিন্তু সায়া ব্লাউজ ! কৃষ্ণা প্রায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, দৈর্ঘে-প্রস্থে দশাসই, সে তুলনায় লাজু তো লিলিপুট। এক দিন পর কৃষ্ণাকে বলতে লাজু বাধ্য হয়েছিল, তোর অফিস তো বিদিশার অফিসের কাছেই, ওকে গিয়ে বল না ও যদি আমাদের বাড়ি থেকে আমার কয়েকটা জামাকাপড় এনে দেয়। আর পঙ্কজের প্যান্টশার্ট, বইখাতা।

দুপুরে বেরিয়ে লাজু চন্দনের অফিসেও ফোন করেছিল সেদিন। মার না জানি মেয়ের খবর না পেয়ে কী অবস্থা হয়েছে ! উলটোপালটা কিছু যদি আশঙ্কা করে বসে !

চন্দন আসার আগে বিদিশা এসেছিল। বিকেলবেলা। হাঁপাতে হাঁপাতে। অফিসের জিপে করে। এই নে তোর চেকবই পাশবই। সাত্যকিকে ফোন করতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছিল বেচারা। দু হাজার টাকাও দিয়ে গেছে।

—তোকে তো খালি জামাকাপড়ের কথা বলেছিলাম। এই সব টাকা, পাশবই চেকবই নিয়ে আমি কী করব ?

—বারে, টাকা লাগবে না ? তুই যে কদিন এখানে থাকবি তার খরচ খরচা নেই ?

লাজু নীরস মুখে বলেছিল, আমি শুধু কদিনের জন্য আসিনি রে। আমি আর সাত্যকির কাছে ফিরব না।

—যাহ্। সাত্যকি তোকে সত্যিই ভালবাসে। বুঝেছি, তোর এখন মাথা গরম হয়ে আছে। ঠাণ্ডা হ'। রাগ পড়লে দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে।

—আমাকে কখনও রাগতে দেখেছিস ? আমি সাত্যকির টাকা ছোঁব না।

—পাশবই চেকবই তোর নামে, এ দুটো রাখ।

—নাম আমার, কিন্তু টাকা সাত্যকির।

—পাগলামি ছাড়। সাত্যকি ভীষণ ভেঙে পড়েছে। তা ছাড়া স্বামীস্ত্রীতে তো ঝগড়া হয়ই। এই তো সেদিন তাপস রেগে গিয়ে আমার কান মুলে দিল। বুবকার সামনে। দোষের মধ্যে আমি জা'কে ফ্ল্যাট বড় করে দেওয়ার গল্পটা বলে ফেলেছি। কী যাচ্ছেতাই মুখ করল আমাকে। পাঁঠা গোরু কী বলেনি ! কই, আমি তো পাত্তা দিইনি !

লাজু কী করে বোঝায় সাত্যকির সঙ্গে তার সংঘর্ষের গভীরতা কতখানি ! চিন্তায় ভাবনায় কর্মে আদর্শে দুজন যদি দুই মেরুর মানুষ হয়, তারাও হয়তো চুম্বকের টানে সংসারে আটকে থাকতে পারে, কিন্তু একই মেরুর ভান করে বদলে যাওয়া মানুষ যে কী দুর্বিষহ !

—তুই বড় মিস্টিরিয়াস লাজু। চাকরি খুঁজছিস ; আমার অফিসে জয়েন করবি না ! বেশ ছিলি সাত্যকির সঙ্গে, বলা নেই কওয়া নেই... ! যা ভাল বুঝিস কর।

লাজু বলল, তুই আমাকে কিছু টাকা দিবি ? লোন ? শোধ দিতে কিন্তু দেরি হবে।

—লোন কেন ? তুই আমার অফিসে জয়েন কর, অ্যাডভান্স স্যালারির বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। বলেই বিদিশা খপ করে লাজুর হাত চেপে ধরল, অফিসে আমি আরও টাইট কর্নারে পড়ে গেছি রে। ভেঙ্কট আর পাইন একটা আঁতাত গড়ে তুলেছে। আমার লাস্ট প্রজেক্ট রিপোর্টে তিনটে ফিগারের গণ্ডগোল হয়েছিল, তাই নিয়ে ওরা ডিরেক্টারের কাছে ঘোঁট পাকাচ্ছে। তুই চলে আয় প্লিজ্। আই

নিড ইউ লাজবন্তী। তুই চাকরি করলে সাত্যকিও রিলিভড্ হবে।

লাজু হেসে ফেলল, তোর অফিসে চাকরি করতে আমি পারব নারে। তুই কি চাস আমাদের এই সুন্দর বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাক ?

বিদিশা আর জোর করেনি। উঠবার সময় নির্মলার ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। নির্মলার অস্বচ্ছ দৃষ্টি বিদিশায় নিবদ্ধ। বিদিশার চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। কাঁপা গলায় বলেছিল, বাবার শরীরটাও খুব খারাপ যাচ্ছে রে। হাই প্রেশার। সুগার। বড্ড রোগা হয়ে গেছে।

—তুই বাপের বাড়ি যাচ্ছিস আজকাল ?

বিদিশা দু দিকে মাথা নেড়েছিল, ইচ্ছে করে। পারি না। কে যেন পা দুটো টেনে রাখে। একদিন কোর্টে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বাবাকে দেখে এসেছি।

—বাড়ি যাস না কেন ? গেলেই পারিস। মাসিমা তো তোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

—যেতাম রে, যদি তাপস বাবার কথাগুলো ভুল প্রমাণ করতে পারত। বাবার কথা রাখতে তাপস নিষ্কর্মাই হয়ে গেল। যে মাকাল ফল, সেই মাকাল ফল। নিজের কাছে তো হেরেই গেছি, বাবার কাছেও হারব ? কভি নেহি। বিদিশা পাশবই চেকবই টাকা গুছিয়ে নিল ব্যাগে। আলাদা পাঁচটা একশো টাকার নোট বার করল, আজ এটাই আছে। রেখে দে। তোর শাড়ি জামা আমি দু-একদিনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। বলতে বলতে বিদিশা হঠাৎই কপাল চুলকোল, আচ্ছা, আমিও যদি এসে এখানে থাকি ? বেশ একটা লেডিজ কমিউন তৈরি করে... ইচ্ছে মতো হাসব, নাচব, গান গাইব !

—হুঁ, তোর বর ছেলেমেয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে চলে আসুক আর কী ! তোর বরের তো আবার একটা বন্দুক আছে, নারে ?

—ওটা এয়ারগান। পাখিমারা বন্দুক। বিদিশা শ্বাস ফেলল, ছেলেমেয়ে দুটোই তো আমার পথের কাঁটা। একদিনের জন্য ওরা পিসির বাড়ি গেলে বুকটা কেমন হা হা করে। নইলে আর কী। আমি যদি কোথাও চলেও যাই, তাপস দু-তিন দিনের আগে খেয়ালই করবে না আমি নেই। তাও হয়তো মাঝরাত্তিরে।

লাজুর চোখে জল এসে যাচ্ছিল। কিছু কিছু মানুষ থাকে, যারা নিজেদেরই কাছে নিজেরাই অসহায়। বোধ আছে, যুক্তি আছে, কিন্তু নিজেই এমন মরচে ফেলে দিয়েছে তাতে যে ইচ্ছে করলেও সে মরচে আর তোলা যায় না। জোর করে তুলতে চাইলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে সবটুকুই ঝরে যায়। বিদিশার সঙ্গে সাত্যকির খুব মিল। না। ভুল হল। মিল থাকলেও বিদিশা সাত্যকির ছাঁচ আলাদা আলাদা।

এই যে শনিবার, অফিস ছুটির দুপুরে, অলসভাবে গড়াচ্ছে কৃষ্ণা আর অবিরাম কলকল করে চলেছে, এর ছাঁচটা কী ?

কৃষ্ণা অফিসের গল্প করতে করতে হঠাৎই প্রশ্ন করল, এই, তোর কাল চন্দনদার সঙ্গে কী কথা হল বললি না তো ?

লাজু আড়মোড়া ভাঙল, দাদারা যা বলে তাই। ফিরে যা। অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা কর।

—তোকে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোর করল না ?

—করেছিল। লাজু চোখ বুজল, আমি রাজি হইনি।

—কেন ?

—বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েদের জন্য বাপের বাড়ির চৌকাঠ অনেক উঁচু হয়ে যায় রে। ফিরতে চাইলে ঠোক্কর খেতে হবেই। লাজু কায়দা করে মূল কারণটা বলল না কৃষ্ণাকে। যার প্রতি গভীর টান থাকে, তার চরিত্রের কালো দিকগুলোর কথা লোককে সহজে বলা যায় না। সাত্যকি সম্পর্কে লাজু বলতে পারছে কারণ সাত্যকির মধ্যে কিছু আদর্শ ছিল একদিন। সততা ছিল। অথবা এও হতে পারে নিজের বিপন্ন অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য সাত্যকিকে এখন আক্রমণ করতেই হয়। কিন্তু চন্দনের বেলায় অস্তিত্ব রক্ষার তো প্রশ্নই আসে না। বাকি থাকে অবক্ষয়। লাজুর দাদার মধ্যে আদর্শই ছিল না কোনওদিন, তার আর অবক্ষয় কীসের ?

ছাত্র বাসে মদের বোতল ধরতে দিয়েছিল বলে অদ্রিনাথ যখন বাড়ি এসে ফুঁসছিলেন, চন্দন অনায়াসে বলে দিয়েছিল, তুমিও ঠিক কাজ করোনি বাবা। তোমার খারাপ লেগেছে, তুমি ফেরত দিয়ে দিতে পারতে। বাইরে ফেলে দিলে কেন ?

অদ্রিনাথ হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন, বেশ করেছি ফেলেছি। মাস্টারমশাই-এর হাতে মদের বোতল রাখতে দেওয়া মাস্টারমশাইকে অপমান করা নয় ?

—অপমান কেন ? সে তো একটা কাগজে মোড়া জিনিস তোমাকে রাখতে দিয়েছিল, মদের বোতল বলে দেয়নি। দ্বিতীয়ত সে তোমার পুরনো ছাত্র, এখন যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক, ব্যক্তিগত জীবনে সে কী করছে, না করছে তোমার দেখার কথা নয়। আমার মনে হয় তোমার থেকেও তার অপমান বেশি হয়েছে। বাসসুদ্ধ লোকের সামনে... তা ছাড়া অতগুলো টাকা দিয়ে কেনা...

লাজু তখন সবে কৈশোর ছাড়িয়েছে। সে বলেছিল, দাদা, তুই হলে মাস্টারমশাই-এর হাতে ওভাবে মদের বোতল রাখতে দিতিস ?

চন্দন উত্তর দিতে পারেনি। অদ্রিনাথ শুষ্ক হাসি হেসেছিলেন, তোর দাদার মনে ঘুণ ধরে গেছে। ও এবার উন্নতি করবেই।

পুরনো কথা ভাবতে গিয়ে দুপুরটা তেতো হয়ে যাচ্ছিল লাজুর। হালকা হওয়ার জন্য খোঁচাল কৃষ্ণাকে, অ্যাই, তুই বিয়ে করবি না ?

—তোর সাহস তো কম নয় ! তুই এখনও অন্যকে বিয়ে করতে বলিস ?

—সবার জীবন কি একরকম হয় রে ? তুই এখন ভাল চাকরি করছিস, এবার একটা রাঙা টুকটুকে গৃহকর্মে নিপুণ বেকার ছেলেকে বিয়ে করে ফেল। বিজ্ঞাপন দিয়ে দ্যাখ, লাইন লেগে যাবে বাড়িতে।

দ্বিপ্রাহরিক সূর্য পশ্চিমে হাঁটতে শুরু করেছে। তেজি পুরুষের মতো রোদ্দুর এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। চিড়িক পিড়িক চড়ুই খুনসুটি জুড়ছে রোদের সঙ্গে। পুরুষরোদে গা ভিজিয়েই ছায়ায় ছুটে পালাচ্ছে। বাতাস হাসছিল ফিকফিক।

বালিশ বুকে চেপে উপুড় হল কৃষ্ণা, একবার খুউব বিয়ে করার শখ হয়েছিল। বছর দুয়েক আগে দাদারা কিছু করবে না তাই নিজেই দিলাম খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন। পাত্রী সরকারি চাকুরিরতা। বয়স পঁচিশ। কমিয়েই লিখলাম। নিজেকে তো কালো বলা যায় না, তাই লিখলাম উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মেয়েদের লম্বা চওড়া লিখতে নেই, তাই স্বাস্থবতী, উচ্চতা পাঁচ সাত। পাত্র সরাসরি যোগাযোগ করুন।

—রেজাল্ট পেলি ?

—পাইনি আবার ! দিস্তে দিস্তে চিঠি। বিপত্নীকদের বাদ দিলাম। পঁয়ত্রিশের ওপরে যারা ছিল, তারাও আউট। প্রবাসী বাতিল। তিনটে চিঠি ছিল মাহিনা উল্লেখ করিয়া যোগাযোগ করুন। সেগুলো কুটিকুটি করে ছিঁড়লাম।

—তারপর ?

—তারপর ঝাড়াই বাছাই করে গোটা পনেরো ইনল্যান্ড ছাড়লাম। দুজন এসে মাকে দেখেই পালাল। পাঁচজন আমার থোবড়া দেখে। এক মক্কেল প্রথমেই ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স জানতে চায়, সেটাকে চা পর্যন্ত দিইনি। বাকিগুলো সব আরও স্যাম্পেল্। কারও ইয়া কোদাল কোদাল দাঁত ! কারও নাক মুখ চোখ সব ভুল ভুল জায়গায় বসানো। একটা তো বেঁটে এইটুকুনি। গুট্‌গুট্টি। বাবু আবার গর্বের সঙ্গে বলে আমি দেড় মিটার। কলকাতায় এত ডিফর্মড চেহারার মানুষ আছে বিজ্ঞাপন না দিলে দেখতে পেতাম না মাইরি। মিউজিয়ামে রাখলে মমিরাও লজ্জা পেয়ে পিরামিডের তলায় ঢুকে যাবে।

—তুই ! তুই লোকের খারাপ চেহারা বলে... !

—আলবত। আমাকে যদি খারাপ চেহারা বলে ছেলেরা রিজেক্ট করতে পারে, আমি কেন পছন্দসই চেহারা ছাড়া বিয়ে করব ? দুটোকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল, তারা আবার আরেক পদের ! বিয়ের আগে মেলামেশা করে একটু টিপেটুপে দেখতে চায় ! সব কটার মুখের ওপর দরজা

বন্ধ করে নিশ্চিন্ত। দূর শালা, বিয়েই করব না। মা মরে গেলে একটা বাচ্চা অ্যাডপ্ট করে নেব, দিব্যি কেটে যাবে, কী বলিস ? একটাই শুধু প্রবলেম। বাড়ি। কৃষ্ণা চিত হয়ে ঘুরন্ত পাখার দিকে তাকাল, একা একটা মেয়েকে কেউ এখনও বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না। কেন দিতে চায় না বল তো ? একা মেয়ে মানেই বাজারের মেয়ে ? অথচ একা ছেলে মানে বোহেমিয়ান ! রোমান্টিক ! কত বাড়ি খুঁজেছি রে একসময় !

—তোরা গড়িয়ার বাড়িটা ছাড়লি কেন ?

—দাদারা সব আলাদা হয়ে গেল যে। বাড়িঅলা রোজ পেছনে লাগত, তোমরা উঠে গেলে আমার বড় ছেলে থাকবে। আমাদের উঠোনে ময়লা ফেলছে। যখন তখন জল বন্ধ করে দিচ্ছে। মা একা সারাদিন কাঁটা হয়ে থাকে। কাঁহাতক পারা যায় ? এই বাড়িঅলাও তো প্রথমে আমাকে দেখে ভাড়া দিতে চায়নি। শেষে বাবুনকে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ থেকে এনে, শিখণ্ডী খাড়া করে তবে না ঠাঁই মিলল। বাবুন এখানে থাকে না তো কী ? ব্যাটাছেলের নামে তো বাড়ি দিয়েছে। ভাবলাম কোথায় একটু নিশ্চিন্ত হব, মা'র সেরিব্রাল হয়ে গেল। বাড়িঅলা মাঝে মাঝে মাকে দেখতে আসে। আমি তো জানি ওটা বুড়োর ছল। ব্যাটা দেখতে আসে নির্মলা দেবীর আর কদ্দিন ! এখন তো তুলতে পারবে না, মা গেলেই গলাধাক্কা দেবে।

লাজু শঙ্কিত হল, কী করবি তখন ?

পাশবালিশ শূন্যে ছুড়ে লুফল কৃষ্ণা, ব্যবস্থা একটা করছি। সরকারি ফ্ল্যাটের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি। মনে হয় শিগগিরই পেয়ে যাব। আমাদের কালীতলার রঞ্জুর বর হাউজিং-এ আছে, ওই একটা ম্যানেজ করে দিচ্ছে। ডানকুনিতে। যদি পেয়ে যাই, বুড়োকে এক কাঁদি কাঁচকলা প্রেজেন্ট করে যাব। আরে ভাই, দুবেলা ভাত জোটানোর ক্ষমতা যখন আছে, কীসের পরোয়া ?

জীবন এত সহজ ! এত স্বাভাবিক ! লাজুর ঠিক প্রত্যয় হচ্ছিল না। হেলায় সমস্ত সমস্যাকে অগ্রাহ্য করছে কৃষ্ণা। নাকি বেঁচে থাকার জটিলতা আদতে সরলই ! শুধু দৃষ্টিভঙ্গির তফাতে অনর্থক জট পড়ে যায় জীবনে।

পঙ্কজ পাশের ঘর থেকে চিৎকার করছে, ও মামি, ও মাসি, দিদিমা আসছে গো ! সঙ্গে ও বাড়ির মামি ! সাদা ট্যাসকি থেকে নামল !

কৃষ্ণা দৌড়ে গ্রিলের দরজা খুলেছে। প্রতিভা লাজুর কাঁধে ভর দিয়ে চৌকিতে এসে বসলেন। ঘামছেন দরদরিয়ে। অনুরাধার কপালে সিঁদুরের টিকা, লালপাড় গরদের শাড়ি খোঁপার ওপর ঘোমটার মতো হয়ে আছে।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করল, কপালে এত সিঁদুর লেপে কোথ্থেকে আসছেন বউদি ?

অনুরাধা কোমরে গোঁজা রুমাল দিয়ে ঘাড়গলা মুছল, সেই কোন সকালে বেরিয়েছি। মা তো একেবারে কাহিল হয়ে গেছেন।

—হব না ? প্রতিভা হাঁপাচ্ছেন এখনও, একটা নয়, দুটো নয়, ছ-ছটা মন্দির ! দক্ষিণেশ্বর থেকে শুরু ! এত আমার সয় ?

লাজু বলল, হঠাৎ এত ভক্তির বাড়বাড়ন্ত যে ?

অনুরাধা বলল, তুমি হয়তো মানো না, আমি বাবা ঠাকুরদেবতা মানি। ছটা মন্দিরেই মানত করলাম। বাজার জন্য।

লাজুর বলতে ইচ্ছে হল ঠাকুরদেবতা কি রাজার হয়ে পরীক্ষা দেবে ? নাকি মানত করলে রাজার স্মৃতিশক্তি প্রখর হবে ? বলল না, কিন্তু গলায় খোঁচা এসে গেল, মাকে বাদ দিতে পারতে ! মাকে দেখলে কি তোমার ঠাকুরদেবতারা বেশি খুশি হয় ?

অনুরাধা ভ্রুকুটি হানল, তুমি আমাদের কথা না ভাবতে পারো, আমরা ভাবি। মা তো তোমার জন্য দুরাত্তির ঘুমোতেই পারেনি। তুমি সোজা ও বাড়ি গেলে মাকে আজ এত ছুটতে হত না।

লাজু মাকে জড়িয়ে ধরল। ঘাম নিঃসরণের পর প্রতিভার শরীর শীতল এখন। লাজু গাঢ় গলায় বলল, আমি কাল-পরশুর মধ্যেই যেতাম মা। এখানে একটু থিতু হয়ে নিয়ে... টিউশনিতেও তো যাওয়া হয়নি কদিন।

—থিতু ফিতু বুঝি না। অনুরাধা চৌকির এক পাশে বসেছে, তৈরি হয়ে নাও, তুমি এখন আমাদের সঙ্গে যাবে।

—তা কী করে হয় ? লাজু এড়াতে চাইল অনুরাধাকে, সারাদিন মন্দিরে মন্দিরে ঘুরছ, নিশ্চয়ই কিছু খাওয়া হয়নি ! পঙ্কজকে বলছি দুটো ভাত চড়িয়ে দিতে। খেয়েটেয়ে একটু হাঁফ জিরোও।

প্রতিভা স্মিত মুখে বললেন, নারে, আমরা মিষ্টি টিষ্টি খেয়েছি। এই অবেলায় আর ভাত খাব না।

কৃষ্ণা দরজায় দাঁড়িয়েছিল, বলল, তা হলে একটু চা করে আনি ?

অনুরাধা বলল, না না, চা-ফার ঝামেলা করতে হবে না ভাই। অনেক বেলা হয়ে গেছে, রাজা বাড়িতে একা...। লাজু, তুমি গুছিয়ে নাও সব। এক্ষুনি ফিরব। পঙ্কজও যাবে তো সঙ্গে ? পঙ্কওওজ, রেডি হয়ে নে বাবা। আজ শনিবার। ফিরবার সময় বড় ঠাকুরের থানেও একটা পুজো দিয়ে যাব।

অনুরাধা এইভাবে টানাটানি শুরু করবে, লাজু ভাবতেও পারেনি। সে কাতর চোখে কৃষ্ণার দিকে তাকাল। কৃষ্ণা সঙ্গে সঙ্গে হাল ধরে নিয়েছে, বউদি, আমি একটু আপনাদের কথায় নাক গলাব ? লাজু এখানে এসে আছে বলেই বলছি। আপনাদের সঙ্গে লাজুর কি কোনও ঝগড়া আছে ?

অনুরাধার কপালে ভাঁজ পড়ল।

—আপনাদের বাড়িতে গেলে লাজুকে খাওয়ানো পরানোর ক্ষমতা আপনাদের আছে ?

অনুরাধার ভাঁজ বাড়ছে।

—আপনারা লাজুর আপনজন, আপনাদের কাছে গেলে লাজু অনেক ইজি থাকতে পারে ?

অনুরাধার ভাঁজ আরও ঘন, পারেই তো। লাজুর দাদা লাজুর জন্য প্রাণ দিতে পারে।

—লাজুও নিশ্চয়ই জানে সে কথা। তবু লাজু আপনাদের বাড়ি না গিয়ে এখানে এসে উঠেছে। এর মানেটা কি আপনি আন্দাজ করতে পারছেন না বউদি ? লাজু যে কোনও কারণেই হোক আপনাদের ওখানে থাকতে চায় না। এর পরও কি আপনার জোর করা উচিত ?

সরল সত্য এত সোজাসুজি বলতে পারে কেউ ? ধাক্কা সামলাতে অনুরাধার সময় লাগল।

প্রতিভা বললেন, 'থাক না অনু। ও যদি এখানে ভাল থাকে, এখানেই থাক। ওর মুখচোখ দেখছ না ? তিন-চার দিনেই কত ঝকঝকে হয়ে গেছে ?

অনুরাধা আহত স্বরে বলল, লাজু, তোমাকে আমি জোর করব না। তবে তোমার সঙ্গে আমি একটু আলাদা কথা বলতে চাই। তুমি একবার বারান্দায় আসবে ?

কৃষ্ণা বলল, বারান্দায় কেন বউদি ? আপনারা মার ঘরে গিয়ে কথা বলুন না। মা কিছুই বুঝতে পারে না।

নির্মলা বোবা চোখে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে, দু জোড়া পায়ের শব্দেও চোখে সাড়া নেই। অনুরাধা সেদিকে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর অকারণ গলা নামিয়ে বলল, লাজু, তোর দাদা তোর ব্যাপারে ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েছে। পরশু রাত্তির থেকে কারও সঙ্গে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলছে না। রাজার সঙ্গেও না।

...লাজু চন্দনের মুখটা দেখতে পাচ্ছিল। বিবর্ণ গুটিয়ে যাওয়া মুখ। লাজুর চোখে চোখ রাখতে পারছিল না চন্দন।...

অনুরাধা লাজুর হাত ধরল, জানিসই তো তোর দাদার প্রেশারটা বেশির দিকে। কোলেস্টেরলের অবস্থাও ভাল নয়। তোর জন্য যদি লোকটার স্ট্রোক ফোক হয়ে যায়। আমার বুক কাঁপছে রে।

...স্খলিত পায়ে কৃষ্ণাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে চন্দন। মাথা মিশে গেছে বুকের সঙ্গে।..

অনুরাধার স্বর করুণতর, সাত্যকির সঙ্গে কি কোনওভাবেই মিটমাট করে নেওয়া যায় না ? বেসিকালি সাত্যকি ছেলেটা খারাপ নয়। হ্যাঁ, মানি তার অনেক দোষও আছে। চালবাজ। সুবিধেবাদী। সে আজকাল কে নয় বল ? এর মধ্যেই একটু মানিয়ে গুনিয়ে... সে তার মতো থাকুক, তুই তোর মতো থাক।

লাজু অনেকক্ষণ পর কথা বলল, সাত্যকিকে তুমি কতটুকু চেনো ? দাদার সম্পর্কে সাত্যকি কী

বলেছে জানো ? জানো না। এই লোকগুলোকে বাইরে থেকে দেখে তুমি কিছু ধরতে পারবে না। কী নীচে নেমে গেছে এরা ! একটা নোংরা সিচুয়েশানকে গার্ড দিয়ে, তাই নিয়ে আমাকে কুৎসিত গালিগালাজ... ! লাজু দম নিল, দাদার সম্পর্কেই বা কতটা জানো তুমি ? দাদা কোথায় যায় ? কী করে... ?

—তোর দাদার কথা এর মধ্যে আসছে কেন ?

—দাদাকে নিয়েও তো সাত্যকি আমাকে কম কথা শোনায়নি ! একত্রিশে ডিসেম্বর অফিসট্যুরের নাম করে দাদা কোথায় ছিল জানো ?

অনুরাধা যেন ঈষৎ চমকে উঠল, জানি।

—জানো ! তুমি জানো !

—তোমার দাদা আমার কাছে কিছু গোপন করে না। সে অফিসের কাজে যায়নি, এক বন্ধু তাকে জোর করে ডায়মন্ডহারবারে নিয়ে গিয়েছিল... তোতা পাখির মতো বলে যাচ্ছে অনুরাধা, সেখানে বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তোমার দাদাও তাই আটকে পড়ে। আমাকে খবর দিতে পারেনি। তার জন্য আমার কাছে সে ক্ষমাও চেয়েছে।

লাজু বোবা হয়ে গেল। চোখ থাকতেও যে মানুষ তাকাতে চায় না, জোর করে কি তার দৃষ্টি উন্মোচিত করা যায় !

অনুরাধা হঠাৎ চুপ হয়ে গেছে। কয়েক পলক নিরীক্ষণ করল লাজুকে, তারপর শিথিল স্বরে প্রশ্ন করেছে, তোর দাদার নামে সাত্যকি বাজে কথা বলল, আর তুই সেটা বিশ্বাস করে নিলি ? দাদাকে সন্দেহ করতে এতটুকু বাধল না তোর ? যে দাদা তোকে এত ভালবাসে ! তোর জন্য এত করেছে !

লাজু অনুরাধার হাত চেপে ধরল, বিশ্বাস করো বউদি, আমিও দাদাকে ভালবাসি। খুউব ভালবাসি। তা বলে দাদা যদি কোনও বড় অন্যায় করে, আমি কী করে সেটা মেনে নেব ?

—চুপ। অনুরাধা সহসা স্থানকাল ভুলে চিৎকার করে উঠেছে, তোর দাদার সম্পর্কে তোর মুখ থেকে আমি একটা কথাও শুনতে চাই না। আমাকে বলবি না। আমাকে কিচ্ছু বলার চেষ্টা করবি না তুই। অনুরাধা হাত ছাড়িয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল। তার মুখ রৌদ্রের মতো অগ্নিময়। প্রায় ছুটতে ছুটতে গাড়ির দরজা খুলে সিটে বসেছে। জোরে জোরে শ্বাস টানছে। ছাড়ছে। লাজুর কথা ছুড়ে ফেলে দিতে চাইছে মন থেকে।

ড্রাইভার সিটে বসে ঢুলছিল, অনুরাধার শব্দে চমকে উঠেছে, ম্যাডাম, মা যাবেন না ?

প্রবলভাবে দু দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে স্থিত করল অনুরাধা। সশব্দে গাড়ি খুলে আবার কৃষ্ণাদের বাড়িতে ঢুকেছে, মা চলুন।

কৃষ্ণা প্রতিভাকে গাড়িতে তুলে দিচ্ছে। হতচকিত প্রতিভা পিছন ফিরে বার বার লাজুকে খুঁজছেন। অসহায় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। লাজু তখনও নির্মলার ঘরে নিস্পন্দ। দাঁড়িয়ে।

অনুরাধা গাড়ি অব্দি এসেও আবার ভেতরে গেছে। লাজুর সামনে গিয়ে আক্রান্ত নাগিনীর মতো ফণা তুলল, নিজের ঘর ভেঙেও শান্তি হয়নি, এখন আমার ঘর ভাঙতে চাস তুই ?

—হল কী রায়চৌধুরী, বোর্ডমানিটা ফেলুন !

—দিইনি বুঝি ? অনুরাধা আর মা আজ লাজুর কাছে গেছে। অনামনস্ক চন্দন টাকার বান্ডিলে হাত রাখল, ভুলে গেছি। সরি।

—প্রতিবারই তো ভুলে যাচ্ছ হে !

—রায়চৌধুরীদার ভুলো মন। অভিষেক রঙ্গ করল, —নেওয়ার সময় নয়, দেওয়ার সময়। তাই না দাদা ?

—ছি, এমন করতে নেই ভাই। কিছু অন্তত দাও, আজ তো তোমার শুধুই আসছে। মাঠে ট্রেবল লাগিয়ে দিলে ! ভাবতেও আমার পা কাঁপছে। কোথ্‌থেকে টিপস্ পাও বলো তো ?

—সিক্রেট সোর্স ভাই। আন্ডারওয়াটার কানেকশান। তনুময় চ্যাটার্জি চোখ মারল, —আজ কিং মিডাসের কপাল যাচ্ছে রায়চৌধুরীর ! যা টাচ করছে, তাই সোনা। পর পর কটা ফুলবোর্ড মারলেন খেয়াল আছে ?

চন্দন তাস বাঁটতে শুরু করেছে। এক এক এক এক এক। দুই দুই দুই দুই দুই। তিন তিন তিন তিন তিন।

অভিষেক ভারিক্কি মুখে সিগারেট ধরাল, বছরটাই রায়চৌধুরীদার দারুণ যাচ্ছে। লাস্ট মান্থে রুটিন চেক করতে গিয়ে তিন-তিনখানা পেল্লাই কাতলা জালে উঠে এল ! আমাদের শালা নলরাজার কপাল। পোড়া শোলমাছ ওই পারুলিয়ার কেস্...

—শুধু বছরের শুরুটাই যা স্লাইট খিঁচ মেরেছিল, তাই না রায়চৌধুরী ?

প্যাকের তাস পাশে সরিয়ে রাখল চন্দন। কটমট করে তনুময়ের দিকে তাকাল, —ফালতু কথা না বলে খেলুন।

উপুড় করা তাসে হাত ছোঁওয়াল তনুময়। গ্লাসে চুমুক দিল, গো। শুদ্ধশীল হাতের চেটো টেনিস র‍্যাকেটের মতো দোলাল, চলুক।

সৌরেন মণ্ডল দোহারকি দিল, চলুক।

অভিষেকও একটা দশ টাকার নোট রাখল, গো।

পাঁচ নেশাড়ুর তিন তাসের আসর তুঙ্গে উঠছে ক্রমশ। জুয়ার টেবিলে টাকার স্তূপ। সুরা আর সিগারেটে ক্লাব টেন্ট ম ম। সন্ধ্যা মন্দির।

শুদ্ধশীল অন্ধের মতো হারতে রাজি নয়। ছ রাউন্ড টাকা ছুড়ে তাস খুলল। বেজার মুখে বলল, প্যাক্।

দেখাদেখি সৌরেনও তাসে হাত রেখেছে। তাস তিনটেকে ঠোঁটের কাছে এনে ছোট্ট চুমু খেল। জাপানি পাখার মতো খুলছে তাস। হরতনের তিন সাত গোলাম। ঝটিতি দ্বিগুণ টাকা ফেলল বোর্ডে, চলুক।

চন্দন তনুময় আর অভিষেক নড়ে বসল। তারা অন্ধ খেলে চলেছে। শুদ্ধশীল লুব্ধ চোখে লক্ষ করছে খেলোয়াড়দের প্রতিক্রিয়া। সৌরেনের মুখ ক্রমশ লাল। চাপা উত্তেজনায় পুরো গ্লাস গলায় ঢেলে দিল।

তনুময় নির্বিকার, আপনার ছেলের প্রিপারেশান কেমন হল রায়চৌধুরী ?

লাজুর আজ কী কথা হল অনুরাধার সঙ্গে ! নিশ্বাস চেপে চন্দন দার্শনিকের ভঙ্গিতে বোর্ডে টাকা দিল, মনে তো হয় ভালই হয়েছে। খুব তো পড়ে দিনরাত। এখন পরীক্ষায় কী হয় !

—আপনার ছেলে ঠিক স্টার পেয়ে যাবে।

—ডোন্ট বি সো শিওর অভিষেক। ভাল রেজাল্টের অনেক হার্ডল আছে। কোয়েশ্চেন কেমন হয়, খাতা কোথায় যায়, কে দেখে, খাতা মুদির দোকানে কিংবা রেলের বাঙ্কে পড়ে থাকে কি না... তা ছাড়া পরীক্ষায় একটা চান্স ফ্যাক্টর তো থাকেই।

—কারেক্ট। চান্স ফ্যাক্টরটাই বড় কথা। যে মাস্টার খাতা দেখবে সে যদি অফমুডে থাকে ! ধরুন তার বউ তাকে খুব রগড়েছে, ব্যাস। আপনার ছেলের হয়ে গেল। এমনিতেই টিউশনি আর কোচিং করে করে মাস্টারগুলো সব টায়ার্ড থাকে... ব্যাটাদের মাইনের স্কেল যত ভাল হচ্ছে তত টাকার খাঁই বাড়ছে।

—মাস্টাররা কোরাপ্ট হলে দেশের আর কী থাকে চ্যাটার্জিদা ?

চন্দনের ঝিম্ চোখের ওপর দিয়ে একটা শরীর দুলে দুলে চলে গেল। লিকলিকে। লম্বা। অদ্রিনাথ। অশান্ত পায়ে স্কুলের করিডোর ধরে হাঁটছেন মানুষটা। স্কুলের দেওয়ালে সার সার পোস্টার। বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হোক।

চন্দন বিড়বিড় করল, শুধু কি কোরাপ্শান ? এডুকেশান সিস্টেমটাই নষ্ট হয়ে গেছে। সেই সত্তর থেকে।

—আর যারা নষ্ট করেছিল তারা এখন বসে বসে ফ্ল্যাশ খেলছে। শুদ্ধশীল ভেংচে উঠল, কী হে

সৌরেন, বিপ্লব শিকেয় তুলে এখন মাল খেতে কেমন লাগে ?

সৌরেনের লাল মুখ আরও লাল, চালবেন আপনারা ? না টেবিল উলটে দেব ?

খেলতে খেলতে কথা। খেলতে খেলতে গ্লাসের টুংটাং। খেলতে খেলতে নেশা চড়ছে পাঁচজনের। একেবারে ফুলবোর্ডের মুখে এসে তাস দেখল তনুময়, ধুস। আমি আর নেই।

শুদ্ধশীল ঝুঁকে টাকা গুনল, হয়ে গেছে।

তিন হাতের তাস সোজা হচ্ছে। অভিষেকের হাতে চিড়েতনের সাহেব, হরতনের বিবি, রুইতনের গোলাম।

চন্দন নিজের তাস দেখে চোখ বুজে ফেলল। ইস্কাবনের দুই তিন চার। আবার জিত। পর পর চার বার।

রাত বেশি নয়, মেরে কেটে আটটা। ময়দান ঝিমোনোর তোড়জোড় করছে। আঁধার মাঠে আলোকময় তাঁবু লাইটহাউসের মতো দীপ্যমান। তাঁবুঘরে দুই ছোকরা নাগাড়ে টেবিল টেনিস খেলে চলেছে। ক্যারামবোর্ডে শব্দ বাজছে টকটক টকাটক। পাশের তাসটেবিলে আরেকটা হুইস্কির বড় বোতল এল। টেলিফোন বেজে উঠল ঝনঝন।

চন্দনের হাই উঠছিল। দুপুর থেকে অবিরাম জিতে একটু যেন ক্লান্তি আসছে এবার। জয়ের চাপে উদ্বেগ পিছু হঠছে। স্নায়ুরা শিথিল থেকে শিথিলতর। আজ একটুও জেতার স্পৃহা নেই, তবু টাকারা যেন তাড়া করে চলেছে তাকে। পরশু রাজার পরীক্ষা শুরু, আজ শনিবারের জুয়ার আসরটায় না বসলেই ভাল হত। বাড়ি ফিরে না হয় রাজার কাছে বসত খানিকক্ষণ। ছেলের পড়াশুনার ব্যাপারে টাকা জোগানো ছাড়া চন্দনের কোনওদিনই কিছু করণীয় নেই। শৈশবে রাজাকে স্কুলে ভর্তি করা থেকে এই মাধ্যমিক পর্যন্ত অনুরাধা একাই একশো। তবু বাবা হিসাবে তো দায় থাকেই। অদ্রিনাথ চন্দনের লেখাপড়া নিয়ে কখনও তেমন মাথা ঘামাতেন না, চন্দন নিজে নিজেই পড়ত। একমাত্র পরীক্ষার আগে ঘাড়ের কাছে বাবার নিশ্বাস অনুভব করত চন্দন। ভয় পেত ঠিকই, আত্মবিশ্বাসও তো পেত অনেকটাই। ওই নিশ্বাসে শুধু শাসন নয়, এক ধরনের নৈকট্যও থাকে। বাবা ছেলের। রাজা যা চায় তার থেকে অনেক বেশি রাজাকে দিয়েও ছেলের কতটুকু কাছে যেতে পেরেছে চন্দন !

পর পর দু বোর্ড হেরে চন্দন আলগা স্বস্তিবোধ করল। খুব বেশি নয়, বড় জোর পাঁচ সাতশো, তবু যেন দম নেওয়া যাচ্ছে একটু।

—তাস ঘুরছে। তাস ঘুরছে। শুদ্ধশীল বেশ উত্তেজিত। মনে হয় লেডি ফরচুনের আমাদের দিকে চোখ পড়েছে।

—আপনার তো মশাই মুরগির কলজে। জিতলেও পাঁচশো, হারলেও পাঁচশো। লেডি ফরচুন আপনাকে আর কী দেবে ? তনুময় প্লেট থেকে বাদাম ভাজা তুলে মুখে ছুড়ল, রায়চৌধুরী, আপনার ছেলের পরীক্ষা কবে শেষ হচ্ছে ?

—রিটন্ পরীক্ষা বাইশ। তারপর ওয়ার্ক এডুকেশান আছে।

—আমার ছেলেমেয়েরও অ্যানুয়াল হয়ে যাচ্ছে, চলুন না সামারে নর্থ ইন্ডিয়া ঘুরে আসি। গিন্নি খুব সিমলা সিমলা করছে। নর্থবেঙ্গলের মেয়ে তো, একদম কলকাতার গরম স্ট্যান্ড করতে পারে না।

—দেখি। বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করছে না চন্দনের। অনুরাধা এ বছর কেদারবদরি যেতে চায়, নিজের হাতে মন্দিরে পুজো দেবে। রাজার জন্য। প্রতিভারও খুব তীর্থ করার শখ। বদরিনাথ নিয়ে সমস্যা নেই, কিন্তু কেদারে কি মাকে নিয়ে যাওয়া যাবে ! প্রতিভা চাইলে অবশ্যই ডুলি ভাড়া করবে চন্দন। যতই অসুবিধা হোক তাঁকে এবার না নিয়ে চন্দনদের উপায়ও নেই। অন্য সময় লাজুর কাছে প্রতিভাকে জমা রেখে যাওয়া যায়। এবার তো তা চলবে না। কী যে কাণ্ডটা করল লাজু !

পলকে লাজুর মুখ চন্দনকে ঝাপটা মেরেছে। কী পাথর চোখে লাজু প্রত্যাখ্যান করল চন্দনকে !

—তুই আমার কাছে আর আসিস না দাদা ! মাকে যদি দেখতে ইচ্ছে হয়, আমি নিজে গিয়ে দেখে

আসব।

লাজু সব জানে। সাত্যকি কথা রাখেনি। লাজুও অনুরাধাদের সব বলে দেবে! চন্দনের বাড়ি ফিরতে পা সরছে না আজ।

আরও তিনটে ডিল্ হারল চন্দন। ঝাঁকুনি খেয়ে মস্তিষ্ক সতেজ আবার। হঠাৎই প্রাণপণে জিততে চাইছে খেলায়। দাঁতে দাঁত কষে টাকা লাগিয়ে যাচ্ছে। টেক্কা টপে লড়ে গেল পুরো বোর্ড। পর পর দুবার রান নিয়ে মার খেল। হচ্ছে না। কিছুতেই হচ্ছে না। তাস দেখে খেলছে। তাস না দেখে খেলছে। তাসে চুমু খাচ্ছে। তাসে টাকা ছোঁয়াচ্ছে। কোনও তুকতাকেই কিছু হচ্ছে না আর।

চন্দন হারছে। চন্দন হারছে।

ট্রেপলটোট চলে গেল। পার্স প্রায় শূন্য। বিবির জোড়া নিয়ে শেষবারের মতো লড়ল চন্দন। ফেল। শুদ্ধশীল টেক্কার জোড়া তুলে ছিনিয়ে নিল শেষ কপর্দক।

চন্দনের চোখ ঘোলাটে হয়ে গেছে। তনুময়কে বলল, আমাকে হাজারটা টাকা দিন।

তনুময় সন্ন্যাসীর মতো হাসল, জুয়াবোর্ডের এথিকস্ তো আপনি মানেন রায়চৌধুরী। ধার ফার চলে না।

চন্দনের মেজাজ চড়ছিল— মাত্র হাজার টাকা দিতে পারবেন না! পারসোনাল লোন হিসেবে দিন!

তনুময় রাগটাকে আমল দিল না, খেলার জন্য আমি এক পয়সা দেব না। বাইরে চলুন, ফেরার জন্য ট্যাক্সি ধরুন, দু হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

—আমি হেরে চলে যাব? ইমপসিবল্। মণ্ডল, আপনি দিন তো। হাজার দিলে দু হাজার ফেরত দেব।

—পারব না ভাই। লাখ টাকা দিলেও নিয়ম ভাঙতে পারব না।

অভিষেকের গলা নেশায় জড়িয়ে গেছে, আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না দাদা। শুদ্ধশীল গুনগুন গান ধরেছে, দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন। ধরো হুইস্কি সোডা আর মুরগি মটন। কলে পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করছে চন্দন। মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুড়ল। কিংডম ফর এ হর্স! কিংডম ফর এ হর্স!

চন্দনের মুখ দেখে ভয় পেয়েছে শুদ্ধশীল। ফিস ফিস করে তনুময়কে বলল, আজ এখানেই শেষ করুন। শালা একদম আউট হয়ে গেছে।

মাতালের কান কখনও কখনও প্রখর হয়ে ওঠে। চন্দন শুদ্ধশীলের দিকে ফিরে গর্জে উঠল, —চোপ। আমি আউট হইনি। আমি খেলব।

সৌরেন টাকা গুছিয়ে উঠে পড়েছে। অভিষেক আর তনুময়ের ওঠার ইচ্ছে ছিল না, তাদেরকেও উঠতে হয়েছে অগত্যা। ঘরের অন্যান্য সকলে পান ও খেলা থামিয়ে চন্দনদের দিকে অভিনিবিষ্ট ছিল, তাস পার্টিদের কলহ বিবাদ এমন কিছু নতুন নয়, খেলুড়েরা উঠে পড়েছে বলে তারাও নিশ্চিন্ত, নিজের নিজের গণ্ডিতে মগ্ন আবার।

চন্দন চেয়ারে শরীর ছেড়ে বসেই আছে, সৌরেন তার কাঁধে হাত রাখল, চলুন। ফিরবেন তো?

বসন্তের মধুর হাওয়ায় বাইরের লন জমজমাট। ছড়ানো ছেটানো চেয়ারে তারিয়ে তারিয়ে মলয় সেবন করছে কেউ কেউ। কেউ বা রঙিন পানীয়। ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ব্যবসায়িক লেনদেনের আলোচনাও চলছে কোথাও কোথাও। অভিষেক আর তনুময় নতুন করে লনে চেয়ার টেনে বসেছে। শুদ্ধশীল খেলা ভাঙতেই হাওয়া।

অনেকদিন পর চন্দনের আজ পা টলছিল। অন্য দিন ছ পেগেও খাড়া থাকে সে, আজ মাত্র তিন পেগে স্নায়ু শরীরের দখল হারিয়েছে। সৌরেনও পুরোপুরি সজ্ঞানে নেই।

নরেন্দ্র শর্মা চন্দনকে দেখে এগিয়ে এল, —আপনাকেই খুঁজছিলাম। আমার একটা কাজ করে দিতে হবে দাদা।

চন্দন চোখ টান করল, কী কাজ?

শর্মা মুঠো করে মুখে পানমশলা ফেলল, কাজটা অবশ্য আপনার সঙ্গে নয়, আপনার বোনের হাজব্যান্ডের সঙ্গে। ভদ্রলোকের তো ভাল পলিটিকাল ইনফ্লুয়েন্স আছে ?

—তা আছে। চন্দন প্রাণপণে জড়ানো জিভ যথাস্থানে রাখার চেষ্টা করছিল, কাউকে উচ্ছেদ করাতে হবে ?

—হ্যাঁ দাদা। শর্মা গদগদ, আপনার ওই কেসটাতে ভদ্রলোকের কিছু পাওয়ার দেখেছিলাম। বিশ লাখ টাকা দিয়ে জমিটা কিনলাম দাদা, কিছুতেই বস্তি ওঠাতে পারছি না। কদিন ধরেই আপনাকে বলব ভাবছি...

—ঠিক আছে। বলে দেব। চন্দনের মনে পড়ল সাত্যকি লাজুকে তার কীর্তির কথা জানিয়ে দিয়েছে। সাত্যকি কথা রাখেনি। দু-চার পা এগিয়ে ফিরে দাঁড়াল চন্দন, একটু চেঁচিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে তো তার ভাল আলাপ হয়ে গেছে ! আপনি নিজেই গিয়ে বলুন না। কাজ হয়ে যাবে।

সৌরেন ডাকল, কাকে বলছেন রায়চৌধুরী ? শর্মা তো চ্যাটার্জিদের কাছে পৌঁছে গেছে !

—অ। চন্দন আলগা হেঁচকি তুলল, ঠিক হ্যায়। কোই বাত নেহি।

ঘাস মাড়িয়ে রাজপথে এসে দাঁড়াল দুজনে। ফুটপাথ ধরে নীরবে হাঁটছে। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে সোডিয়াম বাষ্পের বাতিরা পৌঁছেও পৌঁছতে পারছে না নীচে। আলোছায়া জাল বুনছিল। ছুটন্ত হেডলাইটের দ্যুতি মাঝে মাঝেই ছিঁড়ে দিচ্ছে জাল। শুকনো পাতারা চমকে উঠছে।

ফোর্ট উইলিয়ামের মোড়ে এসে সৌরেন বলল, দেখলেন রায়চৌধুরী, শুদ্ধশীল আমাকে কেমন অপমান করল !

চন্দন কিছুটা শান্ত হয়েছে, বাদ দিন।

—কেন বাদ দেব ? আমি সত্যিই এক সময়ে মুভমেন্ট করেছি ! ডেবরা গোপীবল্লভপুরের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরেছি ! চাষিদের দাওয়ায় কত রাত কাটিয়েছি জানেন ?

চন্দনের গলা আবার জড়িয়ে গেল, আরে, বাদ দিন।

—আপনি কোনওদিন রাজনীতি করেননি রায়চৌধুরী, আপনি বুঝবেন না। কত স্বপ্ন ছিল আমাদের। দেশে অভাব থাকবে না, দারিদ্র্য থাকবে না, বৈষম্য থাকবে না। স্টিংকিং রিচ থাকবে না। মানুষ তার ক্ষমতা মতো পরিশ্রম করবে, প্রয়োজন মতো আহার শিক্ষা বাসস্থান পাবে, তা শালা আমাদের কেউ পাত্তাই দিল না !

চন্দন সান্ত্বনার স্বরে বলল, আহা, বাদ দিন।

—বাদই তো দিয়ে আছি রায়চৌধুরী। গলা অব্দি পাঁকে ডুবে নাক টিপে দাঁড়িয়ে আছি। সৌরেনের গলা ডুবে গেল, খোঁয়াড়ের শুয়োরদের মতো দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছি। তবে আপনাকে আজ বলে রাখলাম রায়চৌধুরী, ওই বেঁটে ভট্‌চাজ্‌ যাই বলুক, যদি সত্যি সত্যি বিপ্লব আসে, তখন এই মালখোর ঘুষখোর সৌরেন মণ্ডলকে আর আপনারা খুঁজে পাবেন না। বউ বাচ্চার মায়া কাটিয়ে, আপনাদের হাত নেড়ে টা-টা করে চলে যাব।

চন্দন সৌরেনের কাঁধে ঝাঁকুনি দিল, থাক, বাদ দিন।

—অ। বিশ্বাস হচ্ছে না ? শুনুন, যে সৌরেন মণ্ডলকে আপনি দেখেন সে হল বিপ্লবী সৌরেন মণ্ডলের ছদ্মবেশ। বিপ্লবের সময়ে ছদ্মবেশ ছেড়ে...

তিনটে গুলি লেগেছিল সমীরণের। মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল সরু গলিতে। সমীরণ হতে পারেনি বলেই কি সৌরেন এত বাচাল ? সমীরণ জানল না তার বন্ধুই তাকে... ! নিজের গায়ে থুতু ছেটাতে ইচ্ছে করল চন্দনের। সৌরেনের মুখেও। আচমকাই ধমকে উঠল, কী হচ্ছেটা কী ? বলছি না বাদ দিন ?

সৌরেন হোঁচট খেল, ঠিক আছে। ঠিক আছে। আপনি যখন এত করে বলছেন, বাদ দিচ্ছি। ট্যাক্সি ধরবেন তো ?

কালীঘাট টেন্টের সামনে ছোট্ট জটলা। জটলার মধ্যে অবিনাশ দাঁড়িয়ে আছেন। আবছা আলোতেও চন্দন দেখতে পেল তাঁকে।

অবিনাশও চন্দনকে দেখে এগিয়ে আসছেন। চন্দন প্রমাদ গুনল। সঙ্গে এক পেঁচি মাতাল, নিজেও ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়, এ অবস্থায় কি শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলা যায় ?

ইতস্তত করে এগোল চন্দন, এখনও বাড়ি ফেরেননি ?

অবিনাশও বুঝি জামাইয়ের হাল টের পেয়েছেন, খুব কাছে এলেন না, দূর থেকে বললেন, এই এবার ফিরব। ফুটবল টিম নিয়ে জরুরি মিটিং ছিল।

এই এক ধরনের মানুষ ! আলাদা করে কোনও সাধ নেই, আহ্লাদ নেই, জীবনটাকেই গড়ের মাঠ বানিয়ে ফেলেছেন !

চন্দন বলল, সোমবার থেকে তো আপনার নাতির পরীক্ষা। জানেন তো আপনাদের পাড়াতেই রাজার সিট পড়েছে ?

—জানি। যামিনীচরণ স্কুলে। রাজা সকালে এসে বলে গেছে।

—রাজা সকালে গিয়েছিল !

—হুঁ। তার দিদিমার কাছে বসেছিল অনেকক্ষণ। বলল তুমি নাকি আজ গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছ। অনু তোমার মাকে নিয়ে সারাদিন মন্দিরে মন্দিরে ঘুরছে !

চন্দন পলকে টানটান। অনুরাধা আজ মাকে নিয়ে লাজুর কাছেও যাবে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফিরেও এসেছে ওরা !

অবিনাশ উদাস হলেন, অনু অনেক বদলে গেছে। খুব ভক্তিমতী হয়ে উঠছে দিন দিন।

অবিনাশের গলায় কি শ্লেষ ? চন্দন বুঝতে পারল না। সহসা অবিনাশ গলা নামালেন, —আচ্ছা, রাজার কী হয়েছে বলো তো ? ছেলেটাকে কেমন মেন্টালি ডিসটার্বড মনে হল ?

—কেন ? ঠিকই তো আছে। পরীক্ষার টেনশানে হয়তো...

—কী জানি বাবা। অবিনাশ স্বগতোক্তি করলেন, —ছেলের মুখচোখ আমার সুবিধের লাগল না। তোমরা কি ওকে বকাঝকা করেছ ?

—নাহ্।

—অনু কি পড়া নিয়ে বেশি চাপ দিচ্ছে ?

—আপনার মেয়েকে তো আপনি জানেনই। ছেলে নিয়ে সবসময় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে।

—উচিত নয়। ছেলে বড় হয়েছে, এখন তোমাদের বুঝে শুনে চলা দরকার। অবিনাশ অর্থপূর্ণ চোখে চন্দনের আপাদমস্তক দেখলেন। জরিপ করলেন সৌরেনকেও, চলি। পরে কথা হবে।

সৌরেন চন্দনকে টানল, এখানে ট্যাক্সি দাঁড়াবে না। পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে যাই চলুন।

চন্দনের পা দুলে গেল। যে অফিসার শীলা সেনের ফ্ল্যাট থেকে তাকে ধরেছিল, এর মধ্যে দুদিন তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে। ওই পার্ক স্ট্রিট মোড়েই। লোকটা চন্দনের সঙ্গে কথা বলেনি, পরিচিতের ভাবও দেখায়নি, তবু কী অশ্লীল হাসি খেলেছিল লোকটার ঠোঁটে।

হয়তো বা লোকটা হাসেওনি। চন্দন নিজেই কল্পনা করেছে হাসিটা। নিমেষে চন্দনের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ। দুবারই। ভয়ে ? নাকি লোকটা তার নগ্ন চেহারা দেখেছে, সেই অপমানে ?

আরেকজনকেও ওই মোড়ে দেখেছে চন্দন। লাল শিফন। শাড়ির বদলে সালোয়ার কামিজ। একদিন স্কার্টব্লাউজ। কোমল বালিকা প্রায়। ভিড় মিনিবাসে ঠেলেঠুলে উঠে গেল মেয়েটা। চন্দনের দিকে ফিরেও তাকাল না।

সৌরেন যাবে যাদবপুর। চন্দনের পথের ওপর দিয়ে। চন্দন কায়দা করে সৌরেনকে কাটাল, আপনি এগোন। চ্যাটার্জিকে একটা দরকারি কথা বলতে ভুলে গেছি, বলে আসি।

—দেরি না হলে ওয়েট করতে পারি।

—দেরি হবে। আপনি যান।

সৌরেন দূরে মিলিয়ে গেল। চন্দন বৃক্ষের মতো নিশ্চল। দীর্ঘ সময় পর অদ্ভুত এক মুক্তির অনুভূতি ছেয়ে যাচ্ছে শরীরে। দুপুরে চন্দন কত টাকা জিতেছিল ? ট্যাক্স বাদ দিয়ে প্রায় ন হাজার। তাসের আসরে অঙ্কটা বেড়েছিল আরও। অত টাকা রোজ রোজ মুঠোয় আসে না। টাকাটাকে কী

ভারী লাগছিল আজ !

এখন চন্দন নাঙ্গা ফকির।

চন্দন দৌড়ে রাস্তা পার হল। যুদ্ধের ট্যাঙ্ক পিছনে ফেলে নেমে পড়েছে ময়দানে। মাঠের প্রান্তে প্রচুর গাছপালা, অন্ধকারও বেশি নিবিড়। তমসাকে পর্দা করে আদিম খেলার মহড়া দিচ্ছে নরনারী। মাঠপরিরা ভেসে বেড়াচ্ছে ঘাসে। তাদের পার হতেই সামনে হুহু প্রান্তর। অতিকায় কচ্ছপের মতো শুয়ে। কচ্ছপের পিঠ মায়াজ্যোৎস্নায় মাখামাখি।

কচ্ছপের পিঠ বেয়ে চন্দন টলমল হাঁটছে। গঙ্গার দিক থেকে বাতাস ছুটে এল হা হা। মিঠেল। দামাল। শরীর ছুঁয়ে শিহরন তুলে চলে গেল মেট্রো স্টেশানের দিকে।

অকস্মাৎ চন্দনের গতি রুদ্ধ। এতকাল পর কোথ্থেকে আবার সামনে এসে ফণা তুলেছে সাপটা ! কৈশোরের সেই শঙ্খচূড় !

চন্দন দরদর ঘামছে। কচ্ছপের পিঠে হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে টাল সামলাল। সাপ দুলছে মৃদু মৃদু। আজ আর রক্ষা নেই। ছোবল এবার মারবেই। চন্দন ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। চোখ খুলতেই মাঠ শুনশান। সাপ উধাও।

অদ্রিনাথ বলতেন, ভয়কে জয় করতে শেখ্ চাঁদু। ভিতু মানুষরা বড় লোভী হয়। আবার লালসার জন্যে কষ্টেও ভোগে বড়।

শৈশবের ভয় যৌবনের আত্মধিক্কার হয়ে এখন শুধু গ্লানি। না। মোটেই না। চাওয়া যদি নাই থাকে তবে মানুষ হয়ে জন্মানো কেন ? বেঁচে থাকার লোভ ছিল বলেই না সাপটাকে ভয় পেয়েছিল চন্দন ! আর ভয় বুকে নিয়েও তো দিব্যি দেড়েমুশে এখনও ভোগ করছে জীবনকে ! কাকে পরোয়া তার।

চন্দন ধীরেসুস্থে মাঠ পার হল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আলো নিভে গেছে। অনুপম স্থাপত্য এক অতিকায় প্রাণীর হাড়ের স্তূপ যেন।

চন্দন শার্টের একটা বোতাম খুলে দিল। লাজু তাকে ঘৃণা করে।

চন্দনের তাতে কাঁচকলা !

দ্বিতীয় বোতাম খুলল। অনুরাধা বিশ্বাস হারাবে। হারাক। চন্দন ভয় পায় না !

তৃতীয় বোতাম খুলল। মা ধরে ফেলেছে চন্দনের সাজানো চেহারা।

ধরুক। বয়েই গেল !

চন্দন এক সফল মানুষ। চন্দনের রাজা আছে।

শার্টের শেষ বোতামটাও খুলে দিল চন্দন।

তেরো

রাজার চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। প্রশ্নপত্রের একটি প্রশ্নও পড়তে পারছে না সে, সব যেন দুর্বোধ্য খরোষ্ঠী লিপি। রাজা দুহাতে মাথা চেপে ধরল। ঘাড় ঝাঁকিয়ে স্থিত করতে চাইছে নিজেকে। আজ তাকে পারতেই হবে।

মাধ্যমিকের লিখিত পরীক্ষার আজই শেষ দিন। আজকের পর আর শুধু ওয়ার্ক এডুকেশন বাকি। এ বছর প্রশ্ন নিয়ে কোথাও তেমন কোনও গুরুতর অভিযোগ নেই, অভিভাবক ছাত্রছাত্রীরাও মোটামুটি সন্তুষ্ট। অঙ্ক নিয়ে মফস্বলের দিকে মৃদু গুঞ্জন উঠেছিল, তবে রাজ্যের কোথাও তেমন বড় গণ্ডগোল হয়নি।

মামার বাড়ির কাছে এক মাধ্যমিক স্কুলে রাজাদের সিট পড়েছে। মাঝারি মাপের স্কুল, দোতলা অসম্পূর্ণ, ঘরগুলোও কেমন খুপরি খুপরি। আলো বাতাস বেশ কম। রাজাদের ঘরে, তিরিশজন পরীক্ষার্থীর মাথার ওপর একটা মাত্র টাউস ফ্যান টিকটিক ঘুরছে।

রাজা ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকাল। এ ঘরের পরীক্ষার্থীরা সকলে রাজাদের স্কুলের নয়, জনা দশেক অন্য স্কুলেরও আছে। সকলেরই কলম সচল। অয়ন সাগ্নিক কণাদ মাথা নিচু করে

লেখা শুরু করেছে। দীপ কিছুক্ষণ সিলিং-এর দিকে তাকিয়েছিল, ঝপ করে ঘাড় নামাল খাতায়। পিছনের দেবাংশু অঞ্জনরা লেখাপড়ায় তেমন ভাল নয়, তারাও টুকটুক করে উত্তর লিখে চলেছে। শুধু রাজাই এ ঘরের ব্যতিক্রম।

রাজা উঠে দাঁড়াল, জল খাব স্যার।

দুই প্রহরীশিক্ষকের একজন সিগারেট হাতে বারান্দায়, দশাসই চেহারার অন্যজন প্রশ্নপত্র বিলি করে খবরের কাগজে তন্ময়। দশাসই পরিহাসের সুরে বললেন, পাচ মিনিটেই গলা শুকিয়ে গেল বাবা ?

রাজা ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শিক্ষক নিজের হাতেই জলের জগ আনলেন, বেশি খেয়ো না। এরপর তো আবার ঘন ঘন বাথরুমে যাবে।

কয়েক ঢোক গলায় ঢেলে হাতের আঁজলায় জল নিল রাজা। চোখেমুখে ছেটাল। ঘাড়ে গলায় বোলাল জলহাত। মাথা ঝিমঝিম তবু যায় না।

প্রথম দিন থেকেই রাজার পরীক্ষা একদম ভাল হচ্ছে না। বাংলা পরীক্ষায় বাঙালি বিজ্ঞানীর জীবনীই রচনায় এসেছিল, লেখার সময় তাঁর বাবা মার নাম পর্যন্ত ভুলে গেল রাজা। তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানও। শেষ পর্যন্ত ঘষে ঘষে অন্য রচনা লিখল। ছাত্রদের সামাজিক দায়িত্ব। কী যে লিখল রাজা নিজেই জানে না। অনুবাদ করতে গিয়ে সহজ ইংরিজির বাংলা প্রতিশব্দ মন থেকে নিখোঁজ। তাও ব্যাকরণের অংশ কণাদ আর সাগ্নিককে জিজ্ঞাসা করে লিখেছিল খানিকটা। কণাদ সাগ্নিকরাও যথেষ্ট সেয়ানা, সহজে মুখ খুলতে চায় না, তাদের বাড়িতেও একটা করে অনুরাধা আছে। মাঝখান থেকে বার বার কথা বলার অপরাধে শিক্ষকদের বকুনি খেল রাজা। অঙ্ক পরীক্ষার দিন তো তাকে উঠিয়ে অন্য স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে বসিয়ে দেওয়া হল। সহজ পরিমিতির অঙ্ক পারল না, অ্যালজেব্রায় পাঁচ নম্বর ভুল হল, জ্যামিতির এক্সট্রার চেনা ছবি কিছুতেই রাজা আঁকতে পারল না গুছিয়ে। সব মিলিয়ে অঙ্কে সত্তরও পাবে কি না সন্দেহ। ফিজিকাল সায়েন্স, লাইফ সায়েন্স মোটামুটি হয়েছিল, ইতিহাসের দিন আবার ব্রেন ফেল। মনকে বশে এনে সারারাত ইতিহাসের সাল তারিখ ঝালিয়েছিল, হলে এসেই সব স্মৃতি থেকে গায়েব। বিগড়ে যাওয়া মেজাজ জেদি হয়ে উঠেছে আজ। ভাল পরীক্ষা দিতে সে বদ্ধপরিকর, কিন্তু কিছুতেই কব্জা করতে পারছে না পেপারগুলোকে।

নতুন করে রাজা মনঃসংযোগ করতে চাইল। আবার গোড়া থেকে প্রশ্নপত্র পড়ছে। শান্ত মাথায়। ধীরে ধীরে। কালো অক্ষরের জট ছাড়ল একটু। এই তো চেনা প্রশ্ন ! হাউ দা ডেজার্ট থর ওয়াজ ফর্মড ইন রাজস্থান ? রাজা আঙুলে কলম চাপল। কীভাবে যেন তৈরি হয়েছিল থর মরুভূমি ? বহুবার মুখস্থ করা উত্তর উগরে দিতে চাইছে। বে অফ বেঙ্গল ব্রাঞ্চ অফ সাউথওয়েস্ট মনসুন ডাজ নট রিচ ... কয়েক লাইন লিখে রাজা খেই হারিয়ে ফেলল। আর কী পয়েন্ট আছে ? আরাবল্লী রেঞ্জের সঙ্গে কী একটা সম্পর্ক আছে না ? আর সিনধ্ নিয়েও কী যেন ? মনে পড়ছে...কিছুতেই মনে পড়ছে না। রাজার স্মৃতিকোষ এখন ঊষর মরুভূমি।

উত্তর অসমাপ্ত রেখে রাজা দ্বিতীয় প্রশ্ন ধরল। হোয়াট ইজ আ গ্লেসিয়ার ? ইশ্, শুরুটা পেলেই লিখে ফেলা যাবে।

রাজা নিচু গলায় ডাকল, এই অয়ন, গ্লেসিয়ারের ডেফিনেশানটা একবার বল তো।

দশাসই ঘরের অন্য প্রান্তে ছাত্রদের খাতায় সই করছেন। সেদিকে তাকিয়ে নিল অয়ন। ঈষৎ ঘাড় বেঁকাল, ওই তো লেখ না স্নো লাইনের ওপরে হেভি স্নো ডিপোজিট হলে স্নো আর ফার্ন গ্র্যাভিটেশানের টানে জমাট বেঁধে যায় ...

—ওভাবে না। এগজ্যাক্ট শুরুটা বল্।

—অ্যাই, একদম কথা বোলো না। ধূমপায়ী শিক্ষক বারান্দার জানলা দিয়ে হুঙ্কার ছুড়লেন, সোজা হয়ে বোসো। একদম গুজগুজ ফুশফুশ নয়।

অয়ন চমকে সিধে হয়েছে।

রাজা সেকেন্ডে ভুলে গেল অয়নের উত্তর। খাতায় ঘাড় ঝুঁকিয়ে গুনগুন করল, আরেকবার বল প্লিজ, না না ঘাড় ঘোরাতে হবে না।

অয়ন ভীষণ মনোযোগ দিয়ে লিখে চলেছে।

রাজা বলল, বল নারে। এই অয়ন ?

অয়ন বধির।

রাজা অসহায় মুখে খানিকক্ষণ ডটপেন চিবোল। মরুক গে যাক, যেটা মনে আছে লিখবে। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে চোখ রাখল। ডিফাইন অ্যাভালাঞ্চে, বার্গস্রুন্ড। মুখস্থ সংজ্ঞা সঠিক সময়ে রিফিলের মুখে এসেও আসছে না। পাহাড়ে বরফের ওপর ক্রমান্বয়ে বরফ জমতে থাকলে অথবা হঠাৎ গরমে চাঁই চাঁই তুষার গলতে শুরু করলে, টন টন পাথর বরফ গড়িয়ে আসে নীচে ! সেটাই তো অ্যাভালাঞ্চে ! আর বার্গস্রুন্ড হল গিয়ে পাহাড় আর বরফের মাঝের ফাটল !

যতটা সম্ভব সাজিয়ে গুছিয়ে উত্তর দুটো লিখল রাজা। আবার সব অন্ধকার। আফগানিস্তানের ভূপ্রকৃতি স্মরণে আসছে না। কলকাতা বন্দরের ক্রম অবনতির একটা কারণও মগজে নেই। আবহাওয়া জলবায়ুর পার্থক্যটুকু পর্যন্ত ভুলে হজম !

অ্যাভালাঞ্চে আর বার্গস্রুন্ডই বা কেন মনে থাকল ! বুকের ভেতর অনন্ত বরফ জমে আছে রাজার। পাহাড় আর বরফের মাঝে অতলস্পর্শী ফাটল নিরবচ্ছিন্ন ঘা মেরে চলছে মস্তিষ্কে।

বাবা জেল খাটছিল ! কোনও নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিল বাবা !

দেয়াব মা বলল, রক্তের ধারা ! রক্তের ধারা !

দেয়ার সঙ্গে কত দিন দেখা হয়নি রাজার !

দেয়া রাজাকে ঘৃণা করে ! বাজার প্রিয় বন্ধু রাজাকে ঘৃণা করে ! রাজার বাবার জন্য !

রাজার বাবা মাতাল ! রাজার বাবা ঘুষখোর ! রাজার বাবা দুশ্চরিত্র !

দেয়া কী করছে এখন ? মন দিয়ে ভূগোলের উত্তর লিখছে ? গ্লেসিয়ার ! মরুভূমি ! ফাটল ! গতিময় কলম থামিয়ে হঠাৎ হঠাৎ ঝাঁকিয়ে নিচ্ছে চুল !

কণাদ পিছন থেকে স্কেলের খোঁচা দিল, অ্যাই সৌভিক, চুপ করে বসে আছিস কেন ? লেখ।

ঢং করে ঘণ্টা বাজল। এক ঘণ্টা শেষ। এখনও পুরো দুটো পাতাও ভর্তি হয়নি রাজার। দেয়ার বাড়ি থেকে ফিরে অন্ধ রাগে রাজা উন্মত্ত ছিল সারারাত। রাগের তীব্রতা অনন্তকাল একই রকম থাকে না ; ক্রমশ তরল হয়ে ক্ষোভে পরিণত হয়। তারপরে আসে অভিমান। এক অন্তহীন অভিমান থকথকে মিউকাসের মতো হৃদয়ে ছেয়ে যায়। এবং অবশেষে এক দুঃখ, খরস্রোতা পাহাড়ি নদী হয়ে বুক চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়। তখন কি আর চোখের সামনে অক্ষরের অস্তিত্ব থাকে ? রাজা কত চেষ্টা করেছে পড়তে ! হয়নি। শূন্য সাদা পাতা খুলে বসে থাকা শুধু। মিনিটের পর মিনিট। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দিনের পর দিন। লাভের মধ্যে আগে যা পড়েছিল তাও কেউ মুছে নিল স্মৃতিকোষ থেকে। ব্লটিংপেপার দিয়ে।

রাজার বুক কাঁপিয়ে শ্বাস ছিটকে এল। হিমানী সম্প্রপাতের মতো। এত যন্ত্রণা তবু এই মুহূর্তে রাজার কেমন নিজেকে অপরাধী লাগছে ! বাবা ঘুষ খাক, মদ খাক, যা ইচ্ছে নোংরামি করুক, তার পিছনে কম টাকা তো খরচ করেনি লোকটা ! ফোঁটা ফোঁটা শক্তিক্ষয় করে তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছে মা ! এগুলো তো মিথ্যে নয় ! রাজা কি প্রতিদানে কিছুই দেবে না তাদের ?

না। হারবে না রাজা। আজ তাকে পারতেই হবে। যেমন করে হোক। আজ পরীক্ষায় এরকম অবস্থা হবে অনুমান করেই বেশ কয়েকটা নোটের পাতা ছিঁড়ে এনেছে সে। প্রশ্ন বেছে বেছে। ইতিহাসের দিনও এনেছিল, বার করতে সাহসে কুলোয়নি। এক হীনম্মন্যতাবোধ হাত চেপে ধরেছিল তার। আজ রাজা মরিয়া।

পকেটে হাত ঢোকানোর আগে রাজা চারদিক দেখে নিল ভাল করে। দুই প্রহরীশিক্ষক নিম্ন স্বরে গল্প করছেন, ধূমপায়ীর রসিকতায় হেসে উঠলেন দশাসই। ফার্স্ট বেঞ্চে উপবিষ্ট সাগ্নিক কাগজ নিল একটা। অংশুমান ছোট্ট করে আড়মোড়া ভাঙল। অন্য স্কুলের একটি ছেলে বাইরে থেকে ফিরে রুমালে মুখ মুছছে। রাজা কম্পিত হাতে নোটসের পাতা বাঁ হাঁটুতে রাখল। বুকপকেট থেকে

চুয়িংগাম বার করে চিবোল একটু, তারপর আঠালো চুয়িংগাম পাতাটার ওপর দিকে সেঁটে আটকে দিল হাইবেঞ্চের নীচে। নিখুঁত। বাঁ হাঁটু চেপে রেখেছে হাইবেঞ্চের সঙ্গে, ডান হাতে কলম চলছে রাজার। মিনিট দশেকের মধ্যে কলকাতা বন্দরের ক্রমাবনতি শেষ।

রাজা উঠে দাঁড়াল, একটু বাইরে যাব স্যার ?

—দাঁড়াও। দুজন গেছে, ওরা ফিরুক।

রাজা পলকে অসহিষ্ণু। সময় চলে যাচ্ছে। সময় চলে যাচ্ছে। মিনিট খানেকের মধ্যেই ফিরেছে একজন, রাজা আবার দাঁড়াল, স্যার, এবার যাই ?

ধূমপায়ীর আড্ডার তাল কেটে গেল যেন, বিরক্ত মুখে বললেন, এ তো মহা জ্বালাল দেখছি। যাও যাও।

রাজা গঙ্গাফড়িং-এর মতো উড়ে এল টয়লেটে। দ্রুত কাগজগুলোকে সাজিয়ে নিল পর পর। এই তো কত সহজ রাস্তা ! মিছিমিছিই উদ্বেগে ভুগছিল সে ! হাহ্। স্যাররা শুধু গল্প করুক। আলোর গতিতে সমস্ত উত্তর নেমে যাবে রাজার খাতায়।

চুয়িংগাম চিবোতে চিবোতে ফিরল রাজা। ধূমপায়ী টেরচা চোখে রাজাকে দেখে হাসলেন, কী হে, ফুটবল খেলছ নাকি ?

রাজা বোকা বোকা মুখ করল, কেন স্যার ?

—চুয়িংগাম চিবোচ্ছ তো। ভাবলাম দম ফম কমে গেছে। যাও, লেখো।

ঝটিকা গতিতে লিখছে রাজা। মূল খাতা শেষ। একটা লুজ শিট নিল। তৃতীয় গ্রুপের তিনটে প্রশ্ন হয়ে গেল। সময়ও তেজি ঘোড়ার মতো ছুটছে সঙ্গে। দ্বিতীয় ঘণ্টা ফুরিয়ে গেছে। দুটো দশ। দুটো কুড়ি। একদম শেষে ম্যাপ পয়েন্টিং করবে। তার আগে আরও তিনটে উত্তর লিখতেই হবে। লুজশিট নিল। সাঁই সাঁই এশিয়ার নদীগুলো সম্পর্কে বিবরণ টুকে ফেলছে। দুটো পঁয়ত্রিশ। এবার পর পর টীকা। অ্যান্টিপোডাল। ফেরেলস্ ল। আইসোথার্ম। আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতে এবার এসেছে রাজা। দুটো পঞ্চাশ। রাজা দিশেহারা। এখনও ম্যাপ পয়েন্টিং ধরা হয়নি। হঠাৎই কাঁধে প্রকাণ্ড এক থাবা। দশাসই কখন চিতাবাঘের পায়ে নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। রাজা চমকে তাকাতেই এক টানে ছিনিয়ে নিয়েছেন পাতা। তীক্ষ্ণ বল্লমের মতো কণ্ঠস্বর, এগুলো কী ?

রাজা ইলেক্ট্রিক শক খেয়েছে। নিমেষে সমস্ত স্নায়ু বিকল। দশাসই বুঝি হৃৎপিণ্ড খামচে ধরেছে তার।

—বাহ্ বাহ্ ! চুয়িংগাম দিয়ে পাতা আটকে টোকা ! এই বয়সেই বেশ ওস্তাদ হয়েছ তো !

রাজা নিস্তেজ। কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট কাঁপছে, সরি স্যার। আর হবে না।

দশাসই গলা ওঠালেন, দেখুন রমেনবাবু, দেখে যান। একেবারে প্রফেশনাল ক্রিমিনাল !

রাজার বন্ধুরা হাঁ করে দেখছে রাজাকে, রাজা মিনমিন করে তর্ক জুড়ল, এ সব কথা বলছেন কেন স্যার ? কে ক্রিমিনাল ?

দশাসই হাইবেঞ্চ থেকে রাজার উত্তরপত্র তুলে নিলেন, যাও। বাড়ি যাও। মা বাবার অনেক আশা পূর্ণ করেছ, এবার ভালয় ভালয় বিদেয় হও।

রাজার ঘাড় আচমকাই ট্যারা, খাতা নেবেন না স্যার। খাতা দিয়ে দিন।

—একটা কথা নয়। মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাও। চুরি করে আবার গলা বাজানো হচ্ছে !

রাজা চকিতে বুনো ভেড়া। লাফিয়ে উঠে টান মেরেছে খাতায়।

ধূমপায়ী ছুটে এসেছেন সামনে, এ তো সাংঘাতিক ছেলে ! কী সব ফ্যামিলি থেকে আসে এরা ! বাড়িতে বাবা মা এই শিক্ষা দেয় !

রাজা ভাঙা ভাঙা গলায় গর্জে উঠল, মুখ সামলে কথা বলবেন। আপনি বাবা মা তুলে কথা বলছেন কেন ?

দশাসই ঘাড় ধরে সিট থেকে বার করেছে রাজাকে, খুব রোয়াব অ্যাঁ ? মস্তানি দেখানো হচ্ছে ? এই বয়সেই কী ফেরোশাস ! চোখের দিকে তাকান, যেন দৃষ্টি দিয়ে খুন করে ফেলবে !

দুই শিক্ষকের হ্যাঁচকা টানে রাজা পৌঁছে গেছে দরজায়। সাগ্নিক কণাদ অয়নরা লেখা থামিয়ে দিয়েছে।

রাজা ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল। তার হিতাহিতজ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত, বিকৃত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, আপনার এত বড় সাহস আপনি আমার খাতা ছিনিয়ে নিলেন! আমার বাপ মা তুলে গালাগাল! আমি আপনাকে ছাড়ব না। আপনি স্কুল থেকে বেরোন একবার, দেখব কে আপনাকে বাঁচায়।

রাজার উন্মত্ত ভঙ্গি দেখে দুই শিক্ষকই স্তম্ভিত। দশাসই কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে সামলালেন নিজেকে, রমেনবাবু, এক্ষুনি ফাইনাল বেল পড়বে। আপনি খাতাগুলো কালেক্ট করুন। আমি এই ছোকরাকে দেখছি। ওর খাতাটা আমার হাতে দিন।

ধুমপায়ী বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে যান। এরা সব হচ্ছে পোটেনশিয়াল সোশাল ডেঞ্জার। এদের অঙ্কুরেই নির্মূল করা দরকার। বেশি ঝামেলা করলে পুলিশে হ্যান্ডওভার করে দিন।

রাজার হাত মুচড়ে ধরেছেন দশাসই। প্রাণপণ চেষ্টাতেও রাজা নিজেকে ছাড়াতে পারল না। অক্ষম ক্রোধে আরও অশ্রাব্য ভাষা বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে।

চিৎকার চেঁচামেচি শুনে হেডস্যার নিজেই ছুটে আসছিলেন এদিকে। সঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্রের আরও দু-একজন লোক। বোর্ডের প্রতিনিধিও। রাজার হিস্টিরিক আচরণ দেখে তাঁদেরও চোখ কপালে।

রাজা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হেডমাস্টারের দেরি হল না। পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রধান হিসেবে রাজার বিরুদ্ধে লিখিত রিপোর্ট জমা দিলেন বোর্ডের প্রতিনিধির হাতে। রাজাকে পুলিশের হাতে দিলেন না বটে, তবে ছাড়লেনও না। নিজের ঘরে আটকে রাখলেন। এ বছরের মতো রাজার পরীক্ষার ইতি।

অয়ন সাগ্নিকদের মুখে খবর পেয়ে অনুরাধা যখন ছুটে এসেছে প্রধানশিক্ষকের ঘরে, তখন রাজার গর্জন থেমে গেছে। এককোণে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার মুখমণ্ডল টকটকে লাল, সেখানে কোনও কোমল মায়ার চিহ্নমাত্র নেই। থেকে থেকে বিশাল বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছে, পরক্ষণে আগুনের হলকার মতো নাকমুখ থেকে বেরিয়ে আসছে ফুসফুসের বাতাস। দরদর করে ঘামছে রাজা।

অনুরাধার মুখে বাক্য সরছিল না। ছেলেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাপের বাড়ি জিরোতে যাচ্ছে কদিন। পরীক্ষা শেষের পর রাজাকে নিতে এসে তার আজ মূর্ছা যাওয়ার দশা। এমন দৃশ্য গভীর দুঃস্বপ্নেও অনুরাধা কল্পনা করতে পারেনি কখনও।

দরজায় রাজার অনেক সহপাঠী দাঁড়িয়ে, বেশ কয়েক জন অভিভাবকও উঁকি দিচ্ছে ঘরটায়। প্রধানশিক্ষক অনুরাধাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি মা?

মা শব্দটা এত ব্যঞ্জনাহীন! শুধুই যেন এক সম্পর্কবাচক ধ্বনি।

অনুরাধা কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়ল।

—আমি খুব দুঃখিত আপনার ছেলেকে আর এ করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না।

অনুরাধা আবারও মাথা নাড়ল শুধু। কেন নাড়ল নিজেও জানে না। পরে বহু বার মনে হয়েছে ওই সময় তার আর্তনাদ করা উচিত ছিল। বুক চাপড়ে কান্নায় ফেটে পড়া উচিত ছিল। সেটাই হত তার স্বপ্নভঙ্গের প্রকৃত অভিব্যক্তি। কিন্তু সে সব সে কিছুই করল না, এক অদ্ভুত আচ্ছন্নতার ভেতর হেঁটে গিয়ে হাত ধরল ছেলের।

প্রধানশিক্ষক বললেন, শুধু টোকাটুকি করলে আমরা খাতা কেড়ে ছেড়ে দিই। কিন্তু ও যা আচরণ করেছে ...! আমার খুব ভয় লাগছে ম্যাডাম। বি কেয়ারফুল অফ ইওর সান। কী করে যে এতটুকু বয়সে এরকম ...! এত হিংস্র ...! আই অ্যাম কমপেলড টু সে, এ আপনাদেরই শিক্ষার দোষ।

একরাশ কৌতূহলী চোখ ভেদ করে অনুরাধা ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে এল। গোটা পথ মা ছেলেতে একটা কথাও হয়নি। বাড়ি ফিরে অনুরাধা ফেটে পড়ল। কান্নায় নয়, ক্রোধে। অপমানে। সপাটে চড় কষাল ছেলের গালে, এত বখে গিয়েছিস তুই! আমাদের মান ইজ্জত সব এভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দিলি! তোর মনে এই ছিল!

রাজা এক নিস্পন্দ আগ্নেয়গিরি।

অনুরাধা ছেলেকে ধাক্কা দিল, মরে যা তুই। তোর মুখ দেখতে চাই না আমি, মরে যা।

প্রতিভা হাঁ হাঁ করে ঘর থেকে ছুটে এসেছেন, হল কী অনু ? ওরকম করছ কেন ? রাজা কি পরীক্ষা খারাপ দিয়েছে আজ ?

—জিজ্ঞেস করুন নাতিকে কী করেছে। অনুরাধা ছেলের শার্ট ধরে ঝাঁকাল, বল্। বল্। নিজের কীর্তির কথা বল্। কী হল ? কথা ফুটছে না মুখে ?

রাজা তবু নির্বাক। শুধু নাকের পাটা ফুলছে তার।

অনুরাধা প্রায় ডুকরে উঠল, ও যা করেছে, আর কোনওদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব আমরা ? আপনার ছেলে কোথাও মুখ দেখাতে পারবে ? আমি কোথাও মুখ দেখাতে পারব ? রাজার ওপর বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল অনুরাধা, এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছিস তুই ? দূর হয়ে যা সামনে থেকে। দূর হ। এই ছেলেকে পেটে ধরেছিলাম আমি ?

রাজার ধৈর্যের বাঁধ এতক্ষণে ভেঙেছে। ঠেলে সরিয়ে দিল অনুরাধাকে। গলা ঘড়ঘড় করছে, লজ্জা করে না আমাকে গালাগাল করতে ? আমার জন্য তোমরা মুখ দেখাতে পারবে না ? নাকি তোমাদের জন্য আমি মুখ দেখাতে পারি না ?

অনুরাধা আবার ঠাস করে চড় মারল, ফের মুখে মুখে কথা ? দোষ করে কোথায় মাথা নিচু করে থাকবি... ?

প্রচণ্ড উত্তাপে বিস্ফোরিত হল আগ্নেয়গিরি। বয়ঃসন্ধির ভাঙা গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আমাকে দেখার আগে আয়নায় নিজেদের মুখ দ্যাখো।

অনুরাধা আবারও হাত তুলেছিল, রাজা মুচড়ে ধরেছে তার হাত, খবরদার বলছি আমার গায়ে হাত তুলবে না। তোমরা নিজেরা কী ? বাবা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঘুষ খাচ্ছে, তুমি যত্ন করে সেই টাকা আলমারিতে গুছিয়ে রাখছ ! ভাবছ আমি কিছু বুঝি না, অ্যাঁ ? দুধের খোকা ? বাবা কোথায় থাকে, কী করে বেড়ায়, সবই তো জান তুমি ! তারপরেও ছেলের গায়ে হাত তোলার স্পর্ধা হয় তোমার ?

অনুরাধার দু চোখ বিস্ফারিত। এই রাজাকে সে দেখেনি কোনওদিন। কোনওরকমে অস্ফুটে বলল, কী বলতে চাস তুই ?

—ন্যাকা সেজো না। তুমিও কম লোভী নও। বাবা যে একটা মুখোশ পরা নোংরা লোক, তুমিও জানো। তুমিই বাবাকে মদত দিয়েছ। তুমিই লোভে লোভে নোংরা রাস্তায় ঠেলেছ। অনুরাধার একদম কাছে এগিয়ে গেল রাজা, —বাবা যে অফিসের নাম করে দুদিন জেল খেটে এল, বলো সে কথাও তুমি জান না ? কোথায় কোন মেয়েমানুষের কেসে ফেঁসেছিল, ...সবই তো জানো। জেনেশুনেও বাবার টাকা হাত পেতে নিতে তোমার কি কখনও হাত কেঁপেছে ? তা হলে আমারই বা টুকতে গিয়ে হাত কাঁপবে কেন ? ধরা পড়ে জুজুর ভয়ে কাঁপবই বা কোন দুঃখে ? অবিরাম লাভা উদ্গিরণ করে চলেছে রাজা। তরল লাভার স্রোত গলিয়ে দিচ্ছে কানের পর্দা। এখনও কেন অনুরাধা বধির হল না ?

প্রতিভা রাজাকে জড়িয়ে ধরলেন। দু চোখ বেয়ে অসাড়ে অশ্রু নেমেছে তাঁর, শান্ত হ বাবা। বাবা মাকে কষ্ট দিতে নেই। তুই ছাড়া ওদের আর কে আছে বল ?

রাজা হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল, আমার কেউ নেই। আমি কাউকে চাই না। আই হেট দেম। আই হেট বোথ অফ দেম।

চৈত্রদিনের সূর্য ক্ষয়ে আসছে ক্রমশ। পশ্চিমের জানলায় মরা হলুদ আলো। পাখিরা ফিরছে।

পাশের জুডো ক্লাব থেকে মহড়ার নিনাদ ভেসে এল। এক তালে হুঙ্কার তুলছে নবীন প্রজন্ম। হু হা। হুহ্ হা। হুহ্ হা।

রাজা বিবেকানন্দর ছবি আছড়ে আছড়ে ভাঙছিল।

চন্দনের অস্বস্তি হচ্ছিল। সাত্যকির ঘর ভর্তি লোক, সকলেই গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। ঘরময় ছড়ানো অসংখ্য চায়ের ভাঁড়। একজন একটা ইলেকটোরাল রোল ধরে পর পর নাম পড়ে চলেছে, দু-তিনটে ছেলে ছোট ছোট স্লিপে লিখে নিচ্ছে সেই নাম আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক। চন্দন কি ভুল সময়ে এল ?

চন্দন আমতা আমতা করে বলল, তোমার তো অনেক দেরি হবে। আমি একটা জরুরি কাজে... । তুমি সেরে নাও, আমি ওয়েট করছি।

চন্দনের চোখেমুখে রাত্রি জাগরণের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। চুল উশকো খুশকো, গালে একদিনের না কামানো দাড়ি, পোশাক আশাকও তেমন সুবিন্যস্ত নয়। দেখলেই বোঝা যায় আজ সারাদিন চরকি মেরেছে সে, নাওয়া-খাওয়ার সময় পর্যন্ত পায়নি।

সাত্যকি চন্দনকে দেখে অবাক, তবে তার মুখচোখ সেভাবে লক্ষ করেনি। প্রায় স্বাভাবিক গলায় বলল, আর বলবেন না, সামনের রোববার ইলেকশান, লাস্ট মিনিটের কাজকর্ম চলছে।

—ঠিক আছে, আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি বসছি।

—পাঁচ মিনিট প্লিজ। পোলিং এজেন্টদের নামের লিস্ট এসেছে, একবার চোখ বুলিয়ে নিই। আপনি ভেতরে গিয়ে বসুন না। বাবা পরশু ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরেছে, বাবার সঙ্গে...সাত্যকি একটু হোঁচট খেল, আপনি অবশ্য এখানেও বসতে পারেন। এমন কিছু সিক্রেট কাজ হচ্ছে না।

বুকের ভেতর উথাল পাথাল ঢেউ, তাও চন্দন সেকেন্ডের জন্য বিরক্ত। লাজু ঘর ছেড়ে চলে গেছে, সাত্যকির কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। একবার শুধু লাজুর বাপের বাড়িতে খবর দিয়েই ঝাড়া হাতপা ! দিব্যি একপাল চেলা জুটিয়ে রাজনীতির ছক কাটতে বসেছে, এত উদাসীন !

চন্দন বসেও উঠে দাঁড়াল, তুমি কাজ সারো, আমি ভেতরেই যাচ্ছি।

ইন্দুভূষণ খাটে বসে পেশেন্স খেলছিলেন, চন্দনকে দেখে বললেন, ভালই হল তুমি এসে গেছ। আমিই তোমাদের বাড়ি যাব ভাবছিলাম। বেয়ানের এখন শরীর কেমন ?

—বেটার। চন্দন কথার পিঠে কথা জুড়ল, —আপনার ব্যাঙ্গালোর কেমন লাগল ?

—ভাল। বেশ ভাল। শহরটা সুন্দর। পরিচ্ছন্ন। ছিমছাম।

—খুব বেড়ালেন ?

—আর বেড়ানো ! ইন্দুভূষণ দুম করে প্রসঙ্গ বদলালেন, কদিনের জন্য গেছি, তার মধ্যে সব তছনছ হয়ে গেল ! কেন এরকম হল বলো তো চন্দন ?

কখন কোথায় কীভাবে যে সংসার তছনছ হয়ে যায় !

বর্ষশেষের অভিশপ্ত রাতে শীলা সেনের ফ্ল্যাটে মৌজ করে মাছভাজা চাখছিল চন্দন। তখন কি সে একবারও ভেবেছিল কত দূর গড়াতে পারে ঘটনাটা ! সব চাপা পড়ে যাওয়ার পরও !

নাকি চাপা পড়েনি। ভেতরে ভেতরে তুষের আগুনের মতো জ্বলছিল রাতটা ! চন্দন দেখতে পায়নি, বুঝতে পারেনি, হঠাৎই জ্বলে উঠল জতুগৃহ !

নিচু গলায় চন্দন বলল, আপনি বয়ঃবৃদ্ধ মানুষ, আপনাকে আর কী বলব। দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক, বুঝদার। তারা যদি একসঙ্গে থাকতে না চায়...

—সেটাই তো আমার প্রশ্ন। কেন তারা থাকতে চায় না ? ইন্দুভূষণ দুহাতে তাসগুলোকে জড়ো করলেন, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বোসো।

ছোট ঘর জুড়ে সাবেকি আমলের বিশাল খাট। কাঠের আলমারি, আলনা, তিন আরশিঅলা নীলিমার ঢাউস ড্রেসিংটেবিল অনেকটাই জুড়ে আছে ঘরের, হাঁটা চলার জায়গা খুব কম।

চন্দন উঁচু খাটের এক ধারে বসল। ইন্দুভূষণ প্যাকেটে ভরে তাস সরিয়ে রাখলেন, —তুমি তো নিশ্চয়ই অফিস থেকে ফিরছ ? খাবে কিছু ? চা টা ?

—না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

—বউমা নেই, পঙ্কজ নেই, তুমি বুঝি ভাবছ আমার অসুবিধে হবে ? চিন্তা কোরো না, নতুন

কাজের লোক আছে। বৃদ্ধের গলা অভিমানে থরথর, বউমা আমাকেও তো একটা চিঠি লিখতে পারত। হ্যাঁ, আমি বোকাসোকা মানুষ, সংসারের মারপ্যাঁচ বুঝি না, আজীবন দশটা-পাঁচটা অফিস করে গেছি, একটু আধটু তাস দাবা খেলেছি, বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা মেরেছি, বাজারহাট করা ছাড়া সংসারের কোনও ঝঞ্ঝাটেই ঢুকিনি কোনওদিন। সবই ঠিক। গিন্নি এই নিয়ে কত চোটপাট করেছে, দুঃখ করেছে, তবু নিজেকে বদলাতে পারিনি। কিন্তু বাবা, যতই সরে সরে থাকি, আমি কি আমার ছেলেকে চিনি না ? নাকি আমার বউমাকে চিনি না ?

একসঙ্গে থাকলেই কি চেনা যায় ! রাজাকে কতটুকু চিনেছিল চন্দন ? তার বিশ্বাস ছিল ঝকঝকে ইস্পাতের মতো গড়ে উঠছে রাজা। মরচেহীন। কলঙ্কহীন।

ইন্দুভূষণ সোজাসুজি চন্দনের দিকে তাকালেন, তুমিই বলো সাত্যকি আমার ছেলে খারাপ ? নেশাভাঙ করে না, বদ দোষ নেই, রোজগারপাতি ভাল, সংসারের ওপর টান আছে। বড়দের ভক্তিশ্রদ্ধা করে। উঁচু গলায় কারুর সঙ্গে কথা বলে না। আজকালকার দিনে এমন ছেলে তুমি কটা পাবে ? আবার বউমাও আমার ধীর-স্থির, বুদ্ধিমতী। সংসারের লক্ষ্মী হয়ে মাথায় করে রেখেছিল সংসারটাকে, আমাকে কোনওদিন চা পর্যন্ত চেয়ে খেতে হয়নি। অত যে খুঁতখুতে শাশুড়ি সেও মৃত্যু পর্যন্ত বউমা বলতে অজ্ঞান ছিল। ওরকম মেয়েই বা কটা আছে দুনিয়ায় ? তা হলে কেন দুটো ভাল মানুষ জোড় বেঁধে থাকতে পারবে না ?

ভাল মন্দের সংজ্ঞা এত সরল ! তা হলে চন্দন কী ? সে তার বউকে ভালবাসে, ছেলেকে ভালবাসে, মাকে ভালবাসে, বোনকে ভালবাসে, সংসারের প্রতি তারও টান কম নয়, কর্তব্যে ত্রুটি করে না, বরং বেশি কর্তব্যপরায়ণ। ভাতের বদলে সে বিরিয়ানির সুখ কিনে দিতে চেয়েছে। সব্বাইকেই। অথচ সে আজ ছেলের চোখে নর্দমার পোকা। আর অনুরাধার চোখে শুধুই এক ইন্দ্রিয়সর্বস্ব ক্রিমি কীট।

কাল রাতে অনুরাধার চোখে কী নিষ্ঠুর জল্লাদের দৃষ্টি দেখেছে চন্দন ! ঘাড় নিচু করে চন্দন আত্মসমর্পণ করেছে, হাঁটু গেড়ে মার্জনা ভিক্ষা করেছে, তবু চন্দনের সমস্ত পাপের অংশীদার একটি মাত্র গোপন অপরাধের জন্য ক্ষমাহীন।

চন্দন তেতো মুখে হাসল, লাজু বলে ওদের আদর্শ মিলছে না। তাই ওরা একসঙ্গে থাকবে না।

আদর্শ শব্দটাকে বিড়বিড় করে বার কয়েক উচ্চারণ করলেন ইন্দুভূষণ, আদর্শ না মেলার জন্য কেউ স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যায় ! স্বামী যা করবে, স্ত্রী তার সঙ্গিনী হবে, তাকে উৎসাহ দেবে, সেটাই তো মেয়েদের আদর্শ !

চন্দনের রক্তস্রোত দ্রুত হল। সেও তো তাই জানে। অনুরাধাও। তবে কেন রাজার এই পরিণতি ?

সাত্যকি ঘরে ঢুকেছে। সরি চন্দনদা, লেট হয়ে গেল।

চন্দন আড়চোখে ইন্দুভূষণকে দেখল, তোমার বাইরের ঘরের সবাই চলে গেছে ?

—হ্যাঁ। চলুন ও ঘরে গিয়ে বসা যাক।

বাইরের ঘরে এসে চন্দন সিগারেট ধরাল। সাত্যকির সঙ্গে কীভাবে কথা শুরু করবে ভেবে পাচ্ছে না। কতটুকু বলবে কতটুকুই বা গোপন রাখবে ?

সাত্যকিই কথা শুরু করেছে, আপনার সঙ্গে আমার আগেই যোগাযোগ করা উচিত ছিল। বিলিভ মি, একদম সময় পাচ্ছি না।

চন্দন সাত্যকিকে সিগারেট এগিয়ে দিল। সাত্যকি সঙ্গে সঙ্গে চন্দনের হাত চেপে ধরেছে, আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে চন্দনদা। আমি কথাটা লাজুকে বলতে চাইনি, রাগের মাথায় মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। আপনি আমার ওপর খুউব রেগে আছেন, না ?

সত্যিই সাত্যকির কাছে আসায় অনীহা ছিল চন্দনের। তবু কেন যে চরম উৎকণ্ঠার মুহূর্তে সাত্যকিরই দ্বারস্থ হল ! এ যেন বিধি নির্ধারিত প্রথা।

চন্দনদের জন্য সাত্যকি ! সাত্যকিদের জন্য চন্দন !

চন্দন সাত্যকির কাঁধে চাপ দিল, ছাড়ো। বাদ দাও। আমি তোমার কাছে অন্য কাজে এসেছি।

—না চন্দনদা, বাদ দেওয়া যায় না। সাত্যকি সিগারেট ধরিয়ে ফোঁস করে শ্বাস ফেলল। ধরা-ধরা গলায় বলল, আমি একটা স্কাউনড্রেল। লাজুর সঙ্গে আমি যে ব্যবহারটা করেছি... আমি জানি লাজু আমাকে কখনই ক্ষমা করবে না।

অন্য সময় হলে চন্দন হয়তো দুর্বল হয়ে পড়ত, আজ সাত্যকির আবেগ ছুঁল না চন্দনকে। পলকা স্তোকবাক্য শোনাল তবু, একটু সময় যেতে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—হুঁহ্। সময়! জানেন লাজু আমার সঙ্গে মিউচুয়াল সেপারেশন চায়? এর মধ্যেই!

—লাজুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

—দুদিন ওর বন্ধু কৃষ্ণার বাড়ি গেছি। হাতে পায়ে ধরে বুঝিয়েছি। এক গোঁ, তুমি নোংরা পলিটিক্স ছেড়ে দাও, ব্যবসাপাতি ছেড়ে দাও, আমরা আবার আগের জীবনে ফিরে যাব। আপনিই বলুন, এ কি আর হয়?

নিজের কথা বলার জন্য ছটফট করছে চন্দন, তবু আনমনে বলে ফেলল, হয় না, না?

—সত্যিই হয় না। যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি, সেখানে আবার কেন ফিরব? কাল একটা আদর্শ সত্যি মনে হত, তার পেছনে তাই ছুটেছি। আজ দেখছি সেটা ধ্রুব সত্য নয়, ওই আদর্শের মধ্যেও বহু গলদ আছে। আমি কেন মুখ্খর মতো ফাঁপা আদর্শ আঁকড়ে ধরে বসে থাকব? পার্টি আমি আজ হোক কাল হোক ছেড়েই দেব। কিছু কিছু করে টাকা দিয়ে যাব, ব্যাস। যে কানেকশানগুলো ওই আদর্শের জন্যই আমি পেয়েছি, সেগুলোকে কেন ছাড়ব! এত দেশবিদেশের ইনভেস্টমেন্ট হবে, কিছুই আমাদের ভাগ্যে জুটবে না! সাত্যকি সামান্য দম নিল, ইলেকশানের পর আমি আর কাজল আরেকটা বিজনেস শুরু করছি। ফরেন কোলাবরেশনে। সাউথ চব্বিশ পরগনায় আমাদের পার্টির লোকজন কিছু ভেড়ি কনট্রোল করে, আমরা কয়েকটা ভেড়ি লিজ নেওয়ার বন্দোবস্ত করেছি। প্রন কালচার করব। প্রন এক্সপোর্ট করব। কোটি টাকার ব্যবসা। এ সব ছেড়ে দেব আমি? আপনার বোনটা এত বোকা কেন চন্দনদা?

—যা ভাল বোঝ করো। সাত্যকির বকবকানিতে মাথা ধরে যাচ্ছে চন্দনের, তুমি আমার দরকারটা শুনবে?

সাত্যকি থমকাল।

—আমার একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই। তোমার বোর্ড অফিসে কোনও জানাশুনো আছে?

—কোন বোর্ড?

—মাধ্যমিকের বোর্ড। বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশান। কী আর বলব তোমাকে! চন্দন ঢোক গিলল, রাজাকে পরীক্ষার হল থেকে এক্সপেল করে দিয়েছে।

—কেন? কবে? যাহ! আপনি কী বলছেন চন্দনদা! কী করেছিল রাজা?

রাজা-অনুরাধার বিকারগ্রস্ত রূপটা এড়িয়ে গেল চন্দন, শুধু ঘটনার রক্তমাংসহীন কাঠামোটা বলল সাত্যকিকে।

সাত্যকি মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ, একটা সিগারেট নিভিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল, আপনি নিজে একবার এগজামিনেশান সেন্টারে গিয়েছিলেন?

—আজ গেছিলাম। সেখান থেকেই সোজা আসছি। ওরা বলল এক্সপেলড ছাত্রের খাতা আলাদা প্যাকেটে সিলড হয়ে বোর্ড অফিসে চলে গেছে। ওদের রিপোর্ট সুদ্ধ। এখন নাকি ওদের আর কিছু করার নেই। করতে পারলে একমাত্র বোর্ডের অফিস থেকেই...

সাত্যকি দু-এক পল ভাবল, তারপর বলল, —ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, আমার বোর্ডের অফিসে কোনও জানাশোনা নেই। তবে হ্যাঁ, আমাদের পার্টির একটা নেটওয়ার্ক আছে, সুবলদা আছেন এডুকেশান সেলে, আমি একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি। কী করতে হবে ভাল করে বুঝিয়ে বলুন তো।

পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রধান চন্দনকে কোনও আশা দেননি। তিনি বলেছেন, রেজাল্ট বেরোনোর সময় রাজার রোলের পাশে আর এ লেখা থাকবে। বোর্ড অফিসে যেতে হবে রাজাকে। যদি রাজার উত্তরে তাঁরা সন্তুষ্ট হন, তা হলে শুধু এ বছরটাই নষ্ট হবে রাজার, তেমন কিছু ঘটলে আরও দু-এক বছর নষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়। যে শিক্ষক রাজাকে পরীক্ষাহলে ধরেছিলেন তাঁর সঙ্গেও কথা হয়েছে

চন্দনের। চন্দনের কাতর দশা দেখে তিনিও ব্যথিত, তিনিই চন্দনকে বোর্ড অফিসে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে তেমন তেমন লোককে ধরতে পারলে কত কিছুই ওলোটপালট হয়ে যায় আজকাল, এ তো সামান্য একটা এক্সপালশান !

চন্দন দ্বিধা কাটিয়ে স্পষ্ট করে বলল, ভেতর থেকে স্কুলের রিপোর্টটা হাওয়া করে দিতে হবে। বুঝতেই পারছ, রাজার শুধু একটা বছর নষ্টই না, সারাজীবনের মতো ব্ল্যাক স্পট !...

—ঠিক আছে দেখি।

—দেখি নয়, আই ওয়ান্ট ইট টু বি ডান। প্লিইজ। যেভাবে হোক, যত টাকা লাগুক, তুমি রাজার কেসটা ক্লিয়ার করে দাও।

—টাকাপয়সার ব্যাপার নয়। আগে সুবলদাকে বলি, তিনি কী বলেন শুনি.. লাখ লাখ ছেলের ভিড় থেকে একটা খাতা খুঁজে বার করে ম্যানেজ করা... সব কিছু কি টাকা দিয়ে হয় !

—আলবাত হয়। আমার অফিসে যারা চোর ধরার জন্য বসে রয়েছে তারা টাকা খেয়ে এনকোয়ারি রিপোর্ট উলটে দিচ্ছে, আর এটা তো লাখ লাখ ছেলের ভিড় থেকে একটা সিঙ্গল কেস !

চন্দন নতুন করে উত্তেজিত বোধ করছিল। একটা লিঙ্ক যখন পাওয়া গেছে, তখন কেসটা ঠিক বার করে আনতে পারবে সাত্যকি।

হঠাৎ দমকা হাওয়া উঠেছে বাইরে। চৈত্রের ধুলোর ঝড়। একটা ধুলোর কুণ্ডলী পাক খেতে খেতে ছুটে এল ঘরে। সঙ্গে দুটো শুকনো পাতা।

সাত্যকি দৌড়ে জানলা বন্ধ করল। তার আগেই দু জোড়া চোখ ঢুকে পড়েছে ঘরের বাতাসে। ভাসছে। দুলছে। কিন্তু নিষ্পলক। ওই দৃষ্টিতে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নেই।

চন্দনের গা ছমছম।

ওই দৃষ্টি চন্দন মুছে দেবেই। তার জন্য সর্বস্ব খুইয়ে তাকে যদি রাস্তার ভিখিরিও হয়ে যেতে হয়, তাও প্রস্তুত সে। মানুষ সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু প্রিয়জনদের ঘৃণা নিয়ে বাঁচা যে কী দুঃসহ !

রাজাকে উদ্ধার করলেই একমাত্র দায়মুক্ত হতে পারে চন্দন। একটা অসতর্ক পাপের গ্লানি থেকেও মুক্তি। পাপ, নাকি ভুল ? ভুলের প্রায়শ্চিত্ত !

চন্দন সাত্যকির হাত চেপে ধরল, আমাকে তুমি আর একটাবার বাঁচাও ভাই। আমি কথা দিচ্ছি লাজুকে তোমায় ফিরিয়ে দেবই। ওয়ার্ড অফ অনার।

—সম্পর্ক নিয়ে কি বারগেন চলে চন্দনদা ? সাত্যকি তার আবেগহীন চেহারায় ফিরে এসেছে। নিরাসক্ত গলায় বলল, আমি লাজুকে ভালবাসি চন্দনদা। এই ভালবাসাটাই আমার জীবনের একমাত্র সত্যি। আমি এও জানি, লাজুও আমাকে ভালবাসে।

—তা হলে তো ঝামেলা মিটেই গেল।

—উঁহু। সমস্যা তো অন্য জায়গায়। আমাদের মাঝখানে ঘষা কাচের পর্দা উঠে গেছে। একদিকে আমার অ্যাম্বিশান, অন্যদিকে লাজুর আদর্শ। এখন দেখতে হবে কে ঠিক ! আমি মনে করি আমি ঠিক, লাজু মনে করে লাজু। আমাদের মধ্যে যদি কেউ বুঝতে পারে সে ভুল, সে অন্যের কাছে ফিরে যাবে। আর আমরা যদি দুজনেই ঠিক হই, তা হলে আমাদের রাস্তা আলাদা থাকাই ভাল। অ্যাম আই ক্লিয়ার ?

চন্দন চুপ। এই মুহূর্তে সাত্যকিকে ঠিক বুঝতে পারছে না সে।

সাত্যকি আরেকটা সিগারেট ধরাল, চন্দনদা, আপনার রুদ্রকে মনে আছে ?

—কে রুদ্র ?

—রুদ্র দাশগুপ্ত। স্যারের সবথেকে প্রিয় ছাত্র !

—ও এখন এম পির দিকে কোথাও থাকে না ? লাজুর সঙ্গে খুব খাতির ছিল। চন্দনের চোখ ছোট হল, রুদ্রকে নিয়েই কি তোমাদের গণ্ডগোল ?

—আপনি যেরকম ভাবছেন, সেরকম নয়। সাত্যকি বিষণ্ণ হাসল, রুদ্র সর্বস্ব ত্যাগ করে লেবারদের নিয়ে পড়ে আছে। ওনলি ফর আইডিয়ালস। আপনার বোনের প্রবলেম হল ও আমাকেও চায়, আবার আমার মধ্যে রুদ্রকেও চায়। কিন্তু আমি তো আমিই, আমি কী করে একসঙ্গে

দুটো মানুষ হব ? তা ছাড়া সাত্যকি রুদ্র দুটো একসঙ্গে হওয়াও যায় না। সাত্যকির মধ্যে রুদ্র ঢুকে পড়লে বড় যন্ত্রণা হয় চন্দনদা।

চন্দনের মধ্যে অদ্রিনাথের ছেলে ঢুকে পড়লে চন্দনেরও যে কষ্ট ! এই কষ্ট থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় নিজেকে শুধুই চন্দন করে রাখা। গড্ডলিকার ভেড়া হয়ে।

সাত্যকি আত্মগতভাবে বলল, আমি যে চাকরির কথা বললাম, লাজু সে চাকরি নিল না। ভাল কথা। নিজে চাকরি জোগাড় করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে ! আরও ভাল।

চন্দন বিড়বিড় করে বলল, তোমরা যেভাবে থেকে শান্তি পাও, সুখী হও...

—সুখশান্তির কথা বলবেন না চন্দনদা। সাত্যকি অকস্মাৎ উত্তেজিত, ওই শব্দ দুটো মানুষের জন্য নয়, বোধবুদ্ধিহীন পশুদের জন্য। সুখ মানে হল থেমে যাওয়া। শান্তি মানে হল জড়তা। ও সব কি মানুষকে মানায় ?

চন্দন সাত্যকিকে দেখে ভয় পাচ্ছিল। তোতলা গলায় বলল, তুমি.... তুমি... তুমি রাজার জন্য চেষ্টা করবে তো ভাই ?

—করব। অবশ্যই করব। আমি লাজুকে দেখিয়ে দেব ক্ষমতা মানুষের উপকারে লাগে কি না। সাত্যকি নিশ্বাস চাপল। লাজু সত্যিই বোকা।

চন্দন মনশ্চক্ষে অনুরাধাদের দেখতে পাচ্ছে। অনুরাধার চোখে আর ঘৃণা নেই, তার বদলে ফুটে উঠেছে কৃতজ্ঞতা। রাজার শক্ত চোয়াল আবার নরম। মায়াবী। প্রতিভার চোখেও জল।

পনেরো

লাফিয়ে লাফিয়ে জ্বর বাড়ছে রাজার। সন্ধে সাতটায় একশো এক ছিল, রাত নটায় দুই, সাড়ে দশটায় থার্মোমিটারের পারা একশো চার ছুঁই ছুঁই।

উদভ্রান্ত অনুরাধা ছেলের মুখের ওপর ঝুঁকল, কী হয়েছে বাবা ? কী কষ্ট হচ্ছে ?

গলা অবধি কাঁথা ঢাকা রাজা নিঃসাড়। তার মুখমণ্ডল চিতার আগুনের মতো রক্তিম। জবা ফুলের মতো লাল চোখ মাঝে মাঝে খুলে যাচ্ছে। ধূসর কালো মণি ভাষাহীন। তপ্ত নিশ্বাসের ঝলক পুড়িয়ে দিল অনুরাধার গাল।

অনুরাধা ছেলের বুকে হাত বোলাল, জল তেষ্টা পেয়েছে ? জল খাবি ?

রাজা সজোরে দু দিকে মাথা নাড়ল। চোখ বন্ধ রেখেই।

অনুরাধার বুক ধকধক। এ কী বিদ্রোহ রাজার ! রাজাকে ছাড়া অনুরাধা বাঁচবে কী করে !

সন্ধেবেলা প্রতিভা বলছিলেন, এত উতলা হয়ে পড়ছ কেন অনু ? ছেলেটা এত বড় একটা ধাক্কা খেয়েছে, ওকে একটু থিতু হতে দাও।

থিতু হওয়া মানে কি প্রমত্ত জ্বর ? অনুরাধা আইসব্যাগ চেপে ধরল ছেলের মাথায়। এক হাতে ব্যাগ ধরে অন্য হাতে ছেলের কপাল থেকে চুল সরাচ্ছে।

প্রতিভা বললেন, ব্যাগটা আমি ধরছি দাও, তুমি বরং বালতি করে জল নিয়ে এসো। আবার মাথা ধোওয়াতে হবে।

কাল সন্ধেবেলা রাজা ঘর বন্ধ করে ছিল, প্রতিভার হাজার ডাকাডাকিতেও দরজা খোলেনি সারা রাত। অনুরাধা তখন ছেলের কথা ভুলে গেছে, রাগে ক্ষোভে সে তখন উন্মত্তপ্রায়। চন্দনকে জর্জরিত করেছে আঘাতে আঘাতে, নিজেও ক্ষতবিক্ষত ক্রমশ।

ধীরে ধীরে অনুরাধার রাগটাও কেমন ঝিমিয়ে এল। তীব্র অভিমানে আচ্ছন্ন হল মন। আঠেরো বছর ঘর করার পর কোনও স্ত্রী যদি শোনে তার ভদ্রলোক স্বামী শরীরের খিদে মেটাতে মেয়েমানুষের বাড়ি যায়, হয়তো বা নিয়মিতই, এবং রাস্তার মেয়ের সঙ্গে ফুর্তি মারতে গিয়ে ধরা পড়ে পুলিশের হাতে, তখন সেই স্ত্রীর মনের অবস্থা কী যে হয় ! আর সেই কীর্তির কথা অনুরাধাকে শুনতে হল কিনা রাজার মুখ থেকে !

রাজা আঙুল তুলছিল অনুরাধার দিকে, তুমিও দায়ী। তুমিও কম লোভী নও !

মাগো, অনুরাধা কেন আগেই মরে গেল না !

মগে করে রাজার মাথায় জল ঢালছেন প্রতিভা, অনুরাধা মৃদু চাপড় দিচ্ছে ছেলের মাথায়, চুল মাথা ভিজিয়ে জল পড়ছে বালতিতে।

বাইরে খুব আস্তে বেল বাজল। চন্দন।

প্রতিভা বললেন, তুমি ভাল করে মাথাটা মুছিয়ে দাও, আমি দেখছি।

মা-ছেলেতে বাইরের ঘরে কী কথা হচ্ছে শুনতে পাচ্ছিল না অনুরাধা। চন্দন একবার দরজায় এসে দাঁড়াল। এক্ষুনি যেন কাঁপা গলায় ডাকবে, হাই প্রিন্স ! ডাকল না। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে।

কাল সারা রাত সোফায় নিথর বসেছিল চন্দন, প্রতিভার ঘরের দরজাও বন্ধ হয়নি রাতভর। অনুরাধা তার নিজের ঘরের অন্ধকারে জাগছিল। ক্রমে ক্রমে অভিমানও কেমন মরে এল তার। হঠাৎই এক তীব্র আতঙ্কে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। বন্ধ ঘরে রাজা কোনও অঘটন ঘটিয়ে ফেলল না তো !

—রাজা, দরজা খোল।

রাজার সাড়া নেই।

—লক্ষ্মীটি দরজা খোল্, আমাকে আর কষ্ট দিস না বাবা।

রাজা তবু নিঝুম।

অনুরাধা দিশেহারা। দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে চিৎকার করছে, খোল্ বলছি, নইলে কিন্তু এবার দরজা ভেঙে ফেলব।

প্রতিভা মিনতি করলেন, রাজা, আমাকেও তুই দরজা খুলে দিবি না ?

বেশ খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর সত্যিই চন্দন দরজা ভাঙতেই উদ্যত, রাজা থমথমে মুখে ছিটকিনি নামিয়েছে। অনুরাধা পাগলের মতো জড়িয়ে ধরেছিল ছেলেকে। রাজা কাঠের মতো শক্ত, মায়ের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, আবার শুয়ে পড়ল বিছানায়। সারাদিন ওঠেনি, স্নান খাওয়াদাওয়াও করেনি, তারপর বিকেল থেকে এই বিপত্তি।

রাজার চোখে লাগবে বলে বড় আলো নিভিয়ে রাখা হয়েছে। নীলাভ রাতবাতি জ্বলা ঘরে এখন অপ্রাকৃত আলোছায়া। সিলিংফ্যান খুব ধীর লয়ে বাতাস ছড়াচ্ছে। মৃদু বাতাসে রাজার টেবিলের বইখাতারা টলমল। দেওয়ালে বিবেকানন্দর ফাঁকা জায়গা আলোআঁধারেও কী প্রকট !

প্রতিভা আবার এসে বসেছেন রাজার পাশে, রাজার কপালে আইসব্যাগ ছোঁয়াচ্ছেন আলতো করে। অনুরাধা বাথরুমে বালতি রাখতে গেল। প্রচণ্ড মাথা ধরে আছে। কল খুলে মুখচোখে জল ছিটোল খানিকটা। নরম ভারী তোয়ালে চেপেছে মুখে। হঠাৎই বেসিনের আয়নায় চোখ পড়ল। দর্পণে এ কার মুখ ? কোন অনুরাধা বিম্বিত হয়েছে আয়নায় ? কে এ ?

খুব ছোটবেলায় অনুরাধা একবার হারিয়ে গিয়েছিল। বেশি দূরে নয়, গড়িয়াহাটের মোড়ে। মার সঙ্গে দোকানে ঘুরতে ঘুরতে কখন যে ছিটকে গেল ! ছোট্ট মেয়ে সিঁটিয়ে গেছে ভয়ে, এলোপাথাড়ি ছুটে মরছে একা। মাকে খুঁজছে। একসময় ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল।

অচেনা এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসেছিলেন, কাঁদছ কেন খুকি ?

—আমি হারিয়ে গেছি। অনুরাধা নাক টানল, —অনুরাধা হারিয়ে গেছে।

বৃদ্ধ মজা পেয়েছিলেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু অনুরাধা কে ?

সত্যিই তো অনুরাধা কে ?

চন্দনের স্ত্রী ? স্বামীর গরবে গরবিনী এক নির্বোধ রমণী মাত্র ?

নাকি রাজার মা ? ছেলের সাফল্যের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা এক মূর্খ নারী ?

নাকি প্রতিভা অদ্রিনাথের পুত্রবধূ ? অর্থহীন কর্তৃত্বের দাপটে উজ্জ্বল হতে চেয়েও মলিন এক স্ত্রীলোক ?

নাকি লাজুর বউদি ? অকারণ ঈর্ষায় পীড়িত নিছক এক মানবী ?

নাকি এর বাইরেও অন্য অনুরাধা আছে ? হয়তো ওই আয়নায় ?

অনুরাধা জানে না।

চন্দন ডাক্তার নিয়ে এসেছে। অনুরাধা ত্বরিত পায়ে ছেলের ঘরে ফিরল।

বড় আলো জ্বলেছে। ফ্যাটফ্যাটে টিউবলাইটের আলোতে বড় শীর্ণ দেখাচ্ছে রাজাকে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জ্বরেই।

ডাক্তার বললেন, হাঁ করো। হাঁ করো। জিভ দেখাও।

রাজা অল্প মুখ ফাঁক করল।

টর্চ জ্বেলে রাজার মুখ চোখ দেখলেন ডাক্তার, নাড়ি টিপলেন, স্টেথো ধরলেন বুকে পিঠে, পালস বিট একটু ইর‍্যাটিক আছে। তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, ওষুধ লিখে দিচ্ছি, তিনদিন খাওয়ান। জ্বর ছাড়লেও অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স পুরো করবেন। এখন একটা পাইরাজেসিক খাইয়ে দিন, জ্বর নেমে যাবে। যদি তিনদিনের মধ্যে পুরো রেমিশান না হয়, তা হলে ব্লাড টেস্ট করতে হবে। বাঁধাধরা গতে ডাক্তারি বুলি আউড়ে যাচ্ছেন ভদ্রলোক, ঘরের জানলা সব বন্ধ করে রেখেছেন কেন ? খুলে দিন। পাখা ফুলস্পিডে ঘুরুক। কাঁথাও সরিয়ে দিন গা থেকে। শরীর থেকে তাপ বেরিয়ে যাক।

বিষণ্ণ জ্যোৎস্নায় ডুবে আছে চরাচর। চাঁদ এখন অস্তগামী। এবার নিকষ আঁধারে তলিয়ে যাবে পৃথিবী। তারপর আলো ফুটবে। ধীরে, অতি ধীরে। দিন রাত্রির সন্ধিক্ষণ এখন।

ওষুধ খেয়ে জ্বর নেমেছে রাজার। অনুরাধা থার্মোমিটার দেখল। একশো এক।

রাজা ঘুমোচ্ছে। প্রতিভা চলে গেছেন ঘরে। দীর্ঘক্ষণ পর অনুরাধা ছেলেকে ছেড়ে বাইরের ঘরে এসে বসল। সামনের সোফায় আধশোয়া চন্দনের চোখেও তন্দ্রার ঘোর। অনুরাধার শব্দ পেয়ে চমকে উঠে বসল সে। তার পরনে এখনও কালকের প্যান্টশার্ট।

চন্দন কয়েক সেকেন্ড নিষ্পলক তাকিয়ে রইল অনুরাধার দিকে। অনুরাধা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

চন্দন নিচু স্বরে বলল, চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

শুনেও না শোনার ভান করল অনুরাধা। কী ঠিক হয়ে যাবে ? রাজা আবার শ্রদ্ধা করবে বাবা মাকে ? অনুরাধা চন্দনের সম্পর্কে ফিরে আসবে পুরনো বিশ্বাস ?

চন্দন নত মুখে বলল, আমার কথা শোনো অনু, সব ঠিক হয়ে যাবে। সময় সবই ভুলিয়ে দেয়।

অনুরাধা এতটুকু সান্ত্বনা পেল না। কত দিন, কত মাস, কত বছর সময় লাগে এমন গ্লানি মুছতে ?

—জানি আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারছ না। কিন্তু আমি কী নিয়ে বাঁচব অনু ? শুধু ঘেন্না ? চন্দন বড় করে শ্বাস ফেলল, আমার যা কিছু ভাল, যা কিছু মন্দ, সবই তো তোমাদের জন্য। তোমার জন্য। রাজার জন্য।

অনুরাধা খর চোখে তাকাল, আমাদের কথা ভেবেই কি তুমি মেয়েমানুষের ঘরে যাও ?

চন্দন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না, চুপ করে বসে রইল। তারপর ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, কী করে তোমাকে বোঝাই এখন ! দোষ তো দোষই। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, এত চাওয়া আমাদের, সবই কি আমার একার ? তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একদিকে ছুটেছ, আমি আমার কামনা-বাসনা নিয়ে আরেক দিকে। এই আকাঙ্ক্ষা, এই কামনা-বাসনা, এর কি কোনও নিবৃত্তি আছে অনু ?

চন্দনের স্বর হাহাকার হয়ে মিশে গেল বাতাসে। ঘুরে ঘুরে গোটা বাড়ি মথিত করছে। বন্ধ জানলা ভেদ করে, সামনের উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি টপকে ছড়িয়ে গেল দিক দিগন্তরে।

অনুরাধার চোখ সহসা জলে ভরে গেল। সে তো প্রথম দিনই বুঝেছিল চন্দন মিথ্যে কথা বলছে ! তখন কেন সত্যের গভীরে যেতে চায়নি সে ! উটপাখির মতো বালিতেই মুখ গুঁজে বালির ঝড় থেকে বাঁচতে চেয়েছিল ! মিথ্যের আবরণটুকু টিকে থাকলে যদি দিনযাপন মসৃণ হয় তবে কেন মিছিমিছি সে সত্যের খোঁজ নিতে চাইবে !

তা কি হয় ! সত্য বড় নিষ্ঠুর কসাই।

চন্দন অনুরাধার অল্প কাছে এল, তুমি দেখো রাজার কেরিয়ারে আমি দাগ পড়তে দেব না।

সাত্যকির সঙ্গে কথা বলে এসেছি, সব ম্যানেজ হয়ে যাবে। রাজার বছরটা আমি বাঁচাবই।

এত দুঃখেও অনুরাধার হাসি পেল। এখনও ম্যানেজ! রাজার বছর বাঁচাবে চন্দন, রাজা কি বাঁচবে?

অনুরাধা মুখ তুলল, না, তুমি আর সাত্যকির কাছে যাবে না। রাজা অন্যায় কাজ করেছে, রাজা শাস্তি পাক।

শ্রান্ত চন্দন প্রায় ডুকরে উঠল, কী বলছ তুমি তার মানে জানো? রাজার জীবনটাই হয়তো...

ক্ষণিকের জন্য অনুরাধার চিত্ত দুলে উঠেছে, পর মুহূর্তেই অচঞ্চল, ভুল করছ তুমি। শাস্তি শুধু রাজার নয়। আমাদেরও। এটাই আমাদের প্রাপ্য।

আকাশে আলো ফুটেছে। পৃথিবীতে তবু কালো ধোঁয়ার আবরণ। শহরের বাতাস ভরে গেছে দূষিত বাষ্পে। ঘন ধোঁয়ার নীচে বাড়িঘর পথঘাট সব গাঢ় তমসায় আচ্ছন্ন। ধোঁয়ার আস্তরণ ভেদ করে কোনও গৃহকেই আর পৃথক কবা যায় না এ সময়ে।

অনুরাধা ভোর দেখছিল। কালো ধোঁয়ামাখা ভোর।

হলুদ গাঁদার বনে

সকাল থেকে এই শব্দটুকুর প্রতীক্ষাতেই তো বসে থাকেন মনোময়।

শব্দ নয়, ছোট্ট একটা ধ্বনি। টুং। ওইটুকু ধ্বনিরই কী যে জোর! মনোময়ের বুকের ভেতরে, অনেক ভেতরে, কোনও এক কুয়োতলায় পৌঁছে যায় শব্দটুকু। প্রতিধ্বনিত হয়ে ঝঙ্কার তোলে বারবার। টুংটুং। টুংটুং।

মনোময় চোখ বুজে থাকেন। সেই কোন সকাল থেকে এভাবেই তো বসে থাকা এখন। বাইরের এই টানা বারান্দাটায়। কাকভোরে উঠে একটুখানি হাঁটা, পায়ে পায়ে তিলাইদিঘির পাড়, সূর্য আগুনের থালা হয়ে উঠলে ফিরে আসা, বাগান নিয়ে খানিক ডুবে থাকা, তারপর এই বেতের চেয়ার। এর মধ্যেই রামবিলাস সকালের নাস্তাপানি রেখে যায়। চা, খবরের কাগজটাও। ধীরেসুস্থে জলযোগ সাঙ্গ করেন মনোময়, খবর পড়াও। তারপর চায়ে চুমুক দিতে দিতে অলসভাবে চোখ বন্ধ করেন। খোলেন না আর।

এবার প্রতীক্ষা। যদি আজ আসে! যদি আসে!

বোজা চোখেই মনোময় টের পেলেন রোদ্দুরে ভিজতে ভিজতে ছোট্ট শরীরটা পৌঁছে গেছে তাঁর গেটে। হাঁপাচ্ছে। কচি মুখ তার টুকটুকে লাল, পাতলা ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেছে অল্প, এতটুকুন এক বুকের খাঁচা উঠছে নামছে জোর জোর। বাতাস নিচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে খুদে খুদে হাতে চেষ্টা করল আগল ছোঁয়ার। নাগাল পেল না। ডিঙ মেরে খানিক লম্বা করে নিল তিন ফুট দেহকাণ্ড। আঙুলের ডগায় ঠেলে টুক করে নামিয়ে দিল আগল। আর অমনি বেজে উঠল এক শব্দ। টুং।

মনোময়ের একদম সামনে এসে রুমঝুম সুর করে বলল,—আমি এসে...এ...এছি।

চোখের পাতা তবু বন্ধ মনোময়ের। বড় বড় শ্বাস টানছেন। ঘ্রাণ নিচ্ছেন বুক ভরে। আহা, কী অপরূপ এক শীতল সুরভি!

রুমঝুম বেতের চেয়ারটাকে পাক খেল কয়েকবার। হাতলে পড়ে থাকা মনোময়ের ডান বাহু ধরে নাড়ল,—ও দাদু, আমি যে এসে গেছি।

মনোময় সাড়া দিলেন না। পেশাদার অন্ধের মতো বাঁ হাতে বাতাস হাতড়াচ্ছেন,—কে এসেছে? কার গলা পাই?

—আমি গো, আমি।

—আমি আবার কে?

—রুমঝুম গো, রুমঝুম।

—কে রুমঝুম?

—সেই যে গো, যে হাসপাতালের কোয়ার্টারে থাকে।

—হাসপাতাল! ঝালুয়ায় আবার হাসপাতাল এল কোত্থেকে?

—মাগো, কী বলে! ঝালুয়ায় হাসপাতাল নেই। প্রতিটি বাক্যে গো যোগ করে কথাকে বুঝি আরও পোক্ত করে রুমঝুম। ভারী মিঠে শোনায়।

মনোময় ইচ্ছে করে দু-চারটে ভাঁজ বাড়িয়ে দিলেন কপালের,—তা হাসপাতালটা কোথায়?

—ওই যে গো, এ রাস্তা ধরে সোজা গেলে শিমুলতলা, তার পাশে মা-শীতলার থান, তার গায়েই তো হাসপাতাল গো।

—হুঁউউম। মনোময় মিটিমিটি হাসছেন,—সেখানে রুমঝুম কী করে?

—ওমা, রুমঝুম আবার কী করবে গো। সে তো ছোট্ট। কাজ করে তো তার মা। রুমঝুম গালে হাত দিয়ে চোখ পিটপিট করল।

— রুমঝুমটা তা হলে কিছু করে না? মহা ফাঁকিবাজ?

—মোটেই না। মোটেই না। এতক্ষণে খেলায় হার মেনেছে রুমঝুম। অধৈর্য হাতে ঠেলছে

মনোময়কে,—ও দাদু, চোখ খোলো না। আর কতক্ষণ বকবক করবে গো? আমরা কি আজ বাগান করব না?

দুহাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে বুকে টেনে নিলেন মনোময়। একরত্তি মেয়েটার সঙ্গে নিত্যিদিনের খুনসুটি সেরে, আর একটা নিত্যিদিনের কাজে নেমে পড়বেন এবার। নতুন সঙ্গিনীকে পাশে নিয়ে আবার এখন শুরু হবে বাগান পরিচর্যার কাজ। যতক্ষণ না রামবিলাস এসে স্নানে যাওয়ার জন্য তাগাদা দেয়। যতক্ষণ না সূর্যটা তেড়ে ফুঁড়ে ওঠে আরও।

বাগান বলতে অবশ্য তেমন বিশাল উদ্যান কিছু নয়, একতলা কটেজ প্যাটার্নের বাড়িটার সামনে বড়জোর কাঠাখানেক ফাঁকা জমি। ওই সামান্য জমিতেই বছরভর হরেক কিসিমের ফুল ফুটিয়ে চলেছেন মনোময়। গোলাপ, বেল, মল্লিকা, সূর্যমুখী, ডালিয়া, জিনিয়া, গাঁদা, ক্রিসেনথিমাম, পপি, লিলি, কী নয়! বছর আড়াই আগে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে যখন বাড়িটা কেনেন মনোময়, তখন ছিল চারদিকে শুধুই ঝোপ আর আগাছার জঙ্গল। রামবিলাস আর তিনি খেটেখুটে সাফ করেছেন সব। সার ছড়িয়ে, কোদাল কুপিয়ে মাটি তৈরি করেছেন। ঝালুয়ায় তেমন উত্তম বীজ পাওয়া যায় না, রামবিলাসকে কলকাতায় পাঠিয়ে বীজ আনিয়েছেন ভাল। তাঁর হাতের গুণে আর কঠোর পরিশ্রমে বাগানটি ভারী মনোরম এখন। ছোট্ট হলেও চোখ জুড়োনো।

রুমঝুমের হাত ধরে বাগানে নামলেন মনোময়। ধুতিটাকে মালকোঁচা মেরে আকাশের দিকে তাকালেন এক ঝলক।

শরৎ এসে গেল। ফুঁ দিয়ে আকাশে শিমুলতুলো ওড়াচ্ছে এক অদৃশ্য জাদুকর। বর্ষা শেষের গাছগাছালি সবুজের বাহার মেলে ধরেছে রোদ্দুরে। রোদ কিন্তু খুশি নয়, তার মেজাজে এখনও বেশ রাগ রাগ ভাব।

মনোময় খুরপি হাতে উবু হয়ে বসলেন। দোপাটি গাছগুলো শুকিয়ে এসেছে, টেনে টেনে উপড়োচ্ছেন গাছগুলোকে।

মাটি ঘাঁটতে ঘাঁটতে চোখ পাকাল রুমঝুম,—অ্যাই, তুমি গাছগুলোকে তুলে ফেলছ কেন গো?

—এরা আর ফুল দেবে না যে।

—কেন দেবে না গো?

—এদের ফুল দেওয়া শেষ হয়ে গেছে। এরা এখন বুড়ো।

—ও। বুড়ো হলেই বুঝি তুলে ফেলে দিতে হয়?

—তা হয় বইকী।

—তুমিও তো বুড়ো, তোমাকেও বুঝি কেউ তুলে ফেলে দিয়েছে?

মনোময় থমকালেন একটু। তারপর হি-হি হেসে উঠেছেন, সে সুযোগ আমি কাউকে দিইনি রে ভাই। আমার বুড়িটা যেই মরল, অমনি নিজের শেকড়টাকে তুলে নিয়ে, সব্বাইকে কাঁচকলা দেখিয়ে পালিয়ে এসেছি।

—তোমার বুড়িটা মরে গেল কেন গো?

মনোময় ছোট্ট শ্বাস ফেললেন,—বোধ হয় আমাকে জব্দ করার জন্য।

রুমঝুমও চুপ হয়ে গেছে। ভাবছে কী যেন। মাটিমাখা বুড়ো আঙুলটা ঘষছে নিজের গালে। হঠাৎ বিজ্ঞের মতো বলল, আমার মাও তাই বলে। বাবাও নাকি মাকে জব্দ করার জন্য মরে গেছে।

মনোময়ের বুকটা মায়ায় ভার হয়ে গেল। আহারে, এইটুকুনি মেয়ে কী দুঃখী! কী একা! মা'টা সারাদিন হাসপাতালে ডিউটি করে, কখনও কখনও রাতডিউটিও থাকে তার, কত সময়ে মা ছাড়া একা একাই থাকতে হয় মেয়েটাকে। কাজের মেয়েটা কত দেখে তা তো বোঝাই যায়। নইলে ওই শিশু হঠাৎ হঠাৎ এভাবে বেরিয়ে পড়তে পারে বাড়ি থেকে! হাসপাতালের কোয়ার্টার থেকে মনোময়ের বাড়ি কম দূর তো নয়, এতটা রাস্তা ওই মেয়ে চলে আসেই বা কী করে! এল তো এল, ঘন্টাভর তার খোঁজ করতেও আসে না কেউ।

হঠাৎই একদিন রুমঝুমকে চোখে পড়েছিল মনোময়ের। শীতের মরশুমি ফুলে তখনও সেজে আছে মনোময়ের বাগান, মনোময় প্রকাণ্ড এক গাঁদার পাশের ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়িগুলোকে ছেঁটে দিচ্ছিলেন।

সহসাই চোখ গেটের দিকে। সবুজ গ্রিলের ফাঁকে কচি মাথাখানা গলিয়ে বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে আছে রুমঝুম। মাঘের কনকনে হাওয়ায় তার ঝুরো চুল উড়ছে ফরফর।

কৌতূহলী মুখে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে হাত নেড়ে ডেকেছিলেন মনোময়। তারপর ওই কটকটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমতে আর কতক্ষণ।

—তুমি গাছটাকে কেটে দিচ্ছ কেন গো?

—গাছ তো কাটিনি, কুঁড়ি ছাঁটছি। ছোট কুঁড়িগুলো ছেঁটে দিলে বড় ফুল আরও বড় হয়।

—কুঁড়ি মানে কী গো?

—কুঁড়ি হল গিয়ে ফুল ফোটার আগের স্টেজ। বলেই হেসে ফেলেছিলেন মনোময়,—বুঝলে না তো? কুঁড়ি হচ্ছ গিয়ে তুমি। কুঁড়ি থেকেই ফুল ফোটে।

রুমঝুমের ঠোঁট অমনি ফুলে উঠেছে। দুপা পিছিয়ে গিয়ে বলল,—তুমি কুঁড়িদের কাটছ কেন? তুমি কি দুষ্টু লোক?

মনোময় অপ্রস্তুত। আপস চালাবার চেষ্টা করছেন রুমঝুমের সঙ্গে,—বেশ বাবা, বেশ। আর কাটব না। এ বার বলো তো ছোট্ট কুঁড়িটা একা একা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে কেন?

—পড়েছে। কুঁড়ির একটু বেড়াতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

—কুঁড়ির তো খুব সাহস! কেউ যদি রাস্তা থেকে কুঁড়িকে তুলে নেয়?

—পারবেই না। কুঁড়ি এক ছুট্টে পালিয়ে যাবে।

—তা কুঁড়ি এখন রাস্তায় ঘুরছেই বা কেন? কুঁড়ি বুঝি স্কুলে যায় না?

—যাবে। আগে বয়সটা ফাইভ প্লাস হোক। ঝালুয়ার স্কুলে তো ফাইভ প্লাস ছাড়া নিচ্ছেই না।

পাঁচ মিনিটও সময় লাগেনি, মেয়েটার ঠিকুজি-কুষ্ঠি সব জেনে গেলেন মনোময়। সঙ্গে সঙ্গে কেউ যেন একটা অন্য সুইচও টিপে দিচ্ছিল তাঁর বুকে। ফিকে হয়ে আসা এক গৃহের স্মৃতি আলগা দোল খাচ্ছিল হিমেল হাওয়ায়।

মায়া। বড় মায়া।

মনোময় খুরপি হাতে আড়চোখে রুমঝুমকে দেখলেন। সার সার গাঁদার চারা লকলকিয়ে উঠেছে। উমনো ঝুমনো চুল মুখে ফেলে তাদের গোড়ার তলতলে মাটি ঘাঁটছে মেয়েটা। ছিট ছিট ফ্রকের এখানে সেখানে ছোপ ছোপ কালো কাদা। বাড়ির থেকে রোদ মাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে, পায়ে একটা চটি পর্যন্ত নেই। হাঁটুতেই বা ও কীসের দাগ? ছড়ে গেছে নাকি?

বাড়ির লোক কি একটুও নজর করে দেখে না মেয়েটাকে!

আহা রে শিশু।

মনোময়ের গলার কাছে একটা ডেলা দলা পাকাচ্ছিল।

মায়া কাটে না। মায়া বদলে যায়।

দুই

—তোর ওপর আমার বড় মায়া পড়ে গেছে রে বকুল।

—আহা ঢং। কত মায়া সব আমার জানা আছে।

—সত্যি বলছি। মাইরি। তোকে দেখে আজকাল আমার সব কেমন ভুলভাল হয়ে যায়। সেদিন মাইতিদের চিঠি মিত্তিরদের দিয়ে এলাম।

বকুল আবার চোখ টিপে বলল,—ঢং।

বকুলের ঢং বলার কায়দায় নরেন হাসছে টিপিটিপি। খপ করে বকুলের একটা হাত চেপে ধরে বলল,—রোজ তা হলে কাজকম্ম শিকেয় তুলে তোর কাছে এসে বসে থাকি কেন বল? এই সক্কালটা ভর?

বকুল হাত ছাড়িয়ে নিল না। গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বার করল। হাসির মতো। বলল,—মায়ায় আস না ছাই। আস তো তেষ্টা মেটাতে। চিঠি বিলি করতে গিয়ে গলা শুকিয়ে যায়, তাই দুদণ্ড

জিরোতে আস।

নরেন বিহ্বল চোখে তাকাল,—এতদিনে আমাকে তুই এই চিনলি?

বকুল ঠোঁট বেঁকাল,—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। সব পুরুষমানুষই চেনা হয়ে গেছে আমার। তোমাদের নোলা সাংঘাতিক। মিঠে আমটিও চাই, টক তেঁতুলটিও চাই। বলতে বলতে চোখ ঘোরাল বকুল,—তাও যদি তোমার হাঁড়ির খবর না জানতাম।

নরেন হাতটা ছেড়ে দিল। ছলাত্ ছলাত্ করে বড় বড় নিশ্বাস ফেলল গোটা কয়েক। তারপর বলল,—আমার দুঃখ এ পৃথিবীতে কেউ বুঝল না।

বকুল এবার মজা পাচ্ছিল। বাইরের ঘরে পাতা চৌকিতে বসে পা দুলিয়ে নিল খানিক। দুহাত কোলের ওপর জড়ো করল। নতুন করে আবার দুলতে দুলতে বলল,—তোমার কীসের দুঃখু গো পিওনবাবু? ঘরে তোমার অমন টসটসে বউ...

—কেন রোজ এক খোঁচা দিস বকুল? ওই খাণ্ডারনি বউকে কি বউ বলে? হাতে একটা লাঠি ধরিয়ে দিলে পুরো ঝালুয়া থানার কনেস্টবল।

বকুল খিলখিলিয়ে হেসে উঠল,—আবার বুঝি বউ ধরে পিটিয়েছে জোর?

—তা হলে আর বলছি কী?

খাকি জামার বোতাম খুলে ডান কাঁধটা দেখাল নরেন। নীল কালশিটে পড়ে আছে। একটু যেন ফুলেও আছে জায়গাটা।

মুখে হাত চাপা দিয়ে শিউরানো শব্দ করল বকুল,—ও মা, এ যে সত্যি সত্যি মেরেছে গো! কী করেছিলে তুমি?

—কিছু করতে হয় নাকি! আমাকে না মারলে মহারানির রাতে খিদেই হয় না।

বকুল সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল,—তা বললে কী হয়। নিশ্চয়ই কিছু একটা করেছিলে। এমনি এমনি কি মেয়েছেলেরা সোয়ামির গায়ে হাত তোলে?

—তোলে রে, তোলে। সন্দেহে পুড়লে মেয়েছেলেরা সব পারে। তখন আর তাদের ডান বাঁ জ্ঞান থাকে না। মিছিমিছি কাল নতুন খুন্তিটাকে বেঁকিয়ে দিল।

বকুল কথাটা বিশ্বাস করল না। কার্তিকের সঙ্গে ঘর করার সময় বকুলও কি কম সন্দেহ করেছে তাকে! সন্দেহগুলো তো খুব ভুলও ছিল না। তা বলে কি বকুলের কখনও সাহস হয়েছে কার্তিকের গায়ে হাত তোলার! অবশ্য কার্তিক অনেক তাগড়াই জোয়ান ছিল, সারাদিন ট্যাক্সি চালিয়ে এসেও একটুও ধুঁকত না। ছিপি খুলে ঢকঢক চুল্লু ঢেলে উলটে বকুলকেই গোবেড়েন দিত। নরেনটা ভারী রোগাসোগা মানুষ, তার জন্যই কি পেটাতে পারে বউ!

নরেন একদৃষ্টে দেখছে বকুলকে। মোড়া ছেড়ে উঠে এসে বকুলের কাঁধে হাত রাখল,—মাইরি বলছি, আমি কাল কিচ্ছু করিনি। সন্ধেবেলা ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল, দাওয়ায় বসে বিড়ি টানছিলাম। তখন কি ছাই দেখেছি পাশের বাড়ির ঊর্মিলা কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে আছে! হঠাৎ ডাইনিটা এসে হিড়হিড় করে আমায় ঘরে টেনে নিয়ে গেল। কী, না আমি নাকি ঊর্মিলার সঙ্গে চোখে চোখে ইশারা করছি। তারপর...। ওই মার খেলে চোর সিধে হয়ে যেত রে। আর আমি কিনা তাও চুরি করে করে তোর কাছে আসি।

বকুলের বলতে ইচ্ছে করল, তা অমন বউ নিয়ে ঘর করার দরকার কী তোমার? ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিলেই পারো।

মুখ ফুটে বলতে পারল না কথাটা। মেয়েমানুষকে স্বামী তাড়ালে তার যে কী হাল হয়, সে তো বকুলের নিজের চোখেই দেখা। শুধু দেখা কেন, হাড়ে হাড়ে টের পাওয়াও বটে। কার্তিক যে সোনারপুরের ওই ধুমসি মাগিটার সঙ্গে অনেকদিন ধরেই পিরিত চালাচ্ছে, এ কথা কি জানত না বকুল! জানত। কিন্তু লোকটা যে তার সঙ্গেই ঘর করার জন্য তাড়াবে বকুলকে, তা কে-ই বা ভেবেছিল। তাড়ানোর অছিলায় শুধু শুধু চাট্টি বদনাম ছড়িয়ে দিল বকুলের নামে। বকুল নাকি বাঁজা। বকুল মুখরা। বকুল কার্তিককে সুখ দিতে পারেনি! আরও কত কী!

নরেনের বউটারও তো ছেলেপুলে নেই, তাকে যদি নরেন তাড়ায় কখনও, ওই সব বদনাম দেবে

কি?

নরেনের দুব্‌লা হাতটা আস্তে করে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল বকুল। উদাস গলায় বলল, ব্যথা হয়েছে খুব? একটু মলম লাগিয়ে দেব?

মাটিতে থেবড়ে বসে চৌকিতে হেলান দিল নরেন, মলম লাগবে না, তুই শুধু একটু হাত বুলিয়ে দে।

বকুলের ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক। পুরুষমানুষের প্রেমপিরিতির কত যে রূপ! কখনও দামাল, কখনও দানব, কখনও শিশুটি! হয়তো রাতে ব্যথায় কোঁকাবে, কিন্তু এখন বকুলের হাতের ছোঁয়াতেই বেশি সুখ পাবে মানুষটা। থাক, অত সুখে কাজ নেই।

বউদির ড্রয়ার থেকে মলম বার করে নরেনের পাশে বসল বকুল। টিউব থেকে একদলা জেলি টিপে থুপে দিল মানুষটার কাঁধে। চেপে চেপে ঘষছে।

চোখ বুজে আছে নরেন। বকুলের হাতের চাপে মুখ মাঝে মাঝে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে তার, তবু শব্দটি কাড়ছে না। হঠাৎ দুহাতের বেড়ে বকুলের কোমর জড়িয়ে ধরল।

বকুল নিজেকে ছাড়ানোর ভান করল,—আহ, কী হচ্ছে কী? রোসো দেখি একটু, মলমটা আগে লাগিয়ে নিই।

নরেন আরও জোরে চেপে ধরেছে বকুলকে,—আর লাগবে না। ব্যথা সেরে গেছে।

বকুল বাধা দেওয়ার জোর পেল না। দু মিনিটেই উত্তম পুত্তম ঘেঁটে বকুলকে কাহিল করে দিল নরেন। ব্লাউজ খুলে গেছে, শাড়ি আলুথালু, আগুন বেরোচ্ছে গা দিয়ে।

মা গো মা, শরীরে এত তাপও থাকে!

নরেনকে ঠেলেঠুলে জোর করে উঠে দাঁড়াল বকুল। আঙুল চালিয়ে চুলটা খানিক ঠিক করল। বেশবাসও। ত্বরিত পায়ে বারান্দায় গেল একবার।

নরেন ছটফট করছে, যাস কোথায়?

বকুল উত্তর দিল না। কোয়ার্টারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দম নিল কয়েক ঢোক। হাসপাতাল-চত্বরের একেবারে কোনার দিকে নার্সদের কোয়ার্টার। মাঝে কিছু বড় বড় গাছপালা আছে। শিমুল, ঘোড়ানিম, শিরিষ আর শিশুগাছের জটলা। তাদের টপকে হাসপাতালের মেন বিল্ডিং এখানে থেকে ভাল দেখা যায় না। ওখানেই এখন আছে বউদি, ঘুরছে ওয়ার্ডময়। সেদিকপানে কয়েক পল তাকিয়ে থেকে খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল বকুল। সন্ত্রস্ত মুখে বাইরের রাস্তায় উঁকিঝুঁকিও মারল একটু। নাহ্, এত তাড়াতাড়ি ফিরবে না রুমঝুমও।

বকুল তবু ঘরে ফিরে হালকা তাড়া দিল নরেনকে। শরীরকে কোনও বিশ্বাস নেই। নিজেরও। পরেরও।

নরেনের ওঠার নাম নেই। হাত ছড়িয়ে লম্বা হাই তুলল,—তুই মাইরি হেভি সেয়ানা আছিস। রোজ সকালে দিব্যি কায়দা করে বাড়ি থেকে ভাগিয়ে দিস মেয়েটাকে।

না ভাগিয়ে উপায় আছে বকুলের। ঘরে যা ডাকাত হামলায় রোজ! একদিন যদি ওই মেয়ে নরেনকে দেখে ফেলে, তা হলে আর রক্ষে আছে, ঠিক মাকে কটকট করে গপ্পো করে দেবে। বকুলকে কি কম সামলেসুমলে চলতে হয়! আশপাশের কোয়ার্টারের দিকে নজর রাখো, হুট করে কেউ এসে পড়ল কি না খেয়াল রাখো, পথে বেরিয়ে মেয়েটা কোথায় গেল, কী করছে, সে চিন্তাও রাখো মাথায়। ভাগ্যিস রুমঝুম এক দাদু জুটিয়ে নিয়েছে, নইলে কি আর নরেনকে নিত্যদিন ঘরে ডাকতে পারত বকুল! তাও তো হ্যাপা কম যায় না! ওই আকুটে মেয়ে রোজ তাল তাল কাদা মেখে ফিরছে, তাকে স্নান করাও ভাল করে। জামা থেকে কাদামাটি ঘষে ঘষে তোলো। কম হ্যাঙ্গাম! মেয়ের জামায় কাদার ক দেখলে বকুলকে কি ছেড়ে কথা বলবে বউদি!

বকুল অবশ্য এত কথা বলল না নরেনকে। মুখ গোমড়া করে খানিকটা গাম্ভারি ভাব আনল গলায়,—আমি পাঠাই না। ও মেয়ে নিজেই যায়। ফিরে এসে আবার সেয়ানার মতো বলে, আমি যে একা একা অত দূরে যাই, মাকে যেন বলে দিয়ো না মাসি।

নরেন খ্যাঁক খ্যাঁক হাসছে, দাদুনাতনিতে খুব জমেছে বলছিস?

—হুঁ। খুব পিরিত। মেয়ে তো প্রায় নেশার মতো ছোটে।

নরেন ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার কব্জা করল বকুলকে,—তুই যেমন আমার নেশা, তাই তো?

বকুল নির্বিবাদে খানিকটা আদর খেয়ে নিল। গোমড়া ভাব মুছে আহ্লাদি স্বর ফিরে এসেছে,—কটা বাজে খেয়াল আছে? এর পর তো ঝালুয়ার লোক চিঠিপত্র না পেয়ে পোস্টঅফিসে হামলা করবে।

—করুক। সব চিঠি আমি নর্দমার জলে ফেলে দেব।

—হুঁউউহ্, বউয়ের কাছে মার খাওয়া বরের যে খুব সাহস!

—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছিস?

—না গো না, যেতে বলছি। কথাটা বলেই কী যেন মনে পড়ে গেল বকুলের। রোগা মানুষটার কবল থেকে নিজেকে ছাড়াল আস্তে করে। ভেতর দরজার কাছে গিয়ে বলল,—এক মিনিট। দাঁড়াও। যাওয়ার আগে শরবতটা খেয়ে যাও। এসেই বড় মুখ করে খেতে চেয়েছিলে।

—সে যখন বলেছিলাম, তখন বলেছিলাম। এখন কি আর শরবতে আমার তেষ্টা মিটবে রে? নরেনের স্বরে প্রায় আর্তনাদ,—তোর জন্য পিপাসায় আমার ছাতি ফাটে রে বকুল।

বকুল শুনেও শুনল না।

রান্নাঘরে গিয়ে ঝটপট লেবু কাটল। কালো কুঁজোর জল ভরল গ্লাসে, চিনি মেশাল, নুন দিল, লেবু চিপল প্রাণপণে। তারপর পানসে সবুজ টকমিষ্টি জলটার দিকে মোহিত হয়ে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড।

মনে মনে বলল,—ওই তেষ্টাটা তোমার থাক পিওনবাবু। সব তেষ্টা মিটে গেলে আর কি তুমি বকুলের কাছে আসবে!

তিন

পাঁচটা নাগাদ হাসপাতাল থেকে বেরোচ্ছিল কবিতা, হঠাৎ একটা ইমার্জেন্সি কেস এসে গেল। অ্যাক্সিডেন্ট কেস। ঝালুয়া থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ন্যাশনাল হাইওয়েতে ঘটেছে দুর্ঘটনাটা। মোটর সাইকেলে এক দম্পতি যাচ্ছিল, কোত্থেকে এক লরি এসে ধাক্কা মেরে ছিটকে ফেলে দিয়েছে দুজনকে। ছেলেটার অবস্থা বেশ খারাপ, স্কাল ইনজুরি হয়েছে, বাঁচবে কি না বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েটার তেমন সাংঘাতিক কিছু হয়নি, কবজির হাড় ভেঙেছে, কোমরেও চোট খেয়েছে একটা।

কবিতা সাধারণত ইমার্জেন্সি ডিউটি করে না। করতে ভালওবাসে না। আজ বাধ্য হয়েছে। কোয়ার্টারে ফেরার জন্য বেরিয়েই পড়েছিল প্রায়, ডক্টর ঘোষ হঠাৎ পাকড়াও করে নিলেন। কবিতা, ইমার্জেন্সিতে কিছুক্ষণ থেকে যাও আজ। সুষমা ওখানে একা পড়ে গেছে।

কবিতার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। আট বছর ধরে সে নার্সের চাকরি করছে, এমনটা তার হওয়ার কথা নয়, তবু কী যে একটা হচ্ছে শরীরের ভেতর! অস্থির অস্থির ভাব।

সুষমা জিজ্ঞাসা করল,—তোকে এরকম লাগছে কেন রে? কী হয়েছে তোর? শরীর খারাপ?

কবিতা মুখে উত্তর দিতে পারল না। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল শুধু।

সুষমা কবিতার অনেক দিনের বন্ধু। আগের হাসপাতালে দুজনে একসঙ্গে কাজ করেছে। কবিতার সমস্ত কথাই জানে সুষমা। বলল,—বুঝেছি। তুই ডক্টর ঘোষকে বলে বাড়ি চলে যা। আমি ম্যানেজ করে নিচ্ছি।

কবিতা ইমার্জেন্সি রুমের বাইরে এসে দাঁড়াল! ওফ, পেশেন্টটার দিকে কেন যে তাকাল কবিতা!

চোখের সামনে একটাই ছবি ভেসে উঠছে বার বার। বড় বীভৎস দৃশ্য। একটা থেঁতলানো শরীর নির্বিকার শুয়ে আছে মর্গের টেবিলে।

সেদিন ওভাবে দুর্দম গতিতে স্কুটার চালানোর কী দরকার ছিল সুপ্রতিমের? ওভাবে উন্মত্তের মতো মৃত্যুর দিকে ছুটে যাওয়াকে কী বলে! অবিমৃশ্যকারিতা! দায়িত্বজ্ঞানহীনতা! অপরিণামদর্শিতা! নাকি স্রেফ নিয়তি!

রুমঝুমের কথাও একবার ভাবল না সুপ্রতিম!

সুষমা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে,—কীরে, দাঁড়িয়ে রইলি যে? গেলি না ডক্টর ঘোষের কাছে?

কবিতার গলা কেঁপে গেল,—আমার ভয় করছে।

—কীসের ভয়?

—জানি না।

—ঠিক আছে, দাঁড়া। বলেই সুষমা চলে গেল । ফিরে এসে হাসিমুখে বলল,—যাহ্, ডক্টর ঘোষ তোকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। কোয়ার্টারে ফিরে মুখেচোখে ভাল করে জল দে আগে।

কবিতা কৃতজ্ঞ চোখে বান্ধবীর দিকে তাকাল। কাছের লোকদের সহানুভূতি কুড়িয়ে কুড়িয়েই তো এখন তার বেঁচে থাকা।

সুষমা বলল,—তোকে একটা কথা বলব?

—বল।

—দু বছর তো হয়ে গেল, এখনও কি ঘটনাটাকে মন থেকে মুছে ফেলা যায় না?

মুছতে চাইলেই যদি মুছে ফেলা যেত! কবিতা ম্লান হাসল,—ভুলেই তো গেছি রে। না হলে ওই একরত্তি মেয়েটাকে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারতাম?

সুষমা হাত রাখল কবিতার কাঁধে,—রাগ যদি না করিস তো আর একটা কথা বলি।

—কী?

—এখনও অনেক দিন তোকে বাঁচতে হবে, বহু সময় পড়ে আছে, নিজেকে নিয়ে একটু ভাবনাচিন্তা কর।

—কী ভাবব?

—জীবনটাকে নতুন করে স্টার্ট কর।

—স্টার্ট তো করেই আছে রে। দিব্যি গড়গড় চলছে।

—এটাকে মোটেই চলা বলে না।

—কী বলে তা হলে? থেমে থাকা?

সুষমা কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল। ঠোঁট উলটে বলল,—দ্যাখ, আমি কী বলতে চাইছি, তুই খুব বুঝতে পারছিস। এখনও রুমঝুম ছোট আছে, ওর চোখে তেমন কিছু ঠেকবে না। মানিয়ে গুনিয়েও নিতে পারবে। বলতে বলতে গলাটা হঠাৎই নরম করেছে সুষমা,—আমাদের সোসাইটি এখনও একা একটা মেয়েকে সুস্থভাবে বাঁচতে দেয় নারে।

বাঁচতে যে সত্যিই দেয় না, কবিতা কি তা টের পাচ্ছে না! সুপ্রতিম মারা যাওয়ার পর থেকেই ঘাড়ের কাছে বিনবিন করছে অজস্র হিতাকাঙ্ক্ষীর দল। আহা কবিতা, তোমার কী কষ্ট! আহা কবিতা, তোমার কথা ভেবে রাতে আমার ঘুম হয় না! আহা কবিতা, চলো কোথাও বেড়িয়ে আসি! বারাসতের কোয়ার্টারে তো রাতদুপুরে টোকা পড়তে শুরু করেছিল দরজায়। সারা রাত মেয়ে কোলে কাঁটা হয়ে থাকত কবিতা। ঝালুয়া জায়গাটা ঢের ভাল, এখানে শেয়াল কুকুরের উৎপাত নেই। তবে চিল শকুন উড়ছে প্রচুর। যখন তখন ডানা মেলে হাসপাতালের বড়বাবুটি নেমে আসছেন গায়ের কাছে, ফিসফিস করছেন! পঞ্চাশ বছরের বুড়ো পাখিটা স্নেহ দেখানোর ছল করে টুকটাক ছুঁয়ে নিচ্ছে কবিতাকে! শ্রাবণ মাসে ডক্টর রায় বউকে বাচ্চা হতে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিল, তারপর রাত অব্দি নিজের কোয়ার্টারে কবিতাকে ডেকে নিয়ে ডাক্তারের সে কী গল্পের বহর! এর পরও আছে রাতডিউটি, ছোকরা ডাক্তার...!

তা এরা না হয় অনাত্মীয়, ঊনত্রিশ বছরের আধাবেওয়ারিশ বিধবাটাকে নিয়ে এরা তো একটু ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাইবেই। কিন্তু নিজের আত্মীয়রা! আপন মেজোজামাইবাবু ষোলো মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে হঠাৎ হঠাৎ সন্ধেবেলা চলে আসছে ঝালুয়ায়। কবিতার কোয়ার্টারে হাত পা ছড়িয়ে বসে যাচ্ছে। শতবার শোনা পারিবারিক ঘোঁট হাজার বার করে শুনিয়ে নিজেই নিজের রসবোধে হাসছে। আর ঘড়ি দেখছে মাঝে মাঝে। এত রাত্রে বাসে করে ফেরাটা কি ঠিক হবে কবিতা? যদি পথে বাস খারাপ হয়ে যায়! আমি বরং আজ থেকেই যাই!

কী ঘেন্না। কী ঘেন্না। বকুলটা আবার শোনে এ সব কথা। কী ভাবে কে জানে!

এই সব চিল-শকুনদের তাড়ানোর রাস্তা একটাই। বিয়ে। কবিতা জানে।

তবে জানা আর কাজটা সেরে ফেলার মধ্যে দুস্তর ফারাক। ভাবতে গেলে কবিতার কান্না পায়।

মাঝে মধ্যেই চোখের পাতা এক হয় না, মাঝরাতে উঠে বসে থাকে বিছানায়। শরীর জুড়েও তখন কী যে এক জ্বালাপোড়া! পাশে ঘুমন্ত মেয়েটার কথাও মনে থাকে না তখন। ঝালুয়ার অন্ধকারে বেপরোয়া হাত পা ছুড়তে থাকে কবিতা। অদৃশ্য এক সুপ্রতিমকে কিল চড় লাথি ঘুষি মেরে যেতে থাকে। সুপ্রতিমের কিছুই হয় না। সে এখন একজন সুখী মৃত মানুষ। চোয়াল কষে সংকল্প করে বিনিদ্র কবিতা, ওই মানুষটাকে একটা কড়া শাস্তি দিতে হবে এ বার। একটাই শাস্তি। বিয়ে। কবিতা আবার চুটিয়ে ঘরসংসার করবে, আর অন্তরীক্ষ থেকে জ্বলে পুড়ে মরবে সুপ্রতিম।

দিনের আলো ফুটলেই সংকল্পটা টলে যায়। কেন যে টলে! আলো কি মানুষের সাহস কমিয়ে দেয়! না হলে মহীতোষকে কেন বার বার ফিরিয়ে দিচ্ছে কবিতা!

মহীতোষ অবশ্য সোজাসুজি কিছু বলেনি কবিতাকে। লোকটা যেন কেমন ধারার! মন্দ তাকে বলা যাবে না, বরং একটু বেশিই ভালমানুষ। হাসপাতাল থেকে কোয়ার্টারে ফেরার পথে প্রকাণ্ড শিশুগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে থাকে মহীতোষ। প্রায় প্রতি বিকেলেই। ঝালুয়ার দক্ষিণ কিনারে কাঠ চেরাইয়ের কল আছে মহীতোষের, তারই কাজে তাকে নাকি রোজ আসতে হয় বাজারপাড়ায়।

কবিতাকে দেখে সন্তর্পণে এগিয়ে আসে মহীতোষ,—আপনার ডিউটি শেষ হল?

মাথার শুভ্র আবরণী থেকে ক্লিপ খুলতে থাকে কবিতা। একটু বুঝি হাসেও।

মহীতোষ খানিক চুপ থেকে বলে,—ঝালুয়ায় আপনার ভাল লাগছে?

কবিতা বিস্মিত হয়। অথবা বিস্ময়ের ভান করে। বলে,—কেন লাগবে না?

—না। জায়গাটার তো তেমন কিছু নেই।

—কে বলল নেই! থানা আছে, হাসপাতাল আছে, সিনেমাহল আছে, বাজার আছে, অত বড় একটা তিলাইদিঘি আছে, গাছপালা আছে...

—তা আছে। কিন্তু আপনার বারাসতের মতো তো আর জমজমাট নয়।

— আপনাকে কে বলল আমার জমজমাট জায়গা ভাল লাগে?

মুহূর্তে চল্লিশ বছরের মহীতোষের চোখ উজ্জ্বল হয়ে যায়,—আপনার ভিড় ভাল লাগে না? আপনার নির্জনতা ভাল লাগে?

উত্তর দেয় না কবিতা। বুঝি বা আবার একটু হাসে।

এরপর মহীতোষ অনেকক্ষণ নীরব হয়ে যায়। শিশুগাছের নীচে একটা হাওয়া খেলে সেই সময়। তক্ষুনি আচমকা গাছের ডালে কিচমিচ করে ওঠে পাখিরা। তাদের ভাষা বড় স্পষ্ট শোনায় কবিতার কানে। তারা বলে, মহীতোষের বউ পালিয়েছে আজ থেকে ন'বছর আগে। বউটা ছিল কলকাতার মেয়ে, ঝালুয়ার নির্জনতায় এতটুকু মন বসেনি তার। মহীতোষ এখন একা। ভীষণ একা।

কবিতা নরম গলায় প্রশ্ন করে,—আপনার শরীরটা এখন কেমন?

—ভাল। বেশ ভাল।

—পেটের ব্যথাট্যাথাগুলো আর আসে না তো?

—না। ঝালুয়া হাসপাতালে চিকিৎসার গুণ আছে।

কবিতা আচমকাই প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে একটু,—শুধু চিকিৎসারই গুণ আছে? সেবার নেই?

কাঁচা পাকা উশকো খুশকো চুলের চৌকো মুখ ধুতিপরা গাঁট্টাগোট্টা মানুষটা বেশ লজ্জা পায়। ডান হাত দিয়ে আড়াল করে বাঁ হাতটা। বাঁ হাতের তিনটে আঙুল নেই মহীতোষের। নিজের হাতে কাঠ চেরাই করতে গিয়ে যন্ত্রকরাতে উড়ে গেছে।

লাজুক মুখে বলে মহীতোষ,—সেবাও তো চিকিৎসা, নয় কি?

—খিদেটিদে হয় ঠিক মতন?

—হয়। কিন্তু বড় বেখাপ্পা সময়ে হয়। সকালে পেট পুরে খেলাম, দু ঘণ্টার মধ্যে আবার খিদে পেয়ে গেল। আবার কোনওদিন কাজের চাপে খাওয়া হল না, খিদেও পেল না। তবে খিদেটা যখন পায়, বড় কষ্ট হয়।

—পাশেই তো আপনার বাড়ি, গিয়ে খেয়ে এলেই পারেন?

—বাড়ি!

আবার নীরব হয়ে যায় মহীতোষ। আবার ওঠে হাওয়াটা। একটু ঘূর্ণির মতো ঘোরে মহীতোষ আর কবিতাকে ঘিরে। তবে পাখিরা তখন আর শব্দ করে না। নির্জন নীরবতা বুকে নিয়ে ঝালুয়ার সেই শেষ প্রান্তে ফিরে যায় মহীতোষ।

শিশুগাছের নীচে এসে কবিতা থমকাল সামান্য। মহীতোষ আজ নেই। কী হল মানুষটার? এসে ফিরে গেল?

দুদণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কবিতা আবার হাঁটা শুরু করল। কোয়ার্টারে ফিরে দেখল রুমঝুমের টিউটর এসে গেছে, বাইরের ঘরের চৌকিতে বসে পড়াচ্ছে রুমঝুমকে।

ঝালুয়ার এই কোয়ার্টারটা খুব বড় নয়। দুটো মাত্র ছোট ছোট ঘর, ছোট বারান্দা, একফালি খাওয়ার জায়গা, রান্নাঘর, বাথরুম। একটু জোরে কথা বললে এ ঘরের কথা ও ঘরে শোনা যায়।

কবিতা গলা নামিয়ে বকুলকে প্রশ্ন করল,—মাস্টারমশাইকে চা দিয়েছিস?

বকুল আস্তে কথা বলার ধার ধারে না, চেঁচিয়েই উত্তর দিল,—চিনি ছিল না। নিয়ে এলাম। এই বার দেব।

—আমাকেও দিস তবে। দুধসাদা পোশাক ছেড়ে একটা ফিকে নীল শাড়ি পরল কবিতা। চুল খুলে ছড়িয়ে দিল পিঠে। পাখার নীচে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট। ও ঘরে রুমঝুম রাইমস পড়ছে, কলি ভেসে আসছে এ ঘরে। টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার, হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর...

ছেলেটা খুব যত্ন নিয়ে পড়ায় রুমঝুমকে। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলে, মুখটা বড় মায়াবী। সামান্য ষাট টাকা করে পায়, তার জন্য সাত দিনই আসে। ওই কটা টাকাতে এত মনোযোগ দিতে পারে কী করে!

বাইরের ঘর ভেদ করে বারান্দায় এল কবিতা। প্রান্তে বসে পা ঝুলিয়ে দিল সিঁড়িতে।

আঁধার গাঢ় হতে শুরু করেছে ঝালুয়ায়। কবিতা আঁধারে চোখ মেলল। পলকে ইমার্জেন্সিতে শুয়ে থাকা যুবকটির মুখ ভেসে উঠেছে চোখে। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ক্ষতবিক্ষত মুখও। সুপ্রতিমের। লাশকাটা ঘরে সুপ্রতিম শুয়ে আছে নির্বিকার।

কবিতা দ্রুত দৃশ্যটাকে চোখ থেকে মুছে দিল। অন্ধকারে শিশুগাছটার দিকে তাকাল। দূরের গাছটা এখন নিরেট কালো। যেন তুলি দিয়ে আলকাতরা বুলিয়ে গেছে কোন শয়তান।

কবিতার বুকটা ডুবডুব করে উঠল।

মহীতোষ আজ এল না।

কেন?

চার

ঝালুয়ায় আঁধার ঘন হলে তুলসীদাসি রামায়ণখানা নিয়ে বসে রামবিলাস। নিজের ঘরের মেঝেতে বাবু হয়ে বসে সুর তুলে যায় একটানা। একই জায়গা পড়ে যায় রোজ। হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে বিয়ে করেছেন রাম, জনকরাজার দেশ থেকে অযোধ্যায় ফিরছেন রামচন্দ্র, সঙ্গে তাঁর সীতামাঈ।

লছমি ঘরে ঢুকে একটুক্ষণ কান পেতে শুনল অংশটা। মুখে আঁচল চেপে ফিক করে হাসল, আপ কভি আগে নেহি বাড়েঙ্গে কেয়া?

রামবিলাস চোখ থেকে চশমা নামাল। বেশ কিছুকাল ধরে কাছের জিনিস ঝাপসা দেখছিল রামবিলাস, ঝালুয়ায় আসার পর মনোময় তাকে একটা চশমা করিয়ে দিয়েছেন।

পঞ্চাশ বছরের কপালে দুটো অতিরিক্ত ভাঁজ ফেলে রামবিলাস বলল, এঁহি তক পড়নেমে আচ্ছা লাগতা হ্যায় রে। ইসকে বাদ মন নেহি করতা।

লছমি বলল, কেন?

—বাকি সবই তো দুখভরা কহানি। এরপরই তো রামজিকে বাপ বনবাসে পাঠাবে। তারপর রাবণ, সীতামাঈকে হরণ, যুদ্ধ...

—তারপর সীতাকে ত্যাগ...। লছমি লোটা থেকে ঢকঢক জল খেল।

কথাটা বিঁধল রামবিলাসকে। কিন্তু কিছু বলতে পারল না।

লছমি একদম বদলে গেছে। আগে কত দুবলি ছিল, ডরপুক ছিল। ঝালুয়ায় আসার পর গায়েগতরে অনেক ভারী হয়েছে লছমি, বাতও ফুটেছে। রামবিলাসের ভাবতে ভারী আশ্চর্য লাগে, জওয়ানিতে যে অউরত অত কালোকুষ্টি, চালিশ পেরোনো দেহে তার অত চেকনাই আসে কোত্থেকে! কালো বলে কালো! চটা ওঠা আবলুস কাঠ কা মাফিক ছিল লছমি। বড়া বড়া দাঁত! টিপি টিপি কপাল! শাদির সময়ে একবার দেখেই রাগে দুঃখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল রামবিলাস। ওই বউ নিয়ে, সে কিছুতেই এক খাটিয়ায় শোবে না। সম্পর্কই রাখবে না বউয়ের সঙ্গে। বাপ বহুত দহেজ নিয়ে ওই বহু ঘরে এনেছে, বাপই বুঝুক ওই বহু নিয়ে কী করবে।

যে কথা, সেই কাজ।

বিশ বছরের হাট্টাকাট্টা জোয়ান রামবিলাস তেজ দেখিয়ে ফিরে এল কলকাতায়। আর কখনও দেশে যাবে না। মনোবাবুর বাড়িতে সে তখন পুরানা নোকর, সেই বারো বছর বয়সে তাকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে গেছে এক দেশওয়ালি চাচা, বাবু মাঈজিও নিজের লড়কার মতো পেয়ার করে তাকে, তার কীসের চিন্তা? দেশ থেকে একটার পর একটা খত আসে, রামবিলাস জবাব দেয় না। মুলুক থেকে লোক এসে ঘরে যাওয়ার জন্য ঝোলাঝুলি করে, রামবিলাস তাদের ফিরিয়ে দেয়। শেষে দু সাল পর বাপের অসুখের মিথ্যে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে মুঙ্গেরে নিয়ে যাওয়া গেল রামবিলাসকে।

সে বারই রামবিলাস দ্বিতীয় শাদি করে ফিরল। এ বার বউ খুবসুরত হয়েছে, হাঁটাচলায় ছমকছল্লু ভাব, রামবিলাসের মেজাজ শরিফ হয়ে গেল। মনোময়ের বাড়িতেই কাজ করে, বছর বছর মুলুক যায়, মাহিনাভর থেকে আসে। রামবিলাসকে একে একে আটটা বালবাচ্চা দিল সরবতিয়া, রামবিলাস খেতিজমি বাড়াল। রামবিলাসের বালবাচ্চারা এখন সবাই সেয়ানা। লেড়কিদের শাদি হয়ে গেছে, এক লড়কা খেতিবাড়ি দেখে, দুই লড়কার জুট মিলে কাজ, আর দুজন এখনও পড়াশুনো করছে।

বছর চারেক আগে হঠাৎ মারা গেল সরবতিয়া। দেশে তার ক্রিয়াকরম সারতে গিয়েছিল রামবিলাস, তখনই কে যেন খবরটা দিল তাকে। লছমির নাকি এখন খুব খারাপ হাল। ভাইভাবীদের সংসারে ভইষের মতো খাটতে হয়, নোকরানির থেকেও বুরা দশা হয়েছে তার। শুনে কেমন চলকে গেল রামবিলাস। যে লছমিকে সাতাইশ বছরে একবারও মনে পড়েনি, তাকে দেখতে সোজা রকিবগঞ্জ চলে গেল। লছমির ভাইরা চোটপাট করতে এসেছিল, তাদের একটুও পাত্তা না দিয়ে লছমিকে নিয়ে চলে এল মুঙ্গের।

রামবিলাস অপরাধী মুখে লছমিকে বলল, তোকে আমি বহুত তকলিফ দিয়েছি, নারে?

লছমি জামাকাপড় ভাঁজ করছে। বলল, ভগবান আমার নসিবে যা লিখেছেন, তাই হয়েছে। এ নিয়ে এখন আর দুখ করে কী লাভ?

—তা হলে সীতামাঈকে ত্যাগ করার কথা বললি কেন?

লছমির মুখে ছায়া নামল, কিছু ভেবে বলিনি জি। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।

—মনের কথাই তো ভুল করে জবানে এসে যায় রে লছমি।

লছমি চুপ।

রামবিলাস বলল, আমি দুখ দিয়েছি, আমার বেটারা দুখ দিয়েছে...।মুঙ্গেরে তোকে এক সালও টিকতে দেয়নি ওরা।

—তো কী আছে! ওরা তো আমারও বেটা। বেটা মাকে দুখ দিলে, মাকে মনখারাপ করতে নেই।

রামবিলাসের বুকটা কেমন গলে গলে যাচ্ছিল। রামায়ণ বন্ধ করে লছমির পাশে উঠে এল। এই মেয়েকে পঁচিশ বছর ধরে পচিয়েছে সে! এই মেয়ের গোটা জওয়ানি কেটেছে শুধু মোষের পিঠ ডলে ডলে!

রামবিলাসের গলা কেঁপে গেল। আড়াই বছর ধরে বহু বার বলা কথাটা আউড়ে ফেলল আবার, আমি খুনি। আমি পাপী। আমার সাজা হওয়া উচিত।

লছমির চোখে কোনও সৌন্দর্য নেই। ভাষাও ফোটে না। তবু কী একটা যেন ঝিলিক দিয়ে গেল। বলল, আপনাকে বারণ করেছি না, ও কথা একদম নয়! ঝালুয়ায় এসে আমি সব ভুলে গেছি।

গলার কাঁপন এ বার ছড়িয়ে যাচ্ছে দেহে। রামবিলাস মোটা মোটা আঙুলে লছমির কাঁধ খামচে ধরল, তুই ভুলেছিস! আমি কেন ভুলতে পারি না রে লছমি?

সোহাগের এই পূর্বলক্ষণগুলো চেনা হয়ে গেছে লছমির। সে তড়িৎ গতিতে সরে গেল, আভি নেহি! বাবুকে খানা দিতে হবে।

কলকাতার বাড়ির মতো দেওয়ালঘড়ি নেই এখানে, আউটহাউসের ঘরে তাই একটা টাইমপিস রেখেছে রামবিলাস। ঝালুয়াতেই কেনা।

রামবিলাস টাইমপিসের দিকে চোখ রাখল, বাবুর এখনও খাওয়ার টাইম হয়নি। নটা বাজতে এখনও বিশ মিনিট বাকি।

লছমি ঘুরে তাকাল, বাবু এত টাইম মেপে খায় কেন?

—এ আর কী টাইম মাপা দেখছিস? কলকাতার বাড়িতে বাবুকে তো দেখিসনি! দেখলে বুঝতিস। এক মিনিট টাইম ইধার উধার হত না। ছটার সময়ে চা, আটটায় নাস্তাপানি, বারোটায় দুপুরের খানা, দুটোয় ফল। ঝালুয়ায় এসে বাবু আর সে বাবু নেই। বহুত চেঞ্জ হয়েছে। ঘড়ি আর মানে কই, বাগিচা নিয়েই পড়ে আছে দিনভর।

আউটহাউসের সামনেই মনোময়ের ফুলবাগান। ঘরের আলো আঁধারকে তরল করে দিয়েছে অনেকটা, দিব্যি দেখা যাচ্ছে ফুলেদের। বাগান আলো করে আছে বেল মল্লিকা গোলাপ। হালকা সুগন্ধ ভেসে আসছে লছমির ছোট্ট ঘরে।

লছমি বাগানের দিকে তাকিয়ে বলল, ফুল কখনও দাগা দেয় না। ফুল নিয়েই থাকা ভাল। বাবু ভাল আছে।

—তা আছে। রামবিলাসও বাগানে চোখ ফেলেছে, বাবুর তবিয়ত এখন অনেক ভাল। মাঈজির স্বর্গবাসের পর কী যে হাল হয়েছিল বাবুর। দিন বুখার। দিন খাঁশি। এখানে কখনও বিমারিতে পড়তে দেখেছিস বাবুকে? জিন্দা গুড়িয়াটাকে পেয়ে বাবু যেন আরও ভাল হয়ে গেছে।

লছমি অন্যমনস্কভাবে শুনছিল। কিংবা শুনছিল না। হঠাৎ রামবিলাসের কাছে ঘেঁষে এল,—এক বাত কহুঁ?

—কেয়া।

—দেশে ফেরার মতলব আপনি বিলকুল ছেড়ে দিন জি। কী হবে ফিরে?

লছমিকে দেশে ফেরার কথাটা মাঝে মাঝে বলে রামবিলাস। কিন্তু নিজের মনেই ঠিক যেন জোর পায় না। এতদিন ধরে সে দেশছাড়া, এখন দেশে পাকাপাকিভাবে গেলে আর কি সেখানে নিজেকে খাপ খাওয়ানো যাবে? মাটি একবার ছেড়ে এলে মাটিও পর হয়ে যায়। দেশে গিয়ে মাঝে মাঝে নিজের বালবাচ্চাদেরই কেমন অচেনা অচেনা লাগত রামবিলাসের! পড়োশিরা যখন এসে দেশগাঁয়ের কথা বলত, এ-বাড়ি ও-বাড়ির গল্প শোনাত, কিছুই যেন তেমনভাবে মাথায় ঢুকত না। আপনা মুলুকের খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিতে গিয়েও কখনও কখনও কী অস্বস্তি। আবার যেই ট্রেন থেকে হাওড়া স্টেশনে নামল, শরীর মন বিলকুল চাঙ্গা। এই যে আড়াই বছর দেশে যায়নি রামবিলাস, তাতেই বা কী এমন মনখারাপ হয়েছে তার!

তবু এক বারে লছমির পরামর্শ মানল না রামবিলাস। ক্ষীণ প্রতিবাদ জুড়ল, বলিস কী লছমি? নিজের ঘরে নিজে ফিরব না? আপনা খেতিবাড়ি দেখব, আপনা গাঁওয়ে মরব...

লছমি ভুরু কুঁচকে দেখল রামবিলাসকে। বলল, এ আপনার দিল কি বাত নয়, আমি জানি। দেশে গিয়ে আপনি খালি বাবুর কথা বলেন। বুড়াবাবুকে ছেড়ে আপনি থাকতেই পারবেন না।

রামবিলাস হেসে ফেলল। লছমিকে যত বোকা ভাবে তত বোকা তো নয়! সত্যিই বাবু তার দিমাগে ঢুকে গেছে। বাবু বেঁচে থাকতে সে যাবে কোথায়!

হাসতে হাসতে রামবিলাস বলল, আমি কি আভি যাওয়ার কথা বলেছি? বাবু বুড়া আদমি, বাবুর যদি কিছু হয়ে যায়, তখন কী করব? কোথায় যাব?

—কেন, আমরা এই মকান পাহারা দেব।

—এই মকান বাবুর ছেলেরা থোড়ি রাখবে! কলকাতায় অত বড় মকান ছিল, সেখানেই কেউ থাকল

না। যে যার মতো আলাদা হয়ে গেল। বাবু মরে গেলে ছেলেরা এই মকান জরুর বেচে দেবে।

—তো?

—তো আবার কী? চলো মুসাফির আপনা ঘর।

লছমি আবার কী যেন ভাবল। বলল, এক কাম করেন তা হলে। আপনার তো কিছু রুপিয়া আছে, বাবুর কাছ থেকে কিছু উধার নিন, তারপর ঝালুয়াতে একটা ঘর তুলে বসে যান। চাই তো এখানে একটা দুকানও খুলে দিতে পারেন। দুজনেরই পাকাপাকি বন্দোবসত্।

কথাটা এভাবে কখনও ভেবে দেখা হয়নি! রামবিলাস আগে মরলে লছমির কী গতি হবে! মুঙ্গেরে তো ঠাঁই নেই লছমির।

রামবিলাস শব্দ করে হাসল, বুদ্ধিটা মন্দ দিসনি।

লছমি টেরচা চোখে দেখছে রামবিলাসকে, আমি এই ঝালুয়াতেই মরব, হাঁ।

রামবিলাস রসিকতা করল, এত পেয়ার হয়ে গেল ঝালুয়ার সঙ্গে?

লছমি ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকাল। নটা বাজছে। আর কথা নয়, এ বার খানা দিতে যাবে বাবুকে।

রামবিলাস পিছু ডাকল, কী, বললি না যে, ঝালুয়া কেন এত ভাল লাগল?

লছমি দরজার চৌকাঠে দাঁড়াল একটু। চোখটা হঠাৎ বুজে ফেলে বলল, আপ যো এঁহি মুঝে মিলা জি।

লছমি কথাটা বলেই ছুটে চলে গেছে। রামবিলাসের মন এক বিচিত্র পুলকে ভরে যাচ্ছিল। কথাটা বলার সময়ে কুৎসিত মেয়েটা কেমন এক পলকে সুন্দর হয়ে গেল। ঠিক যেন ম্যাজিক।

একেই কি পেয়ার বলে!

সরবতিয়ার গর্ভে আটটা বালবাচ্চা হয়েছে রামবিলাসের, কই সরবতিয়াকে দেখে কখনও তো ঠিক এই অনুভূতি আসেনি মনে!

ঝালুয়ার আকাশে এখন অনেক তারা। চাঁদ ওঠেনি বলে তারারা যেন আরও বেশি চমক মারছে।

রামবিলাস একটা বিড়ি ধরিয়ে বাইরে এল। অনেক রকম এতাল বেতাল চিন্তা ঘুরছিল তার মাথায়। চারদিন পরে মহালয়া, তারপর ঝালুয়া জুড়ে পুজোর বাজনা বাজবে। পুজোর পরে বাবুর ছেলেমেয়েরা আসবে বিজয়া করতে। প্রতিবারই আসে। দু-চার দিন থেকেও যায়। জোর হল্লাগুল্লা চলে বাড়িতে। পুজোর আগেই ঘরগুলো সব ভাল করে সাফ করতে হবে। পিছনের ঘর দুটো বহু দিন বন্ধ পড়ে আছে, লছমিকে সঙ্গে নিয়ে কাল থেকেই নেমে পড়বে কাজে। কুয়োর কপিকলটারও দড়ি ছিঁড়ে গেছে, জল তুলতে কষ্ট হচ্ছে বেশ, কাল বাজার থেকে মনে করে দড়ি কিনতে হবে। গাঁদার চারা লাগানো জমিটাতেও আরেক বার নিড়েন দেওয়া দরকার।

হঠাৎই একটা বেখাপ্পা ভাবনা ধেয়ে এল রামবিলাসের মনে। লছমির একটা বাচ্চা হলে বেশ হয়। সরবতিয়ার সঙ্গে তো চিরকাল দূর থেকেই সংসার করেছে, বালবাচ্চা নিয়ে রামবিলাসের সেভাবে ঘর করা হল কই।

লছমির বাচ্চা খেলে বেড়াবে রামবিলাসের ঘরে। বসে বসে দেখবে বুড়ো রামবিলাস। খেলতে খেলতে বাচ্চাটা ছুটে আসবে রামবিলাসের কাছে। আধো আধো গলায় জিজ্ঞাসা করবে, ঝালুয়া তোমার এত পেয়ারা কেন বাবুজি?

বুড়ো রামবিলাস হাসবে মাথা নেড়ে। বলবে, আপ যো এঁহি মুঝে মিলা জি।

পাঁচ

তিলাইদিঘি পুরো একটা পাক দিলে পাক্কা এক মাইল। পূর্ণেন্দু হিসেবটা জানে। কিন্তু এই পথটুকু কিছুতেই আড়াই মিনিটের কমে ঘুরে আসতে পারছে না সে। আরও গতি বাড়াতে হবে। আরও। আড়াই মিনিটটাকে দুমিনিটে নামাতে হবে। হবেই।

বড় পিপুল গাছটার পাশে এসে পূর্ণেন্দু সাইকেলটা আরেকবার ভাল করে পরখ করে নিল। চাকার পাম্প ঠিকই আছে, কিন্তু এ তো আর রেসিং সাইকেল নয় যে, পেশাদারি নিপুণতায় সাঁই সাঁই ছুটবে।

এ হল গিয়ে অফিসকাছারি করা কেরানি সাইকেল, বাবার রিটায়ারমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যেও কেমন নিরাসক্তভাব এসে গেছে। প্যাডেলে চাপ মেরে যতই হাঁটু অবশ করে ফেলো, চাকা দুটো নিজের খেয়ালেই ঘুরবে। সাইকেলটাও এখন বোধ হয় ঘরে বসে পেনশন খেতে চায়।

উপায় নেই, এই সাইকেল নিয়েই পূর্ণেন্দুকে লড়ে যেতে হবে। চাইলেই বা রেসিং সাইকেল সে এখন পাবে কোথায়? অন্তত ঝালুয়ায় তো মিলবে না। পঞ্চাশ মাইলের রেসে গোটা ঝালুয়া থেকে পূর্ণেন্দু ছাড়া আর কেই বা নাম দেয়!

মিলিটারি চেহারার এক বুড়ো পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বুড়োটাকে চেনে পূর্ণেন্দু। মনোময় সরকার না সরখেল কী যেন নাম। খুব বেশি দিন আসেনি ঝালুয়ায়। দু-তিন বছর হবে। বুড়োটা এমনিতে বেশ ভাল, দুর্গাপুজো কালীপুজোয় চাঁদা চাইতে গেলে এককথায় মোটা টাকা দিয়ে দেয়। কথাও বলে হেসে হেসে। কিন্তু প্যান্ডেল মাড়ায় না। একটু যেন খিটকেল ধরনের! রোজ ভোরে পূর্ণেন্দু যখন সাইকেলে চক্কর দেয়, কেমন কটকট করে তাকিয়ে থাকে লোকটা!

পূর্ণেন্দুকে পার হতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল বুড়ো, কী হে, তুমি থেমে গেলে যে?

পূর্ণেন্দু স্ট্যান্ডে সাইকেল দাঁড় করিয়ে পিছনের চাকার স্পোকে চাপ দিচ্ছিল। বনবন ঘুরছিল চাকাটা। ডাক শুনে তাকাল, আপনি আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ তুমি। তুমি ছাড়া এখানে আর আছে কে? হঠাৎ থামলে যে আজ?

কৈফিয়ত চায় নাকি? বাড়িতে কৈফিয়ত, রাস্তাঘাটে কৈফিয়ত, বন্ধুবান্ধবদের কাছে কৈফিয়ত, টিউশনি বাড়িতে কৈফিয়ত, শেষে এখন এই বুড়োকেও কৈফিয়ত দিতে হবে! যথেষ্ট বিরক্ত হলেও রাগটা দেখাল না পূর্ণেন্দু। ঝালুয়ার ভোরে, তিলাইদিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ রেগে ওঠা মানায় না।

মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, সাইকেলটা একটু টেস্ট করছিলাম। কেন বলুন তো?

—তোমার দৌড়ের সঙ্গে আমার হাঁটার একটা সম্পর্ক আছে যে। তোমার আট পাক ঘোরা হলে আমার মর্নিংওয়াক শেষ হয়। তুমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলে আমাকে বেশি হাঁটতে হবে না?

পূর্ণেন্দু হেসে ফেলল, সরি। আমি দাঁড়িয়ে পড়লে অন্যের অসুবিধে হয়, জানা ছিল না। এ বার থেকে মনে রাখব।

—হ্যাঁ। রেখো। আর শোনো, চক্কর মারতে মারতে হঠাৎ থেমে গেলে দমে ঘাটতি পড়ে। নতুন করে মাসলগুলো বুস্টআপ করতে অনেক সময় লেগে যায়। এমনিতেই তোমার পায়ের মাসল তেমন পাওয়ারফুল নয়, দমে টান পড়লে তো এ বার ফিফথ্ পজিশানও জুটবে না।

পূর্ণেন্দু অবাক, আপনি আমার গত বারের রেস দেখেছেন?

ঘাড় দুলিয়ে হাসছে বুড়ো, বাহ, তুমি ঝালুয়াকে রিপ্রেজেন্ট করছ, দেখব না? তোমার আরেকটা ডিফেক্ট আছে। চালানোর সময়ে বডিটাকে অত বেন্ড করো কেন? লং ডিসট্যান্সে ওতে কোমরে স্ট্রেন পড়ে। বডিটাকে খানিকটা আর্চ করো। ধনুক হয়ে যাও। হাতের প্রেশারটা এমনভাবে হ্যান্ডেলে রাখো যাতে অটোমেটিকালি তোমার পা আরও জোরে ঘুরতে চায়।

ফাঁকতালে বুড়ো দিব্যি উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। পূর্ণেন্দু প্রশ্ন করল, আপনিও সাইক্লিং করতেন নাকি?

—পূর্বাশ্রমের কথা নিয়ে আমি আলোচনা করি না। যা বললাম শোনো। দেওয়ালির দিন উপকার পাবে। ঘাড় গোঁজ করে ভিক্টরি স্ট্যান্ডে অন্যদের হাসি দেখতে হবে না।

বুড়ো আবার হাঁটা শুরু করেছে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে বুড়োকে দেখল পূর্ণেন্দু। ঠিক উপদেশ নয়, আরও কিছু যেন আছে বুড়োর কথায়। অনেকটা যেন পূর্ণেন্দুর নিজেরই অন্তরের কথা বলে গেল বুড়ো।

পূর্ণেন্দু সাইকেলে উঠে প্যাডেলে চাপ দিল। রডের সমান্তরালে বডিটাকে ঝুঁকিয়েও কী ভেবে খানিকটা সোজা হয়ে নিল, শরীরের ভর ছাড়ার চেষ্টা করল হ্যান্ডেলে। সত্যিই তো, পায়ের চাপ অনেকটা কমে গেল যেন! সাইকেলও ছুটছে বাঁইবাঁই!

এক পাক পূর্ণ করে পূর্ণেন্দু ঘড়ি দেখল। পুরো আট সেকেন্ড টাইম কমে গেছে।

চোখে দেখেও পূর্ণেন্দুর ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। এত দিন ধরে প্র্যাক্টিস করছে সে, দশ সেকেন্ড টাইম কমাতে এক মাস লেগে যায়। আর আজ হঠাৎ বুড়োর একটা কথাতেই একবারে আট সেকেন্ড! ধুস,

বিশ্রাম নেওয়ার জন্যও তো শক্তি একটু বেশি সঞ্চয় হয়ে থাকতে পারে।

দ্বিতীয় পাক ঘুরে পূর্ণেন্দু আরও অবাক হল। আরও তিন সেকেন্ড কমেছে! একি ভোজবাজি নাকি!

তৃতীয় পাক ঘুরল পূর্ণেন্দু। চতুর্থ পাক। পঞ্চম পাক। না, সময় আর কমানো যাচ্ছে না, তবে শরীরটা অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক ঝরঝরে লাগছে আজ। সপ্তম পাক দেওয়ার সময়ে বুড়োটাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য খুঁজল পূর্ণেন্দ। নেই। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে। কুছ পরোয়া নেই, কাল তো আবার আসবেই।

তিলাইদিঘির জল থেকে একটা ভাপ উঠছে। দিঘির বুকে হালকা কুয়াশা কুয়াশা ভাব। এখানে কাপড়চোপড় কাচা হয় না, ঝালুয়ার লোকজন শুধু স্নান করতে আসে এই জলে। জলটিও ভারী টলটলে। নরম এক সবজে আভা লেপটে থাকে গায়ে। চার পাশ ঘিরে ঝালুয়ার যত অফিস। সরকারি। বেসরকারি। থানা। ব্যাঙ্ক। ভোরে এখন ঘুমোচ্ছে বাড়িগুলো, আরও কয়েক ঘণ্টা পরে প্রাণচঞ্চল হবে পাড়াটা।

কুড়ি পাকের পর থেকে একটু একটু করে ক্লান্ত হচ্ছিল পূর্ণেন্দু। হাঁটুতে নয়, ফুসফুসে। কিন্তু এখন থামা যাবে না। পঁচিশ পাক তার আজকের শিডিউল। প্রত্যেক দিনই একটা করে পাক বাড়াচ্ছে সে। এমনভাবে চার্ট তৈরি করেছে, যাতে কালীপুজোর পাঁচ-সাত দিন আগেই টানা পঞ্চাশ পাকে রপ্ত হয়ে যায় শরীর। তারপর একদিন বিশ্রাম, একদিন পঞ্চাশ পাক। একদিন বিশ্রাম, একদিন পঞ্চাশ পাক।

ব্যাস, মহড়া শেষ। পূর্ণেন্দু প্রস্তুত।

ফেরার পথে আশপাশের অফিসগুলোর দিকে একবার হিংস্র চোখে তাকিয়ে নিল পূর্ণেন্দু। এই সব অফিসের একটাতেও ঠাঁই হয়নি তার। বি.এ. পাশ করার পর প্রতিটি দরজায় ঘুরে ঘুরে জুতোর সুকতলা ক্ষয়ে গেছে, একটা চাকরি জোটেনি। এদের ওপর প্রতিশোধ নিতেই এবারকার রেসটা জিততেই হবে পূর্ণেন্দুকে। ফার্স্ট প্রাইজটা পেলেই জীবনের গতিপথ বদলে যাবে পূর্ণেন্দুর। ফার্স্ট প্রাইজটা কম নয়, অনেক টাকা। দশ হাজার। ওই টাকায় পূর্ণেন্দু লটারির দোকান দেবে একটা। ঝালুয়ায় লটারি-ব্যবসার এখন খুব রমরমা, ফেলে ছড়িয়ে হাতে দেড়-দুহাজার টাকা থাকবে প্রতি মাসে। শুধুমাত্র গোটা কতক টিউশনির টাকায় আর টানতে পারছে না পূর্ণেন্দু।

বেলা বেড়েছে।

পূর্ণেন্দু বাড়ি ফিরে সাইকেলটা রাখল বারান্দায়। আড়চোখে দেখে নিল বাবা বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে, রোজকার মতোই কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে পূর্ণেন্দুকে দেখে নিল একবার, কী, বাবুর কসরত শেষ হল?

পূর্ণেন্দু সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, হল।

—আমার কথাটা মনে আছে?

—কী কথা?

—বাহ, ভুলে মেরে দিয়েছ? কোথায় যে মন থাকে! তোমাকে একবার সান্যালবাবুর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম না?

—আমার সময় হবে না। দুপুরে টিউটোরিয়াল হোমে ক্লাস নিতে হবে।

—তা সময় হবে কেন? টিউশনিতে গেঁথে গেলে আর কি চাকরির চিন্তা মাথায় থাকে!

—সান্যালবাবুর কাছে গেলেই চাকরিটা হবে?

—গিয়ে দেখতে দোষ কী?

পূর্ণেন্দুর কথা বাড়াতে ইচ্ছে করল না। চাকরির চেষ্টায় তার ঘেন্না ধরে গেছে। কিন্তু এ কথা বাবাকে বলা মানেই কুরুক্ষেত্র আহ্বান করা। বাবা দুটো চিমটি কাটবে, সেও দুটো পটকা ছুড়বে, ঘরের ভেতর থেকে ভাইবোনেরা খিকখিক হাসবে, মা সিঁটিয়ে থাকবে রান্নাঘরে, এই তো এখন এ বাড়ির দৈনন্দিন চিত্র। পেটে আগুন জ্বলছে, এখন এ সব কি ভালও লাগে?

চটপট কুয়ো থেকে জল তুলে স্নান সেরে নিল পূর্ণেন্দু। মা আজ তার জন্যে জলখাবারে একটা ডিমসেদ্ধ রেখেছে। গোটা ছয়েক আটার রুটি, আলুর তরকারি আর ডিমটা খেয়ে পূর্ণেন্দু বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

বাদামতলার দিকে এগোচ্ছিল পূর্ণেন্দু। বাদামতলা ঝালুয়ার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে, বাজার হাসপাতাল পেরিয়ে আরও খানিকটা যেতে হয়। ক্লাস সেভেনের একটা ছাত্র আছে বাদামতলায়, তাকে দিয়ে শুরু হয় পূর্ণেন্দুর টিউশনির দিন।

বড় রাস্তায় এসে হঠাৎ ওপারে চোখ আটকে গেল পূর্ণেন্দুর। রুমঝুমের মা না!

হাতে একটা ভারী ব্যাগ নিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটছে কবিতা। থেমে থেমে। দেখেই বোঝা যায় হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

পূর্ণেন্দু দ্রুত রাস্তা পার হল, আপনি বাজারে এসেছিলেন আজ?

কবিতা চমকে তাকাল, ও, মাস্টারমশাই।

—হ্যাঁ...মানে...আপনাকে দেখতে পেলাম। পূর্ণেন্দু সামান্য তোতলাল,—আমি তো এ দিকেই থাকি। শিবমন্দিরের পাশের গলিতে।

—জানি। কবিতা একটু হাসল, বকুলের শরীরটা ভাল নেই। আমাকেই বাজারে আসতে হল।

—দিন। থলিটা আমার হাতে দিন।

—না না, ঠিক আছে। আমি পারছি।

—দিন না। আমি তো ওদিকেই যাচ্ছি। এগিয়ে দিই একটু।

কবিতার হাত থেকে ব্যাগটা প্রায় কেড়েই নিল পূর্ণেন্দু। পাশাপাশি হাঁটছে দুজনে। কথা বলছে টুকটাক।

কবিতা জিজ্ঞাসা করল, আপনার ছাত্রীর প্রগ্রেস কেমন দেখছেন? কিছু শিখবে টিখবে বলে মনে হয়?

—কেন শিখবে না? রুমঝুম খুব ভাল মেয়ে। এখনই কার্সিভ রাইটিং বেশ ভাল পারছে।

—পারলেই ভাল। যা চঞ্চল। সবসময়ে ছটফট করছে।

পূর্ণেন্দু আবার বলল, না না। রুমঝুম খুব ভাল মেয়ে।

কবিতা বেশ খানিকক্ষণ নীরব। হঠাৎই আনমনে বলল, মেয়েটার জন্য সেভাবে তো ঠিক সময় দিতে পারি না। সারা দিন কাজের লোকের কাছে থাকে...

পূর্ণেন্দু বলল, ওটা মনে হয় রুমঝুমের অভ্যেস হয়ে গেছে।

—তা হয়েছে। ওর জন্মের আগে থেকেই তো কাজ করছি আমি। তবু...কী একটা যেন, বলতে গিয়েও কবিতা থেমে গেল।

পূর্ণেন্দু কবিতাকে দেখছিল। কবিতার চোখ দুটো খুব বড় নয়, তবে ওই চোখে সবসময় একটা ভাষা ফুটে থাকে। ভাসানের দিন দুর্গাপ্রতিমার চোখে যে ভাষা থাকে, ঠিক যেন তেমনটাই। পূর্ণেন্দুর কেমন গা ছমছম করে। কী একটা হতে থাকে ভেতরে! কী যেন! মাজা রং, ছোট্টখাট্টো চেহারা, পানপাতা মুখ, ওই মহিলার এক গোপন দ্যুতি এক লক্ষ চুম্বকের মতো টানতে থাকে পূর্ণেন্দুকে। কবিতার সঙ্গে তার কথা হয় খুব কম। রুমঝুমকে যখন পড়ায় পূর্ণেন্দু, কবিতা ফেরে ক্লান্ত হয়ে। কোনও দিন বা দাঁড়িয়ে একটু কথা বলল পূর্ণেন্দুর সঙ্গে, কোনও দিন বা খেয়ালই করল না পূর্ণেন্দুকে। না করুক, ওই যে একবার রোজ শুভ্র বিষাদ শরীরে মেখে পূর্ণেন্দুর সামনে দিয়ে হেঁটে অন্দরে চলে যায়, তাতেই এক অদ্ভুত দুঃখী মোহে জারিত হতে থাকে পূর্ণেন্দু।

কবিতার জন্য কিছু করতে ইচ্ছে করে পূর্ণেন্দুর। পৃথিবীর সব আনন্দ জড়ো করে যদি কবিতার হাতে তুলে দিতে পারত পূর্ণেন্দু!

কিন্তু পারবেই বা কী করে? পূর্ণেন্দু নিজেই এত অক্ষম!

পূর্ণেন্দু খুব নিচু গলায় বলল, আপনি কিছু ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কবিতা একবার চোখ তুলে দেখল পূর্ণেন্দুকে। ম্লান হাসল, রুমঝুমের কথা বাদ দিন। আপনার কথা বলুন। গত মাসে কলকাতায় যে ইন্টারভিউ দিতে গেলেন, কোনও খবর এল?

—নাহ। পূর্ণেন্দু জোর করে হেসে উঠল, চাকরি বাকরি আমার কপালে নেই। ঝালুয়াতেই কিছু জোটাতে পারলাম না...

—একটা ব্যবসা ট্যবসা শুরু করে দিন না। চারদিকে কত রকম স্কিম টিম হচ্ছে...

—ও সবের জন্যও অনেক তদ্বির তদারকি লাগে। লোককে তেল মেরে মেরে আমার তেলের স্টক ফিনিশ, নতুন করে আবার তেল ঢালা পোষাবে না। পূর্ণেন্দুর স্বর দৃঢ় হল,—তবে ব্যবসাই করব ঠিক করেছি। আশা করছি একটা জায়গা থেকে টাকা পেয়েও যাব।

—হুঁউ?

কবিতা কি বিশ্বাস করল না কথাটা?

আবেগের মাথায় হঠাৎ উচ্ছল হল পূর্ণেন্দু, টাকাটা আমি পাবই। এ বার আমাকে কেউ হারাতে পারবে না।

কবিতা অবাক হয়ে তাকাল, কীসে হারাতে পারবে না?

—আপনি জানেন না? ও, আপনি জানবেনই বা কী করে? আপনি তো গত বছর ঝালুয়ায় আসেননি। দেওয়ালির দিন ঝালুয়ায় একটা সাইকেল রেস হয়। বড় রেস, পঞ্চাশ মাইলের। তিলাইদিঘিকে ঘিরে পঞ্চাশ পাক। অনেক জায়গা থেকে কম্পিটিটর আসে। কলকাতা থেকেও।

—ও।

পূর্ণেন্দু কবিতার অনাগ্রহ লক্ষই করল না। তুমুল উৎসাহে বলেই চলেছে, কম্পিটিশনে ঝালুয়ায় মাত্র একজনই থাকে। আমি। জানেন, গত বারে আমি ফিফথ হয়ে গেলাম। চল্লিশ পাক অব্দি আমিই লিড করছিলাম, তারপর...। প্রাইজমানিটা খুব ভাল। দশ হাজার। ওটা এ বার আমাকে পেতেই হবে।

কবিতা এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

পূর্ণেন্দু নিজের ঘোরে ডুবে যাচ্ছিল। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে তার লটারির দোকানটাকে। ঝালুয়ার বাজারে জ্বলজ্বল করছে নাম। গুড লাক। দোকানের ঝাঁপ ফেলার আগে রোজ একটা করে টিকিট সরিয়ে রাখবে পূর্ণেন্দু। প্রতিটি লটারির। যত্ন করে পকেটে রেখে দেবে টিকিটগুলো। তারপর একদিন ছুটতে ছুটতে কবিতার সামনে গিয়ে ফেলে দেবে একটা টিকিট। এই দেখুন, ভাগ্য ঘুরে যায়। এই দেখুন, আপনার নাম করে কেটেছিলাম। এই দেখুন, আমি আপনার ভাগ্য ঘুরিয়ে দিলাম।

পূর্ণেন্দুর হঠাৎ খেয়াল হল কবিতা অনেকটা পিছিয়ে গেছে। আবার পাশে আসার পর বলল, আপনি কখনও দেখেছেন সাইকেল রেস?

কবিতা দুদিকে মাথা নাড়ল।

—ভাবতে পারবেন না, ঝালুয়া জুড়ে সেদিন কী এক্সাইটমেন্ট! হাজার হাজার দর্শক দিঘির পাড়ে ভিড় করে, বিশাল শামিয়ানা, মাইকে গান, নাটুদা, সমরদা সমানে রিলে করে চলেছে...বলতে বলতে থামল পূর্ণেন্দু, আপনি শুনছেন না?

—কই, শুনছি তো।

—না। আপনি শুনছেন না। দেখেননি তো কোনও দিন, তাই বুঝতে পারছেন না। দারুণ রোমাঞ্চকর। কুড়ি-পঁচিশটা সাইক্লিস্ট সাইকেলের ওপর ঝুঁকে বনবন সাইকেল চালাচ্ছে, সাঁ সাঁ টার্ন নিচ্ছে, কেউ কাউকে জায়গা দিচ্ছে না, এ ওকে কাটিয়ে বেরোচ্ছে...দুজন তো গত বার ধাক্কা খেয়ে পুকুরের জলে ছিটকে গেল। আমি নেহাত স্পিডটা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম...।

—হয়েছে, চুপ করুন। কবিতা আচমকা গলা উঠিয়েছে, আমার স্পিড ভাল লাগে না মাস্টারমশাই।

পূর্ণেন্দু চুপসে গেল। কী বলবে হঠাৎ ভেবে পেল না। খানিকটা দিশেহারার মতো বলল, সাইকেল রেস আপনার ভাল লাগে না?

—আমার কোনও রেসই ভাল লাগে না। হাসপাতালের গেট এসে গেছে, পূর্ণেন্দুর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিল কবিতা, আসি।

পূর্ণেন্দু মরিয়া হয়ে বলল, আপনি আমার রেস দেখতে যাবেন না?

কবিতা আলগাভাবে বলল, দেখি। এখনও তো দেরি আছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ চলে আসবেন। রুমঝুমকে আনবেন, ওর ভীষণ ভাল লাগবে। রোজ ভোরবেলা উঠে প্র্যাক্টিস করি, আপনারা কেউ যদি দেখতে না আসেন...

—বেশ। সে নয় দেখা যাবে। উদগ্রীব পূর্ণেন্দুকে একফালি হাসি উপহার দিল কবিতা। তারপর হাঁটতে হাঁটতে মিলিয়ে গেল শিশুগাছটার পিছনে।

পূর্ণেন্দুর বুকে একটা দ্রিম দ্রিম ধ্বনি বাজছিল। কবিতা আসবে। কবিতা পূর্ণেন্দুর জয় দেখতে আসবে। মন থেকে সমস্ত দুঃখ গ্লানি মুছে যাচ্ছে পূর্ণেন্দুর।

পূর্ণেন্দু নিজেকেই নিজে বলল, আমি কিন্তু সেদিন শুধু রুমঝুমের মাস্টারমশাই থাকব না। সেদিন আমি পুরোদস্তুর পূর্ণেন্দু হয়ে যাব।

ছয়

...প্রাণেশ্বরী বকুলবালা, বহু কাল কাটিয়া গেল তোমার কোনও সংবাদ পাই না। আশা করি ওঁ শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল। অনেক কষ্ট করিয়া তোমার বর্তমান কাজের বাড়িব সাকিন জোগাড় করিয়াছি। বেলঘরিয়ায় তোমার দিদি জামাইবাবুর বাড়িতে গিয়াছিলাম, উহারা তোমার খবর দেন নাই। খুঁজিয়া ২ তোমার আগের কাজের বাড়ি গিয়াছিলাম, তাহারাও তোমার হদিস দিতে পারিল না। উলটে বলিল তুমি নাকি দুই শত টাকা অগ্রিম নিয়াছিলে, ফেরত দাও নাই। উহাবা আমার নিকট টাকাটা দাবি করিয়াছিল। আমি দিই নাই। তোমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কেন দিব বলো?

উঁউঁউহ প্রেমের একেবারে ধুচুকুনি! বাড়ি থেকে পাছায় লাথি মেরে বার করে দিয়ে এত দিন পর ধানাই পানাই! ব্যাটার মতলবটা কী?

নরেন বিকৃত মুখে চিঠিটা ভাঁজ করে বালিশের তলায় রাখল। হেলান দিয়ে বসল বালিশে। রমলারও কি এই সময়েই ঘরে না এলে চলছিল না?

রমলা টেরচা চোখে দেখেছে নরেনকে, কী লুকোলে বালিশের তলায়?

—ও কিছু না। অফিসের চিঠি। আমাকে দিয়েছে।

—অফিসের চিঠি তো লুকোবে কেন?

—লুকোইনি তো। রেখে দিলাম। তুমি ঘরে এলে, তোমার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলি।

রমলার চোখে তবু কুটিল সন্দেহ, কী আছে তোমার চিঠিতে?

—এইই, ভাল ভাল কথা। নরেন ঝটপট বানিয়ে চলল, আমার কাজ দেখে সরকার খুব খুশি। ঝালুয়ার লোক রিপোর্ট করেছে, আমার মতো কাজের পিওন তারা নাকি আর দেখেনি। সরকার ভাবছে আমাকে কোনও ইনক্রিমেন্ট দেওয়া যায় কি না। ইনক্রিমেন্ট মানে অনেক টাকা, বুঝলে? যদি পেয়ে যাই, প্রথম মাসে তোমাকে একটা নাকছাবি গড়িয়ে দেব। তোমার কত দিনের শখ...

—না না, নাকছাবি করে পয়সা নষ্ট করতে হবে না। রমলা কিছুটা গলল যেন,—তুমি বরং আমাকে একটা দামি শাল কিনে দিয়ো। কাশ্মীর থেকে শালওয়ালারা আসে, কী সুন্দর সুন্দর নকশা করা শাল থাকে ওদের কাছে। ঝুমার মা একটা কিনেছে। মাসে মাসে টাকা দিতে হয়। গায়ে লাগে না।

—তাও কেনা যায়। তবে নাকছাবিটা তোমাকে মানাত ভাল। নরেন উশখুশ করছে, তোমার রান্নাবান্না হল?

—ডিমের ঝোল বসিয়ে এসেছি। এ বার রুটি করব। রমলা বাক্স খুলছে। একটা পাতলা কাঁথা বার করে খাটে ছুড়ে দিল।

—এটা কী হবে?

—গায়ে দেবে।

—এখনও কাঁথা গায়ে দেওয়ার মতো ঠাণ্ডা পড়েনি।

—কে বলেছে? ভোরের দিকে বেশ শীত শীত করে। ঝালুয়ায় ঠাণ্ডা তাড়াতাড়ি পড়ে।

—পড়ে। কিন্তু এ বার পড়েনি। নরেন গাঁইগুঁই করল, রাতে পাখাটা কমিয়ে দিলেই হয়।

—যা বলছি শোনো। তক্কো কোরো না। তোমার ঠাণ্ডার ধাত, কালও রাত্তিরে খ্যাকর খ্যাকর করে কাশছিলে।

—ওটা তো বিড়ির কাশি।

—তা হলে বিড়িও খাবে না। রোগাভোগা মানুষ, যা বলছি তাই শুনবে। আগের বারের মতো বিছানায় শুয়ে পড়লে ভুগবেটা কে?

হুবহু ঝালুয়া থানার মেজো দারোগার গলা। একটা ছেলেপুলে যদি হত, এত হুকুমদারি মেজাজ থাকত না মেয়েছেলেটার। নরেনের অবরে সবরে মায়াও আসে বউটার ওপর। স্বামী ছাড়া রমলার ঘরকন্নায় আর আছেই বা কী?

এই মুহূর্তে অবশ্য কিছুই আসছিল না নরেনের। তার অন্য কাজ আছে। অনেক জরুরি। রমলাকে ভাগানোর জন্য জোরে জোরে নাক টানল, ডিমের ঝোল কি লেগে গেল না কি! কেমন যেন গন্ধ বেরোচ্ছে!

পড়িমরি করে ছুটল রমলা।

নরেন বিছানা থেকে চেঁচাল, রুটি হলে আমাকে হাঁক দিয়ো। তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব।

দরজার দিকে দু-এক পলক তাকিয়ে নিয়ে আবার চিঠিটা বার করল নরেন। হাতের লেখাটা বেশ কায়দার আছে। পেটে খানিকটা বিদ্যে আছে বলে মনে হয়। না কি নিজে লেখেনি? কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে? পোস্টাপিসের সামনে তো চিঠি লিখে দেওয়ার জন্য লোকজন বসেই থাকে আজকাল। ঝালুয়া পোস্টাপিসেও গোপাল বলে একটা ছেলে আছে, বি.এ. ফেল, বসে বসে লোকের চিঠি মানিঅর্ডার লিখে দেয়। গোপালের হাতের লেখাটা মুক্তোর মতো, এই লেখা তত সুন্দর নয়।

নরেন আগে এগোল।...যাহাই হউক, শেষমেশ তোমার ভাঙনখালির বাড়িতে গিয়া তোমার মায়ের হাতে পায়ে পড়িয়া ঠিকানা জোগাড় করিয়াছি। তাও তিনি সহজে দিতে চান নাই। আমাকে অনেক গালমন্দ করিয়া তবে দিয়াছেন। আমি মনে কিছু করি নাই। সত্যই তো আমি দোষী। আমি তোমার উপর অবিচার করিয়াছি। আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। যে কালনাগিনীর মায়ায় ভুলিয়া তোমাকে ত্যাগ করিলাম, সে অতি নচ্ছার। তাহাকে আমি এক জোড়া বালা (রুপার), একটি সোনার চেন (এক ভরি), এবং একটি টিভি (সাদাকালো) কিনিয়া দিয়াছিলাম। সে সবকিছু লইয়া গত আষাঢ় মাসে চম্পট দিয়াছে। আমি ভুলেও জানিতে পারি নাই এক ইলেকট্রিক মিস্তিরির সহিত তাহার তলে ২ পিরিত চলিতেছিল। জানিলে আমি তাহাকে পূর্বেই দাউ দিয়া কাটিয়া দু টুকরা করিয়া রাখিতাম। যাহাই হউক, উহারা এখন রাজপুরে ঘর বাঁধিয়াছে। লোক মুখে শুনিতেছি নাগিনী সুখে নাই। সে আবার আমার নিকটে ফিরিয়া আসিতে চায়। আমি তাহাকে ফিরত নিব না। কেন নিব বলো? সে আমার নামে অনেক বদনাম দিয়াছে। আমি নাকি আঁটকুড়া। আমি শয়তান। আমার তাহাকে সুখ দিবার মুরোদ নাই। তুমি আমাকে জানিতে, বিচার করিয়া বলো কথাগুলি কি মিথ্যা নয়?...

নাহ্, রমলা কিছুতেই মন দিয়ে চিঠিটা পড়তে দেবে না। আবার ঘরে আসছে। চায়টা কী?

নরেন চিঠি লুকিয়ে কেঠো হাসি হাসল, আবার কী বার করতে এলে?

রমলা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, সত্যি বলো তো কী পড়ছ তুমি?

—কী আবার? চিঠি।

—চিঠি তো দেখতেই পাচ্ছি। কোমরে হাত রেখে নরেনের সামনে এল রমলা, আবার কারুর প্রেমপত্তর সরিয়েছ নাকি?

নরেনের এই অভ্যেসটি আছে। মোটা খামের চিঠি দেখলেই নাম ঠিকানা খুঁটিয়ে দেখে, গন্ধ শুঁকে প্রেমের চিঠি কি না শনাক্ত করে নেয়। প্রেমপত্র হলে আগে নিজে বাড়িতে এনে রসিয়ে রসিয়ে পড়ে নেয়, তারপর আবার খামের মুখ এঁটে পরের দিন পৌঁছে দেয় যথাস্থানে। এক-আধ বার রমলাকেও পড়ে শোনানোর চেষ্টা করেছে, বেরসিক রমলা দু-এক লাইন শোনার পরই কানে আঙুল দেয়। খরখর করে বলে, ছি ছি। এই সব অসভ্য কথা তুমি পড়ছ বসে বসে?

একবার মোক্ষম বিপদেও পড়েছিল নরেন। মগরায় পোস্টেড থাকার সময়ে সেখানকার লালুডাক্তারের ছেলে রজতেন্দ্রকে চিঠি লিখেছিল তার নতুন বউ শীলা। বাপের বাড়ি থেকে লেখা নতুন বউয়ের চিঠি বেশি রগরগে হয়, খুব উৎসাহ নিয়ে নরেন চিঠিটা এনেছিল বাড়িতে। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর যেই না খাম খোলা, অমনি রমলা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়েছে। একটুখানি উলটে দেখেই সে কী চিৎকার! শীলা কে? সে এক কেচ্ছার একশেষ! রাত দুপুরে বাসন ছুড়ছে! শাঁখা ভাঙছে ঠুকে ঠুকে! কয়লা ভাঙার হাতুড়ি নিয়ে তাড়া করেছে নরেনকে!

নরেন আজ পর্যন্ত ভেবে পায়নি, যে ছেলের নাম অত সুন্দর, রজতেন্দ্র, যার ডাকনাম বিলু, তাকে

তার বউ কোন হিসেবে 'আমার নরেনসোনা' বলে সম্বোধন করে! কত কষ্টে যে সেবার খামটার ওপর রজতেন্দ্রর নাম দেখিয়ে টেখিয়ে সামলাতে পেরেছিল রমলাকে!

নরেন আজ একটু চালাকি করতে চাইল। নির্বিবাদে বলল, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। এটা অফিসের চিঠিটা নয়, এটা লাভলেটার। কে এক কার্তিক কোন এক বকুলবালাকে লিখেছে।

রমলার সন্দেহটা নিভল। টেবিলে রাখা পানের বাটা থেকে পান বার করে সাজছে। মুখে পুরে বলল,—থাকে কোথায় সেই বকুলবালা?

নিপুণ অভিনেতার মতো খামটা তুলে ঠিকানা জোরে জোরে পড়ল নরেন, বকুলবালা দাসী। কেয়ারঅপ্ কবিতা মজুমদার। কোয়ার্টার নম্বর জি টু। ঝালুয়া হাসপাতাল...

রমলা শুনল কি শুনল না, বোঝা গেল না। বলল, রুটি হয়ে গেছে। খাবে চলো। বলতে বলতে দরজায় গিয়ে ফিরে তাকিয়েছে, তোমার এই নোংরা অভ্যেসটা আর গেল না।

নরেন খুক খুক হাসল, অভ্যেসটা আছে বলেই তো রাতের বেলা ভাল লাগে আমাকে।

রমলা ঝপ করে বলে উঠল, ছাই লাগে। একটা বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা নেই...

—সে কি আমার দোষ? নরেনেরও আঁতে লেগেছে সঙ্গে সঙ্গে, ভগবান যদি না চায়, আমি কী করতে পারি?

—ভগবানের দোহাই দিও না। কতবার বলেছি, ডাক্তারের কাছে চলো। একবার দেখিয়ে আসি।

—ডাক্তার দেখিয়ে কী হবে? হওয়ার হলে এমনিই হবে। নরেন মুখ খিচোল, বাচ্চা হলেই বা সংসারে কী এমন সুখ উথলে পড়বে, শুনি?

—তোমরা পুরুষমানুষ তোমরা কী বুঝবে? বাইরে বাইরে আছ, আড্ডা ফূর্তি মারছ...

—তুমিও যাও না, পাড়া বেড়াও। কে বারণ করেছে?

—আমার ভাল লাগে না।

রমলা মুখ কালো করে চলে গেল।

নরেনেরও মনটা বিস্বাদ হয়ে গেল। তাবিজ, কবজ, মাদুলি, এই থান, ওই মন্দির কিছুই বাদ রাখেনি রমলা। শুধু ডাক্তারটাই বাকি। নরেনই এড়িয়ে গেছে। কেঁচো খুঁড়তে কোন সাপ বেরোয়! সংসারে কিছু কিছু জিনিস গোপন থাকাই ভাল। অশান্তি বাড়ে না।

নরেন চিঠিটা বার করেও রেখে দিল। ভাল লাগছে না। দাওয়ায় এসে দাঁড়াল চুপচাপ। খানিক দূরে পূর্বপল্লির দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল, দত্তদের ফাঁকা জমিতে। লক্ষ্মীপুজো হয়ে যাওয়ার পরও বাঁশের কাঠামোটা রয়ে গেছে। দেখতে বড় শুনশান লাগে। কেমন একটা হাহাকারের মতো।

খেয়ে দেয়ে ঘরে ফিরে একটা পান মুখে দিল নরেন। রান্নাঘর থেকে বাসনকোসনের শব্দ আসছে, রাতেই সব ধুয়ে মুছে রাখে রমলা। রান্নাঘর ধোয় দুবার করে। শুচিবাই।

নরেন অন্যমনস্কভাবে চিঠিটা খুলল। নিশির ডাকের মতো টানছে চিঠিটা।...বকুলবালা, আমি ভুল করিয়াছি। তোমাকে চিনিতে পারি নাই। আমার শত অত্যাচারেও আমাকে তুমি ছাড়িয়া যাইতে চাও নাই। অন্য পুরুষের প্রতিও তোমার মন যায় নাই। তবু আমি তোমাকে তাড়াইয়াছি। আমি মহাপাতকী। জানি বলিবার মুখ নাই, তবু বলি। তুমি আবার ফিরিয়া আইস। আশা রাখি আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার সুযোগ তুমি দিবে। দিবে না, বকুলবালা? ইতি। তোমারই প্রাণেশ্বর শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র নস্কর। পুনশ্চ। তোমার উত্তর পাইলে আমি তোমাকে আনিতে যাইব। আমার ঠিকানা বদলায় নাই।...

চিঠিটা মুড়ে কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল নরেন। তারপরই পেট গুলিয়ে হাসি উঠে এসেছে। শালা কার্তিকচন্দ্র জানেই না, বকুলের লাভার বকুলের হাতে পৌঁছে না দিলে এ চিঠি কোনও দিনই পাবে না বকুল। আর একবার যখন নরেনের জিম্মায় এসে গেছে, তখন এ চিঠি পৌঁছবেও না। শালা, দিব্যি সুখে নরেন একটা আশনাই চালাচ্ছে, তাকে কিনা ব্যাগড়া দেয় কোন সোনারপুরের কার্তিক।

মৌজ করে একটা বিড়ি টেনে নরেন শুয়ে পড়ল। নিশ্চিন্তে।

শেষ রাতে এক আজব স্বপ্ন দেখল নরেন। পোস্ট অফিসের সিঁড়িতে গোপালের সামনে উবু হয়ে বসে আছে সে। চিঠি লেখাচ্ছে। মুক্তোর অক্ষরে। প্রাণেশ্বরী রমলাবালা, আমার শত অনাচারেও

আমাকে তুমি ছাড়িয়া যাও নাই। অন্য পুরুষের প্রতিও তোমার কখনও মন যায় নাই। তবু আমি তোমাকে তাড়াইয়াছি। তুমি আবার ফিরিয়া আইস। আমাকে কি তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিবার সুযোগ দিবে না, রমলাবালা? চিঠি শেষ করে আবার পুনশ্চ লেখাল নরেন।...আমি বকুলবালাকে ভুলিয়া গিয়াছি। তাহার সহিত আমার কোনও সম্পর্ক নাই।

ঘুম ভেঙে বিছানায় বসে খুব এক চোট হেসে নিল নরেন। কী খিটকেল স্বপ্ন রে বাবা। মাধ্যমিকে সেকেন্ড ডিভিশন পাওয়া নরেন চিঠি লেখাচ্ছে গোপালকে দিয়ে! রমলা তাকে ছেড়ে গেছে! বকুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই! মাইরি আর কী!

পোস্ট অফিস থেকে চিঠির ঝোলা নিয়ে নিত্যকার মতো চলে এল নরেন। হাসপাতাল কোয়ার্টারে। ঘোড়ানিমের কাছে এসে হাঁটু কেঁপে গেল। বাচ্চা মেয়েটা বারান্দার সিঁড়িতে পা ঝুলিয়ে বসে! তার পাশে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে বকুল!

নরেন এগোবে, কি পিছোবে ভাবছে, বকুল নেমে এল তরতর, পালাও কেন গো পিওনবাবু?

নরেন আমতা আমতা করল, খুকি যে আজ আছে বড়?

—আর বোলো না। ওর সেই দাদুর বাড়িতে অনেক লোকজন এসেছে। দাদুর ছেলে, ছেলের বউ, মেয়ে, জামাই, নাতি, নাতনি। দাদুর এখন রুমঝুমের দিকে তাকানোর সময় কোথায়? দেখছ না মেয়ে কেমন ঠোঁট ফুলিয়ে বসে আছে?

—হ্যাঁ, আপনজন এসে গেলে কে আর পরকে মনে রাখে? ঠিক আছে। আমি তবে যাই।

—যাই-যাই করছ কেন? দুদণ্ড বোসো না। ঘরে না হয় নাই গেলে, বারান্দাতেই বসলে।

নরেন গোমড়া হল,—তা ওই বুড়োর বাড়ির লোকজন কত দিন থাকবে?

—সে আমি কী করে বলব? বকুল ঘুরে দেখে নিল রুমঝুমকে, শহর থেকে এসেছে তো, নিশ্চয়ই দু-চার দিনের বেশি ঝালুয়ায় মন টিকবে না।

—দু-চার দিন! সে তো অনেক সময় রে বকুল! এত দিন আমার কাটবে কী করে?

—কেন, চিঠি বিলি করে। সেটাই তো তোমার কাজ গো। বকুল চপল হাসছে, আজ তোমার খুব বেশি তেষ্টা মনে হয় পিওনবাবু?

নরেনের রাগ হয়ে গেল, ঠাট্টা করতে হবে না। যাচ্ছি আমি।

—আহা, রাগো কেন? এসো, আজ নয় মনে মনে কথা বলি।

—আমি বারান্দায় বসব না। কে কোথায় দেখবে...

—কোয়ার্টারের পিছনে আমগাছ তলায় চলো তবে। ওখানে কেউ দেখবে না। বকুল উচ্ছল হাসছে, দাঁড়াও, রুমঝুমকে বলে আসি।

ছাইগাদার পাশে, কোয়ার্টারের পিছনে একটা বেঁটে, কলমের আম গাছ দাঁড়িয়ে আছে। ভীষণ ঘন পাতা গাছটার। ছায়া ভারী সুশীতল। গায়েই হাসপাতালের পাঁচিল। উঁচু। নির্জনতাই নির্জনতা এখানে।

গাছতলায় বসেছে দুজনে। বেশ খানিকটা তফাত রেখে।

বকুল বলল, কী হল, এখনও মন খারাপ।

নরেন হাসল, তোকে দেখলে মনে খারাপ আরও বেড়ে যায় রে।

—কেন?

—কী জানি! মনে হয় আজ আছিস, কাল হয়তো থাকবি না।

—মরে যাব বলছ?

—আরও কত কী তো হতে পারে।

—কী রকম?

—ধর, তুই এখান থেকে চলে গেলি।

—না বাবা, এ বউদি খুব ভাল। এ বাড়ির কাজ এখন ছাড়ছি না।

—যদি তোর বউদি বদলি হয়ে যায়?

—সবে তো এল, এত তাড়াতাড়ি হবে না।

—ধর, হঠাৎ যদি বদলি হয়েই যায়?

—কখখনও হবে না। কেন কু ডাকছ?

নরেন পাঁচিলের দিকে তাকাল। তারপর মজা করার সুরে বলল, ধর, এমন যদি হয়, তোর বর তোকে নিতে চলে এল?

—কে বর?

—তোর বর। কার্তিক।

বকুল হি হি হেসে উঠল, আহা, আমার কি আর সেই কপাল হবে গো?

নরেন সামান্য ধাক্কা খেল, বর এসে ডাকলেই চলে যাবি?

—বারে, সোয়ামি নিজে নিতে এলে তাকে না বলে দেব? বকুলের হাসি বাড়ছে।

—সেই লোকটা তোকে মারধোর করত, তোকে তাড়িয়ে দিল, অন্য মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করে, তারপরও তুই...! নরেনের গলায় কথা আটকে গেল।

—সে তো পুরুষমানুষরা করেই। বকুল হাসিতে দুলছে, তুমিও তো তোমার বউকে ঠকাও, সেটা বুঝি অন্যায় নয় পিওনবাবু।

হুট করে রাত্তিরের স্বপ্নটা মনে পড়ে গেল নরেনের। জোর করে মন থেকে সরাতে চাইল স্বপ্নটাকে, তুই আমাকে ওই ট্যাক্সি ড্রাইভারটার সঙ্গে তুলনা করলি? আমি একটা লেখাপড়া জানা লোক, সে একটা মোদো মাতাল...!

—তো কী? হাসির দমকে গোটা শরীর কাঁপছে বকুলের, তার শরীরস্বাস্থ্য কত ভাল! তুমি তো আমাকে বেড়েই পাও না!

ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হল নরেন। যা ভাঙবে, তা ভাঙুক। পকেট থেকে খাম-খোলা চিঠিটা বার করে ছুড়ে দিল বকুলের কোলে।

বকুলের হাসি স্তব্ধ হল,—কী এটা।

—তোর কার্তিকের চিঠি। কাল পোস্টাপিসে এসেছে।

কেউ যেন ব্লটিংপেপারে বকুলের মুখ থেকে রক্ত শুষে নিল, কী আছে ওতে?

—নিজেই পড়ে দ্যাখ।

—আমি অত পড়ালেখা জানি না। তুমি তো পড়েছ, তুমিই বলো না।

—তোর কার্তিক তোকে আবার ফেরত নিতে চায়। সেই মেয়েছেলেটা তাকে ছেড়ে পালিয়েছে।

শুনল বকুল। পাথরের মতো নিশ্চুপ। ডান হাতে সজোরে চেপে আছে খামটা।

নরেন উঠে দাঁড়িয়ে ভূতগ্রস্তের মতো হাসল, আর কী। তোর তো এবার সুখের দিন। কাউকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিস, কার্তিক এসে তোকে নিয়ে যাবে।

নরেন ফিরে যাচ্ছে। এক একটা পা যেন এক এক যোজন পথ। ঘাসভরা মাঠ রুক্ষ পাহাড়ের মতো এবড়ো খেবড়ো।

পিছন থেকে ডাক শুনে চমকে তাকাল নরেন।

বকুল কাছে আসছে, দাঁড়াও পিওনবাবু।

চোয়াল শক্ত করল নরেন, কী বলবি?

—রোজ চিঠি না দিয়ে তেষ্টা মেটাতে আসো। আজ হাতে করে আমার জন্য চিঠি আনলে, একটু শরবত খেয়ে যাবে না?

বকুলের স্বরে কি বিদ্রূপ? বকুল মজা করছে নরেনকে নিয়ে?

নরেন বলল, আমার আর তেষ্টা নেই। আমি আর আসব না।

—বকুলের কাছে আসতে না চাও, এসো না পিওনবাবু। বকুল কারও পথ চেয়ে থাকবে না। তা বলে যেন চিঠির দোহাই দিও না কখনও।

চিঠিটা কুচি কুচি করে ছিড়ছে বকুল। ভাসিয়ে দিল শূন্যে। নবীন হেমন্তের রোদ্দুরে ভেসে যাচ্ছে কাগজের টুকরো। উড়ছে ঝালুয়ার বাতাসে।

উড়ছে। ভাসছে।

সাত

অবনীর ছায়া পড়ল দরজায়, মহীদা, আপনি কি একবার অফিসে আসবেন?

মহীতোষ বিছানায় শুয়ে ছিল। চোখ বুজে। শেষ বিকেলে এই সময়টায় একটা ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের মৌতাত আসে তার। কদিনেই আবার অভ্যেসটা খারাপ হয়ে গেছে।

মহীতোষ পাশ ফিরল, কেন রে?

—ঝালুয়া ফার্নিচার্সের গোবিন্দবাবু এসেছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

—তুইই কথা বলে নে। আমার আর বেরোতে ভাল লাগছে না।

—গোবিন্দবাবু আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চান। বোধ হয় কোনও অর্ডার টর্ডারের ব্যাপার। অবনী মাথা চুলকোল, ওই ব্যাপারটাতেও হতে পারে।

—হুঁ। দু-এক সেকেন্ড কী যেন ভাবল মহীতোষ। উঠে বসল বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন করে উঠেছে মাথাটা। উফ, দুর্বলতাটা কিছুতেই যাচ্ছে না। বলল, ঠিক আছে, এখানে পাঠিয়ে দে। আর শোন, বাড়ি যাওয়ার আগে কারখানা ভাল করে বন্ধ করে যাস।

অবনী চলে গেল।

আলো বেশ কমে এসেছে। উত্তরের হাওয়াটাও পৌঁছে গেছে ঝালুয়ায়। পাতলা সুতির চাদর গায়ে জড়িয়ে মহীতোষ ভাবল ঝালুয়ায় এবার কড়া ঠাণ্ডা পড়বে।

মহীতোষের ঘরের গায়েই কাচঘেরা বিশাল গোল বারান্দা। রঙিন কাচ। এলোমেলো চেয়ার পাতা আছে কয়েকটা। কাঠের। বেতের। একটা পুরনো মলিন আরামকেদারা গড়াগড়ি খাচ্ছে পাশে। বারান্দার মধ্যিখানে আস্ত এক শুকনো চা-গাছের ওপর প্রকাণ্ড এক গোল কাচ। সেটাই টেবিল। এখানে বসেই বাইরের লোকজনের সঙ্গে কথা সারে মহীতোষ।

মহীতোষ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে, গোবিন্দ পালিত এল। একটা চেয়ার টেনে বসেছে, কী হে, তুমি আর সুস্থটুস্থ হবে না নাকি? আমাদের তো ডুবিয়ে দিলে...

মহীতোষ মৃদু হাসল, কেন কাকা, আপনার আবার কী হল? আপনার মালটাল তো ঠিকই যাচ্ছে! আমি আপনাদের রেগুলার খবর রাখি।

—কিছু খবর রাখো না। তোমার লোক একরকম অর্ডার নিয়ে যায়, আর একরকম সাপ্লাই দেয়। নিজে একটু না দেখলে চলে? গত সপ্তাহে গামার কাঠের একটা অর্ডার দিয়েছিলাম, ছ সিএফটি মাল কম। তোমার অবনীকে বললাম, সে শুধু জিভ কাটে।

মনে মনে হাসল মহীতোষ। অবনী ঠিকই আন্দাজ করেছিল, নালিশের পর এবার বোধ হয় রেটের ব্যাপারে চাপ দেবে।

বিনয়ী মুখে মহীতোষ বলল, হ্যাঁ কাকা, ওটা আমি অবনীর কাছে শুনেছি। বিলে অ্যাডজাস্ট করে দেব।

—টাকাটা বড় নয় মহীতোষ, আসল হল গুডউইল। তোমার বাবার যেটা ছিল। গোবিন্দ পালিত মাথা নাড়ছে, রণতোষদা কোথ্থেকে কোথায় উঠেছিল, সে তো আমি জানি। সবই তো গেছে তোমার, অন্তত এইটা সামলাও।

এ কথা আর কত শুনবে মহীতোষ? তার বাবার জীবনটাই তো গুডউইল। ছিল সামান্য এক ব্যাঙ্কের কেরানি, ব্যাঙ্ক ফেল পড়তে ব্যবসা ধরল। তারপর থেকে যাতে হাত দিয়েছে, তাই সোনা। স' মিল দিয়ে শুরু, তারপর লেটারপ্রেস, দার্জিলিং টি'র হোলসেলার, রেডিমেড পোশাকের দোকান, কী না করেছে! পার্টনারশিপে একটা কোল্ডস্টোরেজও বানানো শুরু করেছিল বাবা।

আর মহীতোষ? বউ পালানো, ঘরকুনো, সর্বস্ব খোয়ানো এক মূর্তিমান ব্যর্থতা। স' মিলে আঠারোজন লোক খাটত আগে, এখন কমে কমে সাত। কী করবে মহীতোষ? তার যে ইচ্ছেগুলোই অন্যরকম। তার আলপথ দিয়ে হাঁটতে ভাল লাগে, নিশীথ রাতে তিলাইদিঘির পাড়ে একা একা শুয়ে থাকতে ভাল লাগে, রাত জেগে কবিতার বই পড়তে ইচ্ছে করে, এগুলো কি তার অপরাধ?

পাতলা শ্বাস ফেলল মহীতোষ, বাবার কথা বাদ দিন কাকা। তিনি ছিলেন কর্মী-পুরুষ, ক্ষণজন্মা

মানুষ, আমি তাঁর অযোগ্য সন্তান।

— তা কেন? তুমিও খুব ভাল ছেলে। ঝালুয়ার সবাই তোমার খুব সুখ্যাতি করে। শুধু আলসেমিটা একটু ঝেড়ে ফেলতে পারলে তুমিও চড়চড় করে উঠে যাবে।

সান্ত্বনা? মহীতোষ এবার শব্দ করে হাসল, কিছু ভাববেন না কাকা, এবার সব ঝেড়ে ফেলব, ঝানু ব্যবসাদার হয়ে যাব। দেওয়ালিটা যাক, আর চার-পাঁচ দিন জিরিয়ে নিই।

—হ্যাঁ, শরীর একদম সুস্থ করেই বেরোও। ঝালুয়ার ম্যালেরিয়া খুব খারাপ। শরীর ঝাঁঝরা করে দেয়। ষাটোর্ধ্ব মানুষটার গলায় অভিভাবকের সুর, তোমার বাবার মতো শরীরের দিকে নজর না রেখে খাটারও কোনও মানে হয় না। আমরা কি কেউ ভাবতে পেরেছিলাম রণতোষদা ওভাবে ধুপ করে স্ট্রোকে মারা যাবে!

বারান্দা ঘরটায় আলো প্রায় নেই এখন। মহীতোষ উঠে আলো জ্বেলে দিল।

গোবিন্দ পালিত দম নিয়ে বলল, তোমার কথা অবশ্য আলাদা। একার জীবন তোমার, কার জন্যই বা আর খাটতে ইচ্ছে করবে? কতবার বললাম আবার একটা বিয়ে থা করো, সংসার করলে ব্যবসাতেও মন লাগত।

মহীতোষ হা হা হাসল, বললাম তো কাকা, আমি ঝানু ব্যবসাদার হচ্ছিই। আপনার আর কোনও কমপ্লেন থাকবে না, দেখবেন।

—আর হয়েছ। যার নয়ে হয় না, তার নব্বইতেও হয় না।

—তা হলে আর বলেন কেন কাকা? বোঝেন তো আমি বেশ আছি। চলে তো যাচ্ছে।

—ওই তোমার দোষ। যা ভাববে, তাই করবে। এই একটা ব্যাপারে তোমাদের বাপ ছেলেতে তফাত নেই। গোবিন্দ পালিত উঠেছে, চলি। দেওয়ালির দিন তিলাইদিঘিতে আসছ?

—সে তো যেতেই হবে। ঝালুয়ার সম্মান বলে কথা।

গোবিন্দ পালিত চলে যাওয়ার পর ঝুম হয়ে চেয়ারে বসে রইল মহীতোষ। কেন যে বার বার তেতো কথা কচলায় মানুষ? কী সুখ পায়? বোঝে না কথাগুলো কোথায় বেঁধে মহীতোষকে?

মাঝেমধ্যেই মহীতোষের এক অদ্ভুত কথা মনে আসে। জীবনের খেলা কী বিচিত্র। বাবার সঙ্গে তার এত তফাত, তবু কোথায় যেন একটা চোরা মিলও রয়ে গেছে! মহীতোষের মা যখন মারা যায়, বাবার তখন মাত্র একত্রিশ। রঞ্জনাও মহীতোষকে ছেড়ে গেছে মহীতোষের একত্রিশ বছর বয়সেই। অথচ প্রায় একই ঘটনা দুজনকে দুদিকে ঠেলে দিল। মা মারা যাওয়ার পর মার গয়না বেচে ব্যবসা শুরু করল বাবা, কোন চূড়ায় পৌঁছে গেল তার ঠিকঠিকানা নেই। গাড়ি বাড়ি সুখ আরাম সব মিলিয়ে ঝালুয়ার এক জীবন্ত কিংবদন্তি। আর রঞ্জনা যখন গেল, তখন মহীতোষ সম্পূর্ণ নিঃস্ব। কী যে কুহকে জড়িয়ে ফেলেছিল রঞ্জনা! তাকে তোয়াজ করতে গিয়ে একটার পর একটা ব্যবসা চলে গেল, শেষে আধতৈরি কোল্ডস্টোরেজের অংশটাও বেরিয়ে গেল হাত থেকে। কি, না সল্ট লেকে জমি কেনা হবে, বাড়ি তোলা হবে। এই ম্যাটমেটে ঝালুয়ায় কি থাকতে পারে রঞ্জনা?

হলও সব। রঞ্জনার নামে। আর সেই জমি বাড়ি সব গুছিয়ে নিয়ে কলকাতার নিউ আলিপুরের মেয়ে ছুড়ে ফেলে দিল ঝালুয়ার আঙুল কাটা মহীতোষকে। ডিভোর্স ফাইল করার আগে রঞ্জনা অবশ্য একবার এসেছিল ঝালুয়ায়। বলেছিল, মহীতোষ যদি চায় জমিবাড়ির ভাগ নিতে পারে। নগদ টাকায়। ডিভোর্সের পর রঞ্জনার তথাগত এসে দিয়ে যাবে টাকাটা।

ছিহ্। ওই টাকা ছুঁলে মহীতোষ কি আর নিজের কাছে মহীতোয থাকত? তিলাইদিঘির জলে নিজের মুখের ছায়া আর দেখতে পারত কোনওদিন?

মাথাটা ধরে গেছে। একটু চা খেলে মন্দ হত না। রান্নাঘর বেশ খানিকটা দূরে। ঘরেই তাই স্টোভ রাখা আছে। মহীতোষ স্টোভে চায়ের জল চাপাল। কাজের লোক বিকেলের মধ্যে রান্নাবান্না সেরে চলে যায়, ইচ্ছে হলে নিজেই চা করে নেয় মহীতোষ।

গ্রিলের গেটে শব্দ হচ্ছে একটা। কে যেন ঝাঁকাচ্ছে। একটা বাচ্চা কলকল করছে না?

মহীতোষ বারান্দায় এসেই ভীষণ চমকেছে, কী কাণ্ড, আপনারা! হঠাৎ!

কবিতা কথা বলার আগে রুমঝুম চেঁচিয়ে উঠেছে, তুমিই বুঝি ভাল কাকু গো?

কবিতা ঝটপট বলে উঠল, মাস্টারমশাই আজ আসবেন না বললেন, ওকে নিয়ে একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। স' মিলটা দেখে মনে হল...

—মোটেই না। রুমঝুম ভুরু পাকাল, তুমি তো বেবোনোর সময়ই বললে আমাকে আজ একটা ভাল কাকুর কাছে নিয়ে যাবে!

বারান্দাঘরে ঢুকেই ছোটাছুটি শুরু করেছে রুমঝুম। এক কাচের জানলা থেকে অন্য কাচের জানলায় যাচ্ছে। দৌড়ে মহীতোষের ঘরে ঢুকে গেল। ঘর থেকেই প্রশ্ন ছুড়ছে, স্টোভে কী করছ গো ভাল কাকু?

উত্তরটা কবিতাকে দিল মহীতোষ, চা বসিয়েছি। খাবেন?

আলতো ঘাড় নাড়ল কবিতা, আপনি বানাচ্ছেন?

—আমার সবই সেলফহেলপ। চা'ও ভালই বানাই। বারান্দার চেয়ারগুলোকে ব্যস্তভাবে ঠিকঠাক করে দিল মহীতোষ, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না।

মহীতোষের ঘর ভেদ করে ভেতরে চলে গেছে রুমঝুম। দৌড়ে ঘুরে এল, মা, মা, দেখে যাও কত বড় উঠোন!

রুমঝুম টানাটানি করছে কবিতাকে, মহীতোষ হেসে বলল, যান না, দেখে আসুন না।

মহীতোষের ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইল কবিতা। দেখছে ঘরদোর। মেয়ের মুহুর্মুহু ডাকে গেল ভেতরে।

মহীতোষ চা ছাঁকছিল। কবিতা কেন এসেছে আজ? কপালে আজ একটা ছোট্ট কালো টিপ পরেছে কবিতা, একদম অন্যরকম লাগছে কবিতাকে। হাসপাতালের সেবিকা নয়, যেন অন্য কেউ। ঝালুয়ার লোক। মহীতোষের কাহিনী শুনে আজ সরেজমিন করতে এল?

কবিতা রুমঝুমকে নিয়ে ফিরল। বসেছে বারান্দাঘরে। রুমঝুম রঙিন কাচে চোখ লাগিয়েছে।

কবিতা বলল, আপনার বাড়িটা তো ভারী অদ্ভুত! এত বড় বাড়ি, কিন্তু একতলা!

মহীতোষ চা নিয়ে এল, বাবার খেয়াল। বাবার একতলাই পছন্দ ছিল।

—ওপাশেও একটা এরকম ধবনের বারান্দা দেখলাম না?

—সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখার নেশা ছিল বাবার। এইখানে বসে সূর্যোদয় দেখতেন বাবা, আর ওইখানে বসে সূর্যাস্ত। দেখেছেন তো ভেতরটা কেমন ইউ শেপ! এদিকে পুব...ওদিকে পশ্চিম...

—ভারী মজার খেয়াল তো!

—হ্যাঁ, বাবা বলতেন সূর্যোদয় সূর্যাস্ত না দেখলে একটা দিন যে চলে গেল, বোঝা যায় না। আর দিন চলে গেল অনুভূতিটা না থাকলে পরের দিনের কাজের স্পৃহাটা আসবে কোত্থেকে?

কবিতা চোখে ঢেউ তুলল, তা আপনি এদিকটা বন্ধ করে দিয়েছেন কেন? সূর্যোদয় দেখেন না?

মহীতোষ জবাব এড়িয়ে গেল, চা কেমন হয়েছে?

কাপে চুমুক দিল কবিতা, ভালই তো। আমার এরকম হালকা চা'ই পছন্দ। কী সুন্দর ফ্লেভার!

—বাবা অভ্যেসটা তৈরি করে দিয়ে গেছেন। দার্জিলিং টি ছাড়া বাবা খেতেই পারতেন না।

কবিতা আড়চোখে টেবিলটা দেখাল, এটাও বুঝি বাবার শখ?

—ঠিক ধরেছেন। মহীতোষ হেসে ফেলল, জলপাইগুড়ির চা বাগান থেকে বাবা এনেছিলেন। বাবার গল্প তো শুনেছেন নিশ্চয়ই। ঝালুয়ার দার্জিলিং টি-র হোলসেলার ছিলেন বাবা।

কবিতাও হেসে উঠেছে, আপনার বাবার কথা থাক। নিজের কথা বলুন। আপনি এতদিন ছিলেন কোথায়? এই টানা এক মাস? পুজোর সময়েও আমাদের ওদিকে গেলেন না একবারও?

মহীতোষের কৌতুক করতে ইচ্ছে হল। হঠাৎ শরীরটা যেন ঝরঝরে লাগছে। হাসি হাসি মুখে বলল, আমার এক প্রিয়জন এসেছিল।

—ও।

—কে প্রিয়জন জিজ্ঞেস করলেন না? সে কিন্তু এখনও আমার কাছাকাছিই আছে।

কবিতা যেন সামান্য আড়ষ্ট হয়েছে আচমকা। ঘুরে ঘুরে দেখছে রুমঝুমকে।

মহীতোষ হাসতে হাসতে গলা চড়াল, ম্যালেরিয়া হয়েছিল। খুউব ভোগাল এক মাস। যায় আসে, যায় আসে, ছাড়তে আর চায় না। অসুখের থেকে কে আর বেশি প্রিয়জন বলুন?

কবিতা বিস্মিত চোখে তাকাল, তাই? আমি ভাবছিলাম...

—কী ভাবছিলেন?

—কিছু না। কবিতা চোখ নামিয়ে নিল, ওষুধপত্র ঠিকমতো খাচ্ছেন তো? ব্লাড টেস্ট করাচ্ছেন?

—অসুখ শুনেই অমনি হাসপাতালের দিদিমণি হয়ে গেলেন? আরে বাবা, আমি এখন ভালই আছি। কয়েকদিন ধরে জ্বরটর আর আসছে না। মনে হয় প্রিয়জন এবার সত্যি সত্যি বিদায় নিল।

—তাও সাবধানে থাকবেন। এমনিই আপনার একটা বড় অপারেশন গেল...

—অসুখের কথা বাদ দিন তো। অন্য কথা বলুন। মহীতোষ হঠাৎ একটু প্রগল্‌ভ হয়ে বলল, তারপর বলুন, আপনাদের পুজো কেমন কাটল?

—ভাল। ভালই। আপনাদের ঝালুয়ায় বেশ সুন্দর পুজো হয়। হট্টগোল কম, সব পাড়ার পুজোতেই বেশ হোমলি ভাব আছে...

—এদিকে তো এবার রজত জয়ন্তী হল। এসেছিলেন?

—আপনাদের রবীন্দ্র নগরে তো? হ্যাঁ, মেয়ে কি আর ছাড়ে?

মহীতোষের বলতে ইচ্ছে হল, এখানে একবার এলেন না কেন? আমি যে গোটা পুজো আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম।

কবিতা যেন বুঝে ফেলল মহীতোষের মনের কথাটা। নিচু গলায় বলল, ভেবেছিলাম আপনার খোঁজ করতে আসি, তারপর মনে হল আপনি হয়তো ঝালুয়াতেই নেই!

মহীতোষ বিমর্ষ মুখে বলল, আমি আর ঝালুয়ার বাইরে যাই না। গত ন' বছরে আমি একটি বারও এই শহরের বাইরে পা রাখিনি।

কবিতা বুঝি ধাক্কা খেল একটু, চুপ হয়ে গেল।

রুমঝুম টেবিলের কাচের তলায় ঢুকেছে, টকটক টোকা মারছে চা গাছের কাণ্ডে। কাচের নীচ থেকে প্রশ্ন করল, কাকু, তোমার সব ঘরগুলোই তালা বন্ধ কেন গো?

—খুলতে গেলে হাঁপিয়ে যাই যে। মহীতোষ ঝট করে উঠে দাঁড়াল, এ মা দেখুন, কী বিশ্রী স্বভাব আমার। আপনারা প্রথম দিন আমার বাড়িতে এসেছেন, তাও পুজোর পর, আর আমি কিনা...! এক সেকেন্ড বসুন। বলেই প্রায় দৌড়ে ঘরে চলে গেছে মহীতোষ। ফ্রিজ থেকে একরাশ মিষ্টি বার করে বড় প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এল, আর কিছু খেতে চাইলে কিন্তু বিপদে পড়ে যাব। নোন্‌তা কিছুই ঘরে নেই। তবে ডিম আছে, যদি খেতে চান তো ভেজে দিতে পারি।

রুমঝুম একটা সন্দেশ হাতে নিল, ওমা, এ যে ঠাণ্ডা গো! মা, আমি কি ঠাণ্ডা মিষ্টি খাব?

কবিতা ভুরু জড়ো করল, না, খাবে না।

—কেন, খাক না। টাটকা মিষ্টি। আজই সকালে একজন দিয়ে গেছে।

—না না, সে জন্য নয়। সদ্য জ্বর থেকে উঠল তো।

—সেকী, কবে জ্বর হয়েছিল? ঠাণ্ডা লেগেছিল বুঝি?

—ওই ইনফ্লুয়েঞ্জা। লক্ষ্মীপুজোর পর হঠাৎ তেড়ে জ্বর। তিন দিন ধরে টেম্পারেচার নামতেই চায় না। কবিতা মেয়েকে দেখে নিয়ে স্বর নামাল, বোধ হয় একটু মেন্টাল প্রবলেমও হয়েছিল।

—ওইটুকু মেয়ের মেন্টাল প্রবলেম?

—আর বলবেন না। কাকে যেন একটা দাদু পাতিয়েছে, আমি ডিউটিতে বেরোনোর পর রোজ সকালে তার বাড়ি চলে যেত। তা সেই দাদুর বাড়িতে কারা যেন এসেছিল...দাদু ভাল করে কথা বলেনি...সেই অভিমানে মেয়ে...! জ্বরের ঘোরে দাদু দাদু করে কাঁদছিল, তাই থেকেই তো বুঝতে পারলাম।

মহীতোষ কৌতূহলী হল, দাদুটি কে? থাকেন কোথায়?

—ওই তো আমাদের ওখানে। শিমুলতলা ধরে একটু এগোলে বাগানঅলা একটা কটেজ প্যাটার্নের বাড়ি আছে, ওই অত দূর রোজ এই মেয়ে...

—বুঝেছি। দেবেনদের বাড়ি। বছর দু-তিন আগে বাড়িটা বেচে ওরা কলকাতায় চলে গেছে। যিনি কিনেছেন তিনি নাকি এক রিটায়ার্ড জাজ।

—হতে পারে। তবে দাদুরও মেয়ের ওপর খুব টান। বকুল গিয়ে খবর দিতেই দৌড়ে এসেছিলেন। দাদুকে দেখে মেয়েরও জ্বর ভ্যানিশ। কবিতা মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিল, দাদু না এলে রুমঝুম আর দাদুর কাছে যেতই না, তাই না রে রুমু?

মহীতোষ আনমনে বলল, কার সঙ্গে যে কীভাবে কার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

—হুঁ।

ছোট্ট এক ধ্বনি, তাতেই মহীতোষের বুক ছন্ করে উঠল। এতক্ষণের প্রগল্‌ভতা মুছে গেল নিমেষে। একটাও কথা খুঁজে পাচ্ছে না। আশ্চর্য, কথা না খুঁজে পেয়ে যেন বড় স্বস্তি হচ্ছে মহীতোষের।

সহসা কবিতা মহীতোষের চোখে চোখ রেখেছে, আপনি কবে আসছেন আমাদের বাড়িতে?

মহীতোষ চোখটাকে পড়তে চাইল। পারল না। বলল, দেওয়ালির দিন যাব ভাবছি। পূর্ণেন্দুর রেসটা দেখতে বেরোব, তখনই...

—আপনার সাইকেল রেস ভাল লাগে?

—পূর্ণেন্দুকে ভাল লাগে। ছেলেটার কী জিল! কী অধ্যবসায়!

—কী জানি বাবা। ওরকম একটা হিংস্র যান্ত্রিক দৌড়, এ ওকে ফেলে দিচ্ছে, সবাই এক সঙ্গে জিততে চাইছে...

—ওভাবে ভাবছেন কেন? ওটা তো একটা খেলা।

—ওরকম জীবন নিয়ে খেলা আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।

—অন্যভাবেও ভাবুন। জেতা হারাটাই তো আর সব নয়, জয়ের চেষ্টা মানুষের মধ্যে একটা উইলফোর্স তৈরি করে।

—হবে।

—মানে? আপনি বলতে চান উইলফোর্সের কোনও মূল্য নেই?

কবিতা যেন কেমনভাবে হাসল, আপনার জেতার উইলফোর্স আছে?

মহীতোষ নিঃশব্দে বলল, নেই। আর নেই বলেই তো পূর্ণেন্দুকে দেখতে যাওয়া।

রুমঝুমকে কাছে টানল মহীতোষ, কী গো, তুমি যাবে না মাস্টারমশাইয়ের রেস দেখতে?

—যাবে আবার না! যেদিন থেকে শুনেছে, সেদিন থেকে নাচছে।

—কিন্তু নিয়ে যাবে কে? তোমার মা তো যাবে না মনে হচ্ছে।

রুমঝুম কচি ভুরুতে কষ্ট করে ভাঁজ ফেলল—কেন, তুমি নিয়ে যাবে।

—আমার সঙ্গে যাবে তুমি?

রুমঝুম পলকের জন্য মাকে দেখল, ক্ষণকাল মহীতোষকে। হঠাৎ মহীতোষের দুহাত আঁকড়ে ধরেছে, যাব গো, যাব! মা না গেলে তুমি আর আমি যাব।

কাটা আঙুলের স্থানটিতে একটা শিরশিরেভাব ছড়িয়ে পড়ছিল মহীতোষের। কবিতারা চলে যাওয়ার পরেও ভাবটা রয়ে গেল।

রাতে বিছানায় শুয়েও মহীতোষের বুকে অভিনব এক বোধ চারিয়ে যাচ্ছিল। কষ্ট নয়, আনন্দও নয়, এ তার থেকেও গহীন অনুভূতি। যেন তার কাটা আঙুলগুলো ফিরে এসেছে আবার। জোড়া লেগে গেছে। দিব্যি তাদের নাড়তে পারছে মহীতোষ।

মহীতোষের অন্ধকার ঘরে মথ উড়ছিল রাশি রাশি। তাদের ডানা ঝাপটানি শুনতে পাচ্ছিল মহীতোষ। ভাবছিল, এরা মথ, না প্রজাপতি?

মহীতোষের চোখ ভিজে যাচ্ছিল। বহু কাল পরে।

আট

দূর থেকে দেখতে পেয়েই উল্লাসে লাফিয়ে উঠল রুমঝুম। ছুটতে ছুটতে কোয়ার্টারে ঢুকল, ও বকুলমাসি, এসেছে গো এসেছে।

বকুলমাসি বাইরের ঘরে বসে ব্লাউজের হুক সেলাই করছিল। রুমঝুমের ঝাপটায় হাতে ছুঁচ ফুটে

গেল তার। বিরক্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, অত লাফানোর কী আছে? এসেছেটা কে?

—মাস্টারমশাই গো মাস্টারমশাই।

—অ। তাই বলো। আমি ভাবলাম কে না কে।

এতদিন পর মাস্টারমশাই আসছে, মাসির যেন কোনও হেলদোলই নেই! রুমঝুমের রাগ হয়ে গেল। মার মতো কড়া মুখ করে বলল, তুমি এখন এ ঘর থেকে যাও তো। মাস্টারমশাইয়ের জন্য চা করে আনো।

বকুলমাসি উঠে দাঁড়াল, হুঁহ্, খালি পাকা বুড়ির মতো কথা! চা আমি মাস্টারমশাইকে ঠিক সময়েই দেব।

—না। এক্ষুনি দাও। খাবারও দেবে। মাস্টারমশাই কত দিন পরে এল...

—এহ্, ভারী তো সাত দিন আসেনি, তার জন্য মেয়ে একেবারে হেদিয়ে গেল।

বকুলমাসিটার যেন কী হয়েছে। মুখে একফোঁটা হাসি নেই।

কটমট করে মাসিকে দেখে আবার লাফিয়ে দরজায় গেল রুমঝুম। মাস্টারমশাই বারান্দায় চটি ছাড়ছে, রুমঝুমের সেটুকুও তর সইছে না। এত এত প্রশ্ন কিলবিল করছে মনে, কোন প্রশ্নটা যে আগে করে রুমঝুম?

মাস্টারমশাই গম্ভীর মুখে চৌকিতে বসেছে। বলল, যাও, বইখাতা নিয়ে এসো।

রুমঝুমের ঠোঁট ফুলে গেল—আগে বলো তুমি এত দিন আসনি কেন?

—ইচ্ছে হয়নি।

—কেন ইচ্ছেটা হয়নি শুনি?

—আহ্, পাকামি কোরো না। যা বলছি শোনো। বই নিয়ে এসো।

মাস্টারমশাইয়ের গোমড়া মুখটা দেখে ভুসভুস হাসি পাচ্ছিল রুমঝুমের। রেগে গেলে মাস্টারমশাই কেমন চোখ পিটপিট করে। নাকটাও কেমন আঙুরের মতো টসটস হয়ে যায়। এক দিন রুমঝুম থার্টিনের পর বার বার ফিফটিন বলে ফেলেছিল, সেদিনও মুখটা ঠিক এরকম হয়েছিল মাস্টারমশাইয়ের। রুমঝুম জানে ওই রাগ রুমঝুমকে ভয় দেখানোর জন্যে। রুমঝুম মাস্টারমশাইকে ভয় পাবে কেন?

চৌকিতে বইখাতা রাখতে রাখতে রুমঝুম বলল, জানি গো জানি, কেন এত রাগ।

—কে বলেছে রাগ করেছি?

—তোমার মুখ বলছে গো।

—কী বলছে?

—বলছে, তুমি হেরে গিয়ে ভীষণ রেগে আছ। তাই না গো?

—আহ্ রুমঝুম, বকবক কোরো না। পড়বে তো পড়ো, নইলে আমি যাচ্ছি।

রুমঝুম চুপটি করে রাইমসের বই খুলল। আড়চোখে দেখল মাস্টারমশাইকে। চুপটা সে থাকবে কী করে? পেটের ভেতর থেকে বুড়বুড় করে ঠেলে আসছে কথারা। বুড়বুড় করে বেরিয়েও গেল, মাস্টারমশাই তুমি হেরে গেলে কেন গো?

—আমার ইচ্ছে!

—ইচ্ছে না কচু। ইচ্ছে করে কেউ হারে নাকি?

মাস্টারমশাই চুপ।

—তুমি একটুর জন্য ফার্স্ট হতে পারলে না, তাই না মাস্টারমশাই?

—হবে।

—হবে না গো, হয়েছে। কী সুন্দর পাঁই পাঁই করে সাইকেল চালাচ্ছিলে, আমি ভাবলাম ফার্স্ট তুমি হবেই, কেউ তোমাকে আটকাতে পারবে না!

—সবাই ফার্স্ট হয় না রুমঝুম।

—দাদুও তাই বলছিল।

—কে দাদু?

—ওই যে গো, বাগানদাদু। উইদিকে থাকে। তোমাকে সেদিন তার কথা বলছিলাম না...

—ও। মনোময়বাবু?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। দাদুও তো সেদিন তোমার রেস দেখতে গিয়েছিল।

—জানি। দেখেছি।

—বাব্বাহ্, তুমি হেরে গেছ বলে সেদিন সবারই কী মন খারাপ। দাদুর মন খারাপ, মার মন খারাপ, ভালকাকুর মন খারাপ...।

রুমঝুম ঝুপ করে কথা থামিয়ে দিল। সেদিন বাড়ি এসে রুমঝুমও কি কম কেঁদেছে। কিন্তু এ কথাটা রুমঝুম মাস্টারমশাইকে কিছুতেই বলবে না। কেন বলবে? রুমঝুমের বুঝি লজ্জা করে না? তা ছাড়া ছোটরা কাঁদলে বড়রা হাসে। রুমঝুম খুব জানে সে কথা। তবে হ্যাঁ, মাস্টারমশাই যদি জিজ্ঞাসা করে রুমঝুমের কষ্ট হয়েছিল কি না, তা হলে সে বলবে।

মাস্টারমশাই সে সব প্রশ্নের ধার দিয়েই গেল না। চোখ পিটপিট করে প্রশ্ন করল, তোমার মার মন খারাপ হবে কেন? তোমার মা তো সাইকেল রেস ভালবাসে না। তোমার মা তো দেখতেও যায়নি।

—এ মা, কী বলে গো? মা বলে সেদিন তোমার রেস দেখবে বলে তাড়াতাড়ি হাসপাতাল থেকে চলে এল! রুমঝুম গুছিয়ে বলল, তারপর মা একটা ভাল শাড়ি পরল, আমি গেলাম, মা গেল, ভালকাকু গেল...

—কই, তোমাদের তো দেখতে পেলাম না!

বলেই মাস্টারমশাই চুপ করে বসে রইল। রুমঝুমের রং পেনসিল দিয়ে হিজিবিজি আঁকছে রুমঝুমের খাতায়। আহা রে, মন খারাপটা যাচ্ছে না মাস্টারমশাইয়ের। এবার নিশ্চয়ই রুমঝুমের মন খারাপ হয়েছিল শুনলে মাস্টারমশাই হাসবে না!

রুমঝুম কান্নার কথাটা বলেই ফেলছিল, তার আগেই মাস্টারমশাই বলে উঠল, তোমার ভালকাকুটা আবার কে?

—ওমা, তুমি ভালকাকুকেও চেনো না? ওই যে অনেক দূরে একটা কাঠ কাটার কারখানা আছে, ঘ্যাসর ঘ্যাসর শব্দ হয়, তার পাশেই তো থাকে। কী বড় বাড়ি গো ভালকাকুর! একটা ইয়া বড় উঠোন আছে। আমার দাদুর বাগানের থেকেও বড়।

—তুমি বুঝি সেই কাকুটার বাড়ি যাও?

—গেছি তো। কাকুর জ্বর হয়েছিল, মা দেখতে গেল, আমিও মার সঙ্গে গিয়েছিলাম। কাকু আমার ফেরার সময়ে এতগুলো চকলেট কিনে দিয়েছিল।

—হুঁ। নাও, রাইমস পড়ো। জ্যাক অ্যান্ড জিল, ওয়েন্ট আপ দা হিল...

মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে একবার রাইমসটা পড়েই কান্না পাচ্ছিল রুমঝুমের। আর পড়তে পারছে না। গলায় আটকে যাচ্ছে পড়া।

মাস্টারমশাই বকুনি দিল, থামলে কেন? পড়ো।

চোখে জল এসে গেল রুমঝুমের। নাক টানতে টানতে কোনও রকমে সামলাল কান্নাটা। মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি যায়নি রুমঝুম, কাকুর বাড়ি গেছে, সেই জন্যই কি মাস্টারমশাই রেগে গেল? রুমঝুম কী করবে? রুমঝুম একা একা সব জায়গায় যেতে পারে? দাদুর বাড়ি যায়, তাতেই না কত ঝঞ্ঝাট! ভাগ্যিস বকুলমাসি মাকে বলেছে বকুলমাসি রুমঝুমের সঙ্গে যায়, নইলে মা কি আর তাকে যেতে দিত? মা যেখানে যাবে, সেখানেই শুধু রুমঝুমকে যেতে হবে। মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি কি একা চিনে যেতে পারবে রুমঝুম?

মাস্টারমশাই কিছু বোঝে না। কালীপুজোর দিন ভালকাকু কত বাজি হাতে করে নিয়ে এল, তারাবাজি, রংমশাল, রংদেশলাই, আরও কত কী! রুমঝুম একটাও জ্বালিয়েছে? মা সেধেছে, ভালকাকু সেধেছে, বকুলমাসিও সেধেছে, তবু জ্বালায়নি। কেন জ্বালায়নি? মাস্টারমশাইয়ের জন্য কষ্ট হচ্ছিল বলেই না?

মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আর কথাই বলবে না রুমঝুম। একা একাই রাইমস পড়ুক মাস্টারমশাই, রুমঝুম কিছুতেই পড়বে না। বকুক, মারুক, চোখ রাঙাক, কিছুতেই না।

বকুলমাসি চা দিয়ে গেছে। ঘুগনিও। অন্য দিন চা এলেই কাপেব দিকে হাত বাড়ায় মাস্টারমশাই, আজ সেদিকে তাকালই না। গরগর করছে, কী হল, আমি একা বকে যাব? বলো, টু ফেএচ আ পেএল্ অব ওয়াটার।

রুমঝুম ঢোক গিলল। শক্ত করে টিপে থাকল ঠোঁট দুটোকে।

মাস্টারমশাই ড্যাবড্যাব দেখল রুমঝুমকে। দুম করে বই বন্ধ করে দিল, আমি আর কাল থেকে পড়াতে আসব না। তুমি অন্য মাস্টারমশাইয়ের কাছে পোড়ো।

রুমঝুম বুঝতে পারল না কী হয়ে গেল। কোথ্থেকে এক দলা কান্না গড়িয়ে এল গালে। দু হাতে জল মুছতে চেষ্টা করছে। যত করছে, তত বেশি কান্না বেরিয়ে আসছে হুড়হুড়।

আর তখনই মা ঢুকেছে, এ কী, রুমঝুম কাঁদছে কেন?

বসে থাকতে পারল না রুমঝুম, দৌড়ে গিয়ে মার কোমর জড়িয়ে ধরল, ও মা, মাস্টারমশাই আর আসবে না বলছে।

—কেন? কী হল মাস্টারমশাই?

মাস্টারমশাইও উঠে দাঁড়িয়েছে, না...মানে...কথাটা আমি আপনাকে বলবই ভাবছিলাম। আমার এক মাসি আছে কলকাতায়, মেসো বলছিল কলকাতায় গেলে যদি কিছু জোটানোর বন্দোবস্ত করা যায়...ঝালুয়ায় তো আমার কিছু হল না।

—ঝালুয়া ছেড়ে চলে যাবেন মাস্টারমশাই? জানেন, আপনি চলে গেলে ঝালুয়ার কত ক্ষতি হয়ে যাবে?

—কী হবে? একটা হেরো সাইক্লিস্ট সরে গেলে কোথাও কারও কিচ্ছুটি হবে না।

—মোটেই না। আপনি জানেন ঝালুয়ার লোক আপনাকে ধন্য ধন্য করছে? জানেন আপনি যখন হেরে গেলেন, আমার কী কান্না পাচ্ছিল?

মা ঠিকই বলেছে। রুমঝুমও তো সেই কথাই বলতে চায়! রুমঝুম চোখ মুছে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

মাস্টারমশাই কেমনভাবে যেন তাকিয়ে আছে মার দিকে। দাদু যেভাবে রুমঝুমের দিকে তাকিয়ে থাকে, ঠিক সেরকম।

—আমার রুমঝুম যে আপনার কাছে ছাড়া পড়বে না মাস্টারমশাই। মা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল, আমি বলি কী, ফার্স্ট প্রাইজ পাননি তো কী আছে, সেকেন্ড প্রাইজ তো পেয়েছেন। তাই দিয়ে এখানেই একটা কিছু শুরু করে দিন। ছোট করেই আরম্ভ করুন।

মাস্টারমশাই গোমড়া মুখে বলল, তিন হাজার টাকায় কিছু হয় না।

—খুব হয়। ঝালুয়ার মানুষ আপনার পাশে আছে, আপনি ঠিক পারবেন। তা ছাড়া সামনের বছর আপনি তো ফার্স্ট হচ্ছেনই। আপনি ঝালুয়ার মানুষকে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে চান?

মা কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারে! মাস্টারমশাই আর উত্তরই দিতে পারছে না, কেমন প্যাঁচার মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

রুমঝুম মাস্টারমশাইয়ের হাত ধরে টানল, ও মাস্টারমশাই, তুমি যাবে না তো?

মাস্টারমশাই রুমঝুমের চুল ঘেঁটে দিল, আজ অন্তত যাই। তবে কাল কিন্তু কোনও ফাঁকি নয়, সব কটা রাইমস মুখস্থ বলতে হবে।

রুমঝুমের বুক থেকে যেন পাথর নেমে গেল। এখন শুধু হাসিই হাসি। হাসতে হাসতে মাস্টারমশাইকে বলল, আমি এখন ফিফটি অব্দি গুনতে পারি। তোমার রাউন্ড দেখতে দেখতে গোনা শিখে গেছি।

—ওরে দুষ্টু মেয়ে, দাঁড়াও তোমার হচ্ছে!

রুমঝুম লাফাতে লাফাতে ভেতরের ঘরে চলে গেল। দুঃখের পর খুশি এলে আনন্দটা যেন আরও বেশি বেশি লাগে। দাদুর বাড়িতে যখন দাদুর ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি এল, তখন তো রুমঝুমের মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। বোজ গিয়ে গেট ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, ভেতর থেকে হাসি হল্লার আওয়াজ ছুটে ছুটে আসে, রামবিলাসদাদা আর লছমিদিদিকেও মাঝে মাঝে দেখা যায়, কিন্তু দাদু যেন ম্যাজিশিয়ানের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। বারান্দার চেয়ারটার দিকে তাকিয়েই থাকে রুমঝুম, দাদু

নিজের নাতিনাতনি পেয়ে বারান্দাতে বসাও ভুলে গেল! একদিন দুটো বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে হঠাৎ বাগানে দৌড়ে এল। এসেই পটাপট ফুল ছিঁড়তে শুরু করেছে। একটা ছেলে আবার ব্যাট দিয়ে ঠাঁই ঠাঁই মারছিল গাঁদার চারাগুলোকে। দেখে রুমঝুমের এত কষ্ট হল। দাদুর আর রুমঝুমের হাতে তৈরি অত সুন্দর বাগান...।

মা ঘরে এসেছে। ইউনিফর্ম ছেড়ে লাল টিপটিপ একটা শাড়ি পরল। আজকাল কী সুন্দর সাজগোজ করে মা। খুব ভাল দেখায়।

মা বলল, কেঁদে কেঁদে তো চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিস। চল আমরা একটু বারান্দায় গিয়ে বসি।

ভেতর থেকে বকুলমাসির রান্নার ছ্যাঁকছোক আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। রুমঝুম নাক টানল। লুচি ভাজারও গন্ধ আসছে যেন! রুমঝুমের মনে হল এত সুন্দর দিনে আজ লুচি হলে বেশ হয়।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে বাইরে। খয়েরি চাদরটা গায়ে জড়িয়ে রুমঝুমকে নিয়ে বারান্দায় বসেছে মা, রুমঝুম টুপ করে চাদরের ভেতর মাথা গলিয়ে দিল।

রুমঝুমকে জড়িয়ে ধরে দুলছে মা। হঠাৎ থেমে গেল।

—হ্যাঁরে রুমি, তোর সেই আগের জায়গাটার কথা মনে পড়ে? যেখানে আমরা ছিলাম?

—বারাসাত? হ্যাঁ, মনে পড়ে।

—সেই জায়গাটা ভাল, না এই জায়গাটা ভাল?

কী সোজা প্রশ্ন। রুমঝুম বলল, এই জায়গা।

মা চুপ করে গেল। আবার জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁরে রুমি, তোর বাবার কথা মনে পড়ে?

—একটু একটু মনে পড়ে।

—কী মনে পড়ে?

কী কঠিন প্রশ্ন! রুমঝুম চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করল। একটাই ছবি মনে আসছে। বাবা তাকে স্কুটারে বসিয়ে হু হু করে অনেক দূর নিয়ে চলে যেত, আর ফিরে এলে মা খুব বকত বাবাকে। না না, আরেকটা কথাও মনে আছে। রুমঝুমকে অনেক উঁচুতে ছুড়ে লুফে নিত বাবা। হাসত হা হা করে। তাতেও মা রাগ করত খুব। ইস, বাবাটা কেন যে মরে গেল? কেমন যেন দেখতে ছিল বাবা? ভাবতে গিয়ে রুমঝুমের খালি শোওয়ার ঘরে টাঙানো বাবার ছবিটাই চোখে আসছে।

রুমঝুম জিজ্ঞাসা করল, বাবা কি খুব ফর্সা ছিল মা? না কালো?

—ফর্সাই ছিল। তোর আমার থেকে অনেক ফর্সা।

—ওই ভালকাকুর মতো ফর্সা।

— কাছাকাছি।

মার গরম নিশ্বাস লাগছে রুমঝুমের গালে। মা আবার বলল, প্রায় ফিসফিস করে, হ্যাঁরে রুমি, ভালকাকুকে তোর কেমন লাগে?

—ভালকাকু তো ভাল।

—আচ্ছা রুমি, ভালকাকু যদি আমাদের সঙ্গে থাকে তা হলে কেমন হয়?

—কেন, আমাদের সঙ্গে থাকবে কেন? আমাদের কোয়ার্টারে এসে থাকবেই বা কী করে? বকুলমাসি বাইরের ঘরে শোয়, আমরা শোওয়ার ঘরে...

—আমরা যদি ভালকাকুর বাড়িতে গিয়ে থাকি?

এ কি তাজ্জব কথা রে বাবা! রুমঝুমরা এই কোয়ার্টার ছেড়ে ওখানে গিয়ে থাকবে কেন? সাধে কি বড়দের কথার মাথামুণ্ডু খুঁজে পায় না রুমঝুম!

রুমঝুম গম্ভীর হয়ে বলল, আমরা কেন পরের বাড়ি থাকব?

—ধর কাকু যদি তোকে বলে, রুমি তুমি আমার বাড়িতে এসে থাকো, আমি সব ঘরের দরজা তোমাকে খুলে দেব, তা হলে তুই যাবি?

—কেন বলবে ওরকম কথা? কাকু কাকুর বাড়িতে থাকবে, আমরা আমাদের বাড়িতে থাকব।...

—ধর যদি কাকু বলেই? কাকু একা একা থাকে, কাকুর কেউ কোথাও নেই...। কাকু তোকে খুব ভালবাসবে...

রুমঝুমের শরীর শক্ত হয়ে আসছিল। মা বার বার এক কথা বলছে কেন? মা কি সত্যি সত্যি কাকুর বাড়িতে গিয়ে থাকতে চায়? রুমঝুমের ভাল লাগছে না শুনতে। একটুও ভাল লাগছে না।

মার চাদর থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে বার করে নিল রুমঝুম।

একটা একটা করে তারা ফুটছে আকাশে। অনেক দূরে একটা তারা পুট করে নিভে গেল, মাথার ওপর জ্বলে উঠল অন্য একটা তারা। যে তারাটা নিভে গেল, সেটা কি জীবনের মতো হারিয়ে গেল?

রুমঝুমের হঠাৎ বড্ড মন কেমন করছিল। মিলিয়ে যাওয়া তারাটার জন্যে।

নয়

শীতের বেলা তপ্ত হচ্ছে ক্রমশ। রোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাওয়া বইছে শনশন। হাওয়া যেন বরফের ছুরি, সূর্য হার মানছে তার কাছে। অঘ্রাণেই পৌষ এসে গেছে ঝালুয়ায়।

রোদের তাতটা বেশ মিঠেকড়া লাগছিল মনোময়ের। গত জীবনে পাউচের তামাক পাকিয়ে সিগারেট খেতেন। সেই তামাকের মতোই মিঠেকড়া গন্ধ আছে রোদটায়, নেশা ধরে যায়। তফাত একটাই। এই রোদে প্রচুর ভিটামিন।

মনোময় বারান্দা থেকে হাঁক পাড়লেন, রামবিলাস...অ্যাই রামবিলাস।

দড়িদড়া বাঁশের খুঁটি কাঁধে রামবিলাস বেরোচ্ছে গেট দিয়ে। হাতেও এক ইয়া বড় শাবল। মনোময়ের ডাক শুনে ঘুরে এল, ডাকছেন বাবু?

রামবিলাসের সাজ দেখে মনোময় বিমোহিত। বললেন, এ সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চললি কোথায়?

রামবিলাস একগাল হাসল, পরশু রাতে আপনার সঙ্গে কথা হল না? বললাম আজ দোকানের কাজটা আরম্ভ করে দেব।

—হুঁ, বলছিলি বটে। তা জায়গাটা পেলি কোথায়?

—এই তো শিমুলতলার পাশে।

—ওখানে তোর ভাজাভুজির দোকান চলবে?

—পাশেই হাসপাতাল আছে, খাবার দোকান চলবে না?

—বুঝেছি। তোর দোকানে খেয়েই সব হাসপাতালে ভর্তি হবে আর কী।

রামবিলাস দাঁত বার করল, আপনার জন্য রোজ নিয়ে আসব। খেয়ে দেখবেন ভেজাল আছে কি না।

—তেলেভাজায় আবার ভেজাল। মনোময় হো হো হাসলেন, তা এই বয়সে দোকানঘর বাঁধার কাজও তুই একলা করবি না কি? কাজটা তো চাট্টিখানি কথা নয়! শেষে বুড়ো বয়সে একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসিস না।

—আমি বুড়ো নই বাবুজি। রামবিলাস গেটের দিকে এগোল। কী ভেবে ঘুরে তাকিয়েছে, লছমিকে আপনার স্নানের জলের কথা বলা আছে। আর কোনও দরকার হলে হাঁক দেবেন, লছমি চলে আসবে।

মনোময় চিন্তিত মুখে বললেন, কটা বাজে রে এখন? নটা বাজেনি?

—বহুক্ষণ বেজে গেছে।

—মেয়েটা এখনও এল না কেন বল তো?

—এসে যাবে। এখনই এসে যাবে।

রামবিলাস চলে যাচ্ছে। চোখ বন্ধ করার আগে চলন্ত রামবিলাসকে একবার জরিপ করলেন মনোময়। পেশি যেন ফেটে বেরোচ্ছে পঞ্চাশ পার হওয়া শরীরটা থেকে। ঝালুয়ায় এসে দিনে দিনে জোয়ান হয়ে উঠল রামবিলাস।

ঝালুয়া জায়গাটাই এরকম। এখানে রামবিলাসদের যৌবন বেড়ে যায়, এখানে পূর্ণেন্দুরা একবার প্রথম হওয়ার জন্য তিলাইদিঘি পাক দিয়ে চলে অবিরাম, কবিতারা বিষাদপ্রতিমা হয়ে এক বিন্দু সুখ খোঁজে, মহীতোষরা বেঁচে থাকে নৈঃশব্দ্য বুকে নিয়ে।

ঝালুয়ায় জীবন বড় সুন্দর। ঝালুয়ায় জীবন বড় কষ্টের।

মনোময় চোখ বুজলেন।

বেলা বাড়ে, তাপ বাড়ে। একটুকু ধ্বনি শোনার জন্য কান পেতে বসে থাকেন মনোময়। কোনও দিন আসে ধ্বনি, কোনও দিন আসে না। শব্দও বড় অভিমানী ঝালুয়ায়।

মনোময় চেয়ার ছেড়ে নেমে এলেন বাগানে। কয়েকটা গোলাপ বড় হতে হতে বিশাল আকার ধারণ করেছে, তাদের খুব নিকটে এসে দাঁড়ালেন মনোময়। কালচে লাল রং ফ্যাকাশে হয়ে আসছে, এবার যে কোনও দিন শব্দ করে ফেটে যাবে ফুলগুলো, পাঁপড়ি সব ঝরে পড়বে মাটিতে। ফুলের মৃত্যু হবে।

ফুলের মৃত্যু! কথাটা কী মনোরম, অথচ কী বিষাদময়!

মুমূর্ষু গোলাপের থেকে চোখ ফেরাতে গিয়ে সহসা হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে এল মনোময়ের। ও কী ওখানে?

সার সার গাঁদাগাছ ফুলে সেজে আছে। তাদের হলুদ রং এত তীব্র যে হঠাৎ দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

মনোময় চোখ ঘষলেন ভাল করে।

না, ভুল দেখেননি মনোময়। হলুদ গাঁদার বনে শুয়ে আছে রুমঝুম। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কুঁকড়ে। ছোট্ট হয়ে। দু গাল জুড়ে তার শুকিয়ে আছে অশ্রু, তবু ঠোঁটের ফাঁকে কী অপার্থিব হাসি।

কখন এল মেয়েটা!

মনোময় মেয়েটাকে ছুঁতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিলেন। আহা থাক, ফুটে থাক ফুল হয়ে।

এমনি করে ফুটে থাকার নামই তো জীবন।

ধূসর বিষাদ

ভাস্বতী ভার গলায় বলল, চলে এলাম রে দাদা।

অন্য সময়ে এ কথা বললে বাড়িতে একটা খুশির হাওয়া বয়ে যায়। ভাস্বতী আসবে, ছেলেমেয়ে নিয়ে কটা দিন কাটাবে, এ তো খুব আনন্দের খবর। কিন্তু আজ ঘরটা কেমন থমথমে হয়ে গেল। বুঝি বা ভাস্বতীর স্বরেই তার আভাস ছিল।

হিমানী শুয়েছিলেন, ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ভাস্কর আর রিনা মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। এমনকী পিকলু যে পিকলু বুবলু মুনিয়াকে পেলেই উচ্ছ্বাসে লাফাতে থাকে, সেও পিসিকে দেখে থতমত।

ভাস্কর অবাক মুখে বলল, চলে এলাম মানে?

—চলে এলাম মানে চলে এলাম। এখানেই থাকব। পাকাপাকি। ভারী সুটকেসটাকে হিমানীর ঘরের এক কোণে ঠেলে দিল ভাস্বতী। আঁচলে মুখ মুছে বলল, ওর সঙ্গে থাকা আর সম্ভব নয়।

—কী হয়েছে তোদের? হয়েছেটা কী? হিমানীর স্বর দুলে গেল।

কী বলবে ভাস্বতী! পৃথিবীর সবথেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বনেদে কেন ঘুণ ধরে, কী প্রক্রিয়ায় তা একটু একটু করে ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ায়, সেটা বোঝানো কি এতই সহজ! নিজেই কি সে বুঝেছে পুরোপুরি!

তবু জবাব তো একটা দিতেই হয়, না দিলে ছাড়ান নেই। অন্তত এই মুহূর্তে।

ভাস্বতী চশমার ব্রিজে আঙুল চাপল—বললাম তো, ওর সঙ্গে ঘর করা অসম্ভব।

ভাস্কর অসহিষ্ণু হল—কেন অসম্ভব সেটা বলবি তো?

—ও আর মানুষ নেই রে দাদা।

—অ্যাদ্দিন পর এটা কি একটা কথা হল বুলু? রণজয় করেছে কী, খুলে বলবি তো?

ভাস্বতী তক্ষুনি উত্তর দিল না। পায়ে পায়ে খাটে গিয়ে বসেছে। বিছানায় হিমানী এখন আধশোয়া, ষাট পার হওয়ার পর থেকে পার্কিনসনে ভুগছেন, ইদানীং মাথাটাও কাঁপে, মেয়েকে দেখার পর থেকে কম্পন বেশ বেড়ে গেছে তাঁর। এখনই মার সামনে কাদা ঘাঁটাঘাঁটি কি না করলেই নয়! বুবলু মুনিয়াও সেই থেকে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে, পিকলুর চোখ গোলগোল, ওদের সামনেও কি আলোচনাটা সমীচীন? তবে এও ঠিক, বুবলু মুনিয়ার কিছুই অজানা নেই, আজ না হোক কাল পিকলুও জেনে যাবে সব, কার কাছে কী গোপন করবে ভাস্বতী!

তবু একটা সঙ্কোচ আসছে।

সঙ্কোচ, না সংস্কার?

ভাস্বতী চাপা গলায় বলল—বলছি সব। একটু জিরোতে দে।...বুবলু মুনিয়া যাও তো, পিকলুদাদার সঙ্গে গিয়ে খেলা করো।

রিনাও যেন সচেতন হয়েছে এতক্ষণে। ব্যস্তভাবে বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা ও ঘরে যাও এখন।...পিকলু, তোমার নতুন ক্যারামবোর্ডটা বুবলু মুনিয়াকে দেখাও। বলতে বলতে ননদের দিকে ফিরেছে—ওদের কিছু খাইয়ে এনেছ...?

—খেয়েছে। ট্যাক্সিতে ওঠার সময়ে দুজনকে দুটো টিফিন কেক কিনে দিয়েছিলাম।

—ওমা, শুধু টিফিন কেকে কি ওদের হয়! না না, ওদের খেতে দিই আগে।...তুমিও তো নিশ্চয়ই...রিনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যাচ্ছে বাচ্চারাও। বড়দের দেখতে দেখতে। বুঝে গেছে, এই রহস্যময় গোপনীয় আসরে তাদের স্থান নেই। দরজায় গিয়েও ছুট্টে ফিরে এল মুনিয়া। ভাস্বতীর আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর বেরিয়ে গেল পায়ে পায়ে।

ঘরের হাওয়া আরও ভারী হয়ে গেছে। রবিবারের সকাল, চৈত্রের সূর্য এখনও আকাশের কাঁধ ছোঁয়নি, ভাস্করদের পাইকপাড়ার বাড়ির দোতলায় আলো বাতাসও খুব, তবু যেন এক গুমোট নেমেছে ঘরে, মৃদুমন্দ পবন থমকে আছে জানলার ওপারে।

ভাস্বতীর বুকে কষ্টটা ফিরে আসছিল। শুধু নিজের জন্য নয়, ছেলেমেয়ের জন্যও। বাবা মার লড়াই দেখে রাতভর সিঁটিয়ে ছিল মুনিয়া, ঘুমের মধ্যেও চমকে চমকে উঠেছে। বুবলুও কি ভয় পেয়েছে কম! না হলে বাপের অত ন্যাওটা ছেলে এক ডাকে ভাস্বতীর পিছন পিছন সুড়সুড় বেরিয়ে আসে! গোটা পথ একটাও কথা বলেনি বুবলু, আধখানা কেক লুকিয়ে ট্যাক্সির জানলা দিয়ে ফেলে দিল। কাকে লুকোস বুবলু? মাকে? বেচারা। বেরোনোর আগে বাবাকে কী যেন বলতে গিয়েছিল বুবলু, বোধহয় যাচ্ছি বাবা, আসি বাবা ধরনের কিছু, কী বিশ্রী এক হুঙ্কার ছাড়ল রণজয়! যেন ছেলে নয়, রাস্তার নেড়ি কুকুরকে ঢিল মেরে খেদাচ্ছে। ছেলেমেয়ের ওপরও যার তিলমাত্র মায়া মমতা নেই, তাকে কি মানুষ বলা চলে!

ভাস্কর মোড়া টেনে বসেছে। ঘাড় ঝুলিয়ে। মাঝে মাঝে দেখছে বোনকে, আবার মাথা নামাচ্ছে। উঠে পাশের ঘর থেকে সিগারেট দেশলাই নিয়ে এল। হিমানীর সামনেই ভাস্কর সিগারেট খায় আজকাল।

সিগারেট ধরিয়ে ভাস্কর বলল—রণজয় কী করেছে তুই কিন্তু এখনও বললি না বুলু।

—কী বলি বল তো দাদা। ভাস্বতী লম্বা নিশ্বাস ফেলল—যা খুশি আরম্ভ করেছে এখন। নেশা করছে, চিৎকার, গালিগালাজ...বাড়িটা পুরো বস্তি হয়ে গেছে।

হিমানী সোজা হওয়ার চেষ্টা করলেন—কই, আগে তো কখনও এ সব শুনিনি!

—এ সব কি ঢেঁড়া পিটিয়ে বলার মতো কথা মা? বললেও কি তোমাদের ভাল লাগত?

—মদ তো রণজয় আজ নতুন খাচ্ছে না। ভাস্কর ঝপ করে বলে উঠল—হঠাৎ কী ঘটল যে...

—সবকিছুর তো একটা মাত্রা থাকে রে দাদা। আগে খেত, ন'মাসে ছ'মাসে। বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় গেল, পার্টিতে গেল, একটু-আধটু খেয়ে এল...ঠিক আছে। সে আর কোন বাড়িতেই বা না খায় আজকাল। আড়চোখে একবার হিমানীকে দেখে নিল ভাস্বতী, কিন্তু বুবলুর বাবা যা শুরু করেছে, তা একেবারে মাত্রাছাড়া। রোজই প্রায় চুর হয়ে ফিরছে, এটা ভাঙছে, ওটা ছুড়ছে, প্রতিদিন হল্লা মাতলামি...গায়ে পর্যন্ত হাত চালিয়ে দেয়। দ্যাখ, কাল কী রকম মেরেছে দ্যাখ, সর্বাঙ্গে আমার কালশিটে পড়ে গেছে।

—কী বলছিস কী। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। রণজয় চিরকাল একটু খ্যাপাটে, কিন্তু...। ভাস্করের তবু যেন ঠিক প্রত্যয় হচ্ছে না, হঠাৎ এমনি এ সব শুরু করে দিল? ওর কি অফিসে কিছু প্রবলেম চলছে?

ভাস্বতী ঈষৎ আহত হল। দাদার কথা শুনে মনে হয় যেন অফিসে কিছু গোলমাল চললেই রণজয়ের এ ধরনের আচরণ স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত হয়ে যায়।

গোমড়া মুখে বলল—না দাদা, তার অফিস দিব্যি চলছে। অত নেশা করে এলে কি আর মানুষ সেন্সে থাকে? তার ওপর এখন আবার নতুন বাতিকে ধরেছে। নতুন কেন বলব, আগেও ছিল। তবে এতটা ছিল না। ভাস্বতী আবার একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল,—সন্দেহবাতিক রে। সারাক্ষণ নোংরা নোংরা সন্দেহ মাথায় ঘুরছে। তুমি ওই ছেলেটার সঙ্গে কথা বলো কেন! ওর দিকে তাকিয়ে হাসলে কেন! অফিস থেকে ফিরতে এত রাত হল কেন! রাহুলকে তো তোরা দেখেছিস, বুবলুর জন্মদিনে এসেছিল, খুব ক্যারিকেচার করছিল...তনুশ্রীর ভাই...আমার থেকে ছেলেটা কত ছোট, আমার ভায়ের মতো...তাকে নিয়ে পর্যন্ত কী ভাষায় যে কথা বলে তুই কল্পনাও করতে পারবি না দাদা।

ভাস্কর চুপ হয়ে গেল। ভাবিত মুখ, বিস্মিত চোখ, কুঞ্চিত কপাল। হিমানীও নিঝুম। তাঁর ধূসর চোখের মণি শঙ্কায় স্থির।

রিনা ফিরেছে ঘরে। ননদ বরেব সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছে, এমন দৃশ্য থেকে নিজেকে বিযুক্ত রাখা তার পক্ষে কঠিন। ক্ষণিক নিস্তব্ধতাও তার পছন্দ নয়। দুঃখী

দুঃখী মুখে বলে উঠল—তা হলে এখন তোমার কী হবে বুলু?

—স্বামী স্ত্রীতে এমন হয়ই। হিমানী বললেন—কদিন বাদে মিটমাট হয়ে যাবে, তখন চলে যাবে।

—না মা, আমি এখন থেকে এখানেই থাকব। অবশ্য তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে।

—ওমা, আপত্তি হবে কেন? থাকো না যতদিন খুশি। এটা তো তোমারও বাড়ি। রিনার চোখ পিটপিট। যেন মাপতে চাইছে ননদের সিদ্ধান্তের গভীরতা। হাসি মুখেই বলল—কিন্তু তোমার ছেলে মেয়ের স্কুলের কী হবে?

এ চিন্তাটা আগে ভাস্বতীর মাথায় আসেনি। কেন আসেনি! টেনশানে কি মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ হয়! ছেলে মেয়ে দিব্যি স্কুলবাসে চলে যেত টালিগঞ্জ, কিন্তু এখন? পাইকপাড়া অবধি কি স্কুল বাস আসবে? মনে হয় না। নর্থ ক্যালকাটায় বোধহয় আসে না বাস। তবে ঠিক এই মুহূর্তেই অবশ্য সমস্যাটা নেই। সদ্য সদ্য স্কুলের পরীক্ষা হয়েছে, রেজাল্ট বেরোতে এখনও দশ-পনেরো দিন, ক্লাস শুরু হবে আরও দিন সাতেক পর, এর মধ্যে কি কোনও একটা সমাধান বেরোবে না?

ভাস্বতী উদ্বেগটা প্রকাশ করল না। নিচু গলায় বলল—সে ভাবনা আমার করা আছে। কাছেই তো মেট্রো রেল, একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে মেট্রো ধরে ওদের স্কুলে পৌঁছে দেব। আবার অফিস থেকে ফেরার সময়ে...

—যাহ, তা হয় নাকি! রোজ রোজ দুজনকে ট্যাঁকে নিয়ে যাওয়া, ফেরা, পারবে?

—পারতেই হবে। উপায় যখন নেই।

—মুনিয়ার সাড়ে তিনটেয় স্কুল ছুটি হয় না? সে তোমার জন্য সাড়ে পাঁচটা ছ'টা অব্দি বসে থাকবে? বাচ্চাদের কিন্তু কষ্ট হবে খুব। তা ছাড়া ওদের স্কুলও তো মেট্রো স্টেশনের গায়ে নয়, অনেকটা হাঁটা!

ভাস্বতীর চোখ হঠাৎ জলে ভরে এল। নাক টানল জোরে জোরে।

চশমা খুলে দুচোখের কোল মুছল। বাপ যদি চণ্ডাল হয়, ছেলেমেয়েদের কষ্ট পেতেই হবে।

হাঁটুতে মুখ গুঁজে ভাস্বতী বলল—তেমন হলে ওই স্কুল ছাড়িয়ে দেব। দাদার তো এদিকে অনেক জানাশুনো, কাছাকাছি কোনও স্কুলে ভর্তি করে দিতে পারবে না দাদা?

—তুই আবার বড্ড বেশি বেশি ভাবছিস। ভাস্কর চঞ্চল মুখে উঠে দাঁড়িয়েছে। অস্থির পায়ে পায়চারি করতে করতে আরেকটা সিগারেট ধরাল—আমি কি একবার রণজয়ের সঙ্গে কথা বলব?

—লাভ নেই দাদা। শুধু শুধু মান খোয়ানো।

—তা বলে চুপ করে থাকব? ভাস্কর ঝাঁ করে তেতে গেল—মগের মুলুক নাকি, যা ইচ্ছে তাই করবে! বিয়ের দুমাস-চারমাস পরে হলে নয় কথা ছিল। বিয়ের এগারো বছর পর...দু-দুটো বাচ্চা হয়েছে...এই সময়ে ওরকম ইল্লুতেপনা সে করে কোন সাহসে' আমাব বোনের সঙ্গে মিসবিহেভ করেছে, আই ওয়ান্ট অ্যান এক্সপ্ল্যানেশন ফ্রম হিম। আমার বোনের গায়ে হাত তুলেছে! আই শ্যাল টিচ হিম আ লেসন। ভেবেছেটা কী আঁ? ভেবেছেটা কী?

রাগলে দাদার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, ভাস্বতী জানে। মাত্র বিয়াল্লিশে দাদার রক্তচাপ চড়ার দিকে, নিয়মিত ওষুধ খায়।

নার্ভাস গলায় ভাস্বতী বলল—আ দাদা, আস্তে। শান্ত হ। বাইরে বাচ্চারা সব শুনছে।

—শুনুক। আমি যদি রণজয় মিত্তিরের ঘেঁটি ধরে এনে তোর কাছে ক্ষমা চাওয়াতে না পারি, আমার নামে তুই কুকুর পুষবি।

—তুমি যে দেখছি শিশুদেরও বাড়া হয়ে গেলে! সবে তো এল, ব্যাপারটা একটু থিতোতে দাও না। বুলুকে একটু একা থাকতে দাও। রিনা ঝেঁঝে উঠে টানল স্বামীকে—এখনই লঙ্কাকাণ্ড না বাধিয়ে, যাও একটু বাজার থেকে ঘুরে এসো তো। বুবলুটা মাংস ভালবাসে, ওর জন্য একটু মুরগি নিয়ে এসো। আর মুনিয়াটার জন্য মিষ্টি দই।

ভাস্কর তবু ফুঁসছে—তুই আর একদম ফিরে যাবি না বুলু। তোর দাদা যদ্দিন জিন্দা আছে, দেখি তোকে কে অসম্মান করে। আজ থেকে বুবলু মুনিয়ার ভারও আমার।

ভাস্বতী এবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল। এইটুকুই তো চায় মানুষ। একটু সহানুভূতি, একটু বোঝাপড়া, একটু ভালবাসা। এটুকুও দিতে মানুষ যে কেন এত কৃপণ হয়!

ভাস্কর চলে গেছে বাজারে। রিনা রান্নাঘরে।

হিমানী কাঁপা কাঁপা গলায় মেয়েকে বললেন—মন খারাপ করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভাস্বতী শূন্য চোখে তাকাল—কী ঠিক হয়ে যাবে মা? তোমার জামাই বদলে যাবে? মদ খাওয়া ছেড়ে দেবে? সন্দেহবাতিক ঘুচে যাবে?

—আরে বাবা, ঘটি বাটি একসঙ্গে থাকলেও ঠোকাঠুকি লাগে, আবার মিলেও যায়। তুই দেখিস, সে যদি কোনও অন্যায় করে থাকে, ঠিক ভুল বুঝতে পারবে।

কী সরল ধারণা! জীবনের প্যাঁচপোঁচ কিছুই বোঝে না মা।

ভাস্বতী নিজেকে অন্যমনস্ক করতে চাইল। যদি কষ্টটা কমে। কান পাতল বারান্দায়। ফটাফট শব্দ হচ্ছে, ক্যারাম খেলছে বাচ্চারা। মালতীকে কী যেন বলছে রিনা, বোধহয় নতুন করে মশলা বাটার কথা। ঘরের দেওয়ালে চোখ বোলাল ভাস্বতী। কত কালের বাড়ি, প্রায় তিরিশ বছর হয়ে গেল, এখনও দেওয়াল মেঝে সিলিং কী ঝকঝকে। বাড়িটার ভারী যত্ন করে দাদা। ভাস্বতীর যাদবপুরের ফ্ল্যাটের অত ভাল প্লাস্টিক পেন্ট ছ' বছরে মলিন হয়ে গেল। শুধু অনাদরে, শুধু অবহেলায়। হাজার বার রণজয়কে বলেছে রং মিস্ত্রি ডাকো, কলি ফেরাও। মোটে আমলই দেয় না। ঘরের কোন দিকেই বা তাকায়! রান্নাঘরে টাইলস ফেটে ফেটে যাচ্ছে, বাথরুমের নর্দমা কথায় কথায় বন্ধ হয়ে যায়, গ্রিলের চটা উঠে কেমন খসকুটে মার্কা হয়ে গেছে, ব্যালকনির দরজার ছিটকিনি সেই কবে থেকে খারাপ, একটা দিকেও কি রণজয় নজর দিয়েছে কখনও! বলতে গেলে প্রোমোটারের দোহাই পাড়ে। শালা ভুসিমাল দিয়েছে। তাপ্পিতাপ্পা দিয়ে কিস্যু হবে না!

ঠিকই তো। তাপ্পিতাপ্পা দিয়ে কোনটাই বা চলে? সম্পর্ক? সংসার? অফিস দুজনেই করবে, অথচ জোয়াল টানতে হবে একজনকে। দশভুজা হয়ে। ঘরেও, বাইরেও। কেন? ভাস্বতীর অফিস কি অফিস নয়? ছেলেখেলা? বাবুর কাজের মধ্যে কাজ হপ্তায় দুদিন বাজার, মাসে একদিন ইলেকট্রিক বিল, বছরে একদিন করপোরেশন ট্যাক্স। পরের দুটো কাজ তো অফিসের বেয়ারাকে দিয়েই করিয়ে নেয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঝাড়া একটি ঘণ্টা চোখের সামনে খবরের কাগজ খুলে বসে রয়েছেন, এই মুখের কাছে চা ধরে দাও, এই সিগারেটের প্যাকেট এনে দাও, এই অ্যাশট্রে খুঁজে দাও। বলিহারি জিভ! সীতার মা সব রাঁধলে হবে না, ভাস্বতীকেও রোজ একটা করে পদ করতে হবে। করতেই হবে। ভাস্বতী যেন দাসীবাঁদি, তার কাজ নাকে দড়ি দিয়ে সকাল থেকে শুধু ছোটা আর ছোটা। রান্নাঘরে যাও, ছেলেমেয়েকে তৈরি করো, নিজে রেডি হও, মাসে কটা দিন ঠিক টাইমে অফিস পৌঁছতে পারে ভাস্বতী! ছুটির পরই বা কদিন দেরি করে ফিরেছে! কার ভরসায় হাঁ করে বসে থাকে বুবলু মুনিয়া! বাবা, না মা? কে তাদের সন্ধেবেলা পড়তে বসায়! কে তাদের স্কুলে ছোটে! ডাক্তার বদ্যি করে! মাস পয়লা ঘরে কিছু টাকা ফেলে দিয়েই বাড়ির কর্তার দায়িত্ব শেষ। সেই যে আল্লার নামে অফিস বেরিয়ে গেলেন, আড্ডা মেরে ফিরলেন রাতদুপুরে। মন হল তো সন্ধেবেলা এলেন কোনওদিন। সংসারধর্ম করতে নয়, বউয়ের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে। নাক কুঁচকে, মুখ ভেটকে বসে থাকলেন, নয়তো বোতল খুললেন ছেলেমেয়ের সামনেই। শুধু মেজাজ বিকার আর অত্যাচার। এর নাম সংসার? একেই টিকিয়ে রাখতে প্রাণপাত করে মানুষ।

অসহ্য অসহ্য। ঘেন্না ঘেন্না।

দুই

দিনটা বড় বিস্বাদভাবে কেটে গেল। সকালে যে প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল ভাস্বতী তা এখন অনেকটাই সয়ে গেছে। সারা দিন আর কেউ তেমন জেরা করেনি, দিব্যি মুরগি রেঁধে হই হই করে খাওয়া দাওয়া হল দুপুরে। যেন কিছুই ঘটেনি, যেন প্রতি বারের মতোই ভাস্বতী ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে এসেছে কটা দিন। দু-চার ঘণ্টা যেতেই বুবলু মুনিয়াও অনেক স্বাভাবিক, খেলছে, হাসছে, ছুটছে, বিকেলে মামার সঙ্গে টালা পার্কের দিক থেকে বেড়িয়ে এল। সন্ধেবেলা

ভাস্করের বন্ধু কমলদা আর মল্লিকা বউদি এল, তাদের সামনেও কিছুই হয়নি এমন মুখ করে হাহা হিহি হল খুব।

তবু ভাস্বতী টের পাচ্ছিল কোথায় যেন তার ছিঁড়ে গেছে। এবারের আসাটা তার অন্য বারের মতো নয়, তাই কি অতি স্বাভাবিক ব্যাপারও চোখে কেমন ঠেকে? মনে হয় বুবলু মুনিয়ার স্বচ্ছন্দ ভাবটা বানানো, দাদা বউদির উচ্ছলতাও মেকি। সবই বুঝি ভাস্বতীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য।

এলোমেলো ভাবনাগুলো বেপথু করে দিচ্ছিল ভাস্বতীকে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে নিজেকে হাতড়াচ্ছিল ভাস্বতী। নিজের বর্তমানকে খুঁড়ছিল, অতীতকে উলটোচ্ছিল, খুঁজছিল ভবিষ্যৎকে। বর্তমান তার চেতনার মতোই ভোঁতা হয়ে আছে এখন, ভবিষ্যৎ রাতের অন্ধকারের মতো অজানা, বার বার শুধু ঝলসে ওঠে অতীত। এই তো সেদিন রণজয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা হল। সেই যে, বাবা মাকে নিয়ে রাজগীর যাচ্ছিল ভাস্বতী, বক্তিয়ারপুরে ট্রেনের কামরায়...

ক বছর হল? বারো বছর! এক যুগ! সময় এত দ্রুত ছোটে! দৃশ্যটা তো একটুও ঝাপসা হয়নি এখনও! নীল জিনস পরে ছিল রণজয়, সঙ্গে ঝকমকে টিশার্ট, চোখে পাঁচকোনা সানগ্লাস, গলায় ঝুলন্ত দামি ক্যামেরা। পাটনা বেড়িয়ে ফিরছিল রণজয়, সঙ্গে মামাতো ভাই প্রলয়, দুজনে রাজগীর ঘুরে বুদ্ধগয়ার দিকে যাবে। রণজয় তখন কী চৌখস! যেমন কথায় ওস্তাদ, তেমনি হাঁটাচলায় স্মার্ট...বাবা মার সঙ্গে পাঁচ মিনিটে ভাব জমিয়ে ফেলল। এই ভাস্বতীদের ওয়াটার বটল নিয়ে জল ভরতে ছুটছে, এই দু হাতে ভাঁড় ব্যালান্স করতে করতে চা আনছে, কখনও বা বাবার পাশে বসে রাজনীতি খেলাধুলো আর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা নিয়ে ঝাঁঝালো মতামত জাহির করে চলেছে। প্রলয়টা চিরকালের মুখচোরা, এখনও যা, তখনও তাই, সমবয়সি পিসতুতো ভায়ের লেজুড়টি হয়ে বসে আছে সারাক্ষণ।

তখনই কি প্রেম হয়েছিল তাদের মধ্যে? উঁহু, মুগ্ধ তো তখন ভাস্বতী হয়ইনি, উলটে একটু যেন ওপরপড়া মনে হয়েছিল রণজয়কে। মনে মনে রণজয়কে তখন কী বলেছিল তাও ভাস্বতীর মনে আছে। চালিয়াত! তবে হ্যাঁ, রণজয়ের হাবভাবে মজাও লাগছিল মাঝে মাঝে। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সে যেমনটা লাগে আর কী। মনে হচ্ছিল রণজয়ের মধ্যে একটা ছেলেমানুষও যেন ঘাপটি মেরে আছে। অনেকটা যেন তার ফেলে আসা কলেজের সহপাঠীদের মতো। প্রলয়ের সঙ্গে ভাস্বতী দু মিনিট কথা বলেছে কি বলেনি, অমনি কায়দা করে ভাইকে হটিয়ে তার পাশে বসে পড়ল রণজয়;—কী ম্যাডাম, ওর সঙ্গে ফিসফিস কেন, আমার সঙ্গেও হোক।

—বলুন কী বলবেন। ভাস্বতীও সঙ্গে সঙ্গে মরালীর মতো গ্রীবা তুলেছে।

—আগে শুনি ওর সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল।

—কী কথা আর! এমনিই।...এখানকার লোকালিটি নিয়ে...আপনার ভাই তো এদিকটা বেশ ভাল চেনে!

—আরে দূর দূর, ও মহা গুলবাজ। পাটনার ছেলে তো, তাই শো করে ও যেন গোটা বিহার সম্পর্কে অথরিটি। আপনি আমায় জিজ্ঞেস করুন, আমি আপনাকে এ অঞ্চলের দু হাজার বছরের ইতিহাস বলে দেব।

তখন চাকরি করতে করতে কম্পিটিং পড়ছে রণজয়। বিক্রমাদিত্য মৌর্য বংশের রাজা, না গুপ্ত বংশের, কাকে বিহার বলে, কাকেই বা সঙ্ঘারাম, কীভাবে ও অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল, সবকিছুতেই সে সমান অজ্ঞ। দু মিনিট কথা বলতেই ধরা পড়ে গেল ভাস্বতীর কাছে। তাতেও লজ্জাশরমের বালাই নেই, মুচকি মুচকি হাসছে। শুধু প্রলয়কে ভাস্বতীর সঙ্গে কথা বলতে দেবে না বলেই...

ভাস্বতীর কি সেদিনই রণজয়কে চিনে ফেলা উচিত ছিল? বোঝা উচিত ছিল রণজয় নিছক ছেলেমানুষ নয়, সে এক আদ্যন্ত ঈর্ষাকাতর পুরুষ! প্রবল অধিকারমত্ত এক আদিম মানব!

কিন্তু ভাস্বতী বুঝবেই বা কী করে? তার তো তখন রণজয়কে নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। যে পুরুষ তাকে টানছে না তার হাস্যকর আচরণে মজা লাগতে পারে, তার মনের গভীরে ঢোকার ভাস্বতীর কী দায়! কে তখন জানত ওই যুবকই একদিন তার নিয়তি হবে! বুবলু মুনিয়ার বাবা হয়ে ছারখার করে দেবে জীবনটা!

রাজগীর পৌঁছে রণজয়রা আলাদা হয়ে গেল। কলকাতা থেকেই ভাস্বতীদের হোটেল বুক করা ছিল, সেখানেই উঠেছে তারা। একদিন নালন্দা পাওয়াপুরী বেড়িয়ে এল, রোজ উষ্ণকুণ্ডে স্নান করছেন হিমানী, বাবা মেয়ে সকালসন্ধে হেঁটে হেঁটে টহল দিচ্ছে রাজগীর, দিন চার-পাঁচ দুই মক্কেলের আর টিকিটি নেই।

হিমানী তো একদিন জিজ্ঞাসাই করে ফেললেন,—হ্যাঁ রে, বুলু, ছেলেদুটো কোথায় উবে গেল বল তো?

ভাস্বতী ভুরু কুঁচকেছিল,—কেন, তাদের দিয়ে তোমার কী দরকার?

—না, এইটুকু তো জায়গা...পথেঘাটে কোথ্থাও দেখা যায় না...ওরা আট-দশ দিন থাকবে বলেছিল না?

—বলেছিল। হয়তো মন টেঁকেনি, চলে গেছে।

ইশ, সত্যিই যদি তাই হত! অন্ধকারে অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকাল ভাস্বতী। হয়তো তা হলে জীবনটা অন্যরকম হত! হয়তো অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হত তার, আরেক খাতে গড়িয়ে যেত জীবন! সেই জীবন কি এর থেকেও বিশ্রী হত কিছু!

গলাটা শুকিয়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে মশারির চালে ফেলা বেডসুইচ টিপতে গিয়ে বাহুমূলে টান অনুভব করল ভাস্বতী। মুনিয়া। মাকে আঁকড়ে ধরে আছে। সন্তর্পণে ভাস্বতী ছাড়াল মেয়ের হাত। আলো জ্বালল। মা দিদিমার মাঝখানে ঠাসাঠাসি করে শুয়ে আছে মেয়ে, পাখার তলাতেও ঘামছে। ভাস্বতী আঁচল দিয়ে মেয়ের কপালটা আলগা মুছে দিল। অল্প কেঁপে উঠল মুনিয়া, ঘুমের ঘোরেই হাত বাড়িয়ে খুঁজছে মাকে। ও বাড়িতে ভাইবোন আলাদা ঘরে শোয়, তখনও কি এভাবে মুনিয়া খোঁজে ভাস্বতীকে? নাকি নিরাশ্রয় হওয়ার চোরা আতঙ্কে এমনটা করছে আজ?

ঘুমন্ত মেয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ভাস্বতী। পালক পালক চোখের পাতা তিরতির নড়ছে। টোপা টোপা গাল, ডলপুতুলের মতো টুলটুল মুখ কী নিষ্পাপ।

ভাস্বতীর বুক মায়ায় ভরে গেল। এই ফুলকেও কিনা রণজয়...!

হিমানী জেগে গেছেন,—কীরে, বসে আছিস যে?

ভাস্বতী সচকিত হল,—জল খাব।

—মন খারাপ লাগছে?

উত্তর দিল না ভাস্বতী। মশারি তুলে বেরিয়ে এল। কোণে টুলে জগ রাখা আছে, ঢকঢক ঢালল গলায়। বেশ খানিকটা জল উপচে গেল মুখ থেকে, গড়িয়ে নামছে গলা বেয়ে। আবার ফিরেছে বিছানায়। আলো নেবাতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল, আবার হাত কাঁপতে শুরু করেছে হিমানীর। ঘুমোলে কাঁপুনি একেবারে থেমে যায়, জেগে উঠলেই শুরু হয়, কী বিচিত্র যে এই রোগ।

মৃদু স্বরে ভাস্বতী জিজ্ঞাসা করল,—তুমি ঠিক মতো ওষুধ খাচ্ছ মা?

—খাই তো।

—তবু দিন দিন এত বাড়ছে কেন? ডাক্তার কী বলছে?

হিমানী চোখ বুজলেন,—এ রোগ আমার আর সারবে না রে বুলু।

—কে বলেছে সারবে না? কত বড় বড় স্পেশালিস্ট দেখাচ্ছে দাদা...কত নতুন নতুন বিদেশি ওষুধ বেরোচ্ছে...

—না রে। প্রবীণ ঠোঁটে শীর্ণ হাসি,—তেমন রোগে ধরলে কারুর আর সারানোর সাধ্যি থাকে না। হোমিওপ্যাথি কবিরাজি অ্যালোপ্যাথি কিছু কি কম হল? কোনও উন্নতি দেখেছিস? বাড়ছে তো বাড়ছেই।

ভাস্বতী কথা না বাড়িয়ে আলো নিবিয়ে দিল। সত্যিই তো, তেমন তেমন রোগে ধরলে তা থেকে সেরে ওঠা বড় কঠিন। শরীরেরও, মনেরও। এক সময়ে এই মা কত শক্ত সমর্থ ছিল। পাড়ার দুর্গাপুজো কালীপুজোয় ফল কাটা থেকে শুরু করে ভোগ রান্না সবেতেই মায়ের ডাক, আত্মীয় স্বজনদের বাড়ির কাজেকর্মে সাত হাতে খাটছে মা। বাবা তো সেই আটটার মধ্যে অফিস বেরিয়ে যেত, তাসের আড্ডা সেরে ফিরত রাত নটায়, সংসারটাকে একা মাথায় তুলে রেখেছিল মা। অথচ তার মধ্যেই কিনা লুকিয়ে

ছিল এই অক্ষম করে দেওয়া রোগের বীজ! ব্যাধি যখন ফুটে বেরোয়, মানুষের আগের রূপ যেন সম্পূর্ণ অচেনা হয়ে যায়।

ভাস্বতীরও কি রণজয়ের আগের রূপটাকে কম অজানা লাগে!

কালো আঁধারে আবার ভেসে উঠছে ছবি। বাবার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে রাজগীরের পাহাড়ে উঠছে ভাস্বতী। তিন পোয়া পথ পার হয়ে হঠাৎ সিঁড়িতে ধপ করে বসে পড়লেন রমানাথ। নিশ্বাস নিতে পারছেন না, হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে মুখ, ঘামছেন দরদর। হিমানীর মুখ ভয়ে কালো, ভাস্বতী কী করবে দিশা পাচ্ছে না। তখনই পাহাড় ফুঁড়ে দেবদূতের মতো আবির্ভূত হল রণজয়। কী পরিশ্রম করে যে বাবাকে নামাল নীচে! ধরাধরি করে তাঁকে টাঙায় তুলে দিল , হোটেলে এসে ডাক্তার ডেকে আনল...! প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু হয়ে যেতে তেমন গুরুতর কিছু ঘটল না বাবার। সকাল বিকেল বাবার খবর নিয়ে গেল রণজয়, বুদ্ধগয়া বাতিল করে তাদের সঙ্গে ফিরে এল কলকাতায়।

প্রায় অপরিচিত রমানাথের জন্য উদ্বিগ্ন সেই রণজয় পরশু রাতে বুবলুর জ্বর শুনেও ডাক্তারের কাছে না গিয়ে বোতল খুলে বসে গেল! মেলা ফ্যাচর ফ্যাচর কোরো না, তোমার ছেলে তুমি সামলাও!

আরও কত বদল। কী পিপাসিত চোখে ভাস্বতীর অফিসের সামনে এসে অপেক্ষা করত রণজয়! তখন ভাস্বতীর নতুন চাকরি, রণজয়কে দেখে লজ্জায় মরে যেত। কী আকুল মুখে ভাস্বতীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল রণজয়! বিয়ের মুখে মুখে রণজয়ের মা বউদিরা হঠাৎ একটার পর একটা বায়নাক্কা শুরু করল। সাঁইত্রিশখানা নমস্কারি চাই। বরযাত্রীদের প্রাইভেট কারে করে আনতে হবে, লাক্সারি বাস টাস চলবে না। দাদা শুনে রেগে কাঁই। রণজয়কে ডেকে বলেছিল, এমন করলে তো আর তোমাদের সঙ্গে কাজ এগোনো যাবে না। বুলুও এমন শ্বশুরবাড়ি পছন্দ করছে না। ভাস্বতীকে হারাতে হতে পারে, শুধু এই সম্ভাবনাতেই ভেঙে পড়েছিল রণজয়। বাড়ি গিয়ে মা বউদিদের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল।

সেই রণজয় আজ ভোরে ভাস্বতী বেরিয়ে আসার সময়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। এত জোরে যে আশপাশের ফ্ল্যাটগুলোও বোধহয় কেঁপে উঠেছিল।

না বদল নয়, এটাই বুঝি রণজয়ের আসল রূপ। অন্য চেহারাটা ছিল রণজয়ের ভান।

ভাস্বতী চোখ বুজল। ঘুম আসছে না। শরীরে একটা অসহ্য জ্বালা জ্বালা ভাব, মাথার পিছনটা দপ দপ করছে। উঠে গিয়ে একটু মাথায় জল দিয়ে আসবে? থাক, মা জেগে আছে, আবার একরাশ কৈফিয়ত দিতে হবে।

পাশ ফিরল ভাস্বতী। সহসা প্রায় ভুলে যাওয়া এক তেতো ছবি হানা দিয়েছে মস্তিষ্কে।...প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে দিঘা গেছে দুজনে। শ্রাবণের সমুদ্র সেদিন বড় উত্তাল, অনর্গল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাড়ে। কোমর জলে দাঁড়িয়ে আছে ভাস্বতী, দু হাত দূরে কায়দা করে সিগারেট টানছে রণজয়। হাত নেড়ে ভাস্বতী ডাকল রণজয়কে। হাসছে রণজয়, এগোচ্ছে না, জলকে তার বড় ভয়। হঠাৎ এক প্রকাণ্ড ঢেউ আনমনা ভাস্বতীর ওপর আক্রমণ হেনেছে। উলটে পালটে পড়ে যাচ্ছিল ভাস্বতী, পাশ থেকে এক মধ্যবয়স্ক মানুষ ঘাবড়ে যাওয়া ভাস্বতীর কাঁধ চেপে ধরলেন, কোনওক্রমে সামলে গেল ভাস্বতী। ভদ্রলোক পাড়ে এসে কথা বলছেন ভাস্বতীর সঙ্গে। এমনি কথা। কোত্থেকে এসেছে ভাস্বতীরা, কোথায় উঠেছে, ভবানীপুরে ঠিক কোন জায়গায় তাদের বাড়ি, এই সব। ভদ্রলোক ডাব কিনেছেন, ভাস্বতীর দিকে এগিয়ে দিলেন, আবার নেমে গেছেন জলে। এপাশ ওপাশ তাকাল ভাস্বতী, রণজয় নেই। দ্রুত হোটেলে ফিরে দেখল এর মধ্যেই স্নান সেরে রণজয় বিছানায় শুয়ে আছে টানটান।

অবাক মুখে ভাস্বতী জিজ্ঞাসা করল,—আমায় একা ফেলে চলে এলে যে?

রণজয়ের মুখ থমথম,—একা কোথায়? তোমার তো ওখানে দোকা ছিলই!

ভাস্বতী খিলখিল হেসে উঠল,—হিংসে হয়েছে? ভদ্রলোক সত্যিই খুব ভাল গো। ব্যাচিলর মানুষ...খুব রসিক...

—থামবে তুমি? রণজয় চকিতে রুক্ষ,—অন্য পুরুষের ছোঁয়া বুঝি বেশি মিঠে লাগে?

ভাস্বতীর মুখ নীল হয়ে গেল। দু-চার সেকেন্ড স্থির দাঁড়িয়ে থেকে ঢুকে গেল বাথরুমে। স্নান সেরে চুপ করে বসে আছে হোটেলের বারান্দায়।

রণজয় পাশে এসে দাঁড়াল,—সরি স্বাতী, আমার তখন ওভাবে কথা বলা উচিত হয়নি। হঠাৎ মাথাটা এমন গরম হয়ে গেল!

সেই শুরু।

সেদিন প্রথম নেকড়ে বাঘটা উঁকি দিয়েছিল। ক্ষণিকের জন্য থাবা দাঁত নখ দেখিয়ে লুকিয়ে পড়ল গোপন ডেরায়।

ক্রোধটা ফিরে আসছে। দাঁতে দাঁত চাপল ভাস্বতী। এবার রণজয়ের ওই নখ ওই থাবা চিরকালের মতো উপড়ে ফেলতে হবে। ভাস্বতী দেখবে রণজয়ের কত তেজ।

তিন

সাত দিনে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেল অফিসে।

টিফিনে শিখা এসে ধরল,— হ্যাঁ রে, তুই নাকি আজকাল পাইকপাড়া থেকে অফিস করছিস?

ভাস্বতী মুড়ি খাচ্ছিল। তেলমাখা মুড়ি, ঝাল ঝাল, বাদাম নারকেল ছড়ানো। অফিস যাওয়ার আগে কোনও কালেই বেশি খেতে পারে না ভাস্বতী, দুপুর বারোটা থেকেই পেট জ্বালা করে। বউদি টিফিন দিতে চায়, নেয় না ভাস্বতী, অস্বস্তি হয়। এ তো এখন একদিন দুদিনের ব্যাপার নয়, বারো মাসই চলবে, কদিন আর হাতের গোড়ায় টিফিন গুছিয়ে দেবে বউদি! একদিন না একদিন বিরক্ত হয়ে যাবে না? নিজেও করে নেওয়া যায়, কিন্তু অন্যের রান্নাঘরে নিজের জন্য ঢুকতে ইচ্ছে করে না। মা সক্ষম থাকলেও একটা কথা ছিল, স্বচ্ছন্দে মার কাছে আবদার করা চলে। ছেলে মেয়ে দুটোকে সারাদিন দেখছে বউদি, এই না ঢের।

এই সব ছড়ানো ছিটানো ভাবনার মাঝে শিখার প্রশ্নের গুরুত্বটা ঠিক বুঝল না ভাস্বতী। স্বাভাবিকভাবেই ঘাড় নেড়ে বলল—হুঁ, বাপের বাড়িতে আছি।

—হঠাৎ অসময়ে সেখানে?

—বারে, ছেলেমেয়ের পরীক্ষা হয়ে গেছে না? স্কুল বন্ধ, তাই কটা দিন...ওদেরও মামার বাড়ি গিয়ে থাকা হয় না...

—ঠিক বলছিস? বরের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে যাসনি তো?

ভাস্বতীর স্নায়ু সজাগ হল। তাদের এই ছোট্ট আধা সরকারি অফিসে সাকুল্যে জনা চল্লিশেক লোক। সাত-আটটা মেয়ে, বাকি পুরুষ। মহিলা কর্মীদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সব পুরুষেরই অসীম কৌতূহল। অকারণ। অবশ্য মেয়েরাও পরচর্চায় পিছিয়ে নেই। এমতাবস্থায় একটা বেফাস কথা কীভাবে পল্লবিত হবে তার নিশ্চয়তা আছে! শিখা তার পুরনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অনেক মনপ্রাণের কথা হয় দুজনের, কিন্তু আজ এই মুহূর্তে বুঝি মুখে কুলুপ এঁটে রাখাই ভাল।

সতর্ক স্বরে ভাস্বতী বলল—দূর, ঝগড়া হবে কেন?

—না...দীপ্তি অসীমা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, কানে গেল, তাই তোকে...

—কী বলছিল ওরা?

—তা হলে ঝগড়া সত্যি হয়েছে? শিখা চোখ সরু করল।

সামনে খোলা টাইপ মেশিনে মুখ নামাল ভাস্বতী—বরের সঙ্গে ঝগড়া হলেই বুঝি শুধু মেয়েরা বাপের বাড়ি যায়? ক্রিসমাসের সময়ে পাইকপাড়া গিয়ে থাকিনি?

শিখা কী বুঝল কে জানে, উঠে দাঁড়িয়ে গোয়েন্দা চোখে ভাস্বতীকে দেখতে দেখতে বলল—তা হলে বোধহয় ওরা ভুল শুনেছে।

ভাস্বতী কথা বাড়াল না। ভাবছিল, কোত্থেকে রটল কথাটা! অফিসের কেউই তার বাড়ির কাছাকাছি থাকে না। থাকলেই বা কী ঘণ্টা হত? রাতে ঝগড়া হয়েছে, সকালে বেরিয়ে গেছে, লোকে টেরই বা পাবে কী করে? অফিস-পিওন মধু টালা পার্কের দিকে থাকে, দু-তিন দিন তার সঙ্গে দেখাও হয়েছে কিন্তু সেই বা কী করে বুঝবে ভাস্বতী চিরকালের মতো চলে এসেছে।

সূত্রটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না।

ছুটির আগে টয়লেটে অসীমার সামনে পড়ে গেল ভাস্বতী। অসীমার সঙ্গে ভাস্বতীর তেমন খাতির নেই, দেখা হলে কুশল বিনিময় হয়, ব্যস। ভাস্বতী বিশেষ পছন্দও করে না অসীমাকে। বড় বেশি বাচাল টাইপ, সিনিয়ারদের সম্মান দিয়ে কথা বলে না।

অসীমাই গায়ে পড়ে কথা শুরু করল—তোমার বরের সঙ্গে তোমার কী হয়েছে গো ভাস্বতীদি?

—কীসের কী!

—লুকোচ্ছ কেন গো? সব জানি। অসীমার ঠোঁটে ফিচেল হাসি,—তোমার বরের সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল। অফিস থেকে কাল একটু বেরোতে দেরি হল, বাসে উঠতে যাচ্ছি...তোমার বর ডাকল।

ভাস্বতীর ভুরু কুঁচকে গেল। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার মুখ নেই, অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে!

অসীমার হাসি বড় হল—জিজ্ঞেস করছিল তুমি অফিসে রোজ আসছ কি না, কখন এসেছ, কখন বেরিয়েছ...। খুব ভেঙে পড়েছে মনে হল। আহা, কেন এত যাঁতা দিলে গো?

ভেঙে পড়েছে রণজয়? অভিনয় অভিনয়, ভাস্বতী সব বোঝে।

উত্তর না দিয়ে চলে আসছিল ভাস্বতী, পিছন থেকে অসীমা বলল—রাহুল বলে ছেলেটাকে নিয়েই বুঝি গণ্ডগোল, ভাস্বতীদি?

সপাং চাবুক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ভাস্বতী।

অমনি অসীমা গলা নামিয়েছে—আমি কী করে জানব! তোমার বরের জেরা শুনে মনে হল। জানতে চাইছিল রাহুল তোমার কাছে আসে কি না, এলে কখন আসে, কতক্ষণ থাকে...

অসীমা কথা শেষ করল না। তবু যেন ফুরোল না কথাটা। ঘুরতেই থাকল ঘুরতেই থাকল, ঘুরে ঘুরে কানে বাজছে ভাস্বতীর। ঝাঁ ঝাঁ করছে কান, যেন লক্ষ ঝিঁঝিপোকা কলরোল তুলছে অফিস জুড়ে।

সিটে এসে খানিকক্ষণ ঝুম বসে রইল ভাস্বতী। ঘরে অপমান করে সুখ হয়নি, এখন অফিসে হানা দিচ্ছে রণজয়! আরও ছোট করতে চায় ভাস্বতীকে! রাহুল এখানে নেই, নাটকের দলের সঙ্গে শিলিগুড়ি গেছে, ফিরে যদি এ সব কথা শোনে, কী ভাববে ছেলেটা!

রাহুলের সঙ্গে ভাস্বতীর হৃদ্যতা বছর দুয়েকের। হঠাৎ একদিন অফিসের সামনে দেখা। ভাস্বতী চিনতেও পারেনি। কলেজের বান্ধবীর ভাই, সেই কবে ছোটটি দেখেছিল, মনে রাখা সম্ভব! রাহুল নিজেই যেচে পরিচয় দিল। তখন সবে চাকরি পেয়েছে রাহুল, ভাস্বতীদেরই বিল্ডিংয়ে, ইনসিওরেন্সে। লম্বা চোখা চেহারার প্রাণবন্ত ছেলে, ঝাঁকড়া দাড়ি, ঝাঁকড়া চুল, ফুটফুট খই ফুটছে মুখে।...দিদির খবর জানো তো? বরুণদার সঙ্গে আফ্রিকার জঙ্গলে চলে গেছে।...না না, ওয়াইল্ড লাইফ রিসার্চ নয় গো, বরুণদা সিএ সিএস। নাইরোবিতে জব ভাউচার পেয়েছে ঘ্যামচ্যাক।...তুমি এখন কোথায় আছ গো ভাস্বতীদি?...আইব্বাস যাদবপুর! আমি তো ওদিকে প্রায়ই যাই। সেন্ট্রাল পার্কের একটা বাড়িতে আমাদের রিহার্সাল হয়।...এই ভাস্বতীদি, ধোসা খাবে? পেট্রোল পাম্পের পাশের দোকানটায় দুর্দান্ত ধোসা করে।...পেমেন্ট কিন্তু আমি করব। বড় বলে রং নেবে না।

পরের শনিবারই বাড়ি খুঁজে হাজির রাহুল। প্রবল বর্ষায়। কাকভেজা হয়ে। তোয়ালে দিয়ে ঘষে ঘষে মুখ মাথা মুছতে মুছতে পুরো জটাধারী সন্ন্যাসী হয়ে গেল। লজ্জাশরমের বালাই নেই, রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়ি পাখলে পাখলে খিচুড়ি খেল ভরপেট। গলা ছেড়ে গান গাইল। সেই দিন থেকেই বুবলু মুনিয়া রাহুলমামার ফ্যান। যখনই আসে ভাগ্নে ভাগ্নির জন্য খেলনা কমিকস চকোলেট। হাহা হাসছে, নাটকের ডায়ালগ শোনাচ্ছে, মূকাভিনয় করছে। বিটকেল বিটকেল সব ধাঁধা শেখাচ্ছে বুবলুকে, মুনিয়াকে নিয়ে চলছে অনন্ত লোফালুফি। কে বলবে রাহুল বুবলু মুনিয়ার আপন মামা নয়।

রণজয়ের সঙ্গেও প্রথম প্রথম পটেছিল খুব। ছুটির দিনে সাতসকালে রাহুল হাজির, —ভাস্বতীদি, আজকের মতো বডি ফেলে দিলাম। রণোদা কোথায়?

বলতে না বলতেই রণজয়ের গলা শোনা যেত,—এসে গেছ? গুড। ভাবছিলাম সারা দিন কীভাবে কাটাব।...হোক তা হলে।

—হোক।

ব্যস, অমনি দাবার বোর্ড বেরিয়ে গেল। গজ-ঘোড়া-বোড়ে-মন্ত্রী-নৌকো সজ্জিত হচ্ছে যুদ্ধের সাজে। পাশে বুবলু মুনিয়া উৎসাহী দর্শক। খেলা আবার এমনি এমনি হবে না, কিছু না কিছু বাজি ধরা চাই। হারলে তুমি চিকেন পকোড়া খাওয়াবে, রাহুল। আপনি হারলে কিন্তু আইসক্রিম খাওয়াতে হবে রণোদা। বাজির খাওয়া তো পরের ব্যাপার, খেলতে খেলতেই হুকুম চলছে, গরম গরম আলুর চপ ভেজে দাও না স্বাতী। শুধু চপ নয় ভাস্বতীদি, সঙ্গে চা'ও...। রান্নাঘর থেকে পরের পর খাদ্য আর পানীয় সরবরাহ চলছে। কাজকর্ম শিকেয় উঠে গেল, দুপুরে নাওয়া খাওয়ার নামটি নেই, চৌষট্টি ঘরে চোখ গেঁথে বসে আছে দুই মহারথী।

তার মধ্যেই চিৎকার শোনা যায় ঘন ঘন।

—অ্যাই, তুমি চাল ফেরত নিলে কেন?

—কোথায় চাল ফেরত নিলাম রণোদা? আমি তো নৌকো মুভ করিনি।

—টাচ তো করেছ। টাচ মানেই মুভ। তোমাকে ওই নৌকোটাই চালতে হবে।

—বারে, আপনি যে তখন বিশপ হাতে তুলে নামিয়ে রেখে ঘোড়া এগোলেন।

—সে পাস্ট ইজ পাস্ট। তুমি আপত্তি করোনি কেন?

—এটা কিন্তু চোট্টামি হচ্ছে রণোদা। নিয়ম দুজনের জন্য একই হওয়া উচিত।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। রণজয় হঠাৎ উদার। বোধহয় বোর্ডে সৈন্যসামন্তের অবস্থা দেখেই—বাট দিজ ইজ লাস্ট টাইম রাহুল।...তবে ও চাল ফেরত নিয়েও তুমি জিততে পারবে না।

—দেখা যাক।

আবার দুই যুযুধান প্রতিপক্ষের লড়াই শুরু। ক্ষণ পরেই রাহুলের অট্টহাসি, নয়তো রণজয়ের হেঁড়ে গলা। ভাস্বতীদি ভাস্বতীদি, রণোদা মাৎ। দেখে যাও স্বাতী, তোমার ভাইকে কেমন পেড়ে ফেলেছি! অ্যাই, টাকা ফ্যালো, টাকা ফ্যালো।

দুজনের গলাতেই হালকা মজা, দুজনের কথাতেই সহজ বন্ধুত্বের সুর। ভাস্বতীর ফ্ল্যাট কী আলো বাতাসেই না তখন ভরে থাকত দিনভর! হঠাৎ কোন সকালে এসে ধুয়ো তুলল রাহুল, খাবার দাবার প্যাক করে বুবলু মুনিয়া সহ নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়েছে রণজয় আর ভাস্বতী। চিড়িয়াখানা। নিকো পার্ক। বোটানিকাল গার্ডেন। গঙ্গাবক্ষে বেসুরে গান ধরেছে রণজয়, নৌকোর খোলা পাটাতনে বসে ধাঁই ধপাধপ সঙ্গত করছে রাহুল। তালি দিচ্ছে বুবলু মুনিয়াও, রণজয়ের সঙ্গে গলা মেলানোর বৃথা চেষ্টা করে চলেছে ভাস্বতী। ঘুরন্ত নাগরদোলায় রণজয়ের হাত চেপে ধরেছে নার্ভাস রাহুল, তার সন্ত্রস্ত মুখ দেখে হাসিতে লুটিয়ে পড়ছে ভাস্বতী। পাঁচ জনে মিলে যেন এক উচ্ছল রঙিন কোরাস।

কদিনই বা টিকল ছবিটা! এক বছর? দেড় বছর? কী দ্রুত পালটাতে শুরু করল দৃশ্যপট! ক্রূর সন্দেহপ্রবণ এক রণজয় ভেসে উঠল ক্রমশ। সন্দেহের স্বভাব তো রণজয়ের ছিলই, চিরকাল ছিল। দিঘায় একদিনের ক্ষণিক বিস্ফোরণ ভাস্বতী তো ভুলে যেতে চেয়েছিল, রণজয় তাকে ভুলতে দিল কই! মাঝে কটা বছর একটু সহ্যের মধ্যে ছিল, এই যা। সন্দেহের বশে কী না করেছে রণজয়। নতুন ফ্ল্যাটে উঠে আসার পর ছোটখাটো একটা আড্ডা জমেছিল বাড়িতে রণজয়ের বন্ধুদের। তাস দাবা চলত, গল্পগুজব হত, মদ্যপানের আসরও বসত মাঝে মাঝে। এ সব আড্ডায় যা হয়, দু-চার জনের বেশ মুখ আলগা ছিল, ছুটছাট আদিরসাত্মক রসিকতা করত ভাস্বতীর সঙ্গে। ঠোঁটে একটু ভাল করে ক্রিম ঘষো ভাস্বতী, অমন তুলতুলে ঠোঁট দুটো শালা রণজয়টা যে ক্ষইয়ে দিল!...হেঁ হেঁ, আমার গালে তো আর ঠোঁট ছোঁওয়াবে না, দাও, এই তাসটাতেই...! কিংবা হয়তো চায়ে চিনি লাগবে না ভাস্বতী, তোমার আঙুলটা ডুবিয়ে দিয়ো তা হলেই হবে। দিব্যেন্দু নামের বন্ধুটা কেমন চাষাড়ে টাইপ ছিল ! দু পেগ পেটে পড়লেই ভাস্বতীকে গিন্নি গিন্নি বলে ডাকা শুরু করত। সবই নিছক ঠাট্টা, তাতেই ভয়ানক রেগে যেত রণজয়। তার ধারণা এ সমস্তই পরকীয়ায় পূর্বাভাস। কায়দা কানুন করে নিজেই রণজয় আড্ডাটা ভেঙে দিল। শুধু কি তাই! ক্বচিৎ কখনও সামাজিক অনুষ্ঠান ছাড়া বন্ধুবান্ধবের বাড়ি যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। নিজে যেখানে খুশি যাবে, যখন খুশি ফিরবে, কিন্তু ভাস্বতীকে অফিস থেকে ঠিক সময়ে ফিরে বাড়িতে থাকতে হবে। এটাই রণজয়ের আইন।

তাও যথাসম্ভব মেনে নিয়েছে ভাস্বতী। সংসার করতে গেলে মেয়েদের অনেকটাই ছাড়তে হয়। তবু

কি নিস্তার আছে? বছরে একদিন অফিসের পিকনিক, গেছে ভাস্বতী, রণজয় তিন দিন গুম। জ্বরে কোঁ কোঁ করছে ভাস্বতী, অফিসের কোনও পুরুষ কলিগ দেখতে এল, অমনি জেরা শুরু। কেন এল! অতক্ষণ ধরে কী গুজগুজ করছিল! অসুস্থ লোককে দেখতে এসে অত হাসে কেন!

এমন সংশয়ী মানুষ কদিন মুখোশ পরে থাকবে! কদিন হজম করবে রাহুলকে! অফিস থেকে রাহুলের নাটক দেখতে গেছে ভাস্বতী, ফিরতে বোধহয় সাড়ে নটা বেজেছে, বাড়িতে দাপাচ্ছে রণজয়। রাহুলের সামনে ভালমানুষটি, কিন্তু আড়ালে আড়ালে বক্র হচ্ছে ভাষা। ভেবেছটা কী, অ্যাঁ? ছেলে মেয়ে সংসার ফেলে ওই ছোকরার পেছনে অত ল্যাল ল্যাল করে ছুটে বেড়াচ্ছ কেন? পুজোর সময়ে শাড়ি দিল রাহুল, অতি সাধারণ শাড়ি, সিম্থেটিক। কেন দিল! কোন সুবাদে দিল! হাহ, ভাই! সারাক্ষণ ঢলাঢলি করছ দুজনে, আবার ভাই মারাচ্ছ! তর্ক করবে না, তর্ক করবে না, চড়িয়ে দাঁত ফেলে দেব।

ছেলেমেয়ের সামনে এই অপমান কাঁহাতক বরদাস্ত করা যায়। অন্যায় শাসনই বা কেন শুনবে ভাস্বতী!

শেষ দিনের লড়াইটাও রাহুলকে নিয়ে। কেন মুনিয়াকে অত দামি ডান্সিং ফ্রক কিনে দিয়ে গেল রাহুল। সব জানি আমি, সব টের পাই। রাহুলের সঙ্গে সম্পর্ক তোমার দুবছরের! মিথ্যে কথা। লাই লাই, ড্যাম লাই। পুরনো আশনাই ঘরে ঢোকানোর জন্য ভাইবোনের কামোফ্লেজ দেওয়া! আমাকে এত বোকা ভাব! আমার রং কালো, তোমার রং কালো, মুনিয়া কী করে এত ফরসা হল! তোমার রাহুলের মতো!

এ কথাও বলেছে রণজয়।

রাগেই বলুক, হিংসেতেই বলুক, কি নেশাতে, বলেছে তো।

একি শুধু সন্দেহ? মনের কোণে সূক্ষ্ম একটা অবিশ্বাস ঘাঁটি গেড়ে না বসলে কোন স্বামী এ কথা উচ্চারণ করতে পারে?

এর পরও আর কত অসম্মান করতে চায় রণজয়!

পাঁচ-সাত দিন কেটে গেল।

রণজয় আর অফিসের ত্রিসীমানায় আসেনি।

অথচ ভাস্বতী আশঙ্কা করেছিল আসবে রণজয়। ছুটির পর সঙ্গে সঙ্গে বাসে ওঠেনি, অপেক্ষা করেছে খানিকক্ষণ, চোখ ঢালিয়ে খুঁজেছে তন্ন তন্ন করে। নেই। সেই একদিনই ধোঁয়ার মতো আবির্ভূত হয়ে তার অফিসের হাওয়া দূষিত করেই উধাও রণজয়। নিশ্চুপ। কী মতলব ভাঁজছে কে জানে! পাইকপাড়ার বাড়িতে একবারও যোগাযোগ করল না, একটা ফোন পর্যন্ত না। আশ্চর্য!

ভাস্বতীর খবর না নিক, বুবলু মুনিয়ার তো খোঁজ নিতে পারত। ছেলেমেয়ের রেজাল্ট বেরিয়ে গেল, থ্রিতে উঠল বুবলু, মুনিয়া নার্সারি টু, তাদের সম্পর্কেও কোনও আগ্রহ নেই রণজয়ের!

এদিকে ও বাড়ির চেহারা ভার হচ্ছে ক্রমশ। বিশেষত মার। রোজই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জামাইয়ের কথা তোলে মা, উলটো দিক থেকে সাড়া না পেয়ে মুখ আরও কালো। বুবলু মুনিয়াও কেমন মনমরা হয়ে যাচ্ছে, ভাস্বতী টের পায়। হাসে কম, খেলে কম, কথা বলে আরও কম। দাদা বউদির চোখের প্রশ্নচিহ্নও বড় হচ্ছে দিন দিন।

অফিসে এসে আজ মনস্থির করে ফেলল ভাস্বতী। প্রথম রাগের ঝোঁকটা কেটে গেছে, এবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রণজয় যদি সত্যিই এত উদাসীন হয়, তারও আর এই সম্পর্ক বয়ে বেড়ানোর দায় নেই। তবে পাকাপাকি আলাদা থাকতে গেলে তার একটা স্থায়ী প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। অফিস থেকে আজ একটু আগে আগে বেরিয়ে সোজা যাদবপুর যাবে। বুবলু মুনিয়ার সোমবার থেকে ক্লাস শুরু হচ্ছে, সেদিন তাড়াহুড়োতে ওদের ইউনিফর্ম আনা হয়নি, আগে সেগুলো নিয়ে আসা প্রয়োজন।

সেই মতোই বেরোচ্ছিল, অফিসের দরজায় রাহুলের সঙ্গে দেখা।

—তাড়াতাড়ি কাটছ যে?

—কাজ আছে। ভাস্বতী আলগা হাসল—তুমি ফিরলে কবে?

—কাল ভোরে। এসেই একটা লম্বা ঘুম দিলাম। টানা আঠারো ঘণ্টা।

—শো কেমন হল? বলতে বলতে ঘড়ি দেখল ভাস্বতী।

—শিলিগুড়িতে তো গ্রান্ড। দারুণ অডিয়েন্স, দারুণ রেসপন্স। পর পর দুটো কল শো হাউস ফুল। কুচবিহারের শো-টা অবশ্য জমেনি। হেভি শাওয়ার। সারাটা দিন। তবু নয় নয় করেও শ' দুয়েক লোক হয়েছিল।

—বাহ্। করিডোর ধরে হাঁটতে শুরু করেছে ভাস্বতী। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার অফিসের দিকে দেখে নিল। চোরা একটা অস্বস্তি কিলবিল করছে বুকে। অফিসের কেউ দেখছে কি!

দ্রুত পা চালিয়ে লিফটের সামনে এল ভাস্বতী।

পিছন পিছন রাহুলও—কী ব্যাপার বলো তো? দৌড়চ্ছ কোথায়?

—বললাম তো কাজ আছে।

—কী কাজ?

—তুমি জেনে কী করবে?

রাহুল ফিক করে হাসল—তুমি এত সিক্রেটিভ হয়ে গেলে কবে থেকে?

ভাস্বতী সামান্য চোয়াল ফাঁক করল।

—বুবলু মুনিয়ার কী খবর? ওরা নিশ্চয়ই আমায় খুব মিস করছে?

ভাস্বতীর এবারও কোনও জবাব নেই।

লিফট এসে গেছে, টুক করে ভেতরে সেঁধিয়ে গিয়ে ভাস্বতী বলল—যাচ্ছি। পরে কথা হবে।

তাতেও রক্ষা নেই। লাফাতে লাফাতে পাঁচতলা থেকে সিড়ি বেয়ে নেমে এসেছে রাহুল। বিল্ডিংয়ের গেটে পৌঁছনোর আগে ধরে ফেলেছে ভাস্বতীকে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো? অ্যাদ্দিন পর এলাম...আমাকে কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছ?

—কতবার তো বললাম। কাজ আছে।

—বাপস রে, এত ফায়ার কেন? তোমাদের ওই টারা বসের কাছে ঝাড়টাড় খেয়েছ নাকি?

—ফাজলামি কোরো না। আমার আজ মেজাজ ভাল নেই।

—কেসটা কী? লুজ মোশান? অম্বল? মাইগ্রেন?

রাহুলের সামনে সত্যিই গোমড়া থাকা কঠিন। ভাস্বতী হেসে ফেলল—কিচ্ছু হয়নি রে বাবা।

—বললেই হল! আমি ফেস রিড করতে পারি। নাকের পাটা ফোলা কেন? মুখে কী বিড়বিড় করছ?

ভাস্বতী আবার মুখে কুলুপ আঁটল। পা চালাচ্ছে জোর জোর।

একটু পিছনে দাঁড়িয়ে গেল রাহুল—কাল তোমাদের বাড়ি আসছি। রাতের দিকে। বুবলু মুনিয়ার জন্য সারপ্রাইজ আছে।

ভাস্বতী মুহূর্তে ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল। অনর্থক জটিলতা বাড়িয়ে লাভ নেই, সরাসরি জানিয়ে দেওয়াই ভাল। পিছিয়ে এসে স্তিমিত স্বরে বলল—বুবলু মুনিয়া নেই। পাইকপাড়ায় আছে।

—সেকী! ওদের স্কুল স্টার্ট হয়নি?

—সোমবার খুলবে।

—ওরা কি রোববার ফিরছে? রাহুল মাথা চুলকোল—রবি সোম তো আমার আবার একটু কাজ আছে, নাটকের একটা ওয়ার্কশপ চলবে...হোলডে...তা হলে কি মঙ্গলবার যাব?

ভাস্বতী একটা নিশ্বাস টানল—বুবলু মুনিয়া এখন পাইকপাড়া থেকেই স্কুল করবে।

—কেন?

—করবে। এবার থেকে ওখানেই থাকব আমরা।

রাহুল যেন এতক্ষণে থমকেছে—রণোদা কোথায়?

—সে তার মতো তার বাড়িতেই আছে।

—তুমি দেখছি আমায় সাসপেন্স দিচ্ছ!

ভাস্বতী আবার চুপ।

নীরবতাই বুঝি সেতু রচনা করে দিল। কিছু কিছু বুঝল রাহুল, কিছু আন্দাজ করল। উচ্ছ্বাস ভরা মুখে পলকা ছায়া, মাথা নিচু, হাঁটছে পাশে পাশে। একটা সিগারেট ধরাল। কটা টান দিয়েই ফেলে দিল।

বাস স্টপ অবধি হেঁটে এসে মুখ তুলেছে—এত সব কবে ঘটল?

—ঘটে গেল।

—আমি যাওয়ার পর পরই?

—বলতে পারো।

দু-চার সেকেন্ড নীরব থেকে রাহুল বলল—কারণটা জানতে পারি?

—পোষাচ্ছিল না।

—হঠাৎ?

—দুনিয়ায় কিছুই হঠাৎ ঘটে না রাহুল। ভাস্বতী বহুক্ষণ পর রাহুলের দিকে সোজাসুজি তাকাল—এই যে সামনে বাসটা আসছে, আমি যদি এখন এর তলায় চাপা পড়ি, সেটাও হঠাৎ ঘটবে না। কারণ থাকবে। হয় আমি অন্যমনস্ক ছিলাম নয় ড্রাইভার রেকলেস চালাচ্ছিল। দুটোর কোনওটাই না হলে বুঝতে হবে গাড়িটার কলকব্জা বিগড়েছিল। নেহাত আমরা তলিয়ে দেখি না তাই ভাবি...

রাহুল চোখ সরিয়ে নিল। আনমনা মুখে পথচারীদের দেখছে। আকাশের কোণে মেঘ জমছে, যখন তখন কালবৈশাখী আসতে পারে। ঢং ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে দমকলের গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, অন্য গাড়িরা সন্ত্রস্ত হয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। বিপদ সংকেত মিলিয়ে গেল ক্রমশ।

রাহুল আপন মনে বলে উঠল—আমি কিছুটা আঁচ করেছিলাম।...রণোদা বড্ড মুডি মানুষ। ...মিটমাট সম্ভব নয়?

—আমি রাজি নই। ভাস্বতী শ্বাস চাপল।

—এত তাড়াতাড়ি ফাইনাল ডিসিশান নিয়ে ফেললে?

এগারো বছর ওই লোকের সঙ্গে ঘর করার পরও রাহুল বলে তাড়াতাড়ি!

ভাস্বতীর ঠোঁট বেঁকে গেল—ডিসিশান ফাইনালই হয় রাহুল। ডিসিশানের কোনও মাঝামাঝি অবস্থা নেই।

—হুম। রাহুল বুঝদারের মতো মাথা নাড়ল—তুমি এখন চলেছ কোথায়? পাইকপাড়া ফিরছ?

পলকের জন্য ভাস্বতী ভাবল হ্যাঁ বলে দেয়, মুখ দিয়ে মিথ্যেটা বেরোলই না। বলল—না। আমি এখন যাদবপুর যাচ্ছি। কটা জিনিস নেওয়ার আছে।

—ও। আমি কি যাব তোমার সঙ্গে?

ভাস্বতী দ্বিধায় পড়ে গেল। না বলাই যায়, কিন্তু কেন না বলবে? সেটা হবে মনের দুর্বলতা দেখানো। রণজয়ের অভিযোগটাকে প্রশ্রয় দেওয়া। যদিও এই মুহূর্তে একা থাকতেই ইচ্ছে করছে, তবু রাহুলকে সে কথা বলা বড় কঠিন। এত সরল মায়াবী ছেলেটাকে আঘাত দিতে খারাপ লাগে।

ভাস্বতী মৃদু ঘাড় নাড়ল—চলো।

—ট্যাক্সি ধরব?

—ধরতে পারো, কিন্তু ভাড়া আমি দেব।

গোটা পথ প্রায় নিঃশব্দেই কাটল। টুকটাক দু-চারটে প্রশ্ন করছিল রাহুল, কীভাবে স্কুল করবে বুবলু মুনিয়া, ভাস্বতীর বেশি পরিশ্রম হয়ে যাবে কি না, এই সব। হু হাঁ উত্তর দিচ্ছিল ভাস্বতী। কথা জমছিল না। কখন যেন দুজনেরই চোখ জানলার বাইরে।

তিনতলায় ভাস্বতীদের ফ্ল্যাট। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দাঁড়িয়ে গেল রাহুল—তুমি কী নেবে নিয়ে এসো। আমি নীচে দাঁড়াচ্ছি।

—কেন?

—এমনিই।...দেরি কোরো না। আমাকে আবার রিহার্সালে যেতে হবে।

—তা হলে তুমি এলে কেন?

রাহুল উত্তরও দিল না, ওপরেও উঠল না। সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। ল্যান্ডিংয়ে

কাচের জানলা, চোখ রেখেছে জানলায়।

ভাস্বতী আর জোরাজুরি করল না। মানুষের মন বোঝা বড় ভার। কী ভেবে এল, কী ভেবে দাঁড়িয়ে গেল ভগবান জানে। রাহুলকে তো সে বলেনি তাকে সন্দেহ করেই যুদ্ধ করেছে রণজয়? তবে রাহুল কি আঁচ করেছে কিছু? নাকি রাহুলের মনেও পাপ আছে কোনও?

ফ্ল্যাটের লক খুলে অন্দরে ঢুকতেই ভাস্বতীর বুকটা ধক করে উঠেছে। শূন্য ফ্ল্যাট কী ভীষণ শূন্য। কত সময়ে তো খালি ফ্ল্যাটে একা থেকেছে ভাস্বতী, কই কখনও তো এমন অনুভূতি আসেনি! কখন কাজ করে গেছে সীতার মা? রণজয় কটায় ফেরে?

ভাস্বতী সব ঘরের আলো জ্বেলে দিল। রান্নাঘর বাথরুম সব আলোকিত হয়ে গেছে। জ্বলুক জ্বলুক, একটু অন্তত দীপ্তিময় হোক।

উচ্চকিত আলোয় শুনশান ফ্ল্যাটে ঘুরছে ভাস্বতী। এ ঘর ও ঘর সর্বত্র। ড্রয়িংরুমের ক্যাবিনেটে হাত বোলাল। এই ফ্ল্যাটে আসার আগে বানিয়েছিল ক্যাবিনেটটা, নিজের পছন্দে, নিজের ডিজাইনে। কাচের শো-কেসটা নিলামঘর থেকে কেনা। রান্নাঘরের বাসন রাখার র‍্যাকটা এখনও ছ মাসও হয়নি। সোফায় নতুন ঢাকা পরাবে ভেবেছিল, চৈত্র সেলে কেনার জন্য সরানোও ছিল টাকা। বুবলু মুনিয়ার ঘর অল্প অবিন্যস্ত, সেখানেও চোখ বোলাল ভাস্বতী। দেখে মনে হয় এই মাত্র দুটিতে গেছে কোথাও, এখনই ফিরবে। ভাস্বতীদের খাটে জংলা ছাপ বেড কভার পরিপাটি পাতা, কোণের তাকে বালিশ মশারি। যেমনটি রাখে ভাস্বতী। ড্রেসিং টেবিলে এখনও ছড়ানো আছে ভাস্বতীর প্রসাধনী। এলোমেলো। একটার গায়ে একটা।

সবই কেমন অচেনা লাগছে। নিজের জিনিস, নিজের ঘরবাড়িও এমনটি মনে হয়! হয়তো।

ডাইনিং স্পেসে এসে ফ্রিজটা একবার খুলল ভাস্বতী। ঠাণ্ডা জলের বোতল, ডিম, মাখন, দুধ। সীতার মা কী যেন একটা রেঁধেও রেখে গেছে। কাঁসির ঢাকা খুলতে গিয়েও খুলল না ভাস্বতী। কী হবে দেখে! ভাস্বতী ছাড়াই সব তো সুন্দর চলছে। ভাস্বতীকে কার কী প্রয়োজন।

বেডরুমে ফিরে এল ভাস্বতী। আলমারি খুলে, ওপর থেকে কিটস ব্যাগ নামিয়ে শাড়ি ভরল কয়েকটা। সেদিন ঝোঁকের মাথায় মাত্র চার-পাঁচটা শাড়ি নিয়ে গেছে, কুলোচ্ছে না। রাহুলের দেওয়া সাদাকালো সিন্থেটিকটা নাড়াচাড়া করে দেখল একটু, পুরল ব্যাগে। দ্রুত হাতে কয়েকটা সায়া ব্লাউজ ব্রেসিয়ার। লকারে রাখা মোটা বালা দুটো নিল, মফচেন নিয়েও রেখে দিল। রণজয়ের দেওয়া জিনিস রণজয়ের ঘরেই থাক। গত বিবাহবার্ষিকীতে রণজয় নীল কাঞ্জিভরম দিয়েছিল, ওটাও ভাস্বতী ছোঁবে না। পাশের ঘর থেকে বুবলু মুনিয়ার ইউফর্মগুলো নিয়ে এল, কয়েকটা জামাকাপড়ও। ঠেসে ঠেসে ভরল ব্যাগে। অনেক কিছু রয়ে গেল। বুবলুর ক্রিকেট ব্যাট, মুনিয়ার একরাশ পুতুল...। দাদাকে পাঠাবে একদিন? এতগুলো জিনিস যে নিয়ে যাচ্ছে, চিরকুটে লিখে রেখে যাবে? কেন লিখবে? সবই তো নিজের জিনিস। নিজের।

কিটসব্যাগ বন্ধ করতে গিয়ে ভাস্বতীর বুকটা হঠাৎ মুচড়ে উঠল। কেউ যেন হ্যান্ড ড্রিল চালাচ্ছে হৃৎপিণ্ডে। কুরছে। রক্তমাংসের অসংখ্য কণা ঠিকরে গেল সাজানো ফ্ল্যাটে। সেদিন যাওয়ার সময়ে রাগ ছিল, আজ কোত্থেকে ঝাঁক ঝাঁক কষ্ট এসে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে। স্বত্ব ছেড়ে যেতে এত হাহাকার! সংসারে এত মায়া জড়ানো থাকে!

ঘরের মধ্যিখানে বসে ডুকরে কেঁদে উঠল ভাস্বতী।

পাঁচ

—মোট কত হল?

—সাতশো বত্রিশ।

—এত?...কমিশান দিলেন না কিছু?

—দিয়েছি তো দিদি। এই বইগুলোতে টেন পারসেন্ট...এই বইগুলোয় ফিফটিন পারসেন্ট...

ভাস্বতী বিরস মুখে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলল। বুবলু মুনিয়ার বইপত্রের দামও বেড়েছে বটে। গত বছর পাঁচশোর মধ্যে হয়ে গিয়েছিল, এবার বাজেট আরও আড়াইশো বেড়ে গেল। এর পর আবার খাতা আছে। অজস্র খাতা, রাশি রাশি খাতা, সেই সব আবার স্কুল ছাড়া অন্য কোথাও থেকে কেনা চলবে না। নাম লেখা বত্রিশ পাতা আটচল্লিশ পাতার খাতাগুলোর কী সব দাম! ছ টাকা! আট টাকা! বুবলু মুনিয়ার মাস মাস মাইনেও বাড়ল পঞ্চাশ টাকা করে। খরচা শুধু বাড়ছেই আর বাড়ছেই, অফিসের মাইনে তো আর সেভাবে বাড়ে না! বুবলু এবার অঙ্কে মোটেই ভাল করেনি, পাঁচের ঘরে নম্বর পেয়েছে, প্রগ্রেস রিপোর্টে ক্লাসটিচার বুবলুর অঙ্ক নিয়ে যত্নশীল হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। প্রাইভেট টিউটর রাখতে হবে কি? সে-ও তো না হোক দুশো-আড়াইশো টাকার ধাক্কা। বুবলু মাস্টারের কাছে পড়ছে দেখলে মুনিয়া কি বায়না ধরবে না? তা ছাড়া ও বাড়িতে পিকলুও আছে...এক বাড়িতে থেকে শুধু একজনের জন্য টিউটর রাখাটা কি দৃষ্টিকটু দেখায় না? দাদাকে অনুরোধ করবে, একটু সময় করে বুবলুকে অঙ্ক দেখিয়ে দিতে? নাহ্, তাও হয় না। পিকলু পড়ে বউদির কাছে, বুবলুকে দাদার কাছে ঠেলে দেওয়াটা...! উফ, চিন্তায় চিন্তায় পাগল হয়ে যাবে ভাস্বতী।

কলেজ স্ট্রিটে সন্ধে নেমেছে। কী তাপ ছিল আজ দিনভর, শহরের ইট কাঠ পাথর থেকে এখনও তার ঝাঁঝ মিলোয়নি। চতুর্দিক ভিড়ে ভিড়াক্কার, একমুখী গাড়ির স্রোত জ্যামে পড়ে হাঁপাচ্ছে। গাড়িঘোড়ার অবিরাম বিষনিশ্বাসে আরও যেন তপ্ত হয়ে উঠছে জায়গাটা। চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেল, এখনও একটা কালবৈশাখীর দেখা নেই।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে ভাস্বতী আঁচলে মুখ মুছল। ইয়ার এন্ডিং-এর কাজ চলছে অফিসে, বড্ড চাপ, ভারী ক্লান্ত লাগছে শরীরটা। তাও ভাগ্য ভাল, এখনও বুবলু মুনিয়ার ক্লাস শুরু হয়নি, এরপর কী করে যে কী সামলাবে!

পর পর দুটো মিনিবাস ছেড়ে দিল ভাস্বতী। থকথকে গাদাগাদি, মশা মাছি গলার জায়গা নেই, বই-এর ভারী প্যাকেট হাতে পাদানি ছোঁয়া অসম্ভব।

ভাস্বতী অসহায় মুখে ঝুম দাঁড়িয়ে। পায়ে পায়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর দিকে চলে যাবে? সেখান থেকে মেট্রো ধরে বেলগাছিয়া? তারপর বাকি পথ হাঁটা? শরীর না চললে রিকশাও নিয়ে নেওয়া যায়...

—ভাস্বতী...অ্যাই ভাস্বতী?

ভাস্বতী চমকে তাকাল। একটু তফাতে ফুটপাথ ঘেঁষে একটা মেরুনরঙা মারুতি জেন। জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ডাকছে এক রমণী।

—কীরে অ্যাই, চিনতে পারছিস না?

ভাস্বতীর ভুরু দু-এক সেকেন্ড জড়ো। তারপরই শিথিল হয়েছে ভাঁজ,—ঋতুপর্ণা!

গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়েছে ঋতুপর্ণা,—এতক্ষণ লাগল চিনতে রাস্কেল? আমি তোকে একবার দেখেই...

—কী করে চিনব? ভাস্বতী ক্লান্তি ভুলে পলকে উচ্ছল,—স্কুলে তোর মুখ লম্বা ছিল, এখন একদম গোল হয়ে গেছে! উফ্, কী মুটিয়েছিস রে তুই!

হি হি হাসছে ঋতুপর্ণা। হাত ধরল,—ইশ, কতদিন পর দেখা।

—হুঁ। তা প্রায় পনেরো বছর। নাকি আরও বেশি?

—ধ্যাৎ। স্কুল ছাড়ার পর তো তোর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

হ্যাঁ, তা হয়েছিল বটে। কলেজে পড়ার সময়ে ন মাসে ছ-মাসে কোনও বন্ধুর বাড়ি দেখা হয়ে যেত বইকী। কোনওদিনই খুব একটা কাছের বন্ধু ছিল না ঋতুপর্ণা, এমন সহপাঠিনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্কুলের পরেই মোটামুটি শেষ হয়ে যায়। তবু আজ এতদিন পর ঋতুপর্ণাকে দেখে ভাল লাগছিল ভাস্বতীর। যেন কথা নেই বার্তা নেই, দুম করে আকাশ থেকে একটা স্কুলের দিন খসে পড়ল। ডানা মেলে ওড়ার দিন।

অপেক্ষমাণ যাত্রীরা ড্যাব ড্যাব করে দেখছে দুই বন্ধুকে। ঋতুপর্ণা ভাস্বতীর হাত টানল,—যাচ্ছিস কোথায়?

দায়সারা গোছের উত্তর দিল ভাস্বতী,—ফিরছি।

—তুই কী একটা যেন চাকরি করিস না? শিপ্রা না কে যেন বলেছিল? তোর কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় অফিস নাকি?

—না, আমার অফিস ক্যামাক স্ট্রিটে। ছেলেমেয়ের বই কিনতে এসেছিলাম।

—ওমা তাই! তোর কটি?

—দুই। ছেলের থ্রি হল, মেয়ে নার্সারি টু।...তোর?

—সবেধন নীলমণি এক ছেলে। ক্লাস ফাইভ। ঋতুপর্ণা এদিক ওদিক তাকাল,—রাস্তায় দাঁড়িয়ে সব কথা হয় নাকি? চল চল, আমার বাড়ি চল।

—নারে, দেরি হয়ে যাবে।

—কিছু দেরি হবে না। চল তো। এই তো সামনেই আমার বাড়ি।...তুই যাবি কোথায়?

—পাইকপাড়া।

—পাইকপাড়াতেই আছিস? বাপের বাড়ির কাছেই বিয়ে হয়েছে বুঝি?

ভাস্বতী আড়ষ্টভাবে হাসল,—না, বাপের বাড়ি এসেছি।

—তা হলে আর ভাবনা কী? ছেলে মেয়ে তো সেফ কাস্টডিতে আছে। চল চল, দু মিনিট বসে যাবি। আমার গাড়ি তোকে নামিয়ে দিয়ে আসবে।

ভাস্বতী আর আপত্তি করে পার পেল না। ঋতুপর্ণার পিছু পিছু গাড়িতে গিয়ে বসেছে। বিলাসী সিটে, অসহজ ভঙ্গিতে। যানবাহনে ঠাসাঠাসি পথেও ভারী মসৃণ চলছে গাড়ি, ঝাঁকুনি লাগছে না। ঋতুপর্ণা কলকল করেই চলেছে। স্কুলের কথা, পুরনো বন্ধুদের কথা। সুচরিতার সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল, সুচরিতা এখন মেডিকেল কলেজের ডাক্তার, নীনার বর আমেরিকায় আছে, নীনা ওখানেই সেটল করেছে, তাদের বাংলার টিচার দীপ্তিদি ক্যানসারে মারা গেছেন...

কিছু শুনছিল ভাস্বতী, কিছু শুনছিল না। হুঁ হাঁ করছে মাঝে মাঝে।

হঠাৎ বলল—তোদের গাড়িটা ভারী সুন্দর। কলকাতা শহরের রাস্তায় চলছে বোঝাই যায় না।

—হুঁ হুঁ বাবা, দেখতে হবে তো কার পছন্দ! ঋতুপর্ণা চোখ ঘোরাল,—আমার বর তো ফিয়াট কেনার ধান্দা করছিল, আমি বললাম তোমার ফিয়াট প্রেম নিয়ে তুমি থাকো। আমার জন্য কিনতে হলে এই গাড়ি কিনতে হবে।...ভাবতে পারিস কী ক্রেজি, এখনও আদ্যিকালের ফিয়াটটা নিয়ে অফিস যায়!

মানে দুটো গাড়ি। ভাস্বতী একটু ঈর্ষান্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করল,—কী করে তোর বর?

—ওর তো কনস্ট্রাকশন বিজনেস। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন। মানে তোরা যাদের বলিস প্রোমোটার। দিনরাত কাজ কাজ আর কাজ। এই সাইটে ছুটছে, ওই করপোরেশন অফিস, আজ এখানে, কাল ওখানে...এমা, তোর কথা জিজ্ঞাসাই করছি না! তোর বর কী করে রে?

ভাস্বতী থমকাল সামান্য। রণজয়ের প্রসঙ্গ তার একদম পছন্দ নয়, কিন্তু এই মুহূর্তে রণজয়ের অস্তিত্ব বুঝি পুরোপুরি অস্বীকার করাও যাবে না।

লঘু স্বরে বলল,—সে তোর বরের তুলনায় হেঁজিপেঁজি লোক। একটা প্রাইভেট কোম্পানির অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

ঋতুপর্ণা শুনল কি না বোঝা গেল না। মারুতি জেন এক পুরনো আমলের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিডন স্ট্রিটে। গাড়ির দরজা খুলে ডাকল,—আয়।

চোখ ঘুরিয়ে কয়েক সেকেন্ড বাড়িটাকে দেখল ভাস্বতী। আগেকার দিনের বনেদি বাড়ি যেমন হয়? সেরকমই চেহারা। তবে বড্ড শ্রীহীন, দেখে মনে হয় বহুকাল কোনও মিস্ত্রিটিস্ত্রির হাত পড়েনি। এ বাড়িতে থেকে ওই মারুতি জেন চড়ে ঋতুপর্ণা?

অন্দরে ঢুকে ভুল ভাঙল। দোতলায়, যেদিকটায় ঋতুপর্ণারা থাকে, সেদিকটা একদম ঝকঝকে তকতকে। দেওয়ালে প্লাস্টিক পেন্ট, পেলমেট থেকে বাহারি পর্দা ঝুলছে, দামি দামি সোফা, প্রকাণ্ড টিভি, সুদৃশ্য ক্যাবিনেটে অ্যান্টিক শো-পিস।

চওড়া ডিভানে ভ্যানিটি ব্যাগ ছুড়ে দিয়ে ঋতুপর্ণা বলল,—ওদিকটায় আমার জা ভাসুর দেওররা থাকে, আমরা এদিকটা আলাদা করে নিয়েছি...তুই হাত পা ছড়িয়ে বোস না। এসিটা একটু বাড়িয়ে দিই?

ভাস্বতী মোহিত হয়ে যাচ্ছিল। একটা কাঁটাও ফুটছিল কোথায়। স্কুলে লেখাপড়ায় তার থেকে অনেক

নিরেস ছিল ঋতুপর্ণা, বাড়ির অবস্থাও এমন কিছু ভাল ছিল না, সেই মেয়ে এখন রীতিমতো অর্ধেক পৃথিবীর অধিশ্বরী। দিব্যি নিজেরটুকু গুছিয়ে নিয়ে আলাদা করে বসেছে। দেখতে অবশ্য, তার চেয়ে অনেক সুন্দর ছিল ঋতুপর্ণা। শুধু সৌন্দর্যের জোরেই বুঝি তার থেকে অনেক ধনী হয়ে গেছে মেয়েটা! অথচ কী আয়রনি, এখন সেই রূপের আর ছিটেফোঁটাও নেই ঋতুপর্ণার! তাকে দেখে এখন এক মুটকি গিন্নি ছাড়া কিছু মনে হয় না। স্কুলে নিয়মিত স্ট্যান্ড করে ভাল কলেজে পড়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কী লাভ হয়েছে ভাস্বতীর! কিছু না করেই ঋতুপর্ণা তার থেকে অনেক বেশি পেয়ে গেল। একেই বোধহয় কপাল বলে।

ভেতর থেকে দ্রুত ঘুরে এসেছে ঋতুপর্ণা। সোফায় গা ছড়িয়ে বসল,—হ্যাঁ বল, কী খাবি?

—কিছু নারে। শুধু এক কাপ চা।

—বন্ধুকে বাড়ি ডেকে এনে শুধু চা?...ফ্রিজে কটা ফ্রাই গড়া আছে, ভেজে দিতে বলি? মিস্টি টিস্টি খাস তো? নাকি ডায়েটিং করছিস?

ভাস্বতী এবারে হেসে ফেলল,—না রে, কিছুই করছি না। সবই খাই, তবু কোনও কিছুতেই গায়ে চর্বি লাগে না।

—আমায় ঠাট্টা করছিস? কিছু না খেয়েই আমি মোটা হচ্ছি রে। বলতে বলতে হাঁক পেড়ে কাজের লোককে ডাকল ঋতুপর্ণা। নির্দেশ দিয়ে গুছিয়ে বসল আরও,—হ্যাঁ, কী যেন কথা হচ্ছিল আমাদের?

—কিছু না তো। ভাস্বতী দ্রুত মাথা নাড়ল।

—না না, গাড়িতে কী যেন একটা কথা হচ্ছিল।...যাক গে। আজকাল কিছুই আর মনে রাখতে পারি না।

ভাস্বতী মুচকি হাসল। ঘাড় হেলিয়ে বলল,—তোর ছেলে কোথায়?

ঋতুপর্ণা গলা নামাল,—ওর আজ ইংলিশের মাস্টারমশাই এসেছে। সোম বুধ শুক্র ইংলিশ, মঙ্গল, বেস্পতি শনি বিজ্ঞান অঙ্ক। ইতিহাস ভূগোলের জন্য কোনও টিচার রাখিনি, ও নিজে নিজেই পড়ে। আমার কর্তা বলছিল ইতিহাস ভূগোলও নেগলেক্ট করা ঠিক না, আই সি এস সি-র সময়ে ওই নিয়েও প্রবলেম হতে পারে। বাংলা ইতিহাস ভূগোল মিলিয়ে একটা টিচার পাওয়া যায় না? তা হলে তিনটে সাবজেক্ট একজনের কাছে পড়তে পারে?

আবার ভাস্বতীর বুকে একটা কাঁটা ফুটল। বুবলুর একটা টিউটর রাখবে কিনা ভেবে ভেবে ভাস্বতী জেরবার হয়ে যাচ্ছে, আর ঋতুপর্ণা...! ঢোক গিলে ভাস্বতী বলল,—তোর ছেলে তো সবে ক্লাস ফাইভ বললি, এখনই এত টিউটর না রাখলেই নয়?

—বারে, ছেলের রেজাল্ট খারাপ হলে কর্তা আমায় ছেড়ে দেবে?

—তোর কর্তাকে তুই খুব ভয় পাস মনে হচ্ছে!

—ধুস, ভয় পাব কেন? ঝটিতি বলেই হাসছে ঋতুপর্ণা,—ভয় একটু পাইও বটে। সে মানুষ ভাল তো ভাল খুব ভাল, কিন্তু রেগে গেলে যে একেবারে নটরাজ।

—তাইই!

—তাই কী রে? ওর রাগ তুই চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবি না। আমাদের আগের কালার টিভিটা তো আছড়ে আছড়ে ভাঙল।

—সেকী রে! কেন?

—দোষ আমারই। কাজ থেকে ফিরেছে, কোনও কারণে হয়তো মেজাজ খারাপ ছিল..আমায় একটু কফি করে দিতে বলল...আমার সেদিন খুব মাথা ধরে ছিল, শুয়েছিলাম। দুম করে বলে ফেলেছি মণ্টুর মা তো আছে, তাকে গিয়ে হুকুম করো না!...ব্যস, অমনি খেপে আগুন।

ভাস্বতী স্তম্ভিত। এ যে রণজয়েরও বাড়া। রণজয়ের হাজারো বায়নাক্কা আছে ঠিকই, তবে ভাস্বতীর শরীর খারাপ শুনলে কক্ষনও তাকে এমন হুকুম করে না রণজয়।

মধ্যবয়সি এক মহিলা চা খাবার নিয়ে এসেছে। ভাস্বতীর সামনে ট্রে নামিয়ে চলে গেল ভেতরে।

ঋতুপর্ণা উঠে গরম ফ্রিশফ্রাই-এর প্লেট ভাস্বতীর হাতে তুলে দিল,—তা একদিক দিয়ে ভেবে দেখলে তার রেগে ওঠাটা তেমন বিচিত্র নয়। পুরুষ মানুষ খেটেখুটে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে, বউয়ের মুখে

তখন অমন কথা শুনলে রেগে যাবে না? যে মানুষটা খেতে পরতে দিচ্ছে, বউ-এর কোনও সাধ অপূর্ণ রাখে না—জানিস, দু দিন পরেই আমাকে দোকানে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ওই জাম্বো কালার টিভিটা কিনে দিল।...শাসন যেমন করে, ভালও তো বাসে। এমন মানুষের মেজাজমর্জি বুঝে চলাটা কি আমারও কর্তব্য নয়? জায়েদের সঙ্গে আমার বনছিল না...বুঝিসই তো বর আমাকে এত শাড়ি গয়না দিচ্ছে, সব চোখ টাটায়...কদিন ঘ্যানঘ্যান করতেই আলাদা হয়ে গেল। তুমি তোমার মতো মহল সাজিয়ে শান্তিতে থাকো। বলতে বলতে গলা নামাল ঋতুপর্ণা,—আমরা অবশ্য এ বাড়িতে আর বেশি দিন নেই। যোধপুর পার্কে আমার বর একটা বড় কমপ্লেক্সের কাজে হাত দিয়েছে, ওখানেই আমরা একটা ফ্ল্যাট রাখছি। বছর খানেকের মধ্যে উঠে যাব। তবে এ বাড়ির অংশও আমার বর ছাড়বে না, এদিকটা যেমন আছে বন্ধ করে রেখে যাব।

ভাস্বতী স্থির চোখে অচেনা সহপাঠিনীকে দেখছিল। তির্যক সুরে বলল,—তার মানে তুই বেশ আছিস!

—তা আছি রে। আমার অভাব কী বল? মেজাজি লোকটাকে একটু মানিয়ে গুনিয়ে চলা আর কী। ভাস্বতীর মন্তব্যের শ্লেষটুকু ধরতেই পারল না ঋতুপর্ণা। আদুরে বেড়ালের মতো শরীর মোচড়াচ্ছে,—জানিস ও কী রকম! বিয়ের পর, তখনও এর লাইনটা তেমন ধরেনি...ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার তো, খুব স্ট্রাগল করত সে সময়ে...আমি একবার বলেছিলাম, তুমি এত খাটছ, আমিও নয় একটা চাকরির চেষ্টা করি। শুনেই চোখ লাল। মেয়েদের চাকরি করা ও একদম পছন্দ করে না। আমিও বাবা বেঁচে গেলাম। দিবি খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, মার্কেটিং করছি।...শুধু একটু তার কথা মতো চলা।...তো হ্যাঁ রে, তোর কর্তাটি কেমন?

ভাস্বতীর আর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। কষ্ট করে হাসল,—নাহ্, সে একেবারে মাটির মানুষ। সাত চড়ে রা কাড়ে না।

—ভাল ভাল, খুব ভাল। তা এখন আছিস কোথায়?

—বললাম তো। পাইকপাড়ায়।

—সে তো বাপের বাড়ি। শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

মুহূর্তের জন্য একটা শূন্য ফ্ল্যাট ভাস্বতীর চোখের সামনে ভেসে উঠল। নির্জন নিরানন্দ এক মরুভূমি। ওই বাড়িটা কী? ভাস্বতীর শ্বশুরবাড়ি? নিজের বাড়ি? নাকি নেহাতই রণজয়ের বাড়িতে আশ্রিত হয়ে বেঁচে ছিল ভাস্বতী? নিশ্চয়ই তাই। না হলে অমন কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিতে পারে!

ভাস্বতী হাসিটাকে ধরে রাখল,—আমার শ্বশুর বাড়ি ভবানীপুরে। বলেই ঘড়ি দেখছে,—অনেক দেরি হয়ে গেল রে। তোর ছেলেকে একবার ডাক, দেখে যাই।

ভাস্বতীর কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার কায়দাটাও ধরতে পারল না ঋতুপর্ণা। এমন মস্তিষ্কহীন হয়ে গেছে এখন। সাজানো গোজানো এক পুতুল মাত্র। এমন হলেই কি সেও রণজয়ের সংসারে খাপে খাপে মিলে যেত? উহু, রণজয় আরও ভয়ঙ্কর, সে তার উপার্জনটাও চায়। তা ছাড়া এমন আত্মসম্মানবোধহীন হয়ে বেঁচে থাকা আর কি ভাস্বতীর পক্ষে সম্ভব?

ফেরার পথে ঋতুপর্ণার গাড়িতে বসেই ঋতুপর্ণার ওপর করুণা হচ্ছিল ভাস্বতীর। বেচারা ঋতুপর্ণা, ঐশ্বর্য কাকে বলে বুঝলই না।

সেদিন টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে গিয়ে মনটা ভারী দুর্বল হয়ে গিয়েছিল ভাস্বতীর। ঋতুপর্ণা যেন জোরটা ফিরিয়ে দিল।

এমনও হয়!

ছয়

বুবলু মুনিয়ার স্কুল পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। নতুন এক রুটিন চালু হয়েছে ভাস্বতীর। সাড়ে আটটার মধ্যেই ছেলে-মেয়েকে তৈরি করে বেরিয়ে পড়ে, তাদের স্কুলে পৌঁছে দিয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে অফিস, রোজ বড়বাবুর হাতে পায়ে ধরে অফিস ছুটির আগেই বেরিয়ে পড়া, হাঁচোড় পাঁচোড় করতে করতে স্কুলে ছোটা, তারপর বাড়ি। ফেরে যখন, তখন একেবারে হাক্লান্ত দশা। নিজেরও। ছেলেমেয়েরও। পনেরো দিনেই ভাস্বতী জেরবার হয়ে গেল।

তবু এভাবেই চলতে হবে এখন। উপায়ই বা কী! এর মধ্যেই খানিকটা ছন্দ খুঁজে নিতে হবে সংসারে।

নিয়েছেও ভাস্বতী। বুবলু পিকলু এখন এক ঘরে থাকে, মুনিয়াকে নিয়ে ভাস্বতী শোয় মার খাটে। হিমানীর খাটটা খুব চওড়া নয়, তিন জনে শুলে বেশ চাপাচাপি হয়, কিন্তু কী আর করা! নিজেদের মালপত্রও সব মার ঘরে। হিমানীর আলমারি, হিমানীর আলনা, সবেতেই এখন ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ভাব। এক-তলায় ভাড়াটে রয়েছে, দোতলার তিনখানা ঘরেই ভাগাভাগি করে থাকতে হবে সকলকে। দাদুর দস্তানার মতো।

অসুবিধে কি শুধু এইটুকুই! এক ধরনের জীবনে ভাস্বতীরা অভ্যস্ত হয়েছে দীর্ঘদিন, অন্য ধরনের জীবনযাপন মেনে নেওয়া খুব শক্ত। বুবলু মুনিয়া মাছ দেখলে নাক সিঁটকোয়, ও বাড়িতে মাংস আর ডিমই হত বেশি। এখানে দু বেলা শুধুই মাছ, মাংস আসে ছুটির দিনে, ব্রেকফাস্টের টেবিলে ছাড়া ডিম খাওয়ার বড় একটা চল নেই। যাদবপুরে রাত দশটার আগে কস্মিনকালে খাওয়া হত না, এ বাড়ির নিয়ম একদম আলাদা। সাবেকি নিয়ম। সওয়া নটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সারো, তারপর ইচ্ছে মতো টিভি দেখো, বই পড়ো, গান শোনো। শ্রান্ত অবসন্ন বুবলু মুনিয়া বাড়ি ফিরেই ঘুমিয়ে পড়ে, অগত্যা খাওয়ার পর তাদের পড়াতে বসে ভাস্বতী। শরীর ভেঙে আসে তখন তার।

এ তো গেল সরল অসুবিধে। সংসারে কিছু জটিল সমস্যাও আছে। খুব সূক্ষ্ম। এত সূক্ষ্ম যে সাদা চোখে দেখা যায় না, মর্মে মর্মে অনুভব করতে হয়। ভাস্করের চাকরি ব্যাঙ্কে। কাছেই, বেলগাছিয়ায়। ভারী জলখাবার খেয়ে অফিস যায় ভাস্কর, দুপুরে টুক করে স্কুটার নিয়ে খেতে আসে বাড়িতে। পিকলুর স্কুল এগারোটায়, সেও পাড়াতেই। তারও সাতসকালে খাওয়ার তাড়া নেই। রিনা সামান্য ঢিলেঢালা ধরনের গৃহিণী, ধীরে সুস্থে রান্না করে, ঘর সামলায়, তাতেই এ বাড়ির চলে যাচ্ছিল এতদিন। ভাস্বতীদের জন্য দিন সাতেক সকালেই হুটোপুটি করে রিনার মুখ হাঁড়ি। দেখে শুনে ভাস্বতী নিজেই হাল ধরল। ভোর ভোর উঠে হেঁসেলে ঢুকে পড়ে, ছেলেমেয়ের খাবার বানায় টিফিন তৈরি করে, সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্যও বন্দোবস্ত করে ফেলে যা হোক। এতেও যে রিনা খুব প্রসন্ন, তা নয়। রান্নাঘরই যার রাজ্যপাট, সে কি আর সহজে তার দখল ছাড়তে চায়। একটুখানির জন্যই ঢুকুক ভাস্বতী, কি সারা দিনের জন্য, রিনার কৌটোবাটা নিয়েই তো খবরদারি। তবে এ ব্যবস্থা মন্দের ভাল, প্রভাতী নিদ্রাটা ছাড়তে হচ্ছে না রিনাকে। ভাস্বতীও বউদির মনস্তত্ত্ব বুঝে ফেলেছে, ভোরের সময়টুকু ছাড়া পারতপক্ষে সে রান্নাঘর মাড়ায় না।

বুবলু মুনিয়ার জামা প্যান্টও এ বাড়ির কাজের লোককে কখনও কাচতে দেয় না ভাস্বতী, নিজেই সাবান ঘষে রোজকারটা রোজ। দরকার কী, যদি মালতী পুট করে কিছু বলে বসে! বিয়ের পর বাপের বাড়ি বেড়াতে আসা এক কথা। কিন্তু পাকা ঘাঁটি গাড়তে গেলে অনেক ব্যাপারেই চোখ বুজে থাকতে হয় মেয়েদের, অনেকটাই জমি ছেড়ে দিতে হয়। ভাস্বতী জানে। বউদির মন রাখতে প্রায়শই কিছু না কিছু কিনে আনে সে। লিপস্টিক নয় পারফিউম, নয় নেল পালিশ, নিদেনপক্ষে ঘর সাজানোর টুকিটাকি। ছুটির দিনে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে, নিজের হাতে ঝাড়াঝুড়ি করে গোটা বাড়ি। তাতেও যেন রিনার মনের তল পায় না। হঠাৎ হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে যায় রিনা, এমন সব কাণ্ড করে! বুবলু সেদিন পিকলুর ক্যারামের স্ট্রাইকার হারিয়ে ফেলল, বউদি পিকলুকে চড় মারল ঠাস ঠাস। বোকা ছেলে, নিজের জিনিস সাবধানে রাখতে পারো না! ভাস্বতী দেখেও দেখেনি, শুনেও শোনেনি। আড়ালে ধমকেছে বুবলুকে।

জীবজন্তুর মতো বাচ্চারাও নিজেদের অসহায় অবস্থাটা টের পেয়ে যায়, পিকলু ডাকলেই বুবলু আর দিশেহারা হয়ে ক্যারাম খেলতে ছোটে না। পিকলুকে ভীষণ ভালবাসেন হিমানী, পিকলুই তাঁর নয়নের মণি, ইদানীং সেই আদরেও ভাগ বসিয়েছে বুবলু মুনিয়া, এতেও কি রিনা খানিকটা অপ্রসন্ন? রিনার সামনে বুবলু মুনিয়া যেন দিদাকে একটু এড়িয়ে এড়িয়ে চলে!

তা এভাবেই তো এখন দিন কাটাতে হবে বুবলু মুনিয়াকে। বাবা মার বনিবনা না হলে ছেলেমেয়েব এই হালই হয়। তাও তো তাদের মামা ভাল। স্নেহশীল, সহৃদয়। মাঝে মাঝে এটা ওটা কিনে দিচ্ছে, একদিন পরেশনাথের মন্দিরে বেড়িয়ে আনল, আরেক দিন এয়ারপোর্ট। ভাস্বতী এর বেশি আর কী

আশা করে!

এরই মধ্যে একদিন ছোটখাটো খিটিমিটি বেধে গেল। মার সঙ্গে। মেট্রো বেলে আগুন লেগেছিল সেদিন, ঝাড়া একটি ঘণ্টা ছেলে-মেয়ে নিয়ে ট্রেনে আটকে ছিল ভাস্বতী, ফলত ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। ভিড়ে ভয়ে খিদেয় ক্লান্তিতে বুবলু মুনিয়া তখন প্রায় আধমরা।

বাড়ি ঢুকতেই হিমানী বললেন—এবার বুঝতে পারছ তো কাজটা ঠিক করনি?

ভাস্বতীর তখন মাথার ঠিক নেই। ঝাং করে বলে উঠল—ট্রেন যদি তোমার জামাইয়ের মতো বদমেজাজি হয়, আমি কী করব?

—জামাই বদমেজাজি, না তুমি, সে খবর কে রাখে!

—আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না মা?

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা ছাড়। তুই ভাব, তুই মা, না পিশাচ! ওইটুকু টুকু শিশুদের ওপর যা নয় তাই অত্যাচার করছিস।

—অত্যাচার করছি আমি! আমার খাটুনি যাচ্ছে না? আমার কষ্ট হচ্ছে না?

—সে তো তোমার নিজের জেদের জন্য। মেয়েমানুষের অত জেদ কীসের? পুরুষমানুষের মাথা গরম হলে, মেয়েমানুষকে একটু নত হয়ে থাকতে হয়। তুমি ফিরে গেলে জামাই কি তোমায় তাড়িয়ে দেবে?

কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল ভাস্বতীর, রক্তে আগুন ছুটছিল। নিজের মা যদি এ কথা বলে, পায়ের নীচে মাটিটা কোথায় থাকে! যে মানুষটা দেড় মাসে একবারও খবর নেয় না, তার সাত খুন মাপ, সব দোষ শুধু মেয়ের! অনেক টাকা খরচা করে বিয়ে দিয়েছিল বলেই কি অত আক্ষেপ মার! এত বিরক্তি।

ভাস্বতী তেড়েমেড়ে মাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, পারল না। তার আগে বউদি ঢুকে পড়েছে ঘরে—কী তোমরা মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া আরম্ভ করলে বলো তো? বাচ্চাগুলো যে বাইরে ভয়ে কাঁপছে!...মার নয় বয়স হয়েছে, শরীর খারাপ, যা মুখে আসে বলে দেন, তা বলে যদি তুমিও...। যাও যাও, মুখ হাত ধুয়ে নাও। পেটে কিছু পড়লে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ সেদিন স্নান করেছিল ভাস্বতী, তবু তাপ কমেনি। ভেতরটা জ্বলছিল। দুঃখে তাপে বিদীর্ণ হচ্ছিল হৃদয়। বউদির সহানুভূতি যেন আরও গভীর অপমান। নিশ্চয়ই মজা পেয়েছে বউদি, হাসছে মনে মনে।

স্নান সেরে ছাদে গেল ভাস্বতী। এই জায়গাটাই এ বাড়ির একমাত্র নির্জন আশ্রয়। জমাট অন্ধকারে দূরে টালার ট্যাঙ্কের আভাস দেখা যাচ্ছে, আরও গভীর আঁধারের মতো।

এগারো বছরের ছোট ছোট স্মৃতি মনে পড়ছিল ভাস্বতীর। আবার। প্রায়ই মনে পড়ে আজকাল। সুখের স্মৃতি। দুঃখের স্মৃতি হানিমুনে আগ্রা গিয়েছিল দুজনে, গাঢ় অমাবস্যায় অপার্থিব সৌধের পানে চেয়েছিল সারা রাত। কী নীরব, অথচ বাস্ময় ছিল সেই রাত্রি। কালচে নীল আকাশ ভরে আছে ঘাস ফুলে, আর অনন্ত এক চাঁদোয়ার নীচে তারা দুজন স্বপ্নে, কল্পনায়, ভালবাসায়...। রাতটা কি মিথ্যে ছিল?

বুবলু হওয়ার পর বিকোলাই হয়েছিল ভাস্বতীর, কী সেবাটাই না করেছিল রণজয়! অফিস ছুটি নিয়ে মাথার কাছে বসে আছে, কপালে জলপটি দিচ্ছে, মাথায় আইস ব্যাগ চাপছে, ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়াচ্ছে বার বার। এক রাতে কী একটা শব্দে ভাস্বতীর ঘুম ভেঙে গেল, চমকে দেখল তার মুখের দিকে স্থির চেয়ে আছে রণজয়। হালকা সবুজ রাতবাতি জ্বলছে ঘরে, সেই আলোতে কী অপরূপ যে দেখাচ্ছিল রণজয়কে! ওই রূপ কি তবে মিথ্যে ছিল? অথবা ওই আলোটা?

মুনিয়া যখন হল চোখ থেকে খুশি ঠিকরোচ্ছিল রণজয়ের। ভাস্বতী, ভাস্বতী, আমি আর জীবনে কিচ্ছু চাই না! সেদিনের সেই অনাবিল খুশিটাও মিথ্যে ছিল?

ছিল তো বটেই। না হলে সেই মুনিয়াকে নিয়ে অত বড় নোংরা কথাটাও বলে রণজয়! সপাটে ভাস্বতীর গালে থাপ্পড় মারল বুবলুর সামনে। ঘরের কোণে ছিটকে পড়ে কাতরাচ্ছে ভাস্বতী। অনেক হয়েছে, তোমার মতো ইতরের সঙ্গে আমি আর একটা দিনও থাকব না। আছিস কেন? পিরিতের নাগরের হাত ধরে বেরিয়ে যা না। ফের যদি ঢুকবি তো ছাল আমি ছাড়িয়ে নেব।

ভাস্বতীর বুক নিংড়ে দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল। এই ছবিটাই শুধু সত্যি। রণজয় ভুলে গেছে কী রক্ত

জল করা পরিশ্রম দিয়ে ভাস্বতী তিলে তিলে সংসারটাকে গড়েছিল। দাদাদের সঙ্গে খিচিমিচি বাধল, ভবানীপুরের অত বড় পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে ঢাকুরিয়ার দাসপাড়ায় দুটো মাত্র খুপরি খুপরি ঘরে উঠে এল রণজয়। ভাস্বতী একটি দিনের তরেও অনুযোগ জানায়নি। আলো নেই, বাতাস নেই, জল নেই, তাই সই। উলটে খুটে খুটে পয়সা জমিয়েছে। শুধু নিজের চাকরিব টাকায় সংসার চালিয়েছে কতদিন, তবে না রণজয় ফ্ল্যাটটা কিনতে পারল। শাড়ি কিনত না, গয়না গড়াত না, কণামাত্র বিলাসিতা ছিল না, মধ্যবিত্তের সাধ বলতে তো টিভি আর ফ্রিজ, তাও কিনল কতকাল পর—কী কৃচ্ছ্রসাধনের পর্বটাই না গেছে! বাবা তখন বেঁচে। তিনি পর্যন্ত ঠাট্টা করে বলতেন, তুই তো এমন ছিলি না বুলু! নাটক নভেল পড়তিস, সিনেমা থিয়েটার দেখতিস...সব ভুলে এত সংসারী হয়ে গেলি তুই!

সংসার! সংই সার। সব ভুলে গেছে রণজয়। একটা মিথ্যে সন্দেহকে সত্যি করে তুলতে নিজের ছেলেমেয়েকেও ভুলে গেছে।

ভাস্বতীকে ভুলবে এ আর নতুন কথা কী।

সাত

রণজয় ভাস্বতীকে ভোলেনি। ছেলেমেয়েকেও না।

এ কথা ভাস্বতী টের পেল ছেলেমেয়ের গরমের ছুটির আগের দিন। স্কুলে তাদের নিতে এসে।

বুবলু মুনিয়া দারোয়ানের ঘরে ছিল, রোজকার মতোই। অন্য দিন মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে থাকে, আজ দুজনেই খুশিতে ঝলমল।

—মা মা, বাবা এসেছিল আজ। এক্ষুনি চলে গেল।

—বাবা আমাকে একটা অ্যাত্ত বড় ক্যাডবেরি দিয়েছে।

—অ্যাই মুনিয়া, আইসক্রিমের কথা বললি না তো!

—হ্যাঁ হ্যাঁ। মিলক বার।... জানো মা, বাবা খুউব রোগা হয়ে গেছে।

—হবে না! বাবার যে খুব অসুখ করেছিল।

ভাস্বতীর বুকটা চিনচিন করে উঠল। কেন করল? রণজয়ের অসুখের খবর শুনে? মানুষটা তবে তত সুখে নেই যতটা সে ভাবছিল? থার্মোমিটারের পারা একশো ছুঁলেই শিশুর মতো হয়ে যায় রণজয়। বায়না আবদার করে, ভুল বকা শুরু হয়, মরে যাব মরে যাব আর্তনাদ করে, এক মুহূর্তের জন্যও ভাস্বতীকে ছাড়তে চায় না। একা বাড়িতে অসুস্থ হয়ে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পেয়েছে রণজয়। কিন্তু তার জন্য তো রণজয় নিজেই দায়ী। ভাস্বতী অনর্থক দুঃখ পাবে কেন?

তবে কি ছেলেমেয়ের মলিন মুখে আজ খুশির ঝলক দেখে ভাস্বতীর বুক চিনচিন? যে বুবলু মুনিয়ার জন্য ভাস্বতীর মন সদাই উথাল পাথাল, সারা দিনে এক সেকেন্ড নিশ্বাস নেওয়ার সময় পায় না, একবার বাবাকে দেখেই তারা এত বিগলিত? ছেলেমেয়েকে কি নির্বাসনে রেখেছে ভাস্বতী?

বিকেল পড়ে এসেছে। বৈশাখী সূর্য ঈষৎ দয়ালু এখন। ছোট ছোট হাওয়া উঠছে, কাগজ পাতা উড়ছে রাস্তায়, গলা পিচে আটকে যাচ্ছে খড়কুটো। নাগরিক পাখিরা এবার ঘরে ফিরবে।

ছেলেমেয়ের হাত ধরে ট্রাম লাইন পার হল ভাস্বতী, সিঁড়ি বেয়ে মেট্রো স্টেশনে নামল। শীতল ভূগর্ভে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। এই অঞ্চলটা অফিসপাড়া নয়, অল্প কিছু যাত্রী অলস মেজাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ক্লোজ সার্কিট টিভিতে চোখ রাখলে দেখা যায় তাদের আনাগোনা। উলটো দিক থেকে নিঃসাড়ে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল, প্রায় সরীসৃপের মতো। গলগল উগরে দিচ্ছে মানুষ।

আবার সরীসৃপ মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ ভাস্বতীর হাত ধরে টানল বুবলু—মা, বাবা আজ রাহুলমামার কথা জিজ্ঞেস করছিল।

ভাস্বতীর স্নায়ু টান টান—কী বলছিল?

—এই রাহুলমামা আমাদের কাছে আসে কি না, কোথাও আমাদের বেড়াতে নিয়ে যায় কি না...বুবলু ঢোক গিলল—আমি কিন্তু কিচ্ছু বলিনি মা।

মুনিয়াও বলে উঠল—আমিও কিছু বলিনি।

ভাস্বতী গম্ভীর হল—বলনি কেন? যা সত্যি তাই বলবে। রাহুলমামা তো তোমাদের কাছে আসেই। কত কী খাওয়ায় তোমাদের, কত আদর করে, ভালবাসে...

—বারে, এ সব কথা বললে বাবা রেগে যাবে না?

—রাগ করার কী আছে। ভাস্বতী একটু ঝেঁঝে উঠল—রাহুলমামা কি খারাপ লোক?

—আমি তাই বলেছি? তুমি কিচ্ছু বোঝ না মা।

বুবলুর স্বরে স্পষ্ট অভিমান। ওইটুকু ছেলেও ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝে গেছে বাবার মনে কাঁটাটা কোথায়। কাঁটা, না বিষ? ভাস্বতীর মুখ শুকনো হয়ে গেল। ছেলেমেয়ের চোখে মাকে ছোট প্রতিপন্ন করলে তাদের যে কোনও মঙ্গল হয় না, সে বোধও হারিয়েছে রণজয়।

ট্রেন এসে গেছে। ফাঁকা কামরা। উঠেই ছেলেমেয়ে নিয়ে বসার জায়গা পেয়ে গেল ভাস্বতী। সামনেই এক ফ্রেমে আঁটা পেন্টিং। এক লোলচর্ম বৃদ্ধার মুখ। ভাস্বতী দেখছিল।

মুনিয়া মার কোল ঘেঁষে এল—আমরা বাবার কাছে কবে যাব মা?

মেয়ের মাথায় আলগা হাত বোলাল ভাস্বতী—কেন, মামার বাড়িতে থাকতে তোদের ভাল লাগছে না?

—একটুও না।

—সে কী। তোরাই তো মামার বাড়ি যাওয়ার জন্য লাফাতিস।

—তা বলে এতদিন ধরে কেউ মামার বাড়িতে থাকে! বুবলুর স্বর করুণ—স্কুলের সবাই বলে, তোরা স্কুল বাসে যাস না কেন রে? আর কতদিন মামার বাড়িতে থাকবি?

—শুধু এই জন্য ভাল লাগে না?

—তা নয়। পিকলুদাদাও বলছিল...বুবলু ঝপ করে থেমে গেল।

ভাস্বতীর ভুরু জড়ো,—কী বলছিল বল?

বুবলু নিরুত্তর।

তীক্ষ্ণ চোখে ছেলেকে দেখল ভাস্বতী। একটু আগের উচ্ছলতার চিহ্নমাত্র নেই ছেলের মুখে, ঘন মেঘ চোখে থমথম করছে। পিকলু কি কোনও টিটকিরি মেরেছে বুবলুকে?

ভাস্বতী গলা কোমল করল—কী বলেছে পিকলুদাদা বল না আমাকে। আমি মামাকে বলে দেব।

বুবলুর ঘাড় হেঁট। একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল।

—ঠিক বাবার মতো জেদি। ভাস্বতী হিসহিস করে উঠল—বলবি না তুই? বলবি না?

প্রতিক্রিয়াহীন বুবলুর দিকে তাকিয়ে ভাস্বতী গোমড়া হয়ে গেল। গুমগুমে গলায় বলল,—ঠিক আছে, নয় না-ই বললি। আমি পিকলুকে জিজ্ঞেস করে নেব।

—না, তুমি পিকলুদাদাকে কিছু বলবে না।

—তা হলে তুই বল কী বলেছে।

বুবলু নিরুত্তর। মুনিয়াও কেমন যেন চোখে তাকাচ্ছে বুবলুর দিকে। ও কি জানে কথাটা? মুনিয়াকে জিজ্ঞাসা করাটা কি ঠিক হবে?

ভাস্বতী সামান্য দিশেহারা বোধ করল। কী এমন কথা যে ছেলে কিছুতেই বলতে পারছে না? অবশ্য হালকা বিদ্রূপও অনেক সময়ে শিশুদের মনে তীব্রভাবে বেঁধে। কিন্তু বিদ্রূপই বা পিকলু করবে কেন? পিকলু বুবলু মুনিয়াকে খুব ভালবাসে, তার মধ্যে আমার বাড়ি তোর বাড়ি, আমার জিনিস তোর জিনিস, হিংসে টিংসে একদম নেই। পিসতুতো ভাইবোনকে রাতদিনের সঙ্গী পেয়ে তাকে তো মহা-খুশিই মনে হয়। তবে কি ওই দশ বছরের ছেলের গলায় অন্য কারুর স্বরের প্রতিধ্বনি শুনেছে বুবলু? হতেই পারে। সেদিন বউদির মা এসেছিল, তার সঙ্গে খুব গুজগুজ করছিল বউদি, ভাস্বতী ঘরে ঢুকতেই কথা বন্ধ হয়ে গেল। নিশ্চয়ই তাকে নিয়েই আলোচনা চলছিল। বর ছেড়ে ভাস্বতী বাপের বাড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে আছে, মা মেয়ের কাছে এটাই তো এখন সবথেকে বড় খোরাক।

মরুক গে যাক, ভাস্বতী ও সব আমল দেবে না। দাদা তার পাশে আছে, বউদির হীনতা সে গায়ে মাখবে কেন? ও বাড়ি যতটা বউদির, তার চেয়ে বেশি কি ভাস্বতীর নয়?

পার্ক স্ট্রিট থেকে কামরায় লোক বেড়ে গেছে, এসপ্ল্যানেডে এসে থইথই। অন্যমনস্ক ভাস্বতীর বুকের

আঁচল সরে গেছে সামান্য। একজন মধ্যবয়স্ক অফিসফেরতা গলায় টাই হাতে ব্রিফকেস মানুষ হ্যান্ডেল ধরে ঝুঁকছে ভাস্বতীর সামনে, চোখ গেঁথে আছে বুকের খাঁজে।

সচকিত ভাস্বতী বিরক্ত মুখে আঁচল গুছিয়ে নিল। মুনিয়াকে আলতো জড়িয়ে নিয়ে ঝুঁকল বুবলুর দিকে। গলা নামিয়ে বলল,—পিকলুদাদা কী বলেছে তাই নিয়ে মন খারাপ করতে হবে না। কাজের কথা শোনো। বাবা যে স্কুলে এসেছিল এ কথা বাড়ি গিয়ে বলার দরকার নেই।

বুবলু মুনিয়া চোখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

ভাস্বতী আবার বলল,—কাউকে বলতে হবে না।

—কেন মা?

—কেন আবার কী! আমি বলছি ব্যস, আমার কথা শুনবে। দিদাকেও বলতে হবে না।

বুবলু কী যেন ভাবছে। হঠাৎ বলল,—আমরা কি কোনওদিন আর বাড়ি ফিরব না মা?

কথাটা ফুটল ভাস্বতীকে। তবু বলল,—এই তো বাড়ি ফিরছি।

—তুৎ, ও তো মামার বাড়ি।

—ওটাই এখন তোমাদের বাড়ি। ওখানে কি তোমাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে?

—হচ্ছেই তো। বলতে বলতে মুনিয়ার দিকে তাকাল বুবলু,—ওখানে তো আমাদের একটা ঘর ছিল, এখানে ঘর কোথায়? আমার সবকিছু ও বাড়িতে পড়ে আছে।

—কী কী লাগবে লিস্ট করে দিয়ো। এনে দেবখন।

—ইহ্, এনে দেব! বুবলু অপ্রত্যাশিতভাবে ঝেঁঝে উঠল,—আমার ঘরে আমি সৌরভের পোস্টার লাগাব বলেছিলাম, পিকলুদাদার ঘরে লাগানো যাবে? পিকলুদাদা তো শচীনের ফ্যান! আর মামা দেওয়ালে কিছু লাগাতেই দেবে না। সেদিন রংপেনসিল দিয়ে মুনিয়া একটা সান এঁকেছিল, তাই বলে মামা কত বকল...ওখানে আমাদের খাটটাও কত বড় ছিল, পিকলুদাদার খাটে দুজন আঁটেই না। পিকলুদাদার শোওয়াটাও কী খারাপ! শুধু সারা রাত লাথি মারে।

—আহ্, বুবলু! ইচ্ছে করে কি পিকলুদাদা লাথি মারে নাকি?

—ইচ্ছে করে না মারুক, মারে তো। আমার ভাল লাগে না। বুবলু ফোঁস ফোঁস করছে,—এখানে আমার বইখাতা রাখার আলাদা টেবিল নেই, জামাকাপড় রাখার আলমারি নেই, ফ্রিজ খুলে জল খেলে মামি রাগ করে...স্ট্যাম্প জমানোর খাতাটা পর্যন্ত যাদবপুরে রয়েছে। রাজা সনু জোজোদের সঙ্গেও কত দিন দেখা হয়নি। সবকিছু তুমি মামার বাড়িতে এনে দিতে পারবে?

ভাস্বতীর মুখ চুন হয়ে গেল। তবু শক্ত গলায় বলল,—অত বায়নাক্কা কোরো না বুবলু। মানিয়ে নিতে শেখো। তোমার যা যা দরকার সবই তোমায় আস্তে আস্তে দেওয়া হবে।

ফাঁপা আশ্বাসটুকু কি ধরে ফেলেছে বুবলু? অমন চোখে ভাস্বতীকে দেখে কেন? আচমকা মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে এল। ফিসফিস করে বলল,—বাবা আর তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবে না মা। আমরা বাবাকে বকে দেব।

অজান্তেই চোখের পাতা ভিজে গেল ভাস্বতীর। ঠোঁট কামড়ে মুখ ফিরিয়েছে মেট্রো রেলের জানলায়। সুড়ঙ্গপথে ছুটছে ট্রেন, বাইরে ধূসর দেওয়াল ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। দুলছে ট্রেন, শব্দ বাজছে ঝমঝম। ও কি ট্রেনের শব্দ? না হৃদয়ের?

বুবলু নাক টানছে। ধরা গলায় বলল—চলো না মা, আমরা বাড়ি ফিরে যাই।

মুনিয়াও অল্প অল্প ফোঁপাতে শুরু করেছে—চলো না মা, বাবার জন্য খুব মন কেমন করছে।

ভাস্বতীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। রাগের সঙ্গে রাগ নিয়ে লড়াই করা যায়, অভিমানের সঙ্গে অভিমানের যুদ্ধ হয়, জেদের সঙ্গে জেদের পাঞ্জা কষা চলে, কিন্তু সন্তানদের এই করুণ আর্তির কাছে মা যে কী ভীষণ অসহায়!

রাত্রে ঘুম আসছিল না ভাস্বতীর। কবেই বা আসে! ভাবছিল শুয়ে শুয়ে। একটা ভাবনা থেকে একটা ভাবনা, সেখান থেকে আরেকটা। ছেলেমেয়েকে বাবার কাছ থেকে সরিয়ে এনে সে কি ভুল করেছে? প্রতিটি শিশুই বাবা মাকে নিয়ে এক সুস্থ স্বাভাবিক সংসারে বাস করতে চায়, নিজের জন্য প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ভাস্বতী কি তাদের সেই প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করল? রণজয়টাও কী বজ্জাত। একদিন মুখ

দেখিয়েই নিপুণ শিকারির মতো ঘায়েল করে ফেলল ছেলেমেয়েকে! না না, তাই বা কেন? যন্ত্রণাটা বুবলু মুনিয়ার মধ্যে ছিলই, বাবাকে দেখে নতুন করে ক্ষরণ শুরু হল। রণজয় হয়তো সত্যিই মনে মনে অনুতপ্ত হয়েছে! প্রকাশ্যে নত হতে না পেরে ছেলেমেয়ের মাধ্যমে...! তা হলে রাহুলের কথা তুলল কেন রণজয়? ঈর্ষা, না কৌতূহল? বুবলু মুনিয়াকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবে ভাস্বতী? অসম্ভব। ভাস্বতী তবে থাকবে কী নিয়ে?

অসংখ্য 'যদি' 'তবে' 'কিন্তু' 'অথবা' পাক খাচ্ছে ভাস্বতীর মস্তিষ্কে। এক সময়ে রাতটা সকাল হয়ে গেল।

আট

কটা দিন ভাবল ভাস্বতী। ভাবল...ভাবল...

ভাবনারা খুব বেশি ভিড় করতে থাকলে মনের মধ্যে এক উৎপীড়ন শুরু হয়ে যায়। মনে হয় কেউ বুঝি অবিরাম কড়া নেড়ে চলেছে দরজায়, অথবা কেউ যেন একটানা টিপে ধরে আছে বাড়ির কলিংবেল। চাপটা বড় অসহনীয়, মস্তিষ্ক ভোঁ ভোঁ করে সারাক্ষণ। খাওয়ায় এতটুকু রুচি হয় না, ঘুম মানে শুধুই বিছানায় এপাশ ওপাশ করা, মেজাজও সারাক্ষণ তিরিক্ষি হয়ে থাকে। কি বাড়িতে, কি অফিসে।

সেদিন অফিসে তো একটা সিনই ক্রিয়েট করে ফেলল ভাস্বতী। প্রৌঢ় বড়বাবুর সঙ্গে হঠাৎ ঝগড়া বেধে গেল। প্রায় অকারণে।

দোষের মধ্যে দোষ, বড়বাবু কয়েকটা চিঠি দিয়ে বলেছিলেন,—এগুলো একটু দেখেশুনে টাইপ কোরো ভাস্বতী। ইম্পর্ট্যান্ট চিঠি। দেখো, স্যালারি স্টেটমেন্টের মতো এতে আবার ভুল কোরো না।

ভাস্বতী চড়াং করে তেতে গেল,—আমি দেখেই টাইপ করি। স্যালারি স্টেটমেন্টে অত কাটাকুটি থাকলে ভুল হবেই। যারা স্টেটমেন্ট তৈরি করে তাদের কিছু বলতে পারেন না?

চকিত আক্রমণে বড়বাবু থতমত,—ওভাবে কথা বলছ কেন? আমি কি তোমাকে অ্যাকিউজ করেছি? শুধু বলছি একটু সাবধানে...

—সাবধান ফাবধান দেখাবেন না। কে কত সাবধানী আমার জানা আছে। নিজে তো আমাদের এরিয়ার বিলগুলো চেক করেছিলেন, তবু জি. এম-এর কাছে ধ্যাতানি খেতে হল কেন?

—সেটা আমার ভুল? সে তো অ্যাকাউন্ট্যান্টের দোষ। রমেশ যোগে গণ্ডগোল করেছিল...

—ওই হল। সবাই সমান। আর উপদেশের বেলায়, ভাস্বতী ঠিক করে টাইপ কোরো! যেন আমরাই শুধু...

গোটা অফিস হাঁ করে তাকিয়ে আছে। নিরীহ বড়বাবুর সঙ্গে এ কী ভাষায় কথা বলছে শান্তশিষ্ট স্বল্পবাক ভাস্বতী। মাথা নিচু করে চেয়ারে ফিরে গেছেন বড়বাবু। ক্ষণপরে ভাস্বতীর চৈতন্য ফিরল। ঝাঁ ঝাঁ করছে কান, অফিসের মধ্যে বসে থাকতে লজ্জা হচ্ছে। উঠে বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে এল। টাইপরাইটারে চোখ চেপে আঙুল চালাচ্ছে চাবিতে।

টিফিনের সময়ে প্রায়ই আসে রাহুল, খানিক গল্পগুজব করে চলে যায়। আজও এল। নতুন একটা নাটকের মহলা চলছে, তারই অনুপুঙ্খ বিবরণ দিচ্ছে হাত পা নেড়ে। কিছুটা মূকাভিনয় আছে নাটকে, সেটা দেখাতে গিয়ে তাদের নির্দেশক কী কাণ্ড করেছে কাল, বলতে বলতে নিজেই হেসে খুন।

ভাস্বতী ভীষণ অন্যমনস্ক।

ভাবটা রাহুলের নজর এড়াল না। ভুরু কুঁচকে বলল, —শুনছ না যে?

—শুনছি তো। ভাস্বতী অল্প চোয়াল ফাঁক করল।

—উঁহু, শুনছ না। শুনলে রিঅ্যাক্ট করতে।...নতুন কোনও প্রবলেম হয়েছে নাকি?

কথা বলতে ইচ্ছে করছে না ভাস্বতীর। বলল,—না, অল্প মাথা ধরেছে।

—চলো, চা খেয়ে আসি।

— নাহ্।

রাহুলের ভুরুতে ভাঁজ বাড়ল,—বুবলু মুনিয়া ঠিক আছে তো?

ঠিক থাকা কাকে বলে সঠিক বুঝতে পারছে না ভাস্বতী। ছোট্ট করে ঘাড় নেড়ে দিল।

—তা হলে আর কী। চলো চলো চলো, চা খেয়ে আসি। দেখবে মাথা বিলকুল সাফ হয়ে যাবে।

—আহ্ রাহুল। ভাল লাগছে না। তুমি যাও।

হঠাৎই বুঝি রুক্ষ হয়ে গেছে ভাস্বতীর গলা, রাহুল বিস্মিত চোখে ভাস্বতীকে দেখল একটুক্ষণ। লঘু স্বরে বলল,—তোমার মর্জির তল পাওয়া ভার। একটু থেমে থেকে আবার বলল,—বুবলু মুনিয়ার তো ভেকেশান পড়ে গেছে, ছুটির পর আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে?

কোথায় জানারও উৎসাহ বোধ করল না ভাস্বতী। চুপ করে আছে।

রাহুল নিজে থেকেই বলল,—ম্যাক্সমুলারে। নর্থ বেঙ্গলের ফোকলোরের ওপর একটা দারুণ ডকুমেন্টারি আছে। চল্লিশ মিনিটের। সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে পাইকপাড়া ফিরে যেতে পারবে।

ভাস্বতী শুনেও শুনল না। যেন সামনে রাহুল নেই এভাবে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক।

রাহুল অনুনয়ের সুরে বলল,—চলো না ভাস্বতীদি, মন মেজাজ ফ্রেশ হয়ে যাবে।

—আমি কি বলেছি মনমেজাজ খারাপ আছে?

—এত চটে যাচ্ছ কেন? ইচ্ছে হচ্ছে না, যেয়ো না। রাহুল উঠে পড়ল,—ভালর জন্যই বলছিলাম। ডকুমেন্টারিটা এবার ম্যানহাইম ফেসটিভালে যাচ্ছে।...

—আমার আজ একটু একা থাকতে ইচ্ছে করছে রাহুল।

ঈষৎ আহত মুখে রাহুল চলে গেল।

হাতের কাজ সেরে থমথমে মুখে বসে আছে ভাস্বতী। বড়বাবু মানুষটাকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, আজ কেন এমন বিশ্রী ব্যবহারটা করে ফেলল? রাহুলের সঙ্গে ছবিটা দেখতে গেলে হয়তো মাথাটা হালকা হত, কেন রাজি হল না? তবে কি তার মনের অতলে কোনও এক গোপন স্রোতস্বিনী ক্ষইয়ে দিচ্ছে বাঁধ? নিজের কাছে নিজেই বড় অচেনা এখন।

ছুটির পাঁচ-দশ মিনিট আগে শিখার টেবিলে গেল ভাস্বতী।

শিখা ড্রয়ারে চাবি লাগাচ্ছিল। টেরচা চোখে তাকাল,—কিছু বলবি?

পেপার ওয়েট নিয়ে নাড়াচাড়া করছে ভাস্বতী। মৃদু স্বরে বলল,—হুঁ।

শিখা ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে কিছু বোধহয় আন্দাজ করল। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বলল,—এক সেকেন্ড। এখানে অনেক চোখ, অনেক কান, বাইরে গিয়ে কথা বলি চল।

দুই নারী এসে দাঁড়িয়েছে প্যাসেজে, একটু কোনা ঘেঁষে।

—বল, এবার মাথা ঠাণ্ডা করে বল। কী বার্তা?

—কী আর বার্তা? ছোট্ট শ্বাস ফেলল ভাস্বতী,—কী করব ভেবে পাচ্ছি না। তুই একটু সাজেশন দে না।

—কীসের কী?

—ছেলেমেয়ে দুটো বড় অধৈর্য হয়ে উঠেছে। মামার বাড়ি থাকতে চাইছে না।

শিখা এখন মোটামুটি জানে ঘটনাটা। অসীমা দীপ্তিদের অশোভন কৌতূহল পাছে স্ক্যান্ডালের পর্যায়ে চলে যায়, শিখাকে একদিন অনেকটাই বলেছে ভাস্বতী। অবশ্যই রেখে ঢেকে, রাহুলের প্রসঙ্গ যথাসম্ভব এড়িয়ে। রাহুলের সঙ্গে অল্পস্বল্প হাসিঠাট্টার সম্পর্ক আছে শিখার, ভাস্বতীর সুবাদেই। তবুও।

সমব্যথীর সুরে শিখা বলল,—পেটের সন্তানের কাছে মেয়েরা বড় অসহায়। এটা জানে বলেই পুরুষ মানুষরা জো পেয়ে যায়।

—ও আর শুনে লাভ কী! কী করি বলবি তো?

শিখা একটু চিন্তা করে বলল,—রণজয় তোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল?

ভাস্বতী দু দিকে ঘাড় নাড়ল। বলল,—একদিন বুবলু মুনিয়ার স্কুলে এসেছিল, আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তারপর থেকেই তো ওরা...

—বাবা বুঝি খুব জপিয়ে গেছে?

—তা ছাড়া কী।...বজ্জাত লোক...

—হুম্। শিখার চোখ সরু হল,—তুই কী চাস?

—কী চাই মানে? যা চাই সেটা বোঝানোর জন্যই তো চলে এসেছি।

—খেপে যাচ্ছিস কেন? ঠাণ্ডা হ। মন যদি এত শক্তই আছে, তা হলে আমার কাছে এসেছিস কেন?...দুমদাম চটাচটি করছিস, মেজাজ দেখাচ্ছিস...

ভাস্বতী সামনের জানলা দিয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ মানে বহুতল বাড়ির ফাঁকে ঝুলে থাকা এক টুকরো নীল। শেষ বিকেলের আলো মেখে নীলের গায়ে এখন রক্তিম আভা। কোনটা সত্যি? নীল, না লাল? নাকি দুটোই মিথ্যে? দুটোই অসীম শূন্যতা? কোনটা পৃথিবীর মায়া মাখা, কোনটা সূর্যের।

শিখা নিম্ন স্বরে প্রশ্ন করল,—তুই কি রণজয়কে ভালবাসিস? এখনও?

ভাস্বতী দূরমনস্কভাবে বলল,—তাতে কার কী আসে যায়।

—অত প্যাঁচ করিস না। সোজাসুজি বল, বাসিস কি বাসিস না?

—ভালবাসি বলেই তো এতদিন অ্যাডজাস্ট করে ছিলাম।

—নো পাস্ট টেন্স। এখনকার কথা বল?

কী উত্তর দেবে ভাস্বতী। রণজয়ের অসুখ হয়েছিল শুনে বুকটা যে হঠাৎ হঠাৎ চিনচিন করে ওঠে, এ কি নিছকই সমবেদনা? বিছানায় গাদাগাদি করে শুয়েও এক এক সময়ে বড় ফাঁকা ঠেকে শয্যা, এ কি নেহাতই অভ্যাস? বাসস্টপে চমকে চমকে খোঁজে রণজয়কে...

চোখের কোলে টলটল করে উঠল দু ফোঁটা মুক্তোদানা, আঙুল বুলিয়ে দ্রুত মুছে নিল ভাস্বতী।

শিখা হাত রেখেছে ভাস্বতীর কাঁধে। আলগা চাপ দিল,—শোন ভাস্বতী, তুই বরং ফিরেই যা।

—কেন যাব? সে তো আমায় ডাকেনি। তেতে উঠতে গিয়েও তেমন তীব্রতা ফুটল না ভাস্বতীর গলায়।

—তুই তাকে ভালবাসিস বলেই যাবি। সংসার ভাঙা খুব সহজ রে, গড়া কঠিন।

ভার বুকেও হাসি পেল ভাস্বতীর। শিখা সুখী গৃহিণী। স্বামী বুঝদার, ভাস্বতীর মতো কোনও সমস্যার তাকে কখনও সম্মুখীন হতে হয়নি। সে কী করে বুঝবে, সংসার গড়া যত কঠিন, ভাঙা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি কঠিন। অস্তিত্বের কতখানি যে জুড়ে থাকে সংসার, ভাঙার সময়ই বুঝি তা টের পাওয়া যায়।

ভাস্বতী আত্মগতভাবে বলল,—সংসার গড়তে, কি তাকে টিকিয়ে রাখতে অন্তত দুজন মানুষ লাগে। তার একজন যদি ক্রমাগত...

—আহ্, আমি কি জানি না! সে মানুষটাকে একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলি, ঠিকই করেছিস। হয়তো এতে তার শিক্ষা হয়েছে। হয়তো মানুষটা বদলে গেছে।

এই কথাই তো নিজেকে মনে মনে বার বার বলতে চাইছে ভাস্বতী। বাইরের কেউ একজন সমর্থন করায় নিজের মনের কথার যেন জোর বেড়ে গেল সহসা।

শিখা ফিসফিস করে বলল,—সে-ও হয়তো মনে মনে পস্তাচ্ছে। দগ্ধে মরছে। নত হতে পারছে না বলে হয়তো আরও বেশি যন্ত্রণা পাচ্ছে। একজন না একজন কাউকে তো আগে এগোতেই হয়।

কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছিল ভাস্বতীর। আবার কোথায় যেন একটা খচখচও করছিল। রণজয় বদলে যাবে? মানুষের স্বভাব কি বদলায়? ফিরে গেলে সে ঋতুপর্ণা বনে যাবে না তো?

তা কেন? ঋতুপর্ণা ঘরে পুষে রাখা আদুরে বেড়াল, তার পায়ের নীচে কোনও মাটি নেই। সুখকে সে আত্মসর্বস্বতার নিরিখে বিচার করে। ভাস্বতী কখনওই ঋতুপর্ণা নয়। সে লক্ষ্মণের গণ্ডির দুদিকেই পা রাখতে পারে।

বাড়ি ফিরে গা হাত পা ধুয়ে ছাদে এল ভাস্বতী। আকাশে আজ একটা বড়সড় চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমা নয়, তার কাছাকাছি কোনও তিথি হবে। কানাভাঙা রুপোর পিরিচ মোহময় দ্যুতি ছড়াচ্ছে শহরে। টালা ট্যাঙ্কের নীচের অন্ধকারটাকেও যেন আর তত গাঢ় লাগে না। এ কি বিভ্রম?

নরম একটা বাতাস বইছে। ভাস্বতীর শরীর জুড়িয়ে এল।

নয়

পরদিন অফিসে এসে রণজয়কে ফোন করল ভাস্বতী—তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। বিকেলে সময় হবে?

—কটায়?

—ধর পাঁচটা নাগাদ।

—আমি কি তোমার অফিসে যাব?

রণজয়ের স্বর ক্ষণকাল অনুভব করার চেষ্টা করল ভাস্বতী। আগ্রহই তো মনে হয়। একটু যেন নরম। হেরে গেল ভাস্বতী। নিজেই সে আগে রণজয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করল। আর কটা দিন অপেক্ষা করলে নিশ্চয়ই রণজয়ই...।

ভাস্বতী গলা ভারী করল—না, অফিসে আসার দরকার নেই। তুমি নিজাম প্যালেসের গেটে থেকো। আমি চলে আসব।

ছুটির আগে টয়লেটে গিয়ে চুলে একটু চিরুনি চালাল ভাস্বতী। দু-এক সেকেন্ড নিষ্পলক নিজেকে দেখল আয়নায়। এই কদিনেই চোখের তলায় কালি পড়ে গেছে, কণ্ঠার হাড় দুটোও যেন প্রকট হয়েছে একটু। মন বড় তাড়াতাড়ি ছাপ ফেলে শরীরে। মন, নাকি ক্লান্তি? বেসিন খুলে মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিল ভাস্বতী, যদি ক্লান্তির ছাপ মোছে। ব্যাগ থেকে লিপস্টিক বার করে আলতো বুলোল ঠোঁটে। সতর্ক, যেন চড়া না হয়ে যায়। ছোট কাজলের পেনসিল ব্যাগেই রাখা থাকে, সন্তর্পণে টানছে আঁখি পল্লবে। কৃত্রিম কালো রেখায় বুঝি আবছা হল চোখের গাঢ় আঁধার।

সময় বুঝে অসীমা আর দীপ্তিও এসেছে টয়লেটে। দীপ্তির বাহুমূলে চিমটি কেটে অসীমা ভালমানুষের মতো বলল—এত সাজছ কেন গো ভাস্বতীদি? কোথাও যাবে?

—হুঁ।

—বিয়ে বাড়ি?

মিটিমিটি হেসে মাথা দোলাল ভাস্বতী—সিনেমায় যাব। বরের সঙ্গে।

—ওমা তাই! তোমাদের সব মিটে গেছে?

ভাস্বতী উত্তর দিল না। ছোট্ট একটা হাসি ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ইচ্ছে হলে অসীমা আসুক পিছু পিছু, দেখে যাক।

লিফটের সামনে এসেও ভাস্বতী দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। সবে পাঁচটা তিন, নিজাম প্যালেস মাত্র মিনিট দুয়েকের পথ, এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে? না, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকুক রণজয়। মন্থর পায়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নামল ভাস্বতী। মেন গেট পার হয়ে কয়েক পা গেলে সামনে একটা ছোট্ট নিলাম ঘর, ভেতরে থরে থরে সাজানো রয়েছে চিনে মাটির পুতুল, অতিকায় ফুলদানি, বাহারি ঝাড়লণ্ঠন, কারুকাজ করা কাচের বাসন। ভাস্বতীর ড্রয়িংরুমের ক্যাবিনেটটা ফাঁকা রয়ে গেছে, ভরাতে হবে। বুবলু মুনিয়ার ঘরে ওই ছোট্ট কাটগ্লাসের টেবিল ল্যাম্পটা রাখলে কেমন হয়? উঁহু ভেঙে ফেলবে। বরং নিজেদের বিছানার পাশেই...

নিজাম প্যালেসের সামনেটা বেশ ভিড় ভিড়। ভাস্বতী আলগা ঘড়ি দেখে নিল। পাঁচটা পঁচিশ। বেশি দেরি হয়ে গেল কি? চঞ্চল চোখে তাকাল এদিক ওদিক। রণজয় নেই। ফিরে গেল? দু-চার পা সামনে হাঁটিল ভাস্বতী, রাস্তার উলটো পারে চোখ চালাল। নেই রণজয়।

দু-চার মিনিট যেন দু-চার ঘণ্টা। প্রতীক্ষার অপমানে কান গরম হয়ে উঠছে ভাস্বতীর। মেট্রো স্টেশনের দিকে এগোবে কি না ভাবছে, যেচে ফোন করার জন্য আফসোসও হচ্ছে, তখনই হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়াল রণজয়—কতক্ষণ?

নিমেষে নিজেকে সামলে নিল ভাস্বতী,—এই তো।

—অফিস থেকে বেরোতে আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

—ও।

রণজয় অন্য দিকে তাকাল,—বলো কী বলবে।

বাস স্টপে একটা ভিড় মিনিবাস এসে দাঁড়িয়েছে। হু হু করে লোক ওঠার চেষ্টা করছে। এক বৃদ্ধ মানুষ নামতে চাইছেন, পারছেন না, ধস্তাধস্তি গুঁতোগুঁতি চলছে ভীষণ। সেদিকে কয়েক পল তাকিয়ে থেকে ভাস্বতী বলল, এখানে দাঁড়িয়েই শুনবে?

—তবে চলো কোথাও বসি।

হাত পঞ্চাশেক দূরে একটা ছোট রেস্টুরেন্ট। মেয়েরাই পরিবেশন করে। একটু বদনাম আছে জায়গাটার। অনেক আগে রণজয়ের সঙ্গে এক-আধবার ভাস্বতী ঢুকেছে রেস্টুরেন্টটায়, পরিবেশটা তার একদম পছন্দ নয়। ঘুপচি মতন। কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজ ভাস্বতী কিছু বলল না, রণজয়ের পিছন পিছন এসে বসল। কেবিনে। পর্দা টেনে দিয়ে।

রণজয় হেলান দিয়ে বসেছে,—খাবে কিছু?

—চা বলো।

—শুধু চা কেন খাবে? অফিস থেকে বেরোলে!

কেবিনের পর্দা সরিয়ে একটা ফ্যাটমুখ মেয়ে উঁকি দিয়েছে।

—দুটো ফ্রাই দেখি। ...তারপর দুটো চা। একটা চিনি ছাড়া।

মেয়েটার মুখ সরে গেল।

ভাস্বতী টেবিলে ঝুঁকল সামান্য—চায়ে চিনি ছেড়ে দিলে।

—ডাক্তার বারণ করেছে।

—হঠাৎ?

—একদিন রাস্তায় মাথা ঘুরে গেছিল। ডাক্তার সুগার টেস্ট করতে বলল...

—কত হয়েছে? উদ্বেগটা চাপতে পারল না ভাস্বতী।

—তিনশো সত্তর। টু উইকস বেডরেস্টে ছিলাম। বলেই মাথার ওপর ঢকঢক করে ঘুরন্ত পাখার দিকে তাকাল রণজয়—ডায়েট রেস্ট্রিকটেড হয়ে গেছে।

—তবে ফ্রাই খাচ্ছ যে?

—ওতে বারণ নেই। ওই আলু ফালু, কার্বোহাইড্রেট...

—আসল জিনিসটা ছেড়েছ?

কথাটা যেন শুনলই না রণজয়। নোংরা নুনের কৌটোটা হাতে তুলে ঘোরাল,—কাজের কথা বলো।

ভাস্বতী একদৃষ্টে রণজয়কে দেখছিল। চেহারাটা সত্যিই বেশ খারাপ হয়েছে। কপালে একটা-দুটো ভাঁজও দেখা দিয়েছে যেন। গালের হনু ঠেলে উঠেছে। জ্বলজ্বলে চোখ নিষ্প্রভ, দ্যুতিহীন।

রণজয় আবার বলল—বলো, কী জন্য ডেকেছিলে?

কীভাবে কথা শুরু করবে ভেবে পাচ্ছিল না ভাস্বতী। রণজয়ই বা নিজে থেকে কেন কিছু বলছে না! বলতে তো পারে, অনেক হয়েছে, এবার বাড়ি চলো স্বাতী। ভাস্বতীর যেন আবছা মনে পড়ল রাহুলকে সে বলেছিল ডিসিশানের কোনও মাঝামাঝি নেই, আজ ঠিক এই মুহূর্তে তার এ কী দশা।

গলা ঝেড়ে ভাস্বতী বলল—ছেলেমেয়ে দুটোর কথা কিছু ভেবেছ?

রণজয়ের চোখ নুনের কৌটোয়—আমি ভাবার কে! তুমি তো একাই সব ভাবছ।

—হুঁ, তা ভাবছি। ভাস্বতী একটু হাসার চেষ্টা করল। মেয়েটা টেবিলে দু গ্লাস জল দিয়ে গেছে। পুরো জল ঢকঢক শেষ করে বলল—দ্যাখো, রাগের মাথায় মানুষ অনেক কথা বলে। তুমিও বলেছ। অনেক অন্যায় কথাও বলেছ।

—হ্যাঁ, তোমার গায়ে হাত তোলা আমার উচিত হয়নি। আই অ্যাম সরি।

ভাস্বতী আবার একটু সময় নিয়ে বলল—ছেলেমেয়ে দুটো কষ্ট পাচ্ছে। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে...

—ও। তার মানে তুমি ছেলেমেয়ের কথা ভেবে আমার কাছে এসেছ?

ভাস্বতীর কোমলতাকে কি দুর্বলতা ভাবছে রণজয়?

ভাস্বতী নিরস স্বরে বলল—কিছুটা তো বটেই। আমাদের সম্পর্ক তো শুধু এখন আমাদের দুজনের

নয়, ওরাও আমাদের মধ্যে বিলঙ করে।

—অত যদি বোঝ, ওদের নিয়ে গেছ কোন আক্কেলে? রণজয়ের গলা সামান্য চড়েছে।

—কেন নিয়ে গিয়েছিলাম মনে নেই? ভাস্বতীরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে—আয়নায় তখন নিজের মুখটা দেখেছিলে?

—আমি দেখব কেন? তুমি একলাই দেখেছিলে। তোমার আয়না আছে, আমার নেই।

তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতে গিয়েও মাথা নামিয়ে নিল ভাস্বতী। ফিশ ফ্রাই এসে গেছে। মেয়েটি মাথা সরাতে গিয়েও থামল—ব্রেড দেব?

—দিতে বলেছি? রণজয় প্রায় খেঁকিয়ে উঠল।

পর্দা আবার টানটান। ফিশ ফ্রাইতে চেপে চেপে ছুরি ঘষছে রণজয়, ফালা ফালা করছে টুকরোগুলোকে। একটা টুকরো কাঁটায় গেঁথেও মুখে তুলল না। চোখ টেরিয়ে জিজ্ঞাসা করল—তোমার রাহুল আজ অফিসে আসেনি?

—এসেছে নিশ্চয়ই। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

—রাহুল ছাড়াও তুমি তা হলে একা একা ঘুরতে পারো।

ভাস্বতীর শরীরের তাপ বাড়ছিল। মাথার পিছনটা দপ দপ।

—শোনো, একটা কথা বলছি পরিষ্কার শুনে নাও। রণজয় কাঁটা চামচ নামিয়ে রাখল—আই অ্যাম সরি ফর দা ইনসিডেন্ট হ্যাপেনড দ্যাট নাইট। তুমি ইচ্ছে করলে ফিরে আসতে পারো, আই শ্যাল ওয়েলকাম ইউ। তবে ফিরতে চাইলে শুধু ছেলেমেয়ের কথা ভেবে নয়, আমার কথা ভেবেই ফিরতে হবে। তার জন্য তুমি যদি আমাদের মধ্যে কিছু বোঝাপড়া চাও, আমি রাজি। আর সেরকম হলে আমাকেও কিছু ছাড়তে হবে...তোমাকেও...। ছাড়ব। আমি আর ড্রিঙ্কস ছোঁব না, তোমাদের জন্য আরও বেশি সময় দেব। ...তোমাকেও সমস্ত রকম আজেবাজে সংসর্গ ত্যাগ করতে হবে। ইয়েস। তোমার রাহুলকেও।

দুর্মর ক্রোধে, ক্ষোভে, ঘৃণায় ভাস্বতী অদ্ভুত রকম শীতল হয়ে গেল। তর্ক করারও প্রবৃত্তি হচ্ছে না, গলা বুজে আসছে। এই সেই মানুষ যার ক্ষণিক অদর্শনও এক সময়ে যেন অসহ্য মনে হত! দুটো দিন বাপের বাড়ি কাটাতে হলে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শূন্য শূন্য ঠেকত! সে এমন কিছু অসামান্য রূপসী নয়, তবু তার মতো এক সাদামাটা মেয়ের বিরহে ওই পুরুষ সারা রাত বিছানায় ছটফট করছে, এই ভাবনাটাই যে কী মোহময় ছিল তখন! মনে হত সে যেন অসম্পূর্ণ ছিল, রণজয় এসে তাকে পূর্ণ করেছে! ওই রণজয়, দর কষাকষি করা রণজয়!

ভুল ভুল, আদ্যোপান্ত ভুল ধারণা। কে কাকে সম্পূর্ণতা দিতে পারে পৃথিবীতে! প্রতিটি মানুষেরই মনের ভেতরে আরও একটা মন থাকে। গভীর গোপন। শক্ত খোলসে ঢাকা। ওই মনটাকে ভেদ করার ক্ষমতা কারুর নেই। সম্ভবত যার মন, তারও না।

ভাস্বতী কোনওক্রমে বলতে পারল,—তুমি বোঝাপড়া চাও, না চুক্তি চাইছ?

—অত কায়দার বাংলা-টাংলা আমি জানি না। তোমার নাটুকে রাহুল জানে। আমি যা চাই তা স্পষ্ট বলে দিলাম।

ভাস্বতী দাঁতে দাঁত ঘষল—তুমি শোধরানোর লোক নও। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসাটাই আমার ভুল হয়েছে।

—তাই। তাই। রণজয় খাবার প্লেট ঠেলে সরিয়ে দিল।

—আমি চলি। ভাস্বতীও উঠে দাঁড়িয়েছে। অপরিচ্ছন্ন কেবিনের ময়লা পর্দা টেনে সরিয়ে বেরিয়ে আসছে হনহন।

পিছন থেকে রণজয়ের গলা ঝাপটে এল,—আমার কথা শুনলে ভাল করতে। এর পর আর পথে দাঁড়ানোরও জায়গা হবে না।

ক্লিষ্ট ভাস্বতী মেট্রোয় ফিরছে। কামরা আলোয় আলোময়, লোকে টইটুম্বুর, কোলাহলে সরগরম। ভাস্বতী শুধু একা। একদম একা।

নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিল না ভাস্বতী। সে আজ অভিসারিকা সেজেছিল, রণজয় তাকে দেখলই না।

দশ

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ভাস্কর বলল—বুলু, তুই একটু আসবি? তোর সঙ্গে একটা জরুরি আলোচনা ছিল।

ভাস্বতী ছেলেমেয়ের হোম-টাস্ক নিয়ে বসবে ভাবছিল। গরমের ছুটি প্রায় পার হয়ে এল, এখনও বুবলু অঙ্কই শুরু করেনি। মুনিয়ারও হ্যান্ডরাইটিংয়ের অনেক লেসন আছে, ধরে বেঁধে না বসালে বইয়ের পাতাটি উলটোচ্ছে না। এ পাড়ায় কয়েকটা বন্ধু হয়ে গেছে বুবলু মুনিয়ার, দিন রাত তাদের সঙ্গে খেলা আর খেলা।

দাদার ডাকটা কানে লাগল ভাস্বতীর। একটু যেন চিন্তিত লাগছে দাদাকে! ভাস্কর ফিরলেই সন্ধে থেকে বাড়ি গমগম করে, আজ যেন একটু ম্রিয়মাণ! খাওয়ার সময়েও কথা বলছিল না!

ভাস্বতী বুবলু মুনিয়ার সামনে থেকে উঠে এল। সামান্য উদ্বিগ্ন মুখে বলল,—কী হয়েছে রে দাদা?

—তেমন কিছু নয়। আয় না, ছাদে আয়।

শেষ জ্যৈষ্ঠের ছাদ, সারাদিনের রোদ শুষে এখনও তপ্ত। তেমন হাওয়া নেই, অল্প গুমোটভাব। আকাশে অনেক তারা, চাঁদ নেই।

আলসেতে হেলান দিয়ে ভাস্কর বলল—কদিন ধরেই তোকে একটা কথা বলব ভাবছি। ...তুই কী ঠিক করলি?

—কী ব্যাপারে বল তো?

—তোর ছেলেমেয়ের ব্যাপারে। তোর ব্যাপারে। ...এভাবে তো অনন্তকাল চলতে পারে না।

—অসুবিধের কথা বলছিস? ওই ছুটোছুটি? ভাস্বতী আলসে ধরে সামান্য ঝুঁকল—ও আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে। আরও কত দূর দূর থেকে ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসে। সল্টলেক...সোনারপুর...

—তাদের উপায় নেই বলে আসে। বাবা মা দূরে থাকে বলে আসে।

—আমিও দূরে থাকি।

—উপমাটা ঠিক হল না বুলু। তাদের বাচ্চাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হয় না। জানিস, এতে বাচ্চাদের ওপর কত মেন্টাল স্ট্রেন পড়ে? একটা ফিলিং অব ইনসিকিউরিটি গ্রো করে? ধর তুই হয়তো স্কুলে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারলি না, পথে কোথাও গণ্ডগোল হল...শহরে তো হয়ই... নাকি?

—ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে, একটা বছর আর কষ্ট করুক। নেক্সট ইয়ার এদিকে কোথাও ভর্তি করে দেব।

—এটাও যুক্তির কথা হল না।

ভাস্বতী অসহায় মুখে তাকাল,—আর কী করতে পারি দাদা?

—সিম্পল সলিউশনটা কেন যে তোর মাথায় আসছে না!

এতক্ষণে যেন দাদার ডাকার উদ্দেশ্যটা স্বচ্ছ হচ্ছে। এই ক মাস ধরে ক্রমশ যে ভারী বাতাবরণ তৈরি হয়েছে বাড়িতে, অপ্রত্যক্ষ চাপ গড়ে তুলছে বউদি মা, দাদার স্বরেও যেন তারই প্রতিধ্বনি। রণজয়ের সঙ্গে সে দেখা করেছে, তাদের মিটমাটের আশু কোনও সম্ভাবনা নেই, এ কথা কি বলবে দাদাকে?

ভাস্কর ঝপ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বিনা প্রস্তুতিতেই বলে উঠল—রণজয় আজ আমার অফিসে এসেছিল।

ভাস্বতী হকচকিয়ে গেল। মনে মনে ধন্যবাদ দিল অন্ধকারকে, দাদা তার চমকটুকু ঠাহর করতে পারেনি। স্বর যথাসম্ভব নির্লিপ্ত রেখে বলল—তো?

—আমি তাকে লেফট অ্যান্ড রাইট ঝেড়েছি। আমার বোনকে হিউমিলিয়েট করে সে পার পেয়ে যাবে...অসম্ভব, ভাস্কর বোস সে ধাতুতে গড়া নয়। ঝাড় খেয়ে রণজয় কেঁউ কেঁউ করছিল, আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। ভাস্কর ঠোঁটে সিগারেট চাপল,—কিন্তু তোমারও তো কিছু দোষ আছে বুলু। ও যা কমপ্লেন করে গেল তার পাঁচ পারসেন্টও যদি সত্যি হয়...

—কী বলেছে?

—ও সেই রাহুলের কথাই বলছিল। কবে অ্যাকাডেমিতে গেছ, কবে নন্দনে গেছ...তুই নাকি এখানে আসার পরও ছেলেটাকে নিয়ে তোর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলি? ফাঁকা ফ্ল্যাটে দুজনে এক ঘণ্টা ছিলি?

—তুই ওর কথা বিশ্বাস করলি দাদা?

—যাসনি তুই?

—অবশ্যই গিয়েছিলাম। টুকিটাকি কিছু জিনিসপত্র আনার ছিল...রাহুল আমাদের ফ্ল্যাটে ঢোকেওনি।

—তুই নিজে মুখে যা বলবি, আমি তাই বিশ্বাস করব। ভাস্করের গলায় প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস। সিগারেট ধরিয়ে কাঠির আগুনটাকে দেখছে। ফুঁ দিয়ে নেবাল। ক্ষণিক আলোকিত মুখ আবার অন্ধকার।

সিগারেটে ঘন ঘন দু-তিনটে টান দিয়ে ভাস্কর বলল,—কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়ে হিসেবে তোমার কী কর্তব্য জানো? আদৌ এ ধরনের কথা না উঠতে দেওয়া। তুমি কি এ কথা অস্বীকার করতে পারো রণজয় তোমাকে ভালবাসে?...হ্যাঁ, আমি মানি রণজয় একটু বেশি পজেসিভ। সেটা কখনও কখনও শিষ্টতা শালীনতার মাত্রা ছাড়ায়। তবু তোমাদের মধ্যে একটা যখন সম্পর্ক রয়েইছে, এবং সেটা কম দিনের নয়, এগারো বছরের...এগারো বছর খুব কম সময় নয় বুলু। মোর দ্যান এ ডিকেড। এখন তো পরস্পরের পছন্দ অপছন্দকে খানিকটা মূল্য দিতেই হবে।

ভাস্বতী নীরব। বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। এগারো বছর মানুষের সহ্যশক্তি পরীক্ষা করার জন্যও অনেক দীর্ঘ সময়। এত দিনেও তার সহ্যের বাঁধ ভাঙবে না, এতটা জড় বস্তু সে হবে কী করে! রুচিতে ভাবনায় সে আর রণজয় যে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর মানুষ। সুন্দর ছবি দেখে আনন্দ পায় না রণজয়, ভাল নাটক দেখতে গেলে তার হাই ওঠে, সেতার সরোদের বাজনা পিড়িং পিড়িং মনে হয়, সেলুলয়েডে প্রমত্ত মারপিট না থাকলে সে সিনেমা দেখে না, গল্পের বই তার দু চক্ষের বিষ, এ সব বুঝেও তো ভাস্বতী রণজয়ের সঙ্গে থেকেছে এগারোটা বছর। অফিস আড্ডা আর ওই নোংরা সন্দেহ বাতিক—এটুকুই রণজয়ের ত্রিভুবন। সংসার আর চাকরির ঘানিতে ঘুরতে ঘুরতে এক চিলতে নীল আকাশ দেখতে চাওয়াটা কি ভাস্বতীর এতই অপরাধ? সমাজনীতি কি তাই বলে?

ভাস্বতী এ সব কোনও কথাতেই গেল না। স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করল—একটা সত্যি কথা বল তো দাদা। আমি এখানে থাকলে কি তোদের অসুবিধে হচ্ছে?

একটু যেন অস্বস্তিতে পড়ল ভাস্কর। বুঝি বা নিজেরই আশ্বাসবাণী মনে পড়ে গেল। হালকা গলায় বলল,—আমি কি সে কথা বলছি? তা ছাড়া এটা তো তোরও বাড়ি। তুই এখানে থাকতে চাইলে আমার কী বলার আছে?

ভাস্বতীর গলা ধরে এল। তার বলতে ইচ্ছে করছিল মেয়েদের কোথাও ঘর থাকে না রে দাদা। যা থাকে তা হল আশ্রয়। বিয়ের আগেও। পরেও। ছেড়ে যাওয়া আশ্রয়ে ফিরতে চাইলেই কি ফেরা যায়! কোথাও কোনও অধিকার ফলাতে গেলেই সংঘাত অনিবার্য। আজ যদি ভাস্বতী দাদাকে বলে, বাড়ির একতলাটা তো কোম্পানিকে ভাড়া দিয়ে রেখেছিস, ওদের নোটিস দিয়ে উঠিয়ে দে, আমি একতলায় ছেলেমেয়ে নিয়ে শান্তিতে থাকি, দাদা কি ড্যাং ড্যাং করে নাচবে? বলবে না কোন মুখে বাড়ির ভাগ চাইছিস বুলু? মনে রাখিস তোর বিয়েতে দেড় লাখ টাকা খরচা হয়েছিল! ভদ্রতাবশে না বললেও মনে মনে বলবে, ভাই বোনের সম্পর্কে সূক্ষ্ম চিড় ধরে যাবে একটা।

ভাস্বতী খুব নিচু স্বরে বলল—আমাকে একটু ভাবতে দে দাদা।

—ভাবো না। টেক ইওর টাইম। তোরা তো আর জলে পড়ে নেই। ...মামার বাড়িতে থেকে কি বাচ্চারা মানুষ হয় না? অনেক হয়।...আমার শুধু ভাবতে খারাপ লাগছে তোকে হয়তো অনেক টিকাটিপ্পনী শুনতে হবে। বুঝিসই তো সবাই এ সব ঘটনা সোজা চোখে দেখে না বলতে বলতে গলা নামাল ভাস্কর। সিঁড়ির দিকেও এক ঝলক তাকিয়ে নিল—এই তো তোর বউদি বলছিল তার বাপের বাড়ির লোকেরা নানা রকম প্রশ্ন করছে। ফালতু কৌতূহল, কোনও অর্থ হয় না, তবু তোর বউদির মানে লাগে। আমাকেও তো সেদিন পল্টুদা মোড়ে ধরল। তোর সম্পর্কে...যাক গে ছাড়। লোকের মুখ আছে বলবে। তুই ভাব। তবে আমার মনে হয় রণজয়কে তুই আরেকটা চান্স দিতেই পারিস। না হয় ওই ছেলেটার সঙ্গে মেশামিশি না'ই করলি...

—তা হলে কি মিথ্যেটা সত্যি হয়ে যাবে না দাদা?

—কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে কে তার হিসেব রাখে বুলু?

—মানে?

—মানে...আমি বলতে চাইছি...ভাস্কর আমতা আমতা করছে,—রণজয়ের সন্দেহটা ভুল হতে পারে, কিন্তু ঘটনাটা তো সত্যি।... আই মিন, রণজয়ের মনের কাঁটাটা তো সত্যি। তুই সেটাকে ইনডালজ করবি কেন? যে কোনও সেন্সেবল স্ত্রীর উচিত স্বামীর মনের কাঁটা উপড়ে ফেলা।

—উচিতটা শুধু স্ত্রীরই। স্বামীর কোনও দায় নেই? সে তার স্ত্রীকে বোঝার চেষ্টা করবে না?

—অবুঝ লোক তো থাকে বুলু। তাদের নিয়েও তো মেয়েরা ঘর করে। ছাড়তে হয়...একটু জমি ছাড়তে হয়। সেও তো কিছু কিছু বদভ্যেস ছাড়বে বলেছে। ড্রিঙ্ক করবে না, সংসারের দিকে মন দেবে...

—ওগুলো তো বাইরের অভ্যেস রে দাদা। ও সব মেনে নেওয়া যায়, মানিয়ে নেওয়া যায়। হয়তো অনেক অসুবিধে হয়, রাগ হয়, ঝগড়াঝাঁটি হয়, তবুও। কিন্তু ভেতরে গেঁড়ে বসা অবিশ্বাসটা ..বিয়ের এগারো বছর পরে...এ যে কী অপমান তুই ফিল্ করতে পারবি না দাদা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে সেটাই যদি নড়বড়ে হয়ে যায়...

—তুই বড় জেদি বুলু। ভাস্করের স্বর তেতো হয়ে গেল। কেটে কেটে বলল,—তুই নিজেই এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে রাজি নোস।...শুধুমুদু একটা থার্ড পার্টির জন্য...সেই রাহুল ছেলেটাই বা কী! সে জানে তোদের সিচুয়েশান কী, তার পরও...আমার ভাল লাগছে না বুলু।

ভাস্বতীরও আর শুনতে ভাল লাগছিল না। ধীর পায়ে নেমে এল। বুবলু মুনিয়া মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মা খাটে চোখ বুজে শুয়ে। বউদির ঘরে টিভি চলছে, মা ছেলে কোনও সিরিয়াল দেখছে বোধহয়।

ছেলেকে টেনে তুলতে চেষ্টা করল ভাস্বতী। উঠছে না। আলো নিবিয়ে নিজেই শুয়ে পড়ল মাটিতে। ছেলেমেয়ের মাঝখানে। এক হাতে বুবলুকে ছুঁয়ে আছে, অন্য হাতে মুনিয়াকে।

বন্ধ চোখে হিমানীর ডাক শুনতে পেল ভাস্বতী,—ওখানে শুলি কেন বুলু? ওপরে আয়।

—নাহ্, এখানেই ভাল আছি। ভাস্বতী হাই তুলল—তোমার শরীর খারাপ, তুমি ঘুমোও।

হিমানী একটুক্ষণ চুপ। আবার গলা বাজছে—দাদার সঙ্গে কী কথা হল?

—কিছু না। এমনি কথা।

—নীলু কি জামাইয়ের কাছে গিয়েছিল?

—না। ভাস্বতী আধা সত্যি বলে মাকে এড়াল,—দাদা যায়নি।

—যদি রাগ না করিস তো একটা কথা বলি? জামাইকে একবার ডাকবি এ বাড়িতে? তোকে থাকতে হবে না, আমিই তার সঙ্গে...একটু বুঝিয়ে দেখতাম।

—নিজেই ডেকে পাঠিও। দাদার কাছে ফোন নাম্বার আছে...

—এই দ্যাখো, তুই রাগ করলি। মেয়েমানুষ হওয়ার বড় জ্বালা রে বুলু। যতই খারাপ লাগুক, গায়ে একটা তকমা লাগিয়ে রাখতেই হয়। এ সংসারে একা মেয়েমানুষের বেঁচে থাকা বড় কঠিন। বর না থাকলেও কঠিন। বর থাকলে আরও বেশি কঠিন। সে তুই রোজগেরে মেয়েই হোস কি ছাই আমাদের মতো...। এখনও এই সমাজটা বড় বেআক্কেলে রে।

ভাস্বতী জবাব দিল না।

হিমানীর গলা আবার কাঁপছে—শুনছিস বুলু? তোর জন্য আমার বড় চিন্তা হয়। ছেলেরা যত অপরাধই করুক, লোকে তা চিরকাল মনে রাখে না। যেটুকু মনে রাখে তা হল, মেয়েটা বরের ঘর করতে পারল না। আরও মুশকিল কী জানিস? স্বামী ছাড়লেই মেয়েরা একদম বেওয়ারিশ। সবাই লুভিস্টি চোখে দেখে। শেয়াল কুকুরে ছেঁকে ধরে।

হিমানীর স্বরে ঘর আরও অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

গাঢ় তমসা লক্ষমুখ বর্শা হয়ে বিধছিল ভাস্বতীর দুচোখের পাতায়। কাঁদতে চাইছিল ভাস্বতী। চোখ শুকনো, খরখরে। মরুভূমির মতো।

এগারো

বর্ষা এল, চলেও গেল। এবার তেমন বৃষ্টি হল না। আকাশ মাঝে মাঝেই ঘনঘোর সাজে সেজে ওঠে, কিন্তু এক-দু ঘণ্টা টিপটিপ করেই কোথায় যেন চলে যায় বাদুলে মেঘেরা। কলকাতা শহরে এবার একদিনও জল জমল না, ভাবা যায়!

বুবলু মুনিয়ার ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষা হয়ে গেছে। রণজয় এখন মাঝে মাঝেই তাদের স্কুলে আসে। মুখ তার সর্বদাই বিরস, ভাস্বতীর সঙ্গে নিতান্ত দায় না পড়লে কথা বলে না। যেটুকুও বলে কাটা কাটা, প্রাণহীন। যেন খুব অপছন্দের ও কোনও আধা পরিচিতের সঙ্গে জোর করে কথা বলছে। বুবলু মুনিয়ার সামনে দৃশ্যটা যথেষ্ট দৃষ্টিকটু, ভাস্বতী চায় না তাদের সম্পর্কের ছায়া ছেলেমেয়ের ওপর পড়ুক, অন্তত সরাসরি। কিন্তু রণজয়ের তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, ভাস্বতীকে প্রতি পলে অপমান করাই যেন এখন তার জীবনের একমাত্র ব্রত।

কদিন দেখে ভাস্বতী পালটা আক্রমণের রাস্তা বেছে নিয়েছে। প্রায়শই সঙ্গে নিয়ে আসে রাহুলকে, যতক্ষণ ছেলেমেয়ের সামনে রণজয় দুঃখী বাবার অভিনয় করে, ততক্ষণ দশ পা তফাতে দাঁড়িয়ে রাহুলের সঙ্গে গল্প করে ভাস্বতী। স্পষ্ট টের পায় রণজয় জ্বলছে। জ্বলুক। এই জ্বলনই তার পাওনা। রাহুল প্রথম প্রথম রণজয়ের সামনে কাঁটা হয়ে থাকত। কোন পুরুষই বা নারীর হাতে ক্রীড়নক হতে চায়? হোক না সে তার ছোট ভাইয়ের মতো। ক্রমে তারও বুঝি সয়ে গেল অনেকটা। বুঝি বা এক পুরুষ ঈর্ষার আগুনে পুড়ছে, এ দেখে অন্য পুরুষের অহং তৃপ্ত হয়। হোক না সে ছোট ভাইয়ের মতো।

বুবলু মুনিয়ার রেজাল্ট বেরোনোর দিন আচমকা এক প্রস্তাব আনল রণজয়। ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন। বুবলু মুনিয়ার স্কুলের গেটে প্রকাণ্ড এক পিপুল গাছ, তার নীচে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল ভাস্বতী, রাহুল সেদিন আসেনি।

দারোয়ানের ঘরের সামনে দাঁড়ানো ছেলেমেয়ের হাতে দুটো প্যাটিজ ধরিয়ে দিয়ে ভাস্বতীর সামনে এসে দাঁড়াল রণজয়। বিনা ভূমিকায় বলে উঠল—আমি বুবলু মুনিয়াকে নিয়ে যেতে চাই।

ভাস্বতীর মাথায় বাজ পড়ল—সেকী! তা কী করে হয়!

—আমার ছেলেমেয়েকে আমি নিয়ে যাব তাতে ভাবাভাবির কী আছে?

ভাস্বতী একটু কুঁকড়ে গেল। অধিকার তো রণজয়ের আছেই। ছেলেমেয়েকে সরিয়ে নিয়ে তাকে জব্দ করতে চায় রণজয়? তা কিছুতেই হতে দেবে না ভাস্বতী। দরকার হলে চেঁচামেচি করবে, সিন ক্রিয়েট করবে।

রণজয়ের ঠোঁটে বাঁকা হাসি—বুবলু মুনিয়াই কিন্তু আমার কাছে যেতে চায়। কারণ, সম্ভবত আমি ওদের বাবা। অন্তত ওরা তাই জানে।

কী ভাষা!

রাগে গলা দিয়ে স্বর ফুটল না ভাস্বতীর।

ছেলেমেয়ে নিয়ে রণজয় চলে গেল।

ভাস্বতী স্তব্ধ। স্তম্ভিত। বুক ফেটে যাচ্ছে। চোখ ভেসে যায় বার বার। বুবলু মুনিয়া নাচতে নাচতে চলে গেল! বাবার ওপর এত টান! ভাস্বতীর দিকে ফিরেও তাকাল না!

সারাটা রাত ভাস্বতী দু চোখের পাতা এক করতে পারল না। বাড়িতে কারুর একটুও কষ্ট হল না ভাস্বতীর জন্য! দাদার না, বউদির না, মা যে মা তারও নয়! ভাস্বতীর বিধ্বস্ত রূপ দেখেও সবাই খোয়াবে মশগুল, বরফ নাকি এবার গলছে!

মাথা মুড়িয়ে ভাস্বতীকে তবে ফিরতেই হবে ওই একগুঁয়ে বেতমিজ লোকটার কাছে! হেরে গেল ভাস্বতী!

পরদিন অফিসে এসেও কাজে মন বসাতে পারছিল না ভাস্বতী। বাঁধা গতের চিঠি, তাই টাইপ করতেই ভুল হচ্ছে বার বার। খিধে তেষ্টা চলে গেছে, কী করবে ভাবছে অবিরাম। স্কুলে গিয়ে ছিনিয়ে আনবে বাচ্চাদের? যদি ওখানে একটা ঝগড়াঝাঁটি চেঁচামিচি হয়, বুবলু মুনিয়াকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করবে না? করুক গে, ওদের ছেড়ে থাকা ভাস্বতীর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু যদি ওরা না আসে? যদি

রণজয় ওদের স্কুল ছাড়িয়ে দেয়? পাড়ায় রণজয়ের বিস্তর প্রতিপত্তি, যদি ওখানকার ওই ওঁচা স্কুলটায় ছেলেমেয়েকে ভর্তি করে দেয়? নিশ্চয়ই তাই করবে। বিনা মতলবে কি রণজয় ওদের নিয়ে গেছে?

ভাবতেই শরীর হিম, হাত পা অবশ, হাঁটু শিথিল। রণজয়ের হাতে ওদের ছেড়ে দেওয়াটা কী মূর্খামিই না হয়ে গেছে। রণজয় শাসিয়েছিল তাকে পথে বসাবে, সত্যিই বসাল। এখন কী করে ভাস্বতী?

টিফিনের পর টাইপ রাইটারে মাথা রেখে বসে আছে ভাস্বতী, কে যেন ডাকল। ভাস্বতী চোখ তুলল। অ্যাকাউন্ট্যান্ট রমেশ।

—মিসেস মিত্র, আপনার ফোন।

শরীর টেনে উঠল ভাস্বতী—কে?

—আপনার হ্যাজবান্ড।

শব্দ দুটো যেন একটু বেশি চেঁচিয়ে বলল রমেশ। যেন ঘোষণা করল। নাকি এ ভাস্বতীরই মনের ভুল! তার কান আজকাল বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। রণজয় আর ভাস্বতীর মধ্যে যে প্যাঁচ পয়জার চলছে, তা এখন অফিসে বেশ ঘূর্ণায়মান রটনা। কত যে প্রশ্ন সকলের, কত আলটপকা সহানুভূতি! টিটকিরিও আছে। মুখফোড় অসীমা তো একদিন বলেই ফেলল, বরের সঙ্গে আর বুঝি সিনেমা যাও না ভাস্বতীদি!

অনেকেই বক্র চোখে দেখছে, ভাস্বতী দৃকপাত করল না, ফোন তুলল।

—হ্যালো।

—ছেলেমেয়েকে ছেড়ে থাকতে কেমন লাগছে?

ভাস্বতীর হৃৎপিণ্ড থেমে আছে।

—রাহুলকে ছেড়ে থাকার থেকেও বেশি কষ্ট হচ্ছে?

ভাস্বতী রিসিভার মুঠোয় চেপে ধরল।

—বুবলু মুনিয়াকে স্কুল থেকে নিয়ে যেয়ো। আমি আজ যাব না।

ভাস্বতীর বুক খালি করে অনেকটা বাতাস বেরিয়ে গেল।

—চুপ মেরে আছ কেন? মনে রেখো, আমার ছেলেমেয়েকে আমি যখন খুশি তোমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারি।

ভাস্বতী মনে মনে বলল—দেখা যাবে।

রণজয়ও কয়েক সেকেন্ড নিশ্চুপ হয়ে আছে। কিছুক্ষণ একটা নীরব তরঙ্গ খেলে বেড়াল টেলিফোনে। তারপর শব্দ হয়ে আবার আঘাত হানল ভাস্বতীর কানের পর্দায়—আমার অফারটা কিন্তু এখনও ওপেন আছে। ফিরে এসো। অ্যান্ড লিভ রাহুল।

ভাস্বতী টেলিফোন কেটে দিল।

বারো

ভাস্বরদের পাড়ায় সম্প্রতি এক অফিস খুলেছে। বাসস্ট্যান্ডের কাছেই। ঠিক অফিস নয়, দোকানও বলা যায়। দুই তরুণ চালায় অফিস কাম দোকানটা। এদের ব্যবসাটা ভারী অদ্ভুত, এরা সব কাজের কাজী। টেলিফোন বিল ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়া থেকে প্লেনের টিকিট কেটে দেওয়া, সেকেন্ডহ্যান্ড মোটরগাড়ি থেকে সিঙ্গথহ্যান্ড সেলাইকলের সুলুকসন্ধান, গৃহশিক্ষক অথবা গৃহভৃত্য সাপ্লাই, পাত্রপাত্রী, সেলসম্যান সেলসগার্ল, জমি বাড়ি ফ্ল্যাট, কী না এরা জোগাড় করে দিতে পারে!

নামটাও ভারী সুন্দর। ম্যাজিকল্যাম্প। আলাদিনের সেই আশ্চর্য জিনটাকে এরা বোধহয় পুষে রেখেছে।

দোকান কাম অফিসটি ভারী সুসজ্জিত। কাচের ঘর, ফাইবার গ্লাসের চেয়ার, আলো ঠিকরানো সানমাইকা বসানো টেবিল, ঝকঝকে সাইনবোর্ড...। যেতে আসতে রোজই সাইনবোর্ডটা চোখ টানে ভাস্বতীর। অমনি একটা করে দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ে, অজান্তেই।

হায় রে, ভাস্বতীর যদি একটা ম্যাজিকল্যাম্প থাকত!

পুজোর ছুটি পড়া পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে একদিন বুবলু মুনিয়াকে বাড়ি নিয়ে গেছে রণজয়,

দুটো কচি কচি ছেলেমেয়ের মগজ ধোলাই করেছে, ফিরে এসে মুহ্যমান বসে থাকত ভাই বোন, ধুকপুক বুকে ভাস্বতী ভাবত এই বুঝি রণজয়ের দিকে ওরা আরও এক পা সরে গেল। আশ্চর্য, ভাস্বতীর বাপের বাড়ির লোকরাও ওভাবে ছেলেমেয়ে দুটোকে টানা হেঁচড়া করাতে বিন্দুমাত্র অখুশি নয়, দাদা মা বউদি কেউ না। উলটে তারা তাতায়, কেন যাবি না, নিশ্চয়ই যাবি, ওটা তোদের বাড়ি...আহারে, ছেলেমেয়ে কাছে না থাকলে বাবার প্রাণ পুড়বে না! সবই পরোক্ষে ভাস্বতীকে ঠেস দেওয়া।

ম্যাজিকল্যাম্প হয়তো বদল ঘটাতে পারত দৃশ্যটার।

রণজয় প্রতি পদে ভাস্বতীকে হেয় করে চলেছে। মহালয়ার পর দিন বুবলু মুনিয়ার স্কুলে ইয়া বড় এক প্যাকেট নিয়ে এল রণজয়। কি, না ছেলেমেয়ের পুজোর জামাকাপড়। খুলে খুলে দেখাচ্ছে! বুবলু, এই জিন্‌সটা পছন্দ হয়! সাড়ে তিনশো পড়ল! মুনিয়া, ফ্রকটায় হাত বুলিয়ে দ্যাখ! কী নরম না! ইটালিয়ান সিল্ক! সাড়ে পাঁচশো! এসি মার্কেটের জিনিস তো, ওখানে আবার লেস কস্টলি কিছু পাওয়া যায় না! কাকে শোনাচ্ছিল রণজয়? ছেলেমেয়েকে, না ছেলেমেয়ের মাকে? খুশিতে চকচক করছে বুবলু মুনিয়ার চোখ, বাবার কেনা জামাকাপড়ই তাদের বেশি প্রিয়। ফিরেই দিদাকে দেখাচ্ছে, মামা মামিকে দেখাচ্ছে, আর তারা গলে গলে পড়ছে! অথচ বোনাসের সর্বস্ব ঢেলে ছেলেমেয়ের জন্য পুজোর সওদা করেছিল ভাস্বতী, মা দাদা বউদি পিকলু কাউকেই সাধ্য মতো দিতে কার্পণ্য করেনি। এবং শেষে নিজের জন্য একটা পেটিকোট কেনারও পয়সা ছিল না।

ম্যাজিকল্যাম্প থাকলে হয়তো বুবলু মুনিয়া মার বুকের কষ্টটা অনুভব করতে পারত।

রণজয় হুকুম ছুড়ে দিল, অষ্টমীর দিন বিকেলবেলা ছেলেমেয়েকে আমার ফ্ল্যাটে দিয়ে যাবে, ওদের ঘুরিয়ে টুরিয়ে রাত দশটায় ছেড়ে দেব, এসে নিয়ে যেয়ো। ভাস্বতী দাঁতে দাঁত চেপেছিল, পণ করেছিল যাবে না, উপেক্ষা করবে রণজয়কে। কিন্তু বুবলু মুনিয়ার ছটফটানি দেখে সেই প্রতিজ্ঞাও...। ছেলেমেয়েকে যাদবপুরে পৌঁছে দিয়ে পুজোর সন্ধেটা শিখাদের টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে গিয়ে শুকনো মুখে বসে রইল ভাস্বতী। আর ফেরার পথে অবিরাম শুনতে লাগল, বাবা আজ বিরিয়ানি খাইয়েছে মা, বাবা আজ আইসক্রিম খাইয়েছে মা! এমন ঢ্যাটা লোক, বিজয়াতে ভাস্বতীর মাকে প্রণাম পর্যন্ত করতে এল না! অবশ্য মা দাদার তাতেও আত্মসম্মানে লাগে না, জামাইয়ের তরফদারি করেই চলেছে। মা তো মুখের ওপর বলে দিল, মেয়ে যা ব্যবহারটা করছে, জামাই আসে কোন মুখে! ঘটঘট ঘাড় নাড়ল দাদা, ঠিক ঠিক, বুলুটা আমাদের বড় বেশি জেদি! ওর কপালে এখনও অনেক দুঃখ আছে!

নিজস্ব ম্যাজিকল্যাম্প থাকলে এ সব কথা কি সহ্য করতে হত ভাস্বতীকে! জিনটা কি ভাস্বতীর হয়ে ওদের দু কথা শুনিয়ে দিত না! রণজয়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে ছেড়ে দিত!

ভাবলেই আরেকটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে ভাস্বতীর। ম্যাজিকল্যাম্প তার কিছুই উপকার করতে পারে না। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণই জোগাতে পারে ম্যাজিকল্যাম্প, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, হৃদয়, অনুভূতি এ সব তার এক্তিয়ারে পড়ে না।

ওই ঝকঝকে সাইনবোর্ড ঝোলানো ম্যাজিকল্যাম্প তার কোনও কাজে লাগবে না।

তবু একদিন ওই ম্যাজিকল্যাম্পের অফিসে ঢুকতে হল ভাস্বতীকে। বাড়ি ফেরার পথে। সন্ধেবেলা। বুবলু মুনিয়ার স্কুল খুলতে তখন হপ্তাখানেক বাকি।

বুবলুর জন্যই তার আসা। ফার্স্ট টার্মে বুবলু অঙ্কে ভাল করেনি, খুব সহজ সহজ অঙ্ক ভুল করেছে পরীক্ষায়, সেকেন্ড টার্ম এসে গেল...। দাদা তো বুবলুর প্রগ্রেস রিপোর্ট দেখেও খুব একটা রা কাড়ল না, বুবলুকে নিয়ে সে যে ভাবিত হতে রাজি নয় এ তো স্পষ্টই বোঝা যায়। ভাস্বতীর সঙ্গে কেমন যেন এক উদাসীন দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে তার।

কাচের দরজা খুলে ঢুকতেই ভেতরের ছেলেটি কেতাবি অভ্যর্থনা জানাল,—আসুন দিদি। বলুন, হাউ আই ক্যান হেলপ ইউ?

—আমি একটা টিউটর...মানে অঙ্কের...

—ওই তো বোর্ডে আমাদের টিউটরদের অ্যাড দেওয়া রয়েছে, আপনি দেখে নিন।

—না না, ঠিক ওরকম নয়। আমার ছেলে গিয়ে পড়বে।

—সে জন্য কোচিং ক্লাস আছে। তারও বিজ্ঞাপন আছে আমাদের।

—আমার ছেলে খুব ছোট। ক্লাস থ্রি।

—ও। চটপটে তরুণ যেন ভাস্বতীর সমস্যা বুঝে গেল,—বসুন দিদি।

বসতে বসতে ভাস্বতী দেখল পাশে একটা টুলে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উশকো খুশকো চুল এক প্রৌঢ়, তার দিকে তাকিয়ে একদৃষ্টে।

ভাস্বতী চোখ সরিয়ে সপ্রতিভ মুখে বলল,—আমাদের বাড়িতে স্পেস প্রবলেম, অসুবিধে আছে, তাই চাই ছেলে মাস্টারমশাই-এর কাছে গিয়ে পড়ুক।

—আজকাল তো বাড়িতে সবাই গ্রুপে পড়ায় দিদি, থ্রি-এর তো এক্ষুনি কেউ নেই...এক সেকেন্ড দিদি, আমি একটু খাতাটা দেখে নিই।

ভাস্বতী ঈষৎ শিথিল হল। এদিক ওদিক চোখ ঘোরাচ্ছে। সবুজ ভেলভেট লাগানো বোর্ডে ঝুলন্ত বিজ্ঞাপনগুলো দেখছে।

আলগাভাবে বলল,—আপনাদের এখানে সিস্টেমটা কী?

খাতার পাতায় চোখ রেখেই যুবকটি বলল,—কীসের দিদি?

—এই সব টিউটর ফিউটর পাওয়ার? আপনাদের একটা চার্জ নিশ্চয়ই দিতে হবে?

—সামান্যই দিদি। কুড়ি টাকা। এনরোলমেন্ট ফি। ওটা জমা দিলে আমরা আপনাকে টিউটরের নাম ঠিকানা দিয়ে দেব, আপনি কনটাক্ট করে নেবেন। চাইলে টিউটরও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, তখন তা হলে আপনি কখন অ্যাভেলেবল তার স্পেসিফিক টাইম নোট করে দিয়ে যেতে হবে।

—ও। কিন্তু সেই টিউটরকে যদি আমার পছন্দ না হয়?

—তা হলে নেক্সট আরেক জনকে পাঠাব। তখন কিন্তু আপনাকে প্রতি জনের জন্য দশ টাকা করে দিতে হবে।

—বাহ্, মজাদার সিস্টেম তো! ভাস্বতী অল্প হাসল,—তা আপনাদের হাতে এখন আমার রিকোয়্যারমেন্ট মতো টিচার আছে?

—জাস্ট নাউ নেই।...তবে দু-একদিনের মধ্যেই...ছেলেটি খাতা বন্ধ করল,—আপনি নাম ঠিকানা দিয়ে এনরোল করে যান না দিদি, আমি আপনার বাড়িতে খবর পাঠাব।

—না না, তার দরকার নেই। ভাস্বতী তড়িঘড়ি বলে উঠল,—আমি নিজেই খবর নিয়ে যাব। বলতে বলতে ব্যাগ থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করে টেবিলে রেখেছে। কী যেন হঠাৎ মনে পড়ল। ভেলভেটের বোর্ডে চোখ বুলিয়ে বলল,—আচ্ছা, বাড়ি ভাড়ার খবর নেওয়ার সিস্টেমটা আপনাদের কী?

—ওই একই। ফার্স্ট বাড়ি কুড়ি, তারপর থেকে দশ। আমাদের লোক গিয়ে দেখিয়ে আনবে। আর বাড়ি সেটল হয়ে গেলে দু মাসের ভাড়া আমাদের ব্রোকারেজ দিতে হবে।

—ও বাবা, সে তো অনেক!

—এরকমই তো রেট চলছে দিদি।...আপনার দরকার?...কী রকম দরকার? টু-রুম ডাইনিং? থ্রি-রুম ডাইনিং?

ভাস্বতী এক সেকেন্ড চিন্তা করে নিল,—ওয়ানরুম হলেই চলবে। একটু খাবার জায়গা থাকবে...রান্নাঘর বাথরুম...তবে অল সেপারেট।

—তাও আছে। টাকা দিয়ে নাম লিখিয়ে যান...

ভাস্বতী ঘাড় নাড়ল,—না, আজ থাক। এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম...তা হলে টিউটরের ব্যাপারটা পরশু দিন এসে খোঁজ নিয়ে যাব? আমার নভেম্বর থেকে পেলেই ভাল হয়।

—দেখছি দিদি, যত তাড়াতাড়ি পারি।

যুবকটি রসিদ কেটে হাতে ধরিয়ে দিল, উঠে পড়ল ভাস্বতী।

রাস্তায় বেরিয়ে মন্থর পায়ে হাঁটছিল। ছেলে মেয়ে দুটো কী করছে সারা দিন কে জানে! গোটা ছুটি তো হুড়ুদ্দুম করে কাটাল। মুনিয়াও দুই দাদার পিছন পিছন ঘুরে ভারী চঞ্চল হয়েছে আজকাল। কাল লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে হাঁটু ছড়ে গেছিল।

—দিদি শুনছেন?

ঘুরে তাকাল ভাস্বতী। ম্যাজিকল্যাম্পে বসে থাকা বুড়ো মতো লোকটা।

—আমায় কিছু বলছেন?

—হ্যাঁ দিদি। আপনি কি সত্যিই বাড়ি খুঁজছেন?

—কেন?

—না, বলছিলেন তো ওখানে।...আমার হাতে একটা বাড়ি আছে। দেখানোর জন্য পয়সা লাগবে না।। দালালি এক মাসের। আপনি যা চাইছেন, তেমনটিই আছে। নিখুঁত ওয়ান রুম অল সেপারেট ফ্ল্যাট। ভাড়াও কম। বলছে বারোশো। আমি ওটা হাজার করিয়ে দেব।

ভাস্বতী ভুরু কুঁচকোল,—আপনি ম্যাজিকল্যাম্পের কর্মচারী নন?

—ধুস্। ওদের বাড়ির খবর এনে দিই, আর ও ব্যাটারা কমিশন খায়। মাঝখান থেকে আমাদের বিজনেস...দালালির মাত্র চার আনা দেয়।...যাবেন দিদি? কাছেই, এই সিমলাই পাড়া লেনে।

ভাস্বতী কথাগুলোকে নিয়ে মাথায় নাড়াচাড়া করল একটু। হাজার খানেকের মধ্যে ঘর পেয়ে গেলে মন্দ হয় না, দাদা বউদির বিরক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সংসার চালাতে কষ্ট হবে, তবু অনেক স্বস্তি থাকবে মনে। মুখে হয়তো দাদা 'না না, এর কী দরকার ছিল' বলবে, কিন্তু মনে মনে কি খুশি হবে না! তা ছাড়া দেখলেই তো আর সত্যি এক্ষুনি নিতে হচ্ছে না।

ঘড়ি দেখল ভাস্বতী,—চলুন।

দু নম্বর বাস টারমিনাসের উলটো দিকে রাস্তা। মোড়টা ভিড় হয়ে থাকে সর্বক্ষণ। কাটিয়ে কাটিয়ে এগোচ্ছে লোকটা, কথার কামাই নেই।

—আপনাদের ক জনের ফ্যামিলি দিদি?

—তিন জন।

—আপনারা স্বামী স্ত্রী আর ছেলে?

ভাস্বতী সামান্য বিরক্ত হল,—তা জেনে আপনার কী দরকার?

—তা নয়, বাড়িঅলা ছোট ফ্যামিলি আনতে বলেছিল কিনা।

—তিন জনের ফ্যামিলি ছোট নয়?

—ছোটই তো। এর চেয়ে কম কি হয়! বাড়িঅলাদের সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি দিদি। ছোট ফ্যামিলি হবে, দু বছর পর বাড়ি ছেড়ে দেবে...তবে এই বাড়িঅলার একটা দিক ভাল। সেলামি অ্যাডভান্স নেবে না। শুধু ছ মাসের সিকিউরিটি ডিপোজিট।

তার মানে অফিস থেকে একটা পি এফ লোন তুলতে হবে। মাসে মাসে শ তিনেক তো কাটবেই। নতুন সংসার করতে গেলেও খরচা আছে। খাট বিছানা আলমারি চেয়ার টেবিল হাঁড়ি কড়া খুন্তি...। সহসা ভাস্বতীর মন ব্যথায় ছেয়ে গেল। ভবানীপুর থেকে আলাদা হয়ে আসার পর সংসারটাকে একটু একটু করে সাজিয়েছিল। নিজের পছন্দও বটে, অনেকটা নিজের পয়সাতেও বটে। রণজয় সব ভেঙে দিল। অভিমান করে সব রণজয়ের হাতে তুলে দেওয়া কি মূর্খামি হবে? দুজনেই যখন গড়েছে, দুজনেরই সমান সমান ভাগ থাকা উচিত। বুবলু মুনিয়ার খাট বিছানা আলমারি অন্তত রণজয় দিয়ে দিক। দেবে কি?

ডানদিকে এক সরু মতন গলিতে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়েছে লোকটা। একটা পুরনো দোতলা বাড়ির দরজায় দাঁড়াল। জোর জোর কড়া নাড়ছে।

এক স্থূলকায় টাকমাথা ভদ্রলোক দরজা খুলেছে। থ্যাতলানো বাতাবিলেবুর মতো মুখ।

দালাল লোকটা হাত কচলাল,—ইনি ঘর দেখতে এসেছেন স্যার।

—অ। লোকটা দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে, নড়ছে না। অপাঙ্গে জরিপ করল ভাস্বতীকে,—আপনি দেখবেন?

—হুঁ। ভাস্বতী মৃদু মাথা দোলাল।

—কে কে থাকবেন?

—আমি, আমার এক ছেলে, এক মেয়ে।

লোকটার চোখদুটো একবার দালালের দিক থেকে ঘুরে এল,—আপনার স্বামী থাকবেন না?

—না।

—বাইরে চাকরি করেন বুঝি?

লোকটার প্রশ্ন করার ভঙ্গি ভাল লাগছিল না ভাস্বতীর। বিরস মুখে বলল,—আপনি তো আমাকে বাড়ি ভাড়া দেবেন, স্বামী কোথায় জেনে লাভ কী? আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চাকরি করি...মানে একটা গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং-এ।

—অ। স্বাধীন মহিলা।

—কেন, স্বাধীন মহিলাকে আপনারা বাড়ি ভাড়া দান না?

লোকটা উত্তর দেওয়ারই প্রয়োজন মনে করল না। দালালের দিকে কটমট তাকাল,—তোমার আক্কেলটা কী বলো তো? কোনও খবর না নিয়ে ভদ্দরলোকের বাড়িতে উলটোপালটা যাকে তাকে নিয়ে চলে আসছ? আমি ছোট ফ্যামিলি বলেছি, তা বলে এরকম একলা মেয়েছেলের কথা বলিনি। যত্ত সব।

মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাস্বতী নিথর। কান মাথা জ্বলে উঠল অপমানে। ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকবে ভাস্বতী, তবু সে একলা মেয়েছেলে? লোকটা কী বিশ্রী একটা ইঙ্গিত করল!

দালালটা কী যেন বলতে যাচ্ছিল, হনহন করে হাঁটা শুরু করেছে ভাস্বতী।

লোকটা প্রায় দৌড়ে এসে ধরল,—দিদি, শুনুন। ঘোষবাবুর কথায় কিছু মনে করবেন না। আমি আপনাকে ভাল বাড়ি দেখে দেব।...আপনার হাজব্যান্ড সঙ্গে থাকবেন না বলার দরকার কী? বলবেন বাইরে চাকরি করে, মাঝে মাঝে আসবে। ও দিদি, শুনুন না...

ভাস্বতী তীব্র দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল। গতি বাড়িয়েছে হাঁটার। হঠাৎই।

তেরো

কদিন ধরে ভাস্বতীর অফিস জুড়ে খুব শোরগোল। ভুবনেশ্বরে ভাস্বতীদের নতুন ডিভিশান খুলছে, এখান থেকে নাকি অনেককেই ধরে ধরে বদলি করা হবে, তাই নিয়ে উত্তেজনা। কার কার কপাল পুড়ছে তা নিয়ে গবেষণা চলছে জোর। শিখা এসে বলে গেল, মেয়েদের কোনও চিন্তা নেই। খোদ জি এম নাকি বলেছেন মেয়েরা না চাইলে কলকাতা থেকে তাদের অন্তত পাঠানো হবে না কোথাও। ছেলেরা এই নিয়ে টিকাটিপ্পনী কাটল অনেক।

শিখার সংবাদটায় ভাস্বতী খুব খুশি হতে পারল না। বাইরে চলে যেতে পারলে বেশ হত। নিজের মতো করে ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকা যেত, রণজয়ের উৎপাত আর সহ্য করতে হত না। রণজয় কি ভাববে ভাস্বতী ভয় পেয়ে পালাল?

এমন সব সাত পাঁচ চিন্তার মাঝে রাহুল এসেছে অফিসে। মুখটা যেন একটু শুকনো শুকনো। গম্ভীর।

ভাস্বতী হেসে বলল,—কী ব্যাপার, তোমার দেখা নেই কেন? সেই মাসের পয়লা তারিখে এক দিন মুখ দেখিয়ে চলে গেলে...অসুখ টসুখ করেছিল নাকি?

—নাহ্। এমনিই। রাহুলকে তেমন সপ্রতিভ দেখাল না।

—তবে? নাটক?

—না, তাও না।...তুমি একটু নীচে আসবে?

—কেন?

—এসো না। কথা আছে।

রাহুলের স্বর যেন কেমন অন্য রকম। চোখও ঠিক স্বাভাবিক নয়, একটু অন্যমনস্ক। ভাস্বতীর সামান্য খটকা লাগল। ব্যাগ কাঁধে নেমে এল রাহুলের পিছু পিছু।

এক তলার ক্যান্টিনে এসে খানিকটা স্বচ্ছন্দ হয়েছে রাহুল। কথা বলছে এতাল বেতাল। নাটকের মহলা বন্ধ এখন, অন্য একটা গ্রুপ বড় রোল করার জন্য তাকে ডাকছে, কোন বন্ধুর এগজিবিশানে চারটে স্কালপচার বিক্রি হল, এই সব।

এই কথা বলতে ডেকেছে রাহুল? মনে হয় না। কথা বলছে রাহুল, তবু যেন উষ্মন বার বার।

বিস্বাদ চায়ে চুমুক দিয়ে ভাস্বতী বলল—আজে বাজে কথা ছাড়ো, কাজের কথা বলো।

—বলছি। তাড়া কীসের? রাহুল ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল—তোমাদের অফিসে তো কেউ আড়াইটের আগে টিফিন সেরে ঢোকে না।

ভাস্বতী অপ্রসন্ন মুখে চারদিকে তাকাল। একটা বিশ্রী ভনভন শব্দ ঘুরছে ঘরটায়, ভাল লাগছে না একটুও। মাথায় এত চিন্তা। পরশু দাদা কী তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বাড়ি তুলকালাম করল! বাজার এনে রান্নাঘরে রেখেছিল দাদা, ঘটনাচক্রে ভাস্বতীও তখন রান্নাঘরে, বুবলু মুনিয়ার টিফিন তৈরি করছে, হতভাগা এক বেড়াল এসে দুটুকরো মাছ মুখে করে নিয়ে চলে গেল। দাদা রেগে কাঁই, ভাস্বতীকে সরাসরি কিছু না বলে বউদির ওপর চোটপাট কবল খুব। জানই তো বুলু নিজেকে আর নিজের ছেলেমেয়ে ছাড়া দুনিয়ার কিছু চেনে না, তুমি একটু নজর রাখতে পারো না! বউকে মেরে বোনকে শেখানো!

ভাস্বতী তাও ঠাণ্ডা মাথায় বলেছিল, আমার ছেলেমেয়ে তো মাছ খেতে চায় না, ওদের আজ নয় নাই দিলে।

শুনে দাদা রণমূর্তি। তুই আমাকে ইনসাল্ট করছিস বুলু! এরপর বলবি দু পিস মাছের দাম দিয়ে দিচ্ছি! কী কথার কী অর্থ! তাও যদি সত্যি মুফতে থাকত ভাস্বতী। মাস গেলে হাজারটি করে টাকা দেয়, লাগবে না লাগবে না করে হাত পেতে নিয়ে নেয় দাদা। মাছ নিয়ে কুরুক্ষেত্রটা যে বাহানা তা কি ভাস্বতী বোঝে না!

রাহুল গাঁজাড়ুর মতো টান দিল সিগারেটে—আমি একটা কথা ভাবছিলাম ভাস্বতীদি। যদি আমাকে ভুল না বোঝ তো বলতে পারি।

—কেন? কী এমন কথা?

—বলছিলাম...রাহুল চারপাশ একবার দেখে নিয়ে গলা নামাল—আমি কি একবার রণোদার সঙ্গে বসব?

—কেন?

—না মানে...আফটার অল আমিই তো ঝামেলার মূল।

—কে বলল?

—আমি কি বাচ্চা ছেলে ভাস্বতীদি?...সব বুঝি। বুবলু মুনিয়ার স্কুলে আমাকে দেখলে রণোদার চোয়াল শক্ত হয়ে যায়, কথা বলতে গেলে নিমপাতা খাওয়া মুখ করে থাকে...। রাহুলের মুখে সবজান্তা হাসির রেখা—তোমার অফিসও আমার অচেনা নয় ভাস্বতীদি, সেখান থেকেও দু-চারটে কমেন্ট আমার কানে এসেছে।

ভাস্বতী চোখ নামাল—আগে তো এ সব কথা বলনি?

—ভাবি বলব। বলা হয় না।...যাক গে, বলো বসব? আমি হয়তো তোমাদের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা মিটিয়ে দিতে পারি।

—কী উপায়ে? বলবে ভাস্বতীদি আমার দিদির মতো? মায়ের পেটের দিদির থেকেও আপন? বিশ্বাস করুন, আমাদের মধ্যে কোনও গুপ্ত সম্পর্ক নেই? নিজের দিদি বিদেশ চলে গেছে বলেই...? ভাস্বতীর স্বরে শ্লেষ ঝরছে।

রাহুল মাথা ঝাঁকাল—দুর, ও সব কথা বলব কেন?

—তা হলে?

—বলব, আমি আর কখনও ভাস্বতীদির সঙ্গে দেখাই করব না। বলব, আপনারা সুখে ঘরকন্না করুন, আমায় টা টা করে দিন।

—মিথ্যে বলবে?

—মিথ্যে কেন? সত্যিই বলব। রাহুলের স্বর হঠাৎ ভারী হয়ে গেল,—এই বিশ্রী ঘটনার এবার ইতি হওয়া দরকার। আমার জন্য তোমাদের সংসার নষ্ট হয়ে যাক, বুবলু মুনিয়ার ফিউচার অ্যাফেক্ট করুক, এটা কোনও কাজের কথা নয় ভাস্বতীদি। আই শুড এগজিট। অ্যান্ড এগজিট গ্রেসফুলি।

ভাস্বতী রাহুলের চোখের দিকে সরাসরি তাকাল। পড়তে চাইল মায়াবী ছেলেটাকে। মুখে হাসি টেনে বলল—তুমি সরে গেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমন বিশ্বাস কী করে এল?

রাহুল উত্তর দিল না। রংজ্বলা টিনের অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে ভাবছে কী যেন।

ভাস্বতী শান্ত স্বরে বলল—শোনো রাহুল, তোমার এখনও জীবনের অনেক দিকই দেখা হয়নি। সন্দেহ ব্যাপারটা এমনই, সেটা কোনও ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভর করে না। মানুষের মনে সন্দেহের বীজ আগেই দানা বাঁধে, পরে মানুষ তার আধার খোঁজে। না হলে ওথেলো কি তুচ্ছ কেসিওকে নিয়ে ডেসডিমোনাকে সন্দেহ করতে পারত? হয়তো এটাই তাদের ভালবাসার ধরন।...তোমার রণোদাও সেরকমই। এক রাহুল চলে গেলেই কি তার মনের কাঁটাটা চিরতরে নির্মূল হবে?

—কেন হবে না? রাহুল তর্ক জুড়তে চাইল।

—তোমার ও সব ছেলেমানুষি প্ল্যান ছাড়ো। ভাস্বতী রাহুলকে থামিয়ে দিল—যেমন আসছ আসবে, মিশছ মিশবে, নইলে আমি নিজের কাছে ছোট হয়ে যাব। ...যাক গে যাক, অনেক বাজে বকলে, এবার একটা দরকারি কথা শোনো। আমার একটু উপকার করতে পারবে?

—কী? রাহুল সামান্য অন্যমনস্ক।

—আমায় একটা বাড়ি খুঁজে দিতে পারবে? বলবে না বলবে না করেও ভাস্বতী বলে ফেলল।

—হঠাৎ।

—তোমাকে তো আগেই বলেছি, দুনিয়ায় কিছুই হঠাৎ ঘটে না।

রাহুল চুপ করে রইল।

ভাস্বতী আবার বলল—পারবে কি না বলো। ছোট্ট টু রুম, দেড়খানা ঘর হলেও চলবে। মোটামুটি জল-টল থাকবে, পাড়াটা সভ্য-ভদ্র হবে...আর একটু সেপারেট। তোমার রণোদার পাড়াতেও নয়, পাইকপাড়াতেও নয়। বুঝতেই পারছ কেন বলছি।

রাহুল ঘাড় নাড়ল, তবে উৎসাহ দেখাল না। চাপা গলায় বলল—একা মেয়েকে সহজে কেউ ঘর ভাড়া দেয় না ভাস্বতীদি।

ভাস্বতী মনে মনে বলল, জানি। মুখে বলল,—একা কেন! ছেলেমেয়ে সঙ্গে থাকবে।

—ওই হল। সঙ্গে পুরুষ কেউ না থাকলে মেয়েদের একাই বলে।

এ সব কথায় ভাস্বতী এখন অভ্যস্ত, গায়ে মাখল না। বলল—হুঁ। সেই জন্যই তো তোমাকে বলা। তোমাদের ওদিকে দ্যাখো না,...দালাল-ফালালকে বলো... হরিদেবপুরের দিকে ভাড়াটাও নিশ্চয়ই একটু কম হবে। জানোই তো আমার কী রোজগার।

—দেখব। রাহুল আরেকটা সিগারেট ধরাল—আমার অন্য কথাও ছিল ভাস্বতীদি।

—বলো বলো, চটপট বলো। ভাস্বতী ঘড়ি দেখছে।

—আমি তোমার কাছে একটা অনুমতি চাই। রাহুল অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল—আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে ভাস্বতীদি। অঘ্রানের সাতাশে।

—বাহ্ এ তো খুব আনন্দের খবর। এতে আমার অনুমতির কী আছে?

রাহুল ঝট করে মুখ ফেরাল—বিশ্বাস করো, বাবা মা খুব জোর করল, বারণ শুনল না।

—বারণ করছিলে কেন? ভাস্বতী অবাক মুখে তাকাল—মেয়ে তোমার পছন্দ নয়?

—তা ঠিক নয়...মেয়ে ভালই। ব্যাঙ্কে চাকরি করে, বেশ স্মার্ট, জলি...কালচারাল দিকেও ইন্টারেস্ট আছে, ইনফ্যাক্ট আমার নাটকও দেখেছে। রাহুল কয়েক সেকেন্ড থেমে রইল। যেন ক্যান্টিনের কলরোল শুনছে। তারপর হঠাৎই ভাস্বতীর হাত চেপে ধরেছে। করুণ মুখে বলল—তুমি রাগ কোরো না ভাস্বতীদি। খোলা মনে অনুমতি দাও। আমার কথা মিলিয়ে নিও, সব মিটে যাবে।

ভয়ঙ্কর এক ক্রোধের অনল জ্বলে উঠল ভাস্বতীর শরীরে। রাহুল ভাবে কী! ভাস্বতী কি স্ত্রীমাকড়সা, তার জালে আটকে আছে রাহুল!

পরমুহূর্তে অদ্ভুত এক শৈত্য অনুভব করল ভাস্বতী! রাহুল তার বন্ধু কেন হবে, সেও তো পুরুষই।

রণজয়ের ছোটানো ক্লেদ এতদিন পরে যেন গায়ে লাগছিল ভাস্বতীর। ঘেন্না আসছে, ভীষণ ঘেন্না আসছে।

রাহুল যেন রণজয়ের থেকেও বেশি অপমান করল তাকে। এটাও বুঝি পাওনা ছিল। ভালই হল, এবার অনেক নির্মোহ হতে পারবে ভাস্বতী।

হাসল ভাস্বতী। বলল—নেমন্তন্ন কোরো কিন্তু। বুবলু মুনিয়াকেও বাদ দিয়ো না।

অফিসে ফিরে টাইপরাইটারের সামনে বসে ভাস্বতী আপন মনে হাসছিল। কেন হাসছে নিজেও জানে না। যেন পাহাড় ফেটে গোপন প্রস্রবণের মুখ খুলে গেছে, অন্তহীন বুদবুদের মতো উঠে আসছে হাসিটা।

চোদ্দো

সাতটা দিনও গেল না, রণজয় এসে হাজির। ভাস্বতীদের পাইকপাড়ার বাড়িতে।

রবিবারের সকাল, একরাশ কাপড় কেচে ছাদে মেলছিল ভাস্বতী। পিকলু ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, বুবলুর হাতে লাটাই, মুনিয়া উৎসাহী দর্শক। ভাস্কর বাড়ি নেই, ব্যাঙ্কের কোনও বন্ধুর কাছে গেছে। হিমানী জপে বসেছেন। রিনা রান্নাঘরে।

রিনাই নীচ থেকে ডাকল—বুলু, বুলুউউ, রণজয়দা এসেছেন।

ভাস্বতীর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল, ঘন কুয়াশায় আকাশ পারে টুকরো রোদের মতো। যেন জানতই রণজয় আসবে।

বাবার নাম শুনেই বুবলু মুনিয়া লাফাতে লাফাতে নীচে নেমে গেছে। ঘুড়ি নামাচ্ছে পিকলুও। ভাস্বতীও বেশ খানিকটা সময় একা একা দাঁড়িয়ে রইল ছাদে। অদূরে অতিকায় জলাধার স্পষ্ট এখন, দৃশ্যমান তার নীচের আবছা আঁধারটাও। যেন অজস্র মানুষের তৃষ্ণা মেটাতেই ওই আধারতলে ক্লান্তি নেমেছে, ভাস্বতীর মনে হল।

দোতলায় নেমে ভাস্বতী দেখল হিমানীর ঘরে ছোটখাটো এক উৎসব শুরু হয়ে গেছে। দিন পনেরো বাবাকে দেখেনি বুবলু মুনিয়া, তারা একেবারে আহ্লাদে ডগমগ, কলকল করছে। রিনা লুচি ভাজতে বসে গেছে রান্নাঘরে। হিমানীর জপও শিকেয়। তাঁর শরীর নিয়ে সুবোধ বালকের মতো প্রশ্ন করছে রণজয়, তিনিও প্রফুল্ল মুখে জবাব দিয়ে চলেছেন। গোটা দৃশ্যটাই আনন্দের এক নিসর্গ চিত্র।

ভাস্বতীকে দেখে সামান্য আড়ষ্ট হল রণজয়।

হিমানীর মায়ের চোখ, ধরেছেন ঠিক। বললেন—এই বুলু, জামাইকে নিয়ে পিকলুর ঘরে বসা না।

হাসিটা ভাস্বতীর মুখে ধরাই আছে। বলল—কেন মা, ও তো এ ঘরে বসেইছে।

—আহ বুলু, মানুষটা কদ্দিন পর এল...এই হাটের মাঝে কি স্বামী স্ত্রীর কথা হয়?

—তাও তো বটে। ভাস্বতী ঘাড় দোলাল। ডাকল রণজয়কে—এসো।

রিনা এর মধ্যেই পিকলুর ঘর ফিটফাট করে দিয়েছে। বইখাতা গুছোনো, নির্ভাঁজ চাদর, দরজায় পর্দা টানটান। পিকলুকে মিষ্টি কিনতে পাঠিয়েছিল, ছেলে ফিরতেই ঝকঝকে প্লেটে লুচি তরকারি সন্দেশ সাজিয়ে দিয়ে গেছে।

পিকলুর চেয়ার টেবিলে খাচ্ছে রণজয়। দরজা ভেজিয়ে ভাস্বতী খাটে বসল। বলল—মিষ্টিগুলো খাবে? তোমার না সুগার?

রণজয় শশব্যস্ত হয়ে মিষ্টির প্লেট সরিয়ে দিল। আড়চোখে দেখল ভাস্বতীকে—আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি স্বাতী।

হঠাৎ? বলতে গিয়েও ভাস্বতী কথাটা জিভে পুরে নিল। এ দুনিয়ায় তো কিছুই হঠাৎ হয় না। সবেরই জমি লাগে, কার্যকারণ থাকে। তা হলে রাহুল...।

ভাস্বতী অল্প মাথা নাড়ল—হুঁ।

রণজয় সন্তর্পণে লুচি ছিঁড়ল—অ্যাই অ্যাম সরি স্বাতী। আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আমায় ক্ষমা করে দাও।

ভাস্বতীর মুখে হাসিটা ফিরে এল—হুঁ।

রণজয় যেন খানিকটা জোর পেয়ে গেল। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল—আমার যে কী মতিভ্রম হয়েছিল! আমি কিনা শেষে ওই বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে তোমায় সন্দেহ করেছিলাম! সামান্য একটা কারণে তুমি কত কষ্ট পেলে, ছেলেমেয়ে দুটো সাফার করল, আর আমি তো...। রাহুল আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে স্বাতী।

—বুঝলাম।...খেয়ে নাও, লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ খাই। ঝটপট একটা গোটা লুচি তরকারি সমেত মুখে চালান করল রণজয়। শেষ করে একটু জল খেল—তুমি রাহুলের বিয়েতে যাচ্ছ তো?

—ভাবছি।

—ভাবাভাবির কিছু নেই, আমরা সবাই যাব। কী প্রেজেন্ট দেওয়া যায় বলো তো?... দামি একটা কিছু তো দিতেই হয়। যেন রাহুলের মনে কোনও ক্ষোভ না থাকে।

ভাস্বতী বলল না কিছু, শুধু শুনছে। দেখছে রণজয়কে। রণজয়ের মুখে চোখে বিন্দুমাত্র গ্লানি নেই, এই মুহূর্তে রণজয় যেন খুশির পদ্মবিল।

রণজয় প্রসন্ন মুখে আরও দুখানা লুচি খেল। তরকারির কাঁচা লঙ্কা পড়েছে পাতে, কুচকুচ করে খাচ্ছে। এক সময়ে ঘরের নীরবতা টের পেল। খাওয়া থামিয়ে বলল—তুমি আমাকে শাস্তিটা দিয়ে ভাল করেছ স্বাতী। আমি একদম অন্য মানুষ হয়ে গেছি। এবার থেকে আমরা একেবারে নতুনভাবে জীবন শুরু করব। এগারো বছরে যত তিক্ততা তোমার মনে জমা হয়েছে, সব আমি মুছে দেব। সব। মদ তো ছাড়ছিই...

—কিন্তু অংশু বলছিল তা নাকি হয় না। ভাস্বতী কথা শেষ করতে দিল না রণজয়কে। অকস্মাৎ প্রগলভ হয়ে উঠেছে—অংশু বলে, যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অন্য কোনও এক তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে, সে সম্পর্ক নাকি কিছুতেই জোর করে টিকিয়ে রাখা যায় না।

রণজয়ের হাত প্লেট থেকে সরে গেল। চোখ স্থির—কে অংশু?

—ওহো, তোমার সঙ্গে তো তার পরিচয় নেই। মনে মনে এক অংশুকে বানানোর খেলায় মেতে উঠল ভাস্বতী, আমার কলেজের বন্ধু। মাসখানেক আগে হঠাৎ একদিন ক্যামাক স্ট্রিটে দেখা, আমাদের অফিসের সামনেই। দিল্লিতে ছিল, কমপিউটার কোম্পানিতে, রিসেন্টলি কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে।

—তাকে বুঝি তোমার সব কথা বলেছ?

—বলতে চাইনি। অংশুই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জেনে নিল। খুব বন্ধু ছিল তো এক সময়ে, কলেজে একসঙ্গে কত গানের প্রোগ্রাম করেছি।

—ম্যারেড?

—জিজ্ঞেস করিনি। অংশু ম্যারেড কি ব্যাচেলার তাতে আমার কী এসে যায়। ফ্রেন্ড ইজ ফ্রেন্ড। নয় কী?

—আগে তো কখনও এর কথা শুনিনি? রণজয়ের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

—তাতে কী আছে! এবার আলাপ করিয়ে দেব। দেখবে কী সুন্দর করে কথা বলে।

রণজয় উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখ লাল। লাল, না কালো? চাপা স্বরে বলল—ভেবেছিলাম তুমি এবারে বদলেছ।

ভাস্বতীর স্বর আরও চাপা, আরও তীব্র—তুমি বদলেছ নিজেকে?

রণজয় চলে গেল

ভাস্বতী আবার ছাদে উঠল। ত্বরিত পায়ে। কার্নিশে দাঁড়িয়ে বিলীয়মান রণজয়কে দেখছে। মাঠের গায়ে চওড়া রাস্তা, ছাতা হাতে হেমন্তের রোদে কুঁজো হয়ে হাঁটছে লোকটা। বড্ড রোগা হয়ে গেছে, হাঁটাটাও বড় শ্লথ, যেন পা টেনে টেনে চলছে। আকাশের দিকে চোখ তুলে একবার তাকাল, আবার হাঁটছে। মাত্র চল্লিশেই রণজয় বুড়িয়ে গেল। কেন যে নিজেরই তৈরি করা জালে নিজেই আটকে যায় মানুষ!

চোখ বুজে লম্বা একটা নিশ্বাস নিল ভাস্বতী। সামনে এখন কত কাজ। মাথা গোঁজার একটা পাকাপোক্ত ঠাঁই খোঁজা দরকার আগে। অফিসে রমেশবাবুরা বলাবলি করছিল, নিজে থেকে দরখাস্ত দিলে এখনই ভুবনেশ্বর পাঠিয়ে দেবে। ভাস্বতী বদলিটা চেয়ে নেবে? নাকি এখানে থেকেই...? আরও কত কাজ। ডিভোর্সের মামলা করার জন্য ভাল একটা উকিল খুঁজতে হবে, ছেলেমেয়ের দখল নিয়ে লড়াই করতে হবে, বুবলু মুনিয়াকে মানুষের মতো মানুষ করতে হবে...

একা একা এখন অনেকটা পথ যেতে হবে ভাস্বতীকে।

গভীর অসুখ

বাইরের বড় ঘরটা বেশ কায়দা করে সাজানো হয়েছে আজ। পেল্লাই পেল্লাই সোফাগুলো সরে গেছে দূরে দূরে, সেন্টার টেবিলের স্থান কোণের স্ট্যান্ডল্যাম্পটার পাদদেশে, পেলমেট থেকে ঝুলছে ইস্ত্রি করা গাঢ় নীল পর্দা। ভারী পর্দা, পাখার হাওয়ায় নড়ে না। মধ্যিখানে এখন বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে শোভা পাচ্ছে ডিমশেপ খাবার টেবিল, তার ওপরে এক প্রকাণ্ড কেক বিরাজমান। তিন থাকের। তিন স্বাদের। স্ট্রবেরি পাইনঅ্যাপল চকোলেট। বিলিতি পিষ্টকের মাথায় মিনি থামের মতো এক লাল টুকটুক মোমবাতি। অপেক্ষা করছে জ্বলে ওঠার এবং নিবে যাওয়ার। দেওয়াল থেকে দেওয়াল অজস্র রঙিন কাগজের মালা, দরজা জানলার মাথায় থোকা থোকা বেলুন, ঘরময় সুতোয় ঝোলানো রাংতার ফুলতারা ঝিলমিল ঝিলমিল।

অভিজিৎ ঘরে ঢুকে পল্লবের পাশে এসে দাঁড়াল। নিঃসাড়ে। এক মনে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ পরীক্ষা করছে পল্লব, চিড়িক চিড়িক আলো জ্বলছে নিবছে। ঘন ঘন। একটু বুঝি চিন্তিত পল্লব, দু-একটা ফ্ল্যাশ মিস হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ওপাশে ঋতুর বাবা গমগমে স্বরে এক মধ্যবয়সি মহিলার সঙ্গে আড্ডা মারছেন। এখনও চেহারায় চটক আছে মহিলার, এই গরমেও রংচং মেখেছে খুব। অভিজিতের অপরিচিত, বোধহয় শ্বশুরমশাই-এর প্রতিবেশিনী। তেষট্টি বছর বয়সেও শ্বশুরমশাইয়ের মহিলামহলে বিপুল সমাদর! সাধে কি লুব্জ বলে অভিজিৎ! গোটা পাঁচ-ছয় বাচ্চা এলোপাথাড়ি ছোটাছুটি করছে, রিমলিকেও তাদের মধ্যে এক ঝলক দেখা গেল। মামারবাড়ি এলেই মেয়ের জীবনীশক্তি যেন ডবল হয়ে যায়। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ঋতুর জামাইবাবু কর্তালি করছে, যেমনটি করে এ বাড়ির অনুষ্ঠানে। হাঁক পেড়ে ডাকছে বউকে, নীতুদি হুড়মুড়িয়ে দৌড়ে এল। ঋতুর মা পাখার নীচে দাঁড়িয়েও নাতি কোলে ঘামছেন দরদর। পল্লবের বন্ধুবান্ধুনিদের সঙ্গে কথা বলছে মালা, হাসছে। কিন্তু ঋতু গেল কোথায়?

ছোট জামাইবাবুর দিকে চোখ পড়েছে পল্লবের। একটু মেয়েলি ধাঁচের ফর্সা কমনীয় মুখে হাসি ফুটে উঠল, —আরে, এসে গেছেন! এত লেট?

—আর বোলো না। কলেজে একটা ইম্পর্ট্যান্ট মিটিং ছিল, শেষ হল পাঁচটায়। তারপর জরুরি কাজে একটা জায়গায় ছুটতে হল...

—সবাই আপনার জন্য ওয়েট করছে। পল্লব গলা ওঠাল, —মালা, মালাআ, এই যে আমাদের চিফগেস্ট এসে গেছে।

একা মালা নয়, সকলেরই নজর পড়েছে অভিজিতের দিকে।

—বাব্বা অভিদা, সাতটা বলে একেবারে আটটা বাজিয়ে দিলেন!

—এই অভি, বউ মেয়ে ফেলে কোন ছাত্রীর পেছনে ছুটেছিলে গো?

—পথে জ্যাম ছিল নাকি ভায়া? অবরোধ টবরোধ?

—আহা, সবাই মিলে ওর পেছনে লাগলে কেন? খেটেখুটে আসছে...

—আর তো দেরি করার কিছু নেই। পল্টু, শুরু করে দে।

সাত বছর হল এ বাড়িতে বিয়ে হয়েছে অভিজিতের, কিন্তু এখনও জামাই জামাই ভাবটা গেল না। লাজুক লাজুক মুখে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। এ বাড়িতে সে কথা বলে কম, গায়ে পড়ে কারুর সঙ্গে আলাপ জমায় না, মুখে একটা স্থির হাসি ধরে রাখে সারাক্ষণ। অধ্যাপকসুলভ। এই মুহূর্তে নিজেকে বেশ কেষ্টবিষ্টু মনে হচ্ছিল অভিজিতের। শুধু সে নেই বলেই একটা অনুষ্ঠান শুরু হয়নি, চিন্তাটা ভারী সুখদায়ক। আবার একটু একটু অস্বস্তিও হচ্ছে। অনেক নিমন্ত্রিত বসে আছে, কসবায় আজ না গেলেই হত!

রিমলি এসে কোমর জড়িয়ে ধরল, —বাবা, আজ আমি দুটো আইসক্রিম খেয়েছি।

—এর মধ্যেই ?

—গরম লাগছিল যে।

মেয়ের মাথায় আলগা হাত বোলাল অভিজিৎ। নিচু গলায় প্রশ্ন করল, —তোর মা কোথায় রে ?

—মার মাথা ধরেছে। মামির ঘরে শুয়ে আছে।

—ওষুধ খেয়েছে কিছু ?

উত্তরের আগেই প্রশ্ন হাজির। আবির্ভূত হয়েছে ঋতু। পরনে তোতারং কাঞ্জিভরম, কানে ঝোলা দুল, গলায় ইমিটেশন নেকলেস। কটকট করে অভিজিতের দিকে তাকাল একবার, মুখ ঘুরিয়ে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘরে মৃদু গুঞ্জন। মূল অনুষ্ঠান শুরু হতে চলেছে। পল্লব ফ্যান অফ করে দিয়ে এল, ক্যামেরা নিয়ে রেডি। যারা এতক্ষণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তারাও জড়ো টেবিল ঘিরে। আজকের আসরের মধ্যমণি গুবলুবাবু ঠাকুমার কোলে চোখ কচলাচ্ছেন। তা এই ভিড়ভাট্টায় কি ঘুম আসে ! মালার বোন তাকে একবার টানার চেষ্টা করতেই তারস্বরে কান্না জুড়লেন। গুবলুবাবুর পরনে আজ ইলাস্টিক লাগানো ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, কপালে চন্দনের টিপ। এই বরসাজে গুবলুবাবু একটুও সন্তুষ্ট নন। আজ এই গৃহে তিনিই সম্ভবত একমাত্র অকৃত্রিম অসুখী মানুষ।

গুবলুর আজ এক বছর পূর্ণ হল।

এখন তার জন্মদিনের কেক কাটা হবে।

এ ধরনের অনুষ্ঠানে শেষ মুহূর্তে কয়েকটা ছোটখাটো বিভ্রাট দেখা দেয়। মোমবাতি জ্বালানোর আগে দেখা গেল দেশলাই নেই। সবাই সবার কাছে খুঁজছে, কারও কাছে নেই। রান্নাঘর থেকে একটা জ্বটল, তাতে মাত্র দুটো কাঠি, হুটোপাটি করে জ্বালতে গিয়ে দুটো কাঠিই নষ্ট। পল্লবের এক বন্ধু বিদেশি গ্যাসলাইটার এগিয়ে দিল, সেই লাইটারের টোকা খেয়ে কেক থেকে মোমবাতির পতন ও মূর্ছা, আগুনের ছ্যাঁকা লাগল মালার বোনের আঙুলে। তবে এ সব দুর্ঘটনাই আনন্দ অনুষ্ঠানের অঙ্গ। অনবরত হাসির ফোয়ারা বয়ে যাচ্ছে ঘরে। হাহা হাসি হিহি হাসি হোহো হাসি। অবস্থা চরমে উঠল মোমবাতি নেবানোর সময়ে। ঘর অন্ধকার, সমস্বরে তালি দিয়ে গান ধরেছে সকলে। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু গুবলু...। কোরাসকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করে চলেছে গুবলু, কিছুতেই সে জ্বলন্ত মোমবাতির কাছে যাবে না। হাল ছেড়ে দিয়ে মালা মুক্তি দিল ছেলেকে, নিজেই ফুঁ দিয়ে নেবাল মোমবাতি, ক্রন্দনরত ছেলেকে ভোলাতে ভোলাতে কেকে ছুরি চালাল।

পল্লবের ক্যামেরায় পটাপট শাটার পড়ছে। ছবি উঠছে বিভিন্ন ভঙ্গিমার। ভিন্ন ভিন্ন কম্বিনেশানের। মা ছেলে। পিসি ভাইপো। দাদু ঠাকুমা ও নাতি। মাসি বোনপো। গোঁফে কেক বড় পিসেমশাই। আনাড়ি হাতে গুবলুকে কোলে নিয়ে টলমল রিমলি। ঠোঁটটেপা অভিজিৎ। দলবদ্ধ বন্ধুবান্ধব। যূথবদ্ধ পড়শি।

এবার আসল কাজ শুরু। ভোজন। আজকাল কাজেকর্মে বাড়িতে রাঁধাবাড়ার চল নেই, চল্লিশজনকে খাওয়ালেও লোকে কেটারার ডাকে। লিস্ট আর মেনু ধরিয়ে দিয়েই খালাস। ঋতুর বাপের বাড়ি আরেকটু উচ্চমার্গের, এরা বুফেপন্থী। ভেতর বারান্দায় উর্দি পরা লোকজন টেবিল আর খাবার সাজিয়ে বসে আছে। নাও, আর ঘুরে ঘুরে খাও।

চার দিকে ছোট ছোট নিউক্লিয়াস তৈরি হয়ে গেল। কোথাও একই পরিবারের। কোথাও বন্ধুবান্ধবের। কোথাও বা শুধুই মহিলাদের। বাচ্চারা বহমান তড়িৎকণার মতো এই নিউক্লিয়াস সেই নিউক্লিয়াস করছে, খাচ্ছে কম, ছড়াচ্ছে বেশি। প্লেট হাতে ঘোরাতেই তাদের আনন্দ।

অভিজিৎ একটা নিরাপদ কোণ বেছে নিয়েছে ঘরের। খাচ্ছিল। কলেজের মিটিং-এ চা বিস্কুট ছাড়া কিছু জোটেনি, পেট এখন চুঁই চুঁই। উল্লাসময় ঘরে একটু যেন অস্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করছিল সে। রিমলির জন্মদিনে এত ঘটা হয় না, এক বছরের জন্মদিনেও হয়নি। খুব ঘনিষ্ঠ পনেরো-বিশজন এসেছিল শুধু, সবই আত্মীয়। মেনুও সরল ছিল। লুচি মাংস মিষ্টি কেক পায়েস। ঋতুর বাপের বাড়ির পয়সাও বেশি, দেখনদারিও বেশি। ঋতু এখন কত দিন যে বাপের বাড়ির এই

উদাহরণটা দেবে।

নাম স্মরণ করতেই ঋতু। ঝমর ঝমর সামনে। হেসে হেসে কথা বলছে মালার মার সঙ্গে, টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছে অভিজিৎকে।

এক সময়ে টুক করে সরে এল। মুখের হাসিতে পর্দা টেনে দিয়ে বলল, —চটপট খেয়ে নাও। ফিরব।

—কেন, তাড়া কীসের ? অভিজিৎ বউকে পড়ার চেষ্টা করল, —রিমলির তো কাল স্কুল নেই।

—আমার শরীর ভাল লাগছে না। গা গুলোচ্ছে।

প্লেটে ফিশফ্রাইয়ের কণাটাও পড়ে নেই, অথচ গা গুলোচ্ছে ! অর্থাৎ অভিজিতের বিলম্বজনিত কারণেই ক্রোধের ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ঋতু।

অভিজিৎ মুচকি হাসল, —তোমার মাথা ধরা গা গুলোনো আমি সারিয়ে দিতে পারি। ওষুধ আছে।

ভ্রূপল্লবে কয়েকটা ভাঁজ বাড়ল ঋতুর।

অভিজিৎ হাসিটা ইঞ্চিখানেক চওড়া করল,— কসবা গিয়েছিলাম। জমিতে ওয়াল গাঁথা শুরু হয়েছে।

—ওমা তাই ! পলকে সমস্ত মেঘ সরে গিয়ে আকাশ ঝকঝকে, —তুমি কসবা থেকে আসছ ?

—না তো কি ডকে গিয়ে জাহাজ গুনছিলাম ! সেই কলেজ স্ট্রিট থেকে ছুটতে ছুটতে কসবা গেলাম, সেখান থেকে হাঁই হাঁই করে বাস বদলে বদলে এই বেহালা ... এই গরম... এই ভিড়... তার পরও তোমার এই মেজাজ...

—আহা রাগ করো কেন ? সবাই বলছিল বলেই না.. ঋতু আরেকটু কাছে এল, —কবে নাগাদ শুরু হচ্ছে ?

—তা ধরো আরও মাস দুই-আড়াই। এখন তো এপ্রিল... শুরু হতে হতে জুলাই। দেবেনদা তো কন্ট্রাক্টরের গায়ে এঁটুলির মতো সেঁটে আছে। তাগাদা দিয়ে দিয়ে প্ল্যান করানো, জমা দেওয়া, সব করাল। এখন করপোরেশান যে কদিন লাগায়।

কথা এগোল না। পল্লব ডাকছে ঋতুকে, —ছোড়দি, এই ছোড়দি, একটু এদিকে শুনে যা না।

—কী ?

—আয় না। মা ডাকছে তোকে।

কৌতূহল জমা রেখে চলে গেল ঋতু।

প্লেটে একটা আইসক্রিম তুলে নিয়ে সোফায় এসে বসল অভিজিৎ। রিমলির খাওয়া শেষ, আবার খেলা শুরু হয়েছে। খেলতে খেলতে মাঝে মাঝেই অভিজিৎকে একটু ছুঁয়ে যাচ্ছে রিমলি। বাবাকে সঙ্গ দিচ্ছে ! পাশেই পল্লবের বন্ধু—বন্ধুর স্ত্রীরা গোল হয়ে গল্প করছে, টুকরো টুকরো কথা কানে আসছিল অভিজিতের। ব্যাঙ্কে ওদের ব্রাঞ্চে কী একটা ফ্রড কেস ধরা পড়েছে, লাখ পনেরো টাকার, তাই নিয়ে গুলতানি চলছে জোর, সবাই মতামত জাহির করছে। দুজন বন্ধুর স্ত্রী অন্য কী একটা কথা নিয়ে খিলখিল হেসে উঠল।

ঋতুর জামাইবাবু আঙুল তুলে কী যেন ইশারা করছে, না বুঝেই হাত তুলল অভিজিৎ। দুলকি চালে এগিয়ে আসছে এবার। অভিজিৎ প্রমাদ গুনল। এমনিতে বরুণদা মানুষটা খারাপ নয়। দায়িত্বশীল, দরাজ হৃদয়। ছোট্ট একটা ফ্যাক্টরি চালায়, সেখানেও তার স্নেহপরায়ণ মালিক হিসাবে সুনাম আছে। লোকের বিপদে আপদে বুক দিয়ে করে, পাড়ায় ফি-বছর চারটে করে ব্লাড ডোনেশান ক্যাম্প চালায়। তবে মুখটা ভাল নয়, বড্ড বেশি আদিরসাত্মক কথার দিকে ঝোঁক।

চোস্ত-পাঞ্জাবি শোভিত চল্লিশোত্তর দশাসই বরুণ সোফায় বসে অভিজিতের কাঁধে থাবা রাখল, —তারপর ভায়া ? মান ভঞ্জন হল ?

অভিজিৎ স্থির হাসিটা ধরে রাখল।

বরুণ চোখ টিপল, —এর পর কী ? নৌকাবিলাস, না রতিবিলাস ?

এমন লোকের সঙ্গে কথা চালানো ভীষণ মুশকিল, অন্তত অভিজিতের পক্ষে।

অভিজিৎ ইতিউতি তাকাচ্ছে, বরুণ আবার বলল, —খুঁজছ ? সে তো ভায়া ভেতরে।

অভিজিৎ ঘাড় নাড়ল, —না না, আমি রিমলিকে দেখছিলাম।

—ও সব কথা পুরনো হয়ে গেছে ভাই। ট্রাই সামথিং নিউ।

—কী আর নতুন ট্রাই করব দাদা ? বিয়ের সাত বছর পরে সব কায়দাই পুরনো হয়ে যায়।

—প্রেমালাপ তো কমেনি হে ! ঠিক সুযোগ বুঝে কপোত-কপোতীতে গুজগুজ ফুসফুস... !

অভিজিৎ বলতে পারত, আমাদের প্রেমালাপ করাটা তো কিছু বিচিত্র নয় দাদা ! আমরা তো আপনাদের মতো বিয়ের আগে ছ' বছর ধরে হাত ধরাধরি, চাঁদ দেখাদেখি, ফুল ফোটাফুটি করিনি ! কিন্তু বলল না, কথাটা গিলে নিল। বরুণদাকে বেশি ঘাঁটানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অভিজিৎ ঋতুর সামনে বরুণদা যেন ইচ্ছে করেই বেশি প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে। হয়তো বা সম্পর্কের সুবাদেই। হয়তো বা শ্বশুরবাড়িতে অভিজিতের মুখচোরা স্বভাবের জন্য। অভিজিৎ জানে। আরও জানে এ বাড়িতে প্রেমের বিশেষ প্রাদুর্ভাব আছে। নীতুদির নিজের পছন্দের বিয়ে, পল্লবেরও তাই। শ্বশুরমশাইও বুক ফুলিয়ে বলেন তিনিও নাকি বিয়ের আগে শাশুড়িঠাকরুনের সঙ্গে চিঠি চালাচালি করতেন। ঋতুই শুধু এ বাড়ির ব্ল্যাকশিপ। তা সেও কি আর কলেজ টলেজে খুচখাচ মন বিনিময় করেনি ! করলে করেছে। সে তো অভিজিৎও জয়িতার সঙ্গে টানা দু বছর...

বরুণ এক প্রসঙ্গে বেশিক্ষণ থাকে না। সে মূলত কর্মী মানুষ। রঙ্গরস ছেড়ে ঝটিতি দরকারি কথায় এল, —তোমার ভাই তো এখন বিদ্যুৎভবনে আছে, না ?

অভিজিৎ ঘাড় নাড়ল।

—তোমার ভায়ের ওখানে হোল্ড কী রকম ?

—বছর আড়াই হল তো ঢুকেছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। ওর আর তেমন কি হোল্ড থাকবে। কেন বলুন তো ?

—একটা অর্ডার নিয়ে খুব ফেঁসে গেছি ভাই। ডেলিভারি কমপ্লিট, কিন্তু পেমেন্ট পাচ্ছি না। শালা গভর্নমেন্টের অর্ডার ধরাই ভুল হয়েছে। আমারও অবশ্য কিছু গলতি ছিল। প্রায় আট লাখ টাকার অর্ডার, লোভে পড়ে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে... তা সে সবও আমি রেকটিফাই করে দিয়েছি। ... তোমার ভাইকে একটু বলো না, কাকে ধরলে কাজ হবে তার হদিসটা যদি দিয়ে দেয়...

—সে তো আপনিই বলতে পারেন। অভিজিৎ হাসতে হাসতে বলল ।

—ছি ছি, তা কী করে হয় ! আমি হলাম গিয়ে তার দাদার কুটুম, সরাসরি তাকে রিকোয়েস্ট করতে পারি ? তুমি যদি... বোঝই তো স্মল ক্যাপিটালের ব্যবসা, পুঁজিতে টান পড়ে গেছে। এদিকে ব্যাঙ্ক লোন, লেবার পেমেন্ট, র-মেটিরিয়াল...

অভিজিৎ অস্পষ্ট ভাবে ঘাড় নাড়ল, —দেখছি।

—প্লিজ দ্যাখো, আই শ্যাল বি গ্রেটফুল। বরুণ উঠে পড়ল, —আমি কাল পরশু তোমাকে একবার রিং করব।

অভিজিৎ ভেতরে ভেতরে একটু চাপ অনুভব করছিল। ইন্দ্রর ওপর তার বিশেষ আস্থা নেই। আজকাল বড্ড ছাড়া ছাড়া হয়ে থাকে ইন্দ্র। নিজের ঘোরে, নিজেকে নিয়ে।

হয়তো চার বছর হোস্টেলে থাকার জন্যই এমনটা হয়েছে। কী করে, না করে, কিছুই বাড়িতে জানায় না। ঋতু বলছিল ইন্দ্র নাকি পাসপোর্টও করে ফেলেছে। বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে কি না কে জানে ! সে যা পারে করুক, অভিজিৎ একটা অনুরোধ করলে ইন্দ্র কি রাখবে না ! ইন্দ্র অবশ্য বড় বেশি নীতিবাগীশ। রিকোয়েস্ট, ফেভার, প্রভাব, এ সব শব্দ শুনলেই লেকচার ঝাড়ে। ঝপ করে 'না' বলে দিলে অভিজিতের মান থাকবে ?

নিমন্ত্রিতদের খাওয়া প্রায় শেষ, কেউ কেউ উঠব উঠব করছে, কেউ যাওয়ার মুখে। গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে বন্ধুদের এগিয়ে দিতে গেল পল্লব। ঋতু নীতুর চলাফেরায় ভীষণ ব্যস্তসমস্ত ভাব, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় তাদের আদৌ কোনও কাজ নেই। মালার বাপের বাড়ির লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন ঋতুর মা, মালা ছেলেকে দুধ খাওয়াতে ঘরে চলে গেল। রিমলিদের দঙ্গলও শ্রান্ত এতক্ষণে, বরুণের ছোট মেয়েটা তো সোফাতেই গড়িয়ে পড়েছে। বরুণ ডাকছে স্ত্রীকে, বাড়ি

যাওয়ার জন্য তাড়া লাগাচ্ছে। নীতু এসে বরের হাতে একটা কাঁধঝোলা ব্যাগ ধরিয়ে দিল।

বাথরুম ঘুরে শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে গেল অভিজিৎ। মানুষটি সম্পর্কে মুখে যাই বলুক, মনে মনে অভিজিৎ তাঁকে একটু শ্রদ্ধাই করে। হাসিখুশি রসিক মানুষটির মধ্যে কোথায় যেন একটা আলাদা ব্যক্তিত্বও আছে। প্রখর বুদ্ধিমান, মজবুত স্বাস্থ্য, তেষট্টি বছর বয়সেও শৈলেন সরকার যেন এক পাথরে কোঁদা গ্রিক ভাস্কর্য।

শৈলেনের হাত অভিজিতের পিঠে। মজলিশি ঢং-এ বললেন, —এ সব অনুষ্ঠানের প্রবলেম কী জানো অভিজিৎ ? আপনজনদের সঙ্গে মেলার জন্যই গ্যাদারিং, অথচ তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্পই করা হয় না। তা তুমি ভাল করে খেয়েছ তো ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। রান্নাবান্না খুব ভাল হয়েছিল।

—সব পল্টুর অ্যারেঞ্জমেন্ট। তোমার শ্যালকটি বাবা হয়ে সাবালক হয়ে গেছে।... তোমার বাবার শরীরটা শুনলাম ভাল নেই ? ঋতু বলছিল আবার নাকি কাশিটা বেড়েছে ?

—হুঁ, জ্বরও এসেছিল। অ্যান্টিবায়োটিক পড়ে এখন... সকালে দেখলাম জ্বরটা ছেড়েছে।

—বছর খানেক ধরে বড্ড ভুগছেন বেয়াইমশাই। মাঝে মাঝেই তো শুনি কাশি জ্বর...

—হ্যাঁ, হঠাৎ ভেঙে গেল শরীরটা। ঠাণ্ডা গরম কিছুই সহ্য হয় না।

—কিন্তু শরীর এত ভাঙার তো বয়স হয়নি অভিজিৎ। আমার হিসেব আছে, উনি আমার থেকে মাত্র তিন বছরের বড়।

হাসল অভিজিৎ, —আপনার কথা আলাদা।

—তুমি বরং আর পাড়ার ডাক্তার টাক্তার না করে বাবাকে ভাল একটা স্পেশালিস্ট দেখাও।

—দেখাব। ভাবছি এর মধ্যেই দেখাব।

—দেরি কোরো না। ডিলে মিনস ডেঞ্জার, এ কথা কিন্তু আমি খুব মেনে চলি। বাই দা বাই, তোমরা নাকি ফ্ল্যাট কিনছ ?

বাবার অসুখ থেকে দুম করে ফ্ল্যাটের কথা ওঠায় অভিজিৎ বেশ অসহজ বোধ করল। নির্ঘাৎ ঋতুর কাজ। একটা কথাও ঋতুর পেটে থাকে না। নিজের বাবা মাকেই সে এখনও খবরটা ভাঙেনি পুরোপুরি, ভাসা ভাসা বলেছে, আর ঋতু কিনা এ বাড়িতে এসে ঢাক পিটিয়ে দিল !

অভিজিৎ এড়ানোর স্বরে বলল, —কথা চলছে। এখনও ফাইনাল কিছু হয়নি।

—তবে যে শুনলাম তোমাদের জমি রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে !

ওফ্, এ তথ্যও সম্প্রচারিত ! সত্যি, ঋতুটা যে কী !

অভিজিৎ গলা খাঁকারি দিল, —হ্যাঁ, ওই জমিটুকুই যা...। কলেজের কয়েকজন কোঅপারেটিভ ফর্ম করল... আমাকেও বলল... সস্তায় জমি পাওয়া গেল...

—নিউ বালিগঞ্জে ?

—ওই আর কী। কসবাও বলতে পারেন।

শৈলেনের ভুরুতে ভাঁজ পড়েছে, —তা তোমাদের নিজেদের বাড়ি থাকতে ফ্ল্যাটের ইচ্ছে হল হঠাৎ ?

উত্তরটা অভিজিতের ঠোঁটে আছে। ঘাড় চুলকে বলল, —রিমলি তো এখন পাড়ার নার্সারিতে পড়ে, ওকে বালিগঞ্জের দিকে একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করা দরকার। গড়িয়া থেকে যাতায়াত করতে ওর স্ট্রেন হবে খুব। ঋতুরও।

—তাও তো বটে। শৈলেন চুপ করে গেলেন। চোখ ছোট করে কী যেন ভাবছেন। বললেন, —বেয়াই বেয়ান নিজেদের বাড়ি ছেড়ে ফ্ল্যাটে থাকতে রাজি হবেন ?

এই উত্তরটা অভিজিতের জানা নেই। এ প্রশ্ন তাকেও পীড়িত করে, কিন্তু সে নিরুপায়। সাংসারিক সুবিধে অসুবিধে, নিত্যদিনের চাহিদা, সন্তানের ভবিষ্যৎ, সবই তাকে মাথায় রাখতে হবে। এটাই সংসার গড়ার ন্যূনতম শর্ত। না মানলে অভিজিতের চলবে কেন ! মা বাবা কি তার সমস্যা বুঝবে না ? তারপর তারা যা ভাল মনে করবে তাই করবে।

সাফাই গাওয়ার অবশ্য প্রয়োজন হল না। ঋতু আর রিমলি আসছে। সঙ্গে ঋতুর মা। প্রতিমার

সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিদায় নিল অভিজিৎ।

রাত বেশি হয়নি। সবে পৌনে দশটা। সারা দিন তাপ ছড়িয়ে চৈত্রের পৃথিবী শীতল হয়েছে অনেক। মাঝে মাঝেই এলোমেলো একটা হাওয়া উঠছে। মিঠে হাওয়া, বসন্তের সুরভি মাখা।

অভিজিতের আজ কপাল ভাল, সখেরবাজার মোড়ে পৌঁছতেই ট্যাক্সি পেয়ে গেল। গড়িয়াতেই যাবে ট্যাক্সিটা, সেখানেই তার গ্যারাজ।

রাস্তায় এখনও বেশ ভিড়। তারাতলায় এসে ট্যাক্সি স্পিড নিল। বিকেল থেকে খুব ধকল গেছে, ট্যাক্সি চলতেই চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল অভিজিতের। রিমলি তো ঘুমিয়েই পড়েছে। ঋতুর চোখ জানলার বাইরে।

হঠাৎ ঋতু বলল, — এই, আমাদের ফ্ল্যাটটার সাইজ যেন কত গো ?

অভিজিৎ হাই তুলল, —সাতশো সত্তর।

—ছোট হয়ে যাবে না ?

—কেন ছোট হবে ? ফ্ল্যাটের প্ল্যান তো তুমি দেখেছ, মনে হয়েছে খুব ঘুপচি ? একটা আট বাই চার ব্যালকনি পর্যন্ত আছে। দুটো বাথরুম।

—সে ঠিক আছে। বরুণদা বলছিল নশো সাড়ে নশোর কমে নাকি ডিসেন্ট ফ্ল্যাট হয় না।

—বরুণদাকেও গল্প করা হয়ে গেছে ! চড়াং করে রাগটা ফিরে এল অভিজিতের, —আর কী, এবার কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও।

—আমি ফ্ল্যাটের কথা বরুণদাকে বলিনি।

—বাজে কথা। তুমি সব্বাইকে বলেছ। তোমার বাবা জানে, মা জানে...

—নয় জানলই। তাতে হয়েছেটা কী ? ঋতু তেড়েমেড়ে উঠল। ঘুমন্ত রিমলির চুল ধরে টেনে সোজা করে দিয়ে বলল, —কেন বলব না ? চুরি করে ফ্ল্যাট করছি ? না লোক ঠকিয়ে ? আমাদের কষ্টের টাকা দিয়ে আমাদের নিজেদের জন্য কিছু বানাতে পারি না ? ওই গড়িয়া খালের ধারেই জীবনটা কাটাতে হবে ?

এই চোটপাটগুলো অভিজিৎকে সমে ফিরিয়ে আনে। একটা সিগারেট ধরাল অভিজিৎ, আড়ে দেখল ঋতু আবার তাকিয়ে আছে উলটো পানে। রিমলি ঢুলে ঢুলে পড়ছে।

মেয়ের মাথা কোলে টেনে নিল অভিজিৎ। সত্যি সত্যি ঋতুর মানভঞ্জনে নামল। নিচু স্বরে প্রশ্ন করল, —গুবলুকে আজ কী দিলে ?

জবাব নেই।

অভিজিৎ ফের বলল, —খেলনা দিলে, না জামাকাপড় ?

—দিয়েছি কিছু একটা।

—কত পড়ল ?

—তিরিশ টাকা ফেরত আছে। বাড়ি গিয়ে নিয়ে নিয়ো।

অর্থাৎ চারশো সত্তর। অভিজিৎ মনে মনে হিসেব কষল। অনুর মেয়ের প্রথম জন্মদিনে তিনশো কুড়ি টাকা দিয়ে অভিজিৎ একটা ছোট্ট রোবট কিনেছিল, ঋতু বলেছিল অপচয়। দেড় বছরে সেই রোবটের দাম নিশ্চয়ই বেড়েছে, কিন্তু চারশো সত্তর হয়েছে কি ? এই নিয়ে প্রশ্ন সমীচীন নয়, বিস্ফোরণের আশঙ্কা আছে। ননদের মেয়ে আর ভায়ের ছেলে সমান নয়।

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো পার হল ট্যাক্সি। রাস্তাটা তত চওড়া নয়, এত রাতেও ট্যাক্সি টিকুর টিকুর এগোচ্ছে। মাঝে একটা ওষুধের দোকান দেখে অভিজিৎ দাঁড়াতে বলল।

ঋতু ভার মুখে বলল, —কী হল ?

—বড্ড অম্বল হয়ে গেছে, কটা জেলুসিল কিনে আনি। বিরিয়ানিতে যা ডালডা দিয়েছিল, বাপস।

—খেলে তো হাঁই হাঁই করে।

—সে তো খিদেয়। বলতে বলতে নামল অভিজিৎ, —তোমার কিছু লাগবে ?

—না। বরং বাবার জন্য একটা কাফ সিরাপ নিয়ো। দুপুরে দেখছিলাম তলানি হয়ে গেছে।

ওষুধ কিনে ফিরল অভিজিৎ। ট্যাক্সিতে বসে অ্যান্টাসিড চিবোচ্ছে।

ঋতু প্রশ্ন করল, —বাবা তোমাকে ফ্ল্যাট কেনা নিয়ে কী বলছিল ?

—ওওই, কেন কিনছ, তোমাদের তো বাড়ি আছে, এই সব।

—কী বললে ?

—যা সত্যি তাই বললাম। রিমলির স্কুল... তোমার অসুবিধে...

—একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কথা বলতে পারো না ? জানোই তো বাবা এ সব ফ্যামিলি ভাঙাভাঙি, শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে যাওয়া পছন্দ করে না। আমার সুবিধে অসুবিধের কথা বলার কী দরকার ছিল ?

—তো কী বলব ?

—বলতে পারতে আজ বাদে কাল ইন্দ্রর বিয়ে হবে, বাচ্চা কাচ্চা হবে, তিনটে মাত্র ঘরে সবাই মিলে গাদাগাদি করে থাকব কী করে !

পেটপাতলা হলে কী হবে, ব্রেন আছে ঋতুর ! ঘুম ঘুম ভাবটা ছেড়ে গেল অভিজিতের। যুক্তিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। এই গ্রাউন্ডটা বেশ জোরালো, এটাই তো লোকজনকে বলা যায় ! উঁহু, এতেও ফাঁক আছে। লোকজন আজকাল ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। বলে বসবে, দোতলাটা তুলে নিচ্ছ না কেন ? একতলা দোতলা মিলিয়েও হবে না, এত বড় ফ্যামিলি হবে তোমাদের !

গড়িয়া বাজারের পর আর এগোল না ট্যাক্সি, গজগজ করতে করতে নেমে পড়ল স্বামী-স্ত্রী। রিমলি ঘুমিয়ে কাদা, এখন আছাড় মারলেও চোখ খুলবে না। বাড়ি বেশি দূর নয়, বড় জোর শ' দুয়েক গজ, কিন্তু ওইটুকু রাস্তাই চার বছরের মেয়ে কাঁধে হাঁটা কি কম পরিশ্রম !

ঘামছিল অভিজিৎ। বাড়ির কাছাকাছি এসে হকচকিয়ে গেল। দরজায় সাধন ডাক্তারের গাড়ি !

দুই

—অতগুলো শাড়ি নিলে ?

—অত কোথায় ! মাত্র তো চারটে।

—আমিই তো ছটা গুনলাম।

—ভুল গুনেছ।

বলল অনসূয়া, স্যুটকেস গোছানো থামিয়ে ঘুরে তাকাল। ধীমান খাটে আধশোওয়া, মুখের সামনে একটা চটি বই। ইংরিজি। জাপানের গেইশাবৃত্তি আর ভারতীয় দেবদাসীপ্রথার ওপর তুলনামূলক আলোচনা। ধীমান বাংলা বই পড়ে না বিশেষ, গল্প উপন্যাস তো একেবারেই নয়, অফবিট্ প্রবন্ধ উলটোনোই তার শখ। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর এই সময়ে বইয়ের পাতায় খানিকক্ষণ চোখ না বোলালে তার ঘুম আসে না। নাকি বইয়ের পাতায় চোখ রাখলেই তার ঘুম আসে ! কোনটা যে ঠিক বিয়ের চার বছর পরেও নির্ভুলভাবে বুঝে উঠতে পারল না অনসূয়া।

মৃদু হাসি ফুটল অনসূয়ার ঠোঁটে— বইটা মিছিমিছি চোখের সামনে ধরে রেখেছ কেন ?

ধীমানের চোখ বই থেকে সরল না— স্যুটকেস ঘেঁটে দেখাব চারটের বেশি নিয়েছ কি না ?

—দুটো তো ঘরে পরার।

—ঘরে পরার জন্য যে তিন তিনটে নাইটি নিলে ?

—ও তো দার্জিলিং-এ পরব। তোমাদের বাড়ি গেলে নাইটি পরা যাবে ?

—তা ঠিক। কুচবিহারে তোমার সালোয়ার কামিজও চলবে না।

—বোঝই যদি তো কমেন্ট করছ কেন ?

— তা বলে অত ড্রেস ! মাত্র দু'হপ্তার ট্যুরে ! এর পর তো আবার শাল কার্ডিগান আছে !

ধীমানের স্বরে ঝাঁঝ নেই, সবটাই কৌতুক। অনসূয়া গোমড়া হতে গিয়েও হেসে ফেলল। সর্ব বিষয়ে ধীমানের বড় বেশি মেয়েলি কৌতূহল। মিসেস মুখার্জি তখন কী ফিসফিস করছিল গো ! অ্যাই অনু, আমাদের একতলার রথীনবাবুর মেয়েটা নাকি ডিভোর্সি ! তোমার ছোট ভাইয়ের ফিয়াসির দিদিটা এখনও বিয়ে করেনি ? সামনের ফ্ল্যাটের রুমা বাপের বাড়ি থেকে ফিরছে না কেন গো ? বাচ্চা

কাচ্চা হবে ? ... সব প্রশ্নই ধীমানের কাগজ পড়তে পড়তে, নয় গুরুগম্ভীর বইকে সাক্ষীগোপাল রেখে। কী যে বিদঘুটে অভ্যাস !

হাসতে হাসতেই অনসূয়া বলল, —আরও অনেক কিছু হিসেব থেকে বাদ পড়ে গেল মশাই। ঝিমলির জামাকাপড়ও এই স্যুটকেসেই ঢুকবে।

—আর আমার ?

আঙুলের ইশারায় মেঝেতে রাখা ট্রাভেল ব্যাগটা দেখিয়ে দিল অনসূয়া, আবার মনোনিবেশ করেছে গোছগাছে। মেয়ের ফ্রক সোয়েটার প্যান্ট ফুলপ্যান্ট মোজা টুপি পাট করে করে রাখল। আসন্ন পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে ঝিমলির জন্য একটা দারুণ সুন্দর নেভি ব্লু ঘাগরা কেনা হয়েছে, সেটাও পুরল সযত্নে। ধীমানকে একবার দেখল আড়চোখে, আলমারি খুলে বার করেছে ঢাকাই জামদানিখানা। পেস্তারং জমির ওপর ঘিয়ে ধানছড়া, অনসূয়ার ভীষণ প্রিয় শাড়ি। গত বছর সার্ক কনফারেন্স কভার করতে ধীমান ঢাকা গিয়েছিল, তখন আনা। শুধু এই একটা নয়, চার চারখানা শাড়ি এনেছিল ধীমান। অফিসের দুটো মেয়ে আনতে দিয়েছিল। সাংবাদিকদের কাস্টমস নাকি তেমন ঘাঁটায় না, আনতে অসুবিধেও হয়নি। সব থেকে সুন্দরটা অনসূয়া বেছে নিয়েছিল আগে, কিন্তু প্রায় পরাই হয়নি। সেই শুধু পুজোয় অষ্টমীর দিন একবার...

টুকুস করে জামদানিখানাও স্যুটকেসে চালান করে দিচ্ছিল অনসূয়া, ধীমানের শ্যেনচক্ষু এড়াতে পারল না। ধীমান এখন জটিল প্রবন্ধের বইয়ে মগ্ন, তার ইন্দ্রিয় এখন অনেক বেশি প্রখর। এখন সে চার তলায় স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হলেও দোতলা থেকে শুনতে পাবে।

ধীমানের মন্তব্য ভেসে এল— দার্জিলিংয়ের ম্যালে কি ঢাকাই জামদানি না পরলেই নয় ?

অনসূয়া মুখ টিপে হাসল,— তুমি কি চাও না তোমার বউকে লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখুক ?

—মনে রেখো, জামদানির ওপর কিন্তু শাল থাকবে।

হুঁহ্, শাল জড়ালে যেন জামদানির গ্ল্যামার কমে যায় ! ফুরফুরে মেজাজে ড্রেসিং টেবিল থেকে টুকটাক প্রসাধনী তুলতে শুরু করল অনসূয়া। ময়েশ্চারাইজার, কোল্ড ক্রিম, নাইটক্রিম, লিপস্টিক, লিপগ্লস..। কিছুই সে নিয়মিত মাখে না, তার অত ফ্যাশান ট্যাশান নেই, তবু সব নিয়ে যাবে। বেড়াতে বেরোনোর চিন্তাতেই বুকের মধ্যে দোল খাচ্ছে রঙিন প্রজাপতি। কত কাল পর যে আবার পাহাড় দেখবে অনসূয়া !

ধীমান আর অনসূয়া শেষ বেড়াতে বেরিয়েছিল বছর তিনেক আগে। নৈনিতাল আলমোড়া রানিক্ষেত কৌশানি। তখন ঝিমলি পেটে। তারপর আর দুজনে কোথাও বেরোনোই হয় না, বেরোনোই হয় না। মাঝে সংসারের ওপর দিয়ে কয়েকটা ঝড়ঝাপটাও গেছে। ছোটখাটো, তেমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়। তবে একটু এলোমেলো বাতাসও ছোট্ট নৌকোকে বেশ টালমাটাল করে দেয়। এক নামী দৈনিকে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছিল ধীমান, দুম করে কাগজখানা বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক দুম করেও নয়, অনেক দিন ধরেই আভাস পাচ্ছিল ধীমান, তবু আশা ছিল ডুবতে ডুবতেও হয়তো...। ধীমানের অনেক বন্ধুবান্ধবই এদিক ওদিক পালিয়ে যাচ্ছিল পুটপাট, ধীমান ভেবেছিল যদি কোনওক্রমে কাগজটা টিকে যায় তো এক লাফে অনেকটা উঠে যাবে সে। সোজা বঙ্গবার্তার চিফ করেসপন্ডেন্ট। তা তো হলই না, উলটে কাগজ বন্ধ হয়ে গিয়ে ভারী আতান্তরে পড়ে গেল ধীমান। সংবাদপত্র মহলে উঠতি নির্ভীক সাংবাদিক হিসেবে তার কিছুটা নাম ছড়িয়েছে বটে, বেশি দিন বেকার বসে থাকার সম্ভাবনাও নেই, কিন্তু কাগজটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন তার দর কষাকষির ক্ষমতাও অনেক কমে গেছে। অগত্যা কেঁচে গণ্ডুষ করো। আবার সাদামাটা রিপোর্টারি হয়ে এক মাঝারি দৈনিকে জীবন শুরু। আগের থেকে কম মাইনেয়। ঘরে সদ্যোজাত মেয়ে, জন্মের পর থেকে ঝিমলির শরীরস্বাস্থ্য মোটেই ভাল যেত না, আজ জ্বর, কাল পেটের গণ্ডগোল, বড় দুঃসময় গেছে ধীমান-অনসূয়ার।

এখন ছবিটা অনেক বদলে গেছে। মাত্র দু বছরেই ধীমান তরতরিয়ে উঠেছে অনেক, সে এখন দিনরাত পত্রিকার নামী রাজনৈতিক সংবাদদাতা। ওঠার জন্য ধীমান খেটেছেও খুব। আজ দিল্লি, কাল পাটনা, পরশু পুরুলিয়া। এই ঢাকা, তো এই কলম্বো। শুধু ছোটা, নিরন্তর ছোটা। মাঝে

কয়েকটা অন্তর্তদন্তমূলক রিপোর্টিং করে হইচই ফেলে দিয়েছিল কলকাতায়, চার-পাঁচজন মন্ত্রীকে তো কাঁপিয়ে দিয়েছিল রীতিমতো। ঝিমলিও এখন অনেক সুস্থ, আধিব্যাধি নেই, হাসছে, লাফাচ্ছে, ছুটছে। অনসূয়া-ধীমানের ছোট্ট নৌকো এখন মসৃণ মোটরলঞ্চ। এই তো তাদের বেড়াতে বেরোনোর সময়।

স্যুটকেসটা চেপে বন্ধ করে ধীমানের ট্রাভেল ব্যাগ নিয়ে পড়ল অনসূয়া। গোছাচ্ছে, টুকটাক কথা বলছে। দরকারি কথা, অদরকারি কথা, এলোমেলো কথা। সবই প্রায় সাংসারিক খুঁটিনাটি। দুধঅলাকে দুধ দিতে বারণ করা হয়েছে কি না, ধীমানের এক বেকার মাসতুতো ভাই রাতে এসে শোবে এই ফ্ল্যাটে, তাকে ডুপ্লিকেট চাবি দেওয়া হয়েছে কি না, ওষুধপত্র ঠিকঠাক নেওয়া হল কি না, এই সব।

কথায় কথায় অনসূয়া বলল— তোমার সেই ভদ্রলোক তো শিলিগুড়ি থেকে ফোন করলেন না ?

ঘুমন্ত ঝিমলির পাশে টান টান শুয়ে পড়েছে ধীমান। আড়মোড়া ভেঙে বলল, —কে, সুব্রতদা ? সে তো আমাকে অফিসে ফোন করেছিল। কাল বিকেলে এন জে পি-তে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে।

—আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভাল লাগছে না।

—কী ভাল লাগছে না ?

—এই বেড়াতে বেরিয়ে লোকের অবলিগেশানে থাকা।

—সুব্রতদার বাড়িতে আমি থোড়াই থাকব। আমরা হোটেলে উঠব।

—ফালতু আমরা হোটেলে উঠবই বা কেন ? ডাইরেক্ট দার্জিলিং চলে যেতে পারি।

—পারি। আবার পারিও না।

—বুঝলাম না।

—তোমায় বুঝতে হবে না। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখো। ঠিক সাড়ে চারটেয়।

অনসূয়া ঈষৎ আহত হল। ধীমানের এই পাশ কাটানো কথাবার্তাগুলো তার একদম পছন্দ নয়। সুব্রত ঘোষাল উত্তরবঙ্গের এক রাজনৈতিক চাঁই, ধীমানের দীর্ঘকালের পরিচিতও বটে, তার রাজনৈতিক উত্থান আর শত্রুনিপাতের পিছনে ধীমানের যথেষ্ট অবদান আছে, এ সবই অনসূয়ার জানা। কিন্তু বেড়াতে বেরিয়ে এই সমস্ত লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, এদেরই ব্যবস্থায় গাড়ি করে এখান সেখানে ভ্রমণ— অনসূয়ার নীতিবিগর্হিত মনে হয়। তারা কি কটা দিন নিজের পয়সায় ঘোরাফেরা করতে পারে না ? নাকি তাদের জিপে চড়ার পয়সা নেই ? তবে এ সব কথা বলবেই বা কে ? শুনবেই বা কে ? নিজের কাজের জগৎ নিয়ে অনসূয়ার সঙ্গে এক মুহূর্তও আলোচনা করতে চায় না ধীমান। পাত্তাই দিতে চায় না অনসূয়াকে। এটাও ধীমানের এক ধরনের স্বভাব।

অনসূয়া উঠে রান্নাঘরে এল। অল্প কয়েকটা এঁটো বাসন পড়ে আছে সিঙ্কে, কাল অত সকালে নির্মলা কাজে আসবে না, নিজেই মেজে নিল বাসনগুলো, গুছিয়ে রাখল র‍্যাকে। স্বপন কাল রাত থেকে থাকবে এখানে, সে ভীষণ চায়ের পোকা, কোথায় কী হাঁটকে মাটকে খুঁজে মরবে, চা চিনির কৌটো দুটো গ্যাস স্টোভের পাশে সাজিয়ে রাখল ভাল করে। আলগা মুছছে স্টোভটা।

ফোন বাজছে। এখন সবে সওয়া এগারোটা, এ সময়ে এ বাড়িতে ফোন আসা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

ধীমান ফোনটা ধরে কি না দেখার জন্য অনসূয়া কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল। উঠেছে ধীমান। কথা বলছে।

আবার কাজে মন দিল অনসূয়া। তখনই ড্রয়িং স্পেস থেকে ধীমানের ডাক শুনতে পেল, —অনু শুনছ ? এদিকে এসো। অভিদার ফোন।

বিস্মিত মুখে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল অনসূয়া। দাদা বড় নিয়মে চলা মানুষ, এত রাতে তো দাদার ফোন আসে না ! ড্রয়িংস্পেসে এসে দেখল ধীমান হাত দিয়ে চেপে রেখেছে রিসিভারের মুখ, কপালে কয়েকটা আলগা ভাঁজ।

অনসূয়া উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল, —কী হয়েছে ?

—তোমার বাবার আজ কাশতে কাশতে গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে।

—সেকী ! কখন ?

—এই তো সন্ধেবেলা। তুমি কথা বলো অভিদার সঙ্গে।

অনসূয়ার মুখ পলকে বিবর্ণ। কদিন ধরেই কাশি জ্বরে ভুগছে বাবা, কাল পরশু যাব যাব করেও যাওয়া হয়ে উঠল না। আজ এই সংবাদ !

ওপার থেকে দাদার গলা শুনতে পেল অনসূয়া, —হ্যালো অনু, শোন ! ব্যাপারটা একটু সিরিয়াস হয়েছে, বুঝলি।

বাবার কিছু হয়েছে শুনলেই অনসূয়ার বুকটা ধড়াস ধড়াস করে ওঠে। এমন কিছু বয়স হয়নি বাবার, মাত্র ছেষট্টি, তবু কেন যেন ইদানীং মনে হয় বাবা আর বেশি দিন নেই। মনশ্চক্ষে বাবার শীর্ণ মুখ, কোটরগত চোখ, ভাঙা দু গাল দেখতে পাচ্ছিল অনসূয়া।

কাঁপা কাঁপা গলায় অনসূয়া একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেলল, —কখন হয়েছে ? কী হয়েছে ? কতটা রক্ত পড়েছে ?

—নার্ভাস্ হোস না, শোন, অনু। অ্যারাউন্ড সাড়ে সাতটায় বাবা খুব কাশছিল, বেসিনে গিয়ে বোধহয় কফ তোলার চেষ্টা করছিল, সেই সময়েই... । মা তো দেখে ঘাবড়ে মাবড়ে...

—ডাক্তার এসছিল ?

—এই তো একটু আগে গেল। ...সাধন ডাক্তার। ইন্দ্র বাড়ি ফিরে ডেকে এনেছিল।

—তোমরা কোথায় ছিলে ?

—আমাদের সেই নেমন্তন্ন ছিল না ! তোর বউদির ভাইপোর জন্মদিন...

—ও, হ্যাঁ। ডাক্তার কী বলল ?

—উনি তো বলছেন তেমন সিরিয়াস কিছু নয়। প্রোলঙড কাশি থেকে অনেক সময়ে গলার মেমব্রেন ছিঁড়ে যায়। তার থেকেই... । বাবার প্রেশার টেশার নরমালই আছে। টেম্পারেচারও খুব বেশি নেই, বড় জোর একশো।

—ওষুধ দিয়েছেন ডাক্তারবাবু ?

—নতুন কিছু তো দিলেন না। ওই অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্সটাই শেষ করতে বললেন। ... কাল সকালে একটা চেস্ট এক্সরেও করে নিতে বলেছেন।

—করাচ্ছিস ?

—সে তো করাবই। কিন্তু...

—কিন্তু কী ?

—একটা অন্য কথা ভাবছিলাম রে অনু। এই সাধন ডাক্তার তো অনেক দিন হল। প্রতিবারই গাদা গাদা অ্যান্টিবায়োটিক দেয়, গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা খরচা হয়, সাময়িক সারে, আবার যে কে সেই।

—তো কী করবি ?

—ভাবছিলাম চেস্ট স্পেশালিস্ট কাউকে দেখিয়ে নিই। ইনফ্যাক্ট সেই চিন্তা করেই তোদের ফোন করা। আমার একজন নামকরা চেস্ট স্পেশালিস্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে। ... নরেন দাশগুপ্ত। নাম শুনেছিস বোধহয় !

—হুঁ।

—প্রবলেম হল উনি ডেট দিয়েছেন জুনের ফার্স্ট উইকে। আমি ভাবছিলাম তার আগেই কাউকে যদি দেখিয়ে নেওয়া যায়... ধীমানের তো অনেক চেনাজানা আছে, ও যদি কারুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি একটা... তোরা কাল ভোরে বেরিয়ে যাচ্ছিস বলেই এত রাত্তিরে তোদের...

—এক সেকেন্ড। কথা বলছি। কান থেকে রিসিভার সরিয়ে ধীমানের দিকে তাকাল অনসূয়া, —দাদা জিজ্ঞেস করছে তোমার কেউ চেনা চেস্ট স্পেশালিস্ট আছে ? এক্ষুনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিতে পারবে ?

ধীমান সোফায় বসে সিগারেট ধরিয়েছে। অ্যাশট্রেতে ছাই ঝেড়ে বলল, —এখনই ?

—বাবাকে তো ইমিডিয়েটলি দেখানো দরকার।

—এক্ষুনি আমি স্পেশালিস্ট কোথায় পাব ? ঘণ্টা দুয়েক আগে ফোন করলেও নয় স্মরণ

ব্যানার্জিকে একটা...

—এখন তাকে ধরা যায় না ? ডাক্তারদের তো পেজার থাকে, যদি একটা পেজ টেজ করে দাও...

—বললেই হয় নাকি ! তোমাদের একেবারে ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে ! ধীমানের স্বরে বিরক্তি, —অভিদা নয় ছিল না, ইন্দ্র তো আমায় রিং করতে পারত ।

ক্ষুব্ধ মুখে ধীমানকে কয়েক পলক দেখে নিয়ে আবার কানে ফোন আনল অনসূয়া । গলা যথাসম্ভব কোমল করে বলল, — এত রাত্তিরে ও কাকে ফোন করবে রে দাদা ?

—ও । ঠিক আছে, দেখি কী করা যায় । অভিজিতের গলাও শান্ত হয়েছে অনেকটা, —চিন্তা করিস না, তোরা ভাল করে বেড়িয়ে আয় । ঠাণ্ডায় যাচ্ছিস, ঝিমলিটাকে সাবধানে রাখিস ।

টেলিফোন রেখে একটুক্ষণ পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল অনসূয়া । দাদা কি ধীমানের সঙ্গে তার কথোপকথন শুনতে পেয়ে গিয়েছিল ? হঠাৎ তবে কথাটা ঘুরিয়ে নিল কেন ? টেলিফোন যন্ত্রটাও হয়েছে মহা হতচ্ছাড়া, মানুষের স্বরটুকু শুধু শোনা যায়, মনের ভাব বোঝা যায় না ।

এই মুহূর্তে কী করছে বাবা ? ঘুমিয়ে পড়েছে, নাকি কাশির দমকে কষ্ট পাচ্ছে ? টান উঠছে কি ? কথাটা জিজ্ঞাসা করা হল না । মা কি উতলা হয়ে পড়েছে খুব ? মা অবশ্য তেমন নয়, অনেক শক্ত মনের মানুষ । শৈশব থেকে তারা তিন ভাই বোন দেখে আসছে কত তুচ্ছ কারণে ব্যাকুল হয়ে পড়ে বাবা, তুলনায় মা অনেক স্থির, অচঞ্চল । ছোটবেলায়, তখন তারা মুদিয়ালির বাড়িতে ভাড়া থাকত, রাস্তায় ক্রিকেট খেলতে গিয়ে নাক ফাটিয়ে এল দাদা । হাউমাউ করছে বাবা, ডাক্তারখানায় নিয়ে গেল মা । অনেকদিন আগে, ইন্দ্র তখন বছর পাঁচেকের, বাড়ির সবাইকে নিয়ে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে মান্না আরতির গান শুনতে গিয়েছিল বাবা । দ্যাখ না দ্যাখ ইন্দ্র হঠাৎ কোথায় নিপাত্তা, গোটা মেলায় উদভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে বাবা, মা'ই শান্ত মাথায় মেলা কমিটির অফিসে গিয়ে মাইকে ঘোষণা করার ব্যবস্থা করল । চিরকালই বাবা এরকম । ছেলেমেয়েদের অসুখ বিসুখ নিয়ে, লেখাপড়া নিয়ে সদাসর্বদা ছটফট করছে বাবা, আর মা নিঃশব্দে কাজের কাজটি করে যাচ্ছে । গড়িয়ার বাড়িটা করার সময়েও কি কম টেনশনে ভুগত বাবা ! মিস্ত্রি মজুর খাটানো নিয়ে দুশ্চিন্তা, টাকার চিন্তায় ঘুম নেই, জলছাদ হয়ে গেল অথচ জল ঢালা হচ্ছে না... । মা পাশে না থাকলে বাড়িটা কি শেষ হত !

অনসূয়ার বিয়েটাই কি সুষ্ঠু ভাবে হত, মা ঠাণ্ডা মাথার না হলে !

বিয়ের সাতদিন আগে বাড়িতে উড়ো চিঠি, ধীমান বসুমল্লিক নাকি বিবাহিত ! বউ বাচ্চা আছে ! পড়েই বাবার মাথা খারাপ, বিয়ে ভাঙতে তখনই কুচবিহারে ছুটে যায় আর কী । মা ধমকে ধামকে থামাল, ফোন করে অফিস থেকে ডাকল ধীমানকে । চিঠি দেখে ধীমান হেসে খুন, এ তো আমার ছোট কাকিমার হাতের লেখা ! বোনের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করেছিল, মেয়েটিকে ধীমানের পছন্দ হয়নি, তাই আক্রোশ ফলাচ্ছে ! মা বিশ্বাস করেছিল ধীমানকে, চিঠিটা কুচিয়ে ফেলে দিয়েছিল । আজ অনসূয়া টের পায় ধীমান সম্পর্কে আশঙ্কাটা কত অমূলক ছিল । ভাগ্যিস মা সেই সময়ে... !

সেই মা বাবার পাশে আছে, এটাই একটা বড় ভরসা । ইস, এই সময়েই অনসূয়ার বেড়ানোর প্রোগ্রাম হল !

দিনভর গরমের পর একটু একটু দখিনা বাতাস বইছে এখন । ব্যালকনির দরজা খোলা, মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ হাওয়া আসছে ভেতরে, পাখার হাওয়ায় মিশে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে হাওয়াটা । রাত নিঝুম হয়ে এল ।

সিগারেট শেষ করে ধীমান বলল, —অমনি রাগ হয়ে গেল তো ?

বিমর্ষ মুখে উলটো দিকের সোফায় বসে পড়েছিল অনসূয়া । মাথা না তুলেই বলল, — রাগের কী আছে ! আমার বাবা তো তোমার বাবা নয় যে ছানি হয়েছে শুনেই দৌড়ে গিয়ে কুচবিহার থেকে কলকাতায় নিয়ে আসবে !

—এই দ্যাখো ! ধীমান হেসে ফেলল, —আমি কি কিছু করব না বলেছি ?

—থাক, তোমায় কিচ্ছু করতে হবে না । আমার ভাই দাদার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, তারা ঠিক ব্যবস্থা করে নিতে পারবে ।

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা, কাল শিলিগুড়ি পৌঁছেই হোটেল থেকে স্মরণ ব্যানার্জিকে ফোন করব, তা

হলে হবে তো ?

অনসূয়া কোনও উত্তর করল না। এ সময়ে চুপ থাকাই শ্রেয়, ধীমান চাপে থাকবে তা হলে।

বাথরুম থেকে ফিরে অনসূয়া দেখল শুয়ে পড়েছে ধীমান। হাত চোখে আড়াআড়ি, অর্থাৎ ঘুমোয়নি। টিউব নিবিয়ে নাইটল্যাম্প জ্বেলে দিল অনসূয়া, ব্যাগ স্যুটকেস দেওয়ালের দিকে ঠেলে সরিয়ে বিছানায় এল। ঝিমলি সাধারণত জানলার ধারে শোয়, মাঝে অনসূয়া, ধারে ধীমান। আজ ঝিমলি বাবার কোল ঘেঁষে ঘুমোচ্ছে। মেয়েকে সরাল না অনসূয়া, নিজেই জানলার পাশে শুয়েছে। হাঁটু মুড়ে।

ধীমান গলা ঝাড়ল, —টেনশান কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার তো বলে গেছে তেমন সিরিয়াস কিছু নয়।

অনসূয়া চুপ।

—ঘুমোনোর চেষ্টা করো। কাল আর্লি মর্নিংয়ে উঠতে হবে। লং জার্নি।

অনসূয়া চুপ।

ধীমান পাশ ফিরল। মেয়েকে টপকে আলতো হাত ছোঁয়াল অনসূয়ার মাথায়, দু-চার সেকেন্ড পর সরিয়ে নিল হাতটা। লঘু স্বরে বলল, —অভিদার শালার ছেলের এক বছর হয়ে গেল ?

সংক্ষিপ্ততম শব্দ করল অনসূয়া, —হুঁ।

—শালার বিয়ে কবছর হয়েছে ?

—জুলাইতে দু বছর হবে।

—তার মানে ফুলশয্যার রাত থেকেই... ধীমান খুক খুক হাসল। নীলাভ আলোয় হাসিটা জঙ্গলের শেয়ালের মতো শোনাল। একটু চুপ থেকে বলল, —নাকি বিয়ের আগেই... ? মেয়েটার সঙ্গে তোমার দাদার শালাবাবুর আগে থেকেই ইকড়ি মিকড়ি ছিল না ?

—যত্ত সব বাজে কথা। ঘুমোও।

অনসূয়া জানলার দিকে মুখ করল। খোলা জানলার পর্দা সরানো, বাইরে এক ফালি আকাশ দেখা যায়। দু-চারটে ঘাসফুল ফুটে আছে আকাশে। ওপর পানে বিচ্ছুরিত হচ্ছে রাস্তার নিওন বাতি, আলোর আভা ব্যেপে আছে শূন্যে। তারাফোটা গাঢ় নীল ওই আকাশে এই আলো পৌঁছবে না কোনওদিন, তবু যেন ছুঁয়েছে বলে ভ্রম হয়। তাকিয়ে তাকিয়ে আলো ছায়ার বিভ্রম দেখছিল অনসূয়া, কখন যেন জড়িয়ে এল চোখ।

ঘুম ভাঙল অ্যালার্মের শব্দে। চমকে জেগে উঠে রান্নাঘরে ছুটল অনসূয়া, চায়ের জল চড়িয়ে ওঠাল ঝিমলিকে, ধীমানকেও ঠেলে তুলল। ঝিমলির জীবনে এই প্রথম ভ্রমণ, ঘুম থেকে উঠেই সে খুশিতে গঙ্গাফড়িং। তাকে তৈরি করে নিজেরাও যখন প্রস্তুত, ঘড়িতে তখন পাঁচটা কুড়ি।

ধীমান ট্যাক্সি ডাকতে গেছে। সন্তোষপুরের এই ফ্ল্যাটে মাস আষ্টেক আগে ভাড়া এসেছে অনসূয়ারা, এখান থেকে বড় রাস্তা বেশ কিছুটা দূর, সময় লাগবে ধীমানের। একটু একটু অস্থির বোধ করছিল অনসূয়া। ছটা পঁচিশে শেয়ালদা থেকে ট্রেন, খানিকটা আগে না পৌঁছলে কোচ সিট খুঁজে পেতে হুড়দুম লেগে যাবে। কেন যে সন্ধের ট্রেনের টিকিট কাটল না ধীমান ! দিব্যি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়া যেত !

তখনই রাতের ফোনের কথাটা মনে পড়ে গেল। ছিঃ, যাওয়ার উচ্ছ্বাসে বাবার অসুখের কথাটা ভুলতে বসেছিল সে ! ঝটিতি ফোনের বোতাম টিপল অনসূয়া। ও প্রান্তে মা। দাদা বউদি ইন্দ্ররা কেউ ওঠেনি নিশ্চয়ই।

—হ্যালো, কে অনু ? তোরা এখনও বেরোসনি ?

—এই বেরোব। ... বাবা এখন কেমন আছে মা ?

ও প্রান্ত কয়েক সেকেন্ডের জন্য নীরব। এক নৈঃশব্দ্য বাতাস হয়ে বাজছে কানে। তারপর কথা ফুটেছে, —ভোরবেলা রক্ত পড়েছে রে আবার !

—আবার ! অনসূয়া প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

—হ্যাঁরে। তাজা রক্ত নয়, কেমন শুকনো শুকনো। কল্যাণীর স্বর নিস্তেজ, —কালচে মতন।

দেখে মনে হয় অনেক দিন ধরে জমাট বেঁধে আছে বুকে।

—দাদাকে ডেকেছ ? বলেছ ?

—বলব। ওরা কাল অনেক রাতে শুয়েছে...

—কিছু একটা করো মা। বাবা...। অনসূয়ার স্বর বুজে এল।

ট্যাক্সি এসে গেছে, হাত ধরে টানছে ঝিমলি। ধীমান ব্যস্ত মুখে ব্যাগ স্যুটকেস নিতে দৌড়ে এল। হাঁপাচ্ছে।

অনসূয়া ফোন ছেড়ে দিল।

তিন

একটু আগে প্রবল এক কালবৈশাখী বয়ে গেল শহরে। দিব্যি দিনভর নির্মেঘ ছিল আকাশ, প্রখর তাপে নিয়ম মাফিক হাঁসফাঁস করছিল নগরবাসী, হঠাৎ শেষ বিকেলে কুচকুচে কালো মেঘ দখল নিল আকাশের। ঘন ঘন বিদ্যুতের টংকার, চিরে ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে নভোমণ্ডল, সঙ্গে কান ফাটানো বজ্রপাত আর মুষল ধারায় বৃষ্টি। ইয়া ইয়া ফোঁটা ঝরছে, মাটি ভেদ করে জলকণারা ঢুকে যাচ্ছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে। হাওয়ার গর্জন কী ! শোঁ শোঁ, গোঁ গোঁ ! শহরের বুকে টিকে থাকা বৃক্ষরাজি আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে বাতাসে, নতজানু হয়ে প্রাণ ভিক্ষা করছে বুনো ঝড়ের কাছে। এমন ঝড়বৃষ্টিতে ঝমঝম বারিধারার কোনও সুললিত সংগীত নেই, বরং এর সঙ্গে যেন রণক্ষেত্রেরই মিল বেশি। মড়মড় শব্দ করে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কোণের কৃষ্ণচূড়া গাছটা ভেঙে পড়ল, দেখতে দেখতে ধর্মতলা স্ট্রিট জলে জলময়।

বিরক্ত মুখে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল ইন্দ্রজিৎ। বৃষ্টি থেমে গেছে পাক্কা বাইশ মিনিট, এখনও ডাক্তারের পাত্তা নেই। ছটায় এই ওয়েলিংটনের চেম্বারে আসার কথা, ছটা তেতাল্লিশ হয়ে গেল ! কোনও মানে হয় ! দময়ন্তী নির্ঘাত অভিমান করবে, নন্দনের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে গাল ফুলিয়ে ফিরে যাবে বাড়িতে। ডাক্তারের ঝঞ্ঝাটটা হুট করে এমন চেপে বসল ইন্দ্রজিতের ঘাড়ে ! দময়ন্তীও তেমনি, আজই সাতসকালে ইউনিভার্সিটিতে না ছুটলে চলছিল না ! খবর দেবে কী করে ইন্দ্রজিৎ, সে কি উড়তে জানে ! জানলেও, কি এই ঝড়বাদলে সাড়ে ছটার মধ্যে নন্দনে উড়ে যেতে পারত।

সুদেব বক্সির চেম্বারে থিকথিকে ভিড়। চেম্বারটা ছোট্ট। বাইরের ফালি জায়গাটুকুতে মুখোমুখি দুটো মাত্র সোফা, সেখানে মিউজিকাল চেয়ার খেলছে পনেরো-ষোলো জন নারী পুরুষ, বিজিতবা দরজার সামনে চাক বেঁধে আছে, ওত পাতা শিকারির মতো তাকাচ্ছে সোফার দিকে। ক্লাইভের আমলের বাড়ি, প্রাচীন দেওয়াল দরজা, মাথার ওপর প্রাগৈতিহাসিক চার ব্লেডের ফ্যান ঘুরছে ধীর লয়ে। হাওয়া অত্যন্ত অপ্রতুল, বাইরের চকিত শীতলতার কণামাত্র অস্তিত্ব নেই এখানে, লোকজন ঘামছে দরদর। এমন একটা ঘুপচি চেম্বারে কী করে যে অত নামী স্পেশালিস্ট বসে ! সুস্থ মানুষও এখানে এলে শ্বাসকষ্টে ভুগবে, বেরোলেই বুকের ভার অনেক হালকা হয়ে যাবে, এটাই কী এরকম একটা চেম্বার করার মটো !

দরজা থেকে সরে এল ইন্দ্রজিৎ। একটা লোক মনের সুখে সিগারেট ধরিয়েছে, ধোঁয়ায় গা গুলিয়ে ওঠে। এই সিগারেটখেকো লোকগুলো কেন যে চেস্ট স্পেশালিস্টের কাছে আসে ! বাবাও এখনও নেশাটা ছাড়তে পারল না। ভুগছেও তেমনি।

চেম্বার আর বড রাস্তার মাঝে প্রশস্ত গলি। পার হয়ে গেটের সামনে এল ইন্দ্রজিৎ। সামনে সারবন্দি ট্রাম দৃষ্টি আগলে আছে, স্টিমারের মতো জল কেটে এগোচ্ছে বাস গাড়ি, ছলাৎ ছল ঢেউ আছড়ে পড়ছে বিল্ডিংয়ের প্রবেশপথে। ইন্দ্রজিৎ মনে মনে একটু শঙ্কিত হল, এই জল ভেঙে ডাক্তার আদৌ আসবে তো ?

—ডাক্তারবাবু আসবেন তো ?

হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনে ভীষণ চমকে গেল ইন্দ্রজিৎ। নিজেই কি বলল কথাটা ! ঘাড় ঘুরিয়ে

তাকাল এদিক ওদিক। আশ্বস্ত হল, প্রশ্নচিহ্ন মুখে নিয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক মাঝবয়সি লোক। রোগাসোগা, হাটুরে ধরনের। বিশেষত্বহীন।

ইন্দ্রজিৎ মুখ ঘুরিয়ে নিল। এই সব শতসহস্র মানুষ পোকার সঙ্গে কথা বলতে তার প্রবৃত্তি হয় না। কেমন যেন মরা মাছের মতো দৃষ্টি এদের, কোনওক্রমে কায়ক্লেশে জীবনটাকে পার করে দেওয়াই এদের চরম মোক্ষলাভ, এখনই ওয়েদারের কথা শুরু করবে লোকটা, নয়তো অসুখ বিসুখ। দুটোই সমান বোরিং।

সামনের ফুটপাথ ঘেঁষে এক তরুণী আসছে। জলে পা ফেলে ফেলে। সাবধানে। ভারী লীলায়িত ভঙ্গিমায় হাঁটছে মেয়েটি, ফিগারটাও এ ওয়ান। উঠতে উঠতে তার শাড়ি হাঁটু পার। নিটোল পা অনেকটাই দৃশ্যমান, প্রায় উরু পর্যন্ত। দময়ন্তী থাকলে নির্ঘাত পেটে চিমটি কাটত, কী অসভ্যর মতো হাঁ করে দেখছ! জীবনে বুঝি কখনও মেয়েদের থাই দেখোনি!

—আচ্ছা, ডাক্তারবাবু কি অন্য কোনও চেম্বার সেরে এখানে আসেন?

আবার সেই লোকটা। গভীর অনিচ্ছায় ইন্দ্রজিৎ তাকাল, —আমি কী করে বলব?

—আপনার কি নিউ কেস?

—হ্যাঁ।

—পেশেন্ট কোথায়, ভেতরে?

ঈষৎ পুলকিত হল ইন্দ্রজিৎ। লোকটা যে তাকে রোগী ভাবেনি, এতেই বোঝা যায় তার স্বাস্থ্য ঝকঝকে। ঠোঁটের কোণ দিয়ে উত্তর দিল, —না। আমি রিপোর্ট দেখাব।

—ও। ইন্দ্রজিতের হাতের প্রকাণ্ড খামটার দিকে টেরিয়ে তাকাল লোকটা, —আপনার তা হলে চিন্তা নেই, ডাক্তারবাবু এলেই কাজ হয়ে যাবে। আমাদের যে কখন ডাক পড়ে!

ইন্দ্রজিতের মুখ আবার রাস্তার দিকে। মেয়েটা ভোজবাজির মতো উবে গেছে! আশপাশের কোনও গলিতে ঢুকে পড়ল নাকি! একটু ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করল ইন্দ্রজিৎ। নেই। দাঁত কিড়মিড় করতে করতে কটমটিয়ে লোকটার দিকে তাকাল আবার।

লোকটা কিছুই বোঝেনি। চিন্তান্বিত স্বরে বলে চলেছে, —ভেবেছিলাম আটটার লালগোলাটা পেয়ে যাব। একটার মধ্যে তা হলে বাড়ি পৌঁছে যেতাম। এ যা হাল দেখছি রাত বারোটার গাড়ি ছাড়া আশা নেই।

—আমি কী করব! ইন্দ্রজিৎ সামান্য খিচিয়ে উঠল এবার, —ওই তো ডাক্তারের চামচাটা বসে আছে, ওকে বলুন না।

ঘাবড়ে গিয়ে সরে গেল রোগাসোগা লোকটা। কাঁধ ঝাঁকাল ইন্দ্রজিৎ। নতুন করে পথে মনোযোগী হওয়ার আগেই দুই নিশ্চল ট্রামের ফাঁকে দাঁড়িয়েছে এক অলীক জলযান। সম্ভবত চার চাকার। দেখা যায় না চাকাগুলো, ডুবে আছে জলে। দরজা খুলে নামলেন ভারী চেহারার এক বয়স্ক মানুষ। যেন শূন্যে হাঁটছেন এমন ভঙ্গিতে রোগীদের জটলা পার হয়ে গেলেন। ড্রাইভার ব্রিফকেস আর ফ্লাস্ক হাতে ছুটেছে তার পিছন পিছন। পলকে রোগীরা অতিকায় মৌচাক রচনা করেছে চেম্বারের মুখে। ডাক্তারের চামচা চকিতে তটস্থ, ভিড় সরাচ্ছে।

যাক, ঝামেলা এবার চুকবে তা হলে। ইন্দ্রজিৎ স্বস্তির শ্বাস ফেলল। দাদার ওপর জমে থাকা ক্ষোভ একটু যেন প্রশমিত হল এতক্ষণে। কী এক পাড়ার ক্লিনিক থেকে এক্সরে করিয়েছিল, পরশু বাবাকে নিয়ে দেখাতে এসে খুব ঝাড় খেয়েছে সুদেব বক্সির কাছে। এক্সরেতে ওঠেইনি কিছু। গোটা প্লেট জুড়ে শুধু শ্যাডো আর শ্যাডো! অগত্যা আবার কাল বাবাকে নিয়ে নামী এক এক্সরে ক্লিনিকে ছুটেছিল দাদা, সেই প্লেট আজ দেখবে ডাক্তার। কাজটায় তাকে ভিড়িয়ে দিয়ে নির্ভাবনায় হাত ধুয়ে ফেলল দাদা। কী, না তার ছাত্ররা আসবে পড়তে। পরশুও নাকি তারা এসেছিল, ফিরে গেছে। টিউশনি করে করে দাদাটা ক্রমশ ছাত্রছাত্রীদের চাকর বনে গেল! না বনে উপায়ই বা কী! যার কাছ থেকে যা পারছে দুইয়ে নিচ্ছে, চারশো পাঁচশো, সাতশো, তারাই বা ছাড়বে কেন! বউদি বলছিল দুটো অবাঙালি মুরগিকে নাকি ভাল জবাই করছে দাদা। সপ্তাহে দু দিন, পার হেড হাজার। শালা ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়ে ইকনমিকস পড়লেই হত।

রিপোর্ট দেখানো চলছে। একজন একজন করে ঢুকছে ভেতরে, বেরোচ্ছে, কেউ ম্রিয়মাণ, কেউ খুশি খুশি, কেউ ভাবলেশহীন।

ইন্দ্রজিতের ডাক পড়ল সাতটা তেত্রিশে। চেম্বারে ঢুকতেই গুমোট কেটে নরম ছোঁয়া। নিজের জন্য অত্যুত্তম টেবিল ফ্যান বসিয়েছেন ডাক্তার, তারই হাওয়ার ছিটেফোঁটা লাগছে গায়ে।

ইন্দ্রজিৎ খামটা এগিয়ে দিল। চোখের সামনে এক্সরে প্লেট উঁচু করে তুলে ধরেছেন ডাক্তার, দেখছেন। ভুরুতে ভাঁজ পড়ল কয়েকটা, মিলিয়ে গেল, আবার ভাঁজ। নিচু হয়ে প্রেসক্রিপশানে চোখ বোলালেন একবার, ইন্দ্রজিৎকে এক ঝলক দেখে নিয়ে আবার চোখ এক্সরে প্লেটে।

—হুঁ, আজকের ছবিটা তো ভাল এসেছে।

ইন্দ্রজিৎ বিনীত হল, —আপনি যেখান থেকে বলেছেন সেখান থেকেই করানো হয়েছে।

আড়ে আরেকবার ইন্দ্রজিৎকে দেখে নিলেন ডাক্তার। হাত বাড়িয়ে ভিউবক্সে বসিয়েছেন প্লেটখানা, আলো জ্বেলে নাক কুঁচকে দেখছেন মন দিয়ে। ঘাড় নাড়ছেন অল্প অল্প, —যা সাসপেক্ট করেছি, তাই। দেখেছেন ডান দিকের লাঙ্-এ আপার জোনে কী রকম বড় সাদা প্যাচ ?

ইন্দ্রজিৎ স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল, —ব্রংকিয়াল প্যাচ ?

—উঁহু। লুকস লাইক টিউবারক্যুলোসিস।

—টিবি ! বাবার ! ইন্দ্রজিৎ চমকেছে সামান্য।

—টিবি আজকাল একটা অসুখ নাকি ! ওর থেকে ম্যালেরিয়া অনেক বেশি ডেঞ্জারাস। দেখছেন না, নাম করা লোকজন সব পটাপট ম্যালেরিয়ায় মরে যাচ্ছে। এক্সরে প্লেট ভিউবক্স থেকে নামিয়ে টেবিলে রাখলেন ডাক্তার, —তবে কিনা...

—কী তবে ?

—শ্যাডোটা এ বিট ডিফারেন্ট। স্পুটাম টেস্ট করিয়ে নিন। পর পর তিন দিন করাবেন। একই ল্যাবরেটরি থেকে। বাই দা বাই, এর মধ্যে আর ব্লাড পড়েছিল ?

—নাহ্। কাল তো ঠিকই ছিল। জ্বরও আসেনি।

—খাওয়া দাওয়া করছেন ?

এটা সঠিক জানে না ইন্দ্রজিৎ। বাড়িতে কানাঘুষো শুনছিল বাবার নাকি ইদানীং খাওয়া কমে গেছে খুব, সেই উত্তরটাই আন্দাজে চালিয়ে দিল।

—না না, অরুচি হলে তো চলবে না। খেতে তো হবেই। টিবি হলে ফুডটাই হবে ফার্স্ট মেডিসিন। যা ইচ্ছে খান, কিন্তু পেট পুরে খান। টিবির ওষুধ আমি এক্ষুনি স্টার্ট করছি না, স্পুটাম রিপোর্ট আগে দেখে নিই। ডাক্তার ফসফস প্রেসক্রিপশান লিখছেন, —আমার খুব স্ট্রেঞ্জ লাগছে। পেশেন্টের জ্বর কাশির রেকারেন্ট হিস্ট্রি রয়েছে, অথচ এতদিনে একটা চেষ্ট এক্সরে হয়নি !

—একবার বোধহয় হয়েছিল। ইন্দ্রজিৎ মিনমিন করল, —বছর ছয়েক আগে।

ডাক্তারের কলম থেমে গেল। চোখ তুলেছেন, —পেশেন্ট আপনার... ?

—বাবা।

—তা হলে বোধহয় বলছেন যে ? বাবার এক্সরে হয়েছিল কি না খবর রাখেন না ?

কথাটা ফুটল ইন্দ্রজিতের গায়ে। ডাক্তার কি বলতে চান বাবাকে অবহেলা করে ছেলেরা ! বাবার খোঁজ রাখে না !

ডাক্তারের ধারণাটা ভাঙতে চাইল ইন্দ্রজিৎ। গম্ভীর মুখে বলল, —আমি সে সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেলে ছিলাম। দাদাই সব দেখাশুনো করত। এখন আমিও....

—উম্। ডাক্তার ঘাড় দোলাচ্ছেন, —টেস্টগুলো করিয়ে নেক্সট উইকে আসুন। আর একটা কথা, এখন থেকে ওঁর ওয়েটটা রেগুলার নোট করবেন। এভরি উইক। না পাবলে অন্তত এভরি মানথ। অ্যান্ড অ্যাবসোলিউটলি নো স্মোকিং।

কথা বলতে বলতে বেল টিপেছেন ডাক্তার, পরের জনকে ডাকছেন। ইন্দ্রজিৎ খাম প্রেসক্রিপশান গুছিয়ে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় এখনও জল জমে আছে, আকাশে ফুট ফুট করছে তারা। পথে নেমে ইন্দ্রজিতের মনটা

অনেক ঝরঝরে হয়ে গেল। বাবাকে নিয়ে যেটুকু মেঘ জমেছিল মনে, সেটুকুও সরে গেছে কোথায়। সত্যি তো বিংশ শতাব্দী শেষ হতে আর মাত্র কটা বছর বাকি, এখনও মানুষ টিবি নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে ! ছোঃ। এই তো পাশের বাড়ির কাজের মেয়েটা কী যেন নাম, লক্ষ্মী না সরস্বতী, সে তো হাসপাতাল থেকে বিনা পয়সায় ওষুধ খেয়ে টিবি সারিয়ে আবার দিব্যি কাজ করছে। একটা কথা ভাল বলেছে ডাক্তার, বাবার স্মোকিংটা ছাড়াতে হবে। চাকরি করার সময় তাও সিগারেট খেত, এখন ফুক ফুক বিড়ি টানে। পায়খানায় গিয়ে বিড়ি, খাওয়ার পরে বিড়ি, শোওয়ার আগে বিড়ি... । হরিবল্।

ধর্মতলা স্ট্রিটের বেশির ভাগ দোকানেরই ঝাঁপ পড়ে গেছে। বাসটাসও কমে গেছে অনেক, ট্রামেরা এখনও স্থাণু। ঘরমুখো মানুষ এলোমেলো ছোটাছুটি করছে রাস্তায়, যে কোনও একটা বাস দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে একযোগে।

হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়ল ইন্দ্রজিৎ। দময়ন্তী এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরে গেছে, তাকে একটা ফোন করলে কেমন হয় ! বাড়ি গিয়েও করা যায়, কিন্তু বউদির যা বিশ্রী স্বভাব ! কান পেতে সব কথা গিলবে, তার পরও তিয়াত্তরটা প্রশ্ন করবে ! কী বলল দময়ন্তী, কেন বলল, কীভাবে বলল, তুমি কী বললে... !

পাশেই একটা বড়সড় রেস্টুরেন্ট। সামনেই কাচঘেরা বাক্সে গরম তাওয়া, মুরগির চাপ গন্ধ ছড়াচ্ছে মনোরম। তার পিছনেই কাউন্টারে এক তাগড়াই চেহারার লোক বসে কাগজ পেনসিলে হিসেব কষছে।

ইন্দ্রজিৎ কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল, —একটা ফোন করা যাবে ?

না তাকিয়েই টেলিফোন এগিয়ে দিল লোকটা, —তিন রুপিয়া।

—সব জায়গায় তো দু টাকা ! মৃদু প্রতিবাদ করল ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্রজিতের দিকে এবারও না তাকিয়ে টেলিফোন স্বস্থানে রেখে দিচ্ছিল লোকটা, ইন্দ্রজিৎ আটকাল, —ঠিক আছে, তিন টাকাই দেব।

দময়ন্তীর দিদি ফোন তুলেছে। বৈজয়ন্তী। মিহি স্বরে বলল, —ইন্দ্র ? কোথথেকে ফোন করছ ?

—এই তো... বাবার ডাক্তারের কাছে এসেছিলাম। বৃষ্টিতে ফেঁসে গিয়ে ... ডাক্তারও দেরি করল...

—ওমা, তোমার বাবার কী হয়েছে ?

—ওই বুকে একটু ... সর্দি কাশি... । টিবির কথাটা বলতে মুখে বাধল ইন্দ্রজিতের। কোনও কারণ ছাড়াই। এই মুহূর্তে বাবার অসুখ নিয়ে আলোচনা করতে তার ইচ্ছেও করছে না। ছোট্ট ঢোক গিলে বলল, —তুমি অফিস থেকে ফিরলে কখন ? ঝড় বৃষ্টিতে আটকাওনি ?

—আমি তো আজ অফিসে যাই-ই-নি।

—সে কী ? কেন ?

—আমার আজ একটা ইন্টারভিউ ছিল।

—আবার চাকরি পালটাচ্ছ ?

—ধুস, এরা বড্ড খাটায়, দেয় তো মাত্র সিক্স পয়েন্ট ফাইভ। আজ যেখানে ইন্টারভিউ দিলাম, তারা মিনিমাম নাইন পয়েন্ট টু দেবে।

বৈজয়ন্তীর মাইনের হিসেব সব সময়ে দশমিকে। সাড়ে ছ হাজার থেকে ন হাজার দুশোয় লাফ দিতে চাইছে বৈজয়ন্তী। যা স্মার্ট ড্যাশি পুশি মেয়ে, হয়তো পেয়েও যাবে। মাইনেও দিচ্ছে বটে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো। কী বা কোয়ালিফিকেশন, বড় জোর দেড়-দু বছরের একটা ডিপ্লোমা। টাকা দিচ্ছে আট হাজার, দশ হাজার, বারো হাজার... পলকের জন্য বুকটা চিনচিন করে উঠল ইন্দ্রজিতের। শিবপুর থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে, চার বছর ঘষটে ঘষটে সবে সে এখন সাড়ে আট হাজারি। শখ করে কি আর সে বিড়লা আম্বানি ভরতরাম চরতরাম খুঁজছে ? এই দুঃখে, এই দুঃখে। তিন তিনটে এজেন্সিতে বায়োডাটা দিয়ে রেখেছে ইন্দ্রজিৎ, কিছুতেই

খাপে খাপে লাগছে না। যে দু-চারটে ডাক পেয়েছে, সবই খুচখাচ কোম্পানিতে। হরিয়ানায়, ইন্দোরে, পুণায়...। একটু যদি নিরাপদ কোনও অরগানাইজেশনে জুতসই অফার পায় ইন্দ্রজিৎ। দিল্লিতেই হোক, কি মুম্বাইতেই হোক, কিংবা জেড্ডা, আবু ধাবি!

দুঃখের শ্বাস গোপন করল ইন্দ্রজিৎ। উচ্ছ্বসিতভাবে বলল, —বাহ্! পেলে একদিন তাজে খাইয়ো কিন্তু।

—ইল্লিরে। খাটব আমি, খাবে তোমরা!

সমবয়সি বৈজয়ন্তীর সঙ্গে ইন্দ্রজিতের ঠাট্টা ইয়ার্কির সম্পর্ক। ইন্দ্রজিৎ আওয়াজ দিল, —এত কিপটে কেন? সাধে কি তোমার বয়ফ্রেন্ড জোটে না!

—মারব এক থাপ্পড়। তুমি বনুর ঘাড় ভেঙে খাও বুঝি?

—সে তোমার থেকেও শাহেনশা। ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে মানিব্যাগ রাখতে ভুলে যায়।

—এক্ষুনি বলছি বনুকে। তোমার জিভ কেটে রেখে দেবে।

ইন্দ্রজিৎ একটু আশান্বিত হল। তার মানে দময়ন্তী ফিরেছে। গলা নামিয়ে বলল, —কী করছে দময়ন্তী?

—শুনতে পাচ্ছ না? পাশের ঘরে হাঁচছে। এই মাত্র ভিজে জাব হয়ে ফিরল। হিহি হিহি। ঠিক যেন ভিজে শালিখছানা। রাস্তায় আবার কোথায় গর্তে পড়েছিল, ক্রিম কালারের কামিজ একেবারে কাদায় মাখামাখি।.... ডাকছি ওকে। ধরো।

কানে রিসিভার চেপে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রজিৎ। শোনার চেষ্টা করছে হাঁচির শব্দ। পাচ্ছে না। গা'টা হঠাৎ ছমছম করে উঠল ইন্দ্রজিতের। দময়ন্তী অন্য মেয়েদের মতো নয়। মেয়েরা বৃষ্টিতে ভিজতে কত ভালবাসে, মেঘ দেখলেই মেয়েরা নাকি ময়ূরের মতো পেখম তুলে নাচতে চায়, দময়ন্তী ঠিক উলটো। এক ফোঁটা বৃষ্টি গায়ে পড়ল কি না পড়ল, অমনি চটে বরফ। হ্যাঁ। বরফই। রাগলে অসম্ভব ঠাণ্ডা সুরে কথা বলে দময়ন্তী। এত শীতল যে অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে যায়।

টক টক শব্দ হচ্ছে কাউন্টারে। তাগড়াই লোকটা বাঁ হাতে এক কাস্টমারের দিকে মৌরির প্লেট এগিয়ে দিল, অন্য হাতে পেনসিল ঠুকছে। ইন্দ্রজিৎ তাকাতেই বলল, —দুটো কল হল।

ইন্দ্রজিৎ কবজি ওলটাল, —পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে?

—আমার এখানে পার কল তিন মিনিট।

—সে কী! সব জায়গায় পাঁচ মিনিট, আপনার এখানে...!

—আমার এটাই নিয়ম।

—সামান্য তিন টাকার জন্য এমন করছেন। ইন্দ্রজিৎ গলা ওঠাল, —ঠিক আছে, দশ টাকা দিয়ে দেব।

—আঁখ দেখাবেন না। পকেটে বেশি পয়সা থাকলে সেলুলার নিয়ে ঘুরবেন। বলেই রেস্টুরেন্টের অন্দরে চোখ ফিরিয়েছে লোকটা, —অ্যাই রামু, পাঁচ নম্বরমে আভি তক ঝুটা কিউ? সাফা কর।

নির্মম উপেক্ষা। আপাদমস্তক জ্বলে গেল ইন্দ্রজিতের। আগুন চোখে গরম তাওয়ার মুরগিগুলোর দিকে তাকাল। লাথি মেরে ফেলে দেবে তাওয়াটা। উঁহু, লোকটা মাফিয়া টাইপ, এর সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব নয়। এই লোকটাকে উচিতশিক্ষা দেওয়ার একটাই রাস্তা। এক্ষুনি একটা সেল ফোন কিনে টানা একঘণ্টা দোকানের সামনের দাঁড়িয়ে ফোন করে যাওয়া।

—হ্যালো, ইন্দ্র...

নাড়া খেয়ে ফোনে ফিরল ইন্দ্রজিৎ। দময়ন্তী নয়, বৈজয়ন্তীরই স্বর, —তোমার ওপর বনু প্রচণ্ড খেপে আছে। হিহি। ও ফোন ধরবে না।

ইন্দ্রজিৎ রুক্ষভাবে বলল, —ওকে বলো আমি বুথ থেকে করছি। জরুরি দরকার।

—যেখান থেকেই করো, হিহি হিহি...। তোমাদের বুঝি ফাইট হয়েছে? ইস্যু কী?

—কিছু না। রাখছি।

ঘটাং করে রিসিভার নামিয়ে একটা দশ টাকার নোট টেবিলে রেখে বেরিয়ে আসছিল ইন্দ্রজিৎ,

কাউন্টারের লোকটা হেঁড়ে গলায় ডাকল, —চেঞ্জ নিয়ে যান।

লোকটার সরু চোখের দিকে তাকিয়ে না বলার সাহস হল না ইন্দ্রজিতের। পায়ে পায়ে কাউন্টারের সামনে এসেছে।

দুটো মলিন জরাজীর্ণ দু টাকার নোট ড্রয়ার থেকে বার করে দিল লোকটা। নোট দুটো হাতে নিয়ে থমথমে মুখে ইন্দ্রজিৎ বলল, —এগুলো চলবে ?

—দৌড়বে। লাল দাঁত বার করে হাসছে লোকটা।

—আপনি ছোটান। আমাকে অন্য নোট দিন।

—অগলি বার চেঞ্জ নিয়ে আসবেন। এমুন নোট নিতে হবে না।

আরেক বার ইন্দ্রজিৎকে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে কাউন্টার ছেড়ে উঠে গেল লোকটা। ছেঁড়া নোট দুটোকে ঘৃণ্য পোকার মতো পকেটে পুরল ইন্দ্রজিৎ। হন হন করে বাসস্টপের দিকে হাঁটছে। হাতের প্রকাণ্ড থামখানা ভারী বোঝার মতো লাগছে এখন, ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে ট্রাম রাস্তায়। কেন যে দাদাকে মুখের ওপর বলে দিল না, ডাক্তার ফাক্তার সে পারবে না, তারও যথেষ্ট জরুরি কাজ আছে আজ ! দাদার শালা ডাক্তার ঠিক করে দিয়েছে, দাদার শালাই আসতে পারত ! বউদি তো সকালে খুন্তি নেড়েই খালাস ! সারা দুপুর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মোটা হয়, নয় টিভি দেখে দেখে চোখ খারাপ করে, সে আসতে পারত না ডাক্তারের কাছে ! তারও তো শ্বশুর, তার কোনও দায়িত্ব নেই !

ফুঁসে ওঠা রাগ নিয়ে বাড়ি ফিরল ইন্দ্রজিৎ। নিজের ঘরে ঢুকল না, সোজা বাবা মার ঘরে এসেছে। বাবা খাটে বসে স্যুপ খাচ্ছে। মোড়ায় মা, হাতে বাবার রুটির থালা।

ছেলেকে দেখে অমলকান্তির খাওয়া থেমে গেছে। ঘোলাটে চোখের মণিতে প্রশ্ন আর শঙ্কা তিরতির।

ওই দৃষ্টিই সংবিতে ফেরাল ইন্দ্রজিৎকে। খামটা টেবিলে রেখে যথাসম্ভব শান্ত করেছে নিজেকে, জোর করে হাসল। অনুচ্চ স্বরে বলল, —ভয়ের কিছু নেই। থুতু পরীক্ষা করাতে হবে।

কল্যাণীর চোখ ছোট হল, —টিবি ?

—অনেকটা সেরকমই। স্যাংগুইন কিছু বলা যাচ্ছে না। টেস্ট ফেস্টগুলো হোক, তারপর....

—খাওয়া দাওয়া কি আলাদা করতে হবে ? বাটি, থালা, গেলাস... ?

—সে সব কিছু ডাক্তারবাবু বলেনি। .... স্পুটাম টেস্টটা দেরি কোরো না। এমনিতেই এক্সরে দেরিতে হয়েছে বলে ডাক্তারবাবু রেগে গেছে। আর সিগারেট বিড়ি আজ থেকে একদম বন্ধ।

অমলকান্তির মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে। করুণ স্বরে বলে উঠলেন, —আমি বাঁচব তো রে ইন্দ্র ?

কথাগুলো শেষ হয়েও রয়ে গেল বাতাসে। নিস্তব্ধ ঘরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

চার

অভিজিতের আজ ক্লাস ছিল দেরিতে। আড়াইটেয়। কলেজে এসে শুনল দেবেন কুশারি খোঁজ করছিল তার। কেন এই অনুসন্ধান আন্দাজ করল অভিজিৎ। টাকা চাইবে দেবেন কুশারি।

বিশাল স্টাফরুম ফাঁকা ফাঁকা। প্রায়ান্ধকার ঘরখানায় গোটা আষ্টেক ফ্যান ঘুরছে, কোণের টেবিলে গুলতানি করছে জনা চার-পাঁচ অধ্যাপক। কয়েক জন ক্লাসেও গেছে, বড় টেবিলে ছড়ানো ছেটানো ব্যাগ দেখলে বোঝা যায়। দেড়টা-দুটোর পর কলেজে ছাত্রছাত্রীরাই থাকে না, অধ্যাপকরা আর বসে থেকে কী করবে ! তাও যাহোক অনার্সের ক্লাসগুলো হয়, অনার্সের ছেলেমেয়েদের কিছু ভয়ভীতি আছে, পাসের ক্লাস তো ঢুঢু। একশো আশির মধ্যে একুশ জন হয়তো টিমটিম করছে। কলেজের দারোয়ান দিবাকর দুটো থেকেই চাবির গোছা হাতে ঘুরঘুর করে, কোন কোন ঘরে তালা মারতে হবে। প্রিন্সিপালের বাড়ি গোবরডাঙায়, নিয়ম করে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন কলেজে আসেন তিনি, বাকি সময়টা স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। শোনা যাচ্ছে সামনের বার তিনি পার্লামেন্টে লড়বেন।

অভিজিৎ চেয়ারে বসে একটু দম নিল। হাতের কাছে প্লাস্টিক জগটা রয়েছে, টানল। যথারীতি জগ ফাঁকা, জল নেই। রুমালে ঘাড় গলা মুছতে মুছতে অভিজিৎ হাঁক পাড়ল,—রঘু...

ঘরের উলটো কোণ থেকে পার্থ সেনগুপ্ত উত্তর দিল,—রঘু চা করতে গেছে।

—কাণ্ড দেখেছেন ! এই গরমে তেতেপুড়ে এসে স্টাফরুমে যদি জল পর্যন্ত না থাকে ...

—কলেজের জল খান কেন ? ফিল্টারটা তো ব্যাকটিরিয়ার ডিপো। বাড়ি থেকে বোতল আনতে পারেন না ?

ব্যাগে বোতল নিয়ে ঘোরার অভ্যেসটা এখনও রপ্ত করতে পারেনি অভিজিৎ। আরও অনেক হাস্যকর অভ্যেসও এখনও সড়গড় হয়নি তার। এই যেমন কলেজের অনেকেই পরস্পরকে নামের আদ্যক্ষর ধরে সম্বোধন করে, ছাত্রছাত্রীদের মতো। এ সি, শুনছেন ! ডি কে, কাল টিভির প্রোগ্রামটা দেখেছিলেন ! বুঝলেন ডি আর, পাড়াটা আমাদের লাথখোরে ভরে গেছে ... ! গার্হস্থ্য সমস্যা নিয়েও অভিজিৎ আলোচনা করে না স্টাফরুমে। সহঅধ্যাপিকাদের নিয়ে রসালো আলোচনা থেকেও দূরে দূরে থাকে, এই নিয়ে পিউরিটান বলে তার খানিকটা বদনাম আছে কলেজে। ব্যাগে করে টিফিন আনার অভ্যেসটাও এখনও ...।

অভিজিৎ ইতিউতি তাকাল। নাহ্, রঘুর আশা করে লাভ নেই, তার এখন টিকিটি দেখা যাবে না। চায়ের কারবারটা বেশ চালু হয়ে গেছে রঘুর, আজকাল স্টাফরুমে তাকে পাওয়াই মুশকিল। এই নিয়ে কিছু বলারও উপায় নেই, অধ্যাপকরাই চেঁচাবে। তারা কেউই আজকাল ক্যান্টিনের ট্যালটেলে চা মুখে তোলে না, রঘুর হাতে তৈরি এক টাকা কাপের চা-ই তাদের বেশি প্রিয়।

অভিজিৎ নিজেই উঠে ফিল্টার থেকে জল ভরে ঢকঢক ঢালল গলায়। আবার এসে বসেছে চেয়ারে। কাঁধঝোলা ব্যাগ থেকে এক রাশ কাগজ টেনে বার করল, খুঁজে পেতে একটা বন্ধ খাম আলাদা করল স্তূপ থেকে। খামটা হাতে নিয়ে আলগা নাড়তে নাড়তে গলা ওঠাল,—পার্থদা, কোয়েশ্চেন কি বড়বাবুকে দিতে হবে ?

দীপেন রায় ফুট কাটল,—আপনি দেননি এখনও !

—এই ... একটু দেরি হয়ে গেল।

—যান। বড়বাবু কথা শোনাবে। পরীক্ষার আর কদিন আছে অ্যাঁ ? কবে জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট ছিল ?

পরীক্ষা মানে সাংঘাতিক সিরিয়াস কিছু নয়, কলেজের বার্ষিক। ইলেভেন আর ফার্স্ট ইয়ারের। প্রশ্ন করতে হয় বলেই করা, খাতা দেখতে হয় বলেই দেখা, প্রায় সবাই উঠে যায় ক্লাসে। তবু এই কোয়েশ্চেন তৈরি করা, জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট, হ্যানো ত্যানো প্রথা বজায় রাখতেই হয়, না হলে কলেজি শিক্ষার মর্যাদা থাকে না। আড়ম্বর যত গুরুগম্ভীর হয়, প্রথাও তত হাস্যকর দেখায়। তবুও।

পার্থ প্রতিবাদ জুড়েছে অভিজিতের হয়ে,—লাস্ট ডেট কি দেখাচ্ছেন মশাই ? কজন এখনও জমা দেয়নি তার লিস্ট দেখাব ? পি ডি আর, সি এস, এম এম...

—মানে আপনাদের গোটা ফিলজফি ডিপার্টমেন্টটাই ?

—আপনাদের ইংলিশের পি পি দিয়েছে ?

সমরজিৎ ফোড়ন কাটল,—আমাদের ধরিত্রীদিও দেয়নি।

—আমাদের ডিপার্টমেন্ট কিন্তু অল ক্লিয়ার। মাধুরীদি শিখা অরুণাংশু নন্দিতা সবাই দিয়ে দিয়েছে। পুলকেশও নাক গলিয়েছে।

—মহিলারা আবার কাজের ব্যাপারে বেশি পাংচুয়াল। দেখেন না, প্রিন্সিপাল কেমন মেয়েদের তোল্লাই দেয়।

ঘরের অন্য প্রান্তে বসে একমনে কী যেন লিখছিল কণিকা বসু। ক্ষীণ তনু, ফর্সা রং, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। কাজ থামিয়ে চোখ পাকিয়ে তাকিয়েছে কণিকা,—অ্যাই, আমাদের মেয়েদের নিয়ে কী কথা হচ্ছে ?

দীপেন মুচকি হাসল,—আমরা আপনাদের প্রশংসা করছি কণিকাদি। সব দিক সামলেও

আপনারা কলেজের নিয়মকানুন কত কঠোরভাবে মেনে চলেন।

—ঠিকই তো। আমরা তোমাদের মতো ফাঁকিবাজ নই। তোমাদেব তো সকালবেলা বাজারটা রান্নাঘরে ফেলে দিয়েই সংসারের দায়দায়িত্ব শেষ। আমরা ঘরদোর যেমন সামলাই, তেমন কলেজটাও। তোমাদের সুবিমলদার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা কোরো, সে কখনও নিজেব হাতে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেয়েছে কি না।

মুখরা বলে কলেজে সুনাম আছে কণিকার, পুরুষ অধ্যাপকরা তাকে একটু সমঝে চলে। তবু এই মুহূর্তে দীপেন তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। সংসারে সে কী কী কাজ করে তার খুঁটিনাটি ফিরিস্তি শোনাচ্ছে। দীপেনের বলার ভঙ্গিটি ভারী ব্যঞ্জনাময়, বাকিরা মজা পাচ্ছে খুব। কণিকাও ছোড়নেঅলি নয়, টুক টুক হুল ফোটাচ্ছে ছেলেদের টিউশনি করা নিয়ে, আড্ডা নিয়ে, আলস্য নিয়ে। স্টাফরুম মুখর।

বিতর্ক সভা থেকে মন বিযুক্ত করতে চেষ্টা করছিল অভিজিৎ। তবু কণিকাদির কথাগুলো মাঝে মাঝেই বিঁধে যাচ্ছে কানে। বাজার আড্ডা ছাড়া ছেলেরা কিছুই করে না ? টিউশনি করাটা শখের ? কণিকাদির বর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, বলতে গেলে সব 'অধ্যাপিকাই ডবল ইনকাম গ্রুপের মানুষ, এরা তো টিউশনিকে নাক কুঁচকে দেখবেই। পড়ত 'অভিজিতের মতো অবস্থায়, বুঝত দায়িত্ব কাকে বলে। মেয়েকে নার্সারিতে ভর্তি করতেই সাড়ে তিন হাজার লেগে যায়। তার সঙ্গে বাবা মার অসুখবিসুখ, বউ-এর সাধআহ্লাদ, বছরে একবার কন্যাকুমারিকা কি গোয়া অজন্তা ইলোরা .. । তার ওপর এখন এই ফ্ল্যাটের চিন্তা মাথায় চেপেছে।

ফ্ল্যাটের ভাবনা আসতেই দেবেন কুশারির কথা মনে পড়ে গেল। ঘড়ি দেখল অভিজিৎ। দুটো দশ। দেবেনদার ক্লাস থেকে বেরোতে আরও কুড়ি মিনিট। চট করে এক টুকরো কাগজ টেনে হিসেব কষতে বসল অভিজিৎ। দু দফায় পঁয়তাল্লিশ আর তিরিশ মোট পঁচাত্তর হাজার দেওয়া হয়েছে এখনও পর্যন্ত। অর্থাৎ আট জনে ছ লাখ। জমি কেনা, রেজিস্ট্রি, মিউটেশান, সব মিলিয়ে পাঁচ সত্তরের মতো পড়েছে, গত মিটিংয়ে হিসেব দেখিয়েছিল দেবেনদা। মানে পড়ে আছে তিরিশ। আর্কিটেক্টকে দিয়ে প্ল্যান বানানো হয়েছে, সে নিয়েছে সতেরো। দেবেনদা বলছে কমই পড়েছে, কিন্তু এটাই একটু বেশি বলে মনে হয়। কী এমন আহামরি প্ল্যান হয়েছে ? রুম দুটো তো সেই দশ বাই সাড়ে এগারোই রয়ে গেল। কী আর করা, মেজরিটির ওই আর্কিটেক্টই পছন্দ। একটা ভাল সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে কি প্ল্যান করানো যেত না ? যাক গে ... হাতে পড়ে রইল তেরো। এর থেকে করপোরেশানেও বুঝি কিছু খাওয়াতে হচ্ছে।... তা হলে তো দেবেনদার হাতে কিছুই থাকার কথা নয়। কিন্তু কত দেওয়া যায় এখন ? দু খেপে এন এস এসের টাকা পুরোটাই তোলা হয়ে গেছে, পড়ে আছে এন এস সি আর ইউনিট ট্রাস্ট। পি এফ অ্যাকাউন্টটা অবশ্য রিসেন্টলি দেখা হয়নি, তবে সেখানেই বা কত থাকতে পারে ? সাড়ে ন' বছরের চাকরিতে কতটুকুই বা ? বড় জোর আঠাশ-তিরিশ। এন এস সি আছে কুড়ি মতো, ইউনিট মেরে কেটে পঁয়ত্রিশ। প্রিম্যাচিওর উইথড্রয়াল করতে গেলে অনেক টাকা লস হয়ে যাবে। তা ছাড়া হাত খালি করে সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়াটাও কাজের কথা নয়। বাড়ি ব্যাঙ্ক কুড়িয়ে বাড়িয়ে পঁচিশ-তিরিশের মতো হবে না ? এদিক ওদিক করে হাজার ষাটেক দেবে এখন ? নাকি পঞ্চাশ ?

কণিকা পার্থ দীপেন পুলকেশদের চিরন্তন নারী পুরুষের দ্বন্দ্ব আপাতত সমাপ্ত। পার্থর চোখের সামনে ইংরিজি কাগজ, পুলকেশ উলটোচ্ছে বই, দীপেন বাথরুমে গেল, সমরজিৎ টিফিন কৌটো খুলে ছানা খাচ্ছে। পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়ল বলে।

অভিজিৎ গলা খাঁকারি দিল,—পার্থদা, ও পার্থদা ?

—কী ?

—একটু এদিকে আসবেন ? কাইন্ডলি ?

—কেন ?

—আসুন না, প্লিজ।

কাগজ ভাঁজ করে উঠে এল পার্থ। প্রায় প্রৌঢ় এই দর্শনের অধ্যাপকটির প্রখর বাস্তববোধের

ওপর আস্থা আছে অভিজিতের। এই লোকটারই পরামর্শে জয় মা বলে কোঅপারেটিভে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অভিজিৎ।

স্টাফরুমে অভিজিৎদের ফ্ল্যাট নিয়ে আলোচনা উঠলেই হাসাহাসি হয়, নানান জন নানান মন্তব্য ছোড়ে। সবই যে খুব শ্রুতিসুখকর তা নয়। ঈর্ষা বলে তো একটা শব্দ আছেই অভিধানে।

অভিজিৎ অন্যদের কান বাঁচিয়ে নিচু গলায় বলল, —দেবেনদা টাকা চাইছেন, ইমিডিয়েটলি কত দেওয়া যায় বলুন তো ?

পার্থ চেয়ার টেনে বসল, —আপনি কত দিতে চান ?

—আপনি কত দিয়েছেন ?

—আমার সঙ্গে তুলনা করলে চলবে ? আমি তো অন দা ভার্জ অফ রিটায়ারমেন্ট, এক পা বাড়িয়ে বসে আছি, আপনাদের মতো লোন ফোন পাব না। যতটা ম্যাক্সিমাম দিয়ে রাখতে পারি সেভিংস থেকে, ততটাই আমার পক্ষে মঙ্গল।

—দিয়েছেন কত তা তো বলবেন ?

—দিইনি এখনও। অ্যারাউন্ড নাইনটি আরও দিয়ে দেব ভাবছি। বোনাস ইউনিটগুলো সব সেল করে দেব।

তাতেই অত হবে ? অভিজিৎ সামান্য ঈর্ষান্বিত হল। লোকটা বছর বছর প্রচুর জমায় শুনেছে, তা বলে এত ! জমানো ইউনিট বেচে নয়, শুধু ইউনিটের বোনাস বেচেই নব্বই হাজার। সত্যি, পার্থদার মাদুর পাতা সার্থক।

ঘণ্টা বাজছে। একটু নড়ে গেল অভিজিৎ। একটাই ক্লাস আজ, ইন্ডিয়ান ইকনমির। প্ল্যানিংয়ের বইটা একটু উলটেপালটে নেওয়া উচিত ছিল। অন্তত ফিগারগুলো...।

পার্থ বলল, —আপনার প্রবলেমটা তো বললেন না ?

—প্রবলেম কিছু না। আমি ভাবছি হাজার চল্লিশ দিয়ে দেব। কমিয়েই বলল অভিজিৎ, পার্থর প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইল।

—তাই দেবেন। সঞ্চয়ের টাকায় বেশি হাত ছোঁয়াবেন না। বয়স আছে, লোনে লোনে চালিয়ে দিন।

—দেবেনদা খিটমিট করবেন না ?

—কেন করবে ? কোঅপারেটিভ গড়ার সময়ে তো কথাই হয়েছে, যে যখন যেভাবে পারবে টাকা দেবে।

—তবু একটা সামঞ্জস্য থাকবে তো। আপনি নব্বই, আমি চল্লিশ, ...দীপেন বলছিল সত্তরের অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারবে।...

—তা হলে একটু বাড়ান। পার্থ উঠে পড়ল। চক ডাস্টার রেজিস্টারের র‍্যাকের দিকে এগোচ্ছে। ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, —আপনি লোনের অ্যাপ্লিকেশান কবে দিচ্ছেন না কেন ?

—হুঁ, করব।

অভিজিৎও উঠল। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বাথরুমে গেছে। ঘন ঘন পেচ্ছাপ পায় আজকাল, সুগার টুগার হল কিনা কে জানে ! মারও তো এরকম চল্লিশের আগেই সুগার ধরেছিল ! টেস্ট একটা করিয়ে নিলে হয়। পার্থদা ঠিকই বলেছে, লোনটা এবার বার করে নেওয়া দরকার। কবে থেকে এইচ ডি এফ সির ফর্ম পেপারস এনে রেখেছে বাড়িতে, শুধু গড়িমসি করেই দেরি করে ফেলছে।

ক্লাসের দিকে এগোচ্ছিল অভিজিৎ, করিডোরে দেবেন কুশারির সঙ্গে দেখা। টাকমাথা বেঁটেখাটো লোকটা ছাত্রী পরিবৃত হয়ে দুলে দুলে আসছে। অভিজিৎকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল, —তুমি এরকম পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন বলো তো ?

—যাহ্। এই ব্ল্যাক সিজনে কার সঙ্গেই বা কদিন দেখা হয় ? আপনার সোম শুক্র অফ, আমার মঙ্গল শনি, ক'টা দিন পড়ে থাকে ?

হাসল দেবেন। হাতের ইশারায় ছাত্রীদের এগিয়ে যেতে বলল। অভিজিতের পিঠে আলগা হাত দিয়ে সরিয়ে এনেছে সিঁড়ির কাছে।

অভিজিৎ হাসতে হাসতে বলল, —আরে আরে জানি আপনি কী বলবেন। নেক্সট উইকে হাজার তিরিশ দিয়ে দেব।

দেবেন কুশারির প্রতিক্রিয়া পার্থ সেনগুপ্তর মতো হল না। সে প্রায় তিড়িং বিড়িং করে উঠেছে, —সেকী! আমি তো তোমার কাছ থেকে আশি এক্সপেক্ট করছি।

অভিজিৎ মিটিমিটি হাসছে, —আমার কি টাকার গাছ আছে দেবেনদা? লোনটা পাই, একটা বড়সড় অ্যামাউন্ট দিয়ে দেব।

—লোন লোন কোরো না। তুমি হচ্ছ আমাদের কোঅপারেটিভের সবথেকে সলভেন্ট পার্টি। এক পয়সা বাড়ি ভাড়া লাগে না, মেয়ে ছোট, তার পড়াশুনোর খরচা নেই, ভাই দাঁড়িয়ে গেছে, বাবা ভাল পেনশান পান...

—কিন্তু আমার চাকরি কবছর হয়েছে?

—রথীন তো তোমার থেকেও জুনিয়ার, টিউশনিও করে না, সে কী করে আশি দিল? বলো? বলো? এত টিপে টিপে টাকা দিলে কন্ট্রাকটার তো কলকাতা ছেড়ে পিটটান দেবে।

—ঠিক আছে, দেখি কী করতে পারি। দেবেনকে ছাড়িয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল অভিজিৎ। যা শুনিয়ে রাখল, মনে হয় পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশে দেবেনদা এখন পটে যাবে। কিন্তু লোনের অ্যাপ্লিকেশানটা করতেই হবে। পারলে আজই বাড়ি গিয়ে... । রথীনের উদাহরণ দেয় দেবেনদা! স্ট্রেঞ্জ! রথীন একটা মানুষ? বাবা মাকে ন্যাজাত না ম্যাজাত কোথায় যেন ফেলে রেখেছে, জন্মে খোঁজখবর নেয় না, একটা ঘরেই খাওয়া, একটা ঘরেই শোওয়া, একটা ঘরেই হাগা মোতা, খাবে রেশনের চাল, বাজার করবে শেয়ালদাব প্ল্যাটফর্মে—সে আর অভিজিৎ সমান! রাতে নাকি গুনে গুনে পাঁচটা রুটি করে রথীনের বউ। কর্তা গিন্নি দুটো দুটো, মেয়ে এক! রথীনের তো লাখের বেশি দেওয়া উচিত।

অনার্সের ক্লাসের গোটা পনেরো ছেলেমেয়ে বসে আছে। উশখুশ করছিল, অভিজিৎকে দেখে টান টান। বিষয়চিন্তা মনের অন্য কুঠরিতে চালান করে ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে পড়ল অভিজিৎ। এই বিষয়টা তার ভাল দখলে আছে, সে বোঝায়ও ভারী চমৎকার। এম এ পাশ করার পর পরই দু' বছর ন্যাশানাল স্যাম্পল সার্ভেতে চাকরি করেছিল। ইনভেস্টিগেটারের। গ্রামে গঞ্জে ঘোরাটাই ছিল কাজ। গ্রামের মানুষদের আয়, ব্যয়, ক্রয়ক্ষমতা, জন্মমৃত্যুর হার, প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কীভাবে তাদের ওপর প্রভাব ফেলেছে বা ফেলছে, এই সবকিছু সম্পর্কেই তার প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হয়েছিল বিস্তর। সে সবও ছাত্রছাত্রীদের গল্প করে করে শোনায় অভিজিৎ। ছেলেমেয়েরা অবশ্য এ সব শোনার থেকে নোটেতেই আগ্রহী বেশি। তাদের জন্য ব্ল্যাকবোর্ডে অনেক লেখাজোখাও করতে হয় অভিজিৎকে। ভালই লাগে। যে পদ্ধতিকেই হোক, পড়ানোয় অভিজিতের কোনও ক্লান্তি নেই। এই পেশায় তার এখন মমত্ব জন্মে গেছে। ছাত্রছাত্রীদের ওপরও।

ক্লাস সেরে স্টাফরুমে ফিরে মুখে চোখে জল ছেটাল অভিজিৎ। সর্বাঙ্গ দিয়ে তাপ বেরোচ্ছে। বৈশাখ পড়ার পর থেকেই আবহাওয়া বদলে গেছে। দিনভর চিটচিটে গরম, সূর্য ডোবার আগেই এক পশলা কেরানি ভেজানো ঝমঝম, তারপর আবার যে তাত সে তাত। তবু এই বৃষ্টিটুকুই সুখ। আজ গুমোট কম, লু ধরনেব তপ্ত হাওয়া বইছে, বিকেলে বৃষ্টি হবে কি না কে জানে। না হলেই ভাল। আজ আবার বাবার ডাক্তার আছে।

স্টাফরুমে জোর এক প্রস্ত ঝগড়া চলছে এখন। একটুক্ষণ কান পেতে শুনে হেসে ফেলল অভিজিৎ। সেই পুরনো বিষয়। মেডিকেল ফান্ড। রোজ শেষবেলায় এই নিয়ে যুদ্ধ লাগে আজকাল। তিন তিনটে ম্যারাথন মিটিং হয়ে গেল, এখনও ফয়সালা হল না ফান্ড হবে কি না। গত নভেম্বরে ইংরিজির মৃন্ময় চট্টোপাধ্যায় এক বিশ্রী পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিল জোর, তিন মাস যমে মানুষে টানাটানি চলেছে, হাসপাতাল আর নার্সিংহোমের খরচ চালাতে চালাতে জেরবার হয়ে গেছে মৃন্ময়ের পরিবার। ওই দুর্ঘটনা থেকেই কলেজে একটা মেডিকেল ফান্ড তৈরি করার পরিকল্পনা এসেছিল সকলের মাথায়। কার কখন অমন বিপদ আসে কেউ বলতে পারে। মজা হল সবাই

চাইছে ফান্ড হোক, কিন্তু ফান্ডের চেহারা কেমন হবে তাই নিয়ে কারও সঙ্গে কারও মত মিলছে না। কেউ চাইছে টিচিং নন-টিচিং সবাইকে নিয়ে ফান্ড হোক। কেউ বলছে নন-টিচিংরা বড্ড বেশি বিনা কারণে লোন তোলে, সুতরাং শুধু টিচাররাই মেম্বার থাকুক। কেউ প্রস্তাব দিচ্ছে মাসে মাসে দুশো করে কাটাতে হবে, কেউ বলছে পঁচিশ। কারও মতে কী কী কারণে টাকা দেওয়া হবে তার একটা লিস্ট তৈরি হোক। কারও ইচ্ছে তিন বছর মূল টাকা ব্যাঙ্কে আটকে থাকুক, তারপর সুদের টাকা থেকে...। উনকোটি বখেড়া। অভিজিতের ভাল লাগে না। এ সব ফান্ড মান্ড করে কী হয়? মেডিকেল ইনসিওরেন্স করে রাখো, অ্যাক্সিডেন্ট বেনিফিট পলিসি করো, তাতেই কাফি। অভিজিতের মেডিক্লেম করা আছে। জয়েন্ট। ঋতুর সঙ্গে। আশি হাজার টাকার কভারেজ। মৃন্ময় চ্যাটার্জি একটা গাড়ল, সাড়ে ন'হাজার টাকা মাইনে পায়, বছরে বারো-চোদ্দোশো টাকা প্রিমিয়াম দিতেও কিপটেমি!

অভিজিৎ আলোচনায় ঢুকল না। প্যান্টের পিছন চকের গুঁড়োয় মাখামাখি, ঝাড়ছে, কাঁধে তুলে নিয়েছে ঝোলাব্যাগ। কী ভেবে বাবার থুতু পরীক্ষার রিপোর্ট তিনটে বার করল ব্যাগ থেকে, আরেক বার চোখ বোলাল। নাহ্, ঠিকই দেখেছে। মিছিমিছি সিঁটিয়ে গেছে বাবা। অবশ্য সত্যি সত্যি টিবি হলেই বা কী ছিল? বড়ি গেলো, খাবার খাও, ঘুমোও, ব্যস। ওই একটু খরচ বাড়ত সংসারের, এই যা।

প্রশ্নপত্রের খাম অফিসে জমা করে সোজা রাস্তায় এল অভিজিৎ। সবে তিনটে চল্লিশ, বাবার ডাক্তার বসবে ছ'টার পর, এতটা সময় যে কী করা যায়! একবার বিকাশ ভবন থেকে ঘুরে আসবে? বছর ঘুরে গেল, এখনও সিনিয়ার স্কেল পেল না অভিজিৎ! ফাইলটা কদ্দূর এগোল সরেজমিন করে এলে মন্দ হয় না। কিন্তু সল্টলেক পৌঁছতে সাড়ে চারটে বেজে যাবে, পাবে কি কাউকে? কফি উসে গিয়ে খানিকক্ষণ বসে থাকবে? ইউনিভার্সিটির দু-চারজন বন্ধু আসে নিয়মিত, দেখা হলে আড্ডা মারা যায়। শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা হলে মন্দ হয় না, শুভেন্দুর ইগনুতে ভাল হোল্ড। কয়েকটা লেকচারের বন্দোবস্ত যদি করে দিতে পারে, পার ক্লাস ভালই পাওয়া যাবে।

কোনও দিকেই গেল না অভিজিৎ, পায়ে পায়ে কখন গোলদিঘিতে ঢুকেছে। সাঁতার ক্লাবের ছেলেমেয়েরা দাপাদাপি করছে জলে, পাড়ের কাছে হাত পা ছুড়ছে শিশুরা। একটা কালো মতো মেয়ে তরতরিয়ে ডাইভিং বোর্ডে উঠে গেল, দুহাত সামনে মেলে খাড়া নামছে জলে, তলিয়ে গিয়ে ভেসে উঠল আবার, ঝাঁকাচ্ছে টুপি পরা মাথা। এক দল সুঠাম যুবক হইহই করতে করতে ওয়াটারপোলো খেলছে দূরে। একটা দমকা হাওয়া উঠল হঠাৎ, দুলে উঠল গাছগাছালি।

সমগ্র দৃশ্যটাই কী মনোরম! সবজেটে জল থেকে কী নরম একটা বাষ্প উঠছে! ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। সোঁদা গন্ধ মাখা।

আহ্! চোখ বুজল অভিজিৎ। তখনই ফ্ল্যাটের চিন্তাটা ঘুরে এল। ম্যাক্সিমাম কত লোন দেবে এইচ ডি এফ সি? দুই? আড়াই? তার পরেও তো লাখের ওপর জোগাড় করতে হবে। লোন নিলে কাটবেও অনেক। টিউশনি বাড়াবে আরও? ঋতু বড় খ্যাচ খ্যাচ করে, বাড়িতে ছেলেমেয়েরা এলে নড়াচড়ার জায়গা থাকে না। ইন্দ্র মাত্র দুই দিচ্ছে সংসারে, আরেকটু কি বাড়াতে বলবে? যদ্দিন না বিয়ে করে, তদ্দিন তো ওর উচিত...। মাকে সংসারের খরচা কমাতে বলবে? কোন মুখে বলবে? ছেলে আলাদা ফ্ল্যাট করছে বলে মা বাবাও কৃচ্ছ্রসাধন করবে এ কোনও যুক্তি হল! না, গরমের ছুটিতে গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী বাতিল। বড় জোর দিঘায় দু-তিন দিন...। কিংবা চাঁদিপুর...। কিংবা বকখালি। বাবার শরীর একটু সতেজ হলে বাবা মাও যেতে পারে। ঋতু তো বোঝালে বোঝে, ক'টা বছর একটু কষ্ট করতে পারবে না ঋতু! তারপর তো শুধু সুখই সুখ। মনের মতো করে থাকা। মনের মতো বাঁচা।

বিকেল বয়ে যাচ্ছিল। সুখ আর উদ্বেগের মধ্যিখান দিয়ে।

পাঁচ

বিকেল থেকেই যাব যাব করছিল অনসূয়া, উঠল সন্ধের পর। আজই সকালে দার্জিলিং মেলে ফিরেছে, এখনও তাদের পথশ্রমের ক্লান্তি কাটেনি। মামার বাড়ি এসে সারা দুপুর এক ফোঁটা ঘুমোয়নি ঝিমলি, হুড়োহুড়ি করেছে রিমলির সঙ্গে। পাহাড় দেখার গল্পও শোনাচ্ছিল দিদিকে। নিজের মতো করে, নিজের ভাষায়। সেও এবার ঘুমোতে চায়।

অনসূয়া দরজা থেকে বলল, —তা হলে আসি মা। দাদা ফিরলেই কিন্তু আমাকে একটা ফোন কোরো।

—করব। বললেন কল্যাণী। ঝিমলির কপালে আলতো চুমু খেলেন, —আবার কবে আসছিস তোরা ?

—দেখি। আসব এর মধ্যে। অনসূয়া গ্রিল বারান্দা থেকে এক পা নামল, —দাদাকে বোলো অনা ডাক্তার যদি দেখাতে চায় তো দেখাতে পারে। তোমার জামাই যে কোনওদিন স্মরণ ব্যানার্জির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেবে।

—কেন, এ ডাক্তার তো ভালই। ইন্দ্রর মতো খুঁতখুঁতে ছেলেও খুব প্রশংসা করছিল।

—খারাপ তো বলিনি। তবে স্মরণ ব্যানার্জি হল নাম্বার ওয়ান। আর কোনও সময়েই একটা ডাক্তারের ওপর ভরসা করতে নেই, সর্বদাই আরেক জন কনসাল্ট করে নেওয়া ভাল। এতে ভুল ট্রিটমেন্ট হওয়ার চান্স কম থাকে।

—তুই তো অনেকদিন পর দেখলি...। কল্যাণীর স্বর অস্বাভাবিক নিচু, —কেমন মনে হল ?

—একটু যেন বেশি রোগা হয়ে গেছে বাবা। কাশির শব্দটাও যেন কেমন কেমন।

—এরকমই তো কাশত। বরং মাঝে আরও খারাপ হয়েছিল।

—তা হবে। কদিন পরে দেখছি বলে হয়তো..। কথা বলতে গিয়ে কিন্তু বড্ড হাঁপাচ্ছিল বাবা।

—দুর্বলতা।

—ডায়েটটা আর একটু ভাল করা যায় না মা ? শুধু স্যুপ আর চিকেন কেন, টেংরির জুসও দাও।

ঋতুর আর সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকা পোষাচ্ছিল না। মা মেয়েতে বহুক্ষণ ধরে ঢেকুচকুচ চলছে। এই যাই, এই আসি, এই যাই, এই আসি। এখনও চলবে অনেকক্ষণ, জানে ঋতু। আর যতক্ষণ ঝিমলি আছে রিমলিকেও এখান থেকে নড়ায় কার সাধ্যি। মাঝখান থেকে মেয়েটার পড়াশুনো আজ শিকেয়। এসেছে তো পাঁচ ঘন্টা হয়ে গেল, এখনও কথা ফুরোল না ! অত যদি বাবার ওপর দরদ, মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে শুনেও দার্জিলিং কালিম্পং বন্ধ করলি না কেন ? স্মরণ ব্যানার্জি যদি তোর বরের পকেটেই থাকে, তবে কেন পল্টুকে ছুটতে হল সুদেব বক্সির দরজায় ? কত কাণ্ড করে দু'দিনের মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড় করে দিল পল্টু ! ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে ধরে, তার দাদাকে দিয়ে বলিয়ে... ! ভাগ্যিস ম্যানেজারের দাদা ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার ! অত বড় ডাক্তারেও বিশ্বাস নেই, এখন বলে... ! কথার ছিরি কী ! স্যুপ নয় মা, টেংরির জুস দাও ! বাবা যদি খেতেই পারতেন, টেংরি কেন, আস্ত পাঁঠা কিনে এনে দিত না তোর দাদা ! অত যদি টান, এখানে এসে বাবার সেবাযত্ন কর।

ঋতু মুখে একটা ইলাস্টিক হাসি টেনে বলল, —অনু, তুমি কি এখান থেকে ট্যাক্সিতে ফিরবে ?

সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝল না অনসূয়া। অন্যমনস্কভাবে বলল, —দেখি কী পাই। অটোতেও যেতে পারি। ইস্, এতক্ষণ অপেক্ষা করলাম, দাদাটা যদি এসে যেত। বলতে বলতে চোখ আবার কল্যাণীর দিকে, —তোমরা বাবাকে সারাক্ষণ ঘরে আটকে রাখছ কেন বলো তো ?

—বাথরুম টাথরুম তো যাচ্ছে। বিকেলে তো তোর সামনেই ছোটঘরে এসে টিভিতে খেলা দেখছিল !

ছোটঘর মানে বাড়ির তিনটে বেডরুম বাদে মাঝখানের আয়তাকার ফালি জায়গা। ঘর বলা যায়, আবার ঘরও না। বেতের সোফা ফেলা আছে, দু-তিনটে মোড়াও। ওখানেই থাকে টিভি,

টেলিফোন, ওখানেই ছেলেমেয়েদের পড়ায় অভিজিৎ, ওখানেই বাইরের লোক এলে বসে। এই ছোটঘরেই অমলকান্তি অনেকটা সময়ই কাটান দিনের, বারান্দায় বড় একটা বসেন না আজকাল।

অনসূয়া বলল, —ওখানে বসাও তো আটকেই থাকা। হাঁটাও হাঁটাও, বাবাকে হাঁটাও। জ্বর নেই, কাশিও বলছ একটু কমের দিকে, হাঁটাহাঁটি না করলে খিদেই বা হবে কেন ? সাধে কি বাবার অরুচি ? কথায় বলে না, হাঁটা খাওয়া ঘুম, তিনে রোগ গুম !

অমৃতবাণী শুরু হয়েছে ! আর সহ্য হয় না ! টুক করে সরে এল ঋতু, ঘরদোর নিয়ে পড়েছে। গোটা বাড়ি জুড়ে ছড়িয়ে আছে খাবারের গুঁড়ো। মুড়ি, বিস্কুট, পোট্যাটো চিপস, সন্দেশ...। ঝিমলিটার যে কী অভ্যেস, কোনও খাবারই খাবে না, অথচ সবই চাই ! একেই বলে দৃষ্টিখিদে ! তাই না এমন প্যাকাটির মতো চেহারা ! রিমলি ওই বয়সে কক্ষনও ওরকম ছিল না, যা দেওয়া হত সোনা মুখ করে খেয়ে নিত। মেয়েকে নিয়ে শুধু আদিখ্যেতা করলেই হয় না, এ সব অভ্যেসও বাবা মাকেই তৈরি করে দিতে হয়।

ছোটঘরের কার্পেটটা দেখে ঋতুর চক্ষু স্থির। ইস্, কী দশা ! সন্দেশ শুধু ফেলেই সুখ হয়নি, লেবড়েছে। ছোট্ট গোল কার্পেটখানা কত শখ করে কেনা হয়েছিল ! কাশ্মির এম্পোরিয়াম থেকে, নিজে পছন্দ করে কিনেছিল ঋতু। দাম শুনে অভিজিৎ আঁতকে উঠেছিল, তবে তার ইচ্ছেয় না বলতে পারেনি। সেই সাড়ে চার হাজার টাকার গালিচা এখন সন্দেশময় ! তাই বুঝি তখন অনু বলছিল, অমন করে না ঝিমলি, অমন করে না ঝিমলি ! সে নয় মেয়ের দিকে মরে গেলেও চোখ পাকিয়ে তাকাবে না, শাশুড়ি করছিলেন কী ? এত তো তাঁর পরিষ্কার পরিষ্কার বাতিক, তাঁরই কোলে বসে নাতনি... !

এতক্ষণে অনসূয়া বাড়ি থেকে হঠেছে খানিক। উচ্চকিত টা টা পর্ব চলছে। রিমলি চেঁচাচ্ছে, ঝিমলি চেঁচাচ্ছে, অনু চেঁচাচ্ছে, কল্যাণীর স্বরও শোনা যায়। লাফাতে লাফাতে ফিরল রিমলি, নাচতে নাচতে দাদুর ঘরে ঢুকছে।

ঋতু কড়া গলায় ডাকল, —অনেক হয়েছে রিমলি। এবার পড়তে বসো।

রিমলি গা মোচড়াতে মোচড়াতে সামনে এল, —কাল তো স্কুলে শুধু হ্যান্ডরাইটিং আছে।

—রাইমস নেই ?

—আছে। রিমলির গলা মিইয়ে গেছে মুহূর্তে।

—মুখস্থ হয়েছে ?

রিমলির ঘাড় ঝুলে গেল।

—ড্রয়িং ?

বিমলির মাথা উঠছে না।

—সামস ?

রিমলির থুতনি প্রায় বুকে ঠেকে গেছে।

কার্পেটে ঝাঁটা আছড়াতে আছড়াতে ঋতু বলল, —যাও, বইখাতা খোলো গিয়ে। আমি আসছি।

এক পা এক পা করে যাচ্ছে বিমলি। তার অনিচ্ছুক গমনভঙ্গি দেখে হাসি পেল ঋতুর। মেয়েটার অঙ্কে খুব মাথা, এখনই টরটর মুখে মুখে যোগ করে ফেলে। কিন্তু পড়তে চায় না। শুধু খেলা আর টিভি। মেয়েকে ডাক্তার বানানোর ইচ্ছে আছে ঋতুর। আপনজন ডাক্তার হলে বুড়ো বয়সে বলভরসা বাড়ে। হবে কি ?

রিমলি ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে এসেছে, —বিছানায় পিপড়ে মা।

—ওফ্ ওখানেও ! ঋতু আর সংযম রাখতে পারল না। গজগজ করছে আপন মনে।

কল্যাণী বারান্দা থেকে ফিরেছেন। রান্নাঘরে যেতে গিয়ে বোধহয় শুনলেন কিছু, দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, —তুমি ঘরটা দ্যাখো, আমি এখানটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

ঋতু বলতে পারল না, জায়গাটা সাফসুতরো হয়ে গেছে মা, আপনার এখন হাত না লাগালেও চলবে। শাশুড়িকে মনে মনে একটু ভয়ই পায় সে। ভয়, না সমীহ ? এমন সুন্দর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সাংসারিক প্যাঁচ জানেন মহিলা !

প্রায় সব পরিবারেই শাশুড়ি বউয়ে প্রথম যুদ্ধ বাধে হেঁসেল আর আলমারি নিয়ে। কিন্তু এ সংসারে তেমনটি হয়নি। কল্যাণীর চাতুর্যের গুণেই হয়নি। চাতুর্য, না রণকৌশল ? বিয়ের পর তিনটে মাস যেতে না যেতেই ঋতুর হাতে সংসার ছেড়ে দিলেন কল্যাণী। রান্নাবান্না, টাকাপয়সার হিসেব রাখা, দুধ, রেশন, গ্যাস, কেরোসিন, খবরের কাগজ, সব। তোমার ঘরদোর তুমিই সামলাও ঋতু ! আমাদের বুড়োবুড়িকে দু বেলা শুধু দু মুঠো খেতে দিয়ো ! অথচ সেই অর্থে কল্যাণী বা অমলকান্তি কেউই তখন বুড়ো বুড়ি নন। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ছেলের মুখাপেক্ষী তো ননই। শ্বশুরমশাইয়ের পেনশন পাসবুক দেখেছে ঋতু। কম নয়, তখনই প্রায় চব্বিশশো পেতেন মাসে মাসে। তবু ওই বানপ্রস্থের ভান ! ঋতুর ওপর সব ছেড়ে দিয়ে কল্যাণী শুধু বই আনছেন লাইব্রেরি থেকে, সারাক্ষণ গল্প উপন্যাস পড়ছেন, বিকেল হলেই চলে যাচ্ছেন গীতা পাঠের আসরে। বাকি সময় স্বামী ছেলেদের সঙ্গে খুনসুটি। যে দেখবে যে শুনবে সেই বলবে এমন শাশুড়ি পাওয়া ভাগ্যের কথা।

ক'টা মাস যেতে না যেতেই ঋতু ফাঁকটা টের পেয়ে গেল। সে সংসারের মালকিন হয়নি, হয়েছে রাঁধুনি কাম বাবুর্চি কাম খাজাঞ্চিখানার দারোয়ান। আসল চাবিকাঠি রয়ে গেছে কল্যাণীর হাতেই। বাজারের টাকা বার করে দেবে ঋতু, কিন্তু কী বাজার আসবে নির্দেশ দেবেন কল্যাণী। দুদিন পাকা মাছ এসেছে, কাল একটু জিওল মাছ এনো ! বাঁধাকপি ফুলকপি দুটো একসঙ্গে আনার দরকার কী, একদিন বাঁধাকপি আনলে পরদিন ফুলকপি আনবে ! ঋতুর বাপের বাড়ির লোক খেলেও কল্যাণী মেনু তৈরি করবেন ! রেশনে চিনি তোলা হবে কি না, রূপশাল চাল আসবে, না চামরমণি মিনিকিট, সে নির্দেশও অমলকান্তি নেবেন কল্যাণীর কাছ থেকে। লাভের মধ্যে লাভ, ছদ্ম স্বাধীনতার ভারে হাঁসফাঁস করে ঋতু, দুটো দিন বাপের বাড়ি গিয়েও থাকতে পারে না। তুমি ছাড়া এ সংসার যে অচল ঋতু !

একবার মরিয়া হয়ে রান্নার লোক রেখেছিল ঋতু। তাকে টেকাতে পারল কই ! দুদিন সে খুন্তি নাড়তে না নাড়তে কল্যাণীর পা পড়ল হেঁসেলে। কুটনো কাটনা বাটামশলা এগিয়ে দাও তো গোবিন্দর মা, মাছের ঝোলটা বসিয়ে দিই ! ঋতু হাঁ হাঁ করে উঠতেই কল্যাণীর মুখে মিষ্টি হাসি ' কী যে বদ অভ্যেস করেছ বাড়ির লোকজনের, তোমার রান্না খাওয়ার পর আর কি গোবিন্দর মার কাঁচা তেলের ঝোল ওদের মুখে রোচে ! দেখি আমি কদ্দিন পারি... তুমি ক'টা দিন শুয়ে বসে নাও না ঋতু ! ক্রোধ নয়, কলহ নয়, মোলায়েম চালাকি। এই মহিলার সঙ্গে ঋতু এঁটে উঠতে পারবে কেন ?

রিমলি হওয়ার আগে পরে ক'টা মাস একটু বুঝি মুক্তি মিলেছিল ঋতুর। বড় জোর বছর খানেক। আবার সেই ঘানি।

কবে যে ঋতু প্রাণ ভরে স্বাধীনভাবে নিশ্বাস নিতে পারবে ! ওই হুকুমহীন ব্যক্তিত্বের চাপ ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে ঋতুর।

ছোটঘর নিজের মনোমতো করে ঝাড়াঝুড়ি শেষ, রান্নাঘরে কী যেন টুকটাক করছেন কল্যাণী, শুনতে পাচ্ছিল ঋতু। এখন তাক থেকে টিন পেড়ে আটা ঢালবেন গামলায়, মাখবেন। ইদানীং রাতের রুটিটা নিজেই করছেন কল্যাণী। ইচ্ছে।

ঋতু রিমলিকে নিয়ে পড়ল। হ্যান্ডরাইটিং-এর খাতা খুলে ধরেছে মেয়ের সামনে। হাঁটু মুড়ে পেনসিল হাতে ঝুঁকেছে রিমলি।

কল্যাণীর ডাক উড়ে এল, —ঋতু, চা খাবে ?

এই এক বাসন। দিনে চোদ্দোবার চা খাওয়া চাই। একবার হয়তো নিজে করলেন, বাকি তেরো বার আবদার জুড়বেন মিহি সুরে।

ঋতু সাড়া দিল,— আধ কাপ দেবেন মা।

—আদা দেব ? তা হলে ওঁকেও একটু দেওয়া যায়।

এও এক কায়দা। এখন আদা দেওয়া চা ভাল না লাগলেও কেউ কি মুখ ফুটে বলতে পারবে ? নাকি ঋতু বললেই উনি এখন চায়ে আদা দেবেন না ?

ঋতু উত্তর দিল না, সরু চোখে রিমলির খাতার দিকে তাকাল। শিস মোটা হয়ে গেছে, ধ্যাবড়া

লেখা পড়ছে পেনসিলে। মেয়ের হাত থেকে পেনসিলটা নিয়ে নিল ঋতু। ছুলছে।

ঘং ঘং শব্দ হচ্ছে কাশির।

অমলকান্তির কাশি একবার শুরু হলে সহজে থামে না। দেখে মনে হয় এক্ষুনি বুঝি গলা ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে প্রাণটা। তবে এমনটি যে হবে না, জানে এ বাড়ির সকলে। ঋতুও জানে।

শাশুড়ির সাড়া না পেয়ে ঋতুই উঠল।

কাশতে কাশতে ধনুক হয়ে গেছেন অমলকান্তি। খাটের বাজু ধরে সামলাতে চেষ্টা করছেন নিজেকে। শীর্ণ দেহযষ্টি কাঁপছে থর থর।

বিছানায় ছড়িয়ে আছে তাস। একা একাই ব্রিজ খেলেন অমলকান্তি। চতুর্ভুজ হয়ে।

ঋতু খাটের পাশে এসে দাঁড়াল,— জল দেব বাবা ?

কোনওক্রমে দু দিকে ঘাড় নাড়লেন অমলকান্তি। লাগবে না।

—কফ ফেলবেন ? উঠছে ?

এবার ওপর নীচে মাথা নাড়ল।

খাটের তলা থেকে মাটির ভাঁড় বার করে শ্বশুরমশাইয়ের মুখের সামনে ধরল ঋতু। তার ঘেন্নাপিত্তি কম, অমলকান্তি দলা দলা কফ তুলছেন, মুখ না ঘুরিয়ে দেখছে ঋতু। আলগা হাত রেখেছে অমলকান্তির পিঠে।

কল্যাণী বুঝি বাথরুমে গিয়েছিলেন। বেরিয়েই ছুটে এসেছেন। ঋতুর সঙ্গে চোখাচোখি হল। ঘাড় নেড়ে ঋতু ইশারায় জানিয়ে দিল কফে রক্তকণা নেই।

মুখ টকটকে লাল হয়ে গেছে অমলকান্তির। জীর্ণ খাঁচা নামছে, উঠছে। শ্বাস নিচ্ছেন হা হা। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, —অভি এখনও ফিরল না ?

শ্বশুরমশাইকে দেখে মায়া হচ্ছিল ঋতুর। ক্ষয় রোগের নাম শুনে পাঁচ দিনেই একেবারে গুটিয়ে গেছেন মানুষটা। অত দিনের নেশা বিড়ি সিগারেট এক কথায় ছেড়ে দিলেন। কয়েকটা বিড়ি সযত্নে লুকোনো ছিল তোশকের তলায়, সেগুলোও ফেলে দিয়েছেন টান মেরে। আহারে, বাঁচার কী তৃষ্ণা !

ঋতু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল,— অত ভাবছেন কেন বাবা ? বলেছি না এ রোগ আজকাল কিচ্ছু নয় ! নিজের কানে শুনলেন তো আপনার বন্ধু কাল কী বলে গেলেন। কলকাতায় এখন যা পলিউশান, একশোটা লোকের এক্সরে করলে পঞ্চাশ জনের টিবি বেরোবে। এ রোগ হয়ে বরং আপনার তো শাপে বর হল। অনিয়ম করতে পারবেন না, খাওয়া দাওয়া ভাল হবে, দু-তিন মাসের মধ্যে আপনার স্বাস্থ্য ফিরে যাবে।

অমলকান্তির ঠোঁটে বিষণ্ণ হাসি— জানি তো। তবু..

—তবুর কিছু নেই। উঠে ওঘরে গিয়ে বসো তো। কল্যাণী মৃদু ধমক দিলেন স্বামীকে— গরম চা দিচ্ছি খাও। গলায় আরাম হবে। ঋতু, ওঁর কাপড়িশটা দিয়ে যাও তো।

কল্যাণী স্বামীর থালা বাসন এর মধ্যেই আলাদা করে দিয়েছেন। গ্লাস এ ঘরেই আছে, কাপড়িশও। পইপই করে মানা করেছিল সবাই, ডাক্তারও এমন কোনও বিধান দেননি, তবুও। ঋতু অবশ্য এই বন্দোবস্তে মনে মনে একটু নিশ্চিন্ত। হাজার হোক রিমলি আছে না ঘরে। শাশুড়ির এই বোধগুলো আছে বলেই না তাঁকে একটু একটু শ্রদ্ধাও করে ঋতু।

অমলকান্তি উঠছেন। ধীর পায়ে চলেছেন ছোটঘরে। পা অল্প অল্প কাঁপছে তাঁর, কিন্তু কাউকে ধরে চলা তাঁর পছন্দ নয়। এটুকু মনের জোর বোধহয় এখনও রয়ে গেছে।

টিভি লো ভলিউমে চালিয়ে দিয়ে আবার ঝিমলির হ্যান্ডরাইটিং নিয়ে বসল ঋতু। শেষ করিয়ে রাইমস ধরল, চুমুক দিচ্ছে কাপে। শাশুড়ি চা বানান ভাল, বেশ আমেজ আসে।

ইন্দ্রজিৎ ফিরল। দীর্ঘ সুঠাম যুবক ঋতুর দরজা ধরে দাঁড়িয়ে। শিস দিচ্ছে— ওয়াও ! সিনিয়ার তো দেখছি আজ হেভি ফিট ! করিশমার নাচ দেখছে !

—বাবার মেয়ে এসেছিল যে। ঋতুর মুখে টেপা হাসি।

—তাই। দিদি কলকাতায় ল্যান্ড করে গেছে ?

ঝিমলি টুক করে বলে উঠল, হ্যাঁগো কাকু, তোমার জন্য একটা উইন্ডচিটার এনেছে পিসিমণি। স্কাই ব্লু। না না, পিকক ব্লু। আর বাবার জন্য হোয়াইট।

—কেমন হোয়াইট ? স্নো হোয়াইট ? মিলক হোয়াইট ? আইভরি হোয়াইট ? লাইম হোয়াইট ?

তর্জনী নাচাচ্ছে ইন্দ্রজিৎ। ফ্যালফ্যাল মার দিকে তাকাচ্ছে রিমলি। মোজা পরা পায়ে ইন্দ্রজিৎ ঘরে ঢুকে পড়ল। রিমলির চুল ঘেঁটে দিয়ে বলল, তুই একটা ছাগলি। তোর জন্য নিশ্চয়ই কিছু আনেনি ?

—সব্বার জন্য এনেছে। রিমলি আবার সপ্রতিভ, আমার জন্য পিংক সোয়েটার, মার শাড়ি, ঠাম্মার ছাতা, দাদুর জন্য মাংকি ক্যাপ... দাদুকে মাংকি ক্যাপটা পরিয়েছিল পিসিমণি, ঢোলা ঢোলা হয়েছে। দাদুর মুখটা খুব সরু হয়ে গেছে তো।

—সিনিয়ার এই গরমে মাংকি ক্যাপ পরবে নাকি ?

—আহা, শীতে পরবে...

—আর হাতে লাঠি নিয়ে গুটগুট করে চলে যাবে গড়িয়া স্টেশন। গুনে গুনে দশটা ট্রেন পার করে...

—ধ্যাৎ। ঋতু চোখ ঘোরাল— বাবা মোটেই অত বুড়ো হননি। বাবা মাংকি ক্যাপ পরবেনই না।

কথায় কথায় বাড়ির আবহাওয়া তরল হয়ে এল। ভাল লাগছিল ঋতুর। তার দেওরটি বাড়িতে সচরাচর এত আমুদে মেজাজে থাকে না, নিশ্চয়ই দময়ন্তীর সঙ্গে মন কষাকষি মিটে গেছে। সে মেয়েই বা কীরকম ! বাবার অসুখের জন্য ডাক্তারের কাছে ছুটেছিল ইন্দ্র, তাতে এত চটে যাওয়ার কী আছে ! ওই ঢঙি মেয়ে এ বাড়ির বউ হয়ে এলে মা বাবার কপালে দুঃখ আছে। সবাই কি ঋতুর মতো সাদা মনের !

কৌতূহলে তবু পেট ফুলছিল ঋতুর। প্রশ্নটা করেই ফেলল, অ্যাই, তোমার দময়ন্তীর মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে ?

ইন্দ্রজিৎ চোখের কোণ দিয়ে তাকাল, মাথা গরম হয়েছিল কে বলল ?

—সব জানি গো মশাই। নইলে কেউ প্রেমিকার সঙ্গে ফোনে অত মিউ মিউ করে ?

রিমলি গোল গোল চোখে কথা গিলছিল, বলে উঠল, প্রেমিকা কে গো কাকু ?

ঋতুর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে হা হা হেসে উঠল ইন্দ্রজিৎ, প্রেমিকা হল ঝটিকার ছোট বোন। কুজ্ঝটিকার দিদি। চিনিস এদের ?

—না তো।

—তোর মা চেনে। জিজ্ঞেস করে নিস। বলতে বলতে ঋতুর দিকে ঘুরল ইন্দ্রজিৎ—তোমার জামাইবাবু অফিসে এসেছিল আজ। বিল সেকশানের দু তিন জনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছি। দিন পনেরোর মধ্যে পেমেন্ট হয়ে যাবে।

ঋতু কায়দা করে সেলাম করল, থ্যাংক ইউ।

—শুধু থ্যাংকসে হয় না। তোমার জামাইবাবুকে বোলো দু পারসেন্ট দিয়ে যেতে।

ঋতুর চোখ ছানাবড়া, তুমি পারসেন্টেজ নেবে ?

—নেওয়াটাই তো দস্তুর, নয় কি ? অন্য কেউ হলে তোমার জামাইবাবু তো দিতই, হয়তো বেশিই দিত।

—ঠিক আছে, বলে দেব।

ইন্দ্রজিৎ মিচকি মিচকি হাসছে, দেখেছ তো, ঘরের লোককেও তোমরা কত কম চেনো ? ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী যে টাকার জন্য হ্যাংকার করে না, সেটাও তোমরা মন থেকে মানতে পারো না।

ঋতু অপ্রস্তুত মুখে হাসার চেষ্টা করল, হাসি ঠিক ফুটল না ঠোঁটে। ইন্দ্রজিৎ শিস দিতে দিতে নিজের ঘরে চলে গেছে। হালকা এক অপমান দুর্গন্ধের মতো নাকে লাগছিল ঋতুর। তার জামাইবাবুর ছোট্ট একটা উপকার করে দিয়েছে, তাই বুঝি তাকে ঘুরিয়ে কথা শুনিয়ে গেল ইন্দ্রজিৎ। যাতে ভবিষ্যতে এমন অনুরোধ আর না আসে। আসবে না, আসতে দেবে না ঋতু। অভিজিৎকেও

বারণ করে দেবে।

মেয়েকে পড়ানো সেরে ছাদে উঠে এল ঋতু। বিকেলে জামাকাপড়গুলো নামাতে ভুলে গেছে, তুলছে এখন। ইন্দ্রকে হাসতে হাসতে ক'টা কথা শুনিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, কেন যে ঠিক সময়ে ঠিক কথাটা মুখে আসে না ঋতুর! টাকা নিয়ে নাকি ইন্দ্রর হ্যাংকারিং নেই! থাকবে কী করে? খরচ তো করে পিঁপড়ের পেট চিপে চিপে। প্রতিটি পাইপয়সা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য আগলে রাখছে। প্রথম প্রথম চাকরি পেয়ে বারোশো দিত সংসারে, চার বছরে বাড়াল মাত্র ছ'-আটশো। বাবার অসুখে যে জলের মতো টাকা খরচ হচ্ছে, একটা পয়সা কি উপুড়হস্ত করে! একদিনও হাতে করে বাবার জন্য আঙুর আপেল বেদানা আনে! সেদিন সাধন ডাক্তারকে সামান্য সত্তর টাকা ফি দেওয়ার সময়েও টুক করে সরে গেল। সব দাদার ঘাড়ে। বেচারা দাদা, বেচারা বলীবর্দ!

সামনের রাস্তায় আলো জ্বলছে না। আধো অন্ধকার গলির মোড়ে গোটা কয়েক ছেলের জটলা, কী নিয়ে তর্ক চলছে জোর। খেলা টেলা হবে বোধহয়। সন্ধে থেকে বেশ একটা বাতাস বইছিল, থেমে গেছে বাতাসটা। আকাশ সামান্য লালচে এখন। ঝড় উঠবে কি? উঠুক, একটু জুড়োক পৃথিবী।

হাতে জামাকাপড়ের ডাঁই নিয়ে নীচে নেমে ঋতু দেখল এসে গেছে অভিজিৎ, বান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে কল্যাণীর সঙ্গে। অমলকান্তি উঠে গেছেন ঘরে, এবার তাঁর খাবার যাবে।

ইন্দ্রজিৎ মাথা মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। মা দাদার সামনে দাঁড়াল কয়েক সেকেন্ড, মুখ দেখছে দুজনের। মন্থর পায়ে ঘরে চলে গেল।

বাড়িতে ইস্ত্রির পাট অনেক কাল উঠে গেছে। বিয়েতে দুটো ভাল ইলেকট্রিক ইস্ত্রি পেয়েছিল ঋতু, দুটোই খারাপ হয়ে পড়ে আছে, সারানোই হয় না। পাড়ার ইস্ত্রিঅলার কাছে সকালে ঝিমলির ইউনিফর্মটা পাঠাতে হবে, অভিজিতের প্যান্ট শার্টও। বাকি জামাকাপড় ভাঁজ করে আলনায় রাখছিল ঋতু, অভিজিৎ ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করল— কী হল বাবার স্পুটাম রিপোর্ট? ডাক্তার কী বলল?

জামা খুলতে খুলতে অভিজিৎ বলল, আবার একটা টেস্ট করাতে হবে।

—তিনটে রিপোর্টেও কিছু বোঝা গেল না?

—যাবে না কেন, গেছে। তবে...

—কী তবে?

—বলছি তো আরেকটা টেস্ট করাতে হবে।

—টিবি তা হলে আছে?

—থাকতেও পারে। না-ও থাকতে পারে।

এ আবার কী জবাব! ঋতু ভুরু কুঁচকে তাকাল, কী টেস্ট হবে আবার?

—আছে একটা জটিল টেস্ট। সিটি এফ এন এ সি।

—সেটা কী?

—অত শত জানি না। ডাক্তার করাতে বলেছে, করাব। আচমকা খিঁচিয়ে উঠল অভিজিৎ, এত ফ্যাচর ফ্যাচর করছ কেন বলো তো? সারাদিন তেতেপুড়ে আসার পর এত কৈফিয়ত দিতে আমার ভাল লাগে না।

—কৈফিয়ত চাইলাম কোথায়! জানতে চাইছি।

—অত জানতে চাওয়ারই বা কী আছে? রিমলি বসে বসে ঢুলছে, তুলে খাইয়ে দিতে পারছ না?

পাজামা কাঁধে বাথরুমের দিকে চলে গেল অভিজিৎ, দড়াম্‌সে দরজা বন্ধ করল। ঋতু হতভম্ব। অভিজিতের মতো স্থিরমস্তিষ্ক মানুষের এহেন তপ্ত আচরণের কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তপ্ত, না বিচলিত? কেমন যেন খটকা লাগছে। অভিজিৎ কি ক্লান্ত খুব? কলেজে কিছু ঘটেছে? ফ্ল্যাট নিয়ে কোনও সমস্যা হল না তো? নাকি বাবার অসুখটাই...?

সংশয়টা ঘনীভূত হল রাতে খাওয়া দাওয়ার পর। কল্যাণী ঘরে গেছেন, অভিজিৎ টেলিফোনে কথা বলছিল বোনের সঙ্গে। চাপাগলায়। গম্ভীর স্বরে।

ফোন রাখতেই ইন্দ্রজিৎ ডাকল, দাদা, একবার শুনে যা তো।

—কেন ?

—আয় না, কথা আছে।

—শরীরটা ভাল লাগছে না রে। কাল সকালে কথা বললে হয় না ?

—একটু আয় না।

ইন্দ্রজিতের এমন সনির্বন্ধ ডাকাটা ভারী অস্বাভাবিক। তার থেকেও অস্বাভাবিক অভিজিতের এড়ানোর ভঙ্গিটা। ঋতু দেওরের দরজায় কান পাতল।

—হঠাৎ সিটি এফ এন এ সি করতে বলল কেন ?

—বলল। হয়তো স্পুটামে কিছু পাওয়া যায়নি, তাই।

—কী টেস্ট হবে এগজ্যাক্টলি বল তো ? নিডল বায়োপসি ? ওই শ্যাডো পোরশান থেকে রস টেনে নিয়ে পরীক্ষা করবে ?

—বোধহয়।

—কিছু কি সাসপেক্ট করছে ?

অভিজিতের গলা শুনতে পেল না ঋতু। বায়োপসি শব্দটা কানে ঝনঝন করছে। ইন্দ্রজিৎ আবার বলল, মাকে বলে দিয়েছিস ?

—কই আর বললাম। ওই তো তোর সামনেই যা কথা হল। বললাম আর একটা টেস্ট হবে, ব্যস। মাও আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

—আমার মনে হচ্ছে ডাক্তার ফালতু ভয় দেখাচ্ছে রে। কিংবা হয়তো রুটিন টেস্ট, চেক করে নিচ্ছে। ইন্দ্রজিতের গলা একটু চড়ল— কিংবা হয়তো পিওর ধান্দাবাজি। একগাদা টাকা খরচা করিয়ে ল্যাব থেকে কমিশান ঝাড়বে।

—হতেই পারে। সবই সম্ভব।

—খরচ কত পড়বে ?

—অ্যারাউন্ড দু হাজার। ডাক্তার যা বলছিল। অভিজিৎ একটুক্ষণ চুপ, —তোর কি মনে হয় ডাক্তার ভয় দেখানোর জন্য বলল ?

—যাদের কাছে মানুষ বিপদে পড়ে যায়, যাদের ভয় দেখানোর ক্ষমতা আছে, তারা মানুষের উইকনেস ইউটিলাইজ করতেই পারে। তবে আমি শিওর কিছু বলছি না। আফটার অল আমি তো ডাক্তার নই। তবে...আমি কিন্তু বাবার মধ্যে ওই অসুখের সিম্পটম দেখছি না। ওয়েট লস আছে, কিন্তু খুব বেশি কি ? বাবা কবে আর তেমন হেলদি ছিল ! ওষুধে ডায়েটে রিকভারও তো করছে অল্প অল্প। করছে না ?

ঘরের ভেতরে অনন্ত নৈঃশব্দ্য। গা ছমছম করে উঠল ঋতুর। এক অতি পরিচিত অসুখের নাম অনুক্ত আতঙ্কের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। তবে কি শ্বশুরমশাই আর... !

বুকটা ভার হয়ে এল ঋতুর। যত না অমলকান্তির জন্য দুশ্চিন্তায়, তার চেয়ে বেশি অভিমানে। অভিজিতের ওপর। ভাই বোন সবার কাছে উদ্বেগটা প্রকাশ করতে পারল অভিজিৎ, বউয়ের কাছে নয় ! সাত বছর ঘর করেও ঋতু যেন এ বাড়ির সুখ-দুঃখের ভাগীদার নয়। পর। তাই হোক, অভিজিৎ নিজে থেকে না বললে ঋতু কিছু জিজ্ঞেস করবে না।

আহত মুখে ফিরতে গিয়ে চমকে উঠেছে ঋতু। অন্ধকার প্যাসেজে ঝুম দাঁড়িয়ে আছেন কল্যাণী। আরও অন্ধকার হয়ে।

ছয়

ধীমান ডটপেন বন্ধ করল, —ডাক্তার একেবারে ভারডিক্ট দিয়ে দিল ?

—হুঁ। মাথা দোলাল অভিজিৎ, —কী যে করি।

—ডাক্তার কিছু সাজেস্ট করেনি ?

—করেছেন। নাম দিয়েছেন এক ডাক্তারের, তার কাছে যেতে হবে।

—কী নাম ?

—এক সেকেন্ড ।

কাঁধঝোলা ব্যাগ থেকে খামটা বার করে টেবিলে রাখল অভিজিৎ । একগাদা অদরকারি কাগজও বেরিয়ে পড়ল । হাতড়াচ্ছে । এই মাত্র তো সুদেব বক্সির চেম্বার থেকে এল, প্রেসক্রিপশানটা গেল কোথায় ? বুকপকেটে রাখল ? না তো । মাথা একদম কাজ করছে না, স্মৃতি যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে ।

ধীমান খামের দিকে আঙুল দেখাল, —এর মধ্যে রাখেননি তো ?

ঠিকই তো । তাই-ই তো । ত্বরিত হাতে প্রেসক্রিপশানটা বার করল অভিজিৎ, স্বস্তিও পেল সামান্য । চেম্বার থেকে আগেই ধীমানের অফিসে ছুটে আসাটা ভুল হয়নি । বিপদে এমন একটা উপস্থিত বুদ্ধির কেউ পাশে থাকা দরকার ।

নামটা পড়ল অভিজিৎ, —সুভাষ মাইতি ।

কপাল কুঁচকে দু'-চার সেকেন্ড মেমারি ব্যাঙ্কে নামটা খুঁজল ধীমান । তারপর বলল, —এজ কীরকম ডাক্তারের ?

—তা তো জানি না ।

—চেম্বার ?

—গোলপার্কের পলি ক্লিনিকে বসে । সপ্তাহে চার দিন । অভিজিৎ নার্ভাস মুখে তাকাল, —বয়সের কথা কেন জিজ্ঞেস করলে ধীমান ?

—না, খুব ইয়াং হলে তার ওপর ঠিক রিলাই করা যায় না । আবার বেশি সিনিয়ার হলে বুঝতেই পারছেন ইগোটিস্ট হবে । অ্যারাউন্ড ফরটি টু ফিফটি গ্রুপের ডাক্তারই হচ্ছে বেস্ট ।

—তা হলে কি সুভাষ মাইতিকে দেখাব না ?

—তা কেন ? ডক্টর মাইতি তো ওই এজ গ্রুপেরও হতে পারেন । তা ছাড়া আপনার ডাক্তার যখন তাকে রেফার করেছেন হি শুড বি কনসাল্টেড ফার্স্ট । তবে কিনা...

অভিজিতের হাঁটুটা আবার দুর্বল হয়ে গেল । ওই তবে শব্দটা বড্ড বেশি শুনছে আজকাল । ঋতু বলছে, ইন্দ্র বলছে, মাও বলছে ইদানীং । কাল স্কুলের কী যেন গল্প বলতে গিয়ে রিমলিও বলছিল । নিজের মুখ দিয়েও কখনও কখনও কথাটা বেরিয়ে যায় । এখন ধীমানও... । কেউ কি এই দুনিয়ায় কোনও কথা সংশয় ছাড়া বলতে পারে না ?

ধীমান হাত বাড়াল, —রিপোর্টটা একবার দেখব অভিদা ?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই, দ্যাখো না । তোমাকে দেখাতেই তো এনেছি ।

সরু ফিলমের স্ট্রিপ, তাতে নেগেটিভের মতো তিনটি ছবি । নিউজ রুমের চড়া আলোয় তুলে ধরে ছবি তিনটে দেখছে ধীমান । কাগজে মোড়া কাচের স্লাইড চারটে খুলতে গিয়েও খুলল না, প্যাথলজিকাল রিপোর্টটা পড়ছে মন দিয়ে । হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, —অসম্ভব । হতেই পারে না ।

—কী বলছ ধীমান ? কী হতে পারে না ?

—আপনাকে নয় অভিদা । বলেই খানিক দূরে তর্কে রত দুটো ছেলেকে দেখল ধীমান । বড়সড় হলঘরখানায় ছড়ানো ছেটানো অনেকগুলো চেয়ার টেবিল, প্রায় প্রতিটি টেবিলেই ব্যস্ত লোকজন । এই সময় থেকেই নিউজ ডেস্কের কাজ বাড়তে থাকে সংবাদপত্রের অফিসে । কেউ কপি করেকশান করছে, কেউ লিখছে খসখস, কেউ বা ইয়া মোটা ডিকশনারি ঘাঁটছে তড়িঘড়ি । ও প্রান্তে টেলিপ্রিন্টার মেশিন ক্রমাগত উগরে দিচ্ছে খবর । শুধু ওই দুই যুবকই যা ব্যতিক্রম ।

একজন চেঁচাল, —কেন অসম্ভব ধীমানদা ?

ধীমান মাথা না তুলেই বলল, —কারণ সাউথের স্টেটগুলো বিজেপি পাবে না । কেরল অন্ধ্র তামিলনাড়ু কনটিক কোথায় বিজেপির পায়ের নীচে মাটি আছে ? শুধু ইউপি আর রাজস্থান গুজরাটের ভরসায় কি পার্লামেন্টে মেজরিটি হয় ?

—শুধু সাউথের কথা বলছেন কেন ? ইস্টের কথাও বলুন । ধীমানের কথা লুফে নিয়েছে দ্বিতীয়

জন, ওয়েস্ট বেঙ্গল নিল, ওড়িশায় এক কি দুই, বিহার মেরেকেটে পাঁচ, গোটা নর্থ ইস্টেই জিরো।

ধীমান প্রেসক্রিপশানে ফিরেছে। গলা চেপে বলল, —ম্যালিগনেন্সির কোনও কিছুই আগে টের পাওয়া যায়নি ? এ কিন্তু পারশিয়ালি আপনার ডাক্তারের ফল্ট।

অভিজিৎ থতমত মুখে তাকাল, —ডক্টর বক্সি আর কদিন দেখছেন !

—ইনি নয়, আপনাদের পাড়ার ডাক্তারের কথা বলছি। ওয়ার্থলেস। এদের মেডিকেল ডিগ্রিটাই কেড়ে নেওয়া উচিত। রিপোর্টগুলো আলগাভাবে খামে ঢোকাচ্ছে ধীমান, —আপনাদেরও দোষ আছে অভিদা। স্মোকিং কাফ স্মোকিং কাফ বলে কোনওদিন পাত্তা দিলেন না, এখন মানুষটাকে শেষ দশায় এনে... আপনার বোনকে যে আমি কী করে দিই খবরটা !

—কিছু বোলো না এখন। পরে নয় আস্তে আস্তে...। অভিজিৎ ঢোক গিলল।

—তা কি হয় অভিদা ? এমনিই তো আপনার বোন টেনশান পাবলিক, রাতদিন বাবার জন্য ছটফট করছে। আজও সকালে বলছিল বাবাব রিপোর্টটা ভাল এলে ডাকাতে কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে আসবে। ধীমান মুখ দিয়ে একটা বিচিত্র শব্দ করল, —সত্যি, কী যে করি এখন !

অভিজিতের মুখ অপরাধীর মতো হয়ে গেল। বাবার এই প্রাণঘাতী অসুখের জন্য যেন সে নিজেই দায়ী। বাবার প্রতি আর একটু বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল না কি ? সে কি বড্ড বেশি স্বার্থপর হয়ে গেছে ?

ধীমানের বুঝি অভিজিৎকে দেখে অনুকম্পা জেগেছে। বলল, —যাক গে, অনুকে নয় আমি সামলে নেব। আফটার অল ফ্যাক্টকে তো ফেস করতেই হবে। যতই ক্রুড হোক, যতই হার্ড হোক।

—সে তো বটেই। অভিজিৎ ছোট্ট শ্বাস ফেলল, —নিয়তিকে আর কে কবে দেখতে পেয়েছে !

—তা বলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেও তো চলবে না। ইমিডিয়েটলি কী করা যায় কিছু ভেবেছেন ?

—ভাবছি কালই ওই ডাক্তারকে... তুমি কী বলো ?

—দেখান। তারপর তো আমি আছিই। বলেই কী যেন মনে পড়ল ধীমানের। মাথা নামিয়ে বলল, —দু মিনিট ওয়েট করুন। কপিটা ছেড়ে দিই, তারপর আপনার সঙ্গে বেরোচ্ছি।

ডটপেন খুলে লেখা শুরু করেছে ধীমান। মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে পেন চিবোচ্ছে, আবার লিখছে। উশখুশ করছে অভিজিৎ, ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন। আটটা বেজে গেল, সাড়ে ন'টা-দশটার আগে বাড়ি ফেরা যাবে না। এদিক ওদিক বার কয়েক চোখ বোলাল অভিজিৎ। উজ্জ্বল আলোকিত ঘর কর্মমুখর, দুই সুবেশা যুবতী খবরের কপি হাতে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, চাঅলা ঘুরে ঘুরে চা দিচ্ছে, ধীমানের টেবিলেও কাপ রেখে গেল, টেলিফোন বাজছে, চিৎকার করে কে যেন কাকে ডাকল—কিছুই ছাপ ফেলছিল না অভিজিতের মস্তিষ্কে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে চড়া ঠাণ্ডা, অভিজিতের কপালে তবু ঘাম জমছে মৃদু মৃদু। বাড়ি ফিরে কী বলবে মাকে ? কেমন এক অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে মা, মনে হয় বুকের ভেতরটা পর্যন্ত পড়ে নিচ্ছে। মিথ্যে বললে কি লুকোছাপা করলে, মা ধরে ফেলবে না ?

ধীমান টেরচা চোখে তাকাল, —চা-টা খেয়ে নিন অভিদা, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, নিই। কাপ টানল অভিজিৎ, —তোমার হল ?

—এই হয়ে গেছে। আর একটু।

—কী খবর করছ ?

—খবর নয়, স্টোরি টাইপ। গোর্খাল্যান্ড ইস্যুর প্রেজেন্ট অবস্থাটা কেমন, তাই নিয়ে। বেড়ানোটা কি বৃথা যেতে দিতে আছে ! ধীমান চোখ টিপল, —দুটো কিস্তি বেরিয়ে গেছে, পড়েননি ? কাল লাস্টটা বেরোবে।

—না, মানে...

—ও। আপনারা তো দিনরাত রাখেন না। আমাদের কাগজের চেহারা কিন্তু এখন পালটে গেছে। আপনাদের প্রভাতী সংবাদের চেয়ে আমরা কিন্তু বেশি ফরেন নিউজ কভার করি।

সার্কুলেশন দেড় লাখ ছুঁয়ে ফেলল প্রায়।

ধীমানের এ এক মহৎ গুণ। কাগজের জন্য খাটেও যেমন, নির্দ্বিধায় নিজের কাগজের হয়ে প্রচারও চালিয়ে যায়। অভিজিৎ ভালমতোই জানে দিনরাত এখনও এক লাখ ছোঁয়নি। তবে উঠছে ক্রমশ।

অভিজিৎ হেসে বলল, —কলেজে আমি পড়ি তোমাদের কাগজ। এই ক'দিনই যা দেখা হয়নি।

ঝটঝট দু চুমুকে চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল ধীমান। লেখা কাগজগুলো নিয়ে যেতে গিয়েও ফিরে এল। ড্রয়ার ঘেঁটে দুটো দিনরাত বার করে ফেলে দিল অভিজিতের সামনে, —পড়ুন ততক্ষণ, আমি আসছি। আমারটা অ্যাঙ্কর স্টোরি, ফার্স্ট পেজেই পাবেন।

ধীমানের ভাষায় একটা আলগা চটক আছে, ঋজু কলম, বক্তব্য টান টান। শুরু করলে শেষ না করে ছাড়া যায় না। কিন্তু আজ কিছুতেই লেখাটায় মন বসাতে পারছিল না অভিজিৎ। অর্থহীন অক্ষরের সমষ্টি বলে মনে হচ্ছে সব। হাত বাড়িয়ে রিপোর্টটাকে টানল আবার। উলটে পালটে দেখছে ফিল্মগুলো। ছায়া ছায়া সুঁচ এগিয়ে যাচ্ছে ফুসফুসের ধোঁয়াটে অংশটার দিকে, স্পর্শ করেছে, ফুঁড়ে ফেলল। কী এমন ভয়ঙ্কর রস ফুসফুসে সঞ্চিত করে রেখেছিল বাবা? কবে থেকে? পাঁচ বছর আগে থেকে? দশ বছর আগে? বিশ বছর? ...শ্যাডো শোজ লাম্পস অব সেলস হ্যাভিং ম্যালিগন্যান্ট পোটেনশিয়াল। ইম্প্রেশান : ম্যালিগন্যান্ট টিউমার অব দা রাইট লাং। ...দুটো মাত্র নিরীহ বাক্যেই একটা মানুষের মৃত্যুর পরোয়ানা লেখা হয়ে গেল!

ধীমান এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছে। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের বেশিই হবে, ছোটখাটো চেহারা, মাথার চুল সামনের দিকে কমে এসেছে। মুখে বুড়োটে ভাব, হালকা হাসি লেপে আছে তাতে।

সামনে এসে ধীমান পরিচয় করিয়ে দিল, পঞ্চশীলদা। আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটার। আর ইনি হচ্ছেন অভিজিৎ চৌধুরী, ইকনমিকসের প্রফেসার। আমার বড় শ্যালক।

অভিজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নোয়াল সামান্য। পঞ্চশীল হাসিটা বাড়াল, কোন কলেজে আছেন?

—রাজা প্রতাপনারায়ণে।

—দীপেন রায়কে চেনেন? ইংলিশের?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। দীপেন আমার খুব বন্ধু। আপনি দীপেনকে কী করে চিনলেন?

—ইউনিভার্সিটিতে আমার ব্যাচমেট ছিল। যা ফক্কড় ছিল না! ব্ল্যাকবোর্ডে বিটকেল বিটকেল কমেন্ট লিখে মেয়েদের কান লাল করে দিত। একবার শুচিস্মিতা বলে একটা মেয়েকে যা টাইট দিয়েছিল...

দু মিনিটে আলাপ জমে গেল। কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এসেছে তিন জনে। সামনেই বউবাজার স্ট্রিট, নৈশ ভিড়ে এখনও জমজমাট এলাকাটা। দু-চারটে রং মাখা নারীমুখ দেখা যায় ইতস্তত, ভিড়ের মধ্যে ক্রেতা খুঁজছে। সালোয়ার কামিজ পরা এক হাড়জিরজিরে কিশোরী কালিমাখা চোখে কটাক্ষ হেনে সামনে দিয়ে হেঁটে গেল।

পঞ্চশীল ফিরে তাকাতে তাকাতে বলল, —ডাক্তার কি আপনাদের ইমিডিয়েটলি কেমো স্টার্ট করতে বলেছেন?

ধীমান বলল, —না না, বললামই তো আপনাকে। এখনও অনকোলজিস্ট কনসাল্ট করা হয়নি।

—সে তোমরা করো। তবে আমার অভিজ্ঞতা যা বলে, ডাক্তার তোমার শ্বশুরমশাইকে প্রথমেই রেডিয়েশানে ঠেলে দেবে।

—হ্যাঁ, ডক্টর বক্সিও সে কথাই বলছিলেন বটে। অভিজিৎ ঝুঁকল, —রেডিয়েশান কোথায় দেওয়া হবে?

—কোথায় আবার দেবে। লাঙে দেবে। পঞ্চশীলের মুখে সবজান্তা হাসি, —লাঙেই তো ধরা পড়েছে বললেন।

—না না, সে তো জানি। আমি জানতে চাইছিলাম কোথায় এ সব দেওয়া হয়।

ধীমান বলল, —কেন, হসপিটালে। হাজরা মোড়ে অত বড় একটা গভর্নমেন্ট হসপিটাল রয়েছে, দেখেননি ?

—ইইই, খবরদার ওই ভুলটি কোরো না। ওখানে গেলে পেশেন্টের কী মেন্টাল সেটব্যাক হবে জানো ? কল্পনা করতে পারো বিংশ শতাব্দীতে এমনও হসপিটাল আছে যেখানে বেড থেকে উঠে পেশেন্টদের নিজেদের খাবার নিজেদের আনতে হয় ? যে উঠে আনতে পারবে না, তার খাওয়া বন্ধ। সে যদি ডায়িং পেশেন্ট হয়, তবুও। ওয়ার্ড ফোয়ার্ডের বর্ণনা তো দিচ্ছিই না, চর্মচক্ষে দেখলে তোমার আর গ্যেটের ফাউস্ট পড়ার দরকার হবে না, নরক একেবারে জ্যান্ত হয়ে চোখের সামনে চলে আসবে। অবশ্য টাকা কিছু বাঁচবে। কিন্তু টাকাটাই কি সব ভাই ? যে পেশেন্ট, তার একটা মেন্টাল দিক বলে কিছু নেই ? ডক্টর সান্যাল আমাদের বার বার বলতেন, এ রোগে মেডিসিনই সব নয়, পেশেন্টের উইলফোর্সও রিকভারিতে একটা মেজর পার্ট প্লে করে। আর তার জন্য দরকার সুন্দর পরিবেশ। হেলদি এনভারয়নমেন্ট।

অভিজিৎ পঞ্চশীলের মুখের দিকে তাকাল, কে ডক্টর সান্যাল ?

—ডক্টর দীপঙ্কর সান্যাল। ধীমান বলে উঠল। সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেট বাড়িয়ে দিল পঞ্চশীল আর অভিজিৎকে।

অভিজিৎ হাত বাড়িয়েও সরিয়ে নিল। ধূমপানে একটা চোরা আতঙ্ক এসেছে তার, দিনে চার-পাঁচটার বেশি খাচ্ছে না এখন।

পঞ্চশীলের সিগারেটে আগুন দিচ্ছে ধীমান। দেশলাই পকেটে রাখতে রাখতে বলল, —ডক্টর সান্যাল পঞ্চশীলদার মামার ট্রিটমেন্ট করেছিলেন। এ রোগে ডিটেকশনের পর অ্যাভারেজ লাইফস্প্যান নাকি এগারো মাস, যাকে ওরা বলে সারভাইভাল পিরিয়ড। মেয়াদ। পঞ্চশীলদার মামাকে ডক্টর সান্যাল চার বছর বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

—টু বি এগজ্যাক্ট চার বছর তিন মাস। আমরা তো ভেবেছিলাম মামা বুঝি পুরো কিওরড হয়ে গেলেন। দিব্যি ঘুরছেন ফিরছেন, মাথা ভর্তি আবার একরাশ কালো চুল গজিয়ে গেছে.... আমাদের সঙ্গে একবার দিঘাও বেড়িয়ে এলেন। ইন ফ্যাক্ট মারাও গেলেন স্ট্রেঞ্জ। কার্ডিয়াক ফেলিওরে। অ্যাটাকের পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ।

উৎকর্ণ হয়ে কথাগুলো শুনছিল অভিজিৎ। লাইফস্প্যান সারভাইভাল মেয়াদ শব্দগুলো হাতুড়ি মারছে হৃৎপিণ্ডে। শব্দ উঠছে ধক ধক ধক ধক। একটা জলজ্যান্ত মানুষের এভাবে মৃত্যু ঘোষিত হয়ে যায়। এত সহজে ! তারই মধ্যে মনে হল চার বছর তিন মাস খুব কম সময় নয়। সত্তর বছর বয়সেও যদি মারা যায় বাবা, তবু সেটা মোটামুটি পরিণত বয়সই হবে। ভারতবর্ষের মানুষের গড় আয়ুর থেকে বেশিই, অনেকটা বেশি।

ধীমান বলল, —অভিদা, আমরা ডক্টর সান্যালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি না ?

—পারি। নিশ্চয়ই পারি। তাঁকে পাব কোথায় পঞ্চশীলবাবু ?

—উনি অনেকগুলো নার্সিংহোমের সঙ্গে অ্যাটাচড। লেক টাউন ক্যান্সার হসপিটালের সঙ্গেও ওঁর ভাল র‍্যাপো আছে, ওঁর কেস ওরা স্পেশালি ডিল করে। মাঝে তো ডক্টর সান্যাল ক্যালকাটাতে ছিলেনও না, বছর দুয়েকের জন্য টাটা মেমোরিয়ালে গিয়েছিলেন। মুম্বই। এই তো রিসেন্টলি ফিরেছেন। কাল আমি ধীমানকে নার্সিংহোমে বসার টাইম ফাইম সব জানিয়ে দেব। তবে হ্যাঁ, আগে কিন্তু বলে রাখি, সান্যালের খাঁই একটু বেশি। বাট ওয়ান্স হি টেকস আপ দা কেস, হি ইজ অ্যাবসোলিউটলি প্রফেশনাল। পেশাদার মানে ভাল অর্থে পেশাদার। রুগির সামান্যতম অসুবিধে দেখলে সব কাজ ফেলে অ্যাটেন্ড করতে ছুটে আসে। টাকা যেমন নেয়, টাকার দামও দেয়। মামার কেসে তো দেখেছি...

সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ মোড় এসে গেছে। পঞ্চশীল শ্যামবাজারে যাবে, হাত নাড়তে নাড়তে পাতালে নেমে গেল। মেট্রো ধরবে।

অভিজিতের আর শরীর চলছিল না। কোন সকালে বেরিয়েছে আজ। কলেজে পরীক্ষার

ইনভিজিলেশান ছিল, অনার্সের। চার ঘণ্টার পেপার, তায় হিস্ট্রি না পলসায়েন্স কী যেন। লুজ শিট বিলি করতে করতে কোমর বেঁকে গেছে। তার পরে ডাক্তার, ধীমান, হাঁটা... এখন স্নায়ু প্রায় অবশ।

ট্যাক্সি ধরল অভিজিৎ। সময়ও বাঁচবে, ধীমানের সঙ্গে একান্তে আলোচনাও করা যাবে। জিভ শুলোচ্ছে, ধীমানের কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়েই নিল অভিজিৎ। বড় বড় টানে অনেকটা ধোঁয়া ভরল বুকে, ধরে রাখল। চোখ বুজে অনুভব করার চেষ্টা করল কী প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে কাজ করছে এই নীল বাতাস। কিছুই ঠাহর হল না। অনেকক্ষণ পর আপন মনে হাসল অভিজিৎ, এ বাতাস ভারী নিঃশব্দ ঘাতক।

ধীমান সিটে হেলান দিয়েছে, —কী ভাবছেন অভিদা ?

—কিছু না। ভাবছিলাম বাবা এই ডেথ পেনাল্টিটা পেল কেন !

—এই তো আপনাদের মাস্টারদের দোষ অভিদা, সবকিছুকেই আপনারা বড্ড বেশি ফিলজফাইজ করেন। ডেথ পেনাল্টি যারা পায় না, তারা বুঝি অমর ?

—তা নয়। কিন্তু মৃত্যু হঠাৎ আসা, আর মৃত্যুকে আগে থাকতে জানা, দুটো কি অ্যাবসোলিউট ডিফারেন্ট নয় ?

—একটুও নয়। জন্ম থেকেই তো আমরা জানি উই আর ডেসটিনড টু ডাই। তা বলে কি আমরা ধুকপুক করে বেঁচে থাকি ? বি অবজেকটিভ অভিদা, বি র‍্যাশনাল। বাবার পর আপনিই হলেন সংসারের মাথা, আপনি এই সব সেন্টিমেন্টালিটিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে বিপদটাকে ফেস করবেন কী করে ?

—নাহ্, আমি ঠিক আছি। স্ট্রং। রাফ অ্যান্ড টাফ। অভিজিৎ হাসল, নড়েচড়ে বসল,—তা হলে আমি কাল ডক্টর মাইতির কাছে যাচ্ছি না।

—না না, যান। পঞ্চশীলদা যাই বলুক, আর আপনিও যাই মনে করুন, মোর দ্যান ওয়ান ওপিনিয়ন আমি প্রেফার করি। যদি চান আমি সঙ্গে যেতে পারি। দু জায়গাতেই। আমার কোনও ডগমা স্টিগমা নেই।

ক্ষোভের কণা যেন মিশে আছে কথাটায়। স্মরণ ব্যানার্জিকে দেখানোর জন্য খুব উপরোধ জুড়েছিল অনু, দার্জিলিং থেকে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিতে চেয়েছিল ধীমান। সুদেব বক্সিকে তখন দেখানো হয়ে গেছে, ডাক্তার বদল করে কে তখন গৃহশান্তি বিঘ্নিত করতে চায় ! ধীমানের ক্ষোভটাও অবশ্য ননসেন্স। স্মরণ ব্যানার্জির ওষুধ খেলে কি বাবার ফুসফুসটা তকতকে নিকোনো হয়ে যেত !

ধীমানকে তবু প্রসন্ন করতে চাইল অভিজিৎ। ক্ষোভ সত্ত্বেও ধীমান এখন তার উদ্বেগের শরিক, এও কি কম পাওয়া ! ধীমানের আগ্রহেই না দীপঙ্কর সান্যাল নামে এক খুদে ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া গেল, যে কিনা ইচ্ছে করলে মানুষের আয়ু প্রলম্বিত করার ক্ষমতা রাখে।

তোষামোদের ভঙ্গিতে অভিজিৎ বলল, তোমাদের পঞ্চশীল লোকটা কিন্তু বেশ। সুন্দর গুছিয়ে কথা বলে।

—ভীষণ উপকারীও। ধীমান মাথা দোলাল,—পঞ্চশীলদার কথাতেই আমি দিনরাতে জয়েন করেছিলাম। কাঠিবাজি করে না, তেল মারে না, খায়ও না...

—যাই বলো, নামটা কিন্তু অদ্ভুত। পঞ্চশীল।

—নামেরও হিস্ট্রি আছে। ধীমান ফিক ফিক হাসছে,—যে বছর ইন্ডিয়া চায়নার পঞ্চশীল প্যাক্ট হল, সে বছরই জন্মেছে পঞ্চশীলদা। ওর বাবা নেহরুর খুব ভক্ত ছিলেন...

—ভাগ্যিস দু-তিনটে বছর আগে জন্মায়নি। তা হলে হয়তো ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের সুবাদে ওর নাম পাঁচসালা বা পঞ্চবার্ষিকী হয়ে যেত। সে খুব বিটকেল শোনাত, কী বলো ?

শব্দ করে হাসল ধীমান। ট্যাক্সির ভেতরের গুমোট কেটে গেল অনেকটাই। এটা ওটা কথা বলছে দুজনে। কলকবজায় অনিচ্ছুক ধ্বনি তুলে ছুটছে ট্যাক্সি। কালো ধোঁয়া উগরোতে উগরোতে।

সুকান্ত সেতুর কাছাকাছি এসে ধীমান প্রশ্ন করল, আপনাদের ফ্ল্যাট কতদূর অভিদা ? শুনলাম স্টার্ট করছে ?

অনুও জেনে গেছে ! উফ। তার মানে মা বাবা ইন্দ্র কারও কিছু শুনতে বাকি নেই ! উঁহু, বাবা নিশ্চয়ই জানে না। জানলে বাবা নির্ঘাত জেরা শুরু করত। বাবাও তো ঋতুরই শ্বশুর, একটা কথাও মনে চেপে রাখতে পারে না।

অভিজিৎ হাসি মুখেই জবাব দিল, অনেক দেরি রে ভাই। সবে প্রাচীর গড়া হল। এর পর পরিখা খোঁড়া হবে, তোরণ গাঁথা হবে, তবে না গরিবের প্রাসাদ !

—কত করে পড়ছে এগজ্যাক্টলি ?

অভিজিৎ সতর্ক হল। সাতশো করে বললে ধীমানের যদি চোখ টাটায় ! কিংবা হয়তো ধীমান মনে করবে ঠকে যাচ্ছে অভিজিৎ ! চেপেচুপে বলল, ছশো কুড়ি পার স্কোয়ার ফিট।

—অনু যে বলল আটশো ?

দূর শালা, ঋতু যে অনুকে জ্বালানোর জন্য দামটা ওপর দিকে চড়িয়ে দিয়েছে, তা অভিজিৎ কী করে বুঝবে ! অনুর বিয়ের আগে থেকেই ননদ ভাজে কী যে এই রেষারেষি !

অভিজিৎ বলল, অনু ঠিক জানে না। প্রথমে ওরকমই একটা এস্টিমেট হয়েছিল বটে, পরে একটু কমেছে। কোঅপারেটিভ করে হচ্ছে তো, কোনও লাভ লোকসানের ব্যাপার নেই .. তাও গিয়ে থাকা হবে কি না কে জানে।

—তবু একটা অ্যাসেট তো হচ্ছে।

—ওটুকুই যা লাভ।

—আমাদের জন্যও একটা জমি টমি দেখুন না। একটু বেশি দাম হলেও ক্ষতি নেই, পাঁচ-সাতজন মিলে একসঙ্গে কিনে নেব। নিউ বালিগঞ্জের দিকে অনেকেরই ফ্যাসিনেশান।

ফ্ল্যাটের স্থান নিয়ে ভুলটা আর ভাঙাল না অভিজিৎ। বলল,—দেখব। কাল তুমি আসছ তো ? সাড়ে চারটেয় বসেন মাইতি। মৌচাকের পাশের গলিতে। তিন-চারটে বাড়ি ছেড়ে। আমি কিন্তু তোমার জন্য ওয়েট করব।

ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছে। অভিজিতের হাতে উষ্ণ এক চাপ দিয়ে নেমে গেল ধীমান। অভিজিৎকে আবার একা করে দিয়ে গেল।

বুকের ধুকপুকুনিটা ফিরে আসছিল অভিজিতের। বাড়ি ফিরে এই মুহূর্তে কী বলবে সে ? বাবাকে নয় উলটোপালটা বুঝিয়ে নিডল বায়োপসি করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু মা ? টিবির নতুন টেস্ট বেরিয়েছে, এ কথা যে মা বিশ্বাস করেনি, অভিজিৎ নিশ্চিত। না হলে শোনার পর থেকে কেন গুম মেরে রইল মা ? বাবাকে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে আসার পরও একটা প্রশ্ন করল না। কী হল, কবে রিপোর্ট দেবে কিচ্ছু না। যেন মা আগে থেকেই জেনে বসে আছে সব, ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। ঋতু বলছিল, ঋতুর সামনেও নাকি মার মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই ! মা তো শক্ত জানেই তারা, তা বলে এত শক্ত ? নাকি গভীর শঙ্কায় দুঃখবোধ লুপ্ত হয়েছে মার ? আজ কি অভিজিৎ সব খুলে বলবে মাকে ? বাবার অসুখ, আসন্ন চিকিৎসা, পড়ে থাকা কয়েক ফোঁটা পরমায়ুর সংবাদ, সব ? মা হয়তো সহজভাবে মেনে নেবে, কিন্তু যদি... ? মারাত্মক জীবাণুর মতো এত 'কিন্তু' 'যদি' কেন ঢুকে পড়ে মস্তিষ্কে ? চল্লিশ বছরের সহযাত্রীর বিদায়ের নোটিস হাতে ধরানো কি খুব সহজ কাজ ?

অভিজিৎ মরে গেলেও পারবে না।

অনু ইন্দ্র ঋতু সবাই জেনে যাবে একে একে। অনু হয়তো এতক্ষণে জেনে গেছেও । ইন্দ্র এখনও ছেলেমানুষ, যতই বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভান করুক আদতে এখনও বোকাই, তবু তার কাছে কিছু গোপন করা সমীচীন নয়। তাকে সঙ্গে নিয়েই তো এ লড়াইটা লড়তে হবে অভিজিৎকে। ঋতুকেও না বলে উপায় নেই। যতই পেট পাতলা হোক, ঋতুর নাক খুব লম্বা, অনেক কিছু টের পায়। নিডল বায়োপসির কথাটা ঠিক জেনে গেল। অভিজিৎ নিজে থেকে তক্ষুনি তক্ষুনি বলেনি বলে অভিমানও হয়েছিল খুব।

এরাই বলুক না মাকে। অভিজিৎ কেন ? নয়তো অন্য কোথাও থেকে পল্লবিত হয়ে খবরটা পৌঁছে যাক মার কানে। অথবা মা নিজেই আন্দাজ করে নিক।

হঠাৎ অভিজিতের বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। মা ভাই বোন স্ত্রী সকলের কথা ভেবে ছটফট করছে অভিজিৎ, আসল মানুষটার কথা মনেই আসছে না ! আশ্চর্য, এমনও হয় ! যার মৃত্যুর সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে আজ এত উদ্বেগের পাহাড, সেই কিনা চিন্তা থেকে হাপিস ! কেন্দ্র থেকে সরে গিয়ে চিন্তাগুলো যেন পরিধিতে ঘুরপাক খাচ্ছে !

অভিজিতের বুকের ভেতরটা দ্রব হয়ে যাচ্ছিল। বাবার ছোট্ট ছোট্ট স্মৃতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষঙ্গ ফুটে উঠছে চোখের সামনে। শৈশব থেকে উড়ে এল একঝাঁক মুহূর্ত।

বাবার হাত ধরে বৃষ্টির জল জমা রাস্তায় ছপছপ হাঁটছে অভিজিৎ। একখানে অনেকটা ঢাল, জল বেশি, ছোট্টখাট্টো রোগাসোগা বাবা হেঁচকা টানে অভিকে তুলে নিল কাঁধে। শীতের রাতে গুটিসুটি মেরে বাবার কম্বলে ঢুকে পড়েছে অভি, সরু কম্বলে কুলোচ্ছে না, বাবা তাকে বুকে জড়িয়ে নিল। কী ওম ! মার হাত থেকে টিফিন বাক্স নিয়ে অফিস যাচ্ছে বাবা, লুব্ধ চোখে দেখছে অভিজিৎ। বড় হয়ে আমি বাবার মতো হব মা। ছিঃ, বাবার মতো হবি কেন। আরও বড় হবি তুই। ডাক্তার হবি, ইঞ্জিনিয়ার হবি, প্রফেসার হবি। বড় হয়ে অভিজিৎ বুঝেছে সত্যিই বাবার মতো হওয়াটা কী অকিঞ্চিৎকর। লোয়ার ডিভিশান ক্লার্ক থেকে শুরু, ঘষে ঘষে গোটা তিন-চার প্রোমোশান পেয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিতে জীবন শেষ। এম এ পড়ার সময় একবার বাবার অফিসে গিয়েছিল অভিজিৎ। বন্ধুরা মিলে একটা পত্রিকা বার করত, গল্প কবিতা প্রবন্ধের, তারই একটা বিজ্ঞাপনের আশায় রাইটার্সে প্রথম পদক্ষেপ। খুঁজে খুঁজে বাবার অফিসটা বার করেছিল অভিজিৎ। তখন সদ্য একটা ঘর পেয়েছে বাবা। ঠিক ঘরও নয়, ছোট একটা কিউবিকল। চেয়ার, টেবিল তাক আলমারিতে ভরাট হয়ে আরও ছোট্ট লাগে জায়গাটাকে। সেইটুকু দেখাতে পেরেই বাবা কী খুশি ! উদাসীন পিওনকে ডেকে চা খাওয়াচ্ছে, মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। কত অল্পে বাবার তৃপ্তি ! ছেলেমেয়ে একটু ভাল রেজাল্ট করলেই আহ্লাদের বান ডাকে বাবার। ছুটির দিনে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে একটু বেড়াতে পারলেই বাবা উল্লসিত। দূরে কোথাও নয়, বড় জোর গঙ্গার ঘাট, মিউজিয়াম, কি ভিক্টোরিয়া, অথবা শীতের বিকেলে ময়দানের মেলা। তাতেই কত খরচ হয়ে যেত, মাসের শেষে নাভিশ্বাস উঠত সংসারের, একটা পয়সা জমত না। কত কষ্ট করে না জমি কিনেছিল বাবা। সামান্য দু কাঠা দু ছটাক সাইত্রিশ স্কোয়ার ফিট জমি, আঠারো-উনিশ বছর আগে গড়িয়ার মতো জায়গায় ক টাকাই বা দাম, তাতেই বাবার কত ধারকর্জ ! সাদার্ন মার্কেটের বেচু স্যাকরার দোকানে মার গয়না বাঁধা রেখেছিল, তিন-চার মাস পর পর একটা একটা করে ছাড়িয়ে আনত। বাড়ি করার সময়ে সেগুলোও চিরতরে চলে গেল। অনুর বিয়ের সময়ে হাত ফাঁকা। রিটায়ারমেন্টের পর দু-চার পয়সা যা পেয়েছিল, সব শেষ। শুধু একটাই ভাবনা, অনু যেন নিজেকে বঞ্চিত না মনে করে। এর মধ্যেই ইন্দ্রর পড়ার খরচ যে কী করে চালাত বাবা !

অভিজিৎ সে সময়ে ক টাকাই বা দিতে পারত সংসারে। বউ আর নিজের মিলিয়ে হাজার খানেক। বাকিটা বাবা ম্যানেজ করত পেনশনের টাকায়।

এখন বাবার সুখের সময়। দুই ছেলে ভাল রোজগার করছে, এখনই বাবাকে চলে যেতে হবে ?

ওই নির্লোভ আত্মসুখহীন মানুষটা কি অনুমান করতে পারছে না কোন মারণাস্ত্রে আক্রান্ত হয়েছে দেহ ? নিডল বায়োপসির সময়েও সন্দেহ হয়নি একটুও ? তবে আজকাল অমন নির্লিপ্ত স্বরে কথাই বা বলে কেন ? কদিন আগেও তো অসুখের ভয়ে কুঁকড়ে ছিল।

মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে হাঁটছিল অভিজিৎ। বাবাও বোধহয় মৃত্যুর পূর্বাভাস পেয়েই গেছে।

মৃত্যু শব্দহীন বটে, কিন্তু গন্ধহীন তো নয়।

সাত

দময়ন্তীদের বাড়িটা চেতলায়, আদিগঙ্গার খুব কাছে। ছিমছাম চেহারার একতলা বাড়ি, সামনে একটু সবুজ লন আছে, ছোট গাড়িবারান্দা, জানলা দরজায় রঙিন কাচ। দেখেই বোঝা যায় দময়ন্তীর দাদু খুব শৌখিন ছিলেন। পাঁচিলঘেরা বাড়ির চার দিকে অনেকটা জমি ফাঁকা পড়ে আছে। ঠিক ফাঁকাও নয়, বেশ কয়েকটা গাছ আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কাঁঠালি চাঁপা, গন্ধরাজ, পেয়ারা, বাতাবি লেবু। গেটের গায়ে লম্বা একটা ঝাউ গাছও আছে, সেই সূত্রেই বোধহয় বাড়ির নাম ক্যাসুরিনা।

এখানে এলেই মনটা খুব ভাল হয়ে যায় ইন্দ্রজিতের। সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের এক প্রশান্তি আছে এখানে।

দু থামঅলা লাল বারান্দায় উঠে কলিংবেল টিপল ইন্দ্রজিৎ। সাড়া নেই। আবার টিপল, তবু সাড়া নেই। ইন্দ্রজিৎ একটু যেন ধন্দে পড়ে গেল। দময়ন্তী কি বাড়ি নেই? সামার ভেকেশান চলছে, এখন তো ইউনিভার্সিটি যাওয়ার কথা নয়। যাবেই বা কেন, অগস্টেই তো এম এ ফাইনাল! ব্রিটিশ কাউন্সিল গেছে কি! উঁহু, তা হলে কাল একবার বলত। জ্যৈষ্ঠের এই প্রখর তাপে এমনি এমনি কোথাও বেরোনোর মেয়ে দময়ন্তী নয়। গ্রীষ্মের দাবদাহ আর বৃষ্টির ধারাপাত দুটোই দময়ন্তীর সমান অপছন্দ, শুধু শীতটাই যা....।

ইন্দ্রজিৎ আবার বেল টিপল। এবার অনেকক্ষণ ধরে। মজবুত বাদামি দরজায় কান পেতে অন্দরের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। দময়ন্তীর খুব গজল শোনার নেশা, টেপ চালিয়ে শুয়ে থাকলে দময়ন্তী বিশ্বসংসার ভুলে যায়। এই নিয়ে বৈজয়ন্তীর সঙ্গে কম ঝগড়া বাধে দময়ন্তীব! বোন গজল চালালে দিদি ওয়েস্টার্ন বাজাবে, মা একজনকে থামতে বললেই অন্য জনের মুখ হাঁড়ি, এ তো এ বাড়ির নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু এখন বৈজয়ন্তীও বাড়ি নেই, টেপধ্বনিও শোনা যাচ্ছে না, তা হলে? যতীনটাই বা গেল কোথায়!

ইন্দ্রজিতের বুক ছমছম করে উঠল হঠাৎ। দময়ন্তীর মাও এখন অফিসে, একলা বাড়িতে দময়ন্তীর খারাপ কিছু ঘটে গেল না তো! কাজের লোক হিসেবে যতীন বেশ ভদ্র বিনীত, এ বাড়িতে সে আছেও বহুদিন, তবু আজকাল কাউকেই বিশ্বাস নেই। এই তো সেদিন কর্নফিল্ড রোডে পঁচিশ বছরের পুরনো চাকর বুড়োবুড়িকে খুন করে হাওয়া! চক্রবেড়িয়ার ফ্ল্যাটবাড়িতেই গত মাসে কী হল? সিকিউরিটির লোকই সুযোগ বুঝে ফ্ল্যাটে ঢুকে মেয়েটাকে রেপ করে খুন করে...। দময়ন্তীর বাড়িটা এমন একটেরে জায়গায় এখানে অমন ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়। যদি....

দুর্ভাবনা কত দূর এগোত তার ঠিক নেই, তার আগে মৃদু শব্দ। দময়ন্তীই দরজা খুলেছে। চুল উমনো ঝুমনো, হাই তুলছে, চোখ খোলা। ঘুম ঘুম গলায় বলল, —ও তুমি! ভাবলাম বুঝি যতীন ফিরল।

রুমালে কপালের ঘাম মুছল ইন্দ্রজিৎ, —সে গেছে কোথায়?

—কালীঘাটে। দেশ থেকে কারা সব এসেছে, তাদের নিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে যাবে।

—তোমাকে একা ফেলে বেরিয়ে গেল?

—যায় তো। দুপুরবেলাটা তো আমি একাই থাকি। দময়ন্তী প্রশ্নটাকে বিশেষ পাত্তা দিল না। ঘাড় দুলিয়ে বলল, —তুমি এই তিনটের সময় কোত্থেকে? অফিস বাংক?

—বারে, আমার আজ ইন্টারভিউ ছিল না।

—ও, হ্যাঁ। কেমন হল?

মনে মনে সামান্য আহত হল ইন্দ্রজিৎ। অন্তত তিন-চার বার ইন্টারভিউটার কথা বলেছে, এর মধ্যেই দময়ন্তী ভুলে গেল! নাকি ঘুম ভেঙে উঠে একটু অন্যমনস্ক রয়েছে? দময়ন্তীর ঘুমের রেশ নাকি বহুক্ষণ থাকে, দময়ন্তীর মা বলছিলেন একদিন।

ইন্দ্রজিৎ আলগা হাসল, —হল এক রকম। সামনের মাসে হয়তো একবার দিল্লি যেতে হতে পারে।

—কেন?

—সিলেক্ট করলে আরেকটা ইন্টারভিউ হবে। দিল্লিতে।

—তার মানে এটা সেমিফাইনাল ? আগে তো এ কথা বলোনি ?

—আমিই কি জানতাম ! জব এজেন্সিগুলো অত ডিটেলে খবর দেয় না ; পাওয়ার সেক্টার থেকে লোক নেবে, একদম ফ্রেশার নয়, ব্যস ওই সূত্রেই কল। কথা বলতে বলতে টিপটপ সাজানো ড্রয়িংরুমে এসে বসল ইন্দ্রজিৎ। পা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, —গুরগাঁওতে একটা বড় ফ্যাক্টরি হচ্ছে, সঙ্গে নিজেদের জেনারেটিং স্টেশন থাকবে। সেট অব ইঞ্জিনিয়ারস লাগবে ওদের। হিউজ প্রজেক্ট।

দময়ন্তীও বসেছে সামনের সোফায়। আঙুল চালিয়ে চুল ঠিক করছে, —স্যালারি বলেছে ?

—অ্যারাউন্ড ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ। বৈজয়ন্তীর কায়দাটা নিল ইন্দ্রজিৎ।

—ইনক্লুডিং পার্কস ?

—আবার কী !

—তা হলে আর তোমার লাভ কীসের ? অ্যাকমোডেশান কি ওরা প্রোভাইড করবে ?

—ইমিডিয়েটলি না। নিজস্ব একটা টাউনশিপ মতন করছে, কমপ্লিট হয়ে গেলে তখন ওখানেই... তদ্দিন অবশ্য ওরা হাউস রেন্ট দেবে।

—তা হলে অবশ্য মন্দ নয়।

ইন্দ্রজিতের বলতে ইচ্ছে হল, মন্দ নয় কথাটা যথেষ্ট নয়, চাকরিটা বেশ বেশ ভাল। শেরিটন ইন্ডিয়ার শেয়ার মার্কেটে ভাল সুনাম আছে, নতুন প্রোজেক্টে জার্মান পুঁজিও ঢালা হচ্ছে বিস্তর। বিদেশেও কোম্পানির কাজ হচ্ছে নিয়মিত, বিশেষত আফ্রিকায়। এমন একটা মাল্টিন্যাশানালে এ সময়ে ঢুকে পড়তে পারলে তাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না। তবে হ্যাঁ, এটা যে লাগবেই এমন কোনও কথা নেই। এমন ইন্টারভিউ সে আগেও ক'বার দিয়েছে, কী এক অজ্ঞাত কারণে শেষ ধাপটা কিছুতেই পার হতে পারে না। হয়তো এবারও....

যাগ গে, যা হবার হবে। এই মুহূর্তে চাকরি বাকরির কথা ভাবতে আর ভাল লাগছিল না ইন্দ্রজিতের। রোদ রুখে দেওয়া বন্ধ দরজা জানলা, মোটা দেওয়াল, উঁচু সিলিং থেকে ঘূর্ণায়মান ফ্যান, সামনে বসে থাকা সদ্য ঘুম ভাঙা দময়ন্তী—সব মিলিয়ে এক ঝিমঝিম মাদকতা তৈরি হয়েছে ঘরখানায়। এখানে এখন কেজো কথা মানায়ও না।

দময়ন্তী এখনও ছোট ছোট হাই তুলে চলেছে। একঢাল চুল থেকে কয়েক গুছি বেছে নিয়ে পাকাচ্ছে আঙুলে। পরনে ঘরোয়া লম্বা স্কার্ট, সঙ্গে ঢোলা ঢোলা টপ। মাঝে মাঝে আড়মোড়া ভাঙছে দময়ন্তী, বিপজ্জনক ভাবে টান টান হয়ে যাচ্ছে জামাটা, পুষ্ট স্তনের আভাস বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠছে। দময়ন্তীর অবশ্য কোনও হেলদোল নেই তাতে। থাকার কথাও নয়। তাদের সম্পর্ক তো আজকের নয়, দেখতে দেখতে পাঁচ বছর হয়ে গেল। সেই কবে বন্ডেল রোডে সৌমিত্রদের বাড়িতে আলাপ। সৌমিত্রের বোনের সঙ্গে তখন এক কলেজে পড়ত দময়ন্তী। আলাপ থেকে ঠিকানা বিনিময়, তারপর পূর্বরাগ অনুরাগের পথ ধরে অনেকটাই চলে এসেছে তারা। এমনকী তাদের শরীরও পরস্পরের কাছে আমাজনের অরণ্য বা সাহারা মরুভূমির মতো সম্পূর্ণ অচেনা নয়। তবু কেন কণ্ঠনালী শুকিয়ে আসে ইন্দ্রজিতের ! এর জন্য কি এই নির্জন দুপুরটাই দায়ী ? অথবা দময়ন্তীর ওই স্খলিত ভঙ্গিমা ?

ঢোক গিলে ইন্দ্রজিৎ বলল, —তুমি দুপুরে আজ ঘুমোচ্ছিলে যে বড় ! পড়াশোনা নেই ?

স্বরটা নিচু ছিল, দময়ন্তী শুনতে পেল না। চোখ পিটপিট করে বলল, —কী ?

ইচ্ছে করে গলাটাকে আরও নামাল ইন্দ্রজিৎ, —ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মোটা হওয়ার চেষ্টা করছ কেন ? প্রেম করলাম চিচিঙ্গের সঙ্গে, বিয়ে করলাম কুমড়োকে, এ কি কোনও কাজের কথা ?

—উঁ ?

—উঁ নয় হুঁ। আমার সোনামোনা, আমার সন্টিমণি...

—কী বিড়বিড় করছ বলো তো ? জোরে বলো।

ইন্দ্রজিৎ ফিচেল হাসল, —এমন সুন্দর দুপুরে চেঁচাতে নেই। পাশে এসো, ঠিক শুনতে পাবে।

—না।

—তা হলে আমি তোমার পাশে গিয়ে বসি ?

—একদম না। যেখানে বসে আছ, সেখানেই থাকো।

—যদি না থাকি ? বলতে বলতে উঠে পড়েছে ইন্দ্রজিৎ। পায়ে পায়ে দময়ন্তীর সামনে এল, একদম সামনে। অনেকটা ঝুঁকে আলতো চুমু খেল দময়ন্তীর কপালে, চোখে, গালে। ধীরে ধীরে মাটিতে বসেছে হাঁটু মুড়ে। ঠোঁটে মিশে গেল ঠোঁট। দময়ন্তী একটুও বাধা দিচ্ছে না। যেন আরও সাহসী হতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আরও নীচে নেমে এল ইন্দ্রজিতের মুখ। ঘাড়ে গলায় বুকে ঠোঁট ঘষছে। পুলকিত শিহরনে বিবশ হয়ে এল শরীর। দু কান দিয়ে আগুনের হলকা বেরোচ্ছে, শিরা ধমনী চকিতে উদ্দাম।

পোষা বেড়ালের মতো একটু আদর খেয়েই পিছলে সরে গেল দময়ন্তী। হাত কয়েক তফাতে দাঁড়িয়ে হাসছে ফিকফিক। চোখ ঘুরিয়ে বলল, —এই ধান্দাতেই দুপুরে আসা, অ্যাঁ ?

ইন্দ্রজিৎ ঘোর লাগা চোখে তাকাল, —মোটেই না। তোমার যতীনের তো এখন বাড়ি থাকার কথা। নেই কেন ?

—এএএএএ। মাথা দুলিয়ে জিভ ভেংচাল দময়ন্তী, —নেই দেখেই অমনি বাঘ !

ইন্দ্রজিৎ চোখ বুজে সোফায় হেলান দিল। স্থিত করছে নিজেকে। বাইরের ঝাঁঝালো দুপুরটাকে শরীর থেকে মুছে ফেলতে চাইছে।

সোফার পিঠের কাছে এসে দাঁড়াল দময়ন্তী। আঙুল ডুবিয়েছে ইন্দ্রজিতের চুলে, —বেরিয়েছ কখন ?

—সাড়ে দশটা। দময়ন্তীর আঙুল ছুঁল ইন্দ্রজিৎ, —বারোটায় ইন্টারভিউ ছিল তো।

—এতক্ষণ তবে কী করছিলে ?

—ওখান থেকে বেরোতেই দুটো বাজল। তারপর সোজা এখানে।

এবার দময়ন্তী ঠোঁট ছুঁইয়েছে ইন্দ্রজিতের কপালে, —খিদে পেয়েছে ? খাবে কিছু ?

অস্ফুটে ইন্দ্রজিৎ বলল, —সে তো পেয়েছেই। বুঝতে পারছ না ?

—নো ফাজলামি। কী খাবে বলো ? ডিম ময়দা গুলে প্যান কেক বানিয়ে দেব ? ফ্রিজে মুরগি সেদ্ধ রাখা আছে, বলো তো চিকেন স্যান্ডুইচ করে দিতে পারি। সসেজ ভেজে দেব ?

ইন্দ্রজিতের বুক কানায় কানায় ভরে গেল। এই উষ্ণ স্পর্শটুকুর জন্যই তো দময়ন্তীর কাছে আসা। শুধু দময়ন্তী কেন, এ বাড়ির সকলের মধ্যেই খুব সহজ একটা আন্তরিকতা আছে। দময়ন্তীর মার মধ্যে। বৈজয়ন্তীর মধ্যে। প্রত্যেকেই স্বচ্ছন্দ, প্রত্যেকেই খোলামেলা, কিন্তু কারও আচরণে কোনও আতিশয্য নেই, অকারণ কৌতূহল নেই। তাদের বাড়ির সঙ্গে এ বাড়ির কত তফাত ! ব্যবহারে, রুচিতে, চিন্তা ভাবনায়। বাবা মা দাদা বউদির মধ্যে যে আন্তরিকতার অভাব, এ কথাও ঠিক বলা যায় না। তবু যেন কী একটা নেই ! বোধহয় পরিমিতি বোধ। ফাইনাল ইয়ারে পড়ার সময়ে কয়েক জন বন্ধুকে বাড়ি নিয়ে এসেছিল ইন্দ্রজিৎ। তাদের মধ্যে দুই সহপাঠিনীও ছিল। তমালী আর দেবাঙ্গনা। তাদের সঙ্গে আড্ডা মারবে কি, বউদি যা উঁকি মারছে ঘন ঘন। চলে যেতেই বাবার সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়ে গেল, কোন মেয়েটিকে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে মানায় ভাল। ফানি ফানি ফানি ফানি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি। নেহাত তমালীরা তেমন খেয়াল করেনি, করলে চাঁটি মেরে ইন্দ্রজিতের মাথায় টাক ফেলে দিত। এ বাড়িতে প্রথম দিন আসার আগে মনে অনেক সংকোচ ছিল ইন্দ্রজিতের। দময়ন্তীর মা দিদি কিছু মনে করে যদি ! শুনে দময়ন্তী হেসে খুন। আমার বন্ধু আমার কাছে আসবে, এতে মনে করাকরির কী আছে ! ওদের কি খেয়ে দেয়ে কোনও কাজ নেই ! হাঃ। খানাপিনাতেও দ্যাখো, দু বাড়ি যেন দুই মেরু। গড়িয়ায় অতিথি এল তো মা বউদি বসে গেল ময়দা ঠাসতে। কিংবা হয়তো দোকান থেকে গাদা খানেক শিঙাড়া মিষ্টি আনতে ছুটল বাবা। তেমন কেউ এলে তো প্যাটিস দরবেশ এগরোল মাটন রোল। রোজকার রোজ জলখাবারটাই বা কী ! পরোটা তরকারি, চিঁড়েদই, ঘুগনি, কিংবা চাউমিন সেদ্ধ থকথকে করে ভাজা। এ বাড়ির পরিশীলিত আবহাওয়ার ছিটেফোঁটাও যদি ও বাড়িতে থাকত ! কী করে যে ওখানে মানাবে

দময়ন্তীকে।

মানাবে না, মানাবে না, একটুও মানাবে না।

না মানানোর, আরও কারণ আছে। বহুকাল আগে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে দময়ন্তীদের পরিবারে। হ্যাঁ দুর্ঘটনাই। অন্তত দময়ন্তী এখন সেই চোখেই দেখে ব্যাপারটাকে। আজ থেকে ষোলো বছর আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে দময়ন্তীর বাবা মার। বাপের বাড়ি ফিরে এসেছিলেন দময়ন্তীর মা, যত্ন করেই মানুষ করেছেন দুই মেয়েকে। নিজের উপার্জনে। বাবা দাদার তত্ত্বাবধানে। দময়ন্তীর দাদু গত হয়েছেন চার বছর। তার বছর ছয়েক আগে মামা পড়াতে গিয়েছিলেন সিডনিতে, ফেরেননি আর, তিনি এখন সেখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা। মা আর দুই মেয়েকে নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে এখন এই পরিবার। আই এ এস অফিসার বাবার কাছে বৈজয়ন্তী এখনও যায় মাঝে মাঝে। কিন্তু দময়ন্তী ভুলেও না। তার হৃদয়ের ক্ষত এখনও শুকোয়নি। ইন্দ্রজিতের বাড়ি গেলে ঝুরি ঝুরি প্রশ্নচিহ্নের সামনে যদি দাঁড়াতে হয়, দময়ন্তী কি সইতে পারবে? মনে হয় না। যা অভিমানী!

না, দময়ন্তীকে নিয়ে আলাদা সংসার পাতাই ভাল। আর সেটা কলকাতার বাইরে হওয়াই শ্রেয়। যদি সম্ভব হয় আরও দূরে, বিদেশে কোথাও।

ইন্দ্রজিৎ চলে গেলে মা কি খুব দুঃখ পাবে? আর বাবা...?

খটাং করে টান পড়ল স্নায়ুতন্ত্রীতে। দাদা আর ধীমানদার আজ দীপঙ্কর সান্যালের কাছে যাওয়ার কথা না! আশ্চর্য, বেমালুম ভুলে বসে ছিল ইন্দ্রজিৎ। বাবার অসুখের কথাটা যেন স্মৃতিকোষেই ছিল না, এল এই মাত্র। কেন? খুক খুক কাশত বাবা, একদিন টিবি ধরা পড়ল, ক'দিন পরেই বোঝা গেল রোগটা টিবি নয়, ক্যানসার। সবই যেন দ্রুত ধাবমান এক চলচ্ছবির দৃশ্য পরম্পরা, এখনও একে বাস্তব বলে বিশ্বাস হয় না ইন্দ্রজিতের। বাবা হয়তো বাঁচবে না, হয়তো কেন, নিশ্চিতই বাঁচছে না, সুভাষ মাইতি দাদাদের কোনও আশা দিতে পারেনি, দীপঙ্কর সান্যালও অন্য বাণী শোনাবে বলে মনে হয় না, কিন্তু মানুষটার অস্তিত্ব তো আছে। এখনও, অতি তীব্রভাবে আছে! তবে কেন মস্তিষ্ক থেকে হঠাৎ হঠাৎ লুপ্ত হয়ে যায় বাবা? বাবার মৃত্যুটা কি এখনই মনে মনে মেনে নিয়েছে ইন্দ্রজিৎ? অপ্রয়োজনীয় ডেটা বলে এখন থেকেই মেমারি ব্যাঙ্ক প্রত্যাখ্যান করছে বাবাকে? ইন্দ্রজিৎ কি অকৃতজ্ঞ? ইন্দ্রজিৎ কি বাবাকে ভালবাসে না?

দময়ন্তী ফিরে এসেছে, হাতে প্লেট ভর্তি স্যান্ডুইচ। সামনে রেখে বলল, —চা খাবে তো?

ইন্দ্রজিৎ অন্যমনস্ক চোখে তাকাল, —চা?

—ইয়েস চা। গরমাগরম চা। চলবে?

—চলতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে কপালে ভাঁজ পড়েছে দময়ন্তীর, —কী হল? হঠাৎ মুখ শুকনো?

দময়ন্তীর এক আশ্চর্য ক্ষমতা। ইন্দ্রজিতের মুখে ক্ষীণ ছায়া নামলেও ঠিক পড়ে ফেলতে পারে দময়ন্তী। হয়তো সব মেয়েই পারে। তবে ইন্দ্রজিতের মনে হয় শুধু বুঝি দময়ন্তীই...

ইন্দ্রজিৎ খুব আস্তে মাথা নাড়ল, —বাবার কথা ভাবছিলাম।

কিচেনে আর গেল না দময়ন্তী, পাশে বসেছে। মৃদু স্বরে বলল, —তোমার বাবার কেসটায় একটা সেকেন্ড ওপিনিয়ান নেওয়ার কথা ছিল না?

—হুঁ। আজ গেছে দাদারা।

—ও। খানিকক্ষণ চুপ রইল দময়ন্তী। ভাবছে কী যেন। হঠাৎ বলল, —তোমার বাবা খুব অ্যাফেকশনেট, তাই না?

—ভীষণ। ভীষণ অ্যাফেকশনেট। একটু বেশিই। বলতে গিয়ে হঠাৎ গলা বুজে এল ইন্দ্রজিতের, কোনও কারণ ছাড়াই। ঢোক গিলে বলল, —বাবা কারও এতটুকু কষ্ট সহ্য করতে পারে না। আমাদের শিবপুরে তো র‍্যাগিং হত খুব, আমাকে পৌঁছতে গিয়ে বাবা হোস্টেলের ঘরে ঘরে সিনিয়ারদের বলে এসেছিল, আমার ছেলেটাকে তোমরা....। সিনিয়াররা সেই নিয়ে কম খেপায়নি আমাকে, প্রচুর টিজ করেছিল। তবে ফিজিকাল টর্চারটা অন্যদের তুলনায়....

দময়ন্তী ফস করে প্রশ্ন করে বসল, —তোমার মা খুব ভেঙে পড়েছেন, না ?

উত্তরটা দিতে একটু ভাবতে হল ইন্দ্রজিৎকে। অনুচ্চ স্বরে বলল, —মাকে ঠিক বোঝা যায় না দময়ন্তী। মা তো একটু ইনট্রোভার্ট ধরনের, চুপচাপ, আনন্দেরও তেমন প্রকাশ নেই, দুঃখেরও না। তবে হয়তো ভেতরে ভেতরে... সেটাই তো স্বাভাবিক, বলো ?

—হুঁ।

দময়ন্তী আবার চুপ। লাল সবুজ কাচের নকশা ভেদ করে আলো এসে পড়েছে ঘরের প্রান্তে। রঙিন আলো, কিন্তু ঔজ্জ্বল্যহীন। অবসন্ন মাছেদের মতো নড়াচড়া করছে মেঝেতে। সেদিকে তাকিয়ে আছে দময়ন্তী। বলল, —তোমার বাবা মার রিলেশান খুব ভাল, তাই না ?

—ভালই তো। বলেই সামান্য সতর্ক হল ইন্দ্রজিৎ, —তবে ঝগড়াঝাটিও হয়। বাবাই ফড়ফড় করে বেশি, মার সঙ্গে পেরে ওঠে না। মার ব্যক্তিত্বই আলাদা।

—আমি তোমার বাবাকে একদিন দেখতে যাব ?

—যাবে। নিশ্চয়ই যাবে। তোমাকে দেখলে বাবা খুব খুশি হবে।

—আমি কে তোমার বাবা বুঝবেন কী করে ? বড় জোর ভাববেন তোমার এমনি কোনও বন্ধু দেখতে এসেছে।

—তা কেন, আমি বাবাকে বলে রাখব।

—যাহ্, ও সব কথা এই সময়ে বলে নাকি ?

—কিছু হবে না। বাবা শুনলে আনন্দই পাবে।

—না, ইন্দ্র, প্লিজ বোলো না। আমার খুব লজ্জা করবে। এমনি সময়ে দেখা করতে যাইনি, এখন...

—আচ্ছা বাবা, বলব না।

ইন্দ্রজিৎ হাসল মনে মনে। দময়ন্তী যদি সত্যি সত্যি যায়, বাবা মার কাছে কি আর সে অচেনা থাকবে ? ঘরে সি বি আই এজেন্ট আছে না ?

সে যে এতদিন বলেনি বাবা মাকে, এটাই কল্পনা করা যে কী কঠিন !

ইন্দ্রজিতের অস্বস্তিও হচ্ছিল একটু একটু। পালিশহীন চাকচিক্যহীন বাবাকে দেখে হয়তো খুব আশাহত হবে দময়ন্তী। হাজার হোক দময়ন্তী হাইফাই আই এ এস অফিসারের মেয়ে, তিনি এখন খাদ্য না মৎস্য কোন দফতরের সচিব, তুলনায় বাবা এক অতি নগণ্য কলমঘষটানো রিটায়ার্ড প্রোমোটি। তবে দময়ন্তী স্নব নয়, নিজের বাবার ওপর তার তেমন শ্রদ্ধাভক্তিও নেই, এটাই যা সান্ত্বনা।

এর পর আর ঠিক কথা জমছিল না। একটু হালকা হওয়ার চেষ্টা করল ইন্দ্রজিৎ। দময়ন্তীর পড়াশুনো আর আসন্ন পরীক্ষা নিয়ে দু-চারটে লঘু প্রশ্ন জুড়ল, ভাসা ভাসা জবাব দিল দময়ন্তী। সেও যেন কেমন বিমনা, কথায় খেই হারিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ। ইন্দ্রজিতের কাঁধে মাথা রেখে বসে আছে দময়ন্তী, তার মোমে মাজা ত্বক স্পর্শ করে আছে ইন্দ্রজিৎকে, গোলাপি আঙুল শিথিল পড়ে আছে কোলে, তবু কোনও রিরংসা জাগে না আর। বাবার চিন্তা যতক্ষণ ছিল না, ছিল না, একবার ঢুকে পড়তেই সব গোলমাল। খোঁচাচ্ছে। নানানভাবে। দাদার সমস্ত আলোচনা শুধু দিদি ধীমানদার সঙ্গে। সব সংবাদই দেয় ইন্দ্রজিৎকে, তবে সে যেন নিষ্প্রাণ তথ্য পরিবেশন। যেন ভায়ের মতামত নিয়ে দাদা তেমন ভাবিত নয়। নাকি ভায়ের পরামর্শের ওপর আস্থা নেই ? অথচ ক্যানসার সম্পর্কে ইন্দ্রজিৎ দাদার চেয়ে কিছু কম জানে না। জটিল এক নাম বলে নিডল বায়োপসির কথা লুকোতে চেয়েছিল দাদা, পারল ? কেন এমন করে দাদা ? ইন্দ্রজিৎকে অপ্রাপ্তমনস্ক ভাবে ? নাকি দায়িত্ববোধহীন ? ইন্দ্রজিতের কি নিজে থেকে আরেকটু ঔৎসুক্য দেখানো দরকার ?

দিদির বাড়ি আজ যাবে একবার ? গেলে হয়। যাওয়া বোধহয় উচিত।

যতীন ফিরল সাড়ে চারটে নাগাদ। আর বেশিক্ষণ বসল না ইন্দ্রজিৎ, সাত পাঁচ ভাবনা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে পথে। রোদের ঝাঁঝ এখনও কমেনি এতটুকু, পিচগলা রাস্তা থেকে গরম ভাপ উঠছে। শুকনো বাতাস বয়ে যায় থেকে থেকে, জ্বালা ধরে শরীরে। কেওড়াতলা শ্মশানের দিক

থেকে একটা পোড়া গন্ধ উড়ে এল। আকাশ বর্ণহীন, সেখানে কণামাত্র জলজ ইশারা নেই।

সন্তোষপুরের ফ্ল্যাটে পৌঁছে ইন্দ্রজিৎ দেখল ধীমান অভিজিৎ এসে গেছে। চা খাচ্ছে দুজনে, সামনে পকোড়ার প্লেট। অভিজিতের মুখ থমথম, ধীমানও গম্ভীর। অনসূয়া চুল আঁচড়াচ্ছে ঝিমলির, তারও মুখ ঘন কালো।

ইন্দ্রজিৎকে দেখে ঘরের লোকেদের মুখের পেশি কি ক্ষণিকের জন্য স্বাভাবিক হল ? বোঝা গেল না।

সোফায় বসেছে ইন্দ্রজিৎ। অভিজিতের মুখোমুখি।

ঘরে এক অসহ্য নীরবতা।

হঠাৎ ধীমান বলে উঠল, —এই তো ইন্দ্রও এসে গেছে আজ।...অফিস থেকে ডাইরেক্ট ?

ভারী পরিবেশে কথাটা কেমন খাপছাড়া শোনাল। ইন্দ্রজিৎ তবু মাথা নাড়ল সামান্য। যার অর্থ হ্যাঁ হয়, নাও হয়।

ধীমান গলা তুলল, —অনু, ইন্দ্রকে আগে চা জলখাবার দাও।

—দিই। এক সেকেন্ড।

রবার ব্যান্ড দিয়ে ঝিমলির চুলে দুটো ঝুঁটি বেঁধেছে অনসূয়া। কাজের মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে দরজায়, তাকে বলল, —ঝিমলিকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসো তো নির্মলা। দূরে যেয়ো না, নীচেই থেকো। যেন ডাকলে সাড়া পাই। বলতে বলতে রান্নাঘরে ঢুকেছে। যান্ত্রিক স্বরে বলল, —টোস্ট খাবি ইন্দ্র ? সঙ্গে ওমলেট ভেজে দিই ?

একটু যেন বাতাস এসেছে ঘরে, একটু যেন দম নেওয়া যাচ্ছে।

ইন্দ্রজিৎ স্বাভাবিক গলায় বলল, —কিছু খাব না রে। পেট ভর্তি। শুধু একটু চা দে।.... ডাক্তার আজ কী বলল রে দাদা ?

অভিজিতের আগে ধীমানই উত্তর দিল, —একই কথা। অ্যাডভান্সড স্টেজ, লাম্পটা খুব সিগনিফিকেন্ট, রে দিয়ে ইমিডিয়েটলি জায়গাটা পুড়িয়ে দিতে হবে, তারপর পেশেন্টের রিকভারি রেট স্টাডি করে পর পর কেমো।

—হুঁম। ইন্দ্রজিৎ বুঝদারের মতো মাথা নাড়ল, —কত র‍্যাড দিতে হবে ?

—র‍্যাডটা কী ? অভিজিৎ মাথা তুলেছে।

—রেডিয়েশান ইউনিট। ওই মাপেই রে দেয়।

বিমূঢ় চোখে ধীমানের দিকে তাকাল অভিজিৎ।

ধীমান চটপট বলে উঠল, —সে তো রেডিওথেরাপিস্ট বলবে। তার কাছে তো এখনও যাওয়া হয়নি।

—কেন, সান্যাল রেডিওথেরাপি করে না ?

—উঁহু, উনি ক্লিনিকাল অনকোলজিস্ট। কেমোথেরাপিটা করবেন। রেডিয়েশান দেওয়াতে হবে সেই লেকটাউন ক্যানসার হসপিটাল থেকে। ওখানে একজনকে সান্যাল চিঠিও দিয়ে দিয়েছেন।

—কবে যাওয়া হবে সেখানে ?

—কাল হবে না, আমার কয়েকটা ঝামেলা আছে। ইউনিভার্সিটিতে এগজামিনারস মিটিং... অভিজিৎ সোজা হয়ে বসল, —পরশু তুমি যেতে পারবে ধীমান ?

—পরশুটা বাদ দিন। তার পরের দিন করুন। আমি হোল ডে ফ্রি রাখব।

অনসূয়া চা এনেছে। টেবিলে কাপ রেখে নাক টানল, —আসল সমস্যাটার কী হবে, কিছু ভাবলে ?

ইন্দ্রজিতের ভুরু কুঁচকে গেল। কী প্রবলেম ? টাকা ?

অভিজিৎ সিগারেট ধরিয়েছে। চিন্তিত মুখে দু আঙুল রেখেছে কপালে। টিপছে। বলল, —সত্যি, কী যে করা যায় ! অ্যাদ্দিন নয় বাবাকে পড়িয়ে পাড়িয়ে রাখা গেল, রে দিতে নিয়ে গেলে তো আর কোনও লুকোছাপা চলবে না। ধর বাবাকে কিছু না বলেই নিয়ে গেলাম, কিন্তু বাবা যদি ক্যানসার হসপিটাল দেখেই আনপ্রেডিক্টেবল আচরণ শুরু করে ! আফটার অল বাবা তো মেন্টালি খুব

স্ট্রং টাইপ নয়।

—কিছু না বলে নিয়ে যাবি কী করে? অনসূয়া মোড়া টেনে বসল। আনমনা মুখে একটা পকোড়া তুলল প্লেট থেকে। চিবোচ্ছে। থামল হঠাৎ। বলল, —কায়দা করে কিছু বলা যাবে না? ধর যদি বলা হয় টিবির এখন অনেক নতুন নতুন ট্রিটমেন্ট বেরিয়েছে বাবা, রে দেওয়াটাও সেরকমই....

—না না না না। ধীমান সজোরে ঘাড় নাড়ল, —না অভিদা, অনুর এ সব প্রিমিটিভ আইডিয়াতে একদম কান দেবেন না। এতে অনেক সময়ে হিতে বিপরীত হয়। পেশেন্ট আরও স্ট্রংলি রিঅ্যাক্ট করে। বিদেশে এখন পেশেন্টের কাছে কক্ষনও কিছু গোপন করা হয় না। জানলে বরং পেশেন্টের উইলফোর্স বাড়ে, তার বাঁচার ইচ্ছেটা মেডিসিনাল ডোজকে হেলপ করে।

—আর যদি শুনে বাঁচার ইচ্ছেটা চলে যায়? অভিজিৎ প্রায় ফিসফিস করে উঠল।

—সেটা ফেট অ্যাকমপ্লি। চান্স একটা নিতেই হবে। বরং জানার পর যা বিহেভিয়রই করুন দ্যাট ক্যান বি ট্যাকলড। আমরা বোঝাতে পারি, ডাক্তার বোঝাতে পারেন, মা বোঝাতে পারেন.....

—সেটা ঠিক। অভিজিৎ বড় করে শ্বাস ফেলল, —বাবা একটা মিথ্যে আশা নিয়ে থাকবে, ক'দিন বাদে আশাটা চুরমার হয়ে যাবে, এটা বোধহয় বাবাব ওপর বেশি টর্চার হয়ে যায়।

—কারেক্ট। হি মাস্ট ফেস দা ফ্যাক্ট। আমরাও আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব, উনিও সজ্ঞানে কোঅপারেট করবেন, এটাই তো চিকিৎসার আইডিয়াল কন্ডিশান।

ধীমান জ্ঞান দিয়েই চলেছে। একবার শুরু করলে শালিমারের মালগাড়ির মতো কথা বলে যায় অন্তহীন। আর সে যা বলবে সেটাই যেন স্বতঃসিদ্ধ, তার ওপর কোনও প্রশ্ন চলে না। মানতে হয় মানো, না হলে নিজেকে মুর্খ প্রতিপন্ন করো।

ইন্দ্রজিতের রাগ হচ্ছিল অল্প অল্প। তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে না কেন? ইন্দ্রজিৎকে উপেক্ষা করে এত নিবিষ্ট ভঙ্গিতে কী করেই বা আলোচনা চলে এদের? দেখে মনে হয় যেন অমলকান্তি ইন্দ্রজিতের বাবা নন, অন্য কোনও অপরিচিত মানুষ, এদের মন্ত্রণাসভায় উটকো ঢুকে পড়েছে সে। উঁহু, তার এই ছুটে আসাটাকে কেউ ফিল পর্যন্ত করল না।

অভিজিৎ মাথা চুলকাচ্ছে, —সবই তো বুঝলাম ভাই, কিন্তু বলে কে?

—আপনি বলবেন।

—আমি! পারব না ভাই। আমি বলে ভয়ে বাবার ঘরে পর্যন্ত ঢুকছি না। চোরের মতো থাকি, চোরের মতো বেরিয়ে আসি। কাল রাতে ছাদে সিগারেট খেতে উঠছিলাম, মা দাঁড়িয়ে আছে দেখে মাঝসিঁড়ি থেকে নেমে এলাম। মা তো সব বুঝেই গেছে, তাকেই আমি ফেস করতে পারি না।

—বাট ইটস ইওর ডিউটি অভিদা। বড় হওয়ার অনেক ঝামেলা।

—জানি কিন্তু... অনু, তুই বল না বাবাকে।

—অসম্ভব। বাবা মরে যাবে এ কথাটা আমি বাবাকে... অনসূয়া হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কান্নার প্রাথমিক দমকা সামলে আঁচল চেপেছে মুখে। ফোঁপাচ্ছে। অভিজিৎ থামানোর চেষ্টা করছে তাকে।

শেষ পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তেই আসা গেল না। কথাটা রয়ে গেল অনির্ণেয় ভবিষ্যতের গর্ভে। এ সব সভায় বোধহয় এমনটাই হয়, ভাবছিল ইন্দ্রজিৎ। এই মুহূর্তে বিরক্তি ছাপিয়ে একটু স্বস্তিও অনুভব করছিল মনে মনে।

কথাটা ভাগ্যিস তাকেই বলতে বলেনি কেউ।

আট

লেকটাউনের হাসপাতালটায় পা দিলেই বোঝা যায় এটা কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠান নয়। অন্দর বাহির সবই বেশ ঝকঝকে, করিডোর অফিস আউটডোর ডাক্তারদের ঘর, সর্বত্রই সুশৃঙ্খল ভাব। ব্যস্তসমস্ত মুখে নার্সরা ছুটছে এদিক-ওদিক, উর্দিপরা কর্মচারীদের চোখে মুখে কোনও উদাসীন

আলস্য নেই, দেওয়ালগুলোও বিস্ময়কর রকমের সাদা। রুগিদের ভিড় আছে, সরকারি হাসপাতালের মতো উপচোনো না হলেও, ভালই আছে। কিন্তু তারাও বেশ সুনিয়ন্ত্রিত, কোথায় কখন যেতে হবে তা নিয়েও হুড়োহুড়ি নেই তাদের মধ্যে। শোনা যায় অনেক বড় বড় শিল্পপতি এই হাসপাতাল গড়ার জন্য মোটা টাকা দান করেছেন, সাধারণ মানুষও অর্থ জুগিয়েছে। এই মারণ ব্যাধিকে নির্মূল করতে কে না চায়। দেখে মনে হয় হাসপাতালের পরিচালন কর্তৃপক্ষ মানুষের সদিচ্ছার সম্মান দিতে জানে।

বাবাকে নিয়ে ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল অনসূয়া। কুঁজো হয়ে হাঁটছেন অমলকান্তি, মেয়ের কাঁধ ধরে। ধুতি শার্ট পরা তাঁর ছোটখাটো শরীর আরও ছোট দেখায় এখন।

করিডোরে সারবন্দি ফাইবার গ্লাসের চেয়ার। ফাঁকা দেখে একটাতে বাবাকে বসাল অনসূয়া, —জল খাবে ?

অমলকান্তি হাঁপাচ্ছেন। মাত্র বিশ-তিরিশ পা হেঁটেই। দুদিকে ঘাড় নাড়লেন, —না।

—খাবে কিছু ? সঙ্গে বিস্কুট আছে, দেব ? সন্দেশ ?

—নন্‌না।

—কখন তো খেয়ে বেরিয়েছ, খাওনা কিছু। চা আনি ? তুমিও খাবে, আমিও খাব।

—নন্না। বলতে গিয়ে অমলকান্তির কাশির দমক এল একটা। বড় না, ছোটই। সামলাতে সামলাতে বললেন,—তুই খা। আমি পরে খাব।

থাক তবে, অনসূয়াও পরেই খাবে। দাদাও নয় ডাক্তারের ঘর থেকে বেরোক। তবে এখন একটু চা হলে মন্দ হত না, ভাবল অনসূয়া। বাবার পাশের চেয়ারটা ফাঁকা হয়েছে, বসতে বসতে ঘড়ি দেখল। এগারোটা চল্লিশ। ধীমান শেষ পর্যন্ত এল না। সংশয়টা মনে ছিলই, বিশেষত যখন সাতসকালে কী এক ছাতার মাথা কাজ দেখিয়ে বেরিয়ে গেল ধীমান। বলেছিল ঠিক টাইমে হাসপাতালে পৌঁছে যাবে, কিন্তু...

ধীমানকে বোধহয় বেশি না জড়ানোই ভাল। যত যাই হোক, ধীমান ব্যস্ত লোক তো বটে। তাও কাজ ফেলে এদিক-ওদিক ছুটছে, ডাক্তার বদ্যি করেছে, এইটুকুই বা ক'টা জামাই করে ! তবু যেন তার না আসাটা কাঁটা হয়ে ফুটছে। আসবে বলল কেন ?

অনসূয়া বাবার দিকে তাকাল। সামনেই এক মধ্যবয়সি রুগিকে স্ট্রেচারে শোয়ানো, অমলকান্তি চোখ কুঁচকে দেখছেন তাকে। মুখটা বিকৃত করলেন হঠাৎ। ঘাড় নামিয়ে নিলেন। ঢুলছেন। যেন চারপাশের এই প্রায়মৃত্যুর মিছিলে চোখ বুজে থাকাতেই শান্তি।

বাবাকে দেখে আজ ভারী অবাক হচ্ছিল অনসূয়া। বার বার। এখানে আসার সময়ে দিব্যি প্রশ্নহীন উঠল ট্যাক্সিতে। ডাক্তারের কাছে বসে রইল অতক্ষণ, মন দিয়ে শুনল ডাক্তারের কথা, কিন্তু কোনও ভাবান্তর নেই ! সেখানেও ঢুলছিল মাঝে মাঝে, এরকমই। হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে, থাকতে হবে এক মাস, এ সব কথাও কি বাবার মনে কোনও রেখাপাত করল না ! এ কি নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার চেষ্টা ! নাকি নিজের মধ্যে নিজের মতো করে জোর খুঁজছে বাবা। কাউকেই মুখে কিছু বলতে হল না বাবাকে, এটাও বেশ ভাল হয়েছে। বাবা একটু বোকাসোকা ধরনের মানুষ, কিন্তু সত্যিই তো বোকা নয়। তারও মনের ভেতর হয়তো কোনও জটিল বোঝাপড়া চলে অনুক্ষণ। হয়তো এখনও চলছে।

অভিজিৎ ফিরছে। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে বাবাকে দেখল এক ঝলক, ইশারায় ডাকছে অনসূয়াকে।

উঠে গেল অনসূয়া। এত দূর থেকে বাবার শুনতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তবু ফিসফিস করে বলল, —আর কী কথা হল ? কবে ভর্তি করবে ?

—উনি তো পারলে আজই বাবাকে বেডে শুইয়ে দেন। তবে সেটা বোধহয় বাবার কাছে বড় ধাক্কা হয়ে যাবে। তা ছাড়া মা-ও... অভিজিৎ বোনের চোখে চোখ রাখল, —কাল অ্যাডমিশান করে দিই, কী বল ? এমনিই তো আর দেরি করা ঠিক নয়। ছাব্বিশ দিন ধরে ছাব্বিশটা ফ্র্যাকশান দেবে.... যত তাড়াতাড়ি মূল চিকিৎসা শুরু হয় ততই মঙ্গল।

—নিশ্চয়ই...

দুই তরুণ ডাক্তার গল্প করতে করতে যাচ্ছে সামনে দিয়ে। সসম্ভ্রমে খানিকটা সরে দাঁড়াল অভিজিৎ। একটু পরে বলল, —একটা অন্য কথাও ভাবছিলাম রে।

—কী ?

—বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করাটা ভুল হচ্ছে না তো ? রোজ ট্যাক্সিতে এনে এনে রে দিইয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু তুই বল সেটা কি প্রতিদিন সম্ভব ? বাবার এই শরীরে ? পথও কম নয়। কোথায় গড়িয়া, কোথায় লেকটাউন ! .... তা ছাড়া ডাক্তারবাবুই অ্যাডমিশানের জন্য ইনসিস্ট করছেন, তুই তো নিজের কানে শুনলি।

কাকে কৈফিয়ত দেয় দাদা ? অনসূয়াকে ? পাড়া প্রতিবেশীকে ? আত্মীয়-স্বজনকে ? নাকি নিজেকে ? অভিজিৎকে দেখে মায়া হচ্ছিল অনসূয়ার। কেমন যেন দিশেহারাভাব দাদার।

নরম সুরে অনসূয়া বলল, —দোনামোনা করছিস কেন ? তুই ঠিক ডিসিশানই নিয়েছিস।

—বলছিস ?

—অবশ্যই। দায়িত্ব তুই নিয়েছিস, ডিসিশানও তোর।

অভিজিতের চোখ যেন সামান্য উজ্জ্বল হল। তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। ঘড়ি দেখে বলল, —ধীমানটা এসে পৌঁছতে পারল না।

—ওর কাজের যা বিশ্রী নেচার। অনসূয়া তড়িঘড়ি বলে উঠল, —নির্ঘাত আটকে গেছে। কোথাও কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না।

—যাক গে, কাজ তো হয়েই গেল। ওকেও সত্যি বড্ড বেশি ট্যাক্স করা হচ্ছে। ভাবছি ইন্দ্রকে কাল সঙ্গে আসতে বলব।

—ইন্দ্রকে তুই বলছিস না'ই বা কেন ? বাবার ওপর ওর কোনও ডিউটি নেই ?

—করবে। .... ছেলেমানুষ....

—কোনওদিন করবে না। সে ওই খোকাবাবুটি হয়েই থাকবে। আর কেটে কেটে বেড়াবে। সেদিন আমাদের বাড়িতে অতক্ষণ রইল, অত কথা হল, টু শব্দটি করল একবারও ? ডাক্তার কী বলল সেটুকু জেনেই তার কর্তব্য শেষ ?

—কেউ যদি নিজে থেকে না বোঝে, এগিয়ে না আসে, আমি কী করব ? জোর করে তো কারও মধ্যে ডিউটিবোধ জাগানো যায় না ! অথচ আয়রনি দ্যাখ, ওই ছোট ছেলের জন্যই বাবাকে সবথেকে বেশি ঢালতে হয়েছে। শান্ত অভিজিৎ যেন চকিতে উত্তেজিত, —এই যে বাবাকে এত ডাক্তার দেখানো হচ্ছে, ওষুধ, ইনভেস্টিগেশান, এর জন্য কী লাগছে, কত খরচা হচ্ছে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে কোনওদিন ?

—দোষ তো তোরই। তুই জানাস না কেন ?

অভিজিৎ চুপ করে রইল। একবার দেখল অনসূয়াকে, মুখ সরিয়ে নিল।

অনসূয়া স্থির চোখে তাকাল, —এখানে কত পড়বে কিছু এস্টিমেট করেছিস ?

—থাকা ট্রিটমেন্ট সব নিয়ে পঁচিশ তো বটেই। বেশিও হতে পারে।

—হাজার !

—নয় তো কি শো ? অভিজিৎ ম্লান হাসল,— সাধে কি দুঃখ হয়। যাক গে, ওকে ছেলেমানুষ ভেবে নেওয়াটাই আমার কনসোলেশান।

অনসূয়ার হঠাৎ বাবার ওপর চোখ পড়ল। অনেকটা সময় কখন যেন কথায় কথায় কেটে গেছে। এতক্ষণ ঢুলছিলেন অমলকান্তি, উঠে দাঁড়িয়েছেন এই মাত্র। উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করেছেন।

অনসূয়া অভিজিৎ দৌড়ল দুজনে। দু দিক থেকে ধরেছে বাবাকে।

ব্যস্ত মুখে অনসূয়া বলল, —যাচ্ছিলে কোথায় ?

—বারে, বাড়ি যাব না। ভাবলাম তোরা চলে গেছিস...

—পাগল পাগল। তোমাকে ফেলে আমরা... ভাবলে কী করে ? অনসূয়া হেসে ফেলল, —যাবে যে, তোমার পকেটে পয়সা আছে ?

বুকপকেটে হাত দিলেন অমলকান্তি, —না তো।

অভিজিৎ আবার ঘড়ি দেখছে। চিন্তান্বিত মুখে বলল, —অনু, তুই একটা কাজ করবি ?

—কী বল ?

—তুই তো এখন গড়িয়াতেই ফিরবি ?

—হ্যাঁ। ঝিমলি আছে...

—তুই একটু বাবাকে নিয়ে চলে যা না রে। আমি ট্যাক্সিতে তুলে দিচ্ছি... পারবি ? অভিজিৎ ইতস্তত করছে, —আমি একবার সল্ট লেক ঘুরে যাব ভাবছি। একটা কাজ অনেক দিন ধরে পেন্ডিং পড়ে আছে, সেরে আসি। কাল থেকে এক মাস যে কী যাবে কে জানে !

তিন জনে উঠেছে ট্যাক্সিতে। সল্টলেকের মুখে নেমে গেল অভিজিৎ। অমলকান্তি চুপটি করে চোখ বুজে বসে আছেন, অনসূয়ার চোখ জানালার বাইরে। শহরের এদিকটায় এখনও শ্যামলিমা আছে, তাকিয়ে থাকলে চোখ জুড়িয়ে যায়। গরম বাতাসের ঝাপটা আসছে একটানা, কিন্তু যেন তত গায়ে লাগে না। ঝাঁ ঝাঁ বেলাতেও বাইপাসে গাড়ির কমতি নেই। সকলেই ছুটছে দ্রুত, অতি দ্রুত। ট্যাক্সি লবণহ্রদ এলাকা পার হয়ে গেল।

আচমকা অমলকান্তির সাড়া পেয়ে অনসূয়া ফিরে তাকাল, —কিছু বলছ বাবা ?

পিঠ সোজা করে বসেছেন অমলকান্তি, —আমার একটা কথা রাখবি অনু ?

অনসূয়া বাবার কিছুটা কাছ ঘেঁষে এল।

—আমাকে একটা সিলকের পাঞ্জাবি কিনে দিবি ?

অনসূয়ার নিজের কানকে বিশ্বাস হল না। স্তম্ভিতভাবে বলল, —হঠাৎ !

—আমার পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে গেছে। কাল হাসপাতালে একটু সেজেগুজে আসব না। এই জামাটা দ্যাখ, কলারটা ফাটা।

অনসূয়ার দু চোখ জলে ভরে এল। বাবার শার্টটা সত্যিই মলিন। বেরোনোর সময়ে তাদের আরেকটু যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। বাবা কি সুস্থ মস্তিষ্কে কথাটা বলছে ? এ সময়ে কারও পাঞ্জাবির কথা মনে পড়ে ? বাবা তো কক্ষনও তাদের কাছে কিছু চায় না কোনওদিন ! ছেঁড়া লুঙ্গি পরে ঘুরছে তো ঘুরছেই। কেউ যদি হাতে করে এনে দিল তো খুব খুশি। কিন্তু নিজে মুখ ফুটে... !

আজ এমন একটা সময়ে বাবা যদি চাইলই, তো প্রাণ নয়, সাহচর্য নয়, উষ্ণতা নয়, শুধু একটা পাঞ্জাবি !

অনসূয়া ভিজে গলায় বলতে গেল, আজই বিকেলে কিনে দেব। কিন্তু তার আগেই অমলকান্তির ঘাড় আবার ঝুলে গেছে, ঘুমোচ্ছেন। ফরর ফরর করে শব্দ বেরোচ্ছে নাক দিয়ে। নিদ্রার ঘোরেই কাশলেন একটু, এলিয়ে গেল ঘাড়টা।

অনসূয়া ধরে নিল বাবাকে। গলার কাছে একটা শক্ত ডেলা জমাট বাঁধছে। হৃৎপিণ্ড কি কণ্ঠনালীতে উঠে এল। সে ছিল বাবার সবচেয়ে প্রিয়। কখনও তার দিকে চোখ লাল করে তাকায়নি বাবা, শত অপরাধেও না। অনুকে নিয়ে বেরোলেই বাবার পকেট ফরসা। লজেন্স কিনে দিচ্ছে, হজমি কিনে দিচ্ছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে মেয়ের সঙ্গে ফুচকা আলুকাবলি খাচ্ছে বাবা। মা বলত, বেশি আহ্লাদী। ইন্দ্র আর দাদা হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরত। অনসূয়াকে খেপানোর জন্য ছড়াও বেঁধেছিল দাদা। অনু অনু অনু, নয়নের মণি হনু। ছেলেরা সব পর, জলে ডুবে মর।

চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠল অনসূয়ার। বিয়ের পর প্রথম বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে অনসূয়া, মা কাঁদছে, বউদি কাঁদছে, দাদার চোখ ছলছল, ইন্দ্রর মুখ চুন, বাবা কোথাও নেই। গেল কোথায় ? খোঁজ খোঁজ খোঁজ। পাওয়া গেল শেষে। বাড়ি থেকে পালিয়ে গড়িয়া স্টেশনে গিয়ে বসে আছে। মেয়ের বিদায়দৃশ্য সইতে পারবে না !

সেই বাবা আজ এক পা রেখেছে কফিনে। তার জন্য কবে কী করতে পেরেছে অনসূয়া ? বাবাকে জাহাজে চড়াতে পারেনি, কেদার বদরি দেখাতে পারেনি, প্লেনে চড়ার বাসনা পূর্ণ করতে পারেনি....। এ সব তো তাও মহার্ঘ চিন্তা, অনসূয়ার সাধ্যের বাইরে। সামান্য সাগরদ্বীপে যেতে চেয়েছিল, তাই হল না। আজ যাব কাল যাব করে দিন যে চলে গেল !

বিয়ের পর মেয়েরা বুঝি এরকমই হয়ে যায়। স্বার্থপর। নিজের সংসারসর্বস্ব। জোরো বাবাকে দেখতে আসারও কতদিন সময় হয়ে ওঠেনি অনসূয়ার!

ঘচাং করে ব্রেক মেরেছে ট্যাক্সি। সামনে একটা গোরু এসে পড়েছিল অকস্মাৎ, তাকে কাটাল সুকৌশলে। ঝাঁকুনিতে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলেন অমলকান্তি, অনসূয়া চেপে ধরল বাবাকে।

সহসা অমলকান্তির চোখ টান টান, —অনু, আমার ছিপটা কোথায় গেল?

অনসূয়া কেঁপে গেল, —কোন ছিপ? কী ছিপ?

—কাল সকালে সাঁকরাইলে মাছ ধরতে যাব না! অত টাকা দিয়ে টিকিট কাটলাম।

অনসূয়া বাবার কবজি খামচে ধরল। প্রতিটি প্রকট শিরা উপশিরা নীল নীল দড়ি হয়ে পরস্পর জট পাকিয়ে আছে, কাঁপছে টিপটিপ। গায়ে বেশ জ্বর রয়েছে বাবার। আসার সময়েও এমনটি ছিল না, ধকলটা কি বেশি হয়ে গেল আজ!

অনসূয়া বলল,—সিটে হেলান দিয়ে একটু শোও তো।

বাধ্য ছেলের মতো শুলেন অমলকান্তি, ব্যাকসিটে হেলান দিয়ে। কণ্ঠা ঠেলে উঠেছে, গলার নীচে এক বড়সড় গহ্বর, তামাটে রঙে কেমন একটা কালো ছায়া পড়েছে, হাড়ের ওপর চামড়াটুকু সার। ডাক্তার বলছিল এ রোগে নাকি এমনটাই হয়। প্রতিদিন একটু একটু করে ক্ষীয়মাণ হয় দেহ। এই কি মৃত্যুর ছায়া!

অমলকান্তি আবার চোখ খুলেছেন। হলদেটে চোখে দেখছেন বাইরের পৃথিবী। উলটো মুখে ছোটা। আবার বুজলেন চোখ, আবার খুললেন। এবার চোখ জুড়ে বিস্ময়, —আমরা কোথায় যাচ্ছি রে অনু?

—কোথায় আবার! বাড়ি। গড়িয়ায়। এই তো বাঘাযতীন রেললাইন এসে গেল।

—গড়িয়া কেন? আমাদের সল্টলেকের বাড়ি কী হল? ভেঙে গেছে?

—বাবা, চুপ করো। ঘুমোনোর চেষ্টা করো।

—কত কষ্ট করে বাড়িটা বানালাম, তোরা ভেঙে দিলি অনু?

অমলকান্তি আবার স্থির!

অনসূয়া বাবার কথার পরম্পরা খুঁজে পাচ্ছিল না। আবার যেন পাচ্ছিলও। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ইচ্ছেতে বাবা ডুবে আছে। বাবা সিলকের পাঞ্জাবি পরবে, ভাবা যায়! জন্মে কোনওদিন সিলক পরেছে বাবা! ওসব শখ শৌখিনতা কোনওদিন ছিলই না। অথবা ওই মাছ ধরার বিলাসিতা। গড়িয়ায় বাড়ি করে কি বাবার তৃপ্তি হয়নি! তাই বুঝি সল্টলেক ঘুরে বেড়াচ্ছে মনের কন্দরে। এত অবরুদ্ধ বাসনা নিয়ে কী করে এত সুখী ছিল বাবা।

বাড়ি এসে গেল। ঝাঁকিয়ে অমলকান্তিকে তুলল অনসূয়া। নামাল অতি কষ্টে। খানিক আগেও অমলকান্তির শরীরে যেন সামান্য জোর ছিল, এখন যেন সম্পূর্ণ হৃতবল।

ঋতু ছুট্টে বেরিয়ে এসেছে। ননদ ভাজ মিলে খাটে শুইয়ে দিল অমলকান্তিকে।

—বাবার গা যে পুড়ে যাচ্ছে গো!

—যা স্ট্রেন গেল বাবার! কী দূর, ট্যাক্সিতে নব্বই টাকা ওঠে! কাল যে আবার কী করে বাবাকে ভর্তি করতে নিয়ে যাওয়া হবে!

—ওমা, কালই ভর্তি!

—হুম, এক মাস...

—অনু, তুই আগে খেয়ে নে। কল্যাণী দরজায়, —তোমার শ্বশুরকে একটু উঠিয়ে বসাও তো ঋতু। ওঁর খাবারও আনি।

সব শুনেছে মা, তবু কী অকম্পিত স্বর। অনসূয়ার বুকে যেন বল এল এতক্ষণে। ক্ষুধা তৃষ্ণা সব যেন ফিরে এল অকস্মাৎ, স্নায়ুতন্ত্রী সচল আবার।

অনসূয়ার একবার মনে হল স্নান করে নিলে কেমন হয়! থাক গে, সকালে তো করেইছে, আবার নয় বাড়ি ফিরে দেখা যাবে।

বাথরুম থেকে ঘাড়ে মুখে থুপে থুপে জল দিয়ে এল অনসূয়া। ঋতুর সঙ্গে কথা হল দু-চারটে।

হাসপাতাল নিয়ে, দাদার ফেরা নিয়ে, বাবার যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে। খেয়ে উঠে ইন্দ্রর খাটে এসে শুয়েছে, ঘুমন্ত ঝিমলিকে নিয়ে। মেয়েকে দেখতে দেখতে নিজেরও কখন চোখ জড়িয়ে এল।

ছোট্ট শব্দে কেটে গেছে তন্দ্রা। মা।

একটু সরে শুল অনসূয়া, মাকে জায়গা করে দিল।

কল্যাণী শুলেন না। খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বসেছেন। বললেন, ধীমানের ফোন এসেছিল, শুনেছিস ?

—হ্যাঁ, ঋতু বলেছে।

—অফিসেই আছে, ওকে কি এখন ফোন করবি একটা ?

অনসূয়া উৎসাহ দেখাল না। বলল,—তার ইচ্ছে হলে সে আবার ফোন করবে। নয়তো রাতে ফিরে শুনে নেবে।

কল্যাণী ঘুমন্ত ঝিমলির মাথায় হাত বোলাচ্ছেন। চোখ বিছানার চাদরে স্থির, শূনা অথচ শূন্য নয়। এক সময়ে মাথাটা ঝাঁকালেন সামান্য। সোজা হয়ে বসলেন,—হাসপাতালটা কেমন দেখলি রে অনু ?

—খুব ভাল মা। ঝকঝকে তকতকে। নতুন খুলেছে তো, খুব যত্নআত্তি করে। দেখে মনে হয় দামি নার্সিংহোম।

—অনেক খরচ, না ?

—সাংঘাতিক কিছু নয়। খরচের পরিমাণটা মাকে জানাতে গিয়েও জানাল না অনসূয়া। দাদা যদি কিছু মনে করে ! হেসে বলল,—এ সব তো আমাদের ভাবনা মা, তুমি ভাবছ কেন ?

—হুঁ, বার্ধক্যে তো সন্তানই অবলম্বন।

—ওভাবে বলছ কেন মা ? তোমরাও তো আমাদের অবলম্বন।

কল্যাণী বিষণ্ণ হাসলেন। বন্ধ ঘর ওই হাসিতে যেন আরও ছায়া ছায়া হয়ে গেল। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন,—তোর বাবাকে কি কেবিনে রাখা হবে ?

—কেবিন নয়.. ওই কেবিন মতোই। একটা বড় ঘরে ছ'জন করে পেশেন্ট। সিঙ্গলবেড ডবলবেডে ভিড় খুব বেশি, এগুলোতে তাও খালি পাওয়া যায়।

—ওখানে তো সব বেডই খালি হয়ে যায়।

অনসূয়ার বুকটা চিনচিন করে উঠল। কী নিস্পৃহ মুখে অমোঘ সত্য বলে মা ! মা কি মায়াহীন ? প্রেমহীন ? মার তুলনায় বাবা সাধারণ, খুবই সাধারণ। রূপে, গুণে, ব্যক্তিত্বে, বুদ্ধিতে। কিন্তু এতকালের একত্র বাসও কি এতটুকু ভারসাম্য তৈরি করেনি দুজনের সম্পর্কে ? তেমন কোনও নিবিড় বন্ধন ?

ভার গলায় অনসূয়া বলল, পজেটিভ অ্যাপ্রোচ আনো মা। আমরা সবাই মিলে মন প্রাণ দিয়ে চাইলে বাবা হয়তো ভাল হয়ে উঠবে।

শুয়ে পড়লেন কল্যাণী। হাত আড়াআড়ি চোখের ওপর। বিড়বিড় করে বললেন,—হাসপাতালটা দূরে হয়ে গেল। তোদের যাতায়াত করতে অসুবিধে হবে।

—যার টান আছে, সে ঠিক যাবে। বলেই মার কথায় একটা অন্য গন্ধ খুঁজে পেল অনসূয়া। সন্দিগ্ধ গলায় বলল,—তুমি যাবে না ?

—যাব এক আধদিন। সবাই মিলে বাড়ি ফেলে গেলে চলবে কেন ? এই বাড়িটাও তো উনিই।

অনসূয়া কথাটা বুঝল না। আলগাভাবে বলল, —না না, তুমি রোজ যাবে। দরকার হলে বউদি থাকবে বাড়িতে।

—সে একা ভূতের মতো বাড়ি আগলাবে ?

—কেন নয় ? যদ্দিন না এ বাড়ি থেকে পিটটান দিচ্ছে, তদ্দিন সামলাবে নাই বা কেন ?

—আহ্ অনু, ছোট মন হোস না। চোখ থেকে হাত সরালেন কল্যাণী। মেয়ের দিকে ফিরে শুয়েছেন, —হ্যাঁ রে অনু, হাসপাতালে গাছপালা আছে ?

—প্রচুর আছে। কী সবুজ, কী সবুজ। সামনে কেয়ারি করা ঘাসের লন, বেঁটে বেঁটে ঝাউ,

অশোক...

—তুই তো তোর বাবার সঙ্গে যাবি, দেখিস যেন একটা জানলার ধারে বেড পায়। মানুষটার খুব গাছের শখ ছিল। বাড়িটাকেই ডালপালা মেলাতে পারল না, তো গাছ!

অনসূয়া বিস্মিত হল। কস্মিনকালে বাবাকে টবেও গাছ পুঁততে দেখেনি, তার নাকি গাছের শখ ছিল! শুধু মা'ই কথাটা জানে!

ক্ষণিকের জন্য অনসূয়ার ইচ্ছে হল বাবার পথের প্রলাপগুলো বলে ফেলে মাকে।

উঁহু, কথাগুলো অনসূয়ারই বুকে জমা থাক।

কল্যাণীর অমলকান্তি আর অনসূয়ার বাবা দুজনে এক মানুষ নাও হতে পারে।

নয়

সময় কখনও আরবি ঘোড়ার চেয়ে বেগবান, কখনও বা শামুকের চেয়েও শ্লথ। কিন্তু সময় যে একইসঙ্গে দুটো গতিতেই ছুটতে পারে, এমনটি অভিজিতের ধারণা ছিল না। গত চার সপ্তাহ রোজ হাসপাতালে এসে এসে এখন সে বুঝে গেছে, শুধু এ দুটোই নয়, আরও অসংখ্য গতি আছে সময়ের। ঘড়ির কাঁটা বা ডেট ক্যালেন্ডার দেখে একে নিরূপণ করতে চাওয়া অর্থহীন।

বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর প্রথম প্রথম সময়ের থই পেত না অভিজিৎ। সকাল দশটায় বাবাকে রেডিয়েশান রুমে নিয়ে যাওয়া হবে, তার আগে যেভাবেই হোক হাঁচোড় পাঁচোড় করে পৌঁছতে হবে সেখানে। কতক্ষণই বা সেই রহস্যময় ঘরে থাকে বাবা! দুমিনিট, তিন মিনিট, বড়জোর পাঁচ মিনিট! ওই পলটুকুকেই যে কী দীর্ঘ মনে হয়! অন্তত তখন হত। বুকে একটা আশঙ্কা তখন বিপ বিপ করত যে। তেজস্ক্রিয় রশ্মি আর খুনে জীবাণুর সংঘর্ষের মাঝে পড়ে এই বুঝি প্রাণ হারাল বাবা! শিশুসুলভ ভাবনা, তবু মনে হত। মনের ওপর তো হাত নেই। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বুকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাবা, একটু দৃষ্টি বিনিময়, দুটো-চারটে কথা, তারপর ছুট ছুট ছুট। কখনও সঙ্গে অনু, কখনও সঙ্গে ইন্দ্র, কখনও তিন জনে, কখনও বা একাই। মাকে খবরটা দিতে হবে। সমুদ্রে এক ডুব দিয়ে উঠতে যেটুকু সময় তার চেয়েও তাড়াতাড়ি পার হয়ে যায় দুপুর। আবার দৌড়। সাড়ে চারটেয় ভিজিটিং আওয়ার শুরু, নিশ্চয়ই বাবা বাড়ির লোকের পথ চেয়ে আছে। ভিজিটারও আসবে অনেক, তারা যদি দেখে বড় ছেলে নেই। রাতে ফিরে হাক্লান্ত দশা। ঘুমের আগে চিন্তা, উঠব কখন!

প্রথম দিকে লোকজন আসছিলও বটে। পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কে নয়। পাড়ার বিখ্যাত চুল্লুখোর মদনদা, সেও একদিন বাবাকে জরিপ করে গেল। কোন্নগরের পিসির সঙ্গে জন্মে যোগাযোগ নেই, সেও নীলুকাকার মুখে খবর পেয়ে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে হাজির। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে হাউমাউ কাঁদল খানিক। বেরিয়েই পান জরদা মুখে ফেলে মাকে উপদেশ। অমলদা থাকতে থাকতে ছোট ছেলের বিয়েটা দিয়ে দাও কল্যাণী, হাতে আমার ভাল পাত্রী আছে! গান জানে, নাচ জানে, রান্নাবান্নার হাত ভাল! ঋতুর বাড়ি থেকে লোক আসার তো বিরামই নেই। আজ পল্লব, কাল পল্লব মালা, পরশু শৈলেন মালা, ছুটির দিনে পল্লব মালা শৈলেন প্রতিমা, গুবলু সহ। শৈলেন মুহ্যমান থাকেন, বেয়াইকে দেখে এসে ঝুম বসে পড়েন লনে। পল্লবও থাকে অভিজিতের পাশে পাশে, জানতে চায়, বুঝতে চায়। মালা আর প্রতিমার কাছে এটা একটা নিটোল আউটিং। গুবলু লনে দাঁড়াচ্ছে টলমল, একদিক থেকে প্রতিমা বলছেন, হাঁটি হাঁটি পা পা, অন্য দিক থেকে মালা সুর তুলছে, গুবলু হাঁটে দেখে যা! ভিজিটিং আওয়ার শেষ হতেই ক্যান্টিনে চা চপ কেক ঘুগনি ডালকচুরি। সে তো অবশ্য অভিজিৎ অনুরাও খায়। কল্যাণী যেদিন আসেন, তিনিও। কী করা যাবে! খিদের টান বড় টান। বরুণদা নীতুদিও আসছে প্রায়ই। বরুণদা এলে ক্যান্টিনে মোগলাই-এর অর্ডার পড়ে, ছ'টা আটটা দশটা।

তা সে যাই হোক, অভিজিতের বিকেলগুলো কেটে যেত একরকম। দ্রুতই। আরবি ঘোড়ার বেগে না হলেও কলকাতার ওভারটেক করা মিনিবাসের গতিতে তো বটেই। লোকজনের সান্নিধ্যে।

লোকজনের সঙ্গে কথা বলে। লোকজনকে দেখে দেখে। পঙ্গপালের মতো লোক দেখে একটু যেন তৃপ্তিও হত মনে মনে। তার বাবা তবে তত নগণ্য নয়! একটা অসুখ বাবাকে অনেকটা বিশেষত্ব দিয়েছে। নাকি অসুখটা ভয়ঙ্কর বলেই বাবা আজ ভি আই পি!

কথাটা মনে হলেই আরও একটা অদ্ভুত চিন্তা ঢুকে পড়ে অভিজিতের মাথায়। এই যে এত লোক বাবাকে দেখতে আসে রোজ, বাবার পৃথিবীতে থাকা না থাকায় সত্যিই এদের কি কিছু যায় আসে! তিল মাত্র নয়। তবু আসে কেন? প্রথমে মনে হয় যেন সমবেদনা জানাতে। তলিয়ে ভাবলে অন্যরকম লাগে। একটা মানুষ পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমি দিব্যি বেঁচেবর্তে আছি, এই বোধে বোধহয় কোনও গোপন স্বস্তি আছে। এ যেন অন্যের মৃত্যুর আয়নায় নিজের জীবনটাকে এক ঝলক দেখে নেওয়া।

হবেও বা। আবার নাও হতে পারে। হয়তো মনের টানেই আসে মানুষ, অভিজিৎ বাবাকে নিয়ে আজকাল খুব গভীরভাবে চিন্তা করে বলেই এমনটা মনে হয়। মনের ওপর তো হাত নেই।

সত্যিই যে কেউ কেউ মনের টানে আসে, অভিজিৎ বেশ টের পায়। বাবা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দুদিন পরেই ছুটে এসেছিল একটা বুড়ো লোক। এক সময়ে বাবার অফিসের পিওন ছিল। কোত্থেকে খবর পেয়েছিল কে জানে! বাবার ঘরে ঢোকেনি লোকটা, দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়, দূর থেকে দেখছিল বাবাকে। ইন্দ্র কত বার যেতে বলল বাবার কাছে, কিছুতেই গেল না। করিডোরে দাঁড়িয়ে ঘষা কাচের চশমা খুলে চোখ মুছছিল। অমলবাবু মারা গেলে পৃথিবীর শেষ ভাল লোকটা চলে যাবে! লোকটার কী উপকার করেছিল বাবা? একটা মানুষের কাছেও তো বাবা পৃথিবীর সেরা মানুষ হয়ে রইল।

তা প্রথমটা এভাবেই কাটছিল।

সাত-আট দিন যেতে না যেতেই সময়ের গতি বদলে গেল।

কদিনের মধ্যেই অভিজিৎ বেশ বুঝে গেছে, সকালে হাসপাতালে পৌঁছতে দু-চার মিনিট দেরি হলে এমন কিছু আকাশ ভেঙে পড়ে না। হাসপাতালের লোক সময় মতোই বাবাকে হুইল চেয়ারে বসাবে, রেডিয়েশান রুমে নিয়ে যাবে, বেডে ফিরিয়ে দেবে, সবই হয়ে যাবে মসৃণ যন্ত্রের মতো। দশটার মধ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করে অভিজিৎ, তবে পড়িমরি করে নয়। ক'দিনেই সকালে ওঠার অভ্যেস হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠে কিছুটা সময় থাকে হাতে, তার মধ্যেই বাজার সারে, কাগজ উলটোয়, ধীরেসুস্থে স্নানখাওয়া সেরে রওনা হয়ে যায়। সারা দিনের জন্য। হ্যাঁ, সারা দিনের জন্য। দুপুরে আজকাল আর বাড়ি ফেরে না। ধকলটা বড় বেশি হয়ে যাচ্ছিল ক'দিন। মিছিমিছি। হাসপাতালে সকালের কর্তব্য সেরে ফোন করে বাড়িতে। কোনও কোনওদিন অনু সঙ্গে থাকে দিনভর, নয়তো একা একাই...। বেচারা অনু তো আর সংসার শিকেয় তুলে রোজ রোজ ছুটে আসতে পারে না। ইন্দ্রর তো তিন দিন সকালে এসেই মুখ কাঁচুমাচু। তোর তো এখন সামার ভেকেশান চলছে দাদা, আমি যদি সকালে না আসি তুই একা ম্যানেজ করতে পারবি না! অতি সত্য কথা। কিন্তু সামার ভেকেশানে ইউনিভার্সিটির যে পরীক্ষাগুলো চলছিল, তার ডিউটির দিনগুলো ম্যানেজ করবে কে! আর গরমের ছুটিও যে দশ দিন আগেই ফুরিয়ে গেছে, সে খেয়াল কি করেছে ইন্দ্র! যাক গে থাক, ঘটনাচক্রে হোক, কি দুর্ঘটনাক্রমেই হোক, অমলকান্তি চৌধুরী অভিজিতেরও তো বাবা, না হয় সে একাই বোঝাটা টানল!

শুধু এই দুপুরগুলো যদি না থাকত! সকালের পরেই যদি ঝুপ করে বিকেলটা চলে আসত! সূর্য এত ধীরে ধীরে সরে! একা একা দুপুরগুলো কাটতেই চায় না। এক একটা সেকেন্ড যেন বছরের চেয়েও লম্বা। একটা দুপুর গোটা জীবনের চেয়েও দীর্ঘ। কাঁহাতক আর করিডোরে হেঁটে, লনে গড়িয়ে, ক্যান্টিনে চা খেয়ে সময় কাটে! হাসপাতালে নতুন নতুন মানুষ দেখে দেখেও যদি...। এখানে কাউকে দেখেই সুখ নেই। হয় মৃত্যুপথযাত্রী, নয়তো তার সঙ্গীসাথী—সকলেই বিমর্ষ।

কলেজ খোলার পর এক-দুটো দিন একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিল অভিজিৎ। হাসপাতাল ঘুরে চলে গিয়েছিল কলেজে। মাঝদুপুরের ক্লাসগুলো নিচ্ছিল বেশ, কিন্তু অমনি গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। সেকেন্ড পিরিয়ডে মেয়েরা আপনাকে খুঁজছিল এসি! লাস্ট পিরিয়ড নেবেন না! যাক গে, আপনার

এখন এমারজেন্সি, একদিন না নিলে কী আর হবে ! পার্থদা তো সমব্যথীর সুরে কাঁধে হাত রাখল, এত টানাপোড়েন কেন নিচ্ছেন ভাই, ক'দিন নয় ছুটিই নিলেন ! আমার মতো তো লিভ এনক্যাশমেন্টের ব্যাপার নেই, এক মাস ছুটি নিলে মাথায় হাত পড়বে না ! অভিজিৎ বলতে পারল না, কলেজে এলে অনেকটা সময় চিন্তাশূন্য থাকা যায়। অ্যাপ্লিকেশান ঠুকে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

অথবা মরল।

আবার সেই একঘেয়ে সময় কাঁধে বসে থাকা।

কাঁহাতক ভাল লাগে ! মাঝে দুটো দিন সকালে ডুব মেরে দিয়েছিল, কাজেব অছিলায়। বিশুদ্ধ অছিলাও নয়, সত্যিই কাজ। এইচ ডি এফ সি অফিসে। লোনের দরখাস্ত জমা পড়ে গেছে, তদ্বির করতে গেছিল এক্ষুনি যেন লোনটা না বেরিয়ে যায়। অনেক টাকার বোঝা চেপেছে, আরও কত চাপবে তার ঠিক নেই, নতুন একটা জগদ্দল পাথর কাঁধে না নেওয়াই ভাল। ওই অফিসে অভিজিতের এক চেনা লোক আছে, তাকেই ধরবে ভেবেছিল, কিন্তু দুদিনের একদিনও তার দেখা পাওয়া গেল না। উলটে রাতে মার মুখে পলকা ছায়া। হয়তো ছায়া নয়, অভিজিতের মনের ভুল। কী করবে, মনের ওপর তো হাত নেই !

দুপুর কাটানোর জন্য দিন তিন-চার এক অভিনব উপায় বার করেছিল অভিজিৎ। কাছেই একটা সিনেমা হল আছে, রগরগে হিন্দি ছবি চলছে সেখানে। পাগল জওয়ানি। বারোটার শোয়ে পর্দার সামনে গিয়ে বসে থাকত অভিজিৎ। প্রায় নগ্ন মেয়েরা ধেই ধেই নাচছে, হিরো ভিলেন প্রমত্ত ঢিসুম ঢিসুম করছে, মাঝে মাঝে শর্টস আর কাঁচুলি ছেড়ে আপাদমস্তক শাড়িতে মুড়ে ঠাকুর পুজো করছে নায়িকা, নায়কের বাবা অনর্থক ভাঁড়ামো করে, নায়িকার মা কাঁদে অকারণ—বেশ মজা লাগত দেখতে। অবশ হয়ে আসত মস্তিষ্ক, বুজে আসত চোখ।

কিন্তু এতেও বিপদ। পঞ্চম দিন টিকিটের জন্য অভিজিৎ লাইনে দাঁড়িয়ে, কাউন্টারে পৌঁছনোর আগেই ঘাড়ে হাত।

—কি অভিদা, ফিল্লম মারছেন ?

অভিজিৎ তড়িৎস্পৃষ্ট। ধীমান। হাসছে হ্যা হ্যা।

কস্মিনকালে দুপুরে আসে না ধীমান, আজ কোত্থেকে মাটি ফুঁড়ে এল !

অভিজিৎ গুটিয়ে এইটুকুনি, —হ্যাঁ মানে... হাঁটতে হাঁটতে এদিকে এলাম...

—টাইম পাস ! এই সিলি ছবি দেখে !

অভিজিৎ হাত উলটোল। তা ছাড়া আর কী।

—বাবা কেমন আজ ?

—একই রকম।

ধীমান চোখ টিপল, —চলুন, আপনাকে সঙ্গ দিই। অফিসে শুনছিলাম এই ফিলমের নায়িকা নাকি সব সময়ে ভেজা থাকে !

স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল অভিজিৎ। বিস্ময় ফুটিয়ে বলল, —তাই ! চলো, দেখেই ফেলি।

পর্দার দৃশ্য আর কী দেখবে, যতই উত্তেজক হোক, এ তো বহুবার দেখা ! ধীমানের পাশে সিঁটিয়ে বসে আছে অভিজিৎ। ধীমান নিশ্চয়ই ভাবছে, শালা তো শালা আমার বড় শালা। মুমূর্ষু বাপ দুশো হাত দূরে মৃত্যুশয্যায় খাবি খাচ্ছে, আর ব্যাটা বসে বসে হিরোইনের নিতম্বনৃত্য গিলছে ! চড়া এসিতেও অভিজিৎ ঘেমে নেয়ে একশা। ইন্টারভ্যালে বাদাম চুষতে চুষতে, চিবোতে ভয় করছিল, গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, —ধীমান, ভাই, এ সব সিনেমা টিনেমার গল্প কাউকে বলার দরকার নেই।

—কেন ? কালচার কোথায় নামছে, সেটা তো মাঝে মাঝে সরেজমিন করা ভাল। ভালগারিটিকে চিনতে হবে না ?

—সে কথা নয়, সে কথা নয়... প্লিজ তুমি বোলো না। অনুকেও না।

—স্ট্রেঞ্জ ! কেন ?

অভিজিৎ ধীমানের হাত চেপে ধরেছিল, —বিশ্বাস করো, দুপুরটা আমার বড় লোনলি কাটে।

ধীমান ভরসা দিল,—কাকপক্ষীটি টের পাবে না।

হয়তো কথা রেখেছে ধীমান। হয়তো রাখেনি। তবে পরদিনই অনু যেন দাদার দিকে তাকিয়ে হাসছিল মিটিমিটি। নাকি হাসছিল না ? অভিজিতের দেখার ভুল। চোখ আর কতটুকু দেখে, দেখে তো মন। মনের ওপর হাত নেই।

ব্যস, দুপুর কাটানোর অভিনব পন্থা কবরে। উলটে এখন নতুন বিপত্তি। ধীমানের সঙ্গে যখনই দেখা হয়, ফিচলেমি করে গান ধরে, অভিদা লারেলাপ্পা লারেলাপ্পা লা লা...। মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে অভিজিতের। গানটা ওই সিনেমাতেই ছিল কিনা।

এই রকম বিপন্ন অস্তিত্ব নিয়েই অভিজিতের দুপুর এখন। তবে সূর্যদেব চরম নির্দয় নন, কাটে দুপুর। বিকেলও আসে রোজ। কিন্তু সে বিকেলও এখন চলে ধীর লয়ে। বাবার কাছে ভিজিটার আসা কমে গেছে ক্রমশ। ছুটিছাটার দিনে তাও আসে দু-চার জন, ঋতুর বাড়ির কেউ, নয়তো কোনও পড়শি। কয়েক দিনের জন্য বিশেষ মানুষ হয়েই আবার যেন তাৎপর্যহীন হয়ে গেছে বাবা। নিয়মিত ভিজিটার এখন শুধু তিন জন। তাও ইন্দ্র এক আধ বিকেল আটকে যায় অফিসে, তখন খালি অভিজিৎ আর অনু। মা দু-তিন দিন আসে সপ্তাহে। বলে, শরীরে কুলোয় না। অভিজিতের মনে হয় কারণটা অন্য। মা এলে ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফেরে অভিজিৎ, তাই হয়তো...। ছেলের ক'টা টাকা বাঁচাতে চায় মা। ঋতুও ছুটির দিন ছাড়া আসে না বড় একটা। রিমলির স্কুল খুলে গেছে, তাকে স্কুল থেকে আনা নেওয়া করবে কে !

কেটেই তো গেল দিনগুলো। সময়ের খেলা দেখতে দেখতে। আর মাত্র তিন দিন। কাল শেষ বে দেওয়া হবে বাবাকে, পরশু অবজারভেশান, পরদিন ছুটি।

অভিজিৎ সে কথাই ভাবছিল। লনের নরম ঘাসে হাত রেখে। পৌনে পাঁচটা বাজে, ওপরে গেছে অনু। মিনিট পনেরো পর নামবে, অভিজিৎ যাবে ওপরে। তারপর যাবে ইন্দ্র, সে আসবে সাড়ে পাঁচটায়। শেষ বেলায় তিন ভাইবোনই থাকবে বাবার কাছে, এটাই এখন রীতি।

অভিজিৎ সিগারেট ধরাল। গোটা জায়গাটাই ভারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, লোকের চোখ এড়িয়ে কোথায় কাঠি ফেলবে দেখছিল, মেন গেটে চোখ আটকে গেল। ঋতু আসছে। সকালে বলেনি তো ?

উঠে এগিয়ে গেল অভিজিৎ, —তুমি হঠাৎ !

উত্তর দেওয়ার তর সইছে না ঋতুর, অভিজিৎকে দেখেই উত্তেজনায় ফুটছে। চোখ ঘুরিয়ে বলল,— এই জানো, আজ কী কেলো হয়েছে !

—কী হল ?

—লায়লি পালিয়ে গেছে।

—কে লায়লি ?

—লায়লি। আমাদের পাশের পাশের বাড়ির। যার বাবা ইনসিওরেন্সে কাজ করে। ...পাড়ায় খুব হইচই। বাড়িতে নাকি ইয়া লম্বা চিঠি লিখে রেখে গেছে...

—এই খবর দিতে তুমি এতটা পথ উজিয়ে এলে !

—আহা, খবরটা তোমায় জানানোর জন্য বললাম। সামান্য দমে গেল ঋতু, —আমি বাবাকে দেখার জন্য বেরোচ্ছিলাম, তখন শুনলাম। সবসময়ে তুমি আমায় এমন করো না !

অভিজিৎ কিছু বলল না। দুজনে পায়ে পায়ে মেন বিল্ডিং-এর দিকে এগোচ্ছে।

হঠাৎ ঋতু প্রশ্ন করল,—অনু আজ আসেনি ?

—ওপরে আছে।

—ও, আমি ভাবলাম... তোমার দেবেনদার আজ ফোন এসেছিল।

—কখন ?

—এই তো, বারোটা-একটার সময়। রিমলি আজ স্কুলে গেল না, খাওয়াতে বসেছিলাম...

—কী বলল দেবেনদা ? অভিজিৎ ভুরু কুঁচকোল।

—বাবা কেমন আছেন জিজ্ঞেস করছিলেন। তোমাকে একবার ফোন করতে বলেছেন।

নির্ঘাত সেই টাকা ! কলেজে অভিজিতের টিকি ধরতে পারছে না, বাড়িতে খোঁজ নিচ্ছে। এখন টাকা অভিজিৎ দেয় কী ভাবে ? এখানকার বিল মেটাতেই পি এফ ভাঙার দশা, আলমারির সঞ্চয় তো কবেই চলে গেছে। আবার দেবেনদাকে একদম কিছু না ঠেকানো বড় বিশ্রী হচ্ছে, কাজ আটকে গেলে সব্বাই অভিজিৎকেই দুষবে।

অভিজিৎ গোমড়া মুখে বলল, রাতে একবার মনে করিয়ে দিয়ো তো। দেবেনদার সঙ্গে কথা বলব।

ঋতু মাথা তুলল, —ও হ্যাঁ, তোমাকে আসল কথাটাই বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। তোমার সেই ছাত্রীটা এসেছিল। বেঁটে মতন, চশমা পরা।

—চিরশ্রী ?

—হতে পারে। ...আমার অত নাম মনে থাকে না। আবার কবে থেকে ব্যাচ বসবে জিজ্ঞেস করছিল।

এও এক ফেঁসে যাওয়া। অমলকান্তি এখানে ভর্তি হওয়ার পর থেকে বাড়িতে ছেলেমেয়েদের পড়ানো বন্ধ রেখেছে অভিজিৎ। সময় কোথায় ! শুধু অবাঙালি ছেলে দুটোকে দুদিন পড়িয়ে দেয়, রাতের দিকে। পড়ানো মানে কিছু হলুদ হয়ে আসা নোটস দিয়ে যাওয়া। এভাবে সাধারণত পড়ায় না অভিজিৎ, কিন্তু উপায় কী !

ভুরুতে ভাঁজ ফেলে অভিজিৎ বলল, পরশু দিনটা ভালয় ভালয় চুকুক, তারপর থেকে রেগুলার ডেট দেওয়া যাবে।

—মেয়েটা কাল আবার আসবে। এলে তাই বলে দেব ?

—দিয়ো।

বিল্ডিং-এর সামনের রেলিঙে বালি বোঝাই বালতি ঝুলছে। সিগারেটটা বালিতে ঠেসে দিল অভিজিৎ। ঋতুর সঙ্গ এখন মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়, একের পর এক যা সংবাদ শোনাচ্ছে ঋতু !

অভিজিৎ দাঁড়াল, —তুমি থাকো এখানে। আমি চট করে ওপর থেকে ঘুরে আসি।

—আমি যাব না ?

—যাবে। ইন্দ্র আসুক।

বড় বড় পা ফেলে দোতলায় উঠে এল অভিজিৎ। ওয়ার্ডটা সিঁড়ি থেকে একটু দূর, পথটুকু মন্থর পায়ে হাঁটল। এও এক সময় বওয়ানো।

জানলার ধারে অমলকান্তির বিছানা। বেড মাথার দিকে খানিক তোলা, আধশোওয়া হয়ে আছেন অমলকান্তি। বেডের কাছ ঘেঁষে টুলে বসে আছে অনু, কী যেন বিনবিন করছে। শুনছেন না অমলকান্তি, তাঁর চোখ জানলার বাইরে।

ছ'টা বেডের একটা খালি। অমলকান্তির পাশেরটাই। কালই খালি হয়েছে। মারা যায়নি লোকটা, বাড়ি ফিরে গেছে, সেখানেই মরতে চায়। ঘরে আরও কিছু ভিজিটার, তাদের পার হয়ে খালি বিছানাটায় গিয়ে বসল অভিজিৎ। চুপচাপ অনসূয়ার ব্যাকুল বাচনভঙ্গি দেখছে।

ঘরের হাওয়া গম্ভীর, তবু হাসি পাচ্ছিল অভিজিতের। কার সঙ্গে ওভাবে কথা বলিস অনু ? বাবা কি এখন কারও ডাকে সাড়া দেয় ? ইচ্ছে হল তো এক আধবার হুঁ হ্যাঁ করল, নয়তো স্পিকটি নট, উলটোদিকে মুখ করে শুয়ে আছে। অভিমান ? প্রত্যাখ্যান ? আতঙ্ক ? এই বাবার সামনে মিনিটের পর মিনিট বসে থাকা যে কী কষ্টকর ! প্রথমদিকে যখন লোক ছেয়ে থাকত, তখন ব্যাপারটা এত অস্বস্তির ছিল না। সবাই পালা করে মিনিট তিন-চার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, দু ঘণ্টা নিমেষে কাবার। লোক কমলেই মাথাপিছু সময়ের বরাদ্দ বেড়ে যায়, এক একজনকে আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিট করে থাকতে হয় রোজ, তখন সময় যেন একেবারে স্থাণু। ভিজিটারের সংখ্যার ওপরও যে সময়ের গতি নির্ভর করে এ তথ্য অভিজিতের জানা ছিল না।

অনসূয়া দেখেছে অভিজিৎকে। ঘুরে বলল, —বাবা আজ দু'বার বমি করেছে।

—জানি। সিস্টার বলছিল। অভিজিৎ নড়ে বসল।

—এত বমি হচ্ছে কেন বল তো ? কিছুই তো খেতে পারে না, তাও যদি বমি হয় শরীরে কিছু

থাকে !

—হুঁ, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। মনে হয় রে দেওয়ার এফেক্ট। তার ওপর কতদিন স্নান হয় না, শরীরটা নিশ্চয়ই ভেতর থেকে গরম হয়ে আছে।

—এমন চললে বাড়ি নিয়ে গিয়ে তো আরও মুশকিল হবে।

—হয়তো কমে যাবে। হয়তো ডাক্তার কোনও ওষুধ দেবে। যাই বল, কাশিটা কিন্তু একটু কমেছে। রেডিয়েশানে নিশ্চয়ই কাজ হচ্ছে।

—কী হচ্ছে ভগবান জানে ! আমি তো শুধু দেখছি বাবা দিন দিন আরও ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

—বা, হিমোগ্লোবিন ফল করেছিল না ! কোথায় তেরো থাকে, কোথায় সাত !

—তার জন্য তো রক্ত দেওয়া হল। তার পরেও ফ্যাকাশে ভাব কাটছে কই ! আর শরীর গরমের কথা বলছিস ? সিস্টার তো বলছিল বাড়ি ফিরেও এক মাস স্নান করানো যাবে না, গায়ে তেল সাবান ছোঁয়ানো যাবে না, তখন তো শরীর আগুন হয়ে থাকবে !

—হুঁ, নিয়ে যাওয়ার আগে ডাক্তারের সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে হবে। ডিটেল ইনস্ট্রাকশন নিয়ে নিতে হবে।

অসুখের নাম না করে সব আলোচনাই চলছে অমলকান্তির কানের কাছে। রোজই চলে আজকাল। রুগির কোনও তাপ-উত্তাপ দেখা যায় না। হঠাৎ হঠাৎ যেন সম্পূর্ণ বধির হয়ে যান অমলকান্তি।

অভিজিৎ বলল, —অনু, তুই এবার নীচে যা। তোর বউদি এসেছে, পাঠিয়ে দে।

অনসূয়া চলে গেল।

বাবার খাটের পাশটিতে এসে দাঁড়াল অভিজিৎ। অনুচ্চ স্বরে ডাকল, —বাবা ?

উত্তর নেই।

—বাবা শুনছ ?

ডাকটা ঘরের দেওয়ালে মিশে গেল।

অভিজিৎ নিজের দিকে টানল বাবাকে। হাড়ের কাঠামো ফিরেছে এমুখে। হাসপাতালের জামা পরে আছেন অমলকান্তি, আকাশ রঙের। জীর্ণ শরীরে বিশাল ঢোলা হয়েছে পোশাকটা। ঘোলাটে মণি নড়ছে এদিক সেদিক, এতেই বোঝা যায় অমলকান্তি জেগে আছেন।

অভিজিৎ ঝুঁকল, —আজ আবার বুক ধড়ফড় করছিল ?

মণি স্থির হল। নড়েছে ঠোঁট, —না।

—নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে ?

ঠোঁট নয়, এবার ঘাড় নড়েছে। হচ্ছে।

—ডাক্তারবাবুকে বলেছ ?

এবার ঠোঁট মণি ঘাড় সবই নিশ্চুপ।

—অক্সিজেন দিলে ভাল লাগবে ? বলব ?

—না।

আবার উলটোদিকে ফিরতে যাচ্ছিলেন অমলকান্তি, আটকেছে অভিজিৎ। মৃদু টানে সরে গেল ঢোলা জামাটা। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অভিজিৎ। ওফ, সেই পোড়া কালো দাগ ! বুকের ডান দিকে ক্ষয়ে যাওয়া অঙ্গারের মতো বসে গেছে ! অঙ্গার, না কালো টিপ ? দেখে মনে হয় পোড়া দাগটা অমলকান্তির ভেতরেই ছিল, হঠাৎ কীভাবে যেন ফুটে উঠেছে।

কেন ওদিকে তাকাতে পারে না অভিজিৎ।

ঋতু এসে গেছে। বলল, —তুমি একবার যাও তো, ইন্দ্র তোমায় ডাকছে।

—কেন ?

—তোমাদের দাদা ভায়ের প্রাইভেট কথা, আমি কী করে বলব !

বাবার জামার বোতামটা আটকে দিয়ে অভিজিৎ নেমে এল। ক্যান্টিনের সামনে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে ইন্দ্রজিৎ আর অনসূয়া, অভিজিৎকে দেখে হাত তুলেছে তারা।

আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমেছে। পড়ন্ত সূর্যে এক মলিন বিষণ্ণতা। সেদিকে তাকাতে তাকাতে ভায়ের সামনে এল অভিজিৎ, —কী বলছিলি রে ?

—বলছিলাম পরশু তো বোধহয় সব বিলপত্র মেটাতে হবে, কত হয়েছে কিছু দেখেছিস ?

অভিজিৎ ভুরু কুঁচকোল, —দেখিনি। কিছু তো দেওয়াই আছে, পরশু বাকিটা পেমেন্ট করব।

—সকালে বলছিলি না, আজ কী একটা দিতে হবে ?

—হ্যাঁ, ভাবছিলাম রেডিয়েশানের পেমেন্টটা...

—কত ?

—ছ হাজার সামথিং... দেখতে হবে বিলটা।

ঝট করে পকেট থেকে একটা একশো টাকার বান্ডিল বার করল ইন্দ্রজিৎ, এখন এটা রেখে দে। দশ আছে। তুই একা সব লোড নিবি কেন। উই শুড শেয়ার।

ইন্দ্রর টাকা দেওয়ার ভঙ্গিটা অভিজিতের পছন্দ হল না। যেন অনুর সামনে ইন্দ্র প্রমাণ করে দিল অভিজিৎকে মোটেই একা বোঝা টানতে হচ্ছে না। অথচ এখানে সাকুল্যে তিরিশ হাজারেরও বেশি দিতে হবে। আগেও টেস্ট ডাক্তার ওষুধ নিয়ে হাজার ছয়েক বেরিয়ে গেছে। এই সব খুঁটিনাটি তো কেউ দেখবে না, শুধু ইন্দ্রর এই বান্ডিলটা দেওয়াই পল্লবিত হয়ে লোকের মনে ঘুরবে। অভিজিৎকে টাকাটা আলাদা করে বাড়িতে দিতে পারত না ইন্দ্র ?

ইন্দ্র অনু বাবার কাছে গেছে। লনে বসে বড়সড় শ্বাস ফেলল অভিজিৎ। যে যা খুশি দেখানেপনা করুক, অভিজিতের যত ইচ্ছে টাকা চলে যাক, কোনও কিছুতেই দুঃখ ছিল না, যদি না এর সবটাই মূল্যহীন হত ! পণ্ডশ্রম হত ! লোকটা বাঁচবে না জেনেও এত অর্থ, এত শ্রম অপচয় ! ভাবনাটা কীটের মতো দংশন করছিল অভিজিৎকে। মনটা তেতো হয়ে যাচ্ছিল। কী করবে, মনের ওপর তো হাত নেই !

দশ

এক শনিবারের দুপুরে দময়ন্তীকে নিয়ে এল ইন্দ্রজিৎ। গড়িয়ার বাড়িতে। ঋতু তখন রিমলিকে নিয়ে বেরোনোর জন্য উশখুশ করছিল। বাপের বাড়ি যাবে।

এগারো দিন হল অমলকান্তি ফিরেছেন বাড়িতে। যাই যাচ্ছি করেও এর মধ্যে একদিনও বেহালা যাওয়া হল না ঋতুর। রুগি ঘরে ফেরার পর তাকে ঘিরে কিছু নিত্যকর্ম তো থাকেই, সঙ্গে আবার ক'দিন ধরে জোর বৃষ্টির উপদ্রব। বর্ষা এবার এসেছে দেরিতে, অবিরাম ঢেলে ঢেলে ঘাটতি পুষিয়ে দিচ্ছে দ্রুত। আজই যা সকাল থেকে একটু সূর্যের মুখ দেখা গিয়েছিল।

আজই এল দময়ন্তী !

বিরক্ত হতে গিয়েও হতে পারল না ঋতু। তীব্র কৌতূহলে আপ্লুত হয়ে পড়েছে। কেন এসেছে মেয়েটা এই অসুখের দিনে ?

অমলকান্তির ঘরে বসেছে দময়ন্তী। ঋতুর সঙ্গে আলাপ হতেই মুখ টিপে হাসল অল্প, কথা বলল না বিশেষ। অমলকান্তি রোজকার মতোই ঘুমোচ্ছেন এখন, ইন্দ্র তাকে ডাকবে ডাকবে করছিল, দময়ন্তী ইশারায় বারণ করল। বসে আছে চুপচাপ।

ঋতু ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, —চা খাবে ?

দময়ন্তী মাথা দোলাল, —শুধু চা।

রান্নাঘরে যেতে গিয়েও দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল ঋতু। মেয়েটা সুন্দর আন্দাজ করেছিল, তা বলে এত রূপসী ! মাখনের মতো রং, ফিলম নায়িকাদের মতো মসৃণ ত্বক, পালক পালক ভুরু, কাটা কাটা নাক চোখ মুখ, এক মাথা ঘন চুল, ঠোঁটে গোলাপি আভা। বৃষ্টির ছাট আসার ভয়ে অমলকান্তির ঘরের জানলা বন্ধই থাকে, প্রায়ান্ধকার ঘরখানায় দময়ন্তী যেন নরম আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। মোটামুটি সুন্দরী বলে ঋতুর চাপা গর্ব ছিল, এই মেয়ে তার জা হয়ে এলে তাকে তো সবাই খেঁদি বুঁচি বলবে !

এই মুহূর্তে অবশ্য ঋতুর মনে তেমন ঈর্ষা এল না। মেয়েটা ভারী শান্ত, দেখে কেমন মায়া জাগে। ইন্দ্র একদিন কথায় কথায় বলেছিল দময়ন্তীর বাবা মার নাকি বহুকাল আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে, হয়তো বা মেয়েটা দুঃখীও। অমলকান্তির মধ্যে কি বাবাকে খুঁজতে এসেছে দময়ন্তী ? হায় রে মেয়ে। শ্বশুরমশাই কি আর তেমনটি আছেন ! এলি তো এলি আর কিছুদিন আগে এলি না কেন !

রান্নাঘরে ঢুকে ঋতু অবাক। কল্যাণী আগেই এসে গেছেন, গ্যাসে চায়ের জল চাপিয়ে বিস্কুট সাজাচ্ছেন নকশাদার প্লেটে।

ঋতু তড়িঘড়ি বলে উঠল, —আপনি কেন মা ? আমি করছি। আপনি ও ঘরে গিয়ে দময়ন্তীর সঙ্গে কথা বলুন না।

কল্যাণী উত্তর দিলেন না, একবার চোখ তুললেন শুধু। এমনভাবেই কল্যাণী তাকান আজকাল। অদ্ভুত এক ভাবলেশহীন দৃষ্টি।

ঋতু চোখে রহস্য ফোটাল, —দময়ন্তী কে বুঝতে পারছেন মা ?

—হুঁ।

—ইন্দ্রর সঙ্গে দারুণ মানাবে, তাই না ?

—হুঁ।

—দেখে আসুন রিমলির কাণ্ড ! মেয়েটার একেবারে কোল ঘেঁষে বসে আছে, নড়তেই চাইছে না।

কেটলির ঢাকনা খুলে চা-পাতা ফেললেন কল্যাণী। আর একবার তাকালেন ঋতুর দিকে। সেই উদাসীন দৃষ্টি। চোখ সরিয়ে কাপে চিনি দিচ্ছেন।

ঋতুর উৎসাহে খানিকটা জল পড়ে গেল। শাশুড়ি যেন কেমনধারা হয়ে গেছেন আজকাল ! কথা চিরকালই কম বলেন কল্যাণী, শ্বশুরমশাই হাসপাতাল ঘুরে ফেরার পর থেকে প্রায় নির্বাক। আর ওই দৃষ্টিটা তো স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় তিনি এখন এক আদ্যন্ত কৌতূহলবিহীন নারী।

ঋতু বলল, —চা বিস্কুট আমি নিয়ে যাই মা ?

—যাও।

ঋতু চা নিয়ে অমলকান্তির ঘরে গেল না, নিজের ঘরে ট্রে রেখে ডাকল দময়ন্তীকে। উঠে এসেছে দময়ন্তী, পিছন পিছন ইন্দ্রও। দময়ন্তীর সঙ্গে একটু একা হতে চাইছিল ঋতু, ইন্দ্রর নড়াচড়ার লক্ষণ নেই। অগত্যা রিমলিকে ঠাকুমার কাছে পাঠিয়ে ইন্দ্রজিতের সামনেই ঋতু ধরেছে দময়ন্তীকে, —অ্যাই, তোমরা বিয়ে করছ কবে ?

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরটাকে দেখছিল দময়ন্তী। হঠাৎ প্রশ্নে যেন একটু থমকে গেল। তারপর ইন্দ্রর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে অনাড়ষ্ট স্বরে বলল, —এখনও কিছু ফাইনাল করিনি।

—এভাবে ঘুরে ঘুরে হাওয়া খেয়ে খেয়ে কাটবে ?

মধুর হাসল দময়ন্তী, —আমরা তো বেশি ঘুরি না। ইন্দ্রই আমাদের বাড়িতে আসে।

আড়ে ইন্দ্রজিৎকে দেখল ঋতু, —রোজ যায় ?

ইন্দ্রজিৎ গলা খাঁকারি দিয়ে উঠল, —রোজ যাব কী করে ! আমার কি আর কাজকর্ম নেই !

—তাও তো বটে ! তুমি তো আবার ভীষণ কাজের মানুষ। ঋতু হাসছে মিটিমিটি, —তোমাদের বিয়ে হয়ে গেলে আমি একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচতাম। এই গন্ধমাদনটা আমায় একা একা বইতে হত না।

—গন্ধমাদন ! দময়ন্তী ভুরু কুঁচকোল।

—মানে এই সংসারটা। ঋতু ঝটপট নিজেকে সংশোধন করে নিল, —এই সংসারের বোঝা কি কম ! এই ইন্দ্র, ইন্দ্রর দাদা, কেউ সংসারের কুটোটি ভেঙে দুটো করে না। মাও গোটা দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। তুমি এলে তাও আমি একটু হালকা হতে পারি।

দময়ন্তী হাসল, —কেন, ইন্দ্র তো বলে আপনি বেশ পাকা হাতে সব সামলান।

যত সব এড়ানো কথা। ঋতু আবার চেপে ধরল, —সত্যি করে বলো তো তোমরা কবে নাগাদ বিয়ে করছ ?

—আমার পরীক্ষাটা আগে শেষ হোক। এর মধ্যে ইন্দ্রও দিল্লিতে ইন্টারভিউটা দিয়ে আসুক।

ঋতু জোর একটা ধাক্কা খেল, —ইন্দ্র দিল্লি যাচ্ছে ? কবে ?

ইন্দ্রজিৎ তাড়াহুড়ো করে বলে উঠল, —যাচ্ছি কি না এখনও ঠিক নেই। একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, হয়তো ওরা ডাকতে পারে।

সুন্দর ছন্দে এগোচ্ছিল কথা, দুম করে তাল কেটে গেল। ঋতু যেন আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না, কথা হাতড়াচ্ছে। পাঁচ-সাত মিনিট পরে উঠে পড়েছে দময়ন্তী। আর একবার অমলকান্তির ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। অমলকান্তি চোখ খুলেছেন, বিস্মিত মুখে দেখছেন দময়ন্তীকে।

কল্যাণীও আছেন ঘরে, তাঁর সঙ্গে দুটো-চারটে কথা বলে ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটা।

ঋতু বিমনা হয়ে গেছে। মেয়েটাকে দেখে যতটা শান্ত নিরীহ মনে হয় ততটা বোধহয় নয়। যথেষ্ট ধূর্ত। ইন্দ্রকে নিয়ে এ বাড়িতে উঠবে না, কেটে পড়বে নির্ঘাত। কবে ইন্দ্র বাইরে চাকরি পাবে, সেই প্রতীক্ষাতেই রয়েছে। নাকি ইন্দ্রটাই বেশি স্বার্থপর, দাদাকে অথৈ জলে ফেলে ভেগে পড়ার ধান্দা করছে! বাবা ঠিকই বলে, হোস্টেল ফোস্টেলে বেশিদিন থাকলে ছেলেমেয়েদের আপনজনের ওপর টান কমে যায়। ইস, ঋতুদের ফ্ল্যাটটা যদি আর এক-দুবছর আগে হয়ে যেত!

ছোটঘরের দেওয়ালে একটা বিশাল ঘড়ি ঝোলে। পড়াতে বসলে অভিজিতের সময়জ্ঞান থাকে না, ঋতুই তাই টাঙিয়ে দিয়েছে। সেই ঘড়িতে সময় দেখল ঋতু। চারটে পাঁচ। এখন আর বেহালা যাওয়া যাবে না, আজকের দিনটাও নষ্ট হয়ে গেল। নষ্টই তো, কাঁহাতক আর রোগের বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগে।

বিরস মুখে ফোনের কাছে এল ঋতু। রিসিভার তুলে বেহালার নম্বর ঘোরাল।

ও প্রান্তে মালা, —ওমা ছোড়দি তুমি! আমিই তোমায় এক্ষুনি ফোন করতে যাচ্ছিলাম।

—কেন রে ?

—তোমার ভায়ের বন্ধু আছে না, দেবজ্যোতি, ওর বউ শাড়ির ব্যবসা করছে। কী দারুণ দারুণ সব কাঁথা স্টিচ এনেছিল গো! রাখবে তুমি ?

—তুই রেখেছিস ?

—রেখেছি একটা। গ্রিন জমির ওপর হোল বডি কাজ। আঠাশশো পড়ল।

—ও বাবা, সে তো অনেক দাম!

—ইনস্টলমেন্টে দেওয়া যাবে। তিনটে, চারটে। তোমার ভাই আমায় ম্যারেজ অ্যানিভারসারিতে কাঁথা স্টিচ দেবে বলেছিল, এই মওকায়... ও ছোড়দি, রাখব তোমার জন্য ? বড়দি কিন্তু নিচ্ছে।

দু দণ্ড চিন্তা করল ঋতু। এই খরচখরচার সময়ে কোন মুখে অভিজিৎকে এখন শাড়ি কেনার কথা বলে! তবু ভায়ের বউয়ের কাছে মচকাতে ইচ্ছে হল না ঋতুর। বলল, —নারে, কাঁথা স্টিচ আর কিনব না। যে দুটো আছে সে দুটোই পরা হয় না।

—দেখলে পারতে ছোড়দি। শান্তিনিকেতন থেকে একজন এসে দিয়ে যায়। তোমার জন্য যা অপূর্ব একটা বেছেছিলাম না! গোল্ডেন বেস-এর ওপর গোল্ডেন কাজ...

কল্পনায় কি শাড়িটাকে দেখতে পাচ্ছে না ঋতু! তবু উদাস স্বরে বলল, —নারে, এখন থাক। মা কী করছে ?

—মা এই মাত্র গুবলুকে নিয়ে বেরোল। বৃষ্টি নেই, একটু পার্কে ঘুরিয়ে আনবে।

—বাবা ?

—আছেন। দেব ?

শৈলেন ফোন ধরেছেন, —কে রে, ঋতু ? বেয়াইমশাই কেমন আছেন ?

—একই রকম বাবা। ঘ্যানঘেনে জ্বরটা ছাড়ছে না। একশো নিরানব্বই একশো এক...

—কাশি ?

—কাশিও আছে। যখন দমক ওঠে তখন... কাল তো থুতুর সঙ্গেও বেশ রক্ত এসেছে।

—সে কী রে ! রেডিয়েশানে কিছু উপকার হল না ! এক মাস ধরে যে অভিজিৎ এত ছোটাছুটি করল, এত খরচাপাতি করল, সব ভস্মে ঘি ঢালা !

ভস্মে ঘি ঢালা উপমাটা জীবনে এই প্রথম ভারী লাগসই মনে হল ঋতুর। শ্বশুরমশাই এখন ভস্ম ছাড়া আর কী। শরীর বিছানায় মিশে আছে, কোটরগত চোখ, গলা দিয়ে চিঁচিঁ আওয়াজ ছাড়া কিছু বেরোয় না, হাড়পাঁজরা হারমোনিয়াম রিডের মতো ফুটে ফুটে আছে, এমন মানুষ তো থাকা না থাকা সমান।

কল্যাণী কাছেপিঠে নেই, সম্ভবত শ্বশুরমশাই-এর ঘরে। ঋতু গলা নামিয়ে বলল, —কী করা যাবে বলো ? তোমার জামাই বাবা-মা অন্ত প্রাণ। সে এই রোগের শেষ না দেখে ছাড়বে না।

—বাহ্, এই তো ছেলের মতো ছেলে। বাবা মা ছেলেমেয়েকে পৃথিবীতে আনে, সাধ্যের অতিরিক্ত করে বড় করে দেয়, তাদের প্রতিষ্ঠিত দেখার জন্য প্রাণপাত করে, তার বিনিময়ে এটুকু তো বাবা মার প্রাপ্য। অভিজিতের যে এই বোধগুলো লুপ্ত হয়নি, দেখে আমার শ্রদ্ধা বাড়ছে ওর ওপর। শৈলেনের ভরাট স্বর কেতাবি নীতিকথায় গমগম করছে, —কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্য। বলছি, এক মাস চিকিৎসাটা কি পুরো বেকার গেল ?

—পুরো বোধহয় নয়। ও তো বলছিল ডাক্তার নাকি এক্সরে প্লেট দেখে বলেছেন একটু উন্নতি হয়েছে। বুকের শ্যাডোটা নাকি কমেছে সামান্য। এক্ষুনি কেমোথেরাপি শুরু করলে উন্নতি আরও স্পষ্ট হবে।

—কবে শুরু হচ্ছে কেমো ?

—ডাক্তার তো ইমিডিয়েটলি স্টার্ট করতে বলছেন। বেস্পতি শুক্কুরবার নাগাদ নার্সিংহোমে ভর্তি করা হবে।

—নার্সিংহোম কেন ? কেমো তো বাড়িতেও হয়।

—হয়, কিন্তু দীপঙ্কর সান্যাল কোনও চান্স নিতে চাইছেন না। মাঝে একদিন প্রেশার ফল করে গেছিল না... নার্সিংহোমে থাকলে নাকি সর্বক্ষণ মনিটর করা যাবে। এমার্জেন্সি হলে সঙ্গে সঙ্গে ইন্টেন্সিভ কেয়ারে...

—ও। তা ভাল। কদিন থাকতে হবে নার্সিংহোমে ?

—সব স্মুথলি চললে তিন-চার দিন। যদি কিছু গণ্ডগোল হয় তবে...

—তেমন সম্ভাবনা আছে নাকি ?

—আছেই তো। ঋতুর গলা খাদে নামল, —তোমার জামাই বলছিল কত পেশেন্ট তো কেমো নিতে নিতেই...

—হুম। ও প্রান্তে শৈলেন নীরব। একটুক্ষণ পরে স্বর ফুটল, —তা যে রোগের যা চিকিৎসা তা তো করাতেই হবে। ভয় পেয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকাটা মানুষের ধর্ম নয়।

ঋতুর শুধোতে ইচ্ছে হল, জেনেশুনে সর্বস্ব খোয়ানোও কি মানুষের ধর্ম ? বলে লাভ নেই, বাবা মানবে না। কিছু কিছু মানুষের ধ্যানধারণা বিশ্বাস সবই চড়া তারে বাঁধা থাকে। এক্ষুনি হয়তো বাবা গীতা আউড়ে দেবে, কর্ম্মণ্যেব্যধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন !

শৈলেন কথা বলছেন আবার, —কোন নার্সিংহোমে ভর্তি করা হচ্ছে রে ?

—রোজমেরি ক্লিনিক। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে।

—যেখানে তোর ছোটমামা ছিল ? ওখানে তো শুনেছি চার্জ খুব হাই। তোদের গড়িয়ার কাছাকাছি কোনও নার্সিংহোমে রাখা যায় না ?

—উপায় নেই বাবা। ডক্টর সান্যাল রোজমেরিতেই চাইছেন। আরও দু-তিনটে নার্সিংহোমের কথা বলেছিলেন, সেগুলো আরও দূর।

—হুম। দেখি, আমি এর মধ্যে একদিন বেয়াইমশাইকে দেখে আসব। বেয়ান ভাল আছেন তো ?

—ঠিক আছে।

ফোনটা রেখে দিয়ে ঋতুর মনে হল বাবাকে কী যেন বলার ছিল, বলা হল না। কী জন্য ফোন

করেছিল ঋতু ? মন খারাপ কাটাতে ? একটু খোলামেলা বাতাসের জন্য ? দূর, মনে পড়ছে না।

কল্যাণী থার্মোমিটার ঝাড়তে ঝাড়তে বেসিনের দিকে যাচ্ছেন। ঋতু জিভ কাটল। চারটের সময়ে একবার শ্বশুরমশাইয়ের টেম্পারেচার নেওয়ার কথা, তিন ঘণ্টা অন্তর জ্বর দেখে চার্ট বানানো হচ্ছে ডাক্তারের কথামতো, ঋতুই নেয় নিয়মিত, কল্যাণীব থার্মোমিটারেব পাবা ঠাহর করতে অসুবিধে হয়।

ঋতু শাশুড়ির কাছে এগোল, —কত দেখলেন মা ?

—একশো পয়েন্ট চার।

—দিন, আমি রেখে আসছি থার্মোমিটার। ...বাবার লেবুর রসটা করব ?

—করে দিয়েছি। খাওয়া হয়ে গেছে।

একেই বলে টেটিয়া শাশুড়ি, মুখে কিছুটি বলবেন না ! ঋতু লজ্জিত মুখে বলল, —তা হলে চা বসাই ?

—মিনিট পনেরো-বিশ পরে কোরো। তা হলে উনিও খেতে পারবেন।

—আচ্ছা।

থার্মোমিটার নিয়ে অমলকান্তির ঘরে এল ঋতু। অমলকান্তি খাটে আধশোওয়া হয়েছেন এখন। কল্যাণী জানলার একটা পাট খুলে দিয়েছেন, আলো আসছে ঘরে। মলিন আলো। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে আবার, ভরা বিকেলে এখন সন্ধ্যার আভাস।

ঋতুকে দেখে অমলকান্তি নড়েচড়ে উঠলেন। বিড়বিড় করে বললেনও যেন কিছু ; ঋতু ঠিক শুনতে পেল না। কাছে গিয়ে বলল, —কী চাই বাবা ?

অমলকান্তির ঠোঁট নড়ল আবার। অস্ফুট ঘড়ঘড়ে স্বর শুনতে পেল ঋতু, —ওই মেয়েটা কে এসেছিল তখন ?

—কোন মেয়েটা বাবা ?

—ইন্দ্রর সঙ্গে...

—দময়ন্তী ? ঋতুর ঠোঁটের কোণে হাসি, —মা আপনাকে বলেনি কিছু ?

—না তো।

—ওই মেয়ে আপনার ছোট ছেলের বউ হবে। সুন্দর না মেয়েটা ?

অমলকান্তির মুখ যেন পলকে বদলে গেল। শীর্ণ তোবড়ানো গালে অলৌকিক হাসি, ঘোলাটে দুই চোখ চকিতে উজ্জ্বল। পরক্ষণে এক তীব্র যন্ত্রণায় ছেয়ে গেছে মুখমণ্ডল, চোখ ভরে গেল জলে। ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন অমলকান্তি। যেন কেউ নিষ্পেষিত করছে মানুষটাকে। যেন জীবনের রূপ রস বর্ণ গন্ধ হাতছানি দিয়ে আকুল করে তুলছে হাড় চামড়ার কাঠামোটাকে।

অদ্ভুত এক মমতায় চিনচিন করে উঠল ঋতুর বুক। মমতা, না করুণা ? মানুষটা তেমন দাপুটে ছিলেন না কোনওদিন, কিন্তু হইহই করতেন খুব। কারণে অকারণে হল্লা জুড়তেন। এই ঋতু, বৃষ্টিবাদলার দিনে রিমলিকে অত পাতলা জামা পরিয়ে রেখেছ কেন, তোমার কি কোনও আক্কেল নেই ! বাথরুম অত পিছল কেন, আছাড় খেয়ে মরতে চাও ! চিৎকারেও যে ভালবাসা মিশে থাকে, শ্বশুরমশাইয়ের সান্নিধ্যে না এলে জানাই হত না ঋতুর। কত আজগুবি উদ্ভুটে শখ ছিল মানুষটার ! রাতদুপুরে কোত্থেকে এক ইলিশ মাছ নিয়ে হাজির ! কী সরল অনুনয়। লোভ সামলাতে পারলাম না ঋতু, ভেজে খাওয়াবে এখন ! তোমার শাশুড়িকে বললে পিঠে চ্যালাকাঠ ভাঙবে !

স্মৃতিরা ধেয়ে আসে দ্রুত। একঘেয়ে প্রাত্যহিকতায় বিবর্ণ হয়ে আসা অ্যালবাম স্পষ্ট হয়, স্পষ্টতর হয় সহসা। নড়েচড়ে ওঠে ছবি। ঋতুর তখন বিয়ের বোধহয় এক মাসও হয়নি, সবে কিন্নর দেশ থেকে হানিমুন সেরে ফিরেছে, মাঝরাতে ছাদ থেকে হাঁক পাড়ছেন শ্বশুরমশাই, ঋতু ঋতু, শিগগির দেখে যাও কী চমৎকার একটা চাঁদ উঠেছে ! ঠিক যেন কানা ভাঙা সোনার পিরিচ।

...রিমলি তখন পেটে, ঋতুর বালিশের নীচে চানাচুরের প্যাকেট গুঁজে দিলেন অমলকান্তি। শুধু তোমার, অভিকেও ভাগ দেবে না। আঙুর আনছেন, আপেল আনছেন, বেদানা আনছেন, মেটে আনছেন...

সেই মানুষ প্রায় স্থবির এখন, প্রায় বোবা।

তবু কী পিপাসা!

মৃত্যু দরজায় টোকা দিলে সুখের তৃষ্ণা কি বেড়ে যায়!

মানুষটাকে কি আর কটা দিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না! অন্তত ইন্দ্রর বিয়ে অবধি!

রাত্রে বিছানায় শুয়ে ভাবনাটা অভিজিৎকে বলেই ফেলল ঋতু।

অভিজিৎ খাতা দেখছিল। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার। জমা দেওয়ার শেষ তারিখ গত সপ্তাহে চলে গেছে, এখনও এক তাড়া বাকি। হেড এগজামিনার কালও ফোন করেছিল, সোমবারের মধ্যে যেমন করেই হোক...

ঋতুর গুনগুন শুনতে পেল না অভিজিৎ। চোখ না তুলেই বলল, —কিছু বলছ?

—বলছিলাম বাবা তো আজ আছেন কাল নেই, বাবা থাকতে থাকতে ইন্দ্রর বিয়েটা...

—বিয়ে! এখন! এ বাড়িতে!

—বাবা খুব খুশি হতেন।

—তা হলে আর কী। নহবতখানা বসিয়ে দাও।

—ঠাট্টা করছ?

—ঠাট্টা আমি করছি, না তুমি করছ? অভিজিৎ খাতার গোছা ঠেলে দিল, —আমি মরছি নিজের জ্বালায়...

—রেগে যাচ্ছ কেন?

—রাগব না তো কী, তা থিয়া তা থিয়া নাচব? এদিকে চিন্তায় চিন্তায় আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি এখন ফুর্তির কথা ভাবছ। ঘুমন্ত রিমলির দিকে একবার টেরচা চোখে তাকাল অভিজিৎ। সোজা হয়ে বসল, —সামনে কত খরচা জানো? পার কেমো ডাক্তার নেবে দশ হাজার, সঙ্গে চারদিন করে নার্সিংহোমের চার্জ আছে, মেডিসিনের দাম আছে.. ছ'টা কেমোর জন্য অ্যাট লিস্ট এক লাখ দরকার। ইফ নট মোর। এমনিই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হাজার চলে গেছে.. ইন্দ্র তো মাত্র দশ ঠেকিয়ে চুপ মেরে গেল। এখন আমাকে এন এস সি ভাঙাতে হবে, এন এস এস ভাঙাতে হবে... তাতেও হবে না, আমি যে এখন কী করব? সবই তো জানো, জানো না? তাও এই সময়ে তুমি বিয়ের কথা ভাবতে পারছ?

ঋতুরও ঝপ করে রাগ হয়ে গেল। খেঁকিয়ে উঠে বলল, —আমার ওপর চোটপাট করছ কেন? ভাইবোনদের কিছু বলতে পারো না? তখন তো পিরিতের আলুবখরা সেজে বসে থাকো।

—মাথা গরম করে দিয়ো না। অভিজিৎ চৌধুরী বেঁচে থাকতে কাউকে টাকার কথা বলবে না। তবে তুমিও মনে রেখো, তোমার ফ্ল্যাট কিন্তু হচ্ছে না। দু হাতের বুড়ো আঙুল নাচাচ্ছে অভিজিৎ, —আমি দেবেনদার সামনে গিয়ে হাত তুলে দেব। কুইটস। আমি আর ফ্ল্যাট ট্যাটে নেই।

—তুমিই তো বলেছিলে তোমার দেবেনদা তোমায় কনসিডার করছেন। দু-চার মাস পরে টাকা দিলেও হবে।

—পরে পাবটা কোত্থেকে? গজাবে? ডিম পাড়ব? এর পর বাড়িতে কাবলিঅলা পুষতে হবে টাকা ধার নেওয়ার জন্য।

অমলকান্তির বিকেলের মুখটা বেমালুম ভুলে গেল ঋতু। ভুলে গেছে ইন্দ্রজিৎ দময়ন্তীর কথা। চোখের সামনে দুলছে স্বপ্নের ফ্ল্যাট। টু রুম, ড্রয়িং ডাইনিং, ব্যালকনি, ব্যালকনির টবে সার সার গাছ, দরজা জানলায় বাহারি পর্দা, রঙিন দেওয়ালে মনোরম পেন্টিং, মোজাইক মেঝে, শৌখিন রান্নাঘর, চোখ ধাঁধানো বাথরুম.. সব দুলতে দুলতে চলে গেল জানলার বাইরে।

ঋতুর ভেতর থেকে আর একটা ঋতু গর্জে উঠল, —লোকটা মরবেই যদি, এক্ষুনি মরে না কেন!

এগারো

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে অনসূয়া দেখল ধীমান আজ এসে গেছে তাড়াতাড়ি। মেয়ের সঙ্গে খেলা করছে। খেলনাবাটি খেলা। প্লাস্টিকের খুদে খুদে হাঁড়ি কড়ায় মিছিমিছি রাঁধছে ঝিমলি, কাল্পনিক ভাত তরকারি খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে ধীমান। বাপ মেয়ে দুজনেই বেশ হাসিখুশি।

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল অনসূয়ার। মেয়েকে নির্মলার জিম্মায় রেখে গেলে উদ্বেগ একটা থাকেই। নির্মলা যা গপ্পে মেয়ে, হয়তো পার্কে গিয়ে কারও সঙ্গে আড্ডা জুড়ে দেবে, আর আনতাবড়ি ছোটাছুটি করে হাত পা ছড়ে বসে থাকবে ঝিমলি! কিংবা ঝিমলিকে একা ফেলে পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে গেল নির্মলা, কেঁদেকেটে একশা হচ্ছে মেয়ে! যদিও এ সব কিছুই ঘটে না কোনওদিন। নির্মলা যথেষ্ট চোখে চোখে রাখে ঝিমলিকে। তবু দুশ্চিন্তাটা থাকে, থেকেই যায়। উপায়ই বা কী! রোজ রোজ কি ওইটুকু মেয়ে ট্যাঁকে সন্তোষপুর, গড়িয়া করা সম্ভব!

স্মিত মুখে অনসূয়া বলল, —এলে কখন? চা জলখাবার খেয়েছ?

—জুটল কোথায়! ধীমানের মুখেও হাসি, —আধ ঘন্টা ধরে ঝিমলির বানানো খাবারেই পেট ভরাচ্ছি।

—ওমা, সে কী! নির্মলা কিছু করে দিয়ে যায়নি? ওকে বলতে পারতে।

—টাইম পেলাম কই! আমাকে দেখেই যা চোঁ চাঁ দৌড় লাগাল।

—কেন?

—কী করে বলব! বোধহয় রোজ আটটা-ন'টা অব্দি আটক থাকতে ভাল লাগে না। ওরও তো ঘর সংসার আছে।

—অত রাত্তির কোথায় হয়? আমি তো সাতটার মধ্যে ফিরে আসি।

—হতে পারে। ওর মুখ দেখে যা মনে হল, তাই বললাম।

ধীমানের কথায় কি শ্লেষ? মেয়ে ফেলে রোজ রোজ বাবাকে দেখতে যাওয়া কি পছন্দ করছে না ধীমান? নাকি এ অনসূয়ারই ভ্রম? অশান্ত মন সরল শব্দেরও বুঝি বাঁকা অর্থ করে নেয়।

অনসূয়া বলল, —নির্মলার নয় তাড়া ছিল, তুমি নিজেও তো একদিন হাত পা নাড়তে পারতে। টেবিলে পাঁউরুটি আছে, ফ্রিজে মুরগি রান্না করা আছে, শুধু একটু বের করা আর গরম করা।

—আমি কি বলেছি আমার খিদে পেয়েছে?

—তা হলে জুটল কোথায় বলে আফসোস করছ কেন?

—ওটা কথার মাত্রা। ধীমান মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিল, —এক কাপ ফার্স্ট ক্লাস চা খাওয়াও তো দেখি।

পরিবেশ পলকে সহজ। ঝটিতি শাড়ি বদলে ঢোলাঢালা কাফতান পরে নিল অনসূয়া, ঢুকে গেছে রান্নাঘরে। আবার খেলায় মেতেছে বাপ মেয়ে, রান্নাঘর থেকে তাদের কথা হাসি শুনতে পাচ্ছিল অনসূয়া। ঝিমলির স্বরে এখনও আধো আধো ভাব, ধীমানও সেই সুরে কথা বলছে মেয়ের সঙ্গে। নকল করছে না, যেন সত্যি সত্যি ধীমান এখন ঝিমলির সন্তান।

অনসূয়ার চোখের সামনে অন্য একটা ছবি নড়ে চড়ে উঠল। অস্পষ্ট ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে আরেক পিতাপুত্রীকে দেখতে পাচ্ছে। সব যুগেই কি দৃশ্যটা একই রকম!

স্মৃতিতাড়িত অনসূয়া নিশ্বাস বুকে চেপে ড্রয়িং স্পেসে এল। চায়ের কাপ প্লেট টেবিলে রেখে নরম চোখে তাকাল মেয়ের দিকে, —বিকেলে দুধ খেয়েছ সোনা?

ঝিমলি কাঁধ অবধি মাথা হেলিয়ে দিল, —সব খেয়েচি। দুদ খেয়েচি, মুসুম্মি খেয়েচি, টোস খেয়েচি...

—থাক থাক, আর ডিটেল করতে হবে না। ধীমান চায়ে চুমুক দিল, —ও বাড়ির কী খবর? বাবা আজ কেমন?

—একই রকম। পেটের গণ্ডগোলটা রয়েই গেছে। কাল রাতেও তিন বার...

—কেমোর পরে ওরকম একটু হয়। ডক্টর সান্যাল তো অভিদাকে সেদিন বললেনই। অত স্ট্রং

ওষুধ শরীরের ভেতর যাচ্ছে, তার একটা এফেক্ট হবে না ? কী সাংঘাতিক টক্সিক ড্রাগ ! সাধারণ মানুষের কাছে তো ও ওষুধ বিষ।

সবই বোঝে অনসূয়া, তবু যেন ঝাঁকুনি খেল একটা। জীবনের শেষ ভাগে পৌঁছে কেন এই বিষ ধারণ করতে হচ্ছে বাবাকে !

ধীমান সোফায় হেলান দিয়েছে, —মুখের ঘা'টা কমেছে ?

—একটুও না। আগেই তো খেতে চাইছিল না, এখন ঘায়ের জ্বালায় খাবার দেখলে আঁতকে উঠছে। লিকুইড ছাড়া কিছু মুখেই তুলতে চাইছে না।

—কমবে। আস্তে আস্তে কমবে। অসুখটা যত ভয়ঙ্কর, তার সঙ্গে লড়াইটাও তত কঠিন। সময়সাপেক্ষ। কেমোথেরাপি রোগের মূল বীজগুলোকে পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়, এ কি এলেবেলে ব্যাপার ? ধীমান সোজা হল, —যেমন ধরো দুর্নীতি ইর‍্যাডিকেশান। করাপশানও তো একটা সামাজিক ব্যাধি, নয় কি ? ওই ক্যানসারেরই মতন। সেটা দূর করতে গেলে কি নরম নরম, ফাঁকা ফাঁকা বুলিতে কাজ হয় ? কড়া ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হয়। চিনের কথা ভাবো। ওখানে তো এক সময়ে করাপ্ট লোকদের ধরে ধরে ফাঁসিতে লটকে দিত। এক্সট্রিম দাওয়াই। তাতে অনেক সময়ে অনেক নিরীহ লোকও ঝুলে গেছে। ক্যানসারের ড্রাগও হচ্ছে সেরকম। শয়তান কোষকে মারতে মারতে দু-একটা ভাল সেলকেও ড্যামেজ করে দেয়। তাই না এত সব ঝামেলা।

মুহূর্তের জন্য অনসূয়ার মনে হল বলে চূড়ান্ত দাওয়াই দিয়েও কিন্তু দুর্নীতিকে নির্মূল করা যায়নি। তোমার চিনেও নয়। পৃথিবীর কোথাওই নয়। মুহূর্তে নিজেরই হৃৎপিণ্ড থর থর কেঁপে উঠেছে। বাবার রোগটাকেও তো.. !

প্রসঙ্গ ঘোরাতে চাইল অনসূয়া। দুম করে বলে উঠল, —কুচবিহার থেকে একটা পোস্টকার্ড এসেছে, দেখেছ ?

—কই না। কোথায় ?

—তোমার লেখার টেবিলে রাখা আছে। মার চিঠি। তোমাকে লিখেছেন।

—কী সমাচার ?

—বাবার চোখটা নাকি আবার ট্রাবল দিচ্ছে, পড়াশুনো করতে গেলে জ্বালা জ্বালা করে। লিখেছেন আরেকবার কলকাতায় এনে ডাক্তার দেখালে বোধহয় ভাল হয়। মারও শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, লিখতে গেলে আজকাল হাত কাঁপে। ... ও হ্যাঁ। আমার বাবার অসুখের খবর স্বপনের কাছে পেয়েছেন ওঁরা। দু'জনেই খুব চিন্তিত। তুমি কেন ওদের জানাওনি তাই নিয়ে অভিযোগও জানিয়েছেন অনেক।

—হুম। এটা একটা ভুল হয়ে গেছে। ধীমান সিগারেট দেশলাই নিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিজের সন্তানের সামনে বসে সে কখনও ধোঁয়া ছাড়ে না, মেয়ের ফুসফুসের ক্ষতি হবে। ব্যালকনিতে গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বলল, —তুমি কাল একটা উত্তর দিয়ে দিয়ো। লিখে দাও সামনের মাসের প্রথম দিকে আমি আসাম যেতে পারি, সময় পেলে তখন একবার ঘুরে আসব।

—তুমি আসাম যাচ্ছ ?

—চান্স আছে। পঞ্চশীলদা বলছিল একবার ঘুরে আসতে।

—কদিনের জন্য ?

—ঠিক নেই। দিন আট-দশ।

অনসূয়া উঠে ঝিমলির ভাত বসাতে গেল। মেয়ে একদম রুটি সহ্য করতে পারে না, তার জন্য অল্প করে দুটো ভাত ফোটাতে হয়। গরম জলে চাল ফেলে অনসূয়া ভাবছিল ধীমান ক'দিন বাইরে গেলে ভালই হয়, সেও ক'টা দিন মেয়ে নিয়ে থেকে আসবে গড়িয়ায়। মারও ভাল লাগবে, অনসূয়ারও কয়েকটা দিন বাবার কাছাকাছি থাকা হবে। ধীমান যদি একটু স্বাবলম্বী হত, এখনই গিয়ে থাকা যেত। রান্না করে দেওয়ার জন্য নয় নির্মলা আছে কিন্তু বাকি কাজ ? মশার কামড়ে গা হাত পা দাগড়া দাগড়া হয়ে যাবে তবু মশারির দড়ি চারটে দেওয়ালের হুকে লাগাতে পারবে না ধীমান।

পর পর দুটো ফোন এল ধীমানের। কথা বলছে হেসে হেসে, ইয়ার্কি ফাজলামি চলছে। বন্ধু

মনে হয়। নিজেও একটা ফোন সারল, অনেকক্ষণ ধরে বিনবিন কথা বলল দূরভাষে। তারপর শোওয়ার ঘরে গিয়ে বসেছে, খাটে আজকের খান চার-পাঁচ নিউজ পেপার। ঝিমলি খেতে খেতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, মেয়েকে খাটের এক ধারে শুইয়ে দিল অনসূয়া। নিজেও বসল ধার ঘেঁষে।

বলল, জানো, দাদা আজ একটা কথা বলছিল।

—উঁ ?

—কাগজগুলো রেখে একটু কাজের কথা শোনো না।

—বলে ফ্যালো। ধীমান হাতের কাগজ ভাঁজ করল।

—দাদার কলেজের কোন কলিগ নাকি বলেছে এ রোগে হোমিওপ্যাথি করে অনেক দিন পেশেন্টকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। ভদ্রলোকের পিসির নাকি পেটে ক্যানসার হয়েছিল, চার বছর পরেও তিনি নাকি বহাল তবিয়তে আছেন।

—হোমিওপ্যাথি করে !

—হ্যাঁ গো। দাদা তো তাই বলল।

ধীমান টেরচা চোখে তাকাল, —হঠাৎ অভিদার মুখে এই কথা ?

—বলছিল সেই হোমিওপ্যাথকে একবার দেখিয়ে নেওয়া যায় না ?

—অভিদারও শেষে এই দশা। ঘুমন্ত মেয়েকে দেখে একটা প্রকাণ্ড অট্টহাসি গিলে নিল ধীমান, —এর পর কি অভিদা হেকিমি য়ুনানি করতে চাইছে নাকি ? তাবপর জলপড়া তাবিজ কবজ মাদুলি, শেষে শনিঠাকুরের থানে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকা ! তোমার দাদার কী হল, আ্যাঁ ? এই কি বিংশ শতাব্দীর ভাবনা ?

—ওভাবে বলছ কেন ? হোমিওপ্যাথি কবিরাজি কি চিকিৎসা নয় ? হোমিওপ্যাথি করলে বরং বাবার ওপর টর্চার অনেক কম হবে।

—সে তো কিছু না করে শুইয়ে রাখলে পেশেন্টের ওপর টর্চাব আরও কম হয়। তোমার দাদা কি সেটাই চায় ?

টিটকিরিটা বিঁধল অনসূয়াকে। গলা সামান্য চড়িয়ে বলল, —তোমার অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার বাবার কী উন্নতিটা করেছে শুনি ?

—আই অবজেক্ট। তোমার ডাক্তার কথাটা বলবে না। ধীমানও ঈষৎ রুক্ষ, —আমাকে জড়াবে না। তোমার দাদা নিজে ডক্টর সান্যালের সঙ্গে কথা বলে স্যাটিসফায়েড হয়ে তবে তাকে দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছে। এর মধ্যে আমার নাম আসে কেন ?

—এটা দায় এড়ানো কথা। তুমিই ওই ডাক্তারের কাছে দাদাকে নিয়ে গিয়েছিলে। অনসূয়া গজগজ করছে, —এক মাস ধরে রে দিইয়ে বাবার বুকটা পুড়িয়ে দিল, এখন শরীরে বিষ ঢালছে... এদিকে বুকের শ্যাডো যে কে সেই ! ঘ্যানঘেনে জ্বরটা পর্যন্ত ছাড়ল না ! একটা দিনের জন্যও না !

ধীমান কাগজগুলোকে দলা পাকিয়ে লেখার টেবিলে ছুড়ে দিল। অর্ধেক কাগজ মেঝেয় গড়াচ্ছে, ভ্রুক্ষেপ নেই। গুম মুখে বলল, —ভুল হয়েছে। খুব শিক্ষা হয়েছে। কেন যে মরতে তোমাদের ব্যাপারে মাথা গলাতে গেলাম। আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার চেনা ডাক্তারদের ওপর তোমাদের আস্থা নেই। মাঝখান থেকে নিজের কাজকর্ম শিকেয় তুলে, ইম্পর্ট্যান্ট এনগেজমেন্ট ক্যানসেল করে ছোটাছুটি করলাম শুধু অপবাদ কুড়োনোর জন্য।

খানিকটা দমে গেল অনসূয়া। ধীমানকে এভাবে আহত করা ঠিক হয়নি, অন্যভাবেও বোধহয় বলা যেত কথাটা। ধীমান বাবার জন্য কম করেনি। অনসূয়াকে দ্বিতীয় বার বলতে হয়নি, দার্জিলিং থেকে নিজেই স্মরণ ব্যানার্জিকে ফোন করেছিল। প্রথম দিন পৌঁছেই। তাদের পরিবারের ওপর মমত্ব আছে বলেই না ধীমান...

গলা নরম করে অনসূয়া বলল, —রাগ করছ কেন ? ফল না পেলে মানুষ অন্য চিকিৎসার কথা ভাববে না ?

—নিশ্চয়ই ভাববে। কিন্তু একটা ট্রিটমেন্টের মাঝখানে নয়। স্পেশালি যে চিকিৎসার এখনও ওয়ান ফোর্থও হয়নি।

—আহা, দাদা তো কেমোথেরাপি বন্ধ করবে বলেনি। জাস্ট একটা অলটারনেট চিন্তা।

—করুক না যা ইচ্ছে। আমি আর এর মধ্যে নেই। আই মাস্ট কিপ মাইসেলফ অ্যালুফ।

অনসূয়ার বুক অভিমানে ভারী হয়ে এল। নিজের ইগোটাই ধীমানের কাছে বড় হল। এরকম একটা বিপদের সময়ে। ঈশ্বর না করুন ধীমানের বাবার যদি এমন কোনও দুরারোগ্য অসুখ হয়, ধীমানও কি তাদের মতো করেই ভাববে না? বাবার সামান্য ছানি অপারেশনের জন্য চারটে ডাক্তার কনসাল্ট করেছিল ধীমান, মনে আছে অনসূয়ার। আজ অনসূয়ার তো মাথারই ঠিক নেই, কী বলতে কী বলে ফেলেছে, অমনি গায়ে ফোসকা পড়ে গেল। স্ত্রীর মনের অবস্থাটা পর্যন্ত বুঝবে না ধীমান!

নীরবে রান্নাঘরে এল অনুসূয়া, যন্ত্রচালিতের মতো রাতের খাবার দাবার গরম করল। শান্ত স্বরে ডাকল ধীমানকে।

গোমড়া মুখে খাচ্ছে দুজনে। হঠাৎ এক সময়ে ধীমান বলে উঠল, —অভিদা কেন হোমিওপ্যাথি করতে চাইছে, আমি বুঝি।

অনসূয়া চোখ তুলল, কেন?

—সিম্পল রিজন। টাকা। মানি। অভিদা এখন টাকা বাঁচাতে চায়।

কথাটা অনসূয়ার মাথাতেও যে একবারও যে আসেনি, তা নয়। তবু বলল, —যে যে ভাবে দেখে, সে সেভাবেই ভাবে।

ধীমান চোখ কুঁচকে তাকাল, —এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছ কেন? আমি তো তোমাকে হার্ট করে কিছু বলিনি। বরং তুমিই আমাকে...

কথা বলতে ভাল লাগছিল না অনসূয়ার। চুপ করে রইল।

—তোমরা মেয়েরা এতটুকু প্র্যাকটিকাল নও। ধীমান হাসছে, —সাদা সত্যির দিকেও তোমরা চোখ তুলে তাকাতে চাও না।

—এ বিষয়ে আমাদের কথা না বলাই ভাল, নয় কি? মনোগত ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েও নিস্পৃহ স্বরে বলল অনসূয়া, —খরচা যখন সব দাদাই করছে, তখন কী ভাবে বাবার চিকিৎসা হবে সেটা ঠিক করারও অধিকারও দাদার। কম পয়সার চিকিৎসা, টাকা বাঁচাতে চাইছে, এ সব বলা কি আমাদের সাজে?

—কেন সাজবে না? অর্থের কথা বলছ? ইন্দ্রও তো কিছু টাকা দিয়েছে। আমি সব খবর রাখি।

—কত দিয়েছে জানো? হসপিটালে দশ দিয়েছিল, কেমোর সময়ে আরও দশ। দু দফায় কুড়ি।

—সে তার সাধ্য মতো দিয়েছে।

—তা ঠিক। আমরা কিন্তু তাও দিইনি। অনসূয়াব গলা ডুবে গেল।

—হঠাৎ আমাদের কথা উঠছে কেন?

—ওঠে না? অনসূয়া স্থির চোখে ধীমানের দিকে তাকাল, —তোমার কথা না হয় ওঠে না, কিন্তু আমার?

ধীমান থতমত খেয়ে গেল, —তুমি দেবে কোত্থেকে? আমার কীই বা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে? দেখবে পাশবই!

—থাক। তবে আমার মনে হয় দাদারও অনন্ত ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নেই।

—একদম নেই? নিজের ফ্ল্যাটের পেছনে যে টাকাটা ঢেলে রেখেছে, সেটা বুঝি কিছু নয়? ও টাকা তুলে নিলেই তো হই হই করে বাবার চিকিৎসা হয়ে যায়।

—কত কী ঢেলেছে তুমিও জানো না, আমিও জানি না।

—আন্দাজ করা যায়। কমসে কম লাখ।

—বেশ তাই হল। ও টাকা তুললে দাদার ফ্ল্যাটের কী হবে?

—ফ্ল্যাট আগে, না বাবা? ক্যানসেল করে দিক। উঁহু, চোখ বড় করে তাকিও না। একদিক দিয়ে হিসেব করলে...থাক।

—বলোই না। হিসেবটা কী?

—ফ্ল্যাটের জন্য তোমার দাদার টাকা জমল কোত্থেকে ? অ্যাদ্দিন যে বউ মেয়ে নিয়ে গড়িয়ার বাড়িতে পড়ে আছে তার একটা ফিনানশিয়াল ভ্যালু নেই ? এক ছাদের নীচে না থেকে টাকা গুনতে হলে অভিদা এত টাকা জমাতে পারত ? সাত বছর বিয়ে হয়েছে... তার মানে সাত বছরে মিনিমাম দেড় লাখ সেভ করেছে। এই টাকা তো সুদেমূলে বাবা মাকে ফেরত দেওয়া উচিত।

—আহা, নিজেদের বাড়ি...

—নিজেদের বাড়ি ফিলিংস থাকলে কেটে পড়ার ধান্দা কেন ? ...একটা কথা মাথায় রেখো, তোমার দাদার ফ্ল্যাট যদি নাও কেনা হয় সে ফুটপাতে গিয়ে বসবে না। বরং বলতে পারো আমরাই হচ্ছি নাঙ্গা ফকির। দু হাজার টাকা করে ভাড়া গুনে গুনে আরও নাঙ্গা হচ্ছি। অতএব সত্যি যদি কারও ফ্ল্যাটের দরকার থাকে, তা আমাদের। আরও ক্রুড কথা শুনবে ? তোমার ভাই দাদা বাবার জন্য সর্বস্ব খরচ করে ফেললেও ও বাড়িতে তাদের একটা জায়গা আছে, কিন্তু সেখানে তোমার কোনও পজেশান নেই। মেয়েরা সম্পত্তির ভাগ পেলেও ওই অধিকারটি আইন তাদের দেয়নি। সো, খরচটাও তাদেরই আগে করা উচিত। অন্তত তাদের যখন আছে। হ্যাঁ, তাদের না থাকলে একটা কথা ছিল। আমি নয় ধার দেনা করে হোক, যে করেই হোক...। ইমোশনাল গ্রাউন্ডে দু-পাঁচ হাজার খরচ করাই যায়। করছিও তো। করছি না ? দু বার আমি দীপঙ্কর সান্যালের ফি দিয়ে দিয়েছি, অভিদার কাছে চেয়েছি টাকাটা ? তুমিও তো রেগুলার কিছু না কিছু হাতে করে নিয়ে যাচ্ছ। ফলটা, হরলিকস কমপ্ল্যানটা, মুরগির স্যুপ...

অনসূয়া হতবাক, —তুমি রোজ রোজ সব হিসেব করে রাখছ ?

—নো। নট অ্যাট অল। এটাই তো আমাদের ডিউটি। মেয়ে জামাইয়ের। অভিদার শ্বশুর যদি আজ কোমর ভেঙে হসপিটালে পড়ে থাকে, কে খরচা দেবে ? জামাইরা, না তার ছেলে ?

নিষ্ঠুর সত্যি, নিখাদ সত্যি, তেতো সত্যি। কিন্তু এ কথাগুলো কি এভাবে না বললে চলছিল না ধীমানের ! তার উদ্বিগ্ন দাদাটাকে কেন এত বিষয়ী চোখে দেখতে শেখাচ্ছে ধীমান ! কেনই বা এই মুহূর্তে অনসূয়ারও মনে হয় বাবা মারা গেলে দাদা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে !

ভাবনায় লাগাম পরাতে চাইছে অনসূয়া। পারছে না। খাওয়া সেরে বিছানা করে দিয়ে ব্যালকনিতে এল। বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ। কদিন ধরেই বর্ষার আর তেমন তেজ নেই, বিদায়বেলা বুঝি ঘনিয়ে এল, তবু নিয়ম রক্ষের মতো একবার অন্তত নামে রোজ।

গ্রিলের বাইরে দু হাত ছড়িয়ে দিল অনসূয়া, জলের ফোঁটা ছুঁচ্ছে। দাদা কি ডুড় তামাক দুইই খেতে চায় ? দুনিয়ার সবার কাছে গলা বাজিয়ে বলবে বাবার জন্য সে একাই করে মরল, এদিকে নিজের ফ্ল্যাটও হাতছাড়া হল না— ভেবেই কি হোমিওপ্যাথির প্রস্তাব ? হতে পারে। হতে পারে না, তাই-ই। ইন্দ্রটারই বা কী মতলব ? সে এমন কিছু খরুচে ছেলে নয়, মাইনের চার ভাগের এক ভাগও সংসারে দেয় না, বাকিটা যায় কোথায় ? জমাচ্ছে, জমাচ্ছে। বিয়ের পর সব টাকা বউয়ের পিছনে ঢালবে। ইস্, অনসূয়ার নিজের যদি কিছু টাকা থাকত ! একদম নিজের !

বাহারি লোহার গ্রিলে মাথা চাপল অনসূয়া। দাদা বিকেলে হোমিওপ্যাথির কথা তুলতেই মার মুখ কেমন শুকিয়ে গেল। কী বিবর্ণ দৃশ্য ! স্বামীর প্রাণের জন্য ভিখিরির মতো ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মা ! অত দাপুটে অনসূয়ার মা কী দাসীবাঁদির পর্যায়ে নেমে গেছে ! অনসূয়া নিজের চোখে দেখেছে বউদিকে সরিয়ে মা আজকাল দুবেলা রান্নাঘরে ঢোকে। তারকেশ্বরে যাওয়ার নাম করে কাজের মেয়েটা তিন দিন ডুব মেরে বসে রইল, পাঁজা বাসন নিয়ে তড়িঘড়ি মাজতে বসে যাচ্ছে মা ! বউদিকে ঘেঁষতে দিচ্ছে না কাছে ! কেন এই স্বেচ্ছাদাসত্ব ? ছেলে ছেলের বউকে কৃতজ্ঞতা জানানো ? বাড়তি খেটে খেটে স্বামীর চিকিৎসাটুকু সুনিশ্চিত করা ?

হায় রে মা ! কী অসহায় কী অসহায় !

সহসা দুচোখ বাষ্পে ভরে গেল অনসূয়ার। সে নিজেই বা কী ? ঊনষাট বছরের অল্পশিক্ষিতা কল্যাণী আর একত্রিশের অনসূয়া তো একই।

একটা তফাত আছে। বিয়ের গয়নাগুলো অবশ্য আছে অনসূয়ার। মার দেওয়া গয়না মার হাতে চুপি চুপি তুলে দিয়ে আসবে ? এ ছাড়া আর কীই বা সাধ্য আছে তার।

বিয়ের পর এই প্রথম অনসূয়া বসুমল্লিকের ওপর ধিক্কার জাগছিল অমলকান্তির মেয়ের। বাবার শ্রমে গড়ে দেওয়া বি এ এম এ ডিগ্রিগুলো কণ্ঠহার নয়, বকলস বনে গেছে। কেন যে অনসূয়া একটা চাকরির চেষ্টা করেনি কোনওদিন ! ধীমান চায়নি বলে ? বাজে কথা। তার নিজের কতটুকু চাড় ছিল ?

হায় রে মেয়ে ! কী মূর্খ কী মূর্খ !

জমাট বাষ্প অশ্রু হয়ে নামছে দু গাল বেয়ে। মুছে ফেলার চেষ্টা করল অনসূয়া।

মোছে না।

ভেজা হাতে কি জল মোছা যায় !

বারো

—প্রোগ্রেস কি কিছু হচ্ছে ডাক্তারবাবু ?

—এক্ষুনি বলা কঠিন। সেকেন্ড কেমোটা যেন কবে শেষ হল... ? শনিবার আফটারনুনে না ?

অভিজিৎ ঘাড় নাড়ল।

—তার মানে চার দিন। আরও কয়েকটা দিন না গেলে রেসপন্সটা ক্লিয়ার হবে না। তবে এটুকু বলতে পারি মিস্টার চৌধুরী এবার খুব স্টেডিলি মেডিসিনটা অ্যাকসেপট করেছেন। সাইক্লটা চলার সময়ে ভমিটিং টেন্ডেন্সি গত বারের চেয়ে কম ছিল, প্রেশার ফ্লাকচুয়েশান ওয়াজ উইদিন টলারেন্স, এ সবই গুড সাইন।

—বাবা কিন্তু খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। ধরে ধরে বাথরুমেও নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না।

—এক্সপেক্টেড, হাইলি এক্সপেক্টেড। দীপঙ্কর সান্যালের চকচকে মুখে কোনও প্রতিক্রিয়াই নেই, —টেস্টগুলো করে এনেছেন ?

—এক্সরে আর ব্লাডটা করিয়েছি। কাঁধঝোলা ব্যাগ থেকে ছোট বড় খামগুলো বার করে টেবিলে রাখল অভিজিৎ, —এ দুটোই তো ইমিডিয়েটলি করাতে বলেছিলেন ?

এক্সরে প্লেট চোখের সামনে ধরে দেখছে দীপঙ্কর সান্যাল, সৌম্য মুখমণ্ডলে পেশাদারি গাম্ভীর্য। আগের প্লেটগুলোও বার করল খাম থেকে। তারিখ দেখে দেখে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করছে। পুরু ঠোঁট ছুঁচোলো হল। প্লেটগুলো সরিয়ে ছোট খামগুলো খুলছে এক এক করে।

ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকলেই অভিজিতের শরীরটা কেমন শিরশির করে। সামনেই যেন এক সর্বজ্ঞ। শুধু সর্বজ্ঞ কেন, সর্বশক্তিমানও বটে। পার্স আর ব্রিফকেসে যে লোক অন্যের জীবন মৃত্যুর বিধান নিয়ে ঘোরে, সে সর্বশক্তিমান ছাড়া আর কী ! কখনও কখনও ডাক্তারের মাথার পিছনে অলৌকিক জ্যোতিও দেখতে পায় অভিজিৎ। ক্যালেন্ডারে অবতারদের ছবিতে যেমন থাকে, ঠিক সেরকম।

সেই জ্যোতি বেশি মাত্রায় আছে সান্যালের। মাথার পিছনে না থাক, পোশাকে আশাকে, চলনে বলনে, হাসিতে গাম্ভীর্যে, সর্বত্র। বয়স খুব বেশি নয় সান্যালের, মেরে কেটে পঁয়তাল্লিশ, কিন্তু কী গভীর আত্মবিশ্বাস। যেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে শ্রীকৃষ্ণ। দু মিনিট এর সঙ্গে কথা বললেই নিজেকে উদ্দীপিত অর্জুন মনে হয় অভিজিতের, জয় পরাজয়ের চিন্তা ভুলে শেষ পর্যন্ত লড়তে সাধ জাগে। তবে প্রশ্ন করতে হয় ভারী মেপে জুপে, রুগির বাড়ির লোকের বেশি কৌতূহল এই ডাক্তার পছন্দ করে না।

অভিজিৎ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, —শ্যাডোটা একটু বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে না ডাক্তারবাবু ?

—উমমম্। ডাক্তারের একটা চোখ সেকেন্ডের জন্য অভিজিৎকে দেখে নিল, —ডব্লু বি সিটা ফল করে গেছে।

—ডব্লু বি সি ? মানে শ্বেত কণিকা ?

—হুঁ। যেটা রক্তকে প্রতিরোধ ক্ষমতা জোগায়। নরমাল কাউন্ট চার হাজারের বেশি হওয়া উচিত, কিন্তু আপনার বাবার এখন সে জায়গায় বিলো দু হাজার। এটা তো আপনাকে পূরণ করতে

হবে প্রফেসার সাহেব।

ডাক্তারের মুখে এই সম্বোধনটা শুনলে একটু বিগলিত হয়ে যায় অভিজিৎ। ফার্স্ট ইয়ারের নবীন ছাত্রর মতো প্রশ্ন করল, —কী ভাবে স্যার ?

—প্লেটলেট ব্লাড লাগবে। ফ্রেশ ব্লাডও। দু বোতল।

প্লেটলেট নামটা শোনেনি অভিজিৎ, তবু মাথা দুলিয়ে দিল। মিনমিনে স্বরে প্রশ্ন করল, —ব্লাড ব্যাঙ্কে তো পাওয়া যাবে, তাই না ?

—ও শিওর। দু দিনের জন্য বাবাকে নার্সিংহোমে অ্যাডমিট করিয়ে দিন, ব্লাডটা নিয়ে বাড়ি চলে আসবেন।

—আবার নার্সিংহোম ? থার্ড কেমোর দু দিন আগে ভর্তি করে তখন যদি দিইয়ে নিই ?

—ইট উইল বি টু লেট। এখনই দরকার। আর হ্যাঁ, এবার স্ক্যান ট্যানগুলো করিয়ে নিতে হবে। বোন, ব্রেন, থোরাক্স...আগে তো ব্রেন স্ক্যান বা সি টি থোরাক্স হয়নি, তাই না ?

—না। অভিজিৎ বড় করে শ্বাস ফেলল। আবার একটা বিশাল খরচ !

বুঝি বা শ্বাস পতনের শব্দ শুনতে পেল সান্যাল। হয়তো শোনা অভ্যেস আছে বলেই তার কান ভারী তীক্ষ্ণ। হেসে বলল, —আপনি তো শিক্ষিত মানুষ, জানেনই তো আমরা একটা আনইকুয়াল লড়াই লড়ছি। ডিউরিং ওয়ার শত্রুপক্ষের অবস্থান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিতে হবে না ? ম্যালিগনেন্ট সেলগুলো হাড়ে ছড়িয়ে গেছে কি না, ব্রেনে পৌঁছে গেছে কি না, কিংবা বুকে আর কোথায় কতটা স্প্রেড করল, সব জানা থাকলে তবেই না ওয়ার স্ট্র্যাটেজির ঠিক ভুলটা বুঝতে পারব। সেই অনুযায়ী আর্মির স্ট্রেংথ বাড়াব কমাব...

কাচের টেবিলে ডটপেন ঠুকতে ঠুকতে বোঝাচ্ছে ডাক্তার, অভিজিৎ অন্য দিনের মতো উদ্বুদ্ধ হচ্ছিল না। দিনভর ক্লাসে ক্লাসে লেকচার দেওয়ার পর অন্যের দীর্ঘ ভাষণ এত বিরক্তিকর লাগে ! অভিমন্যু বধের পর অর্জুনেরও বোধহয় এমনটা হয়েছিল। তার মতো মধ্যবিত্তের পকেট থেকে সত্তর-আশি হাজার টাকা গলে যাওয়া কি পুত্রশোকের চেয়ে কম ! অর্জুন কৃষ্ণকে মারতে তেড়ে গিয়েছিল না ! নাকি যুধিষ্ঠিরকে !

অভিজিৎ ডাক্তারকে থামাতে চাইল, —মোটামুটি এ সব টেস্টের ইয়েটা যদি একটু বলে দ্যান।

—উইদিন সেভেন হয়ে যাবে। এর মধ্যে আপনার সি টি থোরাক্সটাই একটু বেশি পড়বে। অ্যারাউন্ড চার হাজার। বাকি দুটো নমিনাল। হাজার, দেড় হাজার...। রোজমেরি থেকেই করিয়ে নেবেন। প্রেসক্রিপশানে টেস্টের কথা লিখছে সান্যাল। চোখ না তুলেই বলল, —টাকাটা এনেছেন ?

যুদ্ধে মন্ত্রণা দানের দক্ষিণা ! যুদ্ধ পরিচালনার দক্ষিণা ! সান্যালের ফি, সেকেন্ড কেমোর। অভিজিৎ পকেট থেকে তিনটে কবকরে পঞ্চাশ টাকার বান্ডিল বার করল, —পনেরো আছে।

—ওকে ওকে। দ্রুত টাকাটা ব্রিফকেসে ভরে রাখল সান্যাল, —ওষুধের বিলটা আমার পিএর কাছে আছে, নিয়ে নেবেন। আর ব্লাডগুলো আজকালের মধ্যে অ্যারেঞ্জ করে ফেলুন। সেপ্টেম্বরের সেকেন্ড উইকে আমি কিন্তু থার্ড কেমো দেব, তার আগে স্ক্যান রিপোর্টগুলো দেখিয়ে যাবেন।

সান্যালের সুসজ্জিত চেম্বারে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল এতক্ষণ, বাইরে এসে ভাল করে দম নিল অভিজিৎ। সান্যালের পিএ এক সুবেশা তরুণী, জনা পাঁচেক অপেক্ষমাণ মানুষের কান বাঁচিয়ে কার সঙ্গে যেন ফোনে নিটির পিটির করছে, বিলটা তার কাছ থেকে নিতে কয়েক মিনিট দাঁড়াতে হল অভিজিৎকে। তিন হাজার একশো সাতচল্লিশ টাকার বিল, গুনে গুনে মেয়েটাকে বুঝিয়ে দিল টাকাটা। সান্যালের পক্ষীরাজ মারুতি থাউজেন্ড রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, গাড়িটাকে টপকে এসে ঘড়ি দেখল। সাতটা পাঁচ। এক্ষুনি কি ব্লাড ব্যাঙ্কে যাবে ? গেলে হয়। প্লেটলেট রহস্যটা বোঝা প্রয়োজন। নাকি আগে বরুণদার কাছে যাবে ? বরুণদা ব্লাড ডোনেশান ক্যাম্প চালায়, দু-তিনটে ব্লাড ব্যাঙ্কের সঙ্গে ভাল যোগাযোগ আছে বরুণদার। আজকাল ডোনার ছাড়া ভাল জায়গা থেকে রক্ত পাওয়াই যায় না। তেমন হলে বরুণদা হয়তো ডোনারও জোগাড় করে দিতে পারে। ফ্রেশ ব্লাডের জন্যও বরুণদাই...

বরুণ বাড়িতেই ছিল। টিভি দেখছিল। হঠাৎ ভায়রাভাইকে দেখে দারুণ শশব্যস্ত। হাঁকডাক

করে বউকে ডাকল, আগে চা জলখাবার দিতে বলল অভিজিৎকে। সমস্যাটা শুনে একটুও ঘাবড়াল না। দু-এক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে বলল, —ও হয়ে যাবে। মেসোমশাইয়ের গ্রুপটা কী ?

—এ বি পজিটিভ।

—নো প্রবলেম। তুমি কালই মেসোমশাইকে নার্সিংহোমে অ্যাডমিট করে দাও, আমি ডোনার, প্লেটলেট নিয়ে পৌঁছে যাব। বাই টুয়েলভ। ...তারপর বলো, তোমার কী খবর ? বহুকাল পর আমার বাড়ি এলে...হা হা হা, রক্তচোষার বাড়িতে রক্তের খোঁজ !

রক্তচোষা নামটা ঋতুর দেওয়া। আদরের নাম। এই ডাকটাকে খুব উপভোগ করে বরুণ।

অভিজিৎ হেসে বলল, —আমার তো এখন একটাই খবর দাদা। বাবা।

—মেসোমশাই খুব কষ্ট পাচ্ছেন ? গত রোববারই আমরা দেখতে যাব ভাবছিলাম...

—হ্যাঁ, কষ্ট যা পাওয়ার তা তো বাবা পাচ্ছেই। তার সঙ্গে...অভিজিৎ থেমে গেল।

—তার সঙ্গে কী ? বরুণ ভুরু কুঁচকেছে, —গৃহযুদ্ধ ? ঋতু প্যান প্যান করছে ? সপ্তাহে একদিন নিয়ম করে বউকে চুমু খেতে খেতে বউয়ের কান মুলে দেবে। অন্দরের দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে নিল বরুণ, —আমি তো নীতুকে চিমটিও কাটি। যন্ত্রণা দেওয়াটাই মেয়েদের তাঁবে রাখার অস্ত্র।

—না না, সে সব কিছু না। অভিজিৎ ঈষৎ অপ্রতিভ হল, তবে বরুণের রসিকতায় অন্য দিনের মতো কুঁকড়ে গেল না। ছায়া ছায়া হাসি ফুটিয়ে বলল, —আপনি ঘরের লোক, আপনার কাছে কী আর লুকোব ! খরচে খরচে একেবারে জেরবার হয়ে গেলাম।

—নিড এনি হেলপ ? টাকার দরকার ?

—না না...

—লাগলে নিতে পারো। সঙ্কোচ কোরো না। ইনফ্যাক্ট কয়েক দিন আগে আমি আর নীতু আলোচনাই করছিলাম। বিপদে আপদে আমরা যদি পরস্পরের কাজে না লাগি, তো কীসের আত্মীয় !

কথাটাতে ভারী স্নিগ্ধ বাতাস আছে, বুকটা একটু হালকা হল অভিজিতের। নিজের ভাই বোন যদি একটু এভাবে বলত ! টাকার কথা শুনলে তারা দিনের বেলাই আকাশের তারা গুনতে শুরু করে। ইন্দ্র পাঁচ টাকা ঠেকালে পরদিনই ঠারে ঠোরে সাড়ে সাত টাকার হিসেব চায়। আর অনু তো ওরে বাবা, কী হল বাবা, তোমার কী হবে বাবা, করে করেই কাটিয়ে দিচ্ছে।

অভিজিৎ মাথা নেড়ে বলল, —লাগলে বলব। এখনও পর্যন্ত কুড়িয়ে কাছিয়ে কোনও রকমে চলছে, এবার হয়তো আপনাদের দ্বারস্থ হতেই হবে।

চায়ের সঙ্গে পাঁউরুটি ডিমে ডুবিয়ে ভেজে এনেছে নীতু। দরজা থেকে বলল, —তোমার ওপর দিয়ে সত্যি বড় ঝড় যাচ্ছে ! ঋতুর সঙ্গে তো ফোনে কথা হয়, সবই শুনি...তা তুমি আবার সারাদিন খাটাখাটুনির পর বেহালা দৌড়ে এলে কেন ? কাজের কথা তো টেলিফোনেই সারতে পারতে।

—বেশ করেছে এসেছে। মানুষের কোথাও একটা আউটলেট দরকার, নইলে ব্রেনটা জ্যাম হয়ে যায়। সারাদিন কলেজ ডাক্তার আর রুগি না করে অভিজিতের এখন মাঝে মাঝে সিনেমা দেখা উচিত। হেভি রগরগে ছবি। অ্যাকশান থাকবে, রোম্যান্স থাকবে, কমেডি সিন থাকবে...

পলকের জন্য পাগল জওয়ানি ঢেউ খেলে গেল সামনে দিয়ে। ঋতুকে ভুল করে বলে ফেলেছিল অভিজিৎ, ঋতু কি আত্মীয় মহলে চাউর করে দিয়েছে কথাটা ! দিতেই পারে।

নীতু পাশে এসে বসেছে। মায়ামাখা গলায় বলল, —কই খাও। চা তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

—এই খাই। ...একটু বাথরুমে যাব যে।

—যাও। তুমি এ বাড়িতে এত অতিথি অতিথি ভাব কর কেন ভাই ?

বরুণ নীতুদের বাথরুমটা বাড়ির তুলনায় বেশ বড়সড়। মেঝেতে টাইলস, দেওয়ালে টাইলস, চার দিকে হরেক রকম ফিটিংস, টেলিফোন শাওয়ার, ডিম্বাকৃতি আয়না, সর্বাধুনিক কমোড— দেখেই বোঝা যায় এ বাড়ির লোকেদের রুচি আছে। প্রতি বার এই বাথরুমে ঢুকলেই অভিজিৎ হীনম্মন্যতায় ভোগে। তাদের বাড়িতে এই ঘরটাই বড় নোংরা। ঋতুটা যে কী করে, জমাদারকে ভালভাবে খাটায়ও না। শ্যাওলা জমে নর্দমার ঝাঁঝরি ভেঙে গেছে, অন্ধকার হলেই পিল পিল আরশোলায়

ছেয়ে যায়, রাত গভীরে ছুঁচো ইঁদুর ঢুকে বসে থাকে। কবে থেকে বাথরুমটা ভাল করে সারাই করে নেওয়ার কথা ভাবছে অভিজিৎ, আর বোধহয় হয়ে উঠল না।

হাতে মুখে খানিক জল দিয়ে ড্রয়িংরুমে ফিরল অভিজিৎ। চুমুক দিয়েছে চায়ে। ফ্রেঞ্চ টোস্টে কামড় বসাল, —মিনটি টুকাইকে দেখছি না ?

—প্যাশের বাড়ির বাচ্চার জন্মদিন। নেমন্তন্ন খেতে গেছে।

—ও।

আবার খাচ্ছে অভিজিৎ। কণ্ঠনালী দিয়ে খাবার পাকস্থলীতে পৌঁছতেই শরীর মনে করিয়ে দিল বহুক্ষণ কিছু পেটে পড়েনি। বরুণ একাই বকবক করে চলেছে, হুঁ হ্যাঁ করতে করতে মুখ চালিয়ে যাচ্ছে অভিজিৎ। বরুণ ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করল, অভিজিৎ ঘাড় নাড়ল। বরুণ শ্বশুরমশাইয়ের প্রশংসা করল, অভিজিৎ ঘাড় নাড়ল। বরুণ ঋতুর গুণ গাইল, তাও ঘাড় নাড়ল অভিজিৎ।

বরুণ কথা থামিয়ে চোখ ছোট করল, —টোটালি এগজস্টেড মনে হচ্ছে ?

—কে ? আমি ? না-তো।

—বললেই হল ! মানসিক চাপে তুমি বেশ ধসে গেছ ভায়া। নেবে নাকি এক পেগ ? চাঙা হয়ে যাবে।

নীতু হাঁ হাঁ করে উঠল, —তুমি এখন বোতল খুলবে নাকি ?

—ওকে একটু দেব। মেডিসিন ডোজ।

অভিজিৎ অল্প আড়ষ্ট হয়ে গেল। মদ্যপানে যে তার অনীহা আছে, তা নয়। বাইরে বেড়াতে গেলে সে খায় মাঝে মাঝে, সঙ্গে ঋতুও একটু আধটু চুমুক মারে। মজা চেখে দেখা। নীতু বরুণের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গিয়ে চার জনই বেহেড হয়ে গিয়েছিল একবার। রাতদুপুরে সমুদ্রে নামার জন্য খেপে উঠেছে অভিজিৎ আর বরুণ, তাই দেখে দু বোন গলা জড়াজড়ি করে কাঁদছে —সে এক সিন ! তারপর থেকে সুরার বিষয়ে ভায়রাভাইকে একটু এড়িয়ে এড়িয়ে চলে অভিজিৎ।

বরুণ কথার চেয়ে কাজে বিশ্বাসী। গ্লাস বোতল বার করে ফেলেছে।

অভিজিৎ আড়মোড়া ভাঙল, —আজ থাক না দাদা। সেই কোন সকালে বেরিয়েছি..আপনার শালী চিন্তা করবে...

—বাড়িতে কোনও স্পেসিফিক কাজ আছে ?

—না, তা নয়, তবে...

—খাও এক পেগ। মাথা ফ্রেশ হয়ে যাবে।

বাড়িতে মৃত্যুপথযাত্রী বাবা থাকলে মদ খাওয়াটা কি অনৈতিক ? এই মুহূর্তে অভিজিৎ যদি নাও খায়, বাবার কি অবস্থার কোনও তারতম্য ঘটবে ? যত দিন বাবা অসুস্থ থাকবে, তাকে কি একটা দুঃখীর পোজ্ করে যেতে হবে সারাক্ষণ ? কোনও সাধ আহ্লাদ থাকতে পারে না তার ? এক দিন স্খলন ঘটতে পারে না ? এ তো ঠিক স্খলনও নয়, কয়েক চুমুক চিনচিনে সুখ মাত্র। ঘাড় গুঁজে সে যে কর্তব্য করে যাচ্ছে, এই না ঢের !

ইত্যাকার দ্বিধাদ্বন্দ্বের বুদবুদের মাঝে প্রথম পেগ নিঃশেষ। আহ্, মাথা ক্রমশ হালকা হয়ে আসছে অভিজিতের, স্নায়ুতন্ত্রীতে আরাম বাজছে ঝিনঝিন।

নীতু ঝাল ঝাল ডালমুট এনে দিয়েছে। পাশে বসে মাঝে মাঝে শাসনও করছে, —এই, আর না। এই, আর না।

কে শোনে কার কথা ! বরুণ দ্বিতীয় পেগ ঢেলেছে গ্লাসে। সোনালি তরল এগিয়ে দিল অভিজিৎকে, —একটা কথা বলি ভায়া, কিছু মনে কোরো না। তোমাদের ওই দীপঙ্কর সান্যাল খুব বড় স্পেশালিস্ট, কিন্তু বাজারে ওর প্রচুর দুর্নামও আছে ভাই। ও ব্যাটা রুগির বাড়ির লোকদের একেবারে ছিবড়ে করে ছেড়ে দেয়।

এ কথা অভিজিতের থেকে বেশি আর কে জানে ! গ্লাস হাতে তুলেও নামিয়ে রেখে অভিজিৎ বলল, —না দাদা, ক্যানসারে এরকমই খরচ।

—মেসোমশাইয়ের কারসিনোমার নেচারটা কী ? স্কোয়ামাশ নয় ?

—তা তো বলতে পারব না।

—কেন, বায়োপ্‌সি রিপোর্টে তো লেখা থাকে। দ্যাখোনি তুমি ?

দেখেছে অভিজিৎ। কিন্তু স্কোয়ামাশ শব্দটা ঠিক মনে পড়ল না। বলল, —এক সেকেন্ড। রিপোর্টটা কাছেই আছে, দেখে বলছি।

এক্সরে-খামের মধ্যে থেকে একটা মাঝারি খাম বার করল অভিজিৎ। কাগজে মোড়া স্লাইডটা রাখল টেবিলে। রিপোর্ট খুলে বলল, —স্কোয়ামাশ নয়। অ্যানাপ্লাস্টিক কারসিনোমা।

—তাতে তো কেমোথেরাপির কিট খুব কস্টলি হওয়া উচিত নয় ! তোমার কত খরচ হয়েছে এখনও পর্যন্ত ?

দ্রুত মনে মনে হিসেব কষে নিল অভিজিৎ। মাথা নিখুঁত কাজ করছে না, তবু মোটামুটি একটা যোগ করে নিল, —রেডিয়েশানের সময়ে হাসপাতাল রেডিয়েশান, আদার মেডিসিন মিলিয়ে চৌত্রিশ হাজার, দুটো কেমোয় নার্সিংহোম ডাক্তার ওষুধপত্র টেস্ট ফেস্ট ধরে অ্যাবাউট বাষট্টি, আরও ধরুন ইন্টারমিডিয়েট ওষুধ এটসেট্রা...এক লাখ পার হয়ে গেছে।

—ডাহা ঠকে গেছ হে। গভর্নমেন্ট হসপিটালে গেলে পনেরো-বিশে তোমার হয়ে যেত।

মুহূর্তের জন্য তীব্র আফসোস হল অভিজিতের। পঞ্চশীলের কথায় নাচাটা গোখুরি হয়ে গেছে। যা রোগ ধরেছে, বাবা তো এমনিও বাঁচবে না, অমনিও বাঁচবে না !

কিন্তু কী আশ্চর্য। অভিজিতের মুখ পঞ্চশীলের কথারই প্রতিধ্বনি তুলছে, —ও সব জায়গা তো নরক দাদা। জেনে শুনে নিজের বাবাকে ওখানে নিয়ে যাওয়া যায় ?

—এ যুক্তি অবশ্য জব্বে মানে। বরুণ টুই টুই ডালমুট ছুড়ছে মুখে, —রোগটা এমনই যে এতে মানুষ পেশেন্টকে সবথেকে দামি ট্রিটমেন্ট দিতে চায়। যার পাঁচ পয়সার ক্ষমতা, সে পনেরো পয়সা লড়িয়ে দেয়। ভাবে বেশি টাকা খসালে যমরাজ একটু ভয়ে ভয়ে থাকবে। মাঝখান থেকে ফয়দা হয় ডাক্তারদের। গ্লাসে এবার লম্বা চুমুক দিল বরুণ, —হ্যাঁ, তুমি বলতে পারো তারা লুঠবে না'টা কেন ? আজকের দুনিয়ায় তো একটাই থিয়োরি। এলোমেলো করে দে মা লুটে পুটে খাই ! রাজা মন্ত্রী শান্ত্রী কোটাল শান্ত্রী পণ্ডিত গুরু শ্রেষ্ঠী সবাই দু হাত্তা মারছে, বৈদ্যরা কেন ফাঁক পড়বে ভাই ! আদর্শের কচকচিতে গুলি মারো, আদত কথা হল ডাক্তারিও একটা বিজনেস। রুগি যত বেশি বিপন্ন, ব্যবসার তত বেশি রমরমা। মৃত্যুভয়ের মতো ক্যাপিটাল দুনিয়ায় আর কিছু আছে নাকি ভায়া ?

নীতু চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎ প্রতিবাদ জুড়ল, —তুমি আবার একটু বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছ। সবাই কি এক ছাঁদের হয় নাকি ? ভাল মন্দ সব প্রফেশানেই আছে। নেই ? আমি তো একজন ডাক্তারকে জানি, আমার বন্ধুর কাকা। তিনি হাসপাতালে ছাড়া আর কোথাও পেশেন্ট দেখেন না। লাখ টাকা দিলেও না। তাঁকে দেখাতে গরিব বড়লোক এমনকী মন্ত্রীকেও লাইন দিয়ে আউটডোরে দাঁড়াতে হয়।

—এক্সেপশান প্রুভস দা ল। আমিও তো সেদিন এক ভদ্রলোকের নাম শুনলাম, এই ক্যানসারেরই। তিনি কেমো মনিটর করতে গেলে ফি নেন মাত্র দুশো টাকা। গরিব হলে ফ্রি।

—আপনি মঙ্গল গ্রহের কথা বলছেন না তো ? অভিজিৎ হেসে ফেলল, —এমন ডাক্তার পৃথিবীতে আছে ?

—আছে আছে। চুঁচুড়া না চন্দননগরে বসে। খুব নাকি আত্মাভিমানী লোক। মতে বনেনি বলে সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে গরিবগুর্বোর চিকিৎসা করে বেড়ান। ক্যানসার স্পেশালিস্ট, কিন্তু জেনারেল প্র্যাকটিসও করেন। পাঁচ টাকা ভিজিট, ভাবতে পারো ? শ'য়ে শ'য়ে লোক ভিড় করে তার চেম্বারে। হেঁজিপেঁজি ডাক্তার নয়, লোকে তাকে ধন্বন্তরি বলে। ...মাঝে তাঁর চেম্বারে হামলা হয়েছিল। দুর্জনেরা বলে প্র্যাকটিস মরে যাচ্ছে বলে অন্য ডাক্তাররাই নাকি...

এতক্ষণে সোজা হয়েছে অভিজিৎ, —এ ডাক্তারের কথা আপনি আগে বলেননি কেন দাদা ?

—বলছি যে, সেদিনই শুনলাম। আমার এক ক্লায়েন্ট এসেছিল বদ্যিবাটি থেকে, তার সঙ্গে কী যেন কথায় কথায় তোমার বাবার কথা উঠল। ...তখনই ভেবেছিলাম তোমায় ফোন করি, তারপর ভাবলাম থাক। তোমরা একটা লাইন ধরে এগোচ্ছ, তোমার ভগ্নিপতি ডাক্তার ঠিক করেছে, অঘটন

কিছু ঘটে গেলে তোমরা কী ভাবে নেবে, না নেবে... তা ছাড়া ভাই, সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে অত সস্তার ডাক্তারে ঠিক মনও ওঠে না। আমার বউয়ের ব্রঙ্কো নিমোনিয়া হলে আমিই কি পাঁচ টাকার ডাক্তার দেখাব ?

একদম অন্তর্যামীর মতো কথা ! অভিজিৎ এক ঢোকে তরলটুকু গলায় ঢেলে ফেলল। পার্থদা কত বড় এক হোমিওপ্যাথের সন্ধান দিল, একবার শুধু তাকে কনসাল্ট করতে চেয়েছিল অভিজিৎ, ইন্দ্র অনু দুজনেই নাকচ করে দিল। ঋতু বলছিল অনু নাকি পরদিন এসে চারটি বাকা বাকা কথাও শুনিয়ে গেছে। কেন পছন্দ হল না তার প্রস্তাব ? সস্তা বলেই না ?

অভিজিৎ ঝপ করে বরুণের হাত চেপে ধরল, —সেই ডাক্তারকে এখন একবার ডেকে বাবাকে দেখানো যায় না ?

বরুণ চোখ বুজে কী যেন ভাবল, —এক কাজ করো। রিপোর্টগুলো রেখে যাও। দেখি, যোগাযোগ করা যায় কি না। বেশি কিছু রাখতে হবে না, এক্সরে প্লেট, বায়োপসি রিপোর্ট, আর ওই মোড়কে ওটা কী ? স্লাইড ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাও।

মিনটি টুকাই ফিরে এসেছে, কলকল করছে। অভিজিৎ কাঁধে ঝোলা তুলে নিল। মাথাটা ঝিমঝিম করছে, দু পেগেই নেশা হয়ে গেল ! নাহ্ বাস নয়, আজ ট্যাক্সিতেই ফিরতে হবে।

আকাশ নির্মেঘ। ভাদ্রের গুমোট কম আজ, থেকে থেকে হাওয়া বইছে। ট্যাক্সির জানলা দিয়ে ফুরফুর ঢুকছে বাতাস, স্নেহের পরশ বোলাচ্ছে অভিজিতের মুখে চোখে। আমেজ আসছে, বেশ আমেজ আসছে। তবু কোথায় যেন কী একটা চিনচিন করে অভিজিতের। দুঃখ ? ক্ষোভ ? হতাশা ? মাত্র চার মাসে জীবনের ছক আমূল উলটেপালটে গেল। ফ্ল্যাট বোধহয় আর হল না অভিজিতের। এইচ ডি এফ সি থেকে লোন স্যাংশনের চিঠি এসে গেছে, কোঅপারেটিভের নামে চেক, উত্তর দিয়ে লোনটা ক্যানসেল করে দিতে বলতে হবে। মাসে মাসে সাড়ে চার হাজার করে কাটলে, খাবে কী ? ঘরের টাকা গেছে, ব্যাঙ্ক গেছে, পি এফ, এন এস সি, এন এস এস সবই প্রায় যাওয়ার মুখে, এবার কোথায় যাবি অভিজিৎ ? বরুণদা টাকা দেবে বলল বটে, সে তো শ্বশুরমশাইয়ের কাছে চাইলেও পাওয়া যায়, কিন্তু সব ধারই তো শুধতে হবে। এবং কীসের জন্য ধার ? কোনও অ্যাসেট নয়, ফর এ বিগ জিরো !

হঠাৎ পেটটা মুচড়ে উঠল অভিজিতের। ডিম পাউরুটি আর দু পেগ সুরা পেটে ঘুষোঘুষি শুরু করে দিয়েছে, হুড়মুড় করে গা গুলিয়ে উঠল।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দুদ্দাড় নেমে পড়ল অভিজিৎ। জোরে জোরে বেল বাজাচ্ছে। ঋতু দরজা খুলতেই তীর বেগে বাথরুমে ছুটে গেল। উবু হয়ে বমি করছে। নোংরা বাথরুম টক দুর্গন্ধে ভরে গেল।

তেরো

অমলকান্তির বাড়ি আজকাল নিঝুম হয়ে থাকে দিনভর। মাত্র কিছুদিন আগেও যে এই গৃহে মোটামুটি প্রাণোচ্ছল কিছু প্রাণী বাস করত, বিশ্বাস করাই কঠিন। টিভি প্রায় চলেই না এখন, যদিও বা চলে অতি লো ভলিউমে। লুকিয়ে চুরিয়ে হয়তো এক-আধটা সিরিয়াল দেখে ঋতু, ছুটির দিনে মাঝে মধ্যে স্পোর্টস চ্যানেল খুলে বসে ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু তারাও খুব সতর্ক থাকে, দেওয়ালকেও বুঝতে দিতে চায় না ভুল করে একটুখানি প্রমোদের খোঁজ করে ফেলেছে এ বাড়ির কেউ। সবাই পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে নিচু পর্দায়, হাসে ঠোঁট টিপে, নয়তো উদাস। নীরবে খেতে বসে, নিঃশব্দে খাওয়া সারে। বাথরুমে ঢুকলে ইন্দ্রজিতের হেঁড়ে গলার গান বন্ধ, অভিজিৎ ভারী স্বরে ধমকায় না রিমলিকে, ছাদে কাপড় মেলতে উঠে পাড়ার বউ ঝিদের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে গল্প জোড়ে না ঋতু, নাতনির পাকা পাকা কথা শুনে কল্যাণীর হেসে গড়িয়ে পড়ার পালা নিঃশেষ। এ বাড়ির সর্বাঙ্গে যেন কেউ অদৃশ্য কালো ফেস্টুন জড়িয়ে দিয়ে গেছে— শোকের বাড়ি।

শুধু রিমলিই যা ব্যতিক্রম। সেই শুধু চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ হঠাৎ, গান গেয়ে ফেলে, লাফালাফি

করে, অকারণে হেসে ওঠে খিলখিল। ওইটুকু মেয়ের কীই বা গলার জোর, তাতেই যেন থর থর কেঁপে ওঠে বাড়িটা। সে থামলেই নিঝুম বাড়ি চতুর্গুণ নৈঃশব্দ্যে ভরে যায়।

আরেকটা কারণেও নৈঃশব্দ্য ভাঙে। কাশির আওয়াজে। অমলকান্তির। যখন তখন কাশতে কাশতে গোটা বাড়িকে আলোড়িত করে দেন তিনি, ফ্যাসফেসে সরু স্বরে আর্তনাদ করেন। তবে এ বাড়ির কেউই শব্দটাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। তারা জানে, এটাও নৈঃশব্দ্যেরই অঙ্গ।

দিন দুয়েক হল ছবিটা একটু পালটেছে। ধীমান আসাম যেতেই বাপের বাড়ি এসে রয়েছে অনসূয়া। রিমলি ঝিমলির জুটি এখন আর কোনও শাসনই মানে না। তারা হাসছে, খেলছে, ছুটছে, লাফাচ্ছে, চিৎকার করতে করতে ঢুকে পড়ছে অমলকান্তির ঘরে। ঋতু অনসূয়া যদি চোখ পাকিয়ে ছুটে গেল, অমনি দে ছুট দে ছুট। তাই দেখে ইন্দ্রজিৎ হাসছে, অভিজিৎও। কল্যাণীরও চিবুক চোয়াল শিথিল মাঝে মাঝে। দুটো খুদে খুদে ঝর্না বুঝি বা প্রাণের সাড়া এনে দিল বাড়িতে।

এমন একটা আবহাওয়ায় কথাটা কী করে পাড়বে ভেবে পাচ্ছিল না ইন্দ্রজিৎ।

তো শেষে বলেই ফেলল। সন্ধেবেলা কিছু ছাত্রছাত্রী এসেছিল পড়তে, তারা যাওয়ার পর নোটস গোছাচ্ছিল অভিজিৎ, পায়ে পায়ে ইন্দ্রজিৎ ছোটঘরে এল।

—দাদা, তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল।

—বল।

—পরশু আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

অভিজিতের হাত থেমে গেল, —কোথায় ?

—বউদি তোকে কিছু বলেনি ? বাইরে একটা চাকরি পাওয়ার কথা হচ্ছিল...

—হ্যাঁ, কী একটা ইন্টারভিউ-এর কথা বলেছিল বটে।

—সেটাই। দিল্লিতে।

অভিজিৎ একটু চুপ থেকে বলল, —তুই এখন চলে যাবি ? ...ফিরছিস কবে ?

—পাঁচ দিন থাকব। সামনের বৃহস্পতিবার রিটার্ন টিকিট করা আছে। সোম মঙ্গল দু দিন ইন্টারভিউ, বুধবারটা হাতে রেখেছি।

অভিজিৎ দু হাতে কপাল টিপে ধরল, মুখে বাক্যটি নেই।

দাদা কী ভাবছে ইন্দ্রজিৎ জানে। সোমবার থেকে বাবার থার্ড কেমো শুরু, রবিবার দুপুরে নার্সিংহোমে ভর্তি হবে বাবা। এ নিয়ে ইন্দ্রজিতের মনেও কি কম টানাপড়েন চলছে ক'দিন ! দাদার মতো হয়তো মাথা ধরে বসে নেই ইন্দ্রজিৎ, তবে ভাবনাটা তো তারও থাকে। না হলে যেদিন দিল্লির খবরটা পেল, সেদিনই তো ঝড়াকসে বলে দিত পারত বাড়িতে।

ইন্দ্রজিৎ বসল সোফায়। অভিজিৎ নিথর।

—দাদা, এবার কেমোটা তুই চালিয়ে নে...

অভিজিৎ ঝট করে মাথা তুলল, —এই বার চালিয়ে নে মানে ? এমনভাবে কথা বলছিস যেন আগের দুটো তুই-ই চালিয়েছিস ?

ইন্দ্রজিৎ একটু আত্মরক্ষায় চলে এল, —আমি তা মিন করিনি। বলছিলাম, এতদিন তো আমরা দুজনেই ছিলাম, এবারটা তুই শুধু একাই...

—তুই ছিলি কবে ? অভিজিতের গলা চড়ল হঠাৎ, —তুই তো আসতিস মুখ দেখাতে। লোকলজ্জার ভয়ে। পাছে কেউ নার্সিংহোমে এসে ছোট ছেলেকে দেখতে না পেয়ে অবাক হয়... ! যা যাহ্, দিল্লি মুম্বাই লন্ডন প্যারিস যেখানে খুশি যা।

ইন্দ্রজিৎ তার মৃদুভাষী দাদাকে হঠাৎ রূঢ় দেখে অবাক হয়েছে খুব। শুকনো মুখে বলল, —আমি বাবার জন্য কিচ্ছু করিনি ?

—কী করেছিস লিস্ট দেব ? একদিন ডাক্তারের কাছে গেছিলি, হসপিটাল নার্সিংহোমে কয়েক দিন রুটিন ভিজিট দিয়েছিস, তিন দিন হসপিটাল লনে সানগ্লাস পরে পোজ মেরে দাঁড়িয়ে থেকেছিস...। ও হ্যাঁ, একদিন তোর গার্লফ্রেন্ডকে এনে বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলি। অবশ্য সেটা যদি বাবার জন্য কিছু করা বলে ধরা হয়।

বিদ্রূপগুলো শরজালের মতো বিঁধছিল ইন্দ্রজিৎকে। শেষ তীরটা হৃৎপিণ্ডে বিঁধল, রক্তাক্ত হয়ে গেল ইন্দ্রজিৎ। চোয়াল কষে বলল, তুই কিন্তু লিমিট ক্রস করে যাচ্ছিস দাদা।

—ছাড় ছাড়, হুঁহ্, লিমিট! ফুটুনি মারিস না। কেটে পড়ছিস, কেটে পড়।

এই কেটে পড়া কথাটাই শুনতে চায় না ইন্দ্রজিৎ। ওই দুটো শব্দতেই তার দ্বিধা লজ্জা ভয় সব মিশে একাকার হয়ে আছে এখন।

তবু ইন্দ্রজিৎ নরম হওয়ার চেষ্টা করল, —তুই আমার সিচুয়েশানটা ভেবে দ্যাখ দাদা। বিশাল বড় অফার এসেছে, অলমোস্ট ডবল স্যালারি, ফ্রি অ্যাকমোডেশান, পার্কস...। এমন একটা লুক্রেটিভ অফার আমি ছেড়ে দেব? পাঁচ দিনে বাবার কী এমন খারাপ হবে?

আর বেশি এগোল না ইন্দ্রজিৎ। বলতে পারল না, যে মানুষটা মরে যাবেই তার মৃত্যুর থেকেও গভীর কাল্পনিক বিপদের আশঙ্কায় সুযোগটা হাতছাড়া করা নিছক আহাম্মকি ছাড়া আর কী!

অভিজিৎ একটুও গলেনি। সোজাসুজি তাকাল ভায়ের দিকে, —পাঁচ দিন দেখাচ্ছিস কেন? চাকরিটা পেলে যেন তুই দিল্লি থেকে বাবার সেবা করবি! বলতে বলতে আঙুল নাচাচ্ছে অভিজিৎ, — ভাবতে আমার ঘেন্না লাগে তোর পড়ার রাজসূয় যজ্ঞ চালাতে গিয়ে বাবা আজ মুখের রক্ত তুলছে। আর সেই তুই কিনা বাবাকে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিস!

এর পরও কি মাথা ঠিক রাখা যায়! ইন্দ্রজিৎও বিষ উগরে দিল, —ঘেন্না নয়, বল হিংসে। কোন জ্বালা থেকে ও কথা বলিস আমি বুঝি না? আমার মেরিট বেশি বলে চিরকাল তুই কমপ্লেক্সে ভুগেছিস। তুই জয়েন্টে চান্স পাসনি, সে আমার দোষ? চান্স পেলে তোর পেছনেও বাবা টাকা খরচ করত। সায়েন্সটাও চালাতে পারলি না, আটসে গিয়ে ভর্তি হতে হল।

—উলটো-পালটা কথা বলবি না।

—বাহ্, তুই যা খুশি বলে যাবি, আমি ছেড়ে দেব? আসল কথা বল না, ভাই বেশি শাইন করে যাবে সেটা তুই সহ্য করতে পারছিস না।

অভিজিৎ থম মেরে গেল। মুখটা যেন তার কালো হয়ে গেছে। মনে জমে থাকা কথাটা কি না বেরিয়ে এলেই ভাল হত! কী করবে ইন্দ্রজিৎ, এমন দৃষ্টিকটু ভাবে আক্রমণ করছে দাদা!

দাদার নিবে যাওয়া মুখ দেখে মায়া হচ্ছিল ইন্দ্রজিতের। উঠে দাদার পাশে গিয়ে বসেছে। আলগা হাত রাখল দাদার কাঁধে, —কুল, কুল। আমি চলে গেলেও আই বিলং টু দিস ফ্যামিলি। বাবার অসুখে দরকার হলে আমি টাকা পাঠাব। ট্রিটমেন্টে আমি যথাসাধ্য কনট্রিবিউট করব।

ঋতু আর অনসূয়া উঁকিঝুঁকি মারছে দরজায়, পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। রিমলি ঝিমলি চোখ গোল গোল করে দেখছে দুই প্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে। সেদিকে তাকিয়েই দপ করে জ্বলে উঠল অভিজিৎ। ঠেলে সরিয়ে দিল ইন্দ্রজিতের হাতটাকে। গর্জে উঠল, —চোপ। একদম টাকার কথা নয়। আমি কি ভিখিরি আছি, যে তোর মানি অর্ডার করা টাকায় বাবার চিকিৎসা চালাব? সব আমি অ্যাদ্দিন একা টেনেছি, বাকিটাও একা টানতে পারব।

—তুই একা টেনেছিস! ইন্দ্রজিৎ বিমূঢ় হয়ে গেল, —আমি কিছু দিইনি?

—খুব দিয়েছিস। পাঁচ পয়সা দিলে পাঁচ দিন পায়খানা বন্ধ হয়ে যায়...কত দিয়েছিস তুই? বিশ হাজার। খরচা কত হয়েছে জানিস? এই শর্মা ভিক্ষে করে করে এক লাখ টাকা জোগাড় করেছে।

—সে তুই যা বলবি তাই মেনে নিতে হবে। পাঁচ লাখ বললে পাঁচ লাখ, দশ লাখ বললে দশ লাখ!

—আমাকে তুই বিশ্বাস করছিস না? ঝাং করে উঠে দাঁড়িয়েছে অভিজিৎ। হাত পা কাঁপছে রাগে। ধাক্কা মেরে ইন্দ্রজিৎকে সরিয়ে ছুটল ঘরের দিকে। সশব্দে আলমারি খুলতে খুলতে গজরাচ্ছে, —সব হিসেব দেখিয়ে দিচ্ছি। দ্যাখ, তুই দ্যাখ।

অনসূয়া দৌড়ে ইন্দ্রজিতের সামনে এল, —তুই বড় ছোটলোক হয়ে গেছিস ইন্দ্র। বাবার জন্য দাদা এত করছে, তুই দাদাকে এইভাবে কথা শোনাস!

—বেশ করেছি বলেছি। ইন্দ্রজিৎও এতক্ষণে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছে, —কোনওদিন দাদা হিসেব দেখিয়েছে? পরামর্শ চেয়েছে? নিজেরা ডাক্তার ঠিক করছে, নিজেরা মিটিং করছে...

—বাবা তো তোরও। তুই জিজ্ঞেস করিসনি কেন ? ঢং করে কেষ্ট ঠাকুরটি সেজে বসে থাকিস কোন আক্কেলে ?

—অ্যাই অ্যাই, ফালতু কথা বলবি না। যে টাকাই হোক, আমি দিয়েছি। তুই তো শুধু এ বাড়ি থেকে লেনেঅলা পার্টি। বাবা তো তোরও, বাবার জন্য তুই ক পয়সা খরচা করেছিস ? আপেল মুসুম্বি দেখিয়েই এত চোখ গরম ?

অভিজিৎ এক তাড়া কাগজ নিয়ে ধেয়ে এসেছে। টেবিলে রেখে ইন্দ্রজিৎকে টেনে বসাল, —তোর তো মেরিট বেশি, যোগ কর।

ঋতু পিছন থেকে ফুট কেটে উঠল, —হ্যাঁ দ্যাখো, তোমার দময়ন্তীর জন্য যত টাকা সরিয়ে রেখেছ, তার চেয়ে বেশি হয় কিনা।

ইন্দ্রজিতের চোখ দিয়ে লকলকে আগুনের শিখা বেরিয়ে এল। ফুঁসছে রাগে, মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। এদের সঙ্গে থাকবে দময়ন্তী ? এই কারণেই এ বাড়ির সংস্রব ত্যাগ করতে চায় ইন্দ্রজিৎ। সাধে চায় !

অভিজিৎ বিকৃত গলায় চিৎকার করে চলেছে, —বিশ হাজার টাকা ঠেকিয়ে রোয়াবি ! তোমার রোয়াবি আমি দেখাচ্ছি। দ্যাখ, কাগজগুলো দ্যাখ। তোর বাপেরই চিকিৎসায় কীভাবে সর্বস্বান্ত হয়েছি দ্যাখ। এবার বাকি টাকা দিয়ে তুই কলকাতা ছাড়বি। নইলে আমি তোকে আটকে রেখে দেব।

—ভয় দেখাচ্ছিস ? রুদ্ধ স্বর ছিটকে ছিটকে এল এবার, —বিশ হাজার কম কীরে, অ্যাঁ ? আমি আর এক পয়সা দেব না, দেখি তুই কী করিস। আমি চার বছর চাকরি করছি, আমি কম টাকা দেব। তুই দশ বছর চাকরি করছিস, তুই বেশি টাকা দিবি। তা ছাড়া তোর মতো তো আমার মাদুর পাতার বিজনেস নেই !

ঋতু ঝাঁপিয়ে এল, —ওই মাদুর পাতার পয়সাতেই এখন তোমাদের সংসার চলে। তোমার টাকায় ভাতের হাঁড়ির জলও গরম হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে উঠেছে অনসূয়া, —সংসার চালানোর খোঁটা কেন দিচ্ছ বউদি ? বাবার পেনশানের টাকাও তো এখনও সংসারে আসে।

লাল চোখে অভিজিৎ বোনের দিকে তাকাল, —অ্যাদ্দিন হয়তো আসত রে অনু, এখন আর চোখেও দেখা যায় না। তোর বর যেদিন থেকে ওই চশমখোর ডাক্তারটাকে লেলিয়ে দিয়েছে, সব সাইফন হয়ে ওই দিকে চলে যায়।

—আমার বর !

—না তো কী ? একটা কেমো মনিটর করতে পনেরো হাজার ! আমাকে একেবারে নিংড়ে শেষ করে দিল !

—সে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছিস কেন তুই ? আমার বর তোকে হাত বেঁধে নিয়ে যায় ? যা অন্য কোথাও। লক্ষ লক্ষ ডাক্তার আছে কলকাতায়।

—আর উপায় আছে ? একবার গাড্ডায় পড়ে গেছি...

—জানতাম, আমি জানতাম। অনসূয়া হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছে, —সে তোদের ভাল করতে গেল...। আমি কত বার বলব ভেবেছি, তুমি আমার ভাইদের চেনো না। একের নম্বরের নীচ নেমকহারাম সব।

—আমরাই শুধু নেমকহারাম ! তুই কী ? বাবাকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে চলে গেছিস ! নিজের হাতে টাকা থাকলে বাবাকে আজ দাদার দয়ায় বাঁচতে হত !

—কীসের দয়া রে ? দাদাই তো বাবার দয়ায় রয়েছে। আর তলে তলে বউ বাচ্চা নিয়ে ভেগে যাওয়ার ধান্দা করছে। ফ্ল্যাট বানাবে, হুঁহ। ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে। বেইমানির খেসারত দিচ্ছে। খসুক ওই টাকা। বাবার জন্যই খসুক।

—আর নিজে যে মার গয়নাগুলো সব হাতিয়ে নিয়ে গেছ, সেগুলো কি লকারে জমবে ? বোলচাল না ঝেড়ে বাবার চিকিৎসা করো তো বুঝি।

—করব করব, তাই করব। তবু হোমিওপ্যাথি করে বাবাকে বিনে পয়সায় মরতে দেব না। লজ্জা করে না বাবার পয়সায় মানুষ হলি..

—বড় বড় কথা বলিস না অনু। বিয়ের সময়ে কীভাবে বাবার রক্ত চুষেছিস মনে নেই ? ষোলো হাজার টাকার খাট চাই, তিন হাজার টাকার ড্রেসিং টেবিল চাই, দশ হাজার টাকার ডাইনিং টেবিল চাই...

—শাড়ির কথাগুলো বলো ? বেনারসি পছমপল্লি কাঞ্জিভরম গাদোয়াল...

—দিয়েছে আমার বাবা। তোমার বাপ তো দেয়নি ! তোমার এত জ্বালা কীসের ?

—কারণ টাকাটা গেছে এ বাড়ি থেকে। কারণ তোমার দাদারও প্রচুর গচ্ছা গেছে। বোন এমন বেইমান জানলে দাদা টাকাটা দিত না।

—অ্যাই অ্যাই, ভাইবোনের মাঝে তুমি মাথা গলাবে না।

—হাজার বার গলাব। আমার বর সারা জীবন মাথা গুঁজে করে যাবে...

—মাথা গুঁজে ! হাসিও না, হাসিও না বউদি। তাও যদি না সেদিন রাত্তিরে এই শর্মাকে বাথরুমে বালতি বালতি জল না ঢালতে হত ! পাঁচ হাত দূরে বাবা মরছে, এদিকে বাবু মাল খেয়ে বাড়ি ফিরছে ! সর্বস্বান্ত, অ্যাঁ ? মালের পয়সা তো ঠিক জোটে !

অমলকান্তির নিঝুম বাড়ি জেগে উঠেছে হঠাৎ। ভয়ার্ত রিমলি ঝিমলি কাঁদতে শুরু করেছে। বাইরে থেকে প্রতিবেশীরা উঁকি মারছে কেউ কেউ। দেখছে এ বাড়ির গোপনতম কুঠুরিতে লুকিয়ে রাখা শব্দরাজি কীভাবে ছিটকে ছিটকে ছড়িয়ে গেল। নোংরা কাদার মতো ! তবে একটু দাঁড়িয়েই সরে যাচ্ছে তারা, সব ঘরেই তো এমন শব্দ ভাঙে মাঝে মাঝে।

কী ক্লেদ, কী ক্লেদ !

বিকৃত কোলাহলে কারুর স্বর আর পৃথক করা যায় না। যেন এক পাল কুকুর খেয়োখেয়ি করছে। অমলকান্তির কাশির দমক থেমে আছে অনেকক্ষণ। দাঁত নখ দেখানো কুকুরগুলো কি শরীরের দুষ্ট কোষেদের ভয় পাইয়ে দিল !

সহসা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন কল্যাণী। এতক্ষণ বসে ছিলেন স্থির, অমলকান্তির বিছানার পাশে। ওঠেননি, নড়েননি, টুঁ শব্দটি করেননি। এখনও স্বর তাঁর অচঞ্চল। হিমেল গলায় বললেন, —হট্টগোল বন্ধ করো। কাউকে আর কিচ্ছু করতে হবে না। আমার স্বামীর চিকিৎসা আমার স্বামীর পয়সাতেই হবে। এ বাড়ি আমি বেচে দেব।

বাড়ি আবার নিঝুম।

বাড়ির ইঁট কাঠ দরজা জানলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে। যেন তারা জানতই এই বিস্ফোরণ ঘটবেই একদিন।

চোদ্দো

স্টাফরুমের এক কোণে বসে ছিল অভিজিৎ। উদাস সামান্য, বুঝি বা ম্রিয়মাণ। সে যে আগে কলেজে খুব মুখর প্রাণবন্ত থাকত এমন নয়, তবে এতটা নির্জীবও বুঝি ছিল না। সে রাতের অভব্য পরিস্থিতি এখনও তাকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে সর্বক্ষণ। কেন যে সেদিন অভিজিৎ স্নায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল !

ভাবতে গেলে অভিজিতের মন আরও বিস্বাদ হয়ে যায়। এই দুনিয়ায় যে করে, সেই তো করে। এটাই নিয়ম, আবহমান কাল ধরে এভাবেই চলে আসছে সংসার। আর যে করে, তাকে মুখ বুজেই করতে হয়। মিছিমিছি সেটা অন্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে কেন যে অভিজিৎ নিজেকে খাটো করল !

বাইরে এখন উজ্জ্বল নীলিমা। তুলো তুলো মেঘ টুকরো টুকরো খুশির মতো ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। শরৎ এখন তার পূর্ণ মহিমায় উদ্ভাসিত। সোনাঝুরি বোদে তার উৎসবের ছোঁয়া, পলকা বাতাসে ছুটির হাতছানি।

ঠাট্টা, সবই নিষ্ঠুর ঠাট্টা। অভিজিতের দিন যে-মলিন সে-মলিন। শেষ পর্যন্ত তাকেই সকলের

কাছে মাথা নোওয়াতে হল ! উপায় বা কী, বাবার রোগ তো আর কয়েকজন দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষের কল্পিত অভিমানের তোয়াক্কা করে না ! তার তৃতীয় দফার কেমোথেরাপি করাতেই হবে অভিজিৎকে, না হলে তো আবার নতুন করে ছোট হতে হয় তাকে ! অতএব সকলের কাছে মাথা মোড়াও ! ভাই বোন মা... ! আশ্চর্য, অভিজিৎকেই সবাইকে বুঝতে হবে, কেউ অভিজিতের কথা ভাববে না ! তার মুখের কথাটাই চরম সত্যি, অথচ তার তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়াটা মূল্যহীন ! বাহা রে দুনিয়া, আত্মত্যাগের কী ফল !

জোর গজল্লা চলছে স্টাফরুমে। পুজোর ছুটির হিসেব নিয়ে। পঞ্চমীর দিন ক্লাস হয়ে বন্ধ হচ্ছে কলেজ, তাই নিয়ে শোরগোল। এবার পঞ্চমী পড়েছে শুক্রবার, দ্বিতীয়ার দিন গান্ধীজয়ন্তী, মহালয়াটা সামনের রবিবারে পড়ে একটা ছুটি মার খেয়ে যাচ্ছে, সুতরাং পুজোর ছুটি কেন মহালয়ার পর দিন থেকেই শুরু হবে না। দীপেন এ বছর কলেজের শিক্ষক সংসদের সম্পাদক, ছুটির লিস্ট সেই তৈরি করেছে, তার ওপরে আক্রমণ হানছে সবাই। সেও কম বলিয়ে কইয়ে নয়, হাত মুখ নেড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্রাণপণ। সবই অবশ্য হালকা চালের কথাবার্তা, শুনলেই বোঝা যায় কলেজে পুজোর আমেজ এসে গেছে।

পুলকেশ বলছে, —ও কণিকাদিদিমণি, একটা কোইন্সিডেন্স লক্ষ করেছেন ? আমাদের লাস্ট ওয়ার্কিং ডেও শুক্রবার, আবার কলেজ খোলার প্রথম দিনটাও শুক্রবার। দুদিনই আমাদের আসতে হবে। ...শুক্রবার আপনার অফ ডে না ?

কণিকার চোখে ছদ্ম কোপ, —শুধু আমার কেন, কলেজের ম্যাক্সিমাম জনেরই তো শুক্রবার অফ ডে। দীপেনবাবু অথরিটিকে তেল দেওয়ার জন্য পঞ্চমী অব্দি ক্লাস টানছেন।

ধরিত্রী বলল, —কী ঝামেলা বলো তো, মহালয়ার পরও কলেজে এলে পুজোর মার্কেটিংটা করব কখন ?

মিটিমিটি হাসছে দীপেন, —ছুটির লিস্ট যখন টিসি মিটিংয়ে প্লেস করি, তখন এ সব কথা বলেন না কেন ?

—বলি না নয়, আপনি বলতে দেন না। প্রিন্সিপালের পালানোর তাড়া থাকে, আপনিও গোলে হরিবোল করে মিটিং শেষ করে দেন।

পুলকেশ টুক করে দীপেনের পক্ষ নিয়েছে, —তাই কি ? নাকি আপনারাই শিঙাড়া মিষ্টি খেয়ে বাড়ি দৌড়োন ?

মঞ্জুলিকা হেসে উঠল, —আমি ভাই এ সব ঝগড়াঝাঁটি বুঝি না, মহালয়া পেরোলেই আমি জঙ্গলে ঢুকে যাব। বান্ধবগড়। টিকিট মিকিট আমার কাটা হয়ে গেছে। ওখানে গিয়ে যদি ভাল একটা বাঘ পাই, ধরে এনে দীপেনবাবুর পেছনে লেলিয়ে দেব।

—বাঘ নয়, বাঘিনী আনবেন। আমার তো শালী ফালী নেই, একটা বাঘিনী পেলে তাও...

সুখ যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে ঘরে ! অভিজিতের অসহ্য লাগছিল। নিচু গলায় সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞাসা করল, —আমাদের স্যালারিটা হচ্ছে কবে ?

কেমিস্ট্রির সিদ্ধার্থ একটা অর্থনৈতিক ভূগোলের বই উলটোতে উলটোতে রঙ্গ রসিকতা উপভোগ করছিল। ঘুরে তাকিয়ে বলল, —পরশু, বা তার পরদিন।

—এক তারিখের আগেই হবে এবার ?

—বলছে তো। ...এগারো মাস দেরি করে হয়, একবার নয় তাড়াতাড়ি দিল।

—আর অ্যাডভান্সটা ?

—আমি নিই না। বলতে পারব না। মাস মাস মাইনে থেকে কাটবে...রিডিকিউলাস।

একটা নিশ্বাস পড়ল অভিজিতের। সিদ্ধার্থর কথাতেও যেন অপমানের ছোঁয়া লেগে আছে। একটু যেন দংশনও হল বিবেকের। গত পাঁচ বছরে ঠিক এই ভঙ্গিতে সেও অনেককে ওই উত্তর দিয়েছে। কে জানত বুমেরাং হবে।

ঘড়ি দেখল অভিজিৎ। কটা দেখল ঠিক খেয়াল করল না। ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকানো অভ্যেস হয়ে গেছে আজকাল। পড়ে না, যেন দেখে সময়কে। কেন দেখে ? কমাস ধরে ঘড়ি

মেপে ডাক্তার নার্সিংহোম হাসপাতাল করতে হয়েছে বলেই কি ! নাকি দুঃসময়কে ঘড়ি দেখে দেখে পার করাতে চায় ! ভাবতে ভাবতে অভিজিৎ বাথরুমে। প্রায়ান্ধকার বাথরুমের আয়নায় এক চোরের মুখ ! অপরাধীর প্রতিবিম্ব ! কেন এমন ছায়া পড়েছে মুখে ? কর্তব্যে অবহেলা না করলে কি এমনই ঘটে ? নাকি হৃদয়ের অচেনা কন্দরে বিরক্তি মিশে আছে বলেই...

বিটকেল এক হিন্দি গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে বাথরুমে ঢুকছে দেবেন। অভিজিৎকে দেখে গান থামল, —কাল এলে না যে বড় ?

—কোথায় ? অভিজিৎ আনমনা।

—বারে, কাল কোঅপারেটিভের মিটিং ছিল না ! পার্থদা তোমাকে চিঠি দেননি ?

—আপনাকেও তো একটা চিঠি দিয়েছিলাম, পাননি ?

—দ্যাট সিলি লেটার ! ছাড়ো তো। পূর্ণ দমে বেসিনের কল খুলে দিয়েছে দেবেন, জোরে জোরে জল ছেটাচ্ছে মুখে। কল বন্ধ করে বলল, —আমি কিন্তু তোমাকে হাইলি এক্সপেক্ট করেছিলাম।

অভিজিৎ ম্লান হাসল, —মিটিংটা বিকেলে ছিল না ? সেই সময়ে আমি বাবাকে নার্সিংহোম থেকে বাড়িতে...থার্ড কেমোটা পরশু শেষ হল।

—ও। দেবেনের মুখ থেকে হাসি হাসি ভাবটা মুছে গেল, —সব ওকে ?

—মোটামুটি।

—আছেন কেমন এখন ?

—ওই আছে। স্টেথো থার্মোমিটার ছোঁয়ালে বোঝা যায় প্রাণ আছে। কাশলে বোঝা যায় বেঁচে আছে।

—তার মানে উন্নতি হয়নি !...রক্ত পড়াটা বন্ধ হয়েছে ?

—নাহ্। জ্বরও আসে। উহু, ভুল বললাম। আসবে কেন, ছাড়েই না। ওই নিরানব্বই, একশো এক, একশো...

—ডাক্তার কী বলে।

—কিছুই বলে না। টেপ বাজায়। ছ'টা কেমো দিতে হবে, ছ'টা কেমো দিতে হবে।

—লাস্ট যেদিন গেছিলাম...যেদিন নার্সিংহোমে তোমার বাবার ব্লাড চলছিল, তোমার মিসেস বলল শ্যাডোটা নাকি আরও বেড়ে গেছে !

—হুঁ। অভিজিৎ মাথা দোলাল, —বোঝেনই তো, শরীরে আর কিছুই নেই। আমি শুধু রুটিন লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছি।

—ভেরি স্যাড। অভিজিতের কাঁধে হাত রাখল দেবেন, —কী করবে বলো ? ট্রুথ তোমায় ফেস করতেই হবে।

অভিজিতের হাসি পেল। কোনটা এখন বেশি ট্রুথ ? বাবার মৃত্যু, না বাবার এই নির্দয় বেঁচে থাকা ? কোনটার কথা বলতে চায় দেবেনদা !

অভিজিতের সঙ্গে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল দেবেন। নিজের চেয়ারের দিকে যেতে গিয়েও দাঁড়াল, —পার্থদা তোমাকে কালকের মিটিং নিয়ে কিছু বলেছে ? মানে কী কথা হয়েছে তাই নিয়ে ?

—নাহ্। আমিও অবশ্য জিজ্ঞেস করিনি।

দেবেন যেন সামান্য ইতস্তত করল, —তোমার ক্লাসের দেরি আছে ?

অভিজিৎ আবার ঘড়ি দেখল, —এবারই ক্লাস।

—হুম। আজ আমি আবার একটু তাড়াতাড়ি বেরোব...। আপন মনে বলল দেবেন, —যাক গে শোনো। কথাটা বলেই নিই। কাল আমাদের মিটিংয়ে ডিসিশান হয়েছে বাড়ির কাজ আমাদের চলতেই থাকবে, তোমার টাকা ছাড়াই। পরে তোমার ক্রাইসিস কাটলে টাইম টু টাইম দিয়ে দিয়ো।

কথাটা ঠং করে অভিজিতের কানে লাগল। প্রস্তাবটা লোভনীয়, কিন্তু এতেও যেন অপমানের ছোঁয়া ! মাথা নেড়ে বলল, —তা হয় না দেবেনদা। আমি তো আপনাদের কাছে চিঠিতে আমার অবস্থা ক্লিয়ারলি স্টেট করে দিয়েছি...

—দ্যাখো অভিজিৎ, বিপদ আসে, বিপদ চলেও যায়। এই ভাবে ফ্ল্যাট করার সুযোগ বার বার আসে না। অ্যান্ড ইউ উইল বি হ্যাপি টু নো, আমাদের কোঅপারেটিভের কোনও মেম্বারই তোমাকে এখন বাদ দিতে রাজি নয়। আমিও না।

—আপনাদের মহানুভবতার জন্য ধন্যবাদ দেবেনদা। কিন্তু আমি আর ফ্ল্যাটে নেই। নিয়ার ফিউচারে আমি টাকা দিতে পারব না।

—ডিসট্যান্ট ফিউচারে তো পারবে। তোমার কেসটা প্রতিটি মেম্বার খুবই সিমপ্যাথেটিকালি ট্রিট করছে।

—আমি কারও দয়া চাই না দেবেনদা।

—দয়া কেন হবে ? সবাই তোমার জন্য ফিল করে। আমরা যে কেউ তোমার অবস্থায় পড়তে পারতাম। তুমি জানো, এর মধ্যে কী হয়েছিল ? অপাঙ্গে গজাননারত সহকর্মীদের দেখে নিল দেবেন, —পুলকেশ সিচুয়েশানটা জেনে তোমার জায়গায় এনট্রি নিতে চেয়েছিল। আমি ভেহিমেন্টলি অপোজ করেছি। কারও অসহায়তার সুযোগ নেওয়াটা উচিত কাজ নয়। ঠিক কিনা ?

অসহায়তা শব্দটা আবার বেজেছে কানে। আবার সেই অপমান... !

—কী, তোমার চিঠিটা উইথড্র করে নিচ্ছ তো ?

—না। বললাম তো আমি নেই।

—কী তখন থেকে নেই নেই করছ ? তুমি আছ, তুমি ছিলে, তুমি থাকবে।

ঝাঁ করে রক্ত চড়ে গেল অভিজিতের। অনেকটা সে রাতের মতোই। কড়া সুরে বলল, —কেন আপনি আমাকে জোর করছেন বার বার ? দয়া দেখানোর আর লোক পেলেন না ?

—দয়ার কথা বার বার আসছে কোত্থেকে ? অভিজিতের পিঠে আলগা চাপড় দিল দেবেন, —বললাম না, উই ফিল ফর ইউ। সবাই আমরা তোমার অসুবিধেটা অনুভব করেছি বলেই না...

—কে আপনাদের অনুভব করতে বলেছে ? স্থানকালপাত্র ভুলে অভিজিৎ চেঁচিয়ে উঠল, —আমি ভিখিরি ? আমাকে ভিখিরি ভেবেছেন ? হ্যাভ আই বেগড ফর ইওর অনুভব ?

—তা কেন ?

—তা নয় না। হ্যাঁ। আপনি আমাকে অপমান করছেন। সকলে টাকা দিয়ে ফ্ল্যাটে যাবে, আর অভিজিৎ চৌধুরী বিনা টাকায় ফ্ল্যাটে ঢুকে আপনাদের কাছে হাত কচলাবে, খুব মজা অ্যাঁ ? খুব মজা ?

ঘরে গুলতানি থেমে গেছে। অনেকে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছে অভিজিৎ দেবেনের কাছে। পুলকেশ কৌতূহলী মুখে জিজ্ঞাসা করল, —কী হয়েছে এসি ?

অভিজিৎ সংবিতে ফেরার চেষ্টা করল। এ কী ছেলেমানুষি করে ফেলল সে ! বুকের গভীরে কোথায় যেন এক হীনম্মন্যতাবোধ পাকাপাকি বাসা বেঁধে ফেলেছে, এ যেন তারই প্রতিফলন !

চোখ বুজে দু হাতে সকলকে ইশারা করল অভিজিৎ, —প্লিজ, আমি একটু একা থাকতে চাই।

বেল পড়ে গেছে। একে একে সবাই চলে যাচ্ছে ক্লাসে। দেবেন কয়েক মিনিট মাথা নিচু করে থেকে ব্যাগ হাতে তুলে চলে গেল।

অভিজিৎ মাথা চেপে বসে আছে। বসেই আছে। ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করছে ক্লাসে, সে হুঁশও নেই। ঘাড়ের পিছনটা দপ দপ করছে ভীষণ, এখনই বুঝি ছিঁড়ে যাবে শিরা। অভিজিতের কি ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল ? এঁএঁএঁহ, কেন ক্ষমা চাইবে ? সে কি চুরির দায়ে ধরা পড়েছে ?

রঘু ডাকছে, —স্যার, আপনার টেলিফোন।

রক্তচক্ষু অভিজিৎ ঘাড় শক্ত করে তাকাল, —কার ফোন ?

উদাস উত্তর দিল রঘু, —বলতে পারব না স্যার। অফিস থেকে আপনাকে ডেকে দিতে বলল।

মুহূর্তে সমস্ত রক্ত হুড়মুড় করে মাথা থেকে নেমে গেছে। শরীর হিম। বুকের মধ্যে একটা গমপেষাই মেশিন চলতে শুরু করেছে। কলেজে তো বিশেষ ফোন আসে না তার ! কোত্থেকে এল ? বাড়ি থেকে ?

চরম সংবাদটা কি এসে গেল।

পড়িমরি করে ছুটেছে অভিজিৎ। কাঁপা হাতে ফোন তুলেছে, —হ্যালো ? ও প্রান্তে ঋতু। ঝলমল করে উঠল, —অ্যাই, তুমি এক্ষুনি একবার চলে এসো।

—কোথায় ? কেন ?

—কোথায় আবার। বাড়িতে। ঋতু উত্তেজনায় চেঁচাচ্ছে, —বরুণদা এসেছে। তোমার সঙ্গে ভীষণ জরুরি দরকার। ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসো।

—হঠাৎ ?

—ওফ, আসতে বলছি, এসো না। বরুণদার ডাক্তার, যাকে তুমি রিপোর্ট স্লাইড সব পাঠিয়েছিলে, তিনি নাকি বলেছেন বাবার আদৌ ক্যানসার নেই !

—যাহ। অসম্ভব। অভিজিৎ রিসিভার খামচে ধরল।

—হ্যাঁগো। এক্সরে দেখেই নাকি ওঁর সন্দেহ হয়েছিল। দুটো স্লাইড দুটো বড় বড় সেন্টারে টেস্ট করতে পাঠিয়েছিলেন। দু জায়গাতেই নাকি রিপোর্ট নেগেটিভ ! বাবার কোনও ম্যালিগনেন্ট সেল পাওয়াই যায়নি !

অভিজিতের হাত থেকে রিসিভার পড়ে গেল।

পনেরো

...ক্রনিক গ্র্যানিউলো মেটাসডিজিজ/নো এভিডেন্স অফ ম্যালিগনেন্সি ইজ ফাউন্ড...

চোখের খুব কাছে কাগজটাকে এনে দেখছিলেন কল্যাণী। বিকেল শেষ হয়ে এল, ঘরে আলো বড় কম এখন, তবু যেন প্রতিটি অক্ষর স্পষ্ট পড়তে পারছেন। যেন আবছায়া চিরে অক্ষরগুলো নিজেরাই কাগজ থেকে উঠে আসছে।

এও সম্ভব !

অমলকান্তি উঠে বসেছেন বিছানায়। আলো আঁধারে তাঁর ক্ষীণ স্বর শোনা গেল, —মনু ?

উনষাট বছরের শরীরটা কেঁপে উঠল কল্যাণীর। বহু যুগ পর অমলকান্তি ডাকলেন ওই নামে। চল্লিশ বছরের গতানুগতিকতায় নামটা কবেই হারিয়ে গিয়েছিল, এতকাল পর হঠাৎ আবার ফিরে এল !

কল্যাণী স্বামীর বিছানার পাশে গেলেন, —কী হল ?

—বার বার কী অত পড়ো কাগজটায় ?

—কিছু না।

—বিশ্বাস হয় না, তাই তো ?

কল্যাণী উত্তর দিলেন না। স্বামীকে দেখছিলেন। হাড়পাঁজরা সর্বস্ব দেহ যেমন ছিল তেমনই আছে, কিন্তু কোত্থেকে যেন একটা চোরা আলো এসে পড়েছে খাঁচাটায়। পরোয়ানা ফিরে যাবে এই আশ্বাসেই শরীরে কী আশ্চর্য জোর ফিরে পেয়েছে মানুষটা !

প্রশ্নটা এড়িয়ে কল্যাণী হাসলেন সামান্য, —তোমার স্যুপটা গরম করে দিই ?

—সন্ধেটা হোক। ...কারও সাড়া পাচ্ছি না আজ ?

—বিকেলে কে থাকবে !...ঋতু একটু রিমলিকে নিয়ে বেরোল।

—ও। অনু আজ এল না ?

—রোজ রোজ সংসার ফেলে কী আসবে !

বলেই পলকের জন্য উদাস কল্যাণী। বাবা মরে যাচ্ছে ভেবে রোজ রোজ আসত মেয়ে, ভাইদের সঙ্গে মন কষাকষি হওয়া সত্ত্বেও। বাবা বেঁচে উঠবে শুনে টানটা কমে গেল !

পাখার হাওয়ায় বোধহয় শীত করছে অমলকান্তির, নিজেই চাদর গায়ে টেনে একটু কুঁকড়ে বসলেন। ধীর লয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ক্ষণেক দেখলেন জানলার বাইরের পৃথিবীটাকে। আবার ডাকলেন, —মনু ?

—উঁ ?

—আবার আমার যে টেস্টটা করাল, তার কী যেন নাম ?

—কেন ?

—ওটা সত্যি সত্যি টিবিরই টেস্ট তো ?

—হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ। ওটা এলাইজা টেস্ট।

—ও।.. রিপোর্ট আসবে কবে ?

—এসে যাবে। আজ...নয়তো কাল...নয়তো পরশু...

অমলকান্তি আবার কী যেন ভাবছেন। কাশলেন একটু, শুকনো কাশি। জোরে জোরে শ্বাস টানছেন।

কল্যাণী ঝুঁকলেন, —কী হল, নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে ?

—তেমন নয়।

—জ্বর আসছে নাকি ! দেখি। কল্যাণী স্বামীর কপালে হাত ছোঁয়ালেন। তাপ আছে অল্প, নিরানব্বই মতন হবে। এই বিকেলের দিকেই বাড়ে জ্বরটা, এখনই সাবধান হওয়ার সময়। বললেন, —শোও তো। শুয়ে পড়ো।

—না। অমলকান্তি মাথা ঝাঁকালেন, —শুলেই কাশি হবে। বসি একটু। তুমি বরং আমায় একটু জল দাও। গলাটা ভিজিয়ে নিই।

জল খেয়ে খাটের বাজুতে হেলান দিয়েছেন অমলকান্তি। চোখ বুজলেন, —আচ্ছা মনু, এত বড় একটা ভুল হয় কী করে বলো তো ?

ভুল যে কোথায় কী ভাবে হয়, কেন হয় তা যদি কল্যাণীর জানা থাকত ! ভুল হয়, ভুল পীড়াও দেয়, আর এই পীড়াটাকেই সহ্য করা স্বতঃসিদ্ধ বলে বোধ হয় মানুষের।

কল্যাণী বললেন, —ভেবে আর কী করবে ? যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে।

—এত মারাত্মক ভুল ?

—তাই তো দেখছি। সবটাই ভুল।

—এর কি কোনও শাস্তি নেই ?

—কে কাকে শাস্তি দেয় !

অমলকান্তি চোখ খুললেন, —ধীমান যে বলল, যে ল্যাবরেটরি ভুল রিপোর্ট দিয়েছিল, তাদের নামে ফ্রন্ট পেজ নিউজ করবে ! তার কী হল ?

কল্যাণী শ্বাস ফেললেন। অনেকেই তো অনেক কথা বলেছিল, কোনটাই বা... ! অভি বলল পুলিশ কেস করবে, ইন্দ্র বলল এখনই উকিলের চিঠি পাঠাচ্ছি, অনু তো ডাক্তারবাবুকেও গালাগাল করে আসবে বলেছিল ! কার আর অত ঝুট ঝামেলা পোষায় ! বড় ঝঞ্ঝাটটা থেকে মুক্তি পেয়েছে, এতেই না তারা কত নিশ্চিন্ত !

বাইরে একটা হল্লা হচ্ছে। আজ চতুর্থী, পাড়ার ঠাকুর এল। আলো একদম মরে গেছে, শরতের সন্ধ্যা নামছে পায়ে পায়ে। খাট থেকে উঠে ঘরের আলো জ্বেলে দিলেন কল্যাণী। পাখা তিন পয়েন্টে চলছিল, এক পয়েন্টে করে দিলেন। ফিরে এসে বললেন, —ওসব ভেবে কী হবে ? ভুলে যাও।

—ভুলেই গেছি। এমনিই বলছিলাম।

—এমনিও বলবে না। এখন তোমার একটাই কাজ। শরীর সারানো।

—শরীর ! অমলকান্তির ঠোঁটের কোণে হাসির মতো কী যেন দেখা গেল।

—হাসছ যে ?

—হাসি কি সাধে ! যা বিষ ঢুকে গেল !

—বরুণের ডাক্তার সেদিন কী বলে গেল শুনলে না ! ওষুধটা বিষ ঠিকই, কিন্তু এতে জীবনহানির আশঙ্কা নেই।

—ডাক্তাররা ওরকম বলে। আমি তো টের পাই শরীরে কী জ্বালাপোড়াটা চলে !

হাত বাড়িয়ে অমলকান্তির হাত ছুঁলেন কল্যাণী, —কমে যাবে। একটু তো সময় দাও।

—অনন্তকাল সময় দিলেও কমবে না। অমলকান্তির মুখ দুমড়ে মুচড়ে গেল, —ও বিষ একবার নিলে নয় কথা ছিল। তিন তিন বার।

অমলকান্তির স্বর নিমেষে যেন হাহাকার হয়ে গেল। ছোট্ট নির্জন একতলা বাড়িটাতে ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

সহসা চোখ ভেঙে কান্না ছুটে এল কল্যাণীর। গত ছ'মাসে অনেক উৎকণ্ঠায় জর্জরিত হয়েছেন তিনি, যন্ত্রণার প্রপাত আছড়ে পড়েছে তাঁর ওপর, এক দিনের জন্যও চোখে জল আসেনি। আজ কেন ওই হাহাকার এত বাজে বুকে! কল্যাণী নিজেও কি তিন তিন বার বিষ ধারণ করেননি!

বাইরের চেঁচামেচি থেমে গেছে। ঠাকুর উঠল প্যান্ডেলে। উৎসবের দিন শুরু হল।

অমলকান্তিও হয়তো ক্যানসার থেকে মুক্তি পেলেন। তবু ব্যাধিটা রয়েই গেল। এ বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

* [এ কাহিনীর সব চরিত্র কাল্পনিক]

ফিরে দেখা

ফোনটা এল সাড়ে নটায়।

সকাল সকাল স্নান সেরে কলেজে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন শ্রীময়ী। স্নান মানে কাকস্নান। চুল শুকনো রেখে গায়ে সামান্য জল ছেটানো। বছরের এই সময়টায় শ্রীময়ী সহজে মাথা ভেজান না। ওই হয়তো রবিবার কি ছুটির দিন, তাও ভেবেচিন্তে, শরীর বুঝে। এবার অবশ্য দিল্লির শীত এখনও তেমন জাঁকিয়ে আসেনি। থার্মোমিটারের পারা একদিনই বুঝি দশের নীচে নেমেছিল। তবু এই ডিসেম্বরের শুরুটাই মারাত্মক। গত ডিসেম্বরেই শ্রীময়ীর যা গেছে! জ্বরে কাহিল, ঘঙঘঙ কাশছেন, ডাক্তার ডাকতে হল, কড়া কড়া অ্যান্টিবায়োটিক চলছে—একেবারে শয্যাশায়ী দশা। চিরকালই তাঁর ব্রংকাইটিসের ধাত, ইদানীং শ্বাসকষ্টের চাপও অনুভব করছেন মাঝে মাঝে। হয়তো দিল্লিতে পলিউশান বাড়ার জন্য, হয়তো বা ফুসফুসের জোর কমে এসেছে তাই। এত গাড়ি, এত কলকারখানা, এত ধোঁয়া, এখানে এখন সুস্থ থাকাটাই মুশকিল। শীতকালে আবার ধোঁয়া চাপ বেঁধে থাকে, কড়া সূর্যালোক না পেলে সরতে চায় না। সে যাই হোক, একা মানুষ সাবধানে থাকতেই হবে।

ইদানীং এই একা একা থাকা শব্দটা মাঝে মাঝেই মাথায় আসছে। ভাল নয়, একদম ভাল নয়। মনের কোণে কি চোরা শঙ্কা উঁকি দেয় কোনও? কোনও অমোঘ নিয়তির কথা মনে পড়ে? যার সঙ্গে দূরত্ব কমে আসছে ক্রমশ? একা থাকাকে আগে তো শ্রীময়ী কখনও ভয় পাননি! এ কি তবে বয়সেরই লক্ষণ?

হ্যাঁ, বয়স তো হয়েছেই। বিকেল ফুরিয়ে গেছে, জীবনে এখন গাঢ় সন্ধে। রিটায়ারমেন্টের আর পাঁচ বছর বাকি, এরপর তো শুধু রাত আর রাত। তবু এই পঞ্চান্ন বছর বয়সটাকে নিয়ে এক পলও ভাবতে রাজি নন শ্রীময়ী। ভাবতে ভালও লাগছে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীময়ী আলগা খোঁপা বেঁধে নিলেন একটা। চিত্তদৌর্বল্য শরীরকে আরও অসুস্থতার দিকে ঠেলে দেয়, চিন্তাটাকে জোর করে ঘুরিয়ে দিলেন কেজো ভাবনায়। আজ প্রথম ক্লাস সাড়ে এগারোটায়। অঙ্কের টিউটোরিয়াল, সেকেন্ড ইয়ার বিএসসির। তাঁর এই মধুবিহার থেকে লাজপতনগর কম দূর নয়, দশটার মধ্যে না বেরোলে ঠিক সময়ে পৌঁছনো অনিশ্চিত। আজকাল দিল্লিতে ট্রাফিক জ্যাম বেড়েছে খুব, কোথায় কোন মোড়ে স্থবির হয়ে যায় বাস তার ঠিক কী! কাল আইটিও ক্রসিং পার হতেই পাক্কা আধঘণ্টা লেগেছিল।

দরজায় পরদা নড়ে উঠল,—মা-জি, খানা লগা দুঁ?

পিঙ্কি। বছর তিরিশ বয়স। লম্বা ক্ষয়াটে মুখ, শীর্ণ চেহারা। বাংলাদেশি মুসলমান। কবে কী করে দিল্লি চলে এল জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যায়। থাকে যমুনাপারের ঝোপড়পট্টিতে, যার কায়দার নাম জে পি কলোনি। স্বামী রিকশা চালায়, এই মধুবিহারেই। ছোট ছোট বাচ্চাও আছে, মেয়ে। কাজে বেরিয়ে ভুলেও কখনও বাংলায় কথা বলে না পিঙ্কিরা। চলনে বলনে পোশাকে আশাকে একেবারে চোস্ত দিল্লিওয়ালি। আসে ঘড়ি মেপে সাড়ে সাতটায়, যায় দশটার মধ্যেই। এর মধ্যেই রান্নাবান্না বাসনমাজা ঘর ঝাড়পোঁছ। ছুটির দিন একটু বেশিক্ষণ থাকে অবশ্য, কাচাকুচি করার জন্য। তার নিঃশব্দ কাজ করার ভঙ্গি দেখলে তাকে রোবট বলে ভ্রম হয়।

মাঝের কটা বছর বাদ দিয়ে প্রায় গোটা জীবনটাই দিল্লিতে আছেন শ্রীময়ী। তিনিও হিন্দিতে চোস্ত, কর্মক্ষেত্রে পথেঘাটে সর্বত্রই তাঁর মুখে রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু এই মেয়েটির সঙ্গে তিনি ইচ্ছে করেই বাংলাতে কথা বলেন। বলে মজা পান। তিনি বাংলায় প্রশ্ন করবেন, পিঙ্কি হিন্দিতে জবাব দেবে, এ এক আজব খেলা।

ওয়ার্ড্রোব থেকে একটা প্রিন্টেড সিল্কশাড়ি বার করতে করতে শ্রীময়ী জিজ্ঞেস করলেন,—কী রাঁধলি আজ?

—জি, গোবিকা সবজি।

—আর মাছ?

—উয়ো তো হ্যায় হি।

পটপড়গঞ্জের দিকে ভাল মাছ ওঠে সন্ধেবেলা। যমুনার এপারে বাঙালি বসতি বেড়ে গেছে খুব, তাদের রসনার তৃপ্তির জন্যই মৎস্যের আগমন। একদিন বেশি করে কিনে এনে ফ্রিজে রেখে দেন শ্রীময়ী, সারা সপ্তাহ ধরে তারিয়ে তারিয়ে খান। মাছের আঁশটে গন্ধটুকু ছাড়া তাঁর মুখে ভাত রোচে না। রুটিও না।

শ্রীময়ী আবার জিজ্ঞেস করলেন,—কী করেছিস মাছের? পাতলা ঝোল, না কষকষে?

—জি, হল্‌কা হল্‌কা।

—ভালই করেছিস।...ভাত বাড়, আমি আসছি।

খোলা জানলা দিয়ে হু হু বাতাস এল হঠাৎ। গা শিরশির করে উঠল শ্রীময়ীর, গুজরাটি চাদরখানা আরও ভাল করে সাপটে নিলেন গায়ে। ওয়ার্ড্রোব ঘাঁটছেন। কোন শালটা নেওয়া যায় আজ? আট-নটা শালের স্তূপ থেকে নীল সুতোর কাজ করা সাদাটাই মনে ধরল। হাতে তুলে শুঁকলেন শালটাকে, এখনও নতুনের গন্ধ লেগে আছে। পুজোর সময়ে মেয়ে জামাই এসেছিল, তখনই দিল্লি হাট থেকে এই শালটা কিনে দিয়েছিল সুগত। জোর করে। জামাইটা তাঁর এক্কেবারে খ্যাপা আছে। একবার ক্যারা নড়ে উঠল তো দুমাদ্দুম কিনতে শুরু করে দিল, টাকাপয়সার তোয়াক্কা না করেই। বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে, কোথায় এখন একটু সঞ্চয়ী হবে, তা নয়...।

শ্রীময়ী আপনমনে হেসে ফেললেন। জামাইটা এরকম বেহিসেবি বলেই বোধহয় তাকে একটু বেশি ভালবাসেন তিনি। ওরকম প্রাণবন্ত হাসিখুশি ছেলে আজকাল কটা পাওয়া যায়! কলেজে তরুণ অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের তো দেখছেন, সব গোমড়ামুখো, নয় ধান্দাবাজ। সুগত এই জগতে ভারী মনোরম ব্যতিক্রম। ঠাট্টাতামাশা করছে, হই হই করছে, অনবরত লেগপুলিং করছে...। অথচ পড়ানোর সময়ে কী ভীষণ সিরিয়াস। অল অ্যালং ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, আঠাশের মধ্যে পি এইচ ডি, মাত্র পঁয়ত্রিশে পৌঁছেই দায়িত্বশীল রিসার্চগাইড।...সুগত লাখো মে এক।

আবার হাসি পেল শ্রীময়ীর। তাঁর এই জামাতাস্নেহ নিয়ে মিতুলের মনে চাপা ঈর্ষা আছে, শ্রীময়ী টের পান। নিজের হাতে দুটো-একটা নতুন পদ রান্না করে সুগতকে খাওয়ালেই মিতুল ঠোঁট ফোলায়। কথাও শোনায় টুকটুক। মেয়ের চেয়ে জামাই দেখছি তোমার বেশি আদরের হয়ে গেল মা!

কেন যে দুম করে দিল্লি ছেড়ে কলকাতা চলে গেল সুগত? যাদবপুর ইউনিভার্সিটির রিডার হওয়া কি এমন মহার্ঘ চাকরি? এখানে থাকলেও কি দু-চার বছরের মধ্যে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে পড়তে পারত না? অভ্যস্ত পরিমণ্ডল, চেনা শহর, আত্মীয় স্বজন সব্বাইকে ছেড়ে ওই দূর কলকাতায় কি খুব ভাল আছে সুগতরা?

যাক গে, মরুক গে, যাদের জীবন, তাদের জীবন। শ্রীময়ী কেন মিছিমিছি ভেবে মরেন! মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন তিনি, মেয়ে জামাই যতই আপনার হোক নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেদের মতো করে ভাবার অধিকার তাদের আছে, শ্রীময়ীর জন্যে তাদের মনোগত বাসনায় এতটুকু বাধার সৃষ্টি হোক, এ শ্রীময়ীর অভিপ্রেত নয়। তাই না তিনি এ নিয়ে কখনও মুখ দিয়ে টু শব্দটি উচ্চারণ করেননি! শত মন খারাপ হওয়া সত্ত্বেও না।

সাদা শালটা বিছানায় রেখে শ্রীময়ী একটা সিল্কের স্কার্ফ বার করলেন। ব্যাগে থাক, কলেজ থেকে ফেরার পথে গায়ে জড়াবেন। গলাটা সামান্য খুশখুশ করছে। বিপদের পূর্বাভাস হতে পারে।

পায়ে পায়ে ডাইনিং স্পেসে এলেন শ্রীময়ী। ছোট্ট টু-রুম ফ্ল্যাট, একটু বসার জায়গা মতোও আছে। সঙ্গে কিচেন বাথরুম আর সরু একফালি ব্যালকনি। কার্পেট এরিয়া পাঁচশো বর্গ ফুট কাছাকাছি, সুপারবিল্ট ধরে ছশো তিরানব্বই স্কোয়ার ফিট। সাত বছর হল কিনেছেন ফ্ল্যাটটা, এখনও লোন শোধ চলছে, বছর দুয়েকের মধ্যে ঋণ চুকে যাবে। অর্থাৎ শ্রীময়ীর রিটায়ারমেন্টের আগেই।

বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, নিজস্ব ফ্ল্যাট বা মাথা গোঁজার ঠাঁই-এর কথা চিন্তাও করেননি শ্রীময়ী। মেয়ে নিয়ে বেশ ছিলেন চিত্তরঞ্জন পার্কে। দাদা বউদি ভাইপো ভাইঝি সকলের সঙ্গে। বছর তেরো আগে বাবা গত হলেন, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেন যেন দাদা বউদির মনে হতে লাগল, ছেলেমেয়েরা

বেশ বড় হয়ে গেছে, বড্ড বেশি ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে হচ্ছে সকলকে! মুখ ফুটে অবশ্য বলেনি কখনও, তবে হাবে ভাবে টের পাওয়া যেত। হয়তো শ্রীময়ীর কলেজের কোনও কলিগ এসেছে সন্ধেবেলা, নটা-দশটা অবধি আড্ডা চলল, রাতে দেখা গেল বউদির মুখ ভার...সামনে ছেলেটার পরীক্ষা, গোটা সন্ধেটা নষ্ট হল...!...ওই খাটে তিন ভাই বোন কি আর একসঙ্গে শুতে পারে! ভাবছি এবার থেকে বাবলুর জন্য বারান্দায় ক্যাম্প খাট পেতে দেব! আর শীতকালে নয় তুতুলই বসার ঘরের ডিভানটায়...!

তখনই সচেতন হয়েছিলেন শ্রীময়ী। কলেজের দু-একজন সহকর্মীকে আলগা ভাবে ভাড়া বাড়ির কথা বলেছিলেন, হিস্ট্রির সোহিনী শর্মা লক্ষ্মীনগরের দিকে একটা বাড়ির খোঁজ দিল। সোহিনীর বাড়ির পাশেই। ওয়ান-রুম ফ্ল্যাট, ভাড়া বারো শো। মায়ের ছলছল চোখ উপেক্ষা করে শ্রীময়ী চলে এলেন মিতুলকে নিয়ে। অনেকটা দূরে। তখনও এদিকটা এত জমজমাট হয়নি। তারপর শহরের এই পুবপ্রান্ত তো দ্রুত বাড়তে শুরু করল। ইয়া ইয়া হাউজিং কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে এদিকে ওদিকে। পটপড়গঞ্জে, মধুবিহারে, প্রেমবিহারে, ময়ূরবিহারে...। মরিয়া হয়ে তখনই একটা নিজস্ব ফ্ল্যাটের জন্য ঝাঁপ দিয়েছিলেন শ্রীময়ী, খানিকটা সাধ্যের বাইরে গিয়েই।

আজ, মধুবিহারের এই সাততলা দৈত্য সাইজ বাড়িটার পাঁচতলার ফ্ল্যাটে দাঁড়িয়ে শ্রীময়ীর মনে হয়, কাজটা সেদিন ভালই করেছিলেন। এই শহরে ভারতবর্ষের এই ঝলমলে রাজধানীতে, তাঁর একটু তো নিজস্ব স্থান আছে। একেবারে নিজস্ব। অংশীদার বিহীন। মেয়ে নাতি এলে আজকাল একটু জায়গার অকুলান হয় বটে, তবুও...

অন্যমনস্ক মুখে শ্রীময়ী খাবার টেবিলে এলেন। সুগন্ধি ভাতের ঘ্রাণ আসছে। ভাতের ব্যাপারে শ্রীময়ী ভারী শৌখিন। সঙ্গে সবজি মাছ যাই থাকুক, চালটি ভাল হওয়া চাইই।

খেতে খেতে শ্রীময়ী অল্প গলা ওঠালেন,—হ্যাঁরে পিঙ্কি, আমায় কী টিফিন দিচ্ছিস আজ?

হিন্দিভাষী বাংলাদেশির বিলম্বিত জবাব,—জি, ব্রেড, বয়েল আণ্ডা, অউর কেলা।

—আজও আবার ডিমসেদ্ধ দিলি?

উত্তর নেই।

—ফ্রিজে মিষ্টি আছে না?...সন্দেশ?

পিঙ্কি বোধহয় রান্নাঘরে কড়া টড়া কিছু মাজছিল। হাত মুছতে মুছতে এসে উদাসীন মুখে ফ্রিজ খুলল,—নেই। মিঠাই নেহি হ্যায়।

শ্রীময়ীর ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। পরশু সন্ধেবেলা সোহিনী এসেছিল, তখনই কি সন্দেশগুলো শেষ হয়ে গেছে? কাল সকালে কি ভাতের পাতে মিষ্টি খাননি? কাল কলেজ থেকে ফেরার পথে পিৎজা কিনে এনেছিলেন, তখন কি ফ্রিজে মিষ্টি ছিল? এত খুঁটিনাটি মনে থাকে না আজকাল। কেন থাকে না? মস্তিষ্কে কি অক্সিজেন কম যাচ্ছে?

ব্যালকনি দিয়ে আলো এসে পড়েছে ডাইনিং স্পেসে। মলিন সূর্যরশ্মি, আকাশে মেঘ আছে প্রচুর। এ সময়ে একদিন বৃষ্টি হলেই চিত্তির, দুম করে ঠাণ্ডাটা বেড়ে যাবে। তখন রোজ ওই তিন চার তিন চার। রুমহিটারগুলো সব ঠিকঠাক আছে তো? চালিয়ে দেখা হয়নি।

পাতে মাছের ঝোল ঢালতে গিয়ে শ্রীময়ীর মনে পড়ে গেল, ঘন ঘন ফোন আসছে বউদির। যেতে বলছে ও বাড়ি। তুতুলের নাকি দু দুটো ভাল সম্বন্ধ এসেছে, দাদা বউদি তা নিয়ে আলোচনা করতে চায়। গেলে হয় আজ। আলোচনা তো হবে লবডঙ্কা, খানিক হইচই আড্ডা...। দূরে থাকার একটা অন্তত সুফল আছে, সম্পর্কটা তেতো হওয়ার সুযোগ পায়নি। চিত্তরঞ্জন পার্কে গেলে অবশ্য আর একটা কাজও হয় আজ। নতুন বাংলা ক্যাসেট কিনে আনা যাবে কয়েকটা। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা নামে একটি মেয়ে নাকি ভাল রবীন্দ্রসংগীত গাইছে আজকাল, তারপর ওই যে ছেলেটা, গত বছর কলকাতা থেকে এল পুজোর সময়ে, চিত্তরঞ্জন পার্কে গান গেয়ে গেল...কী যেন নাম? কী যেন নাম?

শ্রীময়ী দু দিকে মাথা ঝাঁকালেন। মস্তিষ্কে কি সত্যিই অক্সিজেন কম যাচ্ছে। মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে স্মৃতিশক্তি এমন দুর্বল হয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয়? তাঁর মতো একজন ক্ষুরধার অঙ্কের অধ্যাপিকার?...

পিঙ্কি কী যেন কাজে আবার এসে ফ্রিজ খুলেছে। ডিপফ্রিজের চেম্বার খুলে কী একটা ঘাঁটাঘাঁটি করছে।

শ্রীময়ীর চোখ পড়ল। জিজ্ঞেস করলেন,—কী খুঁজছিস?

—কুছ নেহি। পিঙ্কি ফ্রিজের দরজা বন্ধ করল,—ঠিক সে বর্ফ নেই জম রহা হ্যায়।

—দেখেছি। ফ্রিজটা এবার বদলাতে হবে। সেই কবেকার কেনা...

—কিতনা সাল হুয়া ইসকা?

—এগারো। না না, বারো।

—নয়া খরিদেঙ্গে? স্বল্পভাষিণী পিঙ্কি হঠাৎ মুখর,—তো ইসকা কেয়া হোগা?

—বেচে দেব।

—কিসকো?

—দেখি কে নেয়? খদ্দের না পেলে দোকানকেই দেব, ওরা এক্সচেঞ্জের জন্য ডিসকাউন্ট দেবে।

পিঙ্কি কী যেন ভাবছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ বলল,—আপকো কেয়া ভাও মিলেগা ইসকা?

—হাজার আড়াই তিন তো পাবই।

—মা-জি, এক বাত কহুঁ?

—বল।

—অগর দো মে হো তো...। পিঙ্কি থেমে গেল।

শ্রীময়ী চোখ কুঁচকোলেন,—তোর চেনাজানা কেউ আছে নাকি কেনার?

—সোচতি হুঁ ম্যায় হি খরিদ লুঁ। পিঙ্কি অস্ফুটে বলল,—অগর আপকো কোই অ্যায়েতরাজ না হো তো...

শ্রীময়ী বেশ চমকে গেলেন। ভাল ভাবে একবার নিরীক্ষণ করলেন পিঙ্কিকে। সালোয়ার কামিজ দুটোই বেশ মলিন পিঙ্কির, হাতে প্লাস্টিকের চুড়ি, মুখে চোখে যথেষ্ট অপুষ্টির ছাপ।

হঠাৎ অবিশ্বাসের সুরেই বললেন,—তুই নিবি? দু হাজার দিতে পারবি?

—তনখাসে চুকতা কর দুংগি। হর মাহিনা শ দো'শো...য্যায়সে আপ চাঁহে...

—ফ্রিজ দিয়ে তুই করবিটা কী? কোন কম্মে লাগবে?

পিঙ্কি উত্তর দিল না। আঙুলে ওড়না পাকাচ্ছে। নিরক্ত ঠোঁটের কোণে লাজুক হাসি।

শ্রীময়ীও হেসে ফেললেন। সত্যি, এই মানুষগুলোর ঘরেও কী ভাবে ঢুকে পড়েছে বিজ্ঞাপনী মোহ! পেটের ভাত, বাচ্চার লেখাপড়ার আগে ফ্রিজ টিভি কিনতে চায়! ভাবলে শিউরে উঠতে হয় পণ্যসভ্যতার থাবা কী ভাবে প্রকাণ্ড হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

বিস্ময়মাখা ভাবনাটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টেলিফোন বেজে উঠল। ঠিক সাড়ে নটায়।

দুই

শ্রীময়ীর লিভিংস্পেসটি অনাড়ম্বর। প্রায় আভরণহীন। দুটি বেতের সোফা এল শেপে পাতা, একটি সেন্টার টেবিল, এক কোণে স্ট্যান্ডল্যাম্প, অন্য কোণে এরিকা পামের টব, ব্যস।

টবের সামনে রাখা টুলে টেলিফোন।

খাবার টেবিল থেকে উঠে রিসিভার তুললেন শ্রীময়ী,—হ্যালো?

—মা...আমি...

শ্রীময়ী অবাক হলেন। এ সময়ে মিতুল? কলকাতার ফোন তো আসে সেই এগারোটার পর, যখন টেলিফোনের চার্জ কোয়ার্টার হয়ে যায়। এখন কী এমন জরুরি দরকার পড়ল...?

জিজ্ঞেস করলেন,—কী ব্যাপার রে? তুই হঠাৎ?

—একটা খারাপ খবর আছে মা। মিতুল মুহূর্তের জন্য চুপ। মুহূর্ত পরে স্বর ফুটল,—বাবার স্ট্রোক হয়েছে।

শেষ বাক্যটি মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গেল। মগজের কোনও

কোষে সংবাদটার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না বলেই বোধ হয়।

ঈষৎ ধাতস্থ হয়ে শ্রীময়ী বললেন,—কবে? কখন?

—আজ ভোরে। ম্যাসিভ অ্যাটাক। নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছে।

শ্রীময়ী অস্ফুটে বললেন,—ও।

—আমার খুব নার্ভাস লাগছে মা। মিতুলের গলা প্রায় বুজে এল,—এখন কী হবে মা?

কী বলবেন ঠিক ভেবে পেলেন না শ্রীময়ী। এ সংবাদে তাঁর পুরোপুরি নিরাবেগ থাকার কথা। কিন্তু তা তিনি থাকতে পারছেন কই! পঁচিশ বছর ধরে যে মানুষটার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, যাঁর কথা স্বপ্নেও আর মনে পড়ে না, তাঁর অসুস্থতার খবরে তিনি কেন বিচলিত হবেন?

সহসাই অচেনা এক উদ্বেগ নড়েচড়ে উঠল,—কী বলছেন ডাক্তার?

—কিছুই বলছে না।

—কেন?

—বাহাত্তর ঘন্টার আগে নাকি কিছু বলা যাবে না। ইনটেনসিভ কেয়ারে আছে।...ইনজেকশান পড়েছে, কড়া সিডেটিভ দেওয়া হয়েছে...

—ও।

ও প্রান্তে মিতুল একটুক্ষণ নীরব। তারপর আচমকাই বলে উঠল,— তুমি একবার আসবে মা?

—আমি? শ্রীময়ী থমকে গেলেন। ঢোক গিলে বললেন,—আমি গিয়ে কী করব?

—তুমি এ সময়ে পাশে থাকলে...

কথাটা ঠং করে কানে বাজল শ্রীময়ীর। মেয়ে কার পাশে থাকার কথা বলছে? মেয়ের? মেয়ের বাবার?

মিতুল আবার বলল,—এসো না মা। প্লিজ। নার্সিং হোমে যাওয়ার পথে বাবা তোমার নাম করছিল।

আশ্চর্য, অন্য কোনও অনুভূতি নয়, কোথ্থেকে ঈর্ষার এক কুটুস কামড়। নার্সিংহোমে যাওয়ার পথে...মানে? সোমনাথ কি তবে মিতুলের কাছে ছিল? এসে থাকে মাঝে মাঝে? মিতুলরা তো কক্ষনও কিছু জানায় না!

পরক্ষণে মেয়ের কথায় ভুল ভাঙল,—সক্কালবেলা ভবানীপুর থেকে মনুপিসির ফোন পেয়ে আমি আর সুগত তক্ষুনি ছুটে গেছিলাম। সুগতই অ্যাম্বুলেন্স ডাকল, তারপর আমরা দুজনে...। জানোই তো ও বাড়ির অবস্থা। দেখার কেউ নেই, যারা আছে তারাও সব নার্ভাস ক্যালাস...

শ্রীময়ী কী বলবেন ভেবে পেলেন না। চুপ করে আছেন।

ফোনে আবার মিতুলের কাঁপা কাঁপা স্বর,—বাবা অনেকক্ষণ অ্যানঅ্যাটেন্ডেড পড়ে ছিল মা। অবস্থা খুব ক্রিটিকাল। প্লিজ পারলে চলে এসো।

শ্রীময়ীর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—দেখি।

—ছাড়ছি। রাতে আবার ফোন করব।

টেলিফোন রেখে খানিকক্ষণ নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রীময়ী। তারপর ফিরে এসে বসেছেন ডাইনিং টেবিলে। খেতে পারলেন না আর। বেসিনে হাত ধুয়ে ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কেন হঠাৎ 'দেখি' বললেন মেয়েকে? সোমনাথ বেঁচে রইল, কি মরে গেল তাতে সত্যিই কি আর তাঁর কিছু এসে যায়? হুঁহ্, বাবা তোমার নাম করছিল....! শ্রীময়ীর নাম থোড়ি মনে আছে সোমনাথের। এও তাঁকে দুর্বল করে দেওয়ার অপচেষ্টা। কারসাজি।

শ্রীময়ী লম্বা একটা শ্বাস ফেললেন। মিতুলটা চিরকাল বাপমুখীই রয়ে গেল। তাঁর এত ধৈর্য, এত পরিশ্রম, লড়াই দু যুগ ধরে দেখছে মেয়ে, এত কাছ থেকে, তবু মন বদলাল না। এ কি অতি নৈকট্যের পরিণাম? শুধু দূরে থাকার জন্যই কি জিতে গেল সোমনাথ?

ছি ছি, এ সব কী ভাবনা! একটা মানুষ জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এখন, প্রাণটা শুধু মুহূর্তের সুতোয় ঝুলছে, এখন কি ও সব জেতা হারা নিয়ে ভাবার সময়? না হয় তিনি না গেলেন, কিন্তু মনটাকে এত ছোট করছেন কেন? এক সময়ে মানুষটার সঙ্গে একটা সম্পর্ক ছিল, সেই সুবাদেও তো তার শুভ কামনা করা যায়।

চোখ বুজে শ্রীময়ী বিড়বিড় করে উঠলেন,—আহা, বেঁচে থাক সোমনাথ। এ যাত্রা বেঁচে যাক।

—আপ লেট গঁয়ে মা-জি?

শ্রীময়ী চোখ খুললেন। ঘরে পিঙ্কি, তার ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে একটু যেন জিজ্ঞাসা,—তবিয়ৎ ঠিক নেই লগ রহা হ্যায় কেয়া?

আড়ষ্ট হাসলেন শ্রীময়ী,—না রে, ঠিকই আছি।

—নিকলেঙ্গে নেহি?

—এই বেরোব।

—মেরে বারে মে আপ কুছ সোঁচে হ্যাঁয় কেয়া?

—কী ব্যাপারে বল তো?

—ওহি ফ্রিজ কী বারে মে?

—নিস খন। আগে নতুনটা তো কিনি।

একটু বুঝি উজ্জ্বল হয়ে উঠল পিঙ্কির মুখ। স্মিত মুখে বলল,—তো অভি ম্যায় চলুঁ?

—আয়। সদরটা ভাল করে টেনে দিয়ে যাস।

ইয়েল-লক বন্ধ হওয়ার শব্দ হতেই শ্রীময়ী উঠে পড়লেন। শাড়ি বদলে গায়ে শাল জড়িয়ে নিয়েছেন। ঝলক উঁকি দিলেন ব্যাগের অভ্যন্তরে, বইটই সব ঠিক আছে কি না দেখে নিলেন। তারপর আকাশটাকে দেখে ছাতাও নিয়ে নিলেন একটা। বৃষ্টি হোক না হোক, সাবধানেব মার নেই।

বাড়ি থেকে বাসস্টপ হেঁটে গেলে মিনিট সাতেক। রাস্তায় বেরিয়ে শ্রীময়ী টের পেলেন শীত আজ একটু বেশিই আছে। সিমলার দিকে কি বরফ পড়ল? ঠাণ্ডা হাওয়া মাঝে মাঝেই ঝাপটা দিচ্ছে গায়ে, শাল ফুঁড়ে। পথ এখন জনবহুল, দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটছে পথচারীরা। উহুঁ, হাঁটছে নয়, ছুটছে। এই শহরে সকাল দশটার সময়ে মন্থরগতিতে হাঁটে না কেউ।

আকাশে ছানা কাটা মেঘ। নিস্তেজ রোদ্দুর। গোমড়া আকাশের নীচে পৃথিবীটাকে ভারী মনমরা দেখায় এখন। প্রকৃতির বিষণ্ণতা শ্রীময়ীর মধ্যেও চারিয়ে যাচ্ছিল। হাজার মাইল দূরের এক শহর কল্পদৃশ্য হয়ে উঠছে চোখের সামনে। শ্রীময়ীর অজান্তেই। ওখানে কোন নার্সিংহোমে আছে সোমনাথ? অল্প অসুখেই সোমনাথ ভারী কাতর হয়ে পড়ত। শ্রীময়ী ঠাট্টা করেে বলতেন, আজুলি! একমাত্র ছেলেকে আদর দিয়ে দিয়ে ননীর পুতুল করে গড়েছেন বাপ মা! থার্মোমিটারের পারা একশো ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি, অমনি বাড়ি কাঁপিয়ে চিলচিৎকার! আমি আর বাঁচব না ময়ী! আমার দিন ফুরিয়ে গেছে, লোকজনকে ডাকো, শেষ দেখা দেখে যাক! শুনতে পাচ্ছ, পূর্বপুরুষেরা ডাকছে, সনু আয়, সনু আয়...! সঙ্গে দু-চারটে হাঁচি হলে তো আর কথাই নেই, দুম করে বাবু ফিরে এলেন কোর্ট থেকে! পোশাক আশাকটি পর্যন্ত ছাড়বেন না, ধরাচূড়ো পরেই শয্যাগ্রহণ, আর অবিরাম প্রলাপ আর আব্দারের ফুলঝুরি! ময়ী, আমার বুকে মালিশ করো! ময়ী, আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দাও! এক্ষুনি ঠাণ্ডাগরম জল নিয়ে এসো, পা ডোবাব! ডাক্তার এল না কেন এখনও, খবর দেয়নি! কী বলছে ডাক্তার, কখন আসবে! আমি অক্কা পাওয়ার পর! ও হো হো হো, কাজের লোকেরা সব গেল কোথায়! আমার জন্য খাট কিনে আনুক! আমার বোম্বাই খাট চাই, মজুমদার বাড়ির ছেলে কিন্তু চারপাই চড়ে শ্মশানে যাবে না।

সেই মানুষের কিনা হার্ট অ্যাটাক!

বাস এসে গেছে। ডিপো কাছেই, এখান থেকে উঠলে বাসে সিট পাওয়া যায়, জানলার ধারে জায়গা পেয়ে গেলেন শ্রীময়ী। পাশে এক দশাসই চেহারার সর্দারনি এসে বসল। মোটামুটি লম্বা সিটেও অকুলান হচ্ছে দুজনের। কৃশতনু শ্রীময়ী আরও চেপে গেলেন জানলায়। ছুরি ছুরি বাতাস ঝাপটে পড়ছে নাক মুখে, কাচটা নামিয়ে দিলেন আস্তে।

অস্বচ্ছ কাচের ওপারে শ্রীময়ীর চোখ। পটপড়গঞ্জের ফাঁকা রাস্তা অতিক্রম করে পাণ্ডবনগরে ঢুকছে বাস, রেলব্রিজে উঠল। দূরগামী ট্রেনলাইন আবার আনমনা করে দিচ্ছে শ্রীময়ীকে। শেষ পর্যন্ত স্ট্রোক হল সোমনাথের! স্ট্রোক হলে বুকে নাকি অসহ্য যন্ত্রণা। বাবা বলত, বাঘে আঁচড়ানোর যন্ত্রণা। নিশ্চয়ই কাটা ছাগলের মতো ছটফট করেছে সোমনাথ! আশ্চর্য, ওই সময়ে নাকি শ্রীময়ীর কথা মনে পড়েছে! অসম্ভব, এ কক্ষনও সত্যি হতে পারে না। শ্রীময়ীর কথা কখনও কোনওদিন ভাবেনি সোমনাথ, আজ

অসুস্থ হয়ে...। কিন্তু মিতুল বানিয়েই বা বলবে কেন? সোমনাথ সম্পর্কে শ্রীময়ীর মনে দুর্বলতা তৈরি করে মিতুলের লাভ কী? গত পঁচিশ বছরে নিশ্চয়ই অজস্রবার রোগব্যাধি হয়েছে সোমনাথের। এক দু বার তো মিতুল কাছেও ছিল। সেই যে সেবার কলেজে পড়ার সময়ে সামার ভেকেশনে কলকাতা গেল মিতুল, ফিরে এসে বলেনি সোমনাথের ম্যালেরিয়া হওয়ার গল্প? একশো ছয় অব্দি নাকি জ্বর উঠে গিয়েছিল সোমনাথের, কখনও কুঁই কুঁই করছিল, কখনও নাকি ছোটবেলায় পড়া পাঠ্যবই-এর কবিতা চিৎকার করে আউড়ে যাচ্ছে...! বলতে বলতে হেসে লুটিয়ে পড়েছে মিতুল, কিন্তু কই অসুখের প্রলাপের ঘোরে শ্রীময়ীর নাম করেছে সোমনাথ এ কথা তো কখনও বলেনি!

আই টি ও ব্রিজ ধরে ছুটছে বাস। নীচে এক ফালি যমুনার স্রোত, নর্দমার মতো। কুয়াশা এখনও পুরোপুরি মোছেনি, অদূরে পন্টুন ব্রিজ ঝাপসা ঝাপসা। ব্রিজ নয়, যেন একটা খেলনা সেতু।

কিংবা জীবন মৃত্যুর মধ্যিখানে টলমলে সাঁকো।

বন্ধ জানলা ভেদ করে হিমরেণু ছুঁয়ে গেল শ্রীময়ীকে। লোকটা কি তা হলে সত্যি সত্যি মরে যাবে?

তিন

শ্রীময়ীদের কলেজটা বিশাল। আয়তন, ছাত্রীসংখ্যা দুটোতেই। বেশ কয়েক একর জায়গা জুড়ে ঘেরা কম্পাউন্ড, তিনটে দারুণ ঝকঝকে অতিকায় বিল্ডিং, বিশাল বিশাল দুখানা মাঠ, মাঠ ঘিরে মনোরম ফুলবাগিচা...। একটা মাঠে হকি খেলে মেয়েরা, অন্যটায় বাস্কেটবলের কোর্ট। বাগান এখন ছেয়ে আছে মরশুমি ফুলে। ডালিয়া জিনিয়া গাঁদা চন্দ্রমল্লিকা...। গোলাপও ফুটেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। হরেক রঙের। লাজপতনগরের এই মহিলা কলেজটির দেশজোড়া সুনাম। পড়াশুনার জন্যও বটে, খেলাধুলোর জন্যও বটে। হাজার দেড়েক মতো ছাত্রী আছে কলেজে। সায়েন্স আর্টস কমার্স মিলিয়ে। এই শীত ছুঁই ছুঁই ঋতুতে উজ্জ্বল পোশাকে শোভিত উচ্ছল মেয়েরা এখন প্রস্ফুটিত কুসুম।

কলেজে ঢুকেই হিমেল ভাবনাগুলো মন থেকে মুছে গেছে শ্রীময়ীর। তিনি এখন ব্যস্ত অধ্যাপিকা, ক্লাস ছাড়া কিছু ভাবার সময় নেই। একটুও অন্যমনস্ক না হয়ে পর পর দুটো পিরিয়ড সারলেন। ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসটায় ধকল গেল খুব। নতুন ব্যাচটা কেমন যেন, ডিটারমিন্যান্টের সহজ অধ্যায়টাও কী যে শূন্য চোখে গিলছিল! এদের পিছনে খাটতে হবে অনেক। লাস্ট ইয়ারে এ কলেজে ম্যাথসের রেজাল্ট তত ভাল হয়নি, এ নিয়ে প্রিন্সিপালও দু তিন বার কাঁই কাঁই করেছেন। শ্রীময়ীর কি বোঝানোর ত্রুটি হচ্ছে কোনও?

দেড়টা নাগাদ স্টাফরুমে এসে শ্রীময়ী টিফিন কৌটো খুললেন। অভ্যাস মতোই। পাঁউরুটি ছিঁড়ছেন, মুখে তুলছেন, চিবোচ্ছেন, গিলছেন। বিস্বাদ মুখে।

বুকের মধ্যে টিপটিপ ভাবটা ফিরে এসেছে আবার। মিতুলের ডাক কি উপেক্ষা করবেন শ্রীময়ী? করা কি উচিত?

স্টাফরুমের ওদিকের কোণে গজল্লা চলছে জোর। রেশমি মঞ্জরী কুসুম আর পারমিতা কী নিয়ে যেন তর্ক জুড়েছে। পারমিতা কলকাতার মেয়ে, বিয়ে হয়ে দিল্লি এসেছে, কোনও ব্যাপারেই সে অন্যদের সঙ্গে একমত হয় না, তাকেই বোধহয় খ্যাপাচ্ছে অন্যরা।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। পারমিতা গলার শির ফুলিয়ে বলছে, তুমহারা দিল্লিকা কোই আপনা ক্যারেকটার হ্যায় কেয়া? সবই তো তোমাদের ধার করা। এমনকী সিজনগুলোও।

—উয়ো ক্যায়সে? মধ্যবয়সি কুসুম সহায় চোখ বড় বড় করে তাকাল।

—বোঝো না? দ্যাখো না? টেরও পাও না? রাজস্থান গরম হলে তোমাদের এখানে সামার আসে। হিমাচল প্রদেশে স্নোফল হলে দিল্লির ঠকঠক করে কাঁপা শুরু হয়। এখানকার পলিটিকাল লিডারগুলোও তো ধার করা। দিল্লি, শুধু দিল্লির কোনও লিডার আছে? ওই নেহরু ফ্যামিলি ছাড়া। ইনফ্যাক্ট, তাদেরও তো অরিজিন...

—এত গজগজ করছিস কেন রে? তোদের কলকাতার লিডাররা দিল্লিতে পাত্তা পায় না বলে?

—আরে যাহ্, আমাদের জ্যোতি বসু তো আর একটু হলেই প্রাইম মিনিস্টার হত।

—হুয়া কিঁউ নেহি? হমলোগ মনা কিয়া থা কেয়া?

—না হয়ে তো ভালই হয়েছে। মঞ্জরী কার্লেকার ফোড়ন কাটল—জ্যোতি বসু প্রাইম মিনিস্টার হলে দিল্লি ক্যালকাটা বনে যেত।

—বন্‌ধ বন্‌ধ, সব বন্‌ধ। রেশমি ফুট কাটল,—চাক্‌কা বন্‌ধ, অফিস বন্‌ধ, ফ্যাক্টরি বন্‌ধ, রাস্তা বন্‌ধ...

উত্তরে কী যেন বলল পারমিতা, ঠাট্টাচ্ছলে মন্তব্য ছুড়ল কৃষ্ণা। দোহারকি দিচ্ছে মঞ্জরী, পারমিতার মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। শ্রীময়ী মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের নিন্দা প্রশংসা তাঁকে বড় একটা ছোঁয় না। মাঝে কটাই বা বছর ছিলেন কলকাতায়! এবং সেই বসবাসের স্মৃতিও এমন কিছু সুখস্মৃতি নয়। মঞ্জরীরা অবশ্য দিল্লির হয়ে লড়াই করছে শুধু পারমিতাকে উত্তেজিত করার জন্যে, শ্রীময়ী জানেন। নইলে এমনিতে মঞ্জরীরাও দিল্লি নিয়ে এমন কিছু আপ্লুত নয়, হরবখতই দিল্লির সমালোচনা করে। কখনও পলিউশান, তো কখনও ভি আই পি উৎপাত, কখনও ওয়াটার লগিং, কখনও লোডশেডিং...।

আবার চিন্তাটা কড়া নাড়ছে বুকে। শ্রীময়ীকে কি কলকাতা যেতে হবে? যদি যানও, সেখানে গিয়ে তাঁর কাজটা কী হবে? সেবা করবেন?

ছোট্ট একটা শ্বাস পড়ল শ্রীময়ীর। সোমনাথ মানুষ হিসেবে যত নিকৃষ্টই হোক, সেবার কাঙাল ছিল খুব। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে কেমন আদুরে বেড়ালের মতো কুঁকড়ে মুকড়ে শুয়ে থাকত!

সোহিনী স্টাফরুমে ঢুকলেন। টেবিলে রেজিস্টার রেখে খোঁপা ঠিক করছেন। শ্রীময়ীর চোখে চোখ পড়তেই পাশে এসে বসলেন। হাসিমুখে বললেন,—নাস্তা খতম?

শ্রীময়ী মৃদু মাথা নাড়লেন,—হুম্‌।

—এখন আর ক্লাশ নেই?

—আছে। আড়াইটেয়।

—কটা অব্দি?

—কেন?

—তোকে নিয়ে সরোজিনীনগর মার্কেটে একবার যাব ভাবছিলাম। খুব বড় সেল দিচ্ছে ওখানে। বেডকভার পিলোকভার কিনতে হবে কয়েকটা, ছেলের জন্য একটা লেদার জ্যাকেট...তুই জামাইয়ের জন্য একটা ব্লেজার কিনবি বলেছিলি না?

—আজ থাক।

—কেন, বাড়ি ফেরার তাড়া আছে?

—না, তেমন কিছু নয়। এমনিই।

সোহিনী আর কিছু বললেন না। ব্যাগ খুলে টিফিন বার করেছেন। চাউমিন। খেতে খেতে চোখের কোণ দিয়ে জরিপ করছেন বান্ধবীকে।

লঘু সুরে বলল,—আজ ইতনা গুমসুম কিঁউ ভাই?

—তুৎ, গুমসুম হব কেন? শ্রীময়ী সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করলেন। ঝপ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—সোহিনী, তোর একটা চেনা ট্রাভেল এজেন্ট আছে না?

—কেন?

—কলকাতার একটি টিকিট করে দিতে পারবি? এনি ট্রেন। রাজধানী হলেই ভাল।

—অচানক কলকাত্তা?

শ্রীময়ী বেজায় অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। বান্ধবীর চোখে চোখ রাখতে পারছেন না। মনে হল সোহিনী বুঝি পড়ে ফেলছে তাঁর মন। আমতা আমতা করছেন শ্রীময়ী। ঠোঁটে ফ্যাকাসে হাসি।

অনেকদিনের পুরনো সখী মিটিমিটি হাসছেন,—নাতির জন্য মন কেমন করছে বুঝি?

শ্রীময়ীর হৃৎপিণ্ডটা তড়াং করে লাফিয়ে উঠল। আরে, এ কথাটা তো আগে মাথায় আসেনি। কেন আসেনি? এই বিশ্বসংসারে চার বছরের নাতিই এখন তাঁর প্রিয়তম জন, নাতির বিরহেই যা একটু প্রাণ কাঁদে এখন। সোমনাথ কেন, নাতিকে দেখতে তো তিনি যখন তখন কলকাতায় যেতে পারেন। যেতেই

পারেন। বুমবুম তো রোজই টেলিফোনে ডাকে, দিম্মা এসো, দিম্মা এসো...।

শ্রীময়ীর হাসি চওড়া হল,—বুঝিসই তো, ওই একটাই মায়া আমার এখন। একমাত্র পিছুটান।

—সমঝ্ গঁয়ে। তু ফঁস্ গয়ি।...কবে যাবি? ক্রিসমাসের সময় কিন্তু খুব রাশ থাকে।

—তখন নয়। আমি এখনই যেতে চাই।

—এখন?

—হ্যাঁ। কাল পরশু তরশু, যে কোনওদিন। অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল।

—পাগলী কাঁহিকি! কে তোকে কাল পরশুর টিকিট দেবে?

—সেজন্যই তো তোকে ধরা। তুই একবার বলেছিলি না, তোর এজেন্ট যখন তখন এমারজেন্সি কোটায় টিকিট করে দেয়?

—আমার এজেন্ট থোড়াই। আমার বরের এজেন্ট। ও ছটহাট বিজনেসের কাজে এদিক ওদিক যায় তো...

—ওই হল। বল না ওকে।

—সত্যিই তুই ইমিডিয়েটলি যেতে চাস?

—নয়তো কি জোক করছি?

—এনি প্রবলেম ইন ক্যালকাটা? বাচ্চার শরীর খারাপ?

—না না, সে সব কিছু না। জাস্ট খুব ইচ্ছে করছে, তাই...

সোহিনী শর্মা দু-এক সেকেন্ড স্থির চোখে দেখলেন বান্ধবীকে। তারপর বললেন,—ঠিক হ্যায়, কথা বলে দেখি। হলে কিন্তু চার-পাঁচশো টাকা এক্সট্রা পড়ে যাবে।

—দিতে হয়, দেব।

—বোস একটু, আমি আসছি।

শ্রীময়ীকে অদ্ভুত চোখে দেখতে দেখতে শূন্য টিফিনবক্স ব্যাগে পুরলেন সোহিনী। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

কী রকম যেন অস্বস্তি লাগছিল শ্রীময়ীর। তাঁর হর্ষ বিষাদ আবেগ উচ্ছ্বাস সবই এখন সুনিয়ন্ত্রিত। বিগত পঁচিশটা বছর তাঁকে অনেক যুক্তিবাদীও করে দিয়েছে। এমন ঝট মাগনি পট বিয়া গোছের কাজ তাঁর ধাতে নেই। কখনও যে বান্ধবীদের সঙ্গে এদিক সেদিক বেড়াতে যান না শ্রীময়ী, তা নয়। তবে সে প্রচুর প্ল্যান প্রোগ্রাম করে। হিসেব ছকে। যেন উলটোপালটা খরচ-খরচা না হয়, সঙ্গীরা যেন মনোমত হয়, সব হোটেলে আগে থেকে বুকিং থাকা চাই...। অন্তত মাস খানেক ধরে বেরোনো হচ্ছে বেরোনো হচ্ছে এই উত্তেজনা পোহাবেন, তবেই না ভ্রমণে সুখ।

হঠাৎ শ্রীময়ীর খাপছাড়া ইচ্ছেটাকে কি সন্দেহ করল সোহিনী? আন্দাজ করল কিছু? সখিত্ব থাকা সত্ত্বেও সোমনাথকে নিয়ে সোহিনীর সঙ্গে কখনও তেমন খোলামেলা আলোচনা করেননি শ্রীময়ী। তবু সোহিনী আবছা আবছা জানে, বহুকাল আগে শুনেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে সোহিনীর তা মনে পড়ার কথাই নয়। তা ছাড়া সত্যিই তো নাতির কাছে যাচ্ছেন শ্রীময়ী, সোমনাথ তো উপলক্ষ মাত্র।

হ্যাঁ, সোমনাথ উপলক্ষই। বুমবুমের আকর্ষণেই তিনি কলকাতা ছুটছেন।

চিন্তাটায় শ্রীময়ী ভারী তৃপ্তি বোধ করলেন। মাথা নাড়ছেন আপন মনে।

সোহিনী মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এসেছেন। ঘাড় দুলিয়ে বললেন,—যা, হয়ে যাবে। তবে রাজধানী হবে না, কালকা। সাড়ে তিনশো এক্সট্রা পড়বে। এসি থ্রি টায়ার।

—কবেকার টিকিট?

—কালকের। কাল ভোরে।

—কালই?

—বারে, তুই তো তাড়াতাড়ি যেতে চাইলি! ব্যাগ থেকে কাগজ বার করে খসখস একটা নামঠিকানা লিখে দিলেন সোহিনী,—টাকা নিয়ে সন্ধে সাতটার মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবি। একেবারে তোর নামে টিকিট দিয়ে দেবে।

ঠিকানাটা আলগা দেখলেন শ্রীময়ী। কালকাজি। সর্বনাশ, চারটে পঁয়তাল্লিশ অব্দি ক্লাস, তার মধ্যেই

বাড়ি ঘুরে সাতটায় পৌঁছোনো যাবে? ব্যাগে আছে কত? মেরে কেটে পাঁচ ছশো। কালকাজি থেকে দাদার বাড়ি দূর নয়, সোজা সেখানে গিয়ে টাকাটা নিয়ে চলে যাবেন ট্রাভেল এজেন্টের কাছে? দাদার কাছে টাকা চাইতে দ্বিধা আছে শ্রীময়ীর। কেন যে দ্বিধা? কখনও চাননি বলে? উঁহু, একবার চেয়েছিলেন। ফ্ল্যাট কেনার সময়ে। সে অবশ্য অনেক, হাজার পঞ্চাশ মতো। দাদার মুখটা পাংশু হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, অফিসে গিয়ে কথা বলে দেখি, যদি লোন টোন পাওয়া যায়...।

সোহিনী বুঝি বান্ধবীর মনের কথা টের পেয়ে গেছেন। আলগা ঠেললেন শ্রীময়ীকে,—কী রে, কাছে টাকা নেই বুঝি?

—কম পড়ছে। শ্রীময়ী লাজুক হাসলেন,—মানে প্ল্যান তো ছিল না...

—কিৎনা চাহিয়ে? পাঁচশো? হাজার?

—হাজার মতো হলে...তোর অসুবিধে হবে না? মার্কেটিং যাবি বলছিলি?

—তোর দরকারটা আরজেন্ট। সোহিনী ব্যাগ খুলে নোটের বান্ডিল বার করল। দশটা একশো টাকার নোট গুনেও কী ভেবে আরও দুটো একশো বাড়িয়ে দিল শ্রীময়ীকে,—বারোশোই রাখ। মার্কেটিং আমি কাল পরশু করব।...বাই দা বাই, কাল ভোরে, বেরোবি, ঘরে টাকা আছে তো?

—তা আছে।

—তা হলে আর কী! যা, কটা দিন নাতির সঙ্গে মস্তি করে আয়।...ক্রিসমাসের আগে ফিরছিস, নাকি একদম ছুটি কাটিয়ে...?

—না না, ম্যাক্সিমাম সাত দিন।

ক্লাসের বেল পড়ল। সোহিনী ক্লাসে গেলেন। শ্রীময়ীর এ পিরিয়ডটাও অফ, কাগজে ছুটির দরখাস্ত লিখতে বসলেন শ্রীময়ী।

লিখতে লিখতে থামলেন একটু। সন্ধেবেলা চিত্তরঞ্জন পার্কও ঘুরে আসবেন কি? দাদাদের কিছুই না জানিয়ে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? মাকেও তো একবার অন্তত...।

ভেতরে ভেতরে চোরা এক সঙ্কোচ টের পাচ্ছিলেন শ্রীময়ী।

চার

শ্রীময়ীর বাপের বাড়ি এখন আনন্দের ঝরনা। চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়ির কাছে এ বাড়িটায় হইহল্লা একটু বেশি হয়, চিরকালই। শ্রীময়ীর বাবা অবিনাশ মানুষটাও ছিলেন হুল্লোড়ে ধরনের, বংশধরদের মধ্যে সেই ধারাটা রয়ে গেছে। হয় বাবলু ঝ্যাং ঝ্যাং গিটার বাজাবে, নয়তো ফুল ভলিউমে টেপ, নতুবা তুতুলের ভরতনাট্যমের রেওয়াজ চলবে ঝমঝম। কোনও কিছুই না করলে শুরু হয় ভাই বোনের খুনসুটি। বাবলুই বিচ্ছু বেশি, সে এখন থার্ড ইয়ার বি কম পড়ছে, দিদিকে চটিয়ে দেওয়ায় সে অত্যন্ত দক্ষ। এমন চিমটি কাটা কাটা মন্তব্য করে তুতুলদের নাচের টুপ নিয়ে! খানিকক্ষণ ভায়ের সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দেয় তুতুল, তারপর আর পেরে ওঠে না। হয় হাউমাউ চেঁচায়, নয় পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। তুতুলের কান্নাও এ বাড়ির খুশির অঙ্গ।

আজও সবই চলছে। পুরো মাত্রায়। তুতুলের আসন্ন বিবাহসম্ভাবনায় বাড়ি একেবারে গুলজার। শ্রীময়ী এ বাড়িতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে তুতুল পিসির গা ঘেঁষে এসে বসে ছিল, বকম বকম করছিল। পিসির সঙ্গে তুতুলের অনেক মনের প্রাণের কথা হয়, শ্রীময়ী নাকি তুতুলের নাচের প্রকৃত সমঝদার। সামনের মাসে তুতুলদের টুপ একটা ডান্সড্রামা নামাচ্ছে, হ্যাবিট্যাট সেন্টারে ফার্স্ট শো, তাই নিয়ে তুতুল রীতিমতো উত্তেজিত। বাবলু মাঝে মাঝে এসে চোখা চোখা বিদ্রূপ ছুড়ছিল, রেগে মেগে তুতুল উঠে চলে গেল।

একটু ফাঁক পেতেই মার ঘরে গেলেন শ্রীময়ী। অশীতিপর সুধাময়ীর এর মধ্যেই ঠাণ্ডায় বেশ জবুথুবু দশা, কুঁকড়ে মুকড়ে বসে আছেন বিছানায়।

তিরতির দুশ্চিন্তার মাঝেও শ্রীময়ী হেসে ফেললেন। বিছানার কোণে বসে বললেন,—হল কী তোমার? ডিসেম্বর পড়তে না পড়তেই এত কাহিল?

—হমু না? বাতাস যে বিঁধতাসে!

সুধাময়ী এখনও ওপার বাংলার বুলি ছাড়তে পারেননি। নাতি নাতনিরা কত খ্যাপায়, তবুও না। অবিনাশ নিজের ভাষা দিব্যি বদলে নিয়েছিলেন, কিন্তু সুধাময়ী পারেননি। হয়তো বা এই সুতো ধরেই কোনও দূর অতীতে পৌঁছে যান তিনি।

এই ঝকঝকে রাজধানীতে মোটামুটি আরামে বাস করে বিষণ্ণ অতীতের স্মৃতি বয়ে বেড়ানো কি সুধাময়ীর মুর্খামি? শ্রীময়ীর অন্তত আজ তেমনটা মনে হল না।

মৃদু স্বরে বললেন,—মা, আমি কাল কলকাতা যাচ্ছি।

ছানি পড়া চোখের মণি একটু একটু উজ্জ্বল হল,—মিতুলের কাসে? বাহ্, খুব ভাল। আওনের সময় আমার লইগ্যা আমসত্ত্ব আনিস তো।

—আনব।

—ওহানে এহন নতুন গুড় উঠসে না?

—উঠেছে নিশ্চয়ই।

—তাইলে কয়খান পাটালি আনিস।

শুধু নিজের খাওয়ার বাইরে আর কোনও কৌতূহলই নেই সুধাময়ীর। মিতুল, নাতজামাই, বুমবুম কারুর সম্পর্কে না। সোমনাথের অসুখের সংবাদ কি মার মগজে ঢুকবে? ঢুকলেও কী প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে! হয়তো ডুকরে কেঁদে উঠবেন, কিংবা ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকবেন! সোমনাথকে কি আদৌ মনে আছে মার?

তাপসী এসেছেন দরজায়। হাতে চায়ের কাপ, জলখাবারের প্লেট। শ্রীময়ীকে জিজ্ঞেস করলেন,—তোমাকে কি এখানেই দেব?

—না, টেবিলে রাখো। আসছি।

একটুক্ষণ দোনামোনা করে মার ঘর ছাড়লেন শ্রীময়ী।

ডাইনিং টেবিলে এসে বসতেই তাপসী বললেন,—জানো তো, একতলায় কী কাণ্ড হয়েছে! ওই গোয়েলটা কাল বেধড়ক বউ ঠেঙাচ্ছিল...মদ খেয়ে চুর...কী সব মুখের ভাষা...! পাড়াটা একেবারে ঝোপড়পট্টির বেহদ্দ হয়ে গেল।

শ্রীময়ী ভুরু কুঁচকোলেন,—এখন একতলায় কোনও গোয়েল আছে বুঝি? সামন্তবাবুরা উঠে গেছেন?

—ওমা, সে তো কবে...। দেড় মাস হয়ে গেল।...ও, তুমি তো এর মধ্যে আসোনি।

এই দোতলা বাড়ির একতলাটা শ্রীময়ীর কাকার ভাগে। কাকা বাবার আগেই গত হয়েছেন, খুড়তুতো ভাই কমলেশ মা বউ বাচ্চা নিয়ে বহুকাল আগে চলে গেছে ব্যাঙ্গালোর। একতলাটা কোম্পানিকে লিজ দিয়ে গেছে, ঘন ঘন ভাড়াটে বদলে যায়। আগে বাঙালি ভাড়াটেই আসত, ইদানীং অবাঙালিও আসছে মাঝে মাঝে। সামন্তবাবুর আগে ছিল এক সর্দারজি, তার আগে এক ইউপি-অলা। বাঙালি কলোনি বলে খ্যাত এই অঞ্চলে আজকাল অবাঙালি বেড়েছে খুব, অনেকেই মোটা টাকা পেয়ে বাড়ি পর্যন্ত বেচে দিচ্ছে। কী আর করা, সর্বত্রই তো এখন বাঙালিদের পিছু হটার সময়।

তাপসী আবার বললেন,—তুমি ছেলেদুটোর ছবি দেখেছ?

—কোন ছেলে?

—যে সম্বন্ধগুলো এসেছে। একজন ইঞ্জিনিয়ার, রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের। গুরগাঁওয়ে সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে আছে। বেশ ভাল পোস্টে। অন্যজনের বিজনেস। ওষুধের। কনট প্লেসে অফিস...

শ্রীময়ীর এসব প্রসঙ্গে মন বসছিল না। তবু জিজ্ঞেস করলেন,—ছেলেরা তুতুলকে দেখে গেছে?

—গেছে মানে? দুজনেরই তো তুতুলকে খুব পছন্দ। আমরাই এখন দোটানায় পড়েছি।...দুটো ছেলেরই ফ্যামিলি এত ভাল!...ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি অবশ্য দিল্লির নয়, লখনৌ-এর।

অরুণেশ অফিস থেকে ফিরেছেন। ষাট ছুঁই ছুঁই অরুণেশের স্বাস্থ্য এখনও বেশ ভাল, নির্মেদ শরীরে জরা এখনও দাঁত ফোটাতে পারেনি। চটপট জামাকাপড় বদলে, বাথরুম ঘুরে তিনিও এসে বসে পড়েছেন ডাইনিং টেবিলে। স্ত্রী আর বোনের কথোপকথন শুনছেন। বিনা মন্তব্যে।

শ্রীময়ী দাদাকে আলগা দেখে নিয়ে বললেন,—তুতুলের কোন ছেলেকে পছন্দ?

—সে তো জিজ্ঞেস করলেই মুখ ভ্যাটকায়। তাপসী ঠোঁট উল্টোলেন,—তার তো মনে হয় কাউকেই পছন্দ নয়।

—তা হলে এগোনোর দরকার কী! আরও ছেলে দ্যাখো।

—হাতে সময় তো অঢেল নেই ভাই। তোমার দাদার জুনে রিটায়ারমেন্ট, তার আগে দায়িত্বটা তো সেরে ফেলতে হবে।

বউদির বক্তব্যে যুক্তি আছে, শ্রীময়ী চুপ করে গেলেন। নিজের কথাটা কিছুতেই পাড়া যাচ্ছে না, কেবলই মনে হচ্ছে একটা ছন্দপতন ঘটে যাবে।

তাপসী বললেন,—তুমি একবার তুতুলকে বোঝাও না ভাই। ও তো তোমার কথা খুব মানে।

—আহা, আমি কী বলব! পছন্দ অপছন্দটা তো সম্পূর্ণ ওর ব্যাপার। তুতুল যথেষ্ট ম্যাচিওর মেয়ে, ওর ভালমন্দ ও ঠিক বোঝে।

—অন্তত একটু কায়দা করে জানো সত্যিই অপছন্দ, নাকি...

শ্রীময়ী অস্বচ্ছন্দ বোধ করলেন। নিজের মেয়ের ব্যাপারেই তিনি কোনওদিন মাথা গলাননি। মিতুল যখন দুম করে একদিন সুগতকে বাড়িতে হাজির করেছিল, একটিও কূট প্রশ্ন তোলেননি শ্রীময়ী। না সুগতর ভবিষ্যৎ নিয়ে, না অতীত নিয়ে। সুগত খুব ভাল ছেলে, সুগতকে শ্রীময়ীর খুবই পছন্দ, তবে সুগত অপছন্দসই হলেও মেয়ের জীবনসঙ্গী নির্বাচনের অধিকারে তিনি কক্ষনও হস্তক্ষেপ করতেন না। তাঁর জীবনদর্শন, তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। যার নিজের নৌকোই ভাঙাচোরা, তার কি অন্যকে সমুদ্র সাঁতরানোর উপায় বাতলানো সাজে! সে হোক না মেয়ে, হোক না ভাইঝি।

তাপসী নিচু স্বরে বললেন,—কী গো, তুতুলকে নিয়ে বসবে ও ঘরে?

—থাক না বউদি, আজ ভাল্লাগছে না।

—আহ্, ছাড়ো না। ওকে বোর করছ কেন? অরুণেশ স্ত্রীকে মৃদু ধমক দিলেন,—যাও তো ওঘর থেকে আমার সিগারেটের প্যাকেটটা এনে দাও তো।

অপ্রসন্ন মুখে সরে গেলেন তাপসী।

অরুণেশ স্থির চোখে বোনকে দেখছেন,—তোর কী হয়েছে রে আজ? মুখ চোখ এত শুকনো লাগছে কেন?

দাদার স্বরে স্নেহের আভাস। বুকটা হঠাৎ চিনচিন করে উঠল শ্রীময়ীর। দাদা তেমন একটা বড় চাকরি করে না, এই রাক্ষুসে খরচের শহরে মেপে মুপে সংসার চালায়, হয়তো অনেক সময়ই দাদা তাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়নি, তবু এখনও তো বোনের মন পড়তে পারে! আজকের দুনিয়ায় এটাই বা কম কী!

শ্রীময়ী প্রায় মুখ ফসকেই বলে ফেললেন,—দাদা, তোকে একটা কথা বলার ছিল।

—কী রে?

—আজ সকালে মিতুলের ফোন এসেছিল। শ্রীময়ী গলার স্বর যথাসম্ভব সহজ রাখলেন,—মিতুলের বাবার স্ট্রোক হয়েছে আজ ভোরে।

অরুণেশের সিগারেট হাতে ফিরছিলেন তাপসী, থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। বিস্মিত প্রশ্ন ঠিকরে এল গলা থেকে,—সে কী?

শ্রীময়ী নির্বিকার থাকার চেষ্টা করলেন। মাথা নাড়ছেন ধীর লয়ে।

অরুণেশ কয়েক পলক নীরব। তারপর জিজ্ঞেস করলেন,—সোমনাথের কি প্রেশার টেশার ছিল নাকি?

—বলতে পারব না।

—মিতুল কী বলল? কন্ডিশান কেমন?

—ক্রিটিকাল। আই সি ইউতে আছে। শ্রীময়ী বড় করে একটা শ্বাস ভরলেন ফুসফুসে। একটু থেমে থেকে বললেন,—আমি কাল ভোরে একবার কলকাতা যাচ্ছি।

—তুই! অরুণেশ ভীষণ চমকেছেন,—তুই যাবি?

—উপায় নেই রে দাদা। মিতুল খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে। বার বার করে এক্ষুনি চলে আসতে বলছে। শ্রীময়ী গড়গড় করে বলে ফেললেন কথাগুলো। এক নিশ্বাসে।

ঘরের আবহাওয়া থমথমে হয়ে গেছে সহসা। অরুণেশ সিগারেট ধরালেন একটা। হেলান দিয়ে বসেছেন সোফায়, ভুরুতে ভাঁজ। তাপসী আড়ে আড়ে দেখছেন স্বামী ননদকে।

শ্রীময়ী আন্দাজ করতে পারছিলেন দাদা কী ভাবছে। বিস্মিত হওয়াই তো স্বাভাবিক। সোমনাথের ওপর বোনের যে কী তীব্র ঘৃণা, কম দিন ধরে তো দেখেনি দাদা! শ্রীময়ীর স্মরণে এল, অনেক অনেক কাল আগে, কলকাতা ছেড়ে দিল্লি চলে আসার পর পরই দাদা দু-একবার মিটমাটের কথা তুলেছিল, ঠারে ঠোরে। শ্রীময়ী বিরক্ত হয়েছিলেন খুব। বাবা পুরোপুরি মেয়ের পক্ষে ছিলেন বলে শ্রীময়ীকে তেমন কোনও মানসিক চাপে ভুগতে হয়নি। বউদি অবশ্য বরাবরই ননদের প্রসঙ্গে নীরব ছিল, আড়ালে আবডালেও দাদাকে এই নিয়ে খোঁচাখুঁচি করত বলে মনে হয় না। মোটামুটি ভাল মানুষ হওয়া সত্ত্বেও দাদার মধ্যে এখনও কিছু পুরনো সংস্কার রয়ে গেছে! এখন নিশ্চয়ই মনে মনে বলছে, থাক বুড়ো বয়সে তাও মিনির পতিপ্রেম উথলে উঠল!

নিজে নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে শ্রীময়ী বলে উঠলেন,—তুই তো জানিসই দাদা, মেয়েটা আমার ওপর কীরকম ডিপেন্ড করে। ও এমন হেলপলেস ফিল করছে,...মা হয়ে কী করে ওকে রিফিউজ করি?

—হুঁ। এই সময়টায় তোর পাশে থাকাই উচিত। অরুণেশ অ্যাসট্রেতে ছাই ঝাড়লেন,—মানে, মিতুলের পাশে। যা, ঘুরে আয়।

তাপসী মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন,—মাকে কি তুমি এই কথাই বলতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, কিন্তু...

অরুণেশ মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে বললেন,—ছাড় তো, মাকে কিছু বলতে হবে না। তেমন বুঝলে আমিই...। আর এই বয়সে সোমনাথের ভাল মন্দ শুনে মা করবেই বা কী?

—আমিও তাই ভাবছিলাম। ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড কী যেন চিন্তা করলেন শ্রীময়ী। তারপরই গলা উঠিয়েছেন,—বাবলু...? বাবলু?

লম্বা লম্বা ঠ্যাঙে আবির্ভূত হল বাবলু। এই শীত শীত সন্ধেতেও তার পরনে সর্টস আর টিশার্ট, ঠাণ্ডা ফাণ্ডা লাগে না বোধহয়। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, বাবা সায়গল প্যাটার্ন। এই কাটিংটা ইদানীং দিল্লিতে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

বোধ হয় পড়তে বসেছিল বাবলু, মুখে চোখে হালকা ঘোর লেগে আছে। প্রশ্ন করল,—কী বলছ গো পিসি?

—তুই আমার একটা উপকার করতে পারবি?

—অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস। শুধু মুখের কথাটা খসাও। ইলেকট্রিক বিল জমা দিতে হবে? টেলিফোন বিল জমা দিতে হবে?

বাবলুর কথাবার্তায় ভারী ঝকঝকে ভাব আছে, সহজেই অন্যের আড়ষ্টতা কেটে যায়। শ্রীময়ী অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করলেন। স্মিত মুখে বললেন,—ওসব কাজ তোকে বলি কখনও? অশক্ত হয়ে না পড়া পর্যন্ত নিজের কাজ আমি নিজেই করে নেব।

—দেন হোয়াট?

—আমি কদিন থাকছি না। কলকাতায় তোর দিদির বাড়ি যাচ্ছি। পারলে মাঝে মাঝে গিয়ে আমার ফ্ল্যাটটা একটু দেখে আসিস। যা চারদিকে চুরিচামারি হচ্ছে...! ডুপ্লিকেট চাবিটা এখানে রেখে যাচ্ছি।

বাবলু ভুরু নাচাল,—কদ্দিনের প্রোগ্রাম?

—দেখি, সুগত কবেকার টিকিট কাটে।

—যাচ্ছ যখন, ওদের সঙ্গে ক্রিসমাসটা কাটিয়েই এসো।

—হবে না রে। এখানে কাজ আছে।

—কাজ নয়, বলো তোমার ঘরের কোণটি ছেড়ে কিচ্ছু ভাল লাগে না। বাবলু হি হি হাসছে,—কোথায় দিদির বাড়ি গিয়ে এক দুমাস হই হল্লা করে আসবে, বুমবুমকে নিয়ে ফুর্তি করবে, তা নয়...।

যাক গে যাক, যাও। তোমার ফ্ল্যাটের সিকিউরিটি এখন আমার চার্জে।

বিনা মন্তব্যে পিসি ভাইপোর কথোপকথন শুনছিলেন অরুণেশ তাপসী। একটু যেন বেশি নীরব হয়ে গেছে দাদা বউদি, মনে হল শ্রীময়ীর। বাবলু চলে যাওয়ার পর আর বসলেন না বেশিক্ষণ। অসহজ ভাবটা ফিরে আসছে।

অরুণেশ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন বোনকে। দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো বললেন,—পৌঁছে কিন্তু ফোন করিস, আমি চিন্তায় থাকব।

বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় দশটা বেজে গেল। দাদার বাড়ির জলখাবারে পেটটা ভরে গেছে বেশ, আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। চটপট স্যুটকেসটা টেনে জামাকাপড় গুছিয়ে নিলেন শ্রীময়ী। গোটা পাঁচেক শাড়ি সায়া ব্লাউজ। কোল্ডক্রিম, ময়েশ্চারাইজার, আরও দু-একটা প্রসাধনের টুকিটাকি। এ সব না নিলেও চলে, মেয়ের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু অন্য কারুর জিনিস ব্যবহার করতে বাধো বাধো ঠেকে শ্রীময়ীর। হ্যাঁ, মেয়েও এখন পর।

অজান্তেই শ্রীময়ীর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল। পর না হলে মেয়ে সোমনাথের জন্য এত উতলা হয়? বাবা? বাবার কোন কর্তব্যটা করেছে সোমনাথ? মেয়ের বিয়ের সময় পর্যন্ত এল না! শ্রীময়ীকে অপমান করার জন্য মেয়েকে এক সেট গয়না পাঠিয়ে দিল!

ফোন বাজছে। শ্রীময়ীর বুকটা ধক করে উঠল। দৌড়ে গিয়ে ধরেছেন।

যা ভেবেছেন তাই, মিতুলই।

—মা, কোথায় ছিলে? আমি তিন তিনবার তোমায় রিং করেছি।

শ্রীময়ী গলাটাকে শীতল করে ফেললেন,—কী খবর?

—একটুও ভাল না মা। সুগত এই মাত্র নার্সিংহোমে চলে গেল, রাতে থাকবে। বাবার প্রেশার অসম্ভব ফ্লাকচুয়েট করছে। ডাক্তার অ্যাপ্রিহেন্ড করছে হয়তো আবার একটা...

শ্রীময়ী নিরস স্বরে বললেন,—আমি কাল ভোরের কালকা মেলে যাচ্ছি।

—তুমি আসছ মা? মিতুলের গলা ঠিকরে উঠল।

কোচ নাম্বার জানিয়ে ফোন রেখে দিলেন শ্রীময়ী।

গোছগাছ শেষ। ঘড়িতে চারটেয় অ্যালার্ম দিয়ে শ্রীময়ী বিছানায় এলেন। ক্লান্ত লাগছে, ঘণ্টা কয়েকের ঘুম এখন ভীষণ জরুরি।

আলো নেভাতেই কেন যেন দাদার মুখটা ভেসে উঠল হঠাৎ! দাদা যেন কেমন অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছিল। মিতুলের আহ্বানের যুক্তিটা কি যথেষ্ট বিশ্বাস্য মনে হল না দাদার?

কেন অবিশ্বাস্য মনে হবে? শ্রীময়ী তো মিছে কথা বলেননি! মিতুল কি কান্নাভেজা স্বরে ডাকছে না তাঁকে? একবার নয়, দুবার নয়, বার বার।

শ্রীময়ীর পাশ ফিরলেন। সঙ্কুচিত ভাবটা ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। নাতিকে দেখতে যাচ্ছেন তিনি, যাচ্ছেন মেয়ের মিনতিতে সাড়া দিতে, সোমনাথ তো উপলক্ষ মাত্র। হ্যাঁ, সোমনাথ উপলক্ষই। তার বেশি কিচ্ছু না।

শূন্য ঘরে শ্রীময়ী এখন আর কারুর মুখোমুখি নেই। ঘরে কালচে আঁধার, নিজেকেও বুঝি আর দেখা যায় না। তবু নিজেরই যুক্তি নিজের কাছে এত ফাঁপা লাগে কেন?

তবে কি বালির নীচে স্রোত আছে এখনও...।

পাঁচ

ট্রেন যমুনা ব্রিজ পার হতেই শ্রীময়ীর বুকটা থম মেরে গেল। সম্পূর্ণ বাতাসহীন। তারপরই মেঘগর্জনের গুড়গুড় ধ্বনি।

শ্রীময়ী জানলার দিকে চোখ ফেরালেন। অন্ধকার কাচ, তার ওপারে পৃথিবীতে এখন নামেই ভোর, কিন্তু আদতে গাঢ়তর অন্ধকার। গতিময় ট্রেন আবছায়া মাখা এক স্টেশন পেরিয়ে গেল।

কেন চলেছেন শ্রীময়ী। কীসের আশায়? কোন সোমনাথের জন্য?

কালো কাচে ভেসে উঠল টুকরো টুকরো ছবি। অসংখ্য। নাচছে ছবিরা, দুলছে, গড়াচ্ছে। যেন সময়ের অবিচ্ছিন্ন স্রোতে চমলান দৃশ্য এখন।

দৃশ্য এক

গভীর রাত। তিন বছরের মিতুল অঘোরে ঘুমোচ্ছে বিছানায়। বেডল্যাম্প জ্বেলে ল-র জার্নাল পড়ছে সোমনাথ। উহুঁ, পড়ছে কোথায়, হাই তুলছে ঘন ঘন। চোখ রগড়াচ্ছে।

পঁচিশ বছরের শ্রীময়ী এইমাত্র ঢুকল ঘরে। মুখে চোখে বিরক্তির ছাপ লেগে আছে, ঘামের মতো। এতক্ষণ শাশুড়ির বকর বকর গিলতে হচ্ছিল। স্নেহলতা যতক্ষণ না ঘরের খিল তুলছেন, ততক্ষণ শ্রীময়ীর বিছানায় আসার জো নেই।

ঢকঢক জল খেল শ্রীময়ী। বিছানার ধারে এসে বসেছে। আলতো ঠেলল সোমনাথকে,—এই?

সোমনাথ ধড়মড় করে তাকাল।

—একটা কথা বলব?

—সকালে শুনব। সোমনাথ লম্বা হাই তুলল,—ঘুম পাচ্ছে।

—আহা, শোনো না। কাজের কথা।

—জ্বালালে। বলো।

শ্রীময়ী সোমনাথের গা ঘেঁষে এল। একটা হাত তুলে দিয়েছে সোমনাথের কাঁধে। নরম গলায় বলল,—আমার কেমন হাঁপ ধরে যাচ্ছে গো। দিনরাত শুয়ে বসে থাকা, কচর কচর পান চিবোনো, পরনিন্দা পরচর্চা...

—বনেদি বাড়ির অন্দর মহলে ওরকমই হয়। শ্রীময়ীর হাত সরিয়ে দিয়ে সোমনাথ সটান শুয়ে পড়ল,—ছিলে তো মাস্টারের মেয়ে, বড়বাড়ির হালচাল তুমি কী বুঝবে!

কথাটা বিঁধল শ্রীময়ীকে, তবু প্রতিক্রিয়াহীন থাকার চেষ্টা করল শ্রীময়ী। বিয়ের পর এই সাড়ে চার বছরে গায়ের চামড়া একটু তো পুরু হয়েছেই।

মুখ হাসি হাসি রেখে আবদেরে সুরে বলল,—আমার ভাল লাগে না গো। একটুও ভাল লাগে না।

—তো আর কী করা যাবে? সোমনাথ নির্বিকার,—মিতুল তো রয়েছে, মেয়ে নিয়ে থাকো।

—মিতুল এখন অনেক সাব্যস্ত। সব নিজে নিজে করতে পারে। কদিন বাদে স্কুলে যাবে। ওর পেছন পেছন কী ঘুরব?

—হুম। একখানা জার্নাল বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, সরিয়ে সাইড টেবিলে রাখল সোমনাথ,—তো?

—বা রে, বুঝছ না যেন! সোমনাথের শরীরের ওপর আর একটু ঝুঁকল শ্রীময়ী,—আগে তো বলেছি তোমায়!

—কী?

—করি না চাকরি। এখন তো আর আমি নতুন বউ নই।

—ফের ওই কথা? সোমনাথের স্বর ভারী হয়ে গেছে অকস্মাৎ, —ভবানীপুরের চৌধুরীবাড়ির বউ হয়ে ব্যাটাছেলের গায়ে গা ঘসার জন্য তুমি রাস্তায় বেরোবে? কেন? তোমার কি ভাতকাপড়ের অভাব হয়েছে?

শ্রীময়ী মৃদু প্রতিবাদ করলেন,—আহা, শুধু ভাতকাপড়ের জন্যই বুঝি লোকে চাকরি করে?

—তা হলে আর কীসের জন্যে করে?

—বা রে, অ্যাদ্দিন ধরে যে এত লেখাপড়া শিখলাম, সব বৃথা যাবে? কোনও কাজে লাগবে না? মনে আছে, বাবা কেন আমাকে এ বাড়ির বউ করে এনেছিলেন?

—না থাকার তো কারণ নেই। বংশে একটা বিদুষী বউ আনার শখ ছিল বাবার।

—হ্যাঁ, তোমাদের চৌধুরীবাড়িতে তো ওই জিনিসটাই ছিল না। শ্রীময়ীর স্বর সামান্য বেঁকে গেল। শ্লেষে। পরক্ষণেই স্বাভাবিক। আবার আদুরে ভাব ফিরিয়ে এনেছে গলায়,—অ্যাই, আমি কাগজ দেখে

একটা দরখাস্ত ছেড়েছিলাম। ইন্টারভিউও দিয়ে এসেছি। চাকরিটা বোধহয় হয়ে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথ তড়াং করে বিছানায় উঠে বসেছে, মা জানে?

—না।

—বাবা?

—না।...মানে বলা হয়নি এখনও।

—তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়! বাড়ির কাউকে না জানিয়ে তুমি...

—বলব তো সবাইকেই। তোমাকেই আগে বলছি। খারাপ চাকরি তো নয়। মেয়েদের স্কুল। কাছেই, বেলতলায়।

—নো তর্ক। সোমনাথ দাঁত কিড়মিড় করল,—ওসব মতলব ছাড়ো। মন দিয়ে মেয়েটাকে মানুষ করো।

—মেয়ে মানুষ করার জন্য অঙ্কে মাস্টার ডিগ্রি লাগে না। শ্রীময়ীর স্বর তরতর চড়ে গেল,—ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট তো নয়ই।

—ফার্স্ট হয়েছ বলে তোমার খুব দেমাক, তাই না? সোমনাথের চোখ জ্বলছে, হিংস্র হয়ে উঠছে মুখ। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,—তোমার চাকরি করা হবে না। অন্তত এই বাড়িতে থেকে।

—কেন হবে না? তোমাদের অসুবিধে হলে আমি ছেড়ে দেব চাকরি।

—নো আর্গুমেন্ট। নো বেচালপনা। ইটস আ ক্যানন।

সোমনাথ বেডল্যাম্প নিবিয়ে দিল।

দৃশ্য দুই

কাগজের একটা খবর নিয়ে সোমনাথের সঙ্গে তর্ক হচ্ছে শ্রীময়ীর। খেলা বা রাজনীতি বা ওই ধরনের কিছু। সোমনাথ যুক্তির পরোয়া করে না। গাঁকগাঁক চেঁচাচ্ছে। ঠাণ্ডা মাথায় নিজের বক্তব্য বলে যাচ্ছে শ্রীময়ী। সোমনাথ আরও রেগে গেল।

—আমার চেয়ে তুমি বেশি বোঝো?

—না বোঝার কী আছে? এটা বুঝতে তো তেমন কিছু মগজ লাগে না।

দরজায় পরদা নড়ে উঠল। স্নেহলতার মুখ। টিটকিরি ছুড়ছেন,—আ লো, পণ্ডিত বাপের পণ্ডিত মেয়ের সঙ্গে একটু সমঝে বুঝে কথা বল রে বাপ...!

দৃশ্য তিন

বাড়ির পিছনের নিমগাছে কাক বাসা বাঁধছে। কোথ্থেকে কাঠিকুটি জোগাড় করে আনছে কাকদম্পতি, কুটুর কুটুর জড়ো করছে ডালে। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে দেখছে শ্রীময়ী, চোখ উদাস। পাখির সংসারেও স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে ঘর গড়ে, মানুষের বেলায় পুরুষ নারীতে এত বিভেদ কেন? মানুষ অনেক উচ্চস্তরের প্রাণী বলে?

কানে স্নেহলতার অমৃতবাণী উড়ে এল,—ও লো ও বিদ্যের জাহাজ? হেঁসেলে অমন মূর্তিটি হয়ে দাঁড়িয়ে কেন বাছা? খাতা কলম এনে দেব? বসে বসে আঁক কষবে?

শ্রীময়ী বিদ্রূপ ঝেড়ে ফেলতে চাইল গা থেকে। শক্ত চোয়াল নরম করে যথাসম্ভব মধুমাখা স্বরে বলল,—আপনি সব সময়ে আমার ওপর এত রেগে থাকেন কেন মা?

—শিক্ষাদীক্ষা নেই তো, তাই। তোমার মতো বিদ্যেময়ী হলে নয় অন্যরকম হতুম।

—ভাল ব্যবহারের জন্য তো বইপড়া বিদ্যে লাগে না মা। আপনিও তো বড়বংশের মেয়ে, আপনার কথাবার্তা তো একটু অন্যরকম হওয়া উচিত।

—কী? বংশ তুলে কথা? আমার শাশুড়ি হলে তোর জিভ ছিঁড়ে নিত। রাগে চিড়বিড় করছেন স্নেহলতা,—যত বড় মুখ নয়, তত বড়...। আমার শাশুড়ি আমায় এর দশগুণ কথা শোনাত, কত ছেঁচা দিয়েছে, তবু এক দিনও মুখে মুখে চোপা করিনি। যদি এ বাড়িতে থাকতে চাস...তুইও করবি না।

—নিজে অত্যাচার সয়েও বোঝেননি, পুত্রবধূর সঙ্গে কীরকম আচরণ করা উচিত? গালাগাল করলে ছেলের বউয়ের মনে কত কষ্ট হয়...

—তুই আমায় জ্ঞান দিচ্ছিস? চোপ।

গর্জনে রান্নাঘর থেকে বেড়ালটা পালিয়ে গেল। দুধের বাটি উল্টে দিয়ে।

দৃশ্য চার

হাইকোর্ট থেকে ফিরলেন আদিনাথ চৌধুরী। সঙ্গে তাঁর জুনিয়র সোমনাথ। বাবার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে ঘরে চলে গেল ছেলে।

শ্রীময়ী এদিক ওদিক দেখছে। সুড়ুৎ করে শ্বশুরমশায়ের ঘরে ঢুকে পড়ল। মাথায় ঘোমটা টেনে বলল,—বাবা...

আদিনাথ আরামকেদারায় গা ছড়িয়েছেন। একটু বুঝি নড়ে চড়ে উঠলেন,—কী বউমা?

—একটা কথা ছিল বাবা?

—বলো।

—আমি চাকরি করতে চেয়ে কি খুব অপরাধ করেছি বাবা?

আদিনাথ নিরুত্তর।

—আপনার ছেলে আমায় পারমিশন দিচ্ছে না, মা রাগ করছেন...

আদিনাথের মুখে টুঁ শব্দ নেই। ভারী শরীর ভাল করে ছেড়ে দিলেন ইজিচেয়ারে। চোখ বুজলেন।

—আপনি তো শুধু আমার রূপ দ্যাখেননি বাবা, বিদ্যেটাও দেখেছিলেন। শ্রীময়ী নখ খুঁটছে,—আপনি জ্ঞানী মানুষ বাবা, আপনাকে আর কী বলব? জানেনই তো প্রয়োগ বিনা বিদ্যা নিষ্ফল।

আশ্চর্য, আদিনাথ চৌধুরী এবারও প্রতিক্রিয়াহীন। স্থূল চেহারাটা যেন কোনও মানুষের নয়, যেন একটা গ্র্যানাইট দেওয়াল। যেন সেখানে আছড়ে পড়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে কথাগুলো।

তবে একসময় আদিনাথ চৌধুরীর নৈঃশব্দ্য ভাঙল। ভাবলেশশূন্য মুখে বললেন,—তোমার শাশুড়িকে বলো তো আমার জলখাবার দিতে। নীচে ক্লায়েন্ট এসে গেছে, আমি এখন চেম্বারে বসব।

শ্রীময়ী মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসছে ঘর ছেড়ে।

বধির! বধির।

দৃশ্য পাঁচ

শ্রীময়ী ব্যাঙ্কের পরীক্ষায় বসেছে। পিসির বাড়ি যাচ্ছি বলে লুকিয়ে বেরিয়েছে বলে বুক কাঁপছে টিপটিপ। কোয়েশ্চেন পেপার দিল, ঘোমটা টেনে আড়ষ্ট হাতে লেখা শুরু করেছে। প্রথম হাফ শেষ হল, বেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে যাচ্ছে পরীক্ষার্থীর দল। খিদেয় শ্রীময়ীর পেট চুঁই চুঁই, তবু চুপটি করে বসে আছে হলে। টিফিন খেতে বাইরে বেরোলে কেউ যদি দেখে ফেলে!

দৃশ্য ছয়

বাড়ি ফিরে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকছে শ্রীময়ী। সামনে রক্তচক্ষু সোমনাথ। কোনও প্রশ্ন নয়,

বাক্যবাণ নয়, চড় আছড়ে পড়ল গালে। বেড়ালছানার মতো ছিটকে পড়ল শ্রীময়ী, দরজায় দাঁড়ানো মিতুল হাউমাউ কেঁদে উঠল।

দৃশ্য সাত

অন্ধকার রাত। ছাদে একলা হাঁটছে শ্রীময়ী। বিশাল ছাদের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। আকাশের দিকে তাকাচ্ছে, শক্ত হয়ে যাচ্ছে শরীর। চোখ জ্বলছে। চোয়াল কঠিন হয়ে গেল।

দৃশ্য আট

শ্রীময়ী শুয়ে আছে বিছানায়, দেওয়ালের দিকে মুখ। সোমনাথ টানছে, ফিরছে না শ্রীময়ী। জোর করে শ্রীময়ীকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল সোমনাথ। থাবা বসাচ্ছে শরীরে, শ্রীময়ীর অনাগ্রহ গ্রাহ্য করছে না। ডলছে, পিষছে, আপন মর্জিতে। যেন শ্রীময়ী স্ত্রী নয়, বাজারের বেশ্যা।

খিদে মিটতেই সরে গেল সোমনাথ। পোড়া কাঠের মতো পড়ে আছে শ্রীময়ী। গা ঘিনঘিন করছে, বমি আসছে। যেন এক নির্লজ্জ কুকুর চেটে গেছে তাকে।

লাঞ্ছিত শ্রীময়ী শয্যা ছেড়ে উঠল, মাঝরাতে ঢুকেছে বাথরুমে, শাওয়ার চালিয়ে দিল। আহ্, নেমে আসছে জলধারা, জুড়োচ্ছে শরীর। জুড়োচ্ছে, জুড়োচ্ছে...

দৃশ্য নয়

মেয়েকে নিয়ে স্কুলে বেরিয়েছে শ্রীময়ী। অ্যাপ্লিকেশন ছাড়ল পোস্টবক্সে। চুপি চুপি ইন্টারভিউ।

রোজ ছুটছে পোস্ট অফিসে, যেন চিঠি কোনও ভাবেই বাড়ি অবধি না পৌঁছোয়। একদিন সত্যি সত্যি একটা লম্বা বাদামি খাম। ইউ আর অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ এ অফিসার ট্রেনি...

নিজের ওপর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে শ্রীময়ীর, তবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যি চাকরি হল! চিঠি পড়তে পড়তে অক্ষরগুলো ঝাপসা।

দৃশ্য দশ

বেপরোয়া শ্রীময়ী শাশুড়ি ঠাকরুনের নাকের ডগা দিয়ে গটগট করে অফিস বেরিয়ে যাচ্ছে। ফিরল সন্ধেবেলা। কোর্ট থেকে জলদি জলদি ফিরে এসেছে সোমনাথ। ঘর অন্ধকার করে বসে আছে নির্বাক। চোখটা কেমন ঘোলাটে দেখাচ্ছে সোমনাথের।

দৃশ্য এগারো

পরের দিন একই ছবি

দৃশ্য বারো

পরের দিনও একই ছবি।

দৃশ্য তেরো

এর পরেই ক্লাইম্যাক্স। সেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

শ্রীময়ী অফিসে ঘাড় গুঁড়ে কাজ করছে। দু ধারে টাইপরাইটারে আওয়াজ বাজছে খটখট, বিশাল হলঘর জুড়ে কেজো ব্যস্ততা।

হঠাৎ শ্রীময়ী ভূত দেখার মতো চমকেছে। সোমনাথ! শ্রীময়ীর দিকে তাকিয়েও তাকাল না, গটগট ঢুকে গেল বড়সাহেবের ঘরে।

শ্রীময়ীর নিশ্বাস আটকে এল। কেন এসেছে সোমনাথ? ও ঘরে ঢুকে কী করছে?

সোমনাথের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ঘেরাটোপ ভেদ করে ঠিকরে আসছে সোমনাথের চিৎকার,—ভেবেছেন কী, অ্যাঁ? জানেন আমি কোন বাড়ির ছেলে?

বড়সাহেব কী যেন বলছেন নিচু স্বরে, এপারে এল না শব্দগুলো।

আবার সোমনাথ,—হ্যাঁ হ্যাঁ, দিস ইজ সোমনাথ চৌধুরী। বি এ, এল এল বি। প্র্যাটিসিং লইয়ার অফ ক্যালকাটা হাইকোর্ট।

বড়সাহেব তাঁর নিজস্ব মার্জিত গলায় বুঝি ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছেন সোমনাথকে।

হুঙ্কার ছাড়ল সোমনাথ,—চুপ। একটা কথা নয়। আমি জানতে চাই কেন আপনারা চাকরি দিয়েছেন আমার স্ত্রীকে? আই ও অ্যান এক্সপ্ল্যানেশন ফ্রম ইউ। আমার কনসেন্ট ছাড়া আমার ওয়াইফকে আপনি পয়সা দিয়ে পুষতে পারেন না।

অফিসসুদ্ধু লোক হতবাক। ড্যাবড্যাব চোখে একবার তাকাচ্ছে বড়সাহেবের চেম্বারের দিকে, একবার শ্রীময়ীকে দেখছে। বড়সাহেব বেল বাজালেন, পিওন বদ্রিনাথ ছুটে ঢুকল ঘরে।

কান ঝাঁ ঝাঁ করছে শ্রীময়ীর। পাথরের মতো বসে আছে চেয়ারে। হে ধরণী, দ্বিধা হও...হে ধরণী, দ্বিধা হও....

শ্রীময়ী অজ্ঞান হয়ে গেল।

দৃশ্য চোদ্দো

সাড়ে পাঁচ বছরের মেয়ের হাত ধরে মোটা মোটা থামওলা বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসছে শ্রীময়ী। পায়ে পায়ে। কাঁধে ব্যাগ, হাতে স্যুটকেস।

পথে নামার আগে একবার ঘুরে দাঁড়াল। আর একবার দেখছে বাড়িটাকে। গত শতাব্দীর বাড়ি এখনও গত শতাব্দীতেই পড়ে আছে। মাঝে পৃথিবীতে কত অজস্র ভাঙচুর, কত পরিবর্তন ঘটে গেল, কিছুই যেন ছাপ ফেলতে পারেনি অচলায়তনে। কত নারীর যে হাহাকার গুমরোচ্ছে ওই বাড়ির অন্দরে।

কোথ্থেকে আচমকা ছুটে এল সোমনাথ। দরজায় দাঁড়িয়ে তর্জনী তুলে শাসাল,—আশা করি যা করছ, ভাল করে ভেবেচিন্তেই করছ। কনসিকোয়েন্স বুঝে করছ। মনে রেখো, এ বাড়ি থেকে তোমার বেরোনোটা স্বেচ্ছাধীন, ফেরাটা নয়।

এর পর রিল ফাঁকা। বেবাক সাদা।

শ্রীময়ী চোখ বুজলেন। সোমনাথের সঙ্গে সেই শেষ মোলাকাত।

সেই দাপুটে সোমনাথ এখন খাবি খাচ্ছে নার্সিংহোমে, আর দুরু দুরু বুকে পথে নেমে আসা সেদিনের শ্রীময়ী হাজার মাইল উজান বেয়ে আজ তাকে দেখতে ছুটছে কলকাতায়!

এ যেন পাশার দান উলটে যাওয়া।

হঠাৎ শ্রীময়ীর বড় শীত করে উঠল। কামরায় এসি কি বেশি বাড়ানো আছে? ট্রেনে উঠেই বেডরোল চেয়ে নিয়েছিলেন শ্রীময়ী, পায়ের কাছে জড়ো করা আছে, টেনে নিলেন কম্বলখানা। ওফ্, এত কাঁপুনি

ধরল কেন? জ্বর আসছে কি?

নাকি দ্বিধারা রক্তকণিকার গতি বাড়িয়ে দিল?

না গেলেই হত। না গেলেই হত।

ছয়

—মা-জি, ব্রেকফাস্ট লাগবে?

প্যানট্রি কারের কর্মচারীর স্বর ক্ষীণ শুনতে পেলেন শ্রীময়ী। কম্বলের মধ্যে থেকে অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়লেন। চাই না। খিদে নেই।

তবু ওই স্বরটুকুই বুঝি তাঁকে স্থিত করল অনেকটা। ট্রেনের কম্বল এখন ওম ছড়াচ্ছে, আরাম হচ্ছে সামান্য।

মাথা থেকে কম্বল সরিয়ে শ্রীময়ী উঠে বসলেন। আলগা চোখ বোলালেন কামরায়। বেশির ভাগ যাত্রীই অবাঙালি, বাচ্চাকাচ্চাও আছে, ক্যালর ব্যালর হচ্ছে খুব। কয়েকজনের পরনে রাতপোশাক, বোধহয় কালকা চণ্ডীগড় থেকে আসছে, হাতে টুথব্রাশ, কাঁধে তোয়ালে, ব্যস্তসমস্ত মুখে চলেছে বাথরুমের দিকে। ওপরের বার্থে এখনও নাক ডাকার শব্দ, শ্রীময়ীর উলটো সিটের মহিলাও ঘুমোচ্ছেন এখনও। পাশের কুপে দুই তরুণী খিলখিল হেসে উঠল। বাঙালি। কী যেন বলছে বাংলায়।

ভ্রাম্যমাণ কফিঅলাকে দাঁড় করিয়ে শ্রীময়ী এক কাপ কফি নিলেন। ধোঁয়া ছড়ানো বাদামি তরলে চুমুক দিতেই মাথার ভার ভার ভাব অনেকটা উধাও। ট্রেনের লোকটাকে ভাগিয়ে দিলেন ঠিকই, তবু একটু একটু খিদের অনুভূতি আসে কেন? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, কাল রাতে কিছু খাননি। কিছু কি নিয়েছেন সঙ্গে? হ্যাঁ, থাকার তো কথা। হাতব্যাগ খুলে বিস্কুটের প্যাকেট বার করলেন শ্রীময়ী। ভোরে খালি পেটে কফি খাওয়া উচিত নয়, অম্বল হবে।

বাইরে আলো ফুটে গেছে। গাঢ়রং কাচের ওপারে নবীন প্রভাত কেমন যেন নীলচে লাগে। আদিগন্ত সরষেখেতের চোখধাঁধানো হলুদ বড় ম্রিয়মাণ। ঘন বসতি এল একটা, পেরিয়েও গেল। আবার নীল মাখা হলদেটে সবুজ খেত।

শ্রীময়ী মনে মনে হিসেব কষলেন। কতদিন পর আজ ট্রেনে চাপলেন তিনি? গত বছর মার্চে বেরিয়েছিলেন, মেয়ে জামাই নাতির সঙ্গে। আগ্রা ফতেপুরসিক্রি সিকান্দ্রা। পাক্কা একুশ মাস আগে। তবে সে তো মাত্র ঘণ্টা চারেকের জার্নি ছিল, এবার পুরো দিন ট্রেনে!

আচম্বিতে একটা কথা চিড়িক করে খেলে গেল মাথায়। জীবনে এই প্রথম তিনি একা দূরে কোথাও যাচ্ছেন। সম্পূর্ণ একা। আশ্চর্য, এ কথাটা তো একবারও মনে হয়নি এতক্ষণ? একটা গোটা জীবন প্রায় কেটে গেল, অথচ জীবনের প্রতিটি সফরে কেউ না কেউ তাঁর সঙ্গী ছিল! নিদেনপক্ষে মিতুল। তাঁর মতো একজন প্রায় স্বাধীন মহিলার পক্ষে ব্যাপারটা একটু বিস্ময়কর না? কেন কখনও কোথাও একা যাওয়া হয়নি? কখনও ব্যাপারটা এভাবে তলিয়ে দেখেননি বলে? নাকি হৃদয়ে কোনও আড়ষ্টতা ছিল? কীসের আড়ষ্টতা? উঁহু, সময় সুযোগ হয়নি, প্রয়োজন হয়নি, নইলে নিশ্চয়ই যেতেন। আজ যেমন চলেছেন। শুধু একা ট্রেনে ওঠার জন্যই কি মনে মনে অস্বচ্ছন্দ বোধ করছেন? মোটেই না।

সত্যি, জীবন কী বিচিত্র! মানুষের কত কিছুই না শুরু হয় পঞ্চান্ন বছর বয়সে!

চিন্তাটা শ্রীময়ীকে কিছুটা নির্ভার করে দিল। সপ্রতিভ পায়ে শ্রীময়ী বাথরুমে গেলেন, ফিরে এসে কিট্‌ব্যাগ খুলে ম্যাগাজিন বার করে সিটে হেলান দিয়েছেন। মেয়েদের লঘু পত্রিকা, ইংরিজি। রিডিংগ্লাস পরে নিলেন শ্রীময়ী, পাখির চোখ বোলাচ্ছেন পাতায়। এক জায়গায় এসে থমকালেন। জনৈক মহিলা ভাস্করের ইন্টারভিউ বেরিয়েছে, একটুক্ষণ সে পাতায় তন্ময় শ্রীময়ী। মহিলার স্বামী পুত্র কন্যার কথা কিছু নেই কেন? মহিলা কি অবিবাহিত? তা হলে তো কোথাও না কোথাও স্পিনস্টার বলে উল্লেখ থাকত। লেখাটার আঁতিপাঁতি খুঁজলেন শ্রীময়ী। নাহ্, কোথাও কিছু নেই। শিল্পী মহিলার ব্যক্তিগত জীবন এড়িয়ে গেছে পত্রিকা? তাই হবে। মনে হয় সেরকম বলার মতন নয়। একটু প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে মেয়েদের যে কত ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে হয়, এ কথা শ্রীময়ীর চেয়ে বেশি আর কে জানে।

পত্রিকাটা আর টানছে না শ্রীময়ীকে, পাশে রেখে দিলেন। প্যান্ট্রিকারের আকাশিউর্দি কর্মচারী ঘুরঘুর করছে, তাকে ডেকে টোস্ট ওমলেট নিলেন। অজান্তেই ঘড়িতে চোখ পড়ল একবার। সাড়ে আটটা। ইশ, পিঙ্কি আজ বেল বাজিয়ে বাজিয়ে ফিরে যাবে। বুদ্ধি করে সামনের ফ্ল্যাটে জিজ্ঞেস করলে হয়। অবশ্য ওর কী দায়! হয়তো তিনি ফেরার পরেও এই অজুহাতে আরও কয়েকটা দিন ডুব মেরে দেবে। মেয়েটা কামাই করতে পারেও বটে। অছিলাও দেখায় না, হয় চুপ থাকে, নয় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে অ্যাইসেহি! এভাবেই তো বেশ কামিয়ে যাচ্ছে, ফ্রিজ কেনার কথাও ভাবে...! ইশ, টিউটোরিয়ালের খাতাগুলো বাড়িতে পড়ে রইল, আজ দিনভর তো শুধু ট্রেনে বসে হাই তোলা, সঙ্গে থাকলে দেখে ফেলা যেত। এবারকার নতুন ব্যাচটা ভাল নয়, ক্রিসমাসের পর একটা স্পেশাল ক্লাসটেস্ট নিতে হবে।...বাবলু তো খুব কায়দা মেরে বলে দিল, ও-ই পিসির ফ্ল্যাটের সিকিউরিটি,...আসবে তো সত্যি সত্যি? নয় বন্ধুবান্ধব নিয়ে একটু হুল্লোড়ই করুক এসে ফ্ল্যাটে। তুতুল বলে বাবলুর নাকি প্রচুর বান্ধবী। তাদের নিয়ে নিরালা ফ্ল্যাটে...! ছি ছি, ভাইপোটাকে নিয়ে এসব কী ভাবনা! বাবলু এক আধ বার টুঁ মারলেই তিনি বর্তে যান। সোহিনী বলছিল ওদের উলটোদিকের ফ্ল্যাটে নাকি এই সেদিন ভরদুপুরে ভয়ঙ্কর ডাকাতি হয়ে গেছে। মহিলাকে ছুরি মেরে, গয়নাগাঁটি টাকাকড়ি হাতিয়ে...। ওহ্, দিল্লিটা কী হয়ে যাচ্ছে দিন দিন!

বেলা গড়াচ্ছিল। এলোমেলো চিন্তা দিয়েই অনেক অস্বস্তিকর ভাবনা দূরে সরাচ্ছিলেন শ্রীময়ী। দেখছেন সহযাত্রীদের। সামনের মহিলা উঠে পড়েছেন বহুক্ষণ, উপরের বার্থ থেকে নীচে নেমে এসেছেন তাঁর স্বামী। মধ্যবয়সি স্বামী স্ত্রীর কথাবার্তা শুনে রাজস্থানি বলে মনে হয়। মহিলা বেশ পৃথুলা, বোঁচকা খুলে খাবার বার করছেন। বাপস, খানা আছেও বটে। দিস্তে দিস্তে পরোটা, আলুর দম, লাড্ডু, আচার, নিমকি, ঝুরিভাজা।...! কাগজের প্লেট আছে সঙ্গে, সে প্লেট আর খালি হয় না। সামনে বসে কেউ এত এত খেলে শ্রীময়ীর কেমন বিবমিষা জাগে, জোর করে দৃষ্টি ফেরালেন অন্যত্র। তিনি স্বভাবমিশুকে নন, যেচে আলাপ পরিচয় করতে পারেন না। তবু কান পাতলেন অন্য সহযাত্রীদের বাক্যালাপে। কখনও কখনও চোখ আটকাচ্ছে ছায়ানিসর্গে—কেটে যাচ্ছে সময়।

দুটো বাচ্চা ট্রেনের মধ্যেই বল খেলা শুরু করেছে। খটাং করে বল উড়ে এসে লাগল শ্রীময়ীর মুখে। অপ্রস্তুত মা হাঁ হাঁ করে ছুটে এল, ধমকাচ্ছে বাচ্চাদের। ভারী মিষ্টি দেখতে শিশু দুটোকে, বুমবুমের বয়সিই হবে।

বুমবুমের কথা মনে পড়তেই বুকের ভেতরটা তুলতুলে হয়ে গেল। আচ্ছা, কী করছে এখন বুমবুম? দিম্মা আসবে শুনে লাফাচ্ছে? কী দুরন্তটাই না হয়েছে বুমবুম! এবার গরমের ছুটিতে দিল্লি এসে দিম্মার সাদা দেওয়ালে কত বিদ্যে ফলিয়ে গেছে। এ বি সি, সূর্য পাখি গাছ...। মিতুল ছেলেটাকে চটাস চটাস মারে, কোনও মানে হয়! বললেই শোনাবে, আমাকে নিয়ে তো তোমায় কখনও ভুগতে হয়নি, ডানপিটে ছেলের জ্বালা তুমি কী বুঝবে! কথাটা অবশ্য বর্ণে বর্ণে সত্যি। মিতুল ছোটবেলায় ভারী শান্ত ছিল। পুতুল আর খেলনাবাটি দিয়ে বসিয়ে দাও, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপটি করে খেলে যাবে। জন্মসংসারী! বুমবুম পেয়েছে বাপের ধারা। বেয়ান বলেন সুগত নাকি ছোটতে ভয়ঙ্কর দুষ্টু ছিল। এটা ভাঙছে, ওটা ফেলছে, এর সঙ্গে মারপিট, নিজের মাথা ফাটা, সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজ প্লাস্টার...। অমন বিচ্ছু হওয়ার দরকার নেই, তবে বাচ্চা একটু চঞ্চল না হলে কেমন যেন গোবরগণেশ মনে হয়। বুমবুম হয়তো একটু বেশি ছটফটে, এই যা। ফতেপুরসিক্রিতে গিয়ে কী ছোটান ছুটছিল! সঙ্গে সঙ্গে দৌড়তে গিয়ে শ্রীময়ীর জিভ এক হাত বাইরে! টকাটক বেগমদের হাওয়া মহলের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে, পাল্লা দিতে গিয়ে শ্রীময়ীর কোমর বেঁকে যাওয়ার জোগাড়! সিকান্দ্রায় ভারী মজা করেছিল বুমবুম। হুমহাম হনুমানের পাল দেখে বাচ্চা একেবারে সিঁটিয়ে যাচ্ছে শ্রীময়ীর গায়ে। যেই মুখপোড়াগুলো একটু হুটছে, অমনি দিম্মাকে টানাটানি, চলো না দিম্মা, হনুমান ধরব! যতটা ভয়, ততটাই কৌতূহল। দুটো প্রায় বিপরীতধর্মী অনুভূতি যে কী করে একসঙ্গে ক্রিয়া করে।

করে। করে। না হলে শ্রীময়ী আবার আনমনা হচ্ছেন কেন? অস্বচ্ছ কাচে আবার কেন অন্যরকম ছবি ভাসে?

রং জ্বলে গেছে ছবিগুলোর, হলদেটে হয়ে গেছে, তবু যেন আছে এখনও।

...বিয়ের পর প্রথম দিল্লি যাচ্ছে শ্রীময়ী। বাপের বাড়ি। জোড়ে। কী মাস ছিল যেন? শ্রাবণ? হ্যাঁ হ্যাঁ, শ্রাবণ। চুনকালি মাখা আকাশ ছিল সেদিন। সকালে এটাওয়া স্টেশনে থেমেছে ট্রেন, দৌড়ে নেমে গেল সোমনাথ। স্টেশনময় ছোটাছুটি করছে। সদ্যপরিণীতা বধূর জন্য শালপাতার আধারে টাটকা রাবড়ি কিনল। কিনতে কিনতেই ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়চ্ছে সোমনাথ। রড ধরে মস্ত লাফ দিয়ে কামরায় উঠল।

কাছে এসে চোয়াল-এঁটো-করা হাসি। ফিসফিস করে বলল,—এ শুধু রাবড়ি নয় কন্যে, এতে আমার লাইফরিস্কও পান্চ করা আছে, চেখে দ্যাখো।

শালপাতার ঠোঙা হাতে নিয়ে শ্রীময়ী হেসে কুটিপাটি। কোথায় রাবড়ি? সবটুকুই চলকে পড়ে গেছে...!

আরও হলদেটে ছবি এল। আরও।

...হানিমুন। কাশ্মীর। গর্জনময়ী লিদ্দার নদীর ধার ঘেঁসে কাবা দুজন ওই সাদা ঘোড়ার পিঠে? পহেলগাঁও-এর আকাশে কী অপরূপ এক চাঁদ, ঠিক যেন রুপোর পিরিচ! নদী কল্লোল তুলছে, জ্যোৎস্নার মসলিন বিছিয়ে দিচ্ছে চাঁদ!

...ঘোড়ায় চড়ে সোনমার্গ যাচ্ছে শ্রীময়ী। বেয়াদপ ঘোড়া, চিলতে ঘাসের সন্ধানে কেবলই সরে যায় খাদের দিকে। পড়লেই নিশ্চিত মৃত্যু, আতঙ্কে ঠকঠক কাঁপছে শ্রীময়ী।

সামনের ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল সোমনাথ। ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে শ্রীময়ীর পাশে পাশে হাঁটছে, শ্রীময়ীকে ছুঁয়ে।

শ্রীময়ী সোমনাথের চোখে চোখ রাখল।

সোমনাথ হাসছে,—ভয় কীসের? আমি তো আছি।

—যদি পড়ে যাই? যদি মরে যাই?

—আমিও মরে যাব। তক্ষুনি ঝাঁপ দেব খাদে। ওপারে জলদি জলদি মিট করতে হবে না?

ওই সব ফিকে ছবি এখনও কি মায়া বহন করে কোনও? যে স্মৃতিকে শ্রীময়ী পিষে ফেলেছিলেন, তা কি মরে নি এখনও? তুষারের নীচে চাপা ঘাস আবার মাথা তুলতে চায়? সামান্য একটু উত্তাপেই?

শ্রীময়ী স্মৃতিগুলোকে আর প্রশ্রয় দিলেন না। নতুন করে চোখ ফেললেন বাইরের পৃথিবীতে। মাঠের ফসল দুলছে হাওয়ায়, ছোট মতন একটা টিলা, আবার মলিন সবুজ প্রান্তর, সরু একটা খাল মতন পড়ল, স্নান করছে দেহাতী মেয়ে বউ, পটে আঁকা কুঁড়েঘর আসছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার মলিন প্রান্তর...। খণ্ড খণ্ড দৃশ্যগুলো প্রতিটি সুন্দর, কিন্তু খানিক পর যেন সবই একঘেয়ে লাগে। মনে হয় একই ছবির যেন পুনরাবৃত্তি ঘটছে, চোখ ক্লান্ত হয়ে আসে।

বড় স্টেশনে ঢুকল ট্রেন। কানপুর। খাবার এল। ট্রেনের। ঠাণ্ডা ভাত, স্বাদহীন মাছের ঝোল, নুন ছাড়া সবজি। এইই ভাল, স্টেশন থেকে উলটোপালটা খাবার কিনে বিপদ ডেকে আনার কোনও অর্থ হয় না। শ্রীময়ীর ভুললে চলবে না, জীবনে এটাই তাঁর প্রথম নিঃসঙ্গ সফর।

খাদ্য কোনও ক্রমে গলাধঃকরণের পরেই শ্রীময়ীর বড় বড় হাই উঠতে শুরু করেছে। অ্যালার্ম বাজার আগেই চাপা টেনশানে ভুগতে শুরু করেছিলেন, সেই শেষরাত থেকে জাগা, শরীরে আর কত সয়!

কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন শ্রীময়ী। কয়েক মুহূর্ত পরেই চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। ঘুম নামছে...ঘুম...ঘুম...

...সার সার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম। থামের ওপার থেকে ক্ষীণ আর্তনাদ উড়ে এল। ওপারে ঘর দেখা যায় একখানা, ধোঁয়া ধোঁয়া, ঝাপসা ঝাপসা। ঘর জুড়ে এক বিশাল পালঙ্ক...। কে একজন শুয়ে আছে ওই পালঙ্কে, নাকে অক্সিজেনের নল, স্যালাইন চলছে! লোকটার পরনে কালো কোট! শায়িত মানুষটা সোমনাথ? কিন্তু ঘরটা কোন ঘর? ভবানীপুরের বাড়ির কক্ষগুলোর সঙ্গে মিল আছে ঘরটার, তবু ঠিক ঠিক যেন মেলে না। কেন এত চেনা লাগে ঘরটাকে? আরে, এ তো শ্রীময়ীর দিল্লির ফ্ল্যাটের বেডরুম! আয়তনে সে ঘর এত বড় হল কী করে? বিছানায় সোমনাথের পাশে শ্রীময়ীর রঙিন টিভি। টিভির ধূসর পর্দায় কী যেন ফুটে উঠল। হৃৎপিণ্ড? কী ভীষণ ধকধক করছে সোমনাথের হৃৎপিণ্ডটা, ঠিক

বায়োলজি প্র্যাকটিকাল ক্লাসে ডিসেক্ট করা ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের মতো। সোমনাথের খাটের পাশে কে ওই নারী এসে দাঁড়াল হঠাৎ? মিতুল? না না, ও তো শ্রীময়ীই।

এ কী করছে সোমনাথ? শ্রীময়ীকে দেখা মাত্র নলসুদ্ধু উঠে বসল যে! চৌত্রিশ বছরের সোমনাথ খপ করে শ্রীময়ীর হাত জড়িয়ে ধরল। হাউমাউ করে কাঁদছে, কী যেন বলছে...! ক্ষমা চাইছে নাকি? হাত ছাড়িয়ে শ্রীময়ী হাসিতে লুটিয়ে পড়লেন।

হাসছেন, হাসছেন, পিশাচিনীর মতো...!

তন্দ্রা ছিঁড়ে গেল। শ্রীময়ী ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। ঠিক এই দণ্ডে তিনি কোথায়, বুঝে উঠতে সময় লেগে গেল দু চার সেকেন্ড। ট্রেনের কামরাটাকে কেমন অস্পষ্ট লাগছে, যেন কোনও অলীক অডিটোরিয়ামে বসে আছেন শ্রীময়ী, স্বপ্নের হাসির রেশটা মিলোচ্ছে না কান থেকে।

আশপাশের কোনও কুপে উচ্চৈঃস্বরে হাসছে একটা মেয়ে, বোধহয় সেই দুই বাঙালি তরুণীর একজন। ওই হাসিই কি ঘুমের ভেতর...?

শ্রীময়ী গা থেকে কম্বল সরিয়ে দিলেন। এসি নির্ঘাত কমিয়ে দিয়েছে, বেশ গরম লাগছে। হাঁটু ছড়িয়ে বসলেন শ্রীময়ী, সিটে আলগা ঠেসান দিলেন। এ সব তিনি কী দেখছিলেন এতক্ষণ? মনের অবচেতনে যা থাকে, তাই তো ঘুমে স্বপ্ন হয়ে আসে। তাঁর কলকাতা যাওয়ার পিছনে ওইটাই কি তবে গূঢ় অভিপ্রায়? নিজেকে বিজয়িনী দেখার সাধ? এক ধর্ষকামী সুখ উপভোগ করতে চান তিনি? স্বপ্নের শ্রীময়ীর পরনে সাদা থান...! কেন শ্রীময়ী থান পরেছেন? কেন? হ্যাঁ, সোমনাথের সঙ্গে তাঁর আইনসঙ্গত বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি, বাবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিজে থেকে উদ্যোগ নিতে প্রবৃত্তি হয়নি শ্রীময়ীর। মনে মনে একটা শঙ্কাও ছিল, আইনি ঝঞ্ঝাটে গেলে যদি মিতুলকে নিয়ে টানাহেঁচড়া শুরু হয়! আদালত হয়তো ন্যাচারাল গার্জেন হিসেবে সোমনাথকেই...! সোমনাথ নিজে লইয়ার, কী ভাবে কোন আইনের প্যাঁচ কষে তার ঠিক কী! তবে তিনি বহুকাল ধরেই সিঁদুর পরেন না, শাঁখা লোহা কিছুই না। অর্থাৎ সধবা থাকার কোনও চিহ্নই ধারণ করেন না তিনি। তবু কি মনের কোণে একটা সংস্কার রয়েই গেছে? সোমনাথ মরলে তিনি বিধবা হবেন...!

ওই সংস্কারই কি অমোঘ নিয়তির মতো শ্রীময়ীকে টেনে নিয়ে চলেছে কলকাতায়?

ট্রেনের দুলুনি কমছে। ঘটাংঘট শব্দে লাইন বদল করছে গাড়ি। গতি মন্থর হয়ে এল। মোগলসরাই আসছে।

শ্রীময়ী ছটফট করে উঠলেন। নেমে পড়বেন এখানে? ফিরে যাবেন দিল্লি?

হঠাৎই তেমন ইচ্ছেই জাগছে এখন শ্রীময়ীর।

স্নাত

সশব্দে ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করে সুগত বলল,—পথে আপনার কোনও অসুবিধে হয়নি তো মা?

শ্রীময়ী উত্তর দিলেন না। মৃদু হাসলেন শুধু। শরীর ছেড়ে দিয়েছেন ট্যাক্সির সিটে। বেলা নটার কলকাতা বেশ উষ্ণ এখন, ঠাণ্ডার ছিটেফোঁটাও নেই, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরা থেকে নেমে গরমই লাগছে বেশ। গায়ে জড়ানো মহার্ঘ শাল সামান্য অবিন্যস্ত করে দিয়ে শ্রীময়ী পলকা একটা হাই তুললেন।

সুগত ফের প্রশ্ন করল,—রাতে ঘুম হয়েছিল?

—হয়েছে মোটামুটি।...ওই ট্রেনে যেমন হয়। গাড়ি চললে চোখ জুড়িয়ে আসে, থামলে তন্দ্রা ভেঙে যায়।

—আমারও সেই দশা। সুগত মুচকি হাসল,—সারা রাত যা গেল!

আবার কি বাড়াবাড়ি হয়েছে সোমনাথের? কাল রাতও কি নার্সিংহোমে কাটিয়েছে সুগত? ছি ছি, তা হলে সুগতকে পাঠাল কেন, মিতুলই তো আসতে পারত।

সোমনাথের কন্ডিশান নিয়ে জামাইকে প্রশ্ন করতে পারলেন না শ্রীময়ী। শুধু ঘাড় ফিরিয়ে সুগতর দিকে তাকালেন একবার।

সুগতর বুদ্ধিদীপ্ত মুখে হাসি জ্বলজ্বলে,—আর কী, আপনার মেয়ের পাগলামি! অ্যালার্ম ঘড়িটা খারাপ হয়ে গেছে, নিজেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় অ্যালার্ম হয়ে বেজে চলেছে! এই, কটা বাজল দ্যাখো না! এই, ভোর ভোর কিন্তু উঠতে হবে! এই, হাওড়া এনকোয়ারিতে একবার ফোন করো না!

শ্রীময়ী আশ্বস্ত হলেন। স্মিত মুখে বললেন,—কেন, মিতুলের এত টেনশান কীসের? আমি কি কচি খুকি, হাওড়া স্টেশনে হারিয়ে যাব?

—বলুন, বলুন...। যত মিতুলকে বলি গাড়ি দু-আড়াই ঘণ্টা লেট, আটটা সাড়ে আটটার আগে ইন করবে না...কে শোনে কার কথা! সুগত মিতুলের বাকভঙ্গি নকল করল,—আমার মা একা আসছে, আমার মা একা আসছে...! প্লিজ, মাকে আতান্তরে ফেলো না প্লিজ! মা কলকাতার রাস্তাঘাট কিছু চেনে না...! টেনশান নয়, আপনার মেয়ের যা আছে তাকে বলে হাইপারটেনশান।

—যা বলেছ। শ্রীময়ী শব্দ করে হেসে উঠলেন,—দ্যাখো না, আমাকেই কেমন ছুটিয়ে আনল!

বলেই ঝপ করে থেমে গেলেন শ্রীময়ী। সুগতর কি বিশ্বাস্য মনে হবে কথাটা? যথেষ্ট স্বচ্ছ মনের ছেলে সুগত, শ্রীময়ীর অতীত সম্পর্কে সে বিয়ের আগে থেকেই জানে, এবং কম দিন ধরে সে তার শাশুড়িকে দেখছে না, বিয়ের আগে পরে মিলিয়ে বছর দশেক তো হবেই, তবুও...। প্রৌঢ়া শাশুড়ির হৃদয়দৌর্বল্যের কথা ভেবে সুগত কি একটুও মনে মনে হাসছে না?

শ্রীময়ী তড়িঘড়ি বলে উঠলেন,—কোনও মানে হয়, তুমিই বলো? আমারও তো বয়স হচ্ছে, না কী? হুট বলতে এরকম ছুটে আসা সম্ভব? কেঁদেকেটে আমায় এমন নার্ভাস করে দিল!

—বটেই তো। ঠিক তো। আপনার মেয়ে এমন অবুঝ...!

অনুযোগ? না অভিযোগ? না ঠাট্টা?

সুগতর সুরটা ঠিক ধরতে পারলেন না শ্রীময়ী। হালকা গলায় বললেন—তোমাকেও নিশ্চয়ই খুব ব্যতিব্যস্ত করে মারছে?

সুগত একটুক্ষণ থেমে থেকে বলল,—না, তা নয়। ওই পরশু রাতটাই যা...। ওদিকটা ও নিজেই সামলাচ্ছে।...আমার অত সময় কোথায় বলুন? একে ইউনিভার্সিটির পিক টাইম, তার ওপর দুটো ছেলে আমার আন্ডারে একটা বড় প্রোজেক্ট করছে, তাদের নিয়েও যথেষ্ট বিজি থাকতে হয়। ওই তারই ফাঁকে যতটুকু পারি...

শ্রীময়ীর কেন যেন মনে হল সোমনাথের অসুস্থতা নিয়ে সুগত তেমন যেন ভাবিত নয়। ভেতরে ভেতরে খুশিই হলেন একটু। সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলও উঁকি দিয়ে গেল বুকে। সোমনাথকে কি অপছন্দ করে সুগত? সম্ভব, খুবই সম্ভব। পছন্দ করার মতো কীই বা গুণ আছে সোমনাথের! বংশমর্যাদা? ফুঃ। বংশ নিয়ে বারফাট্টাই আজকালকার ছেলেরা মোটেই পছন্দ করে না। সুগতর মতো আধুনিক যুক্তিবাদী ধারালো স্বনির্মিত ছেলেরা তো নয়ই। অবশ্য সুগতর সোমনাথকে পছন্দ না করার অন্য কারণও থাকতে পারে। বিয়ের আগে মিতুল একদিন কথায় কথায় বলেছিল, সুগত তোমায় দারুণ রেসপেক্ট করে মা! তোমার মতো লড়িয়ে স্বাধীনচেতা উদার মহিলা নাকি ও জন্মে দেখেনি! হয়তো তাঁর মতো নারীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে বলেই সোমনাথ কোনওদিন সুগতর ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র হতে পারবে না।

চিন্তাটায় একধরনের সুখ আছে। আত্মতৃপ্তি আছে। এই মুহূর্তে সোমনাথের শারীরিক অবস্থা কেমন জানার ইচ্ছেটা সযত্নে দমন করলেন শ্রীময়ী। জানলায় চোখ, দেখছেন অনেক দিন আগে ছেড়ে যাওয়া শহরটাকে। হাওড়া ব্রিজের অল্প জ্যামে শম্বুক গতিতে এগোচ্ছে ট্যাক্সি, অন্য গাড়িগুলোরও গতি বড় কম। উফ্, দিল্লিতে সব যেন ছুটছে সর্বসময়, তুলনায় এই শহরটাকে অনেক বেশি শ্লথ মনে হয়। ভারতের রাজধানীর স্লো মোশান! কাতারে কাতারে মানুষ হাঁটছে ব্রিজ ধরে, প্রবেশ করছে শহরে, হঠাৎ দেখলে মানুষের অন্তহীন মিছিল বলে ভ্রম জাগে। এক জোড়া তরুণ তরুণী ব্রিজের রেলিং ধরে ঝুঁকে নদীর পানে উদাস তাকিয়ে, এই কেজো দুনিয়ার সঙ্গে তাদের যেন কোনও সম্পর্কই নেই! শ্রীময়ীর ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি ফুটে উঠল। সকাল নটা দশটার দিল্লিতে এই দৃশ্য কি দেখা যাবে?

ব্রিজ পেরিয়ে একটা ফ্লাইওভারে উঠল গাড়ি। শ্রীময়ী স্মরণ করার চেষ্টা করলেন কলকাতা ছাড়ার সময়ে এই উড়ালপুল তিনি দেখেছেন কি না। মনে পড়ল না। নাহ্, মস্তিষ্কে সত্যিই অক্সিজেন কম যাচ্ছে।

সুগত চুলে আঙুল চালাচ্ছে। চশমা ঠিক করতে করতে বলল,—কেমন দেখছেন আমাদের শহরটাকে?

শ্রীময়ী চোখ পাকিয়ে তাকালেন,—অ্যাই, আমাদের শহর কী? তুমি না দিল্লির ছেলে!

—তা বললে হবে! এখানে যখন বাস করতে এসেছি...

—কথার সুরে মনে হচ্ছে কলকাতা খুব ভাল লেগে গেছে? প্রথম দিকে তো খুব বলতে, অ্যাডজাস্ট করতে পারছ না, অ্যাডজাস্ট করতে পারছ না!

—এখনও পারি না। নিজের শহর ছেড়ে অন্য জায়গায় ভাল লাগে?

—তা হলে?

—কী করব, মানিয়ে নিচ্ছি। চাকরি বলে কথা।

সুগতর গলায় কি ক্ষোভ আছে কোনও? থাকা বিচিত্র নয়। শ্রীময়ীর মনে কূট সন্দেহ আছে, মেয়ে হয়তো কলকাতায় বাবার কাছাকাছি থাকবে বলে পীড়াপীড়ি করে সুগতকে যাদবপুরে চাকরিটা নিতে বাধ্য করেছে। সুগত অবশ্য মুখে কিছুই বলেনি কোনওদিন, তবে তার হাবভাবে যেন বোঝা যায় শ্রীময়ীর সংশয় অমূলক নাও হতে পারে।

লুকিয়ে একটা শ্বাস ফেললেন শ্রীময়ী। মিতুলের যে চিরকালই বাবার ওপর একটা চোরা টান, নানা সময়ে, নানা ভাবে টের পেয়েছেন তিনি। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে মেয়ে ফাঁকি দেবে কী করে! মেয়ের ডায়েরিতে বাবার উল্লেখ, মেয়ের ওয়ার্ড্রোবে বাবার ছবি, কলকাতা থেকে ক্বচিৎ কখনও বাবার টেলিফোন এলে মেয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠা...! মেয়েকে শ্রীময়ী আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে রেখেছিলেন। স্নেহে, মমতায়। প্রয়োজন হলে শাসনেও। কিন্তু বাবার কাছে মেয়ের যাওয়া কোনওদিন আটকাননি তিনি। কেন আটকাবেন? মিতুল তো সোমনাথেরও মেয়ে, জোর করে মেয়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক ছিন্ন করতে গেলে তিনি যে মেয়ের কাছে ছোট হয়ে যাবেন, এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি শ্রীময়ীর ছিল।

শ্রীময়ী কলকাতা ছাড়ার পর বহু বারই দিল্লি এসেছে সোমনাথ। মিতুলকে দেখতে। অথবা মিতুলের ওপর নিজের অধিকারটাকে বজায় রাখতে। অবশ্য কোনও বারই তাঁদের চিত্তরঞ্জন পার্কের বাড়ির ছায়া মাড়ায়নি সোমনাথ। সে উঠত তাঁর কাকার কাছে, সেই রাজিন্দর নগরে। সেখানেই পৌঁছে দেওয়া হত মিতুলকে। এই আনা নেওয়ার কাজটা দাদাই করত। ক্বচিৎ কখনও সোমনাথের খুড়তুতো ভাই। মেয়ে নিয়ে দিল্লিতে থাকত না সোমনাথ, কখনও ছুটত আগ্রা জয়পুর, কখনও বা দেরাদুন মুসৌরি। আশ্চর্য, ফিরে এসে কখনও তেমন উচ্ছ্বসিত ভাবে বাবার গল্প করেনি মিতুল! মেয়ের এই আপাত অনুচ্ছলতাই বুঝিয়ে দিত কোথায় যেন এক গোপন সাঁকো তৈরি হয়েছে বাপ মেয়ের মধ্যে। মায়ের কাছে বাবাকে আড়াল করে রাখতে চায় মেয়ে।

এমনটা চলছিল বেশ কয়েক বছর। মিতুলের গোটা স্কুললাইফটাই। তারপর তো কলেজে উঠে মিতুলের পা লম্বা হয়ে গেল, ছুটিছাটায় একাই চলে যেত কলকাতায়। হয়তো গোটা সামারটাই কাটিয়ে এল, কিংবা বড়দিন।

সব মেনে নিয়েছেন শ্রীময়ী, সব। নিঃশব্দে। হাসি মুখে না হলেও নির্বিকার মুখে। যেন এটাই স্বাভাবিক, এমনই হওয়া সঙ্গত। বাবা মার বিচ্ছেদের আঁচ মেয়ে কেন পোহাবে? কোনওদিন ভুলেও নিজের পছন্দ অপছন্দের আঁচড়টুকু মেয়ের গায়ে লাগতে দেননি শ্রীময়ী। অথচ সোমনাথের নোংরামি আর ধারাবাহিক অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়ে প্রতি পলেই তিনি কি মেয়ের মন বিষিয়ে দিতে পারতেন না?

নিয়তি কী রহস্যময়! নিজেরই মহত্ত্ব এখন শেল হয়ে বেঁধে শ্রীময়ীর বুকে। হাহাকার জাগে। নিজের উদারতা দিয়ে সোমনাথের নীচতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন শ্রীময়ী, মেয়ে তার কিছুই বুঝল না।

বাপ মেয়ের সম্পর্ক বুঝি এমন ধারাই হয়। মার যন্ত্রণার বোঝা মেয়ে বইতে যাবে কেন?

জনবহুল অফিসপাড়া পেরিয়ে চওড়া ফাঁকা রাস্তায় এসে পড়েছে ট্যাক্সি। দু ধারে সবুজ ময়দান একটু বিবর্ণ যেন। শীত না এলেও শীতের প্রস্তুতি নিচ্ছে গাছেরা, একটু একটু করে রং হারাচ্ছে।

শ্রীময়ী মনটাকে বিশেষ তারে বেঁধে নিয়েছেন। নিজস্ব দুঃখবোধ তিনি তো গোপন রাখতেই ভালবাসেন।

সহজ গলায় সুগতর সঙ্গে গল্প শুরু করলেন,—তারপর বলো, তোমার ইউনিভার্সিটি কেমন চলছে?

—যেমন চলে। শামুকও নয়, ঘোড়াও নয়, চলছে এক রকম।

—কলকাতায় তো শুনি খুব স্টুডেন্ট ইউনিয়নের উপদ্রব। তা নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে না?

—যাদবপুরে অতটা নেই। স্টাফ ইউনিয়ন আছে...খুব জোরদার। তা ওই সব নিয়েই কেটে যাচ্ছে। সুগত এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল। হঠাৎ প্রশ্ন করল,—আপনি যে কলকাতা আসছেন, মা বাবা জানে?

—তোমার মা বাবা?...না মানে...

শ্রীময়ী ঈষৎ লজ্জায় পড়ে গেলেন। সেদিন যখন চিত্তরঞ্জন পার্কে গেলেন, একবার কি বেয়াই বেয়ানের বাড়ি ছুঁয়ে আসা উচিত ছিল? কী বলতেন গিয়ে? ফ্ল্যাটে ফিরে একবার বোধহয় ফোন করার কথা মনেও হয়েছিল। কী জন্য যেন হল না। মিতুলের ফোন এসে গেল বলে কি?

সুগত ঠিক বুঝে গেছে প্রসঙ্গটায় শাশুড়ির অস্বস্তি আছে। ঝটিতি অন্য দিকে কথা ঘুরিয়ে দিল। বুমবুম, কলকাতার বাজারদর, শব্দহীন দীপাবলি, সব নিয়েই গল্প করছে টুকটাক। সোমনাথের প্রসঙ্গ একবারও তুলল না।

বাকি পথ শ্রীময়ী আর বিশেষ কথা বললেন না। ওই শুধু হুঁ হ্যাঁ।

ট্যাক্সি বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ফ্ল্যাটের দরজায় পলক থমকে গেলেন শ্রীময়ী। মেয়ে জামাইয়ের কলকাতার ফ্ল্যাটে এই তাঁর প্রথম পদার্পণ, একটু মিষ্টিমাষ্টা হাতে করে আনা উচিত ছিল।

এ হে হে, বুমবুমের জন্যও কিছু আনেননি।

আট

মিতুলদের ফ্ল্যাটটা টালিগঞ্জে। একেবারে বাসরাস্তার ওপর। বেশ বড় সড়, ভেতরে অনেকটা জায়গা, কমপক্ষে হাজার স্কোয়ার ফিট। দুটো বড় বড় শোয়ার ঘর, ছোট একটা স্টাডি, লিভিং স্পেসটাও অনেকখানি। চারজনের খাবার টেবিল পড়েছে, ফ্রিজ রয়েছে, ক্রকারি কেস রয়েছে, তার পরেও দিব্যি হাত পা মেলা যায়। বসার জায়গাটাও ভারী সুন্দর করে সাজানো। বেতের সোফাসেট, কাচের সেন্টারটেবিল, এক দেওয়ালে ডিভান, অন্য দেওয়ালে বাহারি ক্যাবিনেট, সাইডটেবিল, স্ট্যান্ড ল্যাম্প, মেঝেয় কার্পেট, সবই আছে।

মিতুল বুমবুম কেউই বাড়ি নেই। একজন নার্সিংহোম দৌড়েছে, অন্যজন কিন্ডারগার্টেন। সুগতই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফ্ল্যাট দেখাচ্ছিল। শ্রীময়ী মাথা দোলাচ্ছিলেন তারিফ করার ভঙ্গিতে। বাহ্, মিতুল দিব্যি গুছিয়ে সংসার করছে কলকাতায়।

ড্রয়িংস্পেসের সোফায় বসে শ্রীময়ী শরীরটাকে ছেড়ে দিলেন। রাতদিনের একটা কাজের মেয়ে আছে, সে রান্নাবান্না সারছে, তাকে চা করতে বলে সুগতও এসে বসল,—একটু ফ্রেশ হয়ে নেবেন না মা?

—হ্যাঁ, যাই। একটু দম নিয়ে নিই।...তোমাদের এই ফ্ল্যাটটা তো দিল্লির থেকেও ভাল।

—এমনি তো ভাল। কিন্তু ওই যে...একতলার ফ্ল্যাট, ধোঁয়া ধুলো আর গাড়িঘোড়ার আওয়াজে সারাদিন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যায়। রাত বারোটা অব্দি প্যাঁপোর পোঁ প্যাঁপোর পোঁ।..বাড়িটা একটু বড় রাস্তা ছেড়ে হলে বেটার হত।

—তোমাদের এখানে ভাড়াও তো কম।

—অনেক কম। দিল্লিতে এই সাইজের ফ্ল্যাট চিত্তরঞ্জন পার্কে মিনিমাম দশ চাইবে। এখানে কত আন্দাজ করতে পারেন? মাত্র সাড়ে তিন হাজার।

—কিন্তু এখানে তো ভাড়া গুনতে হচ্ছে, দিল্লিতে তুমি ফ্রি থাকতে। শ্রীময়ী লঘু রসিকতা জুড়লেন,—এখানে সেটলই যদি করো, আস্তে আস্তে কিছু কেনার কথা ভাবো।

—দেখি। সুগত যেন সামান্য অন্যমনস্ক,—ভাবি। তাড়া কীসের!

চা দিয়ে গেছে কাজের মেয়েটা। চটপট কাপ শেষ করে সুগত উঠে দাঁড়াল,—আমি তা হলে স্নানটা সেরে নিই মা? খেয়ে দেয়ে আমায় একবার বেরোতে হবে।

—ক্লাস?

—হ্যাঁ। পর পর দু দিন যাইনি।...আপনি রেস্ট নিন মা। দরকার হলে আর একটা বাথরুম আছে...। মিতুল এক্ষুনি এসে পড়বে।

সুগত চলে যেতেই সেন্টারটেবিলে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা টানলেন শ্রীময়ী। বাংলা ইংরিজি দুটো কাগজই নেয় সুগতরা। শ্রীময়ীর বাংলা কাগজ সচরাচর দেখা হয় না দিল্লিতে। নিজে তো ইংরিজিই নেন, দাদা হয়তো কালেভদ্রে কোনও রবিবার...।

বাংলা কাগজটাই খুললেন শ্রীময়ী, বড় বড় হেডিংগুলোতে চোখ বোলাচ্ছেন। কী সব উড়ালপুল টুল নিয়ে বিবাদ চলছে, হকারদের কী যেন দাবিদাওয়া নিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের কোন মন্ত্রী...। দিল্লিরও খবর আছে প্রথম পাতায়। রাজনীতি সমাচার, রোজ যেমন থাকে। কোনও খবরেরই গভীরে ঢোকায় উৎসাহ পেলেন না শ্রীময়ী, কাগজ বন্ধ করে চোখ বুজলেন।

কাজের মেয়েটা শ্রীময়ীর ব্যাগ স্যুটকেস শ্রীময়ীর জন্য নির্দিষ্ট করা ঘরে ঢুকিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে,—মা, খাবেন কিছু এখন? টোস্ট ওমলেট দিই?

মেয়েটি পিঙ্কিরই সমবয়সি প্রায়, তবে মুখে চোখে বেশ লাবণ্য আছে। কথা বলার ধরনটিও মিষ্টি।

শ্রীময়ী হেসে বললেন,—তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে, টুকাই।

—টুকাই? শ্রীময়ী বড় বড় চোখে তাকালেন,—সে তো ছেলেদের নাম! তোমার কোনও ভাল নাম নেই?

—নাহ, টুকাই বলে তো ডাকে। টুকাই সলজ্জ হাসল,—আমাদের তিন বোনদেরই ছেলেদের নাম। টুকাই বুকাই পুকাই। মার খুব ছেলের শখ ছিল তো।

কত ভাবেই যে মানুষ শখ পূর্ণ করে!

টুকাই আবার বলল,—তা হলে পাউরুটি সেঁকি, মা?

—দু পিস। আর ডিম ফিম লাগবে না।

শ্রীময়ী উঠে পড়লেন। বাথরুমে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখখানা দেখলেন একবার। রোগা লম্বা মুখমণ্ডলে শ্রান্তির ছাপ পড়েছে, কালো হয়ে আছে মুখ চোখ। ভাল করে জল ছেটালেন মুখে। কলকাতার জল এখনও তেমন ঠাণ্ডা নয়, আরাম হচ্ছে। যত্ন করে তোয়ালে রাখা আছে রডে, চেপে চেপে হাত মুখ মুছলেন। একেবারে স্নান সেরে নিলে কি ভাল হত? থাক, নতুন জায়গা, একটু গরম জল না নিলে শরীর গড়বড় করতে পারে।

বাথরুম থেকে বেরোতেই মিতুল।

ছোট্টখাট্টো চেহারার মিতুল পাখির মতো উড়ে এসে জড়িয়ে ধরল,—তুমি এসে গেছ মা?

—তুই যেভাবে ডাকলি, না এসে পারি! ঝামর হয়ে থাকা মেয়ের চুলে হাত বোলালেন শ্রীময়ী। তারপর প্রায় স্বাভাবিক স্বরে বললেন,—এখন কেমন আছে তোর বাবা?

—ভাল। বেশ ভাল। মিতুল বড় করে শ্বাস নিল,—মানে অনেকটা স্টেডি হয়েছে আর কী।

—ডাক্তার কী বলছে? বিপদ কেটেছে?

—পুরোপুরি অ্যাশিওর করছে না। আজকের দিনটা না গেলে...পরশু রাত্তিরে তো ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ আবার বুকে পেইন...ওফ, রাতটা যা চিন্তায় গেছে!

কথা বলতে বলতে শ্রীময়ীকে নিয়ে শ্রীময়ীর ঘরে এল মিতুল। এ ঘরে সিঙ্গলবেড খাট, আপাতত অতিথি টতিথি এলে থাকে বোধহয়, পরে হয়তো বুমবুমের দখলে যাবে।

বিছানায় বসেছেন শ্রীময়ী। পাশে মিতুল।

শ্রীময়ী জিজ্ঞেস করলেন,—তোর বাবার হঠাৎ অ্যাটাকটা হল কেন? প্রেশার টেশার বেড়েছিল বুঝি?

—প্রেশার তো বরাবরই বেশি।

—ওষুধ খেত?

—খাওয়ার তো কথা। নিয়মিত খেত কি না কে জানে!...কোনও কিছুই মানত না...! মিতুলের গলা ধরে এল,—মঙ্গলবার রাতে চিংড়িমাছের মালাইকারি খেয়েছিল বাবা। মনুপিসি বার বার বলেছিল চিংড়ি খেয়ো না ফুলদা, বাবা জোর করে তিন তিনটে...। রাতেই নাকি অস্বস্তি হচ্ছিল খুব, অ্যান্টাসিড খেয়ে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ভোরবেলা বাথরুমে গিয়েছিল, সেখান থেকে বেরোনোর পর পরই...

মিতুল চোখ বুঝে হাত উলটোল। নাক টানছে।

শ্রীময়ী মনে করছিলেন মনুকে। রোগা ফ্যাকাসে মেয়েটা সোমনাথদের মেজ তরফে থাকত, আশ্রিত হিসেবে। লতায় পাতায় কী রকম যেন বোন হয় সোমনাথের, অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল...। শ্রীময়ীর সঙ্গে মনুর তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না, তবে কথাবার্তা হত মাঝে মাঝে। মেয়েটা সারাক্ষণই খুব ভয়ে ভয়ে থাকত। জেঠিমাকে ভয়, কাকিমাকে ভয়, বউদিদের ভয়...। মনু একদিন শ্রীময়ীকে বলেছিল, তোমার খুব বুকের পাটা আছে ফুলবউদি...! সেই মনু সোমনাথের কেয়ারটেকার হল কবে থেকে?

মিতুল আবার কথা শুরু করেছে,—জানো মা, বাবা অনেকক্ষণ একা একা পড়ে ছিল। ভাগ্যিস মনুপিসির ঘুম পাতলা, গোঙানির শব্দ শুনে উঠে এসেছিল!

এখন এসব কথাবার্তা অর্থহীন, তবু শ্রীময়ীর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—মনু যখন জানেই তোর বাবার খাওয়া রেস্ট্রিক্টেড, তখন ওসব মালাইকারি ফালাইকারি করতে গেল কেন?

মিতুল মাথা নামিয়ে নিল। চকিতে অপরাধীভাব ফুটেছে মুখে। নিচু গলায় বলল,—বাবার জন্য করেনি। আমাদের জন্য করেছিল।

—তোদের জন্য? শ্রীময়ী বিস্মিত।

—হ্যাঁ। বাবার সেদিন জন্মদিন ছিল তো। আমাদের নেমন্তন্ন করেছিল বাবা। জানোই তো, আমি কীরকম প্রন লাইক করি, তাই বাবা...। আমি কি জানি, বাবা ওসব রিচ রান্না খাবে?...আমাদের সামনে বসে খাওয়াল, কিছুতেই নিজে তখন খেল না। বলল কোর্টে কী সব খেয়েছে, পেট ভার, পরে বসবে। ইস্, আমি যদি ওদিন জোর করে আমাদের সঙ্গে খাইয়ে দিতাম!

মিতুল ফুঁপিয়ে উঠল। ওই চাপা কান্নার শব্দে বুকের ভেতরটা কেমন অসাড় হয়ে আসছিল শ্রীময়ীর। যেন যন্ত্রণা, ঈর্ষা, একাকিত্ব, সমস্ত রকম বোধের বাইরে চলে যাচ্ছেন তিনি। যেন নিজের মেয়ে নয়, কোনও এক সোমনাথের মেয়ে বসে আছে পাশে। এই প্রথম সোমনাথের সেই মেয়ে বাবাকে নিয়ে কথা বলছে তাঁর সঙ্গে। হ্যাঁ, প্রথম। জীবনে এই প্রথম।

শ্রীময়ী সোমনাথের মেয়েকে সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বললেন,—মন খারাপ করছিস কেন? তোর বাবার ক্রাইসিস তো কেটে গেছে।

—ছাই কেটেছে। তুমি দ্যাখোনি, বাবার চোখ কেমন ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল! আমার জন্য...শুধু আমার জন্য..

এত দুঃখের মুহূর্তেও শ্রীময়ীর হাসি পেয়ে গেল। ভালবাসার মধ্যেই বোধহয় এমন তীব্র অহংবোধ থাকে, যার জন্য মানুষ প্রিয় জনের মৃত্যুর হেতু হিসেবে পর্যন্ত নিজেকে দাঁড় করিয়ে অনর্থক ব্যথা পায়। অথচ একটু সাদা চোখে দেখলে মিতুল বুঝতে পারত, সোমনাথের মতো সংযমহীন মানুষের আজ না হয় কাল স্ট্রোক হতই। ওই ঘটনার জন্য মিতুল নিমিত্তের ভাগী বই আর কিছু নয়।

সুগত স্নান সেরে বেরিয়েছে। খেতে বসল। মিতুল উঠে খাবার টেবিলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীময়ীও। টেবিলেই শ্রীময়ীর টোস্ট দিয়েছে টুকাই, সঙ্গে ওমলেট দেয়নি বটে, তবে প্লেটে প্রকাণ্ড সাইজের এক কলা।

শ্রীময়ী কলাটা তুলে নিয়ে টুকাইকে ডাকতে যাচ্ছিলেন, সুগত কঠোর দৃষ্টি হানল,—ও কী করছেন মা? খেয়ে নিন।

সুগতর শাসনে ভারী মজা পান শ্রীময়ী। বুকের খাঁচায় যেন কোনও অজানা বালিকার অস্তিত্ব উঁকি দেয়।

নার্ভাস নার্ভাস মুখে বললেন,—এগারোটা বাজে সুগত, একটু পরেই তো ভাত খাব।

—নয় ভাত একটু কম খাবেন। প্লেট থেকে কিছু ওঠানো চলবে না।

মিতুলও বলে উঠল,—খেয়ে নাও না মা। সকাল থেকে নিশ্চয়ই কিছু পেটে পড়েনি।

অগত্যা কলার খোসা ছাড়াচ্ছেন শ্রীময়ী। টোস্টে কামড় দিলেন।

মিতুল সুগতর পাতে ডাল দিতে দিতে প্রশ্ন করল,—তুমি কি আজ বিকেলে নার্সিংহোমে যাবে মা?

শ্রীময়ীর খাওয়া থেমে গেল। অবধারিত প্রশ্ন, তবু শ্রীময়ী অস্বচ্ছন্দ বোধ করলেন। একটু ইতস্তত করে পালটা প্রশ্ন জুড়লেন,—তুই কী বলিস? যাওয়া দরকার?

সুগত পুট করে বলে উঠল,—আজ গিয়ে লাভ কী? আই সি সি ইউ-এর ভেতরে তো ঢুকতে পারবেন না।

—তা অবশ্য ঠিক। বাহাত্তর ঘণ্টার আগে ভিজিটার আলাও করছে না। গিয়ে সেই কাচের বাইরে থেকে দেখা...। মিতুলের ভুরুতে ভাঁজ,—তবে মা যেতে চাইলে...

—আমি একটা কথা বলব? ঠাণ্ডা মাথায় শুনবে?

—বলো।

—মা এতটা পথ জার্নি করে এসেছেন, আজকের দিনটা টোটাল রেস্ট নিন। সুগত রায় দিয়ে দিল,—তুমি তো নার্সিংহোমে যাচ্ছই, আমি ইউনিভার্সিটি থেকে সোজা ওখানে চলে যাব। মাকে যদি নিয়ে যেতেই চাও, কাল পরশু বরং...

—হুঁ, তাও হয়। মিতুল ঘাড় নাড়ল,—তাড়া নেই...

সুগতর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন শ্রীময়ী। ছেলেটা ঠিক তাঁর হৃদয়ের দোলাচল বুঝেছে। তাঁর চকিত কলকাতা আসাটাকে সইয়ে নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে।

সুগত বেরিয়ে যাওয়ার পর ডাস্টার দিয়ে ঘরদোর ঝাড়ল মিতুল। টুকিটাকি গোছগাছ করল। মার সঙ্গেও বকবক করল খানিক। দিল্লি নিয়ে, তুতুলের বিয়ে নিয়ে...। তুতুলের বিয়ের ব্যাপারে মিতুলের দারুণ কৌতূহল। দুই পাত্রের বর্ণনা শুনে সে এক বাক্যে ইঞ্জিনিয়ারটির পক্ষে। ব্যবসাদারদের ওপর মিতুলের আস্থা নেই, এ ব্যাপারে সে নিখাদ বাঙালি, দিল্লিতে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও। ফেব্রুয়ারি মার্চে বিয়ে লাগতে পারে শুনে একটু বুঝি চিন্তায়ও পড়ে গেল। বোধহয় মনে মনে হিসেব করে নিল, কদিনের জন্য দিল্লি গেলে পড়তায় পোষাবে। বুমবুমের ওই সময়ে পরীক্ষা, অনন্তকাল তো দিল্লিতে বসে থাকতে পারবে না।

কাজের মেয়েটা বেরিয়েছে কোথাও। নিজেই মার জন্য গরম জল বসাল মিতুল, নিজেও স্নানে গেল।

ঘরে ফিরলেন শ্রীময়ী। স্যুটকেস খুলেছেন। স্নান করে উঠে পরার শাড়ি বার করছেন, নিজের ব্রাশ চিরুনি তোয়ালে পেস্টও। স্যুটকেসের অন্দর নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎই শ্রীময়ীর চক্ষু স্থির। এ কী ভরেছেন স্যুটকেসে? কাফ্‌তানটা কেন? ঢোলাঢাল্লা ওই পোশাকটা পরেন মাঝে মাঝে, রাত্রে। তা বলে ওই বগলখোলা ড্রেসে শোভিত হয়ে সুগতর সামনে ঘুরবেন? ছি ছি।

শ্রীময়ী কাফ্‌তানটাকে একদম তলায় চালান করে দিলেন। রান্নাঘরে এসে দেখছেন জল গরম হল কি না, তখনই দরজায় গুমগুম আওয়াজ।

হৃৎপিণ্ড তড়াং করে লাফিয়ে উঠল শ্রীময়ীর। চপল পায়ে ছুটেছেন। দরজা পুরো খুলতে না খুলতেই টুকাই-এর হাত ছাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুমবুম,—দিম্মা দিম্মা দিম্মা...

টানা দেড় দিনের দ্বিধা সংকোচ জড়তা অস্বস্তি এক লহমায় নিশ্চিহ্ন। শ্রীময়ী দু হাত বাড়িয়ে বুমবুমকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন,—আমার সোনা, আমার সোনা...কত দূর থেকে তোকে দেখার জন্য দৌড়ে এলাম।

শ্রীময়ীর গালে গাল ঘসছিল বুমবুম। দিদিমার হাত ছাড়িয়ে দু পা পিছিয়ে গেল অকস্মাৎ। তর্জনী তুলে বলল,—মিথ্যে কথা। লাই।

শ্রীময়ী হেসে উঠলেন,—ওমা, কী মিথ্যে কথা বললাম?

—তুমি মোটেই আমায় দেখতে আসোনি। তুমি তো এসেছ দাদুকে দেখতে। আমি জানি।

অমোঘ সত্য। নিখাদ সত্য। নির্লজ্জ সত্য।

শ্রীময়ী নির্বাক হয়ে গেলেন।

—দিম্মা...ও দিম্মা....

বুমবুমের ধাক্কায় শ্রীময়ীর ঘুম ভেঙে গেল। মাথামুণ্ডহীন স্বপ্ন দেখেছিলেন ঘুমের মাঝে, ঘোর ছিড়ে গেছে, তবু চোখ খুলতে পারছেন না। ক্লান্তি? খেয়ে উঠে শোওয়ার সময়ও তো টের পাননি এত ক্লান্তি জমে আছে শরীরে?

বুমবুম আবার ঠেলছে,—দিম্মা, ও দিম্মা? আর কত ঘুমোবে? ওঠো না, বিকেল হয়ে গেছে!

শ্রীময়ী চোখে রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসলেন বিছানায়। জীবজন্তু জঙ্গল সমুদ্র দিল্লির কুতুবমিনার সব মিলিয়ে এক জগাখিচুড়ি ছবি অদৃশ্য পর্দায় নেচে বেড়াচ্ছিল এতক্ষণ, চেপে চেপে মুছছেন, আস্তে আস্তে ফিরছেন বাস্তবে। কলকাতায়। মেয়ের বাড়িতে।

তক্ষুনি তক্ষুনি একটা আজব তথ্য ঝিলিক দিয়ে গেল শ্রীময়ীর মাথায়। জীবনে এই প্রথম শ্রীময়ী মেয়ের বাড়ি বাস করছেন! দিল্লিতে মেয়ে জামাই থাকত শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে, সেখানে গিয়ে থেকে যাওয়ার তো কথাই ওঠে না, আর কলকাতায় মিতুলের বাড়িতে এই তো তাঁর প্রথম আগমন।

আনমনে হেসে ফেললেন শ্রীময়ী। সত্যিই জীবনের কত কিছুই যে পঞ্চান্ন বছর বয়সে প্রথম শুরু হয়!

বুমবুম গোল গোল চোখে শ্রীময়ীকে দেখছে,—ও দিম্মা, তুমি হাসছ কেন?

শ্রীময়ীর হাসি আরও চওড়া হল। হাসতে হাসতেই নাতিকে কাছে টেনে নিলেন,—এমনিই। ইচ্ছে করছে তাই।

—এমা, তুমি কি পাগল? পাগলরা তো মিছিমিছি হাসে।

ওফ্, কথায় একেবারে ওস্তাদ! শ্রীময়ী আলগা গাল টিপলেন নাতির, স্মিত মুখে কৃত্রিম এক গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললেন,—ঠিক আছে, আমি আর এমনি এমনি হাসব না। আবার তবে ঘুমিয়ে পড়ি?

—না না। বুমবুমের প্রবল আপত্তি,—আমরা এখন বেড়াতে যাব।

—ওমা, কোথায়?

—পার্কে।

—কী হবে পার্কে গিয়ে?

—আমি খেলব, তুমি দেখবে। আমার কত বন্ধু আসে পার্কে...। বুমবুম ঘোষণার ভঙ্গিতে বলল,—আমি রোজ বিকেলে পার্কে যাই।

—কিন্তু আমি যে কলকাতার কিছু চিনি না ভাই। আমার সঙ্গে গেলে তুই যদি হারিয়ে যাস?

—মোটেই হারাব না। আমি সব রাস্তা চিনি।

—তোর মা বুঝি তোকে নিয়ে খুব ঘোরে?

—ধ্যাৎ, মা যাবে কেন? টুকাইদিদি আমায় নিয়ে যায়। পার্কে বাজারে দোকানে...। আমি তো বিকেলে একা একা থাকি, টুকাইদিদি আমায় নিয়ে ঘোরে।

—কেন? একা থাকিস কেন? তোর মা যায় কোথায়?

—মা তো পড়তে যায়। লাইব্রেরিতে।

শ্রীময়ী আঁচ করলেন ব্যাপারটা। এম এ করার পর মিতুলের রিসার্চের বাসনা ছিল, কাজকর্ম শুরুও করেছিল অল্প অল্প, বিয়ের পর ভাঁটা পড়েছিল উৎসাহে, ইদানীং আগ্রহটা তবে ফিরে আসছে! পুজোর সময় বলেছিল বটে নতুন করে কাজ শুরু করবে।

বুমবুম আবার টানছে,—ও দিম্মা, চলো।

—তোর টুকাইদিদি কোথায়?

—আমি আজ টুকাইদিদির সঙ্গে যাবই না। তোমার সঙ্গে যাব।

অগত্যা উঠতেই হয়। শ্রীময়ী নামলেন খাট থেকে। নাহ্, শরীরটা ধীরে ধীরে বেশ চাঙ্গা লাগছে তো! তাঁর দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার অভ্যেস নেই, কিন্তু ঘুমটা আজ বেশ কাজে দিয়েছে।

ত্বরিত পায়ে শ্রীময়ী বাথরুম ঘুরে এলেন। রান্নাঘরেও উঁকি দিলেন একবার। টুকাই আটা ঠেসছিল,

তাঁকে দেখেই চায়ের কেটলি গ্যাসে চড়িয়ে দিয়েছে। শাড়িটা বদলে নিলেন শ্রীময়ী। দিল্লির মতো অত চামড়া টানছে না, তবু হালকা করে ক্রিম ঘষলেন গালে, চুলেও চিরুনি বুলিয়ে নিলেন একটু।

বাইরে এক অপরূপ হৈমন্তী বিকেল। যানবাহনের গর্জন আর লোকজনের কোলাহলে এখন কান পাতাই দায়, ধোঁয়া আর ধুলোর দূষণে জ্বালা জ্বালা করে মুখচোখ, তারই মধ্যে সোনালি মসলিন বিছিয়ে সূর্য। ফিরোজা রং আকাশে তুষারকুচির মতো ছড়িয়ে আছে মেঘ। সব মলিনতা সব ক্লিন্নতা ছাপিয়ে উঠে শহর এখন ভারী মায়াময়।

সন্তর্পণে পথ হাঁটছিলেন শ্রীময়ী। বুমবুমের হাত ধরে। টকর টকর কথা বলে চলেছে বুমবুম। স্কুল নিয়েই সে উত্তেজিত থাকে বেশি, স্কুলের কথা শুরু করলে আর থামতে চায় না। কোন আন্টি সংহিতাকে বকেছে, সম্রাট কী কী দুষ্টুমি করে, বুমবুম কেন দেবজিৎকে মাঠে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল...। মনোযোগ দিয়ে শুনছেন শ্রীময়ী, ক্বচিৎ কখনও হুঁ হ্যাঁ করছেন, ব্যস তাতেই আরও উদ্যম বেড়ে যাচ্ছে বুমবুমের।

বড়রাস্তা ধরে সামান্য হাঁটতেই বাঁয়ে চওড়া গলি। গলি ধরে বিশ-পঞ্চাশ গজ এগোতেই মাঝারি সাইজের পার্ক। বেশ অনেককালের পুরনো পার্ক, ঘিঞ্জি এই অঞ্চলটায় ফুসফুসের মতো বিরাজ করছে যেন। শ্রীময়ীদের দিল্লির পার্কগুলোর মতো অত সুন্দর সাজানো গোছানো নয় বটে, তবু মোটামুটি আছে সবই। স্লাইড দোলনা সি-স...। একটুখানি সবুজও আছে, সেখানে চলছে কচিকাঁচাদের অনন্ত হুড়োহুড়ি।

ছোট্ট ঘেরা জায়গাটায় মা মাসি আয়া দিদিদেরও কমতি নেই, তারাও ঘুরছে ফিরছে যত্রতত্র। ছড়ানো ছেটানো কাঠের বেঞ্চিতে ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই ভাব।

শ্রীময়ী একটা বেঞ্চিতে জায়গা খুঁজে বসতেই তীর বেগে শিশুদের অরণ্যে ঢুকে গেল বুমবুম। শ্রীময়ী এদিক ওদিকে দেখছিলেন। এলোমেলো চিন্তা আসছিল মনে। বুমবুমের কথা শুনে মনে হয় মিতুল আজকাল তেমন সময় দেয় না ছেলেকে...এটা কি ঠিক কাজ করছে মিতুল? বিকেলে একা থাকে বলার সময় বুমবুমের মুখে কেমন ছায়া পড়েছিল না? পড়াশুনো তো তিনিও করেছেন, ডক্টরেট করার সময়ে মিতুল ছিল সাত আট বছরের মেয়ে, প্রতিটি কাজের ফাঁকে কী হাঁচোড় পাঁচোড় করেই না শ্রীময়ী মেয়ের কাছে থাকতে চেয়েছেন সর্ব সময়ে। মিতুলের মামার বাড়িতে মানুষজন কম ছিল না, দাদু দিদা মামা মামি তুতুল বাবলু...তা সত্ত্বেও মেয়েকে সঙ্গ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করতেন শ্রীময়ী। কী যে হচ্ছে আজকালকার মেয়েরা! মিতুলকে তো তিনি একটু অন্যভাবে গড়তে চেয়েছিলেন, নিজের আদলে। হয়নি। বোধহয় হয়ও না। মিতুলের জিনের মধ্যে তো শ্রীময়ী একা নেই! ছোট্ট একটা শ্বাস পড়ল শ্রীময়ীর, ভাবনাটা সেই সোমনাথের অভিমুখে ঘুরে গেল। কেমন আছে এখন সোমনাথ? শ্রীময়ীর আগমনবার্তা কি আজই বাবাকে শুনিয়ে আসবে মিতুল? শুনে কী প্রতিক্রিয়া হবে সোমনাথের? মিতুলকে জিজ্ঞেস করবেন শ্রীময়ী? ছিঃ, তিনি এসেছেন কর্তব্যের তাগিদে। মেয়ের আহ্বানে। নাতির টানে। এই ধরনের বালখিল্যসুলভ চিত্তচাঞ্চল্য তাঁকে মোটেই মানায় না।

বাচ্চাদের ঝাঁক থেকে ফিরে আসছে বুমবুম। দু পকেটে হাত, মুখ বেজার।

শ্রীময়ীর ভুরু কুঁচকে গেল,—কী রে, কী হল?

—আমার একটাও বন্ধু আসেনি।

—ও, এই ব্যাপার। শ্রীময়ী হেসে ফেললেন,—তুই স্লাইডে ওঠ, দোলনায় চড়...

—আমার ওসব ভাল লাগে না। বুমবুমের ঠোঁট ফুলে গেছে,—কেন কেউ এল না গো আজ?

—তা আমি কী করে জানব! শ্রীময়ী নাতিকে কাছে টানলেন,—আয়, তুই আর আমিই বসে বসে গপ্পো করি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাশে এসে বসল বুমবুম। দু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুঁজছে বন্ধুদের।

শ্রীময়ী একদৃষ্টে দেখছিলেন নাতির মুখখানা। পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছে বুমবুমের গালে, বিচ্ছুরিত হচ্ছে হেমবর্ণ। বেশ ফরসা হয়েছে বুমবুম। মিতুলের থেকে তো বটেই, এমনকী তাঁর চেয়েও। মুখটায় কিন্তু মিতুলেরই ভাব। আরও ছোটতে সুগতর সঙ্গে মিল লাগত। মাত্র ক বছরেই ছাঁদ কেমন বদলে গেল! ভাল, ভালই তো। মাতৃমুখী ছেলেরা নাকি সুখী হয়। বড় হলে বুমবুমকে কেমন দেখতে লাগবে? এই নরম সরম ভাব আর থাকবে না, চোয়াল কঠিন হবে, মুখের পেশি অন্যরকম হবে, তবু

মিতুলের ভাবটুকু থাকবে নিশ্চয়ই।

মনে হতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল শ্রীময়ীর। মিতুলের মুখ তো সোমনাথের কার্বন কপি! অর্থাৎ বুমবুম সোমনাথ হয়ে ঘুরবে পথে ঘাটে!

চিন্তাটার চোরা বিতৃষ্ণা এড়াতেই বুঝি শ্রীময়ী আলটপকা প্রশ্ন করে বসলেন নাতিকে,—হ্যাঁ রে, আমি যে দাদুকে দেখতে এসেছি, তুই জানলি কী করে?

বুমবুম ঘাড় ফেরাল,—বা রে, মা তো বলছিল বাবাকে। বাবা বলল, মাকে আবার কেন কষ্ট দিতে গেলে...! উনি এই বয়সে ছুটে ছুটে আসবেন!

একেবারে পাকাস্য পাকা। কী ভাবে সুগতর প্রতিটি শব্দ মেমারিতে গেঁথে নিয়েছে বুমবুম!

নাতির চুলে আলতো হাত বোলাতে বোলাতে শ্রীময়ী বললেন,—কেন দাদুকে দেখতে এসেছি, তা জানিস?

—দাদুর যে অসুখ করেছে। দাদু নার্সিংহোমে।

—তুই দাদুকে দেখতে গেছিলি?

—না। মা বলেছে সানডে ছাড়া বাচ্চাদের নার্সিংহোমে ঢুকতে দেয় না।

একটু বুঝি দুষ্টুমিতে পেল শ্রীময়ীকে। লঘু গলায় জিজ্ঞেস করলেন,—বুমবুম, দাদুকে তুই ভালবাসিস?

বুমবুম ঘাড় হেলিয়ে দিল,—হ্যাঁ।

—কতটা বাসিস?

—অনেকটা। দু হাত ছড়িয়ে দিল বুমবুম,—এই এতটা।

—মানে আমায় যতটা ভালবাসিস, তার চেয়েও বেশি?

এবার যেন একটু ধন্দে পড়েছে বুমবুম, নাক মুখ কুঁচকোচ্ছে। একটু সময় নিয়ে বলল,—না, তোমার চেয়ে বেশি নয়। সমান সমান।

সূক্ষ্ম কাঁটার মতো ফুটল কথাটা, একটু বুঝি রক্তক্ষরণও হল শ্রীময়ীর। ম্লান মুখে বললেন,—একেবারে সমান সমান?

—হ্যাঁ। বুমবুম ঘাড় দোলাল,—দাদু কত খেলে আমার সঙ্গে।

—খেলে? তোর সঙ্গে? শ্রীময়ী কৌতূহল চাপতে পারলেন না,—তোরা বুঝি প্রায়ই দাদুর বাড়ি যাস?

—আমরাও যাই, দাদুও আসে। দাদুই বেশি আসে।

রক্তক্ষরণটা বাড়ছে শ্রীময়ীর, তবু নীরব থাকতে পারলেন না। যেন এক গোপন রহস্যের চাবিকাঠি পেয়েছেন, শেষ না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

ফের প্রশ্ন করলেন,—দাদু এসে কী করে? শুধু তোর সঙ্গে খেলে?

—মার সঙ্গেও গল্প করে। বাবা থাকলে বাবার সঙ্গেও।

আশ্চর্য, কী নিটোল এক ইউনিট গড়ে উঠেছে এখানে! সোমনাথ মিতুল বুমবুম। এবং সুগত। এবং এই ইউনিট তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণ শ্রীময়ীর অগোচরে। তবে কি শ্রীময়ীর ধারণাই সত্যি? সোমনাথকে নিয়ে বৃত্ত রচনার জন্যই কলকাতায় চলে এসেছে মিতুলরা? সুগতর মতো ছেলেও তা হলে মন থেকে মেনে নিয়েছে সোমনাথকে? অবশ্য শ্রীময়ীকে শ্রদ্ধা করলে সোমনাথকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে হবে, এতটা বুঝি শ্রীময়ীর আশা করাও ঠিক নয়। কিন্তু তাঁর কাছে কথাটা লুকিয়ে রাখার অর্থ কী? তিনি আহত হবেন, এই আশঙ্কা? নাকি স্রেফ কপটতা? আশ্চর্য, পুজোর সময়েও যখন গেল, তখনও কেউ ভুলেও সোমনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেনি! বুমবুম পর্যন্ত না! কেন সচেতন ভাবে তাঁকে বৃত্তের বাইরে ঠেলে দিয়েছে সকলে?

বুকটা হু হু করছিল শ্রীময়ীর। ঈর্ষায় পুড়ছেন? অভিমানে জ্বলছেন? নাকি চোরা বিষাদ তুষের আগুন হয়ে শ্রীময়ীকে দাহ করছে ধিকিধিকি? নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস কি টলে যাচ্ছে শ্রীময়ীর?

বুমবুম ডাকছে,—ও দিম্মা, কী ভাবছ?

—কিছু না রে ভাই। শ্রীময়ী মাথা দোলালেন,—ভাবছি আমার কপালের কথা।

—কী হয়েছে কপালে? ব্যথা করছে?

—সে তো আছেই রে। শ্রীময়ীর অস্ফুটে বললেন,—এ ব্যথা কি তুই বুঝবি?

বুমবুম কথাটা শুনতে পেল না। ছোট্ট ছোট্ট দুই চোখে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করছে দিদিমাকে। নিজের

মতো করেই কিছু ভেবে নিল বোধহয়। কলকল করে উঠেছে আবার,—আমি জানি, তোমার মন খারাপ লাগছে।

শ্রীময়ী হেসে ফেললেন—যাহ্, মন খারাপ হবে কেন?

—হচ্ছে। আমি জানি। দাদুর অসুখ হয়েছে...দাদু মরে যাবে...তাই।

—অসুখ হলেই কেউ মরে যায় নাকি?

—দাদু মরে যাবে। মা সেদিন বলছিল, আর কাঁদছিল। আমি দেখেছি।

—ও এমনি এমনি বলেছে। দাদু অসুখে খুব কষ্ট পাচ্ছে তো, তাই তোমার মা মন খারাপ করে বলে ফেলেছে। নাতিকে একদম কোলের কাছে টানলেন শ্রীময়ী। উপদেশ দেওয়ার ঢঙে বললেন,—তুমি ওভাবে মরার কথা বোলো না। আপনজনদের মরার কথা বলতে নেই।

—দাদু কি আমার আপনজন?

—নিশ্চয়ই। তোমার আপনজন, তোমার মার আপনজন, তোমার বাবার আপনজন...

আর এগোতে পারলেন না শ্রীময়ী, থেমে গেলেন। সোমনাথকে কি কোনও হিসেবেই তাঁর আপনজন বলা যায়? সুতো না ছেঁড়া একটা সম্পর্কের সূত্রে হয়তো যায়, কিন্তু তাতে কোনও নৈতিক সায় পাওয়া যায় কি? তবে তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনদের আপনজন তো বটেই সোমনাথ, সেই হিসেবে হয়তো আপন বলা গেলেও যেতে পারে। এক সময়ে তাঁর জীবনটাকে যত বিষিয়েই দিয়ে থাকুক, তবুও। এটাকে কি ম্যাথমেটিকাল ফ্যালাসি বলে? শূন্যের মান কখনও সসীম হচ্ছে, কখনও অসীম হচ্ছে, কখনও বা শূন্য শূন্যই থাকছে...!

সন্ধে নামছিল। পার্কের কোণে এক আদ্যিকালের ছাতিম গাছ, ডালে ডালে কিচিরমিচির ধ্বনি গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ। পাখিরা কুলায় ফিরছে। স্লাইড দোলনা ঘাসের মাঠ ফাঁকা হচ্ছে দ্রুত, অভিভাবকদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাচ্ছে শিশুরা। একটা দুটো ফুল ফুটেছে আকাশে। তারার ফুল।

শ্রীময়ী বুমবুমকে ঠেললেন,—চল, উঠি।

—উঁউঁউঁ। আর একটু থাকি না দিম্মা।

—কেন রে?

—বাড়ি গেলেই তো হোমটাস্ক করতে হবে।

—তোর পড়তে ভাল লাগে না?

উত্তর দিল না বুমবুম, চুপ করে আছে। শ্রীময়ীর হাতে হাত ঘসছে। কী নরম উষ্ণ হাত! বেশ লাগছে শ্রীময়ীর। সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়েছেন। ঠাণ্ডা পড়ছে, এই সময়ে বাচ্চাদের অসুখ বিসুখ করে খুব।

শ্রীময়ী ঝুঁকে আদর করলেন বুমবুমকে,—বাড়ি চলো সোনা, হিম পড়ছে যে।

ওমনি বুমবুম শ্রীময়ীর কোলে মাথা গুঁজে দিয়েছে, ছোট ছোট হাতে বেষ্টন করে আছে শ্রীময়ীকে। যেন শ্রীময়ীই ঢাল হয়ে হিমকে রুখে দেবেন।

কে কাকে হিম থেকে বাঁচায়! ছোট্ট বুমবুমের পেলব উত্তাপে ভরে যাচ্ছিলেন শ্রীময়ী। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ে গরম লাগছিল বেশ, চাদর নেননি, এই শিশিরভেজা সন্ধ্যায় এতটুকু শীতের অস্তিত্বও আর টের পাচ্ছেন না শ্রীময়ী। ক্ষণপূর্বের বিষণ্ণতাও উধাও, অপার্থিব এক সুখ জাগছে প্রাণে। প্রায় নির্জন পার্ক জ্বালিয়ে দিচ্ছে ঝাড়লণ্ঠন, বুকের গভীরে, অনেক গভীরে।

এই কি বন্ধন! সুখ। নাকি এ মায়া।

দশ

রাত্রে খাবার টেবিলে কথা হচ্ছিল। তিনজনে। সোমনাথের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে। মিতুল পুঙ্খানুপুঙ্খ সমাচার শোনাচ্ছে বাবার, কিছু বাদ পড়ে গেলে সুগত ধরিয়ে দিচ্ছে, মাঝে মাঝে টুকিটাকি প্রশ্ন করছেন শ্রীময়ী। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে সারাক্ষণই সোমনাথের হৃদয়ের মনিটরিং চলছে, গত চব্বিশ ঘণ্টায় আর তেমন কোনও গোলমাল ধরা পড়েনি। স্ট্রোকটা মারাত্মকই ছিল, সোমনাথের হৃৎপিণ্ডের অ্যান্টেরিয়র ওয়ালের পেশি ছিঁড়ে গেছে। ডাক্তারের অভিমত ওই পেশি আপনাআপনি জুড়বে। জুড়ছেও, ওষুধে

বেশ সাড়া দিচ্ছে সোমনাথের হৃদয়। রক্তচাপও এখন সুস্থিত হয়েছে, সুতরাং স্ট্রোকের সম্ভাবনাও কমে গেছে অনেকটা। রক্তে সোডিয়াম পটাশিয়ামের পরিমাণও পরীক্ষা করা হচ্ছে নিয়মিত, এখন তাদের মধ্যে মোটামুটি একটা ভারসাম্য ফিরে এসেছে।

সব মিলিয়ে সোমনাথের অবস্থা এখন ভালর দিকে। যদি এক্ষুনি এক্ষুনি আবার নতুন করে হৃদয়ের ওপর কোনও আক্রমণ না হয়, তবে বেঁচেবর্তেই নার্সিংহোম থেকে ফিরে আসবে সোমনাথ।

দুশ্চিন্তা কিছুটা পরিমাণে লাঘব হওয়ার কারণেই মিতুল এখন বেশ হাসিখুশি। নার্সিংহোম থেকে ফিরে মার জন্য দু-একটা পদ রান্নাও করে ফেলেছে। রুইমাছের ভিন্ডালু, বেগুনভর্তা। দুটোই শ্রীময়ীর প্রিয় আইটেম।

মোটামুটি আগ্রহের সঙ্গেই শ্রীময়ী মেয়ের রান্না পরখ করছিলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলেন,—হ্যাঁ রে, তোর বাবাকে কবে ছাড়বে সে ব্যাপারে কিছু বলল?

—এখন কী! আগে আই সি সি ইউ থেকে তো ছাড়া পাক, কেবিনে যাক, তারপরে তো...

—কাল পরশু বোধহয় কেবিনে শিফট করে দেবে। সুগত মন্তব্য করল,—ডক্টর রাহা তো বলছিলেন আজ রাতটা স্মুথলি কেটে গেলে পেশেন্টকে আই সি সি ইউ থেকে সরিয়ে নেবেন।

—আমার ইচ্ছে বাবা নার্সিংহোমে দিন দশ পনেরো থাক।

—অ্যাদ্দিন?

—হ্যাঁ। বাড়ি ফিরলেই তো আবার শরীরের ওপর অত্যাচার করবে। ওখানে তো আর ট্যাঁ-ফোঁটি চলবে না।

—তা ঠিক। সুগত সায় দিল,—নিয়মে থাকাটাই এ অসুখের একটা বড় চিকিৎসা।

অনেকক্ষণ ধরে একটা চিন্তা পাক খাচ্ছিল শ্রীময়ীর মাথায়। একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললেন,—একটা কথা ভাবছিলাম...বুঝলি...

—কী মা?

—তোর বাবা তো এখন অনেকটাই রিকভার করে গেছে...তাই ভাবছিলাম...আমার দেখতে যাওয়াটা কি খুব জরুরি?

—তুমি যাবে না মা? মিতুলের গলা দিয়ে প্রায় আর্তনাদ ঠিকরে এল।

—কী হবে গিয়ে? মিছিমিছি ভিড় বাড়ানো।

—অদ্দূর থেকে এলে...?

—তখন ঝোঁকের মাথায়, প্লাস অমন একটা ক্রিটিকাল কন্ডিশান শুনে...তুইও কান্নাকাটি করলি...

—আমি যে বাবাকে বলেছি মা, তুমি কাল আসবে! মিতুলের চোখে একই সঙ্গে বিস্ময় আর মিনতি,—প্লিজ মা, কাল একটা বার অন্তত...

একটুক্ষণ মনকে সংহত করে একটা সিদ্ধান্ত গড়েছিলেন শ্রীময়ী, সব কুটোর মতো ভেসে গেল। মেয়ের মুখ চেয়ে এতটা যখন এসেছেন, এটুকুও নয় করলেন। সোমনাথ নামের মানুষটার ওপর এখনও যে তাঁর তীব্র ঘৃণা জমে আছে, লোকটাকে দেখে আদৌ যে তাঁর মায়া জন্মাবে না, উলটে ওই ঘৃণাটাই বেড়ে যাবে বহু গুণ, পুরনো নোংরা দিনগুলো ওই রোগশয্যায় শুয়ে থাকা লোকটার মুখে আয়না হয়ে ভেসে উঠবে, এই সহজ সত্যটা কেন বুঝতে পারে না তার পেটের মেয়ে? কী ভাবছে কী মিতুল? এক দীর্ঘ বিরহের নাটকের মিলনান্তক পরিণতি ঘটবে? ঠিক আছে, শ্রীময়ী নয় চোয়ালে চোয়াল কসেই যাবেন কাল। সারা জীবন কর্তব্যই তো করে গেলেন শুধু, মেয়ে তাঁর হৃদয়টাকে চিনল না।

শ্রীময়ীর মুখ বুঝি ভার হয়েছিল সামান্য, সুগত বুঝি আঁচ করেছে কিছু। সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল,—ওসব ছাড়ো তো। সে মা নয় যাবেনখন কাল। বলেই শ্রীময়ীর দিকে ফিরেছে,—মাঁ, তুতুলের বিয়ে তা হলে সব ঠিকঠাক?

শ্রীময়ী সমে ফিরলেন। স্মিত মুখে বললেন,—মোটামুটি! দুজন ক্যান্ডিডেট শর্টলিস্টেড হয়েছে এখন। একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন বিজনেস-ম্যান। তুতুল যেদিকে ঘাড় হেলাবে, সেদিকেই..

—তুতুলের নিশ্চয়ই বিজনেস-ম্যানকে পছন্দ?

—কেন? মিতুল ফস করে বলে উঠল,—বিজনেসম্যানকে কেন পছন্দ করবে?

—টাকা বেশি বলে। তুতুলকে তো জানি একটু খরুচে টাইপ। বরের হাতে কাঁচা টাকা থাকলে ও বেশি খুশি হবে।

—বাজে কথা। বিজনেসম্যানদের বাড়ির আবহাওয়া অনেক কনজারভেটিভ হয়, তুতুল সেখানে মোটেই স্যুট করবে না। বেচারাকে হয়তো নাচ ফাচ ছেড়ে পুরোপুরি বাড়িতে আটকা পড়তে হবে।

—আহা, সব ফ্যামিলি এক রকম হবে কেন? আজকাল কত বিজনেসম্যান-বাড়ির বউ পারফর্মিং আর্টের স্ফিয়ারে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

—হোক গে। ইঞ্জিনিয়ার পাত্রটাই ভাল। সিকিওরড লাইফের কোনও বিকল্প নেই।

—তোমার সঙ্গে তো আমার মত মিলবে না। তুমি তো কোনও কিছুই রিয়েলিটি দিয়ে দ্যাখো না...। হতে পারে তুতুল তোমার বোন, কিন্তু তার নেচারটা পর্যন্ত তুমি স্টাডি করোনি। ও কোনও কিছুই আঁকড়ে থাকার মেয়ে নয়, নাচ টাচ ও কন্টিনিউ করবে না। সি উইল বি আ পারফেক্ট হাউসওয়াইফ।

—মানে রাঁধাবাড়া আর বাচ্চা তৈরি করার যন্ত্র? তুতুলকে তুমি এই ভাবলে? ছিঃ।

—এটা আমার অ্যাসেসমেন্ট।

—তোমার অ্যাসেসমেন্ট তোমার কাছে রাখো। সব জায়গায় পণ্ডিতি ফলিও না।

এ যে প্রায় ঝগড়া লেগে যাচ্ছে। এ কি খুনসুটি? নাকি এরকমই বাদবিসম্বাদ হয় আজকাল?

শ্রীময়ী হাত তুলে থামালেন দুজনকে। হাসতে হাসতে বললেন,—তুতুলের বিয়ের ভাবনাটা তুতুলের ওপরই ছেড়ে দে না। তোরা মিছিমিছি জল্পনা কল্পনা করে মরছিস কেন?

সুগত শান্ত হয়েছে। জিজ্ঞেস করল—বিয়েটা হচ্ছে কবে নাগাদ? ফাল্গুন? বৈশাখ?

—উহুঁ, বৈশাখ তো নয়ই, ফাল্গুন অব্দিও বোধহয় গড়াবে না। সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে এই মাঘেই...। শ্রীময়ী খাওয়া শেষ করে জলে চুমুক দিলেন,—টানা দিন পনেরোর ছুটি নিয়ে চলে এসো, খুব হই হই হবে।

—মাঘ? আই মিন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি? মনে মনে কী হিসেব করল সুগত,—আমি কি ও সময়ে যেতে পারব?

—না পারার কী আছে? মিতুল ঈষৎ বক্র সুরে বলল,—তোমাদের ইউনিভার্সিটি ছুটি দেয় না, এমন তো শুনিনি।

—তমাল মার্চে পেপার সাবমিট করবে, তার আগে এক থেকে দেড় মাস টানা আমার সঙ্গে বসে সমস্ত ডাটা স্টাডি করবে। আমি চাই না শুধু আমার জন্য ছেলেটার কাজ হ্যাম্পার হোক।

—ফালতু এক্সকিউজ দেখিও না।

—আমি এক্সকিউজ দেখালেই সেটা ফালতু? নিজেও তো কাজ শুরু করেছ, টের পাও না হুটহাট গাইড কেটে পড়লে কতটা প্রবলেম হয়? তোমরা যাও। তুমি বুমবুম...। অবশ্য বুমবুমের তখন অ্যানুয়াল পরীক্ষা এসে যাবে, তুমিও বেশিদিন স্টে করতে পারবে না।

—থাক। বুমবুমের ভাবনা তোমার না ভাবলেও চলবে। কত ছেলেকে নিয়ে ভেবে উলটে যাচ্ছে! মিতুলের মুখ হাঁড়ি হয়ে গেছে,—তুমি তা হলে মাঘ মাস হলে যাবে না?

—দেখি।

—দেখি নয়। যেতে তোমায় হবেই। মনে রেখো, আমাদের বিয়ের পরে এটাই আমাদের পরিবারে প্রথম শুভ কাজ। তুমি সেখানে অ্যাবসেন্ট থাকলে কত কৈফিয়ত দিতে হবে জানো?

—আচ্ছা আচ্ছা, পরের কথা পরে।

—কোনও টালবাহানা করবে না, আমি বলে দিচ্ছি।

মিতুলের কথার ভঙ্গিটা শ্রীময়ীর ভাল লাগছিল না। বড্ড বেশি কর্তৃত্বের সুর যেন। উঠে বেসিনে হাত ধুতে ধুতে জামাইকে দেখলেন ঝলক। সুগত মাথা নিচু করে খাবার খুঁটছে। শাশুড়ির সামনে স্ত্রীর ওরকম আচরণে কি ক্ষুব্ধ হয়েছে সুগত? কোথায় যেন একটা মিলছে না দুজনের, ছন্দ কেটে কেটে যাচ্ছে!

শ্রীময়ী জোরে মাথা ঝাঁকালেন। নিজে ঘরপোড়া গোরু বলেই কি স্বামী স্ত্রীর তুচ্ছ কথা কাটাকাটিও আগুন বলে ভ্রম হয়? সুগত মিতুলের জীবনে অশান্তি আসবে কেন? ওরা তো পরস্পরকে চেনে, জানে,

দীর্ঘদিন মেলামেশার পর বিয়ে করেছে, ওদের জীবনে ভুল বোঝা বুঝির অবকাশ থাকতেই পারে না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা, মানে এখনকার স্বামী স্ত্রী হয়তো এভাবেই কথা বলে। হয়তো এদের মতের অমিল থাকলেও মনের অমিল ঘটে না।

বুমবুম বহুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। মেয়ে জামাই-এর শোওয়ার ঘরের দরজা থেকে বুমবুমকে একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে শ্রীময়ী সোফায় এসে বসলেন। অন্যমনস্ক ভাবে টিভি চালালেন। চ্যানেল বদলে বি বি সি-তে এসেছেন, খবর শুনছেন। বি বি সি-র এই সংবাদপাঠিকার খবর পড়ার ধরনটা শ্রীময়ীকে টানে বেশ। পাশে এসে বসল সুগত মিতুল, তাদের চোখও রঙিন পর্দায়। একটুক্ষণ বসে থেকে মিতুল উঠে গেল শ্রীময়ীর ঘরে, মার বিছানা করে দিয়ে সোজা চলে গেছে নিজের শয্যায়। কাল রাতেও ভাল ঘুম হয়নি, সকাল থেকেও আজ বেশ ছুটোছুটি গেছে, এখন বেচারা সত্যিই ক্লান্ত।

শ্রীময়ীও আর বেশিক্ষণ বসলেন না। এসে শুয়ে পড়েছেন বিছানায়। দরজা ভেজিয়ে। আলো নিবিয়ে। যত্ন করে মশারি টাঙিয়ে দিয়ে গেছে মিতুল। দিল্লিতে তাঁদের এলাকায় মশার তেমন একটা উপদ্রব নেই, ফলত মশারি খাটানোরও অভ্যেস নেই শ্রীময়ীর, এখানে এই নেটের খুপরিতে ঢুকে অস্বস্তি হচ্ছে। তবু শ্রীময়ী চোখ বুজলেন জোর করে, বেশি রাত অবধি জেগে থাকা তাঁর অভ্যেস নেই।

নাহ্, ঘুম আসছে না। দুপুরের শোওয়াটাই বুঝি কাল হল। নাকি এই অপরিচিত বিছানা? খানিকক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ করলেন শ্রীময়ী। মেয়ে পায়েব কাছে একটা পাতলা কম্বল ভাঁজ করে রেখে গেছে, গায়ে টানলেন, আবার সরিয়ে দিলেন। উফ্, বাইরে এখনও কী গাড়িঘোড়ার শব্দ, চোখ বোজে কার বাপের সাধ্যি! বিছানায় উঠে বসলেন, খাটের পাশে টুলে জল রাখা আছে, মশারি থেকে বেরিয়ে কয়েক চুমুক জল খেলেন। গলাটা কেমন শুকনো লাগছিল, একটু আরাম হল। আবার মশারিতে ফিরতে যাবেন, তখনই মনে পড়ে গেল, দাদাকে তো ফোন করা হল না? এখন করবেন? কটা বাজে এখন?

শ্রীময়ী আলো জ্বাললেন। এগারোটা দশ। ফোন এখন একটা করাই যায়। চিত্তরঞ্জন পার্কের বাড়ি বারোটার আগে নিঝুম হয় না। দাদা হয়তো টেনশানে থাকবে...। তা ছাড়া কথা যখন দিয়ে এসেছেন, ফোন করাটা তাঁর কর্তব্য।

ড্রয়িংস্পেসে এসে কেজো ফোনটা সেরে ফেলে নিশ্চিন্ত বোধ করলেন শ্রীময়ী। বাথরুমে গেলেন একবার, অভ্যাস মতো। ফেরার সময়ে চোখে পড়ল স্টাডির দরজা আধভেজানো, ভেতরে আলো জ্বলছে।

কী ভেবে শ্রীময়ী পায়ে পায়ে স্টাডির দোরগোড়ায় এলেন। হুট করে কারুর ঘরে ঢুকে পড়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না তিনি, সামান্য ইতস্তত করে আলতো টোকা দিলেন দরজায়।

উঠে এসেছে সুগত। শ্রীময়ীকে দেখে হঠাৎ চমকিত যেন,—আপনি ঘুমোননি এখনও?

শ্রীময়ী অপ্রতিভ মুখে হাসলেন।

সুগত ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ল,—আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।

ঘরটা ছোটই। বড় জোর দশ বাই আট। দুটো স্টিলের র‍্যাক দু দেওয়ালে, দুটোই বইএ ঠাসা। আসবাব সামান্যই। একটা টেবিল, একটা চেয়ার, আর একটা বেতেব আরামকেদারা। টেবিলে স্তূপ হয়ে আছে বই, সুদৃশ্য টেবিলল্যাম্প আর টাইমপিসখানা কোনওক্রমে তাদের মাঝে স্থান করতে পেরেছে। সাদা কাগজে কিছু বোধহয় লেখালেখি করছিল সুগত, খোলা ডটপেন গড়াগড়ি খাচ্ছে পাতার ওপর।

শ্রীময়ী বেতের চেয়ারটায় বসলেন। ঠোঁট টিপে বললেন,—তোমায় ডিসটার্ব করলাম তো?

—না না। জানেনই তো, আমি একটু নিশাচর টাইপ। সাড়ে বারোটা একটার আগে ঘুম আসে না। তাই একটু বইখাতা নিয়ে...। সুগত ডটপেন খাপে বন্ধ করে সরিয়ে রাখল,—তারপর বলুন, কেমন লাগল আমাদের পাড়া?

—আবার আমাদের?

—বাহ্, বাস করছি, আমাদের বলব না? সুগত মিটিমিটি হাসছে,—দেখলেন ঘুরে ফিরে?

—ওই বুমবুম আমাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে পার্ক অব্দি নিয়ে গেল আর এল...ওইটুকুই যা দেখা। যাই বলো বাপু, তোমাদের কলকাতা বড় কনজেস্টেড।

—হ্যাঁ, লোক বাড়ছে, জায়গা বাড়ছে না। আনপ্ল্যানড গ্রোথ।...ওই দরিয়াগঞ্জ কারোলবাগের মতো আর কি।

শ্রীময়ী আলগা চোখ বোলালেন ঘরে। বইপত্র একটু বেশি এলোমেলো। মিতুল যথেষ্ট পাকা গৃহিণী, সে কি এ ঘরটা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পারে না? ঝাড়পোঁছও ভাল করে হয় না মনে হয়, ধুলোও আছে বেশ। কোনও মানে হয়!

আনমনেই শ্রীময়ী বললেন,—তোমার একটা প্রোজেক্ট চলছে বলছিলে না? কীসের প্রোজেক্ট?

—রিগার্ডিং লিটারেসি। মানে ঠিক লিটারেসি নয়, সাক্ষরতার সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক। মানে ঠিক তাও নয়, নারী সাক্ষরতা বৃদ্ধির সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা সম্পর্ক.. । ঠিক এটাও নয়। যেখানে পুরুষের সাক্ষরতার হার মোটামুটি কনস্ট্যান্ট, সেখানে নারী সাক্ষরতাবৃদ্ধি কী ভাবে জনসংখ্যাকে অ্যাফেক্ট করছে, আবার যেখানে নারী সাক্ষরতার হার কম, সেখানে শুধুই পুরুষের সাক্ষরতা বাড়িয়ে সরকারের ফ্যামিলি প্ল্যানিং কর্মসূচি কতটা সাকসেসফুল হতে পারছে, এদুটোর একটা তুলনামূলক স্টাডি...। বেশ গুছিয়ে বসেছে সুগত। দারুণ মনোযোগী ছাত্রীকে ক্লাসের পড়া বোঝাচ্ছে, এমনই তার মুখ চোখ। হাত পা নেড়ে বলেই চলেছে,—অর্থাৎ ধরুন কিনা একটা গ্রামে পুরুষের সাক্ষরতা তেত্রিশ পারসেন্ট, নারী লিটারেসি আঠারো পারসেন্ট, তার ঠিক পাঁচ মাইল দূরে আর একটা গ্রাম, সেখানে পুরুষসাক্ষর চৌত্রিশ পারসেন্ট, কিন্তু নারীসাক্ষর আঠাশ পারসেন্ট। এই দুটো গ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে ক্লিয়ারকাট ডিফারেন্স আছে। আবার বিপরীত দিক দিয়ে দেখতে গেলে...

শ্রীময়ীর মুখভাব দেখে কিছু বুঝি অনুমান করল সুগত, বোকা বোকা মুখে হাসছে। ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল,—খুব বোরিং, না?

শ্রীময়ী একটু পরিহাসের লোভ সামলাতে পারলেন না। হাসতে হাসতে বললেন,—হ্যাঁ, রাত সাড়ে এগারোটা বারোটার সময় শাশুড়িকে বোঝানোর পক্ষে একটু তো বোরিং বটে।

—সরি সরি। আমি বড্ড বেশি বকে ফেলি।

—না, না, ঠিক আছে। কোনও একটা কাজ সিরিয়াসলি করলে সেটা নিয়ে আলোচনা করার সময়ে একটু তো উৎসাহ আসবেই। সেটাই স্বাভাবিক। শ্রীময়ী চেয়ারে হেলান দিলেন,—যাই বলো বাপু, কাজটা কিন্তু তোমার বেশ জটিল। এত সব ডাটা পাচ্ছ কী করে?

—খুব খাটতে হচ্ছে। আমার রিসার্চ স্কলার নিজেও খুব পরিশ্রম করছে। তিনজন ইনভেস্টিগেটার রেখেছি, তারাও গ্রামে গ্রামে ঘুরছে...। ইউনিসেফের প্রোজেক্ট, বাই জুন শেষ করতেই হবে। সুগতর মুখে হঠাৎ একটা ছায়া পড়ল,—সেই জন্যই তো মিতুলকে বলছিলাম এই সময়টা আমার পক্ষে কলকাতা থেকে নড়া খুব কঠিন।

—ভাল করে বোঝাও মিতুলকে।

—ও বুঝতে চায় না। সুগতর ছোট্ট একটা শ্বাস পড়ল যেন,—কতগুলো ব্যাপারে মিতুল এত রিজিড, এত আনরিজনেবল্...

সুগত আরও কী বলতে গিয়েও থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে নেমে এসেছে এক চরম নৈঃশব্দ্য। টেবিলের ওপর রাখা টাইমপিস টিকটিক শব্দ করে চলেছে শুধু। ধ্বনিটা প্রতি মুহূর্তে দ্বিগুণ হচ্ছে, চতুর্গুণ হচ্ছে, বাড়ছে ক্রমশ, শ্রীময়ীর কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। তবু নিস্তব্ধতা কাটছে না।

বিকট শব্দ তুলে ট্রাক চলে গেল বাড়ির সামনে দিয়ে। রাতটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে। ওই শব্দটুকুরই বোধহয় প্রয়োজন ছিল এখন।

শ্রীময়ী অনুচ্চ স্বরে বলে উঠলেন,—তোমার মনে কি কোনও ক্ষোভ জমেছে সুগত?

সুগত চুপ করে রইল।

শ্রীময়ী গলা আরও নামালেন,—আমি শুধু মিতুলের মা নই সুগত, তোমারও মা। মিতুল কি তোমায় হার্ট করছে? তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পারো।

সুগত দু দিকে মাথা নাড়ল,—না, তেমন কিছু নয়। এটা একটা পাসিংথট। আমরা ঠিক আছি।

শ্রীময়ী আর কথা বাড়ালেন না। দরজায় পৌঁছে থামলেন একটু। মৃদু শ্বাস পতনের শব্দ পেলেন কি? নাকি কানের ভুল?

বিছানার অন্ধকারে ডুবতেই এতাল বেতাল চিন্তা ঝাঁপিয়ে এল শ্রীময়ীর মাথায়। সুগত আর মিতুলের মধ্যে কি দূরত্ব তৈরি হয়েছে কোনও? নিশ্চয়ই হয়েছে। নিশ্চয়ই কোনও রন্ধ্রপথে ঢুকে পড়েছে ভুল বোঝাবুঝির বীজ। কী হতে পারে কারণ? সুগতকে বাবা মা ছেড়ে মিতুলের জনাই চলে আসতে হয়েছে, তাই নিয়ে সুগতর মনে মেঘ জমতেই পারে, যতই হোক সে'ও বাবা মার একমাত্র ছেলে। বেয়াই বেয়ানও সুগতকে যথেষ্ট মিস করেন। নাকি সোমনাথকে নিয়ে একটু বেশি আহ্লাদিপনা করছে মিতুল, যা সুগতর আদৌ পছন্দ নয়? যাক গে মরুক গে, মেয়ে জামাই-এর সমস্যা নিয়ে বেশি মাথা না ঘামানোই ভাল। এমনিতেই মনটা খচখচ করছে। সুগতকে প্রশ্নটা না করলেই হত। সুগত হয়তো ভাবতে পারে, কদিনের জন্য এসে শাশুড়ি একটু বেশিই কৌতূহল দেখাতে শুরু করেছেন! তিনি নিজে একজন সংসারভাঙা নারী, তাঁর পক্ষে এটা বোধহয় শোভনও নয়।

এতক্ষণে দু চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে ঘুমে। এক সময়ে ঘুমটা ভেঙেও গেল। এই বয়সে রাতে টানা ঘুম হতে চায় না, বেশ কয়েকবার বাথরুম ছুটতে হয়। আলো জ্বাললেন না শ্রীময়ী, নিকষ অন্ধকার হাতড়ে বেরিয়েছেন ঘর থেকে।

ঘুম মাখা চোখ গেঁথে গেল স্টাডির দরজায়। এখনও আলো জ্বলছে।

আবার একটা শ্বাস পতনের শব্দ শুনতে পেলেন শ্রীময়ী। নিজের।

এগারো

দেশলাই খোলের মতো বাড়িটা চারতলা উঠে গেছে। নার্সিংহোম। বাড়িটার বহিরঙ্গ দিব্যি ঝকঝকে, দেখে মনে হয় চিকিৎসাপাতি এখানে ভালই হয়। একতলায় দর্শনার্থীদের জন্য ছোট্ট লাউঞ্জ, তার এক পাশে রিসেপশান কাউন্টার, অন্য পাশে অফিস। রিসেপশান কাউন্টারে টেলিফোন আর ল্যাপটপ সহ দুই সুবেশা তরুণী। ঠোঁটে তাদের মাপা হাসি, মাপা আগ্রহ, মাপা ঔদাসীন্য, মাপা লিপস্টিক। মাথায় সাদা টুপিধারী সেবিকাদেরও চকিত দর্শন মিলছে। তাদেরও মুখমণ্ডলে অপার্থিব নির্লিপ্তি। লাউঞ্জে ভালই ভিড়, ফাইবার গ্লাসের চেয়ার সব টইটুম্বুর।

খানিকক্ষণ লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে থেকে শ্রীময়ী রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। থোকা থোকা ভিড়ের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকতে কেমন বিশ্রী লাগে। মনে হয় সকলে যেন হাঁ করে তাকেই দেখছে। বাইরে এসেও পুরোপুরি স্বস্তি নেই, এখানেও যথেষ্ট লোকজন দাঁড়িয়ে। তবে নার্সিংহোমটা একদম মেন রোডের ওপর নয়, সামনের রাস্তা ভালই চওড়া, অ্যাম্বুলেন্স বা শববাহী শকট ঢোকার কোনও অসুবিধে নেই, এমন জায়গায় ভিড় থাকলেও নিভৃতি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়। গেট থেকে বেশ খানিকটা সরে এলেন শ্রীময়ী। কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পর পর, ফাঁকে ফোকরে টুকরো জটলা, উদ্বিগ্ন স্বরের চাপা গুঞ্জন। শ্রীময়ী এদিক ওদিক দেখছিলেন, একটু বিস্ময় নিয়েই। চারদিকে এত লোক, এত ভিজিটার, এর মধ্যে সোমনাথের বাড়ির কেউ নেই? সোমনাথদের জ্ঞাতিগুষ্টি তো কম নয়, জাড়তুতো খুড়তুতো মামাতো পিসতুতো ভাই বোন দাদা ভাগ্নে ভাইপো ভাইঝি শহরময় ছড়ানো, তাদের একজনও আসেনি? সোমনাথ কি সবার সঙ্গেই সম্পর্ক খারাপ করে ফেলেছিল? নাকি এসেছে কেউ কেউ? শ্রীময়ী চিনতে পারছেন না তাদের? খুবই সম্ভব। মাঝে গঙ্গা বেয়ে তো কম জল বয়ে গেল না! কিন্তু তারা এসে থাকলেও শ্রীময়ীকে কি চিনতে পারছে কেউ? কোনও আড়াল থেকে ড্যাবডেবিয়ে দেখছে না তো?

ভাবতেই আবার বিজবিজে অস্বস্তি। মিতুলটা সেই কখন ওপরে গেছে এখনও ফেরে না কেন? সকালে মিতুল নার্সিংহোম ঘুরে গিয়ে বলল বাবার কন্ডিশান একই রকম, তবে আই সি সি ইউ থেকে আজই বের করছে না। ডাক্তার বিকেলে ভিজিটার অ্যালাও করবে বটে, কিন্তু একবারে একজনের বেশি কিছুতে নয়।...বাবার সামনে গিয়ে কি বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে গেল মিতুল? নাকি আবার কোনও গণ্ডগোল হল সোমনাথের? এসব রুগির কিছু বলা যায় না। এই ভাল, তো এই খারাপ। কেমিস্ট্রির সরোজিনী সহায়ের হাজব্যান্ড তো স্ট্রোকের পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গিয়েছিল, গাড়ি ফাড়ি নিয়ে সরোজিনী যেদিন বরকে হাসপাতাল থেকে আনতে গেল সেদিনই দুপুরে আবার পর পর দুটো অ্যাটাক

হয়ে...!

উহুঁ, কু গাওয়া ঠিক নয়। শ্রীময়ী ধমকালেন নিজেকে। সোমনাথ বাঁচুক, আরও অনেক দিন বাঁচুক। নিজের মতো করে বেঁচে থাক।

আলো মরে আসছে। সন্ধে ডানা মেলছে শহরে। ইট কাঠের জঙ্গলেও একটা দুটো পাখি উড়ছে এদিক সেদিক, নীড়ে ফিরছে। বাতাস বইছে অল্প অল্প। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া, তবে তেমন কামড় নেই।

এদিক ওদিক দৃষ্টি ফেরালেন শ্রীময়ী। সাদা অ্যাম্বাসাডারের বনেটের সামনে এসে চোখের মণি থেমে গেল সহসা। অবনত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন এক মহিলা, নার্সিংহোমের ঠিকরে আসা আলো পড়েছে মহিলার মুখে, কোনাকুনি ভাবে। কেমন যেন চেনা চেনা লাগে না? হ্যাঁ, মনুই তো। আশ্চর্য, মাত্র সাত আট হাত তফাতে দাঁড়িয়ে, অথচ শ্রীময়ী এতক্ষণ লক্ষই করেননি! আগে থেকেই ছিল? না, এই এসে দাঁড়াল? কী চেহারা হয়েছে মনুর! ঝিরকুটে! মাথাভরা সাদা চুল...! এত বুড়িয়ে গেছে মনু? মনু তো মোটামুটি তাঁরই সমবয়সি ছিল, বনেদি বাড়ির মানুষদের সেবা করতে করতে এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল?

মনু কি দেখতে পেয়েছে শ্রীময়ীকে? মনে হয় না। কেমন অকম্পিত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে মনু, কোনও দিকে তাকাচ্ছেই না। শ্রীময়ী কি যেচে গিয়ে কথা বলবেন? পা সরতে চাইছে না। কোথ্থেকে এক অচেনা সংকোচ এসে বাধা দিচ্ছে শ্রীময়ীকে। অর্থহীন। অর্থহীন। হাজার মাইল ঠেঙিয়ে তিনি কলকাতা আসতে পারলেন, মনুকে তাঁর কীসের লজ্জা?

কুণ্ঠা কাটিয়ে গাড়িটার সামনে এলেন শ্রীময়ী। নিচু গলায় বললেন,—কেমন আছ মনু?

মনু অর্থাৎ মনোরমা চমকে তাকিয়েছেন। একটুক্ষণ মুখটা হাঁ হয়ে রইল। আস্তে আস্তে একটা পাতলা হাসি ফুটে উঠেছে মুখে,—ফুলবউদি!

—চমকালে যে? মিতুল বলেনি আমি এসেছি?

—বলেছিল। মনোরমা সামলে নিলেন নিজেকে,—কেমন আছ ফুলবউদি?

বার বার ফুলবউদি সম্বোধনটা কানে লাগছিল শ্রীময়ীর, তবু স্মিত মুখে বললেন,—ভাল আছি।

মনোরমা আর কথা খুঁজে পেলেন না, প্রশ্নও না। বোধহয় এই মুহূর্তে আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকেও না।

বনেদি বাড়ির আশ্রিতাকে একটু ধাক্কা দিতে ইচ্ছে হল শ্রীময়ীর। বললেন,—সোমনাথকে দেখে এসেছ?

মনোরমা কি বিস্মিত হলেন? শ্রীময়ীর অবলীলায় স্বামীর নাম ধরে ডাকায়?

প্রতিক্রিয়াটা ঠিক বুঝতে পারলেন না শ্রীময়ী।

মনোরমা বললেন,—যাব দেখতে। এই তো এলাম।...আজ একটু দেরি হয়ে গেল।

শ্রীময়ী আর একটু প্রগলভ হলেন,—তুমিই তো এখন সোমনাথের গার্জেন, তাই না?

—ঠাট্টা করছ? মনোরমার মুখটা শুকিয়ে গেল। ম্লান হেসে বললেন,—ভাত কাপড়ের বিনিময়ে ফুলদার দেখভাল করি, সেবা শুশ্রূষা করি। একে গার্জেনি বলে না।

বাহ্, অনেক কথা ফুটেছে তো!

শ্রীময়ী জিজ্ঞেস করলেন,—তা এমনি আছ কেমন?

—আমার আর থাকা!...যেমন দেখছ।

—চুলগুলো সব পাকিয়ে ফেললে কী করে? ফুলদার ঘরে খাটতে খাটতে?

মনোরমা নিরুত্তর।

—মেজো তরফ থেকে এদিকে চলে এসেছ যে? ঝামেলা ঝঞ্ঝাট হয়েছিল্ কিছু?

—কেন, মিতুল তোমায় কোনওদিন কিছু বলেনি?

হ্যাঁ বলবেন, কি না বলবেন, ভাবতে একটু সময় নিলেন শ্রীময়ী। যদি না বলেন তা হলে কি তাঁর সঙ্গে মিতুলের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা নেই বলে মনে করবে মনু? আর হ্যাঁ বললে তো প্রশ্নটাই অর্থহীন হয়ে যায়।

মনোরমা অবশ্য উত্তরের অপেক্ষা করলেন না। ভার ভার গলায় বললেন,—সে অনেক ইতিহাস।

কী দুঃস্বপ্নের কাল যে গেছে! তুমি চৌধুরীবাড়ি ছেড়ে চলে গেলে, তার পরের বছর...নাকি তারও পরের বছর হঠাৎ কোথ্থেকে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন এসে উপস্থিত। বড় ভাশুর, আর এক দেওর। কী? না আমাকে তারা সসম্মানে তাদের পরিবারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কোথ্থেকে নাকি শুনেছে মামার বাড়িতে দাসীবাঁদির মতো আমার জীবন কাটছে, তাতে তাদের নাকি মানে লেগেছে...মরা ভায়ের বউকে এবার তারা মাথায় করে রাখবে। তখনই মেজোমামা পইপই করে বারণ করেছিল, যাস্ না...। ভালবাসা থেকে বলেনি অবশ্য। বিনি মাইনের ঝি চলে যাচ্ছে...! সেজদা রাঙাদাও বলেছিল, যাচ্ছ যাও, তবে পরে পস্তালে আর আমাদের কাছে কাঁদতে এসো না।...।

—তা সেখানে টিঁকতে পারলে না কেন?

—কপালের গুণে। মনোরমা একটা লম্বা শ্বাস ফেললেন,—তারাও তো আর সত্যি সত্যি ভালবেসে নিয়ে যায়নি ফুলবউদি, বিষয় স্বার্থের খাতিরে আমাকে তাদের প্রয়োজন হয়েছিল। কদিন খুব যত্নআত্তি করল, আমিও সুখে গলে যাচ্ছি...ওই সময়ে আমাকে দিয়ে কী সব কাগজপত্র সই করিয়ে নিল। পরে জানলাম, আমার স্বামীর ভাগটা আমাকে দিয়ে দানপত্র করিয়ে নিয়েছে।

—হুম্। তারপর তারাও আবার দাসী বানিয়ে ফেলল, তাই তো?

—তা হলেও নয় সেখানে টিঁকে থাকতাম।...তাও কপালে জুটল না। শুরু হল অন্যরকম অত্যেচার। বোঝো তো...তখন তো আমার যৌবন আছে...রোজ রাতে দরজায় ধাক্কা পড়ছে! খুড়তুতো দেওর এসে হামলাচ্ছে, নিজের সেজো ভাশুর পর্যন্ত...সে আমি মুখে আনতে পারব না ফুলবউদি। এক রাতে মরিয়া হয়ে ট্রেন ধরে এক বস্ত্রে কলকাতায়। সারা রাত শেয়ালদা স্টেশনে বসে কেঁদেছি আর ভেবেছি কোথায় যাই, কী করি...। শেষে আলো ফুটতেই কপাল ঠুকে ফের ভবানীপুর। মেজমাইমা তো দেখে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, শেয়াল কুকুরের মতো, তখন বড়মাইমাই ডেকে...

—বড়মাইমা? শ্রীময়ী শিহরিত,—মানে সোমনাথের মা?

—হ্যাঁ, ফুলবউদি। তিনিই। আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখের কোণটা মুছলেন মনোরমা,—তুমি চলে যাওয়ার পর বড়মাইমা অনেক বদলে গেছিলেন। বোধহয় ভাবতে পারেননি তুমি সত্যি সত্যি গালে চড় মেরে চলে যেতে পারো। সে হাঁকডাকও আর ছিল না, কেমন যেন ধন্দ মেরে গেছিলেন। বড়মামা তোমার আর ফুলদার কাগজপত্রে ছাড়ান কাটানের জন্য খুব উঠেপড়ে লেগেছিলেন এক সময়ে, মাইমার আপত্তির জন্যই।...মাইমা বলতেন, সে যদি নিজে থেকে না চায়, তোমরা জোর করে সম্পর্কটা ভাঙবে কেন? মেয়েমানুষের ফেরার একটা রাস্তা থাকা ভাল।

শ্রীময়ী নিথর হয়ে গেলেন। কোন মানুষ কখন যে কীরকম বুঝে ওঠা সত্যিই বড় কঠিন। যাঁকে এক সময়ে অবিমিশ্র দানবী বলে মনে হত, তাঁর মধ্যেও ন্যায় অন্যায় বোধ ছিল তা হলে!

মনোরমা আবার বলে উঠলেন,—তা হলে বলো, এত ঝড়ঝাপটার পরেও আমার শরীরে কোনও লয় ক্ষয় হবে না? আমার তো তোমার মতো পেটে বিদ্যেও ছিল না, মনের জোরও না। আমাদের তো অন্যের দয়ায় বেঁচে থাকাটাই নিয়তি।

শ্রীময়ী নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন। বটেই তো।

—আমার কথা ছাড়ো ফুলবউদি, তোমার কথা বলো। মনোরমার চোখে সম্ভ্রম,—তুমি তো এখন অনেক উঁচুতে উঠে গেছ। কলেজে পড়াচ্ছ, ফ্ল্যাট কিনেছ, একার জোরে ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দিলে...

—মেয়ের বিয়ে দেওয়াটা আমার কর্তব্য ছিল।

—না না, কর্তব্য বোলো না ফুলবউদি, কটা মা তোমার মতো পারে? তোমার গল্প শুনলে আমার মাথাটাও উঁচু হয়ে যায়, চোখে জল আসে।

—কার কাছে শোনো?

—কেন? মিতুল। মেয়ের তো মা ছাড়া মুখে কোনও কথা নেই। আমার মার মতো মা হয় না, এত কষ্ট করেছে, এত পরিশ্রম করেছে...! মিতুলের মুখে তো শুধু ঘুরে ফিরে তোমারই নাম।

সত্যি বলছে মনু? শ্রীময়ীর গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যেই বা বলবে কেন? তাঁকে খুশি করার তো কোনও দায় নেই মনুর! মেয়ে মুখে কিছু বুঝতে না দিলেও ঠিকই তবে উপলব্ধি করেছে মার আজীবনের সংগ্রাম! শ্রীময়ীর সব শ্রম সার্থক। বেঁচে থাকারও বুঝি একটা মানে খুঁজে পাওয়া

গেল। যে বাড়ি থেকে মা একদিন অপমানিত হয়ে বেরিয়ে এসেছে, সেই বাড়িতে মাকে একটা উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠিত করা—এর চেয়ে বড় প্রতিদান আর কী দিতে পারত মিতুল?

মনটা অনেক নির্ভার হয়ে গেছে শ্রীময়ীর। সহজ গলায় বললেন,—তা এখন তো অনেকটা থিতু হয়েছ? আর তো ঘর হারানোর, আশ্রয় হারানোর ভয় নেই, এবার তো একটু শরীর টরিরের দিকে নজর দিতে পারো।

—নিজেকে দেখব, না ফুলদাকে সামলাব?

—বকা ঝকা করো, শাসন করো।

—শোনে নাকি কিছু! মেয়েই এসে সামাল দিতে পারে না! মনোরমা ফ্যাকাসে হাসলেন,—কিছু মনে কোরো না ফুলবউদি, তুমি আর ফুলদা একই ধাতুতে গড়া। তোমাদের কারুরই জেদ কম নয়। টের তো পাই, তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে ফুলদাও ভেতরে ভেতরে পুড়েছে খুব। মুখে তো মরে গেলেও প্রকাশ করবে না...শরীরটাও আস্তে আস্তে ঝাঁঝরা হয়েছে।...ডাক্তারের বারণ মানে না, ঠিক মতো ওষুধ খায় না...। বুঝিয়ে বলতে গেলে হাসে। বলে, মনু বেঁচে যে আছি এটাই তো যথেষ্ট। মনোরমা এক সেকেন্ড থামলেন, ভাবলেন কী যেন। তারপর বললেন—পুরুষমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের কাছে হারতে হয়েছে, এ ঘা কি ফুলদার ইহজীবনে শুকোবে! তাও আবার যে সে পুরুষ নয়, ভবানীপুরের চৌধুরীবাড়ির পুরুষ।

এতকাল চৌধুরীবাড়ির অন্ন খেয়েও এখনও সে বাড়ির লোকের ওপর চোরা ঘৃণা রয়ে গেছে মনুর! কারণটা শ্রীময়ী ঠিক বুঝতে পারলেন না। বঞ্চিতা নারী বলে? নাকি এ মেয়েমানুষের স্বাভাবিক স্বাজাত্যবোধ?

কথা বলতে বলতেই মনোরমা হঠাৎ নড়েচড়ে উঠেছেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে শ্রীময়ী দেখতে পেলেন মিতুলকে, ইতিউতি খুঁজছে তাঁদের।

মনোরমাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এলেন শ্রীময়ী। মিতুল বলে উঠল,—কোথায় ছিলে? কখন থেকে খুঁজছি!

—এই তো, তোর মনুপিসির সঙ্গে গল্প করছিলাম।

—যাও, তাড়াতাড়ি ঘুরে এসো। তোমার পর মনুপিসি যাবে।

—সোমনাথকে বলেছিস আমি আজ এসেছি?

—হুঁ।

—শুনে কী বলল?

—আহ, তুমি যাও না। ভিজিটিং আওয়ার বেশিক্ষণ নেই।...আই সি সি ইউ একেবারে টপ ফ্লোরে। হেঁটে উঠো না, লিফটে যাও।

ভেতরে ভেতরে হঠাৎ কেমন নার্ভাস বোধ করছিলেন শ্রীময়ী। বাইরে অবশ্য সেটা প্রকাশ হতে দিলেন না, কোলাপসিবল্ গেটে দাঁড়ানো দারোয়ানকে কার্ড দেখিয়ে ঢুকছেন। অসতর্ক মুহূর্তে ঘাড় ঘুরে গেল। দেখলেন মিতুল গেছে কাউন্টারে, ঝুঁকে কথা বলছে রিসেপশনিস্টের সঙ্গে, ভ্যানিটিব্যাগ থেকে কাগজ বার করে কী সব টুকে নিচ্ছে। নার্সিংহোমের বিল মিতুলরাই মেটাচ্ছে নাকি? ছি ছি, সোমনাথের কি এতই হীন দশা এখন! বাপ মরার পর নিজে নিজে প্র্যাকটিস আর তেমন জমাতে পারেনি বোধহয়। বোধহয় কেন, তাইই। বাবুর তো যত বাক্যবাণ শুধু বাড়িতেই ছুটত, এজলাসে দাঁড়ালে তো তোতলাতো সোমনাথ। শ্বশুরমশাই এ নিয়ে কম গালাগাল করতেন ছেলেকে! পাঁঠার বেহদ্দ পাঁঠা, আমি মরে গেলে তো শুধু এফিডেভিট করে খেতে হবে! যত দূরবস্থাতেই পড়ুন না কেন, শ্রীময়ী কক্ষনো মেয়ে জামাই-এর হাততোলা হয়ে থাকবেন না। সাধে কি আত্মীয়স্বজনরা কেউ আসছে না। নির্ঘাৎ টাকা খসানোর ভয়ে। বেচারা মনু, শেকলে আটকা পড়ে গেছে তাই...। অবশ্য বাবা অসুস্থ বলে মিতুলের এটা সাময়িক সাহায্যও, হতে পারে। সোমনাথ সেরে উঠে হয়তো সব মিটিয়ে দেবে। চৌধুরী পরিবারের আত্মসম্মানজ্ঞানের দেখনদারি তো কম নয়!

চিন্তা জুড়ে জুড়ে অন্যমনস্ক হয়ে থাকা শ্রীময়ী লিফটে উঠেছেন, নামলেন চারতলায়। সহসা

হাঁটুর জোর নিঃশেষ। রাগ অভিমান দুঃখ ঘৃণা প্রেম সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। একটু বুঝি শ্বাসকষ্টও অনুভব করলেন শ্রীময়ী। এ বাড়ির চারতলায় কি অক্সিজেন কম?

শ্রীময়ী কি এগোবেন আর? না নেমে যাবেন?

বারো

নার্সিংহোমের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটটা তেমন বড় নয়। মাত্র গোটা ছয়েক বেড, ঘন হরিৎ পর্দা দিয়ে দিয়ে পৃথক করা। প্রতিটি বিছানায় মাথার কাছে মনিটারিং মেশিন, হালকা সবুজ তরঙ্গ দুলে দুলে উঠছে পর্দায়। অক্সিজেন স্যালাইন গ্লুকোজ কত কী চলছে রুগিদের। ব্যস্ত মুখে নার্সরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সাদা অ্যাপ্রন জড়ানো জনা দুয়েক ডাক্তারও।

কাচের দরজা ঠেলে শ্রীময়ী পা রাখলেন ঘরটাতে। সঙ্গে সঙ্গে এক তীব্র ঠাণ্ডার অনুভূতি। এসি মেশিন ভয়ানক চড়ায় চলছে। ঘরময় চাপা উগ্র ঝাঁঝ। ওষুধের।

জোরে শ্বাস টেনে শ্রীময়ী বাতাস ভরার চেষ্টা করলেন ফুসফুসে, নিজেকে স্থিত করলেন। যৌবনের চাপল্য তাঁকে শোভা পায় না, তিনি এখন এক পরিণতবয়স্কা নারী। এমন নারী, যে জীবনের বেশিটা পথ একলাই হেঁটেছে।

কয়েক পা এগোলেন শ্রীময়ী, শয্যাগুলোর দিকে তাকালেন। সামনে এই ছ ছজন রুগির মধ্যে কোন জন সোমনাথ? সবাইকেই এক রকম লাগছে যে! যেন পরোয়ানা পাওয়া ছয় আসামী শুয়ে আছে চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায়।

—শ্রীময়ী...!

ক্ষীণ ডাক শুনে শ্রীময়ী চমকে তাকালেন। কোন বেড থেকে এল স্বরটা? দু নম্বর থেকে? আর একটু এগোলেন শ্রীময়ী। এইটেই কি সোমনাথ?

আবার ডাক উড়ে এল,—ময়ী...!

ঘুরলেন শ্রীময়ী। একটা দুর্বল হাত উঠছে একটা বিছানা থেকে, ডাকছে। ওইটেই কি সোমনাথ?

শ্রীময়ী নিষ্পলক। এ কে? কোন সোমনাথ? জীর্ণ চেহারা, কোটরগত চোখ, গালময় খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি, মাথার চুল প্রায় নেই বললেই চলে, টকটকে ফর্সা রঙে কালচে বাদামি প্রলেপ—এই লোকটাকে কি তিনি চিনতেন কোনওদিন?

নাহ্, দু যুগ আগের সেই সোমনাথের সঙ্গে এই সোমনাথকে দূরকল্পনাতেও মেলানো যায় না। যাকে ছেড়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন, সে এই সোমনাথ নয়।

সোমনাথের হাত শ্রীময়ীর করতল চেপে ধরেছে,—তুমি এসেছ তবে? আমি ভাবতে পারিনি...আমি বিশ্বাস করতে পারছি না...

আশ্চর্য, সব অস্থিরতা, এ কদিন ধরে বুকের মধ্যে অহরহ চলতে থাকা অসহ্য টানাপোড়েন পলকে উবে গেছে শ্রীময়ীর। তিনি এখন পুরোপুরি স্থিত। হাতে ধরা হাতের চাপটা অনুভব করতে পারছেন, কিন্তু কোনও অনুভূতিই জাগছে না। উলটে অদ্ভুত এক নির্লিপ্তি ছেয়ে ফেলছে হৃদয়। নাহ্, এই সোমনাথের সঙ্গে তাঁর কোনও লড়াই ঝগড়া নেই।

কোনও ঘৃণা নেই। বিদ্বেষ নেই। ঈর্ষা নেই।

নাহ্, এই সোমনাথের জন্য তাঁর কোনও ভালবাসাও নেই।

করুণা? মমতা? তাও নেই।

সোমনাথ দুর্বল স্বরে বললেন,—দেখো, আমি এবার ঠিক ভাল হয়ে যাব।

—নিশ্চয়ই ভাল হবে। কী এমন হয়েছে?

একদম সহজ গলায় কথাটা বললেন শ্রীময়ী। বোধহয় পাশের বেডের রুগির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেও এখন এই কথাই বলতেন। তাপহীন শীর্ণ হাতখানা অতি সন্তর্পণে নামিয়ে দিলেন রুগির বুকে।

শান্ত মুখে বললেন,—বেশি কথা বোলো না। বিশ্রাম নাও।

—তোমাকে কাছে পাব বলেই বোধহয় এটা ঘটে গেল, ময়ী।

সম্বোধনটা ছুঁতেই পারল না শ্রীময়ীকে। চুপ করে রইলেন।

সোমনাথ আবার বললেন,—এখন থাকছ তো কলকাতায়?

—দেখি।

সোমনাথ আবার কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, শ্রীময়ী ঠোঁটে আঙুল রাখলেন,—চুপ। তোমার এখন কথা বলা বারণ।

—আজকের দিনেও চুপ থাকব?

শ্রীময়ীর নিরাসক্ত চোখ দেওয়ালে উঠে গেল। তারপর মনিটারে। ড্রিপের বোতলে। অক্সিজেন সিলিন্ডারে। একরঙা পর্দায়। ঘুরতে ঘুরতে ফিরেছে সোমনাথে। আর কোনও কথা বলছেন না সোমনাথ, শুধু ঘোলাটে মণি দুটো কেমন জ্বলছে যেন।

ওই দৃষ্টিও যেন এক অচেনা পুরুষের।

শ্রীময়ী গলা ঝেড়ে বললেন,—আমি যাই। আমি গেলে মনু আসবে।

পিছন ঘুরেও শ্রীময়ী সোমনাথের স্বর শুনতে পেলেন,—সব ভুলে গেছ তো ময়ী? কোনও খেদ মনে রাখোনি তো?

এতক্ষণ পর একটা সত্যি বলার সুযোগ পেলেন শ্রীময়ী। দ্রুত মাথা নেড়ে বললেন,—ভুলে গেছি। সব ভুলে গেছি।

কাচের দরজার এপারে এসে হঠাৎ খুব কান্না পাচ্ছিল শ্রীময়ীর।

এতদিন ধরে পুষে রাখা বিদ্বেষটা মরে যাওয়ার জন্য।

ঘৃণা উবে যাওয়ার জন্য।

ভালবাসা মুছে যাওয়ার জন্য।

কে এদের গ্রাস করল?

সময়?

তেরো

ফেরার পথে মা মেয়েতে কথা হচ্ছিল। ট্যাক্সিতে বসে। মিতুল আজ একটু চিন্তান্বিত যেন। কথা বলছে, তবে সঙ্গে সঙ্গে কী যেন ভেবেও চলেছে। শ্রীময়ী অবশ্য পুরোপুরি নির্ভার, মেয়ের সঙ্গে লঘু রসিকতাও করছেন এক আধটা।

হঠাৎই মিতুল বলল,—একটা কথা বলব মা?

—কী রে?

—বাবার কন্ডিশান তো দেখলে। গড ফরবিড, বাবা যদি এবার ভালয় ভালয় ফিরে আসে...। মিতুল অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকাল,—কটা দিন বাবাকে আমার কাছে এনে রাখলে কেমন হয়?

—সে তোর ইচ্ছে। রাখতেই পারিস।

—কিন্তু...

—কিন্তু কী?

—প্রবলেম আছে। ওই তোমার জামাই...

—সুগত আপত্তি করবে?

—মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু সারাক্ষণ তোলো হাঁড়ি হয়ে থাকবে। একটা সাইলেন্ট প্রেশার তৈরি করবে আমার ওপর।

—কেন? সুগত তো তোর বাবার জন্য যথেষ্ট ছোটাছুটি করছে!

—ওর অনেক লোকদ্যাখানো ব্যাপার আছে। ও তুমি বুঝবে না। ও বাবাকে একটুও পছন্দ করে না, আমি জানি। নেহাত আমার মুখ চেয়ে...

সোমনাথের মেয়ের দিকে শ্রীময়ী তাকালেন এক ঝলক, উত্তাপহীন স্বরে বললেন,—হুম। তো কী করবি?

—ভাবছি। একটুক্ষণ জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল মিতুল। তারপর যেন শ্রীময়ীকে নয়, নিজেকেই বলল,—আমার বাবা যেমনই হোক, ভাল হোক, মন্দ হোক...তবু সে তো আমার বাবা। মেয়ে হয়ে আমি তাকে নেগলেক্ট করি কী করে? কেন যে সুগত আমাকে একটু ফিল করে না! ও যদি একটু রিজনেবল হত!

পলকের জন্য সুগতর স্টাডিটা শ্রীময়ীর চোখের সামনে দুলে গেল। আলো জ্বলছে ঘরটায়, নিশুত রাতে। বসে আছে সুগত, একা।

শ্রীময়ীর মনে হল স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে আগুন আর বরফ ছাড়াও আরও কিছু থাকে বোধহয়। শুকনো চর। কিংবা অনতিক্রম্য খাদ।

আবার মিতুলের স্বর,—যাক গে, মরুক গে, আমার অত ভাবলে চলবে না। বাবাকে কাছে এনে রাখতেই হবে। বাবার একটু কড়া ওয়াচে থাকা দরকার। মনুপিসিকে দিয়ে হবে না, বাবা মনুপিসিকে উলটো ট্যাকে গোজে। একটু ফিট হলেই বাবা ফের অনিয়ম শুরু করে দেবে। করবেই। এবার যদি বাবার কিছু হয়ে যায়, তখন আর হাত কামড়ানো ছাড়া উপায় থাকবে না।

—হুম্।

মিতুল কয়েক পলক গোয়েন্দা চোখে জরিপ করল মাকে। তারপর বলল,—তোমার খারাপ লাগবে না তো মা?

—আমার! কী? কেন?

—না মানে...। মিতুল আবার একটু চুপ। দাঁতে নখ খুঁটছে। আচম্বিতে ধরা গলায় বলল,—বাবা খুব একা মা।

আবেগটা শ্রীময়ীকে একটুও ছুঁল না। একা কে নয়? মিতুলের চোখে মোহাঞ্জন, বোঝে না সেও একা। সুগতও। এমনকী বুমবুমও। মানুষ নিজেকে ঘিরে কিছু কিছু সম্পর্কের বৃত্ত রচনা করে, আত্মসুখের জন্য। ভাবে তাতেই সে পরিপূর্ণ। এই আমার মা, এই আমার বাবা, এই আমার স্বামী, আমার সন্তান...। কিছুই কিছু না। নিজের নির্মাণ করা এই বৃত্তে নিজেরই রিপুগুলো শুধু পাক খেয়ে মরে। কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য। অভিমান। ভালবাসা।

হ্যাঁ, ভালবাসাও।

কী শূন্যগর্ভ এই বিলাস—ভালবাসা!

না হলে সময় কি তাকে এমন নিঃসাড়ে গিলে নিতে পারে?

শ্রীময়ীকে নিশ্চুপ দেখে মিতুল কাকুতির সুরে বলল,—তুমি জানো না মা, ভবানীপুরের বাড়িটা এখন প্রেতপুরী। বাবাদের অংশে মানুষ বলতে ওই মনুপিসি। আর পুবনো বুড়ো চাকর অজুকাকা। কানে শুনতে পায় না, চোখে দেখতে পায় না, শুধু মরার জন্য ওখানে পড়ে আছে।

অন্য কোথাও থাকলেও কি অনন্তকাল বাঁচবে সোমনাথ? কথাটা প্রায় শ্রীময়ীর মুখে এসে গিয়েছিল, গিলে ফেললেন। কোমাল গলায় বললেন,—বেশ তো। রাখ না এনে।

—বিশ্বাস করো মা, বাবা এখন একদম বদলে গেছে। তুমি যে বাবাকে চিনতে, সে বাবা আর নেই।

এ সত্যও শ্রীময়ীর চেয়ে বেশি আর কে জানে! শ্রীময়ী বললেন,—হুম।

—অতীতে তোমার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছে, তার জন্য বাবা খুব অনুতপ্ত। কম বয়সে চৌধুরীবাড়ির বনেদিআনা বাবার দৃষ্টিকে ঘুলিয়ে দিয়েছিল। বাবা এখন অনেক স্বচ্ছ ভাবে সব কিছু দেখতে পারে, খোলা মনে ভাবতে পারে...

—বেশ তো। ভাল তো। আমাকে এত করে বলছিস কেন?

—তা হলে তোমার আপত্তি নেই তো মা?

—তুই তোর বাবাকে কাছে এনে রাখবি, সেবাযত্ন করবি, এতে আমার আপত্তির প্রশ্ন আসছে কোথ্থেকে? মেয়ে হিসেবে এটা তো তোর ডিউটি। শ্রীময়ীর ঠোঁটের আলগা হাসি অনেকটাই ছড়িয়ে গেল। মেয়েকে কাছে টানলেন। নিরাসক্ত আঙুল বোলালেন মেয়ের চুলে,—এবার আমি একটা কথা

বলব? রাগ করবি না তো?

—কী মা?

—দুম করে চলে এলাম, কলেজে ছুটি নেওয়া হয়নি। অনেকগুলো কাজও আছে। কাল পরশু যদি একটা টিকিট পাওয়া যায়, তো চলে যাই।

—তুমি রাগ করলে? মিতুল সহসা টানটান,—তুমি এখনও বাবাকে হিংসে করো? এত অসহায় দেখেও লোকটাকে তুমি ক্ষমা করতে পারছ না?

শ্রীময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মিতুল কি বললে বুঝবে, ক্ষমা বা হিংসে করার জন্যও যেটুকু আবেগ থাকা দরকার, সোমনাথের জন্য শ্রীময়ীর আর সেটুকুও অবশিষ্ট নেই!

ট্যাক্সি এগোচ্ছে। বাঁয়ে এক ভাঙা মসজিদ। বিশাল কাঠামো দাঁত বের করে আছে। এক সময়ে কত লোক এখানে জড়ো হত। আজ সুনসান। অন্ধকার।

সব বদলে যায়। কাল সব কিছুকেই বদলে দেয়।

চোদ্দো

রবিবারের পূর্বা এক্সপ্রেসে টিকিট পেয়ে গেলেন শ্রীময়ী। সুগতই জোগাড় করে দিল । প্রায় সোহিনীরই কায়দায়। তবে কলকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী নয় তো, ঘুষের রেট এখানে কিঞ্চিৎ কম।

সক্কাল সক্কাল শ্রীময়ীকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছে মেয়ে জামাই নাতি। স্টেশনময় ছুটে বেড়াচ্ছে বুমবুম। তাকে সামলাতে সুগতও ছুটছে, গলদঘর্ম হয়ে। মিতুলের মুখ ভার, সে এখনও মা'র এই নিষ্ক্রমণ মন থেকে মেনে নিতে পারেনি।

শ্রীময়ী অবশ্য তা নিয়ে ভাবিত নন। বরং বুমবুমের দস্যিপনা দেখে হাসছেন মিটিমিটি। কফি খেলেন, ম্যাগাজিন কিনলেন, চকাস চকাস চুমু খেলেন বুমবুমকে।

ট্রেন প্রায় ঠিক সময়েই ছাড়ল। মাত্র পাঁচ মিনিট লেট।

শীতল কামরায় ফিরে নিজস্ব সিটে বসলেন শ্রীময়ী। কেজো ভাবনাগুলোকে ডেকে আনছেন একে একে। কাল সকাল আটটা সাড়ে আটটার আগে দিল্লি পৌঁছবেন। স্টেশন থেকে অটো ধরে মধুবিহার মিনিট কুড়ির বেশি লাগার কথা নয়। পিঙ্কিকে গিয়ে ধরা যাবে কি? ঘরের কী হাল হয়ে আছে কে জানে, একটু সাফসুতরো না করলে কি চলবে? খাওয়া অবশ্য কলেজ ক্যান্টিনেই সেরে নেওয়া যায়। টোস্ট ওমলেট ঘুগনি ফুগনি যা হোক কিছু। একটা তো মাত্র দিন...। কলেজের প্রথম ক্লাসটা কি ধরতে পারবেন? কাদের ক্লাস আছে প্রথমে? ফার্স্ট ইয়ার না? ক্রিসমাসের পরই আবার ওদের ক্লাসটেস্ট নিতে হবে। কার্ডনস্ মেথডটা জলদি জলদি শুরু করা দরকার। বাড়িতে এক কাঁড়ি খাতা জমে আছে, কলেজে নিয়ে যাবেন কি কাল? সোমবার পর পর দুটো পিরিয়ড অফ থাকে, কালই যদি খাতাগুলো শেষ করে ফেলা যায়...

এর মাঝেই একটা বাক্য বিদ্যুৎ ঝলকের মতো শ্রীময়ীর মনে উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল।

শ্রীময়ীর এবার কলকাতা আসাটা বড় জরুরি ছিল।

তাঁর নিজের জন্যই।

হেমন্তের পাখি

খাঁচার টিয়াটাকে বুলি শেখানোর চেষ্টা চালাচ্ছিল অদিতি। রোজই চালায়, এই দুপুরবেলায়। অদিতির নির্জন সময়ে। পাখি কথা বলবে না, অদিতিও বলাবেই, দুজনের এ এক ভারী নিভৃত খেলা।

মাসখানেক আগে রাস্তার এক পাখিওয়ালার কাছ থেকে টিয়াটা কিনেছে অদিতি। করকরে আশি টাকায়। পাখিটা খুব বাচ্চা নয়, মোটামুটি বড়ই। পাকা সবুজ রং, পরিণত ডানা, গলা জুড়ে বকলাসের মতো স্পষ্ট কালো দাগ। বেচার সময়ে লোকটা অনেক ভাল ভাল কথা বলেছিল। সেলসম্যানশিপে সুপ্রতিমকেও বুঝি হার মানায়। নিয়ে নিন বউদি, একদম তৈরি পাখি, সাত দিনে পোষ মেনে যাবে! জাত দেখেছেন, আসলি সিঙ্গাপুরি টিয়া! এ পাখি কথা বলে না, লেকচার দেয়! যা শুনবে তাই আউড়ে যাবে সারাদিন! হাত বাড়াবেন, হাতে চলে আসবে! কাঁধে চড়ে ঘুরবে, ঠিক যেন ঘরের ছেলে! দেখবেন, আপনারই তখন খাঁচায় পুরতে মায়া হবে!

কিন্তু পাখি কথা বলে কই! এক মাস ধরে বিশ্রী একটা কর্কশ ডাক ছাড়া আর কিছুই তো এল না অদিতির কানে। পোষ মানা দূরস্থান, খাঁচা খুলে ছোলা দিতে গেলেও ক্যাঁ ক্যাঁ করে তেড়ে আসে। সুপ্রতিম আর পাপাই তাতাই-এর সামনে অদিতি বেইজ্জতের একশেষ। বাপ আর দুই ছেলে তিনজনই একমত। টিয়াটা বুড়ো। টিয়াটা গোঙা।

অদিতির বিশ্বাস হতে চায় না। এমনও তো হতে পারে টিয়াটা খুব তেজি, প্রখর বুদ্ধিমান। হয়তো ভাবছে অদিতি নিজেই একদিন বিরক্ত হয়ে খাঁচার দরজা খুলে দেবে, অমনি ও ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে আকাশে! অথবা ওর মনে এখনও ফেলে আসা নদী জঙ্গল গাছ আকাশের ছবি অম্লান! সেই স্মৃতি ধুয়ে-মুছে সাফ না হওয়া পর্যন্ত হয়তো কথা বলবে না বলে পণ করে রেখেছে টিয়া।

নাহ্, অদিতির হাল ছাড়লে চলবে না। পাপাইটা ছোটবেলায় অঙ্কে কী কাঁচাই না ছিল, সামান্য গুণ ভাগ করতে দিলে সিঁটিয়ে যেত, চিবিয়ে চিবিয়ে ভুট্টিনাশ করত পেনসিলের। বুঝতে পারছি না মা! হচ্ছে না মা! পারব না মা! সেই ছেলের পিছনে লেগে থেকে থেকে সে এখন অঙ্কে রীতিমতো পালোয়ান। মাধ্যমিকে অঙ্কে সাতানব্বই, উচ্চমাধ্যমিকে একশো নব্বই, ইন্টার স্কুল অঙ্ক কম্পিটিশানেও কুস্তি লড়ে প্রাইজ পেয়েছে কত। এখন পাপাই-এর থার্ড ইয়ারের ক্লাসমেটেরা ফিজিক্সের জটিল অঙ্ক নিয়ে পাপাই-এর কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। অঙ্কভয় দূর করার থেকেও কি পাখির মুখে বুলি ফোটানো কঠিন?

ব্যালকনির রডে ঝোলানো লোহার খাঁচাটাকে একটু দুলিয়ে দিল অদিতি। নিচু স্বরে বলল,—কীরে কথা বলবি না?

টিয়া তরতর জাল বেয়ে উলটো দিকে চলে গেল।

অদিতি দ্রুত ঘুরে গেল সেদিকে। খাঁচার তারে মুখ রেখে নরম করে বলল, —বল সুপ্রতিম। সু-প্র-তি-ম। বল বল।

টিয়ার মোটেই যুক্তাক্ষরে আগ্রহ নেই। একবার ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল অদিতিকে, আবার সরে গেছে।

—বুঝেছি। আমাব বরটাকে তোর পছন্দ নয়। হবেই বা কেন, ও কি তোকে ভালবাসে!

টিয়ার এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। চুপ, যেন সায় দিচ্ছে।

অদিতি ঠোঁট টিপে হাসল,—বেশ তবে পাপাই তাতাইকে ডাক। বল পাপ্‌পাই। তাততাই।

কুৎসিত আওয়াজ করে খাঁচার মেঝেতে বসল টিয়া। বসেই লাফিয়ে উঠেছে। ঝটপট করছে খাঁচা জুড়ে।

—কী অসভ্য রে তুই! দাদাদেরও পছন্দ নয়!

তড়াং করে খাঁচার মাথায় ঝুলে জিমন্যাসটিক দেখাচ্ছে টিয়া।

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা। কাউকে ডাকতে হবে না। আমাকেই ডাক। অদিতি। অ-দি-তি।

দাঁড়ে বসেছে টিয়া। দুলছে অস্থিরভাবে। ঘন ঘন চোখ টিপছে।

অদিতি ফিসফিস করে বলল,—অদিতিও কঠিন লাগছে? খুকু বলে ডাকবি? বল খুউকু। খুউকুউ।

অদিতির দুই ছেলেই ছোটবেলায় নাম ধরে ডাকত অদিতিকে। খুকু। সুপ্রতিমই শিখিয়েছিল। ছোটর তো অনেক বড় অবধি অভ্যেসটা ছিল। ক্লাস ফাইভে উঠেও তাতাই মাকে বলত খুকুমা। অদিতি ছেলেকে বকত খুব। এখন কেন যে সেই ডাকটাই শুনতে ইচ্ছে করে অদিতির!

ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে অদিতি বলল,—একবারটি খুকুমা বলে ডাকবি আমাকে? ডাক না। বল খু-কু-মা।

এতক্ষণে টিয়ার মুখে বোল এসেছে,—ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ।

—এই পাজি, চেঁচাচ্ছিস কেন?

—ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ।

—যা, তোর সঙ্গে কথাই বলব না। ওরা তোকে ঠিক চিনেছে। তুই একটা বুড়োর হদ্দ। সাত জংলির এক জংলি!

বিরক্ত হয়ে খাঁচার পাশ থেকে সরে এল অদিতি। গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ চোখে দেখছে পাখিটাকে। সত্যিই কি পাখিওয়ালা তাকে ডাহা ঠকিয়ে গেল? বেশি দাম নিয়ে রদ্দি টিয়া গছিয়ে গেল একটা?

তা অদিতির ঠকা অবশ্য এমন কিছু নতুন কথা নয়। এর আগে একবার কত শখ করে একটা নেপালি ময়না পুষেছিল অদিতি। হাঁ করে খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, এই বুঝি পাখি মানুষের স্বরে কথা বলে ওঠে! হায় কপাল, পাখি শুধু গেলে আর খাঁচা নোংরা করে। শেষে একদিন বাপ-ছেলেদের তুমুল হর্ষধ্বনির মাঝে খাঁচা খোলা পেয়ে পুঁই করে উড়ে পালাল পাখিটা। সবাই বলল, ওটা নাকি গাঙশালিখ্ ছিল। অদিতি চিনতে ভুল করেছে! হবেও বা। আর একবার, পাপাই তাতাই তখন বেশ ছোট, দুই ছেলেকে নিয়ে রাসবিহারীর রথের মেলা থেকে চারটে মুনিয়া কিনে এনেছিল অদিতি। সবুজ-হলুদ কালো-বাদামি নীল-খয়েরি কী তাদের রঙের বাহার! দুই ছেলে পিচকিরিতে জল ভরে ক'দিন তাদের স্নান করাতেই বর্ণচোরা মুনিয়ারা ক্যাটকেটে চড়ুই!

সুপ্রতিম সেবার খুব চটেছিল। তিরিশটা টাকা নষ্ট করার জন্য কম খোঁটা দেয়নি অদিতিকে। রোজগার তো করো না, টাকার মর্ম বুঝবে কী! এখন অবশ্য সামান্য আশি টাকা গলে যাওয়াতে সুপ্রতিমের কিছু যায় আসে না। সে তো আর কোম্পানির সেই ছুটন্ত ফেরিওয়ালা নেই, রীতিমতো লোটাস ইন্ডিয়ার দাপুটে এরিয়া ম্যানেজার।

পাখিটার দিকে আরও খানিকক্ষণ কটমট তাকিয়ে থেকে ঘরে ফিরল অদিতি। কাচা জামাকাপড় বিছানায় স্তূপ করে গেছে মলিনার মা, সেগুলোকে নিয়ে পড়ল। পাপাই তাতাই-এর শর্টস টি-শার্ট, সুপ্রতিমের গেঞ্জি পাজামা, নিজের শাড়ি সায়া ব্লাউজ পাট করল আলাদা আলাদা করে। কোনওটা রাখল আলনায়, কোনওটা দিয়ে এল ছেলেদের ঘরে, কোনওটা আলমারিতে তুলল। খাটে শুয়ে গড়াল খানিকক্ষণ। পড়া খবরের কাগজ নতুন করে উলটোল, সরিয়ে রাখল, আবার শুয়ে রইল চোখ বুজে। ঘুমও ছাই আসে না, আবার এসে গেলেও বিপদ। সারা বিকেল গলা জ্বলবে, সারা সন্ধে টক ঢেকুর। অপারেশনের পর থেকে অম্বলের রোগটা যেন আরও বেড়ে গেল। আবার কি পাখিটাকে নিয়ে পড়বে, নাকি গড়াবে আর একটু? উল কাঁটা নিয়ে বসলে কেমন হয়। ধুস্, কী হবে? ছেলেরা তো আজকাল কেনা সোয়েটার বেশি পছন্দ করে।

অদিতি যে এখন কী করে? কী করে?

হেমন্ত চলছে। শরৎ আর শীতের মাঝে হেমন্ত ঋতুটা যেন কেমনতর। কখন যে একটা পাতলা কুয়াশায় মুখ লুকিয়ে চুপিসারে এসে যায়। তারপর যেন আর কাটতেই চায় না, কাটতেই চায় না। বাতাস শুকনো হয়ে আসে, চামড়ায় টান ধরে, এক হিমঋতুর পদধ্বনি শোনা যায় দূরে। কিন্তু আসে

না শীত। তখনও যেন শরতের গন্ধ লেগে থাকে বাতাসে। উচ্ছল শরৎ আর হাড়-কাঁপানো শীত, মাঝের সময়টা বড় নিশ্চেতন। প্রলম্বিত।

ফোন বাজছে। উঠল অদিতি। ছুটল না, অলস পায়ে এল ড্রয়িংস্পেসে। মন্থর হাতে রিসিভার তুলল। সুপ্রতিম।

—কী ব্যাপার, ঘুমোচ্ছিলে নাকি ?

—না, এই...একটু...

—পারোও বটে। সুখে আছ।

—এই বলার জন্য ফোন করেছ ?

—ঘুম ভাঙালাম বলে চটেছ মনে হচ্ছে ?

অদিতি একা একাই ম্লান হাসল,—কী বলবে বলো না।

সুপ্রতিম কি একটু সময় নিল ? না বোধ হয়। কাজের কথাটা পেড়েছে,—একটু দ্যাখো তো, শোওয়ার ঘরের টেবিলে কি আমি একটা গোলাপি ফাইল ফেলে এসেছি ?

—ধরো, দেখছি। দ্রুত পায়ে শোওয়ার ঘর ঘুরে এল অদিতি, —হ্যাঁ, পড়ে আছে।

—বাঁচালে। আমি ভাবছিলাম শেয়ার ট্যাক্সিতে ফেলে এলাম। একগাদা দরকারি পেপারস আছে ফাইলটায়।

—তুমি আজ ব্রিফকেস নিয়ে বেরোওনি ?

—কেন, তুমি দ্যাখোনি আমি ক'দিন ধরে ব্রিফকেস নিয়ে বেরোচ্ছি না !

অদিতি বলতে পারত, খেয়াল করিনি। খেয়াল করার সময়ই বা কোথায় সকালে। পাপাই তাতাই এমন ঘোড়ায় জিন দিয়ে থাকে। ওই একটা সময়ে এখনও তাদের মাকে দরকার। ট্রাউজারটায় একটু ইস্ত্রি চালিয়ে দাও না মা ! শার্টের বোতাম ছিঁড়ে গেছে, চটপট লাগিয়ে দাও তো ! ইশ্, আমাকে এত ভাত দিয়েছ কেন, ওঠাও ওঠাও। তার মধ্যেও সুপ্রতিমের টাইটা মোজাটা রুমালটা খাটের বাজুতে রেখে আসে অদিতি। শুধু সুপ্রতিমের যাত্রাকালে দরজায় গিয়ে দুগ্‌গা দুগ্‌গাটাই করা হয়ে ওঠে না। বহুকাল যাবৎই।

হালকাভাবে অদিতি অন্য কথায় গেল,—অতই যদি দরকারি ফাইল, অফিসে যাওয়ার চার ঘণ্টা পরে মনে পড়ল কেন ?

চটজলদি জবাব এসে গেল, অফিস তো আর করলে না, দিব্যি শুয়ে বসে জীবন কেটে গেল। ফার্স্ট আওয়ারে এসেই সেলসের ছেলেদের নিয়ে মিটিং-এ বসেছিলাম, একটু ফাঁক পেতে তবে মনে পড়ল।

—ও। ফস্ করে একটা অবান্তর প্রশ্ন করে বসল অদিতি, —ফিরছ কখন ?

—আমি ? আজ ? সুপ্রতিমও যেন কোনও আজগুবি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে—যেমন ফিরি। সাড়ে ন'টা। দশটা। পার্টনার এজেন্ট এসেছে, ওকে নিয়ে সন্ধেবেলা একটু বসতে হবে।

—বেশি গিলো না। প্রেশারটা বেড়েছিল, খেয়াল রেখো।

—জানি। জ্ঞান মারতে হবে না।

—হুঁহ্, তাও যদি বোতল দেখলে জ্ঞান থাকত। বাড়ি ফিরে খাবে তো, না কালকের মতো খাবার নষ্ট হবে ?

—অফকোর্স খাব। আমি আজ হোটেলবাজি করতে যাচ্ছি না। রাখছি।

কট। দাম্পত্য আলাপ শেষ। রিসিভারটা হাতে নিয়ে অদিতি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল কয়েক সেকেন্ড। নাকি আরও বেশি ? সময় যখন কাটে না, কয়েক সেকেন্ডও এত দীর্ঘ হয়ে যায়। মাত্র সাড়ে সাতশো স্কোয়ার ফিটের আসবাব ভরা ফ্ল্যাটটাকেও মনে হয় জনহীন প্রান্তর।

রিসিভার একটানা কুঁ কুঁ কুঁ কুঁ শব্দ করে চলেছে। যেন বলছে রাখ রাখ রাখ রাখ। রিসিভারটাকে আঁচলে ঘষে খানিকটা চকচকে করল অদিতি, রেখে দিল ক্রেডলে। যন্ত্রটার এ বাড়িতে তিন বছর বয়স হল। একমাত্র কাজের কথা ছাড়া আজ পর্যন্ত টেলিফোনে কোনও নরম গরম কথা বলল না সুপ্রতিম। অদিতি মাঝে মাঝে ভাবে, বিয়ে হয়ে অদিতি যখন শ্বশুরবাড়িতে এল,

তখন যদি ও বাড়িতে টেলিফোন থাকত, সুপ্রতিম কি তখনও দুপুরবেলা এরকম নিরস স্বরে ফোন করত অদিতিকে ? মনে হয় না। সুপ্রতিমের তখন যথেষ্ট রসকষ ছিল। কী মিষ্টি একটা নামে ডাকত অদিতিকে। ফুল। এখনও ডাকে। ক্বচিৎ কখনও। ফুল ভেবে নয়, বোকা ভেবে।

অন্যমনস্কভাবে সোফাগুলো ঝাড়ছিল অদিতি। মলিনার মা যত্ন করেই ঝাড়াঝুড়ি করে, তবু যেন অদিতির ঠিক তৃপ্তি হয় না। ক্যাবিনেটের গায়ে, সেন্টার টেবিলে, টিভি-র কাচে সর্বত্রই অদৃশ্য ধুলোর কণা দেখতে পায় অদিতি। এগুলোই কি সংসারের মায়া ?

কিছুক্ষণ অদিতি ঝুম হয়ে বসে রইল সোফায়। কী ভেবে উঠে টিভি-টা চালিয়ে দিল। আবার বসল। একা একা টিভি দেখতেও ভাল লাগে না অদিতির। পর্দায় চলমান ছবি ভেসে উঠছে, কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ গান গাইছে, কেউ ভালবাসছে কাউকে, কেউ কাউকে মেরে ফেলছে, আর অদিতি একা বোকার মতো বসে বসে দেখছে তাদের—সবই কেমন অলীক লাগে অদিতির। পর্দার মানুষগুলোর সঙ্গে কিছুতেই ঠিকঠাক সংযোগ ঘটে না তার। যেন মনে হয় পুতুলের নড়াচড়া দেখছে, সে-ও এক পুতুল। কেউ যদি পাশে বসে অদিতির সঙ্গে দৃশ্যটার রস ভাগাভাগিই না করল, তবে সেই দৃশ্য দেখে অদিতির কীসের আনন্দ ? পাপাই তাতাই ক্রিকেট টেনিস চালিয়ে রাখলেও অদিতি সারাদিন বসে দেখতে পারে, কিন্তু একা একা... !

দু-তিন বছর আগেও অদিতির দুপুরটা অনেক অন্য রকম ছিল। মাধ্যমিকের আগে পর্যন্ত তাতাই-এর ছিল মর্নিং স্কুল, সারা দুপুরই তখন গমগম করত বাড়ি। এই তাতাই দড়াম করে বাথরুমের দরজা বন্ধ করল। এই গান গাইছে গলা ছেড়ে। একবার ফুল ভলিউমে টিভি চালিয়ে দিল, একবার টেপ। সঙ্গে অনবরত হাঁকডাক। মা, আমার ব্রায়ান অ্যাডামস-এর ক্যাসেটটা কোথায় গেল ? মা, দাদা আজ আবার আমার টি-শার্ট পরে বেরিয়েছে, তুমি দেখতে পারো না ? মা ফ্রিজে দেখছি একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস আছে, খাব ? দুর ছাই, ওয়াকম্যানটা কোথায় রাখলাম ? ও মা, খুঁজে দাও না। মা মা মা মা মা। অস্থির অস্থির লাগত অদিতির।

এখন চতুর্দিক দমচাপা রকমের ফাঁকা।

তাও তাতাই এখনও কিছুটা ছেলেমানুষ আছে। অদিতিকে জড়িয়ে ধরে এখনও হুমহাম আবদার চালায়। পাপাইটা যেন পুরোপুরি লোক হয়ে গেল। অথচ ওই ছেলেই পাঁচ বছর আগেও কী মা-ঘেঁষাই না ছিল ! স্কুল টিউটোরিয়াল খেলার মাঠ বন্ধুবান্ধব, রাজ্যের সব গল্প পুঙ্খানুপুঙ্খ মাকে বলা চাই। অদিতি শুনতে না চাইলেও কানের কাছে বকবক করে যাবে। এখন পাপাই বাড়িতে কথা বলারই সময় পায় না।

অদিতির দুই ছেলেই বৃত্ত পেয়ে যাচ্ছে।

বৃত্ত, না ডানা ?

পাপাই তাতাই উড়ে যাচ্ছে ডানা মেলে। মাঝে মাঝে ফিরবে কুলায়। আবার ওড়া। আবার ওড়া। ওদের সামনে এখন সুনীল আকাশ।

আর অদিতির সামনে এই ফ্ল্যাট। সাড়ে সাতশো স্কোয়ার ফিটের এক আদিগন্ত ধুধু মাঠ।

অদিতি নিষ্পলক তাকিয়ে আছে রঙিন পর্দায়। সম্ভবত পুরনো দিনের সিনেমার গান হচ্ছে টিভি-তে। অদিতি দেখছেও না, শুনছেও না। পৌনে তিনটে বাজে। চারটে নাগাদ মলিনার মা বাসন মাজতে আসবে, সাড়ে চারটেয় রান্না করতে সবিতা। ছেলেরা ফিরতেও পারে, নাও ফিরতে পারে। তাদের জন্য জলখাবার করে রেখে লাভ নেই, এলে দেখা যাবে। প্রেশারে খানিকটা মটর সেদ্ধ করা আছে, চটপট ঘুগনি বানিয়ে দেবেখন। সন্ধেবেলা অদিতির একবার দাসপাড়া বাজারে যাওয়া দরকার। কাল সকালে পাপাই-এর স্যারের কাছে পড়তে যাওয়া আছে, বাজার যেতে পারবে না, রাতেই মাছটা সবজিটা কিনে রাখতে হবে অদিতিকে। টুথপেস্ট ফুরিয়ে এসেছে, গায়ে মাখার সাবানও। ও সব অবশ্য সামনের দোকান থেকেই সওদা করা যায়। সুপ্রতিম জুতোর ফিতের কথা বলছিল, দাসপাড়া বাজারে পাওয়া যাবে কি ? পাখির ছোলাও শেষ, আজই কিনে এনে ভিজিয়ে রাখতে হবে রাতে।

পাখির কথা মনে পড়তেই অদিতির বুকটা খচখচ করে উঠল। ডাহা ঠকে গেল পাখিটা কিনে ?

সামান্য ক'টা টাকার জন্য কেন যে মানুষ মানুষকে ঠকায় ! চাইলে তো পাখিওয়ালাকে এমনিই দশ-বিশ টাকা দিতে পারত অদিতি ! দেয়ও তো। মোড়ের ইস্ত্রিওয়ালাটা বাচ্চার ওষুধ কেনার জন্য এই তো গত মাসে পঞ্চাশটা টাকা নিল, অদিতি কি ফেরত চাইতে গেছে টাকা ? যেচে না দিলে অদিতি চাইতেও পারবে না।

যাক গে, ঠকাক গে। অদিতির যে দুপুরের অনেকটাই এখন টিয়াটাকে নিয়ে কাটে, তার দাম কে চায় !

অদিতি একবার উঁকি দিয়ে দেখে এল পাখিটাকে। ঘাড় কাত করে কী যেন শুনছে টিয়া। কী শুনছে ? গান ? টিভি-র ?

তড়াং করে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠেছে অদিতির। পাখিওয়ালা কী যেন বলেছিল ! টিভি-টা একটু জোরে ছেড়ে দেবেন বউদি, পাখি গান শুনে শিস শিখে যাবে !

শিস তো অদিতি নিজেই শেখাতে পারে, তার জন্য টিভি-র কী প্রয়োজন ? পাপাই তাতাইকে কত শিস দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে অদিতি।

বহুকালের অনভ্যাস, এখন কি আর বাতাস বাজবে।

অদিতি ঠোঁট সরু করে ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা বাতাস ঠেলল বুক থেকে। দিব্যি বাজছে। সাইকেল আর সাঁতারের মতো শিসও কি মস্তিষ্কে গেঁথে যায়।

দ্রুত টিভি বন্ধ করে ব্যালকনিতে ফিরেছে অদিতি। এদিক ওদিকের ফ্ল্যাটের দিকে সন্তর্পণে তাকিয়ে নিল। একই কম্পাউন্ডে সামনে পাশে আরও তিনটে ফ্ল্যাটবাড়ি, হেমন্তের দুপুরে সব ফ্ল্যাটই মিঠেকড়া রোদ্দুর মেখে ঝিমোচ্ছে। কোনও ব্যালকনিতেই কেউ নেই। না, একজন আছে। সামনের ফ্ল্যাটের চারতলায়। শিপ্রার বুড়ি শাশুড়ি। বুড়ি চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না, তবু ওই বারান্দাতে বসে আছে সর্বসময়। কী ছাই দেখে কে জানে ? হয়তো আলো বাতাসের ঘ্রাণ নেয়।

খাঁচার খুব কাছে গিয়ে ঠোঁট সরু করল অদিতি। ছোট্ট একটা শিস দিল।

টিয়া চমকে তাকিয়েছে।

অদিতি আবার শিস দিল। এবার একটু লম্বা।

টিয়ার ঘাড় কাত সামান্য, শুনছে। লাল টুকটুক ঠোঁট কি কেঁপে উঠল ?

অদিতি মজা পেয়ে গেল। ঘন ঘন শিস দিচ্ছে।

টিয়াটাও চমকিত হয়ে তাকাচ্ছে বার বার।

বুক থেকে বাতাস ঠেলে ঠেলে শিসটাকে সুরে নিয়ে গেল অদিতি। সুন্দর একটা ছন্দে বেঁধে ফেলল। বাহ, বেশ তো বাজছে !

কলেজে পড়ার সময়ে শিস দিয়ে বাজারচলতি গান তোলা জল-ভাত ছিল অদিতির। ব্রিজ অন দা রিভার কোয়াই-এর মন কাড়া শিসটা ধরা ছিল ঠোঁটে, হনিমুনে সুপ্রতিমকে শুনিয়েছিল। পুরীর সমুদ্রপাড়ে। ঢেউ-এর সামনে বসে আছে দুজনে, ঢেউ-এর সঙ্গে দুলছে অদিতির শিস। দুলছে শিস, দুলছে সুর। সুপ্রতিম অভিভূত। সুপ্রতিম বিমোহিত। নতুন বউ শিস দিয়ে গান শোনায়। নিজেও সুপ্রতিম চেষ্টা করল বারকয়েক, পারল না, মোটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফুক ফুক বাতাস বেরিয়ে গেল। অদিতি হেসে কুটিপাটি। হাল ছেড়ে অদিতিকে জড়িয়ে ধরেছে সুপ্রতিম। আর একবার করো, আর একবার করো।

নেশা ধরে গিয়েছিল সুপ্রতিমের। নইলে রাতে হোটেলের নিবিড় শয্যাতে বউকে বলে শিস শোনাও ! অদিতির মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চেপেছিল হঠাৎ, স্কুলের এক ফক্কড় বন্ধুর কাছে শেখা লক্কা সিটিটা বাজিয়ে দিল শুয়ে শুয়ে। জিভের নীচে দুআঙুল রেখে। কী তার আওয়াজ। পুঁই পুঁউইইই ! ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে গেছে সুপ্রতিম। তার হাতের ঝটকায় টেবিলে রাখা কাচের ফুলদানি ভেঙে খান খান। পাশের রুমে ছোট্ট এক মাদ্রাজি পরিবার ছিল, বাবা মা ছেলে মেয়ে। চারজনই পরদিন সকালে জুলজুল চোখে দেখছে সুপ্রতিমকে। হয়তো ভেবেছে এটাই বোধ হয় বাঙালিদের প্রেম করার নতুন রীতি।

আজ একবার সিটিটা বাজিয়ে দেখবে অদিতি ? কেউ তো কোথাও নেই, কে আর জানছে !

অদিতি শিপ্রার শাশুড়ির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। মুখে আঙুল পুরেও থেমে গেছে সহসা। এ কী ছেলেমানুষি ! ফ্ল্যাটবাড়িতে কোথায় যে কোন চোখ ঘোরাফেরা করে !

ক মাস আগে এক খ্যাপামি পেয়ে বসেছিল অদিতিকে। বাড়ি ফাঁকা হলেই অদিতি ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসে যেত। যত রাজ্যের পাউডার ক্রিম লিপস্টিক মাখত বসে বসে। মুখ চোখ রঙিন করেই তৃপ্তি হত না, সুপ্রতিমের প্যান্টশার্ট বার করে পরত, তারপর মডেলদের মতো হেঁটে বেড়াত ফ্ল্যাটময়। বেড়ালের মতো হাঁটছে। সিংহের মতো হাঁটছে। ময়ূরীর মতো হাঁটছে। কী একটা শব্দ শুনে একদিন বুঝি উঁকি দিয়েছিল ব্যালকনিতে, ব্যস অমনি ব্যাপারটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। বাড়ির লোকদের কৈফিয়ত দিতে দিতে অদিতি জেরবার। যাহ্ ভুল দেখেছে, যাহ ভুল দেখেছে, বলতে বলতে গলা চিরে গিয়েছিল অদিতির। এখন অদিতির সিটি যদি কেউ শুনে ফেলে, পাপাই তাতাই নির্ঘাত এই পঁয়তাল্লিশ বছরের মা-টাকে রাঁচিতে ছেড়ে দিয়ে আসবে।

রাঁচির রাস্তায় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে অদিতি, লোকজনকে জিজ্ঞাসা করছে পাগলাগারদটা কোথায়, মাঝবয়সি পাগলিনীর প্রশ্ন শুনে ছিটকে যাচ্ছে পথচারী, পালাচ্ছে ঊর্দ্ধশ্বাসে, তাদের পিছনে ধাওয়া করছে অদিতি... মনশ্চক্ষে দৃশ্যটা দেখে অদিতি নিজের মনে হেসে গড়িয়ে পড়ল। হাসতে হাসতে ফিরল ঘরে।

খাটে শুয়েও হাসছে। চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল, পেটও। শেষে আর হাসতে পারছে না অদিতি, তবু তার ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়েই আছে।

হাসি ফুরোতে আবার সেই সমস্যা। সময় থেমে গেল।

সাইড টেবিলের নীচ থেকে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করল অদিতি। পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছে, তবু উলটেপাটটে ছবি দেখছে। রেখে দিয়ে উঠে ছেলেদের ঘরে এল, টেবিল ঘাঁটল পাপাই-এর। ইয়া মোটা এক ইংরিজি থ্রিলার, সামনের মলাটে অর্ধনগ্ন নারী আর মেশিনগান। পিছন মলাটে কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার। একবার চোখ বুলিয়ে নাক কুঁচকোল অদিতি, রেখে দিল। আবার ফিরে এসে শোকেস থেকে একটা বাংলা বই বার করেছে। ধুস, সবই তো পড়া, এক বই কত বার পড়া যায় ! পাড়ায় যদি একটা লাইব্রেরিও থাকত ! জামির লেনে অদিতির শ্বশুরবাড়ির পাড়ায় কী ভাল একটা গ্রন্থাগার ছিল, শ্বশুরমশাই পালটে পালটে বই নিয়ে আসতেন, ছেলে কোলে নিয়ে গপগপ বই গিলত অদিতি।

ছোট ছোট অগুন্তি কালো পিঁপড়ে লাইন দিয়ে দেওয়াল বেয়ে উঠছে। কী যেন সাদা সাদা গুঁড়ো মুখে করে নিয়ে চলেছে সকলে। ভারী সুশৃঙ্খল এক পদযাত্রা। শীতের প্রস্তুতি। মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত চলে গেছে পিঁপড়ের সারি। ঠিক সরলরেখাও নয়, বক্ররেখাও নয়, যেন এক সাদা ফুটকিঅলা কালো সুতো ঝুলছে দেওয়ালে। কাঁপছে মৃদু মৃদু। সিলিং-এ পৌঁছে ছড়িয়ে পড়ছে পিঁপড়েরা, কী এক অপরূপ জ্যামিতিক নক্শা !

দৃশ্যটা ছিঁড়ে গেল। ডোরবেল বাজছে। মলিনার মা এল বোধ হয়।

দরজা খুলে অদিতি বিস্মিত। এক কুঁজোটে বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে প্যাসেজে। পরনে পাজামা পাঞ্জাবি, কাঁধে সুতির চাদর, হাতে একটা লম্বা ডাঁটির ছাতা। অদিতির দিকে তাকিয়ে লোকটা হাসছে মিটিমিটি।

চেনা চেনা যেন ! কে ?

চশমাপরা লম্বাটে তোবড়ানো মুখে রহস্যের হাসি,—কী, চিনতে পারছ না ?

কথা বলতেই অদিতি চিনেছে লোকটাকে। ওই গমগমে স্বরেই।

হেমেনমামা না !

দুই

রাত্রে খাবার টেবিলে অদিতি বলল, —জানো, আজ একজন এসেছিল বাড়িতে।

ঘুগনির বাটিতে পেঁয়াজকুচি ছড়াচ্ছিল সুপ্রতিম, মুখ না তুলেই প্রশ্ন করল,—কে ?

—হেমেনমামা।

—কে মামা ? সুপ্রতিম কপাল কুঁচকে ছেলেদের দিকে তাকাল, —এই, তোরা একটু থামবি ? খাবার টেবিলে ঝগড়া না করলে কি তোদের রুটি হজম হয় না ?

দু ভাইতে ক্রিকেট নিয়ে লেগেছে আজ। ভারতীয় ক্রিকেট দল কোথায় যেন বিদেশ সফরে যাবে, খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাতাই-এর একটুও পছন্দ হয়নি টিমটা। সদ্য কলেজে ঢোকার সুবাদে তাতাই এখন প্রায় সর্বজ্ঞ, অথচ দুবছরের ছোট ভাইকে নেহাতই নাবালক ভাবে পাপাই, পাত্তাই দিতে চায় না। তর্কের সময়ে সে নিজে কখনও উত্তেজিত হয় না, বরং ছোট ছোট মন্তব্য করে চতুর্গুণ রাগিয়ে দেয় ভাইকে।

বাবার কথা কানে তুলল না তাতাই। গাঁক গাঁক চেঁচাচ্ছে, —স্টুপিডের মতো কথা বলিস না। নিজে কোনও দিন স্কুল টিমেও চান্স পাসনি, এদিকে খেলার ব্যাপারে সব বুঝে গেছিস !

—একটু তো বুঝি। পাপাই গম্ভীর মুখে বাবার দিকে ঘুরল,—শুনলে, আমাকে স্টুপিড বলল ?

সুপ্রতিম একটু কড়া গলায় ধমক দিল,—তাতাই, দাদার সঙ্গে যদি ভদ্রভাবে কথা না বলতে পারো, তা হলে এ সব তর্ক করবে না।

তাতাই ফোঁস ফোঁস করছে, —তা বলে ইডিয়টের মতো রিমার্ক করে যাবে ? যে চোদ্দোটা টেস্ট খেলে আজ পর্যন্ত নিজেকে শো করতে পারল না ..

—এবার ইডিয়ট বলল বাবা। আস্তে করে কথাটা ছুড়ে রুটিতে মন দিল পাপাই।

—কী হচ্ছে তাতাই, চুপ কর না। একটু শান্তিতে কথা বলতে দে। অদিতি মুরগির মাংসের বাটিটা তাতাই-এর দিকে এগিয়ে দিল,—কাদের সঙ্গে মিশিস ? মুখের এরকম ভাষা হয়েছে ?

তাতাই দাঁতে দাঁত ঘষে থেমে গেল। দাদার মতো কৌশলী ঝগড়ুটের সঙ্গে সে কোনও দিন পেরে ওঠে না। গাঁক গাঁক চেঁচায় ঠিকই, কিন্তু তাকেই ঢোক গিলতে হয় শেষমেষ। কত দিন রাগের মাথায় খাওয়া ছেড়ে উঠে গেছে তাতাই !

আজও তাতাই হাত গুটিয়ে বসেছে। অদিতি ছেলের চুল ঘেঁটে দিল,—খা, খা, খেয়ে নে।

সুপ্রতিম আড়চোখে তাতাইকে দেখে বলল,—থাক, ওকে আর অত আহ্লাদ দিতে হবে না। হ্যাঁ, কার কথা যেন বলছিলে ?

সবাইকে খেতে দিয়ে নিজেও বসে গেছে অদিতি। একটু ঘুগনি মুখে তুলে বলল,—হেমেনমামা। আমার ছোটমামার বন্ধু। আমাদের আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে খুব আসত। লেখক।

পাপাই মুখ তুলেছে,—লেখক ? পুরো নাম কী ?

অদিতি এক সেকেন্ড ভেবে বলল,—হেমেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক।

—ওই নামে কোনও লেখক আছে বলে তো শুনিনি ?

তাতাই ঝেঁঝে উঠল,—তুই কি সব লেখকের নামও জেনে বসে আছিস ? আমি হেমেন্দ্র কি যেন মল্লিকের তিনটে উপন্যাস পড়েছি।

—তুই। উপন্যাস। বাংলা ! মা শুনছ.. ?

—আহ্ তাতাই। অদিতি ছোট ছেলের গরগরে ভাবটা থামাতে চাইল। সুপ্রতিমের দিকে ঘুরে বলল,—লেখক মানে সেরকম নামকরা কেউ নয়। এক সময়ে খুব লিখত-টিখত। কবে যেন ছোটমামার ভবানীপুরের বাড়িতে গেছিল, সেখান থেকে আমার ঠিকানা জোগাড় করে এসেছে।

—হঠাৎ তোমার কাছে কেন ?

—এমনিই। তেমন কিছু কারণে নয়। অদিতি কুণ্ঠিত মুখে হাসল, —আমি এক সময়ে লিখতাম-টিখতাম তো, আমাকে খুব স্নেহ করত।

—তুমি লিখতে ? রাগ ভুলে তাতাই-এর চোখ বড় বড় ।

—হ্যাঁরে হ্যাঁ । স্কুল ম্যাগাজিনে আমার কত কবিতা বেরিয়েছে, কলেজ ম্যাগাজিনে গল্প বেরিয়েছে, কলেজে আমাদের বাংলার টিচার অন্নপূর্ণাদি কী প্রশংসা করেছিল গল্পটার । বিশ্বাস না হয় তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ ।

—আমি ! আমি কী করে জানব ! সুপ্রতিম যেন আকাশ থেকে পড়ল ।

—বাজে কথা বোলো না । আমি নিজে তোমাকে বলেছি । বিয়ের পর পরই । শুধু আমি কেন ? মা বলেছে, দাদা বলেছে...

—ও বিয়ের সময়ে মেয়েদের ওরকম অনেক গুণের কথা শোনা যায় । সবকিছু কি সত্যি বলে ধরে নিতে আছে ? ছেলেদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল সুপ্রতিম, —তোমার মা তো বিয়ের সময়ে বলেছিল তুমি নাকি দারুণ আমিষ রান্না করো, প্রথম দিন আমাদের বাড়িতে মাংস রাঁধতে গিয়ে কী করেছিলে ? নুনেপোড়া ! ঘ্যাঁট ! নেহাত বাবা নতুন বউ-এর মুখ চেয়ে জলে ধুয়ে ধুয়ে খেয়ে নিয়েছিল ।

অদিতি আহত মুখে বলল,—তুমি মাংস রান্নার সঙ্গে গল্প লেখার তুলনা করছ ?

—ওই হল । দুটোই মশলা-টশলা দিয়ে পাকাতে হয় । কোনওটা লোকে চিবিয়ে খায়, কোনওটা গেলে ।

—তুমি তো বলবেই । একটা বই-এর পাতাও খুলে দেখেছ কখনও ? যারা এ সব নিয়ে চর্চা করে তারা জানে গল্প লেখা কী কঠিন কাজ । জানো, হেমেনমামা আমাকে কী বলছিল আজ ? বলছিল তুমি এত ভাল লিখতে... লেখাটা একদম ছেড়েই দিলে ?

—অত আফসোস করার কী আছে ? লেখো না, কে বারণ করেছে ।

—হ্যাঁ মা, একটা আত্মজীবনী লিখে ফেলো । এক গৃহবধূর স্মৃতিকথা । পাপাই ফুট কাটল, —শেষ করতে পারলে ছাপানোর বন্দোবস্ত করা যাবে ।

তাতাই এখনও ঠাণ্ডা হয়নি । চোখ টেরিয়ে তাকাল দাদার দিকে,—কে ছাপিয়ে দেবে ? তুই ?

—উঁহু । বাবা । মার একটা বই ছাপানোর জন্য তুমি আট দশ-হাজার টাকা খরচ করতে পারবে না বাবা ? মা অবশ্য তোমার নামে বইতে অনেক ভাল ভাল কথা লিখে দেবে ।

সুপ্রতিম হো হো হেসে উঠল,—মাত্র আট-দশ হাজার একটা ব্যাপার হল ? তোর মা শাড়ির ব্যবসা করতে গিয়ে আমার কত ধসিয়েছে ইম্যাজিন করতে পারিস ? ষোলো হাজার । সিক্সটিন থাউজ্যান্ড ।

অদিতি ক্ষীণ প্রতিবাদ করল,—আমি তোমায় কিচ্ছু ফেরত দিইনি ?

মুরগির হাড় থেকে খুঁটে খুঁটে মাংস ছাড়াচ্ছে সুপ্রতিম । বলল,—দিয়েছ বলেই ষোলো হাজার বললাম, নইলে কুড়ি বলতাম ।

অদিতি একদম মিইয়ে গেল । সত্যি, মাঝে কী যে ভূত চেপেছিল মাথায় । সময় কাটে না, ব্যবসা করব । সুপ্রতিমই মূলধন জোগাল । সময় কাটার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে যদি দুটো পয়সা আসে মন্দ কী ! ট্যাঙোস ট্যাঙোস করে বড়বাজার থেকে পাইকারি দরে শাড়ি কিনে আনছে অদিতি, দাম ফেলে পরিচিতদের মধ্যে বেচছে । ইনস্টলমেন্টে । কুড়ি পারসেন্ট লাভ । তা ওই ব্যবসা কি অদিতিকে দিয়ে হয় ! প্রথমেই ফস করে আসল দাম বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে, ঝুপঝাপ দাম কমিয়ে দেয়, তিনটে ইনস্টলমেন্ট শেষ পর্যন্ত ছ'টা আটটায় গিয়ে দাঁড়ায় । তাও দাম চাইতে লজ্জা করে, নিজেকে কেমন কাবুলিওয়ালা কাবুলিওয়ালা মনে হয় । কিছু কিছু আত্মীয় তো রীতিমতো শাহেনশা । খুকু, তুই কিন্তু অনেক দিন আমাকে পুজোতে শাড়ি দিস না, এটা তোর নাম করে রেখে দিলাম ! তুমি যেন কত পাবে বউদি, দেড়শো ! সে কী, তিনশো কী করে হয়, গত মাসে আমি দেড়শো দিয়ে এলাম না ! একটা একশো টাকার নোট, পাঁচটা দশ টাকার নোট ! বছরখানেক পরে বউ-এর ব্যবসার হিসেব কষতে গিয়ে সুপ্রতিমের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় । দুঁদে এরিয়া সেলস ম্যানেজারের বউ হয়ে অদিতি স্বামীর সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে ! অদিতি বেচারি আর কী করে, কিছু শাড়ি দামে দামে ছেড়ে, কিছু নিজেই পরে, ব্যবসা গুটোল । এই বিল্ডিং কমপ্লেক্সেই কিছু না হলেও তিন-চার হাজার

টাকা পড়ে আছে, সে কি আর উদ্ধার হবে !

অদিতি গুম হয়ে খাওয়া সারল। রাত্রে শোওয়ার আগে চুল বাঁধতে বাঁধতে তুলল কথাটা, —ছেলেদের সামনে আমাকে ওভাবে টাকার খোঁটা দিলে ?

সুপ্রতিম ঘরে এসে খবরের কাগজের পাতায় ডুবে ছিল। খবরে নয়, শেয়ারের দরে। তামাম ভারতের স্টক এক্সচেঞ্জ গেলা না হলে রাতে সুপ্রতিমের ঘুম আসে না। কোন শেয়ারের দাম পড়ছে, কোনটা চড়ল, প্রতিদিন তার হিসেব রাখা চাই। নেশা।

অদিতির কথা যেন কানে গেল না সুপ্রতিমের। অদিতি আবার বলল, —ছেলেদের সামনে আমাকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করে তোমার কী লাভ হয় ?

তরলভাবে এবার উত্তর দিয়েছে সুপ্রতিম, —হলটা কী ? গজগজ করছ কেন ?

অদিতির চোখে জল এসে গেল, —তুমি আমাকে ছেলেদের সামনে মিথ্যেবাদী পর্যন্ত বললে !

—যাহ্ বাবা, মিথ্যেবাদী কখন বললাম ?

—বলোনি ? বুকে হাত দিয়ে বলো, আমি তোমাকে আমার লেখার কথা বলিনি কোনওদিন ? নিজে তুমি তখন বলেছিলে ও বাড়ি থেকে আমার ম্যাগাজিনগুলো এনে পড়বে.. !

—ও, এই জন্য গোঁসা ! সুপ্রতিম গাল ছড়িয়ে হাসল। খেপাচ্ছে অদিতিকে, —আমি মোটেই ও কথা বলিনি। খালি বলেছি তুমি যে লিখতে এটা আমার তেমন বিশ্বাস হয়নি।

—সেটাও তো কোনওদিন বলোনি।

—কী বলিনি ?

—যে আমার কথা বিশ্বাস হয়নি !

সুপ্রতিম মুচকি হাসল, —নতুন বউকে এ কথা কেউ বলে ? তুমি যদি তখন বলতে ঘোড়া চালাতে পারি, পাহাড়ে চড়তে পারি, সে কথারও আমি থোড়াই প্রতিবাদ করতাম।

—তোমার পেটে পেটে এত প্যাঁচ ছিল ?

—প্যাঁচ নয়, সেলফ ডিফেন্স। কে আর নতুন বউ-এর মুখ ভার দেখতে চায় !

অদিতি কথা বলল না। নাকের পাটা ফুলিয়ে জোর জোর চিরুনি চালাচ্ছে চুলে। এখনও তার চুল বেশ লম্বা, কেশচর্চায় সময় যায় তার। ফিতের এক পাশ দাঁতে চেপে অনেকক্ষণ ধরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চুলের গোড়া বাঁধল। দীর্ঘদিনের অভ্যাস। আলগা চুল বড় পিছলে যায় বালিশে, অদিতির অস্বস্তি হয়।

বিনুনি শেষ হতে হতে অভিমানটা কমে এল অদিতির। তার রাগ ক্ষোভ অভিমান সবই শরতের মেঘের মতো ক্ষণস্থায়ী। এই বৃষ্টি, এই রোদ্দুর।

চিরুনি থেকে চুল ছাড়িয়ে অদিতি উঠে গেল জানলায়। উড়িয়ে দিচ্ছে চুল। জানলা থেকেই বলল, —হেমেনমামার চেহারাটা দেখে আজ খুব মায়া হল।

—খুব মায়াবী চেহারা হয়েছে নাকি ?

অদিতি হেসে ফেলল। সুপ্রতিম বড্ড ফাজিল। পঞ্চাশ বছর বয়স হতে চলল, ফক্কুড়ি কমল না। হাসতে হাসতে বলল, —নাগো, কী ছিল, কী হয়েছে ! প্রথম যেদিন ছোটমামার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এল, আমি তো একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কতই বা তখন বয়স হবে ? সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ। আমিই তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। কী দেখতে ছিল তখন হেমেনমামা ! লম্বা চাবুকের মতো শরীর, টকটকে রং, খাঁটি গ্রিকদের মতো নাক, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা... লেখক বলতে যে চেহারা মনে আসে ঠিক সেইরকম। এখন একদম ঝিরকুটি মেরে গেছে।

—মন খারাপ লাগছে ?

—লাগারই তো কথা। অত সুন্দর চেহারা, ওরকম বুড়োটে মেরে গেলে...

সুপ্রতিম খুচখাচ পেনসিল চালাচ্ছিল কাগজে। গোল করে দাগ টানছিল। থামল। চালশে চশমা খুলে দোলাচ্ছে।

—প্রেমে পড়েছিলে মনে হচ্ছে ?

—পড়লে তো ভালই হত। অদিতি ছদ্ম শ্বাস ফেলল, —লোকটার একটা হিল্লে হত।

—মানে ? বিয়ে করেননি ?

—না। সাহিত্যপাগল লোক, ওই নিয়েই থাকত। কী একটা কাগজ বার করত যেন। ছোটখাটো কাগজ। তারপর হঠাৎ একটা স্কুলে চাকরি নিয়ে আলিপুরদুয়ার চলে গিয়েছিল।

—হাফসোল কেস নাকি ? কলকাতা ছেড়ে একেবারে আলিপুরদুয়ার ?

—হতে পারে। আমারও তাই ধারণা।

—মেয়েটি কে ? তুমি নও তো ?

—যাহ্, কী যে বলো না ! আমার থেকে কত বড়...। মামার বন্ধু, সে তো মামাই।

—সাউথ ইন্ডিয়াতে মামা-ভাগনি কিন্তু খুব রোমান্টিক রিলেশান। সুপ্রতিম লম্বা আড়মোড়া ভাঙল, —এমন তো হতে পারে, ভদ্রলোক তোমার নীরব প্রেমিক ছিলেন ! না হলে অ্যাদ্দিন পর খুঁজে খুঁজে তোমার কাছে এলেন কেন ?

—মোটেই না। বললাম তো আমার লেখা হেমেনমামার খুব ভাল লাগত। অদিতি বিছানায় এসে বসল, —হেমেনমামা কলকাতায় ফিরে আবার কাগজ বার করছে। আমাকে সেখানে লিখতে বলছিল।

—বাহ্, ভালই তো। লেখো। কী লিখবে ? কবিতা, না গল্প ?

—দুর, এই বয়সে আর লেখা হয় নাকি !

—কেন হবে না ? যা পারবে লিখবে, উনি তো ছাপিয়ে দেবেন। সুপ্রতিম সিগারেট ধরিয়েছে। টানছে আয়েশ করে,—নিজেই তো বলো সময় কাটে না। কাটাও সময়। নাকি তাতেও আলস্য ? এত কুঁড়ে কেন ?

সুপ্রতিমের এই টিপ্পনীটা অদিতিকে বেঁধে খুব। অদিতি কুঁড়ে। বিয়ের পর থেকে কীভাবে দিন কেটেছে অদিতির, সুপ্রতিম কি জানে না ? শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করে, দেওর ননদদের কলেজ ইউনিভার্সিটির ভাত জুগিয়ে, দুই দস্যি ছেলের পিছনে চরকি কেটে কতটুকু সময় থাকত অদিতির হাতে ? ক্রমে ক্রমে সুপ্রতিমের পদোন্নতি হল, দেওর ভাল চাকরি পেয়ে চলে গেল লখনউ, দুই ননদের একে একে বিয়ে হয়ে গেল, এক বছরের তফাতে শ্বশুর-শাশুড়ি দুজনেই গত হলেন, নতুন ফ্ল্যাট কিনে সেলিমপুরে উঠে এল অদিতিরা, তাতেও কি অবসর মিলেছিল ? পাপাই তাতাই-এর পড়াশুনো নিয়ে কোনওদিন এতটুকু ভাবতে হয়নি সুপ্রতিমকে, সে শুধু সংসারে টাকা দিয়েই খালাস। আগে অফিসই তার ধ্যানজ্ঞান ছিল, এখনও অফিসই তার কাশী বৃন্দাবন। তফাতের মধ্যে তফাত, তখন ছুটত মালদা মুর্শিদাবাদ শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি, এখন ওড়ে ভুবনেশ্বর, পাটনা, রাঁচি গৌহাটি, কটক। আর মাঝে মাঝেই তার স্বর্গধাম—মুম্বাই হেডঅফিস। এরই মধ্যে দুই ছেলে মাধ্যমিক করল, উচ্চমাধ্যমিক করল, দেখতে দেখতে ঢুকে গেল কলেজে, কোনওটাই এলেবেলে ভাবে নয়, রীতিমত দাপিয়ে দুপিয়ে, এত কিছু তো আর হাওয়ায় ভেসে ভেসে হয়নি ! নিত্যি ছেলেদের স্কুলে ছোটা, এর টিউটোরিয়াল খোঁজা, ওর মাস্টার ঠিক করা, কে কোন সাবজেক্টে পিছিয়ে পড়ছে তার হদিস রাখা, ভোরে পাপাই-এর ক্রিকেট প্র্যাকটিস তো বিকেলে তাতাই-এর সাঁতার ক্লাব, দুই ছেলের অবিরাম বায়না আবদার—এ সব তো অদিতি কুঁড়েমি করেই সেরেছে কিনা ! পাপাই যদি এ কাঁধ ধরে ঝোলে, তো তাতাই লাফায় অন্য কাঁধে। হিমশিম দশা। এর সঙ্গে বাজারহাট, সংবৎসরের হরেকরকম কেনাকাটা, লোকলৌকিকতা। পায়খানা পরিস্কার করার অ্যাসিড কেনা থেকে শুরু করে সুপ্রতিমের টাই বাছা, সব একা হাতে করতে হয়েছে অদিতিকে।

আজ সুপ্রতিম বলে অদিতি কুঁড়ে !

হ্যাঁ, এখন অদিতির সময় অঢেল। দুপুর বিকেল সন্ধে অনেকটাই এখন হাতের মুঠোয়। ছেলেরা আর গায়ে লেপটে থাকে না। অদিতির অ্যাপেনডিসাইটিস অপারেশনের পর থেকে দু বেলা রান্নার লোক রাখা হয়েছে। পাপাই অল্পস্বল্প বাজারহাট করে দেয়। আর সুপ্রতিম তো নটার আগে বাড়িই ফেরে না। ফাঁকা ফ্ল্যাটে অদিতির তো এখন সময়ই সময়।

সময় আছে। সময় চলেও গেছে।

যা যায়, তা তো চলেই যায়। নদীর এক জলে কি দ্বিতীয়বার স্নান করতে পারে মানুষ ? এই

বয়সে লেখার কথা ভেবে লোক হাসিয়ে লাভ কী ? তাব চেয়ে বোধহয় কুঁড়েমির অপবাদ শোনা ঢের ভাল।

অদিতি ছোট্ট শ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। রাত্রে গলাটা বার বার শুকিয়ে যায়, ঘরে জল এনে রাখতে হবে।

সুপ্রতিম অ্যাশট্রেতে সিগারেট নেবাচ্ছে। ডাকল অদিতিকে, —এই, টেবিল থেকে আমার ফাইলটা দাও তো।

—তুমি এখন শোবে না ? কাজ নিয়ে বসবে ?

—না না, দেখব একটু। এই পাঁচ-দশ মিনিট।

ফাইল দিয়ে অদিতি রান্নাঘরে এল। গ্যাসের ওপর গরম দুধ রেখে গিয়েছিল, ঠাণ্ডা হয়েছে, এবার ফ্রিজে তুলতে হবে। কম্পাউন্ডে আজকাল প্রায় রাতেই চোর আসছে, পরশুদিনও রেনপাইপ বেয়ে পাশের ফ্ল্যাটে উঠেছিল। চোররা একটু জিপসি ধরনের হয়, এক পাড়ায় তারা বেশিকাল ঘাঁটি গাড়ে না। তবু সাবধানের মার নেই, রান্নাঘরের জানলা ভেতর থেকে ভাল করে দড়ি বেঁধে বন্ধ করল অদিতি। দশ বছর হল ফ্ল্যাটে এসেছে, এর মধ্যে একবার মাত্র কলি ফেরানো হয়েছে, তাও প্রায় চার বছর আগে, রান্নাঘরের দেওয়ালের অবস্থা বেশ খারাপ, এই শীতেই বাড়িটা রং করাতে হবে। রান্নাঘরে কি আরও ফুটখানেক টাইলস লাগিয়ে নেবে ? নিলে হয়।

বাথরুম সেরে, জলের জগ হাতে ঘরে ফিরছিল অদিতি, অভ্যেসবশে ছেলেদের ঘরে উঁকি দিল একবার। বড আলো নেবানো, তাতাই নিজের খাটে ঘুমোচ্ছে। রেগে থাকলে বেশি রাত অবধি টিভি দেখে না তাতাই, ফোলা মুখে ঘুমিয়ে পড়ে। ছেলেমানুষ। টেবিলল্যাম্প জ্বেলে পড়াশুনো করছে পাপাই। দিনের বেলা পাপাই বই ছোঁয় না, রাতই তার পড়ার সময়। জেগে থাকতেও পারে বটে। একটাই শুধু অনুষঙ্গ প্রয়োজন। কফি। হায়ার সেকেন্ডারির সময় থেকে ধরেছে নেশাটা। ছেলে চাইলেও অদিতি অবশ্য এখনও খুব কড়া কফি দেয় না পাপাইকে, বেশি করে দুধ দিয়ে দু আড়াই কাপ মতন ফ্লাস্কে ভরে দেয়। কফি তাও ভাল, ভাগ্যিস তাতাই-এর মতো সিগারেটের নেশা হয়নি ! ওইটুকুনি পুচকে তাতাই-এর গা দিয়ে কী ভুক ভুক তামাকের গন্ধ বেরোয় ! সুপ্রতিম শুনে বলেছিল, আমি ওই বয়সে বিড়ি খেতাম ! হুঁহ্, বাপ কা বেটা।

অদিতি ঘরে এল।

এক ঢোক জল খেয়ে ড্রেসিংটেবিলে জগ রাখল অদিতি, পাখাটা দু পয়েন্ট কমিয়ে দিল। ভোরের দিকে বেশ ঠাণ্ডা পড়ছে আজকাল, পাখার হাওয়ায় শীত শীত করে। এ ঘরের দুটো জানলাই উত্তরমুখী, তাই শীতলতাও বেশি। ঠাণ্ডার সময় দিনদুপুরে হাড় কাঁপে।

মশারি টাঙিয়ে শুয়ে পড়েছে সুপ্রতিম। ঠিক শোয়ওনি, আধশোওয়া। ফাইল পড়ছে।

অদিতি অপ্রসন্ন মুখে বিছানার ভেতরটা দেখল, —আজও তুমি সুজনি দুটো নাওনি ?

—সরি। ভুলে গেছি।

—এত ভুলো মন কেন ? মশারি টাঙানো, আর বিছানায় বালিশ চাদর নেওয়া, এই দুটোই তো তোমার কাজের মধ্যে কাজ। তাতেও রোজ ভুল ?

—বলছি তো সরি। নিয়ে নাও না। সুপ্রতিম চশমা মাথার পিছনে রাখল। ফাইলটাও। হাই তুলতে তুলতে বলল, —আমার অত সুজনি ফুজনি লাগে না। তোমারই শীত বেশি।

—তাইই তো। ভোরবেলা আমিই খকখক কাশি কিনা ! বাক্সখাটের গহ্বর খুলে সুজনি বার করল অদিতি, আলতো ঢুকিয়ে দিল বিছানায়।

আশপাশে কোথাও টিভি চলছে, বোধহয় কেবল্ টিভির সিনেমা। শব্দটা চাপা কোলাহলের মতো ভেসে আসছে ঘরে। কোনও ফ্ল্যাটে ঝনঝন বাসন পড়ল, কোথাও কেউ একটা চিৎকার করল হঠাৎ, বাঁকের মুখে এসে শিয়ালদাগামী শেষ লোকাল ট্রেন তীক্ষ্ণ হুইসিল্ বাজাচ্ছে, সমস্ত শব্দই বড় জ্যান্ত লাগে এ সময়ে।

অদিতি বিছানায় এল। মশারির চালে রাখা বেডসুইচ টিপে অন্ধকার করল ঘর।

সুপ্রতিম চিত হয়ে শুয়েছে। বলল, —গোলেমালে কথাটা বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। আমার

একটা ভাল নিউজ আছে।

—কী ?

—সামনের মাস থেকে আর শেয়ার ট্যাক্সির ধান্দা করতে হবে না, অফিস গাড়ি দিচ্ছে।

—তাই ?

—ইয়েস। অবশ্য আমার একার জন্য নয়। যাদবপুরে অ্যাকাউন্টস-এর সেন আছে, ও আর আমি যাব। অফিসে গাড়িটা টোটালি আমার কনট্রোলে থাকবে।

—হুঁ।

—হুঁ হুঁ করছ কেন ? মানেটা বুঝছ ? কোম্পানিতে আমার ইম্পর্টেন্স বাড়ছে। যদ্দুর আমার কাছে খবর আছে মুম্বই অফিস ইজ টেকিং অ্যাকটিভ ইন্টারেস্ট অন সুপ্রতিম মজুমদার। একটা বড় পে-হাইক হতে পারে।

—ভাল তো।

—ভাল, কিন্তু প্রবলেমও আছে। শুনছি জেমসন ইন্ডিয়া নাকি আমাদের সঙ্গে অ্যামালগামেট করে যাবে। নামেই অ্যামালগামেশান, ওদের যা ক্যাপিটাল, গিলেই নেবে আমাদের। এমনি কিছু না, মাইনেপত্তর পার্কস ফার্কস নিয়ে প্রবলেম নেই, তবে মাথার ওপর একগাদা আননোন্ লোক এসে যাবে... পঁচিশ বছর চাকরি করছি, এখন কি আর উটকো লোকের দাপট ভাল লাগবে ? ...আমার একটা ওয়ার্কিং প্যাটার্ন আছে, সে সব যদি তাদের পছন্দ না হয়...

এ সব কথা মনোযোগ দিয়েই শোনে অদিতি। তার স্বামী একজন কর্মঠ মানুষ, খেটে খেটে উঁচুতে উঠেছে, ফাঁকিবাজি স্বভাব নেই, কোম্পানিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, চোর জোচ্চোর ঘুষখোর লোভী নয়, এমন লোকের কাজকর্মের গল্পে স্ত্রীর আগ্রহ থাকাটাই তো স্বাভাবিক। সুপ্রতিমের চোখ দিয়ে ভিন্ন স্বাদের বৃহত্তর পৃথিবীর সন্ধান পাওয়া, এই বা কি কম প্রাপ্তি অদিতির ?

শুনতে শুনতে অদিতি ডুবতে থাকে সুখের নিদ্রায়। ঘুমপাড়ানিয়া গানের মতো কথা বলে যেতে থাকে সুপ্রতিম। একাই। সেলস লাইনে চাকরি করার সবথেকে বড় সুবিধে তার কথা কেউ শুনছে কি না তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার হয় না। কথা বেচেই খাওয়া। কথা বলেই সুখ। কথা শুনিয়েই ঘুম।

আজও ঘুমিয়ে পড়েছিল অদিতি। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। ব্যালকনিতে পাখিটা ভীষণভাবে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

অদিতি সুপ্রতিমকে ঠেলল, —এই, কার্নিশে বেড়াল এসেছে বোধহয়। একটু দ্যাখো না।

সুপ্রতিমেরও চোখে তন্দ্রা এসেছিল। বিরক্ত মুখে বলল, —একটু ঝাপটাক ডানা। আমাদের গ্রিল দিয়ে বেড়াল ঢুকতে পারবে না।

অদিতি আলো জ্বালাল, —নাগো, পাখিটা খুব ভয় পাচ্ছে। যাও না একটু, বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এসো।

—আমি পারব না। তোমার পাখি, তুমিই যাও।

—প্লিজ যাও। আমার উঠতে ইচ্ছে করছে না।

—জ্বালালে। দুম দুম করে বিছানা থেকে উঠে গেল সুপ্রতিম। একটু পরেই ফিরে এসেছে। পাখিটাও নীরব।

অদিতি কোমর অবধি সুজনি টেনে নিল, —বেড়াল এসেছিল, না ?

—দ্যুৎ, সেই কোন ওদিকের পাঁচিলে বসে আছে... পাখিটা তোমার একেবারে রাম বোকা।

—এখনও আছে বেড়ালটা ? তা হলে তো আবার এক্ষুনি ডানা ঝাপটাবে।

—আর ঝাপটাবে না। খাঁচাটাকেই চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। ও ব্যাটা বেড়ালটাকে আর দেখতেই পাবে না।

সুপ্রতিম আলো নিভিয়ে দিল।

তিন

নিস্তরঙ্গ পুকুরে এক কুচি ঢিল পড়লেও তরঙ্গ ওঠে বইকী। তবে সেই তরঙ্গের স্থায়িত্ব আর কতটুকু ? দশ সেকেন্ড, বিশ সেকেন্ড, বড় জোর এক মিনিট ! এ তরঙ্গ বড় মৃদু, শক্তিহীন। দুর্বল বৃত্তাকার ঢেউ হয়তো একসময়ে কাঁপতে কাঁপতে পাড়ে এসে পৌঁছয়, কিন্তু তখন তার অস্তিত্বই অনুভব করা কঠিন। স্থির পুকুরের দিকে তাকিয়ে কে তখন বলবে, একটু আগে ঢিল পড়েছিল এখানে ?

হেমেনমামা নামক মানুষটিরও চকিত আগমন অদিতির কাছে অনেকটা এই গোত্রেরই ঘটনা। ছোট্ট এক সুখস্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে অদিতির মনোজগতে ক্ষীণ আলোড়ন জাগিয়েছিল হেমেনমামা, ক্ষণকাল অদিতির চিত্ত উদ্বেল রইল তাতে, তারপর আবার সব স্বাভাবিক। সংসারের পাড়ে অচিরেই হারিয়ে গেল তরঙ্গ, কোনও অভিঘাতই সৃষ্টি করতে পারল না।

অদিতিও নিশ্চিন্ত। খাঁচার পাখির সঙ্গে সময় কাটছে তার, স্বামী ছেলেদের ভাবনা ভেবে দিন যাচ্ছে, সময়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পার করছে সময়।

অথবা সময় কাটছে না।

তাতেই বা অদিতির কী এল গেল ? সময় তো আর সত্যি সত্যি নিশ্চল অনড় এক পাহাড় নয়, যেমন ভাবেই হোক সে ঠিক গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে যাবে।

যাচ্ছেও তো। সুপ্রতিম গত সপ্তাহে তিনদিনের জন্য গৌহাটি ঘুরে এল, এই শনি রবিবার বন্ধুদের সঙ্গে দীঘায় উইকএন্ড কাটিয়ে এল তাতাই, পড়াশুনো নিয়ে আরও বেশি রাত জাগা শুরু হয়েছে পাপাই-এর। এও তো অদিতির দিন কাটা।

আলমারি খুলে শাড়ি বাছছিল অদিতি। হ্যাঙারে সার সার শাড়ি ঝুলছে, সবই দামি। কাঞ্জিভরম্ ঢাকাই কলাক্ষেত্রম্ বালুচরি বমকাই চান্দেরি। অদিতির পুজোর শাড়ি নিজে পছন্দ করে কেনে সুপ্রতিম, সেই বিয়ের পর থেকেই। বেশিরভাগই চড়া রং-এর। ঘোরতর রঙিন না হলে সুপ্রতিমের মনে হয় বুঝি ঠকা হল দামে।

বাসন্তী রং কাঞ্জিভরমটা বার করে উলটেপালটে দেখল অদিতি। নাহ্, এটা পরে যাবে না, একটু নোংরা হয়ে আছে। ছোট ননদের দেওরের বিয়েতে শেষ পরেছিল শাড়িটা, শ্রাবণে। তারপর আর কাচানো হয়নি। এত শাড়ির কটাই বা পরা হয় অদিতির ! তবু কেনা হয়, তবু ঝোলে। ঘেঁটে ঘেঁটে অদিতি এবার একটা বমকাই সিল্ক বার করল। এ শাড়িটারও রং বেশ চড়া, তুঁতে নীল। ছেলেরা বড় হয়েছে, এত গাঢ় রং আর পরতে ভাল লাগে না অদিতির। কিন্তু উপায় নেই। সুপ্রতিম আর অদিতির মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি আছে। আত্মীয়স্বজনের বাড়ির কোনও অনুষ্ঠানে অদিতি নিজের পছন্দমতো শাড়ি পরতে পারে, কিন্তু সুপ্রতিমের বন্ধুবান্ধবের বাড়ি গেলে সুপ্রতিমের পছন্দের শাড়ি পরতে হবে অদিতিকে। থাক, এটাই থাক তবে। এই শাড়িটার রং তাও চোখে একটু কম লাগে।

শাড়ি ব্লাউজটায় হালকা ইস্ত্রি চালাতে চালাতে তাতাই-এর গলা পেল অদিতি। বাড়ি ফিরেই হুকুম জারি শুরু করেছে, —সবিতাদি, আমাকে শিগগিরই কিছু খেতে দাও। এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে।

অদিতি দরজায় গেল, —এক্ষুনি তো ঢুকলি, এই সন্ধেবেলা আবার কোথায় বেরোবি ?

—কাজ আছে মা।

—কী কাজ ?

—আছে।

তাতাই হেলেদুলে নিজেদের ঘরে ঢুকছে, অদিতি পিছন পিছন এল, —তোর ব্যাপার কী বল তো ? সারাদিনে তো কখনও তোকে বই খুলতে দেখি না ?

তাতাই সোজা বিছানায় শুয়ে পড়ল। হাতের চেটোয় মাথা রেখে ফুঃ ফুঃ শব্দ করছে মুখে। মাকে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, —কে বলেছে পড়ি না ? আমি ভোরবেলা পড়ি।

—বাজে কথা বলিস না। উঠিসই তো সাতটার পর।

—তা হলে তখনই পড়ি।

—ফের বাজে কথা? উঠে তুই কী করিস আমি দেখি না? এক ঘণ্টা ধরে খবরের কাগজ চটকাস, তারপর টুক করে কোথায় বেরিয়ে গেলি, তারপর ফিরে এসেই হুড়দুম করে কলেজ। ...এর মধ্যে তুই পড়িসটা কখন?

তাতাই উত্তর দিল না। চোখ বুজে রয়েছে।

তাতাইটা চিরকালই এরকম। মহা ফাঁকিবাজ। জোর করে ধরে বেঁধে পড়াতে না বসালে পড়তই না। কম মার খেয়েছে অদিতির হাতে! স্কুল পালিয়ে সিনেমা যেত। টিউটোরিয়ালে ডুব মারত। নজর না রাখলেই বিপত্তি। অথচ আশ্চর্য, তাতাই রেজাল্ট কিন্তু খারাপ করেনি কখনও। পাপাই-এর মতো অত ভাল না হলেও মাধ্যমিকে স্টার, উচ্চমাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশান। উচ্চমাধ্যমিকের পর সায়েন্স ছেড়ে কমার্সে চলে গেল। জেদ করে। গ্র্যাজুয়েশানটাও কি এভাবে পার হবে তাতাই? তারপর?

অদিতি পায়ে পায়ে ছেলের কাছে এল, —হ্যাঁ রে, তোর দাদাকে দেখেও একটু শিখতে ইচ্ছে করে না?

তাতাই তড়াং করে উঠে বসেছে, —প্লিজ মা, কতদিন বলেছি দাদার সঙ্গে আমার তুলনা কোরো না। ও তো একটা বুকওয়ার্ম। পড়া, লাইব্রেরি, নোটস, স্যার এ ছাড়া ওর কোনও জগৎ আছে? আমি ওর মতো হতে চাই না।

দুই ভাইয়ে যে আকাশপাতাল তফাত এ সত্যটা বহুকাল আগেই টের পেয়েছে অদিতি। শুধু পড়াশুনো কেন, কোন বিষয়েই বা দুজনের মিল? পাপাই-এর টেবিল বইখাতা জামাকাপড় খাটবিছানা নিখুঁত গোছানো, তাতাই-এর সবই চূড়ান্ত এলোমেলো। আগে আগে অদিতি নিজের হাতে পরিষ্কার করত এ ঘর, এখন অদিতি ছুঁলেই নাকি তাতাই আর দরকারি জিনিস খুঁজে পায় না!

অদিতি ছেলের খাটে বসল, —কার মতো হতে চাস তুই?

সবিতা পরোটা তরকারি দিয়ে গেছে, দ্রুত গিলছে তাতাই। গাল ভর্তি খাবার নিয়ে বলল, —আমি আমার মতোই হতে চাই মা। দুনিয়ায় এক পিসই তাতাই থাকবে।

—সে তো তুমি এখনই আছ।

তাতাই ঢকঢক জল খেল খানিকটা, —তুমি আজ আমার পেছনে পড়লে কেন বলো তো? তোমার আজ একটা নেমন্তন্ন আছে না?

—কথা ঘোরাস না তাতাই। জীবনের সব পরীক্ষায় স্টেজে বাজিমাৎ হয় না।

অদিতির আঁচলে মুখ মুছে নিল তাতাই, —আজ রূপককাকুর ম্যারেজ অ্যানিভারসারি না? বাবা সেদিন বলছিল গ্যালা টুয়েন্টিফাইভ ইয়ারস...

ছেলের কায়দায় অন্যদিন হেসে ফেলত অদিতি, আজ একটু রুক্ষই হয়ে গেল, —অনেকদিন আমার হাতে কিন্তু মার খাসনি তাতাই। কোথায় টোটো করিস দিনরাত? কলেজ টলেজ যাস?

—তোমার খোচড়কে পাঠিয়ে খবর নিয়ে নিও। চোখের ইশারায় দাদার খাটটা দেখাল তাতাই। হাসছে, —বাবা কখন আসবে বলেছে? ছটা? বলেই তাতাই ঘড়ি দেখল একবার—এখন কিন্তু পৌনে সাতটা বাজে। বাবা ঠিক সাড়ে সাতটায় ঢুকবে। এখন থেকে সাজগোজে বসে না গেলে ম্যানেজ করতে পারবে না।

তাতাই উঠে পড়ল। বেরোচ্ছে। অদিতিকে আমল না দিয়েই। ফ্ল্যাটের দরজা অবধি গিয়েও ফিরে এল। দু হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে, —তোমাদের ফ্লাওয়ার বোকে টোকে লাগবে না? টাকা দাও তো এনে দিতে পারি।

—থাক। যেখানে চরতে যাচ্ছ যাও।

তাতাই দাঁড়িয়েই আছে। গাল চুলকোচ্ছে, —তা এমনিই কিছু দাও না। খুব বেশি নয়, গোটা পঞ্চাশ।

অদিতি কঠোর চোখে ছেলের দিকে তাকাল। পরশুই পঞ্চাশ টাকা নিয়েছিল তাতাই, আজ

আবার চাইছে, কী করছে টাকা নিয়ে ? শুধু সিগারেটে তো এত টাকা লাগে না ?

মায়ের চোখ দেখে দু হাত তুলে দিয়েছে তাতাই, —ওকে। লাগবে না। ভুরুটা সোজা করে নাও। নইলে রূপককাকুর বাড়িতে বাবার বদনাম হবে।

তাতাই চলে গেল।

ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসেও তাতাইকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছিল অদিতির। ছোট ছেলেটার বিপদের দিকে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। ক্লাস ফোরে পড়ার সময়ে সাঁতার শেখার জন্য খুব আবদার জুড়েছিল তাতাই, দুরন্ত ছেলেকে জলে ছাড়তে অদিতি রাজি হয়নি প্রথমে। বলেছিল, তুমিও দাদার সঙ্গে ক্রিকেট প্র্যাকটিসে যাবে। উহু, সাঁতারই শিখবে সে। কদিন মার কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করার পর ওইটুকু ছেলে একদিন একা একাই চলে গেছে লেকে। এমন সেয়ানা, বন্ধুকে দিয়ে খবরটা পাঠিয়েও দিয়েছে বাড়িতে। অদিতি হাঁচোড়পাচোড় করে ছুটে গিয়ে দেখে পাবলিক সুইমিং পুলে হাত পা ছুড়ছে তাতাই। জল খাচ্ছে মাঝে মাঝে, তবু মাকে দেখে কী হাসি ! হিড়হিড় করে বাড়ি নিয়ে এসে ছেলেকে খুব পিটিয়েছিল অদিতি, পরদিন ভর্তিও করে দিয়েছিল সাঁতার ক্লাবে। একবার তো, এই বছর দু-এক আগে, বন্ধুর দাদার মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে হাত পা ফালা ফালা করে এল। আবার কোনও বিপজ্জনক খেলায় মেতে উঠছে না তো তাতাই ?

বলে না। কিছুই বলে না। পাপাই তো বহুদিনই চুপচাপ, তাতাইও এড়িয়ে চলছে ! আগে তাও ছেলেদের ইচ্ছে অনিচ্ছেগুলো বুঝতে পারত অদিতি, এখন ছেলেরা তার চেনা না অচেনা এই নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে অনুক্ষণ। যদি কখনও মানুষ আবিষ্কার করতে থাকে তারই শরীরের অংশ একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, সেই বিচ্ছিন্ন অংশদের, হাত পা মুখ গজাচ্ছে ধীরে ধীরে, আলাদাভাবে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে তারা, তখন যে ঠিক কী অনুভূতি হয় !

অন্যমনস্ক মুখে সাজগোজ সারল অদিতি। খুব একটা প্রসাধন সে কোনওদিনই করে না। মুখে একটু হালকা ক্রিম কিংবা ফেসপাউডার, চোখে সামান্য কাজল, ছোট টিপ, আলতো লিপস্টিক, কিছু ছোটখাটো গয়না, এইটুকুই। তার চেহারাটা আগে বেশ ছিপছিপে ছিল, ইদানীং মেদ জমছে শরীরে, অপারেশনের পর থেকে শরীরটা যেন একটু ভারীই হয়ে গেল। তবে তার মুখ থেকে যৌবনের কমনীয়তা পুরোপুরি মুছে যায়নি। এক ঢাল কালো চুলে, ফর্সা ভরাট মুখে অদিতি এখনও দীপ্তিময়ী। সুপ্রতিমের বন্ধুমহলে অদিতির রূপের খ্যাতিতে ভাঁটা পড়েনি এখনও।

সুপ্রতিম এল ঠিক সাড়ে সাতটায়। যেন তাতাই-এর কথা শুনেই। এসেই হাঁকডাক শুরু করে দিল, যেমনটি এ ধরনের পার্টিতে যাওয়ার আগে সে করেই থাকে। একী, আমার জন্য ক্রিম কালারের পাঞ্জাবি বার করেছ কেন, এটা নয়, তসরের সেটটা দাও। দেখি দেখি তোমার মুখটা দেখি, টিপটা একটু বড় পরতে পারতে। আমার ইলেকট্রিক রেজারটা পাপাই-এর ঘরে আছে বোধহয়, বসে রইলে কেন, দেখো না। ওফ্, তোমার কোনও সেন্স নেই, এই পাঞ্জাবির সঙ্গে আমি ওই জ্যাকেট পরব ! আর একটু লিপস্টিক লাগিয়ে নাও, মুখটা ম্যাড়ম্যাড় করছে। কেমন হয়েছে বোকেটা বললে না তো ! নিউমার্কেট থেকে করিয়ে আনলাম ! টু থারটি ! শালা আমাকে তিনশো বলছিল !

বেরোনোর সময়ে মনটা খুঁতখুঁত করছিল অদিতির। সবিতা রান্না করে চলে গেছে, পাপাই ফেরেনি, মিনিট পাঁচ-দশ আরও দেখে গেলে হত। কিন্তু সুপ্রতিম যা তাড়া লাগাচ্ছে ! কোথাও যাওয়ার থাকলে সুপ্রতিম কখনই সময়ে বাড়ি ফেরে না, কিন্তু একবার বাড়ি এলে এক মিনিটও তর সয় না তার। অগত্যা পাশের ফ্ল্যাটে চাবি রেখেই বেরিয়ে পড়তে হল অদিতিকে।

রূপকদের বাড়ি বেশ দূর। বেহালা চৌরাস্তা পেরিয়ে। ট্যাক্সিতে প্রায় মিনিট কুড়ি লাগে। মহাবীরতলায় এ সময়টায় ট্রাফিক জ্যাম থাকে, আর একটু বেশিও লাগতে পারে।

রাত্রি গাঢ় হচ্ছে। কাল থেকে ঠাণ্ডাও পড়েছে বেশ। মাঝে মাঝে হাওয়া দিচ্ছে একটা, কামড় আছে হাওয়াটায়। মাঝ-অঘ্রানে এই হাল, শীত বোধহয় এবার জাঁকিয়ে আসবে।

ট্যাক্সির একটা কাচ খানিকটা উঠিয়ে দিল অদিতি, গলায় আলতো আঁচল জড়াল। সুপ্রতিম সিটে হেলান দিয়ে বসে, গানের কলি ভাঁজছে গুনগুন।

অদিতি বলল, —কায়দা করে জ্যাকেট না পরে গরম কিছু একটা পরতে পারতে।

—ছাড়ো তো, একি আবার ঠাণ্ডা নাকি ? ঠাণ্ডা ছিল গৌহাটিতে। ...ফিরবার সময়ে তো গরম হয়েই ফিরব।

অদিতি মুখ ফিরিয়ে নিল। তাতাইটা একটা পাতলা টিশার্ট পরে বেরিয়ে গেল, ঠাণ্ডা না লাগে। বাচ্চাবেলায় খুব সর্দির ধাত ছিল তাতাই-এর, গোটা শীতটা ভুগত। সাঁতার কেটে কমেছিল অনেকটা। মাধ্যমিকের পর থেকে আর সাঁতারে যাচ্ছে না তাতাই, ভোগান্তিও শুরু হয়ে গেছে। সিগারেট কটা করে খায় কে জানে !

আনমনে অদিতি বলল, —কোনওদিন তো সংসারের দিকে দেখলে না, ছোট ছেলেটার দিকে নজর করেছ ?

ফুলের তোড়া পাশে রেখে সিগারেট ধরিয়েছে সুপ্রতিম, বলল, —কেন, তার আবার কী হল ?

—হবে আবার কী। বড্ড ডোন্ট কেয়ার ভাব এসে গেছে।

—এই বয়সে ওরকম হয়। জোশ্। নতুন পাখনা গজাচ্ছে...। সুপ্রতিম টোকা দিয়ে দেশলাই কাঠি বাইরে ফেলল।

অদিতি একটু ভাবল। ছেলেদের নিয়ে সুপ্রতিমের সঙ্গে সে সচরাচর আলোচনা করে না, এটা তার নিজস্ব এলাকা।

তবু আজ চুপ থাকতে পারল না। বলল,—আমার তাতাই-এর সঙ্গীসাথীদের একটুও পছন্দ নয়।

—ওর তো চিরকালই সবরকম বন্ধু আছে। ভাল। খারাপ। ...দু-চারটে খারাপ বন্ধু থাকা ভাল। তাতে ছেলে বিগড়োয় কম। দ্যাখো না, বড় রোগ আটকাতে শরীরে ছোটখাটো জার্ম ঢোকাতে হয় ? নইলে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয় না। সুপ্রতিম বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাচ্ছে। দুল্‌কি চালে বলল—আমার সব বন্ধুরাই কি ধোয়া তুলসী পাতা ছিল নাকি ? সীতেশ বলে আমার একটি হেভি ইন্টিমেট বন্ধু ছিল, সে পরে গ্যাঙ্‌রেপের কেসে আসামি হয়ে যায়। ওরকম বন্ধু ছিল বলে আমি কি বখে গেছি ?

—তা নয়। তবু...

—অত পুতুপুতু কোরো না তো। সবার সঙ্গে না মিশলে ভাল খারাপ চিনবে কী করে ? তা ছাড়া সকলেরই কিছু না কিছু সৎ গুণ থাকে। সীতেশ কী সুন্দর কথা বলতে পারত। কাউকে কিছু বোঝাতে হলে দু মিনিটে কন্‌ভিন্স করে ফেলত। আমি তো ওর কাছে কথা বলার টেকনিক শিখেছি। মোদ্দা কথা হল, যে যার কাছ থেকে যা নেয়...

অদিতি অল্প বিমর্ষ হয়ে গেল। সুপ্রতিমের সঙ্গে পাপাই তাতাইকে নিয়ে যদি কখনও আলোচনা করতে যায়ও, সঙ্গে সঙ্গে যেন বিরোধী পক্ষ হয়ে যায় সুপ্রতিম।

গোমড়া মুখে অদিতি বলল—আমি তো বলিনি ওর সঙ্গীসাথীরা বদ, বলেছি ওদের আমার পছন্দ হয় না। কেমন যেন। আপস্টার্ট। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে বলে মনেই হয় না। কেমন বেনিয়া বেনিয়া ভাব। গাড়ি রয়েছে, মোটর সাইকেল রয়েছে...দামি দামি জামাকাপড় পরে...

—তা হলে তো ভাল খবর। ছেলে বেশ তালেবর হয়েছে। ওস্তাদ ওস্তাদ বন্ধু জোগাড় করেছে।

—হুঁহ্, তালেবরই বটে। কী খরচের হাত হয়েছে জানো ? পরশু পঞ্চাশ টাকা নিল, আজ আবার টাকা চায়...

—তাই ? সিগারেটে শেষ টান দিয়ে জানলার বাইরে ছুড়ল সুপ্রতিম। মুখে হাসিটি ধরে আছে—কাল তো ছোকরা আমার কাছ থেকে একশো টাকা নিল।

—তুমি তো আমাকে বলোনি ? অদিতি রুক্ষ হল সামান্য।

—বলার কী আছে ? চাইল...। অদিতির মুখ দেখে হুবহু তাতাই-এর মতো হাত তুলেছে সুপ্রতিম—ঠিক আছে, আর দেব না।

অদিতি গুম হয়ে গেল। ছেলেদের এই আলগা আদর দেখানোর স্বভাবটা আগাগোড়াই আছে সুপ্রতিমের। দুই ভাই এক খাটে শোবে না, শুলেই মারামারি, দুই ছেলের জন্য আলাদা আলাদা খাট

এসে গেল। তাতাই দাদার পুরনো প্যান্টজামা পরবে না, পুরনো বই ছোঁবে না, অতএব সেগুলো ফেলে দাও। একই জিনিস ডবল্ ডবল্ কিনে আনো। টেবিল চেয়ার আলমারি বুকসেলফ। দাদার যা আছে, ভাইয়েরও অবিকল তাই চাই। একবার অদিতি পাপাইয়ের জন্য একটা বড় ওয়াটার বটল্ এনেছিল, তাতাইয়ের জন্য একটু ছোট. সারাদিন পা ছড়িয়ে বসে কেঁদেছিল তাতাই। অদিতি বলেছিল, যত খুশি কাঁদ, ওই ওয়াটার বটল্‌ই ব্যবহার করতে হবে তোকে। সুপ্রতিম দু দিনের মধ্যে পাপাইয়ের মতো একটা জলের বোতল এনে দিল তাতাইকে। পাপাই অবশ্য মুখে তেমন আব্‌দেরে ছিল না কোনওদিনই, তবু তাকেও কম দিয়েছে সুপ্রতিম! পুজোর বাজারে বেরিয়ে সবথেকে দামি পোশাকটির দিকে জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকত পাপাই, নামিয়ে হাত বোলাত, সরাসরি চাইত না। সুপ্রতিম কিন্তু চিনে ফেলেছে সঙ্গে সঙ্গে। পাঁচশো সাতশো কুছ পরোয়া নেই। অত দামি জিনিস কিনে দিতে গা কিশকিশ করত অদিতির, মনে হত দু দিন বাদেই তো ছোট হয়ে যাবে, এ তো অপচয়! সুপ্রতিম নিরুত্তাপ। ফর হুম আই অ্যাম আর্নিং মানি ম্যাডাম। ছেলেদের ভালভাবে মানুষ করার জন্যই তো, নাকি!

ট্যাক্সি অনেকটা পথ চলে গেছে। নিউআলিপুর পেরিয়ে তারাতলার মোড় ঘুরল। রাস্তাঘাটে পথচারী কমে এসেছে, হয়ত চকিত ঠাণ্ডাটার জন্যই। গাড়িঘোড়ার ভিড় আছে, তবে তাও যেন আজ তেমন বেশি নয়।

সুপ্রতিম কাঁধ ছুঁল অদিতির—কেন এরকম মুড অফ করছ? একটা আনন্দের পরিবেশে যাচ্ছি...। আরে বাবা, তুমি হলে আমার সংসারের স্টিয়ারিং, সবাই আমরা তোমার কন্ট্রোলে থাকি। তোমার যা পছন্দ হবে না, স্ট্রেটকাট বলে দাও। দ্যাখো তোমার কথা কেউ শোনে কি না।

অদিতি কিচ্ছু বলল না। বড় করে নিশ্বাস নিল একটা। বাতাসটা অনেকক্ষণ জমিয়ে রাখল বুকে। ছাড়ল। হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল মুখে। ফুটল কি?

রূপকদের বাড়িটা দোতলা। নতুন। খুব বড় না, ছোটই। কিন্তু একদম রাস্তার ওপরেই। রূপক দোতলায় ছিল, সুপ্রতিমদের ট্যাক্সির আওয়াজ পেয়ে তরতরিয়ে নেমে এসেছে নীচে—কীরে, তোরা এত দেরি করলি?

—আর বলিস না। সুপ্রতিম টেরচা চোখে বেমালুম দেখিয়ে দিল অদিতিকে—পালিশ চুনকামে এত টাইম লাগাল! এই শাড়ি চলবে না, ওই শাড়ি চলবে না।

অদিতি কটমট করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সুপ্রতিম রূপকের হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে—মেনি হ্যাপি রিটার্নস্ অফ দা ডে। শালা, একসঙ্গে পঁচিশটা বছর পার করে দিলি মাইরি!

অদিতির বাড়িয়ে দেওয়া ফুলের তোড়া গদার মতো হাতে ঝুলিয়ে নিল রূপক। গর্বিত মুখে বলল—অফকোর্স। আশা করছি আরও পঁচিশ বছর কাটাতে পারব।

—দ্যাটস্ দা স্পিরিট। বন্ধুর কাঁধে জোর চাপড় মারল সুপ্রতিম, —মাল টাল কী আছে রে?

—যা চাস্। হুইস্কি রাম জিন ভদ্‌কা ব্র্যান্ডি। শ্যাম্পেনও একটা ছিল। ফ্রেঞ্চ। তোরা দেরি করলি, শেষ হয়ে গেল।

—কুছ পরোয়া নেই। ...কে কে এসেছে?

—সব্বাই। সোমেন তথাগত অনিরুদ্ধ...শুধু দীপকটা আসতে পারল না। ওর এমন একটা বিশ্রী ফ্যাচাং চলছে! বলতে বলতে আজকের দিনের জন্য ধুতিপাঞ্জাবি পরে নিপাট বাঙালি সেজে থাকা রূপক ঘুরল অদিতির দিকে—এই, তুমি ভেতরে যাও না। সীমারা সবাই তোমার জন্য ওয়েট করছে।

পার্টি বহুক্ষণ শুরু হয়েছে। বিয়ের রজত জয়ন্তী বলে কথা, উৎসবটা বেশ ঘটা করেই করছে রূপক। বন্ধুবান্ধব ছাড়া রূপকের আত্মীয়স্বজনও রয়েছে কিছু। শালা শালী ভাই ভাইয়ের বউ বোন ভগ্নিপতি। দোতলার ছোট হলঘর ফুল আর রাংতায় মোড়া। ঘরে হাল্‌কা সবজেটে আলো। দুটো পেল্লাই অ্যামপ্লিফায়ারে দ্রুত লয়ে ইংরিজি বাজনা বাজছে। হলঘরের একদিকে কাচঘেরা ব্যালকনি আজকের পানশালা। রূপকের দুই মেয়েও দৌড়ে দৌড়ে পানীয়ের গ্লাস ধরিয়ে দিচ্ছে অভ্যাগতদের। পান চলছে। নাচ চলছে। তালে। বেতালে। শাড়ি সালোয়ার জিনস্ ধুতি

কুর্তাপাজামা সবই আজ নাচপোশাক।

অদিতি হলঘরে বসেছিল। সুপ্রতিমের বন্ধুর বউদের সঙ্গে। কস্তুরী সুদীপা গোপা প্রণতি...। সীমা ভারী শরীর নিয়ে প্রজাপতির মতো উড়ে আসছে মাঝে মাঝে, আবার উধাও হয়ে যাচ্ছে অন্য নিমন্ত্রিতদের ভিড়ে। সে আজ সেজেছেও খুব। দারুণ জমকালো সাদা বেনারসি, মাথায় ফুলের মালা, গা ভর্তি গয়না। তবু যেন সীমার চোখে কীসের যেন একটা ক্লান্তি দেখতে পাচ্ছিল অদিতি। আজকের ধকলের ক্লান্তি ? না বয়সের ?

এ সব পার্টিতে কারও কোনও পৃথক কথা থাকে না। এক ধরনের কথাই গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, তার থেকেই ফুলকি ছিটে হঠাৎ হঠাৎ হাসির ফোয়ারা ওঠে। কখনও বা তা নেহাতই বিশ্রম্ভালাপ হয়ে যায়। সোমেনের বউ কস্তুরী আর তথাগতর বউ সুদীপা দুজনেই ভাল চাকরি করে, এ সব আসরে চাকুরে বউদের কথা একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে শোনে অন্য বউরা। প্রায় একই কথা বলে তারাও। সেই শাড়ি গয়না সিনেমা। পরচর্চা। সেই স্বামী ছেলে মেয়ে সংসার। কাজের লোক শাশুড়ি জা। তবু শোনে। প্রায় সকলেরই হাতে গ্লাস ঘোরে, সাধ্যমতো নাচেও কেউ কেউ। রেওয়াজ।

অদিতিও ওই সবই করছিল। শুধু পানটাই খুব সীমিত তার। কোনও ছুঁৎমার্গের জন্য নয়, অ্যালকোহল পেটে গেলেই মাথাধরা আর অম্বলের রোগটা তার চাগিয়ে ওঠে। এই ধরনের জমায়েত মন্দ লাগে না তার, কিন্তু কিছুতেই যেন তেমন উচ্ছল হতে পারে না। শোনা দেখাতেই তার সুখ বেশি, ডুবে যাওয়াতে নয়। স্বভাব।

সুপ্রতিম কিন্তু পার্টিতে এলেই টগবগে ঘোড়া। এক দমে গ্লাস নিঃশেষ করে দেরিতে আসা পুষিয়ে নেয়, তিন-চার পেগ গিলেই সে প্রস্ফুটিত হতে শুরু করে। উচ্চৈঃস্বরে বকে, প্রবল বিক্রমে হাত পা ছুড়ে নাচে, অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে অকারণে। কোনও কোনওদিন গানও শুরু করে। তার কণ্ঠটি যেমন বিশুদ্ধ বেসুরো, গানের কলিও তেমনই ভুলভাল। পার্টিতে এ সবই গা-সওয়া, অনেকেই সুপ্রতিমকে তাতিয়ে দিয়ে মজা লোটে খুব।

অদিতি আজ অত দূর গড়াতে দিল না। ঠেলেঠুলে এগারোটার আগেই তুলে ফেলল সুপ্রতিমকে। ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না, এই অজুহাতে।

ফিরছে অদিতিরা।

সুপ্রতিম সিটে মাথা দিয়ে গড়িয়ে আছে। হঠাৎ বলল—আজ পার্টিটা তেমন জমল না।

অদিতি ঠাট্টা ছুড়ল—কেন, বেশ তো শুরু করেছিলে। জন জানি জনার্দন। রম্ পম্ পম্। রম্ পম্ পম্। ড্রিঙ্ক করলেই ওরকম হয়ে যাও কেন ?

সুপ্রতিম সোজা হয়ে বসল—তুমি তো জানোই সুপ্রতিম মজুমদারকে মদ কখনও মাতাল করতে পারে না। ওটা তো একটু ধুম্‌কির ভান। একটু রিলিজ করা। বন্ধুবান্ধবদের পার্টিতেও যদি নিজেকে খুলতে না পারি, কোথায় খুলব বলো তো ?

—বয়স হচ্ছে এটা তো খেয়াল রাখবে ?

—বয়স ? বয়স তো একটা মেন্টাল ফিক্সেশান। বয়স টয়স বলে কিস্যু নেই। চঞ্চল বাতাস উঠেছে একটা, অদিতির কাচটা এ বার সুপ্রতিমই তুলে দিল। তিন-চারটে কাঠি নষ্ট করে সিগারেট ধরাল একটা। গম্ভীর মুখে বলল—বয়স যদি ফ্যাক্টরই হবে তবে দীপকের ইন্সিডেন্টটা হয় ? অ্যাট দিস্ এজ দে আর রানিং ফর সেপারেশান। শর্মিলা নাকি একটা তিরিশ বছরের ছেলের প্রেমে পড়েছে।

অদিতি মাথা রাখল সিটে—আমি তো উলটো শুনলাম। দীপকদাই নাকি একটা বুড়ির সঙ্গে লটঘট চালাচ্ছে।

সুপ্রতিম একটু চুপ করে রইল। তারপর হা হা হেসে উঠে বলল, —হতেও পারে। লেট দেম গো টু হেল্। কাম টু দা পয়েন্ট। আমরাও কিন্তু পঁচিশের দিকে এগোচ্ছি, মনে আছে ?

অদিতি শুধরে দিল—পঁচিশ নয় স্যার, সামনের জুলাইতে চব্বিশ হবে।

—কথা কেটো না। এই জুলাই না সই, সামনের জুলাইতে তো হবেই। তুড়ি মেরে হাই তাড়াল

সুপ্রতিম—রূপক কী করেছে, আমি এর থেকে অনেক গরজাস্ ফাংশান করব। মালাবদল টদল তো হবেই, ভাবছি একটা নহবৎখানা বসিয়ে দেব। সকাল থেকে প্যাঁ পোঁ সানাই বাজবে।

—ছিহ্, তোমার কি লজ্জাশরম নেই ? অত বড় বড় ছেলে...

—আরে, ওরাই তো হোস্ট্ হবে। প্রধান নিমন্ত্রণকর্তা। বাপের বিয়ে কাকে বলে দেখুক ছেলেরা ! নিজের বিয়েটা আমার কনট্রোলে ছিল না, এই সেরিমোনিটা পুরো আমার গ্রিপে থাকবে।

অদিতি হেসে ফেলল—সব ব্যাপার নিয়ে ফাজলামি করাটা তোমার আর গেল না।

—ফাজলামি নয়, আমি সিরিয়াস। সুপ্রতিম আচমকা ঘুরে বসল। চোখ ছোট করে দেখছে অদিতিকে। ঘাড় নেড়ে বলল, এই যে পঁচিশ বছর আমরা একসঙ্গে কাটিয়ে দিলাম, এটা কি কম কথা ! বিয়ে চাইলে অনেকবার হতে পারে, কিন্তু বিয়ের পঁচিশ বছর জীবনের একটা মাইলস্টোন্। এই পঁচিশ বছরে কনজুগাল লাইফে কী কী অ্যাচিভ করেছি তার একটা ডেমনস্ট্রেশান করব না ?

অদিতি আর হাসল না। অ্যাচিভ শব্দটা হঠাৎই ঘণ্টাধ্বনির মতো বেজে উঠেছে বুকে। এই পঁচিশ বছরে অদিতি কী অর্জন করেছে ? স্বামী পুত্র সংসার স্বাচ্ছন্দ্য নিরাপত্তা ? নাকি একটু একটু করে একা হয়ে যাওয়া ? এক ভাঙা ভাঙা নিঃসঙ্গতা ? কী ?

চার

অলকেশ বাস থেকে পিছলে পড়ে পা ভেঙেছে, প্লাস্টার করে শুয়ে আছে বিছানায়। ভাইঝির ফোন পেয়ে দুপুরবেলা আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে গেল অদিতি। দাদাকে দেখতে।

বাপের বাড়িতে অদিতির আজকাল আর তেমন আসা হয় না। মা যতদিন ছিলেন, এ বাড়ির সঙ্গে গ্রন্থিটা অনেক মোটা ছিল, রোজ না হলেও সপ্তাহে এক-আধবার তো আসতই। চার বছর আগে মা মারা গেলেন, তারপর থেকে গ্রন্থি ক্রমশ কৃশ থেকে কৃশতর। বিজয়া, ভাইফোঁটা ছোটখাটো পারিবারিক অনুষ্ঠান, এরাই এখন সম্পর্কর সুতো। দাদা বউদিও সেভাবে আসা যাওয়া করে কই ! একমাত্র দাদার মেয়েটাই যা যোগসূত্র। তুলতুলি যাদবপুরে এম এ পড়ছে, এখনও সে মাঝে মাঝে চলে আসে পিসির কাছে।

অদিতি একটা মোড়া টেনে দাদার সামনে বসল, —কীরে, পড়লি কী করে ?

অলকেশ মনমরা হয়ে শুয়েছিল, বোনকে দেখে মুখটা উজ্জ্বল হয়েছে। বলল—আর বলিস না, ভাবলাম লাফ দিয়ে পাদানিটা পেয়ে যাব, পাটা কিছুতেই উঠল না।

হাত দিয়ে দিয়ে দাদার ডান হাঁটুর প্লাস্টারটা নিরীক্ষণ করল অদিতি—একদম ভেঙেই গেছে, না মচকেছে ?

—না, ডিস্‌লোকেশন। সেট হয়ে যাবে। শুধু দেড় মাস শুয়ে থাকতে হবে এই যা।

—তোর ডান হাঁটুটাও কমজোরি হয়ে গেল রে দাদা !

—বাঁ পায়ের কথাটা তোর মনে আছে ?

—নেই আবার। পিনকাদা ন্যাড়াদার কাঁধে ভর দিয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে মাঠ থেকে ফিরলি তুই। ফিরেই কান্না, এ সিজন্‌টা আর আমার খেলা হবে না ! সারা রাত মা জেগে রইল, চুনহলুদ বাটা গরম করে লাগাচ্ছে বার বার। বাবা গজগজ করছে ! কেন এই খেলতে যাওয়া ! কেন এই খেলতে যাওয়া !

—হ্যাঁ, আমি যখন হাসপাতাল থেকে প্লাস্টার করে ফিরলাম, তুই তো দরজায় দাঁড়িয়ে খুব হাততালি দিয়েছিলি। খোঁড়া ল্যাঙ ল্যাঙ ল্যাঙ, কার বাড়িতে হাঁড়ি খেয়েছিস, কে ভেঙেছে ঠ্যাং !

অলকেশের কথা বলার ভঙ্গিতে ঘরসুদ্ধ লোক হাসছে। অদিতির বউদি ভাইপো ভাইঝি সব্বাই। অদিতিও হাসছিল। তবু মনের মধ্যে কোথায় যেন এক চাপা বিষণ্ণতাও উঁকি ঝুঁকি মারছিল মাঝে মাঝে। এ বাড়িতে এলেই ইদানীং এমনটা হয়। প্রাচীন বাড়িটার এখন আর কোনও ছিরিছাঁদ নেই, মোটা মোটা দেওয়াল স্যাঁতসেতে, নোনাধরা। তবু যেন এই অনুজ্জ্বল বাড়িটাতে পা রাখলেই বহুকাল আগে হারিয়ে যাওয়া কৈশোর কোমর জড়িয়ে ধরে আজকাল, অদিতির আঁচল ধরে টানতে

থাকে। সামান্যতম অছিলায়। কারণে অকারণে। কেন এমন হয়?

বয়স? মার না থাকা? নাকি অদিতি বিয়ের পর থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে সংসারে জড়িয়ে গিয়েছিল বলে পিছন ফিরে তাকানো হয়নি বহুকাল? অথবা দাদার সঙ্গে সম্পর্কটা চিড় খেয়ে যাওয়া?

বড় তুচ্ছ কারণে দাদার সঙ্গে সম্পর্কটা ঢিলে হয়ে গেল অদিতির। মা মারা যাওয়ার পর অদিতিকে দিয়ে গোটা কতক কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিল দাদা। কোন কাগজ কীসের কাগজ অদিতি পড়েই দেখেনি। দাদা বলল সই করতে এই না যথেষ্ট। পরে জানল দাদা না-দাবিপত্রে সই করিয়ে নিয়ে গেছে। অদিতি নাকি স্বেচ্ছায় আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ির অধিকার ছেড়ে দিল দাদাকে! শুনে সুপ্রতিমের কী বকুনি! তুমি বাড়ির ভাগ নাও, না নাও, তোমাকে একবার অফার করবে না দাদা! নিদেনপক্ষে কোন্ কাগজে সই করাচ্ছে সেটাও বোনকে বলে নেবে না। তোমারও বলিহারি! লেখাপড়া শিখেছ, দুমদাম না দেখে সই মেরে দিলে।

অদিতির মনেও খোঁচা মেরেছিল কথাটা। দাদা সরকারি অফিসের সামান্য চাকুরে, লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক হয়ে ঢুকেছিল, এখন বড়বাবু, অদিতির মতো তেমন সচ্ছল অবস্থা তার নয়, ছেলের এখনও চাকরি হয়নি, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—এমন দাদার কাছ থেকে কি বাড়ির ভাগ চাইত অদিতি? কখনওই না। কিন্তু অমন চুপি চুপি সই করিয়ে নিয়ে গেল কেন?

পরে আর-একটা কাগজ সই করাতে এল দাদা। মার ফিক্সড ডিপোজিট সংক্রান্ত। অদিতি সেদিন ছেড়ে কথা বলেনি। সোজা বলে দিল—আমাকে কি এটারও ভাগ ছেড়ে দিতে হবে?

ক্ষণকালের জন্য দাদা বিমূঢ়। আমতা আমতা করে বলল—সামান্য তো কটা টাকা। মাত্র দশ হাজার। তুই এর ভাগ নিবি খুকু?

তেতো মুখে অদিতি বলেছিল—দশ হাজার টাকাটা কোনও কথা নয় রে দাদা। আমি যদি বোন না হয়ে তোর ভাই হতাম, তা হলে কি তুই এ ভাবে আমাকে কিছু না জানিয়ে ঝপঝপ করে সব কাগজে সই করিয়ে নিতে পারতিস?

দাদার মুখ ফ্যাকাশে—অত কথার কি আছে, এ টাকার ভাগ আমি তোকে দিয়ে যাব।

বউদি তখন দাদার পাশেই বসে। ফস্ করে বউদি বলে উঠল—তুমি সম্পত্তির ভাগ চাও সেটা আগে বলে দিলেই পারতে। আমাদের ধারণা ছিল তোমার এত আছে, তুমি হয়তো নেবে না।

অদিতি সেদিন কিছুতেই দাদা-বউদিকে বোঝাতে পারেনি ভাগ নেওয়াটা বড় কথা নয়, অদিতির যে একটা অধিকার আছে সেটাকে অবজ্ঞা করাটা অন্যায়। বোনকে অসম্মান করা। টাকাটাও অদিতি নেয়নি, কিন্তু ওই কথাটুকুই মনে লেগে গেল দাদা-বউদির। মার বাৎসরিকের আগে পর্যন্ত অদিতির বাড়ির ছায়া মাড়াল না। কালে কালে ক্ষোভ থিতিয়ে এল। তবে সম্পর্ক আর নিখুঁতভাবে জোড়া লাগল না, কোথায় যেন সরু ফাঁক রয়েই গেল একটা।

মা বাবা না থাকলেই কি ভাই-বোনের সম্পর্কে অদৃশ্য ঘুণপোকারা এসে বাসা বাঁধে? ছোটবেলার সমস্ত টান, ভালবাসা, খুনসুটি, মনকেমন করাগুলো নিরর্থক হয়ে যায়?

নাকি কিছু থেকেই যায়? ছেঁড়া ছেঁড়া স্মৃতি হয়ে? যেমনটি আজ বলছে দাদা?

তিপ্পান্ন বছরের দাদা আর পঁয়তাল্লিশ বছরের বোন শৈশব সেঁচে মণিমুক্তো কুড়োচ্ছে। চা-মিষ্টি হাতে দাঁড়িয়ে আছে বউদি। তুলতুলি রুন্টু টাকাটিন্নী কাটছে বাবা পিসিকে নিয়ে। এক অসহ্য সুখের পারিবারিক দৃশ্য।

এর মধ্যেও কাঁটা থাকে।

শীত শহরের দখল নিয়ে নিয়েছে। শেষদুপুরেই ঠাণ্ডা বেশ কড়া। আমহার্স্ট স্ট্রিটের এই বাড়িটা পিছনের প্লটের বাড়ি, প্রায় বদ্ধ, আলোবাতাসহীন। দেওয়াল থেকেও যেন হিমকণা বিচ্ছুরিত হয় এখানে।

অদিতি শালটা ভাল করে জড়িয়ে নিল। হুশ হুশ চুমুক দিচ্ছে চায়ে। বউদিকে বলল—তুলতুলির আর কোনও সম্বন্ধ এল?

—এসেছিল। ছেলে ইনসিওরেন্সে চাকরি করে। জুনিয়ার অফিসার। তোমার ভাইঝির পছন্দ হল না।

—কেন, দেখতে ভাল নয় বুঝি ?

—জানি না বাপু। তোমার ভাইঝিকে জিজ্ঞেস করো। মেয়েমানুষের অত নাক উঁচু হলে চলে ?

—সে ভীষণ বেঁটে গো পিসি। তুলতুলি মুখ বেঁকাল—গায়ের রংটাও যা না ! পিচরাস্তা।

—তুমি এমন কী অপ্সরী ? শিবানীও ঝেঁঝে উঠেছে—সম্বন্ধটা অনেক দূর এগিয়েছিল গো। তোমার ভাইঝিকে ওদের খুব পছন্দ ছিল।

তুলতুলি হাউমাউ করে উঠল—হলেই হল, আমার কোনও মতামত নেই ? আমি তো বলেই দিয়েছি আমার জন্য ছেলে দেখতে হবে না। আগে একটা চাকরি বাকরি পাই, তারপর দেখা যাবে।

—আসল কথা বলো, বাবা মা-র পছন্দে মন উঠবে না। নিজে পছন্দ করে বিয়ে করবে।

—সেটাই তো ভাল। তোমাদের পরে দুষতে পারবে না। অদিতি হেসে ভুরু নাচাল। তুলতুলিকে বলল—হ্যাঁ রে, ঠিক করা আছে নাকি ?

রুন্টু অনেকক্ষণ চুপচাপ শুনছিল, এবার আর ফুট না কেটে পারল না। বলল—ওদের যাদবপুর তো বৃন্দাবন, না ঠিক থাকাটাই আশ্চর্য।

অদিতি ঠোঁট টিপল—বৃন্দাবন, না নবদ্বীপ রে ? তাতাই তো বলে ওখানে নাকি চোখে চোখ মিললেই কণ্ঠীবদল হয়ে যায়। সত্যি ?

—বলেছে এ কথা ? তুলতুলির গোলগাল মিষ্টি মিষ্টি মুখে রাগের ছল—আমি যাই, নেক্সট দিন গিয়ে ওর কান মুলে দেব।

অলকেশও মিটিমিটি হাসছে। এ ধরনের আলোচনাতে একটু অস্বস্তিও বোধ করছে যেন। পা সামলে বিছানায় উঠে বসে বলল—এই খুকু, পাপাইয়ের পার্ট টু-র প্রিপারেশন কেমন চলছে রে ?

—বলছে তো হচ্ছে মোটামুটি।

তুলতুলি বলল—পাপাইয়ের ওইরকমই কথা। রেজাল্ট বেরোলে দেখা যাবে ফাটিয়ে দিয়েছে।

অলকেশ বলল—বি এসসি পাশ করে কী করবে কিছু ঠিক করেছে ?

—এম এসসি পড়বে। রিসার্চে জয়েন করবে। ওর তো লেখাপড়ার লাইনেই ইন্টারেস্ট, মনে হয় প্রফেসারি টফেসারির দিকেই যাবে।

—ওকে সিভিল সার্ভিসে বসা না। আমাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কোনও আই এ এস-আই পি এস নেই। ভাগ্নেকে দেখে আমরাও একটু বুক ফোলাই।

অদিতির মনেও সেরকমই একটা সূক্ষ্ম বাসনা ছিল। ছেলে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হবে, বিশাল কোয়ার্টার পাবে, অদিতি গিয়ে অবরে-সবরে থেকে আসবে সেখানে। ছেলের জিপে চড়ে বেড়াবে এদিক সেদিক। দেখা যাক কী হয়।

রুন্টু বলল—পাপাইটা বড় লাজুক। ও কড়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হতে পারবে না। এ ব্যাপারে তাতাই একদম ফিট্।

শিবানী হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলল—তোমার কপালটা খুব ভাল। দুটো ছেলের দুটোই রত্ন। রুন্টুটার যে কী হবে ?

রুন্টু পলকে গম্ভীর। তুলতুলি ধমকাল মাকে—আহ্ মা, থামো তো। আমি কি বেজগার করি না ?

অদিতি আড়চোখে দাদাকে দেখছিল। পরিবেশটা কেমন কেটে কেটে যাচ্ছে। এককালে পাউরুটি আলুর দম খেয়ে ফুটবল মাঠে খেপ খেলে বেড়ানো হাট্টাকাট্টা দাদা এখন কেমন বসে আছে জবুথবু ! নিষ্পলক। আনমনা। কপালে বুঝি ভাঁজও এসে গেছে এলোমেলো ! হয়তো রুন্টুর ভাবনাতেই।

খুব আশা ছিল অদিতির, দাদা হয়তো রুন্টুর চাকরির জন্য বলবে সুপ্রতিমকে। বি কম করে চার চারটে বছর বসে আছে রুন্টু। ঠিক বসে নেই, প্রচুর টিউশনি করে। নিচু ক্লাশের। একটা ছোটখাটো কম্পিউটার কোর্সও করেছিল। রেজাল্ট খুব ভাল নয়, তবে দাদা একবার মুখ ফুটে সুপ্রতিমকে বললে একটা হিল্লে হয়তো হয়ে যেত। প্রায়ই সেলস লাইনে নতুন নতুন ছেলে নেয় সুপ্রতিমরা। চারদিকে নিজেরও বহু জানাশুনো সুপ্রতিমের। এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটার, এই পার্টি, ওই

পার্টি। সুপ্রতিম তেমন গড়িমসি করলে অদিতিও চাপ দিতে পারত তখন।

দাদা বলে না। বলবেও না। বোনের ওপর অভিমান ? না, বোনের কাছে আর ছোট করে দেখাতে চায় না নিজেকে ? নাকি আশা করে অদিতি সুপ্রতিমই যেচে... ! রুন্টুটাও পিসির বাড়ি যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। হীনম্মন্যতা ?

এ কথা সে কথার পর উঠল অদিতি। বেরোনোর আগে জোর জোর নিশ্বাস টানল কয়েকবার। কেমন একটা ভ্যাপসাটে গন্ধ, কোনওমতেই সুঘ্রাণ বলা যায় না, তবু শুঁকল প্রাণভরে। কী যেন মিশে আছে বাতাসটায় ! হলুদ শৈশব ! গোলাপি কৈশোর ! নীলচে যৌবন ! কী যেন !

অধিকার চলে যাওয়ার পর থেকেই কি গন্ধটা বেশি করে নাকে এসে লাগে অদিতির !

রাস্তায় নেমে অদিতি বাসে উঠল না। শেষ বিকেলের শীত মাখানো নরম রোদ্দুর মাড়িয়ে হেঁটে এল শিয়ালদায়। ট্রেনে ফিরবে।

স্টেশনে ঢোকার আগে বাড়ির জন্য কিছু ফল কিনল অদিতি। সুপ্রতিমের জন্য আঙুর, পাপাইয়ের জন্য কমলালেবু, তাতাইয়ের জন্য ন্যাশপাতি। অফিসফেরত যাত্রীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যখন ঢাকুরিয়া স্টেশনে নামল, তখন অন্ধকার গা বিছিয়েছে চতুর্দিকে।

বাড়ি ফিরেই অদিতি চমকে গেল। আবার হেমেনমামা এসেছে। সোফায় বসে দিব্যি গল্প করছে পাপাইয়ের সঙ্গে। পরনে সেই একই পোশাক। শুধু সুতির চাদর পালটে সাদা এক শাল এসেছে গায়ে।

অদিতি কথা বলার আগেই হেমেন গৃহকর্তার ভঙ্গিতে দু হাত ছড়িয়েছেন দু দিকে—সুস্বাগতম্।

দুপুর থেকে বুড়বুড়ি কেটে চলা চোরা বিষাদের বুদ্‌বুদ্ নিমেষে উধাও। অকৃত্রিম খুশিতে হাসল অদিতি—আপনি কতক্ষণ ?

—ঘড়ির হিসেবে বলব ? না সময়ের হিসেবে ?

—সেটা কীরকম ?

—খুবই সরল। ঘড়ি ধরে বললে, আমি ঠিক পঞ্চাশ মিনিট হল এসেছি। সময়ের হিসেব করলে, এই মাত্র। তোমার ছেলের সঙ্গে গল্প করতে করতে কী করে যে সময়টা চলে গেল !

অদিতি পাপাইয়ের দিকে তাকাল—কী রে দাদুকে চা-টা খাইয়েছিস ?

এবারও আগেই হেমেনের উত্তর,—শুধু চা নয়, আরও অনেক কিছু খাইয়েছে। পেস্ট্রি পোট্যাটো চিপস্...। তোমার ছেলে আপ্যায়নে কোনও ত্রুটিই রাখেনি।

সবিতা রান্না করতে এসে গেছে। ডাইনিং টেবিলের বড় কাচের পাত্রে ফলগুলো রেখে সোফায় বসল অদিতি। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল—তাতাই ফেরেনি ?

—না তো। পাপাই উঠে গেছে—তুমি এবার কথা বলো মা। আমাকে একটু শৌণকদের বাড়ি যেতে হবে।

হেমেন হাঁ হাঁ করে উঠলেন—তোমার সঙ্গে আলোচনাটা তো শেষ হল না ! বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের কোথায় বিরোধ সে ব্যাপারে একটা ফয়সালা হওয়া দরকার।

—হবে একদিন। আজ আসি। ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি ফুটিয়েই ঘরে ঢুকে গেল পাপাই। পুলওভার চড়িয়ে বেরিয়েও গেল মুহূর্তে।

অদিতি দরজা বন্ধ করে এসে তরল অভিযোগের সুরে বলল—বলেছিলেন শীগ্‌গিরই আসবেন। অ্যাদ্দিনে আপনার সময় হল ? এক মাস পর ?

—আমি কি আর বসে আছি রে ভাই। বলতে বলতে পাশে পড়ে থাকা প্লাস্টিকের থলি থেকে একটা চটি মতন বই বার করে এগিয়ে দিলেন হেমেন। বললেন—আমার পত্রিকাটা দ্যাখো। লেটেস্ট ইসু। এর পেছনে কদিন যা খাটুনি গেল।

অদিতি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল কাগজটাকে। নব্বই-একশো পাতার বই। কবিতা গল্প প্রবন্ধ সবই আছে। বেশ কয়েকজন কবির নাম তো রীতিমতো পরিচিত। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, সবই ঝকঝকে। পরিপাটি। তুলোট কাগজের মলাট। মলাটে কোনও ছবি নেই, শুধু কাগজটার নাম পাতা জুড়ে ছড়িয়ে আছে, ঢেউয়ের মতো। বহতা। সম্পাদকের নামও গাঢ় নীল রঙে জ্বলজ্বল।

হেমেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক।

অদিতি জিজ্ঞাসা করল—আপনি এই কাগজটার কথাই বলছিলেন ?

হেমেন কেমনভাবে যেন তাকালেন অদিতির দিকে। বললেন—কাগজ নয়, পত্রিকা বলো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ পত্রিকা। অদিতি অপ্রস্তুতভাবে হাসল—আপনি একাই পত্রিকাটা বার করছেন ?

হেমেন শব্দ করে হেসে উঠলেন। দরাজ গলায় বললেন—জীবনেই দোকা পেলাম না, পত্রিকায় দোকা পাব কোথ্থেকে ? তবে হ্যাঁ, আলিপুরদুয়ারে আমার দুজন সহযোগী ছিল। দুই ছোকরা। আমারই ছাত্র।

আগের দিন অতশত গা করেনি অদিতি। আজ একটু নড়েচড়ে বসল। বলল—এ তো অনেক খরচের ব্যাপার হেমেনমামা ! আপনি একা একা...

—আরে বাবা, রিটায়ারমেন্টের পর কিছু টাকা তো পেয়েছি। সে টাকা কি আমি যক্ষের মতো বসে বসে আগলাব ? পুরনো বন্ধুবান্ধব কিছু আছে, তারা কয়েকটা বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করে দিল...। গভর্নমেন্টের বিজ্ঞাপনও আসতে শুরু করেছে...। এবার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা এসে গেলে কোনও প্রবলেম থাকবে না, বুঝেছ ?

অদিতির ঠিক ঠিক মাথায় ঢুকছিল না কথাগুলো। নিয়ম রাখার মতো করে বলল—ভালই করেছেন। মানুষকে তো একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে। চা খাবেন আবার ?

—বলো। ঠাণ্ডার দিনে চা-টা ভালই লাগে। তবে আলিপুরদুয়ারের তুলনায় এখানকার শীত কিছুই নয়। সে হচ্ছে বাঘকাঁপানো ঠাণ্ডা।

অদিতি চেঁচিয়ে চা করতে বলল সবিতাকে। হেমেনমামা আলিপুরদুয়ারের শীতের গল্প শোনাচ্ছে। কবে নাকি একটা বাঘ ডুয়ার্সের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, সোজা ঢুকে গিয়েছিল কার কাঠের বাড়িতে, বাড়িঅলার গা থেকে নাকি কম্বল খুলে নিয়েছিল বাঘটা ! বলার ভঙ্গি এত সরস যে, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাচ্ছিল অদিতির। আগের দিন মানুষটা যেন সঙ্কুচিত ছিল সামান্য, আজ কত স্বচ্ছন্দ। খোলামেলা।

হেমেনমামা অনেক বদলে গেছে। অদিতিদের আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে যখন আসত, তখন কত গম্ভীর ধরনের ছিল। ঠিক যেন গম্ভীরও নয়, মিতবাক, শান্ত এক সৌম্য পুরুষ। হাসতও, কিন্তু মাপা হাসি।

হঠাৎ কথা থামিয়ে হেমেন বললেন—কই, যে জন্য এসেছি সেটা দাও।

অদিতি হোঁচট খেল—কী বলুন তো ?

—গল্পটা। নিয়ে এসো, পড়ে দেখি।

অদিতি আকাশ থেকে পড়ল—গল্প ! আমি... !

হেমেনও যেন ভীষণ অবাক—কেন, আগের দিন তোমাকে আমি বলে গেলাম না, একটা গল্প লিখে রাখতে ? আমার পত্রিকার জন্য ?

অদিতি সলজ্জভাবে বলল—বলেছিলেন। তবে...

—কী তবে ?

—লেখা জোখা আর আমাকে দিয়ে হবে না। কবেই ও সব ছেড়ে দিয়েছি।

হেমেনের মুখমণ্ডল পলকে বদলে গেল যেন। গোমড়া মুখে বললেন—আগের দিনও তুমি এই কথাই বলেছিলে। আমি তোমাকে বলেছিলাম চেষ্টা কোরো, নিশ্চয়ই পারবে। তুমি কি চেষ্টা করে দেখেছ ?

—না, তা করিনি...

—কেন করোনি ? সময় পাওনি ?

অদিতি সরাসরি মিথ্যে বলতে পারল না। বলল—তাও ঠিক নয়। এমনিই হয়ে ওঠেনি।

হেমেন কথা বাড়ালেন না আর। চুপ করে বসে আছেন। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মুছলেন কাচ দুটোকে। তারপর প্রায় স্বগতোক্তির মতো বললেন—সবার সব ক্ষমতা থাকে না অদিতি। আবার প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ক্ষমতা থাকে। গুণ থাকে। সেই গুণটার বিকাশ ঘটতে

না দেওয়ার মানে হল নিজের জীবনকে নিজেই অপমান করা। এ এক ধরনের আত্মহত্যা। তোমার মধ্যে কিন্তু গুণটা ছিল।

অদিতির অস্বস্তি হচ্ছিল। আবার যেন ভালও লাগছিল শুনতে। মৃদু স্বরে বলল—সে যখন ছিল, তখন ছিল। এই তেইশ বছর ধরে ঘানি টানতে টানতে, ছেলেদের মানুষ করতে করতে...। মেয়েদের অনেক কিছুই ভুলে যেতে হয় হেমেনমামা। আপনি তো ঠিক সংসারী নন, আপনি বুঝবেন না।

—ওগুলো তোমাদের অজুহাত। তোমরা মেয়েরা ওই ধরনের কথা বলে নিজেদেরই সান্ত্বনা দিতে ভালবাসো। লেম্ এক্সকিউজ। যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না? হেমেন রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন—তোমার একটা গল্প পড়েছিলাম। আজও মনে আছে। বোধহয় তোমার কোনও কলেজের ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিল। একটা মেয়ে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে কুয়াশার সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। চাপ চাপ কুয়াশা। যত সে কুয়াশার মধ্যে ঢুকে পড়ে, ততই সে নতুন নতুন কিছু আবিষ্কার করতে থাকে। নদী পাহাড় জঙ্গল জলপ্রপাত ঝর্না...। যেই কুয়াশাটা মিলিয়ে যায়, অমনি দেখে তার সামনে কিছুটি নেই। তোমার মনে আছে গল্পটা?

নিস্তরঙ্গ পুকুরের তলদেশে পড়ে থাকা ছোট্ট ঢিলের কুচিটা যেন উঠে আসছে। অদিতি খুব ধীরে মাথা নাড়ল—হুঁ, মনে আছে। গল্পটার নামও ছিল কুয়াশা।

—ওরকম একটা গল্প লেখার পরও তুমি বলতে চাও, তুমি আর লিখতে পারবে না? তোমার কি মনে কোনও কথা জমে নেই? তোমার কি নিজেকে প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে না? হাতের কাছে কলম আছে, কাগজ আছে, বসে যাও। চেষ্টা করে দ্যাখো না, হয় কি না। এখন তো তোমার সময় আছে। ছেলেরা বড় হয়ে গেছে। সংসারের ঘানি টানার অজুহাত এখন আর তোমার খাটে না অদিতি।

অদিতি হেসে ফেলল—তা খাটে না। তবে বয়সও তো একটা ফ্যাক্টর, সেটা তো মানবেন? এই বুড়ো বয়সে ও সব আর আসে?

—না চেষ্টা করলে তুমি জানবে কী করে? হ্যাঁ, এজ একটু তো ম্যাটার করে বটেই। মনের ওপর পলি পড়ে গেছে। অভ্যাস করে, চর্চা করে সেটাকে সরাতে হবে। বাট দা থিং ইজ্ দেয়ার।

সবিতা চা এনেছে। ঘুরে ঘুরে দেখছে উত্তেজিত বৃদ্ধকে। অদিতিকে বলল—আমি কি চলে যাব বউদি? আমার কিন্তু হয়ে গেছে।

—যা। কটা রুটি করেছিস আজ?

—সতেরো আঠেরোটা।

—অতগুলো করলি কেন? সকালে বললাম না, দাদা এবেলা খাবে না! ফিরতে দেরি হবে।

সবিতা জিভ কাটল।

—থাক. যা করেছিস, করেছিস। ক্যাসারোল চেপে বন্ধ করেছিস তো? রুটি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভাইদের মেজাজ কিন্তু গরম হয়ে যাবে।

—চেপেই বন্ধ করেছি।

—ঠিক আছে, সকালে তাড়াতাড়ি আসিস। অদিতি কথাটুকু শেষ করে হেমেনের দিকে তাকাল—শুনলেন তো? এ সবও মাথায় রাখতে হয়।

হেমেন অনেকটা স্থিত হয়েছেন। অল্প হেসে বললেন, রামকৃষ্ণদেবের একটা কথা আছে, জানো তো? কখন ঢেউ আসবে না, তার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকলে, সমুদ্রে আর স্নান করাই হবে না।

ঠাণ্ডা বাতাস আসছে একটা। জানলা দরজা সব বন্ধ, তবু কোথা থেকে ঢুকছে বাতাসটা?

হেমেন চায়ে চুমুক দিয়েছেন। আপন মনে বলছেন—শোনো অদিতি, তোমার কথা আমার মাথাতেই ছিল না। আলিপুরদুয়ার থেকে যখন পাকাপাকিভাবে ফিরে এলাম, তখনও মনে পড়েনি। একদিন হঠাৎ বিমলের সঙ্গে দেখা। ডালহাউসিতে। তোমার ছোটমামা বোধহয় পেনশান টেনশন তুলতে এসেছিল। তারপর একদিন ওর ভবানীপুরের বাড়িতে গেলাম। এ গল্প। সে গল্প। হঠাৎ

তোমার কথা উঠল। সেই তোমাদের বাড়িতে যেতাম, তুমি তোমার লেখা দেখিয়েছিলে, সে কথাও হল। বিমল বলল, তুমি নাকি এখন ঘোর সংসারী। কৃতী স্বামী, কৃতী সন্তানদের নিয়ে যাকে বলে একেবারে আপ্লুত হয়ে আছ। শুনে কেমন যেন মনে হল, যাই তোমাকে একটু টোকা দিয়ে আসি। এত ভাল লেখার হাত ছিল তোমার! এত সুন্দর অবজারভেশান! এত সুন্দর ভাষা! তোমার একটা নিজস্ব ইনসাইট আছে। একবার চেষ্টা করতে দোষ কী? আমি আবার মাসখানেক পরে আসব। তখন কি তোমার কাছ থেকে একটা লেখা আশা করতে পারি?

অদিতি ঘাড় নাড়ল কি না, নিজেই বুঝতে পারল না। সম্ভবত নাড়ল। না হলে হেমেনমামার মুখে হাসি ফুটল কেন?

হেমেন চলে গেলেন।

অদিতি ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়েই আছে।

পৃথিবী শীতল হচ্ছে ক্রমশ। বায়ুমণ্ডলে পাতলা কুয়াশার পর্দা। কম্পাউন্ডের গেটের সামনেই অত্যুজ্জ্বল রাস্তার বাতি, দূর থেকে তাও যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। চতুর্দিকের দরজা জানলা বন্ধ ইট কাঠের অবয়বগুলোকেও এখন কেমন ভৌতিক লাগে।

পাপাই তাতাই ফিরল না এখনও। সুপ্রতিমও কখন ফিরবে কে জানে! অদিতি গ্রিল থেকে সরে টিয়ার সামনে এল। সন্তর্পণে হাত রাখল খাঁচার তারে। রেখেই সরিয়ে নিয়েছে হাত। খাঁচাটা কনকনে ঠাণ্ডা, ছ্যাঁকা লাগে।

পাখি ঝিমোচ্ছে। অন্ধকার নামলেই চুপ মেরে যায় টিয়াটা। অথচ সামনে পল্‌কা ছায়া দেখলেও ঠিক টের পায়, চোখ খুলে তাকায় এদিক ওদিক।

অদিতি ফিসফিস করে শুধোল—এই টিয়া, গল্প লিখবি?

ব্যালকনির ছায়া ছায়া আঁধারে স্বরটাকে খুঁজছে টিয়া।

অদিতি ফের শুধোল—কী লিখবি বল তো? আসে কিছু মাথায়?

টিয়া নড়ে বসে।

—সারাদিন তো আফিংখোরের মতো ঢুলিস, আর মাঝে মাঝে ক্যাঁ ক্যাঁ চিৎকার, এর বাইরে তোর আর কিছু করার আছে?

টিয়া চুপ।

—লেখ না যা হোক কিছু। পাগলবুড়োটা এত করে বলে গেল...।

টিয়া একটু চঞ্চল হয়েছে। টিপ টিপ ঘাড় দোলাচ্ছে।

—নিজের কথাই লেখ্ না হয়। ধর তোর দাদার পা ভেঙে গেছে। ভাঙেনি, মনে কর চিড় খেয়েছে। তুই তোর দাদাকে খুব ভালবাসতিস, কত স্মৃতি আছে তোর দাদাকে নিয়ে...। তা তুই দাদাকে দেখতে গেছিস। অনেকদিন পর। মাঝে ওই সই করানোর ব্যাপারটা রেখে দে না। দুজনের মনের কথাই লেখ। দাদারও। বোনেরও। তারপর? তারপর? বানা না, বানা। একটা ফিলিং-এ নিয়ে যা গল্পটাকে। একটা সুন্দর রিলেশান চিড় খেয়ে যাওয়ার অনুভূতি।

অদিতি উৎসুক হয়ে ঝুঁকল খাঁচার দিকে—কীরে, পারবি না?

পাঁচ

পৌষ ফুরোনোর আগেই এবার ঝুপ করে কমে গেল শীতটা। প্রায়দিনই এখন মেঘ করে থাকে, বৃষ্টিও হচ্ছে ঘন ঘন। মুষলধারে কিছু নয়, ঝিরঝির ঝিরঝির। সৃষ্টিছাড়া এই মেঘের পল্টন কোত্থেকে যে এল! লাভের মধ্যে লাভ রোজ বাজারে সবজিঅলারা শাসাচ্ছে এরকম চললে ফুলকপি বাঁধাকপির দর নাকি বেড়ে যাবে চার গুণ। ঘরে ঘরে অসুখবিসুখও বেড়েছে হঠাৎ। একটু ভিজলেই সর্দি কাশি জ্বর।

তাতাইয়েরও কাল থেকে অল্প অল্প গলা ব্যথা। গ্ল্যান্ড ফুলেছে। রাত্রে শুধু দুধরুটি খেল আজ। অন্য সময়ে অদিতিকে কতবার বলতে হয়, আজ খেয়ে উঠেই বাধ্য ছেলের মতো গলায় মাফলার

পেঁচিয়েছে তাতাই। অদিতির শাল গায়ে জড়িয়ে টিভি খুলে বসেছে।

টেনিস চলছে টিভিতে। কোন এক টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল। আন্দ্রে আগাশি আর মাইকেল চ্যাং। এ কোর্ট ও কোর্ট, ও কোর্ট এ কোর্ট, র‍্যালি চলছে জোর।

তাতাই মুষ্ঠিবদ্ধ হাত ছুড়ল শূন্যে— কামঅন্ আগাশি, কিল হিম।

হাঁটু ঝোলা জিনসের ওপর মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি চড়িয়ে ভাইয়ের পাশে এসে বসল পাপাই। রঙিন পর্দায় চোখ রেখে বলল,— কী স্কোর চলছে রে ?

হলদেটে টেনিস বলের সঙ্গে চোখের মণি ঘুরে চলেছে তাতাইয়ের। ঘুরন্ত চোখেই বলল,— যা হওয়ার তাই হচ্ছে। আগাশি ইজ উইনিং। ফার্স্ট সেট পেয়ে গেছে।

—ও তো হেরে যাবে। পাপাই সেন্টার টেবিলে পা তুলে দিল।

—কেন ?

—অত প্লেবয়গিরি করে টেনিস খেলা হয় না। টেনিসে অনেক মেন্টাল ডিসিপ্লিন লাগে।

—তুই আগাশির র‍্যাঙ্কিং জানিস ! কোথায় আগাশি, কোথায় চ্যাং !

—র‍্যাঙ্কিং দিয়ে সব হয় না। চ্যাং-এর টেনাসিটি অনেক বেশি। চাইনিজ অরিজিন আছে তো ...

তাতাই ঝট করে ঘাড় ঘুরিয়েছে,— আগাশি জিতবে না বলছিস ?

—নো চান্স। চ্যাং-এর দম অনেক বেশি। স্পিডও বেশি।

পাপাই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষিপ্র চিতাবাঘের মতো কোর্টের শেষ প্রান্ত থেকে নেটে ছুটে এসেছে চ্যাং। দুরন্ত একটা স্ম্যাশ করল লাফিয়ে। চোয়াল শক্ত করে র‍্যাকেট মাথার ওপর তুলে ঝাঁকাচ্ছে। দর্শকদের চিৎকার আর হাততালিতে কানে তালা লাগার জোগাড়। গমগম শব্দ বেজে উঠল। গেম টু চ্যাং।

তাতাই গুম্।

পাপাই নির্বিকার স্বরে বলল,— এই শুরু হয়ে গেল। এবার দ্যাখ ...

এবার স্থির চোখে দাদাকে দেখছে তাতাই। চোখ ছোট করে বলল,— তুই কি আমাকে রাগাতে চাইছিস ?

—নাআ। যা ফ্যাক্ট তাই বলছি।

তাতাই আরও কয়েক সেকেন্ড দেখল দাদাকে। হঠাৎই তার মুখমণ্ডল ভরে গেছে অপার্থিব হাসিতে। বলল,— আমি আজ রাগব না রে দাদা। চেঁচাতে গেলে ভীষণ কাশি আসছে।

সুপ্রতিম হেসে ফেলল। দাঁত মাজতে মাজতে এতক্ষণ বেসিনের আয়নায় সে দেখছিল ছেলেদের। রাতে দাঁত মাজা তার দীর্ঘকালের অভ্যাস, খেয়ে উঠে মুখে একবার ব্রাশ না চালালে কেমন অপবিত্র অপবিত্র লাগে নিজেকে। বেশ কয়েকবার কুলকুচি করেও তৃপ্তি হচ্ছিল না সুপ্রতিমের, দাঁতের গোড়ায় জিভ ঘষছে।

গলা উঁচিয়ে সুপ্রতিম ডাকল,— অ্যাই শুনছ ?

রান্নাঘরের সিঙ্কে বাসন নামাচ্ছিল অদিতি। সেখান থেকেই সাড়া দিয়েছে,— কী ?

—এদিকে শোনো না।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এল অদিতি,— হল কী ?

—একটা কাঠি দাও তো দেখি। দাঁতের ফাঁকে কইমাছের কাঁটা ফুটে গেছে।

—নিজের দেশলাই থেকে নিয়ে নাও না।

—আমার মোম দেশলাই। ও দিয়ে খোঁচানো যায় না।

বেজার মুখে রান্নাঘর থেকে গুনে গুনে দুটো কাঠি এনে দিল অদিতি। সুপ্রতিম দাঁত খোঁচাচ্ছে। হালকা উদ্বেগ নিয়ে দেখছে অদিতি,— বেরোল ?

—বেরোবে। দাঁতের গোড়ায় আবার জিভ বোলাল সুপ্রতিম,— তোমার কাজকর্ম হল ? কী পড়বে বলছিলে, পড়বে না ?

অদিতির বুকটা ধক করে উঠল। ছোট্ট নিশ্বাস নিয়ে দমন করল ভেতরের উত্তেজনাটাকে। সপ্রতিভ থাকার চেষ্টা করে বলল,— হ্যাঁ, পড়ব তো। রান্নাঘরটা একটু গুছিয়ে আসি।

—তাড়াতাড়ি করো। আজ একটু আর্লি শুয়ে পড়ব। কাল সাড়ে সাতটার মধ্যে বেরোতে হবে।

—একটু বসে টিভি দ্যাখো না, আমি এক্ষুনি আসছি।

রান্নাঘরে এসে অবশ্য কাজে হাত দিল না অদিতি, চুপটি করে দাঁড়িয়েই রইল। হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনিটা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। স্কুলে পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর আগে যেমনটি হত, ঠিক সেই অনুভূতি। লজ্জাও লাগছে খুব। অদিতি কি সেই জোড়াবিনুনি বাঁধা কিশোরী হয়ে গেল। পড়বে গল্পটা ? হাসবে না তো সবাই ?

হেমেনমামা চলে যাওয়ার পর দিনই কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিল অদিতি। নিরালা দুপুরে। উফ, সে কী কষ্ট। মাথার ভেতর ভেঁজে নিয়েছে গল্পটাকে, কিন্তু কিছুতেই শুরু আর হয় না। যেভাবেই আরম্ভ করে সেটাকেই যেন বেঠিক মনে হয়। এক লাইন লেখে, কেটে দেয়। আবার লেখে, আবার কেটে দেয়। আপ্রাণ জেদে যদিবা প্রথম দুটো বাক্য লেখা গেল, তৃতীয় বাক্যটি আর কোথাও নেই। ঘরে, ড্রয়িং স্পেসে, রান্নাঘরে, খাবার জায়গায়, ব্যালকনিতে, বাথরুমে, মস্তিষ্কে, কোথাও নেই। কত চুল ছিঁড়ল অদিতি, কাগজ ছিঁড়ল, ব্রহ্মতালু জ্বলতে লাগল রাগে, তবু কলমে এল না বাক্য। প্রতিদিন যে দুপুরটা কচ্ছপের পিঠ হয়ে মড়ার মতো চোখের সামনে পড়ে থাকে, সেটা যেন কোন জাদুতে অলিম্পিকের দৌড়বীর হয়ে গেল ! মাঝখান থেকে হলটা কী ? মলিনার মা এসে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ! এ কী করেছ গো বউদি ! ঘরময় এত কাগজ ছিঁড়েছ কেন ! কচি ছেলের মতো !

তারপর আর বসাই হয় না, বসাই হয় না। পরের দিনই সকালে ছোট ননদ এল বাড়িতে। তার দুই মেয়ের দুটিই কনভেন্টের ছাত্রী, স্কুলে সদ্য ক্রিসমাসের ছুটি পড়েছে তাদের, বড়মামার বাড়ি ডে-স্পেন্ট করবে তারা। করলও বটে। সারা দুপুর ধরে হইহল্লা, সারা বিকেল লাফালাফি। গেল যখন, অদিতির তখন সব শক্তি নিঃশেষ, পরদিনও আর শরীর চলল না। তারপর তো ছুটিছাটার মরশুমই এসে গেল বাড়িতে। বড়দিন, একত্রিশে ডিসেম্বর, নিউ ইয়ার্স ডে। এ সময়ে বাপ-ছেলেদের জিভটাও চাগিয়ে ওঠে। দুপুরে বাড়ি থাকুক না থাকুক, ছেলেদের হুকুম চলছে অবিরাম। আজ বলে চকোলেট কেক বানাও, কাল বলে ফ্রুট কেক বানাও। কোনওদিন বিরিয়ানি চাই, তো কোনওদিন নবরতন পোলাও। সবই দোকান থেকে আনা যায়, তবে অদিতির হাতে না হলে কারও মন ওঠে না। এরই মধ্যে একদিন প্রেম জাগ্রত হল সুপ্রতিমের, নববর্ষের থিকথিকে ভিড়ে বউকে নিয়ে ঘুরে এল ডায়মন্ডহারবার। কী উচ্ছ্বাস ! আহ্, শীতের গঙ্গাটা কী ফাইন ! জলে রোদ্দুর পড়ে রংটা কী লাগছে দ্যাখো, ঠিক যেন আমাদের বডি ম্যাসাজ অয়েল ! ইশ্, এই গঙ্গার মতো যদি প্রোডাকশান দিতে পারতাম আমরা... !

তা এ সব তো থাকবেই। সংসারধর্ম বলে কথা। সবকিছু কাটিয়ে কুটিয়ে আবার একদিন বসল অদিতি। নিরালা দুপুরে। লেখে, কাটে, ছেঁড়ে, লেখে, শামুকের গতিতে এগোয় লেখা। বাপস্, এ কি সহজ কাজ ! এ যে সৃষ্টি। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংগম ঘটিয়ে জন্ম দেওয়া। সন্তান গর্ভে ধরার মতো ধারণ করো চরিত্রদের, হৃদয় মন বুদ্ধি দিয়ে রক্তমাংসে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করো, ভাষার কারুকাজে বাঁধো তাদের— এ এক শরীর নিংড়ানো সাধনা। দীর্ঘ অনভ্যাসে যা আরও বেশি দুরূহ। শব্দের পর সঠিক শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না, বাক্যের গঠন মনোমতো হয় না সহজে। দু পাতা লেখার পর গোঁয়ার ছেলের মতো গল্প ছোটে অন্য দিকে, তখন ভুলিয়ে ভালিয়ে ফিরিয়ে আনো তাকে, সাজিয়ে গুছিয়ে বসাও কাগজে। একদিন তো অদিতি ফাঁকা ফ্ল্যাটে পা ছড়িয়ে কাঁদতেই বসে গেল। নিজেদের নিয়ে গল্প বানানোও এত কঠিন ! কী কুক্ষণে যে হেমেনমামাকে কথা দিল অদিতি।

তা লেখা শেষ অবধি বেরোল একটা। বর্ণনায় সংলাপে সেজেগুজে। এবার এটা শোনানো যায় কাকে ? লজ্জার মাথা খেয়ে অদিতি স্বামী ছেলেদেরই ধরল শেষমেশ। শুনবে ?

মাইকেল চ্যাং সেকেন্ড সেট জিতে গেছে। তৃতীয় সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে দুই খেলোয়াড়ের। টুং। টাং। টুং। টাং। টাক্। অদিতির ফ্ল্যাটময় প্রতিধ্বনিত হল স্কোরারের স্বর। ফিফটিন লাভ্।

অদিতি ফুলস্কেপ কাগজের গোছাটা নিয়ে সোফায় এসে বসল। নিপুণ অভিনেত্রীর মতো মনের ভাব ফুটতে দিচ্ছে না মুখে। একবার সুপ্রতিমকে দেখল, একবার পাপাইকে, একবার তাতাইকে। সামান্য গলা ঝেড়ে বলল,— পড়ব ?

—না পড়ে কি ছাড়বে ? হা হা করে প্রশ্রয়ের হাসি হাসল সুপ্রতিম,— পড়ো। পড়েই ফ্যালো।

অদিতি লেখাটা খুলতে যাচ্ছিল, তাতাই বলে উঠল,— এক সেকেন্ড মা। এই গেমটা শেষ হয়ে যাক।

—দেখে নে। অদিতি ওপর ওপর চোখ বোলাচ্ছে প্রথম পাতাটাতে, একবার গুনে দেখে নিল সব পাতা,— বেশি নয়, সওয়া দশ পাতা।

গেমটা ডিউসে চলে গেল। দুই পক্ষ সমান সমান। একবার আগাশির দিকে ঢলে পড়ে, একবার চ্যাং-এর দিকে। অ্যাডভানটেজ আগাশি। ... ডিউস। অ্যাডভানটেজ চ্যাং। ... ডিউস। অ্যাডভানটেজ ... অ্যাডভানটেজ ... অ্যাডভানটেজ ...।

চলছে ... চলছে ... চলছে। এ যেন অদিতির বিজন দুপুর, শেষ আর হয় না।

সুপ্রতিম আড়চোখে দেখে নিল অদিতিকে। নিঃশব্দে হাসছে।

—গেম তো মনে হচ্ছে শেষ হবে না রে।

—এক্ষুনি হয়ে যাবে, তুমি দ্যাখো না।

—অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে রে তাতাই, আমাকে শুতে হবে।

—বাবা প্লিজ ...

আগাশির সার্ভিস গেম ছিনিয়ে নিল চ্যাং। বিপুল করতালি। পাপাই টুক করে উঠে টিভি বন্ধ করে দিল,— পড়ো তো মা।

সুপ্রতিম কোলে অ্যাশট্রে টেনে সোফায় হেলান দিল। সিগারেট ধরিয়েছে। বলল,— তোমার হেমেনমামা তা হলে তোমাকে লিখিয়েই ছাড়লেন, কী বলো ?

—হ্যাঁ, এমন করে হেমেনমামা বলতে লাগল ...

—কথা তা হলে ভদ্রলোক ভালই বলেন ? তোমাকে কনভিন্স করে ফেলেছেন ? তোমাকে বোঝাতে বেচারা সেলস গার্লগুলোর ঘন্টা কাবার হয়ে যায় !

—যাহ্, আমি তো ওদের সঙ্গে এমনিই গল্প করি। অদিতির লেখাতেই চোখ এখনও। তুলল চোখ,— হেমেনমামা কী সুন্দর কথা বলে পাপাই জানে। এই পাপাই, বল না।

—বিগ বোর। পাপাইয়ের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

—সে কী রে। তুই সেদিন অতক্ষণ ধরে ... হেমেনমামা বলল তুই নাকি খুব গল্প করছিলি !

—করছিলাম কোথায় ? শুনছিলাম। শুধু সাহিত্য নিয়ে ভ্যাজারং ভ্যাজারং ! যেন আর কিছু নেই দুনিয়ায় !

—ও। সেকেন্ডের লক্ষ ভগ্নাংশ সময়ে পাপাইয়ের সেদিনের মুখটা মনে পড়ল অদিতির। কী ভালমানুষের মতো বসেছিল হেমেনমামার সামনে ! মনের ভাব লুকোতে এত দক্ষ হয়ে গেছে পাপাই ! একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে অদিতি বলল,— যে যা নিয়ে থাকতে ভালবাসে।

তাতাই অধৈর্য মুখে বলল,— তোমরা কি শুধু বকবক করবে ? তা হলে আমি টিভিটা চালিয়ে দিই।

—আহ্ তাতাই। কোমল ধমক দিয়ে সুপ্রতিম তাকাল অদিতির দিকে। মোটর রেস্ স্টার্ট করার ভঙ্গিতে হাতের চেটো দোলালো,— শুরু করো। চালাও।

অদিতি ঈষৎ ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছিল। গুজরাটি চাদর সাপটে নিয়ে আবার গুছিয়ে বসেছে। সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল,— পড়ি তবে। গল্পটার নাম ফাটিল।

—অ্যাহ্, নামটা ভাল হয়নি। সুপ্রতিম চোখ বুজে টান দিচ্ছে সিগারেটে,— অন্য নাম দাও।

—আহা গল্পটা তো শোনো আগে। দেখবে নামটা গল্পের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে।

—কী নাম বললে ? ফাটোল্। ফাআটোল্ ? ছুঁচোলো ঠোঁটে তাতাই উচ্চারণ করছে শব্দটা,— তুমি কি আঁতু গল্প লিখেছ নাকি মা ?

—আরে না না, শোন না। ঘরোয়া গল্প।

এবার সত্যি সত্যি পড়তে শুরু করেছে অদিতি। পড়ছে। দুই ভাই বোনের গল্প। দাদার বড় অভাবের সংসার। তার মধ্যে আরও বিপদ, কলতলায় পিছলে পড়ে মাথা ফেটেছে দাদার। অনেকটা পথ উজিয়ে বোন দেখতে গেছে দাদাকে। বহুকাল পর। বোনের অবস্থা বেশ ভাল। বর ডাক্তার, ভাল পশার তার। দাদার বাড়িতে পৌঁছে বোনের হঠাৎ খেয়াল হল, হাতে করে একটু ফল মিষ্টি আনা হল না তো ? এমনই লৌকিকতার সম্পর্ক এখন দাদার সঙ্গে ...

টেলিফোন বাজছে।

মুহূর্তে বাজপাখির মতো উড়ে গেছে পাপাই। ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিল। মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে বলল,— এক মিনিট মা।

অদিতি হোঁচট খেয়েও হাসল। আলগা মুড়ল গল্পটাকে। ঠিক এই সময়ে প্রায়দিনই পাপাইয়ের ফোন আসছে। একটা মেয়ের ফোন। অদিতি ধরলে মেয়েটা কাঁপা কাঁপা গলায় পাপাইকে ডেকে দিতে বলে, সুপ্রতিম ধরলে কট করে কেটে দেয় লাইন। কলেজের সহপাঠিনী হলে তো এমনটি হওয়ার কথা নয় ! পাপাইও চাতকের মতো ফোনের কাছে ঘুরে বেড়ায় এই সময়ে।

ভুরু কপালে তুলে তাতাই প্রশ্ন করল,— আমরা কি দাদার জন্য অপেক্ষা করব ?

অদিতি চোখে হাসল,— দাঁড়া, কথা বলে নিক।

—হুঁহ্, দাঁড়িয়েই থাকতে হবে তা হলে।

—ছটফট করছিস কেন ? দু-চার মিনিট দ্যাখ।

তাতাই অস্থির মুখে হাতে হাত ঘষছে। ঘাড় উঁচু করে ফোলা গ্ল্যান্ডে আঙুল বোলাল,— চট করে একবার স্কোরটা জেনে নেব ? বলেই কারও অনুমতির অপেক্ষা না করে দৌড়ে টিভিটা চালিয়ে দিল। ঝুঁকে পড়ে দেখছে খেলা।

পাপাই নিবিষ্ট মনে কথা বলে চলেছে। অত্যন্ত নিচু স্বরে, এত নিচু যে ঠোঁট নড়া ছাড়া আর কিছুই বোঝা যায় না। ভাবলেশহীন মুখে হঠাৎ হঠাৎ হাসি ফুটে উঠছে পাপাইয়ের। মুছে গিয়েও মুছছে না হাসি, ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট।

সুপ্রতিম আস্তে করে ঠেলল অদিতিকে। চোখের ইশারায় দেখাল পাপাইকে।

অদিতিও চোখে ইঙ্গিত করল, চুপ। তারপর গলা ঝেড়ে বলল,— কেমন লাগছে গল্পটা ?

—এখন কি বলা যায় ? দেখি, কেমনভাবে খেলাও।

—না মানে, আরম্ভটা কেমন লাগল ?

—মন্দ কী। ভাই ... বোন ... বেশ একটা ফ্যামিলি ড্রামা আছে। টেনশন ফেনশান রেখেছ তো ?

—শেষ অবধি শোনোই না।

সুপ্রতিম সেন্টার টেবিলে পড়ে থাকা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে শেয়ারের পাতায় চলে গেছে। চশমা নেই, চোখের একদম কাছে নিয়ে দেখছে কাগজটা। অদিতি হাতে পেন নিয়ে বসেছিল, তার কাছ থেকে পেনটা নিল। দাগ দিচ্ছে। ভুরুতে ভাঁজ।

আগামি থার্ড সেট জিতে নিল। গোটা কোর্ট দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তাতাইয়ের চোখের মণি খুশিতে উজ্জ্বল। বুড়ো আঙুল দেখাল দাদাকে।

অদিতি অন্তরের উৎসাহটিকে নিবতে দিল না। একটু ঢোক গিলে পাপাইকে ডাকল,— কীরে, তোর হল ?

পাপাই হাত তুলল,— এক মিনিট।

সুপ্রতিম হাই তুলে কাগজ রেখে দিল,— তুমি পড়ে ফেলো তো। আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

—পাপাই তা হলে শুনবে না ?

—পরে শুনে নেবেখন। নয়তো তোমার মামার কাগজ থেকে পড়ে নেবে।

—ভাল না হলে হেমেনমামা ছাপবে কেন ?

—ছাপবেন না মানে ? তোমাকে দিয়ে লেখালেন ? না না, ঠিক ছেপে দেবেন। নাও, শুরু করে

দাও। জলদি জলদি। বললাম না আমাকে কাল সকাল সকাল উঠতে হবে ?

তাতাই করুণ মুখে অদিতিকে বলল,— মা, সাউন্ড অফ করে টিভিটা চালিয়ে রাখলে তোমার পড়তে অসুবিধে হবে ?

—কেন, তোর বুঝি শুনতে ভাল লাগছে না ?

—শুনছি তো। শুনব। চোখ দেখবে, কান শুনবে। দুটো দু কাজের জন্য তৈরি, দুটোকেই সেপারেটলি ফাংশন করানো উচিত। বিশ্বাস না হয়, শেষ করে ধোরো আমাকে। পুরোটা গড়গড় করে বলে দেব।

তাতাই টিভির শব্দ বন্ধ করে এল।

খেলার মূকাভিনয় চলছে পর্দায়। অদিতি গল্প পড়ছে। টেলিফোন কানে দাঁড়িয়ে আছে এক মুগ্ধ শ্রোতা ও কথক। অদিতি পড়ে চলেছে। ধোঁয়ার বৃত্ত তৈরি করছে সুপ্রতিম। তাতাইয়ের চোখ টিভি-তে মগ্ন। অদিতি পড়ছে। দুই ভাই-বোনের ভালবাসার গল্প। দুই ভাই-বোনের ভালবাসায় ভাঙন ধরার গল্প। স্বার্থ এসে প্রিয় মানুষকে অচেনা করে দিল। আত্মসুখ পর করল পরস্পরকে। সন্দেহ পাঁচিল তুলে দাঁড়াল। তবু কি কিছু রইল না ... ?

শেষের দিকে এসে অদিতির গলা ধরে আসছিল। উত্তেজনা আর আবেগের এক গাঢ় মিশ্রণে ডুবে যাচ্ছিল সে। যেন তার সামনে অমনোযোগী শ্রোতারা নেই, রঙিন টিভিতে কোনও মরণপণ যুদ্ধ নেই, কেউ শুনছে কি শুনছে না তার পরোয়াও নেই অদিতির।

সে শুধু পড়ছিল।

পাঠ সমাপ্ত। নিজের অজান্তে ভেজা চোখের পাতা মুছে নিল অদিতি। ভারী গলায় বলল,— শেষ।

ছয়

অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার করে ডেকে চলেছে পাখিটা। রোজই চেঁচায় আজকাল এই দুপুরবেলায়। অদিতি কাগজ-কলম নিয়ে বসলেই এই এক ঢঙ শুরু করে টিয়া, গলা ফাটিয়ে ডাকাডাকি।

এমনিতে টিয়ার ইদানীং বেশ উন্নতি হয়েছে। হাবে ভাবে চালচলনে মাত্রাছাড়া বুনো স্বভাব কমে এসেছে অনেক। মুখে বুলি ফোটেনি, কিন্তু বাড়ির মানুষদের চিনে গেছে মোটামুটি। সুপ্রতিম কাছে গেলে যেন কিছুই দেখছে না এমন একটা অন্যমনস্ক চোখে লক্ষ করে সুপ্রতিমকে। পাপাই তাতাইকে সামনে দেখলে খানিকটা আত্মরক্ষামূলক আচরণ শুরু করে দেয়, কখনও তাদের মন পাওয়ার জন্য খাঁচাময় ঘুরে ঘুরে নানান কসরৎ দেখায়। জিমন্যাস্টিক, ট্র্যাপিজ, ব্যাক-ভল্ট। তবে সবথেকে বেশি বুঝি টিয়া অদিতিকেই চিনেছে। অদিতি ছোলা দিতে গেলে আর ক্যাঁ ক্যাঁ করে তেড়ে আসে না, বরং ভারী শান্ত বুঝদার এক ভঙ্গি করে, কখনও বা দাঁড় বেয়ে টুক টুক এগোয় অদিতির দিকে। শুধু এই দুপুরবেলাতেই কেন যে পাখিটা এত জংলি হয়ে যায় !

চৈত্র মাস পড়ে গেছে। রোদ্দুরের তাতও বেড়েছে খুব। ভরদুপুরে ব্যালকনিতে এলে ঝাঁ করে গায়ে হল্কা লাগে, যেন অতিকায় এক তোলা উনুন প্রকৃতিময় আঁচ ছড়াচ্ছে। এ বছর এখনও কালবৈশাখী আসেনি, এলে হয়তো তাপ একটু কমত।

অদিতি কলম বন্ধ করে ব্যালকনিতে এল।

ছোট ছোট ঘূর্ণি উঠছে বাতাসে, তিনতলার ব্যালকনিও ভরে গেছে ধুলোয়, মোজাইক মেঝেতে পাউডারের মতো ধুলোর আস্তরণ। কোথ্থেকে এক টুকরো সেলোফেন হাওয়ার তাড়া খেয়ে গ্রিল দিয়ে ঢুকে পড়ল। ভাসছে।

ভাসমান সেলোফেনটা খপ্ করে মুঠোয় চেপে খাঁচার সামনে দাঁড়াল অদিতি। টিয়ার দিকে ঝুঁকে বলল, —কী রে, চেঁচাস কেন ? গরম লাগে ?

অদিতির দর্শন পাওয়া মাত্রই টিয়া চুপ। পিট পিট তাকাচ্ছে।

—তোমার মতলব আমি বুঝেছি। সারাটি দুপুর তোমার সামনে আমাকে সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তাই তো ?

টিয়া লাজুক মুখে ঘাড় নামাল।

—ওটি হচ্ছে না বাপধন। আমার হাতে এখন অনেক কাজ। গল্পটা শেষ করতেই হবে। কাল বাদে পরশু সাহিত্যসভায় নিয়ে যাবে হেমেনমামা, লেখাটা না হলে বুড়োর কাছে কে বকুনি খাবে, তুমি ?

গলা দিয়ে বিচিত্র শব্দ করল টিয়া। কঁক কঁক।

—বায়না করে লাভ নেই। তোমার সঙ্গে মোটেই এখন কথা বলব না।

—কঁক কঁক।

—চোপ্। একদম স্পিকটি নট্। বলেই সেলোফেনটা গ্রিলের বাইরে ছুড়ে দিল অদিতি। ঘরে ফিরতে গিয়েও দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। হাওয়ায় উড়ছে সেলোফেন, মাটিতে পড়ছে না, ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে বহু দূর।

যাক্, যেখানে খুশি ভেসে যাক।

অদিতি ঘরে ফিরে আবার লেখাটা নিয়ে বসল। ঠিক বসল না, উপুড় হয়ে শুল। মাটিতে। বুকের নীচে বালিশ রেখে। খাটে শুয়ে লিখতে পারে না অদিতি, চেয়ার টেবিলে বসেও না। মাটিতে শরীর ছড়িয়ে দিলে তার মনে হয় লেখার সঙ্গে এক প্রবল শারীরিক ও মানসিক নৈকট্য গড়ে উঠছে, যেন অদিতি ছুঁতে পারছে লেখাটাকে। তার লিখন ভঙ্গিমাতেও এক ধরনের আবেশ মিশে থাকে। মুখের ওপর ঘন ঘন চুল এসে পড়ে, বুকের আঁচল খসে থাকে মাটিতে, হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতা দুটি শূন্যে দোলায় সে। লেখার সময়ে ক্ষণে ক্ষণে তার ভাবপরিবর্তন হতে থাকে। কখনও বা মুখ হাসি হাসি, কখনও ভ্রূ কুঞ্চিত, কখনও বা আপন মনে মুখ বিকৃত করে চলেছে। শেষ বিকেলের আকাশের মতো মুহুর্মুহু অজস্র রঙের ছটা খেলে যায় তার মুখে চোখে। বিড়বিড় করতে করতে কখনও গড়াগড়ি খায়, পরমুহূর্তে লেখায় ফিরে এসে সন্দিগ্ধ চোখে নিরীক্ষণ করে নিজের লেখাকে। এ সময়ে যদি কোনও ভিডিও ক্যামেরায় তার অঙ্গভঙ্গির ছবি তোলা যায়, তবে তাকে নিঃসংশয়ে পাগল প্রমাণ করা যাবে।

সত্যিই এই নির্জন দুপুরে আজকাল পাগলই হয়ে যায় অদিতি। কিংবা পাগলিনী।

অদিতির প্রথম গল্প ফাটল বেরিয়েছে গত মাসে। তার হেমেনমামার পত্রিকায়। গল্প লেখা নিয়ে মনে যে দোলাচল ছিল, তা এখন পুরোপুরি কেটে গেছে অদিতিব। তার প্রথম গল্পই বেশ সুনাম অর্জন করেছে। হেমেনের পরিচিতের গণ্ডিটি রীতিমতো বড়, অনেক সমঝদার লোককেই লেখাটি জোর করে পড়িয়েছেন তিনি। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই মতে গল্পটি নাকি কোনও লেখিকার প্রথম প্রকাশিত রচনা বলে মনেই হয় না। ভাষা বেশ পরিণত, অনুভূতির গভীরতা আছে, সবচেয়ে বড় কথা শেষে গল্পের একটি সুন্দর উত্তরণও ঘটেছে। হেমেনের সঙ্গে হেমেনের এক বন্ধু এসে তো খুব পিঠ চাপড়ে গেলেন অদিতির। বহুকাল এমন হৃদয়স্পর্শী গল্প পড়িনি। আপনি এত দিন লেখেননি কেন ? আপনার কাছ থেকে আরও অনেক অনেক ভাল লেখা আমরা আশা করি।

শুনতে শুনতে অদিতির বুক শিরশির করছিল। কদিন ধরে অবিরল ভেবেছে সত্যিই তো কেন এত কাল লেখেনি সে ? সংসারের সুখে মগ্ন থেকেই কি লেখার কথা ভুলে গিয়েছিল ? সত্যিই কি সে সুখী ছিল এতদিন ? আজ কি সে অসুখী ? কিন্তু তা তো নয়। স্বামী ছেলেদের সঙ্গে তুচ্ছ কারণে মনোমালিন্য হয়েছে, বিবাদ ঘটেছে, কখনও কখনও মনঃকষ্টেও ভুগেছে অদিতি, কিন্তু সেগুলোকে তো ঠিক অ-সুখ বলা যায় না। সে তো সাংসারিক জীবনের ছোটখাটো খাঁজখোঁজ, চড়াই উতরাই, যা না থাকলে জীবনধারণটাই অর্থহীন হয়ে পড়ত। বরং স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, গৃহের লক্ষ্মীশ্রী, সবকিছু মিলিয়ে তাকে সুখী বলাটাই সত্যের অনেক কাছাকাছি হয়। আরও গভীরভাবে ভাবতে গেলে সে বোধহয় সুখী বা অসুখী কোনওটাই ছিল না। মাটিতে জল যেভাবে গড়ায়, সেভাবেই তার জীবনটা গড়িয়ে গেছে। এই প্রবাহ কখন কোন মুখী হবে এই বিষয়ে তার কোনও সচেতন ভূমিকাই নেই। আরও দুঃখের কথা, এই বোধহীন অচৈতন্য স্তরে থাকার বোধটুকুও বুঝি

তার ছিল না, তার চিন্তাশক্তিই কেমন যেন ভোঁতা মেরে গিয়েছিল। মনের ভেতর কুয়ো তৈরি করে সেই কুয়োতে ডুবে বসেছিল অদিতি, লেখার জগৎ কি সেখানে রোদ্দুরের ঝলক নিয়ে এল ?

নাকি এ সব কিছুই নয়, অদিতি একটা খেলনা খুঁজে পেয়েছে ? যে সময়টাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিল অদিতি, সেই সময়টাকে পার করার একটা বিনোদন পেল আজ ?

নাকি এ সাময়িক নেশা ? ক্ষণিক উত্তেজনা ? হৃদয়ে তরঙ্গ তুলে কদিন আলোড়িত করবে অদিতিকে, আবার এক মোহনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়বে অদিতি ?

অদিতি জানে না। মনে মনে প্রশ্নগুলোর সমাধানও খুঁজে পায়নি অদিতি। কিন্তু লেখার অভ্যাসটা তার বেশ ধরে গেছে। সে যে একটা কিছু পারে, একটা বিশেষ কিছু, স্বামী সন্তান সংসার প্রতিপালনের গণ্ডির বাইরেও তার যে এক স্বতন্ত্র গুণ আছে— মনের ভাবকে ভাষার তুলিতে আঁকার ক্ষমতা, এই উপলব্ধি যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে অদিতিকে। বাড়ি ফাঁকা হলেই কাগজ- কলম নিশির ডাকের মতো টানতে থাকে তাকে। আগে নির্জনতায় ছটফট করত অদিতি, এখন নির্জন হওয়ার জন্য সে উতলা। প্রতি দুপুরেই মনে হয় কত অজস্র মধ্যাহ্ন অপচয় করেছে সে, আর একটি অলস দুপুরও অদিতি হাতছাড়া করতে রাজি নয়। অনুভবকে ভাষায় বেঁধে ফেলার কষ্টে যে এত আনন্দ তা কে জানত !

লিখছে অদিতি।

চৈত্র-দুপুরে ঘরের জানলা সব বন্ধ, টিউবের আলো জ্বলছে, মাথার ওপর পাখা ঘুরছে বনবন। অদিতি লিখছে। আলগা কাগজ হাওয়ায় বড় উড়ে যায়, সুপ্রতিমের বালিশ দিয়ে পাতাগুলোকে চেপে রেখেছে অদিতি। আনমনে বালিশটা একটু টানতেই একটা লেখা পাতা ফর্‌র্‌ করে খাটের নীচে ছুটে গেল। হাঁইহাঁই হামাগুড়ি দিয়ে পাতাটাকে তাড়া করেছে অদিতি।

টেলিফোন। এই সময়েই বাজল ?

খাটের তলা থেকে পাতাটাকে টেনে বার করল অদিতি। বালিশে চাপা দিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ফোন ধরতে ছুটেছে।

সুপ্রতিম।

—কী ব্যাপার, ফোনের পাশে বসেছিলে নাকি ?

—না তো। কেন ?

—না, তোমার ফোন ধরতে অনেক সময় লাগে তো।

—কী বলবে, তাড়াতাড়ি বলো।

—অত তাড়া কীসের ? করছটা কী ? রান্নাবান্না কিছু বসিয়ে এসেছ নাকি ?

—নাহ্।

—বুঝেছি। লিখছিলে। সুপ্রতিম খুক খুক হাসল, —সুখে আছ বটে। কাজকম্মো নেই, বসে বসে গপ্পো ফাঁদছ।

অদিতি ধৈর্য হারাচ্ছিল—কী বলবে বলে ফেলো না।

সুপ্রতিম যে কতক্ষণ সময় নিল ! বোধহয় কয়েক ঘণ্টা। ঘড়ির হিসেবে কয়েক সেকেন্ড। অবশেষে কাজের কথায় এসেছে, —শোনো, আমাকে আজ বিকেলের স্টিলে জামশেদপুর যেতে হচ্ছে।

—হঠাৎ ?

—কাজ আছে ম্যাডাম। তোমার মতো বসে বসে গপ্পো ফাঁদলে তো আর পেট চলবে না। আমার জামশেদপুর এখনও টার্গেট রিচ করতে পারল না...। সামনেই ইয়ার ক্লোজিং...। লাস্ট টাইমে গিয়ে দেখি, ডিসকাউন্ট ইনসেন্টিভ বাড়িয়ে সিচুয়েশানটা যদি ম্যানেজ করা যায়। আমার দুটো ছেলে ওখানে যা ফ্লপ্ করে গেছে না...। তুমি চেনো। সেই পুম্পল আর সমীর। ওদের এগেনস্টে এজেন্টেরও কমপ্লেন আছে। আমি একবার ঘুরে না এলে...

—ফিরছ কবে ?

—আমি ? কথার মাঝে আকস্মিক প্রশ্নে সামান্য থমকেছে সুপ্রতিম, —পসিবলি টুমরো নাইট। কোনও কারণে ফেল করলে ওখান থেকে ফোন করে দেব।

—বাড়ি এসে যাবে তো ?

—তা হলে আর ফোন করছি কেন ? হাতে পাহাড়প্রমাণ কাজ জমে আছে। অফিস থেকেই স্ট্রেট হাওড়া চলে যাব।

এরকম সুপ্রতিম মাঝেমধ্যেই করে থাকে। অফিস থেকেই হঠাৎ হঠাৎ ছোটখাটো ট্যুর। কোনও কোনওদিন এসে বুড়িটা ছুঁয়ে যায়, কখনও কখনও তাও করে না। গত মাসে দুবার অফিস থেকে ভুবনেশ্বর চলে গিয়েছিল। সুপ্রতিমের এই ট্যুর ব্যাপারটা এত নিত্যনৈমিত্তিক, এত গা সওয়া, তবু এখনও প্রতিবারই সুপ্রতিম বাইরে গেলে এক ধরনের উদ্বেগ বোধ করে অদিতি। কিছু খেয়েদেয়ে সুপ্রতিম অসুস্থ হয়ে পড়ল কি না, টেনশান করে প্রেশার বাড়িয়ে বসল কি না, লু লাগাল, না সর্দিকাশি বাধাল...। তেমন গভীর কিছু দুশ্চিন্তা নয়, পাপাই তাতাইকে স্কুলে পাঠিয়ে যতটুকু উদ্বিগ্ন থাকত অদিতি, প্রায় সেরকমই। এই মায়াময় উদ্বেগে প্রেমের চেয়ে বাৎসল্যের ভাবই বেশি।

আজ সেটুকুনি উদ্বেগও যেন আসছিল না অদিতির মনে। বরং যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগছিল। যাক্, দুপুরে শেষ না হলে রাতেও আজ গল্পটা নিয়ে বসা যাবে।

প্রতিবারের মতোই অদিতি বলে উঠল, —সাবধানে যেয়ো। ছাড়ি ?

—ছটফট করছ কেন ? বর বিদেশবিভুঁই-এ চলে যাচ্ছে, দু মিনিট বরের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না ?

অদিতি হেসে ফেলল,— জামশেদপুর কবে থেকে তোমার কাছে বিদেশবিভুঁই হল ? তুমিই তো বলো ভুবনেশ্বর জামশেদপুর যাওয়া আমাদের আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ি যাওয়ার থেকে সোজা।

—ওই হল। গৃহসুখ তো আর সেখানে নেই। সুপ্রতিম কথা বাড়িয়েই চলেছে,— তারপর ? কী লিখছ আজ ?

খুবই সাধারণ প্রশ্ন, হালকা জিজ্ঞাসা, তবু ঘরের মানুষের আগ্রহে একটু নাড়া খেল অদিতি। খুশিও হল কি ! বলল, —ওই হেমেনমামাদের সাহিত্যসভায় একটা গল্প পড়তে হবে, সেটাই...

—ভাল। লেখো। বাই দা ওয়ে, এবার কাকে ধরেছ ?

—মানে ?

—বাহ, আগের গল্পে তোমার দাদাকে তুমি জব্বর টাইট দাওনি ? ভুলিয়ে ভালিয়ে বোনকে ঠকিয়ে নিয়েছে দাদা, বোন খুব দুঃখ পেয়েছে...ঠিকই লিখেছ। উচিত কথাটা লেখার দরকার ছিল।

অদিতি নীরব। সুপ্রতিমের বদ্ধমূল ধারণা, গল্পটা অলকেশকে নিয়েই লেখা। কিছুতেই তাকে বোঝানো যায়নি ওটা শুধু অদিতি অলকেশের কথা নয়, ভাই বোনের চিরন্তন সম্পর্কের কাহিনী। যে সম্পর্ক সাংসারিক বিষয়বুদ্ধিতে বিষিয়ে যায়, কিন্তু মরে না, চিড় ধরে যাওয়া সম্পর্কেও কোথায় যেন একটা চোরা টান থেকেই যায়, ফল্গুনদীর মতো বইতে থাকে হৃদয়ে। গল্পের দাদা ঘুড়ি ওড়ালে বোন লাটাই ধরে থাকত, জিততাল খেলে জেতা গুলি বোনের কাছে জমা রাখত দাদা—এ সব তো অদিতির জীবনে সত্যি নয়। আসলে বোধহয় গল্পটা থেকে ওইটুকুই রস পেয়েছে সুপ্রতিম। মাঝখানে থেকে সুপ্রতিমের কথা শুনতে শুনতে অদিতির মনেও কেমন দ্বিধা এসে গেল, কিছুতেই গল্পটা তুলতুলিকে পড়াতে পারল না। অদিতি এতদিন পর আবার গল্প লিখেছে শুনে অলকেশও কী খুশি, পত্রিকাটা চেয়েও পাঠিয়েছিল, অদিতি বেমালুম বলে দিল হারিয়ে গেছে। তাতেই যেন সুপ্রতিম আরও মজা পেয়ে গেল।

সুপ্রতিম অদিতির নীরবতার তোয়াক্কা করল না। হাসছে, —দাদার নামটাও বেড়ে দিয়েছিলে। রামকৃষ্ণ। বিষয়জ্ঞান টনটনে, কিন্তু মুখে কত দরদ।

অদিতি রুক্ষভাবেই বলল, —তোমার হাতে অনেক কাজ জমে আছে বলছিলে না ?

—দাদার কথায় গায়ে ফোস্কা পড়ছে ? হা হা। ঠিক আছে, রাখলাম।

টেলিফোন যথাস্থানে রেখে কয়েক পল স্থির দাঁড়িয়ে রইল অদিতি। তারপর শিথিল পায়ে ফ্রিজের সামনে এল, বোতল খুলে ঢকঢক ঠাণ্ডা জল ঢালল গলায়, ঘাড়ে মুখে শীতল জলের ছোঁয়া

দিল। ফোন ধরতে এসে চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে গেছে, বাঁধতে সময় লাগবে। অস্থির পায়ে ড্রয়িংস্পেসে খানিক পায়চারি করল অদিতি। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল।

বেলা গড়িয়েছে। পায়ে পায়ে পিছু হঠছে রোদ্দুর। কম্পাউন্ডে ছায়া। আশপাশের ফ্ল্যাটের কয়েকটি মেয়ে এই মাত্র কলকল করতে করতে স্কুল থেকে ফিরল, ঘাসজমিতে জড়ো হয়ে হিহি হাহা করছে। শিপ্রার শাশুড়ি শীর্ণ শরীরে চৈত্রের তাপ নিচ্ছে। গেটের গুলমোহর গাছে ফুলেরা দুলছিল। টিয়া ঘাড় গুঁজেছে পিঠে। ঘুমোচ্ছে। শেষ দুপুরেই।

গল্পটা নিয়েই ভাবার চেষ্টা করছিল অদিতি। মনের ভেতর এক আজব কাটাকুটি খেলা চলছে।

...ভাড়া বাড়ি বদলাতে বদলাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এক মধ্যবিত্ত দম্পতি। কোথাও দু বছর গেলেই জল নিয়ে ঝামেলা শুরু করে বাড়িঅলা, কোথাও দেওয়ালে একটা পেরেক ঠুকলে বাড়ির মালিক হাঁ হাঁ করে ওঠে, কোথাও ফিরতে একটু রাত হলে ঠারেঠোরে কথা শোনায়, কোথাও বা বেশি দিন থাকতে চাইলেই উঠে যাওয়ার হুকুম জারি হয়ে যায়। উপায়ান্তর না দেখে নির্বিরোধী দম্পতি নিজস্ব একটা আস্তানার জন্য মরিয়া, গেছে এক প্রোমোটারের কাছে, যদি কোনওভাবে ছোটখাটো ফ্ল্যাট কিনে ফেলা যায়। দুটো নেকড়েসদৃশ অ্যালসেশিয়ান দু পাশে নিয়ে বসে আছে প্রোমোটার, মুখে তার বরাভয়। ডোন্ট ওরি, আপনাদের বাজেটের মধ্যে তৈরি করে দেব। উইদিন টুয়েলভ মানথস্। সঞ্চয় উজাড় করে ফ্ল্যাট বুক করল আশা আর পরেশ। পরেশের অফিস থেকে লোন, আশার গয়না বিক্রি, কোঅপারেটিভ থেকে দেনা—প্রাণপণে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছে দুজনে। বাড়ি শুরু হল। দিন যায়, মাস যায়, দুজনে রোজ একবার ছুটে গিয়ে দেখে আসে নির্মাণ। বাড়ি উঠছে। নিজস্ব আশ্রয়ে যাওয়ার স্বপ্নে আশা পরেশ বিভোর। মনোমতো ঘর সাজানোর স্বপ্নে স্বামী-স্ত্রী মশগুল। খাঁচা ঢালাই হয়ে হঠাৎ বাড়ির কাজ বন্ধ হয়ে গেল। কবপোরেশান কী ঝামেলা করেছে। এক বছর গেল, দেড় বছর গেল, আশা পরেশের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। দু বছরের মাথায় আবার শুরু হয়েছে কাজ। নতুন করে আশা ফুটছে স্বামী-স্ত্রীর। ঠিক তখনই প্রোমোটারের ভাষা বদলে গেল। ও দরে আর পারব না দাদা। লাখখানেক বেশি লাগবে। লোন্ চান তো বলুন দিয়ে দিচ্ছি। টোয়েন্টি পারসেন্ট্ ইন্টারেস্ট্। শোধ করে ফ্ল্যাটের চাবি নিয়ে নেবেন। আশা পরেশের মাথায় হাত। ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে তারা, আরও ধার করলে ছেলেমেয়ে নিয়ে খাবে কী ? আশা পরেশ এখন কী যে করে ? আরও ধার বাড়াবে ? প্রোমোটারের কাছ থেকে টাকা ফেরত নিয়ে নেবে ? আবার সেই হীনম্মন্যতা নিয়ে বেঁচে থাকা ? অন্যের বাড়িতে ? মুখ গুঁজে ? মুখ শুনে ?...

পাশের ফ্ল্যাটের কল্যাণী জল দিচ্ছে টবে। বারান্দার বাগানের পরিচর্যা থামিয়ে ডাকছে অদিতিকে,—কী দিদি, আজকাল যে আপনার দেখাই পাওয়া যায় না ?

আশা পরেশের সমস্যায় অদিতি গভীর চিন্তামগ্ন।

কল্যাণী আবার ডাকল, —আপনার শরীর খারাপ নাকি দিদি ?

বিমনা অদিতি ফিরেছে এবার। আলতো ঘাড় নাড়ল। না।

—পাপাইয়ের পার্ট টু তো এসে গেল, তাই না ?

—হুঁ।

—কবে থেকে শুরু ?

অদিতি চট করে মনে করতে পারল না। আজ কত তারিখ ? এটা যেন কী মাস ? নিজেতে ফিরতে কয়েক লহমা সময় লাগল অদিতির। সামান্য গলা তুলে বলল, —এখনও মাস দেড়েক বাকি। মে'র গোড়াতে শুরু হবে।

—বেশ মজা আপনার। দুটো ছেলেই বড় হয়ে গেল। আমার ওই শুশুটা যে কবে মানুষ হবে ! ছেলের পেছনে দৌড়তে দৌড়তে জান বেরিয়ে গেল।

—সামনের বার মাধ্যমিকটা দিক, দেখবেন হু-হু করে সময় চলে যাবে। অদিতি ছোট্ট করে হাসল।

স্তোকবাক্যটা যেন ঠিক কানে গেল না কল্যাণীর। গ্রিলের কিনারে এসে গলা নামিয়েছে, —কাল

রাত্তিরে গোপাদের ফ্ল্যাটের হল্লা শুনেছিলেন ?

অদিতির ক্ষীণ মনে পড়ল দোতলায় কাল একটা গণ্ডগোল হচ্ছিল বটে। অদিতিরা তখন খেতে বসেছে। কী একটা যেন চটুল মন্তব্যও করেছিল সুপ্রতিম ! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সুপ্রতিম বলছিল, ওই আবার গানবাজনা শুরু হল। সুপ্রতিম কথাটা বলল, না তাতাই ?

অদিতি নির্লিপ্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, —কী হয়েছিল বলুন তো ?

—ওমা জানেন না ? গোপা তো বরের অফিসে গিয়ে বরের এগেনস্টে কমপ্লেন করে এসেছে। সিদ্ধার্থবাবু নাকি সংসারে টাকাপয়সা দেয় না, সেই মহিলাকে সব দিয়ে আসে। সেই যে, যার সঙ্গে এখন চলছে। কল্যাণী ইঙ্গিতপূর্ণ চোখ টিপল, —মেয়েছেলেটার নাকি খুব খাঁই।

কল্যাণীর কথা থেকে মনকে বিযুক্ত করার চেষ্টা করল অদিতি। পরেশরা যদি প্রোমোটারের কাছ থেকে টাকা ফেরত চায়ও, প্রোমোটার কি সহজে ফেরত দেবে ? অদিতিদের এই ফ্ল্যাট কেনার সময়ও কি কম টালবাহানা হয়েছিল ? গোড়ায় বলল আড়াই লাখ, বাড়তে বাড়তে সওয়া তিন। তবে সে টাকা জোগাড় করেছিল সুপ্রতিম। দুটো ইনশিওরেন্সের পলিসি বাঁধা রেখে। তাতেও কুলোয়নি, বড় ভগ্নীপতির কাছ থেকে বেশ কিছু ধার নিয়েছিল। পরেশের কি সেরকমও কেউ নেই ?

অদিতির নীরবতা কল্যাণীকে দমাতে পারেনি। প্রবল উৎসাহে ফিসফিস করে চলেছে,

—গোপা সিদ্ধার্থবাবুর অফিসে গিয়েছিল বলেই তো ফাটাফাটি।

—যাওয়াই তো উচিত। ঠিক করেছে। অদিতি মুখ ফসকে বলে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা লুফে নিয়েছে কল্যাণী, —উচিত তো বলছেন, গোপাকে কে মদত দিচ্ছে জানেন ? ওই যে লোকটা আসে ওদের বাড়িতে...গোপা বলে ওর মামাতো ভাই...। কাল তো ওকে নিয়েও যাচ্ছেতাই কথা বলছিল সিদ্ধার্থবাবু। কল্যাণী নীচের ফ্ল্যাটের দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন, আরও অনুচ্চ স্বরে বলল, —ওটা নাকি সত্যি সত্যি মামাতো ভাই নয়, মামার বন্ধুর ছেলে। গোপার নাকি বিয়ের আগে তার সঙ্গে একটা ইয়ে ছিল। রোজ রোজ বাড়িতে বউয়ের প্রেমিক এসে বসে থাকলে কোন পুরুষের বউতে মন থাকে ? আমার কর্তা তো শুনে ফায়ার হয়ে গেছে। বলছিল এরকম বস্তিবাড়ির দশা চললে ফ্ল্যাট বেচে চলে যাব। ওদের ছেলেপিলেরা কী দেখছে বলুন তো ? ছি ছি...

অদিতির এ সব কেচ্ছাকাহিনী শুনতে ভাল লাগে না, আজও লাগছিল না। আশা পরেশকে বিপদসাগরে ফেলে সে এখন হাঁসফাঁস করছে।

সহসা মুক্তিদূতের মতো ডোরবেল বেজে উঠেছে। মলিনার মা।

বাসন মাজতে এসে বিকেলের দিকে রাজ্যের গল্প জোড়ে মলিনার মা। কোনও কোনওদিন মন দিয়ে শোনে অদিতি, আজ চটপট ভাগিয়ে দিল। মাথাটা ভার হয়ে আছে, এক কাপ চা করে খেল আগে। আবার লেখাটা নিয়ে বসেছে। সবিতা আসার আগে দু-চার লাইন যদি আরও লিখে ফেলা যায়।

পারল না। সবিতার আগে আজ পাপাই এসে গেছে। পিছন পিছন তাতাইও। পাপাই জলখাবার খেয়ে শুয়ে পড়ল, রাত নটায় তাকে ডেকে দিতে হবে। তাতাই বসে গেল টিভিতে।

অদিতি ছটফট করছিল। ছেলেরা বাড়ি থাকলে এত ভাল লাগে তার, আজ কেন অসহ্য লাগছে ? মাথার ভেতর গুবরে পোকার মতো ঘুরছে গল্পটা, তাই কি ? তাতাই সন্ধেবেলা বাড়ি থাকলে অদিতির কি একটুও সুস্থিত থাকার জো আছে ? পরের পর হুকুম চলবে তাতাইয়ের। পিৎজা ব্রেড এনে দিচ্ছি, একটু চিজ্ পিৎজা করে দাও না মা। উফ্ কী গরম লাগছে, মা একটু শরবত করে দেবে ? ওকী, শুধু ঠাণ্ডা জলে করছ কেন, দু-চারটে আইসকিউব ফেলে দাও। অদিতি একবার বলেই ফেলল, তোর সাঙ্গোপাঙ্গরা আজ তোকে পরিত্যাগ করল ন্যাকি ! শুনে ছেলের কী হাসি। নো ডিয়ার মাম্মি, চিরন্তন মজুমদারই আজ সবাইকে ছুট্টি দিয়েছে। আজ আমি মাথাটাকে একটু রেস্ট দিচ্ছি।

আজই ? কেন ?

অনেক রাতে, পাড়া যখন নিশুত, সংসার থেকে পুরোপুরি ছাড়ান পেল অদিতি। একা ঘরে দরজা বন্ধ করে আবার আশা পরেশ। টাকাটা যদি প্রোমোটার ফেরত দিয়েই দেয়, পরেশ কী

করবে ? আরেকটু ছোট ফ্ল্যাটের জন্য চেষ্টা চালাবে কোথাও ? মানুষের স্বপ্ন কি সম্পূর্ণ সফল হয় কখনও ? তার চেয়ে স্বপ্নটাকেই যদি ছেঁটেকেটে ছোট করে নেওয়া যায়, যদি সেটাকেই মানুষ রাঙিয়ে নিতে পারে, তা হলে কি... ?

নাহ্, গোছানো যাচ্ছে না। দুপুরে সুপ্রতিমের ফোনটা আসার পর থেকেই গল্পটার যেন খেই হারিয়ে গেছে।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল অদিতি, ঘুম আসে না। জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে অদিতি, ঘুম আসে না। ছোট্ট একটা ঝড় উঠে রাতটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, অদিতির ঘুম আসে না। ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসছে অদিতির, ঘুম আসে না।

নীল অন্ধকারে জেগে আছে অদিতি। গল্পের শেষটুকু চাই। মস্তিষ্ক অদৃশ্য আঁকিবুকি কেটে চলেছে শূন্যে। শেষটুকু চাই। শেষটুকু।

সাত

হেমেন এলেন পাঁচটা নাগাদ। অদিতি তখন বিকেলের চা করছিল। সকাল থেকে বুকের ভেতর যে সূক্ষ্ম কম্পন চলেছে, হেমেনকে দেখেই তা বেড়ে গেল সহস্রগুণ। জীবনে প্রথম কোনও সাহিত্যসভায় যাবে অদিতি, একরাশ অচেনা মানুষের সামনে বসে নিজের লেখা গল্প পড়বে—ভাবনাটা অদিতির পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সটাকে কেমন টলমলে করে দিচ্ছিল। একুশ বছরের তরুণীর পক্ষে বয়সের প্রখর তেজে যা অনায়াসসাধ্য, অদিতির মতো আটপৌরে গৃহবধূর পক্ষে তা কি চরম বেমানান নয় ? হঠাৎ ঝোঁকের বশে হেমেনমামার কথায় রাজি হয়ে গিয়ে কি ভুল করল অদিতি ?

হেমেন আজ বেশ সেজেগুজে এসেছেন। পাটভাঙা ধুতি, মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে কোলাপুরী চপ্পল। কুঁজোটে বৃদ্ধ চেহারা আজ অনেক ঋজু, টানটান। তোবড়ানো গালেও চকচকে আভা।

ফ্ল্যাটে ঢুকেই তাড়াহুড়ো শুরু করে দিয়েছেন হেমেন, —কী হল, তুমি এখনও তৈরি হওনি ?

অদিতি কাঁচুমাচু মুখে বলল, —না গেলে হয় না হেমেনমামা ?

—কেন, তোমার কি গল্প লেখা হয়নি ?

—তা কোনও মতে একটা খাড়া করেছি...

—বাড়িতে কোনও বিশেষ কাজ আছে ?

—তাও ঠিক নয়...অদিতি অসহায় চোখে সুপ্রতিমের দিকে তাকাল, —অ্যাই, তুমি বলো না...

রবিবারের বিকেল। সোফায় গা ছড়িয়ে আয়েশ করে চা খাচ্ছিল সুপ্রতিম। হেমেনকে দেখে পা নামিয়েছে। বলল, —আপনার ভাগ্নী আজ সকাল থেকে হরিনাম জপ করছে। ও বাবা গো, কী হবে গো, সবাই মিলে আমাকে খেয়ে ফেলবে গো...

—আমি কি তাই বলেছি ? লঘু প্রতিবাদ করল অদিতি—এত বছর ধরে ঘরসংসার করছি...যাওয়ার মধ্যে যাওয়া আত্মীয়দের বাড়ি, নয় তোমার কোনও বন্ধুবান্ধবের বাড়ি...এরকম জায়গায় আগে গিয়েছি কখনও ?

—তা বললে চলবে কেন, অ্যাঁ। তুমি এখন লেখিকা হতে চাইছ, এ সব গ্যাদারিং-এ তো তোমাকে যেতেই হবে। যে লাইনের যা নিয়ম। সবকিছুর তো একটা চ্যানেল চাই। সুপ্রতিম শেষ চুমুক দিয়ে পেয়ালা-পিরিচ সেন্টার টেবিলে রাখল, —বুঝলেন মামা, আমি যখন প্রথম সেলস্ লাইনে আসি, থোড়াই তখন এ লাইনের ঘাঁতঘোত জানতাম। ছোট্ট একটা কোম্পানিতে ঢুকেছি, ট্রেনিং বলে কিস্যু নেই, চোখে অন্ধকার দেখছি, সেই সময়ে লাইনের কয়েকটা ছেলের সঙ্গে আলাপ। রোজ সন্ধেবেলা দল বেঁধে আমরা ডেকার্স লেনে বসতাম, সেই গ্যাদারিং থেকেই আমার শিক্ষা, সেই গ্যাদারিং-এই আমার কাজকর্মে হাতেখড়ি। লাইনে সাকসেসফুল হতে গেলে মিক্সিং ইজ্ মাস্ট্। দিবে আর নিবে, মেলাবে মিলিবে...কী বলেন মামা ?

সুপ্রতিমের কথায় এমন এক সহজ কর্তৃত্বের সুর থাকে যার প্রতিবাদ করা কঠিন। যেন সে যা বলছে, তাই পৃথিবীতে ধ্রুব সত্য। তেল সাবান বেচা আর সাহিত্য করার মধ্যে যে আদতে কোনও ফারাক নেই, এ কথা তুড়ি মেরে যাকে তাকে বুঝিয়ে দিতে পারে সুপ্রতিম।

হেমেন চায়ের কাপ হাতে হাসছেন মৃদু মৃদু। অদিতিকে বললেন, —এরকম একজন উৎসাহী স্বামী পেয়েছ, তোমাকে এত প্রেরণা দেয়, তোমার তো গর্বিত হওয়া উচিত অদিতি।

—আপনি আমাকে আর লজ্জা দেবেন না মামা। যদ্দিন জানতাম না, জানতাম না। এখন অ্যাদ্দিন পর যখন একটা গুণ বেরিয়েই পড়েছে, কেন আমি প্যাট্রোনাইজ করব না? আফটার অল্ সবার বউ তো আর লেখিকা হয় না! এই তো, আজ সন্ধেবেলাতেই আমার এক বন্ধু বউ নিয়ে আসতে চাইছিল। আমি স্ট্রেট বলে দিলাম, আজ এসো না ভাই, আজ আমার বউ সাহিত্যসভায় যাবে।

হেমেন বললেন, —এর পরও তুমি এখনও তৈরি হওনি? যাও যাও। আমাদের কিন্তু ঠিক ছ'টায় পৌঁছতে হবে।

অদিতি ঘরে এসে ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসল। সুপ্রতিম সত্যিই বড় সাদা মনের মানুষ। মালিন্যহীন। সঙ্কীর্ণতাবিহীন। এই বয়সে অদিতিকে হঠাৎ লেখায় পেয়ে বসল বলে রঙ্গরসিকতা করে ঠিকই, আবার পাঁচজনের কাছে স্ত্রীর কথা গর্ব করে বলতেও ছাড়ে না। গত রবিবার কস্তুরীরা কর্তাগিন্নি এসেছিল এ বাড়ি, তাদের পত্রিকা দেখিয়ে, অদিতির গল্প পড়িয়ে কী হইচই না শুরু করল সুপ্রতিম! দেখেছ ছেলেরা বড় হয়ে গেছে বলে আমার বউ শুয়ে বসে সময় কাটায় না! কী ফাইন একটা পাসটাইম খুঁজে নিয়েছে!

উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছে সুপ্রতিম। হেমেনমামার ভারী কণ্ঠস্বরও শোনা যায় মাঝে মাঝে। কী যে বিষয় তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে সুপ্রতিম আর হেমেনমামা কথা শুরু করলে বিষয়ের স্থিরতাও থাকে না, অনবরত প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় দুজনে। সুপ্রতিমই অবশ্য কথা বলে বেশি।

অদিতি দ্রুত হাতে অল্প প্রসাধন সেরে নিল। তার ত্বক একদম গরম সহ্য করতে পারে না, এখনই দু-চারটে ঘামাচি বেরিয়ে গেছে। ঘাড়ে গলায় আলগা পাউডার বোলাল অদিতি, মুছেও নিল। ছোট্ট একটা টিপ কপালে লাগাতে লাগাতে গলা ওঠাল একটু, —এই, একবার শুনে যাও তো।

সুপ্রতিম তক্ষুনি এল না, এল মিনিট দু-তিন পরে, —কী বলছিলে?

অদিতি ঢোক গিলে বলল, —তুমি আমার সঙ্গে চলো না।

—আমি গিয়ে কী করব?

—বাড়িতে বসে থেকেই বা কী করবে? গেলে কত নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ হত। সুপ্রতিমের দিকে ঘুরল অদিতি, —তুমি গেলে আমিও একটু ভরসা পেতাম।

সুপ্রতিম হেসে ফেলল, —মামার ওপর ভরসা হচ্ছে না?

—তা নয়, তুমি থাকলে...

—না রে ভাই, সভাটভায় যাওয়া আমার পোষাবে না। ভাবছি একটু দীপকের কাছ থেকে ঘুরে আসি। ...তুমি ফিরছ কখন?

—হেমেনমামা যখন ফেরত আনবেন। অদিতি ছোট শ্বাস ফেলল।

—বেশি রাত কোরো না। পাপাই তাতাই ফিরে আসবে...আমি থাকব না...। রোববার বলে আবার বাসফাসের ধান্দা কোরো না যেন। ট্যাক্সিতে যাতায়াত কোরো। টাকা আছে কাছে, না দিয়ে দেব?

—আছে। অদিতি ইতস্তত করে বলল, —হেমেনমামা কি আমাকে ভাড়া দিতে দেবেন? মাঝখান থেকে ওঁরই গাঁটগচ্চা।

সুপ্রতিম দরজায় উঁকি দিয়ে ড্রয়িং স্পেসটা দেখে নিল একবার। রবিবারে এ বাড়িতে একটা করে বাংলা কাগজ আসে, হেমেন কাগজের ক্রোড়পত্র পড়ছেন। মুখ ফিরিয়ে খুক খুক হাসল সুপ্রতিম। গলা নামিয়ে বলল, —আরে না না, উনি দেবেন কেন? রিটায়ার্ড মানুষ...তুমি একজন সল্‌ভেন্ট ভাগ্নী...। তা ছাড়া...

—তা ছাড়া কী ?

—পুরুষমানুষের অনেক সিক্রেটই তুমি জানো না ম্যাডাম। বেশি মাঞ্জা দেওয়া লোকেদের পকেটে মালকড়ি থাকে না। তুমি ভাড়া দিলে মামা বর্তে যাবে।

—শুধু ফাজলামি। শুধু ফাজলামি। অদিতি আলমারি খুলল, —কী শাড়ি পরা যায় বলো তো ?

সুপ্রতিম ওয়ার্ড্রোবে চোখ বোলাল। আঙুল নেড়ে বলল, —ওই বটল্ গ্রিন সিল্ক কলাক্ষেত্রমটা পরো।

—এই গরমে সিল্ক ! ওই গরজাস্ শাড়ি ! বিয়েবাড়ি যাচ্ছি নাকি ?

—তো কী হয়েছে ? একটা জায়গায় প্রথম যাচ্ছ, একটু তো সেজেগুজে যাওয়াই ভাল। লেখিকার গ্লেজ্ দেখে পাবলিক চমকে যাবে।

—থাক, অত চমকিয়ে লাভ নেই। কী কপালে আছে কে জানে। অদিতি একটা সাদা খোলের তাঁতের শাড়ি বার করল, —গরমের দিনে এই ভাল, কী বলো ?

সুপ্রতিম নাক কুঁচকেছে, —বেশি যোগিনী যোগিনী হয়ে যাচ্ছে না ?

—এখন যোগিনী সাজারই বয়স। রাধিকা সাজার নয়।

—নিজের পছন্দ মতোই সাজবে যখন, আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন ?

সুপ্রতিম ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অদিতি আবার ডাকল, —তুমি হঠাৎ আজ দীপকদার বাড়ি যাচ্ছ ?

—যাই। বেচারা একা একা আছে।

দরজা ভেজিয়ে শাড়ি পরছে অদিতি। আঁচল কাঁধে ছুড়ে বলল, —শর্মিলা কি একেবারেই চলে গেল ?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—ছেলেটাও দীপকদার কাছে আসে না ?

—ওই নিয়েই তো ঝামেলা। শর্মিলা নাকি ছেলেমেয়েদের আসতে দেয় না। শুনলে না সোমেন বলছিল দীপক খেপে ফিউরিয়াস হয়ে আছে !

—আর মদ গিলছে।

—মানুষকে তো একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে, নাকি ? পুরুষ মানুষ হয়ে লোকের কাছে কেঁদে কেঁদে বেড়াবে ? কোর্টে গেলে তখন শর্মিলা টাইট হবে। অত অ্যাডামেন্ট অ্যাটিচিউড...

শর্মিলার মতো শান্ত ধীর স্থির মেয়েকে একগুঁয়ে ভাবতে অসুবিধা হয় অদিতির। তবে এই মুহূর্তে শর্মিলাকে নিয়ে সে তেমন ভাবছিলও না। যেন সুপ্রতিমের সঙ্গে কথা বলে বলে নিজেকে সহজ করতে চাইছিল। কুঁচি কোমরে গুঁজে বলল, —দীপকদা দেবদাস হয়েছে বলে তুমি যেন আবার চুনীলাল হতে যেয়ো না।

সুপ্রতিম সশব্দে হেসে উঠল, —আরে বাবা, দীপক একাই দেবদাস হতে পারে, ওর জন্য চুনীলাল লাগে না।

গম্ভীর মুখে অদিতি বলল, —কথাটা কেন বলেছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ ?

—আরে বাবা হ্যাঁ। তুমি ঠোঁট নাড়লে তোমার পেটের কথা আমি টের পেয়ে যাই।

—কথাটা মনে রেখো। ওখানে গিয়ে গ্লাস নিয়ে বসে যেয়ো না।

সুপ্রতিম হঠাৎ যেন তেতে গেল একটু, —তুমি আমাকে কী মনে করো বলো তো ? বাড়িতে তো বোতল রাখাই থাকে ! পাপাই তাতাই এখন যথেষ্ট ম্যাচিওর হয়ে গেছে, ওরা কিছু মনেও করবে না, তা বলে কি আমি গেলাস নিয়ে বসি রোজ ?

অদিতি কথা বাড়াল না। যা ইচ্ছে করুক। নিজের শরীর নিজে বুঝবে। গত বছর যখন বুকে ব্যথা বুকে ব্যথা বলে সাতদিন বাড়িতে শুয়ে ছিল, তখন ডাক্তারের সতর্কবাণী শোনেনি ! হার্ট-ফার্ট নিয়ে প্রবলেম নেই, কিন্তু বয়সটা আপনার ভাল নয় মিস্টার মজুমদার ! বুজিং স্মোকিং সবই এখন কন্ট্রোল করার সময় ! সুপ্রতিম বাড়াবাড়ি করে না ঠিকই, রোজ পান করাও তার অভ্যাস নয়, তবু এক-আধদিন তো মাত্রা ছাড়ায়ই। অদিতি আর কত খ্যাচখ্যাচ করবে !

আকাশে অল্প মেঘ করেছে। কালও করেছিল, তবে বৃষ্টি হয়নি। অস্তগামী সূর্য ঈষৎ ম্রিয়মাণ হলেও তার তাপ এখনও প্রবল। সিমেন্ট পিচ ইট লোহার অরণ্য উত্তাপ বিকিরণ করে চলেছে। সন্ধে নামলে মলয় বাতাস উঠবে একটা, তবে তার এখনও সময় হয়নি।

সাহিত্যসভায় পৌঁছে অদিতি বিস্মিত হল। সভা বলতে তার চোখে যে এক মহতী ছবি আঁকা ছিল, এ তো সেরকম কিছু নয়! চারু মার্কেটের পিছনে একটা পুরনো দোতলা বাড়ির একতলার বৈঠকখানা ঘরে ফরাস পাতা হয়েছে, জনা দশ-বারো মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন সেখানে, পরস্পরের সঙ্গে গল্পগুজব করছেন। কোনও নামী সাহিত্যিক তো নেইই, বরং যাঁরা বসে আছেন তাঁদের দেখে লেকের বয়স্ক আড্ডাবাজদের উপমাই মনে আসে। প্রৌঢ়দের মাঝে দুটি মাত্র কমবয়সি ছেলে, তারা অবশ্য বসে নেই, রীতিমতো ব্যস্ত মুখে মাঝে মাঝে ঘর-বার করছে। হেমেনমামা বলেই ছিল খুবই ছোট ব্যাপার, কিন্তু এ যে নিছকই ঘরোয়া আড্ডাখানা!

হেমেন একে একে সকলের সঙ্গে অদিতির পরিচয় করিয়ে দিলেন। কেউ পেশায় শিক্ষক, কেউ অধ্যাপক, কেউ অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, কেউ গ্রন্থাগারিক। একজন ওষুধ দোকানের মালিকও আছেন। এঁদের মধ্যে দু-তিনজন অদিতির ফাটল গল্পটি পড়েছেন, আলাপের সময়ে সংক্ষিপ্ত প্রশংসাসূচক মন্তব্যও করলেন তাঁরা। একজন বললেন ফাটলের লেখিকাকে আরও প্রবীণা ভেবেছিলেন তিনি, আরেকজনের মুখ দেখে মনে হল অদিতি আরেকটু তরুণী হলে তিনি যেন খুশি হতেন।

এক বয়স্কা মহিলা, সম্ভবত এ বাড়ির কোনও গৃহিণী, হাত ধরে বসালেন অদিতিকে। তিনিও অদিতির গল্পটি পড়েছেন, অদিতি যে নতুন গল্প লেখা শুরু করেছে তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করার ফাঁকে অদিতির স্বামী পুত্র সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করে নিলেন তিনি। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল আরও দুজন মহিলার আজ আসার কথা ছিল, দুজনেই শিক্ষিকা।

অদিতির জড়তা কেটে যাচ্ছিল। কৌতূহলী কানে শুনছিল চারদিকের টুকরো-টাকরা সংলাপ। হেমেন প্রৌঢ়দের মধ্যমণি হয়ে বসে গেছেন, তিনি এখানে বেশ জনপ্রিয় বোঝা যায়, অনেকের সঙ্গেই নিজের পত্রিকা নিয়ে তিনি আলোচনা চালাচ্ছেন। মাঝে মাঝে কয়েকজন প্রখ্যাত লেখকের কথাও উঠে পড়ছে, বাংলা সাহিত্যের যে এখন বেশ বেহাল অবস্থা সে সম্পর্কেও তর্ক চলছে জোর। নব্য প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যে বাংলা পড়ে না তাই নিয়েও অনেকের কপালে চিন্তার ভাঁজ। টিভির অপকারিতা সম্পর্কেও সরব অনেকে।

অদিতি এক প্রান্তে বসে আছে। সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। প্রৌঢ় গ্রন্থাগারিকটি আড্ডা ছেড়ে সেখানে এসে বসলেন। হয়তো অদিতিকে একা দেখেই। আলাপ জমালেন, —কী, আমাদের এই পরিবেশটা কেমন লাগছে?

অদিতি স্মিত মুখে বলল, —ভালই তো।

—অন্য সভার থেকে এটা অনেক ঘরোয়া না?

বাজারে সবজিঅলা নিজের কুমড়োর প্রশংসা করলে অদিতি যেভাবে হাসে, হুবহু সেই হাসি হাসল, —হুঁ। তা বটে। খুব হোমলি।

—আমাদের প্রেমতোষদা সেটাই চান। ওঁর মতে সভা হবে ঘরোয়া, আলোচনা হবে তীক্ষ্ণ। এতেই বেশ গল্পের আসরের মেজাজ আসে। আমাদের এখানে তাই কোনও রাখঢাক গুড়গুড় নেই, যার যা খুশি বলে ফেলতে পারে।

প্রেমতোষ নামটা অদিতির পরিচিত। হেমেনমামার মুখেই শোনা। ভদ্রলোকের নব্বইয়ের ঘরে বয়স, এখনও নাকি যথেষ্ট শক্তপোক্ত। পেশায় কবিরাজ, এখনও দু বেলা চেম্বারে বসেন। নেশা হল এই সাহিত্য। নিজে লেখেন না, কিন্তু লেখার একজন প্রকৃত সমঝদার। তিনিই এ বাড়ির মালিক।

অদিতি প্রশ্ন করল, —তাঁকে তো দেখছি না?

—ওপরেই আছেন, এখুনি এসে পড়বেন। স্ত্রীর অসুখটা খুব বেড়েছে, তাই নামতে একটু দেরি হচ্ছে।

—কী হয়েছে ?

—বহুকাল ধরেই ভুগছেন। প্রায় তিন বছর। ক্যানসার।

ক্যানসার ! অদিতি হতভম্ব হয়ে গেল। কই, হেমেনমামা তো একবারও বলেনি সে কথা ! হ্যাঁ, আগের দিন বলছিল বটে প্রেমতোষবাবুর স্ত্রী নাকি অসুস্থ, কিন্তু অসুখটা যে ক্যানসার... ! আশ্চর্য, তার পরেও এ বাড়িতে আজ এই সভা...হট্টগোল... !

ভদ্রলোক বললেন, —অবাক হবেন না। এ বাড়িতে সাহিত্যসভা থাকলে পৃথিবী উলটে গেলেও তা বন্ধ হবে না। দেখলেন না প্রেমতোষদার পুত্রবধূকে ? অণিমাদি ? একবার করে শাশুড়ির কাছে বসছেন, একবার নীচে এসে তদারক করে যাচ্ছেন ! উনিও কিন্তু খুব বড় সাহিত্যরসিক। নামী-দামি পত্রিকায় গল্প উপন্যাসের সমালোচনা করেন, মাঝেমধ্যেই খবরের কাগজে চিঠিপত্র লেখেন...। একটা কলেজেও পড়ান। ইংরিজি। এ বছরই বোধহয় রিটায়ার করছেন।

অদিতির সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। এখানে উপস্থিত সব কটি মানুষকেই তার যেন কেমন ভিন্ন প্রজাতির মনে হচ্ছে। কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল,—আপনিও কি লেখালিখি করেন ?

—না না, আমি লিখি না। এখানে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা বেশির ভাগই পাঠকমাত্র। সাহিত্যকে ভালবাসেন। আমিও তাই। তবে এখানে অনেক লেখকও আসেন। মাঝে মাঝে বড় বড় লেখকদেরও আমন্ত্রণ জানাই আমরা। কেউ আসেন, কেউ আসেন না। কবে থেকে এখানে এই সাহিত্যসভা চলছে জানেন ?

—হেমেনমামার কাছে শুনেছি। এটা নাকি খুব পুরনো...

—পুরনো নয়, প্রাচীন বলুন। প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হল। প্রতি দু মাসে একবার করে বসা হয়। আগে আগে কারা না এখানে এসেছেন ? প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর, প্রমথনাথ বিশী...। মাঝে বেশ কয়েকটা বছর প্রায় মরে এসেছিল, হেমেনদা কলকাতা ফিরে আবার আসরটাকে জমানোর চেষ্টা করছেন।

অদিতি চোখ ঘুরিয়ে একবার হেমেনমামাকে দেখে নিল। কী একটা পত্রিকা খুলে কোনও লেখা পড়ে শোনাচ্ছে দুই শিক্ষককে। আলগা হেসে অদিতি বলল,—হ্যাঁ, হেমেনমামার এ সব ব্যাপারে খুব উৎসাহ।

—শুধু হেমেনদা নিজের লেখাটাই ধরে রাখতে পারল না এই যা। অথচ এককালে হেমেনদার তীর্থযাত্রী উপন্যাসটা কী পপুলারই না হয়েছিল। আমার লাইব্রেরিতে রেগুলার ইস্যু হত।

বইয়ের নামটা যেন মনে পড়ছিল অদিতির। আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে আছেও বোধহয়। হেমেনমামা যে কেন এখনও লেখে না, এ প্রশ্ন অদিতির মনেও এসেছে, বারকয়েক হেমেনমামাকে জিজ্ঞাসাও করেছিল, সদুত্তর পায়নি। ঠাট্টার ছলে অন্য কথায় চলে যায় হেমেনমামা। নাহ্, এ বার একদিন হেমেনমামাকে চেপে ধরতেই হবে।

প্রেমতোষ নেমেছেন। সঙ্গে অণিমা। দুজনের ঠোঁটেই আপ্যায়নের হাসি। অদিতি টান টান হয়ে বসল। কোনও বিষয়ে কতটা নিবেদিতপ্রাণ হলে পারিবারিক বিপর্যয়ের ওপরে এ রকম হাসির প্রলেপ দিয়ে রাখতে পারে মানুষ ? কেনই বা পারে ? ছাপার অক্ষরে নিজেদের নাম দেখার অভিলাষ নেই, সভাসমিতি করে নিজেদের প্রচার ছড়ানোও উদ্দেশ্য নয়, শুধু সাহিত্যকে ভালবেসে এ ভাবে এতগুলো মানুষ সংগোপনে এক জায়গায় জড়ো হয় ? সুপ্রতিম বা পাপাই তাতাই শুনলে নির্ঘাত বলত, উন্মাদ, উন্মাদ সব।

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বাবু হয়ে বসেছেন প্রেমতোষ। সত্যিই তাঁর শরীর এখনও ঈর্ষণীয় রকমের মজবুত, দেখে সত্তর-পঁচাত্তরের বেশি মনে হয় না। আলকাতরার মতো গায়ের রং, ধবধবে সাদা চুল, হাত গলার চামড়া শিথিল হলেও হাঁটাচলায় এক আশ্চর্য দৃপ্ত ভঙ্গি। তুলনায় অণিমাদির শরীর অনেক ভেঙেছে, প্রেমতোষকে তাঁর শ্বশুর বলে মনেই হয় না।

সভা যত ক্ষুদ্রই হোক, তার একজন সভাপতি থাকে। প্রেমতোষ সম্ভবত এই সভার স্থায়ী সভাপতি। তবু হেমেন নিয়মমাফিক তাঁর নামটি প্রস্তাব করলেন, সমর্থনও করলেন একজন। অণিমা একটা খাতা খুলে সভার বিবরণ লিখছেন, সকলকে দিয়ে সইও করিয়ে নিলেন প্রথমে।

সভা শুরু হল।

আজকের সভায় গল্পপাঠের জন্য দুজনের নাম স্থির হয়ে আছে। অনল গুপ্ত আর অদিতি মজুমদার। অনল দুই তরুণের অন্যতম। সেই প্রথম স্বরচিত গল্প পড়ল। গল্পটি একটু জটিল ধরনের, অনলের পড়াব ভঙ্গিটিও ভারী নিষ্প্রাণ। গল্পটি অদিতি ঠিক অনুধাবন করতে পারল না। গল্প শেষ হওয়ার পর একে একে আলোচনা করলেন সকলে। প্রায় তর্কের মতো বাগ্‌যুদ্ধ চলল খানিকক্ষণ। ভাল লাগা, মন্দ লাগা মিশিয়ে বেশ প্রশংসিতই হল লেখাটা।

এবার অদিতির পালা।

কাঁপা কাঁপা হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে গল্পটা বার করল অদিতি। হঠাৎই যেন অস্বাভাবিক দ্রুত লয়ে চলতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ড। তালু শুকিয়ে আসছে। জিভ খরখরে। জীবনে এই প্রথম তার সামনে একরাশ মনোযোগী শ্রোতা। যাদের এই মুহূর্তে অন্য কোনও কাজ নেই। যারা শুধু অদিতির গল্প শুনতে এসেছে।

এক নিশ্বাসে গল্পটা পড়ে ফেলল অদিতি। তার আশা পরেশ শেষ পর্যন্ত ছোট বাড়িটা থেকে আরেকটা বাড়িতে উঠে গেছে। এ বাড়ির ভাড়া অনেক বেশি, চব্বিশ ঘণ্টা জল, বাড়িটাও আগের থেকে বড়। তারা যে ফ্ল্যাটের জন্য জীবন পাত করছিল, তার চেয়েও বড়। গল্পের শেষে যেন নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে কথাটা আশা বলছে পরেশকে। পরেশ নিশ্চুপ। মনে মনে বলছে, এখানেও কি আমাদের পুরোপুরি ধরে যাবে আশা ? প্রাণপণে চাইলেও আমরা কি কোথাও সম্পূর্ণ ধবাতে পারি নিজেদের ?...

এ গল্পটার আলোচনা তেমন জমল না। দু-তিনজন দায়সারা গোছের বললেন কিছু। একজন জানালেন, গল্পটি লেখিকার ফাটল গল্পের তুলনায় অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। বিশেষত পরেশের আর্তি যেন তেমনভাবে ফোটেনি। প্রেমতোষ আর অণিমার মতে গল্পটির ভাষা আগাগোড়া ঝরঝরে, কিন্তু লেখিকার আরও বেশি যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। হেমেন নীরব।

অদিতি বিষণ্ণ হয়ে গেল।

গল্পপাঠ শেষে চা বিস্কুট খাওয়া হল, টুকটাক কথাও হল খানিক, অদিতির মন বসছিল না কোনও কিছুতেই। এত কষ্ট করে, সংসারের উদ্বৃত্ত সময় কৃপণের মতো খরচ করে লেখা গল্প কত সহজে নস্যাৎ হয়ে গেল।

বাস্তায় বেরিয়েও কথা বলছিল না অদিতি। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, তা যেন একটুও লাগছে না গায়ে। কান এখনও লাল হয়ে আছে। অদিতি ঘামছিল।

হেমেন কথা শুরু করলেন,—কী, মন খারাপ হয়ে গেছে তো ?

হালকা একটা শ্বাস ফেলল অদিতি, উত্তর দিল না। বাতাসে মিশে গেল নিশ্বাসটা।

হেমেন বললেন,—জীবনের প্রতিটা কাজে মানুষ একশো ভাগ সফল হতে পারে কি ? চেষ্টা করাটাই হল আসল জিনিস। আমি জানি, তুমি চেষ্টা করেছ। ভুল বলছি ?

নিঃশব্দে দু দিকে মাথা নাড়ল অদিতি। সে টের পাচ্ছিল তার ভেতর থেকে একটা জেদ উঠে আসছে।

অদিতি ভাঙছিল। এক পুরনো অদিতিকে।

আট

এক দিকে এক পুরুষ্ট গোঁফ দশাসই তরুণ শাড়ি পরে ঘোমটা মাথায় দাঁড়িয়ে আছে টুলের ওপর। অন্য দিকে ক্ষয়াটে চেহারার তালসিড়িঙ্গে যুবকের সর্বাঙ্গ মোটা বেডকভারে মোড়া। তার উদাস ভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন কলকাতার চিড়চিড়ে রোদ্দুরে নয়, নরম শীতের সকালে দার্জিলিং-এর ম্যালে দাঁড়িয়ে হিমালয়ের শোভা দেখছে সে। উলটো প্রান্তে মধ্যবয়সি মানুষটি গাময় লেডিজ ব্যাগ ঝুলিয়ে ক্রুশবিদ্ধ যীশু। পাশেই দু হাতে দু পাটি চটি গেঁথে ফটাফট বাজাচ্ছে এক তামাটে কিশোর। সেল সেল সেল সেল সেল। লিয়ে যান, লিয়ে যান, এমনটি আর পাবেন না। দুনিয়ার শেষ পিসখানা

চলে গেল।

ভরদুপুরে গড়িয়াহাটে চৈত্রের মেলা কলমুখর।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি ঘর্মাক্ত যুবকটি পেশাদারি চিৎকার ছুড়ল, —ও বউদি যেয়েন না, ও বউদি শোনেন...

অদিতি বেশিদূর এগোতে পারেনি, বড় জোর চার-পাঁচ পা। বিজবিজে ভিড়ে এক কদম অগ্রসর হওয়াও এখন রীতিমতো সংগ্রাম। চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য। লোকারণ্য নয়, প্রমীলারণ্য। একে রবিবার, তায় কাল চৈত্রসংক্রান্তির দিন মেলার মেয়াদ শেষ, তামাম কলকাতার কোনও রমণীই আজ বুঝি বাড়ি বসে নেই। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন এক বিশৃঙ্খল নারীবাহিনী যুদ্ধ শেষে উদ্দাম লুটপাটে নেমে পড়েছে। এই গুঁতোগুঁতির মাঝে হাঁটা কঠিন, স্থির থাকা বোধহয় আরও কঠিন।

অদিতি দাঁড়াতে পারছিল না। কোনওক্রমে গলা উঁচু করল, —কেন পিছু ডাকছ? তুমি তো আমার দামে দেবে না।

—আহা শোনেনই না। এ দিকে আসেন, এ দিকে আসেন।

—শোনার কিছু নেই। আমি আর এক পয়সাও বাড়াব না।

—আর দশটা টাকা?

—পারব না।

—পাঁচ?

—এক টাকাও না। তোমার কাছে ছাড়া কি আর বেডশিট নেই?

—আসেন, নিয়া যান। আর ঝঞ্ঝাট ভাল্লাগে না।

অদিতি মুখ টিপে হাসল। এই ভিড়েও লোকগুলোর সঙ্গে দরদাম চালাতে কেন যে তার এত মজা লাগে! মুখগুলো ভারী টানে অদিতিকে। মাল বেচতে কেউ কেমন মরিয়া হয়ে ওঠে, কেউ বা নিবাসক্ত, কেউ সরস সংলাপে জমিয়ে দেয় পরিবেশ! কেনা নয়, কেনার এই অনুষঙ্গগুলো অদিতির বেশি পছন্দ। এই পিছু ডাকার ধরনটাও।

ফিরছে অদিতি। উজান স্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছে। পাঁচ পা আসতে কালঘাম ছুটে গেল।

অদিতিকে বাগে পেয়েই হকার ছেলেটির প্রতিশ্রুতি টাল খেয়ে গেছে। ফুল ফুল বিছানার চাদরটি পাট করতে করতে বলল,—পাঁচটা টাকা আরও দেবেন বউদি।

—কেন?

—দেখলেন না, পর পর দুদিন বাজার কেমন ঝাড় খেয়ে গেল! ঝড় বৃষ্টি...পুরো লসে ঢুকে গেলাম।

অদিতি ছদ্ম কোপে তিনটে ভাঁজ ফেলল ভুরুতে, —অ্যাই, কাল তো সন্ধের পর ঝড় উঠল! তোমাদের বাণিজ্য তো হয় সব দুপুরে!

—শেষ বাজারে আর দুপুর সন্ধে থাকে না বউদি। একটা সন্ধে লস মানে ম্যানহোলে ডুবে যাওয়া। প্লিজ বউদি, পাঁচ টাকা।

ছেলেটির কুশলী অনুনয়ে সত্যি সত্যি হেসে ফেলল অদিতি,—তুমি কিন্তু কথা ভাঙছ। এ রকম করলে কিন্তু নেব না।

সঙ্গে সঙ্গে এক হাত জিভ ঝুলে গেছে ছেলেটির। দু হাতে কানের লতি চিপল,—পাঁচটা টাকা চেয়ে নিচ্ছি বউদি। আপনি পুরাতন খরিদ্দার, আপনের থিকে কি বেশি নিতে পারি? মনে করেন গরিব দেওররে ভালবেসে পাঁচটা টাকা দিলেন।

কথার প্যাঁচও জানে বটে! পুরাতন খরিদ্দার! দেওর বউদির ভালবাসা! ঝানু গৃহিণীদের কীভাবে তলতলে করে দিতে হয়, তা একেবারে ঠোঁটস্থ। কস্মিনকালে এর কাছ থেকে কিছু কিনেছে বলে অদিতির মনে পড়ে না। ওপার বাংলাকে এপার বাংলায় মিশিয়ে ভারী মিঠে এক ভাষাও বানিয়ে ফেলেছে ছেলেটা। আহা রে, সুপ্রতিমকে কখনও ফুটপাথের হকারদের কাছ থেকে কেনাকাটা করতে হয় না, করলে নিশ্চয়ই চমকিত হত।

দোকানবাজার থেকে কাগজের পাট প্রায় উঠেই গেছে, এসেছে এক পলিথিন যুগ। খাবার থেকে

জুতো সবই এখন প্লাস্টিকের মোড়কে। ছেলেটি এক ফিনফিন প্লাস্টিকের থলিতে আঁটোসাঁটো করে ঢুকিয়ে দিয়েছে বেডশিট, প্যাকেটখানা বিগশপারে সাবধানে গুছিয়ে নিল অদিতি। ছিঁচকে চোর ঘুরছেই, কে কখন প্যাকেট তুলে নেয়।

এখনও অদিতির উনকোটি রকমের সওদা বাকি। এই সেলের মরশুমেই বাপ ছেলেদের বচ্ছরকার ঘরোয়া পাজামা পাঞ্জাবি কেনা হয়। গেঞ্জি জাঙ্গিয়া আন্ডারওয়্যারও। নিজেদের শৌখিন প্যান্টজামা ছাড়া আর কিছু স্বহস্তে কেনা পোষায় না ছেলেদের। গরমে পাতলা পাতলা পাঞ্জাবি পরে সুপ্রতিম, তার জন্য বেছে বেছে গোটা কয়েক নিমা পাঞ্জাবি কিনতে হবে। কাজের লোকরাও ফরমায়েশ জারি করে দিয়েছে। পয়লা বৈশাখে দুজনেরই ছাপা শাড়ি চাই। পাতলা, কিন্তু জ্যালজেলে নয়। ওহো, পিলো কভারও তো কেনা দরকার। কয়েকটা কফিমগও। নিজের জন্যও কি একটা-দুটো ছাপা শাড়ি কিনবে ? সময় থাকলে দেখা যাবে।

এক দিনে এত বাজার করা কি মুখের কথা ? প্রতি বছর এই কেনাকাটাই অন্তত পাঁচ দিন ধরে করত অদিতি। দিনে একটা জিনিস, বড় জোর দুটো, হেঁটে দেখে চক্কর মেরেই দিব্যি কেটে যেত কয়েকটা দুপুর। তখন ছিল অনন্ত সময়, এখন দুপুর এলেই অসংখ্য চরিত্র মাথার ভেতর হুটোপুটি করতে থাকে। ভাষা দাও। ভাষা দাও। তবু সংসার বলে তো একটা কথা আছে। আর অদিতি না করলে এ সব করবেই বা কে ?

এক হৃষ্টপুষ্ট মহিলা জোর তর্ক জুড়েছে দোকানদারের সঙ্গে। কী নিয়ে বিবাদ বোঝা যাচ্ছে না, তবে মহিলার হাত মুখ নেড়ে ঝগড়া করার ধরনটা ভারী মজার। এক হাত কোমরে, অন্য হাতের তর্জনী নাচছে দোকানদারের নাকের ওপর। তুমি ওভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো না। তুমি আমাকে বাজে জিনিস নিতে বাধ্য করতে পারো না। তুমি আজ আমায় ফিরিয়ে দিতে পারো না।

মুখ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ভঙ্গিমা যেন চেনা চেনা !

হাজার বছরের ওপার থেকে সিগ্‌নাল ভেসে আসছে বিব্ বিব্। ধরা পড়ছে মস্তিষ্কের রাডারে। অতলান্ত গহ্বর থেকে উঠে আসছে টাইম ক্যাপসুল। মুখটা খুলে গেল। স্কুলে কে যেন অবিকল এইভাবে ঝগড়া করত ?

অদিতি চেঁচিয়ে উঠল, —অ্যাই সুজাতা...

ডাক শুনেই ঘাড় ঘুরেছে মহিলার। অদিতির চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে অপলক। বিস্ময়। সংশয়। আবিষ্কার। সহসা রাগ মুছে মহিলার মুখমণ্ডল ভরে গেল নিষ্পাপ খুশিতে, —অদিতি না ?

অদিতি মাথা দোলাল।

মুহূর্তের বিহ্বলতা কাটিয়ে সুজাতা হাত চেপে ধরেছে অদিতির, —ইশ, কত দিইইন পর দেখা হল রে।

মস্তিষ্কের ক্যালেন্ডার ওলটাচ্ছে অদিতি। অস্ফুটে বলল, —ছাব্বিশ বছর। না না, বোধহয় আঠাশ।

—তুই আমাকে দেখলি কী করে ?

—দেখতে পাইনি তো, শুনতে পেলাম। অদিতি হাসল। কিশোরীর চপল হাসি নয়, কুয়াশা মাখা হেমন্তের হাসি। সুজাতাকে আপাদমস্তক জরিপ করতে করতে বলল,—তোর চেহারাটা পালটেছে। মুটিয়েছিস, চশমা নিয়েছিস, কিন্তু গলাটা যাবে কোথায় ? আর ওই ঝামরে ঝামরে ঝগড়া করা ?

—আর বলিস না। বলেছিল শাড়িতে দাগ থাকলে পালটে দেবে, দ্যাখ না এখন...

—সেলের মাল বদল হয় না মাসিমা। সত্তর টাকার শাড়ি, সাত দিন পরে নিন। পিঙপিঙে দোকানদার এখনও টিটকিরি ছুড়ছে।

ঠোঁট কামড়ে কয়েক সেকেন্ড ক্রুর চোখে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইল সুজাতা। সম্ভবত দৃষ্টি দিয়ে খুন করার চেষ্টা করছিল। না পেরে অলস ঔদার্যে বলল,—যাও যাও ছেড়ে দিলাম। ভবিষ্যতে কারুর সঙ্গে এ রকম চিটিংবাজির চেষ্টা কোরো না।

অদিতি একদৃষ্টে দেখছিল সুজাতাকে। স্কুলের সেই শ্যামলা ছিপছিপে লম্বাটে মুখ মেয়েটা এখন থপথপে গিন্নি। চুল কমে কপালে চড়া পড়েছে, জুলপির কাছে ঝুরো চুলে চিকচিক রুপোলি আভা, চশমার নীচে চোখের কোল ফোলা ফোলা, গলায় দু-তিনটে স্পষ্ট বৃত্তাকার ভাঁজ।

আঠাশ বছর সময় অদিতিকেও কি এতটা পালটে দিয়েছে! আয়নায় প্রতিনিয়ত যে মুখ দেখে অদিতি সে মুখের তো বড় একটা বদল হয় না! কিংবা হয়। নিঃসাড়ে। এই পরিবর্তন এত ধীর যে নিজের প্রতিবিম্বও তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারে না। অদিতির চোখে নিকটজন এবং নিকটজনের চোখে অদিতি দুটোই এমন নিত্যদিনের ছাঁচে ঢালা, যে সময়ের প্রবাহ এখানে প্রায় স্থবির। সর্বক্ষণই মনে হয় এই আমি তো সেই আমি। পনেরোয় যা ছিলাম পঁচিশেও তাই, পঁয়তাল্লিশেও। তিরিশ বছর দর্পণে নিজেকে না দেখে সহসা যদি কেউ আপন চেহারা বিম্বিত হতে দেখে, তবে কি সুজাতাকে দেখারই অনুভূতি হয়! কে জানে!

সুজাতা বুঝি অদিতির মনের কথাটা ধরে ফেলেছে। চটাস করে অদিতির কাঁধে চাপড় মেরে বলল, —তোর কিন্তু খুব একটা চেঞ্জ হয়নি। এএএকটু শুধু...রহস্যটা কী রে?

—কিছু রহস্য নেই। সংসার করছি, খাটাখাটুনি করছি, ছেলেদের পেছনে ছুটে বেড়াতে বেড়াতে মোটা হওয়ার সময় পেলাম কই!

—ছোটাছুটি আমিই বা কি কম করি রে। একসঙ্গে অফিস সংসার ছেলেমেয়ে বড় করা, বরের মন জোগানো...

—ওমা, তুই চাকরি করছিস? কোথায়?

—রেলে। ফেয়ারলি প্লেসে। তুই?

অদিতি ফিক করে হাসল, —জেলে। হাজব্যান্ডস প্লেসে। আজীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত গৃহবধূ।

বয়স ভুলে দুই বন্ধু হেসে উঠল খিলখিল।

—তোকে দেখে আমার হিংসে হচ্ছে রে। ঘরে বসে থেকেও তুই মোটাসনি। আর আমি...

—মনে আছে স্কুলে মোটা মেয়ে দেখলে তুই হেসে গড়িয়ে পড়তিস? বি সেকশানের কাজল বলে একটা মেয়ে ছিল, তাকে তুই কুমড়োপটাশ বলে খেপাতিস?

—যাহ্, আমি অত মোটা হইনি। এই জানিস, সেই কাজল এখন কী রোগা হয়ে গেছে। গত বছর এক্সপোতে দেখা হল...কেমন শুকনো চেহারা, কণ্ঠা বেরিয়ে গেছে...

—কাজলের বর মারা গেছে না? স্ট্রোকে?

—হ্যাঁ রে, কী স্যাড। দীপ্তিকে মনে আছে তোর...

চৈত্রমেলায় দুই বান্ধবী কথা বলে চলেছে কলকল। অতীতকে ছুঁয়ে নিচ্ছে, বর্তমানকে উগরে দিচ্ছে। তিন মিনিটে পরস্পরের ঠিকুজিকুষ্ঠি জানা শেষ। অদিতি কবে ফ্ল্যাট কিনল, সুজাতা কবে বাড়ি করেছে কসবায়, সুজাতার টাবলু ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কোন ইয়ার, মুনিয়া সামনের বার উচ্চমাধ্যমিক দেবে, সুপ্রতিম মাসে কত দিন ট্যুরে যায়, কদিন বাড়ি থাকে, সুজাতার বর ব্যাঙ্কের কোন শাখা থেকে কোন শাখায় বদলি হয়েছে, ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের পাণ্ডা বলে কত তার হাঁকডাক, পাপাই তাতাই কী কী ভালবাসে না, টাবলু মুনিয়া কী দেখলে নাক সিঁটকোয়, সব খবর দেওয়া নেওয়া হয়ে গেল। তবু যেন কথা ফুরোয় না। আরও কথা আছে। আরও কথা।

কালকের বৃষ্টি বেশ মুষলধারেই হয়েছিল। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। রাস্তায় এখনও প্যাচপেচে কাদা। বৃষ্টির পর রোদ্দুরেরও আজ খুব মেজাজ। পশ্চিম আকাশে পৌঁছেও গলগল তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য। গা হাত পায়ে জ্বালা ধরে যায়।

ছোট্ট রেস্টুরেন্টের আরও ছোট্ট ঘেরাটোপে মুখোমুখি বসেছে দুই বান্ধবী। মাঝখানে নুন গোলমরিচ। নুনের কৌটো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে অদিতি, গোলমরিচের কৌটোয় আঙুল বোলাচ্ছে সুজাতা।

—অ্যাই, মানসীর কোনও খবর জানিস্?

—নাহ্, বহুকাল দেখা হয় না। সেই যখন এন আর এস-এ ডাক্তারি পড়ছিল, তখন একবার

শেয়ালদায় দেখা হয়েছিল। বোধহয় তখন ইন্টার্নি। স্বাগতা বলছিল মেডিকেলেরই কোন্ ব্যাচমেটকে বিয়ে করেছে।

—স্বাগতার সঙ্গে দেখা হয় ?

—মাঝে মধ্যে। ন মাসে ছ মাসে। বিশাল চাকরি করছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে। ওর লাকটা খুব ভাল। পরীক্ষা দিয়ে ঢুকেছিল, প্রোমোশান পেয়ে পেয়ে অনেক উঠে গেছে।

—লাক কেন বলছিস্ ? স্বাগতাই তো আমাদের মধ্যে লেখাপড়ায় সবথেকে ব্রিলিয়ান্ট ছিল। অঙ্কে কখনও নয়ের ঘরের নীচে পায়নি।

—তুই বা কি কম ছিলি রে ? বাংলা ইংরিজিতে স্বাগতা কোনওদিন তোকে ছুঁতে পেরেছে ? কী সুন্দর গল্প লিখতিস্, কবিতা লিখতিস্...

অদিতির বুকটা হঠাৎ টনটন করে উঠল। সে কবে কী পারত, আঠাশ বছর পরেও মনে করে রেখেছে বন্ধু, অথচ সে নিজেই ভুলে গিয়েছিল কথাটাকে। ভুলে গিয়েছিল, না ভুলে ছিল ? পলকের জন্য অদিতির ইচ্ছে হল সুজাতাকে বলে ফেলে আবার সে শুরু করেছে গল্প লেখা, পর মুহূর্তে মত বদলাল। বাড়ির লোকেদের তরল ঔদাসীন্য তাও অত গায়ে লাগে না, কিন্তু চাকুরে সুজাতা যদি গৃহবধূ বান্ধবীর এই চেষ্টাকে 'ভালই তো মন্দ কি' গোছের বাহবা দেয়, সেটা অদিতির সহ্য হবে না।

নিশ্বাস চেপে প্রসঙ্গ ঘোরাল অদিতি। হাসতে হাসতে বলল, —তুইও তো কী ভাল তর্ক করতিস। আমরা বলতাম সুজাতা বড় হয়ে উকিল না হয়ে যাবে না।

—ওমা, জানিস না ? আমি তো উকিলই হয়েছিলাম ! সুজাতা প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছে,—ল পাস করলাম, হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ শুরু করলাম। গলায় সাদা বো বেঁধে, ফুলহাতা ব্লাউজ পরে, কালো গাউন চাপিয়ে...

—চাকরি করছিস বললি যে ?

উচ্ছ্বাস মরে গিয়ে সুজাতা চকিতে মেঘলা বিকেলের মতো ম্লান। বেয়ারা দু প্লেট ফিশফ্রাই রেখে গেছে, কাঁটাচামচ দিয়ে আস্তরণটা খুঁটছে। প্লেটের দিকেই চোখ তার, তবু যেন নয়ন মেলে দিয়েছে বহু দূরে। বিড়বিড় করে বলল,—প্র্যাকটিস্টা ছেড়ে দিতে হল।

—কেন ? জমাতে পারলি না ?

—জমানো তো কঠিনই। তবু হচ্ছিল কিছু কিছু। আমার সিনিয়ার ছিলেন দীপেশ বাগ্চি, তাঁরই ছত্রচ্ছায়ায় ছিলাম বলতে পারিস। নিজেও দু-একটা ইনডিভিজুয়াল কেস করছিলাম...।

—তো ?

—বিয়ের পর সব ভেস্তে গেল।

—কেন, তোর শ্বশুরবাড়ি কি খুব কন্জারভেটিভ্ ?

—এক কথায় বলা খুব কঠিন রে। তার আগে বুঝতে হবে কনজারভেটিভ্ কাকে বলে।

অদিতি হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

সুজাতা মলিন হাসল,—বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। আমাদের বিয়েটা লাভ ম্যারেজ। বিকাশ তো ব্যাঙ্কে ঢোকার পর থেকেই ইউনিয়ন করে, মাঝে মাঝে আসত হাইকোর্টে। আমার সিনিয়ারের কাছে। তখনই আমাদের চার চোখে মিলন। হাইকোর্টের উকিল মেয়ে দেখে কেউ যে অমন পাগল হতে পারে, আমার বরকে না দেখলে তুই বিশ্বাসই করতে পারবি না। ঘন ঘন কোর্টে আসতে শুরু করল। ঘন ঘন কেন, রোজই। নিজেদের কেসের কথা আর কতটুকু থাকে, সারাক্ষণ আমি যে কোর্টে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মতো ড্যাশিপুশি স্মার্ট মেয়ে নাকি জীবনে দেখেনি ! আমায় কোথায় প্রোপোজ করেছিল জানিস ? চিফ জাস্টিসের কোর্টরুমে। ফাঁকা ঘরে একদম পেছনে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার হাত চেপে ধরে বলেছিল এই আইনের মন্দিরে শপথ করে বলছি, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।

—বাহ্, দারুণ রোম্যান্টিক ব্যাপার তো !

—হুঁ। শুনতে সেরকমই লাগে। এক কুচি শশা মুখে তুলে কচকচ চিবোচ্ছে সুজাতা,—তা

বিয়েটা তো হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়ির লোকেরও আমাকে নিয়ে তখন কী আহ্লাদ। পাড়াপ্রতিবেশী সকলকে ডেকে ডেকে লইয়ার বউ দেখায় আমার শাশুড়ি। শ্বশুরমশাই বাড়িঅলাকে শাসায় ঘরে উকিল বউ এসে গেছে, আর আপনাদের ভয় পাই না। এদের কি গোঁড়া বলা যায় ?

—তা হলে ?

—তা হলে আর কিছু নেই অদিতি দেবী, পৃথিবীটা যে গোল সেই গোলই থেকে গেল। এক বছর যেতে না যেতেই শ্বশুরের মনে হতে লাগল সিনিয়ারের চেম্বার থেকে আমি অনেক রাত করে বাড়ি ফিরছি, শাশুড়ির মনে হতে লাগল বউ সংসারের কোনও কাজই তো করে না, ব্যস লেগে গেল অশান্তি।

—আর বর ?

—বর মুখে কিছু বলত না। প্রগতিশীল মানুষ তো, পার্টি-ফার্টি করে...। তবে তার হাবভাবে আমি টের পেতাম। আরে ভাই, প্রেম করার জন্য ড্যাশিপুশি মেয়ে ঠিক আছে, ভীষণ অ্যাট্রাক্টিভ। কিন্তু বিয়ে করলে সব পুরুষই বউকে একটু শাঁখা সিঁদুর নোলকে দেখতে ভালবাসে। নিজে বিছানায় শুয়ে ইউনিয়নের গল্প করতে পারে, বউ কোর্টকাছারির কথা বললেই মনে হবে পাশে একটা আইনের বই শুয়ে আছে। শ্বশুর শাশুড়ি বর যাকেই কোনও কথা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে যাই সেই ভাবে আইনের ধারা দেখাচ্ছি। ফেডআপ হয়ে প্র্যাকটিসের চেষ্টা ছেড়ে দিলাম।

—নিজেই ছাড়লি ?

—অগত্যা। ঘর সামলাতে গেলে সিনিয়ার কথা শোনায়, কাজে বেশি ইনভলভড় হলে ঘর। এর মধ্যে ছেলেটাও হয়ে গেল... পুরোপুরি ফেরে পড়ে গেলাম।

—চাকরিটা ধরলি কবে ?

—ছেলে হওয়ার পর। বরই বলল ঘরে চুপচাপ বসে থেকে কী করবে, একটা সাদামাটা সরকারি চাকরির চেষ্টা করো। বয়সটা ছিল, পরীক্ষায় বসলাম, জুটেও গেল। সব দিকে শান্তি। নো অ্যাম্বিশান। নাথিং।

—অত আফসোস করছিস কেন ? তাও তো তুই একটা চাকরিবাকরি করছিস, পাঁচ জনের সঙ্গে মিশছিস। স্বাধীন জীবন...

—স্বাধীন জীবন না হাতি। চাকরি করা মেয়েদের পায়ে শিকলটা আরও শক্ত করে বাঁধা থাকে। সকাল থেকে কুকুরের মতো দৌড়ে মরো, রান্না দেখো, বর মেয়ের টিফিন গোছাও, তবু ভাগ্য ভাল ছেলে এখন হোস্টেলে থাকে, নইলে তারও ফরমাশ থাকত। তারপর নাকে-মুখে গুঁজে ভিড় বাসে যুদ্ধ করতে করতে অফিস দৌড়োও। সেখানেও আতঙ্ক, লাল দাগ পড়ে যাবে। তার পরও কত চিমটি কাটা কথা চালাচালি হয় অফিসে। মেয়েরা কেন যে শুধু শুধু ছেলেদের ভাত মারতে অফিসে আসে ! অত যদি বাড়ির চিন্তা তো বাড়ি বসে থাকলেই হয় ! মহিলাদের দেখো, কাজ করবে কী, চারটে বাজতে না বাজতে বাড়ি ফেরার জন্য সব ছোঁক ছোঁক করছে !

অদিতির ভুরু জড়ো হল,—তোরা মুখ বুজে শুনিস এ সব ?

সুজাতা হেসে ফেলল,—সুখে আছিস রে ভাই, এক নৌকোয় পা দিয়ে আছিস। ঘর বার দুটো একসঙ্গে সামলানো হল গিয়ে দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা। কনটিনিউয়াস্ ব্যালান্স। সেই কোন যুগে চাকরিতে ঢুকেছিলাম, এখনও সার্কাসের খেলা দেখিয়ে যাচ্ছি।

চা এসে গেছে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছল অদিতি। ঠিক বুঝতে পারছিল না কোন জীবনটা সুজাতা চেয়েছিল ? ঘরের, না বাইরের ? হালকাভাবে বলল,—এত কষ্ট করে এখন আর চাকরি করার দরকার কী ? ছেড়ে দিলেই পারিস ?

—ওরে ব্বাস, কী বললি রে ? সংসারে আমার মাইনেটাও তো লাগে। ওটা চলে গেলে আমার কর্তার বাজেট ফেল মেরে যাবে না ?

—তা হলে তোর বরেরও সংসারের দায়িত্ব কিছু নেওয়া উচিত। একা একা বাড়ির চিন্তা ভাবতে গেলে তোকে যে অফিসে কথা শুনতে হয়, এ কথাটাও তো তার চিন্তা করা দরকার।

—ভাবে বই কী। মনে মনে ভাবে। ইউনিয়ন মিটিং-এ লেকচার দেওয়ার সময় ভাবে। আর

বাড়ি এসে ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাং তুলে শুয়ে পড়ে। কখন ফিরেছ ? এই এলে বুঝি ? গরম গরম এক কাপ চা খাওয়াও তো, বড্ড টায়ার্ড। ও, তুমিও টায়ার্ড ! তা হলে আর চায়ের ঝামেলায় যেও না, কফি বানাও।

সুজাতার কথায় হাসতে হাসতে অদিতি বিষম খাওয়ার জোগাড়। বলল,—এ যে দেখছি আমার বরের কার্বনকপি রে।

—সে তো হবেই। বর তো দুনিয়ায় একটাই থাকে। মানে একটা ছাঁচ। হাতের মুদ্রায় শূন্যে একটা মানুষের অবয়ব ফুটিয়ে তুলল সুজাতা,—এই একটা বর থেকেই জেরক্স হয়ে হয়ে লাখে লাখে কোটিতে কোটিতে বর বেরোতে থাকে। কেউ অদিতির বর হয়, কেউ সুজাতার, কেউ মানসীর, কেউ স্বাগতার। এ ভাই বিশ্বজনীন সিস্টেম। আমেরিকাতেও আছে, চিন জাপানেও আছে, ফ্রান্স জার্মানিতেও আছে।

—যাহ্, তুই আবার বাড়াচ্ছিস। হাসতে হাসতে সখীকে চিমটি কাটল অদিতি,—আমাদের নীচের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক তো দেখি তাঁর স্ত্রীকে খুব সাহায্য করেন। যেদিন কাজের লোক আসে না, বউয়ের কুটনো কুটে দেন, ঘর ঝাড়েন, এমন কী বাসন পর্যন্ত মাজেন।

—ওগুলো জেরক্সের ডিফেক্টিভ কপি। দেখিসনি জেরক্সে কোনও কপি তেড়া বেঁকা হলে, কি কালি বেশি কম হলে সে কপিগুলোকে ফেলে দেওয়া হয় ? তারাই হল ওই সব লক্ষ্মী বর। আমাদের অফিসেও আছে দু-এক পিস্। তাদের নিয়ে যা ঠাট্টাতামাশা চলে ! আমরা মেয়েরাও করি। বলি জরু কা গুলাম। সুজাতা চোখ টিপল,—বাঁদি দেখে দেখে চোখ সয়ে গেছে, গোলাম দেখলে চোখে লাগে। যাক গে থাক, এভাবে তো যা হোক করে কাটিয়েই দিলাম জীবনটা। আর বিশ-পঁচিশটা বছর টেনে দিতে পারব না ?

হাসতে হাসতে কথা বলছে সুজাতা, তবু যেন হাসিতে কোথায় একটা চোরকাঁটা বিঁধে আছে। অদিতি বুঝতে পারছিল।

বাড়ি ফিরে মড়ার মতো শুয়ে রইল অদিতি। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে এতকাল পর দেখা হয়ে মনটা কোথায় নীল আকাশ হয়ে যাওয়ার কথা, তার বদলে কোত্থেকে একরাশ বাদুলে মেঘ এসে জড়ো হচ্ছে মনে। উঠে কেনাকাটাগুলোও দেখাতে ইচ্ছে করছে না। সুপ্রতিম আর তাতাই ড্রয়িং স্পেসে। তাদেরও দেখার কোনও চাড় নেই। খবরের কাগজ খুলে দুজনের গজল্লা চলছে। ছেলেও আজকাল শেয়ার মার্কেটে উৎসাহী হয়ে পড়েছে। বাজারের ওঠা নামা নিয়ে সপ্তাহভর গবেষণা চলে বাপ ছেলেতে। সপ্তাহ শেষে মিলোয় কার অনুমান সঠিক। তাতাই বইয়ের পাতা উলটোচ্ছে কি না সেদিকে বাবার নজর নেই, কিন্তু অদিতির অপছন্দের এই নেশাটাকে দিব্যি ছেলের মধ্যে চারিয়ে দিচ্ছে।

খানিক পরে সুপ্রতিম ঘরে এল। বোধহয় দেশলাই-টেশলাই খুঁজতে। ঈষৎ গুমরোনো অদিতিকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল,—হল কী তোমার ? এসেই শুয়ে পড়েছ কেন ?

আড়াআড়িভাবে হাতে চোখ চাপা দিল অদিতি। চিত হল,—এমনিই।

—শরীর খারাপ লাগছে ?

—না।

—মাথা ধরেছে ? উফ্, যা রোদ্দুর ছিল আজ।

—তাতে তোমার কী এসে যায় ? তুমি তো আর ছাতা নিয়ে আমার সঙ্গে যাওনি !

—আমি গেলে প্রাণভরে চষতে পারতে ?

চষাই বটে। হাল চষা। তবে গোরু লাঙল জমি তিনটেই অদিতি, এই যা। ভারী স্বরে অদিতি বলল,—ডাইনিং টেবিলে ফিশফ্রাই-এর প্যাকেট রাখা আছে, গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও। যাওয়ার সময়ে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যেয়ো।

—কী ব্যাপার বলো তো ? গল্পের প্লট-ফ্লট মাথায় ঘুরছে নাকি ? সুপ্রতিম হাসছে।

অদিতি বলতে পারত আমি কি সারা দিনই গল্প ভাজি ? তা হলে তোমাদের সংসারটা চালায় কে ? বলে কী লাভ, কে বোঝে !

বাইরে মেঘ জমছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ। নীল শিখায় আকাশের এক পাশ ফালা ফালা হয়ে গেল। ঝড় উঠছে বোধহয়।

নয়

পাপাই হাঁক দিল,—মা, তোমার ফোন।

অদিতি স্নানে ঢুকেছিল। কী তাপ, কী তাপ, বৈশাখ মাসটা এবার পুরো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিল। সন্ধেবেলার দিকে এ সময়ে একবার গা মাথায় জল না ঢাললে শরীর কেমন অস্থির অস্থির করে।

শাওয়ার বন্ধ করে সাড়া দিল অদিতি,—কার ফোন ?

—শর্মিলা কাকিমার।

—কে ? অদিতি একটু অবাকই হল। হঠাৎ শর্মিলা তাকে ফোন করছে কেন ? শর্মিলা তো ইদানীং অদিতিদের কারুর সঙ্গেই যোগাযোগ রাখে না ?

পাপাই প্রশ্ন করল,—এক্ষুনি বেরোবে, না পরে করতে বলব ?

—ধরতে বল্। আসছি।

অদিতি গা মুছল না, ভেজা গায়েই শাড়ি ব্লাউজ চড়িয়ে নিল। যতক্ষণ গায়ে জলটা থাকে ততক্ষণই আরাম।

আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে রিসিভার তুলল অদিতি,—কীরে, তুই হঠাৎ ?

—তোর সঙ্গে একটা জরুরি কথা ছিল। শর্মিলার গলা ভার ভার।

—আমার সঙ্গে ? বল্।

—ফোনে বলা যাবে না। তুই আমার সঙ্গে একটু দেখা করতে পারবি ?

—এখানে চলে আয় না।

—তোর ওখানে ? শর্মিলা যেন থমকাল,—কথাটা একটু কন্‌ফিডেনশিয়াল। তোকেই বলতে চাই। কখন তোকে একা পাওয়া যাবে ?

—দুপুরের দিকে একা থাকি।

—দুপুর ? শর্মিলা আবার কী যেন ভাবছে,—ঠিক আছে। কাল থাকবি ?

—থাকব। অদিতি সামান্য কৌতূহলী হল,—তোর ছেলের খবর কী ?

—ভাল আছে।

অদিতি আরেকটু টোকা দিল,—তুই কি বাপের বাড়ি থেকে ফোন করছিস ?

—না। পাবলিক বুথ থেকে। শর্মিলা আবার থেমে থেকে বলল,—আমি যে যাব সেটা কিন্তু কাউকে বলিস না। আই মিন্ সুপ্রতিমদাকে। প্লিজ।

টেলিফোন রেখে একটুক্ষণ ভাবল অদিতি। শর্মিলার ব্যক্তিগত সমস্যায় অদিতির কী করার আছে ? অদিতি যত দূর শুনেছে দীপকদার সঙ্গে শর্মিলার ছাড়াছাড়ির ব্যাপারটা কোর্টে চলে গেছে। সুপ্রতিমকেই বা বলতে বারণ করল কেন ? সুপ্রতিম কি শর্মিলার সঙ্গে কিছু... ? ধ্যাৎ, তা কী করে হয় ? তেইশ বছর ঘর করে হাতের তালুর মতো চেনা মানুষটাকে নিয়ে অন্য কিছু ভাবল অদিতি ? ছিহ্। দীপক-শর্মিলার সঙ্গে হাজার একটা পার্টি পিকনিকে গেছে অদিতি, বছর আষ্টেক আগে একবার একসঙ্গে দেরাদুন মুসৌরি বেড়াতে গিয়েছিল, কোনওদিন তো শর্মিলা সম্পর্কে সুপ্রতিমের তিলমাত্র অশোভন আগ্রহ দেখেনি ! বরং বন্ধুপত্নীদের সঙ্গে সুপ্রতিম একটু দূরত্ব বজায় রেখেই চলে। পিছনে লাগে, ফাজলামি ইয়ার্কি করে, তবে সবেতেই খুব সচেতন, মাপা। এ ব্যাপারে বউমহলে সুপ্রতিমের বেশ সুনাম আছে। শর্মিলা কি তবে দীপকদার সঙ্গে মিটমাট করতে চায় ? অদিতিকে মিডিয়াম করবে ? সেটাই বা সুপ্রতিমকে গোপন করতে হবে কেন ? লজ্জা ? আর কী হতে পারে ?

কাল্পনিক ভাবনায় চাঁদি গরম করা পোষাল না অদিতির। তার হাতে এখন অনেক কাজ। পাপাইয়ের পরীক্ষা চলছে, এ সময়ে ছেলের কিছু কিছু বাতিক সামলাতে হয় অদিতিকে। সারা দিন ধরেই। দুপুরে রাতে কখনই পাপাই এখন পেট পুরে খাবে না, তাতে নাকি ঘুম পেয়ে যায়। আবার

খালিও রাখা চলবে না পেট, ক্ষিধে পেলে পাপাইয়ের মনঃসংযোগে অসুবিধা হয়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় এখন খাওয়ার আয়োজন। সন্ধেবেলা একবার মিল্কশেক খাবে, আটটা নাগাদ আম। সেই আম আবার কেটে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখতে হবে এখনই, যথেষ্ট ঠাণ্ডা না হলে আমে নাকি স্বাদ আসে না। এরই মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে বন্ধুরা আসছে অথবা হঠাৎ হঠাৎ উর্ধ্বশ্বাসে বন্ধুদের বাড়ি ছুটছে পাপাই, তাড়া তাড়া নোটস্ ধরিয়ে দিচ্ছে অদিতিকে। মা, প্লিজ চটপট জেরক্স করে এনে দাও না। নিজের লেখাই এখন শিকেয় তোলা, অন্যের ভাবনা নিয়ে গালে হাত দিয়ে বসবে অদিতি ! আর সুপ্রতিমকে এক রাত কথাটা না বললে অদিতির কি পেট ফেটে যাবে। কাল দুপুর অবধি দেখাই যাক।

পরদিন দুপুরে ফুটিফাটা রোদ মাথায় করে এল শর্মিলা। পাপাইয়ের আজ থিয়োরিটিকাল পরীক্ষার শেষ দিন, কাজের লোকরাও বাড়িতে নেই, ফ্ল্যাট আক্ষরিক অর্থেই শুনশান। শর্মিলা তবু অস্বস্তি ভরা চোখে দেখছে চারদিক। প্রচণ্ড উত্তাপে মুখ থমথমে লাল। দরদর ঘামছে। ভূমিকা না করেই আসার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দিল। সুপ্রতিম নাকি দীপককে নিয়ে শর্মিলার বাপের বাড়ি গিয়েছিল, শর্মিলার অনুপস্থিতিতে শর্মিলার বাবা মাকে ভয় দেখিয়ে এসেছে। শর্মিলা যদি ছেলের হেপাজতের দাবি ছেড়ে না দেয় তা হলে কোর্টে শর্মিলাকে ব্যভিচারিণী প্রমাণ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে দীপক। শুধু এটুকুই নয়, টিনটিনের স্কুলেও নাকি বার দুয়েক হানা মেরেছে দীপক আর সুপ্রতিম। স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছে শর্মিলার নামে প্রচুর কুৎসা রটনা করেছে, একদিন নাকি টিনটিনকে জোর করে স্কুল থেকে তুলে আনতে চেয়েছিল। দীপক অতি হীন চরিত্রের মানুষ, সে যে এরকম কিছু করবে সেটা নাকি আন্দাজ করেই আগাম থানায় খবর দিয়ে রেখেছে শর্মিলা। তার অভিযোগ, এর মধ্যে সুপ্রতিম কেন ?

সবটুকু শুনে অদিতি নিথর বসে রইল কিছুক্ষণ। আশ্চর্য, সুপ্রতিম তাকে কিছুই বলেনি ! সুপ্রতিমের মতো মানুষ এই ধরনের ছেলেমানুষি কাণ্ড করেছে ! তাও এই বয়সে, যখন প্রায় বানপ্রস্থে যাওয়ার সময় ! এই মধ্যবয়সে সুপ্রতিমকে প্রায় এক ভাড়াটে গুণ্ডার অপবাদ দিচ্ছে একটা বাইরের মেয়ে, অদিতিকে বসে হজম করতে হচ্ছে ! ছিহ্।

অদিতি শুকনো গলায় বলল,—আমাকে এ সব না বলে তুই ডাইরেক্ট সুপ্রতিমের সঙ্গে কথা বলছিস্ না কেন ?

শর্মিলা সোফায় হেলান দিয়েছে। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। দু দিকে মাথা নেড়ে বলল,—ভরসা হয়নি। দীপকের সঙ্গে সুপ্রতিমদার এত ভাব... । ভাবলাম তোকে আগে বলি। তুই তো মেয়ে, তুই নিশ্চয়ই আমার অবস্থাটা ফিল করতে পারবি।

অদিতি শর্মিলার কাঁধে হাত রাখল,—তুই একটু বোস। ...অফিস যাসনি আজ ?

—না। বাড়ি থেকেই আসছি।

—হাঁপাচ্ছিস খুব। দাঁড়া একটু শরবত করে আনি।

দু-এক চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখল শর্মিলা, সেন্টার টেবিলে দৃষ্টি স্থির। অস্ফুটে বলল,—তোর শুনতে খুব খারাপ লাগল, তাই না রে ?

খারাপ লাগা। অভিমান ! ক্রোধ ! অপমানবোধ ! ঠিক কী অনুভূতি যে হচ্ছে অদিতি নিজেই জানে না। প্রাণপণে গলা স্বাভাবিক রেখে বলল,—আমার বর কতটা ইনভলভড় আমি জানি না। তবে যদি কিছু করে থাকে ঠিক কাজ করেনি। কিন্তু তুই আমাকে একটা কথা বল তো ? দীপকদাই বা তোর ওপর এত হিংস্র হয়ে উঠল কেন ? তাও বিয়ের বিশ বছর পর ?

—স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ঠিক কেমন তা কি বাইরে থেকে বোঝা যায় রে ? বিশেষ করে আমাদের মতন ভদ্র বাড়িতে ? শর্মিলা নিজের নিশ্বাসে নিজে কেঁপে উঠল,—ও আজ থেকে তো এরকম নয়, বরাবরই...

—তা হলে তুই আগেই ডিভোর্স করিসনি কেন ?

—আমরা মেয়েরা কি চট করে সংসার ভাঙতে পারি ? না ভাঙতে চাই ? সবসময়ে ভাবি ফাঁকফোঁকরগুলো রিপু করে করে চালিয়ে নেব। বিয়ের পর বাচ্চা হতে দেরি হচ্ছিল, তখন কী যাচ্ছেতাই না করেছে। তুমি ইচ্ছে করে বাচ্চা চাও না ! তোমার খুব রূপের অহঙ্কার। জানিস,

একদিন আমাকে গেলাস ছুড়ে মেরেছিল, একটুর জন্য চোখ বেঁচে গেছে। এক একবার তুলকালাম করে তারপরেই এমন কান্নাকাটি শুরু করে দিত...। বিয়ের আট বছর পর যখন টিনটিন পেটে এল ভাবলাম এবার অন্তত ঠাণ্ডা হবে। তখন শুরু হল সন্দেহ। ও বাচ্চা আমার নয়!

—কেন, এরকম সন্দেহ এল কেন?

—সন্দেহের কি কারণ লাগে রে?

—এমনি এমনি সন্দেহ এল! অদিতি ঈষৎ কটাক্ষ করল,—নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছিল যাতে দীপকদার বিশ্বাস ভেঙে গেছিল?

শর্মিলা আহত হল না। তার সুন্দর ডিম্বাকৃতি মুখে লালচে আভা ফুটেও মিলিয়ে গেল। হাসল। বড় শীর্ণ হাসি। শান্তভাবে বলল,—দেখ্ অদিতি, বিশ্বাস, বিশ্বাস ভাঙা, সন্দেহ এ সব বড় আজব শব্দ। সবই মানুষের মনগড়া, কিন্তু রকমফের আছে। মানুষ গাছপালা পশুপাখি জীবজন্তু এদের মতো বিশ্বাসেরও একটা শরীর থাকে। আমাদেরই তৈরি করা, তবু আছে। তার লয়-ক্ষয় আছে, ভাঙনও আছে, মৃত্যুও আছে। কিন্তু সন্দেহ হল অশরীরী। ধোঁয়ার মতো। কুয়াশার মতো। এ এমন ধোঁয়া যা চোখে দেখা যায় না, অথচ চোখের মণিতে লেগে থাকে। ওই ধোঁয়াচোখে তাকালে সব কিছু আবছা। একে মারা যায় না, কাটা যায় না, উপড়োনো যায় না। বুঝতে পারছিস কী বলতে চাইছি? সন্দেহের জন্য কোনও উপকরণ লাগে না রে। আমাদেরই দুর্বলতার ছিদ্র দিয়ে সন্দেহ মনের ভেতর ঢুকে পড়ে। চারপাশের জগৎ থেকে উপকরণ খুঁজে নিয়ে আমরা সেটাকে মেলাতে চাই। একটা না মিললে আরেকটা উপকরণ খুঁজি, সেটা না মিললে আরেকটা। দীপক তো আমাকে বিশ্বাসই করেনি, বিশ্বাস ভাঙার প্রশ্ন আসে কোত্থেকে? তার তো আগাগোড়াই সন্দেহ। বাচ্চা হচ্ছে না কেন তাই নিয়ে সন্দেহ, বাচ্চা হচ্ছে কেন তাই নিয়ে সন্দেহ। আমি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরলে সন্দেহ, দেরিতে ফিরলে সন্দেহ। ভাবতে পারিস, আমার এখন বয়স হয়ে গেছে, একটা বারো বছরের ছেলের মা, আমাকে একটা বাচ্চা আঠাশ-তিরিশ বছরের ছেলের সঙ্গে সন্দেহ করে? ছেলেটার দিদি মরে গেছে, আমাকে দিদি দিদি করে...। অথচ দেখ, ধীরাদিকে জড়িয়ে অনেকে তো ওর সম্পর্কে অনেক কথা বলে। আমি কান দিইনি, এখনও দিই না। কেন দেব বল? আমার স্থির বিশ্বাস, দীপক পৃথিবীতে নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই ভালবাসতে পারে না। ওই মানুষ করবে অ্যাফেয়ার? তা হলে আমার ধীরাদির ওপর করুণা হবে।

শান্ত মুখে শুরু করেও উত্তেজিত হয়ে গেছে শর্মিলা। টেবিল থেকে গ্লাস তুলে এক ঢোকে পুরো শরবতটা খেয়ে নিল। শরীর ছেড়ে দিয়েছে সোফায়। চোখ বুজেছে।

অদিতি কুণ্ঠিত মুখে বলল,—সব বুঝলাম। তবু বলি, টিনটিনকে নিয়ে টানাটানিটা কি না করলেই নয়?

—না, দীপকের শাস্তি পাওয়া দরকার। শর্মিলা হঠাৎ ফুঁসে উঠেছে,—এখন ছেলে ছেলে করে কাঁদছে, অথচ একদিন এই ছেলেকেই দীপক...। আসলে কী জানিস্, টিনটিনকে কেড়ে নিয়ে ও আমাকে জব্দ করতে চাইছে। আমি প্রাণ থাকতে টিনটিনকে ছাড়ব না। আমার এগেনস্টে ও যদি পাঁচটা অ্যালিগেশান আনে, আমি ওর এগেনস্টে পঞ্চাশটা অ্যালিগেশান আনব। অনেক ইনসাল্ট সহ্য করেছি, আর নয়। যখন কম বয়স ছিল তখন অনেক সোশ্যাল বেরিয়ার ছিল, আমি এখন আর কিছুকে ভয় পাই না।

অদিতি শর্মিলাকে দেখছিল। কুড়ি বছর একসঙ্গে ঘর করার পরও পারস্পরিক সম্পর্কে এত বিতৃষ্ণা জমতে পারে? তা হলে সম্পর্ক কথাটার অর্থ কী? শিকড়বিহীন হয়ে শুধু ডালপালা ফুলপাতা মেলে দাঁড়িয়ে থাকা? অথবা দড়ির ওপর হাঁটা? ব্যালান্স করতে করতে? সার্কাসের খেলার মতন?

রাত্রে শোওয়ার আগে কথাটা তুলল অদিতি। সরাসরি নয়, একটু বাঁকা পথে। নিরীহ মুখে সুপ্রতিমকে জিজ্ঞাসা করল,—হ্যাঁ গো, দীপকদার সেই কেসটার কী হল?

স্নান সেরে এসে চুল আঁচড়াচ্ছিল সুপ্রতিম। বলল,—মামলা চলছে।

—কে শেষ পর্যন্ত করল মামলা? দীপকদা, না শর্মিলা?

—শর্মিলা। তবে দীপকও ছাড়নেঅলা নয়, লড়ে যাবে।

—কী নিয়ে লড়বে ? ডিভোর্স নিয়ে ? দীপকদা কি ডিভোর্স দিতে চায় না ?

—দীপক টিনটিনকে দিতে চায় না। ছেলের কাস্টডি নিয়ে মনে হয় জোর টানাটানি চলবে।

গরমকালে রাত্রে এ বাড়িতে মশারি টাঙানোর চল নেই, রাসায়নিক ট্যাবলেট রক্তচক্ষু মেলে সারা রাত মশা তাড়ায়। নতুন একটা ট্যাবলেট যন্ত্রে গুঁজে দিল অদিতি। সুইচ অন্ করে বলল,—শর্মিলারই কিন্তু কাস্টডি পাওয়া উচিত।

—কেন ?

—কারণ ও টিনটিনের মা। ছেলেরা মায়ের কাছে থাকাই বেশি প্রেফার করে।

সুপ্রতিম আলোর দিকে চিরুনি তুলে চুল খুঁজছে। বলল,—দেখো কে পায়।

—দীপকদা যে জেদ করছে, ছেলে নিয়ে সামলাবে কী করে ? সন্ধেবেলা বোতল খুলে বসবে, ছেলের পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে।

—ছাড়ো তো। যার ছেলে সে বুঝবে। আমাদের মাথা ঘামানোর কী দরকার ? চালশে চশমা চোখে পরছে সুপ্রতিম,—পাপাইয়ের প্র্যাক্‌টিকাল পরীক্ষা করে ?

—সোমবার ডেট দেবে। অদিতি আয়নার ভেতর দিয়ে সুপ্রতিমকে দেখছিল। চোখ না সরিয়ে বলল,—দীপকদাদের ব্যাপারে আমাদের কোনও মাথা ঘামানোর দরকার নেই বলছ ? তোমার এতদিনের বন্ধু...

—কী আর করা যাবে। সম্পর্ক যদি না টেকে... বেটার পার্ট অ্যাজ ফ্রেন্ডস্ দ্যান্ লিভ টুগেদার অ্যাজ অ্যানিম্যালস্।

—ওরা এখন দূরে থাকলে শত্রু, কাছে গেলেও শত্রু।

—হুঁ। ইদানীং ওদের রিলেশানটা বড় তিক্ত হয়ে পড়েছিল। সুপ্রতিম হঠাৎ যেন একটু সচকিত হল,—তোমার হঠাৎ দীপকদের ব্যাপারে এত উৎসাহ কেন ?

ইঁদুরবেড়াল খেলাটা আর পছন্দ হচ্ছিল না অদিতির। খর গলায় বলে উঠল,—তোমার উৎসাহ নেই ?

—আমার ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার। ন্যাকামি করছ কেন ? শর্মিলা আজ দুপুরে এখানে এসেছিল। ঘরে বসে মুনিঋষির মতো কথা বলছ, এদিকে সাত জায়গায় শর্মিলার কুচ্ছো গেয়ে বেড়াচ্ছ, তোমার লজ্জা করে না ? ছি ছি, শর্মিলা কী অপমানটাই না করে গেল আজ !

হঠাৎ মিথ্যা ধরা পড়ে গেলে অসহায় অবস্থাতেও একটা রাগ আসে। মরিয়া, কিন্তু অক্ষম রাগ। সিগারেট ধরিয়ে ফসফস টানল সুপ্রতিম, ঘষে ঘষে অ্যাশট্রেতে নেবাল,—শর্মিলা এসেছিল তুমি এতক্ষণ বলোনি কেন ?

—তুমিও তো বলোনি। তুমি শর্মিলার বাড়িতে গিয়েছিলে, টিনটিনের স্কুলে গিয়েছিলে... একটা পঞ্চাশ বছরের লোক, খোকামি করে বেড়াচ্ছ...

—বাজে কথা বোলো না। শর্মিলা যা বলে গেছে সবই বুঝি ধ্রুব সত্যি ?

—সত্যিটা কী তুমিই বলো না। পেটে চেপে রেখেছ কেন ? আমি তো সত্যিটাই জানতে চাই।

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বেড়ালের মতো খুনি চোখে তাকাচ্ছে সুপ্রতিম। নিশ্বাস ফেলছে জোর জোর। ঢকঢক করে গোটা জগের জল শেষ করল। বেডসুইচ টানল খাটের বাজুতে। পড়াত করে আলো নিবিয়ে দিল। অন্ধকারে হিস হিস করে উঠেছে,—যা করেছি, ঠিক করেছি। যা ভাল বুঝেছি, তাই করেছি। তোমার কাছে আমায় কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি ?

ফটাস্ করে আলো জ্বালিয়ে দিল অদিতি,—ঘর অন্ধকার করছ কেন ? মুখ দেখাতে লজ্জা করছে ?

স্থান কাল ভুলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল সুপ্রতিম,—আমাকে ঘুমোতে দেবে ? গাধার খাটুনি খেটে আমায় তোমাদের অন্ন জোগাতে হয়। রাত দুপুরে ইয়ে করা আমার ভাল্লাগে না।

অদিতি ঝুম হয়ে গেল। ঝুম, না নিঝুম ?

পরদিন থেকে সুপ্রতিমও গুম। এক বিরক্ত বুলডগের মুখোশ এঁটে ঘোরাফেরা করছে বাড়িতে। সকালবেলা বেরিয়ে যায়, রাত করে ফেরে। ছুটির দিনেও আয়েশ আরাম ফেলে টোটো করতে চলে যায় কোথায়। ছেলেদের সঙ্গে যেচে কথা বলে না, বড় জোর চোয়াল ফাঁক করল, বাস্। পাপাই তাতাই বাবার এই মেজাজটা দেখেছে কয়েক বার, তারাও বাবাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। অদিতিকেই পুছতাছ করেছে তারা। বাবা হঠাৎ আউট অফ ফোকাস্ কেন ? এবার কী নিয়ে ফাইটটা হল তোমাদের ? অদিতি বিরস মুখে এড়িয়ে যায় প্রসঙ্গটা। বলবেই বা কী ছেলেদের ?

সুপ্রতিমের সঙ্গে ঝগড়া হলে সাধারণত অদিতিই মিটিয়ে নেয়। বাড়ির ভেতর একটা হুতুম প্যাঁচা ঘুরে বেড়াবে, এটা কি খুব দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য ? তরল মেজাজের মানুষ হলেও সুপ্রতিমের মধ্যে একটা গোঁয়ার্তুমিও আছে। এ ধরনের লোকদের বাবা বাছা করে ঠাণ্ডা করতে হয়।

এবার অদিতি তা করল না। তারও বুকের হাড়পাঁজরায় এক তপ্ত বাতাস জমাট বেঁধে আছে। হয়তো সুপ্রতিম নিছক বন্ধুকে সঙ্গ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই শর্মিলার বাড়ি গিয়েছিল। বা টিনটিনের স্কুলে। দীপকদা তেমন বাক্‌পটু নয়, সুপ্রতিমকে হয়তো জোর করেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল দীপকদা। বন্ধুর জন্য সুপ্রতিম এ কাজ করতেই পারে। অন্যায় জেনেও। কিন্তু অদিতিকে গোপন করল কেন ? সব থেকে বেশি অদিতির বুকে বেজেছে সেই রাতে সুপ্রতিমের নির্বিকার হাবভাবটা। সুপ্রতিমকে ওই স্তরের মিথ্যাচারী ভাবতে কী যে কষ্ট হচ্ছে অদিতির !

এরই মধ্যে হেমেন এলেন একদিন। সঙ্গে একটি বছর তিরিশেকের ছেলে। হেমেনের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই এক-আধটা চেলাচামুণ্ডা আসে আজকাল। এই ছেলেটি নতুন। ছিপছিপে চেহারা, রোদে পোড়া ফর্সা রং, গালে সযত্নে লালিত এলোমেলো দাড়ি। চোখ দুটিও সুন্দর। ভাসা ভাসা। মায়া মাখানো। সাদা চোস্তের ওপর নরম হলদে পাঞ্জাবি পরেছে ছেলেটি, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ঝোলা ব্যাগ।

প্রথম দর্শনেই ছেলেটিকে বেশ ভাল লেগে গেল অদিতির।

খুন্তি হাতেই ছুটে এসেছিল অদিতি, হেমেন সোফায় বাবু হয়ে বসে বললেন, —দেখো রঞ্জন, এই সেই অদিতি মজুমদার। এক হাতে খুন্তি চালায়, অন্য হাতে কলম।

অদিতি লাজুক হাসল, —যাহ্, আপনার না বাড়াবাড়ি। না ভাই, গল্প আমি সাকুল্যে গোটা চারেক লিখেছি। আর খুন্তি চালানো ? আজ রান্নার লোক ছুটি নিয়েছে তাই বাধ্য হয়ে...

রঞ্জন বিনীতভাবে বলল, —আপনার ফাটল গল্পটা আমার অসাধারণ লেগেছিল।

রঞ্জনের কণ্ঠস্বরটিও ভারী উদাত্ত। পুরনো হেমেনমামাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আবৃত্তি করে নাকি।

রঞ্জন আবার বলল, —তার পরেও আপনার কী একটা গল্প পড়লাম ? কী যেন নাম ?

অদিতি হেসে ফেলল, —নাম মনে নেই তো ? তার মানে ভাল লাগেনি।

—না না, ওই গল্পটাও ভাল। তবে এক একটা গল্প মনকে সরাসরি বিদ্ধ করে। ফাটল গল্পটা সেরকম। মনে হয় কোথায় যেন একাত্ম বোধ করতে পারছি। জানেন আমার এক কাকার গল্পটা পড়ে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

কদিন ধরে বুক কামড়ে পড়ে থাকা দমচাপা ভাবটা ক্রমশ লঘু হয়ে আসছে। অদিতি হাসি মুখে বলল, —এত প্রশংসা করলে তো আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। কী খাওয়াব বলুন, ঠাণ্ডা না গরম ?

—গরম। চা। হেমেনই উত্তর দিলেন, —তোমার বড় পুত্রের পরীক্ষা শেষ হল ?

—হ্যাঁ। নিশ্চিন্ত। গত কাল প্র্যাক্‌টিকাল হয়ে গেল।

—কী পরীক্ষা দিল আপনার ছেলে ?

—পার্ট টু। বি. এসসি।

রঞ্জন বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়েছে, —আপনার এত বড় ছেলে আছে ! দেখে কিন্তু একদম মনে হয় না।

অদিতি ভ্রূকুটি হাসল, —একটা নয়, আমার দুটো ছেলে আছে। ছোট জন সেকেন্ড ইয়ারে উঠবে।

—বিশ্বাস করুন, আপনাকে দেখে পঁয়ত্রিশের বেশি মনেই হয় না।

হেমেন গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলেন, —এরকম একটা কমপ্লিমেন্ট পেলে, ওর চায়ে একটু বেশি করে চিনি দিও।

অদিতি দ্রুত রান্নাঘরের কাজ শেষ করে চা নিয়ে এসে বসেছে। বড় প্লেটে সাজিয়ে দিয়েছে নোনতা বিস্কুট, চানাচুর, হিমশীতল সন্দেশ।

চা খেতে খেতে হেমেন বললেন, —রঞ্জনও কিন্তু খুব ভাল লিখছে এখন। একটি বিখ্যাত পত্রিকায় দুটো গল্প বেরিয়েছে।

অদিতির ভুরুতে ভাঁজ পড়ল, —আপনিই রঞ্জন দাশগুপ্ত ?

লজ্জা লজ্জা মুখে মাথা চুলকোল রঞ্জন, —বাবা মা ওই নামটাই রেখেছেন।

—দুটো গল্পই আমি পড়েছি। স্বপ্নের নৌকো, আর অঙ্ক দৌড়। ঠিক বলছি ?

রঞ্জন ঘাড় নাড়ল।

অদিতি বলল, —আপনি থাকেন কোথায় ? এদিকেই ?

—না, একদম উল্টো দিকে। বারাসত।

হেমেন বললেন, —বারাসতে ওদেব একটা গ্রুপ আছে। তরুণ লেখকদের। নিয়মিত বসে সকলে, গল্প পড়া হয়, আলোচনা হয়...। ওদের গ্রুপের আরেক জনও খুব উঠছে। আনিসুর রহমান। আনিসুরের লেখা তুমি পড়েছ অদিতি ?

—নামটা শোনা শোনা। মনে হচ্ছে পড়েছি।

হেমেন বললেন, —এই রঞ্জন, আনিসুরকে একদিন এনো না এ বাড়িতে। তুমি তো চিনে গেলে।

—সে আনাই যায়। রঞ্জন অদিতিকে বলল, —আপনিও একদিন আমাদের ওখানে চলুন না।

—যাহ্, আমি কি তরুণ নাকি ? জানেন এই নভেম্বরে আমি ছেচল্লিশে পড়ব ?

হেমেন হাসছেন,— তারপর ক' বছর তোমার ছেচল্লিশ চলবে ?

—কেন ?

—বারে, মেয়েদের তো শুনেছি তিরিশের পর থেকে দু-তিন বছর পর পর একটা করে জন্মদিন হয !

—হেমেনমামা, আপনি না...। অদিতি হেসে বাঁচে না, —দু দুটো ছেলে তালগাছের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, কোন ফাঁক দিয়ে বয়স লুকোব ?

রঞ্জন বলল, —তাতে কিছু এসে যায় না। আপনি যখন নতুন লিখছেন, তখন আপনি তরুণই। সে আপনার আশি বছর বয়স হলেও আপনি তরুণ। কী হেমেনদা, ঠিক কিনা ?

গল্পগুজবে হাসিঠাট্টায় অন্তর ধুয়ে যাচ্ছিল অদিতির। প্রথম জ্যৈষ্ঠের উষ্ণতাও আর তত প্রখর লাগছে না। খোলা জানলা দিয়ে লাজুক লাজুক বাতাস আসছে মাঝে মাঝে। স্বপ্নের কুঠুরিটা খুলে যাচ্ছে অদিতির। লেখালিখির গল্প, গল্পের গল্প রূপকথা হয়ে অদিতিকে নিয়ে চলেছে কৈশোরের দরজায়। অথবা এক প্রমত্ত যৌবনে।

হেমেন সোফায় পা নাচাচ্ছেন, —তারপর ? তুমি কিছু লিখলে ? অনেক দিন কিন্তু তোমার গল্প শোনা হয়নি।

অদিতি টিপ টিপ হাসল, —পাপাইয়ের পরীক্ষার আগে একটা লিখেছিলাম। ফেয়ার করা হয়নি। পরে পড়ে শোনাব।

—পরে কেন ? আজই নয় কেন ? রঞ্জন নড়েচড়ে বসেছে।

অদিতি বলল, —না বাবা, আপনারা সব বড় বড় লেখক, আপনাদের সামনে আমি গল্প পড়ব না।

—এরকম বললে তো আজই শুনতে হয়।

হেমেন বললেন, —নিয়ে এসো না। চটপট শুনিয়ে দাও। রঞ্জন আবার বারাসত ফিরবে।

—গল্পটা কিছু হয়নি হেমেনমামা। আরেকবার লিখতে হবে।

—আপনি ঠিক আমার ছোট বোনের মতো করছেন। কী ভাল গান গায়, কেউ শুনতে চাইলেই বলে আইসক্রিম খেয়ে গলা ভেঙে গেছে!

চাপের মুখে অদিতিকে আনতেই হল গল্পটা। সবে পাতা খানেক পড়েছে, দস্যুর মতো হাজির হল তাতাই। ঢুকেই অতিথিদের দেখে তার মুখ শুকিয়ে আমসি।

হেমেন বললেন, —কী ছোটেমাস্টার, এমন ভগ্নদূতের দশা কেন?

কেঠো হাসি হাসল তাতাই, —আপনারা টিভি খোলেননি? ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার খেলা দেখাচ্ছে।

—ওহো, তাই তো। রঞ্জন ঘড়ি দেখল, —আটটায় আরম্ভ হওয়ার কথা না?

তাতাই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, —আপনি দেখবেন?

—দেখলে হত। কিন্তু তোমার মার গল্পটা যে শুনছি ভাই।

তাতাই একবার আড়চোখে তাকাল অদিতির দিকে, —খেলাটা দেখে নিয়ে শুনুন।

—না। তা হলে আমার দেরি হয়ে যাবে। কাল সকালে তো রিপ্লে দেখাবে, তখন দেখে নেব।

হেলেঞ্চা পাতা খাওয়া মুখ হয়ে গেল তাতাইয়ের। গ্যাঁট হয়ে বসে পড়েছে সোফায়। উশখুশ করছে। টেবিলে পড়ে থাকা চানাচুর থেকে ঘন ঘন বাদাম তুলে খাচ্ছে।

হেমেনের বোধহয় প্রাণে দয়া জাগল। বললেন, —আমরা কি অন্য কোথাও বসে গল্পটা শুনতে পারি না অদিতি? ছোটেমাস্টার নয় খেলা দেখুক।

অদিতি এক মুহূর্ত চিন্তা করল। ছেলেদের ঘরে গিয়ে বসা যায়, সেখানে আবার পাপাই এসে পড়তে পারে। নিজেদের ঘরে বসবে?

তাই বসল। খাটের ওপর জমিয়ে বসেছেন হেমেন, পাশে রঞ্জন। তাদের মুখোমুখি বসে গল্পটা পড়ছিল অদিতি। পড়তে পড়তেই টের পেল সুপ্রতিম ফিরেছে, দরজায় এসে দাঁড়ালও একবার, হেমেনের সঙ্গে চোখাচোখি হতে সৌজন্যের হাসি হেসে সরে গেল। ছেলের পাশে বসে টিভি দেখছে।

রঞ্জন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল লেখাটার, হেমেনমামা অতটা না। রঞ্জনের মতে গল্পটা বড় কোনও পত্রিকায় পাঠানো উচিত, হেমেনমামা চান গল্পটা আরেকবার লিখুক অদিতি। পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর লেখিকা যে অনুভূতিটা নিয়ে ফিরছে সেটা আরও তীব্র হওয়া প্রয়োজন। রঞ্জন গল্পের কোনও বদল চায় না, অতি স্বাভাবিক সমাপ্তিতেই সে বেশি অভিভূত।

আলোচনা করতে করতে রাত গড়িয়ে গেল। হেমেনরা উঠলেন রাত সাড়ে নটায়।

খুশি খুশি মেজাজে খাবার থালা সাজাচ্ছে অদিতি। তখনই বিস্ফোরিত হল সুপ্রতিম। পাপাই তাতাইয়ের সামনেই।

—আমি জানতে চাই এ সবের অর্থ কী? যে কেউ আসবে, বেডরুমে ঢুকে যাবে, আমার বাড়ির কি একটা প্রাইভেসি নেই?

অদিতি বিমূঢ়, —তাতাই খেলা দেখছিল তাই...একদিন একটু ঘরে বসে গল্প পড়েছি!.... হেমেনমামা প্রায় আমাদের ঘরের লোক...!

—ও সব হেমেনমামা ফেমেনমামা বুঝি না। ওই যে সখী সখী চেহারার দেড়েল ছেলেটা খাটে উঠে বসেছিল, সেও কি ঘরের লোক?

অদিতি তপ্ত হল এতক্ষণে, —ঘরে কি আজ প্রথম বাইরের লোক ঢুকল? তোমার সোমেন তথাগতরা এসে কি সারাক্ষণ ড্রয়িংরুমে বসে থাকে?

—আমার বন্ধুদের সঙ্গে ওই রাস্তার হ্যাগার্ডদের তুলনা? সমস্ত বাড়াবাড়ির একটা লিমিট থাকা উচিত। ফের যদি কোনওদিন আমার ঘরে বাইরের লোক ঢোকাতে দেখেছি...

অদিতি অপমানে ম্লান হয়ে গেল। সাংসারিক তুচ্ছ কারণে বহুবার অজস্র বিবাদ হয়েছে তাদের, এইটুকু ফ্ল্যাটে পাপাই তাতাইয়ের কাছে তা সব সময়ে আড়ালও থাকে না, তা বলে এই ভাষায় কথা বলবে সুপ্রতিম? এত অকিঞ্চিৎকর কারণে? চেনা মানুষ কি কবে এমন অচেনা দানব হয়ে যায়?

মলিন মুখে ছেলেদের খেতে দিল অদিতি। সুপ্রতিমকেও। পাপাই তাতাই গম্ভীর, সুপ্রতিমের

ভ্রূক্ষেপ নেই, খাচ্ছে সে। শব্দ করে করে স্টিলের থালায় মাংসের হাড় ঠুকল, চুষে চুষে নরম শাঁসটুকু বার করে নিল। ল্যাংড়া আমের আঁটি নিপুণভাবে শেষ করে তৃপ্তির উদগার তুলছে।

খাওয়া শেষে বিছানায় নিঃসাড়ে শুয়ে আছে অদিতি। বাইরে এক নিষ্করুণ গুমোট। ঘরেও। পাখার হাওয়াতেও ঘাম জমছে গায়ে, থসথস করছে দেহ।

আলো নিবিয়ে সুপ্রতিম ঠেলল অদিতিকে, —অ্যাই।

অদিতি কাঠ হয়ে রইল।

সুপ্রতিম টানল অদিতিকে, —খুব রাগ করেছ ?

নিজেকে আরও শক্ত করল অদিতি।

অদিতির মাথা মুখের খুব কাছে নিয়ে এল সুপ্রতিম। অভ্যস্ত নিশ্বাসপ্রবাহে অভ্যস্ত উত্তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমশ। কোমল জড়ানো স্বরে সুপ্রতিম বলল, —রাগ করো কেন ? তুমি আমাকে একদিন অপমান করেছিলে, আমি তোমাকে কাউন্টার ইনসাল্ট করে দিলাম। কাটাকুটি হয়ে গেল।

অদিতির রক্তস্রোত থেমে গেছে অকস্মাৎ। নিজের মিথ্যে আর অন্যায়ের সঙ্গে অদিতির আজকের সরল উচ্ছ্বাসকে এক দাঁড়িপাল্লায় বসাতে চাইছে এ কোন সুপ্রতিম ! তেইশ বছর পরেও পরিচিত ঘ্রাণ কেন আজ অজানা লাগে !

অদিতি ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। পাশ ফিরে শুল। ভাঙা স্বরে বলল, —ঘুমোও।

দশ

সকালে পাখিকে জল ছোলা দিতে গিয়ে শিউরে উঠল অদিতি। ব্যালকনিতে ছড়িয়ে আছে অজস্র ছোট ছোট পালক, খাঁচা ঢাকার কাপড় মেঝেতে লুটোচ্ছে। টিয়া টলছে খাঁচায়। বাঁ ডানায় তার গভীর ক্ষত, সবুজ শরীরে ছোপ ছোপ রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে।

মেরেই দিল পাখিটাকে ?

সুপ্রতিমের সঙ্গে অদিতির সম্পর্ক এখনও স্বাভাবিক হয়নি, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া পরস্পরের কথা হয় না। যাও বা হয়, ভাববাচ্যে। ক্রিয়াপদবিহীন। অফিস যাওয়ার আগে সুপ্রতিম হয়তো চেঁচিয়ে বলল, মোজা ? রান্নাঘর থেকে অদিতি উত্তর দিল, আলনার পেছনে। রাত্রে হয়তো সুপ্রতিম প্রশ্ন করল, কখন খেতে বসা হবে ? অদিতি জবাব দিল, টেবিলে বসলেই দেওয়া হবে। কখনও আবার সরাসরিও নয়, কথা চলছে ছেলেদের মাধ্যমে। তাতাই জিজ্ঞেস কর তো, ছোটপিসির বাড়িতে কি অফিস থেকেই চলে যাবে, না এখানে এসে যাবে ? পাপাই বলে দে, রিঙ্কির জন্মদিন পরশু, কাল ভেবে ডিসাইড করা হবে।

ছোট্ট একটা ঝাপটাও অনেক সময়ে বুকের পাষাণভার নামিয়ে দেয়।

অদিতি সব ভুলে আর্তনাদ করে উঠল,—এই শুনছ, শিগগির একবার এদিকে এসো।

ঘুমচোখে দৌড়ে এসেছে সুপ্রতিম। পাখির রক্তাক্ত দশা দেখে তারও চক্ষু স্থির।

নিজের অজান্তে অদিতি খামচে ধরেছে সুপ্রতিমকে। থরথর কাঁপছে,—কী হবে এখন ? ও কি মরে যাবে ?

সুপ্রতিম খাঁচার কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখছে পাখিটাকে। দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো বলল,—অত ভেঙে পড়লে চলবে ? কিছু তো একটা করতেই হবে।

—কী করব ?

খাঁচার দরজা খুলল সুপ্রতিম। পাখিকে একবার ছুঁতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল,—ইশ, জোর চোট লেগেছে। মারল কী করে বলো তো ?

অদিতি প্রায় কেঁদে ফেলল,—বুঝতে পারছি না। কিছু একটা করো প্লিজ।

—এই হল গিয়ে পাখি পোষার বখেড়া। কতবার বলেছি পুষতে হলে অ্যালসেশিয়ান পোষো, ডোবারম্যান পোষো, কেউ কাছে ঘেঁষতে পারবে না। তা নয়, পাখি ! যাও, একটা পরিষ্কার তোয়ালে নিয়ে এসো।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটল অদিতি। তোয়ালের সঙ্গে সঙ্গে পাপাই তাতাইকেও ঘুম থেকে তুলে এনেছে। সন্তর্পণে পাখিটাকে তোয়ালেতে তুলে নিয়েছে সুপ্রতিম, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আঘাতটা দেখছে। অদিতির টিয়া একেবারে নির্জীব, গলায় শব্দটি নেই, একবার করে তাকাচ্ছে আর চোখ বুজে ফেলছে।

পাপাই বলল,—ও বাঁচবে না। খাবি খাচ্ছে।

তাতাই বলল,—না না, বেঁচে যাবে। চোটটা ডানার ওপর দিয়ে গেছে।

—পাখিদের ডানাটাই আসল।

—মোটেই না, ডানা ছাড়াও পাখি বাঁচতে পারে। মেন হল বডি। হার্ট লাঙস্ ব্রেন অ্যাবডোমেন্। ... শরীরের কোথাও তেমন ইনজুরি হয়নি।

—স্টিল, ডানা চলে গেলে পাখির আর পাখিত্ব রইল কী ?

সুপ্রতিম বলল,—তর্ক থামিয়ে কাজের কাজ কিছু কর। তোর মার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে আমাদের কোম্পানির অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম আছে, জলদি নিয়ে আয়।

—তার আগে একটু ডেটল দিয়ে ওয়াশ করে নিলে ভাল হত না বাবা ?

—না বাবা, ডেটলে ভীষণ জ্বালা করবে। তার থেকে গরম জল দিয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল।

সুপ্রতিম বলল,—আমাদের ক্রিম লাগালে জল ডেটল কিছু লাগে না। তুমি যাও তো, ক্রিমটা নিয়ে এসো তো।

দিশেহারা অদিতি ছুট্টে ক্রিম নিয়ে এল।

পাখির পরিচর্যা চলছে। বাপ আর দুই ছেলে মিলে ওষুধের প্রলেপ লাগাচ্ছে পাখির ডানায়। অবিরাম মন্তব্য চলেছে। ডাক্তারি শাস্ত্র এমনই একটা বিষয় যাতে প্রতিটি মানুষেরই অগাধ জ্ঞান। তবে একজনের সঙ্গে আর এক জনের জ্ঞান কিছুতেই মিলতে চায় না। একজন যদি বলে ব্যান্ডেজ করে দাও, অন্য জন বলে খোলা থাকাই ভাল। পাপাই বলল বেবি ডোজের অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো উচিত, তাতাই বলল পেনকিলাব। ছেলেদের মতে পাখিকে এক্ষুনি কোনও ভেটেরিনারি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। সুপ্রতিমের মত, কিচ্ছু লাগবে না, তার ক্রিমেই পাখির ক্ষত শুকিয়ে যাবে। বরং আয়রন টনিক ড্রপারে করে খাইয়ে দেওয়া হোক, রক্ত তৈরি হবে তাড়াতাড়ি।

পশুপাখি জীবজন্তুর স্বভাবচরিত্র সম্পর্কেও বাপ ছেলেদের পাণ্ডিত্য কম নয়। সবাই অভিজ্ঞ মতামত জানাচ্ছে।

পাপাই ব্যালকনির গ্রিলটাকে এবকুল পোয়ারোর মতো তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করল,—এইটুকু ফাঁক দিয়ে বেড়াল ঢুকল কী করে ? আমার মনে হয় ব্যাটা কোনওভাবে বাড়ির ভেতরেই ছিল।

—কী বুদ্ধি ! তাতাই ভেংচে উঠল,—ভেতরে থাকলে বেরিয়েই বা গেল কী করে ? বেড়াল কি দরজার ছিটকিনি খুলে ব্যালকনিতে এসেছিল ? বেড়ালের বডি খুব ফ্লেক্সিবল্ হয়। এইটুকু সরু ফাঁকের মধ্যে দিয়েও গলে আসতে পারে।

সুপ্রতিম বলল,—আমি শিওর, বেড়াল যখন অ্যাটাক করে, পাখিটা নির্ঘাত গাধার মতো ঘুমোচ্ছিল। না হলে একটা চিৎকার-টিৎকার অন্তত করত।

—খাঁচার বাইরে থেকে মারল কী করে বলো তো ?

—পাখিটা নিশ্চয়ই সাইডে ছিল, ইজিলি থাবা মেরে দিয়েছে। বেড়ালের থাবা খুব সুইফট চলে। ইনফ্যাক্ট ডোমেস্টিক অ্যানিমেলের মধ্যে বেড়ালই সবথেকে ফাস্ট মুভিং ক্রিচার।

—এবং সবথেকে শয়তান। সাংঘাতিক বেইমান। তুই একটা বেড়ালকে বেবি অবস্থা থেকে দুধটা মাছটা খাইয়ে বড় কর, দেখবি চান্স পেলে তোর কিচেনেই সাফ করে দিচ্ছে। চোখে চোখে কেমন তাকিয়ে থাকে লক্ষ করিসনি ? সব সময়েই কেমন বেপরোয়া অ্যাটিচিউড্।

অদিতি নির্বাক শুনছিল। তার আর্দ্র চোখ পাখিতে স্থির। আহত টিয়াকে দেখার পর থেকেই হাত পা কেমন অসাড় হয়ে গেছে তার। স্বামী ছেলেরা খুব যত্ন করেই পরিচর্যা করছে পাখির, পাখিসুদ্ধু খাঁচাটাকে ফ্ল্যাটের অন্দরে নিয়ে এসেছে। পাখিটাকে ছুঁতে কিছুতেই সাহস হচ্ছিল না অদিতির। কাজে মন বসছে না, বুকের ভেতর টিপ টিপ করছে একটা কষ্টের দানা, ঘুরে ফিরে

অদিতি দেখে যাচ্ছে টিয়াকে। নড়ে না টিয়া, ঝিমিয়ে আছে।

বড় মায়া। বড় মায়া।

অফিস বেরোনোর আগে সুপ্রতিম অদিতির কাঁধে হাত রাখল,—মন খারাপ কোরো না। তোমার পাখি ঠিক হয়ে যাবে।

আশ্চর্য, অত বড় আঘাতটাও সামলে উঠল অদিতির টিয়া, বেঁচে গেল। সুপ্রতিমের মলমের গুণেই হোক, অদিতির মায়ার টানেই হোক, কী পাপাই তাতাই-এর দেখভালেই হোক, অথবা নিজেরই জীবনীশক্তির জোরে, একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠল টিয়া। ক্ষত শুকোল, নিস্তেজ পাখি চাঙা হল ধীরে ধীরে। প্রথম দু দিন টিয়া মুখে তোলেনি কিছু, ড্রপারে করে তাকে গ্লুকোজের জল খাইয়ে টিকিয়ে রাখল তাতাই। তৃতীয় দিন থেকে ক্ষুধা তৃষ্ণার বোধ জাগল টিয়ার, নিজে নিজেই ঠোঁট ছোঁয়াল ছাতুতে। তার ডানা বেশ কমজোরি হয়ে গেছে, তবু নাড়ে মাঝে মাঝে, একটুখানি ছড়িয়ে রেখে দাঁড়ে উঠে বসে।

শেষে একদিন স্বরও বেরোল। কর্কশ নিনাদ, তবু কী মধুর! যেন শুধু ডাক নয়, বেঁচে থাকার এক প্রবল ঘোষণা।

টিয়ার আততায়ীকে শনাক্ত করেছে তাতাই। পরদিনই। সেটা এক চ্যাপটামুখো হুলো বেড়াল, গোটা বিল্ডিং কমপ্লেক্সে তার প্রবল দাপট, অনেক ফ্ল্যাটই তার ডাকাতির জ্বালায় অতিষ্ঠ। তবে সে হুলোও সেদিন রাত্তিরে পুরোপুরি রেহাই পায়নি, টিয়াও তার চোখের নীচে ঠোক্কর মেরে গর্ত করে দিয়েছে। তাতাই স্থির করেছে, হুলোটাকে দেখতে পেলেই পেটাবে।

পাখির চিন্তায় অদিতি কদিন লেখা নিয়েও বসতে পারেনি। দুপুর হলে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থেকেছে চুপচাপ। সে সময়ে হুলোটাকে অনেকবার চোখে পড়েছে তার। গালে একটা কুৎসিত ঘা নিয়ে বিমর্ষ মুখে পাঁচিলে পাঁচিলে ঘুরে বেড়ায়, কখনও বা উলটো দিকের ফ্ল্যাটের কার্নিশে মুখ গুঁজে বসে থাকে। বেড়ালটার জন্যও অদিতির কেমন মায়া হয়। আহারে, বেচারা নিজেও জানে না তার আচরণ কত নির্মম! কী করবে বেড়াল, পাখির সঙ্গে চিরকাল যে তার খাদ্যখাদকের সম্পর্ক, সেই চোখেই তো সে দেখে এসেছে পাখিকে! মগজহীন বেড়ালটা যদি বুঝত তাদের আদি বাসভূমি বনজঙ্গল সৃষ্টি হয়েছে ওই পাখিরই ঠোঁটে ঠোঁটে।

অদিতি ছোট ছেলেকে বলে,—বেড়ালটাকে মারিস না রে তাতাই। ও ওর মতোই থাক। ও কি বোঝে কোন কাজটা ভাল, কোন কাজটা খারাপ?

সুপ্রতিম শুনে হাসে খুব। বলে,—এবার তুমি ওই বেড়ালের চিকিৎসাতেও নেমে পড়বে না কি? বলো তো অফিস থেকে আরও কয়েকটা ক্রিম নিয়ে আসি।

সুপ্রতিমের সঙ্গে অদিতির সম্পর্ক আবার মসৃণ। ছোট্ট একটা ঢেউ এসেছিল, ফিরে গেছে। সংসার তো এরকমই। ঢেউ আসে, ফেনা রেখে চলে যায়। ফেনাও শুকোয় ক্রমশ, পড়ে থাকে সিক্ত বেলাভূমি। আবার সেখানে নিশ্চিন্তে পা ফেলে মানুষ, বালুতটও প্রতীক্ষা করে নতুন ঢেউয়ের। অদিতি এক সামান্য মানবী মাত্র, তার ক্ষেত্রেই বা এর ব্যতিক্রম ঘটবে কেন?

সবকিছুই নিয়মমতো চলছে আবার। লিখছে অদিতি। হেমেন একদিন এসে একটা গল্প নিয়েও গেলেন, বড় কোনও পত্রিকায় পাঠাবেন। সুপ্রতিম টুক করে আড়াই দিনের জন্য রাঁচি ঘুরে এল। তাতাইয়ের এখনও গরমের ছুটি চলছে, কিন্তু সারা দিনে তার টিকি পাওয়া মুশকিল। পাপাই সামনের সপ্তাহে বন্ধুদের সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে যাচ্ছে, দিন দশেকের জন্য। মাঝে হঠাৎ এক রবিবার সন্ধেতে সুজাতা বাড়ি খুঁজে খুঁজে হাজির। মেয়ে নিয়ে। সারা সন্ধে আড্ডা মেরে গেল অদিতি সুপ্রতিমের সঙ্গে। খুব হাহা হিহি করল। সুপ্রতিমের মুখে অদিতির গল্প লেখার গল্প শুনে সুজাতা এই মারে তো সেই মারে। কী অসভ্য রে তুই? আমাকে সেদিন বলিসনি কেন? দে দে, তোর লেখাগুলো দে, পড়ে ফেরত দেব। সুজাতার মেয়েটাও দারুণ সপ্রতিভ, চোখেমুখে কথা, তাতাইয়ের মতো বক্তৃতাবাজও মুনিয়ার কথার তোড়ে কাহিল। অদিতিকেও কম অপ্রস্তুতে ফেলল না মেয়েটা। ও মাসি, তুমি কী নিষ্ঠুর গো! পাখিটাকে খাঁচায় বন্ধ করে রেখে দিয়েছ! সুপ্রতিমের খুব মজা লেগেছে শুনে। বন্দি থেকে থেকে ও পাখির কি আর ওড়ার ক্ষমতা আছে! খাঁচা খুলে ছেড়ে

দিলেও দু পা গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে।

এ বছর জোর বর্ষা নেমেছে। গ্রীষ্মের তীব্র দাহের পর বর্ষা এবার একটু দেরিতেই এল। আকাশ এখন সর্বক্ষণই সীসে বরণ, মেঘের ভারে নেমে এসেছে নীচে। দেরিতে আসার ঘাটতি বর্ষা পুষিয়ে দিচ্ছে পুরোমাত্রায়। একের পর এক নিম্নচাপ চলছে, টানা বৃষ্টিতে পথঘাট থইথই, এক এক সময় কলকাতাকে ভেনিস বলে ভ্রম হয়। শুধু রাস্তায় গণ্ডোলাই নেই, এই যা। সূর্য এখন এক নিরুদ্দিষ্ট নক্ষত্র, এই বুঝি কাগজে টিভিতে তার সন্ধান চেয়ে ছবি বেরোয়!

বৃষ্টির বিকেলে সুপ্রতিমের আধভেজা শার্টপ্যান্ট ইস্ত্রি চালিয়ে শুকিয়ে নিচ্ছিল অদিতি। সুপ্রতিমরা নতুন একটা শ্যাম্পু ছাড়ছে বাজারে, সেই উপলক্ষে কাল সন্ধেবেলা বড়সড় পার্টি দিচ্ছে কোম্পানি। সঙ্গে ফ্যাশান প্যারেড। চুল ফাঁপিয়ে নিতম্ব দুলিয়ে হাঁটবে সুন্দরীরা। অনুষ্ঠানে এই শার্টটাই পরে যেতে চায় সুপ্রতিম। মোড়ের ইস্ত্রিঅলাটা বসছে না কদিন, সে বোধহয় সূর্যের খোঁজে গেছে।

ডোরবেল বাজল।

দরজা খুলে অবাক হয়েছে অদিতি। দাদা এসেছে। এই বর্ষায় দাদা!

অলকেশের এক হাতে ভেজা ছাতা, অন্য হাতে প্লাস্টিকের প্যাকেট, বগলে পেটমোটা চামড়ার ব্যাগ। ঈষৎ অপ্রস্তুত মুখে হাসল অলকেশ,—চমকে গেলি তো?

অনেক দিন আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে যাওয়া হয়নি অদিতির। শেষ গিয়েছিল মাস দুয়েক আগে। দাদা সেদিন বাড়ি ছিল না, ছুটির দিনে কোনও এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

দাদাকে দেখে অদিতি খুশিই হল। বলল,—চমকানোরই তো কথা। এরকম বৃষ্টি মাথায় করে কেউ আসে!

—কী করি, তুলতুলিটার ইউনিভার্সিটি বন্ধ, বহুদিন তোদের খোঁজখবর পাই না। ...

অলকেশের ছাতা বাথরুমের সামনে মেলে দিয়ে তোয়ালে এনে দিল অদিতি,—নে, আগে ভাল করে মাথা মোছ। এই সেদিন পা ভাঙলি, এই জলকাদায় আবার ...

অলকেশ বোনের বাড়িতে আসে কম, তবে এলে কখনও খালি হাতে আসে না। প্লাস্টিকের ঠোঙা অদিতির হাতে দিয়ে বলল,—হাঁটু আমার পুরো সেরে গেছে। আয় আমরা ভাইবোনে আজ একটু বেগুনি আলুর চপ খাই। তোর ছেলে দুটো কোথায় গেল?

—এই বিকেলে ওরা বাড়ি বসে থাকবে! কোথায় চরে বেড়াচ্ছে। পাপাইটা তো আবার সোমবার দার্জিলিং যাচ্ছে।

—বর্ষায় দার্জিলিং যাচ্ছে কী রে! কোথায় কখন ধস নামে, রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায় ..

—আমারও তো সেই চিন্তা। কে শোনে! বর্ষায় নাকি দার্জিলিং-এর আলাদা চার্ম।

—কী চার্ম?

—সে ওরাই জানে। বোস, চা করে আনি। আমার রান্নার মেয়েটা এবেলা বোধহয় ডুব মারল।

তোয়ালেতে মুছে ব্যাগ সেন্টার টেবিলে রাখল অলকেশ। ঘষে ঘষে মাথা মুছছে। সোফায় বসেও উঠে দাঁড়াল, হাত বুলিয়ে দেখল সোফা ভিজছে কি না। ভেজেনি। নিশ্চিন্ত হয়ে হেলান দিয়েছে।

গ্যাসে জল বসিয়ে ভাবছিল অদিতি। দাদা তো কারণ ছাড়া এ বাড়িতে বড় একটা আসে না! এই দুর্যোগের দিনে যখন এসেছে, দরকারটা নিশ্চয়ই জরুরি। মুখটা শুকনোও লাগছে যেন! অদিতি গলা তুলল,—তুই কি অফিস থেকে আসছিস?

—হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। তোর এখানে আসব বলে।

—তা হলে তো তোর খিদে পেয়েছে। কটা লুচি ভেজে দিই?

—না না, তোকে আর হ্যাঙ্গাম করতে হবে না। মুড়ি থাকলে দে।

অদিতি সামান্য অস্বস্তিতে পড়ল। এ বাড়িতে তার দুই ছেলের কেউই মুড়ি ছোঁয় না। বাঘের ঘাস খাওয়ার মতো সুপ্রতিম ন মাসে ছ মাসে খায়, তার জন্য এই বর্ষার দিনে ঘরে মুড়ি কিনে রাখার কোনও মানেই হয় না।

অদিতি আবার বলল,—লুচি ভেজে দিই না? সেই কখন ভাত খেয়েছিস ...

—ঘরে বুঝি মুড়ি নেই ? দু-এক মুহূর্ত উত্তরের প্রতীক্ষায় থেকে অলকেশ বলল,—তোকে ব্যস্ত হতে হবে না, চা তেলেভাজা নিয়ে চলে আয়। তোকে একটা জিনিস দেখাতে এসেছি।

—কী জিনিস ?

—আছে। আয় না।

পলকের জন্য বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল অদিতির। দাদা যখনই কোনও কাগজ সই করাতে আসে এই ভাষাতেই কথা বলে। এরকমই নরম সুরে। মার একটা এন এস সি ছিল না ? ম্যাচিওর করল ? সুপ্রতিম নেই আন্দাজ করেই কি এই বিকেলবেলা... ! ছোট্ট শ্বাস ফেলল অদিতি। নিজের দাদার সঙ্গে এই তিক্ততা আর ভাল লাগে না।

বড় প্লেটে তেলেভাজা সাজিয়ে চা নিয়ে দাদার সামনে বসল অদিতি,—দেখি কী জিনিস।

—দেখাচ্ছি। নিচু হয়ে গোটানো প্যান্টের ভাঁজ খুলছে অলকেশ,—তোদের এখানে এবার জল জমেনি দেখছি !

—করপোরেশানের দয়া হয়েছে। রাস্তা উঁচু করে দিয়েছে। আমাদের ফ্ল্যাটের পেছনেই এখন কাউন্সিলার থাকে যে।

—তাই বল।

—তোদের রাস্তা তো ডুবে আছে। তোর বাড়িতে এবার জল ঢোকেনি ?

অলকেশ পলকের জন্য স্থবির,—কত দিন বারণ করেছি না খুকু, তোর বাড়ি তোর বাড়ি করবি না ?

অদিতি আলুর চপে কামড় দিয়ে বলল,—বাহ্, বাড়ি তো তোরই। বললেই দোষ ?

—না খুকু। ওটা আমাদের বাড়ি। তোরও। আমারও। অলকেশ বড় করে একটা নিশ্বাস টানল,—কাগজে-কলমে লেখাপড়া করা না থাকলে কি অধিকার চলে যায় ? বাড়ি সারাইটারাই করার জন্য অফিসের লোন নিতে অনেক প্রবলেম হয়, তাই আমার নামে . .

যুক্তি, না ভাবের ঘরে চুরি ? অদিতি খুচ করে খোঁচা দিল,—বাড়ি কিন্তু তুই একবারও সারাসনি দাদা। ও সব কথা থাক। কী দেখাবি বলছিলি দ্যাখা।

অলকেশ ঝিম মেরে গেল। ঝমঝম বৃষ্টি নেমেছে আবার। চায়ের কাপ হাতে ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে রয়েছে অলকেশ। ব্যালকনির এপাশে ছোট্ট প্যাসেজে পাখির খাঁচা ঢুকিয়ে রাখা আছে, সেদিকেও দৃষ্টি ফেলে রাখল কিছুক্ষণ। কাপ নামিয়ে ফোলিও ব্যাগটা টেনেছে কোলে। চেন খুলে একটা বাদামি কাগজের মোটা প্যাকেট বার করল।

অদিতি জিজ্ঞাসা করল,—কী ওটা ?

—খুলে দ্যাখ।

মোড়ক খুলতেই জোর এক ঝাঁকুনি খেয়েছে অদিতি। খাতা ! খাতা ! তার সমস্ত পুরনো গল্প লেখার খাতা। স্কুলের। কলেজের। খাতার নীচে তার স্কুল কলেজের ম্যাগাজিনও আছে কয়েকটা।

অদিতি বিহ্বল স্বরে বলল,—কোত্থেকে পেলি এগুলো ?

অলকেশের মুখে মেঘলা বিকেলের হাসি,—তুই আবার লেখা ধরেছিস ... মার কালো ট্রাঙ্কে গাদা হয়ে পড়েছিল ... খুঁজে খুঁজে বার করলাম।

দ্রুত হাতে একের পর এক খাতা উলটোচ্ছে অদিতি। কোনও পাতায় শুধুই কাটাকুটি। কোথাও বা অপটু হাতে আঁকা মেয়েলি মুখের ছবি, দেখে কার্টুন মনে হয়, তলায় কোনও বান্ধবীর নাম। কোনও পাতায় একই লাইন বিশ-পঁচিশবার লেখা। কবিতা। গল্প। উপন্যাসের ছক, পাশে পাত্রপাত্রীদের সম্ভাব্য চেহারা আর গুণাগুণ। একটা পাতায় অতিকায় হরফে অদিতিরই হাতে লেখা—অদিতি তুই একটা হাঁদি। তোর দ্বারা লেখা হবে না। কলেজ ম্যাগাজিনে কুয়াশা গল্পটাও রয়েছে।

অদিতি আঙুল বোলাচ্ছে পাতায়, অক্ষরগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে। অক্ষর, না প্রাণ ? অক্ষর, না সময় ? অক্ষর, না স্মৃতি ? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাতারা বিবর্ণ, হলদেটে, নীল কালির আঁচড় ফিকে

অনেক, তবুও কী মুখর ! অসংখ্য স্মৃতি ছুটে এল টগবগিয়ে, তিরতির করে, দুলতে দুলতে। অদৃশ এক কুবো পাখি ডেকে চলেছে বুকে। কুব কুব কুব কুব।

অলকেশ মৃদু স্বরে বলল,—তুই খুশি হয়েছিস খুকু ?

অদিতি চোখ তুলল। দাদাকে দেখছে অপলক। তিপান্ন বছরেব দাদাকে নয়, চোদ্দো বছরের দাদাকে। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে বোনের জন্য হজমিগুলি এনেছে দাদা, খাওয়া শেষে কাগজ চাটছে বোন।

ছ বছরের মেয়ের মতো কাঁধ পর্যন্ত ঘাড় হেলিয়ে দিল অদিতি। আধফোটা স্বরে বলল,—শুধু এটা দেওয়ার জন্য এই দুর্যোগের দিনে এত দূব ছুটে এলি !

—ভেবেছিলাম তুলতুলির হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব। অলকেশও যেন অনেকটা বছর পিছিয়ে গেছে। বলল,—তোর জন্য হঠাৎ বড় মন কেমন করছিল রে। ভাবলাম কত দিন তোকে নিজে হাতে কিছু দিইনি। তোর কাছ থেকে শুধু নিয়েই গেলাম।

অদিতির চোখে এক অসহ্য চাপ। এই বুঝি ফিনকি দিয়ে জল বেরিয়ে আসে।

—ছোটমামাও সেদিন বলছিল তুই নাকি খুব ভাল লিখছিস। তুলতুলিও তোর কথায় পঞ্চমুখ। আমি ছাপোষা মানুষ, সাহিত্য-টাহিত্য অত বুঝি না, তবু শুনলে বুকটা ফুলে ওঠে। সময়টা হারিয়ে ফেলেছিলি, ফিরে পেয়েছিস। লেখ, আরও লেখ।

অলকেশ উঠে পড়েছে। ভিজে ছাতা হাতে ঝুলিয়ে নিল, চিমসে যাওয়া ফোলিও ব্যাগ আবার চেপেছে বগলে। ফিরে যাচ্ছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে অদিতি দেখছিল দাদাকে। ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে দাদা। অদিতি চিৎকার করে একবার ডাকতে চাইল অলকেশকে। সেই শৈশবের স্বরে।

স্বর ফুটল না।

ল্যান্ডিং-এর বাঁকে হারিয়ে গেল অলকেশ। অদিতিব গরিব স্বার্থপর দাদা।

বৃষ্টি নেই। ফ্ল্যাটময় ফিরে বেড়াচ্ছে এক স্যাঁতসেঁতে বাতাস। সেন্টার টেবিলে ছড়িয়ে আছে অদিতির খাতা। নাকি মণিমুক্তো।

দাদা কি এর চেয়েও বেশি কিছু নিয়ে গিয়েছিল অদিতির কাছ থেকে ?

পায়ে পায়ে খাঁচার ধারে গেল অদিতি। খাঁচার দরজা খুলে টিয়ার পিঠে আলতো হাত রাখল। এই প্রথম পাখিটাকে সাহস করে স্পর্শ করছে অদিতি।

ক্ষতস্থান শুকিয়ে যাচ্ছে, পাখির দেহে আবার পেলব শ্যামলতা, তবু পাখি ছিটকে যায় ভয়ে। ছোট্ট ছোট্ট ঠোকর মারছে অদিতিকে।

অদিতির ব্যথা লাগছিল না।

এগারো

সিঁড়ির নীচে সার সার লেটারবক্স। আটটা ফ্ল্যাটের আটটা। মজুমদার লেখা বাক্সে আজ অনেক চিঠিপত্র। পাপাই সুপ্রতিমের নামে বড় বড় দুটো খাম। ইনশিওরেন্সের নোটিস। ইলেকট্রিক বিল। লখনউ থেকে সুপ্রতিমের ভাইয়ের চিঠি, ইনল্যান্ডে।

ইলেকট্রিক বিলের অঙ্ক দেখে ভুরু কুঁচকোল অদিতি। তিনশো বাহান্ন। গত মাসে তিনশো এগারো ছিল না ! মানে একচল্লিশ টাকা বেশি। একই তো কারেন্ট পোড়ে, এত তফাত কী করে যে হয় !

অদিতি চোখ ছোট করে পাপাইয়ের খামের প্রেরকের নাম পড়ল। মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটি। প্রায়শই বিদেশ থেকে এরকম খাম আসছে পাপাইয়ের। গত মাসে কী এক ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছিল, আরিজোনা না ওরিগন। ভেতরে ছিল ইয়া মোটা বুকলেট। মা খাম খুলে দেখেছে বলে কী উষ্মা ছেলের ! অন্যের চিঠি খোলা কিন্তু খুব বাজে হ্যাবিট মা ! পাপাই কি বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে ? ভাঙে না কেন ? থাক পড়ে, এ চিঠি পাপাই দার্জিলিং থেকে ফিরেই খুলবে।

সুপ্রতিমের খামটাও খুলে দেখার দরকার নেই। এ হল এক রহস্যময় রাজেশ গুলাটির কাছ থেকে আসা অদরকারি কাগজ, অদিতি জানে। সুপ্রতিম একে চেনে না, কোত্থেকে লোকটা সুপ্রতিমের ঠিকানা পেয়েছে তাও জানে না, কিন্তু অজ্ঞাত শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো লোকটা মাঝে মাঝেই কাগজপত্র পাঠিয়ে দেয় সুপ্রতিমকে। হাজার কোম্পানি প্রতিদিন শেয়ার ছাড়ছে বাজারে, সেই সব শেয়ার কেনার কাগজ এগুলো। প্রায় প্রতিবারই সময় পার করে পৌঁছোয় কাগজ, সুপ্রতিম এক ঝলক দেখে ওয়েস্টপেপার বাস্‌কেটে ফেলে দেয়। দৈবাৎ কখনও সময়মতো এলে অসীম কৌতূহল নিয়ে বিনিয়োগে লাভ আর ঝুঁকির সম্ভাবনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। এবং ওয়েস্টপেপার বাস্‌কেটে ফেলে দেয়। শেয়ার কেনার জন্য অফিসে নিজস্ব পরিচিত লোক আছে সুপ্রতিমের। এ খামও বাজে কাগজের ঝুড়িতে যাবে। বেচারা রাজেশ গুলাটি !

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অদিতি দেওরের চিঠিটা পড়ছিল। দাদা বউদি দুজনকে এক সঙ্গে চিঠি লিখেছে পার্থপ্রতিম। জা কাবেরীও। নেহাতই ঘরোয়া চিঠি। বাবাই ক্লাস সেভেনে উঠেই স্কুলের হকি টিমের ট্রায়ালে ডাক পেয়েছে, দিবারাত্র এখন স্টিক নিয়ে ছুটছে। কাবেরীর লু লেগে গিয়েছিল, শয্যাশায়ী ছিল ছ-সাত দিন, বৃষ্টি নামার পর সে এখন সুস্থ। এবার হয়তো পুজোয় পার্থপ্রতিমরা কলকাতা আসতে পারে, তবে দিন সাতেকের বেশি থাকা হবে না, বাবাইয়ের স্কুলে ছুটি নেই। বউদির গল্প লেখা কেমন চলছে, জানতে চেয়েছে পার্থপ্রতিম। কাবেরীও। দুজনে পাপাই তাতাইয়েরও খোঁজ নিয়েছে নিয়মমাফিক। সুপ্রতিম শরীরস্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখছে কি না সে সম্পর্কেও...।

অদিতি চিঠিটা পড়তে পড়তে হাসছিল মনে মনে। পার্থটা ক্রমশ কেমন নিরুত্তাপ হয়ে গেল ! অথচ বিয়ের পর পার্থই ছিল শ্বশুরবাড়িতে অদিতির প্রথম বন্ধু। দুই ননদ এখন খুব সমীহ করে বটে তবে তখন তাদের চোখে অদিতি ছিল যেন শত্রুপক্ষের লোক। যেন অনাহূতের মতো এসে ভালমানুষ দাদাকে কেড়ে নিয়েছে অদিতি। কী ছেলেমানুষিই না করত ননদ দুটো ! গল্প করার ছলে ইচ্ছে করে রাত দুটো অবধি আটকে রাখত অদিতিকে ! পাউডার ক্রিম পারফিউম যা কিনে আনত সুপ্রতিম, খাবলা মেরে গায়েব করে দিত ! পার্থ ছিল অন্যরকম। হাসিখুশি, দিলদরিয়া ধরনের। টিউশনির টাকা থেকে অদিতিকে শাড়ি কিনে দিয়েছিল একবার। কাবেরীর সঙ্গে প্রেম করার আদ্যোপান্ত গল্পও শোনাত বউদিকে। এখন সেই দেওরই কত দূরের লোক, ননদরা অনেক বেশি বন্ধু। সময় আর সংসার মানুষকে কত রকম ভাবে যে ভাঙে গড়ে !

তিনতলার ল্যান্ডিং-এ পৌঁছে অদিতি থমকাল। একটি বছর কুড়ির মেয়ে তাদের ফ্ল্যাটের দরজায় ! বেল টিপছে। পরনে সালোয়ার কামিজ, কাঁধে ওড়না। বাসন্তীরং ওড়নার প্রান্ত পেঁচাচ্ছে আঙুলে। ঘাড় ঘুরিয়ে কল্যাণীদের বন্ধ দরজার দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন।

সেলস্ গার্ল কি ? সঙ্গে তো কিছু নেই ?

অদিতি তরতর করে উঠে এল,—কাকে চাই ?

মেয়েটি চমকে ঘুরল,—সায়ন্তন মজুমদার এই ফ্ল্যাটে থাকে না ?

—হ্যাঁ থাকে। অদিতি হাসিমুখে বলল,—আমি সায়ন্তনের মা।

—ও। মেয়েটি ঢোক গিলল,—সায়ন্তন বাড়ি নেই ?

—না। ও তো দার্জিলিং গেছে।

—তাই ? মেয়েটির কথার সঙ্গে খানিকটা বাতাস ঝরে পড়ল যেন। খুব ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল,—কবে ফিরবে সায়ন্তন ?

—কাল তো নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেনে চাপার কথা। পরশু ফিরবে।

—ও।

—সায়ন্তন ফিরলে কিছু বলতে হবে ?

—না না। মেয়েটি কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। সজোরে মাথা নাড়ছে দু দিকে,—আমি পরে যোগাযোগ করে নেব।

অদিতির একটু সন্দেহ হল। মেয়েটিকে এত নার্ভাস দেখাচ্ছে কেন ? গলাটাও যেন শোনা

শোনা !

মন্থর পায়ে নামছে মেয়েটি, অদিতি ডাকল,—শোনো।

মেয়েটি দাঁড়িয়েছে।

—তোমার নামটা বলে গেলে না তো ?

—আম-আম-আমার ? সায়ন্তনকে নাম বলতে হবে না।

অদিতির সংশয় ঘনীভূত হল। হেসে বলল,—আমি তোমার নাম জিজ্ঞেস করছি।

—শ্রেয়া।

মুহূর্তে মস্তিষ্ক হাতড়াল অদিতি। পাপাইয়ের বহু সহপাঠিনীর নাম তার শোনা, চন্দনা সুতনুকা বৈশাখী এরকম কয়েকজন এসেছেও বাড়িতে, তাদের কারুর মুখে কি শ্রেয়া নামটা শুনেছে অদিতি ? অদিতির কৌতূহল বাড়ছিল। জিজ্ঞাসা করল,—তুমি সায়ন্তনের সঙ্গে পড়ো ?

—নন্‌না।

—কী পড়ো তুমি ?

—ইংলিশ অনার্স।

—সায়ন্তনদের কলেজে ?

—না। যাদবপুরে।

—থাকো কোথায় তুমি ?

—বেলেঘাটায়।

এতক্ষণে গলাটা যেন চেনা যাচ্ছে ! এই মেয়েটিই কি পাপাইকে ফোন করে ?

অদিতি মেয়েটিকে আটকাতে চাইল। বলল,—ওমা, অত দূর থেকে এসেই ফিরে যাবে ? এসো, একটু বসে যাও।

—আমি বাড়ি থেকে আসছি না মাসিমা। মেয়েটির কথার গতি বেড়ে গেছে অকস্মাৎ,—কলেজে এসেছিলাম, কলেজে আজকে ক্লাস হল না, সেই জন্য এখান থেকে একবার ...

—বারে, তা বললে কী হয় ! সায়ন্তন যদি এসে শোনে তার বন্ধু দরজা থেকে ফিরে গেছে, আমাকে আস্ত রাখবে ? এসো এসো।

দরজার লক খুলল অদিতি। মেয়েটি ল্যান্ডিং-এই দাঁড়িয়ে আছে। ইতস্ততভাব।

গোয়েন্দা চোখে কয়েক সেকেন্ড মেয়েটিকে দেখল অদিতি। ভারী মিষ্টি মুখ। চোখ দুটো বড় বড়, টানা টানা। স্টেপকাট চুল মাথার পিছনে ঢেউ হয়ে আছে। চাপা সংকোচে ফর্সা মুখে লাল আভা। ঘামছেও খুব।

অদিতি ঈষৎ আদেশের সুরে বলল,—কই, এসো।

কদিন টানা বৃষ্টির পর কাল থেকে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে আকাশ। তবে মেঘ এখনও পুরোপুরি কাটেনি, ভারী শরীর নিয়ে অলস মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ হারানো সূর্য দেখা দিয়ে যায়। তার লাজুক আলোয় দুপুরের আকাশ যেন জলরঙে আঁকা ছবি। অদিতির ঘরেও এক মায়াবী আলোছায়া।

শ্রেয়া সঙ্কুচিত মুখে সোফার এক কোণে বসে আছে, ভিতু খরগোশের মতো দেখছে চারদিক, ওড়নায় ঘাড় গলা মুছছে আড়ষ্টভাবে।

অদিতি শরবত করে এনে শ্রেয়ার সামনে বসল,—সায়ন্তন তো সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ে, তোমার সঙ্গে সায়ন্তনের আলাপ হল কী করে ?

—ওদের অ্যানুয়াল ফেস্টিভাল হয়, জাভোৎসব ... ওখানেই ...

—তাই বলো। তার মানে তোমার সঙ্গে খুব বেশি দিনের বন্ধুত্ব নয়।

—নাহ্। সাত-আট মাস।

—আচ্ছা, দাঁড়াও দাঁড়াও। অদিতি একটু চিন্তা করার ভান করল,—তুমিই রাত্তিরের দিকে টেলিফোন করো, তাই না ? সায়ন্তনের বাবা ফোন ধরলেই কেটে দাও !

শ্রেয়া শববতে চুমুক দিয়েছিল, বিষম খেয়ে কাশতে শুরু করেছে। কাশতে কাশতে লাল টকটকে

হয়ে গেছে মুখ। হাঁপাচ্ছে।

শ্রেয়ার অবস্থা দেখে মজা লাগছিল অদিতির। সহাস্য মুখে বলল,—যাওয়ার আগের দিনও তো তোমার সঙ্গে আধ ঘণ্টা কথা হল, তখন তোমাকে বলেনি দার্জিলিং যাচ্ছে ?

শ্রেয়া হঠাৎ স্থির। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে অদিতির দিকে,—আমি তো এর মধ্যে ফোন করিনি মাসিমা !

—কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল তা হলে ! আমার তো মনে হল তোমার গলা !

—বিশ্বাস করুন মাসিমা, দু মাসের ওপর সায়ন্তনের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগই নেই।

—কেন ?

শ্রেয়া উত্তর দিল না, নত মুখে বসে আছে।

মায়ের চোখে সরলতার কাজল থাকলে অনেক দৃশ্যমান জিনিসও গোচরে আসে না, আবার মাতৃ ইন্দ্রিয় প্রখর হয়ে উঠলে অনেক অদেখা ছবিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঠোঁটে হাসি বজায় রেখে অদিতি বলল,—তোমাদের কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছে ?

শ্রেয়া চুপ।

অদিতি গার্জেনের মতো বলল,—তোমার এত লজ্জা, তবু তুমি সায়ন্তনের খোঁজে বাড়ি অবধি ছুটে এসেছ ? এ তো ভারী আশ্চর্য কথা।

শ্রেয়া তবু মুখ খোলে না।

—তোমাদের শেষ কবে দেখা হয়েছিল ?

—পঁচিশে বৈশাখ।

—কোথায় ?

—আমরা একসঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।

—কী ছবি ?

শ্রেয়া আবার চুপ।

অদিতি আর প্রশ্ন করল না। তার জেরার তোড়ে যেটুকুনি কথা বেরিয়ে এসেছে তাই যথেষ্ট। মনে হয় সেদিনই কোনও ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। পাপাইয়ের মধ্যে একটা অন্য ধরনের চাপা জেদ আছে। তাতাইয়ের জেদ অনেক খোলামেলা, বোঝা যায় তাকে। পাপাই নিজেকে সহজে প্রকাশ করে না, গোঁজ মেরে থাকে। একবার পাপাইকে আইসক্রিম খেতে মানা করেছিল অদিতি, গলা ব্যথা হয়েছিল বলে। দু-তিনবার বায়না করে চুপ মেরে গেল পাপাই, কিন্তু জেদটাকে মনে মনে একটা অন্য আকার দিয়ে নিল। তারপর থেকে অন্তত কয়েক মাস অদিতি সুপ্রতিম সাধলেও প্রিয় আইসক্রিম অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করত পাপাই, হাসি মুখে।

শ্রেয়ার ওপরও কি সেরকমই কোনও অভিমান হয়েছে পাপাইয়ের ?

অদিতি বলল, —দ্যাখো, কী নিয়ে তোমাদের ঝগড়া হয়েছে তা যদি আমাকে না বলতে চাও, আমি জিজ্ঞেস করব না। তবে...

—আমার সঙ্গে সায়ন্তনের কোনও ঝগড়াই হয়নি মাসিমা। শ্রেয়া জড়তা কাটিয়ে হঠাৎ সোজাসুজি তাকিয়েছে।

—তা হলে ?

—আমি জানি না মাসিমা। ওইদিনের পর থেকে কোনও কারণ ছাড়াই সায়ন্তন আমাকে অ্যাভয়েড করছে। দেখা করতে বললে এড়িয়ে যায়, ফোন করলে কথা বলে না।

যথেষ্ট ঋজু থাকার চেষ্টা করেও শ্রেয়ার গলা ধরে যাচ্ছে, অদিতি বুঝতে পারছিল। শ্রেয়া চলে যাওয়ার পরেও খটকাটা কাটছিল না তার। পাপাই শুধু শুধু মেয়েটির সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করছে ? নিশ্চয়ই মেয়েটির কোনও আচরণে পাপাই আহত। ছেলে তার এমনিতেই অন্তর্মুখী, হয়তো বাদবিসম্বাদে না গিয়ে নিঃশব্দে সরে আসতে চায় !

সারা দুপুর লেখাতেও মন বসল না অদিতির। কাগজ কলম নাড়াচাড়া করাই সার ! বারবার নতমুখী মেয়েটির মুখ মনে পড়ে। শ্রেয়া কেমন মেয়ে ? চেহারা হাবভাবে তো ভাল ঘরের মেয়ে

বলেই মনে হয়। নিষ্পাপ মুখেও কীট লুকিয়ে থাকতে পারে। তার ছোট ননদ রিনা তো পাত্রপক্ষের আশীর্বাদের দিন সকালেও তার প্রেমিক অজয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল! বিয়ে যে স্থির হয়ে গেছে সে কথা তখনও অজয়কে বলেনি! অদিতিকে পথে ধরে অজয়ই একদিন পরে মনোবেদনা জানিয়েছিল। বিয়ের দিন রিনার আপ্লুত মুখ দেখে কেউ বুঝতে পেরেছে টানা দেড় বছর ধরে অজয়কে কড়ে আঙুলে নাচিয়েছে রিনা? শ্রেয়ার ক্ষেত্রেই বা পাঁচ-দশ মিনিট কথা বলে কতটুকু আন্দাজ করতে পারে অদিতি? সে রাত্রেই বা পাপাই কার সঙ্গে কথা বলছিল? একই নিবিষ্ট ভঙ্গিতে? নিচু স্বরে? হাসি মুখে?

সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরল সুপ্রতিম! কদিন ধরেই সুপ্রতিমের মুখ শুকনো, আজ যেন আঁধার নেমেছে। কী নিয়ে সুপ্রতিমের উদ্বেগ, জানে অদিতি। জেমসন ইন্ডিয়ার সঙ্গে লোটাস ইন্ডিয়ার সংযুক্তির ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, সুপ্রতিমদের অফিসে এখন কিম্ভূত গোলমেলে অবস্থা। কিন্তু এত কালো মুখ কেন? ফিরেই হুড়হুড় করে স্নান করল সুপ্রতিম, চা জলখাবার খেল না, টিভি চালিয়ে বোতল খুলে বসে গেল।

অদিতি পাশে এসে বসে রইল একটুক্ষণ। অফিসের কথা তুললে চটে যাচ্ছে সুপ্রতিম, ও কথা তুলল না। কোমলভাবে বলল, —এই, একটা কথা বলব?

সুপ্রতিম টিভির দিকে তাকিয়ে আছে, দেখছে না। পর্দাতেই চোখ রেখে বলল, —কী?

সুপ্রতিম মন খারাপ করে থাকলে অদিতির একটুও ভাল লাগে না। টিপ্পনী কাটবে, গাঁক গাঁক চেঁচাবে, হো হো হাসবে, অদিতির ওপর মেজাজ দেখাবে—সেই মানুষটাই তো সুপ্রতিম।

অদিতি সুপ্রতিমের মেজাজটা ছন্দে আনতে চাইল, —চলো না, আজ নাইট শো-এ সিনেমা যাই।

ঠাণ্ডা চোখে তাকাল সুপ্রতিম, —কেন?

—অনেক দিন যাইনি তাই।

সুপ্রতিম হুইস্কিতে ছোট্ট চুমুক দিল, —তোমার কি মনে হচ্ছে এটা এখন ফুর্তি করার সময়?

অদিতি একটু রাগাতে চাইল সুপ্রতিমকে, তাতলে যদি ধাতে ফেরে। বলল, —তোমাকে দেখে তাই তো মনে হচ্ছে। বোজ যেভাবে এসেই তড়িঘড়ি গ্লাস বোতল নিয়ে বসে পড়ছ।

সুপ্রতিমের চোখ কুঁচকে গেল, —তোমার আপত্তি আছে?

—অবশ্যই আছে। গত মাসে তোমার প্রেশার কত ছিল মনে আছে? একশো চল্লিশ বাই নাইট্টিফাইভ।

—তা হবে। নিজের ব্লাড প্রেশার মুখস্থ রাখা ছাড়াও আমার অন্য কাজ কাছে।

সুপ্রতিমের স্বর বড় নিষ্প্রাণ। অদিতি মিনিট খানেক নীরব থেকে আবার খোঁচাল, —শুধু শুধু খাচ্ছ কেন? তাতাইকে দিয়ে চানাচুর পোট্যাটো চিপস কিছু আনিয়ে দেব?

—না। থ্যাঙ্কস।

—খালি পেটে ড্রিঙ্ক করলে তোমার অম্বল হয়। সারা রাত বুক জ্বালা করছে বুক জ্বালা করছে করে ছটফট করবে।

—তোমার অসুবিধে হলে বোলো, সোফায় শুয়ে থাকব।

সুপ্রতিমের বদলে এবার অদিতিই খেপে গেল। বিকেলে ভেবেছিল সুপ্রতিম এলে শ্রেয়ার কথাটা বলবে, বেবাক ভুলে গেল। রাগ রাগ গলায় বলল, —কী এমন আজ ঘটেছে অফিসে, যে বাড়ি এসেও তোলো হাঁড়ি হয়ে বসে আছ?

হাসিঠাট্টা কোমলতায় যা হয়নি, মেজাজ দেখানোতে তাই হল। ঘড়ঘড়ে গলায় সুপ্রতিম বলল, —হয়ে গেল।

—কী হয়ে গেল?

—অ্যামালগামেশান। আজ মুম্বাইতে দুই বোর্ডের জয়েন্ট মিটিং ওভার। ডিসিশান ফাইনাল হয়ে গেছে।

—তো কী হয়েছে? তুমিই তো বলেছিলে অ্যামালগামেশান হলে তোমাদের চাকরির কোনও ক্ষতি হবে না।

—হোয়াট ডু ইউ মিন বাই চাকরির ক্ষতি ? জানো, আজ আমার অফিসে সুইসাইড করতে ইচ্ছে হচ্ছিল ?

—সে কী ! কেন ? অদিতি প্রায় আঁতকে উঠল।

—মিস্টার গিলানি ইজ নো মোর।

—তোমাদের গিলানিসাহেব মারা গেলেন ? স্ট্রোক ?

—দুৎ, মারা যাবেন কেন ! রিজাইন করেছেন। গিলানি আমাকে কী চোখে দেখতেন তুমি জানো না ফুল। অ্যাজ ইফ আই ওয়্যার হিজ সান।

স্বামীর গলায় আদরের ডাকটি শুনে অদিতি দিব্যি বুঝে গেছে নেশার পারা চড়েছে সুপ্রতিমের। তবু বলে ফেলল, —মিস্টার গিলানি তোমার বাপ হতে যাবেন কোন দুঃখে ? তিনি তোমার সমবয়সি না ?

—ওই হল। ওটা কথার মাত্রা। এজ হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ফাদারহুড। তিনি আমাকে পিতার মতো প্রতিপালন করেছেন, তাই তিনি আমার বাবা। বুঝলে ?

—খুব বুঝেছি। বোতলের ছিপি আটকাল অদিতি, —তুমি খাটবে, কোম্পানির বিজনেস বাড়াবে, কে মাথার ওপর রইল না রইল, তোমার কী দায় ?

মর্মাহত চোখে অদিতির দিকে তাকিয়ে রইল সুপ্রতিম।

অদিতি শাসন করল, —ওঠো। খেয়ে নেবে চলো। তাতাইকেও ডাকছি খেতে, দয়া করে তাতাইয়ের সামনে আর প্রলাপ বোকো না।

তাতাই টের পেয়েছে সবকিছুই। খাবার টেবিলে বসে হাসছে মিটিমিটি। অদিতি চোখ পাকিয়ে তাকাল ছেলের দিকে। ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় বলল, চুপ।

পরদিন সম্পূর্ণ অন্য মূর্তিতে অফিস থেকে ফিরল সুপ্রতিম। ক্রোধে গরগর করছে, শূন্যে হাত ছুড়ে আস্ফালন করছে। হেতু কী, না পূর্বভারতের সর্বময় কর্তা হয়ে গিলানির জায়গায় আসছে কোন এক বিবেক আহুজা। সে নাকি এক বত্রিশ বছরের চ্যাংড়া ছেলে, তারই হুকুমবরদার হয়ে কাজ করতে হবে সুপ্রতিমকে ! সবথেকে শোকাবহ ঘটনা বিবেক আহুজা লোটাস ইন্ডিয়ার লোকই নয়, সে জেমসন ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানের ভাইপো। নাহ্, এই চাকরি ছেড়েই দেবে সুপ্রতিম। কলকাতার আরও দশটা কোম্পানি সুপ্রতিম মজুমদারকে পাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে।

এমত এক সময়ে দার্জিলিং থেকে কলকাতায় নেমে এল পাপাই। ট্রেন চার ঘণ্টা লেট, কামরায় পাখা জল কিছুই ছিল না, হাক্লান্ত পাপাই সারা দুপুর সারা বিকেল পড়ে পড়ে ঘুমোল।

চিত্ত বিক্ষেপ ঘটলে মানুষ অনেক সাধারণ জিনিসও ভুলে যায়। পাপাইকে দেখেও শ্রেয়ার কথা মনে পড়ল না অদিতির। সে এখন ঘোরতর চিন্তান্বিত। তেইশ বছরের যৌথ জীবনে বহুবারই স্বামীকে অফিস নিয়ে দুর্ভাবনায় আক্রান্ত হতে দেখেছে অদিতি, এবার যেন বড় বাড়াবাড়ি চলছে। সুপ্রতিম যথেষ্ট হিসেবি মানুষ, সংসারজ্ঞান তার খুবই টনটনে, তার ওপর অদিতির যথেষ্ট আস্থাও আছে, তবু ঝোঁকের মাথায় যদি কিছু করে বসে মানুষটা... ! লোটাস ইন্ডিয়া সুপ্রতিমের প্রাণ, প্রায়শই রসিকতা করে বলে কোম্পানি রানস ইন মাই ভেইনস, সেই মানুষ এই পঞ্চাশ বছর বয়সে অন্য কোথাও চাকরি করে কি শান্তি পাবে ?

শ্রেয়ার কথা অদিতির মনে পড়ল দিন দুয়েক পর। বিচিত্র এক মুহূর্তে। পাপাই সেদিন সকালে বেরিয়েছিল, ফিরেছে দুটো আড়াইটের সময়, ফিরেই কী সব কাগজপত্র নিয়ে বসে গেছে, অদিতি ছেলের ঘরে এল, —কীরে, ঘড়ির দিকে দেখেছিস ? স্নান খাওয়া করবি না ?

পাপাই একটা কী ফর্ম ফিল আপ করতে করতে মুখ তুলল, —করব। আগে একটু পোস্ট অফিসে যেতে হবে।

—এক্ষুনি ? এই চড়া রোদ্দুরে ফিরলি, আবার বেরোবি ? একবারে কাজ সেরে আসতে পারতিস ?

মার মতো নাবালিকার কথায় বহুদর্শীর মতো হাসল পাপাই, —একবারে সেরে ফেলা গেলে তাই তো ফিরতাম মা। যাও, একটু শরবত নিয়ে এসো।

—তুই কি চাকরির চেষ্টা করছিস ?

—না।

—তা হলে কীসের দরখাস্ত পাঠাচ্ছিস ?

—আছে। সময়ে জানবে।

—তুই জি আর ই-তে বসতে চাইছিস, না ? পাস করে স্টেটসে পড়তে যেতে চাস ?

পাপাই চোখের কোণ দিয়ে মার দিকে তাকাল, —গুড গেস।

—তুই বাইরে পড়তে যাবি ? কেন, এখানে কী অসুবিধে ?

—ও মা প্লিজ, আমি যাইনি এখনও অ্যাপ্লাই করছি শুধু। ফট করে ডট পেন বন্ধ করল পাপাই, —বলছি এক গ্লাস শরবত খাওয়াতে ! গলা শুকিয়ে গেছে !

ফ্রিজ থেকে স্কোয়াশের বোতল বার করতে করতে শ্রেয়ার কথা মনে পড়ে গেল অদিতির। কেন যে পড়ল ! পাপাইয়ের সঙ্গে নিরালায় কথা বলছে বলে কি ? নাকি শেষবার এই স্কোয়াশের বোতল বার হয়েছিল শ্রেয়ার জন্য, সেই কারণে ?

কমলা বর্ণ তরল পাপাইয়ের সামনে রেখে অদিতি কায়দা করে প্রশ্ন করল, —হ্যাঁ রে, যে মেয়েটা রোজ রাত্তিরে তোকে ফোন করে, তার নাম কী রে ?

—কেন বলো তো ?

—না, এমনিই জানতে চাইছিলাম।

—ও।

—মেয়েটা তোর ক্লাসমেট নয়, তাই না ?

—ভালই তো অনুমান করো। পাপাই শরবত শেষ করে ঝটিতি দরখাস্তে মন দিল।

পরবর্তী প্রশ্ন ঠিক খুঁজে পাচ্ছিল না অদিতি। শ্রেয়ার সঙ্গে সম্পর্ক কতটা কী না জেনেই মেয়েটির বাড়িতে আসার কথা বলা উচিত হবে ? প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে কত দূর জেরা করা মার পক্ষে সঙ্গত ?

অদিতি দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করল, —শ্রেয়াকে চিনিস ?

পাপাই দৃশ্যতই চমকেছে। ডটপেন থেমে গেল, —কে শ্রেয়া ?

—সে তুই আমার থেকে ভাল জানিস।

—আমি কোনও শ্রেয়া-ফেয়াকে চিনি না। পাপাই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, —তুমি কোত্থেকে ওই নাম পেলে ? ও নামে কেউ ফোন করেছিল ?

না, সশরীরে বাড়িতেই এসেছিল। বলতে গিয়েও নিজের জিভকে টেনে রাখল অদিতি। ছেলের মুখ দেখে ব্যাপারটা কি শুধু মান-অভিমান বলে মনে হয় ? কোমলভাবে সরল সত্যটাকে এড়িয়ে গেল অদিতি। বলল, —মার কাছে কি ছেলের কিছু গোপন থাকে রে ? তোর মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছি...

—স্টপ ইট মা। দম দেওয়া পুতুলের মতো ঘাড় ঘোরাল পাপাই। ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসছে, —তোমাকে কে কী বলেছে জানি না, তবে তুমি আমার মুখ থেকে শুনে রাখো, শ্রেয়া বলে কোনও মেয়ের সঙ্গে আমার কোনওদিন কোনও সম্পর্ক ছিল না। এখনও নেই।

—তুই শ্রেয়াকে চিনিস না ?

—চিনব না কেন ? চিনতাম। বাজে মেয়ে। আমার পেছনে খুব লেগেছিল, পাত্তা দিইনি।

ছেলের বিকারহীন মুখভাব দেখে উত্তরোত্তর বিস্ময় বাড়ছিল অদিতির। ফ্যালফ্যাল মুখে বলল, —যে মেয়েটার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে কথা বলতিস, সে শ্রেয়া নয় ?

—নো।

—তা হলে কে সে ?

—তোমার এত কৌতূহল কেন বলো তো ?

—বারে, ছেলের সম্পর্কে মার কৌতূহল থাকবে না ?

—থাকবে। ছেলে যতটুকু বলবে ততটুকুই। কাটো এখন। আমাকে কাজ করতে দাও।

অদিতি আহত মুখে সরে গেল। মনের কোণে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া ঘন হচ্ছে ক্রমশ। পাপাই

কি অদিতির কাছে মিথ্যে কথা বলছে ? নাকি শ্রেয়াই... ? মিথ্যে বলে পাপাই বা শ্রেয়া কার কী লাভ ? অদিতি এমন কিছু আদ্যিকালের মা নয় যে পাপাইকে তার কাছে কথা গোপন করতে হবে ! শ্রেয়া কি সত্যিই খারাপ মেয়ে ? সাজিয়ে গুছিয়ে পাপাইয়ের নামে মিথ্যে অভিযোগ জানাতে এসেছিল ? তাই বা কী করে হয় ? মেয়েটা তো ফিরেই যাচ্ছিল, অদিতিই জোর করে... ? শ্রেয়ার আসার কথাটা না বলা কি ভুল হল ?

ভেবে ভেবে কূল পাচ্ছিল না অদিতি। একে সুপ্রতিমকে নিয়ে দুশ্চিন্তা চলছে, সঙ্গে পাপাই মাথায় আর একটা গুবরে পোকা ঢুকিয়ে দিল, অদিতির গল্প লেখা প্রায় লাটে। দুদিন ধরে দুপুরবেলা একটা গল্প নিয়ে কত ঘষাঘষি করল অদিতি, এগোতে পারল না একটুও।

অদিতি যে তিমিরে সেই তিমিরে। স্বামী সন্তান নিয়ে। লেখা নিয়ে। বুঝি বা নিজেকে নিয়েও।

বারো

উদ্বেগেরও প্রাণ আছে, প্রাণীদের মতো তার রূপভেদও অজস্র। কখনও সে তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলে। কখনও বা একছিটে মেঘ হয়ে দেখা দেয় মনের আকাশে, ক্রমশ দখল করে নেয় হৃদয়গগন। আবার কখনও বা নিজের ফুঁয়েই নিজে হাওয়া ভরা বেলুনের মতো অতিকায় হয়ে ওঠে।

অফিস নিয়ে সুপ্রতিমের উদ্বেগটা এই বেলুন প্রজাতির। অন্যবারের চেয়ে এবার মাত্রার কিছু তারতম্য থাকতে পারে কিন্তু গুণগত কোনও তফাত নেই।

অচিরেই এক সন্ধ্যায় হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ফিরল সুপ্রতিম। হাতে প্রকাণ্ড খাবারের প্যাকেট। থরে থরে কেক পেসট্রি প্যাটিজ। পার্ক স্ট্রিটের মহার্ঘ দোকান থেকে কেনা।

উল্লাসে টগবগ ফুটছে সুপ্রতিম। দৈবাৎ ঘরে থাকা পাপাই তাতাইকে ডাকছে চেঁচিয়ে, —এই পাপাই, এই তাতাই, আয় আয়। চটপট খেয়ে নে।

অদিতি চোখ বড় বড় করে দেখছিল। লটারি পেয়েছে, না শোকেতাপে পাগল হয়ে গেল মানুষটা ! বলল, —হলটা কী তোমার ? এত কেক পেস্ট্রি তো ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরাও খেয়ে শেষ করতে পারবে না !

সুপ্রতিম নিজস্ব সুরে গান ধরেছে, —দিল হ্যায় কি মানতা নেহি..

তাতাই ব্ল্যাক ফরেস্টে কামড় দিয়ে বলল, —বাবা প্লিজ, ওই গানটার সিচুয়েশান আলাদা।

—কী রকম সেটা ?

—ঠিক ফ্যামিলি সিচুয়েশান নয়। একটু নীল আলো... তাতাই ফিক ফিক হাসছে, —তোমার বয়সটাও ধরো আরও পঁচিশ বছর কমাতে হবে.... কোমরটা কমাতে হবে... মাকেও আরও...

অদিতি ধমক লাগাল ছেলেকে, —মহা ডেঁপো হয়েছিস তো ? বাবা মাকে নিয়েও ইয়ার্কি ?

—আরে যেতে দাও। পড়োনি, প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে... সুপ্রতিম হোঁচট খেতে খেতে চাণক্য শ্লোকটা হাতড়াল, —ওই তো বাপ ছেলেতে কী যেন একটা হয় ! কী যেন পুত্রং মিত্রং... ! এই পাপাই, বল না।

পাপাই চিকেন প্যাটিজ চিবোচ্ছিল। উদাস মুখে বলল, —আমাদের স্কুলে স্যানসক্রিট ছিল না বাবা।

—ছিল না ? স্ট্রেঞ্জ ! আমাদের সময়ে তো থাকত। আঃ ল্যাঙ্গুয়েজটা এত সুন্দর ছিল ! ঝনঝন কানে বাজত। এনি ওয়ে, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি ?

—বিলক্ষণ। অদিতি হাত উলটোল, —কিন্তু বিকজটা কী ?

—আছে। যবনিকা কম্পমান। ধীরে ধীরে উত্তোলিত হবে। বলেই ঘরে ঢুকে গেছে সুপ্রতিম। প্যান্টশার্ট বদলে, মুখ হাত পা ধুয়ে, পাজামা পাঞ্জাবি শোভিত হয়ে বসেছে সোফায়। সিগারেট ধরিয়ে দু পা তুলে দিয়েছে সেন্টার টেবিলে, —আমার অ্যাসেসমেন্টটা ভুল ছিল, বুঝলে ?

—সে আর নতুন কথা কী !

—না না, বুঝছ না, এটা প্রায় ব্লান্ডার হতে যাচ্ছিল। গরম খেয়ে চাকরিটা ছেড়ে দিলে একেবারে ম্যাসাকার হয়ে যেত।

অদিতি লম্বা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যাক, এবারও তা হলে উদ্বেগটা মেঘ ছিল না। এবং বেলুনটা ফেটে গেছে।

অদিতি চোখ নাচাল, —আজ আর তা হলে তোমার গ্লাস বোতল বেরোচ্ছে না ?

—প্রশ্নই ওঠে না। আমি কী ড্রাঙ্কার্ড ? জমিয়ে কফি বানাও তো।

সবিতা তাড়াতাড়ি রান্না সেরে চলে গেছে, অদিতি ছেলেদের জন্য দুধকফি বানাল, নিজেদের জন্য কড়া। কফি নিয়ে সোফায় এসে বসেছে।

যবনিকা উঠতে দেরি হল না। সুপ্রতিম সাড়ম্বরে জানাল কোম্পানি তাকে সবসময়ে ব্যবহারের জন্য গাড়ি দেবে স্থির করেছে, পার্কস-টার্কসও বাড়ছে প্রচুর, বড়সড় পেহাইক তো হয়েছেই। তবে তার পরিমাণটা নিয়ে ছেলেদের সামনে সে আলোচনা করল না। সুপ্রতিমকে সামনের সপ্তাহে একবার মুম্বাই যেতে হবে, কোম্পানির নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর সমস্ত ডিপার্টমেন্ট-এর এরিয়া ম্যানেজারদের সঙ্গে বসতে চান।

সুপ্রতিমের এই নাটুকে ভঙ্গিটা অদিতির ভারী প্রিয়। স্বামীর সুসংবাদে সেও খুশি, যেমনটি তার হওয়া উচিত। যতটা উৎফুল্ল হওয়া সুপ্রতিম তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করে, ঠিক ততটাই উৎফুল্ল সে এখন।

পাপাই বেরিয়ে গেছে। তাতাই ঘরে গিয়ে গান চালিয়েছে। অদিতি আর সুপ্রতিম গল্প করছিল।

অদিতি হাসতে হাসতে বলল, —আমি কিন্তু সত্যিই এতটা আশা করিনি।

—কী ভেবেছিলে ?

—তোমার নাচ দেখে ভাবছিলাম বোধহয় তোমার গিলানিসাহেব আবার ফিরে এসেছেন।

—আরে ছোহ্। ও ব্যাটা চোরস্য চোর। গাঁটকাটা। আমাদের কোম্পানির কত টাকা ঝেড়ে দিয়ে গেছে জানো ? সব ওই বিবেক আহুজা এসে ধরেছে। কোম্পানি তো ভাবছে ওর এগেনস্টে ক্রিমিনাল কেস লজ্ করবে কি না।

অদিতির মুখ অল্প হাঁ, —তুমিই না কদিন আগে গিলানিকে বাবা দেবতা কী সব বলতে।

—আহ্, ও সব এখন দূর অতীত। গিলানি এখন কোম্পানির দুঃস্বপ্ন।

—তোমাদের বিবেক আহুজা তা হলে লোক ভাল ?

—ভাল কী, জেম অব আ ম্যান। আমি জানতাম না, হার্ভার্ড থেকে এমবিএ করেছে। মার্কেট সম্পর্কে কী নলেজ, কী কনসেপশান ! কী মডেস্ট বিহেভিয়ার !

—আর সেই গিলানি এখন কোথায় ? টাকাপয়সা নিয়ে ফেরার ?

—ধ্যাৎ, তুমি যে গাঁওয়ার সেই গাঁওয়ারই রয়ে গেলে। অত হাই পোস্টের লোকবা কি এলেবেলে চোরেদের মতো লুকোয় নাকি ? বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এখন পিটারসন অ্যান্ড পিটারসনে জয়েন করেছে।

—তারা চোর জোচ্চোর জেনেও নিল ?

—আরে, ওপর মহলে চুরি করার ক্ষমতাটা হচ্ছে এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটি। পাপাইটার যেমন হকি, তাতাইয়ের সাঁতার, তোমাদের ওই শিপ্রার মেয়েটার টেবিলটেনিস... । এই ধরো যেমন তোমার গল্প লেখা.... । এদের টাকাপয়সা চুরিটাও ঠিক তেমনি। জুতসই উপমাগুলো দিতে পেরে সুপ্রতিম অট্টহাসি হাসছে। আপন মনে আক্ষেপ উক্তিও করল, —আমি শালা বুরবকই রয়ে গেলাম। কোম্পানির থেকে হাত্তা লুটতে পারলাম না।

অদিতি ভুরু কুঁচকে বলল, —পারলে না কেন ?

—ইটস নট মাই ফল্ট্। দ্যাট ওল্ড ম্যান, তোমার শ্বশুর, এমন সব জিনিস ছোটবেলা থেকে আমার মাথায় ইনজেক্ট করে দিল। সৎ পথে খেটে খাবি ব্যাটা। মরে গেলেও চুরি জোচ্চুরি করে

পকেট ভরাস না, দেখবি পেট আপনি চলে যাবে। যাচ্ছেও তো, যাচ্ছে না ?

শ্বশুরমশাই মানুষটাকে কোনওদিনই কট্টর আদর্শবাদী বলে মনে হয়নি অদিতির, বরং একটু যেন ভিতু ধরনের, নির্বিরোধী। একটা অ্যালুমিনিয়াম কারখানার হেড অফিসে মাঝারি অফিসার ছিলেন, বইপত্র পড়ার নেশা ছিল খুব, রাত জেগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান শুনতে যেতেন, কারও সাতেপাঁচে থাকতেন না বড় একটা। তিনিও ছেলের মধ্যে একটা সৎ গুণ বপন করে দিয়ে গেছেন ভাবতে ভাল লাগছিল অদিতির। সৎ গুণ, না নিষেধের বেড়ি ? অসৎ লোকদের স্ত্রীরা নিজেদের কাছে নিজেরা মুখ দেখায় কী করে ? অদিতি হলে তো পারত না।

অদিতি বলল, —চলেই যখন যাচ্ছে, তখন হাহুতাশ করছ কেন ?

—না, চারপাশে দেখি তো দিনরাত....

ঝপ করে একটা প্রশ্ন মাথায় এল অদিতির। বলল, —আচ্ছা, তোমাদের গিলানিসাহেব যে চুরি করতেন তা তুমি জানতে ?

—সে কে না জানত। বলেই সচকিত হয়েছে সুপ্রতিম। গম্ভীর হয়ে গেল, —বড্ড ফালতু কথা বলো তো। মুড খারাপ করে দিয়ো না।

অদিতি চুপ করে গেল। চুপ নয়, স্থাণু।

আনন্দসন্ধ্যায় ছায়া পড়ছিল। পলকের জন্য সুপ্রতিম বদলে যাচ্ছিল অদিতির চোখে। পলকের জন্যই। সৎ কর্মঠ স্বামীকে নীতিহীন, শিরদাঁড়াবিহীন, চোরের বন্দনাকারী এক অন্তঃসারশূন্য মানুষ বলে মনে হচ্ছিল অদিতির।

অদিতি ধমকাল নিজেকে। এতদিন ঘর করার পরে এ সব ভাবনার কোনও মানে হয় !

সুপ্রতিম টিভি চালিয়েছে। সেন্টার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেবল চ্যানেলের সিনেমাটা বার করল। দেখছে। আলগা হাত রাখল বউয়ের কাঁধে, —আজ রাত্রে মেনু কী গো ?

—ভাত আর ইলিশ মাছ। অদিতি হাতটা নামিয়ে দিল।

—আম টাম নেই ?

—আছে। খাওয়ার সময়ে কেটে দেব।

—আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব। ভাল করে একটা শান্তির ঘুম দরকার। আজকের কাগজটা একটু এনে দাও তো। চশমাটাও।

কাগজ চশমা দিয়ে ব্যালকনিতে এল অদিতি। টিয়াটাকে ঘরে তুলবে।

পিঠে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে টিয়া। অদিতি কাছে যেতে একবার মুখ তুলেই আবার মুখ গুঁজল। অদিতির গন্ধও বুঝি আজকাল চিনে গেছে টিয়া, ভয় পায় না। নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়।

গেটের সামনে কাদের যেন জটলা চলছে, তিন-চারটে ছেলে চেঁচাচ্ছে জোর জোর। স্ট্রিটলাইটটা দপদপ জ্বলছে নিবছে, বড় চোখে লাগে। তারা নেই, আকাশ আবার লাল হয়েছে আজ। বাতাস বইছে। মৃদু, অতি মৃদু, প্রায় না বওয়ারই মতো। রাত্রে আবার ঢালবে নাকি !

টিভির পর্দায় চলমান ছায়াছবি, কাগজের ওপর সুপ্রতিমের ঘুরন্ত পেনসিল, ছেলেদের ঘর থেকে ভেসে আসা পাশ্চাত্য সুর—কেমন অলীক ঠেকছিল অদিতির। সুপ্রতিম আঙুল দিয়ে সেন্টার টেবিলে তবলা বাজাচ্ছে মাঝে মাঝে, কখনও টিভির গানের তালে ঘাড় দোলাচ্ছে, কখনও বা ছেলের ঘর থেকে ভেসে আসা সুরের তালে। কী আজব যে দেখাচ্ছে দূর থেকে !

সুপ্রতিমের কি নিজস্ব কোনও তাল নেই ?

অদিতি মুখ ঘুরিয়ে নিল।

পরদিন তুলতুলি এল। বিকেলের দিকে। ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পথে। তখন সবে মলিনার মাকে বিদায় করেছে অদিতি, লেখা নিয়ে বসেছে দ্বিতীয় রাউন্ড।

শোওয়ার ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে জিভ কাটল তুলতুলি, —এমা, তুমি লিখছিলে। অসময়ে এসে লেখা চৌপাট করে দিলাম তো।

ঘরের মেঝেতে এলোমেলো কাগজ ছড়ানো, তিনটে বালিশ তিন দিকে ছিটকে আছে, মশলার

কৌটো পাউডারের কৌটো অ্যাশট্রেরা পেপারওয়েট হয়ে চেপে রেখেছে কাগজদের। একটা মোটা অভিধানও গড়াচ্ছে মাটিতে, বাংলা।

লেখাতে ছেদ পড়লেও অদিতি বিরক্ত হয়নি একটুও, তুলতুলিকে দেখলে হয়ও না। বরং মনটা এক নির্মল প্রসন্নতায় ভরে যায়। বাপের বাড়ির সৌরভ বয়ে নিয়ে আসে বলেই কি ? হবে হয়তো।

অদিতি বলল, —ছাড় তো আমার লেখা। এ হল অন্ধ মানুষের সেলাইফোঁড়াই নিয়ে বসা, স্রেফ সময় কাটানো।

—সে তুমি যাই বলো পিসি, লেখাটাও তো একটা কাজ। তিন-চারটে গল্প ছাপা হয়ে গেল, তুমি এখন পুরোদস্তুর লেখক ছাড়া আর কী !

অদিতির মনটা থইথই করে উঠল। বাড়ির লোকে না পুঁছুক, ভাইঝি তাকে লেখক বলে মানে ! মানে দাদাও, যদিও সে পড়েনি কিছুই।

অদিতি মধুর হেসে বলল, —তুই কিন্তু অনেক দিন পর এলি তুলতুলি।

—ইউনিভার্সিটি না থাকলে আসা হয় না গো।

—কবে খুলল ?

—তা হল গিয়ে ধরো আট দিন। রোজই ভাবি ফেরার পথে নামব, আকাশ দেখে সাহস হয় না। কাল রাত্রে বাবা খুব খ্যাচখ্যাচ করছিল, তাই আজ জয় মা বলে...

মুহূর্তের জন্য অলকেশের মুখটা দেখতে পেল অদিতি। মলিন বিষণ্ণ এক দাদা বোনের মাথায় খুশির জাদুকাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে নেমে যাচ্ছে ধীর পায়ে অবসন্নের মতো।

অদিতি লজ্জিত মুখে বলল, —আজ আমার লেখাগুলো দিয়ে দেব, নিয়ে যাস তো। দাদাকে পড়তে দিস। সেদিন অমন ভরা বর্ষায় এল... যাওয়ার সময় আমারও মনে পড়ল না...

—বাবা এসেছিল নাকি ? কবে ?

—এই তো দিন পনেরো আগে। কেন, তোদের বলেনি ?

—না তো !

অদিতি আর বেশি কিছু বলল না। কাগজপত্র গোছ করে রেখে তুলতুলিকে শোওয়ার ঘরে বসাল। ফ্রিজে কালকের পেসট্রির পাহাড় পড়ে আছে, ভাইঝির জন্য নিয়ে এল দুটো। তুলতুলিকে দেখার পর থেকেই একটা প্রশ্ন মাকুর মতো বুকে ঘুরে চলেছে। দোনামোনা করে বলেই ফেলল, —তুই আমাকে একটা খবর এনে দিতে পারবি ?

—কী খবর ?

—একটা মেয়ের সম্পর্কে। তোদের যাদবপুরেই পড়ে। ইংলিশে অনার্স।

—কোন ইয়ার ? কী নাম ?

—ইয়ার বলতে পারব না। নাম শ্রেয়া। টাইটেলটাও ঠিক জানি না।

চামচেতে পেসট্রি কেটেও মুখে পুরছে না তুলতুলি। হাত স্থির, চোখ অদিতির চোখে।

—তুমি কী জানতে চাও ?

—তুই মেয়েটিকে চিনিস ?

—আগে তুমি কী জানতে চাও বলবে তো ?

—তেমন কিছু নয়। এই... মেয়েটি কেমন... মানে...

—কেন বলো তো ?

তুলতুলির দৃষ্টি বড় অন্তর্ভেদী। অদিতির অস্বস্তি হচ্ছিল। সঙ্কোচও। পাপাই তার এত ভাল ছেলে, তাকে সে কি বিশ্বাস করে না ? সংশয় যে তবু যায় না মন থেকে !

দ্বিধা ঝেড়ে অদিতি বলেই ফেলল তুলতুলিকে। সব কথা। শ্রেয়ার আসা থেকে শুরু করে পাপাইয়ের উত্তর। সব। শুনে তুলতুলির মতো প্রাণচঞ্চল মেয়েও চিত্রার্পিতের মতো বসে রইল কিছুক্ষণ।

মাথার ওপর বনবন পাখা ঘুরছে। ছিরছিরে বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। তবু যেন গুমোটে গায়ে জ্বালা ধরে। মাঝবিকেলেই আলো কমে এসেছে খুব। বাঁকে পৌঁছে হুইসিল দিচ্ছে ইলেকট্রিক ট্রেন,

লেভেল ক্রসিং-এর গেট পড়েনি বোধহয়।

তুলতুলি প্লেটটা রান্নাঘরের সিঙ্কে রেখে এল। মাখন-রং দোপাট্টার কোণ দিয়ে আলগা মুছছে মুখ। নিচু গলায় বলল, —আমি মেয়েটাকে চিনি পিসি। ইন ফ্যাক্ট চিনতাম না, পাপাইয়ের সঙ্গে আমাদের ক্যাম্পাসে ঘোরাঘুরি করতে দেখে যেচেই আলাপ করেছিলাম। শ্রেয়া খুব ভাল মেয়ে পিসি। যেমন লেখাপড়ায়, তেমন স্বভাবচরিত্রে। শান্ত। কুল।

অদিতি ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিল। ঢোক গিলে বলল, —তা হলে হয়তো ওদের কোনও ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে! লজ্জায় দুজনেই বলতে চাইছে না!

তুলতুলি বিছানায় বসল। একটু কিন্তু কিন্তু করে বলল, —পাপাইকে দেখে আমরা যেরকম ভাবি পাপাই কিন্তু ঠিক সেরকম নয় পিসি। আমারও ধারণা ছিল পাপাই শুধু অ্যাকাডেমিক মাইন্ডেড ছেলে, চারদিকের কিছু বোঝে না, জানে না, খেয়াল করে না... তুলতুলি একটা বড় করে নিশ্বাস নিল, —আমারই ভাই, বলতে খারাপ লাগে, শ্রেয়া ছাড়াও আরও দু-তিনটে মেয়ের সঙ্গে ওর একইরকম সম্পর্ক আছে।

অদিতির চোখে অবিশ্বাস, —তুই কী করে জানলি?

—জেনেছি। শ্রেয়াও বলেছে। পাপাইকে জিজ্ঞেস কোরো নন্দিনী বলে একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরত কি না! তারপর দেবাঞ্জলি! তারপরেও একটা মেয়ে, সে অবশ্য আমাদের যাদবপুরের স্টুডেন্ট নয়, বোধহয় গোলপার্ক টোলপার্কের দিকে থাকে...। গরমের ছুটির পর শ্রেয়া আমার কাছে এসে খুব কান্নাকাটি করছিল একদিন। পাপাইয়ের ব্যাপারে মেয়েটা ভীষণ সিরিয়াস গো। আমি ঠিক করেছিলাম পাপাইয়ের সঙ্গে নিজেই কথা বলব। এর মাঝে যে এত কিছু ঘটে গেছে... শ্রেয়া এখানে এসেছে...! পাপাই কিন্তু ভাল কাজ করছে না পিসি।

তুলতুলি কথা বলছে না, যেন এক অদৃশ্য হাত সপাসপ চড় মারছে অদিতিকে। এই সেদিনের পাপাই, মা ভাত খাইয়ে না দিলে খেতে পারত না, তাতাই হওয়ার পর মার কোল না পেয়ে মার একটা শাড়ির কোনা মুঠোয় চেপে সারারাত ঘুমোত—সেই পাপাই মেয়েদের নিয়ে খেলা করতে শিখে গেছে! অদিতির বড় দর্প ছিল তার ছেলেরা শুধু লেখাপড়াতেই ভাল হয়নি, তাদের চরিত্রও দৃঢ়ভাবে গড়ে দিতে পেরেছে অদিতি, এই তার নমুনা।

রাগটাকে দলামোচড়া কাগজের মতো পাকিয়ে রাখল অদিতি। রাত্তিরে খেতে বসে সকলের সামনে ফাঁস করল কথাটা। ইচ্ছে করেই। সুকৌশলে।

পাপাইয়ের বাঁ হাতে ইংরিজি থ্রিলার, খেতে খেতে পড়ছে পাপাই। টিভি খোলা, হরর্ মুভি চলছে, দূর থেকেও তাতাইয়ের চোখ সেঁটে আছে পর্দায়। সুপ্রতিম, তৃপ্ত সুখী সুপ্রতিম, জরিপ করছে কাটা আমের টুকরো, স্যালাডের প্লেট।

অদিতি অনেক দূর থেকে প্রসঙ্গে এল। পাপাইয়ের পাতে রুটি দিয়ে ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করল, —হ্যাঁ রে পাপাই, তুই যে জি আর ই দিচ্ছিস, বাবা জানে?

পাপাই বই থেকে চোখ সরাল না, —হুঁ।

—ও, বাবাকেও বলা হয়ে গেছে? আমার বেলাই যত লুকোছাপা?

—বাবাকে তো বলতেই হয়। আফটার অল পরীক্ষার ফি-টা তো বাবাকেই দিতে হবে।

—কত?

—হাজার তিনেক।

—পাস করলে কী করবি?

—বাইরে পড়তে যাব।

—কেন, এখানে এম এসসি পি এইচ ডি করা যায় না?

—যায়। কিন্তু লাভ কী?

—মানে?

—এখানে রিসার্চের স্কোপ অনেক কম। ওখানে কত অ্যাডভান্সড ল্যাবরেটরি, শয়ে শয়ে জার্নাল, দুর্দান্ত গাইড... পড়াশুনোর পরিবেশই কত ভাল। এক একটা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে কী বিশাল

বিশাল লাইব্রেরি আছে কল্পনাও করতে পারবে না।

—শুধু তোর পড়ার মগজটা এখান থেকে তৈরি করে নিয়ে যাচ্ছিস, তাই তো ?

বইয়ের পাতা আঙুলে মুড়ে অদিতির দিকে তাকাল পাপাই। বুড়ো আঙুল নেড়ে বলল, —সরি। বুঝলাম না।

অদিতি শান্ত মুখে বলল, —এ কথা তুই বুঝিস না তা তো নয় পাপাই। ওখানকার সবই ভাল। মানছি। কিন্তু ওখানে পৌঁছনোর জন্য এখানকারই সব অযোগ্য অচল অখদ্যে জায়গাগুলো থেকে বেস তৈরি করে নিয়ে যেতে হয়, তাই না ?

পাপাই কাঁধ ঝাঁকাল, —কী করব, এমন দেশে জন্মেছি...

সুপ্রতিম কথা শুনছে মা ছেলের। হাসছে। মজা পাচ্ছে।

অদিতি বলল, —সেই জন্মস্থানে ফিরবি তো পাপাই ?

—এখনই এ সব কথা বলছ কেন বলো তো মা ? আগে চান্সটা তো পাই...

—ধর পেলি। কী করবি ?

—এটা একটা হাইপথিটিক্যাল কোয়েশ্চেন হয়ে গেল মা।

—তবু তোর মনে তো কিছু একটা ভাবনা আছে...

—তোমার কী মনে হয় ? ফেরা উচিত ?

—আমার কথা বাদ দে। তুই বল।

দু-এক পলক ভাবল পাপাই। তারপর বলল, —আচ্ছা তুমিই বলো, এখানে ফিরে কী লাভ ? ধরো ওখানে যদি ভাল একটা জায়গায় রিসার্চ করার সুযোগ পাই, এখানে চলে এলে তা কি কন্টিনিউ করতে পারব ? আমার ন্যাক স্পেসসায়েন্সে, অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে। মহাকাশ। এখানে তার স্কোপ কোথায় ? নাসার মতো জায়গার কথা বাদই দাও, একটা ভাল অবজারভেটরি আছে ইন্ডিয়ায় ? বলতে বলতে বাবা আর ভাইকে একঝলক দেখে নিল পাপাই, —এখানে ফেরা মানে আইদার কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ঠেঙানো, নয়তো মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি নিয়ে রাতদিন ঘচর ঘচর করা। উইদাউট এনি সিরিয়াস গেইন।

তাতাই হি হি হেসে উঠল,—আসল কথাটা চেপে যাচ্ছিস কেন রে দাদা ? বল না ওদেশে মাল্লু বেশি। রাজার হালে থাকবি...

ভুরু কুঁচকে ভাইকে দেখল পাপাই। বলল, —হ্যাঁ, সেটাও একটা কারণ। ওখানে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য। এখানকার মতো হকার ভিড় বস্তি পলিউশন নেই... একটা কাম কোয়ায়েট লাইফ কে না চায় !

তাতাই বলল, —আমার বাবা নোংরা দেশই ভাল। খামচে খুমচে ঠিক টাকা রোজগার করে নেব। এত চারদিকে দুশো পাঁচশো হাজার কোটি টাকা স্ক্যামে গলে যাচ্ছে, কোথাও থেকে খাবলা মারতে পারব না ?

অদিতি বলল, —তার মানে টাকা রোজগারই তোদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাই তো ?

সুপ্রতিম এতক্ষণে মুখ খুলেছে। প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে বলল, —চোখ কান খোলা মানুষ হলে তাই তো হওয়া উচিত। আমি তেমন কামাতে পারিনি কোনওদিন, তা বলে আমার ছেলেরাও পারবে না ?

এই মুহূর্তে এই ঘরে নিজেকে ভিন্ন গ্রহের মানুষ মনে হচ্ছিল অদিতির। ছেলেদের পিছনে যে এত পরিশ্রম করেছে, এত সময় দিয়েছে, তার ফল তা হলে এই ? এক বৃহৎ অশ্বডিম্ব ?

অদিতি শুকনো স্বরে বলল, —তা হলে বলো, ওদেশে গবেষণা করতে যাচ্ছি বলাটা একটা অজুহাত। বলো সুখ কিনতে যাচ্ছে তোমার ছেলে।

সুপ্রতিম কী যেন বলতে যাচ্ছিল, পাপাই হাতের ইশারায় থামাল, —তোমার কি ধারণা মা ওদেশে সুখ এমনি এমনি মেলে ? রিসার্চ করে খেটে আমি যদি কোনও সার্ভিসই না দিতে পারি, ওরা মুখ দেখে আমাকে গাড়ি বাড়ি দেবে ?

—সে তুই ওদের দেশকে সার্ভিস দিবি, তাতে আমাদের কী ?

—বিজ্ঞানের এদেশ ওদেশ নেই মা। নিউটনের আবিষ্কার কি শুধু নিউটনের দেশে কাজে লেগেছে ?

—নিউটন তো আর গরিব দেশের মানুষ হয়ে জন্মে বড়লোকের দেশে মগজ বিক্রি করতে যায়নি !

পাপাই মুখ টিপে হাসল, —যদি সত্যি আমার মগজ বিক্রি হয়, তুমি কিন্তু তার শেয়ার পাবে মা। ডলারে।

অদিতি পাপাইয়ের কপটতার সীমা দেখবে আজ। মনের কষ্ট মনে চেপে বলল, —বাপ মা নয় বুড়ো বয়সে তোর পাঠানো ডলার চিবিয়ে সুখী হল, ওদেশে সেটল্ করলে তোর আমাদের জন্য মন কেমন করবে না ?

সুপ্রতিম ফস করে বলে উঠল, —তুমি আজ আমার বড় ছেলেটাকে নিয়ে পড়লে কেন বলো তো ? বেচারা একটা ব্রাইট ফিউচারের জন্য চেষ্টা করছে, কোথায় এনকারেজ করবে...

—ডিসকারেজ তো করিনি। আমি বোকাসোকা মানুষ, শুধু বুঝতে চাইছি। অদিতির ঠোঁটে বিদ্যুৎ, —এইটুকু বুঝতে পারি, ও নাসায় বসে চাঁদে রকেট পাঠালে আমাদের মলিনার মার উপকার হবে না। যতই যা হোক, ওর এখানকার স্কুল কলেজের খরচায় মলিনার মার তো পাঁচটা পয়সাও আছে। কীরে তাতাই, তোদের ইকনমিকস্ বই কী বলে ?

দাদাকে জাঁতাকলে পড়তে দেখে তাতাই খুব খুশি। বলল, —হ্যাঁ, লেখাপড়াতে তো স্টেট কম সাবসিডি দেয় না, সেখানে তো মলিনার মারও কনট্রিবিউশান আছে।

অদিতি বলল, —মরুক গে যাক মলিনার মা। আমার কথাটার উত্তর দে পাপাই, বাবা মার জন্য মন কেমন করবে ?

পাপাইয়ের স্থৈর্যে চিড় ধরেছে যেন। বিরক্ত মুখে বলল, —তোমার হাইপথিটিকাল কোয়েশ্চেন ইজ গোয়িং টুউ ফার মা। অতই যখন বোঝ, তখন এটাও নিশ্চয়ই জানো, পৃথিবী এখন একটা বিশাল গ্রাম। তোমরা এক পাড়ায় থাকবে, আমি থাকব আর এক পাড়ায়। ইচ্ছে হলে আমরা এ পাড়া ও পাড়ায় যাওয়া আসা করব। বাবা মা দেশে পড়ে রইল... মন কেমন করা... এ সব মধ্যযুগীয় সেন্টিমেন্ট আর চলে না মা। তুমি কি চাও শুধু তোমাদের বুড়ো বয়সে দেখভাল করার জন্য, টু বি মোর প্রিসাইজ, তোমার ছেলে শুধু তার মুখখানা তোমাদের দেখানোর জন্য, নিজের ভূত ভবিষ্যৎ নষ্ট করে পচে মরুক ? এটা কি একটা সুস্থ চিন্তা ?

এই তো ছেলেকে চিনতে পারছে অদিতি। মুখোশটা সরে যাচ্ছে। শীতল হৃদয়হীন এক রোবট সামনে এখন।

রোবটের শক্তি পরখ করা দরকার। অদিতি অতর্কিতে আঘাত হানল, তুই—কোনটা সুস্থ চিন্তা রে পাপাই ? বিদেশে পালাবি প্ল্যান করে রেখেছিস বলে এখানে একটার পর একটা মেয়েকে নিয়ে ফূর্তি করে বেড়াবি, এটাও কি সুস্থ চিন্তা ? নাকি একটা নিষ্পাপ ফুলের মতো মেয়েকে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলার জন্য বাজে মেয়ের বদনাম দেওয়াটা সুস্থ চিন্তা ?

টেবিলে যেন বাজ পড়ল। পাপাই পাথর। তাতাইয়ের হতচকিত চোখ ঘুরছে সকলের মুখের দিকে। সুপ্রতিমের হাত থেকে আমের আঁটি পিছলে গেল, মোজাইক মেঝেতে গড়াচ্ছে।

অদিতি ধারালো দৃষ্টিতে পাপাইকে দেখছে, —চুপ মেরে গেলি যে ? বল কী মহৎ ধারণা থেকে তোর দেবাঞ্জলি, নন্দিনী, শ্রেয়া, তারপর ওই গোলপার্কের মেয়েটা....

—মা। পাপাই উঠে দাঁড়িয়েছে, —তুমি কিন্তু লিমিট ক্রশ করে যাচ্ছ।

—লিমিট কে ক্রশ করছে ? তুই, না আমি ? বল আমি একটাও বাজে কথা বলছি ? ওই মেয়েগুলোর সঙ্গে তুই বাঁদরামি করে বেড়াচ্ছিস না ?

—আমি যা করছি সেটা আমার ব্যাপার। তুমি এর মধ্যে নাক গলাচ্ছ কেন ?

—গলাচ্ছি, কারণ আমি তোমার মা।

—তো ?

রাগে মুখ দিয়ে আর কথা বেরোচ্ছিল না অদিতির। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। হেঁটমাথা

হয়ে বসে আছে।

পাপাই দুম দুম করে ঘরে ঢুকে গেল। তাতাইও মানে মানে সরে পড়েছে। সুপ্রতিম এখনও চুপ।

বৃষ্টি পড়ছিল। মুষলধারে, বড় বড় দানায়। জলের ঝাপটায় ভেসে যাচ্ছে ব্যালকনি। টিয়া অস্থির নড়াচড়া করছে খাঁচায়।

সুপ্রতিম এঁটো হাতেই বসে আছে। ফিসফিস করে বলল, —কাজটা কিন্তু তুমি ভাল করলে না।

অদিতি মুখ তুলল।

—বোঝো না কেন, ছেলেরা বড় হয়ে গেছে। ওদের একটা পারসোনাল লাইফ তৈরি হয়েছে, সেখানে কি ওরা আর আমাদের খবরদারি মেনে নেবে ?

অদিতি নাক টানল, —তুমি পাপাইকে সাপোর্ট করো ?

—সাপোর্ট-টাপোর্ট করার কথা হচ্ছে না। ওরা ওদের মতো থাক, আমরা আমাদের মতো থাকব। ছেলেরা বড় হয়ে গেলে এভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলা ঠিক নয়।

—ছেলে চোখের সামনে অন্যায় করছে দেখলেও মুখে কুলুপ এঁটে থাকব ?

—থাকবে। তুমিই তো সেদিন আমাকে বললে, কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপারে ইন্টারফিয়ার করা উচিত নয় ?

বিমূঢ় চোখে তাকাল অদিতি, —সে তো দীপক শর্মিলার ব্যাপারে ! তারা তো বাইরের লোক ! ডিভোর্স একটা প্রাইভেট ব্যাপার।

—এটাও তোমার ছেলের প্রাইভেট ব্যাপার। দীপক শর্মিলা অ্যাডাল্ট, তোমার ছেলেও অ্যাডাল্ট, সেই মেয়েগুলোও কেউ কচি খুকি নয়। একটাতে নাক গলানো অন্যায় হলে, অন্যটাও অন্যায়। তাদের ব্যাপার তারা বুঝবে, হু দা হেল ইউ আর ? সুপ্রতিম সেকেন্ডের জন্য থেমে বলল, —তাদের কেউ যদি এখানে মায়াকান্না কাঁদতে আসে, কান ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেবে। গল্প লিখছ, গল্প লেখা নিয়ে থাকো, তা নয় যত সব...। আমার অত মেরিটোরিয়াস ছেলে..। না না, কাজটা ভাল করোনি অদিতি।

বৃষ্টির হুঙ্কার বাড়ছে। ধোঁয়া ধোঁয়া জলকণা মথিত করছে ত্রিভুবন। রুপোলি তলোয়ার ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে আকাশ।

অদিতি কাঁদছিল। কিন্তু কার জন্যে।

তেরো

হেমেন ফ্ল্যাটে ঢুকেই হেঁকে উঠলেন, কই, অদিতি কোথায় ? শিগগির মিষ্টি নিয়ে এসো।

হেমেনের পিছনে রঞ্জন, তার স্বরে মার্জিত উল্লাস, —শুধু মিষ্টিতে হবে না হেমেনদা, আমাদের একদিন পেট পুরে মাংসভাত চাই।

সোফায় আংটা লাগানো রঙিন পর্দার স্তূপ। টাঙাচ্ছিল অদিতি, তাতাইকে সঙ্গে নিয়ে। প্রতি বছরই পুজোয় অদিতির ফ্ল্যাটে নতুন পর্দা ঝোলে, এ বছর সেলাই করাতে করাতে দেওয়ালি ভাইফোঁটা পার হয়ে গেল।

চটপট পর্দাগুলো শোওয়ার ঘরে রেখে এল অদিতি। হাসিমুখে বলল, —খাওয়াতে হবে তো বুঝলাম, কিন্তু উপলক্ষটা কী ?

—তুমি আজকের কাগজে বিজ্ঞাপন দ্যাখোনি ?

—কীসের বিজ্ঞাপন ?

—ও হো, সরি। তোমার বাড়িতে তো আবার রোববার ছাড়া বাংলা কাগজ ঢোকে না।

—ও হেমেন মামা, হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা বলুন না।

হেমেনের আগে রঞ্জনই বলল, —আজ বিজ্ঞাপনে আপনার নাম বেরিয়েছে। আগামী কাল রবিবারের পাতায় আপনার গল্প থাকবে।

হৃৎপিণ্ড চলকে উঠল অদিতির, শিরা-উপশিরায় রক্তচাপ বেড়ে গেছে সহসা। যা শুনছে তা কি সত্যি ?

মনের উচ্ছ্বাস যাতে ছেলেমানুষি মনে না হয় তার জন্য সতর্ক হল অদিতি। কৃতজ্ঞ স্বরে বলল, —এ কিন্তু সবটাই হেমেন মামার কৃতিত্ব।

—কেন ? গল্পটা তোমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম বলে ? আমি তো শুধু ক্যুরিয়ারের কাজ করেছি।

—আপনি না নিয়ে গেলে...আপনার কত জানাশোনা...

—আহ্ অদিতি, এ সব কী কথা ! তোমার গল্প তার নিজের মেরিটেই বেরোচ্ছে। আমি কাউকে কিচ্ছু বলিনি। নিজের লেখা নিয়ে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থাকা একদম ভাল নয়।

রঞ্জন বলল, —আমি প্রথম গল্পটা পড়েই বুঝেছিলাম আপনার মধ্যে ফ্ল্যাশ আছে। এখন আপনার দরকার শুধু অধ্যবসায়, পড়াশুনো, আর অবিরাম লিখে লিখে লেখা আরও শানানো।

তাতাই সোফায় বসে কথা শুনছে সকলের। বাইরের মায়াবী হেমন্তের বিকেল অনেকক্ষণ ধরেই টানছে তাকে, পর্দা টাঙানোর মতো নগণ্য কাজে মাকে সাহায্য করতে গিয়ে ইঁদুরকলে আটকে পড়েছিল সে, অতিথিদের আগমনে তার নিমপাতা খাওয়া মুখ বেশ প্রফুল্ল এখন। চনমনে গলায় জিজ্ঞাসা করল, —খবরের কাগজে গল্প লিখলে টাকা পাওয়া যায় না ?

—সে তো যায়ই। মজলিশি ভঙ্গিতে বসেছেন হেমেন, —কর্মার্শিয়াল কাগজ লেখা ছাপবে, সম্মানমূল্য দেবে না ?

—মা-ও পাবে ?

—অবশ্যই।

তাতাইয়ের কৌতূহল বাড়ছে। একবার মাকে দেখল, একবার অন্য দুজনকে। বলল,— কত দেবে ?

—তা ধরো পাঁচ-ছশো তো দেবেই। বেশিও দিতে পারে।

—ওয়াও ! পাঁচ-ছশো ! মা, এটা তোমার জীবনের প্রথম কামাই, তাই না ?

অদিতি মুখ টিপে হাসল।

—পয়লা কামাই কিন্তু ব্যাগে পুরতে নেই মা, পুরোটাই খরচ করতে হয়।

অদিতির হাসি অম্লান।

তাতাই উঠে পড়ল, —আমার কিন্তু চাইনিজ বুক কবা রইল মা।

তাতাই চলে যাওয়ার পর গল্পগুজব জমে উঠেছে। হেমেন এসেছেন দিন কুড়ি পর। শেষ যেদিন এসেছিলেন সেদিন অদিতির বাড়ি ভর্তি লোকজন। পার্থ কাবেরী বাবাই তো ছিলই, সঙ্গে সুপ্রতিমের দুই বোন ভগ্নীপতি আব তাদের ছেলেমেয়েরাও। পার্থ লখনউ ফিরে যাওয়ার আগে সেদিনই ছিল ভাইবোনদের শেষ মিলনদিবস। হেমেনমামার সঙ্গে অদিতি ভাল করে কথাই বলতে পারেনি সেদিন।

আজ হেমেন গল্পের মেজাজে আছেন। বহু প্রবীণ লেখকের জীবনের অজস্র অকথিত ঘটনা হেমেনের মুখস্থ, হেমেন রসিয়ে রসিয়ে চুটকির মতো করে শোনাচ্ছেন সে সব। মাঝে মাঝে হেমেন আর রঞ্জনের তর্কও হচ্ছে জোর। সাহিত্যে পরাবাস্তবতা জাদুবাস্তবতা, মিথ ফ্যান্টাসির সঙ্গে বাস্তবের কোথায় মিল, কোথায় বা গরমিল, লেখার বিষয় ও আঙ্গিকের দ্বন্দ্ব, কত কী যে তর্কের বিষয়।

রঞ্জন যখন যাব যাব করছে, অদিতি জিজ্ঞাসা করল, —আবার আসছেন কবে ?

রঞ্জন বলল, —দেখি। চলে আসব যে কোনওদিন।

অদিতি বলল —এ কথা আপনি আগের দিনও বলেছিলেন, এলেন তিন মাস পরে।

হেমেন বললেন, —আসবেটা কী করে ? ওর পুজোর লেখা ছিল না ? পুজোয় কী কী লিখলে রঞ্জন ?

রঞ্জন সলজ্জ মুখে বলল, —গোটা কয়েক গল্প, একটা উপন্যাস, আর একটা হাল্কা প্রবন্ধ।

অদিতির চোখ বড় বড় হয়ে গেল, —এত লিখেছেন ?

হেমেন বললেন, —উঠতি লেখকদের কাছে পুজো সংখ্যায় লেখা যে কী নেশার তা তুমি বুঝবে না অদিতি। এই একটা পত্রিকায় লিখছে, ওই একটা পত্রিকায় লিখছে। আমি নয় বার করিনি, কিন্তু কত পত্রিকা যে বার হয় এ সময়ে...

রঞ্জন বলল, —এ আর আপনাকে বলে বোঝাতে হবে না হেমেনদা, দু-এক বছর লেখার জগতে থাকলে উনি নিজেই বুঝে যাবেন। তখন পুজোর আগে কে বাড়িতে এল কে এল না তা মনেই থাকবে না। সুরার নেশা মানুষ ত্যাগ করতে পারে, সাহিত্যের আকর্ষণ ত্যাগ করা বড় কঠিন।

হেমেন ঘন ঘন ঘাড় দোলাচ্ছেন, —তা বটে! তা বটে! আচ্ছা অদিতি, এবার তো একদিন আমরা তোমার এখানেই বসতে পারি!

—আমার এখানে! খুব ভাল হয় তা হলে। কবে আসবেন বলুন? কে কে আসবেন?

—সে অনেক লোক হয়ে যাবে। রঞ্জন, তোমাদের ওখান থেকেও কয়েক জনকে আসতে বলো না। আনিসুরকেও এনো।

—শেয়ালদের ভাঙা বেড়া দেখাচ্ছেন? রঞ্জন অদিতির দিকে তাকিয়ে হাসছে,—এ লাইনে কম পাগল আছে! একবার গ্রিন্ সিগনাল দিলেই দেখবেন আপনার ফ্ল্যাট প্যাকড্ হয়ে গেছে।

—ভালই তো। ফ্ল্যাটটা তাও পাগলদের কাজে লাগবে।

হেমেন জিজ্ঞাসা করলেন, —কবে তা হলে বসছি আমরা?

অদিতি বলল, —আপনিই বলুন। কাল রবিবারের পরের রবিবারে আসবেন?

—তোমার কোনও অসুবিধে হবে না তো?

—একটুও না।

খুশিতে ঝলমল করছিল অদিতি। হৃদয়ের গভীরে, অনেক গভীরে, এক ঝর্না বয়ে চলেছে কুলকুল। পাথর ভাঙছে। অসংখ্য নুড়ি সরে সরে গিয়ে পথ খুলে দিচ্ছে ঝর্নার। নিস্তরঙ্গ খাতে বইতে থাকা জীবন আবার যেন ছোঁয়া পেল প্রাণের।

সুপ্রতিম ফিরল একটু রাত করে। মুম্বাই থেকে কোম্পানির কিছু কেষ্টবিষ্টু এসেছে, তাদের সঙ্গে সেলস্ প্রোমোশন নিয়ে অফিসে মিটিং চলেছে বহুক্ষণ, তারপর ক্লাবে বসেছিল সবাই। আহারাদি সেরে এসেছে সুপ্রতিম, মদ্যপানও ভালই করেছে, মেজাজ দিব্যি আমোদিত হয়ে আছে তার। ফিরেই শুরু হয়েছে অফিসের কথা, —জানো আজ ভোগলে কী বলেছে আমাকে? বলেছে মজুমদার ইউ আর জিনিয়াস্। বলো তো কেন বলেছে?

গল্প বেরোনোর খবরটা সুপ্রতিমকে দেওয়ার জন্য ছটফট করছিল অদিতি। পাপাই তাতাই খেতে বসেছে, তাদের আয়োজন সাজিয়ে অদিতি ড্রয়িং স্পেসে এল। নিজের উৎসাহ চেপে প্রশ্ন করল, —কেন?

সোফায় অদিতির পাশে ধুপ করে বসল সুপ্রতিম, —আমাদের কোনও জোন্ই এবার হাফইয়ারলি টার্গেট রিচ করতে পারেনি, একসক্লুডিং দিস মজুমদারস্ জোন্। নট ওনলি টার্গেট, আমাদের নতুন শ্যাম্পু বিল্কি সব জায়গায় ফ্লপ, এক্সেপ্ট দিস্ ইস্টার্ন এরিয়া। আরে বাবা, রঙ্গনাথের খেলা কি চিরকাল চলে? জানো তো ব্যাটা কী করেছিল?

অদিতি না শুনে বলল, —আমার একটা দারুণ খবর আছে।

—তোমার?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমার।

—কী খবর?

—ওই যে হেমেনমামা আমার একটা গল্প নিয়ে গিয়েছিল, সেটা কালকের কাগজে বেরোচ্ছে।

—অ। তাই বলো। আমি ভাবলাম কী না কী! এমনভাবে বললে...

—বারে, এটা বড় খবর নয়?

সুপ্রতিম ঢুলু ঢুলু চোখে হাসল, —তোমার বলার ধরন দেখে কী মনে হচ্ছিল জানো?

—কী?

আহাররত ছেলেদের এক ঝলক দেখে নিয়ে ফিস ফিস করে সুপ্রতিম বলল, —ভাবলাম বুঝি

পাপাই তাতাইয়ের পরে আবার কেউ আসছে।

—শুধু ইয়ার্কি। অদিতি হেসে ফেলল, —তোমার এটাকে দারুণ খবর বলে মনে হয় না?

—ভালই তো। গুড নিউজ। তোমার উন্নতি হচ্ছে। তবে এর জন্য তোমার আমাকে ক্রেডিট দেওয়া উচিত।

—কেন?

—তোমার কি ধারণা তোমার হেমেনমামাই তোমাকে একা উৎসাহ দিয়েছে? আমি দিইনি? আমি তোমাকে বলিনি দুপুরগুলো নষ্ট না করে লেখো? বলিনি ঝুটঝামেলায় জড়ানো বা শুয়েবসে সময় কাটানোর থেকে লেখা অনেক ভাল কাজ?

অদিতি দূরমনস্কভাবে ঘাড় নাড়ল, —তা তো বটেই।

—গুড। মাথায় রেখো কথাটা। জুতো খুলে মোজা দুটো জুতোর ভেতর চালান করল সুপ্রতিম, —হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কী বলছিলাম যেন?

—কী বলছিলে?

সুপ্রতিম এক সেকেন্ড মাথা চুলকোল, —হ্যাঁ, সেই রঙ্গনাথন। সে কী করেছিল জানো? আনইম্যাজিনেবল্ থিং। রেল কোম্পানিকে ধরে বেয়াল্লিশ লাখ টাকার ডিটারজেন্ট বেচে দিল। কী করে করল বলো তো?

অদিতি উদাস গলায় বলল, —কী করে?

—ক্যাচ ছিল। রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বার ব্যাটার মামাশ্বশুর। হি ইজ দা কী। নইলে ভাবতে পারো রেল ডিটারজেন্ট কিনছে! আমাদের পারচেজের মুখার্জি তো শুনে বলেছিল, মজুমদারদা আপনার ছেলেদের ধরে ধরে ধাপার মাঠে পাঠিয়ে দিন! পারফিউম বেচে আসবে! হা হা কী জোক! সেই রঙ্গনাথনের মুণ্ডু এখন মাটিতে লুটোবে। পুছো কিউ? পুছো। পুছো।

অদিতি বড় করে একটা শ্বাস ফেলে বলল, —কেন?

—বিকজ ওই মামাশ্বশুরের এগেন্স্টে সি বি আই লেগেছে। দ্যাট ম্যান্ ইজ আ ডেড মিট্। সো রঙ্গনাথনের অর্ডার গন্। এখন গেরুয়া পরে ব্যাটাকে মাদ্রাজের রাস্তায় নামতে হবে। দে দে অর্ডার দে, অর্ডার দে, অর্ডার দেএ রে... হামে অর্ডার দে। হা হা হা।

বাবার সুরেলা কণ্ঠসঙ্গীত আর অট্টহাসির দাপটে খাওয়া শেষ করে উঠে এসেছে দুই ভাই।

সোফায় পা তুলে বসে তাতাই বলল, —বাবাকে রোজ একটা করে এরকম সিটিং দিতে বোলো মা, দারুণ দারুণ গল্পের প্লট পেয়ে যাবে। তোমার ইনকামও হু হু করে বেড়ে যাবে।

—তুমি লিখে টাকা পাচ্ছ নাকি?

অদিতি হাসল সামান্য, খবরের কাগজে গল্প লিখলে টাকা তো পাবই।

তাতাই ফুট কাটল, —পার স্টোরি মিনিমাম পাঁচ-ছ শো।

সুপ্রতিম থমকেছে। নাক নাচাচ্ছে ঘন ঘন। ঠোঁট কুঁচকে বলল, —মন্দ কী! যত সামান্যই হোক, মানি ইজ মানি। শাড়ির ব্যবসায় লেগে থাকতে পারলে এর থেকে অবশ্য বেশিই আসত। তবে এটা বলতে পারো, এখানে ইনভেস্টমেন্টটা কম। শুধু কাগজ কলম আর কালি ব্যস্। আমি প্লট সাপ্লাই করে যাচ্ছি, তুমি লিখে যাও। হা হা।

প্রয়োজন ছাড়া পাপাই আজকাল বাড়িতে বিশেষ কথা বলে না। অদিতি সুপ্রতিম তাতাই কারও সঙ্গেই না। তার জি আর ই পরীক্ষার আর দিন পনেরো বাকি, বি এসসি-র রেজাল্ট বেরোতে মাসখানেক? বাড়িতে যেটুকু সময় থাকে বেশ চিন্তিত দেখায় তাকে। সে'ও আজ চুপ থাকতে পারল না। তরলভাবে বলল, —তোমরা লেখকদের অত হ্যালাফ্যালা কোরো না, লিখেও প্রচুর রোজগার হয়। বিদেশে এক একজন রাইটার শুধু লিখেই প্যালেস এরোপ্লেন দ্বীপ কত কী কিনে ফেলছে।

ব্যস, কথা ঘুরে গেল। কোন্ দেশে কোন্ লেখকের কী পরিমাণ রোজগার, কে কত বিলাসবহুল জীবনযাপন করে, কে মাতাল, কে লম্পট, কে গাঁজা টেনে লিখতে বসে, কে চুল্লু, তাই নিয়ে ভুলভাল পর্যালোচনা শুরু হয়ে গেছে।

অদিতির হঠাৎ খুব কষ্ট হচ্ছিল। এত কিছু নিয়ে গবেষণা চলছে তিনজনের, কই একবারও তো কেউ জিজ্ঞাসা করল না কোন্ লেখাটা বার হচ্ছে অদিতির! সব কিছুর মধ্যেই টাকার গন্ধ খোঁজে, এরা কারা? অদিতিরই স্বামী? অদিতিরই সন্তান? ওই যে পাপাই, কৃতকার্যের জন্য এতটুকু অনুতপ্ত হল না, উলটে ভাব দেখায় যেন অদিতিই তার ব্যক্তিগত জীবনে এক হীন অনুপ্রবেশকারী, এখনও বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে ফোনে একইভাবে ফস্টিনস্টি করে চলে, তাকে তো ক্ষমা করেছিল অদিতি, তবু যে কেন এক তীক্ষ্ণ শলাকা বুকে বিঁধে থাকে! ছেলেকে মার্জনা করা মার পক্ষে খুব সহজ কাজ, কিন্তু সন্তানের দুষ্কর্ম বিস্মৃত হওয়া বড় কঠিন, বড্ড কঠিন। আর ওই যে তাতাই, অদিতির সদাহাস্যমুখ ছোট ছেলে, সে তো এক ভাবী বানিয়া! না হলে ওইটুকু ছেলে এখন থেকেই শেয়ারবাজার নিয়ে মাতামাতি করে!

অদিতি ঘরে যেতে গিয়েও ফিরে এল। সুপ্রতিমকে বলল, —তোমাকে আরেকটা দরকারি কথা বলা হয়নি। সামনের রবিবার এই ফ্ল্যাটে একটা সাহিত্য সভা হবে।

—এখানে? রবিবার? ছুটির দিনে?

—একটা রবিবার নয় হলই। অদিতি গম্ভীর।

অদিতির মুখের দিকে তাকিয়ে সুপ্রতিম কী বুঝল কে জানে, হাত উলটে বলল, —ও কে। ও কে। শুধু একটা প্রবলেম...

—কী?

—তথাগত বলছিল সামনের রবিবার আসবে...

—বারণ করে দিয়ো। পরের রবিবার আসতে বোলো। ও হ্যাঁ, আরও একটা কথা। হেমেন মামা আর রঞ্জনকে ওই দিন দুপুরে খেতে বলব ভাবছি।

—হঠাৎ?

—আমার ইচ্ছে।

অদিতি আর দাঁড়াল না। এক নিঃসীম শূন্যতা ছেয়ে ফেলছিল তাকে।

পরদিন খুব ভোরে, গোটা ফ্ল্যাট যখন ঘুমিয়ে আছে, অদিতি বেরিয়ে পড়ল নিঃসাড়ে। বাড়িতে খবরের কাগজ আসার এখনও অনেক দেরি, তার আগেই নিজের গল্পটাকে একবার ছুঁতে চায় অদিতি।

একা।

চোদ্দো

এক হেমন্তের শুরুতে এসেছিল টিয়া, পরের হেমন্ত ফুরোবার আগেই অপরূপ এক বদল ঘটেছে তার। বুলি ফুটেছে মুখে। টিয়ার শব্দভাণ্ডারটি বড় নয়, বরং খুবই ছোট, মাত্র একটি শব্দ জমা হয়েছে তার ভাঁড়ারে। খুকু। শিস নয়, অন্য কোনও নাম নয়, শুধু খুকু।

ওই শব্দটুকুই ঘুরে ফিরে আওড়ায় টিয়া। সকাল নেই, দুপুর নেই, বিকেল নেই, যখনই শোনো শুধু খুকু আর খুকু। শুনতে শুনতে বাড়িসুদ্ধু সকলের কান ঝালাপালা হয়ে গেল। এক অদিতি ছাড়া। একটি শব্দেই অদিতির টিয়া প্রমাণ করেছে সে গোঙা নয়, এর বেশি আর টিয়ার কাছে কী চাওয়ার আছে অদিতির!

পাখির আজকাল তেজও বেড়েছে। খুব ডানা ঝাপটায়, ঝটপট ঝটপট শব্দে তোলপাড় হয় খাঁচা। চট করে দেখে মনেও পড়ে না কোন ডানাটা কমজোরি হয়েছিল টিয়ার, কোথায় বা থাবা বসিয়েছিল বেড়াল।

অদিতি অবশ্য টিয়ার দিকে নজর দেওয়ার সময় পায় না এখন। কোন দিকেই বা পায়! গল্প লেখা এক সময়ে তার কাছে ছিল স্রেফ ব্যসন, অবসরের সঙ্গী। এখন আর তা নেই। ক মাসের শখ কখন যেন সাধনা হয়ে গেছে। শুধু দুপুরই নয়, লেখা এখন সারাদিনই অদিতিকে অধিকার করে থাকে। লেখার মাঝে সে সহজে ওঠে না, লেখার সময়ে পাড়াপ্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজন এলে সে

ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। পাপাই তাতাই হুটহাট এসে পড়লেও অবলীলায় বলে দেয় অমুক জিনিস অমুক জায়গায় আছে, নিজেরা নিয়ে নাও। সন্ধেটুকুই শুধু লেখে না অদিতি। রাত্রে বসে আবার। রোজ না হলেও প্রায়ই। নির্জন রাতে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না, অদিতি অনেক বেশি মনোযোগী হয়ে উঠতে পারে তখন।

রাতের সাধনাতেও বিঘ্ন এল। একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল সুপ্রতিমের। ফটফটে আলো জ্বলছে ঘরে, মেঝেতে বালিশ নিয়ে উপুড় হয়ে লিখছে অদিতি, সেদিকে তাকিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে সুপ্রতিম বলল, —কী আরম্ভ করলে! একটু শান্তিতে ঘুমোতে দেবে না?

অদিতি বলল, —কেন, আমি তো তোমার ঘুমিয়ে পড়ার পর লিখতে বসেছি।

সুপ্রতিম বলল, —এই রাত দুপুরে কি না লিখলেই নয়?

অদিতি হাসল একটু, —কী করি বলো, রাত্রে যে অনেক সুন্দর সুন্দর চিন্তা এসে যায় মাথায়! জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালে কত পুরনো ছবি দেখতে পাই, চোখের সামনে কত ঘটনা ভেসে ওঠে। লেখার সময়ে এগুলো বড় কাজে লাগে গো।

সুপ্রতিম বেজার মুখে বলল, —সে চিন্তাদের গুছিয়ে গাছিয়ে দিনভর লেখো না, কে তোমাকে বারণ করেছে!

অদিতি বলল, —ঘুম থেকে উঠলে ছবিগুলো যে আর মাথায় থাকে না, পুরো ভ্যানিশ হয়ে যায়।

সুপ্রতিম গজগজ করল, —তার জন্য আমাকেও রাতভর জেগে বসে থাকতে হবে! জানো আমি আলোয় ঘুমোতে পারি না। সারাদিন খেটেখুটে এসে এ সব আর ভাল্লাগে না।

অদিতি বলতে পারত গত চব্বিশ বছরে বহু দিন সুপ্রতিম রাত জেগে অফিসের কাজ করেছে। অদিতিরও অন্ধকার ছাড়া ঘুম আসে না, তা সত্ত্বেও সুপ্রতিম আলো নেবায়নি। এখনও মাঝে মধ্যে তাতাই-এর সঙ্গে বসে টিভিতে লেট নাইট মুভি দেখে সুপ্রতিম, গত হপ্তাতেও রাত তিনটে অব্দি ফুটবল খেলা দেখল, তখন তো রাত জাগার কথা ওঠে না! অদিতিরও তো সে সময়ে অসুবিধে হয়, অদিতি কোনওদিন বলতে গেছে! অদিতির শরীর কি শরীর নয়!

কিছুই বলল না অদিতি। শান্তভাবে কাগজপত্র গুছিয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল সে রাতে। পরদিনই বেরিয়ে দোকান থেকে একটা টেবিল ল্যাম্প কিনে এনেছে। কী আর করা, মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে খেতে লেখার অভ্যাসটা রাত্রে ঝেড়ে ফেলতে হবে।

টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে অদিতিকে লিখতে দেখে প্রথম দু-চার দিন সুপ্রতিম হাসাহাসি করল। তুমি দেখছি নোবেল লরিয়েট না হয়ে ছাড়বে না! তারপর দুম করে একদিন বলে বসল, —এটা কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে অদিতি।

অদিতি বলল, —এতেও কি তোমার অসুবিধে হচ্ছে?

সুপ্রতিম বলল, —আমার সুবিধে অসুবিধের কথা হচ্ছে না। সবকিছুর একটা ডিসেন্সি আছে। তুমি তো আর লিখে রোজগার করে খাচ্ছ না, যে রাতদিন এরকম মুখ গুঁজে লিখে যেতে হবে! আমার দেখতে খারাপ লাগে।

অদিতি বলে ফেলল, —তার মানে বলতে চাইছ রোজগার করে খেতে গেলে ডিসেন্সি, লিমিট এ সব না রাখলেও চলে?

সুপ্রতিম গুম হয়ে গেল।

অদিতি পড়াশুনোও শুরু করছে নতুন করে। তার এতদিনকার ছোট্ট পৃথিবীটার বাইরেও যে এক বৃহৎ জগৎ আছে তাকে জানার জন্য তার এখন উদগ্র পিপাসা। বিষয় নিয়ে খুব একটা বাছাবাছি নেই অদিতির। গল্প উপন্যাস শিল্প সংস্কৃতি ইতিহাস যা হেমেন মামা এনে দেয় তাই গোগ্রাসে পড়ে ফেলে। গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের একটা বড় লাইব্রেরি আছে, তার মেম্বার হয়েছে অদিতি, সেখান থেকেও বই নিয়ে আসে। রঞ্জনের কাছ থেকে পায় হরেক কিসিমের লিটল্ ম্যাগাজিন, তাও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

অদিতির বাড়িতে সাহিত্যসভাও শুরু হল। বেশ কিছু তরুণ লেখকের সমাবেশ ঘটল বাড়িতে।

হেমেন এবং রঞ্জনই মূল উদ্যোক্তা। স্বরচিত গল্প পাঠ হল, অদিতির ড্রয়িং স্পেস কাঁপিয়ে প্রবল তর্ক বিতর্কের তুফান উঠল, গল্প নিয়ে কাঁটাছেড়াও চলল প্রচুর। বিকেল থেকে সন্ধে অদিতির ফ্ল্যাট জমজমাট। হেমেনের সঙ্গে প্রেমতোষের সভাতেও বার কয়েক আরও গেছে অদিতি, তবে সেখানকার পরিবেশ অনেক বেশি গুরুগম্ভীর, তুলনায় অদিতির বাড়ির আসর অনেক স্বচ্ছন্দ। প্রেমতোষের বাড়িতে সবাই প্রায় শ্রোতা, এখানে লেখকদেরই সাবলীল জটলা। কত ধরনের ছেলে যে আসে! কেউ সারাক্ষণ অস্বাভাবিক গম্ভীর, কেউ বা তুবড়ির মতো কথা বলে চলেছে। কেউ অসম্ভব লাজুক, স্বপ্নালু চোখে নিজের গল্পটি পড়ে মাথা হেঁট করে আক্রমণের প্রতীক্ষায় বসে থাকে, কেউ বা সামান্যতম সমালোচনাতেই বুনো কুকুরের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সকলের মধ্যেই এক ধরনের উত্তাপ টের পায় অদিতি। সহমর্মীর উত্তাপ। সহধর্মীর উত্তাপ। তরুণদের সান্নিধ্যে বেশি দিন জড়তা বজায় রাখা কঠিন, অদিতি এখন নিঃসঙ্কোচে যে কোনও লেখা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে পারে।

প্রথম দিনের সভায় এলাহি জলখাবারের বন্দোবস্ত করল অদিতি। লুচি আলুর দম ভেজিটেবল্ চপ মিষ্টি। নিজের হাতে লুচি ভেজে আনল সকলের জন্য, চা করল বার দু তিন।

সেদিন সভা শেষ হওয়ার পরেই হেমেন ধরলেন অদিতিকে, —এখানে যত বারই সভা হবে, তত বারই এত আয়োজন করবে নাকি?

অদিতি বলল, —বারে, সবাইকে আমন্ত্রণ করে এনেছি..

হেমেন বললেন, —সে তো এখানে সভা করার জন্য, খাওয়ানোর জন্য নয়। এর পর থেকে তুমি আর এত ঝামেলায় যাবে না।

অদিতির মুখ করুণ হয়ে গেল। ওই সব প্রাণবন্ত ছেলেদের খাওয়াতে ভালই লেগেছে তার, হেমেন মামা শুধু শুধু আপত্তি করছে কেন! বলল, —তা হলে নেক্সট্ সভা থেকে খাওয়া বন্ধ?

হেমেন বললেন, —বন্ধ করবে কেন? সাহিত্যের যা নির্ভেজাল সঙ্গী, তা তো থাকবেই। মুড়িবাদাম আর চা। ওই চায়ের কষ্টটুকুই তোমাকে করতে হবে বার কয়েক। তোমার ছেলেদের বোলো না, তোমাকে একটু হেলপ্ করে দেবে...

অদিতি শুনে হেসেছিল মনে মনে। তার ছেলেরা করবে সাহিত্য সভায় অংশগ্রহণ! সাহিত্যের নাম শুনলেই দুই ছেলে দু দিকে পোঁ পোঁ দৌড়তে থাকে। এত্ত বোরিং! এত্ত বোরিং! পাপাই-এর জিআরই পরীক্ষা হয়ে গেল, বিএসসির রেজাল্টও বেরিয়ে গেছে। যথারীতি ফার্স ক্লাস পেয়েছে পাপাই, এমএসসিতে ভর্তিও হয়ে গেছে। তবে এখনও তার মন জিআরইর রেজাল্টের দিকে, অদিতি বুঝতে পারে। যাক, যে যেভাবে থেকে খুশি থাকে থাকুক।

আশ্চর্যের বিষয়, সুপ্রতিম কিন্তু প্রথম দিনের সাহিত্যসভায় ছিল। হয়তো বা অদিতির অনুরোধ রাখতে। অথবা নতুন ধরনের মজা চাখার বাসনায়।

থাকার ফলটা অবশ্য শুভ হল না। অদিতির পক্ষেও না। সুপ্রতিমের পক্ষেও না।

উৎসাহের ঝোঁকে নবীন লেখকদের মধ্যে থেকে এক কোমলদর্শন যুবককে পাকড়াও করল সুপ্রতিম। মুরুব্বি চালে আলাপ জমাল ছেলেটির সঙ্গে।

আলাপটাই কাল হল। ছেলেটা একথা সেকথার মাঝখানে ঝপ করে বলে বসল, —আপনি তো খুব বড় চাকরি করেন, তাই না?

সুপ্রতিম হাসতে হাসতে বলল, —বাহ্, এখবরও জানা হয়ে গেছে! কে বলল?

—হেমেনদা বলছিলেন। ...আপনি নাকি লোটাস ইন্ডিয়ার গোটা পূর্বাঞ্চলের সর্বেসর্বা।

—নারে ভাই, ওই সেলস্টা দেখাশোনা করি আর কী।

ছেলেটি টুপ করে বলল, —আপনাদের কোম্পানি তো বিজ্ঞাপনে অনেক খরচা করে, আমাদের পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দিন না।

অদিতি সুপ্রতিমের পাশে বসে ছেলেটির কথা শুনছিল, বায়নার সুরে বলল, —হ্যাঁগো, দাও না।

—হ্যাঁ, তা ব্যবস্থা একটা করা যায়। কী নাম আপনার পত্রিকার?

—রোহিণী।

সুপ্রতিম পেশাদারি স্বরে জিজ্ঞাসা করল, —সেল্ কী রকম ?

—ভাল। বেশ ভাল। লাস্ট ইস্যুটা আমাদের চারশো কপি ছাপা হয়েছিল, তার মধ্যে হার্ডলি ষাট কপি পড়ে আছে। ...গোটা চল্লিশ কম্প্লিমেন্টারি গেছে...তার মানে শ তিনেক কপি তো বিক্রি হয়েছেই।

সুপ্রতিম তাকাল এদিক ওদিক। বুঝি দু-চারটে নিশ্বাস নিল, —মাত্র তিনশো ?

—কেন, তিনশো কম নাকি ? আমাদের এনটায়ার কাগজের দাম উঠে গেছে।

—আর ছাপার খরচ ?

—ওই দু-একটা বিজ্ঞাপনও আসে, বাকি যা শর্ট পড়ে পকেট থেকে যায়।

সুপ্রতিম হা হা হাসল, —তার মানে আপনার ট্যাঁকের জোর আছে।

—জোর থাকলে কি আর বিজ্ঞাপন চাইতাম ! টিউশ্যনির টাকায় সব ইস্যু টাইম্লি বার করতে পারি না...

সুপ্রতিমের চোখ গোল হয়ে গেল, —আপনি চাকরি করেন না ?

ছেলেটা বলল, —চাকরি করলে কি আর ভাবনা ছিল ! পত্রিকাটা কত বড় করে বার করতে পারতাম।

সুপ্রতিম আরও অবাক, —শুধু পত্রিকা বার করার জন্যই চাকরি পাওয়া দরকার ?

ছেলেটা দিব্যি বলে দিল, —চাকরি পেয়ে যদি পত্রিকাই না বড় করতে পারি তা হলে সে চাকরি করে আমার লাভ কী !

—আপনার বাড়িতে কেউ নেই ? মা, বাবা ?

—হ্যাঁ, সবাই আছে। মা বাবা ভাই বোন। কেন বলুন তো ?

সুপ্রতিম ধন্দ মারা মুখে বসে রইল খানিকক্ষণ, তারপর উঠে চলে গেল। রাত্রে ধরল অদিতিকে, —তোমার সাঙ্গোপাঙ্গরা যে দেখছি সব বদ্ধ পাগল !

অদিতি টেরচাভাবে হাসল, —একটা বিজ্ঞাপন চেয়েছে বলে পাগল হয়ে গেল !

—তিনশো কপি কাগজ বিক্রি হয় তার জন্য আমাকে বিজ্ঞাপন দিতে হবে ? টাকা কি খোলামকুচি ?

অদিতি তর্ক জুড়ল, —টিভিতে অসভ্য নাচগানের জন্য তোমরা লাখ লাখ টাকার বিজ্ঞাপন দিতে পারো, আর এই সামান্য একশো-দুশো টাকা... একটা ভাল কাজের জন্য নয় দিলেই। তবু একটা ক্রিয়েটিভ কিছুর মধ্যে রয়েছে ছেলেগুলো !

—ক্রিয়েটিভ না হাতি। উচ্চণ্ড পাগলামি। ফ্যামিলির চিন্তা নেই, টাকা উড়িয়ে পত্রিকা বার করা ! হুঁহ্।

—সবাই কি এক ছাঁদের হবে নাকি ! অফিস আর রোজগার।

—থাক থাক জ্ঞান মেরো না। তোমাদের ওই ফালতু ব্যাপারে আমাকে আর জড়াবে না।

বাস্ হয়ে গেল। আর চোরে কামারে দেখা নেই। দ্বিতীয় সাহিত্যসভার দিন আগরতলায় ছিল সুপ্রতিম, তৃতীয় আসরের দিন প্রথম অতিথি ডোরবেল্ বাজাতেই চোস্ত পাঞ্জাবির ওপর শাল জড়িয়ে সোজা বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ফিরল দুপুররাতে। পুরো চুর হয়ে। যা সে কদাচ হয়।

ফিরেই হুঙ্কার, —তোমার সব অপোগণ্ডের দল গেছে ?

অদিতি স্তম্ভিত। সংবিৎ ফিরে পেয়ে ধমকাল সুপ্রতিমকে, —হচ্ছেটা কী ? মাঝরাতে ফিরে হল্লা করছ কেন ?

—বেশ করছি। আমার বাড়িতে আমি যা খুশি তাই করব। কোথায় তোমার সেই হারামজাদার দল ?

—ও কি ভাষা ! হারামজাদা শব্দের মানে জানো ?

—না। তোমার কাছে শিখতে হবে ! চটি খুলে দরজার দিকে ছুড়ল সুপ্রতিম। বেসামাল পায়ে শোওয়ার ঘরে গেল। গজরাচ্ছে, —খুব ভাষার ধ্বজা ওড়াতে শিখেছ অ্যাঁ ? ওফ্, জীবনটা আমার হেল্ করে দিল !

অদিতি শান্ত করার চেষ্টা করল সুপ্রতিমকে। বলল, —এরকম করছ কেন ? মাসে তো মাত্র একটা দিন...

—তাই বা হবে কেন ? আমার একটা ছুটির দিনে আমারই ফ্ল্যাটে একপাল সুগ্রীব আর অঙ্গদ নাচানাচি করবে, এ কি মামদোবাজি ?

অদিতি তাড়াতাড়ি দরজা ভেজিয়ে দিল, —কী আরম্ভ করলে কী ? পাপাই তাতাইয়ের ঘুম ভেঙে যাবে যে !

—যাক। সব্বাই শুনুক। স্খলিত পায়ে দরজা খুলে দিয়েছে সুপ্রতিম, —অ্যাই পাপাই, অ্যাই তাতাই, তোরাই বল্, এ কি মামদোবাজি ?

অদিতি টেনে হিঁচড়ে সুপ্রতিমকে বসিয়ে দিল বিছানায়। হিসহিসিয়ে উঠল, —আমার বন্ধুরা এখানে আসে বলেই যত রাগ, তাই না ? তোমাব বন্ধুরা যে সারা সন্ধে তাণ্ডব করে যায়, তার বেলা ?

সুপ্রতিম ফুঁসে উঠল, —আমার বন্ধুরা তোমার ওই লাফাঙ্গাদের মতো ভিখিরির বাচ্চা নয়। কোত্থেকে শালা এক বুড়ো ভাম মামা জুটেছে, মাথাটা একেবারে চিবিয়ে ঝরঝরে করে দিল। তোমাকে লেখিকা বানানোর জন্য তার এত কীসের ইন্টারেস্ট, আঁ ? গাদা গাদা ছেলে এনে আমার ফ্ল্যাটে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, যখন তখন তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, মানে কী এ সবের বোঝো ?

অদিতি স্তব্ধ হয়ে গেল। কার্নিশের বেড়ালটা যেন হৃৎপিণ্ডে নখের আঁচড় টানছে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে আসছে শরীর। কেটে কেটে বলল, —মাতলামির ঝোঁকে তুমি কী বলছ তুমিই জানো। একটা কথা শুনে রাখো, আমার বন্ধুরা এখানে আসবে। আমার মামাও আসবে। এটা যেমন তোমার ফ্ল্যাট, আমারও ফ্ল্যাট।

—তোমার বাপ দাদা এই ফ্ল্যাট উইল করে দিয়ে যায়নি। এটা আমার রোজগারের টাকায় করা, বুঝেছ ?

—সংসারের পেছনে আমার বুঝি কোনও খাটুনি নেই ? তার বুঝি দাম নেই ?

—চোপ। একটা কথাও নয়। মাগ্না খাটছ ? যা চাও তাই তো দেওয়া হয়। সুপ্রতিম অসংলগ্ন স্বরে চেল্লাচ্ছে, —আমার ফ্ল্যাটে এ সব আর চলবে না। আই ড় হিয়ার বাই ডিক্লেয়ার...

অদিতি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় শোনা যায় না এমন স্বরে বলল, —এ কথা এতদিন পরে মুখ থেকে বেরোল ?

—আগেও বলতে পারতাম। বলিনি। মার্সি। ওয়াচ করছিলাম। ভেবেছিলাম কাজকর্ম নেই, একটা কিছু নিয়ে থাকবে... সাহিত্য-ফাহিত্য অনেক হয়েছে। এবার ও সব ছাতার মাথা বন্ধ করো। এটা হল গিয়ে হোম। আ প্লেস অফ হ্যাপিনেস্। এখানে আমাদের সুখ বিঘ্নিত হওয়া আমি আলাও করব না।

অদিতি চৈতন্যের শেষ সীমায়। মাতালের প্রলাপ, না মনের কথাই উগরে দিচ্ছে সুপ্রতিম ? হৃদয়ের গভীরে, অনেক গভীরে, কোথায় যেন একটা ভূমিকম্প হচ্ছে টের পাচ্ছিল অদিতি। চব্বিশ বছর ধরে গড়ে ওঠা ধারণার ইমারত— অদিতিই এই সংসারের চালিকাশক্তি— ভেঙে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে যেন।

নিশ্বাস বন্ধ করে অদিতি বলল, —বেশ, তোমরা যা চাও তাই হবে।

বাতাসে এখন হিমরেণু। দূরের পর্বত তার জমাট দুঃখের নিশ্বাস পাঠাচ্ছে এই শহরে। নিজের ডানায় ঠোঁট গুঁজে ওম খুঁজছে পাখি। বড় শীত। এত শীত যে হাড় মজ্জা কাঁপছে অদিতির।

বিড়বিড় করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে সুপ্রতিম। একটা পা খাটের বাইরে ঝুলছে। অদিতি পাটা তুলে দিল বিছানায়, নরম লেপে ঢেকে দিল সুপ্রতিমকে, মশারি টাঙাল। মেঝেতে লুটিয়ে থাকা সুপ্রতিমের শাল গুছিয়ে রাখল ওয়ার্ড্রোবে।

আলো নিবিয়ে লেখার চেয়ারে এসে বসেছে অদিতি। বসেই আছে।

সুইচ টিপে অদিতি টেবিল ল্যাম্প জ্বালাল। মুহূর্তে ঘরের কোণ ঝলসে উঠেছে আলোয়। পরক্ষণে নেবাল। অন্ধকার। আবার জ্বালাল বাতি। আবার নেবাল। জ্বালাচ্ছে। নেবাচ্ছে। জ্বালাচ্ছে।

অনেক প্রশ্ন। অনেক প্রশ্ন।

দিন পাঁচেক পর একদিন ছোট ননদের বাড়ি গেল অদিতি। দু দিন ধরে ফোন আসছে, রিনার বড় মেয়েটা খুব অসুস্থ, একবার না গেলে খারাপ দেখায়। গিয়ে দেখল জ্বর একটু কমেছে, তবে সাংঘাতিক কাশিতে ভুগছে মেয়েটা। ডাক্তার সন্দেহ করছে ব্রংকাইটিস, এক্সরে করতে বলেছে, হয়েও গেছে আজ, রিনার বর অফিস থেকে ফেরার পথে রিপোর্টটা আনবে।

ডাক্তারকে রিপোর্ট দেখিয়ে রিনার বর বাড়ি ফিরল দেরিতে। অদিতি অপেক্ষা করছিল। এক্সরেতে কিছু পাওয়া যায়নি, সাধারণ কাশি, কাফ সিরাপ দিয়েছে ডাক্তার। রিনার বরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেরোতে বেরোতে নটা বেজে গেল অদিতির।

বাড়ি ফিরে অদিতি দেখল সুপ্রতিম সকাল সকাল ফিরে এসেছে আজ। সেন্টার টেবিলে পা তুলে, শরীর শালে মুড়ে, একটা অ্যাকশান ফিলম্ দেখছে টিভিতে। অদিতিকে দেখে বলল,—কেমন আছে রিঙ্কি?

অদিতি এখন চুপচাপ হয়ে গেছে খুব। প্রবল এক অভিমানে বুকের ভেতরটা পুড়ে গেছে তার, কিন্তু মুখে সে কিছুই প্রকাশ করে না। নিয়ম মতোই কাজকর্ম করে যাচ্ছে সংসারের, যেখানে যা কর্তব্য আছে পালন করছে, দুপুরবেলা এক অপ্রতিরোধ্য মানসিক তাড়নায় লিখতেও বসেছিল দু দিন, শুধু বাড়ির কারও সঙ্গে অদিতি যেচে কথা বলছে না। ছেলেদের অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। মা-র কোনও পরিবর্তন এলেও তাদের এখন দেখার চোখ কোথায়! অথবা সময়! যে যার মনে বেরিয়ে যায়, ফেরে, খায়, শুয়ে পড়ে এবং রুটিনমাফিক হুকুম ছুড়ে যায় মাকে। সুপ্রতিমও তার সেদিনের ব্যবহারের জন্য খুব একটা অনুতপ্ত বলে মনে হয় না। যেন সেদিন নেশার ঝোঁকে কিছুই তেমন হয়নি। যেন সেদিন কিছুই তেমন বলেনি অদিতিকে।

শীতটা জাঁকিয়ে এসেছে। খালি পা মেঝেতে পড়লে ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে। বাইরের চটি ছেড়ে হাওয়াই চপ্পল পায়ে গলাল অদিতি। বলল,—ভালই আছে। কাশিটা জ্বালাচ্ছে একটু।

—সিরিয়াস কিছু?

—না।

সুপ্রতিম টেবিলে পা নাচাচ্ছে,—এদিকে তো একটা ভাল খবর আছে।

অদিতি কৌতূহল দেখাল না।

সুপ্রতিম নিজেই বলল,—পাপাইয়ের আজ জি আর ই-র রেজাল্ট বেরিয়েছে। দারুণ রেজাল্ট করেছে তোমার ছেলে। নাচতে নাচতে বন্ধুদের নাইট শোয়ে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেল।

—তাই বুঝি? অদিতির স্বর নিরুত্তাপ।

—আমি অবশ্য ওদের রেজাল্ট-ফেজাল্ট তেমন বুঝি না, তবে পাপাই বলল ওর স্কোর নাকি খুব ভাল। হয়তো কোনও স্টেট ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়ে যেতে পারে।

—ভালই তো। অদিতি শাড়ি বদলাতে ঘরে ঢুকে গেল।

তাতাই ঘরে আছে, টেবিলে খাবার সাজিয়ে তাকে ডাকল অদিতি। সুপ্রতিমকেও। খাচ্ছে তিনজনে।

আলুকপির ডালনায় রুটি ডুবিয়ে সুপ্রতিম বলল,—আমি একটা কথা ভাবছিলাম, জানো?

—কী?

—তুমি তো অনেক দিন ধরেই ফ্ল্যাটটা রং করানোর কথা বলছ। গত শীতে হল না, এই শীতে করিয়ে দিই, কী বলো?

—করাও।

—কী রং করলে ভাল হয় বলো তো?

তাতাই ঝাঁপিয়ে বলল,—বেজ্ কালার। বেজ্ কালার।

সুপ্রতিমের ভুরু কুঁচকোল,—সেটা কী রং?

—ঠিক চন্দনও নয়, মাটিও নয়, ও আছে একটা। চার্ট দেখলে বুঝতে পারবে।

সুপ্রতিম চোখের কোণ দিয়ে দেখল অদিতিকে,—না না। তোমার মা যে রং চুজ করবে সেটাই

হবে।

—মা-র বেজ কালার খুব পছন্দ, আমি জানি। তাই না মা?

—তোমাদের পছন্দই আমাব পছন্দ। ক্যাসারোলের দিকে হাত বাড়াল অদিতি,—তুই আর রুটি নিবি?

—একটা।

সুপ্রতিম বলল,—কাল তা হলে মিস্ত্রির সঙ্গে কথা বলি। ঘরদোর দেখে একটা এস্টিমেট করে দিয়ে যাক।

অদিতি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল।

সুপ্রতিম ঠোঁট ছুঁচোলো করে দেখছে অদিতিকে। হঠাৎ বলে উঠল,—বুঝলি তাতাই, আমি আরেকটা কথাও ভাবছিলাম।

—কী?

—ওই যে তোব দাদা একবার বলেছিল না, তোর মা লিখতে পারলে একটা বই বার করে দিতে! তোর মা তো অনেকগুলো গল্প লিখে ফেলল, ভাবছি সব কটা এক জায়গায় করে একটা বই ছেপে দিই। কেমন হয়?

চতুর তাতাই মুচকি হাসল। দেখল বাবা মাকে। বলল,—দারুণ।

—তুই তো কলেজ স্ট্রিটের দিকে যাস, খোঁজখবর নিস তো কীরকম খরচ-খরচা পড়বে।

অদিতি নিস্পৃহ স্বরে প্রশ্ন করল,—কপির তরকারিতে নুন ঠিক আছে? সবিতার আজকাল নুনের হাতটা বড় বেড়েছে।

সুপ্রতিম যেন হোঁচট খেল একটু। কথা থামিয়েছে এতক্ষণে। মন দিয়ে খাওয়া শেষ করে উঠে গেল।

শোওয়া হল আজ রাত করে। পাপাই ফেরার পর তাকে খাবার গরম করে দিল অদিতি। জি আর ই-র বেজাল্ট নিয়ে স্বভাববিরুদ্ধ উল্লাস প্রকাশ করল পাপাই, অদিতিও হাসল। মাপা হাসি।

লেপের তলায় ঢুকে সুপ্রতিম বলল,—তোমার কী হয়েছে বলো তো?

অদিতি আলো নিবিয়ে দিয়েছে। আলগাভাবে বলল,—কিছু না তো।

—তুমি কি আমার ওপর রেগেই থাকবে ফুল? নেশার ঝোঁকে কী বলে ফেলেছি...।

অদিতি বলল,—আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি রাগ করে আছি?

—একটা ভাল খবর পেলে, দু-দুটো এক্সাইটিং প্ল্যান শোনালাম, তোমার মুখে হাসি নেই কেন?

—কোনটা তোমার এক্সাইটিং প্ল্যান? বাড়ি রং করা, না আমার বই ছেপে দেওয়া?

অন্ধকারে চুপ সুপ্রতিম। নীরবতায় ঘরের অন্ধকার আরও গাঢ় যেন। তলহীন। মিশমিশে।

হঠাৎ সুপ্রতিম হাত বাড়িয়ে ছুঁল অদিতিকে,—দ্যাখো ফুল, আমাদের বিয়ের পঁচিশ বছর হতে চলল, তুমিও আর কনে বউটি নেই, আমিও আর সেই নার্ভাস বর নয়, এখন কি আমাদের মধ্যে কোনও মান-অভিমান খেলা সাজে? আমরা দুজনে দুজনকে হাতের তালুব মতো চিনি, এখন কি আমাদের মধ্যে কোনও মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আসা উচিত?

অদিতি উত্তর দিল না।

সুপ্রতিম আরেকটু ঘন হয়েছে,—হ্যাঁ, ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি হয়। হতেই পারে। তুমিও জানো আমি তোমাকে কতটা ভালবাসি, আমিও জানি তুমি আমাকে কতটা ভালবাসো, আমরা কেউই কারও খারাপ চাই না। চাই কি?

সুপ্রতিমের স্বরে বুঝি সংশয়! না হলে বিয়ের চব্বিশ বছর পরে এত ভালবাসি বলার আধিক্য কেন?

অদিতি বলল,—ও কথা থাক।

—থাকবে কেন? এ সব কথা বলা দরকার। সুপ্রতিম কাশল খুক খুক। গলা ঝেড়ে বলল,—তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারো আমি যা করি তোমার ভালর জন্যই করি। তুমি ভুল পথে গেলে আমি তোমাকে আটকাতে চাইব, আমি ভুল করলে তুমি। দীপক শর্মিলার ঝঞ্ঝাটে তুমি আমাকে থাকতে

বারণ করলে, আমি সরে এলাম। তারপর দীপক শর্মিলার ডির্ভোস হয়ে গেল, শর্মিলা ছেলের কাস্টডি পেল, আমি আর ওখানে মাথা গলিয়েছি? দীপককে স্ট্রেট বলে দিয়েছি, আমার বউ পছন্দ করছে না, আমি আর তোর সঙ্গে নেই। বিশ্বাস না হয় দীপকের সঙ্গে দেখা হলে তুমি জিজ্ঞেস কোরো। আমাদের এখন কত সুন্দর একটা ফ্যামিলি লাইফ, দু-দুটো এবল ইন্টেলিজেন্ট ছেলে, একটা ওয়েলনিট ফ্যামিলি...ঝকঝকে ফ্ল্যাটে শ্রাবণ মাসে জমিয়ে পঁচিশ বছর সেলিব্রেট করব...আমরা এখন আমাদের মধ্যে ইনট্রুডার আসতে দেব কেন?

অদিতি অন্ধকারে হাসল। বিষণ্ণ হাসি। ঘরের শীত যেন দ্বিগুণ হয়ে গেল হাসিতে।

সুপ্রতিম জড়িয়ে ধরেছে অদিতিকে। কানের কাছে মুখ এনে বলল,—যদি রাগ না কর তো একটা কথা বলি।

—বলো।

—তোমার হেমেনমামা আজ এসেছিলেন। আমি তাঁকে খুব ভদ্রভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি, তুমি একজন সম্মানিত মহিলা। একজন হাউসওয়াইফ। তোমার পক্ষে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয়।

অদিতি আর স্থির থাকতে পারল না। লেপ ফেলে ছিটকে উঠে বসেছে,—কখন এসেছিল হেমেনমামা?

—সন্ধেবেলা। আগামী সপ্তাহে তোমাকে বারাসত না কোথায় নিয়ে যাবে বলছিল, আমি না বলে দিয়েছি। খারাপ ব্যবহার করিনি, খুব ভালভাবেই বলেছি। তাতাই সামনে ছিল, তাতাইকে জিজ্ঞেস কোরো। সুপ্রতিমের স্বরে এতটুকু জড়তা নেই, নির্দ্বিধায় বলে যাচ্ছে,—তোমার মধ্যে একটা কোয়ালিটি আছে, ভদ্রলোক সেটাকে এক্সপ্লোর করেছেন, তার জন্য আমরা গ্রেটফুল। তোমার গুণের কদর তো আমরাই করতে পারি। করেছিও তো। করিনি? পাঁচজনকে বলে বেড়াই না তোমার গুণের কথা? তা বলে ঘরদোর ফেলে অত নাচানাচি করার কী আছে? মেয়েদের একটু দূরত্ব রেখে চলাই ভাল। এতে সম্মান বাড়ে, সংসারেরও বনেদটা শক্ত থাকে। নিজে বিয়ে থা করেননি, উনি বিবাহিত মেয়েদের মানসম্মানের কথা কী বুঝবেন? তুমি তো লেখার জন্য সংসার ভাসিয়ে দিতে চাও না। নাকি চাও?

বাইরে শীতার্ত রাত। লেপ ছাড়া ঠায় বসে আছে অদিতি। ঠাণ্ডা লাগছে না তার।

সে এখন নিজেই বরফ।

পনেরো

বাড়িটার চেহারা দুঃস্বপ্নের মতন। কলকাতার এ অঞ্চলে জরাগ্রস্ত বাড়ির কমতি নেই, কিন্তু এ যেন একেবারে সৃষ্টিছাড়া। শুধু জীর্ণ শ্রীহীন নয়, প্রায় ভগ্নস্তূপ। পলেস্তারা কবেই খসে পড়েছে, সর্বাঙ্গে টেরাবাঁকা অজস্র ফাটল, ভাঙাচোরা লাল ইট টাটকা ঘায়ের মতো গামায় দাঁত ছিরকুটে আছে। দেখেই বোঝা যায় অন্তত পঞ্চাশ বছর এ বাড়ি স্নেহস্পর্শ পায়নি। ফাটলের খাঁজখোঁজ ফুঁড়ে ইতিউতি বট অশ্বত্থের শিকড়। তাদের বামনাকার শরীর ঝুলছে বাইরের দেওয়ালে।

এমন একটা বাড়িতে থাকে হেমেনমামা!

মোটা কাঠের প্রকাণ্ড সদর হাট করে খোলা। সামান্য দ্বিধা নিয়ে কড়া নাড়ল অদিতি। সাড়া নেই কারও। ভেতরে দেখা যায় এক চৌকো চাতাল, মেঝেতে তার পাথর ছিল এক সময়ে, এখন যত্রতত্র পুরু শ্যাওলার আস্তরণ। ভরা দুপুরেও চাতাল ছায়াছন্ন, স্যাঁতসেঁতে। এক প্রান্তে বিশাল উঁচু এক চৌবাচ্চা, চাতাল ঘিরে বর্গাকার বারান্দা, বারান্দার গায়ে সার সার কোটর। কোনও কোনও কোটর থেকে আচমকা মহিলাকণ্ঠ ছিটকে আসছে, তারপরই অন্দর সম্পূর্ণ নীরব। কে যেন কাকে খুব জোরে বকে উঠল। একটা বাচ্চা কাঁদছে।

অদিতি অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিল। কেউ বেরোয় না কেন? ভুল বাড়িতে এল নাকি? ঠিকানাটা বোধহয় ছোটমামার কাছ থেকে ঠিকঠাক জেনে এলেই ভাল হত। ভুলই বা কী করে হয়! হেমেনমামা যে রকম বলেছিল তাতে তো এই বাড়িই হওয়া উচিত। হাতিবাগানে নেমে বাঁ ফুটপাত

ধরে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ-এর দিকে এগোলে বাঁ দিকের প্রথম রাস্তা, রাস্তার বাঁ দিকের দ্বিতীয় গলি। গলিতে ঢুকে ডান হাতের চারটে বাড়ি ছেড়ে পঞ্চম বাড়িটাই তো... !

হৃদয়ের উত্তেজনা অদিতিকে তাড়িয়ে এনেছে আজ, কিন্তু কেন এল অদিতি ? সুপ্রতিমের হয়ে ক্ষমা চাইতে ? হেমেনমামা ক্ষমা করলেই কি সুপ্রতিমের দোষ মুছে যাবে ? নাকি হেমেনমামার সামনে হাউহাউ করে কাঁদবে অদিতি ? সেটা কি বেশি মেলোড্রামাটিক হয়ে যাবে না ?

ফিরে যাবে অদিতি ? এতটা পথ উজিয়ে এসে ?

অদিতি আবার কড়া নাড়ল। এবার বেশ জোরে।

সাড়া মিলেছে। এক প্রৌঢ়া। চাতালে। ভারী শরীরটি ইটচাপা ঘাসের মতো সাদাটে। গোলাকার মুখমণ্ডল বিরক্তিতে ভরপুর। হাত নেড়ে বলল, —আমাদের কিছু লাগবে না বাপু।

অদিতি সামান্য ঘাবড়ে গেল। কালো জরিপাড় ক্রিম রঙের তাঁতের শাড়ি পরে আছে, বেশ দামি শাড়ি, গায়ে কাশ্মীরি শাল, কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ, ঝোলা নয়। তাও মহিলা তাকে সেলস্‌গার্ল ভেবে বসল !

অদিতি মরিয়া হয়ে বলল, —না, মানে আমি একটা দরকারে এসেছিলাম।

প্রৌঢ়া যেন বধির। অদিতির দিকে পিছন ফিরে উঁচু দড়ি থেকে শাড়ি নামাচ্ছে। শুঁকল শাড়িটা, কাঁধে ফেলল। ঘরের দিকে এগোতে এগোতে ঘাড় ঘুরিয়েছে, —দাঁড়িয়ে কেন ? বললাম তো কিছু নেব না।

অদিতি ঠোঁট নাড়ার আগেই এবার উলটো দিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে এক তরুণী। তুলতুলিরই বয়সী। ফুরফুরে রঙিন প্রজাপতির মতো হাবভাব, ঘড়ি বাঁধছে হাতে, মুখচোখে ভীষণ তাড়া। বারান্দা বেয়ে তরতরিয়ে অদিতির সামনে চলে এল মেয়েটা, —কী আছে, কী আছে ? চটপট দেখান।

অদিতি গম্ভীর মুখে বলল, —আমি একজনকে খুঁজতে এসেছি, তুমি আমাকে একটু হেলপ্ করতে পারো ?

—ও, তাই বলুন। মেয়েটা যেন একটু হতাশ, —কাকে খুঁজছেন ?

—হেমেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক। বহতা পত্রিকার সম্পাদক। এই বাড়িতেই থাকেন কি ?

মেয়েটা রীতিমতো চমকেছে। হাঁ করে দেখছে অদিতিকে, —আপনি ছোটদাদুকে খুঁজছেন !

অদিতি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। আন্দাজে আসাটা ভুল হয়নি।

মেয়েটা অপসৃত প্রৌঢ়ার দরজার দিকে তাকিয়ে নিল একবার, —উনি কিছু বললেন না ?

অদিতির ভুরুতে ভাঁজ বাড়ছিল, —না। কেন ?

—ওই রকমই স্বভাব। সেদিন আমার কলেজের একটা বন্ধু এসে ফিরে গেছে।

অন্য দিন হলে মেয়েটার কথা শুনে হয়তো হাসত অদিতি, আজ কেজো স্বরে বলল, —হেমেনমামা মানে হেমেনবাবু কি আছেন ?

—ছোটদাদু আপনার মামা !

—হ্যাঁ। আছেন উনি ?

—কে জানে, ছোটদাদু কখন বাড়িতে থাকে, কখন থাকে না। হালকাভাবে কথাটা বলে কী ভাবল মেয়েটা, —এক কাজ করুন, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যান। ডান হাতের তিনটে দরজা ছেড়ে ফোর্থ ঘরটা দেখবেন, যদি তালা ঝোলে তো নেই।

ক্ষয়াটে উঁচু উঁচু ধাপ। নড়বড়ে রেলিং। সাবধানে উঠছিল অদিতি। ছোটমামা বলত, হেমেনদের বাড়ি দেখে মাথা ঘুরে যায়। ঘোরেই বটে। এই সিঁড়ির কথাই কি বলেছিল ছোটমামা !

চতুর্থ দরজার সামনে পৌঁছে বুকটা ফাঁকা হয়ে গেল অদিতির। তালাই ঝুলছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অদিতি তবু দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড।

এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এসেছেন পাশের ঘর থেকে, পিটপিট চোখে দেখছেন অদিতিকে।

অদিতি আমতা আমতা করে প্রশ্ন করল, —হেমেনমামা এই ঘরেই থাকেন তো ?

লোলচর্ম বৃদ্ধার দন্তহীন মুখে আরও খানিক ভাঙচুর, —কে মামা ? —হেমেন মল্লিক। —অ।

ঠাকুরপো এখন ভাগ্নিও জোটানো শুরু করেছে ! এতদিন তো হাঁটুর বয়সী সব ভাইদেরই দেখতাম ! বৃদ্ধার মুখে নিঃসীম অবজ্ঞা, —তা বাছা, সে তো নেই ।

—কখন ফিরবেন ? অদিতিও গলাটাকে একটু কড়া করেছে এবার ।

বৃদ্ধা আপাদমস্তক জরিপ করলেন অদিতিকে । তারপর হাত নেড়ে বললেন, —বলতে পারব না । সে কি কাউকে কিছু বলে যায় ?

—একটা খবর দিয়ে দিতে পারবেন ? বলবেন সেলিমপুর থেকে অদিতি মজুমদার এসেছিল ।

—পারব না । চিরকুট লিখে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে যাও ।

অদিতির বিষণ্ণ মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল, —পাশের ঘরে থাকেন, কথা শুনে মনে হচ্ছে বউদি, একটা খবর পর্যন্ত দিতে পারবেন না ?

—পাশের ঘরে থাকি বলে কি অপরাধ করেছি বাছা ? সে তো আমাদের সংসারের লোক নয় । বিভুঁই থেকে যখন ফিরল কত আদর করে বললাম, ঠাকুরপো তুমি আমাদের সংসারে থাকো, পেনশানের টাকা থেকে যা পারো দিও । দু মাস খেয়েই বাবু রাগ দেখিয়ে হোটেলে খাওয়া শুরু করলেন ! অমন লোকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী বাছা ! কাজের মধ্যে কাজ তো গুষ্টির পিণ্ডি লেখা, তাও তো শুনি নিজে এখন লেখে না, অন্যের জন্য কাগজ বার করে । এই ভাবে পেনশানের টাকাগুলো তুই ওড়াবি, আর আমরা কিছু বলতে পারব না ! লোকের পোঁদে টাকা উড়িয়ে কী অমন রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম হলি রে তুই ! আমরা বাছা থাকার ঠাঁই পাই না, বাবু একটা আস্ত ঘর বই খাতায় বোঝাই করে বসে আছেন ! মেজো তরফ সেজো তরফ তো তাক করে আছে কাকা মরলেই ঘরটা নেবে । আমার ছেলে বলে দিয়েছে ওটি হচ্ছে না । ছোটকাকার ঘরের ওপর আগে তার...

অদিতি ক্লান্ত পায়ে নেমে আসছিল । কী ক্রূর এক পরিবেশে বাস করে হেমেনমামা, অথচ এক বারও তাকে হাসিমুখ ছাড়া দেখা যায় না ! হেমেনমামা একা থাকে জানত অদিতি, কিন্তু এত একা ! আর এই সাহিত্যপ্রাণ মানুষটিকে অবলীলায় অপমান করে দিল সুপ্রতিম ! হেমেনমামা বলে আমার মধ্যে সেই তীব্র অনুভূতিটাই নেই অদিতি ! যা লিখেছি সব বড় জোলো মনে হয় ! তীব্র অনুভূতি কাকে বলে ? এই যে হেমেনমামা নিজের জীবনটাকেই জলাঞ্জলি দিয়ে লেখক গড়ার নেশায় মেতে উঠেছেন, এই নিঃস্বার্থ পিপাসাকে তবে কী বলা যায় ?

শীতের দুপুর দৌড়চ্ছে বিকেলের দিকে । হিমেল হাওয়া ঝাপটে আসে হঠাৎ হঠাৎ । রোদ্দুর বড় মলিন এখন । ম্রিয়মাণ ।

অদিতি বাড়ি ফিরছিল । এক অন্য অদিতি ।

ষোলো

শ্রীচরণেষু হেমেনমামা,

আপনার কাছে এই আমার প্রথম চিঠি । সম্ভবত এই শেষ । সুপ্রতিমের আচরণের কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য এ চিঠি লিখছি না । সুপ্রতিমের কাজের দায় সুপ্রতিমেরই, আমার নয় । এই চিঠি একান্তই আমার কথা ।

আপনি আমার জীবনে এসেছিলেন এক ধূমকেতুর মতো । দিব্যি আধো ঘুমে আধো জাগরণে জীবনটা কেটে যাচ্ছিল আমার, আপনি এসে সব তছনছ করে দিলেন । কেন আমার মধ্যে ভাবতে শেখার নেশাটা ঢুকিয়ে দিলেন হেমেনমামা ? আমার মতো এক অতি সাধারণ মেয়ে, বয়সের জন্য যাকে আপনি মহিলাও বলতে পারেন, তার তো জন্মই হয়েছে একটা খাতে বয়ে যাওয়ার জন্য । যেভাবে আরও আরও অসংখ্য মেয়েদের জীবন আদিগন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে । স্বামী সন্তান সংসার, দেখতে দেখতে এক সময়ে একা হয়ে যাওয়া, বার্ধক্যের প্রতীক্ষা, মৃত্যুর জন্য বসে থাকা । আমিও তো তিল তিল করে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম স্বামী আর ছেলেদের মধ্যে । জানতাম এটাই নিয়ম, এটাই আমার বেঁচে থাকা । কেন আপনি শেখালেন নিজেদের কুচি কুচি করে সংসারে

বিলিয়ে দিয়েও আরও কিছু পড়ে থাকে মেয়েদের ? কেন আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝালেন আমিও চেষ্টা করলে কিছু করতে পারি ? আমিও দিব্যি আপনার চক্করে পড়ে ভাবতে শুরু করলাম আমিও একটা আস্ত মানুষ। ভাবতে পারি। দেখতে পারি। লিখতে পারি। কী বোকামি, কী বোকামি ! ছেলেরা শিল্পী লেখক হতে গিয়ে যদি বোহেমিয়ান হয়ে যায়, সেও তো তাদের একটা গুণ, অথচ মেয়েরা লিখুক আঁকুক যাই করুক, তাদের কিন্তু থাকতে হবে এক লক্ষ্মণরেখার মধ্যে। সংসারের গণ্ডিটুকু আঁকড়ে ধরে। সেখানে কোনও বেচালপনা সহ্য করবে না কেউ। কেন যে আপনি কদিনের জন্য এ সব কথা ভুলিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে ! সুপ্রতিম একশো ভাগ পুরুষ, সে আমাকে ঠিক সময়ে সমঝে দিয়েছে কোথায় আমার সীমা।

একটা প্রশ্নের উত্তর শুধু ভীষণভাবে জানতে ইচ্ছে করে। অদিতি কে ? সুপ্রতিম মজুমদারের স্ত্রী ? পাপাই তাতাইয়েব মা ? তাদের প্রয়োজনটুকুর জন্যই কি অদিতির নারীজন্ম ? শুধু অদিতির কাছেই কি অদিতির কোনও অস্তিত্ব নেই ?

সময় আমার চলে গেছে হেমেনমামা। যেটা পাঁচে হওয়ার কথা, সেটা পঞ্চাশে আর জোর করে হয় না। হওয়াতে গেলে যে জটিলতা আসে তাকে কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা আমাদের মতো সাধারণ মহিলাদের নেই। দুপুর আমার আসবে, গড়িয়ে পারও হয়ে যাবে। আমার এক বন্ধু সুজাতা বলে সংসার হল গিয়ে দড়ির ওপর হাঁটা। আমার সামনের ফ্ল্যাটের এক বৃদ্ধা দিনরাত বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন, রোদ্দুর আলো বাতাসের গন্ধ নেন। পাশের ফ্ল্যাটের এক মহিলা সুযোগ পেলেই পরের ঘরের কেচ্ছা শোনায়। আশীর্বাদ করুন, আমিও যেন এদের মতোই এবারকার ভোঁতা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি।

আমি আর লিখব না হেমেনমামা। চেনা সংসারে অচেনা মানুষদের নিয়ে জীবন কাটানোই আমার নিয়তি। আপনি দূরে থাকুন, ভাল থাকুন।

কীসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে। প্যাসেজে। অদিতি কান পাতল। এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেল টিয়ার !

সুপ্রতিম অকাতরে ঘুমোচ্ছে। উষ্ণ লেপে নিজেকে পুরোপুরি মুড়ে। শীতের ভোরে এই ঘুমটা বড় প্রিয় সুপ্রতিমের।

অদিতি টেবিল ল্যাম্প নেবাল। পায়ে পায়ে বেরিয়ে এসেছে বন্ধ ঘর থেকে। কোত্থেকে এক চিলতে প্রভাতী কিরণ এসে পড়েছে অদিতির নিঝুম ফ্ল্যাটে। সেই আলোটুকুর দিকে তৃষ্ণার্ত চোখে তাকিয়ে আছে টিয়া। অস্ফুট স্বরে ডাকছে, কঁক কঁক।

অদিতির এতটুকু মায়া জাগল না পাখিটাকে দেখে। ব্যালকনির দরজা খুলল, ভাল করে গায়ে শাল জড়িয়ে খাঁচা নিয়ে এসেছে বাইরে।

সামনে এক নির্দয় শীতের ভোর, কুয়াশাহীন। আকাশে এখনও চাঁদ দেখা যায়, পাণ্ডুর এক ক্ষয়-রুগির মতো বিরাজ করছে একা একা। ভয়ানক ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে গেছে পৃথিবী।

অদিতি টিয়ার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল, —কীরে, ওড়ার শখ হচ্ছে ?

টিয়া আওয়াজ করল, —কঁক কঁক।

—ডানায় জোর আছে তোর ? উড়তে পারবি ?

টিয়া একটু নেচে উঠল, —কঁক কঁক।

অদিতি খাঁচার দরজা খুলল। ঝটকা টানে বার করল পাখিকে। সঙ্গে সঙ্গে কোমল উত্তাপ চারিয়ে গেছে শরীরে।

টিয়া ডেকে উঠল, —খুকু। খুকু।

অদিতি হিংস্র চোখে তাকাল, —খুকু মরে গেছে। তুইও মর্। বলেই পাখিটাকে ছুড়ে দিয়েছে গ্রিলের বাইরে।

ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পড়ছে পাখি। টলতে টলতে উড়ছে। ভূমির কাছে গিয়েও নিজেকে টেনে নিয়ে গেছে কার্নিশে।

অদিতি দাঁতে দাঁত ঘষল। বিড়বিড় করে বলল, —খাক্, তোকে বেড়ালে খাক্।

পাখি কি শুনতে পেল ? কার্নিশ ছেড়ে সাঁ করে উড়ে গেল সামনের ফ্ল্যাটের ছাদে, বসেছে টিভির অ্যান্টেনায়। দূর থেকে একবার ঘাড় ফেরাল অদিতির দিকে, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নেমে এল গুলমোহর গাছে। সেখান থেকে উড়ে যাচ্ছে আবার।

উড়ছে। উড়ছে। দেখতে দেখতে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল পাখি।

অদিতির শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। উড়ে গেল পাখিটা ! দুর্বল ডানা নিয়ে ! একি পাখিরই ক্ষমতা, নাকি মুক্তির সম্মোহনী টান !

পাখির গতিতে টেবিল থেকে চিঠিটা নিয়ে এল অদিতি। দু হাতে কুটি কুটি করে ছিঁড়ল। ভাসিয়ে দিল বাইরে।

এক অদিতি লক্ষ অদিতি হয়ে ভাসছে শূন্যে। ভাসছে।

ঢেউ আসে ঢেউ যায়

এক দিন দল বেঁধে

কামরা থেকে একটা একটা করে মালপত্র নামাচ্ছিল শুভ্র আর পল্লব। ব্যস্তসমস্ত মুখে। সতর্ক চোখে। একটু অসাবধান হলেই কে কোথায় কোন্ মাল নিয়ে চম্পট দেয় তার ঠিক কী! পুরী ধর্মস্থান বটে, তবে কে না জানে পুণ্যক্ষেত্রেই চোর ছ্যাঁচোড়ের উপদ্রব বেশি।

জগন্নাথ এক্সপ্রেস আজ ঘণ্টা দেড়েকের ওপর লেট। ভুবনেশ্বর অবধি ঠিকঠাকই চলছিল, খুর্দারোডে এসে খামোখা দাঁড়িয়ে রইল নিঝুম। ছাড়েই না, ছাড়েই না। যাও বা ছাড়ল বাকি পথ এল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। একটু থামে, একটু চলে, থামে....কোথায় সাড়ে পাঁচটায় ইন্ করে যাওয়ার কথা, সাতটা বাজিয়ে দিল!

মেয়েরা আগেই নেমে পড়েছে। জয়া মিত্রা বন্দনা তিন জনেরই চুল উশকো খুশকো, শাড়ির ভাঁজ এলোমেলো, বাসি মুখে আলগা ক্লান্তি। জয়ার গা ঘেঁষে টুটুল, ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিরীক্ষণ করছে চারদিক। সাড়ে তিন বছরের মেয়েটার চোখে অচেনা স্বপ্নরাজ্য দেখার বিস্ময়।

অবাক চোখেই টুটুল প্রশ্ন করল,—বাবা, ও বাবা, এটা কি পুরী?

অনুতোষ মাথার ওপর দু হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙছিল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল,—ইয়েস ম্যাডাম, আমরা পৌঁছে গেছি।

—যাহ্, এখানে সমুদ্র কোথায়?

—দূর বোকা, সমুদ্র কি স্টেশনে থাকে?

—তা হলে কোথায় আছে?

—আছে, নিজের জায়গাতেই আছে। অনুতোষ মেয়ের চুল ঘেঁটে দিল। এক্ষুনি দেখতে পাবি, আমরা স্টেশন থেকে বেরোই।

বাপ মেয়ের বকর বকর চলছে। মাল নামানোর পালা শেষ, এবার নেমেছে মধুময়। ঘাড়ে ইয়া এক কিটস ব্যাগ। প্ল্যাটফর্মে পা রেখেই সে ব্যাগ স্যুটকেসের পাহাড়ের দিকে তাকাল,—মোট কটা হল রে?

শুভ্র আঙুল চালিয়ে আরেক বার গুনে নিল,—নাইনটিন।

—তোরা মাত্র সওয়া ছ জন মানুষ, থাকবি মাত্র কটা দিন, তাতেই এত? মধুময় মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসল,—মাইরি, মেয়েছেলে সঙ্গে থাকা মানেই এক গাদা লাগেজ।

সঙ্গে সঙ্গে মধুময়ের কাঁধে পল্লবের চটাস থাপ্পড়,—এই এঁড়ে, মেয়েছেলে কী রে? এখনও ভাষাজ্ঞান হল না?

—যাহ্ বাবা, ভুল কী বললাম?

—শালা, লেবার তো লেবারই। মহিলা বা লেডিজ বলতে পারিস না?

—ও এই কথা! ঘাড়ে হাত বোলাল মধুময়,—সরি বস।

মিত্রার জিম্মায় গোটা চারেক ওয়াটার বটল। এখনও তলানি জল পড়ে আছে, রেল লাইনে ঢেলে ঢেলে শূন্য করল বোতলগুলো, গুছিয়ে নিচ্ছে কাঁধে। মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠল,—কথার কী ছিরি!

শুভ্র ফুট কাটল,—ভাষাজ্ঞান যেমনই হোক, খুব ভুল কথা কিন্তু মধু বলেনি। মেয়েরা সঙ্গে না থাকলে কত ঝাড়া হাত-পা থাকা যায়।

—তাই বুঝি? আমরা সঙ্গে থাকলে বুঝি বোঝা বাড়ে? জয়ার চোখে ছদ্ম কোপ।

—অফকোর্স। শুভ্র পল্লবকে চোখ টিপল,—আসল লাগেজ তো তোমারই। লিভিং লাগেজ।

—কী রে মিত্রা, চুপচাপ শুনে যাচ্ছিস, কিছু বলছিস না যে?

—বলতে দে, বলতে দে। মিত্রার ঠোঁটে আবার ভাঙচুর,—কে যে কার বোঝা তা যদি অত সহজেই

বোঝা যেত!

—আরেব্বাস পুলু, তোর বউ-এর তো দেখছি দিব্যি মুখ ফুটে গেছে। ক মাস এগজ্যাক্ট, পাঁচ মাস দশ দিন?

মালপত্র ঘিরে গুলতানি চলছে। কামরাটা একেবারে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে, স্টেশন থেকে বেরোতে বেশ খানিকটা পথ যেতে হবে। যাত্রীরা এগোচ্ছে যে যার মতো, এদিকটা প্রায় ফাঁকা হয়ে এল। পড়ে আছে শুধু পাণ্ডারা, কানের কাছে গুনগুন করছে। মন্ত্র পড়ার মতো। পল্লবরা কেউই তাদের কথা শুনছে না, তবুও তাদের নড়ার লক্ষণ নেই।

অনুতোষ কুলিদের সঙ্গে দরাদরি শুরু করল। তার কথাবার্তা হাঁটাচলা সবেতেই বেশ নেতা নেতা ভাব, ধমকে ধামকে নিজের দরেই রাজি করিয়ে ফেলল কুলিদের। ব্যাগ সুটকেস তাদের কাঁধে গুছিয়ে দিতে দিতে বলল,—চল্ চল্, হ্যা হ্যা হিহি পরে করিস।

সকালটা আজ ভারী মনোরম। সবে ফাল্গুন পড়েছে, বাতাসে এখন বসন্তের ঘ্রাণ। রোদও তেমন ওঠেনি এখনও। কচি সূর্য ঘুমভাঙা শিশুর মতো লেপটে আছে পুব আকাশে। আড়মোড়া ভাঙছে, হাই তুলছে, তাপ ছড়ানোয় মন নেই।

অনুতোষ কুলিদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল। পিছু পিছু বন্দনা। খানিক গিয়ে দাঁড়াল অনুতোষ, বন্দনাকে পাশে আসতে দিল, পাশাপাশি দ্রুত পায়ে হাঁটছে দুজনে।

পল্লব শুভ্রকে দেখাল দৃশ্যটা। হালকাভাবে বলল,—কী রে, তোর বউ যে দেখি এখনই অন্তর সঙ্গে সেঁটে গেল!

শুভ্র হাত ওলটাল,—তাই তো দেখছি। ট্রেন থেকে নেমেই লক্ষ্মী মেয়ের মতো শর্ত পালন শুরু করল। এদিকে জয়া আমার সঙ্গে শুধু ঝগড়াই করে চলেছে।

বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকা মধুময়ের ধাতে নেই। ফস করে সে স্বভাবসিদ্ধ নির্বোধ মন্তব্য করে বসল,—তুই যদি জয়াকে নিস, তা হলে তো শুধু মিত্রা পড়ে থাকে। মিত্রার তা হলে কী হবে?

—মানে?

—মানে আর কী! ও তো আর তোদের শর্ত মতো পল্লবের নয়। মিত্রা কি তবে আমার ভাগে পড়ল?

—খুব যে রে শালা। পল্লব আবার এক রদ্দা কষাল মধুময়ের কাঁধে,—খুব রস হয়েছে, আ্যাঁ?

শুভ্র ঠং করে একটা গাঁট্টা মারল,—তোর ভাগে কাকে রাখা হয়েছে জানিস না?

বন্ধুদের এ ধরনের চড় চাপড়ে মধুময় মোটামুটি অভ্যস্ত। সেই ছোটবেলা থেকেই সে শুভ্র পল্লবদের মজা আর হাতের সুখ করার খোরাক। এতে কি মধুময়ের মনে কোনও গ্লানি আছে? সে তো জানেই তার বুদ্ধি কম। সুতরাং বন্ধুদের সঙ্গ করতে গেলে এই ব্যবহার তো তার প্রাপ্যই।

নির্মল হেসে মধুময় প্রশ্ন করল,—কে রে? কে রে?

—টুটুল, আবার কে! যাহ্, ওকে কাঁধে তুলে নে।

টুটুলকে নিয়ে জয়া মিত্রা সামান্য পিছনে। শুভ্র পল্লবদের কথা বুঝি কিছু কানে গেছে তাদের। জয়া লঘুস্বরে কথা ছুড়ল,—অ্যাই, কী ব্যাপার বলুন তো?

মধুময়ই ঘাড় ঘোরাল,—কীসের কী ব্যাপার?

—ওই যে বন্দনা শর্ত মেনে চলছে...

—কীসের শর্ত?

—ওমা, তোমরা জান না? পল্লব শুভ্র বারণ করার আগেই মধুময় বলে উঠল,—ট্রেনে ওঠার আগেই তো ঠিক হয়ে গেছে, পুরী পৌঁছে বর বউ সব বদল হয়ে যাবে।

—মানে? জয়ার চোখ বড় বড় হল।

—মানে খুব সহজ ম্যাডাম। মধুময়কে থামিয়ে শুভ্র কাঁধ ঝাঁকাল,—আমরা ডিসাইড করেছি একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্য আনব। রোজই এক বউ, পানসে ব্যাপার।...মধুর অবশ্য শুধুই সমুদ্র দেখার কথা ছিল, এখন দেখছি ওরও প্রাণে পুলক জেগেছে।

টুটুল ছুট্টে এসে মধুময়ের হাত ধরল,—পুলক মানে কী গো মধুকাকা?

—তুই থাম। মেয়েকে আলগা ধমক দিয়ে খিলখিল হেসে উঠল জয়া,—প্ল্যানটা কার শুনি? আপনার?

—যদি বলি তোমার বরের?

—হতেই পারে না। আমার বর মোটেই আপনাদের মতো অসভ্য নয়।

—বটেই তো, বটেই তো। অন্তু একেবারে ভিজে বেড়ালটি।

—আর তুমি হলে গিয়ে চিত করা ভাজা মাছ।

পল্লবের ফোড়নে পায়রা ওড়ানো হাসি উঠল। জয়া হাসছে, মিত্রা হাসছে, এমনকী টুটুলও হাসছে কিছু না বুঝে। হাসতে হাসতেই সকলে প্ল্যাটফর্মের বাইরে।

পর পর চারটে রিকশায় তোলা হয়েছে মালপত্র। অনুতোষ আর বন্দনা নতুন করে মাল গুনে নিচ্ছে।

শুভ্র কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল,—এবার তা হলে কে কোন রিকশায় উঠবে ঠিক করো।

মিত্রা তড়িঘড়ি বলে উঠল,—আমি আর জয়া একটায় উঠছি।

—উঁহু, শুরুতেই প্ল্যান ভেস্তে দিয়ো না। পল্লব ফিচেল হাসল,—বন্দনা তো আগেই অন্তুকে বেছে নিয়েছে, এবার তোমাদের টার্ন।

বন্দনা থতমত মুখে সবার দিকে তাকাল,—ও আবার কী কথা? আমি আবার কখন কী বাছলাম?

শুভ্র দাঁতে ঠোঁট চেপে গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করল,—অন্তুকে তোমার পছন্দ নয় বলছ? বেশ তবে পুলু...নয়তো মধু...

সকলেই মুখ টিপে টিপে হাসছে। এমনকী অনুতোষও। বন্দনার কিছুই মাথায় ঢুকছিল না।

হঠাৎই সে খেপে গেল,—আমি একাই একটা রিকশায় যাব।

—আহা, চটছ কেন? অনুতোষের মুখে স্বভাবসুলভ নরম হাসি,—বুঝছ না, ওরা তোমার পেছনে লাগছে।

বন্দনা দুম করে সামনের রিকশাটায় উঠে বসল,—অমন ভালগার রসিকতা আমার ভাল লাগে না।

পলকে গোটা পরিবেশটাই বদলে গেছে। সবাই গম্ভীর, সবাই অন্যমনস্ক। যেন কেউই বন্দনার কথা শুনতে পায়নি এমন একটা ভান করছে সকলে। শুভ্র যে শুভ্র, যার মুখে সর্বদা কথার খই ফোটে, চটুল রসিকতা ছাড়া যে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না, তার মুখের হাসিটিও উধাও।

মধুময় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকাল এদিক ওদিক। আমতা আমতা করে বলল,—তা হলে আমি কি টুটুলকে নিয়ে একটা রিকশায় যাব?

মিত্রা রুক্ষ হল,—যা ইচ্ছে করুন। জয়া, তুই আমার সঙ্গে আয়।

কিঞ্চিৎ টালবাহানার পর চারটে রিকশাই ছাড়ল। টুটুলকে কোলে নিয়ে মধুময়, পাশে অনুতোষ, শুভ্র পল্লব চতুর্থ রিকশায়। স্টেশন চত্বর পেরিয়ে রিকশার মিছিল ঢুকে পড়ল পুরী শহরে। হু হু ছুটছে, বালি বালি পথ মাড়িয়ে। বাতাসে নোনা গন্ধ, বাড়ছে ক্রমশ।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চুয়িংগাম বার করে মুখে পুরল মিত্রা। জয়াকেও দিল একটা। ভুরু কুঁচকে বলল,—বন্দনাটা হঠাৎ অমন রেগে গেল কেন বল তো?

—ও এই রকমই। জয়া যেন সামান্য উদাস।

—বেশি বেশি। সবাই বুঝতে পারছে একটা ঠাট্টা ইয়ার্কির ব্যাপার চলছে...আননেসেসারি সিন ক্রিয়েট করার কোনও মানে হয়!

—বোধহয় শুভ্রদার সঙ্গে কিছু গণ্ডগোল চলছে। আজকাল কেউ কিছু বললেই...বিশেষ করে শুভ্রদা...। দেখলি না, কাল ট্রেনে কী করল? সামান্য চাদর পাতা নিয়ে কী অশান্তি!

—টুউউ মাচ। নিজেদের মধ্যে যা থাকে থাকুক, একসঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে ওরকম করবে কেন?

—অথচ তুই শুভ্রদাকে দ্যাখ। ওই মানুষটাও তো কত অসুখী, তবু মুখে হাসি কিন্তু লেগেই আছে।

—সত্যি, শুভ্রদার মতো দিলখোলা মানুষের সঙ্গে বন্দনাকে একটুও মানায় না। ...কী নিয়ে ওদের গণ্ডগোল বল তো?

—বুঝি না। মনে হয় ছেলেপুলে হয়নি তাই...

—শুধু ওই কারণে?

—শুধু বলছিস কী রে? ছ বছর হল ওদের বিয়ে হয়েছে। আমাদেরও আগে।

—সো হোয়াট? এখনও এমন কিছু বয়স হয়নি। আজকাল কত রকম ট্রিটমেন্ট হচ্ছে...মিত্রা কচকচ চুয়িংগাম চিবোল,—আমার ধারণা অন্য কোনও কেস আছে।

—কী রকম?

—সে আমি কী করে বলব?

—তা হলে বললি কেন হঠাৎ?

—না... মানে মনে হল...

—উঁহু, নিশ্চয়ই পল্লবদা তোকে কিছু বলেছে!

—না না, কী বলবে? এ সব নিয়ে আমাকে ও কিছুই বলতে চায় না। জিজ্ঞেস করলেই চটে যায়। বলে পি এন পি সি ছাড়ো।

কথা বলতে বলতেই কখন যেন এসে পড়েছে সমুদ্র। নীল বঙ্গোপসাগরের সফেন গর্জন বাড়ছে ক্রমশ, বাড়ছে।

স্বর্গদ্বার এসে গেল।

সামনেই হোটেল। ব্লু লেগুন।

আনমনে জয়া

ভাগ্যিস তিনখানা ঘর পাশাপাশি ঠিক করাই ছিল। এখন অবশ্য ভিড়ের সময় নয়। স্কুলকলেজের পরীক্ষা চলছে, অফিস কাছারিতেও তেমন ছুটিছাটা নেই, তবু আগে থেকে বুক না করলে এমন সুন্দর ঘর কি পাওয়া যেত? দোতলায় তিনটে ঘরের সামনেই এক টুকরো করে ব্যালকনি, দাঁড়ালেই মাতাল সমুদ্র একেবারে মুখোমুখি। নীলাভ সবুজ জলে উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়িয়ে সম্রাটের মতো মাথার ওপর দাঁড়িয়ে সূর্য, হিরের কুচি মেখে ঝিকমিক করছে জল, বালি, আকাশ পৃথিবী। ভেজা বাতাসের ঝাপটানিতেও কী বিবশ মাদকতা। ঘরের আসবাব অল্প ক্ষয়া বটে, বিছানা টিছানা স্যাঁতসেঁতে... কী এসে যায়? সমুদ্রের কাছে এসে তার নোনা স্বাদ গায়ে মাখব না?

উফ, কী ভাল যে লাগছে! কত দিন পর আবার পুরী এলাম!

এখানে আসা ঠিকঠাক হওয়ার পর শুভ্রদা বলেছিল,—আবার আলাদা আলাদা ঘর কেন? একটাই সিক্সড বেডেড রুম নিলে হয় না?

সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়েছে অনুতোষ,—ঠিকই তো। একসঙ্গে বেড়াতে বেরোচ্ছি, কেউ তো আর হানিমুনে যাচ্ছি না।

শুভ্রদা বিশ্বফাজিল, এরকম প্রস্তাব দেওয়া তাকে মানায়। কিন্তু অনুতোষ কী করে যে বলেছিল কথাটা! ওভাবে কখনও সবাই মিলে শোওয়া বসা করা যায়? মেয়েদের কত রকম অসুবিধে থাকে না?

ভাগ্যিস তখন জোর গলায় আপত্তি জানিয়েছিলাম,—উঁহু, অন্তত দুটো ঘর নাও।

মিত্রাও বলল,—হ্যাঁ, একটা মেয়েদের, একটা ছেলেদের।

বন্দনা হাঁ হাঁ করে উঠেছিল,—পাগল হয়েছিস? এদের এখনও চিনিস না? আমরা একটা ঘরে থাকলে সারা রাত ওরা তাণ্ডব চালাবে।

শুনেই পল্লবদার হা হা হাসি,—ওটা তোমাদের অজুহাত। আসলে তোমরাই আলাদা ঘরে থাকতে ভয় পাও। ইউ নিড সাম মেল কেয়ার। অ্যাট লিস্ট ডিওরিং নাইট। যখন কোনও অচেনা মাতাল এসে দরজায় দুম দুম ধাক্কা মারবে...

ব্যাস, ওমনি শুভ্রদার ফোড়ন,—চেনা মাতাল ধাক্কা দিলে অবশ্য তোমাদের ভয় নেই...

যখন এ সব কথা হচ্ছিল, তখন অবশ্য মধুদার আসার কোনও ঠিক ছিল না। একদম শেষ মুহূর্তে মধুদাকে নেওয়া হল। অসুবিধে হল একটু, সামান্য ছিটকে গেল মধুদা। সিঙ্গল রুম পেয়েছে, একতলায়, একটু ভেতর দিকে।

অনুতোষ এখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আয়েসি মানুষ বটে একটা, খাওয়া দাওয়ার পর দু মিনিটও গেল না, সোজা ঝাঁপ দিয়েছে বিছানায়। সকালে সমুদ্রে যেতেই চাইছিল না, শেষ পর্যন্ত অবশ্য শুভ্রদার পীড়াপীড়িতে গাত্রোত্থান করল। বেড়াতে এসেও দলছুট হয়ে আলস্য দেখানো কী ধরনের ঢঙ কে জানে!

বন্দনা মিত্রারা এখন যে যার নিজের ঘরে। ঘুমোচ্ছে কি? যা হুড়দুম সব করেছে আজ সমুদ্রে, নিশ্চয়ই ক্লান্ত এখন। সমুদ্রস্নানের একটা ফল তো হয়েছেই, বন্দনার রাগটা একদম পড়ে গেছে। অনুতোষের হাত ধরে যখন জলে নেমে গেল, বেশ হাসিখুশিই দেখাচ্ছিল। মেয়েটা যেন কেমন কেমন! খুব অহংকারী কি? কীসের দেমাক? রূপসী বলে? আমিই বা কী এমন খেদিবুঁচি! বেশি পড়াশুনো করেছে বলে? চাকরি করে বলে? আহা, আজকাল ওরকম এম. এ. পাশ ঘরে ঘরে গড়াগড়ি যায়। চাকরি তো জয়াও করতে পারত, টালিগঞ্জ গার্লস স্কুলে ইন্টারভিউও দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, নেহাত টুটুল পেটে এসে গেল...।

টুটুলটা এসেই মধুদার সঙ্গে একেবারে সেঁটে গেছে। খুব ভাব দুজনের। এখনও মেয়ে মধুদার ঘরেই। অনুতোষ বলে মধুটাব আই. কিউ. কম তো, টুটুলের সঙ্গে ওর ওয়েভলেঙথ্ মেলে। সে যাই হোক, সারাক্ষণ গায়ে লেপটে থাকছে না, ম্যা ম্যা করে ঘ্যানঘ্যান করছে না, আমি বাবা নিশ্চিন্ত। মধুকাকুই এখনও ওর হিরো। কাঁধে করে সমুদ্রের অনেক ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল...। লুডোর বোর্ড নিয়ে তো গেল, খেলছে কি এখন? নাকি ঘুমিয়ে পড়ল? বেয়ারাকে ডেকে একটু পরে মধুদার ঘরে মুসম্বিগুলো পাঠিয়ে দিতে হবে।

ব্যালকনিতে দুটো চেয়ার। বেতের। বেঁটে বেঁটে। একটু বসি এখানে। আহ, সমুদ্র কী সুন্দর হাওয়া পাঠাচ্ছে। বাষ্পমাখা, নরম নরম। ফাল্গুনের রোদকেও যেন আর তত কড়া লাগে না।

সকালের কথা মনে পড়ছে বার বার। কাঁটা দিচ্ছে শরীরে। ছি ছি, এমন কেন হচ্ছে? অনুতোষ জানতে পারলে কী ভাববে?

ইস, সমুদ্রের ঢেউগুলো কী ভীষণ দুরন্ত। অবিরাম নাচতে নাচতে আছড়ে পড়ছে তীরের বুকে। ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, মাতামাতি চলছে তো চলছেই। যত দূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। সবজে নীল রং ঘন হতে হতে আকাশের কাছাকাছি পৌঁছে গাঢ় নীল। দিগন্তে এমনধারা হয় না, কেমন যেন ঘোলাটে ভাব থাকে। মাঝসাগরে কোনও কোনও শান্ত ঢেউ-এর মাথায় মুক্তোর মতো ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে ধবধবে ফেনা। জেলেদের নৌকোগুলো কালো বিন্দু। ডুবছে, ভাসছে, আবার ডুবছে। মনে হয় যেন তুলিতে আঁকা ছবি।

হাই উঠছে। অনুতোষের পাশে গিয়ে একটু গড়িয়ে নিলে হয়। থাক, এখানেই বসে থাকতে ভাল লাগছে বেশি। নয় এখানে বসেই ঢুলি।

আড়চোখে একবার দেখলাম অনুতোষকে। কী নির্লিপ্ত সুখে ঘুমোয় মানুষটা! জেগে যখন থাকে তখনও কি বদলায়? আশ্চর্য, পাঁচ বছরের ওপর বিয়ে হয়েছে, এখনও যেন অনুতোষের মনের তল পাওয়া গেল না। বড্ড বেশি শান্ত, বড় বেশি চুপচাপ। শাশুড়ি বলেন, ছোটবেলা থেকেই নাকি এরকম। নিজের মধ্যে ডুবে থাকা মানুষ। দুটো-চারটে কলেজের ছাত্রছাত্রী যা আসে বাড়িতে, তাদের কথাও তো কানে আসে! এই, আস্তে কথা বল, এ আর সি বিরক্ত হবে! এই এত শব্দ করে হাসছিস কেন, এ আর সি খচে যাবে! অর্থাৎ কলেজেও অনুতোষের একই চেহারা। হোক না আমার সবথেকে কাছের লোক, এমন মানুষের সঙ্গে বাপু প্রাণ খুলে মেশা যায় না, কেমন যেন বাধ বাধ লাগে। অন্তত আমার মতো বকবক যষ্ঠীর। হাসির কথা শুনলে হেসে লুটোপুটি খাব, হইচই করব, এর পিছনে লাগব, তার পিছনে লাগব, এই না হলে বেঁচে থাকা? ঘরের মানুষটিও অমনটা না হলে ভাল লাগে? অনুতোষ কেন যে পল্লবদা শুভ্রদাদের মতো হল না?

মানুষটার ভেতরে কি কোনও উচ্ছ্বাস নেই? উঁহু, তা তো বাপু নয়। দুটো-চারটে বিরল মুহূর্তে অনুতোষ কী অসম্ভব বদলে যায়, তা কি দেখিনি আমি? বেতলাব জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে সেবার কী বৃষ্টি! মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি বিছানা ফাঁকা। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। ও হরি, বাবু বাংলোর হাতায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারে একা একা ভিজছেন। আমি ডাকতেই মুখে ধরা পড়ে যাওয়া হাসি, সঙ্গে সঙ্গে

আহ্বান,—এসো না, একসঙ্গে ভিজি দুজনে। খুব খুব ভাল লেগেছিল সেদিন অনুতোষকে। কেন যে অনুতোষ সবসময়ে ওরকম থাকে না।

আবার সমুদ্রস্নানের কথা মনে পড়ে কেন? সমুদ্রে নামার আগে মেয়েরা সবাই সালোয়ার কামিজ পরে নিয়েছিলাম, ছেলেরা সুইমিং কস্টিউম। আর মধুদা ঢোল্লা এক হাফপ্যান্ট। মধুদাকে কী চাঁটান চাঁটাচ্ছিল পল্লবদারা। আহা রে, ভালমানুষ বলে মধুদাকে নিয়ে সকলে যা করে! নেহাত সহজ সোজা মন বলে হাসিমুখে সব সহ্য করে নেয়, অন্য কেউ হলে রেগে ফায়ার হয়ে যেত।

মধুদার স্নানের পোশাক নিয়ে ঠাট্টা মশকরার পর পল্লবদা দুম করে আমায় নিয়ে পড়ল,—ফ্যান্টাস্টিক! দারুণ দেখাচ্ছে তোমায়! একেবারে মনীষা কৈরালা!

আমি লজ্জায় মরে যাই। বিয়ের পর থেকে সালোয়ার কামিজ আর পরিই না, নেহাত সমুদ্রে শাড়ি সামলানো যাবে না বলেই...।

বললাম,—অ্যাই মশাই, আমায় গ্যাস দিচ্ছেন কেন? নিজের বউকে দেখুন।

পল্লবদা ভুরু কুঁচকোল,—কার কথা বলছ?

—ন্যাকামি করবেন না। চোরা চোখে তো দেখছেন মিত্রাকে।

—ও আর এখন আমার বউ নয় ম্যাডাম, ও শুভ্রর বউ।

—ফের ওই ফাজলামো?

পাশ থেকে মধুদা ফস করে বলে উঠল,—তোরা কিন্তু আমার সঙ্গে বিক্লাসি করলি। আমার প্রাপ্য ছিল মিত্রা, টুটুল নয়।

শুনেই মিত্রা যা মুখ বেঁকাল! বন্দনাও কটকট করে তাকাল মধুদার দিকে। ওরা মধুদাকে একটুও সহ্য করতে পারে না। বেচারা বোকাসোকা মানুষ, কোথায় কী বলতে হয় জানে না, বন্ধুদের চপলতা দেখে নিজেরও তো একটু রঙ্গরসিকতা করার সাধ জাগতে পারে। বন্দনা মিত্রা কিছুতেই কথাটা বুঝতে চায় না। অনুতোষেরও বলিহারি, এদের মধ্যে কী দরকার ছিল মধুদাকে টেনে আনার?

হোটেল থেকে বেরিয়ে ছেলেরা আগে গেল ট্র্যাভেল এজেন্টের অফিসে, কবে কোনার্ক যাওয়ার বুকিং পাওয়া যায় দেখতে। আমরা তিন সখী চললাম সমুদ্রের পানে। বালির ঢাল বেয়ে নামতেই জল এসে ছুঁল পা। একটার পর একটা ঢেউ এসে ফেনার মুকুট খুলে রাখছিল পায়ের কাছে। কী অসহ্য সুখের অনুভূতি! মিত্রা আর বন্দনা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। ক্ষণে ক্ষণে দামাল বাতাস এসে এলোপাতাড়ি জড়িয়ে ধরছে ওদের, চুল টুল সব উড়ে একশা।

আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম,—আহ মারভেলাস। আমি আর এখান থেকে ফিরব না রে, সমুদ্রেই থেকে যাব।

বন্দনা এগিয়ে আসতে আসতে বলল,—দূর, সমুদ্র বড় বোরিং। আই লাভ মাউনটেন।

—কী যে বলিস! পাহাড়ের এরকম লাইফ আছে? সমুদ্র অনেক বেশি সুন্দর।

মিত্রা অত শত তর্কে গেল না। আপোসের সুরে বলল,—আমার ভাই পাহাড় সমুদ্র দুটোই খুব প্রিয়।

হঠাৎই কোত্থেকে একটা বড়সড় ঢেউ দৌড়ে এল কাছে, দ্যাখ না দ্যাখ ছিটকে ফেলে দিয়েছে আমাদের। তিন জনই ভেজা বালিতে বেসামাল।

কোথায় খুশিতে পাগল হয়ে যাবে তা নয়, পিছিয়ে শুকনো বালিতে যেতে যেতে বন্দনা গজগজ করে উঠল,—এই জন্যই আমার সমুদ্রের কাছে আসতে ভাল লাগে না।

মিত্রা চোখ টিপে বলল,—কেন রে, ঢেউগুলো কি বেশি ইনকুইজিটিভ?

বন্দনার মুখ হাঁড়ি। আমি বন্দনাকে টানলাম জলের দিকে,—আয় না, এখানে বসে থাকবি।

বন্দনা হাত ছাড়িয়ে নিল,—ছাড় ছাড়, আমার ভাল লাগে না। ঢেউগুলো অত্যন্ত ভালগার।

বন্দনার সালোয়ার তখন হাঁটু অবধি ভেজা। বেচারা জানে না, সে সময়ে ওকে কী সুন্দর লাগছিল। সত্যি, বন্দনা হিংসে করার মতো সুন্দরী। মিত্রার রং খুব ফর্সা, ফিগারটাও চোখা, একটু অবাঙালি ধরনের, কিন্তু মুখচোখে তেমন শ্রী নেই। হয়তো মিত্রা পাশে ছিল বলেই বন্দনাকে আরও বেশি সুন্দর

লাগছিল।

বন্দনার ভিতু ভিতু বিরক্ত মুখ দেখে মজাও লাগছিল আমার। আবার হাত ধরে টানলাম।

বন্দনা খেঁকিয়ে উঠল,—তোর ভাল্লাগে তুই যা না, আমায় টানছিস কেন?

—মর গে যা। তুই পাহাড়ে গিয়েই মর। জলে পা ডোবালাম আমি। হালকা শ্লেষ ছুড়লাম,—বেরসিকের ডিম একটা। ঠিক আমার বরের মতো।

শেষের কথাটা যেন শুনতেই পেল না বন্দনা। উদাসভাবে বলল,—পাহাড়ে গিয়ে মরাও সুখের। পাহাড় কী শান্ত! ধ্যানগম্ভীর। আহ, যেন রূপবান এক বলিষ্ঠ পুরুষ!

—রূপবান না হাতি। পাহাড়কে আমার গোমড়ামুখো হুঁকোমুখো হ্যাংলা বলে মনে হয়। সমুদ্রের উচ্ছ্বাস তুই পাহাড়ে কোথায় পাবি?

মিত্রা আমার দিকে আঙুল তুলল,—তুই তা হলে উচ্ছলতা ভালবাসিস? বন্দনার দিকে তর্জনী হেলাল,—আর তোর পছন্দ গাম্ভীর্য? বলেই খিলখিল হেসে উঠল,—ওদের কথা মতো তোরা তা হলে বদলাবদলিটা করেই ফ্যাল না। পারমানেন্টলি।

ভাগ্যিস তক্ষুনি ছেলেরা এসে গেল, নইলে বন্দনা হয়তো দৃষ্টি দিয়েই মিত্রাকে কাঁচা খেয়ে ফেলত!

পল্লবদা ঢেউ-এ আলগা লাথি মারতে মারতে এগিয়ে এল,—এখনও এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছ তোমরা? জলে নামোনি?

আমি ঠোঁট ফোলালাম,—দেখুন না, এই মেয়ে দুটো একেবারে ভিতুর ডিম, নামতেই চাইছে না।

—ইস, আমি মোটেই ভয় পাই না। মিত্রা চোখ ঘোরাল,—একা নামিনি, পাছে কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়। যা জলের ধাক্কা! দিঘায় একবার একা নেমে যা জোর আছাড় খেয়েছিলাম। পুরো তিন দিন পিঠে ব্যথা ছিল।

—এবার তোমার কোনও ভয় নেই। শুভ্রদা মিত্রার হাত ধরে তবতর জলে নেমে গেল,—আমি এবার তোমার পার্টনার আছি, প্রাণ থাকতে চোট লাগতে দেব না। আই প্রমিস।

মিত্রার কী হি হি হাসি!

টুটুল বাবার পাশে ছিল। একবার দৌড়ে গিয়ে জলে পা ছুঁইয়েই ঢেউ-এর সঙ্গে সঙ্গে তীর বেগে পালিয়ে আসছে পাড়ে। আবার এগোচ্ছে পাঁচ পা, তো দশ পা পিছোচ্ছে। মধুদা টুটুলকে কোলপাঁজা করে তুলে নিল,—কী রে, যাবি ভেতরে?

টুটুল মধুদার গলা আঁকড়ে ধরল,—যাব যাব যাব।

বন্দনা হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়ল,—যা বাবা যা, তোরা প্রাণের সুখে জল খেয়ে মর। আমি একটু সূর্যস্নান করি।

শুনে অনুতোষ বলল,—সে কী, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? চলো, তুমিও নামবে।

—না না, আমার ভীষণ ভয় করে।

অদ্ভুত মেয়ে, যেই ছেলেরা এল অমনি আর সমুদ্রকে বিশ্রী লাগার কথা বলছে না, ভয়ের দোহাই দিচ্ছে!

অনুতোষ তোয়ালেগুলো শুকনো বালিতে গুছিয়ে রেখে চশমা খুলল,—কীসের ভয়? এসো আমার সঙ্গে।

আশ্চর্য, বন্দনা উঠে দাঁড়াল! মুখে গদগদ ভাব,—আমি কিন্তু বেশি দূর যাব না।

বলল বটে, কিন্তু অনুতোষের হাত ধরে কত দূর চলে গেছে! বুকটা আমার ভার হয়ে যাচ্ছিল! অনুতোষ কি এসে আমাকে ডাকতে পারত না? ও তো জানে আমি কতটা সমুদ্র ভালবাসি!

সবাই নেমে গেছে জলে। আমি শুধু তীরে একা। একাই যেতে পারি, কিন্তু ইচ্ছে করছে না। অভিমান হচ্ছিল সমুদ্রের ওপর। হাস্যকর অভিমান। সমুদ্র কি এক সামান্য মানবীর অভিমান টের পায়?

হয়তো পায়। না হলে ঠিক তখনই পল্লবদা জলে নেমেও উঠে আসবে কেন?

—অ্যাই, তুমি দাঁড়িয়ে? চলো চলো।

পল্লবদার সঙ্গে জলে যেতে যেতে অদ্ভুতভাবে মনটা বদলে যাচ্ছিল আমার। একবার দেখলাম বন্দনা অনুতোষকে, মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছি পল্লবদার হাত।

বললাম,—আমরা পাড়ের এত কাছে থাকব না। চলুন দূরে যাই, অনেকটা দূরে।

পল্লবদার হাতটা কী সবল! সত্যিকারের পুরুষের হাত বুঝি এমনই হয়। ঢেউ এলেই কী করতে হবে আমায় শিখিয়ে দিচ্ছে পল্লবদা। কখনও কাঁধে ধরে আমায় তুলে দিচ্ছে ঢেউ-এর মাথায়, কখনও বা একসঙ্গে ডুব দিচ্ছি আমরা। পলকের জন্য বেসামাল হলেই পল্লবদা ধরে নিচ্ছে আমায়, আগলে রাখছে। বড় ঢেউ এলেই বলছে, লাফাও! পায়ের তলা থেকে সর সর সরে যাচ্ছে বালি, নাকে চোখে মুখে নোনা জলের ঝাপটা, আছড়ে পড়া ঢেউ জাপটে ধরছে আমাদের দুজনকে।

অনুতোষ কি ঠিক ওই সময়ে দেখেছে আমাদের? আমি অন্তত তাকাইনি। কী দেখব? বন্দনার আহ্লাদি মুখ? তার চেয়ে পল্লবদার সঙ্গে অশান্ত উন্মাদনায় ডোবা ভাসার খেলাটা ঢের ঢের ভাল। পল্লবদার হাত কি একটু বেশি চঞ্চল ছিল তখন?

ভাবতেই গায়ে আবার পদ্মকাঁটা। ছি ছি, এ সব কী চিন্তা! অনুতোষ যেমনই হোক, ওকে ছাড়া অন্য কাউকে মনে আনাও পাপ। অনুতোষের দোষই বা কী? শুভ্রদাকে নিয়ে সুখী নয় বলে বন্দনা যদি নির্লজ্জের মতো গায়ে পড়ে, কতক্ষণ আর নিজেকে সামলে রাখবে? হাজার হোক পুরুষের মন, অমন একটা মেনকা রম্ভা গোছের মেয়ে ঢলাঢলি করলে মতিভ্রম হতেই পারে।

না। অনুতোষকে ছাড়া আর সমুদ্রে নামা নেই। শত্রুরা বদলা বদলি করুক, আমার বর আমারই থাক। এক্ষুনি আমি অনুতোষকে জাগাব, জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে অস্থির করে তুলব। বলব,—আদর করো আমায়। ভালবাসো, শুধু আমাকেই ভালবাসো।

আহ্, ঘুম ভাঙে না কেন? এ যে কুম্ভকর্ণের জ্যাঠা।

কপোত কপোতী যথা

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর আড্ডা চলছিল আমাদের। শুভ্রর ঘরে। মেয়েরা কেউ ছিল না, নিশ্চিন্তে কথা বলা যাচ্ছিল। ট্যুরের হিসেবপত্র মেয়েদের সামনে করার শতেক বখেড়া। কবে কোথায় যাওয়া হবে তা নিয়ে আলোচনা করারও ঝঞ্ঝাট অনেক, কিছুতেই মেয়েরা একমত হবে না। মাঝখান থেকে হয়তো এর সঙ্গে ওর মন কষাকষি—বিচ্ছিরি ব্যাপার। কোনার্ক যাওয়া তো ঠিকই হয়ে আছে, অন্তু চিল্কার কথা তুলছিল। গেলে হয়! মিত্রারও খুব চিল্কা দেখার শখ। তবে গিয়েই ফিরে আসার কোনও মানে হয় না, একটা দুটো দিন ওখানকার রেস্ট হাউসে থাকতে হবে! পকেট কি অত পারমিট করবে? শুভ্র অন্তুর কী এসে যায়! এ ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার, ও কলেজের প্রফেসার, ফ্যাট স্যালারি পাচ্ছে...। আর মধুর তো চিন্তাই নেই। এসেছে অন্তুর ঘাড়ে চেপে, অন্তু যদি ওকে বঙ্গোপসাগরের নীচেও নিয়ে যায়, সেখানেই চলে যাবে। নাহ্, আমার মতো প্রাইভেট কোম্পানির পেটি চাকুরের অত শখ মানায় না। যাক গে, এখন পুরী কোনার্কই ভাল। পরে যদি কোনওদিন সুযোগ সুবিধে হয়... চিল্কা তো আর পালাচ্ছে না।

একটু আগেও লোডশেডিং ছিল, মিনিট দশেক হল কারেন্ট এসেছে। কী ঘন ঘন এখানে বিদ্যুৎ যায় রে বাবা! যতক্ষণ সমুদ্রের ধারে বসেছিলাম, গোটা শহরটাই অন্ধকারে ডুবে ছিল। যেন ভূতনগর। এখনও ভোল্টেজের কী ছিরি! বালবটা জ্বলছে দ্যাখো, যেন মোমবাতি!

মিত্রা খাওয়া দাওয়ার পরই ঘরে এসে টানটান শুয়ে পড়েছে বিছানায়। ফর্সা লম্বা শরীরটা নীল চাদরের ওপর রজনীগন্ধার ডাঁটি হয়ে পড়ে আছে। খাটের গা বেয়ে ঝুলছে মোটা বেণী। বেণী, না সাপিনী? সকালে অতক্ষণ সমুদ্রে দাপাদাপি করে হালকা একটা লাল আভা ফুটেছে মিত্রার ফোলা ফোলা গালে, ঠোঁট দুটো যেন কমলালেবুর কোয়া।

—কী দেখছ? মিত্রা চোখ খুলেছে।

—কতক্ষণ পর আবার তোমায় একলা পাওয়া গেল। অজান্তেই আমার ঠোঁট নেমে এল মিত্রার ঠোঁটের ওপর।

চুম্বনটাকে গ্রহণ করল মিত্রা। মুখ টিপে বলল,—আমিও তো কতক্ষণ পর তোমায় একলা পেলাম।

বুকের নীচে তুলতুলে নারী শরীর, তবু কেন বুক চিনচিন? বিয়ের পর মিত্রাকে নিয়ে সেভাবে হানিমুনে যাওয়া হয়নি। শালা, মালিক ছুটিই দেয় না। সাত দিন কোথাও গেলে ব্যাটা সাতশো টাকা কেটে নিত। বিয়ের জন্য পাঁচ দিন ছুটি দিয়েছিল বলে ঠারেঠোরে কম কথা শুনিয়েছে। এবার কত কষ্টে পটিয়ে পাটিয়ে...। আচ্ছা, এইটাই কি আমাদের হানিমুন? ভেবে নিলেই হয়।

ধুর, এই হাটের মধ্যে কি মধুচন্দ্রিমা হয়? বউকে নিয়ে একটু একান্ত হলেই চারদিক থেকে আওয়াজ আসবে। সন্ধেবেলা সমুদ্রের ধারে কী ইচ্ছেই না করছিল মিত্রা শুধু আমারই পাশে এসে বসুক। অন্ধকারে বালির ওপর গাঢ় নীল সমুদ্রকে সামনে রেখে ঘন হয়ে বসে থাকব আমরা, মিত্রার রেশমি মাথা থাকবে আমার কাঁধে, গুনগুন গান গাইবে মিত্রা, সমুদ্রের শব্দ আর মিত্রার গুঞ্জন মিলে মিশে এক হয়ে যাবে...

—কী ভাবছ? মিত্রা আলগা টোকা দিল গালে।

—ভাবছি ওদের সঙ্গে না এসে পরে শুধু দুজনে এলে অনেক ভাল হত। সমুদ্রকে চালচিত্র করে তোমায় নতুন করে দেখতাম।

—কাব্য হচ্ছে। তুমিই না বন্ধুদের সঙ্গে আসতে বেশি ব্যস্ত হয়েছিলে?

আহা, সে কি সাধ করে? কে না জানে, বিয়ের পর প্রথম সমুদ্র ভ্রমণ শুধু বউকে নিয়েই করা উচিত! কিন্তু দল বেঁধে আসার সুবিধেটাও তো কম নয়। টাকাও বাঁচে, বেড়ানোটাও হয়ে যায়।

মিত্রার কি এ নিয়ে কোনও ক্ষোভ আছে? থাকতেই পারে, নতুন বউ বলে কথা।

মন বোঝার জন্যই হালকা গলায় বললাম,—সবার সঙ্গে এসে তোমার ভাল লাগছে না, না?

—তা নয়। তবু শুধু তুমি আমি এলে আরও ভাল লাগত।

আরেকটু কাছে টানলাম মিত্রাকে—জানো, কলেজে পড়ার সময়ে আমরা তিন বন্ধু খুউব বেড়াতাম। মধুও থাকত আমাদের সঙ্গে, কখনও সখনও। তখনই ঠিক করেছিলাম, যে সব জায়গায় বেড়াচ্ছি, বিয়ের পর সবাই মিলে বউদের নিয়েও সে সব জায়গায় যাব আমরা। অন্তত এক বার। তা মধুটার তো বিয়ে টিয়ের কোনও চান্স নেই...

মধুময়ের নাম শুনেই মিত্রার মুখ ভেঙেচুরে গেল,—ওই ক্যাবলাটাকে কেন তোমরা সঙ্গে এনেছ বলো তো?

—কেন? কী হল?

—ইডিয়টের মতো কথা বলে। ভাব দেখায় যেন কিচ্ছু বোঝে না, ওদিকে কী ড্যাবড্যাব করে তাকায়...

—না না, ভুল করছ। মিত্রার চুল ঘেঁটে দিলাম,—ওর চোখটাই ওরকম, একটু ড্যাবাড্যাবা।

—কচু পোড়া। ও একটি বজ্জাতের ধাড়ি।

এ কী ভাষা মিত্রার। মধু যেমনই হোক, সে আমার বন্ধু, তার সম্পর্কে উলটোপালটা মন্তব্য করা মিত্রার মোটেই উচিত নয়। বেচারা কত অভাগা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিটা ঠিক বেড়ে ওঠেনি। ছোটবেলায় কী একটা কঠিন অসুখ হয়েছিল মধুর, টাইফয়েড মেনিনজাইটিস ধরনের, বেশি দূর লেখাপড়া করতে পারেনি, পাড়ার কাছে একটা পেনের কারখানায় লেবারের চাকরি করে। ওই অসুখই হাত ধরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। মাথা নেই ঠিক, তবে ভয়ানক দৈহিক পরিশ্রম করতে পারে মধু। বন্ধুবান্ধবদের যাবতীয় ফাইফরমাশ মধুই খেটে দেয়। ওর পিছনে লেগে হয়তো মজা পাই আমরা, কিন্তু ভালও তো বাসি। ভালবাসার দায় মিত্রার না থাক, করুণা তো করতে পারে।

ঠাণ্ডা গলায় বললাম,—শোনো, তুমি মধুর সম্পর্কে যা ইঙ্গিত করছ তা কিন্তু সত্যি নয়।

—থামো তো। মিত্রা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল আমাকে,—সকালে সমুদ্র থেকে উঠেছি, ফস করে বলে দিল, তোমায় ভিজে ড্রেসে দারুণ লাগছে। ঠিক যেন কিমি কাতকার।

হো হো করে হেসে উঠলাম,—বুঝলে না কেন বলেছে?

—কেন?

—আরে, আমি তখন জয়াকে মনীষা কৈরালা বললাম, তাই শুনে শুনে...কাল ব্যাটাকে এমন ঝাড় দেব না...

—থাক, তুমি আর সিন ক্রিয়েট কোরো না। মিত্রার বিরাগ ঝপ করে উবে গেল,—ওই বোকাটাকে তোমাদের নিয়ে আসাই উচিত হয়নি।

—না গো, তুমি জানো না, মধু ট্যুরে কত কাজে লাগে। আসার সময়ে দ্যাখোনি, কত বার ব্যাটা নামল ট্রেন থেকে? চা আনা, জল আনা, খাবার আনা...মিত্রার গালে ঠোঁট রাখলাম,—তুমি কোনও একটা কাজ দিয়ে দেখো, কেমন গুছিয়ে করে দেবে।

—কী রকম?

—এই ধরো, তোমার এক ডজন সেফটি পিন চাই, বা তিনটে চুলের কাঁটা, কিংবা দুটো স্যারিডন...এখন ডেকে বলো, এক্ষুনি বাজারে ছুটবে।

—আমার দরকার নেই।

আবহাওয়াটা কি একটু গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে না? মিত্রার গলা জড়িয়ে ধরলাম,—বাদ দাও মধুর কথা। অন্য কথা বলো।

—কী কথা?

—কাকে শেষমেশ পছন্দ করলে তুমি? অন্তুকে, না শুভ্রকে?

মিত্রা ফিক করে হেসে ফেলল। কুটুস করে একটা চিমটি কাটল আমাকে,—খুব শখ, অ্যাঁ? জয়াকে নিয়ে অতক্ষণ স্নানলীলা করেও আশ মেটেনি?

—হিংসে হচ্ছে?

—হিংসে করতে আমার বয়েই গেছে। হিংসুটে তো তুমি। কেন জয়াকে নিয়ে নেমেছিলে আমি জানি না?

—কেন বলো তো?

—শুভ্রদা আমাকে নিয়ে নামল, তাই।

ছদ্ম গাম্ভীর্য আনলাম মুখে,—আমার তো হিংসে হওয়ারই কথা। আমার মিষ্টি বউটাকে নিয়ে শুভ্র জলকেলি করবে...

—এই ছিঃ। শুভ্রদা না আমার দাদার মতো?

—আহা, লজ্জা পাচ্ছ কেন? ...ধরে নাও, জয়াও আমার বোনের মতো। ব্যস, কাটাকুটি হয়ে গেল।

মিত্রার শরীরটা ওমে গলে গলে যাচ্ছে। এখন ওকে নিয়ে যা খুশি করা যায়। আমার হাত মুখ ঠোঁট কিছুই আর এখন আমার বশে নেই। মিত্রারও না।

বুকে লেপটে থেকেই মিত্রা ফিসফিস করল,—যাই বলো, তুমি কিন্তু বেশ ব্যাকডেটেড আছ।

—কেন?

—এত পজেসিভ হবে কেন? শুভ্রদার সঙ্গে একটু চান করলে কি আমি ক্ষয়ে যাব?

—যাবেই তো, যাবেই তো। তুমি আমার ফিক্সড ডিপোজিট, সেখানে আমি অন্যের হাত সইব কেন?

—ফের সেকেলে লোকদের মতো কথা?

মিত্রার তেজি, অথচ প্রেমে আপ্লুত দুই চোখ যে কী অপরূপ এখন! আর একটু উসকে দিতে ইচ্ছে করল মিত্রাকে। বললাম,—পজেসিভনেস কিন্তু ছেলেদের থেকে মেয়েদেরই বেশি।

—কক্ষনও না। তোমরাই সব সময়ে আমাদের সম্পত্তি ভাবো। নইলে বউ পালটানোর প্ল্যান মাথায় আসে?

এবার পুরোপুরি চুপ করিয়ে দিলাম মিত্রাকে। এখন কথা বলার সময় নয়, এখন প্রেম করার সময়। শরীরে ডুব দেওয়ার সময়।

কতটা সময় যে বয়ে গেল কে জানে! ব্যালকনি দিয়ে একটা নরম ঠাণ্ডা হাওয়া এল ঘরে, ঘুরপাক খাচ্ছে। আমাদেরই ঘিরে। সমুদ্রের স্বর শুনতে পাচ্ছি আমরা, যেন এক অলৌকিক গান হয়ে বাজছে।

হাই তুললাম একটা। উঠে বসে সিগারেট ধরালাম। মিত্রা শুয়ে আছে পাশে, চোখ বুজে। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি। ওই হাসিকে কী বলে? সুখ? তৃপ্তি? আনন্দ?

একটু পরে মিত্রা বলে উঠল,—এই, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—এখনও কথা আছে? আমি হাসলাম,—আমি কিন্তু ওয়ার্ক মোর টক লেসেই বিশ্বাসী।

—এই, ফাজলামি নয়। বলো না গো, শুভ্রদার সঙ্গে বন্দনার গণ্ডগোলটা কী নিয়ে?

অস্বস্তিকর প্রশ্ন। মিত্রা আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নতুন মিশছে, এখনই তাদের সম্পর্কে কিছু উলটো সিধে ধারণা করবে, সেটা কি ভাল?

যা হোক কিছু বলার মতো করে বলে দিলাম,—কী কেস আমিও ঠিক জানি না। তবে মনে হয় ওই ছেলেপুলে না হওয়াটাই..

—ডাক্তার দেখায়নি?

—শুনেছিলাম তো একবার দেখাচ্ছে। আমি এই নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করি না। তবে শুভ্রর থেকে বোধহয় বন্দনা অনেক বেশি ফ্রাসট্রেটেড।

—স্বাভাবিক। মেয়েরা মা হতে না পারলে আপসেট হয়ে যায়।

মিত্রা সামান্য চুপ। ভাবছে কী যেন। হঠাৎ বলল,—ওদের লাভ ম্যারেজ না?

—লাভ ম্যারেজ কী গো? বলো সুপার লাভ ম্যারেজ। সিগারেটটা ছাইদানে গুঁজে মিত্রার পাশে শুয়ে পড়লাম,—ওদের প্রেম কলেজে একটা দারুণ সেন্সেশান ছিল। বন্দনাকে বিয়ে করল বলে শুভ্র তাড়াহুড়ো করে চাকরি জোগাড় করে ফেলল, এম. এস. সি.-টা পর্যন্ত কমপ্লিট করল না। ওর যা মেরিট ছিল, তাতে কি শুধু ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার হওয়ার কথা? শুভ্রও অন্তর মতো প্রফেসার হতে পারত, যদি তক্ষুনি তক্ষুনি মাথাচাড়া দিয়ে না উঠত খ্যাপামিটা। কী কাণ্ড করে ওরা যে বিয়ে করেছে আমরা তো জানি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছিলাম কী একটা যেন কেলো হয়েছিল।

নব পরিণীতা বউ-এর মুখে কেলো শব্দটা কানে খট করে বাজল। বিশেষত বিছানায়, এই আবেগঘন মুহূর্তে। মাঝে মাঝেই মিত্রার মুখ দিয়ে এরকম রকের ভাষা বেরিয়ে যায়।

চোখ কুঁচকে প্রশ্ন করলাম,—কেলোর খবর তুমি কী করে পেলে?

—জয়া একদিন কী যেন প্রসঙ্গে বলছিল, পুরোটা শোনা হয়নি। কী কিচাইন হয়েছিল বলো না গো?

কিচাইন শব্দটাও কানে টুসকি মেরেছে। হেসে ফেলে বললাম,—সে এক ইতিহাস। হঠাৎ একদিন দুপুরে শুভ্র আমার বাড়িতে হাজির। মুখ থমথম, ঘাড় ঝুলে গেছে...যাকে তোমার ভাষায় বলা যায় বিলা থোবড়। কি, না বন্দনাকে আর পাওয়া হল না। বন্দনার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, মাঝে আর মাত্র নটা দিন, পাছে শুভ্রর সঙ্গে বন্দনা যোগাযোগ করে, মা বাবা ঘরে শিকল তুলে আটকে রেখেছে মেয়েকে। সুতরাং শুভ্রর আর প্রাণধারণ বৃথা, এক্ষুনি ওর সঙ্গে আমাকে হাওড়া ব্রিজে যেতে হবে, ধাক্কা মেরে গঙ্গায় ফেলে দিতে হবে ওকে।

—যাহ।

—যা নয়, হ্যাঁ। ...আমি তো চিন্তায় পড়ে গেলাম। খিঁচিয়ে উঠে বললাম, অ্যাদ্দিন কী করছিলি? শুভ্র বলল, বিশ্বাস কর, আমি জানতাম না। দু দিন বন্দনা আমার সঙ্গে ডেট ফেল করল, আমি ওকে বাড়িতে ফোন করলে হয় ওর বাবা নয় ওর মা তোলে, আর সঙ্গে সঙ্গে রেখে দেয়, তখনই আমার মনে হল ডালমে কুছ কালা হ্যায়। ওদের ক্লাসের সীতা, ওই যে কেলেকুষ্টি মেয়েটা, যাকে আমরা শাঁকচুন্নি বলতাম, ওকেই জপিয়ে জাপিয়ে পাঠালাম বন্দনার বাড়ি, বাস কেস কট।

—তার মানে বন্দনার সেই বিয়েতে সায় ছিল?

—মোটেই না। কোথায় কোন বিয়েবাড়িতে দেখে ওকে নাকি পছন্দ করে ফেলেছিল ছেলের বাপ, তার থেকেই একেবারে নহবতখানার অর্ডার হয়ে গেছে।...হ্যাঁ, তারপব যা বলছিলাম। শুভ্রকে বললাম, খ্যাপামি করিস না, অন্তর কাছে চল, একটা কিছু সলিউশন বেরোবেই। গেলাম...। অন্ত শুনল চুপচাপ। একটু ভেবে নিয়ে বলল, যার সঙ্গে বিয়ে তার অ্যাড্রেস তোর কাছে আছে? শুভ্র কাঁচুমাচু মুখে বলল, না রে, বন্দনা আমায় একটা চিরকুট পাঠিয়েছে। তার থেকে শুধু জানি পাত্র শিবপুর বাজারের কাছে থাকে। অন্ত বলল, ওতেই হবে। চল, একটা ট্যাক্সি ধর।

—তারপর?

—তারপর সে কী গোরু খোঁজা রে ভাই। মাংসের দোকান, ফলঅলা, লন্ড্রি, সেলুন, সর্বত্র সন্ধান

করতে করতে শেষে হদিস পাওয়া গেল। রাস্তাটার নাম এখনও মনে আছে। রাজা রাজনারায়ণ রায়চৌধুরী ঘাট রোড। সে এক আদ্যিকালের পেল্লায় বাড়ি। তার নাম আবার বাতাসী মঞ্জিল। জয় মা বলে ঢুকলাম বাড়িটায়। কপালগুণে পাত্রটাও ছিল বাড়িতে। অন্তু তাকে স্ট্রেট বলল, আপনার সঙ্গে একটু জরুরি কথা আছে, এক্ষুনি বাইরে চলুন। অন্তুর চেহারায় জৌলুস তো আছেই, লোকটা ভড়কে গেল, নার্ভাস মুখে আমাদের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এল। আমি লোকটাকে বললাম, আপনি জেনেশুনে দুটো মানুষের মৃত্যু চান? লোকটা আমতা আমতা করে বলল, কেন, এ কথা বলছেন কেন? অন্তু বলল, জানেন যার সঙ্গে আপনার বিয়ের ঠিক হয়েছে সে অন্যপূর্বা? বন্দনা মোটেই আপনাকে বিয়ে করতে চায় না। লোকটার মুখ গোমড়া হয়ে গেল। কী যেন ভাবল একটু। তারপর উদাস মুখে বলল, কিন্তু বিয়ে তো স্থির হয়ে গেছে, আমার এখন কিছু করার নেই। আমি বললাম, এত কিছু জানার পরও আপনি বিয়ে করবেন? লোকটা... তুমি মাইরি বিশ্বাস করবে না, অম্লান বদনে বলল, বিয়ের আগে কত মেয়েরই তো ওরকম লটঘট থাকে, স্বামীরা কি সব জানতে পারে? আমি নয় ধরে নেব, আমি কিছু শুনিনি।

—এমা ছি ছি...। মিত্রা আমার গা ঘেঁষে এল,—কী নির্লজ্জ লোক রে বাবা।

—কারেক্ট। এই কথাটাই আমরা বললাম লোকটাকে। বললাম, অত কানকাটা হবেন না। এই যে যুবকটি আমাব পাশে দাঁড়িয়ে আছে, এই হল বন্দনার প্রেমিক। কাবাবমে হাড্ডি বনে দুটো নির্মল প্রাণকে বিনষ্ট করার আপনার কোনও রাইট নেই। লোকটা কটকট করে দেখল শুভ্রকে। হয়তো মায়া হল। ভয়ও পেয়ে থাকতে পারে, শুভ্রর তখন ফিজিকটা আরও ভাল ছিল। মিনমিন করে বলল, দেখুন ভাই, বিয়ে তো ঠিক করেছেন আমার বাবা। বিয়ে দেওয়ারও মালিক তিনি, ভাঙারও মালিক তিনি। বড়বাজারের পগেয়া পট্টিতে চলে যান, ওখানে আমাদের কাপড়ের দোকান, বাবাকে পেয়ে যাবেন ওখানে, তাঁর সঙ্গে গিয়ে কথা বলুন।

মিত্রার চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে। যেন কোনও রহস্য উপন্যাস শুনছে। মুখ হাঁ করে বলল,—তোমরা গেলে?

—অফ-কোর্স। তখন আমবা শুভ্রর জন্য জান লড়িয়ে দিয়েছি। যদি সাহারা মরুভূমিতে যেতে বলত, সেখানেও যেতাম।

—ভদ্রলোক শুনেই বিয়ে ভেঙে দিলেন?

—আরে নাহ্। সে এক মহা তিকড়ম লোক। শুনেই তার কী লম্ফঝম্প! কক্ষনও না, বিয়ে আমি ভাঙব না' তোমরা কোথাকার কোন্ অপগণ্ড, আমি এক্ষুনি পুলিশে খবর দিচ্ছি, চাবকে তোমাদের লম্বা করে দেবে! শুভ্র তো নার্ভাস হয়ে বলেই ফেলল, চল কেটে পড়ি। দেখি কোনওভাবে বন্দনাকে ইলোপ করা যায় কি না। কিন্তু অন্তু ওই মোমেন্টে স্ট্যামিনা দেখাল বটে। কিছুতেই জমি ছাড়ল না। লোকটার চোখে চোখ রেখে বলল, আপনি আমাদের কেটে কুচি কুচি করে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াতে পারেন, কিন্তু তাতে সত্য মরবে না। এবং আপনার ছেলেও সুখী হবে না। বন্দনার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, ও ফুলশয্যার রাতে পটাশিয়াম সায়ানাইড খাবে। চিঠিও লিখে রাখবে হয়তো, আমার মৃত্যুর জন্য দিজ দিজ পারসনস আর দায়ী। এখন ভেবে দেখুন আপনি কী করবেন, আমরা চলি। ব্যস, রাত এগারোটার সময়ে বন্দনার বাবা মা মুক্তকচ্ছ হয়ে শুভ্রর বাড়ি উপস্থিত। বিয়েটাও হয়ে গেল। ওই দিনই। তবে শুভ্রর বাবা খুব জিদ্দি আদমি তো, বলল তুমি কোথায় লভ করে ফেঁসেছ, তার জন্য তোমার বউকে আমায় খাওয়াতে হবে, আমি সে পার্টি নই। তিন মাস টাইম দিলাম, এর মধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়াও। নয়তো দুজনে ওই গাছতলায় গিয়ে থাকবে। ব্যস, শুভ্রও এম. এস. সি-র পাট চুকে গেল। প্রথমে একটা ছোটখাটো চাকরি জোগাড় করল, তারপর ব্যাঙ্কে পরীক্ষা দিয়ে ক্যাশিয়ার। কহানী শেষ।

মিত্রা নীরব হয়ে গেছে। নখ দিয়ে নখ খুঁটছে, অন্য মনে।

বললাম,—কী, দারুণ রোমহর্ষক এপিসোড নয়?

—হুঁ।

—এই হল গিয়ে ভালবাসা। প্রেম। বুঝলে?

—হুঁ। ...কিন্তু সেই গভীর প্রেমেও চিড় ধরে!

এবার কথা নয়, কথার সুরটা কানে বাজল। যেন আমার আদুরে বউ নয়, কোনও পরিণত নারী দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমারও শ্বাস পড়ল একটা। বললাম,—তাই তো দেখছি। প্রেম ট্রেম বোধহয় খুব পলকা শব্দ। মানুষ কি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে কখনও ভালবাসে? স্বার্থে ঘা লাগলে, চাওয়া পাওয়ায় গরমিল হলে, সমস্ত সম্পর্কই চিড় খেয়ে যায়।

মিত্রা যেন কেঁপে উঠল, ভিতু পাখির মতো। বলল,—আমাদেরও কি এমনটা হতে পারে কোনও দিন?

মিত্রার নাকে নাক ঘষে দিলাম,—আমি হতে দেবই না। আমরা চিরটা কাল হানিমুন কাপল্ থাকব, দেখো।

আর কথা বলল না মিত্রা, উঠে বসল। বিছানায় পড়ে থাকা সালোয়ার কামিজ জড়ো করছে দু হাতে, ভাঁজ করে খাটের বাজুতে রাখল। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ড্রেসিং টেবিলের সামনে। দেখছে নিজেকে। গায়ে সুতোটি নেই মিত্রার। স্বচ্ছন্দ পায়ে হাঁটছে ঘরে। যেন মানবী নয়, যেন জল থেকে উঠে এসেছে ভেনাস, কোনও জাদুমন্ত্রে ঢুকে পড়েছে এ ঘরে। ঈষৎ অবনত স্তন, রুপোর পিরিচের মতো নাভিদেশ, শঙ্খধবল উরু—কে এই মায়াবিনী!

বুক ধড়াস ধড়াস করছে আমার। শুধু এই মুহূর্তটাই কি অনন্তকাল হতে পারে না?

মিত্রা আমার মনের কথা কিছুই টের পেল না। নিজের খেয়ালে বাথরুমে ঢুকে গেল। ফিরে এসে নাইটি পরে নিয়েছে। বসল বিছানায়। আবার সে এক সামান্য নারী।

সামান্য মানবীর মতোই বলল,—যাই বলো, তোমাদের বন্দনা কিন্তু একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে। যন্ত্রণাটা তো ওর একার নয়, শুভ্রদারও কষ্ট আছে।

আমিও রূঢ় বাস্তবে ফিরেছি। মাথা নেড়ে বললাম,—শুভ্রর জন্য একটু বেশি খারাপ লাগে। বন্দনা ওকে যেখানে সেখানে এমন নিশ্রীভাবে হার্ট করে, যখন তখন রাফ বিহেভ করে...অথচ শুভ্র, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজও বন্দনাকে তেমনই ভালবাসে।

—শুভ্রদা ভীষণ ভীষণ ভাল। এত হাসিখুশি, এত লাইভলি, কে বলবে মানুষটাকে এত হিউমিলিয়েশান সহ্য করতে হয়!

—বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু...আমার ধারণা, শুভ্র সবকিছু ভুলে থাকতে চায়।

মিত্রা ঝেঁঝে উঠল,—বন্দনা ওকে ভুলে থাকতে দিলে তো! দেখলে না, আজ সকালে কী কুচ্ছিতভাবে অন্তুদার সঙ্গে ঢলাঢলি করছিল।

ছি ছি ছি, মিত্রাও লক্ষ করেছে? অবশ্য দেখবে না'ই বা কেন, মেয়েদের চোখ এ সব ব্যাপারে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ হয়। অন্তু আর বন্দনার মধ্যে কোনও রিলেশান গড়ে উঠেছে কি না খোদাই মালুম, আশা করি ওদের মধ্যে কিছু নেই। কিন্তু যদি কিছু হয়ে থাকে, শুভ্রর থেকে বেশি আঘাত পাবে জয়া। এত ভাল মেয়ে, হয়তো কেঁদে কেঁদেই মরে যাবে। এত মিষ্টি মেয়ে জয়া, এত সরল, সাদাসিধে। জয়ার মতো ওরকম একটা নরম মনের মেয়ে পেলে সব পুরুষই সুখী হতে পারে। কী যেন একটা আলাদা চার্ম আছে জয়ার। মিত্রার মতো নয়, অন্য রকম।

—এই, কী ভাবছ গো?

—কিছু না তো। চমকে উঠলাম।

মিত্রা ঝুঁকল আমার দিকে। আলগোছে জড়িয়ে ধরল গলা,—এই, আমাদের ভালবাসা যদি কখনও ফুরিয়ে যায়...?

কথাটা শেষ করল না মিত্রা। হঠাৎ থেমে গেছে। মুখচোখও কেমন বদলে গেছে মিত্রার। যেন সেই অচেনা ভেনাস আবার উঁকি দিচ্ছে!

আমি আচ্ছন্নের মতো বললাম,—চুপ। ও কথা বলতে নেই।

সমুদ্রের গর্জন বাড়ছে। জোয়ার আসছে বোধহয়। আমাদের এই ঘরেও যেন ঢুকে পড়ছে জোয়ার।

আলোটা নিবিয়ে দিলাম।

সন্ধে নেমেছে।

গাঢ় নীলাম্বরী পরে চঞ্চল অভিসারিকার মতো ছটফট করছে সমুদ্র। তীরে এসে আছড়ে পড়ছে পায়ের নূপুর, শব্দ বাজছে ঝুমঝুম ঝুমঝুম।

মনটা বড় চঞ্চল আমারও। যেন আমার মন আমারই বশে নেই। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ, ডুবডুব ডুবডুব। আজ সকালে যে ঘটনাটা ঘটে গেল, তার জন্য কে দায়ী? আমি? বন্দনা? শুভ্র? অন্তহীন জলরাশির সামনে বসে প্রশ্নটা কুরে কুরে খাচ্ছে আমাকে। নিজেকে গোপন রাখা বড় কঠিন এখন।

আমি, আমিই অপরাধী।

তটভূমির এদিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। পিছনে উঁচু বালিয়াড়ি, লোকজন তেমন আসছে না এদিকে। আছি শুধু আমরা কজন। এখনও চাঁদ ওঠেনি, নীলচে অন্ধকারে সমুদ্র এখন আরও রহস্যময়। ছোট ছোট ঢেউ ফেনা ছড়িয়ে চিকচিক করে উঠছে। হঠাৎ হঠাৎ। দূরে দূরে। আচমকা মনে হয় যেন জলকন্যারা মাথা তুলল।

—অ্যাই অন্তু, সিগারেট আছে?

শুভ্র। অকারণ চমকটা সামলে প্যাকেট বাড়িয়ে দিলাম।

শুভ্র প্যাকেট রাখল না। একটা সিগারেট বার করে নিয়ে ফিরিয়ে দিল। গলা ঝেড়ে বলল,—একটাও চাঅলা আসছে না কেন বল তো?

সত্যি, এখন একটু চা পেলে ভাল হত। কিন্তু জুটছে কোথায়? যা দু-চারটে ফেরিঅলা আসছে, তাদের হাতে শাঁখ, নয় ঝিনুক। একটু আগে জয়া আর মিত্রা একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে ঝিনুকের মালা নিয়ে দরাদরি করছিল। মেয়েদের জন্যই ফেরিঅলারা আসে বেশি।

মধু ভেজা বালিতে চিত হয়ে শুয়ে। বেচারার শরীরটা সকালে ভাল ছিল না, তার ওপর বিকেলে যা জোর একটা ঝাড় খেল পুলুর কাছে! বন্দনাকে নিয়ে পুলু বুঝি হাঁটতে বেরিয়েছিল, মধু নাকি তখন ধাওয়া করেছিল ওদের! ইচ্ছে করে! কড়া ধমক খেয়ে বেচারার কী কাঁচুমাচু দশা! এখন অবশ্য দিব্যি ভুলে গেছে, খেলা করছে টুটুলের সঙ্গে। টুটুল আঁজলা ভরে বালি তুলে মধুর বুকপকেটে ভরে দিচ্ছে, মধু ঝেড়ে ফেলছে পকেট থেকে, টুটুল আবার ভরছে। বাচ্চারা মধুকে বড় তাড়াতাড়ি ভালবেসে ফেলে। মধুও।

শুভ্রর দু পাশে বন্দনা আর জয়া। না, বন্দনা ঠিক পাশে নয়, খানিক তফাতে। মিত্রা পুলু আরও দূরে। নতুন বিয়ে হয়েছে, এখন ওরা তো একটু আলাদা আলাদা থাকতে চাইবেই। তা বলে বেশি আদিখ্যেতা দেখানোরও মানে হয় না। সবার সঙ্গে যখন এসেছিসই, একটু মানিয়ে গুনিয়ে চলা উচিত নয় কি? না এলেই পারতিস।

আমারও কি আসাটা ঠিক হয়েছে? এ ভাবে দল বেঁধে না এলে হয়তো ঘটনাটা ঘটত না। বন্দনাকে দোষ দিই না, সে বেচারা হয়তো কোনওভাবে একটু শাস্তি চাইছে, পালাতে চাইছে শুভ্রর কাছ থেকে। এত তাড়াতাড়ি ধৈর্য হারাল বন্দনা?

অস্বীকার করব না বন্দনার ওপর এককালে আমারও দুর্বলতা ছিল। নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পাইনি, তার আগেই বন্দনা শুভ্রর হয়ে গেল। মনের ইচ্ছে মনেই মেরে ফেললাম আমি। প্রিয় বন্ধুর প্রেমিকার দিকে ভুলেও হাত বাড়াবে, অনুতোষ রায়চৌধুরীর সে ধাতই নয়। সত্যি কথা বলতে কী, বুকে তখন কাঁটা খচখচ করলেও খুশিও কি হইনি আমি? কেন হব না? শুভ্রর মতো দরাজদিল ছেলে কটাই বা আছে দুনিয়ায়? পুলুর ভেতরে তাও কিছু কিছু ছোট ছোট নীচতা আছে, স্বার্থপরতা আছে। টাকাপয়সার ব্যাপারে তো রীতিমতো ছ্যাঁচড়া, যত টাকা দিচ্ছে তার পাইপয়সা প্রতি স্টেপে বুঝে নিচ্ছে। কোথায় কোন ট্রাভেল এজেন্সি কোনার্ক ট্যুবে পাঁচ টাকা কম নেবে, পুলু সেখানেই ছুটল। এত চমৎকার হোটেল তাও ব্যাটার মন ওঠে না। কথায় কথায় বলছে, শালারা চামার, গলায় গামছা দিয়ে পয়সা আদায় করে। মাংস কেন তিন পিস দেয়, চিকেনটা কেন বুড়ো...। শুভ্র একদম আলাদা। আজও আমি বললে

আমার সামান্য উপকারের জন্য জান লড়িয়ে দেবে। এ কি শুধুই কৃতজ্ঞতাবোধ? ওদের বিয়েটা ঘটিয়ে দিয়েছিলাম বলে? কক্ষনও না। আবেগ ভালবাসা পরোপকার শুভ্রর রক্তে আছে, জানি আমি। তবু শুভ্রর জীবনটাই কেন এমন হয়ে গেল? কেন ওরা অত অসুখী?

বন্দনা যা বলল তা কি সত্যি? হতেও পারে। একটা মানুষের তো অজস্র চেহারা থাকে। আমরা হয়তো একটা মুখ দেখি, বন্দনা দেখে আরেকটা মুখ, ওর অফিসের লোকজন দেখে আরও একটা! বাইরে থেকে দেখে স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত সম্পর্ক আন্দাজ করা অত সহজ নয়।

শুভ্র অনেকক্ষণ নিশ্চুপ। সিগারেট শেষ, সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। কেমন একটু ঝুঁকে বসে। সমুদ্রের ধারে এলে মানুষ এমনিতেই স্তব্ধ হয়ে যায়, নিজের তুচ্ছতা অসহায়তা বড্ড বেশি মনে পড়ে, শুভ্র কি সেই কারণেই চুপ? চুপ, নাকি গুম?

কিছু কি আন্দাজ করেছে শুভ্র?

সকালে টুটুলকে নিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিতে গেল জয়া। মিত্রা পুলু আর শুভ্রও গেল সঙ্গে। মধুটার কাল রাত থেকে একটু পেট গড়বড়, নিজের ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল। আমি কেন গেলাম না জয়াদের সঙ্গে? ঠাকুর দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই ঠিকই, কিন্তু মন্দির ঘুরে দেখতে তো দোষ ছিল না।

কেন মনকে চোখ ঠারিস অনুতোষ? বন্দনা রয়ে গেল বলেই তো তুই...

মোটেই না। বন্দনা হোটেলে থাকবে আমি জানতামই না।

মিথ্যে কথা। ব্রেকফাস্ট টেবিলেই বন্দনা বলেছিল মাথা ধরেছে, সকালে কোথাও বেরোবে না।

আমি অত খেয়াল করিনি। তখন টুটুলকে খাওয়াচ্ছিলাম।

ড্যাম লাই। তুই জেনেশুনে...

দুটো স্বর ভেতরে যেন ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে। ঝগড়া করছে গলার শির ফুলিয়ে। একটা স্বর গর্জে উঠল, বেশ করেছি। নয় জেনেশুনেই ছিলাম। তাতে হয়েছেটা কী? মেয়েটা অসুস্থ, একজন কারুর তো থাকা উচিত।

অন্য স্বর খলখল হেসে উঠল, যাক, সত্যিটা স্বীকার করলি তা হলে? ...বাই দি বাই, বন্দনার মাথাব্যথা কবে থেকে তোর চিন্তার এক্তিয়ারে এল? কাল হাত ধরাধরি করে সমুদ্রস্নানের পর থেকে?

চোপ, একদম চুপ।

কাকে চোখ রাঙাস অনুতোষ? শরীরে শরীর ছোঁয়াতেই বদলে গেলি? নাকি সমুদ্রের ঢেউ বুকে ঢুকে গেল, অ্যাঁ?

অন্য স্বর নীরব। নিথর। আবার হৃৎপিণ্ডে শব্দ বাজছে, ডুবডুব ডুবডুব ডুবডুব। সকালটা দুলে উঠল চোখের সামনে...

...বন্দনার ঘরে টোকা পড়ল।

—কে?

—আমি। অস্তুদা।

—ও, আসুন।

উঠে বসে কাপড়চোপড় ঠিক করছিল বন্দনা। শুভ্রর সঙ্গে সকালেই আবার ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল হয়তো। একা শুয়ে কি কাঁদছিল? দুগালে যেন তার অশ্রুচিহ্ন?

অপ্রস্তুত মুখে বললাম,—ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি শুয়ে থাকো। তোমার মাথাধরা কমেছে কি না দেখতে এসেছিলাম।

—না না, এখন ঠিক আছি। বসুন।

তখনই কি আমার ফিরে আসা উচিত ছিল? মন তো সেরকমই বলছিল, তবু কেন চেয়ারে বসলাম? কথাও খুঁজে পাচ্ছি না, উঠেও আসতে পারছি না, কী যে এক উদ্ভট দশা তখন! নৈঃশব্দ্যও যে কখনও কখনও মানুষকে এত বিভ্রান্ত করে তোলে।

বন্দনাই বাঁচাল। বলে উঠল,—অস্তুদা, কী করি বলুন তো?

—কীসের কী করবে?

—আমার আর আজকাল কিচ্ছু ভাল লাগে না।

কথাটা বাতাসে ভাসতে লাগল। যেন ভাল না লাগার কষ্টটা চাপা গুমোট হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল ঘরে।

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—তোমাদের কী হয়েছে বলো তো?

—কিছু বোঝেন না? একটু আগের কান্না যেন আবার মুক্তোবিন্দু হয়ে জমাট বাঁধল বন্দনার চোখে। চাপা স্বরে বলল,—আপনাকে অন্তত একটু অন্য রকম ভেবেছিলাম। সেন্সেটিভ। সিরিয়াস।

ভিতু গলায় বললাম,—প্রবলেমটা কী খুলে বলো না।

—প্লিজ, আমি কী করব আপনি বলে দিন। আমি আর শুভ্রর সঙ্গে থাকতে পারছি না।

ভাবতেও পারিনি কথাটা এত সরাসরি বলবে বন্দনা। বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না আমার। বুঝতে পারছিলাম না ঠিক এই মুহূর্তে আমারই বা কী বলা উচিত।

—অ্যাম আই টু বিলিভ, আপনারা কিচ্ছু বোঝেন না? আমরা কেউ আর কাউকে সহ্য করতে পারি না আজকাল।

—কেন?

—কেন আবার কী, শুভ্র আমায় বিশ্বাস করে না। সন্দেহ করে। যাচ্ছেতাই ভাষায় গালিগালাজ করে, যখন তখন। বন্দনা স্পষ্টতই উত্তেজিত। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। জানলায় গিয়ে স্থির। ফিরল, এবং আচমকা ফুঁপিয়ে উঠল,—সবার কাছে আমায় দোষী সাজিয়ে ও ভালমানুষ সাজতে চায়। শুভ্র যে কত বড় হিপোক্রিট আপনারা জানেন না। আমাকে একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। আমি এখন একটা নরকে বাস করি অন্তুদা, নরক।

কেন সন্দেহ করে শুভ্র? কাকে নিয়ে সন্দেহ করে? প্রশ্নটা মনে এলেও ঠোঁট নড়ল না। যদি বন্দনা বলে শুভ্রর সন্দেহের লোকটি আমি নই, অন্য কেউ, সেটা বুঝি আরও গভীরভাবে বিঁধবে আমাকে।

বন্দনার দুগাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বড় বড় ফোঁটায়। রক্তকরবীর পাপড়ির মতো পাতলা ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠল।

আমার বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম কোনও এক অবচেতনায় বন্দনার প্রতি দুর্বলতাটা আমার রয়েই গেছে। এমনটাই বোধহয় হয়। সবকিছুই তো চিরকাল বুকেই জমে জমে থাকে আমার। জমে পাথর হয়ে যায়, কিন্তু মরে না। আশা আকাঙ্ক্ষা ক্ষোভ দুঃখ...। হয়তো গোপন কামনাও। বাবা মারা গেছে কোন ছোটবেলায়, তার মুখটাও মনে পড়ে না। মা ব্যস্ত থাকত কাজে, স্কুল টিউশনি মিলিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম। আমাকে তেমন সময় দিতে পারত কই! শৈশব আমার কেটেছে একা একাই। হয়তো সেই জন্যই আমি এরকম। আমার ইনট্রোভার্ট নেচারটাকে লোকে অহঙ্কার বলে ভাবে। চাকরির জায়গার লোকেরা, আমার বন্ধুরা, এমনকী জয়াও। কিন্তু কী করব আমি? আমি যে আমার মধ্যেই থাকতে ভালবাসি।

বন্দনা সামনে এসে বসল। অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে ফেলল সহসা। শাড়ির আঁচল সরিয়ে ব্লাউজের হাতাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল,—দেখুন আপনার বন্ধুর কীর্তি। দেখুন, কীভাবে ছ্যাঁকা দিয়েছে আমাকে। সিগারেট দিয়ে।

দগদগ করছে পোড়া দাগ। টাটকা। শিউরে উঠলাম,—এ কী, এমন কেন করেছে?

—মেজাজ। ইচ্ছে। নিজেই বলল বউ বদলাবদলির খেলা খেলি, অথচ আপনার সঙ্গে সমুদ্রে গেছি বলে... ও একটা ইমপসিবল ধরনের মানুষ। ওর সঙ্গে কোনও সুস্থ স্বাভাবিক মেয়ে এক ছাঁদের নীচে বাস করতে পারবে না।

বন্দনার মাথায় হাত উঠে গেল আমার,—কেঁদো না, কেঁদো না। আমি তো আছি। দেখছি, দেখছি সব।

বন্দনা আমার হাতটা তুলে নিয়ে মুখে চেপে ধরল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে,—অন্তু, অন্তু...অন্তু, আমায় বাঁচাও। প্লিজ বাঁচাও।

এমন একটা পরিস্থিতি যে জীবনে কখনও আসবে স্বপ্নেও ভাবিনি। কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। হৃৎপিণ্ড তড়াং তড়াং লাফাচ্ছে, মনে হচ্ছে এক্ষুনি খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে যাবে।

সমস্ত সংযম ছিঁড়ে গেল। এতদিনের শিক্ষা দীক্ষা, চর্চিত অন্তর্মুখীনতা কোথায় ভেসে গেল। যেন হৃদয়ের অতলে কবেই হারিয়ে যাওয়া কথাটা বেরিয়ে এল,—আমি তোমায় ভালবাসি বন্দনা, বিশ্বাস করো। কোনও দিন মুখ ফুটে বলতে পারিনি...। তুমি এভাবে কাঁদলে আমার খুব কষ্ট হয়।

বন্দনা পাগলের মতো জড়িয়ে ধরল আমায়। পাগল, না কুহকিনী? কুহকিনী, না সাপিনী? নাকি এ এক অসহায় লতা, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরছে মহীরুহকে? কতক্ষণ আমাদের ঠোঁটে ঠোঁট মিশেছিল? কতক্ষণ থেমে ছিল সময়?...

বন্দনা এখন দু হাঁটুর মাঝে থুতনি ঠেকিয়ে সাগরমনস্ক। তরল অন্ধকারে মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। ওর দিকে আর সোজাসুজি তাকাতে পারছি না আমি। কেন পারছি না? সংকোচ? লজ্জা? আত্মধিক্কার? বড় বেশি নিঃসঙ্গ লাগছে নিজেকে। অন্ধকারের আয়নায় নিজের মুখ দেখে আমি চমকে চমকে উঠছি। এতই যদি বন্দনার ওপর দুর্বলতা ছিল, কেন বিয়ে করেছিলাম জয়াকে? নয় নয় করে পাঁচ-পাঁচটা বছর ঘর করছি আমরা, টুটুলের মতো একটা ফুটফুটে মেয়ে রয়েছে আমাদের, নিটোল সুখী দম্পতি বলে ভাবি নিজেদের, সবটাই তা হলে ফাঁকি? জয়ার ওপর কোনও টান নেই আমার? সে কি শুধুই শরীর?

জয়া জানলে কী ভাববে? শিশুর মতো সরল জয়া, আমি ছাড়া দুনিয়াটাকে ভাবতেই পারে না। ওকে প্রতারণা করার কী অধিকার আছে আমার?

আবার প্রতিস্বর জেগে উঠছে বুকে। ওভাবে ভাবছিস কেন অনুতোষ? জয়াকেও ভালবাসিস তুই, তোর মতো করে ভালবাসিস। এক জনকে ভালবাসলে কি আরেক জনকে ভালবাসা যায় না? পুরুষের হৃদয় কি এত ক্ষুদ্র কুঠুরি, যে একজনকে রাখলে দ্বিতীয় জনকে সেখানে ধরবে না? জয়াকে আঘাত দিস না, কিন্তু বন্দনাকেও পাশে রাখ। শুধু একটু সতর্ক থাকলেই হল।

টুটুল দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কোত্থেকে এক বেলুনঅলাকে জোগাড় করে এনেছে, জয়ার কাছে বায়না ধরেছে বেলুনের।

জয়া চাপা স্বরে ধমকাল। কাঁদো কাঁদো মুখে মধুময়ের পাশে বসে পড়ল টুটুল। মধুময় ছুটল বেলুনঅলার পিছু পিছু। দু হাতে দুখানা বেলুন কিনে ফিরছে, গালভর্তি হাসি। টুটুল বেলুন হাতে উচ্ছল, ছুটছে এদিক ওদিক, ঘুরে ঘুরে সব্বাইকে বেলুন দেখাচ্ছে।

উঠে জয়ার পাশে এসে বসলাম। নীরবে আকাশের তারা গুনছি। মেঘহীন আকাশে শলমা চুমকি টিপ টিপ। এখনও চাঁদ উঠল না।

—কী ভাবছ? জয়া নিচু গলায় প্রশ্ন করল।

—কিছু না।

—উঁহু, কিছু একটা তো ভাবছই।

—সত্যি, কিছু না। সমুদ্রের পাড়ে চুপচাপই বসে থাকতে হয়।

চোখ কুঁচকে জয়া তাকাল আমার দিকে,—শরীর টরীর খারাপ হয়নি তো? বলেই কপালে হাত ছুঁইয়েছে,—সমুদ্রে আজ নেমেই উঠে এলে...ভাত খেলে ওইটুকুন...কোনও অস্বস্তি টস্বস্তি হচ্ছে?

মায়া মাখা স্বর। একটুতেই বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে জয়া। জোর করে হেসে উঠলাম,—আরে না না, আমি হানড্রেড পারসেন্ট ফিট।...তারপর তোমাদের মন্দির ভ্রমণ কেমন হল?

জয়া সামান্য ঠোঁট ফোলাল,—এতক্ষণে মনে পড়ল? তোমার মতো নাস্তিক বাপু আমি জীবনে দেখিনি।

—শুধু কি নাস্তিক? বলো, পাষণ্ড নাস্তিক। ...তারপর, কত টাকা গচ্ছা দিলে পুজোয়?

—বেশি না, পঁচিশ টাকা।

—জগন্নাথ দর্শন হল?

—একদম কাছ থেকে দেখেছি। শুভ্রদা একটা পাণ্ডাকে ফিট করে ফেলেছিল, সে একেবারে...

—তবে আর কী! তোমার পুণ্য এখন খায় কে!

—ঠাট্টা করছ?

—উঁহু, হিংসে হচ্ছে। সামনে থেকে জগন্নাথ দেখা, এ তো এক বিরল সৌভাগ্য। গর্বও হচ্ছে, কত বড় এক পুণ্যবতীর স্বামী আমি...

—অ্যাই, টিজ করবে না।

নিজের আকস্মিক প্রগল্‌ভতায় নিজেরই অবাক লাগছে। বেশি উচ্ছলতা দেখে জয়া আবার কিছু সন্দেহ না করে বসে!

তবু উচ্ছ্বাসটাকে ধরে রেখেই বললাম,—জগন্নাথবাবুর সঙ্গে ফেস টু ফেস দেখা হয়ে গেল, কিছু বর টর চাওনি?

—চেয়েছি তো। বললাম আমার রামগরুড় স্বামীটাকে একটু হাসিখুশি করে দাও।

—কী বলল জগা? হাত তুলল, তথাস্তু? ওহো, জগন্নাথের তো আবার হাত নেই। পুওর ফেলো।

জয়া হেসে গড়িয়ে পড়ল,—ঠাকুর দেবতা নিয়ে মশকরা? দেখবে দেখবে...

শুভ্র পাশ থেকে বলে উঠল,—অ্যাই, তখন থেকে তোরা কী গুজগুজ করছিস বল তো? প্রেম করতে হলে ও পাশে যা, মিত্রা পুলুদের ওদিকে।

—ইস, প্রেমের কথা বলবে আপনার বন্ধু? তা হলেই হয়েছে।

—তা হলে কি জিওমেট্রির এক্সট্রা বোঝাচ্ছে?

জয়া আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল।

শুভ্র হইহই করে উঠল,—এই তো, এতক্ষণ পর জমেছে! সারাক্ষণ কেউ চুপচাপ, কেউ গুজগুজ, ভাল লাগে? ...এই জয়া, একটা গান ধরো তো।

জয়া হাসতে হাসতে হোঁচট খেল,— গান? এখন? এখানে?

—হ্যাঁঅ্যা। আমরা শুনব। তোমার বর শুনবে। সমুদ্র শুনবে।

পলকের জন্য মনে পড়ল এই শুভ্র সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছে বন্দনাকে। আমার সঙ্গে পরকীয়া সন্দেহ করে।

তেতো গলায় বললাম,—গাও না। শুভ্র যখন বলছে। চুপ করে বসে থাকতে আর ভালও লাগছে না।

বন্দনা চকিতে মুখ তুলল হাঁটু থেকে। এক ঝলক আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার মুখ নামিয়েছে।

শুভ্র বলল,—আমি বলছিলাম বলে তো দর বাড়াচ্ছিলে। এবার বর বলছে, গাও।

—তুৎ, কোনও ভাল গান মনে আসছে না।

—ওরকমই হয়। সমুদ্রের ভাস্টনেসের সামনে সব গুলিয়ে যায়।

মধু চেঁচিয়ে উঠল,—আমি গাইব?

টুটুল হাততালি দিয়ে উঠল,—তুমি গানও গাইতে পার মধুকাকা?

—মধু যে কী না পারে। শুভ্র হা হা হাসল,—খেলতে পারে, হাসতে পারে, চপল সুরে গাইতে পারে... কী গান গাইবি রে?

মধু গা মুচড়োল,—হাম তুম এক কামরেমে বন্‌ধ হো গাইব?

—শালা, চতুর্দিক হু হু করে খোলা, সামনে এত বড় একটা সমুদ্র দাপাচ্ছে, আর তোর কিনা এই গানটা মনে এল? মারব পাছায় তিন লাথ...

—তা হলে জিসকি বিবি মোটি গাই?

—শালা, মোটা বিবি পেলেও তুই বর্তে যেতিস রে। অন্য গান ভাব।

পুলু দূর থেকে স্বর পাঠাল,—অ্যাই, পাগলটাকে সাঁকো নাড়াতে বলিস না। জয়াই গাক।

বন্দনা আবার মুখ তুলেছে। ঘাড়টা হেলাল সামান্য। নরম স্বরে বলল,—গা না জয়া।

—একটা পুরনো গান গাই? জয়া নড়ে বসল।

—পুরনো গানই তো ভাল। গা।

গুনগুন করে গানটাকে একটু ভেঁজে নিল জয়া। তারপর খোলা গলায় গাইতে শুরু করল,—এই বালুকাবেলায় আমি লিখেছিনু/একটি সে নাম আমি লিখেছিনু/আজ সাগরের ঢেউ দিয়ে তারে যেন মুছিয়া দিলাম...

মিত্রা পুলু গুটি গুটি এসে বসল কাছে। জয়া গায় ভাল, এখনও সময় পেলে বসে হারমোনিয়াম নিয়ে। আজ, এই মুহূর্তে ওর স্বরটা যেন অন্য রকম লাগছিল। কোত্থেকে যেন এক চাপা বিষাদ এসে

ভর করেছে ওর গলায়, সমুদ্রকেও যেন থমকে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। এই জয়াই না একটু আগে খিলখিল হাসছিল? কোনটা সত্যি? ওই হাসি, না এই বিষণ্ণতা?

বন্দনা আবার মাথা নিচু করে বসে। গান শেষ করে আবার একটা গান ধরেছে জয়া, শেষ করে আবার একটা। মিত্রা গলা মেলাল জয়ার সঙ্গে, পুলুও। কোরাসে গাইছে সকলে, মাঝখানে নাচছে টুটুল।

চাঁদ উঠল। মায়াবী চাঁদ। সমুদ্রে এখন সোনালি জ্যোৎস্না।

একা একা শুভ্র

শালা, কিছুতেই আমি মাতাল হতে পারি না! যত ভাবি নেশায় চুরচুর হয়ে যাব, নেশা শালা তত আমাকে বুড়ো আঙুল দেখায়! লোকে বলে মদ খেয়ে নাকি দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে থাকা যায়! বকোয়াস, বকোয়াস, অল বকোয়াস। দেওদাসটা শালা পুরো ঢপ কেস ছিল। এই তো আমিই চার-পাঁচ পেগ টানার পরেও দিব্যি সজ্ঞানে বসে আছি! কোথায় নেশা? কোথায় নেশা? অ্যাই নেশা, তুই কোথায় রে?

আমি রোজ রোজ মাল খাই না। রেস্ত কোথায় অত, তা হলে তো ব্যাঙ্কের ক্যাশটা ভাঙতে হয়। ভালও লাগে না তেমন। ওই বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে মাঝেমধ্যে খেলাম, ব্যস। তবে হ্যাঁ, যখন খাই তখন চুটিয়ে খাই। যাকে বলে দিল খোলকে। ওই অন্তটার মতো খুচখুচ একটু খেলাম, পৌনে এক পেগ, ওটা আমার ধাতে নেই। কিন্তু আমার ব্রেনের কেসটা বেশ গড়বড়ে আছে। খেয়ে কোথায় ঝিম মারব, টলমল করব, তা নয়, ব্রেনসেলগুলো যেন আরও টনকো হয়ে ওঠে। কত কিছু যে স্পষ্ট হয়ে যায় তখন। ঘুণাক্ষরেও যা স্মৃতিতে নেই, তাও। সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো উচিত?

বন্দনা মাল খাওয়া একদম পছন্দ করে না। ওর বাপটা, মানে আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর টানুস টুনুস একটু বেশি করতেন বলেই বোধহয় ওই বস্তুটির ওপর ওর তীব্র অনীহা। খেয়ে শাশুড়িকে পেটাতেন কি? হতেও পারে। ওই বজ্জাত মেয়েছেলেটাকে দু-চার ঘা দেওয়াই উচিত। সজ্ঞানে না হলেও, অজ্ঞানে। শালী আমার বিয়েটাই কাঁচিয়ে দিচ্ছিল।

ওই মায়েরই যে মেয়ে বন্দনা তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। জিদ্দি, বেশি নীতিবাগীশ, দেমাকি...। কী সিনটাই না করেছিল দার্জিলিঙে। অফিসের বন্ধুরা দশ-পনেরো জন মিলে গেছি, এক দিনও কি আমোদ ফুর্তি করে বেচাল হতে নেই? জানুয়ারির ঠাণ্ডায় পাহাড়ে একটু উষ্ণ পানীয় লাগবে না? গোটা রাত বিছানাতেই এল না বন্দনা, ওই কনকনে শীতে ঠায় ব্যালকনিতে বসে রইল! কী, না আই হেট ড্রাঙ্কার্ডস! অন্তর ফার্স্ট ম্যারেজ অ্যানিভারসারিতে কী ইনসাল্টটাই না করল! ক' পেগই বা খেয়েছি, বড় জোর দুই কি তিন, তাতেই নবাবনন্দিনীর কী মেজাজ! সকলের সামনে! গটগট করে অন্তর বাড়ি থেকে স্ট্রেট বাপের বাড়ি চলে গেল। আজকাল চোদ্দো বছরের ছেলেরাও মাল খেয়ে উলটে পড়ে থাকছে, আর আমি একজন ম্যারেড ম্যান উইথ অ্যাকটিভ হ্যাবিটস, আমি একটু সুরা পান করব না? বেশ করব খাব। বন্দনা যা যা ডিসলাইক করে সবগুলোই করব। বন্দনা করে না? কত বার বারণ করেছি, হুটহাট বাপের বাড়ি ছুটবে না, কথা শোনে বন্দনা? যে শ্বশুর শাশুড়ি দায়ে পড়ে টেকি গিলেছিল, যারা এখনও জামাইকে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি, জামাই গেলে মৌনী বাবা মৌনী মা হয়ে যায়, কিংবা ড্যাবড্যাব করে অনন্ত টিভি গিলতে থাকে, জামাইকে আদর করে দুটো কথা বলার ফুরসত পায় না, তাদের কাছে সপ্তাহে তিন বার করে ছোটা কি শুভ্র ব্যানার্জিকে ইনসাল্ট করা নয়? কী সব অজুহাত! বাবা একটু কেশেছিল যে! মা হেঁচেছিল যে! নেকু। শুভ্র জ্বরে পড়ে ভুল বকলেও অফিস কামাই করে বন্দনা? কী এত মধু অফিসে, অ্যাঁ? চাকরি তো করিস গভর্নমেন্টে, একদিন না গেলে সরকার কি উলটে যাবে?

কান্না পাচ্ছে হঠাৎ। বন্দনা এমন পালটে গেল কেন? বাচ্চা কাচ্চা না হওয়ার জন্য? ডাক্তার তো বাবা দুজনেই দেখিয়েছি! নিজের কানে শুনেছে ডাক্তার বলেছে আমার কোনও দোষ নেই! বরং যেটুকু প্রবলেম, বন্দনারই। ট্রিটমেন্ট করালে ঠিক হয়ে যাবে। তা হলে? দেয়ার মাস্ট বি সাম থার্ড ম্যান! ব্যাঙ্কের এক পেটি ক্যাশিয়ারে বন্দনা আর হ্যাপি নয়, ওর চোখ আরও উঁচুতে কোথাও।

হাহ্, এখন তো এ সব ভাবনা আসতেই পারে বন্দনার। এই শুভ্র ব্যানার্জি কার জন্য নিজের কেরিয়ারকে দু হাতে পিষে ফেলেছিল, তা বন্দনার মনে রাখার কী দায়! হয়তো এখন হাওড়ার সেই কাপড়ের দোকানদারের ছেলেটার জন্য মনে মনে আপসোস করে। বন্দনার অত রূপ বোধহয় ওই বাতাসী মঞ্জিলেই মানাত।

থার্ড ম্যানটা আর কে হতে পারে? অন্তু? ওকে বন্দনা সিডিউস করার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু সুবিধে হবে না। অন্তু ইজ আ টাফ গাই। কী ন্যাকার ন্যাকাটাই না হয়েছে বন্দনা! জলকে আমার ভয় করে বলেই অন্তুকে জড়িয়ে নাচতে নাচতে সমুদ্রে নেমে গেল! মুখে তখন হাজার বাতির আলো। ইয়া এক ঢেউ এসে ভেঙে পড়ল অন্তু বন্দনার মাথায়, অন্তুকে জড়িয়ে ধরার জন্য বন্দনার তখন কী নির্লজ্জ আকুতি। হুঁ হুঁ বাবা, এই জন্য অন্তু বাড়িতে এলে মহারানি এত খুশি খুশি হয়ে ওঠেন। ওরে, অন্তু তোকে পাত্তা দেবে না। খুব শিক্ষা দিয়েছে আজ অন্তু, জলেই নামেনি। তাই কি মহারানি গুম আজ?

গেল কোথায় মেয়েরা? মার্কেটিং? আসে না কেন এখনও? মধুকে যখন সঙ্গে নিয়ে গেছে, তাইই হবে। প্যাকেট ট্যাকেট বয়ে আনার একটা লোক চাই তো।

—কী রে, গ্লাসটা শেষ কর। এমন ব্যোম মেরে গেলি কেন?

খিকখিক হাসলাম,—আমি এখন ব্যোমে আছি।

—শালা, তুই আউট হয়ে গেছিস।

—নট অ্যাট অল। ভাংরা নেচে দেখাব? কিংবা বল ড্যান্স? স্টেডি পা পড়বে।

অন্তু বিছানায় হেলান দিয়ে বসেছে, হাতে সিগারেট। ঠাণ্ডা গলায় বলল,—থাক, কেরামতি দেখাতে হবে না। তাড়াতাড়ি গ্লাস শেষ কর, জয়ারা ফিরলে ডিনারে যাব।

—এত তাড়াতাড়ি তো শেষ হবে না চাঁদু। চোখ টিপলাম,—বাকি বোতলটার তা হলে কী হবে, অ্যাঁ?

—আর বোতল কোত্থেকে আসবে? অন্তুর চোখে অবিমিশ্র বিস্ময়।

—আছে আছে। বলতে বলতে উঠলাম আমি। হোটেলের বেঁটে দেরাজ থেকে ওল্ড মংকের বড় বোতলটা বার করে আনলাম। অন্তুর নাকের সামনে নাড়িয়ে বললাম,—দিস ইজ দা থিং।

পুলু প্রায় আঁতকে উঠেছে,—এই শুভ্র, এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। হুইস্কির পর রাম।

—একটু রাম নাম ছাড়া জমে? খেতে খেতে কেত্তন গাইব...

অন্তু কড়া চোখে তাকাল,—কিনলি কখন রে ওটা? সারাক্ষণ তো তুই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলি!

—ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। বোতল টেবিলে রেখে সিগারেট ধরালাম,—হোটেলের বেয়ারাগুলো আছে কী করতে!

পুলু হেসে ফেলল,—পারিসও বটে।

গ্লাসের তলানিটুকু ঢেলে দিলাম গলায়। সোনালি পানীয় তরল আগুন হয়ে প্রবেশ করছে ভেতরে, স্নায়ু আরও টান টান হল। অন্তু কেন জলে নামল না আজ? বন্দনাকে এড়াতে চাইছে? অন্তু যদি সে লোকটা না হয় তা হলে হু ইজ দা থার্ড ম্যান? দীপু খুব ঘন ঘন আসছে বাড়িতে, সে ব্যাটা নয় তো? সাত জন্মে কোনও সম্পর্ক ছিল না, শিলিগুড়ি থেকে বদলি হয়ে এসেই তোর মামাতো দাদার ওপর এত ভালবাসা উথলে উঠল? ব্যাটা চাকরিটাও করে জব্বর, হাজার বিশেক তো পায়ই। আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভারসারিতে অবলীলায় একটা দামি কাঁথাস্টিচ প্রেজেন্ট করল বন্দনাকে। কী মুগ্ধ চোখে বন্দনার দিকে তাকিয়ে থাকে।

দরজায় শব্দ।

পুলু উঠে ছিটকিনি খুলে দিল। মিত্রা বন্দনা ঢুকেছে ঘরে, পিছনে মধু।

মিত্রা জোরে জোরে নাক টানল,—বাপস কী গন্ধ ঘরে! তোমরা শুরু করে দিয়েছ?

—শুরু কী গো! আমরা এখন মাঝদরিয়ায়।

—ওমা, কী মজা! মিত্রার চোখ পড়েছে সেন্টার টেবিলের বড় বোতলটায়,—এই শুভ্রদা, আমরাও একটু খাব।

বন্দনার কপালে বাষট্টিটা বিরক্তির ভাঁজ। গোমড়া গলায় বলল,—আমি ও সবের মধ্যে নেই।

ন্যাকামো। স্বামীর বন্ধুদের সামনে সতীপনার ভিডিও ক্যাসেট চালাচ্ছে আবার। কাল রাতে আরেকটু দাওয়াই দেওয়া উচিত ছিল।

বন্দনাকে তাতানোর জন্য হা-হা হাসলাম,—নিশ্চয়ই খাবে। তোমাদের জন্যই তো এখনও বোতলটা খুলিনি।

মধুময়ের হাতে যা ভেবেছিলাম তাই, ইয়া ইয়া দুটো প্লাস্টিক ব্যাগ। জানি ওটা উপুড় করলে কী কী বেরোবে। মোষের শিঙের শোপিস, হরিণের চামড়ার চটি, কটকি শাড়ি, বাগায়রা বাগায়রা। গড়িয়াহাট থেকে শ্যামবাজার সর্বত্র যা পাওয়া যায়। আজ পর্যন্ত কোনও মেয়েকে আমি পুরী এসে এ সব না কিনে ফিরতে দেখিনি। আজই কি আর মার্কেটিং শেষ। কাল আছে, পরশু আছে..

অন্তু জিজ্ঞাসা করল,—জয়া কোথায়? রুমে গেল?

—না, ডাইনিং হলে। টুটুল ঢুলছিল খুব। ওকে খাইয়ে ঘুম পাড়াতে নিয়ে যাবে।

মিত্রা বোতলটা হাতে তুলে লেবেল দেখছে। ভুরু বেঁকিয়ে বলল,—এটা কিন্তু খুব কড়া। আমি জানি।

বন্দনা বাঁকা সুরে বলল,— তুই তো অনেক কিছুই জানিস রে মিত্রা!

—না জানার কী আছে। আমি তো কত বার টেস্ট করেছি। জামাইবাবুরা খাইয়েছে, কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে খেয়েছি...

—ভাল লাগে ও সব?

—মন্দ কী! কী দারুণ একটা ঘোর আসে, আলোগুলো আবছা আবছা লাগে, পা যেখানে ফেলতে চাইছি সেখানে পড়ছে না... কী মজা যে লাগে! তুই খাসনি কোনওদিন?

বন্দনার মুখ আরও থমথমে। উত্তর না দিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলল,—এত সব কি আগে থেকেই কেনা ছিল?

মধু তড়িঘড়ি বলে উঠল,—আমি আনিনি। বিশ্বাস করো।

—কে বলেছে আপনি এনেছেন? বন্দনা খেঁকিয়ে উঠল,—সব দোষ নিজের ঘাড়ে নেন কেন?

মধু আরও সিঁটিয়ে গেল। বেচারা মেয়েদের ভীষণ ভয় পায়। জানে, ওর কপালে কোনও মেয়ে জুটবে না কোনওদিন। তার জন্য মধুর কি কষ্ট আছে? ওরে মধু, তুই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান। তুই ভাবতে পারিস কম, এ এক ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

পুলু বলল,—তা হলে আর দেরি করে লাভ কী? বোতলটা খুলে ফেলি? ...নাকি জয়ার জন্য একটুখানি ওয়েট করব?

অন্তু বলল,—জয়া কি রাম খাবে? বিয়ার হলে একটু টেস্ট ফেস্ট করত।

—আপনি তো খাবেন, তাই না? বন্দনা ঝট করে অন্তুর দিকে তাকিয়েছে। গলায় শ্লেষ।

অন্তু মুখ ফিরিয়ে নিল,—খাই একটু। এক যাত্রায় পৃথক ফল হলে আড্ডার সুর কেটে যায়। ...তুমিও আজ একটু টেস্ট করে দ্যাখো না। বি স্পোর্টিং।

আশ্চর্য, বন্দনা ফেটে পড়ল না, বরং জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো শান্ত হয়ে গেল সহসা। শুকনো হেসে বলল,—বেশ তো, খাব। মাতলামি করাকেই যদি আনন্দ বলা হয়, তবে নয় মাতালই হব।

রাগ দেখাচ্ছে বন্দনা? অভিমান? নাকি এ আমাকেই কটাক্ষ? কবে আমি মাতলামি করেছি, অ্যাঁ?

পুলু বোতল খুলে ফেলেছে। গ্লাসে গ্লাসে ঢালছে কালচে সুরা। মধুর হাতে জলের জগ, পর পর গ্লাসে জল মিশিয়ে দিল। কুণ্ঠিত মুখে।

বন্দনা জল টল মেশাল না। হাতের ইশারায় বারণ করল। সত্যি সত্যি নিট খাবে নাকি? সহ্য করতে পারবে না যে! বাধা দেব? তা হলে যদি উলটো...?

দরজায় আবার গুমগুম শব্দ। জয়া এল কি? হ্যাঁ, জয়াই। সরল চোখে ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছে সবার দিকে।

আহা, মেয়েটা ঢুকতেই গোটা ঘর যেন বদলে গেল। কী টলটলে চোখ মেয়েটার! কী একটা গান আছে না, চোখই মনের আয়না, না কী যেন? গায়ের রং সামান্য চাপা বটে, তবু ওই শ্যামলা রঙেই ওকে মানায় বেশি। বন্দনার মতো উদ্ধত দুর্বিনীত রূপ নেই জয়ার। জয়া যেন স্নিগ্ধ চাঁদের মায়া।

একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিলাম জয়ার দিকে,—চলবে?

জয়া ভিতু ভিতু লাজুক লাজুক চোখে অন্তর দিকে তাকাল,—ভাত খেয়ে এসেছি, এখন এ সব...?

—একটা সিপ দাও।

অন্ত দায়িত্বশীল স্বামীর মতো বলল,—ওকে আলাদা দিতে হবে না। আমার থেকেই চুমুক দিয়ে নেবে।

বন্দনা টেরচা চোখে এক মুহূর্ত দেখল অন্তকে। পরমুহূর্তে এক ঢোকে গ্লাস শেষ। মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে বন্দনার, জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে। আবার গ্লাস বাড়িয়ে দিল পুলুর দিকে,—নেক্সট?

মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মস্তিষ্ক এখন স্বচ্ছ রাখা দরকার। মিত্রার দিকে চোখ পড়ল। মিথ্যে চালবাজি মারেনি, ভালই অভ্যেস আছে মনে হয়। চুকচুক চুমুক দিচ্ছে, পাকা নেশাড়ুর মতো। পুলু ভালই কমপ্যানিয়ান পেয়েছে, দ্যাবা দেবি গলা জড়াজড়ি করে দিব্যি মাল টানতে পারবে।

মধুর গ্লাসও শেষ। একটু পেটে পড়লেই মধু জোর চাঙা হয়ে ওঠে। চিরকালই। একবার কালী পুজোর প্যান্ডেলের পিছনে আমরা ভাঁড়ে ঢেলে হুইস্কি খাচ্ছি, কোত্থেকে মধু এক কোয়ার্টার পাউন্ড পাঁউরুটি নিয়ে হাজির! ভাঁড়ে পাঁউরুটি ডুবোচ্ছে, কচকচ খাচ্ছে, আর হেঁড়ে গলায় শ্লোক আউড়ে চলেছে। সে যে কী উদ্ভট শ্লোক। না সংস্কৃত, না হিন্দি, না বাংলা, না ইংরিজি! হুইস্কি ভেজানো পাঁউরুটি শেষ করেই হুঙ্কার দিয়ে উঠল, মা মা, তারা কালী ব্রহ্মময়ী, বুকে পা দিয়ে চেপে ধর, মা, বদরক্ত সব বেরিয়ে যাক! পাড়ার বাবা কাকারা উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছিল, শেষ পর্যন্ত মাথায় এক বালতি জল ঢেলে শান্ত করতে হল ব্যাটাকে।

মধুর গুনগুন গান স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশ। উচ্চগ্রামে চড়ছে গলা। আপন মনে মাথা নাড়ছে মধু,—জুতায়ে করিব লম্বা, ঘুচে যাবে হম্বি তম্বা...জতায়েএ...এএএ...এএএ...

পুলু ফটাস একটা চাঁটি মারল,—অ্যাই, তোর গিটকিরি বন্ধ করবি?

জয়া মুখে আঁচল চেপে হাসছে,—কাকে জুতিয়ে লম্বা করবেন, মধুদা?

মধুর ভ্রূক্ষেপ নেই, সে তার সুরে অটল। তার গলায় এখন ফৈয়াজ খাঁ থেকে ভীমসেন যোশী সবাই একের পর এক ভর করবেন। হোটেলের ম্যানেজার না আমাদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বার করে দেয়!

জয়া ব্যালকনিতে চলে গেল।

বন্দনা আবার পাত্র ভরেছে। চোয়ালে চোয়াল ঘষে চুমুক দিল। উঠে দাঁড়াল টলতে টলতে। ধপাস করে এসে বসেছে বিছানায়, প্রায় অন্তর গা ঘেঁষে।

অন্ত সরে যাচ্ছে না কেন? স্মার্ট হাতে সিগারেট ধরাল অন্ত। রিঙ করছে ধোঁয়ার। আলগা ঘুরছে ফ্যান, হাওয়ায় ভেঙে যাচ্ছে বৃত্ত। এত কায়দা মারছে কেন অন্ত? নিজে স্টেডি আছে দেখাতে চায়? সবসময়ে বন্ধুদের থেকে এক কাঠি ওপরে থাকার ইচ্ছে? শালা, হিসেব করা খচ্চর। হি ইজ দা থার্ড ম্যান, আই বেট।

বন্দনা প্রায় ঢলে পড়েছে অন্তর গায়ে। ওরে তোরা দ্যাখ, তোরা দ্যাখ।

আমার নিশ্বাসে কি আগুন? আমি কি অন্তর কলার চেপে ধরব?

অন্ত বোধহয় টেলিপ্যাথি জানে, ঝড়াকসে উঠে দাঁড়িয়েছে। মেঝেয় থেবড়ে বসে পড়েছিল মধু, তাকে টেনে তুলল,—অ্যাই চল, তোকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মধু হাউমাউ করে কেঁদে উঠল,—আমায় তোরা মার, খুব মার অন্ত।

—কেন রে? তোর আবার কী হল?

—আমি একটা মাথামোটা। আমি তোদের যোগ্য নই। আমাকে তোরা মেরে ভাগিয়ে দে। লাথি মার, লাথি মার...

পুলু বলল,—শালা, এই জন্য ব্যাটার হাতে গ্লাস দিতে নেই।

মিত্রার চোখ ঘোলাটে হয়ে গেছে। এক হাতে কাঁধ জড়িয়ে ধরেছে পুলুর। শাড়িটার বেশ আলুথালু দশা।

পুলু মিত্রার গালে গাল ঘষল,—কী হে, তুমিও কি মাতাল হয়ে গেছ?

মিত্রা হি হি হেসে উঠল। হাসতে হাসতে এলোমেলো করে দিল পুলুর চুল।

জয়া ফিরেছে ঘরে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে সবাইকে। এতগুলো মাতালকে দেখে খুব মজা পাচ্ছে কি জয়া? ঘুরন্ত দৃষ্টি বন্দনায় এসে স্থির হল। মুচকি মুচকি হাসছে জয়া। মধুকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল অন্তু, মধু এখন বিছানায়। যে মধুকে বন্দনা ঘোরতর অপছন্দ করে, সেই মধুর পাশে গড়াগড়ি খাচ্ছে বন্দনা!

পেট গুলিয়ে হাসি উঠে এল। এ যে পুরো মিড সামার নাইটস ড্রিম। গাধার মাথাঅলা বটম ছুতোরের পাশে অকাতরে শুয়ে আছে মহামান্য জিউসের পত্নী!

মিত্রার হাসি থামছেই না। হেসে কুটিপাটি খাচ্ছে।

জয়া মিত্রাকে ধরে নাড়া দিল,—এই মিত্রা, থাম থাম। হচ্ছেটা কী?

মিত্রা শিথিল হাত দোলাল,—কাণ্ডটা দ্যাখ! নিজে আউট হয়ে আমায় জিজ্ঞেস করছে হিহিহি...

পুলুর ঘাড় ঝুলে গেছে। কোনওক্রমে মাথা তোলার চেষ্টা করল,—মাইরি বলছি মিত্রা, তুমি আউট।

—না, তুমি আউট।

—না, তুমি।...একদম ঝাপসা হয়ে গেছ।...এই জয়া, আলোটা কী ডিম রে!

জয়া ওদের দুজনের কাঁধে হাত রাখল,— এই, তোরা ঘরে যা।

পুলু আর মিত্রা আবার হেসে পরস্পরের গায়ে পড়ে গেল।

মিত্রা নাকী সুরে বলল,—এই, তোমার খোঁমাটা এঁমন বেঁকে গেঁছে কেন? সোজা করে দেব? নাও, একটু খেলেই সোজা হয়ে যাবে।

অন্তু গম্ভীর স্বরে বলল,—পুলু, খাবি চল।

—খাচ্ছি তো। দে, আরেকটু দে।

—না। আর একটাও নয়। চল আমার সঙ্গে।

মিস্টার অ্যান্ড মিসেস অনুতোষ এখন মাতাল সামলানোর ব্রতয় নেমেছেন! উত্তম।

অন্তু কটমট চোখে আমার দিকে তাকাল,—অ্যাই তুই, তুই হচ্ছিস পালের গোদা। কী দরকার ছিল...? আমি মধু পুলুদের ঘরে পাঠাচ্ছি, তুই বন্দনাকে দ্যাখ।

—তুই বন্দনাকে দেখতে পারছিস না? কে যেন আমার মুখ দিয়ে বলে ফেলল,—তোরই তো ওকে দেখা উচিত।

অন্তু কি চমকাল একটু? বোঝা গেল না। আমারও দৃষ্টি ক্রমে ঘোলাটে হয়ে আসছে। সবকিছু কেমন অস্পষ্ট, ধোঁয়া ধোঁয়া।

জয়া মিনতি করার ভঙ্গিতে বলল,—এই শুভ্রদা, প্লিজ। আপনি তো মোটামুটি ঠিক আছেন, এবার শেষ করুন না।

বোতলে সামান্য কালচে সুরা পড়ে আছে এখনও, বোতল থেকেই চলে গেল কণ্ঠনালিতে। দু হাত উলটে দিয়ে বললাম,—ব্যস, ফিনিশড।

পুলু আর মিত্রা টালমাটাল পায়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে। অন্তুর হাত মধুর কাঁধে, এক পা গিয়েই টলে গেল মধু, শক্ত হাতে অন্তু ধরে নিল তাকে। একা অন্তু সামলাতে পারছে না, হাত লাগিয়েছে জয়াও। মাথায় কিছু না থাকলেও ঘাড়ে গর্দানে মধু তো কম নয়।

অন্তুর বুক ফুলিয়ে প্রস্থান পছন্দ হচ্ছে না আমার। পিছন থেকেই তীর ছুড়লাম,— কীরে, কাটছিস যে? বন্দনাকে কে দেখবে?

অন্তু থামল, কিন্তু ঘাড় ঘোরাল না,—তুই দেখবি। ওঠ, বিছানায় চলে যা।

—নো। তুই বন্দনাকে নিয়ে যা। ও তোর। ইওরস, অ্যান্ড ইওরস, অ্যান্ড ইওরস।

অন্তু জয়ার দিকে তাকাল,—দেখেছ তো, শুভ্র নাকি আউট হয় না।

অন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হা ঈশ্বর, আবার জিতে গেল অনুতোষ! এই হট্টগোলের মধ্যেও ঠিক মাপ মতো পান করল, মাপ মতো কথা বলল, মাপ মতোই সামলাল সকলকে। আর শুভ্র ব্যানার্জি একটা বোকা সার্কাসের ক্লাউনের মতো উলটোপালটা বকে বুরবক বনে গেল। শুভ্র, তুই আটার ফেলিওর।

শূন্য ঘর। নিষ্প্রভ আলো। স্তূপীকৃত গ্লাস বোতল। সোফায় প্লাস্টিক ব্যাগ। কার্পেটে বালিশ। জগ উলটে গিয়ে জল গড়াচ্ছে।

গড়াক, সব গড়িয়ে যাক। সংসারই যেখানে গড়াচ্ছে...

একটা গন্ধ নাকে ঝাপটা মারল। এই ঘর থেকেই আসছে কি? কীসের গন্ধ? হুইস্কির? রামের? নাকি পেচ্ছাপের? বাথরুমের দরজা হাট হয়ে আছে, বন্ধ করতেও ইচ্ছে করছে না। হাঁটি হাঁটি পা পা করে বিছানায় এলাম। বসেছি। বিচিত্র ভঙ্গিতে শুয়ে আছে বন্দনা, উপুড় হয়ে, হাত ছড়িয়ে, ঘাড় হেলিয়ে। বিছানার একেবারে মধ্যিখানে।

গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম,—এই যে, ওঠো, ঠিক হয়ে শোও।

বন্দনার বোজা চোখ খুলল না। টেনে টেনে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল,—উঠব না। তুমি পাশে এসো। এসো না, প্লিজ।

কাকে খোঁজে বন্দনা? আমাকে, নাকি থার্ড ম্যানকে? ঝুঁকলাম সামান্য। বন্দনার পিঠে ভর রেখে। ওই তো সেই মুখ, টোলপড়া গাল, ওই তো কমলালেবুর কোয়ার মতো ঠোঁট! সবই তো এক আছে বনো, তবে তুমি কেন বদলে গেলে? সন্দেহও তো ভালবাসাই, এটুকু বোঝ না?

কান্না পাচ্ছে আবার। মুচড়ে উঠল বুকটা। কোন এক অদৃশ্য বেহালাঅলা ছড় টানছে পাঁজরে। ওথেলোও তো কেঁদেছিল, না কি?

আরে যাহ, আমি বোধহয় মাতালই হয়ে গেছি!

মিত্রার মন

বিছানায় রোদ পড়তেই ঘুমটা ছিঁড়ে গেল। চোখ খুলতে পারছি না, কে যেন ভারী পাথর বসিয়ে দিয়েছে পাতায়। মাথাটার কী হাল রে বাবা, এ যেন একেবারে দশ-মনি বোঝা! আমি কোথায়?

পিটপিট করে তাকালাম। আলো সওয়াচ্ছি চোখে। হ্যাঁ, এ তো আমাদেরই ঘর, ব্লু লেগুনের দুশো তিন। পাশে পল্লব, হাত পা ছড়িয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মুখটা কী বিশ্রী হাঁ হয়ে আছে পল্লবের। কটা বাজে এখন? সাতটা? আটটা? ঠেলে তুলে দেব পল্লবকে?

চোখ রগড়ে উঠে বসতেই মাথা ঝিমঝিম। কে যেন ডাঙশ মারছে মাথায়। বাথরুম আর ক পা, এটুকু যেতেই কষ্ট হচ্ছে বেশ। শরীরের গাঁটে গাঁটে কী ভীষণ যন্ত্রণা। কাল কি খুব বেশি খেয়ে ফেলেছিলাম? ছিলাম তো বন্দনাদের ঘরে, ফিরলাম কখন? ছি ছি, নির্ঘাত টোটাল আউট হয়ে গিয়েছিলাম! কী কী কাণ্ড করেছি কে জানে! অন্যরা কী অবস্থায় ছিল? পল্লব খুব হাসছিল, মধুদাও কী সব চেঁচাচ্ছিল, আর...আর...? দূর ছাই, কিচ্ছু মনে পড়ছে না।

বেড-টি কেন দিয়ে যায়নি আজ? নাকি এসেছিল, দরজায় ধাক্কা মেরে ফিরে গেছে? বাথরুম ঘুরে এসে বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে চা দিতে বললাম। ডাকব পল্লবকে, যদি না ওঠে দু কাপই মেরে দেব। তাতে যদি মাথাটা ছাড়ে!

ইস, কী চেহারা হয়েছে মুখের! চোখ দুটো ফোলা ফোলা, কাজল ধেবড়ে আছে, সিঁদুর কপালে মাখামাখি, চুলের কথা তো অকহতব্য। কী জট রে বাবা, চিরুনি চালাতে মাথা টনটন করে উঠছে! নাহ, কাল একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছি। কেন যে অমন ফাঁট মারতে গেলাম? সত্যি সত্যি জীবনে কটা দিনই বা ড্রিঙ্ক করেছি আমি? বড় জামাইবাবুর বাড়িতে বার দুয়েক বিয়ার, মেরে কেটে এক গ্লাস করে, আর মেজো জামাইবাবুর গ্লাস থেকে একদিনই মাত্র হুইস্কিতে চুমুক, ব্যস। না না, আরেক দিন সেই কলেজের পিকনিকে। সৌম্য অনীশ মালবিকা তনুশ্রী সবাই খাচ্ছিল, সেদিন বড় জোর এক পেগ। রাম আমি জন্মে ছুঁইনি। কী কড়া রে বাবা, একেবারে আছড়ে ফেলে দিয়েছে! খেতে কিন্তু তখন বেশ লাগছিল। মাথাটা হালকা হালকা, হাত পা ল্যাল ল্যাল করছে, মনে হচ্ছে যেন শূন্যে হাঁটছি আর গোঁত খাচ্ছি...। পল্লবকে আরেক দিন উসকোতে হবে, ফেরার আগের দিন। রাম না খাই, হুইস্কিই খাব, তাতে নিশ্চয়ই এত হ্যাঙওভার হবে না। হিহি, হ্যাঙওভার! আমার হ্যাঙওভার! শ্বশুর শাশুড়ি শুনলে মূর্ছা

যাবেন।...বন্দনাটা না আবার ব্যাগড়া দেয়।

দাম্ভিক মেয়েটাকে বোঝা দায়। খাস না খাব না করেও চৌ চৌ অনেকটাই তো টানল। পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ, ও আমি অনেক দেখেছি!

ওফ্, পল্লবের কী নাক ডাকছে! এখনও। এমন তো ডাকে না সচরাচর, এও কি মদ্যপানের পার্শ্বক্রিয়া? পল্লবও বেশ জমিয়ে টানতে পারে। মিছিমিছি সেদিন দিদির ওখানে ঢঙ করে বলল, আমার ও সব অভ্যেস নেই।

শ্বশুরবাড়িতে এক অদ্ভুত মুখ করে থাকে পল্লব! যেন ভীষণ ভালমানুষ, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। অ্যাক্টিং।

খাটে এসে আলগা ধাক্কা দিলাম পল্লবকে,—অ্যাই ওঠো, বেলা হয়ে গেছে।

পল্লবের নাক থামল। পাশ ফিরে শুয়েছে। একবার তাকিয়েই চোখ বুজে ফেলল,—কটা বাজে?

—সাড়ে নটা।

—সে কী, ডাকোনি কেন? পল্লব ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। জলহস্তীর মতো হাই তুলল কয়েকটা। সুখী বেড়ালের মতো আড়মোড়া ভাঙছে। আমাকে জড়িয়ে চকাস করে চুমু খেল,—ওরা উঠেছে?

—কী জানি! মনে হয় আমরাই ফার্স্ট।

পল্লব চোখ টিপল,—খুব হুল্লোড় হল কাল, কী বলো?

—সেই মস্তির ঠেলাই তো সব সামলাচ্ছে এখনও। কলেজের ভাষা বেরিয়ে গেল আবার। পল্লবের কাঁধে মাথা রাখলাম,—মাথা যা ধরে আছে না।

পল্লব শশব্যস্ত,—ওষুধ খাওনি কেন? ব্যাগে তো স্যারিডন ম্যারিডন আছে।

—আমার ওষুধ খেতে ভাল লাগে না।

পল্লবের চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে গেল,—মাথা টিপে দেব?

—থাক। তুমি কি আর মাথা টিপেই থামবে?...কাজের কাজ করো, মুখ টুখ ধুয়ে নাও, রেডি হয়ে সমুদ্রে যাই চলো।

—যদি আজ স্নানে না যাই?

—তা হলে আমি একাই যাব। সমুদ্রে না নামলে শরীর ঠিক হবে না।

—তুমি বড্ড বেরসিক। বেজার মুখে উঠে পড়ল পল্লব। অলস পায়ে বাথরুমে ঢুকেছে।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল। কাপে চুমুক দিতে দিতে ব্যালকনিতে গিয়ে বসলাম। সমুদ্রতীরে যথারীতি স্নানার্থীদের ভিড়। দুটো একদম গেঁড়ি গেঁড়ি বাচ্চা বালিতে ছুটছে উদ্দাম, ধপাস করে পড়ে গেল, কাঁদল না, আবার উঠে ছুটছে। চড়া রোদ পড়ে সমুদ্র এখন নীল নয়, প্রায় বর্ণহীন। বহু বহু দূরে একটা কালো বিন্দু, ও কি কোনও জাহাজের মাস্তুল?

কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। দরজা খুলেই দু পা পিছিয়ে এলাম। মধুদা। পরনে সেই কিম্ভূতকিমাকার হাফপ্যান্ট, খালি গা, দু হাতে দুটো ব্রেকফাস্টের প্লেট। এই পোশাকেই গোটা হোটেল ঘুরে বেড়াচ্ছে? লজ্জাশরমও নেই?

দাঁত বার করে হাসল মধুদা,—কী ঘুম ঘুমোচ্ছিলে গো? তোমাদের ব্রেকফাস্ট সেই কখন থেকে আমরা ঘরে রেখে দিয়েছি।

কিছু একটা বলতেই হয়। বললাম,—থ্যাংক ইউ।

—চা কিন্তু পাবে না। দু বার এসে ফিরে গেছে।

চা পান যে হয়ে গেছে বলার প্রয়োজন বোধ করলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম,—জয়ারা কোথায়?

—ঘরে। সকালে উঠে আমি জয়া টুটুল আর অন্তু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। অনেক দূর। যা ঝিনুক কুড়িয়েছি না, পুরো একটা দোকান হয়ে যাবে। বলতে বলতে হেঁ হেঁ হাসছে।

পলকের জন্য মনে পড়ে গেল রাতের দৃশ্যটা। উৎকট চেঁচাচ্ছিল মধুদা! মুখ দিয়ে তখন লালা ঝরছিল।

গা ঘিনঘিন করে উঠল। বললাম,—ঠিক আছে, আপনি ওগুলো রেখে চলে যান, আমরা আসছি।

মধুদা বিছানায় গিয়ে বসল। আচ্ছা বেহায়া তো, যেতে বললেও যায় না? ইতিউতি তাকাচ্ছে।

পল্লবের চা রাখা আছে টেবিলে, দেখলও সেটা। তার পরও প্রশ্ন,—পুলু নেই? বেরিয়েছে বুঝি?

আমি নয়, পল্লবই বাথরুম থেকে উত্তর দিল,—হ্যাঁ রে, আমি একটু মন্দিরে গেছি।

—ও, তুই পায়খানায়?

অসহ্য। একে কি গলাধাক্কা দিয়ে বার করতে হবে? সেই বিশ্রী চাহনি, যেন চাটছে আমায়! লজ্জাও নেই, কাল অত বকুনি খেল...!

কটমট করে তাকালাম। পাত্তা না দিয়ে কামড় বসালাম টোস্টে। চিবোতে চিবোতে বিছানা টান করছি। তবু নড়ল না লোকটা, যেখানটা বসে আছে সেখানটা একটু ঝেড়ে পা গুটিয়ে বসল। একগাল হেসে বলল,—তোমরা দুজনেই কালকে একদম আউট হয়ে গেছিলে।

—তো?

—না, মানে শুধু তোমরা নও, জানো তো, বন্দনা পুরোপুরি ডাউন। সারারাত বমি টমি করে...এখন একেবারে নেতিয়ে পড়ে আছে।

—সে কী? কথা বলতে না চেয়েও বলে ফেললাম।

—হ্যাঁ গো, জীবনে তো কখনও খায়নি, একবারে ওভারভোজ হয়ে গেছে।

আমারও কেমন যেন মন বলছিল, কিছু একটা হবেই। বড় জামাইবাবু সবসময়ে বলে, মাল সইয়ে সইয়ে খেতে হয়। কাল যা ঢকঢক করে গিলছিল বন্দনা। নভিশদের বোধহয় এমনটাই হয়।

একসঙ্গে এসেছি, চিন্তিত হওয়াটাই শোভন। গলা উঠিয়ে বললাম,—এই, তুমি তাড়াতাড়ি বেরোও। বন্দনার শরীর ভাল না, কী সব বমি টমি করেছে।

পল্লব তোয়ালে পরে বেরিয়ে এসেছে। গালভর্তি সাদা সাবান, হাতে রেজার। ট্যুরে এসেও পল্লব টিপটপ থাকে। অভ্যেস।

পল্লব কিছু প্রশ্ন করার আগেই চোখের ইশারায় বললাম, লোকটাকে তাড়াও।

ঠিক বুঝে গেছে পল্লব। এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে স্থির করে নিল ইতিকর্তব্য। নিচু হয়ে চায়ের কাপে আঙুল ছোঁয়াল। নিপুণ অভিনেতাদের মতো বলে উঠল,—অ্যাহ্, এ তো একদম ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে রে।

মধুদা নির্বোধ চোখে তাকাল,—ও, তোরা চা পেয়েছিস?

—নয়তো এটা কী? ঘোলের শরবত? যা, এক কাপ আরও নিয়ে আয়। একদম গরম গরম, ধোঁয়া ওঠা।

গলায় আহ্লাদিভাব ফোটালাম,—আমার জন্যও এক কাপ আনবেন মধুদা, প্লিজ।

লোকটা গলে গদগদ হয়ে চলে গেল। প্রায় লাফাতে লাফাতে।

পল্লব খ্যাকখ্যাক হাসল,—দেখলে তো, পাঁঠাটা সঙ্গে থাকলে কী লাভ? কত কাজে লাগে...! বাই দা বাই, তোমার কী পাকা ধানে মই দিচ্ছিল ব্যাটা?

—যা ঝাড়ি মারছিল! ওর সামনে থাকা যায় না।

—আরে বাবা, কত বার বলব, ওটা ঝাড়ি নয়। অ্যাবনরমাল। অ্যাবনরমাল লোকেদের দৃষ্টি কখনও নরমাল হয়?

—কীসের অ্যাবনরমাল বুঝি না বাপু। খাচ্ছে দাচ্ছে, বগল বাজাচ্ছে...

—সত্যিই ও সুন্দর বগল বাজায়। পল্লব মুখের কথা কেড়ে নিল,—যা ফাইন একটা আওয়াজ করে না...

—তুমি থামবে?

পল্লব রণে ভঙ্গ দেওয়ার ভঙ্গিতে দু হাত তুলে বাথরুমে চলে গেল। দরজা খোলা, দাড়ি কামাচ্ছে আয়নায়।

ওখান থেকেই বলল,—বন্দনার ব্যাপারটা কিছু বুঝলে?

—বোঝার কী আছে! অনভ্যাসের নেশা...

—অত সোজা কেস নয় ম্যাডাম। ...বন্দনা শুভ্রকে টাইট দিচ্ছে।

—বমি করে?

—ও সব পারে। লক্ষ করছ না, এখানে এসে অন্তুর সঙ্গে বেশি মাখামাখি করছে? ওটাও ইচ্ছে করে। শুভ্রটা একটু কমপ্লেক্সে ভোগে তো...

—কীসের কমপ্লেক্স? শুভ্রদারও যথেষ্ট হ্যান্ডসাম চেহারা।

—রাখো তোমার হ্যান্ডসাম। বন্দনার কাছে শুভ্র? মুখে আফটারশেভ লোশান থুপতে থুপতে ঘরে এল পল্লব। আয়নায় দাঁড়িয়ে দু-চার বার হাত বোলাল গালে। কপাত করে একটা ডিমসেদ্ধ তুলে মুখে পুরল। খেতে খেতে বলল,—বন্দনার কথা ছাড়ো। এক বেলা রেস্ট নিয়ে নিলে ঠিক হয়ে যাবে।

—তা হয়তো হবে।... কাল না খেলেই পারত।

—হুঁ। পল্লব হঠাৎ চোখ টেরচা করল,—এই, তুমি আমায় একটা সত্যি কথা বলবে?

—কী?

—গুল মারবে না কিন্তু। ...তোমার কি বিয়ের আগে মাল খাওয়ার হ্যাবিট ছিল?

—এমা, না। মাইরি না। তোমায় ছুঁয়ে বলছি। কালই প্রথম...

কেন অনর্থক মিথ্যে বললাম? মিথ্যেই বা কোথায়, আধা সত্যি। এক-দুবার ছোঁয়াকে না ছোঁয়াই বলে।

হালকা মনে বললাম,—গা'টা কিন্তু এখনও ম্যাজ ম্যাজ করছে। কী করে হ্যাঙওভার কাটানো যায় বলো তো?

—দুটো উপায় আছে। পল্লব মুখ টিপে হাসল,—এক, আরেকটু নতুন করে খেয়ে নেওয়া। আর দ্বিতীয়টা একেবারে মহৌষধ। সেটা অবশ্য মুখে বলার থেকে করে দেখানোই সোজা। পল্লব চোখ মারল,—দেখাব?

—কানকি মেরো না। এত ক্ষিধে কেন, অ্যাঁ? কলা খাচ্ছ, তাই খাও না।

পল্লব বোধহয় আরও কিছু আদিরসাত্মক কথা বলতে যাচ্ছিল, ভেজানো দরজা ঠেলে আবার বোকা লোকটা ঘরে ঢুকেছে। সঙ্গে অন্তুদা, জয়া। টুটুলও আছে, পরনে মিষ্টি একটা লাল সুইমিং কসটিউম।

অন্তুদা গমগম করে হাসল,—কী, খোঁয়াড়ি কাটল?

হায় রে, সারাদিন এরা আমার পেছনে লাগবে? ঠোঁট উলটে বললাম,—ইশ, নিজেরা একটুও না খেয়ে আমাদের খাইয়ে মজা দেখলেন, এখন আওয়াজ মারা হচ্ছে?

জয়া চোখমুখ কুঁচকোল,—বাবাহ্, কী বিচ্ছিরি খেতে! এক চুমুক খেয়েই আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসছিল।

—ওইটুকু খেলে অমনই লাগে। তুই তো আসল মজাটাই পেলি না। শরীর থেকে মনটা একদম আলাদা হয়ে যায়। মনে হয় আমি বুঝি আর আমাতে নেই।

—সেটা কী গো কাকিমা? টুটুল পুট করে বলে উঠল,—আমিও মজার জিনিস খাব।

—হ্যাঁ, ওটাই তোমার খাওয়া বাকি আছে তো! জয়ার লঘু ধমক।

অন্তুদা গম্ভীর মুখে বলল,—এবার টপিক পালটাও। ...চটপট তৈরি হয়ে নাও তো দেখি। এর পর জলে নামলে কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না।

পল্লব জিজ্ঞাসা করল,—শুভ্রদের কী হবে?

—ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। বন্দনা তো নিশ্চয়ই বেরোবে না। অন্তুদা জয়াকে বলল,—যাও তো, ওদের আরেক বার দেখে এসো।

জয়া টানল আমাকে,—চল তো!

শুভ্রদা দরজা খুলেছে। মুখ চোখ শুকনো, চোখের নীচে কালি।

হাসল, কিন্তু কষ্ট করে,—কী গো, সুন্দরী মেয়েরা? কী বা বারতা? কহো।

—বন্দনা এখন কেমন?

পর্দা সরিয়ে বন্দনাকে দেখিয়ে দিল শুভ্রদা। দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে বন্দনা, গায়ে একটা পাতলা চাদর।

জয়া জিজ্ঞাসা করল,—এখনও ঘুমোচ্ছে?

শুভ্রদা মাথা দোলাল,—ঘুমোচ্ছে, জাগছে, এখন বোধহয়...

—বমি হয়েছে আর?

—নাহ্। ওই সারা রাতই যা...

জয়া মুখ ঘুরিয়ে একবার আমায় দেখে নিল। তারপর চাপা স্বরে প্রশ্ন করল,—আপনি সমুদ্রে যাবেন?

—গেলে মন্দ হয় না, শরীরটা একটু ছাড়ত। শুভ্রদা ঘাড়ে হাত বোলাল,—সেই কোন রাত থেকে জাগা...

—তো একটু ঘুমিয়ে নিন না। বন্দনার কাছেও থাকা হবে...আমার তো মনে হয় বন্দনাকে একা ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়।

কী মেয়ে রে বাবা! বন্দনা অন্তুদা এখানে এসে যা করছে, যে কেউ দেখে বলবে ওদের মধ্যে একটা কিছু আছে! সেদিন জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার জন্য জয়া অত করে সাধল অন্তুদাকে, সবাই গেল, অন্তুদা কিছুতেই নড়ল না, আর বন্দনা তো আগে থেকেই.. জয়ার মনে কি একটুও খটকা লাগেনি? কেমন উদার বড়দি বড়দি ভাব করে কথা বলছে দ্যাখো! আমি হলে তো বাবা বন্দনার খবরই নিতাম না। জয়াটা বোকা বোকা বোকা, রামবোকা। মধুময় নন্দীর পরিশীলিত সংস্করণ।

মনে মনে স্থির করে ফেললাম, জয়াকে একটু জ্ঞান দিতে হবে। ওর একটু চোখ ফোটা দরকার।

জয়া ঘরে ঢুকতে সামান্য ইতস্তত করছে। শুভ্রদা বলল,—যাও না। ডেকে দ্যাখো ওঠে কিনা...পুলু অন্তুরা কোথায়?

—আমার ঘরে। আমিই উত্তর দিলাম এবার।

চোখ কুঁচকে এক সেকেন্ড আমায় দেখল শুভ্রদা। অন্যমনস্ক মুখে ঘরে ফিরল একবার, সিগারেট দেশলাই নিয়ে আমাদের ঘরে চলে গেল।

কী ভীষণ বিচলিত দেখাচ্ছে শুভ্রদাকে। আহা রে, ওরকম একটা বউয়ের পাল্লায় পড়ে বেচারার জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল।

জয়া বন্দনার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমিও গেলাম।

বন্দনা যেন টের পেল আমাদের উপস্থিতি, সহসা চোখ মেলেছে। ফ্যাকাশে হাসল,—ও, তোরা?

জয়া বসল খাটে। বন্দনার চুলে হাত বুলিয়ে দিল,—কী রে, কী কষ্ট হচ্ছে এখন?

বন্দনার হাসি আরও ম্লান,—এখন বেটার।

জয়া কোমল স্বরে বলল,—কেন জেদ করে কাল অতটা খেতে গেলি? সকলের কি সব সহ্য হয়? দেখলি না, আমি মুখে একটু ছুঁইয়েই রেখে দিলাম?

বন্দনা নিশ্চুপ। দু ফোঁটা জল জমেছে চোখের কোলে।

জয়ার স্নেহমাখা স্বরে যেন জাদু আছে। কোথ্থেকে যেন একটু একটু মায়া আমার বুকেও সংক্রামিত হচ্ছিল। ইশ, কী চোখমুখ বসে গেছে মেয়েটার! ফিকে গোলাপি রং ক্যাটক্যাট করছে, অ্যানিমিক রুগির মতো।

মৃদু গলায় বললাম,—ওষুধ টষুধ খেয়েছিস কিছু? বমির জন্য?

—না।

—মধুদাকে দিয়ে আনাব?

—লাগবে না রে। আর একটু রেস্ট নিলেই ফিট হয়ে যাব।

—খাসনি তো কিছু নিশ্চয়ই? একটু শরবত টরবত করে দিতে বলব হোটেলে?

—না রে।

—কোল্ড ড্রিঙ্কস আনাব, খাবি?

—না রে। বন্দনা নাক কুঁচকোল,—ভাল্লাগছে না।

—কিছু না খেলে আরও কাহিল হয়ে পড়বি কিন্তু।

—বললাম না, ভাল্লাগছে না।

জয়া চোখ পাকিয়ে তাকাল,—অ্যাই মেয়ে, কী তখন থেকে ভাল্লাগে না ভাল্লাগে না করছিস? ...মিত্রা যা তো, অন্তুকে একবার ডেকে আন তো। ও না ধমকালে এ বেটি সিধে হবে না।

প্রায় স্তম্ভিত হয়েই ঘরে চলে এলাম আমি। মুখের কথা খসাতেই অন্তুদা আর পল্লব হন্তদন্ত হয়ে ও ঘরে গেল। শুভ্রদা শুয়ে আছে আমাদের বিছানায়, চোখ বুজে। নড়ল না। কেমন যেন অস্বস্তি লাগল আমার। গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম,—টুটুল মধুদা গেল কোথায়?

শুভ্রদা তাকাল,—মধু টুটুলকে নিয়ে জলে নেমে গেছে। টুটুলের আর তর সইছিল না।

—এমা, একা মধুদার সঙ্গে ছেড়ে দিলেন?

—তো কী আছে? মধু খুব ভাল সাঁতার জানে।

—সমুদ্রে সাঁতার জানা তেমন কাজে লাগে না! টুটুল কোথায় কোন দিকে ছুটবে, মধুদা ভুসো মক্কার মতো তাকিয়ে থাকবে...

—সে চান্স নেই। মধুকে ডিউটি অ্যালট করলে কদাচ ফাঁকি মারে না। টুটুলের হাত মধু ছাড়বেই না।

তবু আমার ভাল লাগল না। আর একজন কারুর অবশ্যই সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল। ব্যালকনিতে গিয়ে চোখ রাখলাম পাড়ে। ভিড় এখন বেড়ে গেছে খুব। এক জায়গায় অনেকটা নেমে গেছে বালিয়াড়ি, ওখানে কেউ থাকলে এখান থেকে দেখতে পাওয়া মুশকিল। যাক গে যাক, অন্তুদার মেয়ে, অন্তুদারই যখন মাথাব্যথা নেই...

শুভ্রদা কী যেন বলছে ঘর থেকে।

ফিরলাম ঘরে,—ডাকছেন, শুভ্রদা?

—ভাবছি আর স্নানে যাব না। তোমরাই চলে যাও। আমার এখন শুয়ে থাকতেই ভাল লাগছে।

—বেশ তো, থাকুন না। ভাল করে ঘুমিয়ে নিন, বিকেলে একদম ঝরঝরে হয়ে বেরোবেন।

—ঘুম আর আসবে না। শুয়ে থাকাটুকুনই আরাম। বিশেষ করে তোমাদের এই বিছানাটায়।

—ওমা, সে কী কথা! কেন? কী এমন মহৎ গুণ আছে এই খাটের?

—আছে একটা গুণ। সুন্দর সুখী কাপলের গন্ধ লেগে আছে।

—যাহ্, কী যে বলেন না! হঠাৎ বুকে রক্ত চলকে উঠল আমার। অস্ফুটে বললাম,—পৃথিবীতে সব কাপলই সুখী, সব কাপলই অসুখী। সুখ অসুখ খুব রিলেটিভ ব্যাপার শুভ্রদা। আপনি যদি আপনাকে দুঃখী ভাবতে চান, তা হলে আপনি দুঃখী। আবার সুখী ভাবতে চাইলে সুখী।

—কী বলে রে মেয়েটা? পুলু যদি একটা অন্য মেয়ের সঙ্গে ভেগে যায়, তা হলেও তুমি একই কথা বলবে?

বাস্তবে কী ঘটলে কী করব বলা কঠিন। তবু সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বললাম,—পল্লবের যদি আমাকে পছন্দ না হয়, যদি না বনে, অন্য কোথাও যেতেই পারে। তা বলে আমি হাপুস নয়নে কাঁদতে বসব কেন? আমি যেমন আছি তেমনই থাকব। মনে করব যা ঘটার ছিল, তাই ঘটেছে।

—তুমি যে স্টোয়িক ফিলজফি আওড়াচ্ছ হে? বিএ-তে ফিলজফি কম্বিনেশান ছিল বুঝি?

হাসলাম,—বই পড়ে দর্শন আসে না শুভদা। জীবন থেকেই আসে।

—হবে হয়তো। তবে দর্শনের কচকচিতে না গিয়ে বলতে পারি তোমাদের বিছানায় শুয়ে মনে হচ্ছে, এখানে হয়তো বহুদিন পর নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব। অফকোর্স তোমার যদি আপত্তি না থাকে।

—ছি ছি, এ কী কথা। থাকুন না শুয়ে, আমি তো এখন সমুদ্রেই চলে যাব।

কথাটা বললাম বটে, তবু বুকটা কেমন যেন ঢিপঢিপ করে উঠল। কেন উঠল কে জানে! মায়া? করুণা? অন্য আর কী হবে?

সালোয়ার কামিজ নিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম। কাল রাতের শাড়িটাই পড়ে আছি এখনও, একেবারে ক্রাশড হয়ে গেছে। ড্রিঙ্কস ট্রিঙ্কসও পড়েছে, সাবানে ভিজিয়ে দেব? থাক গে, কলকাতায় গিয়ে লন্ড্রিতেই দিয়ে দেওয়া যাবে। স্নান সেরে ফিরে এ শাড়ি থোপাথুপির জোস থাকবে না। পল্লবকেও হুকুম করাটা অমানবিক হবে।

পোশাক বদলে তোয়ালে কাঁধে বেরিয়েই দেখি সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে শুভ্রদা। নিখাদ ঘুম। সমলয়ে নিশ্বাস পড়ছে।

বন্দনাকে দেখার অনেক লোক আছে, কিন্তু এই মানুষটাকে কে দেখে? একটু হাত বুলিয়ে দেব শুভ্রদার মাথায়?

চিন্তাটায় কি পাপ আছে কোনও? না হলে কেন এগোতে পারছি না?

কোনার্ক ও মধুময়: এক

ট্যুরিস্ট বাসে পর পর সিট পাওয়া গেছে। সামনে মিত্রা পুলু, মাঝে অন্তু টুটুল জয়া, তারপর শুভ্র বন্দনা, শেষে আমি। এমনটাই হয়, বেড়াতে বেরোলে সবচেয়ে ওঁচা জায়গাটা আমার জন্যই বরাদ্দ থাকে। এর ব্যত্যয় ঘটলেই আমি অবাক হই।

তবে এই সিটটার একটা অন্তত প্লাস পয়েন্ট আছে। জানলা পাওয়া গেছে। এটুকুও না'ও জুটতে পারত।

আমার পাশে এক মাঝবয়সি লোক। শিক্ষিত চেহারা, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, পোশাক আশাকেও বেশ আভিজাত্য আছে। একটাই দোষ। ঘন ঘন নস্যি নিচ্ছে লোকটা, ছিটে ওড়াচ্ছে। বাপস কী ঝাঁঝ, এক্ষুনি আমার একটা হাঁচি হবে।

হলও। একটা নয়, চলল পর পর কয়েকটা। মাথার ঘিলু চলকে গেল।

শুভ্র সিটের ফাঁক দিয়ে ঘুরে তাকিয়েছে,—এই গাড়োল, হচ্ছেটা কী? ভদ্রলোকেদের সঙ্গে যাচ্ছিস, সভ্য-ভব্যের মতো হাঁচ। নিদেনপক্ষে একটা রুমাল চাপ নাকে।

ঝকঝকে সকালটা বিস্বাদ হয়ে গেল। বন্ধুরা কি চিরকাল আমার সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলবে? আমি অভব্য গাড়োল, আর যে লোকটা সবার অসুবিধে করে নাকে নেশা ঠুসছে সে হল ভদ্রলোক?

জোর করে হাসি ফোটালাম,—হেহ্, আমার কাছে রুমাল! ল্যাঙোটের আবার বুকপকেট!

বন্দনা কটমট তাকাল। শব্দগুলো কি ওর কানের পর্দায় বিঁধল? আহা, মধুময় যেন জানে না শুভ্র তোমার ওপর চোটপাট করার সময়ে কী ভাষা ব্যবহার করে!

হাতের পিঠে নাক মুছে বাইরে চোখ মেললাম। হু হু হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। পথের ধারে লাইন দিয়ে এক ধরনের গাছ। কাজু না? দিঘায় অন্তু আমায় দেখিয়েছিল? আজ আকাশে ভাসা ভাসা মেঘ, কাজুবনে কী সুন্দর হালকা ছায়া! এই রাস্তার নাম মেরিন ড্রাইভ রোড, আমি জানি। রাস্তাটাও প্লেন, একদম ঝাঁকুনি টাকুনি নেই। ভাগ্যিস নেই, থাকলে নাড়িভুঁড়ি চটকে যেত! একদম চাকার মাথায় সিট। মাঝে মাঝে বালিয়াড়ি আসছে, তারপর আবার সবুজ, আবার সবুজ। মনের তেতো ভাবটা কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সারা বছর ধরে কেন এমন বেড়ানো হয় না?

আর মাত্র কটা দিন, তারপর আবার গয়ংগচ্ছ। সেই ঘুম থেকে উঠেই কারখানায় ছোটা, টিফিনে বাড়ি এসে বউদির বিরস মুখ দেখতে দেখতে চাট্টি ভাত গিলে যাওয়া, ফেরা সেই সন্ধের পর। হরেনদা'টা খাটায়ও খুব, রস নিংড়ে নেয়। তা নিক, কাজকে মধু নন্দী ডরায় না। শুধু কারখানাটা যদি আরেকটু ভাল হত, যদি একটু আলো বাতাস ঢুকত, হরেনদার মুখের বুলিগুলো যদি একটু অন্য রকম হত, কটা টাকা যদি আরও বেশি দিত...!

এত চাওয়ার সময় এখন নয় রে মধুময়। এই মুহূর্তটা নিয়েই বাঁচ এখন। একটা গান কুনকুন করে উঠছে বুকে। ঘোড়ে জ্যায়সি চাল, হাতি জ্যায়সি দুম, ও শাওন রাজা কাঁহা সে আয়ে তুম...। গাই গলা ছেড়ে? থাক, শুভ্র এক্ষুনি চেঁচিয়ে উঠবে, অ্যাই গাধা ফাল্গুনে তুই শ্রাবণ পেলি কোত্থেকে! গান মনে এলে দিন মাস অত খেয়াল থাকে নাকি? শ্রাবণ মাসে যদি গানটা না মনে পড়ে! ঠিক আছে, একটু গলা নামিয়েই নয় গাই। কী আর হবে? বড় জোর বন্ধুদের আওয়াজে বাসসুদ্ধ লোক হাসবে। এই মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে ক্লাউন সেজে মানুষকে হাসাতে পারাটাও তো মহাপুণ্যের কাজ।

টুটুল বাবা মা'র পাশ থেকে উঠে আসছে। টলমল পায়ে। জয়া হাত ধরে এগিয়ে দিচ্ছে মেয়েকে,—মধুদা, আপনার কাছে যাবে বলে বায়না ধরেছে।

ধরবেই তো, আমি যে টুটুলের বেস্ট ফ্রেন্ড। শিশুদের মনে প্যাঁচ পোঁচ থাকে না, ওদের সঙ্গে আমার

বেশ বনে। আয় মামণি আয়।

হাঁটুর ওপর বসল টুটুল। পাশের লোকটা একটু বিরক্ত যেন। হবেই তো, সভ্যভদ্র লোক, সামান্যতম অসুবিধে সহ্য করতে পারে না।

ঘাড় ঘোরালাম,—কিছু বলবেন?

অড়ি বড়ি করে কী যেন বলল লোকটা। ইংরিজি, না তেলেগু?

গম্ভীর মুখে বললাম,—একটু মেরে বসুন, চিলড্রেন আছে।

লোকটা কী বুঝল কে জানে, উদাস হয়ে গেল।

টুটুলের কানে কানে বললাম,—দেখলি, ভয় পাইয়ে দিলাম কেমন?

—কেন ভয় পাওয়ালে গো?

—ইচ্ছে হল।

—কেন ইচ্ছে হল?

ঠোঁটে এসে গিয়েছিল, মুখোশ পরা ভদ্রলোকদের ভয় দেখাতে আমার ভাল লাগে, গিলে নিলাম কথাটা। হাসতে হাসতে বললাম,—ওরে মামণি, সব প্রশ্নেরই যদি উত্তর দিতে পারতাম, তবে তো আমি তোর বাবার মতো প্রফেসার হতাম! ক্লাস নাইনে তিন বার গাড্ডু খেতাম না, বিনয় স্যার কথায় কথায় আমায় মুরগি করে রাখত না...

—মুরগি করা কী গো মধুকাকা?

মনে মনে বললাম, আমাকে তোর বাবা মায়েরা এখনও যা করে। মুখে বললাম,—ও আছে একটা প্যাঁচ। হাত দুটোকে হাঁটুর মধ্যে দিয়ে গলিয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে, উবু হয়ে বসে...

—আমায় শিখিয়ে দেবে? আমিও মুরগি হব।

—রাম কহো! তুমি কোন দুঃখে মুরগি হবে মামণি? তুমি এখনই কত কী শিখে গেছ, এ বি সি ডি, ওয়ান টু থ্রি, হাট্টিমাটিম টিম...

—ওগুলো শিখে গেলে বুঝি মুরগি হওয়া যায় না?

কঠিন প্রশ্ন। মেয়েটা ভারী ব্রিলিয়ান্ট, প্যাঁচ কষে কষে এমন প্রশ্ন করে, উত্তর খুঁজে পাওয়া ভার। জয়া অন্তু কি প্রশ্নের গুঁতো সামলাতে না পেরেই এখানে পাঠিয়ে দিল?

টুটুলের পেটে আলগোছে কাতুকুতু দিলাম, হি হি হেসে উঠল টুটুল। আরেকটু কাতুকুতু, হাসছে খিলখিল। হেসে একেবারে যাকে বলে কুটিপাটি। ঠিক জয়ার মতো হাস্যমুখী হয়েছে টুটুল, ভারী মিষ্টি, ভারী মিষ্টি।

জয়াটা খুবই ভাল মেয়ে। অন্তু সত্যিই লাকি, ওর বউটাই সবার সেরা। জয়াকে দেখলেই আমার মা'র কথা মনে পড়ে যায়। ঠিক যেন মা'র মতো করেই কথা বলে জয়া, হাসে, বকে... জয়ার ধমক শুনলেও গা চিড়বিড়িয়ে জ্বলে ওঠে না। সুন্দর তো বন্দনাও, তবে বড্ড কাঠ কাঠ। প্রাণহীন প্রতিমার মতো। মুখটিও সর্বক্ষণ ভেটকে আছে, ঠিক যেন আমার বউদিটি। ছটার জায়গায় সাতটা রুটি খেলেই কপাল জুড়ে ভাঁজ, এত যে গিলছ, আটার দামের খবর রাখো! মিত্রা আবার যেন কেমন কেমন। দেখতে বেশ, লম্বা চওড়া ফর্সা। আমার মা ছিল ছোট্টখাট্টো, নরমসরম, এত বড়সড় চেহারার মেয়ে দেখলে আমার যেন কেমন অস্বস্তি হয়। যেন অনেক দূরের কেউ, আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। মিত্রাকে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি, চোখাচোখি হলেই বুক ধড়ফড়। কেন এমন হয়?

কথা বলতে বলতেই টুটুল ঢুলতে শুরু করেছে। আর প্রশ্ন করবে কি, গায়ে ফুরফুরে হাওয়া লাগতেই মেয়ের দম শেষ। কিচ্ছু দেখছে না, কত সুন্দর সুন্দর সব বালিয়াড়ি চলে যাচ্ছে পর পর। ওই তো একটা, ঠিক যেন উটের কুঁজ।

বুকটা কেঁপে উঠল। অমনই এক বালিয়াড়ির ওপারে কাল বসে ছিল শুভ্রা দুজন। পুলু আর মিত্রা। শুভ্র অন্তু কাল হোটেল থেকে বেরোলই না, জয়াও হোটেলে রয়ে গেল, আর বন্দনা তো কাল সারাদিন বিছানায়। এমনকী টুটুলেরও মুড খারাপ, ঘ্যানঘ্যান করছিল, অন্তুর কাছ থেকে নড়লই না। আমারও যে খুব বেরোনোর ইচ্ছে ছিল তা নয়, পুলুর টানাটানিতেই অগত্যা...।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা সমুদ্রের পাড়ে। পুলু হঠাৎ উশখুশ করতে শুরু করল। আচমকা মিত্রা

বলল,—মধুদা, একটা কাজ করে দেবেন? প্লিজ যদি কিছু মনে না করেন...

মধুর মনে করায় কার কী এসে যায়! বন্ধু বা বন্ধুপত্নীদের হুকুম তামিল করাই তো তার ভবিতব্য। বললাম,— বলো, কী করতে হবে?

—আমার জন্য একটা মাথা ধরার ট্যাবলেট এনে দেবেন?

দুম করে ছবিটা আমার কাছে স্বচ্ছ হয়ে গেল। একা দুজনে বেরোলে খারাপ দেখায়, তাই আমাকে সঙ্গী করা হয়েছে! এখন আমিই কাবাবমে হাড্ডি। অথচ মিত্রা যখন বলছে, মুখের ওপর না বলাও যায় না।

কাঁধ ঝাঁকালাম,—যাচ্ছি। ...তোমরা এখানেই থাকবে তো?

—না থাকলে খুঁজে নেবেন। কী, পারবেন না?

ওষুধের দোকান সমুদ্র থেকে বেশ খানিকটা দূর। কপা হেঁটেই কী যেন একটা বিক্রিয়া ঘটল আমার মধ্যে, থেমে গেলাম। কেন আমি এইভাবে বেকরা বনব বার বার? কী এমন নিষিদ্ধ কাজ করবে পুলুরা, যে আমি সেখানে অবাঞ্ছিত? না হয় একটু দূরেই বসতাম আমি, সমুদ্রের ঢেউ গুনতাম।

একটা অন্য মধুময় আমায় তাড়িয়ে নিয়ে চলল অন্য পথে। সমুদ্রতীরে ভিড়ভাট্টা ভালই, তাদের আড়ালে গা ঢাকা দিলাম আমি। গোয়েন্দার চোখে নজর রাখছি কোন দিকে যায় যুগলে। আগের দিন কিছু না ভেবেই ওদের পিছু নিয়েছিলাম, কিন্তু কাল আমি ছিলাম অতি সতর্ক, এবং সচেতন। হওয়ার প্রয়োজনই ছিল না, ওরা হাত ধরাধরি করে হাঁটছে, ফিরেও তাকাচ্ছে না, আমার দিকে তাকানোর ওদের অবকাশ কই! নির্জন জায়গা দেখে বসল দুজনে। ঘনিষ্ঠ হচ্ছে ওরা। আরও ঘনিষ্ঠ! পুলুর ঠোঁট মিশে গেল মিত্রার ঠোঁটে।

আমার শরীরে আগুন জ্বলে উঠল। এক তীব্র আগুন, যা দিয়ে গোটা পৃথিবীকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া যায়। দেহ জুড়ে পাল পাল বুনো জন্তু গরম নিশ্বাস ছড়াচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে জিভ টাগরা কণ্ঠনালি। কেন আমিই থাকব চিরকাল বঞ্চিতের দলে? মাত্র বারোশো টাকা মাইনে পাই বলে? ইস্কুলের গণ্ডিটাও পার হতে পারিনি, তাই? সবটাই কি আমার দোষ? বাপ-মা মরা ভাইকে গোরুর মতো খাটাত দাদা বউদি, নিজে মাস্টার হয়েও জন্মে কখনও আমাকে পড়া দেখিয়ে দেয়নি, এক পয়সা খরচ করেনি আমার জন্য। হ্যাঁ, মাথা আমার একটু মাটো ছিল বটে, কিন্তু মাধ্যমিকটাও কি আমি উতরোতে পারতাম না? একটু সাহায্য পেলে? উলটে দাদা গল্প চাউর করে দিল, ছোটবেলায় মেনিনজাইটিস হয়ে ভাইটা আমার নিরেট হয়ে গেছে!

আশ্চর্য, বন্ধুরাও কথাটা গিলে নিল।

সেই বন্ধুরা এখন সুখে ঘরকন্না করছে। মিত্রাকে চুমু খাচ্ছে পুলু।

শরীরে আগুন নিয়েই সরে এলাম আমি। চাবুক খাওয়া কুকুরের মতো যন্ত্রণাটা তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে আমাকে, তখনই একবার ফিরেছিলাম পুলুদের দিকে। আর দেখা যাচ্ছিল না পুলুদের, ওরা তখন বালিয়াড়ির ওপারে। ঠিক ওই রকমই এক বালিয়াড়ি, উটের কুঁজের মতো।

কতক্ষণ পর আবার এলাম সমুদ্রতীরে? আধ ঘণ্টা? এক ঘণ্টা? সময়ের হিসেব ছিল না। গোটা পাড় জুড়ে তখন ঘন অন্ধকার।

ট্যাবলেট বাড়িয়ে দিলাম মিত্রাকে। ঠাণ্ডা গলায় বললাম,—ধরো।

মিত্রার মাথা তখনও পুলুর বুকে, পুলুর হাত মিত্রার কাঁধে। আমাকে দেখেও একটু সরে বসেনি ওরা।

ওষুধটা হাতেই নিল না মিত্রা। মুচকি হেসে বলল,—ওটা আপনার পকেটেই রেখে দিন। এখানে জল কোথায় যে খাব?

বটেই তো, জল আনাটাও তো মধুময়েরই কর্তব্য ছিল। এই সমুদ্র কিনারে।

আরও ঠাণ্ডা গলায় বললাম,—চাঅলা ডাকব? চা দিয়ে খাবে?

পুলুর বোধহয় আমায় দেখে করুণা হল। মিত্রার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল,—ছেড়ে দে।

—কিন্তু মিত্রার মাথা ধরা?

—উবে গেছে। চুপ করে বোস, সমুদ্র দ্যাখ।

এই পুলু আমার বন্ধু! এরকমই বন্ধুর সঙ্গের জন্য লালায়িত থাকি আমি। কেন থাকি? এরা আমাব চেয়ে সফল বলে? নাকি আমি এদের মতো হতে চাই বলে? কেন আমি মিত্রার মতো একটা বউ পাব না, একটা নিখাদ মেয়েমানুষ?

—কী রে, টুটুল কি ঘুমিয়ে পড়ল?

অন্তর ডাকে ভাবনা ছিঁড়ে গেল। পলকে ঢুকে পড়েছি চেনা মধুর খোলসে। হেসে বললাম,—হ্যাঁ রে, এক্কেবারে কাদা।

সামনে থেকে বন্দনা বলে উঠল,—ওকে আমার কাছে দিয়ে দিন।

টুটুল সরে যেতে ভার খানিকটা লাঘব হল। জয়ার হাতে চায়ের ফ্লাস্ক, ভায়া শুভ্র আমার কাছে পৌঁছে গেল। ঢেলেছি ঢাকনা-কাপে, চুমুক দিচ্ছি সড়াৎ সড়াৎ। ভাল লাগছে বেশ, মাথা হালকা হচ্ছে। নাহ্, এই জন্যই জয়াটা সেরা বউ।

শুভ্র ঘাড় হেলান,—আস্তে খা। অত শব্দ করছিস কেন?

—বা রে, চা খেলে শব্দ হবে না?

—আমাদের হয়?

লে হালুয়া, আমি আর তোরা সমান? নিঃসাড়ে কোন কাজটা করতে পারি আমি, তোদের মতো? প্রেম হিংসে আর স্বার্থপরতার খেলা যদি আমিও চুপিসারে চালাতে পারতাম?

একটা তালঢ্যাঙা লোক ড্রাইভারের কেবিন থেকে গেটের মুখে এসে দাঁড়াল। হাতে মাউথপিস, কোনার্ক মন্দিরের জন্ম ইতিহাস শোনাচ্ছে। যত্ত সব ভ্যাজারং ভ্যাজারং। বাসসুদ্ধ লোকের আক্কেল দ্যাখো, ইস্কুলের ছেলেদের মতো হাঁ করে গিলছে। মন্দির কবে তৈরি হয়েছে জেনে পরীক্ষায় বসবে নাকি? পৌঁছলে তো আস্ত মন্দিরটাই দেখতে পাবে।

লোকটাকে একটু ঝেঁকে দিতে ইচ্ছে হল। ইয়া বড় এক হাই তুলে প্রশ্ন ছুড়লাম,—ও মোয়াই, বাইরে কী দারুণ কাজুবাদামের গাছ, সে নিয়ে কিছু বলছেন না যে?

ব্যস, লোকটা হোঁচট খেয়ে গেল। মুখস্থ বিদ্যে ঘুলিয়ে গেছে। আমতা আমতা করে বলল,—হ্যাঁ, বলছি। ...দু পাশে এই যে গাছপালা দেখছেন, এ সবই উড়িষ্যার জঙ্গলের অংশ।

—যাহ বাবা, জঙ্গলে কাজুবাদাম? ...জঙ্গলে বাঘ নেই?

যা ভেবেছি তাই, বাসসুদ্ধ লোক খ্যাঁ খ্যাঁ হেসে উঠেছে। নাহ্, আমার ক্লাউনজন্ম সার্থক।

অন্ত পিছন ফিরে চোখ পাকাল,—একদম কথা নয়, মুখে চাবি এঁটে বসে থাক।

অন্তর হুকুম, অমান্য করি সাধ্য কী! খরচ খরচা দিয়ে সঙ্গে এনেছে, একটা কৃতজ্ঞতাবোধও তো আছে। যদিও বেগার খেটে উশুল করে দিচ্ছি, তবু...

চুপ করলাম, তো ঘাড়ও সঙ্গে সঙ্গে এলিয়ে গেল। তন্দ্রা ভাঙল চাপা কলরোলে। বাসসুদ্ধ লোকের চোখ ডান দিকের জানলায়, হইহই করে কী যেন দেখছে!

সেই ব্যাটা মাউথপিস হেঁকে উঠল,—ওই ওই, ওই হল রামচূর্ণী নদী। ওই নদী তিন ভাগে ভাগ হয়ে সমুদ্রে মিশেছে। তাকিয়ে দেখুন, এক্ষুনি মোহনা দেখতে পাবেন।

উঁকিঝুঁকি দিয়ে হতাশ আমি,—দূর মশাই, ও নদী কোথায়, ওটা তো একটা খাল। সমুদ্রের ঢেউগুলো খালে ঢুকছে।

আবার বাস জুড়ে হাসির রোল।

শুভ্র ধমকে উঠল,—অ্যাই পাঁঠা, ওটা খাল নয়, নদী। সাগবে গিয়ে পড়ছে।

কী অন্যায় কথা, মিত্রার পর্যন্ত হাসি থামছে না।

ক্লাউনেরও বোধহয় বিরক্তি আসে। ঝেঁঝে উঠে বললাম,—যা খুশি বোঝালেই হল? আমি কি দেখতে পাচ্ছি না ঢেউগুলো এক পাল শুশুকের মতো খালে চলে আসছে?

—আইব্বাস, তুই যে কবিতা আওড়াচ্ছিস রে!

সকলের দেখার চোখ কি এক ছাঁচে ঢালা হয়? আমার যেমনটা মনে হয়, তেমন আমি বলতে পারব না?

কথা বাড়ানোর আর প্রবৃত্তি হল না। ফিরে গেলাম পুরনো পোজে। ঘুমই ভাল, ঘুমেই শান্তি।

এক সময়ে কোনার্ক এসে গেল।

হাই তুলতে তুলতে বাস থেকে নামলাম। টুটুলও জেগে গেছে, সে এখন শুভ্রর সঙ্গী। পাশেই হোটেল, বেলা বেড়েছে, অন্তু সেখানে ভাতের অর্ডার দিতে গেল। আমি জয়া আর বন্দনা পাশাপাশি চলেছি, সামনে মিত্রা আর পুলু যথারীতি আলাদা আলাদা।

কোথ্থেকে গোটা তিন-চার গাইড এসে ছেঁকে ধরল। পঞ্চাশ টাকা দিলে মন্দিরের ইতিহাস ভূগোল সব বুঝিয়ে শুনিয়ে দেবে। শুভ্র তাদের পাত্তাই দিল না, ওর কোনার্ক ঘোরা আছে, গাইডের ভূমিকাটা নাকি নিজেই নিতে পারবে।

বন্দনা দু পা হেঁটেই কাহিল, বসে পড়ল গাছের ছায়ায়। অন্তু চলে এসেছে, হাঁ হাঁ করে ছুটে গেল,—কী হল? আবার শরীর খারাপ লাগছে?

বন্দনা মাথা দোলাল। নিশ্বাস ফেলছে জোরে জোরে।

অন্তু অসহায় চোখে তাকাল আমাদের দিকে,—এই, আমি একটু বন্দনার সঙ্গে বসি, তোরা ঘুরে আয়।

জয়াও অমনি ঝুপ করে বসে পড়ল,—আমিও বাবা তা হলে একটু রেস্ট নিই।

অন্তু বলল,—আহা, তোমরা যাও না। স্কালপচারগুলো দেখে এসো। মারভেলাস, চোখ ফেরাতে পারবে না।

শুভ্র চোখের কোণ দিয়ে বন্দনাকে জরিপ করছিল। হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বলল,—চলো জয়া, বন্দনাকে ভাল করে রেস্ট নিতে দাও।

কী একটা যেন নাটক চলছে! পাত্রপাত্রীরা কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করছে ঠিক ধরা যাচ্ছে না, কিন্তু নাটক একটা চলছেই।

শুভ্র-জয়ার পিছন পিছন চলেছি আমি। টুটুল দৌড়ে দৌড়ে একবার শুভ্র জয়ার কাছে যাচ্ছে, একবার ফিরে আমার কাছে। এখনও তার প্রশ্নের শেষ নেই। চাকাগুলো অত বড় বড় কেন গো? এত এত পাথর এল কোথ্থেকে? কে পাথর কাটল গো? সূর্যকে কেন পুজো করে, সূর্য কি ভগবান?

সাধ্য মতো উত্তর দিচ্ছি। হাঁটছি। দেখছি পাথরে খোদাই করা সার সার মূর্তি। কী অসভ্য ভঙ্গি সব! ওইভাবে কি রমণ করে নারীপুরুষ? ভাগ্যিস টুটুল পাশে আছে, জয়া মিত্রারা কেউ থাকলে ওদিকে তাকানোই যেত না।

শুভ্রর গলা কানে এল,—বুঝলে জয়া, এ সব মূর্তি দেখে অনেকে অনেক রকম ধারণা করে। আসলে কাম ক্রোধ লোভ হিংসে সব ত্যাগ করে পবিত্র স্থানে যেতে হয়, তাই মন্দিরের বাইরে এ সব... ওই দ্যাখো, একটা হাতির নীচে সিংহ পড়ে আছে, সিংহের নীচে মানুষ, এর মানে কি জানো? মানুষ পরাজিত শৌর্যের কাছে, সেই শৌর্য আবার বিশালত্বের কাছে অসহায়।

জয়া শুনছে মন দিয়ে। ঘাড় নাড়ছে।

জয়ার হাত ছেড়ে টুটুল আবার আমার কাছে এল,—বিশালত্ব মানে কী মধুকাকু?

শুভ্র জয়া ঘাড় ফিরিয়ে হেসে উঠল। শুভ্র বলল,—বিশালত্ব মানে প্রকাণ্ড কিছু। এই যেমন তোমার মধুকাকু।

—আর অসহায় মানে?

টুপ করে শুভ্রর মুখ থেকে হাসি মুছে গেল। চোরা চোখে তাকাল জয়ার দিকে, জয়াও। অন্যমনস্ক মুখে আবার হাঁটছে দু জনে। রোদ বেশ চড়া এখন, পায়ের তলার পাথর বেশ তেতে উঠেছে। এক পা এক পা করে উঁচু উঁচু সিড়ি ভেঙে মন্দিবে উঠলাম আমরা। তিন দিকে তিনটে সূর্যমূর্তি। নোনা ধরা, ধ্বংসস্তূপের মতো। এই মূল মন্দিরটার সামনে নাট মন্দির, পিছনে সূর্যের স্ত্রী ছায়া মায়ার মন্দির, সবই এখান থেকে স্পষ্ট দৃশ্যমান। পল্লব আর মিত্রা ছায়াদেবী মায়াদেবীর মন্দির ঘুরছে, টুটুল চেঁচিয়ে ডাকল ওদের, ওরা হাত নেড়ে সাড়া দিল। নগ্ন মূর্তির দিকে আঙুল তুলে কী যেন বলল পুলু, মিত্রা মুখে আঁচল চেপে হেসে উঠল।

আমার আর ভাল লাগছিল না। নেমে এলাম পায়ে পায়ে। একা একাই ঘুরছি মন্দিরকে বেড় করে। ওই ছায়া মায়ার মন্দির, ওই নাটমন্দির যেখানে এক সময়ে নাচত দেবদাসীরা, পড়ে থাকা ওই বিপুল

ভগ্নস্তূপ, হাতি, সিংহ, রথের চাকা, ওই মৈথুনরত যক্ষ যক্ষিণী—সব মিলে মিশে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে বুকে। বিচিত্র এক অনুভূতি হচ্ছে আমার। এমন এক অনুভূতি যাকে ব্যাখ্যা করার আমার ক্ষমতা নেই, অথচ ছমছম করে ওঠে গা।

হঠাৎ কেন এত ভয় করছে আমার?

দ্রুত পা চালিয়ে ফিরলাম গাছতলায়। বন্দনা ঘাসের ওপর শুয়ে পড়েছে, পাশে চিন্তিত মুখে অন্তু।

ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলাম,—বন্দনা এখন কেমন?

অন্তু মাথা তুলল,—ভাল নয় রে। বলছে ভীষণ মাথা ঘুরছে। বমি বমি ভাবটাও বেড়েছে।

—কী হবে এখন? সারাটা দিন এখনও বাসজার্নি বাকি...

—তাই তো ভাবছি। ...ভুবনেশ্বর টুবনেশ্বর বাদ দিলে কেমন হয়?

—সে নয় দিলি। কিন্তু ফিরবি কী করে?

—আজ ফিরব না। এখানে পান্থনিবাসে থেকে যাব।

—দ্যাখ, সবাই কী বলে।

কথার মাঝেই টুক টুক করে এসে গেছে শুভ্র পুলুরা। প্রস্তাবটা শুনে পুলু প্রায় লাফিয়ে উঠল,—গ্র্যান্ড আইডিয়া। ফালতু ফালতু আরও কটা মন্দির দেখে কী হবে? বন্দনা যেমন নেতিয়ে পড়েছে, ফারদার স্ট্রেইন করাটাও একদম ঠিক নয়।

এখানকার পান্থনিবাসের দারুণ চাহিদা, আগে থেকে বুক না করে এলে জায়গা পাওয়া কঠিন। কপাল ভাল, আজ সকালে কিছু জাপানি ট্যুরিস্ট চলে গেছে, এক রাতের জন্য মিলবে পান্থনিবাস।

হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে পুলুর গলা কানে এল,—ভালই হল, না মিত্রা? রাত্তিরবেলা আরেক বার মন্দিরটা দেখা যাবে। চাঁদের আলোয়।

আবার গা ছম ছম করে উঠল আমার। কেন এমন হচ্ছে বার বার?

কোনার্ক ও মধুময়: দুই

দুপুরটা নিস্তরঙ্গ কেটে গেল। খেয়ে শুয়ে, গড়িয়ে গড়িয়ে।

মন্দির ছাড়া এখানে প্রায় কিছুই দেখার নেই। এক আছে সমুদ্র, যা এক কালে মন্দিরের পাশে ছিল, তাও এখন সরে গেছে অনেকটা দূর। বিকেলে বললাম সকলকে, চল সমুদ্রই দেখে আসি, তা কেউ তেমন গা করল না। আজকের হোলডে ট্যুর আধাখেঁচড়া হয়ে গিয়ে সবার মধ্যেই কেমন ঝিমুনি এসে গেছে, নড়তে চড়তে সকলের ভারী আলস্য।

অগত্যা একাই বেরিয়ে পড়লাম, টুটুলকে নিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছি বহু দূর, সেই সমুদ্রের পাড়। সমুদ্র এখানে ভীষণ নির্জন, রুক্ষ। ঢেউ-এর কোনও ছিরিছাঁদ নেই, খ্যাপা মোষের পালের মতো শুধু পাড়ে ধেয়ে আসছে। তবে নীলটা বড় অপরূপ, জল যেন তুঁতে বরণ।

ওই সমুদ্রকে দেখে এক অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল আমার। অন্তু বলছিল, মন্দিরের মাথায় নাকি এক সময়ে চৌম্বক কলস বসানো ছিল। সেই কলস নাকি মাঝ-সমুদ্রের জাহাজকেও হিঁচড়ে টেনে আনত পাড়ে, আছড়ে চুরমার করে দিত। কল্পচোখে ভেসে উঠছিল দৃশ্যটা, শুনশান সমুদ্রে। কী আজব খেয়াল ছিল রে বাবা রাজা মহারাজাদের! শুধু মজা পেতেও কত শয়ে শয়ে জাহাজ ডুবিয়েছে! সমুদ্রের এই সরে যাওয়া কি প্রকৃতির প্রতিশোধ? মন্দিরের আজ যে জরাজীর্ণ দশা, সেও কি হাজার হাজার হতভাগ্য নাবিকের দীর্ঘশ্বাসের ফল? এটাই বোধহয় নিয়ম। অন্যের ক্ষতি করে নিজে বেশিদিন সুখে থাকা যায় না। দুঃখী মানুষের অভিশাপ বড় ভয়ানক, তাকে এড়ানো বেজায় কঠিন, এমনকী দেবমন্দিরের পক্ষেও।

টুটুল জল দেখেই আত্মহারা। পা ছোঁয়াবে বলে কী বায়না মেয়ের! আমি একদম কাছে ঘেঁষতে দিইনি। এবার ট্যুরটা যেন কেমন ছানা কেটে গেছে, দুম করে নতুন ঝঞ্ঝাট ডেকে না আনাই ভাল।

ফিরলাম সন্ধে গড়ানোর পর। ফিরেই অবাক, সব ঘর ভোঁ ভাঁ, তালা ঝুলছে। হোটেল ম্যানেজারকে

জিজ্ঞাসা করতে সে হাত উলটে দিল। আশ্চর্য, বেরোবে না বলেও গেল কোথায় সব?

খোঁজ খোঁজ খোঁজ। মন্দির চত্বর চষে ফেললাম দুজনে। কাছে ছোটখাটো বাজার মতো আছে একটা, সেখানে গেছে কি? উঁহু, সেখানেও নেই। ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে ক্লান্ত যখন, দর্শন মিলল। মন্দির থেকে বেশ খানিক তফাতে এক গাছতলায় বসে আছে সকলে। গোল হয়ে, অনেকটা ছেলেবেলার সেই রুমালচোর খেলার ভঙ্গিতে।

আমাদের দেখে পুলু চেঁচিয়ে উঠল,—কী রে ছাগল, তোর চরা শেষ?

কথা শুনে মনে হল নেতিয়ে পড়া পরিবেশ চাঙা হয়েছে কিছুটা। হেসে বললাম,—চরব যে এখানে ঘাস কোথায়? শুধুই বালি...

—সাবাশ, কী ডায়ালগ রে! টুটুল কি তোকে ট্রেনিং দিচ্ছে?

ছোট্ট একটা হাসির তুফান উঠল। বন্দনাও মিটিমিটি হাসছে। যাক, সারাদিন আজ ধকল না নিয়ে ভালই করেছে। মানে মানে এখন কাল সকালে পুরী ফিরলে হয়।

টুটুল লাফিয়ে চলে গেল জয়ার কাছে, বিনবিন করছে কী যেন। জয়া ব্যাগ খুলে ক্রিমবিস্কুট দিল মেয়ের হাতে। অন্তু আর শুভ্র কথা বলছে নিচু স্বরে। মিত্রা কেমন একটু উদাসীন। দেখছে আকাশ, দেখছে চরাচর।

পৃথিবী এখন সত্যিই মায়াময়। এই মাত্র চাঁদ উঠল, পাতলা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে গেল দশ দিকে। মিহি আলো মেখে সূর্যমন্দির চন্দ্রাহত যেন, ভাঙাচোরা প্রাচীন স্থাপত্যটাকে অলৌকিক মনে হচ্ছে। সকালের চেনা মন্দির এখন এক অচিন পুরী।

পুলু হঠাৎ বলে উঠল,—কী দারুণ একটা স্বপ্ন স্বপ্ন পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল মাইরি!

অন্তু বলল,—আজ তা হলে এখানে থেকে গিয়ে ভালই হয়েছে বল?

—ভাল কী রে, বল মোর দ্যান ভাল। গুড বেটার বেস্ট। নন্দন কাননে গিয়ে কী দেখতাম? সেই তো কটা বাঘ সিংহ বাঁদর হরিণ। ও তো ক্যালকাটা জু-তেও গেলে দেখা যায়। পাল পাল।

শুভ্র বলল,—এখন বেশ জোর একটা ইতিহাসের স্মেল পাওয়া যাচ্ছে না?

মিত্রা ঘুরে তাকাল,—স্মেল কী বলছেন শুভ্রদা, ইতিহাস তো এখন জ্যান্ত হয়ে উঠছে। ওই দেখুন, ওই যে নাটমন্দির, ওখানে এক্ষুনি নাচ শুরু করবে দেবদাসীরা। নূপুরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন না? ওই তো কলিঙ্গরাজ এবার নাটমন্দিরে আসছেন...

কথা ফুরোনোর আগেই চার দিক আরও নিঝুম হয়ে গেল। সত্যি সত্যি বুঝি নূপুর বেজে উঠল নাটমন্দিরে, মৃদঙ্গ বোল তুলল। ধিক তাং ধিক তাং ধিক তাং, রিনিঝিনি রিনিঝিনি রিনিঝিনি...। মিত্রা মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে চলেছে মন্দিরের কাছে। আমরা সবাই চুপ, মুখে কুলুপ আঁটা, দেখছি মিত্রাকে। এমনকী পুলুও নিথর।

আচমকাই ছিঁড়ে গেল দৃশ্যটা। কোথ্থেকে একটা অশ্লীল সিটি বেজে উঠল। ঘোর ভেঙে চমকে তাকিয়েছি সকলে। দ্যাখ, না দ্যাখ গোটা পাঁচেক ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে মিত্রার সামনে, একসঙ্গে সাইকেলের বেল বাজাচ্ছে।

জয়া চিৎকার করে উঠল,—এই মিত্রা, চলে আয়।

বন্দনা গজগজ করে উঠল,—কোথাও একটু শান্তিতে বসার জো নেই!... যান না পল্লবদা, দেখুন না।

মিত্রাই পিছিয়ে আসছিল, উড়ে আসা এক অশালীন শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ। কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে দুমদাম এগিয়ে গেল কয়েক পা,—ব্যাপারটা কী, অ্যাঁ? ট্যুরিস্টদের সঙ্গে এমন বিহেভ করতে লজ্জা করে না? পুলিশে খবর দিলে সব কটাকে একেবারে চাবকে সিধে করে দেবে।

হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল ছেলেগুলো। নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করল, আবার হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে চোখা চোখা মন্তব্য।

আর দেরি করা নয়, উঠেই প্রায় দৌড়েছি আমরা। মিত্রা বুঝি আমাদের দেখে জোর পেল অনেকটা, কড়া গলায় বলল,—ভাগ, ভাগ এখান থেকে। নইলে এমন ঝাড় খাবি...

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেগুলোর মুখ চোখ বদলে গেছে। সাইকেল ফেলে একসঙ্গে এগিয়ে এসেছে মিত্রার

দিকে। একটা ষণ্ডা মতন ছেলে খপ্ করে মিত্রার হাত ধরে টানল। কোনওক্রমে নিজেকে সামলেছে মিত্রা, পালটা চড় কষিয়েছে ছেলেটাকে।

অন্তু হাঁ হাঁ করে মাঝখানে গিয়ে পড়ল,—হচ্ছেটা কী? যান না আপনারা। কেন ঝামেলা করছেন?

চড় খাওয়া ছেলেটা মুহূর্তের জন্য থমকেছিল, পরক্ষণেই খ্যাপা কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে অন্তুর ওপর। অন্য একজন হিড়হিড় করে টানল মিত্রাকে। এলোপাথাড়ি হাত চালাচ্ছে মিত্রা, নিজেকে ছাড়াতে পারছে না, ডুকরে কেঁদে উঠল হঠাৎ।

আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। এক লাফে ছেলেটার টুঁটি চেপে ধরেছি। শরীরের সব শক্তি জড়ো করে ঘুষি চালালাম ছেলেটার তলপেটে, আঁক করে ককিয়ে উঠল ছেলেটা, উবু হয়ে বসে পড়ল মাটিতে। পলকে আরেক জন কোমর থেকে ছুরি বার করেছে, আমার দিকে তেড়ে এল। চকচকে ছুরির ফলা বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে আসছে আমার পেটের দিকে, শরীর ছোঁয়ার আগেই ধরে ফেললাম হাতখানা। মুচড়োচ্ছি, মুচড়োচ্ছি... স্প্রিং-টেপা ছুরি ঘষে যাচ্ছে কাঁধে...

পুলু নার্ভাস গলায় বলে উঠল,—মন্দিরের দিকে গার্ড আছে না? দৌড়ে গিয়ে ডেকে আনব?

অন্তু বলল,—দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা না।

শুভ্র মিত্রাকে টেনে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছে। হাঁক ছাড়ল,—ছেড়ে দে মধু, সরে আয়।

কক্ষনও না, কেন সরব? মোচড়ের সঙ্গে জোর ঝটকা মারলাম একটা, ছুরি ছিটকে গেল বালিতে। চুলের মুঠি ধরে সাপটে ধরলাম ছেলেটাকে, হাঁটু দিয়ে আঘাত করলাম পেটে। নুয়ে পড়ল ছেলেটা, সবেগে লাথি চালালাম। সাত হাত দূরে গিয়ে ছেলেটা গড়াচ্ছে এখন, কেঁউ কেঁউ করছে। কোনওক্রমে উঠে দাঁড়াল, তারপরই সাইকেল নিয়ে ভোঁ দৌড়। বাকিরাও সাইকেলে চেপে পালাচ্ছে।

মিনিটের মধ্যে পাঁচ মূর্তি উধাও।

উত্তেজনা কাটতেই নজরে পড়ল কাঁধ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

জয়া কাছে এসে শিউরে উঠল,—ওমা, এ তো অনেকটা কেটে গেছে! ইশ, কী হবে এখন?

আলগা হাত বোলালাম কাটা জায়গাটায়। বললাম,—না না, ও কিছু না। সামান্য একটু ঘষা লেগেছে।

—মোটেই সামান্য নয়। এত রক্ত পড়ছে... বলতে বলতে ব্যাগ খুলে রুমাল বার করল জয়া। ধবধবে ফর্সা রুমাল চেপে ধরেছে আমার কাঁধে,—চলুন, এক্ষুনি গিয়ে ওষুধ লাগাতে হবে।

বন্দনা বলল,—আমার কাছে ব্যান্ডেজ আছে। ভাল করে বেঁধে দিতে হবে জায়গাটা। ...উফ, ধন্য সাহস বটে আপনার! ওই রকম একটা ছুরিঅলা রাফিয়ানের সঙ্গে লড়ে গেলেন!

আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। কী বা এমন বাহাদুরির কাজ করেছি আমি! আমাদেরই এক বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে কটা ছেলে এসে ইতরামি করবে, আর আমি চুপচাপ হজম করব? এও কি হয়? যা করেছি তার থেকে কম কিছু করলে নিজের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারতাম? ওই তো একটু কাটা, রাত পোহালে তার চিহ্নই থাকবে না...

এতক্ষণে ফিরেছে পুলু, সঙ্গে মন্দিরের এক প্রহরী। পরনে খাকি প্যান্টশার্ট, হাতে মোটা লাঠি, বয়স বোধহয় কুড়িও ছোঁয়নি। রক্ত টক্ত দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল ছোকরা, ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক।

শুভ্র ছেলেটাকে খেঁকিয়ে উঠল,—আপনাদের এখানে ল অ্যান্ড অর্ডার বলে কি কিছু নেই? থানা কোথায় আপনাদের? চলুন আমার সঙ্গে। রিপোর্ট করব।

ঘাড় ঝুলে গেল ছেলেটার।

বেচারার মুখ দেখে আমার মায়া হল। বললাম,—ছেড়ে দে ওকে। যা হওয়ার হয়ে গেছে, আর কিছু করতে হবে না।

—কেন ছাড়ব? মামদোবাজি? ট্যুরিস্ট স্পটে এ সব বাঁদরামো চলবে, তার একটা প্রোটেস্ট হবে না?

বন্দনা ঠোঁট বেঁকাল,—এখন খুব বুলি ফুটেছে দেখি! এদিকে গণ্ডগোলের সময়ে তো হাঁটু কাঁপছিল!

শুভ্রর মুখ নিমেষে কালো।

তড়িঘড়ি বললাম,—আহ, চলো তো ফিরি।

ছাড়া পেয়ে প্রহরী ছেলেটাও বাঁচল যেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটা দিল মন্দিরের দিকে। প্রায় ওই গুণ্ডাগুলোর মতোই।

পান্থনিবাসের পথে পায়ে পায়ে চলেছি আমরা। অন্তর কোলে টুটুল। ভয় পেয়ে কাঁদছিল মেয়েটা, এখন ড্যাবড্যাব তাকাচ্ছে আমার দিকে। পুলু আমার হাত ধরল, চাপ দিচ্ছে মৃদু। এই প্রথম পুলু আমার কোনও কাজের জন্য আমাকে গাড়োল বলছে না।

রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে বসলাম বারান্দায়। সিগারেট ধরিয়েছি। কমই খাই সিগারেট, দিনে তিনটে কি চারটের বেশি কখনওই না। আজ বেশ লাগছে সিগারেটের স্বাদ। মস্তিষ্কে কাজ করছে ধোঁয়া, মাথা এখন তুলোর মতো হালকা। সন্ধের ঘটনাটা ফিরে ফিরে আসছে মনে। ইশ, ব্যাটা বদমাশগুলো বড় অল্পে ছাড়া পেয়ে গেল। গোটা দুয়েকের মুখ ফাটাতে পারলে বেশ হত। শালা, টিমের মেয়েদের সঙ্গে মাজাকি, অ্যাঁ? তাও আবার যে সে মেয়ে নয়, মিত্রা!

—মধুদা, আপনি এখনও বাইরে?

জোর ঝাঁকুনি খেলাম। মিত্রা! এইমাত্র মিত্রার কথা ভাবছিলাম, অমনি মিত্রা আবির্ভূত সামনে!

ধড়মড়িয়ে সোজা হলাম,—এই এমনিই।...তুমি এখনও শোওনি?

—শোব।

বলল বটে, কিন্তু মিত্রা ঘরের দিকে গেল না। টানা বারান্দায় সার সার বেতের চেয়ার, টেনে বসল মুখোমুখি। দেখছিলাম মিত্রাকে, কেমন যেন অন্য রকম লাগছে মুখখানা। শুকনো শুকনো, ভার ভার। এখনও সন্ধের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি? আমার দৃষ্টির সামনে মিত্রা কেমন কুঁকড়ে যায়। হয়তো বা ঘৃণায়। হয়তো বা বিরক্তিতে। এখন কিন্তু তেমনটি হচ্ছে না! বরং চোখে চোখ পড়তেই নামিয়ে নিল মুখ, চুপ করে বসে আছে। কিছু বলবে কি? সন্ধের ঘটনাটার পর থেকে সকলেই কিছু না কিছু কথা বলেছে আমার সঙ্গে, একমাত্র মিত্রা ছাড়া।

ঝপ করে মিত্রা বলে উঠল,—আপনার ঋণ আমি কোনওদিন শোধ করতে পারব না মধুদা।

এমন কথার জন্য তৈরি ছিলাম না। বললাম,—কীসের ঋণ?

—জানেন না? মিত্রার গলা ধরা ধরা শোনাল,—আপনি না থাকলে আজ...আর কেউ তো...

—আরে দূর, ছাড়ো তো। হালকাভাবে উড়িয়ে দিতে চাইলাম মিত্রাকে। লঘু সুরে বললাম,—তুমিও তো, ওই যে কী বলে, কম বীরপুরুষ নও। দিব্যি একা একাই লড়ে যাচ্ছিলে।

—যাহ্। মিত্রা হেসে ফেলল,—আমার এমন দুমদাম মাথা গরম হয়ে যায়, খেয়াল থাকে না কোথায় কারা সামনে আছে...

—আমারও তো তাই। রাগের মাথায় একটু বেশি ইয়ে দেখিয়ে ফেলেছি।

—উঁহু, রাগের মাথায় নয়।

—তবে? মুখটা হাঁ হয়ে গেল আমার।

—আপনি জানেন না, আপনি সবার থেকে আলাদা। কেউ যা পারে না, আপনি তা অনায়াসে পারেন। আপনি একা বুক চিতিয়ে লড়তে পারেন। কটা মানুষ পারে এরকম?

কী বলছে মিত্রা? বত্রিশ বছর বয়স হতে চলল, এমন কথা কোনও মেয়ে বলেছে আমাকে?

মিত্রা আবার ফিসফিস করে বলল,—আমার এতদিন ভুল ধারণা ছিল মধুদা। সরি, এক্সট্রিমলি সরি।

সুন্দর একটা বাতাস বইছে। মিত্রা চলে যাওয়ার পরও বসে আছি, বসেই আছি। বুকটা কেমন চিনচিন করছে। আনন্দে? পুলু অন্ত শুভ্র কেউ যা পাবে না, আমি তা পারি? কান্না আসছে কেন হঠাৎ?

ঘরে যেতে আর ইচ্ছেই করছে না। নেমে এলাম লনে। গেট পেরিয়ে এলোমেলো পথে হাঁটছি। মাথার ওপর এক তারায় ছাওয়া আকাশ, এক কোণে ঝুলছে নৌকোর মতো চাঁদ, নিঝুম নিরালা রাতে হাওয়া বইছে শনশন... আহ, বেঁচে থাকাটা কী সুখের! গলা ছেড়ে গান গাইব? ধেই ধেই নাচব? পাঁই পাঁই ছুটব? বালিতে গড়াগড়ি দেব? থাক গে, এই গভীর রাতে কেউ দেখে ফেললে হয়তো আমাকে পাগলা গারদেই ঢুকিয়ে দেবে।

কতক্ষণ একলা হেঁটেছি হিসেবই নেই, পান্থনিবাসের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। ওপাশের ঝোপ

ঝোপ ঝোপ জায়গাটায় অন্ত না? সঙ্গে কে? জয়া? না তো, জয়া তো নয়। বন্দনা। দুজনে হাত ধরে অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছে? কী ঘনিষ্ঠ ভঙ্গি, ঠিক যেন কাল সমুদ্রতীরের মিত্রা আর পুলু।

দ্রুত সরে গেলাম। নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছি। অন্ধকারে ছায়ামূর্তি হয়ে মিলিয়ে গেল দুজনে। একটু পরেই ফিরল, ওই পথেই। ঝোপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইল অন্ত, বেড়াল পায়ে বারান্দায় উঠে গেল বন্দনা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্ত সিগারেট খেল একটা, দু চার পা হাঁটল লনে, তারপর সেও ঘরমুখো।

ধপাস ধপাস লাফাচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ড। হা ঈশ্বর, এ কী দেখলাম? কেন দেখলাম? হে ভগবান, আর কেউ দেখেনি তো? দেখলেই কেলেঙ্কারি, দেখলেই দুঃখ, দেখলেই প্রলয়। কেউ কারুর জন্য দুঃখ পাচ্ছে, একজনের জন্য অন্যের অশান্তি হচ্ছে, এই ভাবনাটাই যে কী কষ্টের।

সব ঘর বন্ধ। খোলা আকাশের নীচে বসে আছি আমি। জ্যোৎস্না মাখা আকাশে তারাব ফুল ভারী নিষ্প্রভ এখন। রাতের বুক চিরে একটা পাখি ডেকে উঠল হঠাৎ, ডানা ঝাপটানোর আওয়াজও পেলাম যেন। নোনা একটা গন্ধ এসে লাগছে নাকে, দুঃখের গন্ধ।

কতক্ষণ আর এভাবে বসে থাকা যায়! উঠেছি এক সময়ে। বারান্দা ধরে এগোচ্ছি, ঘরের কাছে এসে পা আটকে গেল। দু হাঁটুর ভাঁজে মুখ রেখে চেয়ারে গুটিসুটি হয়ে বসে জয়া!

বুকে বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠল। জয়ার সঙ্গে মায়ের বড় মিল।

—তুমি এভাবে বাইরে বসে আছ কেন?

মুখ তুলল জয়া, বড় একটা শ্বাস ফেলল। উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করল,—আপনি এত রাতে কোথায় গিয়েছিলেন?

—ঘুম আসছিল না। ঘুরছিলাম একটু। তুমি এখানে কী করছ?

—আমারও ঘুম আসছে না।

অন্ধকারে জয়ার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। চোখ কি জ্বলছে জয়ার? জ্বলছে, না জল চিকচিক করছে?

হায় ভগবান, সবই কি দেখে ফেলেছে জয়া?

দায়িত্বশীল দাদার মতো গম্ভীর স্বরে বললাম,—একা একা বসে থাকতে হবে না। ভেতরে যাও। ঘুম না এলেও শুয়ে থাকো।...যাও।

আশ্চর্য, জয়া অবাধ্য হল না। গুটি গুটি পায়ে যাচ্ছে ঘরের দিকে। আমার গলায় কি ব্যক্তিত্ব এসেছে কোনও?

সন্ধের ঘটনাটা কি সত্যিই বদলে দিল আমাকে? অন্তত ওদের চোখে?

সমুদ্র উত্তাল

সকালটা আজ বড় মলিন। কাল কোনার্ক থেকে ফেরার পরও আকাশ ভারী ঝকঝকে ছিল। কোত্থেকে এত কালো মেঘ এসে গেল কে জানে! ঝুঁকতে ঝুঁকতে মেঘ ছুঁয়ে ফেলেছে সমুদ্র, বাতাস থম মেরে গেছে। বৃষ্টি হবে কি? হলে বেশ হয়। অসময়ের বৃষ্টি বড় সুখের।

একটু আগে ওরা সবাই ব্রেকফাস্টে গেল। নীচের ডাইনিং হলে। জয়া যায়নি শুধু। টুটুলের নাকি শরীর খারাপ, গা ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে, জয়া টুটুলের খাবার ঘরেই যাবে।

আমারও বিছানা ছেড়ে উঠতে একটুও ইচ্ছে করছে না। এ কি অবসাদ? আলস্য? জানি না। মাত্র কটা দিনে আমার সবকিছুই কেমন ওলট পালোট হয়ে গেল। অনুতোষ যেন মাতাল হাওয়ার মতো এসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। মাতাল হাওয়া? না বসন্তের হাওয়া?

হ্যাঁ, বসন্তই। শুভ্রর সঙ্গে সম্পর্কটা তো এখন অনন্ত রুক্ষ শীত বই কিছু নয়।

আমি এখন কী করি? কী যে করি?

কী দেখে যে শুভ্রতে মজেছিলাম আমি? অনুতোষ তো পাশেই ছিল, কেন তাকে আগে চোখে

তড়িঘড়ি বললাম,—আহ, চলো তো ফিরি।

ছাড়া পেয়ে প্রহরী ছেলেটাও বাঁচল যেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটা দিল মন্দিরের দিকে। প্রায় ওই গুণ্ডাগুলোর মতোই।

পান্থনিবাসের পথে পায়ে পায়ে চলেছি আমরা। অন্তর কোলে টুটুল। ভয় পেয়ে কাঁদছিল মেয়েটা, এখন ড্যাবড্যাব তাকাচ্ছে আমার দিকে। পুলু আমার হাত ধরল, চাপ দিচ্ছে মৃদু। এই প্রথম পুলু আমার কোনও কাজের জন্য আমাকে গাড়োল বলছে না।

রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে বসলাম বারান্দায়। সিগারেট ধরিয়েছি। কমই খাই সিগারেট, দিনে তিনটে কি চারটের বেশি কখনওই না। আজ বেশ লাগছে সিগারেটের স্বাদ। মস্তিষ্কে কাজ করছে ধোঁয়া, মাথা এখন তুলোর মতো হালকা। সন্ধের ঘটনাটা ফিরে ফিরে আসছে মনে। ইশ, ব্যাটা বদমাশগুলো বড় অল্পে ছাড়া পেয়ে গেল। গোটা দুয়েকের মুখ ফাটাতে পারলে বেশ হত। শালা, টিমের মেয়েদের সঙ্গে মাজাকি, আঁ? তাও আবার যে সে মেয়ে নয়, মিত্রা!

—মধুদা, আপনি এখনও বাইরে?

জোর ঝাঁকুনি খেলাম। মিত্রা! এইমাত্র মিত্রার কথা ভাবছিলাম, অমনি মিত্রা আবির্ভূত সামনে।

ধড়মড়িয়ে সোজা হলাম,—এই এমনিই।...তুমি এখনও শোওনি?

—শোব।

বলল বটে, কিন্তু মিত্রা ঘরের দিকে গেল না। টানা বারান্দায় সার সার বেতের চেয়ার, টেনে বসল মুখোমুখি। দেখছিলাম মিত্রাকে, কেমন যেন অন্য রকম লাগছে মুখখানা। শুকনো শুকনো, ভার ভার। এখনও সন্ধের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি? আমার দৃষ্টির সামনে মিত্রা কেমন কুঁকড়ে যায়। হয়তো বা ঘৃণায়। হয়তো বা বিরক্তিতে। এখন কিন্তু তেমনটি হচ্ছে না! বরং চোখে চোখ পড়তেই নামিয়ে নিল মুখ, চুপ করে বসে আছে। কিছু বলবে কি? সন্ধের ঘটনাটার পর থেকে সকলেই কিছু না কিছু কথা বলেছে আমার সঙ্গে, একমাত্র মিত্রা ছাড়া।

ঝপ করে মিত্রা বলে উঠল,—আপনার ঋণ আমি কোনওদিন শোধ করতে পারব না মধুদা।

এমন কথার জন্য তৈরি ছিলাম না। বললাম,—কীসের ঋণ?

—জানেন না? মিত্রার গলা ধরা ধরা শোনাল,—আপনি না থাকলে আজ...আর কেউ তো...

—আরে দূর, ছাড়ো তো। হালকাভাবে উড়িয়ে দিতে চাইলাম মিত্রাকে। লঘু সুরে বললাম,—তুমিও তো, ওই যে কী বলে, কম বীরপুরুষ নও। দিব্যি একা একাই লড়ে যাচ্ছিলে।

—যাহ্। মিত্রা হেসে ফেলল,—আমার এমন দুমদাম মাথা গরম হয়ে যায়, খেয়াল থাকে না কোথায় কারা সামনে আছে...

—আমারও তো তাই। রাগের মাথায় একটু বেশি ইয়ে দেখিয়ে ফেলেছি।

—উঁহু, রাগের মাথায় নয়।

—তবে? মুখটা হাঁ হয়ে গেল আমার।

—আপনি জানেন না, আপনি সবার থেকে আলাদা। কেউ যা পারে না, আপনি তা অনায়াসে পারেন। আপনি একা বুক চিতিয়ে লড়তে পারেন। কটা মানুষ পারে এরকম?

কী বলছে মিত্রা? বত্রিশ বছর বয়স হতে চলল, এমন কথা কোনও মেয়ে বলেছে আমাকে?

মিত্রা আবার ফিসফিস করে বলল,—আমার এতদিন ভুল ধারণা ছিল মধুদা। সরি, এক্সট্রিমলি সরি।

সুন্দর একটা বাতাস বইছে। মিত্রা চলে যাওয়ার পরও বসে আছি, বসেই আছি। বুকটা কেমন চিনচিন করছে। আনন্দে? পুলু অন্ত শুভ্র কেউ যা পারে না, আমি তা পারি? কান্না আসছে কেন হঠাৎ?

ঘরে যেতে আর ইচ্ছেই করছে না। নেমে এলাম লনে। গেট পেরিয়ে এলোমেলো পথে হাঁটছি। মাথার ওপর এক তারায় ছাওয়া আকাশ, এক কোণে ঝুলছে নৌকোর মতো চাঁদ, নিঝুম নিরালা রাতে হাওয়া বইছে শনশন... আহ, বেঁচে থাকাটা কী সুখের! গলা ছেড়ে গান গাইব? ধেই ধেই নাচব? পাঁই পাঁই ছুটব? বালিতে গড়াগড়ি দেব? থাক গে, এই গভীর রাতে কেউ দেখে ফেললে হয়তো আমাকে পাগলা গারদেই ঢুকিয়ে দেবে।

কতক্ষণ একলা হেঁটেছি হিসেবই নেই, পান্থনিবাসের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। ওপাশের ঝোপ

ঝোপ ঝোপ জায়গাটায় অন্তু না? সঙ্গে কে? জয়া? না তো, জয়া তো নয়। বন্দনা। দুজনে হাত ধরে অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছে? কী ঘনিষ্ঠ ভঙ্গি, ঠিক যেন কাল সমুদ্রতীরের মিত্রা আর পুলু!

দ্রুত সরে গেলাম। নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছি। অন্ধকারে ছায়ামূর্তি হয়ে মিলিয়ে গেল দুজনে। একটু পরেই ফিরল, ওই পথেই। ঝোপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইল অন্তু, বেড়াল পায়ে বারান্দায় উঠে গেল বন্দনা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্তু সিগারেট খেল একটা, দু চার পা হাঁটল লনে, তারপর সেও ঘরমুখো।

ধপাস ধপাস লাফাচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ড। হা ঈশ্বর, এ কী দেখলাম? কেন দেখলাম? হে ভগবান, আর কেউ দেখেনি তো? দেখলেই কেলেঙ্কারি, দেখলেই দুঃখ, দেখলেই প্রলয়। কেউ কারুর জন্য দুঃখ পাচ্ছে, একজনের জন্য অন্যের অশান্তি হচ্ছে, এই ভাবনাটাই যে কী কষ্টের।

সব ঘর বন্ধ। খোলা আকাশের নীচে বসে আছি আমি। জ্যোৎস্না মাখা আকাশে তারার ফুল ভারী নিষ্প্রভ এখন। রাতের বুক চিরে একটা পাখি ডেকে উঠল হঠাৎ, ডানা ঝাপটানোর আওয়াজও পেলাম যেন। নোনা একটা গন্ধ এসে লাগছে নাকে, দুঃখের গন্ধ।

কতক্ষণ আর এভাবে বসে থাকা যায়! উঠেছি এক সময়ে। বারান্দা ধরে এগোচ্ছি, ঘরের কাছে এসে পা আটকে গেল। দু হাঁটুর ভাঁজে মুখ রেখে চেয়ারে গুটিসুটি হয়ে বসে জয়া!

বুকে বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠল। জয়ার সঙ্গে মায়ের বড় মিল!

—তুমি এভাবে বাইরে বসে আছ কেন?

মুখ তুলল জয়া, বড় একটা শ্বাস ফেলল। উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করল,—আপনি এত রাতে কোথায় গিয়েছিলেন?

—ঘুম আসছিল না। ঘুরছিলাম একটু। তুমি এখানে কী করছ?

—আমারও ঘুম আসছে না।

অন্ধকারে জয়ার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। চোখ কি জ্বলছে জয়ার? জ্বলছে, না জল চিকচিক করছে?

হায় ভগবান, সবই কি দেখে ফেলেছে জয়া?

দায়িত্বশীল দাদার মতো গম্ভীর স্বরে বললাম,—একা একা বসে থাকতে হবে না। ভেতরে যাও। ঘুম না এলেও শুয়ে থাকো।...যাও।

আশ্চর্য, জয়া অবাধ্য হল না। গুটি গুটি পায়ে যাচ্ছে ঘরের দিকে। আমার গলায় কি ব্যক্তিত্ব এসেছে কোনও?

সন্ধের ঘটনাটা কি সত্যিই বদলে দিল আমাকে? অন্তত ওদের চোখে?

সমুদ্র উত্তাল

সকালটা আজ বড় মলিন। কাল কোনার্ক থেকে ফেরার পরও আকাশ ভারী ঝকঝকে ছিল। কোত্থেকে এত কালো মেঘ এসে গেল কে জানে! ঝুঁকতে ঝুঁকতে মেঘ ছুঁয়ে ফেলেছে সমুদ্র, বাতাস থম মেরে গেছে। বৃষ্টি হবে কি? হলে বেশ হয়। অসময়ের বৃষ্টি বড় সুখের।

একটু আগে ওরা সবাই ব্রেকফাস্টে গেল। নীচের ডাইনিং হলে। জয়া যায়নি শুধু। টুটুলের নাকি শরীর খারাপ, গা ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে, জয়া টুটুলের খাবার ঘরেই যাবে।

আমারও বিছানা ছেড়ে উঠতে একটুও ইচ্ছে করছে না। এ কি অবসাদ? আলস্য? জানি না। মাত্র কটা দিনে আমার সবকিছুই কেমন ওলট পালোট হয়ে গেল। অনুতোষ যেন মাতাল হাওয়ার মতো এসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। মাতাল হাওয়া? না বসন্তের হাওয়া?

হ্যাঁ, বসন্তই। শুভ্রর সঙ্গে সম্পর্কটা তো এখন অনন্ত রুক্ষ শীত বই কিছু নয়।

আমি এখন কী করি? কী যে করি?

কী দেখে যে শুভ্রতে মজেছিলাম আমি? অনুতোষ তো পাশেই ছিল, কেন তাকে আগে চোখে

পড়েনি? অনুতোষ না, অন্তু অন্তু অন্তু...। ওই হল পুরুষ। পাহাড়ের মতো উদাস, শান্ত, গম্ভীর। জয়া সেদিন ভাবল আমি এমনি এমনি বলছি। ওরে বোকা মেয়ে, তুই সমুদ্রেই বিভোর থাক, পাহাড়ের মর্ম বোঝা তোর কম্মো নয়। মিত্রা ঠিকই বলেছে, শুভ্রর মতো ছ্যাবলার সঙ্গেই তোকে মানায় ভাল। জয়াকে অবশ্য আঘাত দিতে আমার খারাপ লাগছে। কী করি, পাহাড় যে নিজেই আমার কাছে চলে এল।

আকাশ পাতাল ভাবনা ঘুরছে মনে। ভাবনা, না সংশয়? অন্তুই কি আমার সত্যিকারের প্রেমিক? নাকি একটা প্যাশন? অথবা নিছকই মোহ? কিংবা বুকের শূন্যতাটুকু ভরানোর জন্য এক মুঠো কুড়িয়ে পাওয়া সুখ? বাঁচার জন্য আঁকড়ে ধরা খড়কুটো নয় তো? জয়াকে যতই উপহাস করি, অন্তু কি জয়াকে ছেড়ে আসবে কোনওদিন? কেন অন্তু বলল, আমার মন অত ছোট নয় বন্দনা, যে একজনকে ভালবেসেই ফুরিয়ে যাবে? আমিই কি শুভ্রকে ছেড়ে যেতে পারব? সেই শুভ্র, যে আমার জন্য কেরিয়ার ভুলেছিল, জেদ ধরে আমার পড়াশুনো চালিয়েছে, রাতের পর রাত জেগে আমায় কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য তৈরি করেছে...! কাজটা কি নির্লজ্জ প্রতারণা হবে না? কোনটা বেশি প্রতারণা? লুকিয়ে চুরিয়ে প্রেম? অথবা অতীতকে মুছে ফেলে নতুন একটা আশার পিছনে ছুটে যাওয়া? যার সঙ্গে বনে না, তার সঙ্গে বাস করাটাও তো তাকে ঠকানো।

আমার কী দোষ? আমি কি একাই বদলেছি, শুভ্র বদলায়নি? আমার পায়ে কাঁকড় ফুটবে বলে যে এক সময়ে মাটিতে নিজেকে বিছিয়ে দিত, সে এখন কোথায়? আস্ত একটা কমপ্লেক্সের ডিপো বনে গেছে। কথায় কথায় বলবে, আমার নাকি রূপের দেমাক! কী অহঙ্কারটা করি আমি? সুন্দর হয়ে জন্মানো কি অপরাধ? রাস্তাঘাটে লোকজন যদি আমায় চেয়ে দেখে, আমি কি তাদের চোখে খোঁচা দিয়ে অন্ধ করে দেব? সৌন্দর্যের স্তুতি কে না ভালবাসে? শুভ্রকে কোনও মেয়ে হ্যান্ডসাম বললে শুভ্র কি মুখ ফিরিয়ে নেবে?

আসল ব্যাপার হল, শুভ্রর মাথায় বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গেছে সে আমার যোগ্য নয়। জন্মেছে, না ছিলই চিরকাল? আমি টের পাইনি? এক ছাদের নীচে, এক বিছানায় হাজার হাজার রাত কাটিয়েও নিকটতম মানুষের কত কিছু যে গোপন থেকে যায়! কী ছোট মন শুভ্রর! সেই বিয়ের আগে বাবা ওর সঙ্গে কী আচরণ করেছিল তা এখনও মনে পুষে রেখেছে! শুভ্রর বাবা মা আমার সঙ্গে কটা দিন ভাল মুখে কথা বলেছিল? কেন আমাদের আলাদা হয়ে যেতে হল? তার পরও তো শুভ্র ও বাড়ি যায়। যায় না? তা হলে?

একটা বাচ্চা হয়ে গেলে কি শুভ্র অনেক স্বাভাবিক থাকত? মনে হয় না। কত স্বামী স্ত্রীর তো সন্তান নেই, সেই সংসারের পুরুষরা কি শুভ্রর মতো খেঁকি কুকুর? ওইটুকু একটা ছেলে দীপু, নিজেরই পিসতুতো ভাই, তাকে নিয়ে পর্যন্ত...!

দড়াম করে দরজা খুলে গেল। এসেছে।

টেরচা চোখে তাকাল বিছানার দিকে,—এখনও শুয়ে আছ যে বড়?

উলটো দিকে ফিরলাম। কথা বলার স্পৃহা নেই।

ঘুরে এসে সামনে বসল শুভ্র। সিগারেট ধরাল একটা, ইচ্ছে করে ধোঁয়া ছাড়ল মুখের ওপর। গন্ধটা আমার ভাল লাগে না জেনেও।

আবার উলটো মুখ ঘুরতে যাচ্ছিলাম, শুভ্র কাঁধ চেপে ধরেছে,—হলটা কী? শরীর খারাপ?

—না।

—ব্রেকফাস্টে গেলে না কেন? পুলুরা অত করে ডেকে গেল!

—খাব না কিছু।

—কেন?

—ইচ্ছে।

—হুঁহ্, তোমার তো সবই ইচ্ছে। শুভ্র দাঁত কিড়মিড় করে উঠল,—লীলা করবে, সেও ইচ্ছে। কেলি করবে, সেও ইচ্ছে...

কাঁধ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম শুভ্রর হাত। উঠে বসলাম। আজই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। সোজাসুজি চোখ রাখলাম শুভ্রর চোখে,—কী বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো।

—বলার বাকি কী আছে? চার দিকে তো টি টি ফেলে দিয়েছ।

—বেশ করেছি। তুমিই তো বউ বদলাবদলির খেলাটা খেলতে চেয়েছিলে? কেন চেয়েছিলে? সন্দেহটা যাচাই করতে? দ্যাখো এবার সন্দেহটা সত্যি হয়ে গেলে কেমন লাগে।

শুভ্র একটু যেন হকচকিয়ে গেল। সম্ভবত এমন পালটা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। দু-এক পল থমকে থেকে ফেটে পড়ল আবার,—বেহায়াপনার সাফাই গাইতে লজ্জা করে না তোমার?

—আমার কীসের লজ্জা? যার বউ বিয়ের ছ বছর পরেও অন্য পুরুষের সঙ্গে ভাবভালবাসা করে, লজ্জা তো পাবে সে।

—চোপ। চোপ। শুভ্র আঙুল নাচাল,—একটা কথা নয়। জিভ ছিঁড়ে নেব।

—হ্যাঁ, ওইটেই তো পারো। বন্ধুদের সামনে ভিজে বেড়ালটি হয়ে, ভালমানুষটি সেজে বসে থাকবে, আর বউকে ধরে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেবে, গায়ে হাত চালাবে, মুখ খারাপ করবে...। তুমি মানুষ?

—বটেই তো, বটেই তো। মানুষ তো এখন তোমার কাছে একজনই।

—অবশ্যই। তুমি তার নখের যোগ্যও নও। রাগের মুহূর্তেই মাথাটা হঠাৎ অদ্ভুত রকমের শান্ত হয়ে গেল আমার। হিম গলায় বললাম,—বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় বলছি, শুনে নাও। হ্যাঁ, আমি এখন অন্তুকেই ভালবাসি, তোমাকে নয়। আমার চোখে এখন একমাত্র অন্তুই মানুষ। তুমি শুধু একটা মৃত প্রেমিক। আমি আর তোমাকে একটুও ভয় পাই না। তুমি আমার জীবন থেকে মুছে গেলে আমি শান্তি পাব।

শুভ্র স্থির মুখে কথাগুলো শুনল। পলকের জন্য দপ করে জ্বলে উঠল চোখ, পলকে মণি নিবে গেল। আধপোড়া সিগারেট গুঁজে দিল ছাইদানে, চেপে চেপে ঘষল। ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে আমার দিকে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিয়ে নিচ্ছে মুখ। উঠে ব্যালকনিতে গিয়ে বসল, আবার একটা সিগারেট ধরিয়েছে, আবার একটা...। নিঃশব্দে ঢুকে গেল বাথরুমে, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সমুদ্রস্নানের পোশাক পরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আহ্, মুক্তি। বুকটা অনেক হালকা লাগছে এখন, মাথার ঝিমঝিম ভাবও যেন চলে গেছে সহসা। গোটা টুারে এক সেকেন্ডের জন্যও শরীর এমন ঝরঝরে লাগেনি। মনের আগল খুলতে পারলে এত আরাম হয়!

বিছানা ছেড়ে আয়নার সামনে এলাম। চোখের নীচে এখনও ঘন কালি। সব মালিন্য মুছে ফেলতে হবে, সব। পুরীতে অদ্যই শেষ রজনী, তারে-না-না করে কাটিয়ে দিতে হবে দিনটা। কলকাতা ফিরেই চরম সিদ্ধান্তটা নিয়ে নেব। বাপের বাড়ি যাওয়ার আর মুখ নেই, অন্তুর সঙ্গে সম্পর্কটাও ওরা খোলা মনে মানবে না। যা মাইনে পাই তাতে একটা ঘরটর জুটবে না? নিদেনপক্ষে কোনও মেয়েদের হোস্টেল ফোস্টেল?

জিভটা কষটে মেরে আছে। সকাল থেকে মুখ পর্যন্ত ধোওয়া হয়নি। ব্রাশে পেস্ট লাগাচ্ছি, মিত্রা এল ঘরে।

—কী রে, আবার শরীর আপসেট?

—না না। ঠিক আছি তো।

—শুভ্রদা যে বলল তোর পেট কনকন্ করছে? কী ওষুধ খাওয়ানো যায় অন্তুদাকে জিজ্ঞেস করছিল...

ঢঙ। শুভ্রকে অ্যাস্টিং-এ একশোয় একশো দেওয়া উচিত। পারলে অন্তুকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে, এদিকে সামনাসামনি গলাগলি বন্ধুত্বের ভাণ! ভণ্ড একটা, আদ্যন্ত মুখোশ পরা মানুষ।

বিরক্তি চেপে আলগা হাসলাম,—তেমন কিছু নয়। স্টমাকটাকে সকালে একটু রেস্ট দিলাম।

—ও। সমুদ্রে যাবি না?

—সবাই চলে গেছে?

—যাচ্ছে। মোটামুটি রেডি। জয়াটা যেতে চাইছিল না, টুটুল এমন বায়না ধরল...

—টুটুলের জ্বর এসেছে না?

—জ্বর নেই। ওই একটু সর্দি, নাক ফোঁচফোঁচ...জয়া মেয়ে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বসে থাকবে। ...নে নে, ঝটপট তৈরি হয়ে নে।

—এক সেকেন্ড।

দ্রুত শাড়ি ছেড়ে সালোয়ার কামিজে মুড়ে নিলাম নিজেকে। ইচ্ছে নেই, তবু যদি নামি সমুদ্রে! অন্তু ডাকলে কি না বলতে পারব?

সবাই সমুদ্রে চলে গেছে। কথা বলতে বলতে এগোচ্ছি আমি আর মিত্রা। টুকটাক কথা। মিত্রাই বলছে বেশি, আমি শুধু হুঁ হাঁ করছি। মিত্রার একটা সম্বলপুরি শাড়ি কেনার শখ, এখানে কি তেমন সস্তা হবে? কোথায় একটা হাতির দাঁতের বাক্স দেখেছে, চোখ ফেরানো যায় না, আজ সেটা বগলদাবা করবেই। পল্লব একটু হাঁ হাঁ করবে, তা করুক, মিত্রা আমল দেবে না। পোড়োপিঠেও নেবে মিত্রা, শ্বশুরের জন্য। শ্বশুর নাকি খুব মিষ্টি ভালবাসে। শাশুড়ির জন্য কটকি চাদর কি খারাপ হবে?

কথার মাঝেই সমুদ্রে চোখ পড়ল। কী বড় বড় ঢেউ রে বাবা আজ! পূর্ণিমা অমাবস্যা কিছুই তো নয় এখন, শুধু মেঘ দেখেই এমন ফুঁসছে সমুদ্র? আকাশের রং সত্যিই এখন ঘন কালো, ঝড় বৃষ্টি একটা নামতেই পারে।

পল্লবদা মিত্রাকে নিয়ে জলে নেমে গেল। দু হাতে ঢেউকে আদর করতে করতে ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। শুভ্র অন্তু কিছুটা দূরে, লড়াই করছে সমুদ্রের সঙ্গে। মধুদা টুটুলকে কোলে নিয়ে পাড় ধরে হাঁটতে শুরু করল।

জয়ার পাশে গিয়ে বসলাম, আজ সমুদ্র কী ভয়ঙ্কর হয়ে আছে দেখেছিস?

জয়া ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখল আমাকে। মুখে আকাশের ছায়া। কিছু না বলে ম্লান হাসল একটু, চোখ নামিয়ে নিল।

কাল সকাল থেকেই জয়া বড় চুপচাপ। ফেরার পথে বাসে মেয়েকে আঁকড়ে চোখ বুজে বসে রইল, বিকেলে কোথাও বেরোল না, এমনকী মার্কেটিং-এর প্রলোভনেও না। শুধুই মেয়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগ? নাকি আঁচ করেছে কিছু? কোনার্কে কিছু দেখেনি নিশ্চয়ই। অন্তু তো বলল জয়া ঘুমোনোর পরই সে এসেছে রুম ছেড়ে। জানলে জানবে। একদিন তো সব মেনে নিতেই হবে, এখন থেকে মনকে প্রস্তুত রাখা ভাল।

পা ছড়িয়ে আধশোওয়া হলাম,—এরকম রাফ চেহারা দেখেও তোর সমুদ্রকে ভাল লাগে জয়া?

—লাগে। জয়া বিচিত্র চোখে তাকাল,—পাহাড়কেও দূর থেকে যত শান্ত দেখায়, কাছে গেলে পাহাড় তত শান্ত নয়। সেখানেও বরফের ঝড় ওঠে, বীভৎস ধস নামে।

জয়া কি ইঙ্গিত করল কিছু? চটজলদি জবাব এল না মুখে।

আবার কী একটা বলার জন্য মুখ ঘোরাল জয়া, তার আগেই পল্লবদা মিত্রা হাঁই হাঁই করতে করতে জল থেকে উঠে এসেছে।

পল্লবদা ধপাস করে বসে পড়ল। দম নিচ্ছে, কাশছে খকখক। থু থু করল বালিতে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,—আইব্বাস, কী ধাক্কা রে! কোমর একেবারে বেঁকে গেল।

মিত্রার কোমরে হাত। হাসছে,—কিচ্ছু হয়নি। ঠিক ঢেউ ভাঙার সময়ে ডুব না দিলে ওরকমই হয়। চলো চলো, আবার চলো।

—অসম্ভব। আমি আর নামছি না।

—ভিতুর ডিম কোথাকার। ...অ্যাই বন্দনা, তুই যাবি?

—হ্যাহ্, বন্দনা যাবে। সমুদ্রে গর্জন তেল ফেলে দিলেও বন্দনা নামবে না, আই বেট।

—জয়া, তুই?

—না রে, আমাকে বাদ দে।

—তা হলে তুমি আমাকে একটা নুলিয়া ফিট করে দাও।

—নুলিয়া? খবরদার। পল্লবদার মুখে ছদ্ম ত্রাস,—ঠিক আছে, আমিই নয় একটু পরে নামব। খানিকটা রেস্ট নিয়ে নিই।

মিত্রা ঝুপ করে পাশে বসে চিমটি কাটল পল্লবদাকে,—অ্যাই মশাই, নুলিয়াতে তোমার এত আপত্তি

কেন? একদম এম সি. পি.-পনা করবে না।

পল্লব দু হাতে কান ধরল,—আমি এম সি পি নই ম্যাডাম। বড় জোর আমাকে ডব্লিউ ও এল বলতে পারো।

—সেটা কী?

—ওয়াইফস্ ওবিডিয়েন্ট ল্যাম্ব। যাকে বলে বউয়ের মেড়া।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠলাম। জয়ার ঠোঁটও ফাঁক হয়েছে সামান্য। মিত্রা কিন্তু গলল না। বলল,—অ্যাই কথা ঘোরাবে না, কথা ঘোরাবে না।

—আরে বাবা, তোমার ভালর জন্যই তো বলছি। তোমার ওই সোনার বরণ নুলিয়ার ছোঁয়ায় যদি কালো মেয়ে যায়, আমি সইতে পারব না।

—নেকু। মিত্রাও এবার হেসে কুটিপাটি,—দেখেছিস তোরা, কী জালি লোক? টুপি দিয়ে কেস লাইট করছে।

ভাষা বটে! বিয়ের আগে কি রকে বসত মিত্রা?

অন্তও জল ছেড়ে উঠে এসেছে। থেবড়ে বসে পড়ল জয়ার পাশে,—কী এত হাসি চলছে তোমাদের?

—তোকে শুনতে হবে না। গ্যাঙ লিডার হয়েছিস, একটু রিফ্রেশমেন্টের আয়োজন কর। ডাব কোথায়, অ্যাঁ?

অন্ত বুঝদারের মতো ঘাড় নাড়ল,—হ্যাঁ ডাব তো চাই। নইলে এই ছোটলোকের মতো সমুদ্রটার সঙ্গে যোঝা যাবে না। ...মধুউ, অ্যাই মধুউ...

মধুদা অনেকটা দূরে। বালি দিয়ে কী একটা বানাচ্ছে, প্রাসাদ টাসাদ বোধ হয়। টুটুল মুগ্ধ চোখে দেখছে সেই বোকামি, অদক্ষ রাজমিস্ত্রির মতো হাতও লাগাচ্ছে মাঝে মাঝে।

হাঁকাহাঁকিতে দুজনেই ছুটে এল। ডাবের নাম শুনেই টুটুলের চোখ বড় বড়, ভেতরের শাঁস খেতে সে বেজায় ভালবাসে, প্রায় আইসক্রিমের মতোই পাকলে পাকলে খায়।

মধুদার ডাকে ডাবঅলা হাজির। দুলে দুলে এগিয়ে দিচ্ছে ডাব, স্ট্র সমেত। নোনতা মিষ্টি জল বেশ লাগছে খালি পেটে। সামনেই স্নানার্থীদের ভিড়, তাদের টপকে হঠাৎ চোখ গেল দূরে। একটা মানুষ অনেকটা ভেতরে চলে গেছে, বিশাল বিশাল ঢেউগুলোর ওপারে। সাঁতারু? না তো, লোকটা কেমন ডুবছে আর ভাসছে! একটা হাত জলের ওপর একবার ভেসে উঠল! আর তো দেখা যাচ্ছে না।

বুকটা কেন যেন ধক করে উঠল। পাগলের মতো চোখ ঘোরাচ্ছি, শুভ্রকে তো দেখা যাচ্ছে না কোথাও!

আরেক বার উঠল হাতটা! শুধু হাত!

চিৎকার করে উঠলাম,—অন্তদা, পুলুদা, শুভ্র কোথায়?

—এই তো ওদিকটায় ছিল।

—না, নেই। ও ডুবে যাচ্ছে। ওই যে, ওখানে, ওখানে...

কে যেন আমায় ধাক্কা দিয়ে ঠেলে তুলল। জ্ঞানহারার মতো ছুটেছি সমুদ্রের দিকে। জল ভুলে, ঢেউ ভুলে, সব ভুলে। লোকজনরাও চমকে গেছে খুব। চেঁচামেচি করে ডাকছে নুলিয়াদের।

মধুদা আমায় এসে টেনে ধরল। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে সবকিছু, অন্ধকার...

হাসপাতালে করিডোরে বসে আছি নিথর। বুক ভেঙে কান্না আসছে, অথচ চোখে আর এক ফোঁটা জলও নেই। এ কী হয়ে গেল? এই রকমই কি আমি চেয়েছিলাম? কক্ষনও না, কক্ষনও না।

ওদিকের বেঞ্চে শুকনো মুখে মধুদা। অনুতোষদা আর পল্লবদা পায়চারি করছে পর্দা টাঙানো কেবিনটার সামনে। সবুজ পর্দা লাল সংকেত হয়ে দুলছে। জল তো সমুদ্রের পাড়েই বার করে দিয়েছে নুলিয়ারা, এখনও জ্ঞান ফিরছে না কেন শুভ্রর?

শুভ্র কি মরে যাবে? আমার জন্য? মাগোঃ।

চিন্তাটা অসাড় করে দিচ্ছে আমাকে, ছেড়ে যাচ্ছে হাত পা। শুকনো টাগরায় জিভ বোলাচ্ছি, জিভও এখন ব্লটিং পেপার, আরও শুকিয়ে যাচ্ছে মুখ। অনুতোষদা এসে কী যেন বলল মধুদাকে, জোরে জোরে দু দিকে মাথা নাড়ছে মধুদা। থম মেরে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অনুতোষদা, এবার পায়ে পায়ে আমার দিকে।

সামনে এসে মৃদু স্বরে বলল,—কতক্ষণ এভাবে ঠায় বসে থাকবে? ...দুপুরে তো খাওয়া দাওয়াও হল না, একটু চা টা দেখব নাকি?

—না।

—একদম খালি পেটে থাকলে তুমিও যে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

—আমি পারব না অনুতোষদা। এখন আমার গলা দিয়ে কিছু নামবে না।

—নাথিং টু ওরি। শ্বাসনালিতে জল চলে গেছে, তাই একটু কম্‌প্লিকেশান...ঠিক হয়ে যাবে।

—সান্ত্বনা দিচ্ছেন? আমি জানি, ও আর ফিরবে না।

—আহ্, অশুভ কথা বলতে নেই।

—শুভ্র আমায় শাস্তি দিল অনুতোষদা। ...শুভ্র বড় অভিমান নিয়ে...

—আহ্, থামবে তুমি? কী তখন থেকে বার বার এক কথা বলছ? ওকে না নিয়ে আমি কি কলকাতায় ফিরতে পারব?

অনুতোষদার স্বরে যন্ত্রণা। মাথা নিচু করে চলে গেল। পল্লবদার পাশে বসেছে।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। দমকা বাতাস উড়ে এল একটা। ঠাণ্ডা বাতাস, হাড় কেঁপে গেল। চোখ বুজে ফেললাম। ধেয়ে আসছে একের পর এক দৃশ্য। কলেজ গ্রাউন্ডে ক্রিকেট ম্যাচ চলছে, বাউন্ডারি মেরে পঞ্চাশে পৌঁছল শুভ্র। ব্যাট তুলেছে, আমারই দিকে। বিয়ের আসরে মন্ত্র পড়তে পড়তে পা দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কানের কাছে ফিসফিস করল, আর তোমার বাতাসী বিবি হওয়া হল না। রানীক্ষেতে গিয়ে পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে গলার শির ফুলিয়ে চেঁচাচ্ছে, বন্দনা... বন্দনা... বন্দনা...। আহ্, অত চিল্লাচ্ছ কেন?... চেঁচাব, চেঁচাব, বাতাসের প্রতিটি তরঙ্গে তোমার নাম আমি মিশিয়ে দেব...

সম্পর্ক যদি গড়েই ওঠে, তবে কেন তা ভেঙে যায়? কোন ছিদ্র দিয়ে ঢোকে বিষকীট? কোনটা সত্যি? তিলতিল করে গড়ে ওঠা, না মুহূর্তে ভেঙে যাওয়া?

এই সময়ে সুখের স্মৃতিই শুধু মনে পড়ে কেন? কষ্টকে কেন আরও বাড়িয়ে দেয়?

—বন্দনা, এই বন্দনা?

—উঁ? চমকে তাকালাম।

—ওঠো। এসো।

—কেন? গলা দিয়ে আর্তনাদ ঠিকরে এল।

—আরে না, নার্ভাস হয়ো না। পল্লবদা হাসল,—ক্রাইসিস কেটে গেছে। এই মাত্র ডাক্তার এসেছিল। শুভ্রর পালস্ রেট অনেক ইমপ্রুভ করেছে। লাঙস্ টাঙস্‌ও ক্লিয়ার।

সমস্ত রক্তকণিকা চঞ্চল হয়ে ছুটতে শুরু করল। তড়াং করে লাফিয়ে উঠলাম,—আমি শুভ্রর কাছে যাব। এক্ষুনি।

—যাও।...তবে বেশি কথা বোলো না। খুব উইক আছে। ...আমরা তো দাঁড়িয়েই চলে এলাম।

আর্ত হরিণীর মতো ঢুকেছি কেবিনে। বিছানার পাশে এসে পা থেমে গেল। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় কী চেহারা হয়েছে শুভ্রর। নির্জীব চোখ, রক্তহীন মুখ, কেমন নেতিয়ে পড়ে আছে অসহায়।

আমাকে দেখেও চোখ উজ্জ্বল হল না। ক্ষীণ স্বর শুধু বলল,—বিশ্বাস করো, আমি বাঁচতে চাইনি।

আর থাকতে পারলাম না। বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো আছড়ে পড়েছি বুকে। একই কথা বিড়বিড় করে চলেছি,—আমায় তুমি মারো মারো মারো, মেরে ফ্যালো।

শুভ্রর চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল। হাত রেখেছে আমার পিঠে।

এতক্ষণে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল।

ট্রেন যথারীতি লেট। ঢুকেছে প্রায় অফিস টাইমে, হাওড়া স্টেশনে এখন পা রাখা দায়। তারই মধ্যে দিয়ে কুলির পিছন পিছন ছুটছে মধুময়। ট্যাক্সির দীর্ঘ লাইনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। মাল নামাচ্ছে গুনে গুনে, এটাই তার কাজ।

বাকিরাও এসে গেল হুড়মুড়িয়ে। কুলিদের ভাড়া মিটিয়েই অনুতোষ সাঁ করে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। জয়ার হাত ধরে টুটুল। মিত্রা ড্রেনের কাছে গিয়ে একটা একটা করে ওয়াটার বটল খালি করছে। টুক করে একটা খবরের কাগজ কিনে হেড লাইনে পাখির চোখ বোলাতে শুরু করল পল্লব। শুভ্র এখনও দুর্বল, রেলিঙের ধারের ধাপিতে বসে পড়ল। পাশ থেকে বন্দনা গলা বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখছে, লাইন কেন এগোচ্ছে না।

মধুময় গজগজ করে উঠল,—কোনও মানে হয়? ভেবেছিলাম সকালে ফিরে ডিউটিতে যাব...

—অ্যাই, ডিউটি দেখাস না তো। পল্লব আলগা খিঁচিয়ে উঠল,—আমার শালা একদিন নো পে হয়ে গেল...

—মাইনে কেটে নেবে? তুই অফিসারের চাকরি করিস না?

—হ্যাঁ রে গাড়োল। উইদাউট নোটিসে কামাই করলে আমাদের কোম্পানির চেয়ারম্যানেরও মাইনে কাটা যায়।

শুভ্র বলে উঠল,—তুই এখান থেকে সোজা অফিস চলে যা না। তোর লাগেজ আমরা বাড়িতে ঢুকিয়ে দেব। তোর মিত্রাকেও।

জয়া মুখ টিপে হাসল,—অ্যাই মিত্রা, দ্যাখ, শুভ্রদা আবার আমাদের লাগেজ বলছে।

অনুতোষের ডাক শোনা গেল,—অ্যাই জয়া, অ্যাই টুটুল, পুলু শুভ্র এদিকে আয়। তাড়াতাড়ি...

—কোথায় যাব লাইন ছেড়ে?

—আরে আয় না, একটা প্রাইভেট কার ম্যানেজ করেছি। হানড্রেড। আয় জলদি, তাগাদা লাগাচ্ছে।

হাতের সামনের বোঁচকা বুঁচকি তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সবাই। মিত্রা কয়েক পা এগিয়েও ঘুরে দাঁড়াল,—ওকি মধুদা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? স্যুটকেস দুটো তুলে নিন। উফ, ঝোলা ব্যাগগুলো পড়ে রইল যে, ওগুলো আগে ওঠান।

মধুময় দু গাল ছড়িয়ে হাসল। সবথেকে ভারী জিনিসগুলো তার জন্যই পড়ে থাকে, সে জানে।

ডিকিতে মাল তোলা হচ্ছে। পল্লব একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছে, জোরে জোরে কটা টান দিয়ে বড়সড় হাই তুলল,—যাক গে, আজ নয় অফিসটা গেল। শুভ্র, তুই এই উইকটা ডুব মেরে দে। একদম ফিট হয়ে জয়েন করবি।

—আমি ফিট। শুভ্র হাসল।

—মোটেই না। তুমি আজই একবার ডাক্তারের কাছে যাবে। বন্দনা মাথা নাড়িয়ে তড়িঘড়ি বলে উঠল,—এখন তোমার টোটাল বিশ্রাম।

শুভ্র দু হাত ছড়িয়ে সামনে ঝুঁকল,—যো হুকুম।... অন্তটারই ইল লাক, ফিরেই ব্যাটাকে কলেজ দৌড়তে হবে। তোর আজ দেরিতে ক্লাস না অন্তু?

—হ্যাঁ, দুটো পনেরোয়। অনুতোষ ভারিক্কি মুখে ঘড়ি দেখল।

জয়া খুকখুক হাসল,—কায়দা করছ কেন? তুমি যাবে আজ কলেজ? এক্ষুনি তো গিয়ে ভোঁস ভোঁস নাক ডাকাবে।

মেয়েরা পিছনের সিটে বসে পড়ছে। পল্লবও ঠেসেঠুসে মিত্রার পাশে জায়গা করে নিল। অনুতোষ আর শুভ্র সামনে, অনুতোষের কোলে টুটুল। আর ঠাঁই নেই।

মধুময় জানলা দিয়ে মুখ গলাল,—আমার কী হবে?

পল্লব হ্যা হ্যা হাসল,—তোর লাগেজটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি। তুই বাসে চলে আয়।

গরগর আওয়াজ তুলল অ্যাম্বাসডার, যান্ত্রিক সরীসৃপের সারিতে মিশে গেল।

একটুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল মধুময়। লক্ষ মানুষের ভিড়েও সম্পূর্ণ একা হয়ে, যেমন সে থাকে সবসময়। তারপর আপন মনে হাসল একটু, যেমনটি সে হাসে।

সে এখন মোটেই বাসে উঠবে না। লঞ্চে গঙ্গা পেরিয়ে চলে যাবে বাবুঘাট, তারপর হাঁটবে...হাঁটবে...হাঁটবে। সবুজ মাড়িয়ে।

তার মধ্যেই শুধু এক ফালি সমুদ্র রয়ে গেছে এখনও।

ভাল মেয়ে, খারাপ মেয়ে

কোর্টে বেরোনোর আগে যথারীতি হাঁকডাক শুরু করেছে সমীরণ, ঊর্মি...ঊর্মি...!

প্রথম ডাকেই সাড়া দিল ঊর্মি, আসছিই। এক মিনিট।

—এক মিনিট নয়। এক্ষুনি এসো। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ঊর্মি আবেকটু গলা চড়াল, যাচ্ছি রে বাবা, যাচ্ছি।

ঊর্মি জানে সমীরণের এ সময়ে ভীষণ তাড়া। তাড়া মানে একেবারে ধুমধাড়াক্কা। ঘুম ভাঙার পর থেকেই ছুটছে সমীরণ। ঘোড়ায় জিন দিয়ে। কোনওরকমে সকালে এক কাপ চা খেয়েই বাথরুম। বেরিয়েই সোজা নীচে, নিজের চেম্বারে। রোজকার কেসের ব্রিফগুলো উলটেপালটে দেখে নেয় সকালে। বইপত্র ঘাঁটে। পেপারস্ গুছোয়। দ্বিতীয় দফার চা, তৃতীয় দফার চা, খবরের কাগজ, সিগারেটের প্যাকেট সবই একতলার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসে মণ্টু। অথবা শিবুর মা। অথবা ধনঞ্জয়। ব্রিফ দেখতে দেখতেই সমীরণ খবরের কাগজে চোখ বোলায়।

টাইপিস্টকে ডিকটেশান দিতে দিতে চুমুক দেয় চায়ে। দু-একটা মক্কেলও আসে সকালে, তাদের সঙ্গে টুকটাক কথা সারে। ওপরে ওঠে কাঁটায় কাঁটায় নটায়। এসেই হল্লাগুল্লা। ঊমি, আমার শেভিং ক্রিম কোথায় গেল!...ঊর্মি, তাড়াতাড়ি টাওয়েলটা দিয়ে যাও না!.. আমার শার্টটায় একটু ইস্ত্রি চালিয়ে দাও তো দেখি! জলদি!.. এ কি, আমার জুতো পালিশ করিয়ে রাখোনি আজ!... ঊর্মি। ঊর্মি। ঊর্মি। ঊর্মি যদি একবার ডান দিকে ছোটে, তো একবার বাঁ দিকে। কখনও রান্নাঘরে, তো কখনও বেডরুমে। কখনও ছেলের ঘরে, কখনও খাবার টেবিলে। নিশ্বাস বেঁধে নিয়ে ঊর্মির শুধু ছোটা আর ছোটা। পান থেকে চুন খসলে ধুন্ধুমার বাধিয়ে দেবে সমীরণ। হাতের কাছে সবকিছু গোছানো না পেলে চিল-চিৎকার জুড়বে এ সময়ে।

স্বভাব।

সুতো পরানো সুচটা ছেলের খাটের ওপরেই ছুড়ে ফেলে দৌড়ে এল ঊর্মি, বাবা রে বাবা। হলটা কী?

—আমার রুমাল কোথায়?

—একদিন তুমি রুমালটাও বার করে নিতে পারো না!

—তুমি কী করছ? এত বার করে ডাকছি!

ছেলের জামায় বোতাম বসাতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় আঙুলের ডগায় সুচ ফুটে গিয়েছিল ঊর্মির। এক বিন্দু রক্ত টলটল করছে সেখানে। রক্তটা চুষে নিল ঊমি। কৈফিয়তের সুরে বলল, দ্যাখো না টুবলুর কাণ্ডটা! কাল স্কুল থেকে শার্টের সব কটা বোতাম ছিঁড়ে এনেছে। যত বলছি অন্য শার্ট পর তা নয়, ওটাই পরতে হবে। এক্ষুনি লাগিয়ে দিতে হবে বোতাম।

—ডিসগাস্টিং। পলকে সমীরণের মেজাজ তিরিক্ষি আরও, তুমিও বা কী! সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটাই তো ছেলে। তার সব ঠিকঠাক আছে কি না আগে থেকে দেখে রাখতে পারো না? কথাটা বিঁধল ঊর্মিকে। হুল ফোটার মতো। তার বলতে ইচ্ছে হল, তোমার ছেলে যদি স্কুল থেকে ফিরে জামাকাপড় নিজের ওয়াড্রোবে পুরে রেখে দেয়, আমি দেখবটা কী করে! ওইটুকুনি দশ বছরের ছেলে এখন থেকে কী সচেতন নিজেরটা সম্পর্কে! বেমালুম বলে দেয়, আমার কোনও জিনিস তুমি ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না তো মা!

কিন্তু এত কথা বলার এখন সময় কোথায়? সমীরণেরও কি শোনার সময় আছে? তা ছাড়া কথা বাড়ালেই তর্ক বাড়ে। সমীরণের এখন মাথা গরম, হয়তো দুমদাম আরও কিছু বলে দেবে। কাজের লোকদের সামনেই। রেগে গেলে কোথায় কখন কী বলছে হুঁশ থাকে না সমীরণের।

বেডরুমের আলমারি থেকে সমীরণকে রুমাল এনে দিল ঊর্মি, আজ এই স্ট্রাইপড শার্টটা পরলে যে

বড়! এটা পরে তো তুমি কোর্টে যাও না!

প্যাসেজে, বেতের চেয়ারে বসে জুতো পরছে সমীরণ। গম্ভীর মুখে বলল, সন্ধেবেলা একটা পার্টি আছে।

—কোথায়?

—আছে একটা। আমার এক ক্লায়েন্ট দিচ্ছে। উদাসীন উত্তর পলকা ছুড়ে দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে সমীরণ। এক ধাপ নেমে ঘুরে দাঁড়াল, ওহোহ্। কাজের কথাটাই বলতেই ভুলে যাচ্ছিলাম।

—কী?

—সন্ধেবেলা কোনও ক্লায়েন্ট এলে রোববার আসতে বলে দিও।

—রবিবার চেম্বারে বসবে? তুমি না বলেছিলে এই রোববার আমরা একটা শর্ট ড্রাইভে বেরোব?

সমীরণের মুখে এক চিলতে হাসি দেখা গেল এতক্ষণে, বলেছিলাম বুঝি? দেখছই তো হল না। মে বি সাম আদার টাইম। মে বি নেক্সট সানডে। আর হ্যাঁ, এক মহিলাও আসতে পারে। এলে বোলো কাল আমার সঙ্গে কোর্টে দেখা করতে। দুপুরবেলা। অ্যারাউন্ড টু।

ঊর্মির ব্যস্তসমস্ত স্বামী এবার সত্যিই নেমে গেছে। তার গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই টুবলুর স্কুলবাস হর্ন দিচ্ছে বাইরে। সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে টুবলু। চেঁচাচ্ছে, মা, আজ আমার ক্রিকেট ম্যাচ। আইল বি লিটল বিট লেট টুডে।

সিঁড়ির রেলিং ধরে ঝুঁকল ঊর্মি, লেট মানে? তুই ফার্স্ট ট্রিপে ফিরবি না?

—নাআআ। সেকেন্ড ট্রিপ।

ঊর্মি ছুটে ব্যালকনিতে চলে এল। ছেলের বাসে ওঠা দেখবে। যতক্ষণ না বাস মোড় ঘুরে যায়, বারান্দাতে দাঁড়িয়ে থাকে ঊর্মি।

অভ্যেস। টুবলু যখন আরও ছোট ছিল, ঊর্মি নীচে গিয়ে বাসে তুলে দিয়ে আসত ছেলেকে। বাস চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত টুবলু হাত নাড়ত তাকে। টা টা মা। টা টা। আজকাল টুবলু আর ফিরেও তাকায় না। বড় হয়ে যাচ্ছে ছেলে। নিজের মতো করে ডালপালা মেলতে শুরু করেছে। মাকে আর তার তেমন প্রয়োজনই হয় না।

আকাশ আজ অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল। গাঢ় নীল মহাশূন্যে, ঊর্মির থেকে অনেক অনেক উঁচুতে, একটা চিল একা একা পাক খেয়ে চলেছে। এত্ত উঁচু দিয়ে উড়ছে চিলটা যে এখান থেকে তাকে একটা কালো বিন্দুর মতো মনে হয়। মাঝে মাঝে বিন্দুটা স্থির। স্থির বিন্দু হঠাৎই নেমে আসছে নীচে, বাতাসে ভাসছে নিজের খুশি মতো। আবার ইচ্ছে হলে নিথর।

অন্যমনস্ক চোখে ঊর্মি অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল চিলটাকে। এবার পাখিটা সরে যাচ্ছে আকাশের পশ্চিম প্রান্তে। ও পাশের বিশাল বহুতল বাড়িটার কাছে এসে দুলল ক্ষণিকের জন্য। তারপর চোখের আড়াল হয়ে গেল।

ঊর্মিও ফিরল।

বড়সড় ডাইনিং কাম ড্রয়িং হল ঘিরে শোওয়ার ঘর, ছেলের ঘর, গেস্টরুম, কিচেন, বাথরুম, স্টাডি। ঘোরানো সিঁড়ি ধরে নেমে গেলে নীচে গ্যারাজ, কাজের লোকেদের থাকার ঘর আর সমীরণের প্রকাণ্ড চেম্বার। মাত্র আড়াই কাঠা জমির ওপর ছিমছাম, শৌখিন বাংলো ধাঁচের বাড়ি। নিজের এই বাড়ি দেখে মাঝে মাঝে কেমন যেন বিস্ময় জাগে ঊর্মির। এত সুখ, এত সম্পদ শুধুই তার!

তারই তো। সমীরণ জাদুদণ্ড ঘুরিয়ে একটার পর একটা বৈভব কিনে দিচ্ছে ঊর্মিকে। উঠিয়ে দিচ্ছে ওপরে। অনেক ওপরে। ওই চিলটার মতো। নিজেও উঠছে। স্পুটনিকের মতো। ওপরে। আরও ওপরে। এই বুঝি মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে গেল! হাইকোর্টের দুঁদে ব্যারিস্টার সুধাংশু গুপ্তর এককালের জুনিয়ার সমীরণ সেন নিজেই এখন আদালতে ঢোকে চার পাশে চার জুনিয়ার নিয়ে। চল্লিশ পেরোতে না পেরোতেই সে সাফল্যের মধ্যগগনে। বছর পাঁচেক আগে বিশিষ্ট এক ব্যবসায়ীকে খুনের মামলা থেকে বার করে এনেছিল সমীরণ, তারই নজরানা সল্টলেকের এই আড়াই কাঠা জমি। বাড়ি অবশ্য সমীরণ নিজেই বানিয়েছে। মনের মতো করে। গাড়িও নতুন কেনার ইচ্ছে ছিল। ইনকাম ট্যাক্সের ঝুট ঝামেলার জন্য ঝুঁকি নেয়নি। জলের দরে পুরনো এক ফিয়াট কিনে যন্ত্রপাতি সব পালটে আমূল বদলে

নিয়েছে চেহারা।

ঊর্মি লম্বা সোফাটায় বসে গা ছড়িয়ে দিল। রোজই দেয়। সকালবেলাকার ওই উদ্দাম ব্যস্ততা কাটার পর ঝুপ করে অপার শান্তি এখন। অখণ্ড অবসর। কী করবে এখন? ভি সি আর-এ একটা ক্যাসেট চালিয়ে দেখবে বসে বসে? শিবুর মাকে রান্নায় একটু সাহায্য করবে গিয়ে? ফিল্ম ম্যাগাজিন উলটোবে? বিউটি পার্লার থেকেও একবার ঘুরে এলে হয়, দু সপ্তাহ হয়ে গেল ফেসিয়াল করা হয়নি। থাক, তার চেয়ে বরং টেলিফোনে দিদির সঙ্গে একটু গল্প করা যাক।

ভাবতে ভাবতে ঊর্মি খবরের কাগজটা খুলল একবার। আনমনাভাবে পাতা ওলটাচ্ছে। আইন আদালতের পাতায় এসে চোখ আটকে গেল। বিখ্যাত বার সিংগার মিস রিয়ার কেস হাইকোর্টে!

ঊর্মি সোজা হয়ে বসল। মিস রিয়া মানে সেই মেয়েটা। কোন বারে যেন গান গাইত। গাড়িতে লিফট দেওয়ার নাম করে দুটো ছেলে ধর্ষণ করেছিল মেয়েটাকে। বছর দুয়েক আগে। লোয়ার কোর্টে বেকসুর খালাস পেয়েছে আসামিরা। মামলাটা নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল এক সময়ে।

খবরটা ভাসা ভাসা পড়ে ঊর্মি পরের পাতায় চলে এল। সেখানে থেকে তার পরের পাতায়। বিশাল জায়গা জুড়ে এক বিজ্ঞাপন। নতুন একটা ক্রিম বেরিয়েছে বাজারে। হার্বাল। ভারতীয় জড়িবুটির সঙ্গে রহস্যময় চিনা শিকড়বাকড় দিয়ে তৈরি। মাখলে ত্বক আরও উজ্জ্বল হয়, যৌবনে ভাঁটা পড়ে না।

নিজের দু হাতে আলগা হাত বোলাল ঊর্মি। মাত্র পঁয়ত্রিশেই চামড়ায় কেমন খসখসে ভাব। কিনে দেখবে নাকি ক্রিমটা। কাগজ রেখে টেলিফোন করল ঊর্মি। টেলিফোন রেখে টিভি চালাল। শিবুর মাকে অর্ডার দিয়ে কফি খেল এক কাপ। গড়িয়ে গড়িয়ে পার করছে সময়।

কে বলে সুখের সময় হু হু করে কেটে যায়! সময় এখন স্থির। মহাশূন্যের ওই চিলটার মতো।

দুই

অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল ঊর্মি। বিকেলের দিকে। দুপুরে মার্কেটিং-এ বেরিয়েছিল একটু। টুকটাক কয়েকটা কেনাকাটা ছিল। কুশন কভার। কিছু মরশুমি ফুলের বীজ, চারা। পরশু দিদির মেয়ের এইট্টিনথ বার্থডে, তার জন্য একটা দামি উপহার।

নতুন এক সেট পরদার কাপড়। কার্তিক মাস ফুরিয়ে এল, এখনও বাতাসে তেমন হিমের ছোঁয়া নেই। ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরে পুড়ছিল দুপুরটা। ফিরেই বেডরুমের যান্ত্রিক ঠাণ্ডায় জড়িয়ে এসেছিল ঊর্মির দু চোখ।

ঘুম ভাঙল মণ্টুর ডাকে, মামি, ও মামি...

ঊর্মি চোখ রগড়াল, উঁ?

—কারা যেন এসেছে মামার কাছে। চেম্বারে বসাব?

—ধনঞ্জয় কোর্ট থেকে ফেরেনি।

—না।

—রোববার আসতে বলে দে। তোর মামা আজ বসবে না। কথাটা বলেই ঊর্মি সচকিত হল। নানা ধরনের ক্লায়েন্ট আছে সমীরণের। অনেক প্রভাবশালী লোকও আসে মাঝে মাঝে। কাজের লোকদের দিয়ে তাদের খবর পাঠানো পছন্দ করে না সমীরণ।

গমনোদ্যত মণ্টুকে পিছু ডাকল ঊর্মি, থাক, তোকে কিছু বলতে হবে না। আমি যাচ্ছি। তুই আমার জন্য চায়ের জল বসা। শাড়ির আঁচল গোছগাছ করে চুলে হালকা চিরুনি বুলিয়ে নিল ঊর্মি।

নীচে নেমে আগন্তুকদের দেখে বিস্মিত হল সামান্য। একটি মেয়ে শুকনোমুখে জড়োসড়ো হয়ে সদরে দাঁড়িয়ে। বয়স বড় জোর বছর তিরিশ। তেমন একটা সুন্দরী নয়, তবে আলগা চটক আছে চেহারায়। পরনে বাঁধনি প্রিন্টের সবুজসাদা সালোয়ার কামিজ, সাদা দোপাট্টা। চড়া মেকআপেও চোখের নীচের কালি ঢাকা পড়েনি।

সঙ্গে এক মাঝবয়সি বুড়োটে মানুষ। টিঙটিঙে শরীর। জামাকাপড় যথেষ্ট অগোছালো। কেমন ভিখিরি ভিখিরি।

ঠিক এই স্তরের মক্কেল তো বড় একটা আসে না সমীরণের কাছে!

মেয়েটিই কথা বলল প্রথমে, সমীরণবাবু আজকে আমাদের আসতে বলেছিলেন।

এই তবে সেই মহিলা! ঊর্মির বিস্ময় বাড়ছিল। সমীরণ তো ফৌজদারি মামলা করে, এদের আবার কী কেস!

মেয়েটার স্বর বেশ রিনরিনে। কথা বললেই যেন মৃদু প্রতিধ্বনি ওঠে বাতাসে।

কৌতূহল চেপে ঊর্মি হাসি ফোটাল মুখে, কিন্তু ওঁর তো আজ ফিরতে দেরি হবে। উনি আপনাদের কাল দুপুর দুটোয় হাইকোর্টে দেখা করতে বলেছেন।

—ও। মেয়েটার স্বরে হতাশা ফুটে উঠল। পিছন ঘুরে একবার দেখল সঙ্গীকে। আবার ফিরেছে। ক্লান্ত স্বরে বলল, আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন?

এর পর আর দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখা অভদ্রতা হয়ে যায়। ঊর্মি দরজা ছেড়ে দাঁড়াল, আসুন। ভেতরে এসে বসুন।

দরজার পরে ছোট্ট প্যাসেজ। তার গায়েই প্রকাণ্ড হলঘর। সমীরণের চেম্বার। আগে শুধু হাইকোর্ট পাড়াতেই বসত সমীরণ। ছোট ছোট পায়রার খুপরির মতো কুঠুরিতে। নতুন বাড়িতে ঢুকেই মন ভরে বিশাল চেম্বার সাজিয়েছে। চতুর্দিকে উঁচু উঁচু কাচের আলমারি। যে দিকে তাকাও শুধু মোটা মোটা বই আর আইনের জার্নাল। মাঝে ইয়া এক সেক্রেটারিয়েট টেবিল। নিজের জন্য পুরু গদিঅলা রাজকীয় চেয়ার। নিলামঘর থেকে কেনা। ঊর্মি ঠাট্টা করে বলে সিংহাসন।

বন্ধ ঘরে চাপা ভ্যাপসা গন্ধ ছমছম করছে। ঊর্মি একটা জানলা খুলে দিল। একটু আগেও বাইরে একটা বিকেল ছিল, এখন গাঢ় আঁধার। বাতাস ঠাণ্ডা হয়েছে সামান্য।

ঘরে ঢুকে মেয়েটা দাঁড়িয়ে পড়েছে আড়ষ্টভাবে। এ দিক ও দিক দেখছে।

ভেতর থেকে নিজেই জল নিয়ে এল ঊর্মি। প্রবল তৃষ্ণার্তের মতো এক চুমুকে গ্লাস শেষ করল মেয়েটা।

জল খাওয়ার ভঙ্গিটি দেখে ভারী মায়া হচ্ছিল ঊর্মির। নরম স্বরে বলল, আর দেব?

মেয়েটা হাসল, না না, ঠিক আছে।

আধবুড়ো লোকটা বসে পড়েছে চেয়ারে। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। ঊর্মি জিজ্ঞাসা করল, আপনি জল খাবেন?

—নো। থ্যাঙ্কস। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করেও কী ভেবে রেখে দিল লোকটা, সমীরণবাবুর কি আসতে খুব দেরি হবে? আমাদের তেমন কোনও কাজ নেই, আমরা অপেক্ষাও করতে পারি।

—উনি কিন্তু বলে গেছেন অনেক রাত হবে।

—হুঁ। লোকটার মুখ চকিতে অপ্রসন্ন। ঊর্মির উপস্থিতি অগ্রাহ্য করেই মেয়েটাকে বলল, এখন ঠেলা বোঝ। কাল সেই কোর্টে ছুটতে হবে।

মেয়েটা চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ল, অগত্যা।

—এখন তো বলছ, কিন্তু কোর্টে গিয়ে তো কাল গজগজ করবে। আমাকে এ দেখছে! আমাকে ও দেখছে! ওই লোকটা আমাকে টিপ্পনী কাটল...!

মেয়েটাও পলকে ঊর্মির উপস্থিতি ভুলেছে। আড়ষ্টতা ঝেড়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল হঠাৎ,... কী করা যাবে? স্যার যখন যেতে বলেছেন যেতেই হবে।

লোকটা দু হাতে হাঁটু চেপে উঠে দাঁড়াল, আমার কী। তোমার কেস, তুমিই বোঝো। আমাকে আর এ ব্যাপারে জড়াবে না।

—উহুহু, কত যেন জড়িয়েছ তুমি!

—সে তো এখন বলবেই। বেইমান।

—বেইমান কে? আমি, না তুমি? ডার্টি স্কাম।

—ইউ ডার্টি...ফুঁসছে লোকটা। কথা বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে।

ঊর্মি হতভম্ব হয়ে যাচ্ছিল। তার সামনেই এ কী শুরু করেছে দুজনে! মাঝে মাঝেই দিব্যি চোস্ত

ইংরিজি বলছে, অথচ দুজনেরই শিক্ষা সহবতের যথেষ্ট অভাব। লোকটা প্যান্টশার্টও পরেছে দ্যাখো! দামি, কিন্তু নোংরা চিট। ঝলমল করছে গায়ে। ঠিক যেন ধার করা। অথবা কুড়িয়ে পাওয়া। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের কোণে চামড়ার ঠুলি। দেখেই বোঝা যায় লোকটা একটা আস্ত মদ্যপ। এদের কথাই কি বলে গিয়েছিল সমীরণ! নাকি এরা অন্য কেউ! ঘরে ডেকে এনে ভুল করল না তো উর্মি!

খানিকটা বিরক্তির সঙ্গেই উর্মি বলে উঠল, আপনারা কি বসবেন? উনি কিন্তু ফিরবেন না।

মেয়েটার এতক্ষণে যেন হুঁশ ফিরেছে। ঘুরে তাকিয়ে বলল, না না, আমরা যাচ্ছি। আপনি দরজা বন্ধ করে দিন।

বাচা গেল। উর্মি গ্লাস হাতে বেরিয়ে এল প্যাসেজে। সরে দাঁড়িয়ে বেরোবার জায়গা করে দিচ্ছে দুজনকে।

দরজাতে গিয়েও দাঁড়াল মেয়েটা, আচ্ছা, কাল যদি আমরা এখানে এসে দেখা করি, তা হলে কি স্যারের অসুবিধে হবে?

—সম্ভবত হবে। উনি তো প্রায়র অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া ক্লায়েন্ট মিট করেন না। উর্মি অনিচ্ছা সত্ত্বেও জবাব দিল, আপনারা বরং কোর্টে গিয়েই...। উনি যদি বলেন তখন নয় আসবেন এখানে।

মেয়েটা সঙ্গী নিয়ে চলে গেল।

দোতলায় ফিরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল উর্মি। উকিল ডাক্তারদের বউ হলে কত রকম চরিত্র যে দেখা যায়! একবার একটা কী রূপবান লোক এল! চকচকে চেহারা! স্মার্ট কথাবার্তা। নিখুঁত সাহেবি অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলে! মেয়েরা দেখেই প্রেমে পড়ে যেতে বাধ্য। সে দিনও সমীরণ বাড়ি ছিল না, খাতির করে উর্মি বসিয়েছিল লোকটাকে। পরে শুনল লোকটার বিরুদ্ধে নাকি স্মাগলিং-এর চার্জ আছে। আছে নারীহরণের অভিযোগ। ড্রাগ পেডলিং-এরও। ধরা পড়ার আগে আগাম জামিনের চেষ্টা করতে এসেছিল লোকটা। পেয়েও ছিল জামিন। সমীরণই পাইয়ে দিয়েছিল। কেস ফি ছাড়াও একটা সোনার নেকলেস উপহার দিয়েছিল উর্মির নাম করে। এখনও অবশ্য কেসটা চলছে, তবে লোকটা আর আসে না এ বাড়িতে।

আজকের মেয়েটা ডাকাত খুনি নয়তো! হতেও পারে। তা হলে ওই সঙ্গী লোকটা কে?

ধুৎতেরি ছাই। যত সব ফালতু ভাবনা। মণ্টু চা রেখে গেছে। উর্মি ডাইনিং টেবিলে বসে চায়ে চুমুক দিল। সমীরণের মামলা, ভাবতে হলে সমীরণ ভাববে। উর্মি কেন?

চা শেষ করে ছেলের ঘরে একবার উঁকি দিল উর্মি। সায়েন্স সাবজেক্টের মাস্টারমশাই এসেছেন, তাঁর কাছে পড়ছে টুবলু। ছেলেকে একটা কম্পিউটার কিনে দিয়েছে সমীরণ। তরুণ শিক্ষকটি টুবলুকে কম্পিউটারও শেখায়। সে আন্দাজে ছেলেটা টাকা খুব বেশি নেয় না। সপ্তাহে দুদিন আসে, মাসে আটশো। রঞ্জনার ছেলেকে শুধু অঙ্ক করাতে পাঁচশো টাকা নেয় টিউটর। রঞ্জনার ছেলে অবশ্য টুবলুর মতো শার্প নয়। ছেলের অঙ্কে সাফ মাথা দেখে সমীরণের খুব ইচ্ছে ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুক। ম্যানেজমেন্ট পড়লেও আপত্তি নেই। দরকার হলে সমীরণ বিদেশ পাঠিয়ে দেবে ছেলেকে। আ ফোরেন ডিগ্রি ইজ মাস্ট নাউ! উর্মির অবশ্য মনোগত বাসনা অন্য রকম। টাকাপয়সা তো থাকবেই, ছেলে লেখাপড়ার লাইনে থাকলেই বা মন্দ কী! উর্মির বাবার মতো যদি প্রফেসার হয় টুবলু! অথবা উর্মির মামার মতো সায়েন্টিস্ট! কথাটা শুনলেই সমীরণ এমন খেপে যায়! ভাবলে কী করে, আমার ছেলে ও সব ছেঁদো ফাঁকিবাজির প্রফেশনে যাবে! আমি রোজগার করছি লাখে, হি উইল আর্ন ইন মিলিয়নস।

তাই হোক। টুবলুর বাবা যখন চায়, সেও তো উর্মিরই চাওয়া।

উর্মিকে যে কানায় কানায় ভরিয়ে রেখেছে, তার চাওয়াকে কি উর্মি অমান্য করতে পারে!

অলস মেজাজে ঘণ্টাখানেক টিভি দেখল উর্মি। এ সময়ে পর পর কয়েকটা টিভি সিরিয়াল হয়। কোনওটা হাসির। কোনওটা প্রেমের। কোনওটা ডিটেকটিভ। গোগ্রাসে গিলল সিরিয়ালগুলো।

হঠাৎ উর্মির খেয়াল হল টুবলুর মাস্টারমশাই চলে গেছেন বহুক্ষণ। অথচ টুবলুর ঘর থেকে কোনও রকম সাড়াশব্দ নেই। হল কী ছেলের! অন্য দিন তো দুদ্দাড়িয়ে বেরিয়ে এসে বসে যায় পরদার সামনে! আজ নিজের প্রিয় সিরিয়ালটার সময়ও গরহাজির!

ছেলের ঘরে এসে আরও নার্ভাস হয়ে গেল উর্মি। আলো নেবানো, বিছানায় শুয়ে আছে টুবলু।

ঊর্মি ঘরের আলো জ্বালল, কী হয়েছে রে তোর? শরীর খারাপ?

টুবলু নিরুত্তর। আড়াআড়ি হাতে চোখ ঢাকল।

কাছে এসে ছেলের কপালে হাত রাখল ঊর্মি। নাহ্, ঠিকই তো আছে।

ঊর্মি ছেলের গায়ে হাত বোলাল, স্যারের টাস্ক করে রাখিসনি বুঝি? বকুনি খেয়েছিস?

টুবলু ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিল মার হাত, ডিস্টার্ব কোরো না। আমাকে এখন একা থাকতে দাও।

ঊর্মি হেসে ফেলল। ছেলে বড় হয়ে যাচ্ছে বলে হঠাৎ হঠাৎ বুক চিনচিন করে বটে, আবার দশ বছরের ছেলের মুখে প্রাজ্ঞ প্রাজ্ঞ কথা শুনতে ভালও লাগে।

ছেলেকে খেপানোর জন্য ঊর্মি বলল, তার মানে স্কুলে আজ ঝাড় খেয়েছিস।

—মোটেই না।

—তা হলে টুবলুকুমার ভ্যাবলাকান্ত হয়ে শুয়ে আছে কেন?

—আমার মন ভাল নেই। আই হ্যাভ লস্ট দ্য ম্যাচ।

—এই ব্যাপার? ঊর্মি হেসে উঠেছে খিলখিল, দূর বোকা, খেলাতে তো হারজিত থাকেই।

—মে বি। কিন্তু আমি কেন লুজিং সাইড হব?

—বারে, কেউ না কেউ তো হারার সাইডে থাকবেই।

—যে খুশি থাকুক। আমার হারতে ভাল লাগে না।

অবিকল সমীরণের স্বর। মামলায় পছন্দসই রায় না পেলে বাড়ি ফিরে এ ভাবেই শুয়ে থাকত সমীরণ। এ ভাবেই কথা বলত। বাপের ধাত পেয়েছে ছেলে। ভাবতে ভাল লাগছিল ঊর্মির।

তিন

সমীরণ ফিরল রাত এগারোটার পর।

পৃথিবী প্রায় নিঝুম। নতুন গড়ে ওঠা এই অভিজাত অঞ্চলে রাত্রি বড় তাড়াতাড়ি নেমে আসে। নাগরিক সভ্যতা এখানে ভীষণ রকমের নির্জন।

ভি সি আর চালিয়ে একটা নাচগানের ছবি দেখছিল ঊর্মি।

গুনগুন গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে দোতলায় উঠে এল সমীরণ, কী ব্যাপার, তুমি এখনও শোওনি?

ঊর্মি হাসল, কবে এ সময়ে শুই মশাই? তুমি কটায় চেম্বার থেকে ওঠো খেয়াল আছে?

—তার মানে আমি আজ আর্লি। বাহ্।

কথাবার্তার ধরনেই বোঝা যায় একটু টিপসি আছে সমীরণ। মদ সে কখনওই খুব বেশি খায় না। বাড়িতে থাকলে মেপে এক পেগ। শোওয়ার আগে। স্বাস্থ্যপান। পার্টিফার্টিতে গেলে তিন, মেরে কেটে চার। মাতাল হয় না, তবে এ সব দিনে সমীরণের মেজাজ বেশ ফুরফুরে থাকে।

সোফায় বসে জুতো খুলছে সমীরণ, টুবলু ঘুমিয়েছে?

—কখন। এতক্ষণে বোধ হয় স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গেল। ঊর্মি পাশে এসে বসল।

—চলো, আমরাও আজ শুয়ে পড়ি।

—এত তাড়াতাড়ি তোমার ঘুম আসবে? রাত বারোটার আগে তো বিছানাতে যাও না কোনওদিন।

—আজ রুটিন ব্রেক। ঊর্মিকে আলগা জড়িয়ে ধরল সমীরণ। মণ্টু-ধনঞ্জয় এ সময়ে দোতলায় ওঠে না, ছেলেও ঘুমোচ্ছে, একটু উদ্দাম হতে এখন বাধা নেই স্বামী-স্ত্রীর।

সমীরণ আলতো চুমু খেল ঊর্মির ঘাড়ে, চলো চলো। ঘুম না এলেও, ঘুমের চেষ্টা করতে দোষ কী।

ইঙ্গিতটা বুঝে মুচকি হাসল ঊর্মি। পেটে তরল পড়লে কামক্ষুধা চাগাড় দেয় সমীরণের। ঊর্মিও তার জন্য প্রস্তুত। তবু একটু মজা করতে ইচ্ছে হল তার। বলল, যাও, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমি সিনেমাটা শেষ করে আসছি।

ঝপ করে উঠে টিভি ভি সি আরের সুইচ অফ করে দিল সমীরণ। হালকা ধমকের সুরে বলল, চলো বলছি। আমার এক্ষুনি তোমাকে চাই।

সমীরণ এরকমই। যখন যেটা চাই, তক্ষুনি সেটার জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠাই তার স্বভাব। সে রুমালই হোক, কি উর্মি।

উর্মি কপট ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল, এমনিতে তো আমার দিকে তাকাতেই চাও না। বিছানায় পড়লে, আর অমনি ভোঁস ভোঁস নাক ডাকা শুরু হল।

—কচকচ কোরো না তো। আমার মুড নষ্ট হয়ে যাবে।

সমীরণের ভালবাসারও ছিরিছাঁদ নেই। রিরংসার মুহূর্তে তার জ্ঞান থাকে না। নিজের দেহে তো কাপড় চোপড় থাকবেই না, উর্মির শরীরেও কণামাত্র সুতো রাখতে দেবে না সমীরণ। শিশুর মতো আদর খেতে চাইবে। দস্যুর মতো হামলাবে। বুনো বাঘ হয়ে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করবে উর্মিকে।

বিশ মিনিটেই ভোগী পুরুষের বাসনা শেষ। দুঁদে ক্রিমিনাল লইয়ার শুয়ে আছে নিরাবরণ। গায়ে নাইটি চড়িয়ে বাথরুম থেকে ঘুরে এল উর্মি। পাখাটা এক পয়েন্ট কমিয়ে দিল। রাতে এ সি বন্ধ করে দিতে হয়। রাতভর যান্ত্রিক ঠাণ্ডা সহ্য হয় না সমীরণের।

নীলচে রাতবাতি জ্বলছে। ঘর এখন ভারী মায়াময়। যেন নাইট ল্যাম্পের আলো নয়, চাঁদের কিরণ ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

উর্মি সমীরণের শরীর ঘেঁষে শুল। নিচু স্বরে ডাকল, এই, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

সমীরণের নেশা অনেকটা কেটেছে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, না। হাত বাড়িয়ে সিগারেট দেশলাইটটা দাও তো।

—বিছানায় শুয়ে সিগারেট খাবে? ভাল্লাগে না।

—নাক টিপে রাখো। দাও।

আলো আঁধারে ঠুকে ঠুকে দেশলাই জ্বালাল সমীরণ। সিগারেট ধরিয়ে সাইড টেবিল থেকে অ্যাশট্রে বুকে টানল। মায়াবী ঘরে আগুনের ফুলকি লাল হয়ে উঠছে। আবার কেটে যাচ্ছে ছাই হয়ে।

সমীরণের লোমশ বুকে হাত বোলাল উর্মি. তুমি যে আমাদের জন্য আরেকটা গাড়ি কিনবে বলছিলে, তার কী হল?

—কিনব। তাড়া কীসের?

—দূর, দুপুরের দিকে মার্কেটিং-এ গেলে আমার খুব অসুবিধে হয়। ফেরার সময়ে বিকেলে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। টুবলুও বড় হচ্ছে, ওরও কি আর স্কুলবাসে যেতে ভাল লাগে?

—ছেলেকে জড়াচ্ছ কেন? বলো না, তোমার শখ। উর্মির চুলে আঙুল চালাল সমীরণ।

উর্মির ভাল লাগছিল। টুকরো টুকরো সুখের মুহূর্ত তো এগুলোই। এ ছাড়া মানুষ বাঁচে কী করে!

সুখী বেড়ালের মতো আদরটা খানিকক্ষণ উপভোগ করল উর্মি।

তখনই কথাটা মনে পড়ে গেল। লঘু গলায় বলল, তোমার সেই মেয়ে ক্লায়েন্ট সন্ধেবেলা এসেছিল তোমার খোঁজে। কাল দুপুরে কোর্টে যেতে বলে দিয়েছি।

সমীরণ বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিল। আলগোছে প্রশ্ন করল, কে? রিয়া?

—নাম তো জিজ্ঞেস করিনি। উর্মির স্বরে কৌতুক, রিয়াটা আবার কে?

অন্ধকারে হেসে উঠল সমীরণ, রিয়ার নাম শোননি? ফেমাস রিয়া। মিস রিয়া। আরে সেই যে লিডো বারে গান গাইত। রেপড হল।

আশ্চর্য! খবরটা তো আজই কাগজে পড়ছিল উর্মি! আর বিকেলে সেই মেয়েই এসেছিল! সমীরণ তারই কেস করছে!

উর্মি বিড়বিড় করে বলল, ওই মেয়েটাই তবে রিয়া!

—ইয়েস। সমীরণ এখন আর হাসছে না, রিয়া কি একাই এসেছিল? নাকি সঙ্গে গাদাবোটটাও ছিল?

—কে জানে কী বোট। তবে সঙ্গে একটা লোক ছিল।

—খেঁকুরে মতো? শ্যাবি?

—হ্যাঁ। আধবুড়ো।

—ও তা হলে রিয়াই। লোকটা মিস রিয়ার স্বামী।

বিস্ময়ের মাঝেও কুলকুল হেসে উঠল ঊর্মি। পঁয়ত্রিশ বছরের দেহে অষ্টাদশীর কল্লোল। হাসতে হাসতে বলল, মিস রিয়ার আবার স্বামী কীগো—

—ও লাইনে ওরকমই হয়। নামের আগে মিস না থাকলে বার হোটেলে গানের আসর জমে না।

ঊর্মি চিত হয়ে শুল, স্বামী হোক আর যেই হোক, লোকটা কিন্তু সুবিধের নয়। কী বিশ্রী ভঙ্গিতে কথা বলে।

সমীরণ মুহূর্তে টান টান, তোমার সঙ্গে মিসবিহেভ করেছে নাকি?

—না না, আমার সঙ্গে নয়। মেয়েটার সঙ্গেই খুব খারাপভাবে কথা বলছিল। দুজনেব ঝগড়া লেগে গিয়েছিল প্রায়। এ ওকে কীট বলে। ও একে বেইমান।

—কেন?

—মনে হয় লোকটা চায় না রিয়া হাইকোর্টে যাক।

—সে তো চাইবেই না। যা হাড়বজ্জাত লোক। এক্কেবারে প্যাবাসাইট। হাইকোর্টে আবার কেস চললে রিয়াব পশার যদি মাব খায়! সমীরণ শেষ টান দিল সিগারেটে, তবে ও ব্যাটার কিছু করার নেই। কেস তো রিয়ার সঙ্গে নয়, কেস গভর্নমেন্টের সঙ্গে।

—স্টেটের কেসে তুমি এলে কী করে?

—রিয়া আমাকে স্পেশালি অ্যাপয়েন্ট করেছে। আই শ্যাল বি কনটেস্টিং দা কেস অ্যালঙ উইথ স্টেট। সিগারেট নিবিয়ে অ্যাশট্রে সাইড টেবিলে রাখল সমীরণ। ঊর্মির বুকে হাত রেখে বলল, লোকটার রিয়ার ওপর চটার যথেষ্ট কারণ আছে। গভর্নমেন্ট হয়তো যেত না হাইকোর্টে, নেহাত কেসটা এত সেন্সেশনাল হয়ে গেল! মেয়েটাও ওপরমহলে গিয়ে খুব ধরাধরি করেছে। বলতে পারো ওই রিয়ার জন্যই...

—তাই! মেয়েটার তা হলে চরিত্রের জোর আছে বলো! আত্মসম্মান বোধ আছে!

—চরিত্রের জোর! রিয়ার চরিত্র! হাঃ হাঃ! তুমি তো আজ শুধু লিগাল হাজব্যান্ডকে দেখেছ, মেয়েটাব মোট কটা স্বামী জানো? এখন যে বারে গান গায়, সে বারের মালিকও তো একটা স্বামী। আরও কতদিকে কত ছড়ানো আছে...

সেকেন্ডের জন্য মেয়েটার মুখ মনে পড়ল ঊর্মির। শুকনো। দুঃখী দুঃখী। প্রসাধনে ঢাকা। চোখের তলায় গাঢ় কালি।

ঊর্মি সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, মেয়েটা নষ্ট?

—গোদা বাংলায় তাই তো বলে।

—তুমি শিওর?

—হ্যাঁরে বাবা হ্যাঁ। রিয়া যে একটা থার্ড গ্রেড প্রস্টিটিউট, এ কথা বিশ্বসুদ্ধ সবাই জানে।

ঊর্মি অল্পক্ষণ কী যেন ভাবল। পায়ের কাছে চাদর ভাঁজ করা আছে, টেনে কিছুটা ঢাকল নিজেকে। সমীরণকেও। নিচু স্বরে বলল, জেনেশুনে তুমি এই কেস তবে নিলে কেন?

—নিলাম। মেয়েটা একজনের রেফারেন্সে এসে ধরে পড়ল। আমিও দেখলাম ইটস আ জেনুইন কজ টু ফাইট। সমীরণের স্বরে দিব্যি নির্বিকারভাব, মেয়েটা তো সত্যিই রেপড হয়েছিল। জাস্টিস তো মেয়েটার প্রাপ্যই।

—ওই মেয়ের আবার ধর্ষণ কী? টাকা দিলেই যার তার সঙ্গে শুয়ে পড়ে...

—নিশ্চয়ই শোয়। কিন্তু নিজের ইচ্ছেয়। তুমি তাকে তা বলে জোর করতে পারো না। টাকা দিয়েও না। ইভন আ প্রস্টিটিউট হ্যাজ দা রাইট টু রিফিউজ। ইন ফ্যাক্ট সেটাই ঘটেছিল। ছেলেগুলো টাকা নাচানো সত্ত্বেও রিয়া ওদের প্রস্তাবে রাজি হয়নি। তখনই ছেলে দুটো গাড়ি থামিয়ে, পার্ক সার্কাস ময়দানের অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে...। মেয়েটা অবশ্য সামান্য ড্রাঙ্ক ছিল। তবে দ্যাট ডাজনট ম্যাটার। ফোর্সিবল সহবাস ইজ রেপ। ছেলেদুটোর তো শাস্তি হওয়াই উচিত। আইউইটনেস রয়েছে, মেডিকেল টেস্টে প্রমাণিত হয়েছে, বাছাধনরা পালাবে কোথায়?

ঊর্মির কৌতূহল বাড়ছিল। এরকমও হয়!

অবাক স্বরে বলল, লোয়ার কোর্টে তবে ছেলে দুটো ছাড়া পায় কী করে!

—ওই চরিত্র ব্যাপারটা নিয়েই কোর্টে বেশি টানাটানি হয়েছিল, তাই। ডিফেন্স বলে মেয়েটার ক্যারেক্টার খারাপ ছিল! পাবলিক প্রসিকিউটর বলে মেয়েটা নিষ্কলঙ্ক গৃহবধূ! ব্যস, ওই খারাপ ভালর প্যাঁচে পড়েই কেস গেল কেঁচে। আমি অবশ্য এখনও লোয়ার কোর্টের জাজমেন্টটা ডিটেলে পড়িনি। পড়লে হয়তো কেসের লুপহোলগুলো আরও নিখুঁতভাবে ধরা যাবে।

—তোমার কী মনে হয়? কেসটা জিততে পারবে?

—খাটতে হবে খুব। আ'ইল ট্রাই।

ঊর্মি এবার ফস করে একটা অন্য প্রশ্ন করে বসল, মেয়েটার হাল তো খুব ভাল বলে মনে হল না। ও তোমার ফি-টি দিতে পারবে?

—আমি তো ফি নিচ্ছি না। শুধু ওই কোর্টের খরচা...টাইপ ফাইপ...

ঊর্মি খুশি হল খুব। তবে একটা ঠাট্টা জুড়তেও ছাড়ল না, হঠাৎ এত দয়া? মেয়ে বলে?

—উঁহু। অসহায় মেয়ে বলে। আমি কেসটা টেকআপ করেছি অ্যাজ আ সোশ্যাল সার্ভিস। মেয়েটা যদি জাস্টিস পায়, সেটাই হবে আমার পারিশ্রমিক। কী, কাজটা খারাপ করেছি?

ঊর্মি উত্তর দিল না। স্বামীর বুকে মুখ ঘষল। আহ্, হৃদয় ভরে যাচ্ছে ঊর্মির। কত অকিঞ্চিৎকর মেয়ে ওই রিয়া, জীবনটাও তার খুব পরিচ্ছন্ন নয়, তবু তার জন্যও সহানুভূতির কপাট খোলা আছে সমীরণের। এখনও। এই ব্যস্ত সময়েও। কে বলে সমীরণ সেন চশমখোর আইনজীবী! যত সব নিন্দুকদের কথা। ঊর্মির স্বামীর মতো স্বামী কটা আছে দুনিয়ায়!

সমীরণ কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেক রাত অবধি জেগে রইল ঊর্মি। বার বার মেয়েটার মুখ মনে পড়ছিল তার। হালকা তন্দ্রায় ঊর্মি স্বপ্নও দেখল। রোজই দেখে। সবুজ বাগান, মনোরম দোলনা, ঝিরঝিরে নদী, এ সব। আজ স্বপ্নটা একটু অন্য রকম। হায়না, শিশু, জঙ্গল কত কী এল স্বপ্নে। বিশ্রী। নিষ্ঠুর। ভারী অদ্ভুত।

এক-দুদিন স্বপ্নটা মনে রইল ঊর্মির। তারপর কখন যেন ভুলেও গেল।

ঊর্মি সুখী। ঊর্মি নিশ্চিন্ত।

চার

কয়েক মাস কেটে গেল।

শীত এবার জাঁকিয়ে এসেছিল কলকাতায়, হাড় কাঁপিয়ে চলেও গেল। গোটা শীতকালটা মরশুমি ফুলে ছেয়ে রইল ঊর্মির বাগান। প্রকাণ্ড ডালিয়া, রংবাহার জিনিয়া, পবিত্র চন্দ্রমল্লিকা। তাদের দেখে দেখেই নয়ন ভরে গেল ঊর্মির। মাঘ মাসের মাঝামাঝি ঠাণ্ডা আচমকা কমে গিয়েছিল, কদিন নিম্ন চাপের বৃষ্টি ঝরিয়ে ফিরে এল হিমেল হাওয়া। সমীরণ টুবলু দুজনেই কাত, পাল্লা দিয়ে কাশছে। ঘঙ ঘঙ ঘঙ ঘঙ। ঊর্মির কদিন ভারী চিন্তা গেল। ফাল্গুন মাস পড়তেই বাতাস রূপ বদলেছে, আবার সব আগের মতো।

সমীরণের ব্যস্ততা বেড়েছে আরও। টুবলু গেঁথে যায় কম্পিউটারের খেলায়। তা থাক, ঊর্মিই বা কী এমন খারাপ আছে! একটা ফুটফুটে লাল মারুতি এসেছে বাড়িতে, তাতে চড়ে বেড়াও যত খুশি। সিনেমা। মার্কেটিং। বিউটি পার্লার। এর বাড়ি। তার বাড়ি। ক্লাব। লেডিজ সার্কল। কিছু না থাকলে অলস হাত পা ছড়িয়ে ঘরে শুয়ে থাকা। একটি মেয়ে সপ্তাহে তিন দিন শরীর দলাইমলাই করে দিয়ে যায় ঊর্মির। সে সময়ে ঊর্মি বিদেশি ম্যাগাজিনের পাতা উলটে সুন্দর সুন্দর ছবি দেখে। সোনালি সমুদ্রতট। পাহাড়ে সূর্যাস্ত। নীল আলোমাখা মায়াময় ভোর।

প্রকৃতিও রুটিন মতো সাজছে নতুন নতুন সাজে। বাতাস শীতল থেকে মধুর হল। মধুর থেকে তপ্ত। তা তাতেই বা ঊর্মির কী এল গেল! ড্রয়িং ডাইনিং স্পেসটাও এ বছর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করে নিয়েছে সমীরণ। দুটো গাড়িতেই এসি মেশিন।

একদিন বিকেলে বাপের বাড়ি গেল ঊর্মি। প্রায়ই যায়, কিন্তু আজকের যাওয়াটা একটু অন্য রকম। নতুন বাংলা বছর আসছে, এ সময়ে বাবা মাকে কিছু দিতেথুতে হয়। নিয়ম নয়, ঊর্মি তৃপ্তি পায় দিয়ে।

বাপের বাড়ি এসে ঝাঁপি খুলে বসল ঊর্মি। বাবার জন্য মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি কিনেছে, মা-র জন্য সাদা জমির ব্যাঙ্গালোর সিল্ক। দাদার ছেলেমেয়ের জন্যও জামাকাপড় এনেছে। হাল ফ্যাশানের। চটকদার।

ঊর্মি এ বাড়ি এলেই খুশির প্লাবন বয়ে যায়। বাবা এক কালের অধ্যাপক মানুষ, এখনও লেখাপড়া নিয়েই থাকেন। অপ্রস্তুত মুখে তিনি বললেন, এটা আবার আনতে গেলি কেন? এই বয়সে কি আর এত মিহি পাঞ্জাবি মানায়!

মা বলল, এখন আর তেমন কোথায় বেরোই রে? এত দামি শাড়ি নিয়ে কী করব!

ঊর্মি ছদ্ম ধমক দিল দুজনকেই, কোনও কথা নয়। যা কিনে এনেছি, তা তোমাদের পরতেই হবে। এক্ষুনি।

তো ধনী মেয়েকে বাবা মা-ও সমীহ করে। সেজেগুজে সঙের মতো দাঁড়াল দুজনে। এটা সেটা কথার মাঝে সমীরণের কথাও উঠে পড়ল বার বার।

বউদি গদগদ স্বরে বলল, সমীরণের তো আজকাল খুব নাম দেখছি কাগজে!

বাবা বলল, সামনের বাড়ির তুলসীবাবু দেখা হলেই বলেন, আপনার জামাই তো মশাই এখন পাবলিক ফিগার।

মা বলল, রিয়া মেয়েটার জন্য কী লড়াই না লড়ছে ছেলেটা!

আগেও বলেছে, আজও বলল ঊর্মি—এই কেসটার জন্য ও কিন্তু কোনও টাকা নিচ্ছে না বাবা। শুধু একটা অন্যায় হয়েছে বলে লড়ে যাচ্ছে তোমার জামাই।

বাবা হাসছে মিটিমিটি, তোর জন্য আমি ছেলে পছন্দ করতে ভুল করিনি, কী বল? টাকা তো অনেকেই কামায়, অমন মন থাকে কজনের!

ঊর্মি স্তুতিটুকু প্রসাধনের মতো মেখে নিল গায়ে।

হাসিমুখে বলল, এখন ভালয় ভালয় কেসটা জিতলে হয়। বিশ্বাস করবে না, এই কেসের জন্য রাত জেগে কত পড়াশুনো করছে ও। জুনিয়াররা লাইব্রেরি ঘেঁটে ঘেঁটে বই আনছে, আর তোমাদের জামাই খুঁটে খুঁটে পয়েন্টস জোগাড় করছে। কত শত কেস যে ঘাঁটা হয়ে গেল।

—তুমি কিচ্ছু ভেবো না। সমীরণ এই কেস নিশ্চয়ই জিতবে। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।

আহা! তাই যেন হয়।

ভরা বুকে বাড়ি ফিরছে ঊর্মি। হঠাৎ রাস্তার একদিকে চোখ পড়ে গেল। হাতিবাগানের ফুটপাতে গিজগিজে চৈত্র সেলের ভিড়, তার মধ্যে একটু ফাঁকায় ওই মেয়েটা কে!

ঊর্মি গাড়ি থামাল। কাচ নামাল। হুঁ, রিয়াই। রিয়া।

রিয়াও দেখেছে ঊর্মিকে। দ্বিধান্বিত চোখে তাকাচ্ছে।

ড্রাইভারকে দিয়ে রিয়াকে ডাকাল ঊর্মি। অবলীলায় তুমিতে নেমে এল, চিনতে পারছ?

রিয়া ঘাড় নাড়ল, আপনি তো স্যারের মিসেস!

—মনে আছে?

—থাকবে না!

ঊর্মির তখনই মনে পড়ল মেয়েটা সেই যে একবার এসে ফিরে গিয়েছিল, তার পর আর কখনও সল্টলেকের বাড়িতে আসেনি।

আলগাভাবে ঊর্মি বলল, তুমি আর আমাদের ওখানে আস না তো?

রিয়া হাসল আলতো। উত্তর দিল না।

—তোমার বাড়ি কি এ দিকে?

—এই তো কাছেই। বাগমারি।

—তুমি কি বাড়ি ফিরবে? আমি তোমাকে এগিয়ে দিতে পারি।

অল্প ইতস্তত করে গাড়িতে উঠে পড়ল রিয়া। শেষ বিকেলে দিনের তাপ কমেছে খানিকটা, তবু কাচটা তুলে দিল ঊর্মি। এসিটা চলুক।

গাড়ি চলছে। মোড়ের মাথায় ভীষণ জ্যাম, শামুকের গতিতে এগোচ্ছে গাড়ি।

আলসামাখা কৌতূহল নিয়ে ঊর্মি দেখছিল মেয়েটাকে। রিয়া শাড়ি পরেছে আজ। সিন্থেটিক। ঘাড়ের ওপর চুল চুড়ো করে বাঁধা। তেমন মেকআপও নেই। প্রসাধনবিহীন মুখটা বেশ টলটলে লাগছে।

ঊর্মি কথা শুরু করল, তুমি তো ভাল গান কর, তাই না?

—ওই এক রকম। রিয়া মৃদু হাসল, কে আর আমার গান শোনে!

—কেন? কত লোকে শোনে...

—নাআ ম্যাডাম। বার হোটেলে কে আর গান শুনতে যায়!

ঊর্মি একটু চুপ থেকে বলল, তুমি কি গান শিখেছিলে?

—আমার বাবা ক্লাসিক্যাল সিঙ্গার ছিলেন। তেমন নামী নয়, তবে তাঁরও কিছু ছাত্রছাত্রী ছিল। সে দিন আমার সঙ্গে যাকে দেখলেন, সেও তো আমার বাবার ছাত্র।

—তোমার স্বামী?

—হুঁ। স্বামী। সুব্রত। বলেই রিয়া ঘুরে বসেছে ঊর্মির দিকে, আপনার সামনে আমরা সে দিন বিশ্রী ঝগড়া করে ফেলেছিলাম।

ঊর্মি কিছু বলল না।

—আমার পরে খুব খারাপ লেগেছিল। রিয়া সামান্য উদাস, কী করব, ওটাই যে অভ্যেস হয়ে গেছে।

লোকটার চেহারা মনে পড়ল ঊর্মির। ক্ষয়াটে অপরিচ্ছন্ন। বুড়ো বুড়ো। ফস করে প্রশ্ন করে ফেলল, অনেকটা সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গিতে, তোমার স্বামী করেন কী?

—কেন, আপনি জানেন না ম্যাডাম? স্যারের মুখে শোনেননি?

—রোজগারপাতি ভাল নয় শুনেছি।

রিয়ার চোয়াল মুহূর্তে কঠিন, ভাল নয় কথাটা ভুল। কিস্যু করে না। ঘর থেকে একদিন ভাঙিয়ে এনেছিল, এখনও ভাঙিয়ে ভাঙিয়েই খাচ্ছে। গিলছেও বলতে পারেন। চেহারাটা দেখেননি? মরকুটে ঝিরকুট্টে। কে বলবে আমার থেকে মাত্র আট বছরের বড়! বোতল টেনে টেনে ওই হাল।

কী কাঠ কাঠ কথা রে বাবা! ঊর্মি শিহরিত হচ্ছিল। মুখের রাখঢাকও নেই। শুনলেই কেমন কান ঝাঁ ঝাঁ করে।

ঊর্মিও একটু টেরিয়া হল, ড্রিঙ্ক তো তুমিও করো। করো না?

রিয়া ঈষৎ চমকাল যেন। ঝাঁঝালো মুখ মিইয়ে গেল সামান্য।

বলল, করি। স্ট্রেন হয়, সেই জন্য করি। জোর করে অভ্যেসটা ধরিয়ে দিয়েছে বলে করি।

—কে ধরিয়েছে? স্বামী?

—শুধু স্বামী কেন, যাদের সঙ্গে ওঠাবসা তাদের ইচ্ছেটাও তো মানতে হয়। তবে অন্যের রোজগার ভাঙিয়ে খাই না, নিজে আর্ন করে খাই। আমার খাওয়ার সঙ্গে সুব্রতর খাওয়ার তুলনা! সুব্রতর লিভারের ট্রিটমেন্ট করাতে প্রতি মাসে আমার কত খরচ হয় জানেন? তার ওপর বাবুর কত ফপিশনেস। দামি জামা চাই। দামি জুতো চাই। এখন অবশ্য আহ্লাদ সব ঘুচিয়ে দিয়েছি।

এত কথা বলছে কেন রিয়া! প্রায় অচেনা ঊর্মির কাছে! ঊর্মি তার ল-ইয়ারের বউ, তাই? নাকি সমীরণ বিনা পয়সায় কেস করে দিচ্ছে বলে গাওনা গাইছে?

ঊর্মি রুক্ষ হল সামান্য, স্বামী যখন ওইরকম, তখন তার সঙ্গে তোমার থাকার দরকারটা কী? তুমি স্বাধীন, তোমার স্বাধীন রোজগার আছে—

রিয়া বড় করে একটা নিশ্বাস নিল, ছেড়েই তো দিতাম। কিন্তু ওই যে, মেয়েমানুষ হওয়ার জ্বালা। প্রকৃতি আগেই ঘা মেরে রেখেছে।

ঊর্মি ঠিক বুঝতে পারল না কথাটা। বলল, মানে?

—মানে একটাই। সন্তান। মেয়ে।

—তোমার মেয়ে আছে নাকি?

—দশ বছর ধরে সংসার করছি, ছেলেমেয়ে থাকবে না ম্যাডাম! মেয়ের জন্যই তো হাতিবাগানে

এসেছিলাম। জামা কিনতে। সেই মেয়ে আবার বাবার খুব ন্যাওটা।

মিস রিয়াও মা! সন্তানের জন্য জামা কেনে! ঊর্মি তার সুখী চিন্তা দিয়ে মেলাতে পারছিল না ব্যাপারটা।

খানিকটা গার্জেনি ঢঙে বলল, যতই ন্যাওটা হোক, মেয়ের কথা ভেবেই তো তোমার তাকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত।

—কী যে বলেন! কেমন করে যেন হাসল রিয়া, মেয়েরা স্বাধীন হোক, কি না হোক, বাঁচতে গেলে তাদের চিরকালই একটা ঢাল লাগে। তা সে স্বামীই হোক, বাপই হোক, ছেলেই হোক বা হাফ স্বামী। আমরা মা মেয়ে যদি আলাদা বাসা ভাড়া করি, সেখানে যে মোচ্ছব লেগে যাবে। এখন তো তাও ক্লায়েন্টদের সঙ্গে রিলেশান, তখন কতজন যে ফ্রি রাইট চাইবে। মাঝখান থেকে মেয়েটাও...

—এখনই বা তোমার মেয়ে ভাল শিক্ষাটা কী পাচ্ছে? ঊর্মি ঝাঁঝিয়ে উঠল।

—সে তার কপাল। আমি কেন তাকে আরও খারাপ দিকে ঠেলব! তার পড়াশুনোর বন্দোবস্ত করেছি, এর পর সে কী হবে, সেটা তার ব্যাপার। আমার বাবা তো প্রায় সাধুসন্ত মানুষ ছিলেন, তা বলে আমার জীবন কি সাধুসন্তর মতো হয়েছে? তাও তো আমি তার মতো শুধু জন্ম দিয়ে কর্তব্য সারিনি।

অনেকক্ষণ ধরে ঊর্মি যে কথাটা বলবে বলবে করছিল, সেটাই এবার বেরিয়ে এল মুখ থেকে, তোমার মুখে তো কিছুই আটকায় না দেখছি!

—আটকাবে কী করে! আমরা তো আর পাঁচটা মেয়ের মতো ঘেরাটোপের মধ্যে থাকতে পাইনি! বাবার আড়াল, স্বামীর আড়াল, ভাইয়ের আড়াল, ও সব আমাদের কোথায়! খোলামেলা আছি, খোলামেলা কথা বলে ফেলি। আপনি কি রাগ করছেন ম্যাডাম?

ঊর্মি কেমন নিষিদ্ধ উত্তেজনার স্বাদ পাচ্ছিল। বলল, না না, বলো বলো।

রিয়া চলন্ত গাড়ির বাইরেটা দেখার চেষ্টা করছে। কালো কাচের ওপারে সাঁঝবেলা আঁধার হয়ে গেছে, কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। একটা সরকারি বাস খারাপ হয়েছে সামনে, গাড়ি একেবারে অনড়। ঊর্মির ড্রাইভার একবার অধৈর্যভাবে রাস্তা দেখছে, একবার পিছনের মেমসাহেবকে।

রিয়া সিটে শরীর ছেড়ে দিল, আমি মাঝে মাঝে একটা কথা ভাবি ম্যাডাম। সুখী গৃহবধূ হয়েই বা কী লাভ হত! সারাদিনের পরিশ্রমের বিনিময়ে দুটো ভাত পেতাম। নয়তো রাতে কারও ইচ্ছাপূরণের বিনিময়ে। এ জীবনের সঙ্গে তার কী বা তফাত! একটাতে সমাজের সায় আছে, আরেকটাতে সায় নেই। নেইই বা বলি কী করে! যারা আমাদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করতে চায়, তারাও তো এই সমাজেরই লোক। কারও দাদা। কারও ভাই। কারও বাবা।

ঊর্মির বাকরোধ হয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটার স্পর্ধা তো কম নয়! ভদ্র মেয়েদের দিকে অশালীন ইঙ্গিত করছে। এক্ষুনি ঘাড় ধরে নামিয়ে দেবে গাড়ি থেকে!

কথা বলতে গিয়ে উত্তেজনায় ঊর্মির গলা কেঁপে গেল, প্রেম ভালবাসা কাকে বলে তুমি বোঝ? স্বামীরা কত ভালবাসতেও পারে স্ত্রীকে, তা জানো?

—জানি ম্যাডাম। বুঝতেও পারি। রিয়া চোখ বুজেছে আচমকা, ওই যে লোকটাকে এতক্ষণ গালাগাল দিলাম, আমার স্বামী, আমি ছেড়ে দিলে ও মনের দুঃখে মরেই যাবে। উপায় ছিল না, লোভও ছিল, তাই এক সময়ে আমাকে প্রায় জোর করেই...। আর এখন সেই যন্ত্রণাতেই আরও বেশি মদ গেলে। এই যে লোকটার আমার ওপর জোর ফলানোর আজ আর সাহস নেই, আমি এত হ্যাকথু করি, তাও আমার পিছন পিছন লু লু করে ঘুরে বেড়ায়, একে কি আপনি প্রেম বলবেন না ম্যাডাম?

ঊর্মির শীত শীত করছিল। বুকের ভেতরে, অনেক ভেতরে ছোট্ট মতো কী যেন একটা কাঁপছে।

রিয়া বিড় বিড় করে বলল, এই যে আমি কেসটা লড়ছি, এত স্ক্যান্ডেল হল আমাকে নিয়ে, এই যে কোর্টে আমাকে এত নোংরা নোংরা জেবা করা হয়েছিল, বলতে পারেন আরও নাঙ্গা করে দেওয়া হল আমায়, এটাই বা আমার স্বামী সহ্য করতে পারল কই! রেগে গিয়ে গালাগাল করে আমাকে। আবার কাঁদেও মাঝে মাঝে। এও তো সত্যি ম্যাডাম।

ঊর্মি অস্ফুটে বলল, তার পরও তুমি কেসটা চালিয়ে যেতে চাইলে?

—না চাইলে যে নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে যেতাম ম্যাডাম। জানেন, যারা আমার ওপর

অত্যাচার করেছিল তারা কে? আমার একদম ছোটবেলার বন্ধু। আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছি, হাত ধরে নেচেছি, পাড়ার ফাংশানে একসঙ্গে গান গেয়েছি...। ওরাও আমাকে মেয়েমানুষ ভেবে ফেলল! মেয়ে হয়ে জন্মানোর কি একটাই মানে ম্যাডাম? একটা মাংসের তাল? কোনও অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে তার অন্য কোনও সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারবে না? যদি তাই হয়, তবে আমি ওদের নরকেই পাঠাতে চাই।

গাড়ি এগোচ্ছে। গতি বাড়ল। মেয়েটা নেমে গেল নিজের জায়গায়। এক সময়ে পথও ফুরোল।

নীড়ে ফিরে এসেছে ঊর্মি।

ড্রাইভার দরজা খুলে ডাকল, মেমসাব।

ঊর্মির নামতে ইচ্ছে করছিল না গাড়ি থেকে। বসে আছে চোখ বুজে।

ড্রাইভার আবার ডাকল, মেমসাব। আমরা এসে গেছি।

পাঁচ

পার্টি জমে উঠেছে।

ঊর্মির গোটা দোতলা জুড়ে সুরার বান ডেকেছে আজ। হুইস্কি জিন ভদকা রাম শেরি শ্যাম্পেন টলটল করছে স্বচ্ছ পানপাত্রে। নেভি ব্লু রঙের বালুচরি সিল্ক পরেছে ঊর্মি, শাড়ি জুড়ে রামসীতার কাহিনী। আজকের উৎসবের মধ্যমণি সমীরণের পরনে বার্লিংটনের স্যুট। স্টিরিওতে নরম একটা বিদেশি বাজনা বেজে চলেছে, অতিথি অভ্যাগত অনেক নারীপুরুষেরই অল্প অল্প দুলছে পা। জ্যৈষ্ঠের তাপ থমকে আছে বন্ধ জানলার গায়ে গায়ে।

সমীরণের তিন বন্ধু গ্লাস তুলে ধরল, চিয়ার্স।

ব্যারিস্টার মুখার্জি সস্ত্রীক এসেছেন। জোরে জোরে হাত ঝাঁকাচ্ছেন সমীরণের, খেল দেখালে ব্রাদার। নিয়ারলি ইমপসিবল কেসটা পুরো টার্ন করিয়ে দিলে।

অ্যাডভোকেট দীপেন বসু চুকচুক শব্দ করল, ছেলে দুটোর পানিশমেন্ট একটু বেশি হয়ে গেল না! সাত বছর! দ্যাট টুউ রেপিং আ হোর!

অ্যাডভোকেট চন্দ্রশেখর মণ্ডল কালচে পানীয়ে চুমুক দিল, যাই বলুন দীপেনদা, বেশ্যাকে রেপ করেছিল বলেই সমীরণ এত ফেমাস হয়ে গেল।

—আরে, সমীরণ রেপ করেছে কোথায়? করেছে তো ছেলেগুলো। হা হা হা হা।

সীমা চিকলিয়া ঝাঁপিয়ে এল কোত্থেকে, বেশ্যা বেশ্যা করছেন কেন? শি ইজ আ বার সিঙ্গার। বার সিঙ্গার হলেই খারাপ মেয়ে হয় না।

—ওই হল। ওই রিয়া মেয়েটা আদতে কী?

—নো, আই অবজেক্ট। আপনি বার সিঙ্গারদের সম্পর্কে এ ধরনের কমেন্ট করতে পারেন না। দিস ইজ আনএথিকাল। শুধু মেয়ে বলেই...

—ডোন্ট বি সো ফেমিনিস্ট সীমা।

—এগেন আই অবজেক্ট। আমি ফেমিনিস্ট নই। আপনার ল্যাংগুয়েজের ইনটেনশন ভাল না।

তালেগোলে গণ্ডগোল বাধাব জোগাড়। সমীরণই এগিয়ে এসে হাল ধরল, ওয়েল। শব্দের ব্যাপারে আমরা একটা রফা করতে পারি। আমার ক্লায়েন্টকে তো একটা মেয়েমানুষ বলা যেতেই পারে। মেয়েও বলা হচ্ছে, মানুষও বলা হচ্ছে, ইটস নট এ ডেরোগেটারি টার্ম।

সীমা হেসে ফেলল। জিনের গ্লাসে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, কথার কায়দা জানেন বটে।

—কথাতেই ম্যাজিক থাকে হে। শব্দই ব্রহ্ম। রজত নন্দী ঢুলুঢুলু চোখে হাসছে—আমি লাইফে সাতষট্টিটা রেপ কেস করলাম, এর একশো ভাগের এক ভাগও পাবলিসিটি পাইনি। বলতে বলতে সমীরণের পিঠে একটা জোর চাপড় মারল, সমীরণ, একটা কথা শুনছিলাম। কথাটা কি সত্যি?

—কী দাদা?

—তুমি নাকি এই বার সিঙ্গারের কেসটা বিনা পয়সায় করে দিয়েছ?

সমীরণ কাছে এসে ফিসফিস করল, বিনা পয়সায় কেন দাদা! এই যে পাঁচ-ছ মাস ধরে খবরের

কাগজে নাম বেরোল, সেই পাবলিসিটিটার হিসেব করুন।

—ক্লায়েন্ট বাড়ছে?

—উপচোচ্ছে।

—এই মওকায় ফিজটাও তবে বাড়িয়ে নাও। আমি তো তিনটে ডাকাতকে খালাস পাইয়ে ফিজ ডবল করেছিলাম।

সমীরণ শব্দ করে হেসে উঠল, সেকি আমাকে বলতে হবে দাদা।

হাসির হিল্লোল উঠছে চারদিকে। খুশির জোয়ার বইছে। ঈর্ষার এক চোরা স্রোতও বইছে যেন।

ঊর্মি দেখছিল। ঊর্মি শুনছিল। পিন পিন করে কাঁটা ফুটছিল বুকে। একরাশ ধূর্ত মানুষের মাঝে নিজেকে বড় ভোঁতা ভোঁতা ঠেকছিল ঊর্মির। তবু হাসি ধরে রাখতে হয় ঠোঁটে। তবু বরণ করতে হয় স্বামীর অতিথিদের। লাস্যে বিভঙ্গে মোহিত করতে হয় সকলকে। নিয়ম।

পার্টি ভাঙল সাড়ে এগারোটায়।

টুবলু ঘুমিয়েছে কিছু আগে, মন্টু ধনঞ্জয়রা দোতলা সাফসুতরো করে এই মাত্র নেমে গেল।

সাজ বদলাচ্ছিল ঊর্মি। রামসীতাকে পরিপাটি ভাঁজ করে তুলে রাখল ওয়াড্রোবে। সমীরণও স্যুট ছেড়ে পাজামা পাঞ্জাবি পরে নিয়েছে। তার আজ ক্লান্তি নেই, নেশা নেশা চোখে সিগারেট টানছে বিছানায় শুয়ে। লম্বা হাই তুলে বলল, এসিটা একটু জোর করে দাও তো।

ঊর্মি ঘরটাকে আরও হিমেল করে বিছানায় এল, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি।

—কী কথা?

—আজ দুপুরে তোমার ক্লায়েন্ট এসেছিল।

— ক্লায়েন্ট? দুপুরে! সে আবার কে?

—যার জন্য তোমার আজ এই উৎসব। রিয়া।

সমীরণ সোজা হয়ে বসল, রিয়া এসেছিল এখানে! কেন?

—আমার সঙ্গে দেখা করতে।

—স্ট্রেঞ্জ! সমীরণ সঙ্গে সঙ্গে গোমড়া হয়ে গেছে, এই জন্যই বলে মেয়েছেলেদের বিশ্বাস করতে নেই।

ঊর্মি যেন ইলেকট্রিক শক খেল সহসা।

—বার বার করে বলে দিয়েছিলাম এ বাড়ির ছায়া না মাড়াতে! একদিন আসার সুযোগ পেয়েই এখানে সিন্‌ক্রিয়েট করে গেছে...! কী বলল তোমায়?

—তেমন কিছু নয়। কৃতজ্ঞতা জানাল। এক বাক্স মিষ্টি নিয়ে এসেছিল। আমাকে একটা শাড়িও দিয়ে গেছে।

—হাউ ডেয়ার শি...! তুমি ওর শাড়ি নিয়েছ?

—বারে, তোমার ক্লায়েন্ট আমাকে গিফট দিতে পারে না! সেবারই সেই লোকটা একটা সাড়ে চার ভরির নেকলেস দিল!

—তার সঙ্গে তুমি ওই বারোভাতারি মেয়েটার তুলনা করছ!

—তুলনা তো করিনি। ঊর্মি থেমেও থামল না, সে ছিল স্মাগলার, আর এ একটা রেপ্ ভিক্টিম...!

— তর্ক কোরো না। ও শাড়ি তুমি কালই ফেলে দেবে।

ঊর্মির মুখে ছায়া নামল। মাথাটা অসম্ভব ধরে গেছে, বাথরুমে গিয়ে জল দিয়ে এল ঘাড়ে গলায়। তারপর বিছানার একেবারে ধার ঘেঁষে চুপটি করে শুয়ে পড়ল।

নীল রাতবাতি জ্বলছে ঘরে। নাইটল্যাম্প নয়, যেন চাঁদের কিরণ। যেমনটি ছিল সেই রাতে যে দিন প্রথম ঊর্মিকে রিয়ার কথা বলেছিল সমীরণ। যেমনটি থাকে প্রতি রাতে সমীরণ আর ঊর্মিকে ঘিরে।

সমীরণ হঠাৎ ছুঁল ঊর্মিকে, রাগ হয়ে গেল নাকি?

ঊর্মি নিরুত্তর।

—এমন রাতটা আমরা সেলিব্রেট করব না? ঊর্মির কাঁধ ধরে টানল সমীরণ।

ঊর্মি নিজেকে ছাড়িয়ে আবার উলটো পাশ ফিরে শুল।

—হল কী? অত মেজাজ কীসের? ঘোরো।

ঊর্মিকে এক রকম জোর করেই কাছে টেনে নিল সমীরণ। প্রবল আশ্লেষে চুমু খেল। ঊর্মি নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতেই চেপে ধরল তার দুটো হাত। মুখ দিয়ে টেনে টেনে খুলছে ঊর্মির রাতপোশাক।

ঊর্মি হিসহিসিয়ে উঠল, ভাল লাগছে না। আমাকে ছেড়ে দাও।

—বললেই হল সখি? আমার যে এক্ষুনি তোমাকে চাই।

—আমার কোনও ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই? তুমিই না বলেছিলে ফোর্সিবল সহবাস ইজ রেপ?

অট্টহাসি হেসে উঠল সমীরণ, দারুণ বলেছ তো। এরকম একটা ম্যারিটাল রেপের কেস পেলে রজতদার সব দুঃখ ঘুচে যেত। যা পাবলিসিটি পেত না! উল্লসিত সমীরণ একটা বরফের শরীর ঘেঁটে চলেছে, কীগো একটা কেস ফাইল করবে? সেকশান থ্রি সেভেনটিসিক্স? দু বছর অবধি সাজা হয়।

অজান্তেই চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে এল ঊর্মির। মনে মনে বলল, আমরা কি তা পারি! আমরা যে সব ভাল মেয়ে। রিয়াদের মতো বুকের পাটা আমাদের কোথায়!

ঊর্মির গোপন অশ্রু দেখতে পেল না সমীরণ।

পরবাস

অনুগ্রহ করে শুনবেন, দু হাজার তিনশো দুই ডাউন নিউ দিল্লি হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেস এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট দেরিতে আসছে ... কৃপয়া ধেয়ান দিজিয়ে, দোহাজার তিনসো দো নাম্বার ডাউন নইদিল্লিসে আনেওয়ালি রাজধানী এক্সপ্রেস ... অ্যাটেনশান প্লিজ, টু থ্রি জিরো টু ডাউন

কান পেতে ত্রিভাষিক ঘোষণাটি শুনছিল রাজিন্দর। শুনছিল নয়, শোনার চেষ্টা করছিল। যেমন ক্যারকেরে অ্যামপ্লিফায়ার, তেমনই জড়ানো কণ্ঠস্বর। এমনিতেই বাংলা ইংরিজি স্পষ্ট উচ্চারণ না বললে রাজিন্দরের বুঝতে একটু অসুবিধে হয়, এই ঘোষিকাটির হিন্দিও বেশ দুর্বোধ্য। তবু মোটামুটি মর্মোদ্ধার করতে পারল রাজিন্দর এবং অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল। বার বার শুধু রাজধানীর কথা বলে কেন, অমৃতসর মেল গেল কোথায়? বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়েও হাওড়া এনকোয়্যারির সমাচার, গাড়ি তিন ঘণ্টা লেট। সাতটা পঞ্চান্ন রিচিং টাইম, এখন সওয়া এগারো, ট্রেন তো এতক্ষণে ঢুকে যাওয়ার কথা। আরও দেরি করছে কি? লেটে চলার ব্যাপারেও রেল কোম্পানি কি একটু সময়নিষ্ঠ হতে পারে না! নাহ্, রাজিন্দরের আজ এ বেলা দোকান যাওয়ার দফা রফা।

অফিসটাইমের জের এখনও কাটেনি। থইথই মানুষ, বিনবিন মানুষ, পিলপিল মানুষ। ঘন ঘন লোকাল আসছে যাচ্ছে, বাসাভাঙা পিপড়ের মতো এলোপাথাড়ি ছুটছে জনস্রোত। ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। চতুর্দিকে সার সার ক্লোজসার্কিট টিভি। ঝুলন্ত বাক্সে বেনীআসহকলার খেলা। সাবান মশলা টাকের তেল শাড়ি গেঞ্জি জাঙ্গিয়া থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ক্যাটকেটে লাল, চোখ ধাঁধানো হলুদ, নীল কমলা বেগ্‌নি। ছেতরে যাচ্ছে পর্দাময়। বড় ঘড়ির নীচে ডেরা বেঁধেছে জটাধারী সাধুরা, চিমটে কোলে বিড়ি ফুঁকছে উদাস। স্টেশন জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দঙ্গল দঙ্গল দেহাতির নির্বিকার সংসার। যত্র তত্র বাক্সপ্যাঁটরা কলার খোসা প্রায়নগ্ন শিশু থলি বস্তা শিকনি পানের পিক অর্ধভুক্ত খাবার। ওধারে বর্গক্ষেত্রাকারে সজ্জিত এখনও-অটুট ফাইবার গ্লাসের কুর্সিতে ছোট ছোট পরিবারের জটলা। বাঙালি মাদ্রাজি গুজরাটি মারোয়ারি মারাঠি ...। ফেজটুপিধারী এক মৌলবিও আসীন, সঙ্গে বোরখাবৃত জেনানা, সম্ভবত উত্তরপ্রদেশীয়। বহতা ভিড়, অপেক্ষমাণ ভিড়, নিরাসক্ত ভিড়, উৎসুক ভিড়, রমতা ভিড়, কুলি ভেন্ডার হকার চেকার ভিখিরি ব্যবসায়ী আমলা দালাল পুলিশ সন্দেহজনক নারীপুরুষ, সব মিলেমিশে ব্রিটিশ স্থপতিদের হাতে গড়া হাওড়া স্টেশন যথারীতি এক মিনি ভারতবর্ষ।

মিশ্র এক ধ্বনি উঠছে স্টেশনে। অনুরণিত হচ্ছে। অবয়বহীন কোলাহল। ভারতবর্ষেরই। চাপা একটা গন্ধও টের পাওয়া যায়। পাঁচমেশালি, ঝাঁঝালো। ভারতবর্ষেরই।

এমন বিশাল স্টেশনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলে রাজিন্দরের এক ধরনের অস্বস্তি হয়। ওই ধ্বনি বা গন্ধের মতোই অস্বস্তিটার কোনও সঠিক আকার নেই। অস্বস্তিই, ব্যস্। কখনও নাড়ির গতি ঈষৎ চঞ্চল, কখনও বা ঊনষাট বছরের শক্তপোক্ত কাঠামোর ভার ধরে রাখা হাঁটুদুটোয় সামান্য দুর্বলতার অনুভূতি, কখনও বুক চিনচিন। কেন যে এমনটা হয়! পুরনো কথা মনে পড়ে কি? এই উপমহাদেশের কোনও বড় স্টেশনে রাজিন্দরের সুখস্মৃতি নেই। যা আছে তা শুধুই দুঃস্বপ্ন। লাহোর অমৃতসর দিল্লি ... মৃত্যু রক্ত আর্তনাদ হাহাকার ...। পঞ্চাশ বছরে লাহোর অমৃতসর অনেক ফিকে হয়ে এসেছে, কিন্তু এক যুগ আগের দিল্লি স্টেশন আজও যেন দগদগে ঘা।

খবরদার খবরদার হেঁকে দুই তাগড়াই জোয়ান মাল বোঝাই ট্রলি ঠেলে দৌড়চ্ছে। সিমেন্টের মেঝে আর চাকার ঘর্ষণে ঘড়ঘড় আওয়াজ, হাড় শিরশির করে উঠল রাজিন্দরের। শব্দ যে কেন এত কর্কশ হয়!

অদূরে হুইলার স্টল। ম্যাগাজিন উলটোচ্ছে কুলদীপ। আকাশনীল শার্ট, কালো ট্রাউজার, মাথায় নেভিব্লু দস্তার। দীর্ঘদেহী চওড়াকাঁধ তামাটে রং সাড়ে একুশ বছরের কুলদীপকে জনারণ্যের মাঝেও পলকে চোখে পড়ে যায়।

পায়ে পায়ে বুকস্টলে এল রাজিন্দর। ডাকল,— পুত্তর ...?

কুলদীপ সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুড়িয়েছে— জি পাপা?

—ট্রেনের তো এখনও দেখা নেই! কী হল বল্ তো?

—এসে যাবে।

—এক বার এনকোয়্যারিতে খবর নেব?

—নিয়েছি একটু আগে। কব্জি উলটে ঘড়ি দেখে হাতের ম্যাগাজিন যথাস্থানে রেখে দিল কুলদীপ— মিনিট দশেকের মধ্যে তোমার গাড়ি ইন্ করে যাবে।

—অ্যানাউন্সমেন্ট করে না কেন? কোন প্ল্যাটফর্মে দেবে?

—সাত নম্বর।

—ঠিক জেনেছিস?

—হান্জি। হিন্দি সংলাপের মাঝে এই প্রথম মাতৃভাষার অনুপ্রবেশ। মিটি মিটি হাসছে কুলদীপ— তুমি তখন থেকে এত টেনশন করছ কেন বলো তো?

—করারই তো কথা। এতটা রাস্তা বুড়োবুড়ি একা আসছে ... দু রাত ট্রেনে ... পহেনজি লিখেছিলেন জিজাজির তবিয়তও ভাল নেই, মাঝে মাঝে বুখার হচ্ছে ...

— রিল্যাক্স পাপা। স্টপ ওরিয়িং। কুলদীপের ভাষা এবার হিন্দি ইংরিজির ককটেল— তোমার ব্রাদার-ইন-ল ইজ আ টিপিকাল পাঞ্জাব কা পুত্তর পাপা। আসলি দেশি ঘি। বুখার টুখাব ইজ স্কেয়ার্ড অফ হিম। নাথিং উইল হ্যাপেন।

ছেলের কথার ভঙ্গিতে কেমন যেন উপহাস, রাজিন্দরের ভাল লাগল না। পিসি পিসেমশাই-এর ওপর তেমন টান তৈরি হয়নি কুলদীপের। হওয়ার কথাও নয়। সজ্ঞানে পিসি পিসেমশাইকে কবারই বা দেখেছে কুলদীপ? দিল্লিতে থাকার সময় তাও মোটামুটি যাতায়াত ছিল, কুলদীপ তখন আর কতটুকু? কলকাতায় আসার পর সে সুতোও তো প্রায় ছেঁড়ার উপক্রম। পহেনজি তাও রশ্মির বিয়ের সময়ে এসেছিলেন, বড় ছেলে, ছেলের বউ, নাতি নাতনি সব নিয়ে। ছিলেনও দিন পনেরো। জিজাজি আসেননি। সবাই রোহিলা ছেড়ে চলে এলে তাঁর খেতি বাড়ি দেখবে কে! খেতিবাড়ির ওপর জিজাজির অসম্ভব মায়া। রাজিন্দরের মনে আছে দিল্লি এলেও দু দিন পর থেকেই পালাই পালাই শুরু করতেন জিজাজি। আপনা গাঁও আপনা মকান, আপনা ভাইবেরাদর, এর বাইরে গুরবচন সিং-এর কোনও দুনিয়াই নেই। রোহিলা থেকে অমৃতসর মাত্র তিন ঘণ্টার পথ, সেখানেও তিনি বছরে দু-তিন বারের বেশি গিয়ে উঠতে পারেন না। রাজিন্দরের সন্দেহ হয় জিজাজি সচমুচ জাঠ কি না! জাঠেরা কি এত ঘরকুনো হয়?

ভাবতে গিয়ে একটা অন্যমনস্ক নিশ্বাস ফেলল রাজিন্দর। ছোট্ট, কিন্তু গভীর শ্বাস। সম্পর্ক গড়ে ওঠা না ওঠার দায় কি শুধু দিদি জামাইবাবুর? নয় নয় করে কলকাতায় তেরো বছর কেটে গেল, এর মধ্যে সে কবার রশ্মি কুলদীপকে নিয়ে গেছে রোহিলায়? ছেলেমেয়ে তো যেতে চাইবেই না, আজকালকার লেড়কা লেড়কি শহর ছেড়ে পাহাড় জঙ্গল দেখতে যায়, কিন্তু দু হাজার কিলোমিটার ঠেঙিয়ে গমের খেত? কভি নেহি। রাজিন্দরেরই কি জোর করা উচিত ছিল না? জাঠের বাচ্চা হয়ে আপনা আদমিদের সঙ্গে জানপহেচান হবে না, এটা কি কোনও রস্মেরেওয়াজ হল? গত জুনে অমন একটা দুঃসংবাদ এল রোহিলা থেকে, সব কাজ ফেলে রাজিন্দর ছুটল রোহিলায়, কুলদীপ তখন পার্ট ওয়ান পরীক্ষার পর বসেই ছিল, তাকে কি জোর করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেত না? উহুঁ, ঠিক কাজ হয়নি।

রাজিন্দর আলগা গলা ঝাড়ল— বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ে কী কী বলেছিলাম মনে আছে?

কুলদীপ ভুরু কুঁচকেছে—কী বলো তো?

—পুয়াজি ফুফ্ফরজি ট্রেন থেকে নামলেই আগে তাদের প্রণাম করবে।

—জি।

—মুখে মাথ্থা ঠেকনি হ্যায় জি বলে কাজ সেরো না, সত্যি সত্যি পায়ে মাথা ঠেকাবে।

—হান্জি।

আর কী কী নির্দেশ দেওয়া যায়? হিন্দি ছেড়ে পাঞ্জাবিতে কথা বলতে বলবে? পারবে না কুলদীপ।

রাজিন্দরের ছেলে মেয়ে দুজনেই বাড়িতেও হিন্দি বলে, সময়ে সময়ে বাংলাও। দাদিজি যতই রাগ করুন, পোতা পোতি তাঁর সঙ্গেও রাষ্ট্রভাষা চালাবে। রাজিন্দরের জামাইটি তো আরেক কাঠি বাড়া, শ্বশুরবাড়ি এলে শালার সঙ্গে ইংরিজিতে ...

রাজিন্দর গলাটাকে ভারী করল— শোনো, ভুল করেও যেন হাই হ্যালো কোরো না। ফটর ফটর অংরেজিও না। জিজাজি বিলাইতি বুলি বিলকুল পছন্দ করেন না।

কুলদীপ হেসে ফেলল— ফুফ্‌ফরজিকে এত কনজারভেটিভ ভাবছ কেন বলো তো? মনজিৎ ভাইয়া তো বছর বছর কানাডা থেকে আসত রোহিলায়, সে কি সারাক্ষণ ত্যায়নু ম্যায়নু করত? পুয়াজি বলেননি, তাঁর বড় ছেলে একেবারে পাক্কা সাহেব বনে গেছে?

ঠিক এই মুহূর্তে মনজিতের উল্লেখ কানে লাগল বড়। গত জুনের দুঃসংবাদটা ছিল এই মনজিৎকে ঘিরেই, টরোন্টোয় রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে মনজিৎ। দিদি জামাইবাবু ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছিলেন সেই সময়ে, রাজিন্দরকে কাছে পেয়ে শিশুর মতো বুক চাপড়ে কেঁদেছিলেন রোহিণী। চৌত্রিশ বছরের টগবগে ছেলেকে হারানোর শোক এখনও কি তাঁরা সামলে উঠতে পেরেছেন? পহেনজির চিঠি পড়ে স্পষ্ট কিছু বোঝার উপায় নেই, তবে মনে হয়, সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগাতেই এতকাল পর ঠাঁইনাড়া হয়েছেন জিজাজি।

রাজিন্দর ছেলের পিঠে হাত রাখল। ধীরে ধীরে হাঁটছে প্ল্যাটফর্ম অভিমুখে—খবরদার যেন পুয়াজি ফুফ্‌ফরজির সামনে তোমার মনজিৎ প্রাজির কথা তুলো না বেটা। ওঁরা কষ্ট পাবেন।

ট্রেন ঢুকছে। নিঃসাড়ে, সরীসৃপের মতো। কুলিবাহিনী টকাটক লাফিয়ে উঠছে চলন্ত কামরায়, পিছু পিছু কাগজকুড়োনো বাচ্চারাও। পলকে আপাত ফাঁকা সাত নম্বর প্ল্যাটফর্ম সরগরম।

রাজিন্দর কুলদীপ এগোল হনহনিয়ে, তীক্ষ্ণ চোখে উঁকি দিচ্ছে প্রতিটি স্লিপার কামরায়। প্ল্যাটফর্মের প্রায় শেষ মুড়োয় এসে থামল। রোহিণী গুরবচনের আগেই নেমে পড়েছেন কামরা থেকে, লটবহর পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দুখানা ভি আই পি স্যুটকেস, বটগাছের কাটা গুঁড়ির মতো একটা হোল্ড অল, মিনি ড্রাম সাইজের ওয়াটার কনটেনার, চাকা লাগানো ত্রিস্তর প্লাস্টিকের বস্তা। আরও মাল নামছে। ঝুড়ি ব্যাগ, বালতি ব্যাগ, লাঠি, নিরেট কাপড়ের বোঁচকা খান দুই ...

এবং সর্বশেষে গুরবচন।

গুরবচন সিং-এর চেহারাটি ভারী বিশাল। অনেকটা পর্বতের মতো। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। তিনি পরে আছেন মেটে রঙের ঢলঢলে সালোয়ার কুর্তা, কুর্তার ঝুল হাঁটু ছাড়িয়ে অনেকটা নেমে এসেছে। পায়ে কালো নাগরা, সেটাকে সহজেই নৌকো বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। রাজিন্দর বা কুলদীপের মতো দাড়িটি তাঁর বাঁধা নয় বা সেখানে কোনও ল্যাকারের কারিকুরি নেই, বুক অবধি ছড়ানো সাদা শ্মশ্রু ফুরফুর উড়ছে হাওয়ায়। কুর্তার ওপর দিয়ে কোমরে একটি চওড়া চামড়ার বেল্ট বেঁধেছেন গুরবচন। ডান দিকে শোভা পাচ্ছে ফোলা বটুয়া, বাঁ দিক থেকে ঝুলছে কৃপাণ। মাথায় পাগড়িও তাঁর তেমন বিন্যস্ত নয়, দশ গজ লম্বা সাদা কাপড়ের অংশ ঝুলছে পিঠ বেয়ে। মানুষটিকে হঠাৎ দেখলে ভয়ের অনুভূতি জাগার কথা। কিন্তু আশ্চর্য, তেমনটি হয় না। মানুষটির বড় বড় চোখে এক অদ্ভুত সারল্য আছে, দেখে কেমন যেন সাধুসন্ত বলে মনে হয়। তাঁর দেহকাণ্ড ঋজু নয়, সামনের দিকে সামান্য ঝোঁকা। যেন বা ধরিত্রীর টানে নুয়ে গেছে। তুলনায় রোহিণী নিতান্ত ছোটখাটো, তবে তাঁর মুখচোখ ভারী ঝকঝকে। রাজিন্দরের থেকে সাত বছরের বড় তিনি, অর্থাৎ ছেষট্টি। এখনও তাঁর গায়ের রং পাকা গমের মতো, বলিরেখা এখনও তাঁকে সেভাবে ছুঁতে পারেনি। তিনিও পরে আছেন ঢোলা সালোয়ার কামিজ। শ্যাওলা রঙের। মাথাভরা সাদাকালো চুল চুড়ো করে বাঁধা।

প্রণাম আলিঙ্গন চোখছলছলের পর্ব চলল কয়েক মিনিট। কুলদীপকে জড়িয়ে ধরে মাথা শুঁকছেন ঘাড় শুঁকছেন রোহিণী, রাজিন্দরকে বুকে জাপটে পিঠে স্নেহের থাবড়া মারছেন গুরবচন— দৃশ্য বটে। অতঃপর কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে ক্যাবওয়ের দিকে হাঁটা শুরু করল চারজন। কুলদীপ দৌড়ে গিয়ে মারুতি ভ্যানের ডিকি খুলে দিল, মুহূর্তে মালে স্তূপ হয়ে গেল পিছনটা।

আসার সময়ে কুলদীপ গাড়ি চালিয়ে এনেছে, ফেরার পথে রাজিন্দরের স্টিয়ারিংয়ে বসার পালা। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রাজিন্দর বলল— কোন দিক দিয়ে যাব? লরি ছেড়ে দিয়েছে, ফার্স্ট ব্রিজ তো এখন

জ্যাম হবে বে।

—সেকেন্ড ব্রিজ ধরো। পুয়াজি ফুফ্‌ফরজির সাইট সিয়িং হয়ে যাবে। সানফ্রান্সিসকোর গোল্ডেন গেট কলকাতাতেই দেখে নিন।

রোহিণী হাসলেন— ও তো আমি গত বার এসেই দেখেছি।

—আবার দ্যাখো, বার বার দ্যাখো। রাজিন্দর অকারণ উচ্ছল হল। রেয়ারভিউ মিররে দেখল গুরবচন শরীর পুরো ছেড়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন, চোখ দুটি বোজা। জিজ্ঞাসা করল— জিজাজি কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন?

গুরবচন চোখ খুললেন না। ঠোঁট নড়ল সামান্য— একটু।

—গরম লাগছে?

—একটু।

—আপনাদের ওদিকে কি ঠাণ্ডা পড়ে গেছে?

—পড়ছে সবে। তবে তেমন বেশি কিছু নয়।

—কলকাতাতেও ডিসেম্বরের গোড়ায় শীত এসে যায়, এবার যে ঠাণ্ডা কোথায়! বলতে বলতে ঘুরে গুরবচনকে এক ঝলক দেখে নিল রাজিন্দর—এসি চালিয়ে দেব?

—না থাক। গুরবচন সিধে হয়ে বসলেন— নতুন দেশে এলাম, একটু এখানকার হাওয়া বাতাস গায়ে লাগাই।

গঙ্গার পাশ দিয়ে মসৃণ মেটাল রোড ধরে ছুটছে গাড়ি। এ রাস্তাটা ফাঁকাই থাকে, গাড়ি প্রায় উড়ে চলে। ধারে ধারে পর পর প্রাচীন কারখানা। কোথাও কোথাও চিমনি দিয়ে গলগল ধোঁয়া বেরোচ্ছে, কোনওটা বা অস্থিসার হয়ে পড়ে আছে নিঝুম। গঙ্গার পানে চোখ না রেখে সেদিকেই তাকিয়ে আছেন গুরবচন। কুলদীপও বসে আছে চুপচাপ, সম্ভবত ভাঙা ভাঙা পাঞ্জাবি বলতে হবে সেই ভয়ে। কথা বলছেন রোহিণী একাই, রাজিন্দরের সঙ্গে।

—এই গাড়িটাই কি নতুন কিনেছিস?

—নতুন কোথায়, এক সাল তো হয়ে গেল।

—অনেক ঝিক্কু ঝিক্কু ফিটিংস লাগিয়েছিস দেখছি! লাল নীল আলো, স্টিরিও, ঘড়ি, এসি ...

—আরে পহেনজি, এ সব আমার নিজের দোকানের মাল। ক্যাশ দিতে হয় না, মাসে মাসে অ্যাডজাস্ট হয়।

—স্পেয়ার পার্টসের ব্যবসাটা তা হলে পুরোপুরি উঠিয়ে দিলি?

—এ সব শৌখিন ফিটিংস্-এর বিজনেসে নাফা অনেক বেশি পহেনজি। বিশ টাকার চিজ আরামসে দুশো টাকায় বেচে দেওয়া যায়। হা হা হা। লোকে কেনেও।

—ব্যবসা তা হলে তোর জমে গেছে?

—মোটামুটি। দিল্লির মতো না হলেও ... চ্যাটার্জিবাবু ভাল লাইনটায় নিয়ে এসেছেন।

—কে চ্যাটার্জিবাবু? তোর সেই বাঙালি পার্টনার? উনি আছেন এখনও?

—আছেন মানে? ওঁরই তো সব হাই হাই কানেকশান। ফিলম্ লাইনে, পুলিশ লাইনে... এ সাল কতগুলো সরকারি জিপে হুড লাগিয়েছি জানো?

—বাঙালিরা কিন্তু খুব ধূর্ত হয় রে রাজু। পার্টনারশিপ ছেড়ে একা একটা বিজনেস করতে পারছিস না?

রাজিন্দর গমগমিয়ে হেসে উঠল— তুমি কলকাতা শহর চেনো না পহেনজি। এ দিল্লি নয়, এখানকার লোকের দিল অনেক দরাজ।

—তুই ভাল থাকলেই ভাল। তোর ওপর গুরুর কৃপা থাকলেই মঙ্গল। ছোট্ট একটা হাই তুললেন রোহিণী। আড়মোড়া ভাঙলেন— রশ্‌মির খবর কী রে?

—আছে ঠিকঠাক। ওর বেটির তো সেপ্টেম্বরে তিসরা সালগিরা হয়ে গেল।

—খুব দুষ্টু হয়েছে চুন্নি। কুলদীপ আর চুপ থাকতে পারল না, হিন্দিতেই বলে উঠল— রশ্‌মিদিদি তো ওকে নিয়ে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে।

—উচিত শাস্তি। হাওয়ায় উড়ন্ত দোপাট্টা আলগাভাবে গলায় জড়ালেন রোহিণী— মনে আছে রাজু, ছোটবেলায় রশ্‌মিটাও কেমন দুরন্ত ছিল? সেই রোহিলায় একবার তোর জিজাজির ট্র্যাক্টর চড়ে দুড়ুম করে স্টার্ট দিয়ে দিয়েছিল।

রাজিন্দর মুখ টিপে হাসল। ফোবশোর রোড ছাড়ার পর বেশ খানিক রাস্তা অত্যন্ত খারাপ, গাড়ি লাফাচ্ছে ঝমাঝম। পথ আর স্টিয়ারিং-এ পূর্ণ মনোযোগ না দিলে গাড়ির সাসপেনশানে চোট লাগতে পারে। বড় একটা গাড্ডা কাটিয়ে নিয়ে রাজিন্দর বলল,— রশ্‌মি আসবে রবিবার। ওকেই স্মরণ করিয়ে দিয়ো। চুন্নিকে কথায় কথায় খালি পিটাই করে রশ্‌মি।

রোহিণী হাসলেন। বাইরে তাকিয়ে থাকা গুরবচনকে আড়ে দেখে নিয়ে গলা নামিয়ে বললেন,— হ্যাঁ রে, জামাই এখন আছে কেমন?

—ভাল। খুব ভাল। সুখবিন্দরের পেট্রল পাম্প এখন রমরমিয়ে চলছে। নতুন ট্যাঙ্কলরি কিনেছে, নিজের পাম্পের তেল নিজে হলদিয়া থেকে তুলে আনে। পেট্রল চুরিটা হয় কম।

—ব্যবসার কথা বলছি না। ... সেই ঝঞ্ঝাট মিটেছে?

রাজিন্দর অস্বস্তিতে পড়ে গেল। রশমির বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতে জামাইকে নিয়ে ভারী চিন্তায় পড়তে হয়েছিল রাজিন্দরকে। খড়্গপুরেরই স্থানীয় এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে নাকি জামাই-এর লটর পটর। কোমলের কাছে এসে খুব কান্নাকাটি করত মেয়ে। মনের দুঃখের কথা একবার চিঠিতে দিদিকে জানিয়ে ফেলেছিল রাজিন্দর, সে কথাই এখন দিদি ...। সম্প্রতি অবশ্য সমস্যাটা মিটে গেছে, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েটি অন্য কাকে যেন পাকড়াও করে বিয়ে-শাদি সেরে পাড়ি দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। রশমি আর সুখবিন্দর আবার মোটামুটি সুখী দম্পতি। কিন্তু কুলদীপ আর জিজাজির সামনে কি এখন সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করা যায়?

দ্বিতীয় সেতুর র‍্যাম্পে উঠে পড়েছে গাড়ি। অদূরে টোল ট্যাক্সের গেট। উত্তর দেওয়ার দায় এড়াতে পার্স খুলে টাকা বার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রাজিন্দর। ঘুরে গুরবচনের দিকে হাসি হাসি মুখে তাকাল, —কী জিজাজি, কেমন ব্রিজ দেখছেন?

গুরবচন সমঝদারের মতো ঘাড় দোলালেন—খুব সুন্দর। খুব উঁচু।

—আপনাকে একদিন পুরনো ব্রিজটাও দেখিয়ে আনব। ... ওটাও সুন্দর, তবে অন্য রকম।

গঙ্গার বুকে উঠে রাজিন্দর গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। সাঁ সাঁ হাওয়া ঢুকছে জানলা দিয়ে, ঝড়ের মতো, শিশুর মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে গুরবচনের মুখচোখ। রোহিণী দু হাতে কপাল থেকে চুল সরাচ্ছেন, চোখ বুজে শ্বাস টানছেন জোব জোর। দূরে খিদিরপুর ডকে জাহাজের মাস্তুল দেখা যায়, গঙ্গায় প্রতিফলিত হচ্ছে দুপুরের সূর্য, ঝিকমিক করে উঠছে রুপোলি জল। ভিক্টোরিয়ার পরি ক্ষণিক দর্শন দিয়েই মিলিয়ে গেল।

দিদি জামাইবাবুর মুগ্ধ দৃষ্টি উপভোগ করছিল রাজিন্দর। উচ্ছ্বাস মাখা গলায় বলল—কী জিজাজি, হাওয়াটা খুব মিঠে না?

—বড়িয়া। বহুৎ আচ্ছা।

—ক্লান্তি কাটছে?

—বিলকুল।

রোহিণী ঠাট্টার সুরে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন— ক্লান্তি আবার কীসের? গোটা ট্রেন তো পড়ে পড়ে ঘুমোলে। চা আনা, খাবার কেনা, জল ভরা সবই তো করল মোহন।

—কে মোহন?

—আমাদের ডিব্বায় ছিল। হাওড়াতেই নামল।

—বাঙালি?

—না, পাঞ্জাবি। মালহোত্রা।

—কলকাতার লোক?

—লোক কোথায়, ছেলে। লুধিয়ানার। কলকাতায় কী যেন কাজে এল। রোহিণী গাল ছড়িয়ে হাসলেন— খুব আলাপী ছেলে। ঠিকানা নিয়েছে। আসবে।

—সে উঠছে কোথায়? আমাদের ভবানীপুরের দিকে?

—না না, হোটেলে উঠবে বলল।

—ও। রাজিন্দর ব্রিজ ফ্লাইওভার পার হয়ে স্বাভাবিক গতিতে ফিরেছে। হালকা গলায় কুলদীপকে বলল— আশা করি তুমি আজ বাড়িতেই থাকবে। কলেজ আছে বলে কেটে পড়বে না!

কুলদীপ উশখুশ করে উঠল—কেন পাপা?

—পুয়াজি ফুফ্‌ফরজিকে সঙ্গ দেবে সারা দিন। আমি তাড়াতাড়ি দোকান থেকে ফিরে আসব।

কুলদীপের ঘাড় গোঁজ—জি পাপা।

রোহিণীর সঙ্গে চোরা দৃষ্টি বিনিময় করল রাজিন্দর। কুলদীপের মুখ আচমকা মেঘলা, দেখে হাসি চাপছে দুজনে।

রোহিণী সস্নেহে বললেন—আহা, ছেলেটার ওপর জোর করছিস কেন? ও যদি কলেজ মলেজ যেতে চায় যাক না। আমরা নিজেরা নিজেরা গপসপ্ করব, জিরোব...

রাজিন্দর বাঁ হাতে গোঁফ চুমরোল—কলেজ তো বাহানা পহেনজি। তুমি জানো না পুত্তর আমার কী আড্ডাবাজ হয়েছে। দিন রাত শুধু বাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে খেলা সিনেমা...একটা দিন রাত নটার আগে ফেরে না। বললেই বলবে লাইব্রেরি ছিল।

চকিতে রোহিণী বলে ফেললেন—আমার মনজিৎটাও এরকম আড্ডাবাজ ছিল। শুধু ইয়ারদোস্ত হইহল্লা—রোহিলাতে এলেও...

গুরবচনের স্থৈর্যে চিড় ধরল। কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন স্ত্রীর দিকে,—আহ্, তুমি থামবে?

সহসা পরিবেশ থমথমে। রোহিণী দোপাট্টা চেপেছেন চোখে, গুরবচনের রোদজ্বলা মুখ ছেয়ে গেছে বিষণ্ণতায়। অঘ্রাণের বাতাসে যেন ভাদ্রের গুমোট নেমে এল।

রাজিন্দরের কষ্ট হচ্ছিল। বিয়েশাদি কিছু করল না, কারুর কথা শুনল না, দুম করে বিদেশে ভাগ্যান্বেষণে চলে গেল মনজিৎ। একটুও মত ছিল না গুরবচনের, রাজিন্দর জানে। বড় বেহিসেবি জীবনযাপন করত ছেলেটা। ধাবা বানাল টরোন্টোয়, চালাতে পারল না। রেডিমেড জামাকাপড়ের দোকান খুলেছিল, সেও নাকি তেমন সুবিধের হয়নি। উচ্ছৃঙ্খলতা আর গতি, এই ছিল মনজিতের জীবনের ধারা। ছুটছে, শুধু ছুটছে, নিজের ক্লাচ ব্রেক গিয়ার স্টিয়ারিং কোনও কিছুই তার বাগে নেই। পরিণাম, কাছের লোকেদের এই যন্ত্রণা। মনজিতের ওপর অল্প অল্প রাগ হচ্ছিল রাজিন্দরের। সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক আশঙ্কা ধেয়ে এল মনে। উইন্‌ড্ স্ক্রিনে চোখ রেখে নিচু গলায় বলল—পহেনজি, জানোই তো, হুকমাই অন্দর সভুকো বাহার হুকম্ না কোই...পৃথিবীতে সবই তাঁর আদেশে চলে, কিছুই তাঁর আজ্ঞা ছাড়া হয় না। যে চলে গেছে সেও তাঁর ইচ্ছেতেই...। যারা বেঁচে আছে এখন শুধু তাদের কথাই ভাবো পহেনজি।

রোহিণী নাক টানলেন।

ধরা ধরা গলায় রাজিন্দর বলল—কেন বলছি বুঝছ? বি'জির হাটের অবস্থা ভাল নয়, বাড়ি ঢুকেই তাঁর সামনে যেন কান্নাকাটি কোরো না।

—জানি রে প্রা। রোহিণীর দেশজ সম্বোধনে ভাই-বোনের দু-হাজার কিলোমিটার দূরত্ব, এই প্রবীণ বয়স, সবই যেন পলকে মুছে গেল। আকুতির মতো শোনাল ওই প্রা ডাকটি। ফোঁপাচ্ছেন রোহিণী—বি'জি তো সারা জীবন ধরে শুধু শোকই পাচ্ছেন। কিন্তু মা ছাড়া মেয়ে আর কার কাছে কেঁদে হালকা হবে বল?

রাজিন্দর বুকে একটা চাপা কষ্ট অনুভব করছিল। হঠাৎ কেমন যেন গরম লাগছে, ঘাম জমছে কপালে। আশুতোষ মুখার্জি রোডে পড়ার পর একটা ট্যাক্সি সমানে পিছন পিছন আসছে। হাতের ইশারায় তাকে এগিয়ে যেতে বলল রাজিন্দর। গেল না। টিকুর টিকুর চলছে পিছু পিছু। চক্রবেড়িয়া এসে গেল, এখনও পিছনে রয়েছে ট্যাক্সিটা।

মানুষের শোক যন্ত্রণাও কি ওরকম, ওই নেই-আঁকড়া ধাবমান ট্যাক্সিটার মতো? পসিনার মতো লেগে থাকে গায়ে?

ছতলা ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল রাজিন্দরের মারুতি ভ্যান। গেটে কোমল, তার ঈষৎ

উদ্বিগ্ন মুখ পলকে উজ্জ্বল। ছুট্টে জড়িয়ে ধরেছে রোহিণীকে।

গুরবচনের স্বর গমগম করে উঠল—সত্শ্রী অকাল। সত্শ্রী অকাল।

দুই

আধো জাগরণে মার গলা শুনতে পাচ্ছিল কুলদীপ। ডাকছে —ওঠ পুত্তর। আটটা বেজে গেছে।

কুলদীপ চাদর জড়িয়ে নতুন করে পাশ ফিরল। এখনও চোখে ঘুম মাখামাখি, উঠতে ইচ্ছেই করছে না। কাল অনেক রাত অবধি হইহই হয়েছে বাড়িতে। পুয়াজিই ছিলেন আসরের মধ্যমণি। এই হাসছেন, এই কাঁদছেন, বকবক বকবক...দাদিজি পর্যন্ত ঘুম-টুম ভুলে মেয়ের পাশে ঠায় বসে। এক সময়ে ঢুলতে লাগল সকলে, আড্ডা ভেঙে গেল। তার পরও বহুক্ষণ জেগে ছিল কুলদীপ। সাউন্ড অফ করে টিভি-তে আধ ঘণ্টাটাক অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের ওয়ান-ডে দেখল, গভীর রাতে বসল অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির নোট নিয়ে। নোট মানে সাজানো গোছানো কিছু নয়, সুকান্ত ডি কে সি-র লেকচারটা নিখুঁত ফলো করতে পারে, সেই রানিং নোটের অংশবিশেষ। এত কিছুর পরে আর কি আটটার আগে বিছানা ছাড়া সম্ভব!

কোমল ঠেলছে ছেলেকে —কীরে, উঠবি তো? বাড়িসুদ্ধু সবাই জেগে গেছে...

—উমমম্।

—আমি জানি না, পাপা কিন্তু এর পর খুব রাগারাগি করবে।

অগত্যা উঠল কুলদীপ। পরনে নাইটড্রেসের মতো ঢোলা পাজামা কুর্তা, ঝুঁটিতে সাদা রুমাল বাঁধা, চোখ ঢুলু ঢুলু, বড় বড় হাই তুলছে। দু হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল —পুয়াজি ফুফফরজি কী করছেন?

—জিজ্ঞেস করতে শরম লাগে না? ঝেঁঝে উঠে দ্রুত হাতে বিছানা ঝাড়া শুরু করল কোমল। কাল রাজিন্দর এ ঘরে শুয়েছিল, ছেলের পাশে, তার বালিশগুলোও খাটের ডালায় ভরে ফেলছে। চাদর পাট করতে করতে মুখ চলছে ক্রমাগত—কখন সকলের স্নান-টান সারা। ফুফফরজি বার বার খোঁজ করছেন...ছি ছি, দেশওয়ালি মানুষ ওঁরা, কী ভাবছেন বল তো? এত বড় একটা দামড়া ছেলে এখনও তাকিয়া আঁকড়ে পড়ে আছে...বদনাম কি তোমার হবে, না তোমার বাবা-মা'র?

কোমল কথা কমই বলে, কিন্তু চটে গেলে তাকে থামিয়ে রাখা মুশকিল। কুলদীপ টুক করে খাট থেকে নেমে পড়ল, মার পায়ে নিয়মমাফিক আঙুল ছুঁইয়েই চলে গেছে ড্রয়িং ডাইনিং স্পেসে। আগের কাজ আগে, ঝটপট প্রণামের পালাটা চুকিয়ে ফেলতে হবে।

কুলদীপ তাদের ধর্মের কোনও প্রথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে না, প্রাতঃকালীন দু-একটা রীতি ছাড়া। যেমন ঘুম থেকে উঠে গুরুজনদের প্রণাম, জপ্জি সাহিব পাঠ, এই সব। আর সব নিয়মের বেলায় সে ঢিলেঢালা, সুবিধাপন্থী। বাথরুমে ঢুকে খুচখাচ কাঁচি চালায় দাড়ি গোঁফে, নিজেকে স্মার্ট দেখানোর জন্য যথাসম্ভব ট্রিম করে নেয়। রাজিন্দর বকলে আবার তর্ক জোড়ে। এত কিছু মানলে আর এ যুগে চলে না পাপা। কাঙ্গি কৃপাণ কছেরাই বা আজকাল সেভাবে ধারণ করে কজন! সবেরই তো এখন শর্টকাট মেথড চলছে! মিনি চিরুনি গোঁথে নাও চুলে, মাইক্রো কৃপাণ লকেট করে গলায় ঝুলিয়ে রাখো, কছেরার বদলে পরো আধুনিক জাঙ্গিয়া। আইনও বাঁচল...। কড়া অবশ্য বালা হয়ে বিরাজ করছে কুলদীপের হাতে, শৌর্যময় অলংকারের মতো। সে গুরদোয়ারায় যায় ন মাসে ছ মাসে, পরব-টরব থাকলে। বৈশাখী, কি গুরুপূর্ণিমা, কি গুরু গোবিন্দ সিং-এর জন্মদিনে...। করসেবা বছরে বড়জোর এক-দু বার, রাজিন্দরের মতো নিয়ম করে মাসে মাসে নয়। তবে গুরদোয়ারায় গেলেই লঙ্গরে বসে কুলদীপ, কোটিপতি থেকে ভিখিরি সবার সঙ্গে একাসনে বসে পঙ্ক্তিভোজনের প্রথাটি তার ভারী প্রিয়।

সূর্য আকাশের হাঁটু ছুঁয়েছে, পুবের ব্যালকনি জুড়ে মিঠেকড়া রোদ্দুর। ব্যালকনিতে পাতা নেয়ারের খাটিয়ায় বসে চুল দাড়ি শুকোচ্ছেন গুরবচন, পিঠ পর্যন্ত নেমে আসা পাতলা পাতলা সাদা চুল আলোয় চিকচিক। বিমলা ডাইনিং টেবিলে, চোখে গোল রিমলেস চশমা, ঘাড় নিচু, নিবিষ্ট মনে মেথির শাক

বাছছেন। অশীতিপর দেহটি তাঁর কাঁপছে টিপটিপ। এ বাড়িতে একটি পবিত্র গ্রন্থসাহিব আছে, লাহোরে থাকার সময়ে রাজিন্দরের বাবা যশপাল সেটি সংগ্রহ করেছিলেন। রেক্সিন বাঁধাই, মলাটে সোনার জলের কারুকাজ। রেশমি কাপড়ে মোড়া গুরুগ্রন্থটি বিমলার ঘরের শোকেস থেকে নামিয়েছেন রোহিণী, ওই ঘরেরই মেঝেতে বসে বিনবিন পাঠ করে চলেছেন। কোমল এইমাত্র রান্নাঘরে ঢুকল, গ্যাস জ্বালিয়ে দুধ বসিয়েছে। চা হবে। রাজিন্দর নিজের ঘরের ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাড়ি বাঁধায় ব্যস্ত।

কর্তব্য-টর্তব্য সেরে ড্রয়িংস্পেসের বড় সোফায় এসে বসল কুলদীপ। খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছে। প্রথম পাতায় যথারীতি গতানুগতিক সংবাদ। ইরাককে আমেরিকার কড়া হুঁশিয়ারি, রাশিয়ায় প্রধানমন্ত্রী বদলানো নিয়ে সমস্যা, দিল্লিতে নতুন নতুন জোট গড়ার ফন্দিফিকির, অমুক মন্ত্রীর নামে ঘুষের মামলা, তমুক দলের বিরুদ্ধে অমুক নেতার বিষোদ্গার, হাওলা, গাওলা...। বিরস মুখে খেলার পাতায় চলে যাচ্ছিল কুলদীপ, হঠাৎ তলার দিকের একটা ছোট্ট খবরে চোখ আটকে গেল। মন দিয়ে পড়ল খবরটা। কী ভেবে কাগজ হাতে উঠে গেল ব্যালকনির দরজায়।

—ফুফ্‌ফরজি, পেপার দেখেছেন আজ?

—পেপার! গুরবচন ফিরে তাকালেন —কী পেপার?

—নিউজ পেপার। আখ্‌বার।

—না পুত্তর।

—খবরটা পড়ুন। ...নীচে...। কুলদীপ কাগজ এগিয়ে দিল।

গুরবচনের তিলমাত্র আগ্রহ নেই, মুক্ত কেশে চিরুনি চালানোর মতো করে আঙুল চালাচ্ছেন। হাসি হাসি মুখে বললেন —হিন্দি আমি পড়তে পারি না বেটা।

—ও। কুলদীপ একটু দমে গেল। পরক্ষণে বলল—পড়ে শোনাব?

—আচ্ছা কোনও খবর?

—আচ্ছা বুরা আপনি বলতে পারবেন। আপনাদের অমৃতসরের হাওয়া তো বেশ গরম হচ্ছে আবার।

—সে তো আসার আগেই দেখে এলাম। বৃষ্টি হচ্ছে না একদম...ওদিকে লাহোরি নালার জলও কমে গেছে...গুরবচনকে চিন্তিত দেখাল,—শুধু শিশিরে কি বাড়ে গম গাছ! দলজিৎটা যে ওখানে কী করছে!

কুলদীপ হেসে ফেলল। একেই বলে মাটির মানুষ। দুনিয়ার যে খবরই দিতে যাও, প্রথমেই খেতিবাড়ি টেনে আনবে।

হাসতে হাসতেই বলল, —এ গরম সে গরম নয় ফুফ্‌ফরজি। এ হল গিয়ে গুলি গোলা। ঢ্যা ঢ্যা ঢ্যা ঢ্যা ঢ্যা। আপনাদের অমৃতসর ডিস্ট্রিক্টে কাল টেররিস্টদের সঙ্গে জোর ফাইট হয়েছে পুলিশের। চার আদমি খতম। পুলিশ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র কার্তুজ উদ্ধার করেছে।

—এই তোর খবর? হা হা হা।

—হাসছেন আপনি? এটা খবর নয়? তবে যে শুনি পাঞ্জাবে গণ্ডগোল থেমে গেছে?

—গেছেই তো। চোদ্দো আনা চলে গেছে।

—তার মানে দু আনা আছে?

—থাকতে পারে। আগুন নিবলেই কি সঙ্গে সঙ্গে তাপ মরে যায়?

—আপনারা নিশ্চয়ই সেই তাপ টের পান। তা হলে এটা খবর নয় বলছেন কেন?

—ওরেব্বাস, তুই যে একেবারে ভকিলবাবুর মতো কথা বলিস! হাসতে গিয়েও গুরবচন সামান্য গম্ভীর হয়ে গেলেন,—দ্যাখ মুনড়া, তোকে একটা সাফ সাফ কথা বলি। আমরা হলাম গিয়ে একেবারে চাষাভুসো মানুষ। আম আদমি। রাজনীতির সঙ্গে আমাদের কী লেনাদেনা? গরমে পুড়তে পুড়তে, বর্ষায় ভিজতে ভিজতে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমরা বাহে গুরুর জয়গান করি। রবের কৃপায় আমার ট্রাক্টর যদি চালু থাকে, ডিপ টিউবওয়েলের মেশিন যদি না খারাপ হয়, খেতের গেঁহুতে যদি পোকা না লাগে, তা হলেই আমাদের শান্তি। যারা ও সব করছে, করছে। যারা খালিস্তান চাইছে, চাইছে। যারা চাইছে না, তারা চাইছে না। পাঞ্জাব খালিস্তান হয়ে গেলে কি আমার খেতে বেশি ফসল ফলবে? নাকি ফসল কমে

যাবে? কোনওটাই না। তা হলে আমি কেন ও সব নিয়ে মাথা ঘামাতে যাব?

উত্তেজনাহীন সহজ সাধারণ সুরে কথা বলছেন গুরবচন। কুলদীপ একটু অবাকই হচ্ছিল। আসা ইস্তক মোটামুটি চুপচাপই ছিলেন মানুষটা, বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন তো!

গুরবচন আবার বললেন,—শোন মুন্ডা, এ বুড়ো জীবনে অনেক কিছু দেখেছে, তার মুখে সার কথাটা শোন। রাজ বদলায়, নেতা বদলায়, পার্টি বদলায়, কারণ সেগুলো মানুষের নিজের তৈরি করা। কিন্তু রবের তৈরি কোনও কিছুই তাতে পালটায় না। আকাশ, ধরতি, পাহাড়, নদী, চাঁদ, সূরয, কিচ্ছু না। আমরা আম আদমি, আমরাও তাঁর তৈরি, আমরাও একই থাকি। ও সব ঝুটঝামেলা আসুক যাক, তাতে আমাদের কী?

রাজিন্দর ঘর থেকে বেরিয়ে গুরবচনের কথা শুনছিল। দাড়ি দস্তার পরিপাটি করে বেঁধে সে এখন দোকান রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত। খাবার টেবিলের দিকে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—আপনি কিন্তু ঠিক বললেন না জিজাজি। কিছু তো যায় আসে বটেই। টেররিস্টরা দুম করে প্রাইম মিনিস্টারকে মেরে দিল...কাজটা অন্যায়, কিন্তু তার ফল ভোগ করল কে? আমরা। আমজনতা। দুটো রুটির জন্য যারা সকাল থেকে সন্ধে খুন পাসিনা এক করে খাটি। দোকান জ্বালিয়ে দিল আমাদের, মহল্লা পুড়িয়ে দিল, বুড়ো বুড়ি জোয়ান বাচ্চাদের ধরে ধরে কাটল...এ কাজ ভি গন্দা, কিন্তু কারা কাটল জিজাজি? আমজনতাই তো? অর্থাৎ রাজনীতি আর আমজনতাকে আপনি আলাদা করে দেখতে পারেন না।

গুরবচন একটুক্ষণ চুপ। তারপর নরম চোখে তাকিয়েছেন শ্যালকের দিকে, —কথাটা তুমি রাগ করে বলছ রাজিন্দর। টেররিস্টরাও আমজনতা নয়, যারা তোমাদের মেরেছিল তারাও আমজনতা নয়। তারা সব ছিল গুণ্ডা লুঠেরা। নেতারা তাদের নাচিয়েছে নিজেদের ধান্দায়, তারাও নেচেছে আপনা মতলবে। আম আদমি কক্ষনও এই খুনোখুনি চায় না।

বিমলার শাক বাছা থেমে গেছে। পিটপিট চোখ ঘুরছে ছেলে আর জামাইয়ের মুখে। কিছু না বললে মানায় না বুঝি এই ভেবে কপালের বলিরেখা ভুরুতে জড়ো করে সুচিন্তিত মন্তব্য ছুড়লেন —কী তখন থেকে তোরা আম আম করছিস পুত্তর? এ কি আমের মরশুম? এখন হাজার ঢুঁড়লেও ভাল আম মিলবে না।

ইদানীং বিমলার কান দুটো একেবারেই গেছে।

ধর্মতলা থেকে মা'র জন্য বিদেশি হিয়ারিং এড কিনে এনেছে রাজিন্দর, সেটি সযত্নে বিমলার আলমারিতে তোলা থাকে।

হাসির ছররা বইছে ফ্ল্যাটে। গুরুগম্ভীর হয়ে আসা পরিবেশ নিমেষে হালকা।

গরম গরম মুলোর পরোটা ভেজে আনছে কোমল, রাখছে ক্যাসারোলে। ডাইনিং টেবিলে সাজানো রয়েছে আচার সস্ টকদই কলার ছড়া। রাজিন্দর খেতে বসে গেল। এই সময়েই পেট পুরে খেয়ে বেরোয় সে, দুপুরে টুকটাক এটা ওটা দিয়ে টিফিন সারে, ভারী খাবার আবার সেই রাত্রে। রোহিণীর গ্রন্থসাহিব পাঠ শেষ, তিনি রান্নাঘরে ঢুকে হাতে হাতে কোমলকে সাহায্য করছেন। ব্যালকনির খাটিয়ায় গুরবচনের নাস্তা এসে গেল।

কুলদীপও শিস দিতে দিতে বাথরুমে। কলেজের সময় হয়ে এল, স্নান সারছে। শাওয়ার থেকে ঝরছে জলধারা, কুলদীপের ঠোঁটও নড়ছে নিজের অজান্তে। প্রথমে প্রভুকে স্মরণ করল। এবার প্রার্থনা জানাচ্ছে একের পর এক গুরুর কাছে। গুরু নানক, গুরু অঙ্গদ, গুরু অমরদাস, গুরু রামদাস, গুরু অর্জনদেব, গুরু হরিগোবিন্দ...

জপ্জি সাহেব। সকালের প্রার্থনা।

এই অভ্যাসটা কুলদীপের একেবারে রক্তে মিশে গেছে।

কুলদীপদের কলেজটাকে সামনে থেকে দেখে তত বড় মনে হয় না, কিন্তু ভেতরে ঢুকলে চমকে যেতে হয়। চারতলা এই প্রাচীন বাড়িটায় কত যে ঘর! প্রায় প্রতিটি ঘরই প্রকাণ্ড, প্যাসেজগুলো চওড়া চওড়া, সামনে পিছনে সিঁড়ি। কলেজের মধ্যে ছোটখাটো এক অডিটোরিয়াম আছে, রয়েছে একটা ভীষণ চালু কম্পিউটার সেন্টার। সকাল দুপুর সন্ধ্যা, তিন শিফটে ক্লাস হয় কলেজে, এটি একটি মিনি

কারখানাও বলা যায়।

কলেজ বিল্ডিং-এর দোতলায় কুলদীপদের কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি। পিছন দিকের কোনায়, সিঁড়ির ধারে, দুটি অতিকায় রুম জুড়ে। তারই একটিতে কুলদীপদের প্র্যাকটিকাল চলছে আজ। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার খুব বেশি নয়, মোট জনা বারো। দুজন অধ্যাপকও আছেন, চেয়ারে বসে মুখ নামিয়ে কী যেন কথা বলছেন। মাঝে মাঝে তাঁদের চোখ ঘুরছে ছেলেমেয়েদের দিকে, পরমুহূর্তেই রহস্যালাপে ডুবে যাচ্ছেন তাঁরা।

কুলদীপ জানলার ধারে টুল টেনে বসল। হাতে ক্যালকুলেটার, ল্যাবরেটরির রাফ খাতা। ডাটা দেখছে মন দিয়ে, ক্যালকুলেটারের বোতাম টিপছে টক টক। দু-চার মিনিট মগ্ন থেকে থামল হঠাৎ, চোখ কুঁচকে বিড়বিড় করছে আপন মনে। আবার মাথা নামল, আবার ক্যালকুলেটারে আঙুল।

—দীপ, অ্যাই দীপ?

অয়নের গলা। নিজের কাজ শেষ, এখন ঘুরে ঘুরে ডিসটার্ব করছে বন্ধুদের!

কুলদীপ ঘাড় ওঠাল না —বলে ফ্যাল।

—ক্যান্টিন যাবি?

—এখন না। আগে রেজাল্ট নামাই।

—ছাড় তো। এসে নামাস।

—নারে, পিবি আজ আমায় খুব ঝেড়েছে। ফিজিকালে আমি অনেক পিছিয়ে আছি। নেক্সট উইকের মধ্যে অ্যাটলিস্ট আরও তিনটে এক্সপেরিমেন্ট করতেই হবে।

অয়ন কুলদীপের খাতা টেনে নিল। বিজ্ঞের মতো দেখছে—অ। সারফেস টেনশান? রেজাল্ট আসবে না, স্টেলাকোমিটারটায় গড়বড় আছে। কাপুরের বইটার পেছনে তো সারফেস টেনশনের পুরো টেবিল আছে, ভ্যালু দেখে নিয়ে ডাটা ম্যানুফ্যাকচার করে নে না।

—যাহ্, যত সব চিটিংবাজি প্ল্যান। ভাগ তো, আমার ঠিক রেজাল্ট আসবে।

কুলদীপ খাতা ফেরত নিয়ে ঘুরে বসল। ক্যান্টিনে সে যায় বটে, কিন্তু ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কখনই নয়। রাজিন্দর তাকে যতই আড্ডাবাজ বলুক, মূলত সে সিরিয়াস ধরনের ছেলে। ভাল ছাত্র বলে ক্লাসে তার সুনামও আছে। মাত্র সাত নম্বরের জন্য পার্ট ওয়ানে ফার্স্ট ক্লাস ফস্‌কে গেছে, পার্ট টুতে কুলদীপ সেটা মেকআপ করবেই। এর জন্য প্র্যাকটিকালেই বেশি জোর দিতে হবে, পার্ট টুতে প্র্যাকটিক্যালে প্রচুর নম্বর ওঠে। কুলদীপ সোজাসুজি পন্থায় বিশ্বাসী, অয়নের ব্যাক মেথড তার ঘোরতর অপছন্দ, চুরি জোচ্চুরি করে কিছু মিলিয়ে দেওয়াও তার স্বভাববিরুদ্ধ। পড়াশুনোর জন্য পরিশ্রম করাটাও যেন তার রক্তে মিশে গেছে।

কুলদীপের জীবনে অনেক সাধই পূর্ণ হয়নি। দিল্লি থেকে এসে এক অতি সাধারণ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, একটা বছর নষ্ট করে। তখন থেকেই স্বপ্ন ছিল হায়ার সেকেন্ডারিটা অন্তত কোনও নামী স্কুল থেকে করবে। হল না। মাধ্যমিকে স্টার ফস্‌কে গেল, তেমন কোনও ঘ্যামচ্যাক স্কুলে অ্যাডমিশনেও বসতে পারল না কুলদীপ। জেদ বেড়ে গেল, হায়ার সেকেন্ডারিতে খাটল খুব, যদি প্রেসিডেন্সিতে ঢোকা যায়। এবারও লেডি লাক বিট্রে করলেন, হায়ার সেকেন্ডারিতে কুলদীপ একাত্তর পারসেন্ট। দু-দু বার স্বপ্নভঙ্গ মন থেকে মানিয়ে নিয়েছে কুলদীপ, মেনে নিয়েছে মাঝারি কলেজটাকে। কিন্তু বি এসসিতে ফার্স্ট ক্লাস না পেলে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির দরজা তার জন্য খুলবে না, এবং ভবিষ্যতের ইতি। কুলদীপ জানে।

সেকেন্ড ইয়ারের দুটো ছেলে দরজা থেকে ডাকছে অয়নকে। তাদের সঙ্গে কথা বলে অয়ন ঘুরে এল। আবার কুলদীপকে খোঁচাচ্ছে —অ্যাই, তুই সাবস্ক্রিপশান দিয়েছিস?

—কীসের? কুলদীপ অন্যমনস্ক মুখে চোখ তুলল।

—রিইউনিয়নের। সেকেন্ড ইয়ারের ছেলেগুলো বার বার তাগাদা দিয়ে যাচ্ছে।.....দেবর্ষি দেয়নি, উর্মি দেয়নি, তুইও.....এ তো থার্ড ইয়ারের প্রেস্টিজের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে।

—উর্মি দেবে না। কুলদীপ কথাটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল—তোরা সুমনকে আনছিস না.....

—ইঁহ্, উর্মি যাকে চাইবে তাকেই বুঝি আনতে হবে? বলেই অদূরে কেমিক্যাল ব্যালান্সে ওজনরত

সালোয়ার কামিজের ওপর অ্যাপ্রন সহপাঠিনীকে ঝটিতি দেখে নিল অয়ন। আরেকটা টুল টেনে বসে গলা নামিয়েছে —বাজেটের একটা ব্যাপার নেই? শুনছিস তো এক্সস্টুডেন্টরা কেউ সেভাবে উপুড়হস্ত করছে না। সব সেজেগুজে আসবে, জ্ঞান মারবে, প্রোগ্রাম খাবার পছন্দ না হলে খিস্তি মেরে চলে যাবে।.....তাও তো দু তিনটে ভাল আর্টিস্ট আসছে। ফোক সঙ, রবীন্দ্রসঙ্গীত.....একজন শানুকণ্ঠীও আছে। বাবলু রায়। হেববি গায়, আটটা হ্যান্ড আছে। কোন কলেজে ডিপার্টমেন্টাল রিইউনিয়নে এর চেয়ে বেশি হয় রে?

—উফ্, তুই আমার কানের পোকা নাড়াচ্ছিস কেন, ঊর্মিদের গিয়ে বোঝা।

অয়ন কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল। মিনিট পনেরোর মধ্যে কুলদীপের ক্যালকুলেশান শেষ, পরের দিনের টাস্ক নিয়ে হেলে দুলে সে পৌঁছে গেছে ক্যান্টিনে। বসেছে দেবর্ষির পাশে।

জোর গুলতানি চলছে। কুলদীপ আঙুল নাচিয়ে চায়ের অর্ডার দিয়ে বলল —হল কী তোদের? এম পিদের মতো চেঁচাচ্ছিস কেন?

দেবর্ষি বলল, —দ্যাখ না, চাঁদা চাঁদা করে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে, এদিকে প্রোগ্রামের ডিটেল কিছু জানাচ্ছে না। আমরা শালা ম্যাক্সিমাম টাকা দেব, অথচ আমরাই সবথেকে বেশি ডার্কে!

—তোরা ফালতু ঝামেলা বাধাচ্ছিস। আমি তো বলেছি বাই মানডে তোদের সব জানিয়ে দেব।

—তুই জানানোর কে রে? গত বছর সি আর ছিলি বলে কি মাথা কিনে নিয়েছিস? ওরা আমাদের সব্বাইকে ডাকছে না কেন? পদে পদে কেন আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের মাতব্বরি মেনে চলতে হবে?

—ঠিকই তো। ওরা প্রোগ্রাম ফাইনালাইজ করে হাতে ধরিয়ে দেবে আর আমরা অমনি নাচতে ছুটব? আউটগোয়িং বলে কি আউটসাইডার হয়ে গেছি?

সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব। দাপুটে বর্তমানের সঙ্গে সদ্য-অতীতের। কুলদীপের মনে পড়ল গত বছর একটা সেমিনার করেছিল তারা। রাসায়নিক বোমা ও বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব। খুব জমকালো হয়েছিল অনুষ্ঠানটা, অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত অধ্যাপক এসেছিলেন। থার্ড ইয়ারের ছেলেরা সেমিনার বয়কট করেছিল, তাদের নাকি পাত্তা দেওয়া হয়নি।

সুকান্ত কড়া সুরে অয়নকে বলল—আমাদের নাটকের প্রোপোজালটার কী হল?

—হবে। কী করবি ঠিক কর।

—বলেছিলাম তো।

—ওফ্, তোর সেই চিকেন উইথ বার্লি স্যুপ? ওয়েস্কার না পেশকার কার লেখা? ছোট্টখাট্টো গুডিগুডি চেহারার হরিহরন্ যথারীতি তার তামিল ঢঙ-এ বাংলা বলছে —প্লিজ সুকান্ত, ওই আইডিয়াটা ড্রপ করে ফ্যাল। নাটকের নাম দেখেই আর্টসের মেয়েরা ঢিল ছুড়বে।

কাঁহাতক আর নিশ্চুপ থাকে কুলদীপ। কুটুস করে ফুট কাটল—ইংরিজি নাটক করে কায়দা করার দরকার কী? বাংলা কিছু কর।

সুকান্ত টেরচা চোখে তাকাল,—ই. জি.?

—ফর এগজাম্পল, টেগোরের কোনও পিস। একটা কি দুটো সিন..... ক্রিসমাসের আগের দিন প্রোগ্রাম, হাতে সময়ও বেশি নেই....

—বস্, তুমি একেবারে টেগোরে চলে গেলে! সুকান্ত ফটাস করে কুলদীপের পিঠে চাপড় দিল—টেগোরের নাটকের হ্যাপা জানো?

—কিচ্ছু হ্যাপা নেই। ছোটবেলায় পাড়ায় কত করেছি।

—তুমি করেছ?

—ইয়েস। ডাকঘর, নটীর পূজা....

—নটী কে হত রে দীপ?

পলকে হলোগ্রামে রিমঝিম। টানাটানা চোখ, ফোলা ফোলা গাল, টোপা টোপা ঠোঁট, মোমে মাজা মসৃণ বাদামি ত্বক। লালপাড় গরদের শাড়ি, কপালে চন্দন, মাথায় ঘোমটা.... শ্রীমতীর সাজে রিমঝিম যে কী অপরূপ!

কুলদীপ মৃদু হাসল—আরও নাটক করেছি। বিসর্জন।

—বিসর্জন? তুই কী রোল করেছিলি?

—আরে, ওর তো দুটো রোল বাঁধা। রঘুপতি, নয় জয়সিংহ। দেবর্ষি খুকখুক হাসল—রঘুপতি হলে দাড়িতে একটু সাদা লাগাতে হবে.....

—নারে। কুলদীপ লাজুক মুখে বলল—আমার তখন দাড়িই ওঠেনি। আমি নক্ষত্ররায় করেছিলাম।

—তোওওর দাড়ি ওঠেএএ নিইই! যাহ্। সুকান্তর স্বরে বিস্ময়ের ভান—আমার তো ধারণা জন্ম থেকেই তোর হাফ ইঞ্চি দাড়ি আছে। পবে গ্রোথ কার্ভটা হরাইজন্টাল হয়ে গেছে!

অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে গোটা টেবিল। নাটকের আলোচনা শিকেয়। প্রাণপণ চেষ্টায় বন্ধুদের প্রসঙ্গে ফেরাল কুলদীপ। মোটামুটি স্থির হল বিসর্জন থেকে তিনটে সিন্ হবে। শেষ দৃশ্য তো বটেই। কে কী রোল করবে সেটা ঠিক হবে এম আরের সঙ্গে কথা বলে। অপর্ণা করার জন্য ঊর্মি বা মধুছন্দাকে বলা হবে। ঊর্মি রাজি হবে বলে মনে হয় না, কপালে বোধহয় একটা মোটা অপর্ণাই নাচছে। রিহার্সাল শুরু হবে সোমবার।

তিনটে কুড়ি। কলেজ প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে, জটলা সব এখন রাস্তার রেলিং-এ। পাশেই একটা ছোট পার্ক, সেখানে দুলে বেড়াচ্ছে অঘ্রানের রোদ্দুর।

কুলদীপ সুকান্তর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কলেজ থেকে বেরিয়ে এল। বাসস্টপে এসে সুকান্ত বলল—এখন বাড়ি ফিরছিস?

—কেন?

—চল না একটু রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরিতে যাই। একটা বই চেঞ্জ করতে হবে।

কপালে ভাঁজ ফেলে কুলদীপ ভাবল একটুক্ষণ। গেলে হয়। গত সপ্তাহে গোলপার্ক লাইব্রেরিতে বসে কোয়ানটাম্ কেমিস্ট্রির একটা নোট তৈরি করছিল, অর্ধসমাপ্ত হয়ে আছে। ঘণ্টা দুয়েক লাগবে আরও। গিয়ে শেষ করে ফেলবে?

পরক্ষণে মত বদলেছে —নারে, বাড়িতে গেস্ট আছে। জলদি জলদি না ফিরলে মা খচে বোম হয়ে যাবে।

—যা তা হলে। সুকান্ত রাস্তা টপকে উলটো ফুটপাথে চলে গেল।

বাসে উঠে কুলদীপ আবার মত বদলাল। ধুস, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে বলে কি এই চারটের সময়ে.....? গিয়ে বুড়ো বুড়ির সঙ্গে কী কচর কচর করবে কুলদীপ? ফুফফরজি লোক মন্দ নয়, কিন্তু অত ভাল মানুষের সঙ্গে গল্প জমে না। সন্ধেবেলা মামাজি মামিজি একডালিয়া থেকে পল্টন নিয়ে হাজির হবে, তার আগে বাড়িতে ঢুকে গেলেই যথেষ্ট। তা হলে এখন কী করা যায়? বাস থেকে নেমে পড়বে, চলে যাবে গোলপার্কে? সুকান্তটা ভীষণ অবাক হয়ে যাবে।

প্রফুল্ল মুখে গেটের দিকে এগোল কুলদীপ, আবার মত বদলে গেল। উঁহু, বকুল বাগানের গ্যারেজটায় একবার ঢুঁ মারা দরকার। স্কুটারটা পড়ে আছে তো পড়েই আছে, গিয়ে তাড়া না লাগালে ছোটেলাল কাজ শেষ করবে না। গিয়ারের সামান্য কাজ আর বডি রং, তাতেই কুড়ি দিন কাটিয়ে দিল। পাপা রোজ খ্যাচ খ্যাচ করছে, স্কুটার সারাতে দিয়ে আর তো কোনও খোঁজখবরই করছিস না! তোকে না দিয়ে ওটা বেচে দিলেই ভাল হত। পাপা আরও তেতে যাওয়ার আগে স্কুটারটা তাগাদা দিয়ে নিয়ে আসাই শ্রেয়।

এ ভাবনাটাও স্থায়ী হল না। জানলার বাইরে চোখ পড়েছে কুলদীপের। মনটা দুলে গেল। বাইরে এক মায়াবী বিকেল ফুটছে, শুকনো বাতাসে অল্প শিরশিরে ভাব। হলুদ আলো মেখে সেজে উঠেছে শহর। এ সময়ে কি গ্যারেজে গিয়ে বসে থাকবে কুলদীপ?

হৃৎপিণ্ডে অন্য এক ধ্বনি উঠছে কুলদীপের। রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম।

তিন

—রানা আছে মাসিমা?

—না তো রে।

—কলেজ থেকে ফেরেনি?

—এত তাড়াতাড়ি ফেরে নাকি? কলেজ থেকে কম্পিউটার ক্লাসে যায় না? আসতে আসতে তো সেই সন্ধে।

—ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। খেয়াল ছিল না।

কুলদীপ অপ্রতিভভাব ফোটাল মুখে। ভাব নয়, ভান। রানা যাদবপুরে ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, থার্ড ইয়ার, গত বছরই একটা কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হয়েছে, সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছটা ক্লাস—কিছুই কুলদীপের অজানা থাকার নয়। স্কুলজীবনের সহপাঠী বাড়ী থেকে মাত্র একশো গজ দূরের এই বন্ধুর সঙ্গে এখন আর রোজ আড্ডা মারা হয় না বটে, তবে সাত-দশ দিনে তো দেখা হয়ই। রানা কী কী মডিউল করছে তাও কুলদীপের মুখস্থ। কিন্তু এটুকু নাটক তাকে করতেই হয়। অন্তত এই অসময়ে এসে পড়লে।

ভান ভণিতা অবশ্য কুলদীপের রক্তে নেই, এটা সে পরিপার্শ্ব থেকে পেয়েছে। বুঝি বা বাঙালিদের সঙ্গগুণে। সেই ন বছর বয়স থেকে পাড়ায় স্কুলে কলেজে সর্বত্র সে বাঙালিদের সঙ্গে মিশছে, কিছু কিছু স্বভাব তো তার ওপর বর্তাবেই। কলকাতায় এসে খালসা স্কুলে ভর্তি হলে হয়তো এরকমটা হত না। কিন্তু রাজিন্দর যে শুধু তাকে নিছক পাঞ্জাবি হিসেবে বড় করতে চায়নি।

কুলদীপ উলটো মুখে ফেরার ভঙ্গি করে বলল,—তা হলে চলি মাসিমা। রানাকে বলবেন আমি এসেছিলাম।

—ওমা, সেকী কথা! চলে যাবি কেন, আয়। তপতী দরজা ছেড়ে দাঁড়াল, —বন্ধু না থাকলে বুঝি মাসির সঙ্গে দু দণ্ড গল্প করতে ইচ্ছে করে না?

এই আহ্বানটুকুরই প্রত্যাশায় ছিল কুলদীপ। ফিক করে হেসে বলল, —এক গ্লাস জল খাব।

এ বাড়ির ড্রয়িংরুমটা ছোট্ট। তবে নিখুঁত সাজানো। বেতের সোফা, কাচের সেন্টার টেবিল, দু কোনায় দুটো বাহারি স্ট্যান্ডল্যাম্প, দেওয়ালে খোপ খোপ শৌখিন কাঠের র‍্যাক, প্রতিটি র‍্যাকে একটা দুটো করে চিনেমাটির পুতুল, জানলায় জানলায় মিনেকরা পেতলের ফুলদানি, দু ধারে কাচের আলমারিতে বই আর বই, নাতিউচ্চ ক্যাবিনেটে টিভি আর ইনডোর প্ল্যান্ট, দরজা জানলায় জংলাছোপ পর্দা, বৃত্তাকার মিনি কার্পেট—দেখে মনে হয় শুধু এই ঘরের জন্যই বুঝি এ সব জিনিসগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। মেঝে দেওয়াল জানলা আসবাব কোথাও এতটুকু ধুলো নেই, মালিন্য নেই। চারদিক চাপা আলো কম ঘরটা নিজের জ্যোতিতেই উজ্জ্বল।

সন্তর্পণে সোফায় বসতে বসতে ছোট্ট একটা প্রশংসাসূচক ধ্বনি বেরিয়ে এল কুলদীপের গলা থেকে। যেদিনই আসে সেদিনই বেরোয়, সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকে। তাদের চারতলার ফ্ল্যাট রানাদের এই শরিকি গৃহের অংশটুকুর তুলনায় যথেষ্ট বড়, আলো বাতাসও অনেক বেশি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সোফা আছে তাদের, আছে দামি দামি আসবাব, টিভি ভি সি আর টেপডেক সবই মহার্ঘ, কিন্তু কোনও কিছুই এমন সাজানো গোছানো টিপটপ নয়। কখনও ড্রয়িংস্পেসের মেঝেয় সব্‌জি গড়ায়, কখনও সোফায় কাপড়ের ডাঁই। যখন তখন নেয়ারের খাটিয়া এখান সেখানে পাতা পড়ে থাকে, টেলিফোনের টেবিলে দাদিজির চুলের কালো দড়ি তো সারা দিন কুণ্ডলী পাকিয়ে ... এ এদিক দিয়ে যাচ্ছে, ও ওদিকে বসছে, কেউ ভুলেও তাকিয়ে দেখে না। কুলদীপ নিজেই বা কী? ঘেমো শার্টটা পর্যন্ত ফেলে রাখে খাটের বাজুতে, জন্মে কখনও স্বহস্তে ওয়ার্ড্রোবে তুলেছে?

কুলদীপ এই নিয়ে একশো সাইত্রিশতম বার শাসন করল নিজেকে। নাহ্, নিজেকে বদলে ফেলতে হবে। আজ থেকেই।

জল আসতেই এক চুমুকে গ্লাস শেষ।

তপতী জিজ্ঞাসা করল, —তোর খুব তেষ্টা পেয়েছে মনে হচ্ছে? আর খাবি?

—নাহ্।

—তা হলে বোস, চা করে আনি।

—থাক না।

তপতী মুচকি হাসল,—ভয় নেই, তোকে আমাদের লিকার খেতে হবে না। তোর জন্য আমি বেশি করে দুধ দিয়ে করে আনছি।

কুলদীপ এবার সত্যি সত্যি অপ্রতিভ হল,—না না মাসিমা, আমার আজকাল লিকার চা খেতে খারাপ লাগে না।

—সত্যি বলছিস?

—সত্যি।

তপতী ভেতরে যেতেই কান খাড়া করল কুলদীপ। বাড়িটা অস্বাভাবিক রকমের নিস্তব্ধ। কেউ কি নেই? পা টিপে টিপে বাঁ দিকের ঘরের দরজায় গেল। চোরের মতো পর্দা সরিয়েছে। শুনশান। টেবিল আছে, চেয়ার আছে, খাট আছে, আলনা আছে, বাতাসে বুঝি সুগন্ধও আছে, কিন্তু রিমঝিম নেই। মুহূর্তের জন্য কুলদীপের ইচ্ছে হল ছুট্টে গিয়ে রিমঝিমের পড়ার টেবিলটাকে ঘাঁটে একটু। মাসিমা দেখে ফেললে কিছু মনে করবে? এ বাড়িতে কুলদীপের অবারিত দ্বার, রান্নাঘর অন্দরমহল সর্বত্র। স্বচ্ছন্দে বলে দিতে পারে, একটা গল্পের বই খুঁজছি মাসিমা!

না, চুরি করে কিছু করা কুলদীপের ধাতে নেই। সোফায় ফিরে এল কুলদীপ। সেন্টার টেবিলের তলায় রাখা বাংলা কাগজটা তুলে নিয়েছে। স্কুলে হিন্দি তার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল, তবে বাংলা সে অল্পস্বল্প পড়তে পারে। বানান করে করে। কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে। যুক্তাক্ষর এলেই সব দম শেষ। আলগা চোখে প্রথম পাতায় সকালের খবরটাকে খুঁজল কুলদীপ, পেল না। দেয়নি বোধহয়।

তপতী চা এনেছে, সঙ্গে একটা স্টিলের বাটি। টেবিলে ট্রে নামিয়ে বলল —দ্যাখ তো, নতুন গুড়ের পায়েসটা কেমন হয়েছে!

কুলদীপ বাটিটা নাকের কাছে এনে শুঁকল—ফ্যান্টাসটিক ফ্লেবার তো।

—তোর মেসোমশাইয়ের এক ছাত্র বসিরহাট থেকে পাটালি দিয়ে গিয়েছিল।

—উমম্, দারুণ হয়েছে। চামচ জিভে ছোঁয়াল কুলদীপ—মেসোমশাইয়ের কি আজ ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস?

—না রে, সেনেটের মিটিং আছে। তোর মেসোমশাই তো এ বছর ডিন হল, এখন এ সব মিটিং-টিটিং অ্যাটেন্ড করতে হয়।

কুলদীপ ঘাড় দোলাল আপন মনে। রানার বাবার ওপর তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। কী পণ্ডিত মানুষ তিনি, অথচ কী বিনয়ী। রজতেন্দ্র সান্যালকে সে কখনও হাতে বই ছাড়া দেখেনি। বাচনভঙ্গিও ভারী শান্ত, কখনও উঁচু স্বরে কথা বলেন না। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোলে এ বাড়িতে ছাত্রছাত্রীর ভিড় লেগে যায়। ঢিপঢিপ প্রণাম চলছে তো চলছেই। এই সম্মানের কাছে অন্য সব পেশা তো নস্যি। রজতেন্দ্র কুলদীপের আইডল। প্রেরণা। বহু দিন আগেই কুলদীপ মনে মনে ঠিক করে রেখেছে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবে। অবশ্য রজতেন্দ্রর মতো দর্শনের নয়, পিওর কেমিস্ট্রির।

পায়েসের বাটি চেটেপুটে শেষ করে ফেলেছে কুলদীপ। তপতী জিজ্ঞাসা করল, —আর একটু দেব?

—না। ভাল জিনিস অল্পই ভাল। বেশি মিষ্টি খেলে আবার মুখ মরে যাবে।

—নোন্‌তা কিছু খাবি? ঝিঙেপোস্ত করেছি আজ।

কুলদীপ লোভে পড়ে গেল। পোস্ত তার খুব প্রিয়। আলুপোস্ত ঝিঙেপোস্ত পটলপোস্ত কপিপোস্ত সব এ বাড়িতে এসেই খেতে শিখেছে। তপতীর হাতের কই মাছের পাতুরি আর ভাপা ইলিশও তার ভারী পছন্দের। রান্নার পদ্ধতিটা জেনে নিয়ে বাড়িতে দু-এক বার করতে বলেছিল কোমলকে, তেমন জুতের হয়নি। রশ্‌মি অবশ্য আজকাল খড়্গপুরে গিয়ে অনেক রকম বাঙালি রান্না শিখেছে, কুলদীপ গেলেই টুকটাক করে খাওয়ায়।

লজ্জা লজ্জা মুখে কুলদীপ বলল —সামান্য একটু দিন। টেস্ট করি।

ঝনঝন বেল বেজে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে কুলদীপের পেশি টান টান। প্রাণপণে অন্যমনস্ক করা চোখ ঘুরছে কাচের আলমারিতে, মন ছুটে গেল দরজায়।

রিমঝিম নয়। রিমঝিমের ছোট বোন ঝিলিক। স্কুল থেকে ফিরল। ক্লাস নাইনের মেয়ে, বেণী দুলিয়ে মাথা দুলিয়ে কথা বলে টকটক।

কাঁধের ব্যাগ টেবিলে রেখে ঝুপুস করে বসল ঝিলিক —ওমা দীপদা, তুমি যে! কী সুইট! আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

তার কথা ভাবায় কী মিষ্টত্ব থাকতে পারে বুঝতে পারল না কুলদীপ। ভুরু নাচিয়ে বলল —কেন?

কেন? কেন? অঙ্ক পারছিস না বুঝি?

—উঁহু। গেস। তোমাকে আমার খুউব দরকার।

—কেমিস্ট্রি অ্যাডিশনাল নিয়েছিস, তাই?

—তুৎ। তার জন্য তো তোমায় ক্লাস টেনে ধরব। নেক্সট গেস?

কুলদীপ ঘাড় চুলকোল। মেয়েদের কখন কাকে কী জন্য প্রয়োজন তা অনুমান করা ঈশ্বরেরও অসাধ্য। একবার ভরা বর্ষার বিকেলে রানার সন্ধানে এসে দেখে বাড়িতে কেউ নেই, শুধু রিমঝিম ছাড়া। কুলদীপকে পেয়েই রিমঝিমের কী উচ্ছ্বাস, প্রায় হাত জড়িয়ে ধরে আর কী! দীপদা, তুমি এসেছ! আজ এই মুহূর্তে তোমাকে দেখে আমার কী ভাল যে লাগছে! হাজার বছর আগেকার উদ্দাম বুনো রক্ত ফিনকি দিয়ে উঠেছিল কুলদীপের শিরায়। রিমঝিম হাসিতে জাদু মাখিয়ে বলেছিল, তুমি কাইন্ডলি আমাদের বাড়িতে একটু বসবে দীপদা? বাবার এক ছাত্রর আসার কথা আছে, তাকে এই বইখানা দিয়ে দিয়ো। আমি এক্ষুনি আসছি। বলেই উবে গেল রিমঝিম। সারা বিকেল, সারা সন্ধে, ভূতের মতো একা বসে আছে কুলদীপ। বসেই আছে। রানাদের টিভি-টা পর্যন্ত সেদিন খারাপ ছিল। শেষে রানা ফিরল সাড়ে সাতটা নাগাদ। কুলদীপের হালত দেখে তার কী হাসি! রিমঝিম তোকে টুপি দিয়ে বেরিয়ে গেল! ও তো আজ মাসির বাড়ি গেছে, রাতে ফিরবে না!

কুলদীপ কড়া চোখে ঝিলিকের দিকে তাকাল—গেস-টেস আমি করতে পারব না। বলতে হয় বল, নইলে কাট।

—বলছি বলছি বলছি। গলা খাঁকারি দিল ঝিলিক—তুমি আমায় একটু ভাংরা শিখিয়ে দেবে?

—কীই?

—ভাংরা। তোমাদের নাচ। আঁহু আঁহু, আঁহু আঁহু...বল্লে বল্লে বল্লে বল্লে বল্লেহ...

—হঠাৎ?

—এক্সমাসের ছুটির পর স্কুল খুললেই আমাদের স্পোর্টস। সঙ্গে গো অ্যাজ ইউ লাইক। আমি সর্দার সাজব। ভাংরা ছাড়া সর্দার সাজাটা কি অথেনটিক হবে দীপদা?

কুলদীপ হো হো হেসে উঠল। সে নিজে ভাংরা প্রায় পারেই না। রশ্‌মির বিয়ের সময়ে তার নাচ জিজাজির বাড়ির লোকের কাছে বেশ একটা মজার খোরাক হয়েছিল। আরে, এ মুন্‌ডিয়া তো বাঙালিদের দুর্গাপুজোর ভাসানের নাচ নাচছে! রানা তো রশ্‌মির বিয়ের দিন সারাক্ষণই ছিল, সে কি এসে কাহিনীটা শোনায়নি এদের?

কুলদীপ হাসি থামিয়ে বলল,—ভাংরার স্টেপিং খুব কঠিন। তুই পারবি না।

—তুমি দেখিয়ে দাও না। ঝিলিক উৎসাহে ফুটছে।

— কেন জ্বালাচ্ছিস? কুলদীপ সোফায় হেলান দিল—দুটো কাঁধের একসঙ্গে মুভমেন্ট করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে পায়ের।

—মুখে বললে হবে? ডেমনস্ট্রেট করো।

তপতী কাচের প্লেটে ঝিঙেপোস্ত গরম করে এনেছে। মেয়েকে আলগা ধমক দিল—স্কুল থেকে ফিরেই কী ধ্যাং ধ্যাধ্যাং শুরু হয়েছে? ছেলেটাকে একটু শান্তিতে খেতে দাও। যাও, ইউনিফর্ম ছাড়ো।

মুখে বিচিত্র ভঙ্গি করে, স্কুলব্যাগ লোফালুফি করতে করতে সামনের ঘরে চলে গেল ঝিলিক।

তপতী মেয়ের ধামসে দেওয়া সোফার কভার দুরস্ত করছে। বলল —হ্যাঁরে, তোদের বাড়িতে কাদের যেন আসার কথা ছিল, এসেছেন?

—পিসি পিসেমশাই? কাল এসেছেন।

—পিসি তোর বাবার থেকে বড়, না?

—অনেক বড়। পিসেমশাই তো পঁচাত্তর।

—প্রায় তোর দাদির বয়সি, বল?

—দাদিজি এইট্টিফাইভ। মানে আর চারটে চার মারলেই একশো।

—যাই বল, এখনও কিন্তু বেশ ফিট আছেন। রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে হাঁটেন তো, দেখি। এখনও কী গায়ের রং! বয়সকালে খুব সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়।

—আমি দাদিজির বয়সকাল থোড়াই দেখেছি!... তবে হ্যাঁ, আমার পিসি সুন্দরী ছিলেন। হাইট দাদিজির থেকে শর্ট, কিন্তু...

—থাকবেন কদিন?

—এ মাসের ছাব্বিশ তারিখে গুরু গোবিন্দ সিং-এর জন্মদিন আছে, ওই পরবের পর...ঝিঙেপোস্তটা আজ একটু মিষ্টি হয়ে গেছে মাসিমা।

—আর বলিস না, ডাক্তার তোর মেসোমশাইকে ঝাল খেতে বারণ করেছে, এখন সব কিছুই তাই মিষ্টি মিষ্টি চাই। যখন সুগার হবে, টের পাবে।

আরও দুটো-চারটে কথা বলে উঠে পড়ল কুলদীপ। ঝিলিক নতুন উদ্যমে আক্রমণ শানানোর আগেই। ধুর, পুরো বিকেল আজ বেকার হয়ে গেল। বকুলবাগানের গ্যারেজে বসে থাকলেই বরং কাজ হত।

পথে নেমে বাড়ির দিকে বেঁকেছে কুলদীপ, সহসা হৃৎপিণ্ড ছলাৎ। কে আসে ওই পিচরাস্তা মাড়িয়ে? পরনে চিত্রবিচিত্র লঙ স্কার্ট, ঢোলা টিশার্ট, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ? কার হাঁটার ছন্দে তিরতির নেচে উঠল বাতাস?

কুলদীপ চলচ্ছক্তিরহিত। রিমঝিমকে দেখে কেন এত বিবশ হয়ে যায় সে? এমন তো হওয়ার কথা নয়! রানার বোন, সেই কোন ছোট থেকে দেখছে...! কবে থেকে হৃদয়ের শব্দ বদলে গেল?

গত বছর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার আগে রিমঝিমকে অঙ্ক আর কেমিস্ট্রি দেখাতে যেত কুলদীপ। রিমঝিমেরই অনুরোধে। দাদার কাছে সে কিছুতেই অঙ্ক করবে না। রানার ধৈর্য বড় কম, বোনকে এক বারের জায়গায় দু বার বোঝাতে হলেই তার মাথা আগুন হয়ে যায়। সেই সময়েই বুঝি অনুভূতিটা প্রথম আবিষ্কার করে কুলদীপ। কী যেন এক অদ্ভুত চৌম্বকশক্তি আহরণ করে ফেলেছে রিমঝিম। যে সব বিকেলে রিমঝিমকে পড়ানো থাকে না, সূর্য সেদিন বড় নিস্তেজ হয়ে যায়। পৃথিবী ধূসর, আকাশ বর্ণহীন। যেদিন পড়ানো থাকে সেদিন যেন আরও বেশি কষ্ট। রিমঝিমকে না দেখলে মন খারাপ হয়, দেখলে আরও বেশি মন খারাপ।

...কেন রে কুলদীপ, কেন এমন হয়...

জাদুকরি সামনে। দু হাতের মধ্যে। ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা থোকা থোকা চুল দুলে উঠল—কী দীপদা, রাস্তার মাঝখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ যে?

—এমনিই। কলেজ থেকে ফিরছ?

—উহুঁ, নন্দনে একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।

—একা?

—একা কেউ সিনেমা দেখতে যায়? রিমঝিম ঝিরঝির হয়ে গেল —বন্ধুরা ছিল।

কুলদীপ আর কথা খুঁজে পেল না। এ সময়ে কেন যে কিছু বলার মতো কথা মনে পড়ে না? নাকি কথা এত বেশি থাকে যে শব্দরা অপ্রতুল হয়ে যায়?

রিমঝিম মিটিমিটি হাসছে,—বাড়ি ফিরছ নাকি এখন? এত তাড়াতাড়ি?

কুলদীপ কাঁধ ঝাঁকাল।

—আমাদের বাড়ি যাবে? চলো না।

কুলদীপ বেমালুম বলতে ভুলে গেল, সে এতক্ষণ ওই বাড়িতেই ছিল। দ্রুত মাথা নেড়ে বলল, —না, বাড়িই যাই।

—এর মধ্যে আসছ?

—কেন?

—এমনিই। যেমন এমনিই রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছ, ঠিক তেমনি। কিছু বুঝলে সর্দারজি?...সরে দাঁড়াও, ঠেলা চাপা পড়বে।

রিমঝিম কুলদীপকে পার হয়ে চলে গেল।

রিমঝিমের কথায় কি গূঢ় ইঙ্গিত ছিল? প্রচ্ছন্ন কোনও গভীর আমন্ত্রণ? নাকি আজকাল এভাবেই কথা বলে রিমঝিম?

ভাবতে ভাবতে ঘোর লাগা মাতালের মতো হাঁটছে কুলদীপ। ফাঁকা চোখ ঘুরছে পথে, ফুটপাথে। বাড়ির গেটে এসে থমকাল সামান্য। উলটোদিকের চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে তিন-চার জন লোক বসে। এক জনের সঙ্গে চোখাচোখি হল কুলদীপের, লোকটা মুখ ফিরিয়ে নিল।

চেনা চেনা! কোথায় যেন দেখেছে কুলদীপ! কোথায়?

কুলদীপ মনে করতে পারল না।

চার

দুপুরের দিকে এ সময়টা ডেকোরিনায় একাই থাকে রাজিন্দর। গাড়ির ফিটিংসের কাজ বেশির ভাগই হয় দুপুরে, একাই সামলায়। তার পার্টনার সমর চ্যাটার্জি বারোটা নাগাদ বেরিয়ে যায়, ফেরে সেই বিকেলে। সমর কথাবার্তায় খুব দড়— যাকে বলে কথা বেচে খাওয়া মানুষ। তার কাজ বিল জমা দেওয়া, পেমেন্ট আনা, ব্যাঙ্ক, চাঁদনি চকের স্টকিস্টদের ঘরে যাতায়াত, নতুন অর্ডারের ধান্দা করা, নিদেনপক্ষে পুরনো যোগাযোগগুলো ছুঁয়ে আসা। এই সব কাজে সমরের দক্ষতা অবশ্যই প্রশ্নাতীত।

ডেকোরিনা দোকানটা বেকবাগান মোড়ের কাছেই, চওড়া এক গলিতে ঢুকে দুটো মাত্র বাড়ির পর। সাইজে তেমন বড় নয়, দশ বাই দশ, তবে ভারী সাজানো গোছানো। কোণে টেরচা কাউন্টার, ওপারে দুখানা গদি আঁটা সুদৃশ্য চেয়ার, এপারে কুশন লাগানো গোটা চারেক শৌখিন টুল, তিন দেওয়াল জুড়ে টানা শোকেস, মেঝেয় পুরু কার্পেট। মাথার ওপর অ্যান্টিরুমও তৈরি করে নেওয়া হয়েছে, অ্যালুমিনিয়ামের মই বেয়ে এই বয়সেও সেখানে তরতর ওঠানামা করে রাজিন্দর। বছর চারেক আগে এসিও বসেছে দোকানে। এতে ক্লায়েন্টের কাছে সম্ভ্রম বাড়ে, বেশি দরাদরির প্রবণতাটাও কমে যায়। এ অঞ্চলে এমন দোকান আরও কয়েকটা আছে, তবে রাজিন্দরদের ডেকোরিনাই এখন সবচেয়ে চালু।

কলকাতায় এসে প্রথমে একটা স্পেয়ার পার্টস-এর দোকান দিয়েছিল রাজিন্দর, শ্যালক পরমিন্দরের পরামর্শে। রাজিন্দরের বহু আগে দিল্লি ছেড়েছে পরমিন্দর। একাত্তরের যুদ্ধে পরমিন্দরের বাবা মারা গেলেন, রাজিন্দর-কোমলের বিয়ে হওয়ার বছর তিনেক পর। তার পরই নিঃসন্তান জ্যাঠার ব্যবসা সামলাতে কলকাতা পাড়ি দিয়েছিল পরমিন্দর। কলকাতাতেই তার মা মারা গেছেন, কলকাতাতেই বিয়ে হয়েছে পরমিন্দরের, এখানে তার বিস্তর জানাশুনা। বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে স্পেয়ার পার্টসের ব্যবসার বন্দোবস্তটা সেই করে দিয়েছিল রাজিন্দরকে। প্রথম প্রথম রাজিন্দার তো খুব খুশি। সে গাড়ির যন্ত্রাংশের হাড়হদ্দ চেনে, দিল্লিতেও তার একই ব্যবসা ছিল, ভাবছিল কমাসেই তুড়ি মেরে কারবার জমিয়ে ফেলবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক তো হয় আর এক। এমনিতেই দিল্লির তুলনায় কলকাতায় গাড়ির সংখ্যা কম, তায় প্রতিযোগিতার বাজার, টিমটিম করে চলছে ব্যবসা, ক্রমশ মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিল রাজিন্দরের। বছর দুয়েক পর রাজিন্দর রীতিমতো ভাবনায় পড়ে গেল। দিল্লি থেকে সে কিছু কোটি কোটি টাকা সঙ্গে আনেনি, সেখানকার অ্যাপার্টমেন্ট বেচা পয়সায় প্রথমেই এখানে একটা ফ্ল্যাট কিনে ফেলেছে, ছেলে-মেয়ের পড়াশুনো চলছে, সেও বেশ খরচসাপেক্ষ ব্যাপার, কদিন পর রশ্মির বিয়ে দিতে হবে তার জন্যও কিছু সঞ্চয় চাই, মা বউ ছেলে মেয়ের অভ্যস্ত স্বাচ্ছন্দ্যও বজায় রাখতে হবে...! মনে তখন রাজিন্দরের অনেক এলোমেলো দ্বন্দ্ব। দিল্লির পাট চুকিয়ে আসাটা কি মুর্খামি হয়ে গেল? পরমিন্দর পই পই করে বলেছিল, নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে আপনার কিন্তু অসুবিধে হবে জিজাজি, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে তবে মনস্থির করুন —পরমিন্দরের কথাই কি শোনা উচিত ছিল? কলকাতা না এসে অন্য কোথাও কি যেতে পারত রাজিন্দর? মুম্বাইতে রাজিন্দরের কাকার ছেলে আছে, সেখানে গেলেই কি সুবিধে হত? কলকাতা মুম্বাইতে দিল্লির মতো অত খুনোখুনি হয়নি, শুধু এই কারণেই কি দিল্লি ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে। তাদের বেরাদরির কত জন তো ওই দাঙ্গার পরেও টিকে গেল দিল্লিতে, দিব্যি ভাল আছে তারা, রাজিন্দারও কি সেখানে আরেক বার নতুন করে শুরু করতে পারত না! ফিরে যাবে রাজিন্দার? কান মলে? নাকখত দিয়ে?

এমনই এক সংকটকালে সমর চ্যাটার্জির সঙ্গে রাজিন্দরের পরিচয়। একটু আকস্মিকভাবেই। এক থমথমে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে রাজিন্দরের দোকানের সামনে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল সমর। লো প্রেশার।

রাজিন্দর তাকে তুলে এনেছিল দোকানে, সেবা শুশ্রূষায় চাঙা করে তুলেছিল। তার পর থেকে মাঝেমাঝেই রাজিন্দরের কাছে আসত সমর, এটা সেটা গল্পগুজব করত, বছর কয়েকের ছোট মানুষটার সঙ্গে ক্রমে বন্ধুত্ব জমে গেল রাজিন্দরের। সমর তখন করে অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ। অফিসে অফিসে স্টেশনারি জোগান দেয়। রোজগার মোটামুটি ভালই, তবে বড্ড খাটুনি। সমরই একদিন ঠাট্টার ছলে নতুন ব্যবসার প্রস্তাবটা পাড়ল। সিংজি, লোকের হাতে এখন প্রচুর কাঁচা পয়সা, শখ-শৌখিনতা বাড়ছে, নতুন নতুন গাড়িও আসছে মার্কেটে, কেনার জন্য হামলে পড়ছে মানুষ, এই সময়ে এই ধান্দাটাই খাবে ভাল! রাজিন্দর শুরুতে বড় একটা আমল দেয়নি। প্রথমত, নতুন কোনও কারবারে যাওয়ার ব্যাপারে রাজিন্দরের প্রবল অনীহা। দ্বিতীয়ত, সমর চ্যাটার্জি এ লাইনের লোকই নয়, তার পরামর্শ কেন সে শুনতে যাবে! তা ছাড়া ব্যবসাটা সম্পর্কে তার তো তেমন স্পষ্ট ধারণাই নেই! কিন্তু কদিন বাজার ঘুরে দেখল সমরের কথায় সারবত্তা আছে। সত্যিই টাকা উড়ছে। তখনও কলকাতায় এ লাইনে দোকান কম, যে কটা আছে লালে লাল হয়ে যাচ্ছে।

ব্যস্, মরিয়া হয়ে সিদ্ধান্ত। টাকা ঢালবে রাজিন্দর, গাড়ির কাজকর্মের দায়িত্ব তার, সমর শুধু বিজনেস আনবে। শেয়ার ফিফটি ফিফটি।

এক দেওয়ালির দিন নয়া বিজনেস শুরু হয়ে গেল।

প্রথম কমাস কান্না পাওয়ার দশা, দিনভর মাছি তাড়াচ্ছে। পনেরো দিনে হয়তো একজন টেপ লাগাতে এল, ছুটকো ছাটকা কোনও পার্টি এসে কার পারফিউম কিনে নিয়ে গেল, ব্যস্। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমূল বদলে গেল চিত্রটা। গাড়ির পর গাড়ি আসছে, লাইন লেগে গেছে গলিতে। রাজিন্দরের মনে আছে, প্রথম বছরেই তেতাল্লিশখানা গাড়িতে এসি মেশিন বসিয়েছিল। সবই সমরের ধরে আনা কাজ। তার পর থেকে আর দোকানের সামনের ফুটপাথ বিশেষ ফাঁকা পড়ে থাকে না।

বালিগঞ্জ ফাঁড়ির দোকান আরও বছর দুই-আড়াই ধরে রেখেছিল রাজিন্দর। লোক দিয়ে চালাত। তারপর একদিন তুলেই দিল।

আজ দশ বছর পর রাজিন্দরের মনে হয় সেদিন সমরের সানস্ট্রোকটা ছিল তার জন্য প্রভুর আশীর্বাদ। রশ্মির বিয়ে দিয়েছে সে ঘটা করে, প্রায় পাঁচ লাখ খরচ হয়েছে। এই ডেকোরিনার কল্যাণে। প্রভুর কৃপা থাকলে, কুলদীপ যদি চায়, তাকে বিদেশে পড়তে পাঠাবে। এই ডেকোরিনার কল্যাণে। কোমলের এক জাঠতুতো দাদা এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির প্রফেসার, তাই নিয়ে কোমলের বড় দেমাক। কুলদীপ মামার মুখে ঝামা ঘষে দেবে। এই ডেকোরিনার কল্যাণে।

আজ বাইরে দুটো গাড়ির কাজ চলছে। একটা সিয়েলো গাড়িতে ফিল্ম লাগাচ্ছে নন্দ, একটা অ্যাম্বাসাডারের ড্যাশবোর্ড বদলাচ্ছে মাধাই।

রাজিন্দর স্টক মেলাচ্ছিল। কাল শাটার ফেলার সময়ে কয়েকটা ফরেন টেপ ডেলিভারি দিয়ে গেছে সীতারাম, তাড়াহুড়োয় ভাল করে দেখে নেওয়া হয়নি। নাহ্, ঠিকই আছে সব। সীতারাম বিশ্বাসী লোক, কাজে গলতি নেই।

কাচের দরজা ঠেলে এক প্যান্টশার্ট ঢুকছে। চেনা। সরকারি আদমি। প্রণামী নিতে এসেছে।

—কী সিংজি, বেওসার হাল কী রকম?

রাজিন্দরের মেজাজ খিঁচড়ে গেল। তোলা তুলতে আসা এই অফিসারগুলোকে দেখলে এটাই তার অকৃত্রিম অনুভূতি। তবু মুখে ইলাস্টিক হাসি টেনে বলল, —এই আপনারা যেমন রেখেছেন। ....আসুন স্যার।

সভ্য ভব্য শিক্ষিত চেহারার লোকটি আমন্ত্রণের তোয়াক্কা না করেই টুল টেনে বসে পড়েছে। হাতের পেটমোটা ফোলিও ব্যাগ কাউন্টারের টেবিলে রাখল। এবং সঙ্গে সঙ্গে শোকেসে শোকেসে চোখ ঘুরতে শুরু করেছে। কী ঘূর্ণন! বাঁই বাঁই বাঁই বাঁই। ... চোখ, না চরকি! চোখের মণি জরিপ করছে টেপরেকর্ডার, রডলাইটার, অ্যামপ্লিফায়ার, হ্যান্ড ফোনহোল্ডার, মিনি টিভি, শৌখিন আলো, সুদৃশ্য স্টিয়ারিং, কোয়ার্টজ ঘড়ি। দৃষ্টি দিয়ে চাটছে সিঙ্গাপুরের কার পারফিউম, তাইওয়ানের হুইলক্যাপ, মুম্বই-এর ঝুলন্ত পুতুল, জাপানি সিটকভার, ব্যাংককের সুগন্ধী রবার আঙুর। পকেট থেকে ফাঁকা সিগারেটের প্যাকেট বার করে খসখস নাড়ল, ফেলে দিল বাজে কাগজ ফেলার ঝুড়িতে।

রাজিন্দর রীতি মাফিক ভদ্রতা করল, —কী খাবেন স্যার? চা, না কফি?

—ঠাণ্ডা আনান।

—ঠাণ্ডা কেন স্যার? কফি নিন না। সামনের দোকানে ভাল এস্প্রেসো পাওয়া যায়।

—সেসব হবেখন। আগে কোল্ড ড্রিঙ্কস্ আসুক।

রাজিন্দর অপ্রসন্ন মুখে বাইরে এল। যত্ত সব ঝুটঝামেলা। এই সব সরকারি লোকগুলোকে চ্যাটার্জিবাবুই সামলায় ভাল, রাজিন্দরের মাথা গরম হয়ে যায়। কম ডিপার্টমেন্টের বায়নাক্কা মেটাতে হয় প্রতি মাসে! এ একবার আসছে, ও একবার আসছে...! মোড়ের ট্রাফিক পুলিশটা পর্যন্ত হঠাৎ হঠাৎ এসে দাঁত বার করে দাঁড়ায়। সিংজি আমরাও কিন্তু কাজে লাগি...। শালা। শুধু খাম নিয়ে যদি চলে যায় তাও তো ভাল, কিন্তু এদের এত নখরা?

রাজিন্দর হাঁক পাড়ল, —নন্দ, অ্যাই নন্দ? জব্বর ঠাণ্ডা দেখে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে আয় তো। বলেই ফেলে দেওয়া সিগারেটের প্যাকেটটার কথা মনে পড়ল। প্রতি বারই ফাঁকা প্যাকেট রাজিন্দরকে দেখিয়ে দেখিয়ে ফেলে লোকটা। দোকানে নো স্মোকিং বোর্ড ঝুলে থাকা সত্ত্বেও। রাজিন্দর ফের ডাকল নন্দকে, —শোন, এক প্যাকেট ভাল সিগারেটও নিয়ে আসিস।

ভেতরে ফিরে কাউন্টারে বসল রাজিন্দর। ড্রয়ার খুলে টাকা বার করব করব করছে। এদের এক এক দেবতার এক এক রেট। যার যত বিপদে ফেলার ক্ষমতা বেশি, তার প্রণামী তত চড়া। এ তো সাতশো করেই নেয়! পুজোর মাসে হাজার টাকা বোনাসও নিয়ে গেছে। কিছু কম ঠেকাবার চেষ্টা করবে এ মাসে?

লোকটা হাসি মুখে প্রশ্ন করল, —দেশের হালচাল কী বুঝছেন সিংজি? লালুপ্রসাদ চারা ঘোটালা থেকে ছাড়া পাবে?

— কে জানে।

—ভাবুন একবার কত টাকা মেরেছে! ব্যাটা হাজার কোটি টাকা কপ্ করে গিলে নিল! এত টাকা দিয়ে করে কী?...পুরো ফ্যামিলি, জ্ঞাতিগুষ্টি সব্বাইকে বড়লোক বানিয়ে দিয়েছে!

—হুঁ। রাজিন্দর খাম এগিয়ে দিল।

—আবার খাম টাম কেন? টাকাটা বার করে নিয়ে অসীম ঔদাসীন্যে খাম ছুড়ে ফেলে দিল লোকটা। নোটের প্রান্তে আলগা হাত বুলিয়েই গুনে ফেলল। ভুরু কুঁচকে বলল —কম কেন সিংজি?

— বোঝেনই তো, শীতকালটা একটু ডাল সিজন যায়।

—বুঝলাম। কিন্তু দিল ছোট করলে কারবার বাড়ে না সিংজি। নজর উঁচু করুন। আগের মাসে চ্যাটার্জি বাবুর সঙ্গে কথা হয়েছিল, এ মাস থেকে পুরো ফোর ফিগার দেবেন বলেছিলেন।

রাজিন্দর অল্প তেতে গেল। হাত বাড়িয়ে বলল —তা হলে কাল আসুন। চ্যাটার্জিবাবুকে থাকতে বলে দেব, তার কাছ থেকেই নেবেন।

দ্রুত টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল লোকটা, —ঠিক আছে ঠিক আছে। না বাড়ান, অন্তত প্রাপ্যটা তো দেবেন।

প্রাপ্যই বটে! কটা ভিখারি মরলে যে এমন সরকারি আদমি হয়! রাজিন্দর অবহেলায় আরও একখানা একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিল।

ঠাণ্ডা পানীয় এসে গেছে। নন্দর হাত থেকে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে পকেটে পুরল লোকটা। স্ট্র-এ ঠোঁট ঠেকিয়ে বলল, —হ্যাঁ, যা বলছিলাম। চোরে চোরে দেশ ভরে গেল, আমরা মিডল্ ক্লাসরাই শুধু সাফার করে মরলাম।

—যা বলেছেন স্যার।

—স্টক বুকটা বার করবেন নাকি? একটা সই ঠুকে দিয়ে যাই? সরকার মাইনে দিচ্ছে, কাজকর্মে গাফিলতি করা তো আর ঠিক নয়। বলতে বলতে শোকেসে চোখ, —ওই আঙুরের থোকাটা কত করে সিংজি?

রাজিন্দর সতর্ক স্বরে বলল — দেড়শো।

—আমার জন্যও ওই দাম?

—পাঁচ-দশ টাকা কম দেবেন।

—থাক। ... আমার মেয়েটা দেখে খুব আনন্দ পেত।

তেতো হেসে আঙুরটা বার করল রাজিন্দর। এই ধরনের কথা মানুষকে যে ঠিক কোন জায়গায় বেঁধে তা লোকটার বুঝবারই ক্ষমতা নেই।

চুন্নিকে এই রকমই একটা থোকা উপহার দিয়েছে রাজিন্দর, পেয়ে মেয়েটা কী খুশি! আনন্দে লাফাচ্ছে , ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে সবাইকে। নানাজি দি, নানাজি দি! এই লোকটার মেয়েও কি অমন...।

আঙুরের থোলো পেটমোটা ব্যাগে চালান করে দিয়েছে লোকটা। উঠে পড়ল, —থ্যাংক ইউ সিংজি। কফিটা কিন্তু ডিউ রইল, পরের দিন হবে,... বাই দা বাই, আমার কিন্তু একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস্‌ও ডিউ আছে। বলতে বলতে হাসছে, — গত মাসে আসিনি। ... আমার রেটটাও কিন্তু সামনের মাস থেকে...

—সইটা করে গেলেন না স্যার?

—কফি খেতে আসব, সেদিন করে যাব।

লোকটা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাওয়ার পর ফুটপাথে এসে দাঁড়াল রাজিন্দর। আকাশে হালকা হালকা মেঘ, পাঁশুটে রঙের। ডিসেম্বরে এরকম অনাহূত মেঘ শীতকে বিলম্বিত করে দেয়। এলোমেলো বাতাস বইছে থেকে থেকে, থেমেও যাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ। সূর্য এখন মেঘের আড়ালে, শহর জুড়ে মলিন ছায়া। আজ বুঝি তাড়াতাড়ি সন্ধে নামবে।

রাজিন্দর মাধাইয়ের সামনে এল, —কীরে, তোর কাজ কদ্দূর?

—এই তো মাইল মিটারের কানেকশানটা, অয়েল মিটারটা ... বনেটে ডুব দিল মাধাই, — টেপ তো বসছে না গাড়িতে?

—না। তুই কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ কর। এর পর স্টিয়ারিং বদলানো আছে, হর্ন আছে...

—কোন হর্ন লাগানো হবে? টকিং?

—না, না, অর্ডিনারি ফিট করে দে।...তপনকে খবর দিয়েছিস? কাল সকালে কিন্তু একটা কনস্যুলেটের গাড়ি আসবে। এসি লাগবে।

—খবর তো দিয়েছি, দেখুন আসে কি না। মাধাই কালিঝুলি মাখা মুখ বার করল,—তপনের খুব পায়াভারী হয়েছে সিংজি। এদিক ওদিক খেপ খাটছে...অটো ডিলাক্স ডাকলে একেবারে হাগা মোতা বন্ধ করে ছোটে।

নন্দ কোল্ড ড্রিঙ্কসের খালি বোতল আনতে ভেতরে ঢুকেছিল, দরজা ফাঁক করে চেঁচাচ্ছে—সিংজি, আপনার ফোন।

—যাচ্ছি। রাজিন্দর যেতে যেতে মাধাইকে মৃদু ধমক দিল —লোকের নামে খালি চুকলি খাবি না। হাতের কাজ সার।

কাউন্টারে এসে ফোন তুলল রাজিন্দর।

—শুনিয়ে জি...

কোমল বড়বড় করে একরাশ কথা বলে চলেছে। মর্মার্থ, সে আজ বিকেলে পহেনজি জিজাজিকে নিয়ে সন্ত্ কুটিয়া গুরদোয়ারায় যাচ্ছে। সান্ধ্য ভজন কীর্তন শুনে ফিরবে। রাজিন্দরের আজ বাড়ি ফেরার জন্য জলদ্‌বাজি করার প্রয়োজন নেই।

রাজিন্দর অবাক হল। সঙ্গে সঙ্গে খুশিও। যাক, কোমল তা হলে শেষ পর্যন্ত গুরবচন সিংকে নড়াতে পারল! সেই যে তিন দিন আগে চারতলার ফ্ল্যাটে পা রেখেছেন গুরবচন, শত উপরোধেও তাকে একটি বারের জন্য নামানো গেল না। চুপটি করে পুবের ব্যালকনিতে বসে আছেন তো বসেই আছেন। কাল কুলদীপ বলল, আজ কলেজ যাব না ফুফ্‌ফরজি, চলুন আপনাকে জাদুঘর দেখিয়ে আনি। হরেক কিসিমের কঙ্কাল আছে, পাথ্‌থর আছে...। না পুত্তর, আমার মুর্দাঘর ভাল লাগে না। তা হলে চিড়িয়াঘর চলুন। কত রকম পাখি আছে, আজব আজব জন্তু আছে...। না পুত্তর, আমার জান্‌বর দেখতে মন করে না। গুরবচনের দাদা এক সময়ে আজাদ হিন্দ ফৌজে ছিলেন, নেতাজির ওপর গুরবচনের অসীম ভক্তি। রাজিন্দর গুরবচনকে নেতাজি ভবন দেখে আসার কথা বলল, তিনি শুনেও

না শোনার মতো উদাস হয়ে গেলেন। দিনভর ব্যালকনিতে বসে কী যে দেখেন জিজাজি! আদৌ কিছু দেখেন কি? নাকি চোখই শুধু তাকিয়ে থাকে, মন চলে যায় অন্য কোথাও! কোথায় যায়? রোহিলায়? না টরোন্টোয়?

নাহ্, মনজিৎ বড় বেশি দাগা দিয়ে গেছে জিজাজিকে। পহেনজি তাও কেঁদে কেটে সামলে গেছেন অনেকটা, জিজাজি এখনও যেন জমাট বরফ। কথা বলছেন, হাসছেন, সবই ছাড়া ছাড়া। উৎসাহহীন। ভালই হল, গুরদোয়ারায় গিয়ে বসে থাকলে, পাঠ রহেরাস শুনলে জিজাজির মন একটু স্থিত হবে।

একটু আগের তিতকুটে মেজাজ শরিফ হয়ে গেল। সিয়েলোর কাচে ফিলম লাগানো শেষ, নন্দকে দোকানে বসিয়ে টুক করে থিয়েটার রোডের মোড়ে গেল রাজিন্দর, পরোটা মাংস খেয়ে ফিরে এসে দেখল দোকানে দু-দু'জন কাস্টমার অপেক্ষা করছে। তাদের ছাড়তে না ছাড়তে আবার লোক, আবার লোক। এক জন বউ মেয়ে নিয়েও হাজির, তাদের পছন্দমতো গাড়ির খোলনলচে পালটাবেন ভদ্রলোক। কথায় কথায় অনেকটা সময় কাটল রাজিন্দরের। ফাঁকে ফাঁকে মাধাইয়ের কাজ নিরীক্ষণ করে আসছে, স্টিয়ারিং অ্যাডজাস্টমেন্টের সময়ে নিজেও হাত লাগাল। কিছু কাজ স্বহস্তে না করলে রাজিন্দরের ঠিক তৃপ্তি হয় না।

বিকেলে প্যারিস মোটরের ইয়াসিনের আবির্ভাব। এক খদ্দের রিমোট কনট্রোল সেন্ট্রাল লক চাইছে, প্যারিস মোটরে মাল বাড়ন্ত, রাজিন্দরদের কাছ থেকে নেবে ইয়াসিন। দোকানে দোকানে এরকমটা চলে, পেশাগত শত্রুতা থাকলেও। সামান্য মার্জিনে মাল ছেড়ে দিচ্ছি, তার পর তুমি যা কামাবে কামাও।

বছর চল্লিশের ইয়াসিন এ অঞ্চলের প্রবাদপ্রতিম মেকানিক। বছরখানেক হল সে প্যারিস মোটর খুলেছে, চালাচ্ছেও মোটামুটি।

নন্দ মাল খুঁজতে মাচায় উঠল। ইয়াসিন আড্ডা জমিয়েছে। বিদেশ থেকে বাঁকা পথে কিছু মাল আসে বিভিন্ন দোকানে, ফ্যান্সি মার্কেটে চেনা লোক আছে, তারাই মাধ্যম। দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে তারা, কেউ যায় সিঙ্গাপুর, কেউ হংকং, ফেরে প্রত্যেকে এক-একটা মালের থলি নিয়ে। টেপ থেকে পারফিউম, ঘড়ি থেকে হুইলক্যাপ কী না থাকে! নির্দিষ্ট দক্ষিণার বিনিময়ে বিনা বাধায় সীমান্ত পারাপার করে তারা। ইদানীং বস্তা প্রতি পারাপারের দক্ষিণা বেড়েছে। পনেরো শো থেকে লাফ দিয়ে দু হাজার। এ সব নিয়ে খানিক আক্ষেপ করল ইয়াসিন।

কথায় কথায় দুম করে প্রশ্ন করে বসল —সিংজি, আপনার সঙ্গে কি চ্যাটার্জিবাবুর কোনও লাফড়া হয়েছে?

রাজিন্দর আকাশ থেকে পড়ল—না তো! কে বলল তোমায়?

—অটো ডিলাক্সে শুনছিলাম। চ্যাটার্জিবাবু নাকি আলাদা বিজনেস করার প্ল্যান করছেন...। কী একটা বড় পেমেন্ট নাকি চ্যাটার্জিবাবু হাপিশ করে দিয়েছিলেন...

—বিলকুল বকোয়াস। রাজিন্দর ঝড়াং করে চটে গেল—আলফাল গুজব রটিয়ে লোকে কী সুখ পায় বলো তো! অ্যাদ্দিন ধরে আমরা দুই দোস্ত পার্টনারশিপ চালাচ্ছি, এ বুঝি লোকের সহ্য হয় না!

ইয়াসিন হাত উলটে মাল নিয়ে চলে গেল। কাঁটাটা খচখচ করতে থাকল রাজিন্দরের বুকে। মাঝে একদিন সমর চ্যাটার্জির সঙ্গে সামান্য চটাচটি হয়েছিল বটে, কিন্তু সে তো নিছকই ভুল বোঝাবুঝি থেকে। পার্টি বলেছিল ক্যাশ পেমেন্ট করবে, রাস্তায় দেখা হতে বলল পেমেন্ট হয়ে গেছে, টাকাটা ক্যাশে জমা পড়েনি বলে ঈষৎ উষ্মা প্রকাশ করে ফেলেছিল রাজিন্দর। সঙ্গে সঙ্গে তো মুখের ওপর ব্যাঙ্কের পাশবই ফেলে দিল সমর চ্যাটার্জি। দেখে নিন পার্টি ক্যাশ দিয়েছে কি চেক! ব্যস, বাত খতম। মাধাই সেদিন দোকানে ছিল, সে-ই কি অন্য মিস্ত্রিদের কাছে গল্পগাছা করেছে! এরকম বাত চালাচালি ভাল নয়, ছোকরাকে কড়কে দিতে হবে।

সমর চ্যাটার্জি এল সন্ধের পর। তার সামনে আর প্রসঙ্গটা তুলল না রাজিন্দর। বিতি হুয়ি বাত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি সমঝদারির কাজ নয়। তা ছাড়া চ্যাটার্জি এখন তার পারিবারিক বন্ধু, পরবে পুজোয় তারা বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে পরস্পরের বাড়ি যায়, ও সব তুচ্ছ রটনা মন থেকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া উচিত।

সমর চ্যাটার্জির সঙ্গে টুকটাক কাজের কথা সেরে উঠি উঠি করছিল রাজিন্দর, চ্যাটার্জি আটকাল,—আমার প্রবলেমটার কথা কিছু ভাবলেন সিংজি?

রাজিন্দর চিন্তায় পড়ে গেল। সমর চ্যাটার্জির ছোট শালা এসেছে বর্ধমান থেকে, আপাতত চ্যাটার্জি-গৃহেই অধিষ্ঠান করছে ছেলেটা। বছর তিরিশ বয়স, কাঠ বেকার। তাকে কলকাতাতেই কোনও একটা ধান্দায় লাগাতে চায় সমর। দু-চার দিন দোকানে এনে বসিয়েছিল, কিন্তু সে কি বসে থাকার ছেলে! পাঁচ মিনিট পর পর বাইরে বেরিয়ে যায়! সিগারেট ফুঁকতে! আর তাকে দোকানে একা ছেড়ে গেলে তো সর্বনাশ। ক্যাশ থেকে টাকা তুলে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছে, চা কফি খাচ্ছে! এবং নিটোল ঘুম তো আছেই। কাউন্টারে বসে বসে ঢোলে! এমন অকর্মণ্যর জন্য রাজিন্দর কী করতে পারে!

তবু বুঝদারের মতো বলল —হুঁ, একটা তো কিছু করতেই হয়। আপনার পুরনো অর্ডার সাপ্লাইয়ের বিজনেসটা ওকে ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন? কথাবার্তা ভাল বলে, দু দিনে শাইন করে যাবে।

—ওর শরীরটা তো তেমন জুতের নয়, ঘোরাঘুরির কাজে ওর দিদি ওকে ঢুকতে দিতে চায় না।...এই দোকান-টোকানের কাজই বাদলের বেশি পছন্দ। গাড়ির ব্যাপারে ন্যাকও আছে। আপনিও তো দেখেছেন, কাছ থেকে দেখে বুঝেছেন...

হুঁ, সেই জন্যই তো ভরসা করা যায় না। মনে মনে বলল রাজিন্দর। মুখে বলল — সে আর আসে না কেন? এলেই পারে।

—না... আসলে আপনার সঙ্গে কথা না বলে পাকাপাকি বসানোর ব্যাপারটা...চ্যাটার্জির মুখে হাসি ফুটল—আপনার বহেনজি আপনাকে একদিন যেতে বলেছে। ওর কাছে কী চিকেনের প্রিপারেশান খেতে চেয়েছিলেন...

—যাব যাব। আমার জিজাজি পহেনজি চলে যান...

—আরে, তাঁদের নিয়েই আসুন না। হোলডে থাকবেন, পাড়ায় পরেশনাথের মন্দিরটা দেখিয়ে দেব...

রাজিন্দর মনে মনে হাসল। জিজাজি আজ গুরদোয়ারা গেছেন তাই না কত, তিনি যাবেন গোয়াবাগান! হ্যাঁ না কিছু বলে বেরিয়ে এল। মারুতিভ্যানে স্টার্ট দিয়েছে। সাড়ে সাতটা নাগাদ। মনটা খিচখিচ করছে, সেই বাদল এসে বসবে রোজ কাউন্টারে!

দু পা এগোতেই উইন্ডস্ক্রিন ঝাপসা। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে।

পাঁচ

—তোর জিজাজি আজ কী বলেছেন শুনেছিস রাজু? ওফ্, আমি আর কোমল তো শুনে হেসে বাঁচি না।

—কী বলেছেন?

—তোদের শহরটা নাকি একটা জঙ্গল। উঁচু নিচু বাড়িগুলো হল গিয়ে সব গাছ। এখানে যারা বাস করে তারা নাকি হঠাৎ একদিন অদ্ভুতভাবে শেষ হয়ে যাবে। ওই সব গাছ চাপা পড়ে।

—হুঁউ? রাজিন্দর সকৌতুকে প্রশ্ন করল—তা সেই দিনের আর কত দেরি?

—দিনক্ষণ উনি বলতে পারবেন না। রোহিণীর মুখে হাসি ঝিকমিক—তবে এমনটা যে ঘটবে উনি নিশ্চিত।

—সব্বোনাশ। রাজিন্দর চোখ টিপল—এই বিপদ থেকে বাঁচার তবে উপায়?

—তোর জন্য একটা রাস্তা উনি বাতলেছেন। কারবার-টারবার অনেক হয়েছে, এবার গ্রামে গিয়ে থাক। বুড়ো বয়সে শান্তিতে থাকবি।

রাজিন্দর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। এটাই হল জিজাজির চিরন্তন কথা। দুনিয়ার তাবত মানুষ গ্রামে গিয়ে বসবাস করো। আবে বাবা, তা হলে শহরগুলোর হবেটা কী! হাসতে হাসতে বলল—ব্যস, মাত্র তিন দিনেই জিজাজির শহরে হাঁপ ধরে গেল?

লঘু আড্ডা চলছে। সারা সন্ধে গুরদোয়ারায় কাটিয়ে রোহিণী আজ বেজায় খুশি, মাটিতে পাতা

চাটাইয়ে বিমলার পাশটিতে বসে কলকল করে চলেছেন। কোনও সংবদ্ধ কথা নয়, হালকা মেজাজের তালবেতাল আলাপচারিতা। একটু আগেও তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল দিল্লির বাংলা সাহিব কলকাতার সন্তু কুটিয়া গুরদোয়ারা থেকে কত বড়, সেখান থেকে চলে গেলেন হেমকুণ্ড সাহিবে। গত বছর প্রতিবেশীদের সঙ্গে হেমকুণ্ডে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন রোহিণী, পথে নাকি এক উদ্ভট পাগলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, সে নাকি আলু ছাড়া পৃথিবীর আর দ্বিতীয় কোনও খাবার স্পর্শ করে না। বলতে বলতে শুধু আলু দিয়ে কত রকম খানা তৈরি করা যায় সে প্রসঙ্গ এসে গেল। কোমল মতামত দিচ্ছে, বিমলা নাক গলাচ্ছেন, কুলদীপ হঠাৎ হঠাৎ এসে টিপ্পনী কেটে ঘরে চলে যাচ্ছে...। রাজিন্দর বাড়ি ফিরে ঘরোয়া পোশাকে বদলে নিয়েছে নিজেকে, মাথায় ছোটি দস্তার, বাবু হয়ে বসেছে সোফায়, এখন তাকে নিয়ে পড়েছেন রোহিণী। এবং নিজের স্বামীটিকে নিয়েও।

স্বামীটি যথারীতি ব্যালকনির খাটিয়ায়। সন্ধেবেলা ঝিরঝির বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর বাতাস এখন বেশ স্যাঁতসেতে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব হঠাৎ বেড়ে গেছে। গুরবচনের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি শুধু গেঞ্জি গায়ে গুনগুন করে রাতের প্রার্থনা সাবছেন। কীর্তন সোহেলা।

রোহিণী আর একবার গুরবচনকে উঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, —মনে আছে রাজু, দিল্লি গিয়েও তোর জিজাজি কী বলতেন?

— নেই আবার! প্রভুজি নাকি এক দিন অচানক দিল্লিতে আলো বাতাস দেওয়া বন্ধ করে দেবেন, আর অমনি সব আদমি জল বিন মছলির মতো তড়পে তড়পে মরে যাবে। রাজিন্দর দাড়ি চুমরোল— তো গাঁয়ে গিয়ে কামকাজ কী করব? ট্র্যাক্টর ডেকরেশান? নাকি তোমাদের পাম্পহাউসের মেকানিক বনে যাব?

—তাই না তাই। রোহিণী হেসে কুটিপাটি। বালিকার মতো ঘাড় দোলাতে দোলাতে বললেন — গাঁও গাঁও করে তোর জিজাজির দিমাগ একেবারে গেছে।

গুরবচনের প্রার্থনা শেষ। ঘুরে বসেছেন। মন্দ্র স্বরে বললেন —আমার মাথা ঠিকই আছে রোহিণী। যেদিন আমার কথা সত্যি হবে, সেদিন বুঝবে।

রাজিন্দর গুরবচনের গলায় বিরক্তির আভাসটা টের পেল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল—সবই তো বুঝলাম জিজাজি, কিন্তু ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ে গিয়ে খাবটা কী?

—কেন, খেতিবাড়ি করবে। বলো তো তোমার জন্য জমি দেখতে পারি। নিজের জমিতে ফসল ফলানোর একটা আলাদা সুখ আছে রাজিন্দর। সে সুখ তোমাদের শহরে, তোমাদের কারবারে, কোথাও পাবে না।... কত রকম নতুন গমের বীজ বেরিয়েছে এখন। কল্যাণসোনা সোনালিকা...। বেঁটে বেঁটে গাছগুলোর শিষ যখন দুধের ভারে নুয়ে পড়ে, মনে হয় ধরতি নয়, নিজের মার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

রাজিন্দরের হাসি পেয়ে গেল। এই আবেগপ্রবণ বৃদ্ধকে কেমন করে বোঝায় ওই সোনালিকা কল্যাণসোনা বা গমের শিষের নুয়ে পড়া তার কাছে কোনও বিশেষ অর্থ বহন করে আনে না।

আলগাভাবে রাজিন্দর বলল —শুনতে তো ভালই লাগে জিজাজি, কিন্তু আমি চাষবাসের বুঝিটা কী?

—শিখে যাবে। আমরা জাঠ, চাষবাস আমাদের রক্তে আছে। আমার কথা শোনো রাজিন্দর, উলটোপালটা দিল্লি কলকাতা অনেক হল, এবার নিজের মাটিতে ফেরো। শাস্‌জিরও জীবনের শেষ কটা দিন আনন্দে কাটুক।

রাজিন্দর আর তর্কে গেল না। গুরবচনের কাছে রোহিলা তার নিজের মাটি কিন্তু রাজিন্দরের সেভাবে কোনও মাটি আছে কি! তার জন্মস্থান লাহোর, সে বড় হয়েছে দিল্লিতে; এখন পাকেচক্রে কলকাতায়, এর মধ্যে তার আপন জায়গা কোনটা?

আবছাভাবে লাহোরের কথা মনে পড়ল রাজিন্দরের। একটা বাড়ি। সব্জিমণ্ডির পিছনে। রং মনে নেই। বাড়িটার দোতলায় তারা থাকত। বড় বড় তিনটে ঘর, খড়খড়িঅলা লম্বা লম্বা জানলা, দরজা জানলার মাথায় অর্ধবৃত্তাকারে লাল সবুজ কাচ। ঘর থেকে রান্নাঘর বাথরুমের দিকে যেতে চৌকো এক চাতাল। উঁহু, চাতাল নয়, একতলার ছোট্ট উঠোনের ছাদ সেটা। সারি সারি লোহার শিক বসানো। ফাঁক ফাঁক। শিকের ফাঁক দিয়ে প্রায়ান্ধকার একতলাটাকে দেখা যেত। কারা যেন থাকত নীচে? মনে

নেই। শুধু মনে আছে লোহার শিকের ওপর লাফালাফি করলে একতলা থেকে একটা বুড়ো ঘড়ঘড়ে গলায় বকত খুব। দোতলায় ওঠার খোলা সিঁড়ি ছিল বাড়ির একদম সামনেটা দিয়ে। সূর্য পশ্চিমে হেলে গেলে ওই সিঁড়িতে মশমশ জুতোর শব্দ তুলে স্কুল থেকে ফিরতেন পাপাজি। পাপাজিকে ভাল মনে নেই, শুধু ওই শব্দটুকুই রয়ে গেছে স্মৃতিতে। শোওয়ার ঘরের পিছনে প্রকাণ্ড মাঠ ছিল একটা, তার ওপারে উঁচু এক লাল বাড়ি। ওটা মাঠ ছিল, না বাগিচা? না না মাঠই...। নাহ্, মনে নেই। স্কুল থেকে ফিরে পাপাজি তাদের নিয়ে বেড়াতে যেতেন। পহেনজি বাদ, শুধু দুই ছেলেকে নিয়ে। যোগী আর রাজু। যোগিন্দর তার চেয়ে তিন বছরের বড় ছিল, মাত্র দশ বছর বয়সে স্মল পক্সে মারা গেল। লাহোরের ওই বাড়িতেই।

লাহোরই কি রাজিন্দরের মাতৃভূমি?

তা কী করে হয়? লাহোর তো পাপাজির কর্মস্থল ছিল, তাদের আসল দেশ তো ছিল আরও ভেতরে। লাহোর জেলারই ভীরনাল গ্রামে। সেখানে দাদাজির খেতি বাড়ি ছিল।

তবে কি ভীরনাল গ্রামটাই রাজিন্দরের মাতৃভূমি?

নাহ্, তাও নয়। সেভাবে ধরতে গেলে ভীরনালে দাদাজিরা তো এসেছিলেন মাত্র চার পুরুষ আগে। খাল কাটল ব্রিটিশরা, নতুন কলোনি বানাচ্ছিল, লান্‌ডিকোটাল থেকে এনে বসিয়েছিল তাঁদের।

তা হলে কি লান্‌ডিকোটালই .....?

ধুস, জাঠেদের তো সেভাবে কোনও নিজস্ব ভূমিই ছিল না। তারা ছিল সর্বত্রগামী। ক্ষত্রিয় বৈশ্য দুই রক্তই বইছে তাদের ধমনীতে, তারা এক দিকে বীরের জাত, অন্য দিকে বণিক। যখন যেখানে তারা বাস করে সেটাই তাদের মাটি। স্বভূমি।

শুধু পাঞ্জাবি বলেই কি গুরবচনের পাঞ্জাব রাজিন্দরের দেশ হয়ে গেল?

কোমল উঠে রান্নাঘরে গিয়েছিল। সেখান থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করছে—তোমরা কি এখন খেতে বসবে? রুটি সেঁকব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। নটা বেজে গেছে, এবার লাগাও।

বিমলা বললেন,—আমি কিন্তু রাত্রে কিছু খাব না। গুরদোয়ারার প্রসাদ খেয়ে পেট ভরে গেছে।

—একটা রুটি অন্তত খান। ডাল দিয়ে।

—তবিয়ত ঠিক নেহি হ্যায় বহু।

কোমল আর পীড়াপীড়ি করল না।

কুলদীপের ঘরে টেপরেকর্ডার বাজছে। নিচু পর্দায়। গানের সুরটা দুলে দুলে আসছে ড্রয়িং ডাইনিং স্পেসে, বাতাসে কেঁপে কেঁপে ঘুরছে।

রোহিণী হাঁটুতে থুতনি রেখে শুনছিলেন। একটা গান শেষ হল, আবার একটা শুরু হয়েছে। মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—মুণ্ডা কী গান বাজাচ্ছে রে?

— বাংলা গান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

—বড় করুণ সুর। মুণ্ডা এত দুঃখের গান শোনে কেন?

—কে জানে! ওর তো এ সব গানই ভাল লাগে দেখি।

—প্রেমে পড়লেই ছেলেরা দুঃখের গান বেশি শোনে। রোহিণী ভায়ের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসলেন,— কারুর সঙ্গে ইশ্‌ক্ হয়নি তো?

—সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করো।

—দেখিস আবার কোনও বাঙালি কুড়িকে না ঘরে নিয়ে আসে।

রাজিন্দর হাত ওলটাল— আজকালকার জমানার লেড়কা, সবই সম্ভব।

—তোর মনে হচ্ছে আপত্তি নেই? রোহিণী ভুরু কুঁচকোলেন—ভাল না, একদম ভাল না। শাদি বিয়া সবসময়ে নিজেদের বিরাদরির মধ্যে হওয়াই ভাল। এমনিই তো তোর ছেলে বাঙালি বনে গেছে, বাঙালি বহু ঘরে এলে আর দেখতে হবে না।

রাজিন্দর হাহা হেসে উঠল।

রোহিণী ছদ্মকোপে বললেন—এই করে করে কিন্তু ছেলের বারোটা বাজাবি। ছেলে কী করে তার

খোঁজখবর তো রাখ।

—আমি ছেলেকে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছি পহেনজি। ও নিজের মতো করে মানুষ হোক। রাজিন্দর হাসি থামাল— কলেজের পর ছেলেকে মাঝে মাঝে দোকানে বসতে বলেছিলাম। গেছে দু-একদিন। কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি ওর বিজনেসে ইন্টারেস্ট নেই। পড়তে চায়। ঠিক আছে, তুমি পড়ো। আরও পড়তে চাও, আরও পড়ো। বি'জি বলেন ও একদম আমাদের পাপাজির মতো হয়েছে। পাপাজি যেমন লেখাপড়া ছাড়া কিছু বুঝতেন না।

বিমলা কানে খাটো হলেও ঠিক শুনতে পেয়েছেন কথাটা। বিড়বিড় করে বলে উঠলেন— পোত্‌রা আমার দেখতেও হয়েছে তার দাদাজির মতো। ওই রকম বড় বড় চোখ, লম্বা নাক, হাসলে মনে হয় বাগিচায় ফুল ফুটল। ... তোদের পাপাজি ছিলেন বংশের প্রথম বিএ, আমার কুলদীপ তাকেও ছাড়িয়ে চলে যাবে।

রাজিন্দরের মনটা পলকের জন্য ভারী হয়ে গেল কি? পাপাজিকে তো সে-ই ছাড়িয়ে যেতে পারত, সুযোগ পেল কই? স্কুল পাশ করেই তাকে রুটিরুজির ধান্দায় নেমে পড়তে হয়েছে। যার মাকে রেডিমেড জামাকাপড় তৈরির কারখানায় বছরের পর বছর ক্যাজুয়াল কর্মী হয়ে খেটে মরতে হয়, তার কি লেখাপড়া করার বিলাসিতা সাজে?

কোমল টেবিলে প্লেট সাজিয়ে ডাকাডাকি করছে। রাতের মেন্যু আজ মক্কিদি রোটি, কালি দাল, সরসোকি শাক। তিনটে পদই গুরবচনের বিশেষ প্রিয়। দোকান থেকে ফেরার পথে রাজিন্দর চিকেন রেশমি কাবাবও কিনে এনেছে, শুধু নিরামিষ খানা তার মুখে রোচে না।

খেতে বসেছে সকলে। বিমলা একটুক্ষণ জামাই-এর খাওয়ার তদারকি করে গুটিগুটি পায়ে শুতে চলে গেলেন। গুরবচন খাচ্ছেন, বাকিরা কথা বলে চলেছে অবিরাম। কোমলের ভাইঝি রিঙ্কুকে রোহিণীর খুব পছন্দ, নাতির বউ করতে চান, কথায় কথায় পাড়লেন প্রস্তাবটা। কোমল চোখের ইশারায় রাজিন্দরকে এগোতে মানা করল। রিঙ্কু কনভেন্টে পড়া আধুনিক মেয়ে, সে মোটেই গ্রামে গিয়ে থাকা পছন্দ করবে না। কুলদীপ গুরবচনকে কাল বড়ি শিখ সঙ্গৎ-এ যাওয়ার কথা বলল, গুরবচন মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ কি না বুঝতে পারল না কুলদীপ, রাজিন্দরের সঙ্গে ক্ষণিক দৃষ্টি বিনিময় করে চুপ করে গেল।

হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠেছে। রাজিন্দর উঠতে যাচ্ছিল, কুলদীপ তাকে থামিয়ে নিজেই দরজায় গেছে। রাজিন্দর গজগজ করে উঠল, খাওয়ার সময়ে বাড়িতে লোক আসা তার ঘোরতর নাপসন্দ্।

দরজা খুলেই চমকেছে কুলদীপ। সামনেই যে লোকটা দাঁড়িয়ে সে কুলদীপের মুখচেনা, কদিন ধরেই দেখছে চায়ের দোকানে। লোকটার পিছনে আরও চার-পাঁচ জন।

কুলদীপ প্রশ্ন করার আগে লোকটা বলে উঠল— গুরবচন সিং আছেন?

—হ্যাঁ। কিকিকিন্তু... আপনি ...?

—আমার নাম মোহন। মোহন মালহোত্রা। উনি আমাকে চেনেন। আসতে বলেছিলেন। আমার সঙ্গে ট্রেনে আলাপ।

ঝাঁ করে কুলদীপের মনে পড়ে গেল। হাওড়া স্টেশন থেকে আসার সময়ে এই নামের একটা লোকের কথা রোহিণী বলেছিলেন বটে, কিন্তু লোকটা কেন এসে চায়ের দোকানে...?

লোকটাকে হাওড়া স্টেশনে দেখেছিল...?

দ্বিতীয় প্রশ্ন করার সময় দিল না লোকটা, সাঁৎ করে ঢুকে পড়েছে ফ্ল্যাটে। সঙ্গে সঙ্গে কুলদীপকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে বাকি কজনও।

রাজিন্দর ধড়মড় করে ছুটে এল— কী? কী ব্যাপার? কী চাই?

রোহিণী খাবার টেবিল থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন—আরে মোহনবেটা, তুমি সত্যি সত্যি এসেছ?

মোহন তাকালই না। পলকে চারজন লোক পেশাদার ভঙ্গিতে ঘরের চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল, প্রত্যেকেরই পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে রিভলবার।

মোহনের পাশের খয়েরি প্যান্ট চেক শার্ট গটগট এগোল গুরবচনের দিকে। বিশুদ্ধ গুরমুখীতে

প্রশ্ন করল— আপনিই তো গুরবচন সিং?

গুরবচন হতভম্ব মুখে তাকালেন— হ্যাঁ। কেন?

—অমৃতসর থেকে আসছেন?

আমতা আমতা করে একই কথা বললেন গুরবচন— হ্যাঁ। কেন?

—আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

—কোথায়?

—কোনও প্রশ্ন নয়। উঠে পড়ুন। লোকটাও কোমর থেকে রিভলবার বার করেছে। সরাসরি গুরবচনের কপালে ঠেকিয়ে বলল— কুইক। কুইক।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে গেছে রাজিন্দর। চিৎকার করে উঠল— এ সব কী হচ্ছে? কে আপনারা?

মুহূর্তে রাজিন্দরকে দেওয়ালে ঠেসে ধরেছে একজন। আরেক জন পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ড বার করে চোখের সামনে দোলাল,— উই আর ফ্রম পাঞ্জাব পুলিশ। দ্যাট ম্যান ইজ আ ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল। টেররিস্ট। আ হার্ডেড ম্যান। গট ইট?

—আপনারা ভুল করছেন। কুলদীপ ককিয়ে উঠল।

—হাহ্।

একজন কুলদীপের দিকে চোখ রাখতে রাখতে বিদ্যুৎবেগে তিনটে ঘরের দরজায় উঁকি মেরে নিল। ঠেলতে ঠেলতে কুলদীপকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তার বাবার পাশে— চোপ। একদম চুপ। আমাদের কাজ করতে দে।

গুরবচনকে টেনে তুলেছে খয়েরি প্যান্ট চেকশার্ট। অশ্লীল এক খিস্তি দিয়ে বলল— কলকাতায় পালিয়ে এসে ভেবেছিস বেঁচে গেলি, অ্যাঁ? চল, এবার তোকে দেখছি।

গুরবচন এত ঘাবড়ে গেছেন যে গলা দিয়ে তাঁর কোনও স্বরই বেরোচ্ছে না। বিনা প্রতিবাদে অচৈতন্যের মতো হাঁটছেন খোলা দরজার দিকে।

রোহিণী পাগলের মতো এসে তাঁকে জাপটে ধরলেন— ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন বলছি। ওকে আপনারা মিছিমিছি ধরে নিয়ে যেতে পারেন না।

—হঠ্

—কেন হঠব? বিনা দোষে একটা বুড়ো মানুষকে এভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, দেশে কি আইন কানুন বলে কিছু নেই? বলতে বলতে আগুন চোখে তেড়ে গেছেন মোহনের দিকে— শয়তান ... হারামি ... এই জন্য তুই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ...? গোটা পথ তো ছিলি, বুঝিসনি মানুষটা কেমন?

—হঠ্ শালী। মোহন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ধাক্কা মারল রোহিণীকে?

ছিটকে পড়েছেন রোহিণী। দরজার কোনায় মাথা ঠুকে গেল। ডুকরে উঠলেন।

হতবুদ্ধি হয়ে থাকা গুরবচন হঠাৎই বিস্ফোরিত হয়েছেন। এক ঝটকায় ছাড়ালেন নিজেকে। বিকট এক জান্তব শব্দ ছিটকে এল গলা থেকে, পাহাড়ের মতো শরীর ভীম বেগে ধেয়ে গেল মোহনের দিকে। দু হাতে টুঁটি টিপে ধরেছেন মোহনের। ঝাঁকাচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করল খয়েরি প্যান্ট চেক শার্ট । পর পর দুবার। রোহিণী বিস্ফারিত চোখে টলতে টলতে ছুটে এসেছেন, রিভলবার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন লোকটার হাত থেকে। আরও একটা গুলি। রোহিণীর কপালে।

রাজিন্দর কুলদীপ গলগল ঘামছে, বাক্‌রোধ হয়ে গেছে বাপ ছেলের। তাদের ছিটকে ফেলে দিয়ে লোকগুলো বেরিয়ে গেল। কোমল উবু হয়ে বসে পড়েছে, গোঙাচ্ছে।

এতক্ষণে বিমলা চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়েছেন—কীসের এত হল্লা হচ্ছে রে? কাদের গলা পাচ্ছি?

কোথাও কোনও শব্দ নেই। আলোময় গৃহে ভুতুড়ে স্তব্ধতা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর।

রাজিন্দরের ফ্ল্যাটে প্রতিবেশীরা যখন এসে পৌঁছল, দুটো টাটকা লাশের মাঝে তখন মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন বিমলা। রাজিন্দর কুলদীপরা তখনও পাথর।

ছয়

পরদিন প্রতিটি সংবাদপত্রে ফলাও করে বেরিয়েছে খবরটা।

...দক্ষিণ কলকাতার চক্রবেড়িয়ায় পঞ্জাব পুলিশের রোমাঞ্চকর অভিযান!

...নিজস্ব সূত্রে খবর পেয়ে পঞ্জাব পুলিশের একটি দল শুক্রবার রাত দশটা নাগাদ সাদা পোশাকে চক্রবেড়িয়ার এক শিখ পরিবারের ফ্ল্যাটে হানা দেয়। পঞ্জাব পুলিশের অভিযোগ, অমৃতসরের কুখ্যাত উগ্রপন্থী গুরবচন সিং কয়েক দিন ধরেই তাঁর শ্যালক রাজিন্দর সিং-এর ওই ফ্ল্যাটে আত্মগোপন করে ছিলেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, পঞ্জাব পুলিশ গ্রেপ্তার করতে গেলে পঁচাত্তর বছর বয়স্ক গুরবচন সিং মরিয়া হয়ে তাদের বাধা দেন এবং পুলিশের সঙ্গে তাঁর তীব্র সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই গুরবচন সিং এবং তাঁর স্ত্রী রোহিণী কাউর পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান। কলকাতা পুলিশ এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি।

... সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ মুখপাত্র বলেন, কলকাতা বা রাজ্য পুলিশ পঞ্জাব পুলিশের এই অভিযান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল, তাদের আগাম কিছুই জানানো হয়নি। একতরফা অপারেশানের পর পঞ্জাব পুলিশ ভবানীপুর থানায় একটি রিপোর্ট দায়ের করেছে মাত্র। পঞ্জাব পুলিশের এ হেন অসৌজন্যমূলক আচরণে কলকাতা পুলিশের ওপরমহল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, গোটা ঘটনাটা সম্পর্কেই তাঁরা পঞ্জাব পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন।

...প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগেও এভাবেই কলকাতা পুলিশের অজ্ঞাতে পঞ্জাব পুলিশ তিলজলার একটি বাড়িতে হানা দেয় এবং উগ্রপন্থী সন্দেহে এক নিরপরাধ বৃদ্ধ শিখ দম্পতিকে হত্যা করে। পরে অবশ্য পঞ্জাব পুলিশ গোটা অভিযানটিকেই অস্বীকার করেছিল, সেই শিখ দম্পতির মৃতদেহের কোনও সন্ধান শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ঘটনাটি নিয়ে অনেক দূর জল গড়িয়ে ছিল। কলকাতা পুলিশ পঞ্জাব পুলিশের বিরুদ্ধে একটি মামলা পর্যন্ত রুজু করে, সেই মামলা এখনও মহামান্য আদালতের বিচারাধীন। এবার অবশ্য মৃতদেহ দুটি অকুস্থলেই পড়ে ছিল, ভবানীপুর থানার ওসি দুটি মৃতদেহই ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।

... গুরবচন সিং-এর শ্যালক রাজিন্দর সিং এবং তাঁর পুত্র কুলদীপ সিং সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করেন। পুলিশ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

... ঘটনাটি ভবানীপুর অঞ্চলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

পরদিন সংবাদটির টীকাভাষ্য বেরোল। সম্পাদকীয় কলামে। বিভিন্ন খবরের কাগজে। বিচিত্র বিচিত্র শিরোনামে।

... কলকাতা পুলিশের মায়াকান্না।

...ক্ষোভের শাক দিয়া অপদার্থতার মাছ ঢাকার অপচেষ্টা।

...কলকাতা পুলিশ কেবলই ঘুমায়ে রয়!

শিরোনাম যতই আলাদা হোক, ভেতরের বয়ান মোটামুটি সকলেরই এক। ... কলকাতা মহানগরী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং শান্ত বলে এই শহর দিন দিন সন্ত্রাসবাদীদের প্রধান আশ্রয়স্থল হয়ে উঠছে। পঞ্জাবের উগ্রপন্থী, কাশ্মীরের উগ্রপন্থী, অসম উগ্রপন্থী, এল টি টি ই, বৈরি নাগা, বৈরি মিজো, যে যখন ইচ্ছে সুবিধা মতো এই শহরে এসে গা ঢাকা দেয়। কলকাতা পুলিশ এদের কোনও খবর তো রাখেই না, রাখার আগ্রহ আছে বলেও মনে হয় না। সাম্প্রতিক চক্রবেড়িয়ার ঘটনাই এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। কলকাতা পুলিশের ক্ষোভ হয়তো অসঙ্গত নয়, এক রাজ্যের পুলিশ অন্য রাজ্যে এসে নির্দ্বিধায় গুলিগোলা চালিয়ে যাবে এটা কখনই কোনও সভ্য রাষ্ট্রে অভিপ্রেত হতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন তাদের আসতে হয়? কেনই বা তাদের গোপনে অভিযান চালাতে হয়? তবে কি এটাই ধরে নিতে হবে কলকাতা পুলিশের কার্যকলাপের ওপর তাদের আস্থা নেই? কলকাতা পুলিশের একটি উগ্রপন্থী দমন বিভাগ আছে বলে শোনা যায়, তাদের কাজ নাকি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অনুপ্রবেশকারী এবং সন্ত্রাসবাদীদের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা। এই ধরনের একটি

ঘটনা কি ওই বিভাগের অকর্ম্মণ্যতাই প্রমাণ করে না? পঞ্জাব পুলিশের দিকে আঙুল না তুলে কলকাতা পুলিশ নিজের দিকে আঙুল দেখাক। অযোগ্যতা কখনই আত্মরক্ষার বর্ম হতে পারে না।

পরদিন কোনও সংবাদপত্রেই আর খবরটির উল্লেখ নেই।

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর পুলিশমন্ত্রী তাঁর বিভাগকে ঘটনাটির অনুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

সাত

শ্মশানে পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার নেমে গেল। গুরদোয়ারার শববাহী গাড়ি মৃতদেহ দুটো নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে, ফটক অতিক্রম করার পরও তাদের গরগর আওয়াজ বেশ খানিকক্ষণ লেগে রইল কানে। ধ্বনি মিলিয়ে যেতেই আপাত নৈঃশব্দ্য। ক্ষণিকের জন্য। আবার শ্মশান ফিরেছে নিজস্ব কোলাহলে।

গাড়ি পার্কিংস্পেসে লাগিয়ে নামল রাজিন্দর, ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। কী দেখছে জানে না, কেন দেখছে জানে না, চার পাশের কোনও দৃশ্যই তার অসাড় মগজে আর এতটুকু ছাপ ফেলতে পারছে না। অদ্ভুত এক ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে রাজিন্দর।

তিন দিন ধরে এমনটাই চলছে। তবু এরই মধ্যে সব কাজ করে যেতে হচ্ছে রাজিন্দরকে। হাত চলে না, তবু স্টিয়ারিং ধরতে হয়। পা সরে না, তবু সতেরো জায়গায় ছোটার কামাই নেই। ঠোঁট নড়ে না, তবু অনর্গল জবাবদিহি করে যেতে হচ্ছে পুলিশকে। খানিক আগে মর্গ থেকে গুরবচন রোহিণীর লাশ ছাড়ানোর তিক্ততম অধ্যায়টি শেষ হল। সেখানেও সইসাবুদ সহ সব করতে হয়েছে রাজিন্দরকেই। সব মানে অনেক কিছু। লালবাজারে কন্‌স্টেবল্ থেকে ডেপুটি কমিশনার, সকলের সামনে মিনতি ভরা চোখে দাঁড়িয়ে থাকা, বার বার থানায় গিয়ে রিপোর্টের জন্য হাত কচলানো, কাউন্সিলারের কাছ থেকে নিজের একটা আইডেনটিটি সার্টিফিকেট বার করা (এই কাজটাই সম্ভবত সবথেকে কঠিন এবং পরিশ্রমসাপেক্ষ। কাউন্সিলার প্রায় ঈশ্বরের মতো। তিনি সর্বত্র আছেন কিন্তু তাঁকে কোথাও পাওয়া যায় না। অথবা গেছোবাবার মতো। এখন উনি এখানে নেই, তার মানে সেখানে থাকতে পারেন। অর্থাৎ সেখানে নেই, তিনি আছেন ওখানে। তাঁর সন্ধানে তাঁর বাড়ি, মিউনিসিপ্যালিটি বরো অফিস, পার্টি অফিস, তাঁর সঙ্গীসাথীদের ডেরা— শাটল্ ককের মতো অবিরাম ঠিকরে ঠিকরে দৌড়তে হয়।), মর্গের ডাক্তারের হাতে পায়ে ধরে জলদি জলদি কাটাছেঁড়া করিয়ে নেওয়া, ডোমকে তেল মারা, এবং ঘন ঘন মানিব্যাগ বার করা। এ সবই রাজিন্দর করেছে এক বুকভাঙা হাহাকার নিয়ে, তীব্র কান্না যখন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে আছে।

মানুষের বোধহয় একটা বোধহীন মগজও থাকে, সেটিও কিছু কম কর্মকুশল নয়। না হলে রাজিন্দরের পক্ষে এত কিছু সামাল দেওয়া সম্ভব হত না।

শ্মশানে খুব বেশি লোক আসেনি। আছে পরমিন্দরের জনা কয়েক বন্ধুবান্ধব, তারা রাজিন্দরেরও পরিচিত বটে। আর বাড়ির লোকদের মধ্যে কুলদীপ, পরমিন্দর, রাজিন্দরের মেয়ে জামাই, গুরবচনের ছেলে নাতি। রশ্‌মি সুখবিন্দর শনিবারই ছুটে এসেছে কলকাতায়, সারাক্ষণ আছে পাশে পাশে। দলজিৎ আর গুড্ডু আজই সকালে রোহিলা থেকে পৌঁছল। গুরবচনের বাড়িতে টেলিফোন নেই, শনিবারই আরজেন্ট টেলিগ্রাম করেছিল রাজিন্দর। পাবে কি পাবে না রাজিন্দর নিশ্চিত ছিল না, পরমিন্দরকে দিয়েও টেলিফোন করিয়েছিল অমৃতসরে, পরমিন্দরের এক বন্ধুর বাড়িতে। এত অবশ্য না করলেও চলত, রবিবারই দলজিৎ ওখানকার কাগজে খবরটা দেখতে পায়। তারা বাপ বেটা প্লেনে এসেছে, ভায়া দিল্লি।

সুখবিন্দর গ্রন্থিকে ডেকে আনতে গুরদোয়ারা চলে গেল। মৃতদেহ দুটো মর্গ থেকে আর বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়নি, প্রার্থনা শ্মশানেই হবে। অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম অবশ্য মর্গেই সেরে ফেলা হয়েছে। মৃতদেহকে দহি পানিতে স্নান করানো, নতুন জামাকাপড় পরানো, শ্বেত বসন জড়ানো, দেহের ওপর শাল বিছিয়ে

দেওয়া...। আগুনে প্রবেশ করানোর আগে এখন শুধু এই অন্তিম কাজটুকুই বাকি।

রাজিন্দর পা টেনে টেনে শ্মশানঘরে এল। হাই পাওয়ারের বালব্ জ্বলছে, তবু হলঘরটাকে বড় অনুজ্জ্বল লাগে। কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া ছায়া ছায়া ভাব। বেদির ওপর পাশাপাশি শায়িত রয়েছেন গুরবচন রোহিণী। আপাদমস্তক মোড়া, ফুলে ফুলে ঢাকা। বাবা মা'র দেহ ঘেঁষে দলজিৎ, মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। কুলদীপ আর গুড্ডু, সমবয়সি কাকা ভাইপো, খানিক তফাতে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে। রশ্মি অনুচ্চ স্বরে কথা বলছে পরমিন্দরের এক বন্ধুর সঙ্গে, তার সাদা ওড়নার কোণ চোখের নীচে চাপা। অপেক্ষমাণ এক শব এই মাত্র চুল্লিতে ঢুকল, মৃদু হরিধ্বনি মথিত করছে গোটা ঘরটাকে।

দলজিতের ঠিক পিছনটিতে এসে দাঁড়াল রাজিন্দর। বস্ত্রাবৃত দেহ দুটির দিকে তাকিয়ে আছে অপলক। চোখের সামনে আবার সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য।... পড়ে যাচ্ছেন রোহিণী, তাঁর পিঙ্গল চোখের মণি পলকে স্থির হয়ে গেল! দৃষ্টি তবু কী ভীষণ বিস্ফারিত! কী বলছিল ওই চোখ? এ কেমন বিচার? এ কেমন সাজা? ফুটো হয়ে যাওয়া কপাল থেকে গড়িয়ে আসা রক্তধারা আশ্রয়হীন যন্ত্রণায় কালো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ! ঠোঁট অল্প ফাঁক হয়ে ছিল রোহিণীর, কিছু কি বলতে চেয়েছিলেন শেষের মুহূর্তে? পাশে বিশাল মাপের মানুষটা উপুড় হয়ে পড়ে, হাত দুটো তাঁর মুষ্টিবদ্ধ! মৃত্যুর ক্ষণে কি মাটি আঁকড়ে ধরতে চাইছিলেন গুরবচন? রোহিলার মাটি? নিজের মাটি?

অজান্তেই গলা দিয়ে একটা গোঙানির মতো শব্দ উঠে এল রাজিন্দরের। দলজিৎ ঘুরে তাকিয়েছে —কিছু বলছেন মামাজি?

রাজিন্দর দ্রুত মাথা নাড়ল।

—ডাকছেন আমাকে?

—না।

দলজিতের ভারী মাথা চলে গেল স্বস্থানে। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে।

একটা তাত অনুভব করছিল রাজিন্দর। অসহ্য লাগছে। যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এই মাত্র কেউ যেন বুকে আবার ধাঁই ধপাধপ নেহাই পেটাতে শুরু করল।

খোলা হাওয়ায় ফিরে এল রাজিন্দর। উত্তুরে বাতাস বইছে। আজ যথেষ্ট কামড় আছে ঠাণ্ডার, বিঁধছে। তবু এখানেই যেন স্বস্তি। ভেতরের ওই ঘরটায় দাঁড়িয়ে থাকার মতো মনের জোর রাজিন্দরের এখন নেই।

সমর চ্যাটার্জি হন্তদন্ত মুখে ঢুকছে শ্মশানে। রাজিন্দরকে দেখে হাঁটার গতি শ্লথ হল। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে চুপচাপ। পরনে হাফস্লিভ সোয়েটার, গলায় মাফলার, হাতে হাত ঘষছে মাঝে মাঝে।

একটুক্ষণ পরে গলা ঝেড়ে বলল —কাজকর্মের কদ্দূর?

রাজিন্দর মুখে কিছু বলল না, ঈষৎ কাঁধ ঝাঁকাল শুধু।

—মর্গে আজ আর কোনও প্রবলেম হয়নি তো?

—নাহ্।

—ফালতু ফালতু বডিগুলো দু দিন ঠাণ্ডাঘরে পড়ে রইল। সেদিন যদি ডাক্তার বিকেল চারটের মধ্যে কেটে না পড়ত তা হলে আর এই ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হত না! ব্যাটারা শুধু নিজেদের তালে থাকে। কখন চেম্বারে গিয়ে বসবে...! আরে বাবা, এটা তো ভাববি, পরের দিনটা রবিবার, কাঁটাছেঁড়া হবে না...

রাজিন্দর আলগা শ্বাস ফেলল — এক দিক দিয়ে ভালই হয়েছে। দিদির ছেলে নাতি সব এসে গেল...

—বাহ্, এসে গেছে? ভেরি গুড নিউজ। ছেলে যা হোক একবার তাও বাবা মার মুখ দেখতে পেল।

আবার একটা শ্বাস পড়ল রাজিন্দরের। দলজিৎ এসে বাবা মার মুখ দেখতে পায়নি, এ কথা জানানোরও উৎসাহ বোধ করছে না। বিষয়টাই কেমন যেন তেতো লাগছে। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য বলল —আপনি কি সিধা দোকান থেকে?

—হ্যাঁ। আজ ঝটপট শাটার নামিয়ে দিলাম।

—নন্দ মাধাই এসেছিল?

—নন্দটা ডুব মেরেছে। ...মাধাই বলছিল আসতে পারে এখানে।

—কনস্যুলেটের গাড়িটার কাজ হয়ে গেছে?

—সে তো শনিবার হয়ে গেছে। তপন করে দিয়েছে।

—ও হ্যাঁ, শনিবারই তো করার কথা ছিল।... আমার কেমন দিন তারিখ গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। রাজিন্দর অপ্রস্তুত মুখে হাসল। ঠিক হাসি নয়, ঠোঁটের কোণে এক চিলতে করুণ রেখা যা দেখে হাসি বলে ভ্রম হয়। চোখ বুজে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল —কী যে জঘন্য বিপদে জড়িয়ে গেলাম!

—সবই নসিব সিংজি। ওপরঅলার খেল। বুড়ো আঙুল তুলে আকাশ দেখাল সমর চ্যাটার্জি। অথবা তারও অন্তরালের অন্য কিছু। আলগা হাত রাখল রাজিন্দরের কাঁধে —তিনি না চাইলে কি এসব ঘটতে পারে?

—হুঁ। রাজিন্দর তো এ কথাই ভাবতে চায়।

—আপনার দিদি জামাইবাবুর কথাটাই ভাবুন। তাঁরা কি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পেরেছিলেন বাড়ি থেকে এত হাজার মাইল দূরে মৃত্যু তাঁদের জন্য ঘাপটি মেরে বসে আছে!

—হুঁ। এই বিস্ময়ের ঘোর এখনও তো কাটেনি রাজিন্দরের।

—তারপর ধরুন, আপনার দিদি যদি হঠাৎ ওভাবে উত্তেজিত না হয়ে পড়তেন... মানে আপনার কাছে যা শুনেছি আর কী... তা হলে হয়তো এমন মর্মান্তিক কিছু নাও ঘটতে পারত। আপনার জামাইবাবুকে তুলে নিয়ে যেত... উনি তো নির্দোষই, আপনি যা বলছেন...দু-পাঁচ দিন বাদে ছেড়ে দিত।

—হুঁ।

রাজিন্দর এবারও শান্তভাবে শব্দটা উচ্চারণ করল বটে, তবে নিজের স্বরের অন্তর্লীন ঝাঁঝটা বেশ টের পেল। ভেতরে ভেতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা ক্ষোভ হঠাৎই যেন ফুঁসে উঠতে চাইছে। তার দুই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তারই কাছে এসে তারই চোখের সামনে কুকুর বেড়ালের মতো মারা গেলেন, তিন হাত তফাতে থেকেও সে তাঁদের প্রাণরক্ষা করতে পারল না, এ যে তার কাছে কী ভয়ানক বেদনার! রোহিণী উত্তেজিত হয়েছিলেন, রোহিণী দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন, সবই সত্যি। কিন্তু রাজিন্দর কেন ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে রাখল না পহেনজিকে? কেন ঠুঁটো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে? নিজের প্রাণের ভয়ে? ছিঃ, এই কি গুরু গোবিন্দ্ সিং-এর শিক্ষা!

সমর চ্যাটার্জি একটু সরে সিগারেট ধরিয়েছে। উলটো দিকে ফিরে ফসফস কটা টান দিল দ্রুত।

—আপনার কাছে টাকা পয়সা আছে তো সিংজি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে।

—সংকোচ করবেন না, লাগলেই বলবেন। আজকের পরেও তো আপনাদের কিছু রিচুয়াল আছে... বলেন তো এখন কিছু... আমি এনেছি।

—টাকা আছে আমার কাছে। থ্যাংক ইউ। রাজিন্দর তাড়াতাড়ি বলে উঠল —আপনাকে অনেক তকলিফ দিচ্ছি চ্যাটার্জিবাবু। একার ঘাড়ে দোকান পড়ে গেল, বার বার আমার কাছে ছুটে আসতে হচ্ছে...

—আরে ঠিক আছে। এমন সিচুয়েশানে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তো মানুষের ধর্ম। আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে, দশ পা পাশে পাশে হাঁটলে মানুষ বন্ধু হয়। আমরা দশ বছর পাশাপাশি হাঁটছি, নয় কি? আপনি আপনার সময় নিন। বিজনেস নিয়ে ভাবতে হবে না, সব মিটলে মন টন ঠাণ্ডা করে দোকানে আসবেন।

রাজিন্দরের চোখে জল এসে গেল। দুঃসময়ে মানুষ তো শুধু এইটুকুই চায়। একটু সহানুভূতি, একটু সহমর্মিতা, একটা দুটো উষ্ণ সান্ত্বনা। দিল্লিতে যদি এইটুকুই পেত তা হলে কি রাজিন্দর সব ছেড়ে কলকাতায় চলে আসত! তার দোকান জ্বালিয়ে দিল, মাল লুঠ হয়ে গেল, গোঁফ চুমরে চুমরে মজা দেখল বিজয় সাহানি, চমনলাল শর্মা, উমেশ সাক্সেনারা। নিজেদের মধ্যে মিঠাই খাওয়াখাওয়ি চলল! যারা দাঙ্গাফাসাদ করল, লুঠতরাজ চালাল, সকলে মিলে পিঠ চাপড়ে দিল তাদের! অথচ একই ছাদের নীচে আঠেরো বছর তারা পাশাপাশি দোকান চালিয়েছে!

পরমিন্দর ঘাটবাবুর অফিস থেকে ফিরছে। রাজিন্দরের হাতে কয়েকটা কাগজ জিম্মা করে দিয়ে শ্মশানঘরে ঢুকে গেল। মিনিট খানেকের মধ্যেই বেরিয়ে এসে সিমেন্টের বেঞ্চিতে উপবিষ্ট দুজন বন্ধুর

সঙ্গে কথা বলছে। পাশেই শবদাহ করতে আসা এক দঙ্গল ছেলে হইহল্লা জুড়েছে জোর, কথার ফাঁকে ফাঁকে পরমিন্দর বিরক্ত চোখে দেখছে তাদের, ঘন ঘন ঘড়ির দিকেও তাকাচ্ছে।

কী যেন ভাবতে ভাবতে রাজিন্দরের কাছে এল— সুখবিন্দর গেছে কখন জিজাজি?

—আধা ঘণ্টা তো হবেই। কেন পরমিন্দর?

—এখনও পাই'সাবকে নিয়ে এল না! আরেকটা বডিব পরেই কিন্তু আমাদের টার্ন।

—তাই তো! তা হলে তো চিন্তার ব্যাপার হল। আসার সময়েই আমাদের গুরদোয়ারা হয়ে আসা উচিত ছিল।

সমর চ্যাটার্জি বলে উঠল —আমি কি এগিয়ে দেখব সিংজি?

উত্তরের আগেই ভীম বেগে শ্মশানে ঢুকেছে একটা ম্যাটাডোর। পিছন পিছন এক লরি। ম্যাটাডোরের ডালা খুলে গেল, স্লোগান সহকারে নামছেন কোনও মৃত ক্ষুদে নেতা। গোটা চত্বর পলকে ভিড়ে ভিড়।

সমর চ্যাটার্জিকে এগোতে হল না, লরির প্রায় পিছনে পিছনে এসে পড়েছে সুখবিন্দর। সঙ্গে প্রবীণ গ্রন্থি। আরও তিন জন বয়স্ক শিখও এসেছেন গুরদোয়ারা থেকে, তাঁরাও অরদাসের সময়ে উপস্থিত থেকে মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করবেন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে প্রার্থনা শুরু হয়ে গেল। রাজিন্দররা যে যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সকলেই এখন গুরবচন রোহিণীকে ঘিরে করজোড়ে দাঁড়িয়ে। কেশরীরং দস্তার পরিহিত দীর্ঘদেহী গ্রন্থি সুপারি গাছের মতো ঋজু হয়ে অরদাস করছেন...যাঁরা চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে তাঁদের তুমি শান্তির আশ্রয় দাও প্রভু... যাঁরা রয়ে গেলেন তাঁদের শোক সহ্য করার শক্তি দাও।

জীবনে কত বার তো এই প্রার্থনা শুনেছে রাজিন্দর, কোনও দিন এভাবে তার মর্মে বেজেছে কি? রাজিন্দরের চোখ বেয়ে টসটস করে জল পড়তে লাগল।

রেওয়াজ অনুযায়ী পরমিন্দরের বাড়ি থেকে আজও রাজিন্দরদের রাতের খাবার এসেছিল। রোহিণী গুরবচন পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর উদ্বেগের একটা স্তরের অবসান হয়েছে, বাড়ি ফিরে সকলেরই শরীর প্রায় ছেড়ে আসছিল, আহারের পাট চুকিয়ে আজ একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল সবাই। তিন ঘরেরই আলো নিবে গেছে। রাজিন্দরের ঘরে আজ রশ্‌মি-সুখবিন্দর-চুন্নি, গুড্ডু শুয়েছে কুলদীপের সঙ্গে, কোমল বিম্‌লার ঘরে। ড্রয়িং স্পেসে মোটা তোশক পেতে দলজিৎ আর রাজিন্দরের বিছানা করে দিয়েছে রশ্‌মি। ড্রয়িংস্পেসের আলো এখনও নেবেনি।

রাজিন্দর টানা সোফায় আধশোয়া হয়ে ছিল, একটা হাত আড়াআড়ি চোখের ওপর ফেলা। বিম্‌লার ঘর থেকে এখনও একটানা কান্নার সুর ভেসে আসছে। কখনও স্তিমিত হয়ে আসে সুর, কখনও চড়ায় উঠে যায়। বেহালার ছড় টানার মতো। রাজিন্দর কান্নাটাকে নিঃসাড়ে ধারণ করে নিচ্ছিল।

দলজিৎ বাথরুম থেকে বেরিয়ে মেঝেয় পাতা শয্যায় বসল। তার বয়স সাতচল্লিশ, মজবুত পেটানো স্বাস্থ্য, গায়ের রং প্রায় কালো ঘেঁষা, কাঁধ অত্যন্ত চওড়া, যাকে ব্যূঢ়স্কন্ধ বলে একেবারে তাই। তার দেহে প্রমত্ত বলের আভাস আছে। সকালে এ বাড়িতে পা রেখেই সে শিশুর মতো কান্নাকাটি করেছিল। এখনও তার রেশ পুরোপুরি চোখ থেকে মোছেনি।

দলজিৎ চাপা স্বরে রাজিন্দরকে ডাকল —মামাজি?

রাজিন্দর চোখ থেকে হাত না সরিয়ে সাড়া দিল —হুঁ?

—মামাজি, আপনার কি ঘুম এসে গেছে? একটু কথা ছিল।

উঠে সোজা হয়ে বসল রাজিন্দর —বলো।

—কিছু ভাবলেন?

—কী নিয়ে?

—আমার নিরীহ বাবা মাকে এরকম কুৎসিতভাবে মরতে হল কেন?

রাজিন্দরের বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল —আমি তো দিনরাতই সে কথা ভাবছি দলজিৎ।

—অমন ভাবার কথা বলছি না মামাজি। দলজিৎ চোখের কোণ দিয়ে রাজিন্দরকে দেখল —এই

অন্যায়ের কোনও প্রতিকারের কথা ভাবছেন?

—কী করা যায় বলো তো?

—ভাবুন আপনি। এখানে এসে আমার বাবা মা মারা গেলেন, প্রতিকারের চিন্তা তো আপনারই করা উচিত।

দলজিৎ যে এ কথাটা তুলতে পারে, আশঙ্কাটা রাজিন্দরের ছিল। উত্তর কী দেওয়া যায় তাও সাজিয়ে রেখেছিল মনে মনে। আসল সময়ে সব গুলিয়ে গেল। শুধু মনে হচ্ছে পহেনজি জিজাজির মৃত্যুর জন্য তাকে দায়ী করছে দলজিৎ এবং সে অধিকার তার আছে।

রাজিন্দর অসহায়ভাবে বলল —আমার মাথায় কিছু আসছে না দলজিৎ। কী করা উচিত তুমিই বলো।

—মামলা করুন। পুলিশের সঙ্গে লড়ুন।

—পঞ্জাব পুলিশের সঙ্গে কী করে লড়া যাবে? তারা তো মেরে দিয়ে পালিয়ে গেছে!

—কোনও উকিলবাবুকে ধরে পরামর্শ করুন। পঞ্জাব পুলিশ মারুক আর যেই মারুক, এ তো মার্ডার। পুলিশ বলে যা ইচ্ছে তাই করবে, আর আমাদের মুখ বুজে মেনে নিতে হবে? দেশে আইন বলে কিছু নেই? আমাদের ওখানে হলে তাও নয় একটা কথা ছিল। গণ্ডগোল চলছে, একে ধরতে গিয়ে পুলিশ ওকে ধরছে, একে মারতে গিয়ে তাকে মারছে... কিন্তু এত দূর ধাওয়া করে এসে দুটো সাধাসিধা ভালমানুষকে...

—সবই তো বুঝলাম দলজিৎ, তবু...

রাজিন্দর বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল। মামলা মোকদ্দমা করে কিছু লাভ হবে বলে তার বিশ্বাস হয় না। যদি কেসে পঞ্জাব পুলিশ হেরেও যায়, সঙ্গে সঙ্গে কি তাদের গর্দান চলে যাবে? মোটেই না। তারা হাইকোর্ট ছুটবে, সুপ্রিম কোর্ট ছুটবে, ছুটিয়ে ছুটিয়ে রাজিন্দরকে তারা পাগলা করে দেবে। যদি প্রমাণ হয়েও যায় জিজাজিকে তারা ভুল করে তুলতে এসেছিল, তাতেই বা কী? শয়তানরা বলতেই পারে জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে গুরবচন সিং তাদের আক্রমণ করেছিল বলেই তারা গুলি ছুড়েছে! প্রত্যক্ষদর্শী আছেটা কে? সে নিজে, কোমল, কুলদীপ আর বিমলা ছাড়া? উঁহু, বিমলাও নয়। তারা তিনজন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলবে জজসাহেব তাই বিশ্বাস করে নেবে? এ কি হয়?

দলজিৎকে এত কথা বলা যায় না। অন্তত এই মুহূর্তে। রাজিন্দর বুকে একটা লম্বা বাতাস টেনে নিয়ে বলল —ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ, আমি উকিলের সঙ্গে কথা বলব।

দলজিৎ সামান্য শান্ত হল। লুঙ্গি গুটিয়ে বাবু হয়ে বসে বলল—আপনাকে একটা কথা জানানো হয়নি। আসার আগে আমি অমৃতসরের পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর সঙ্গে দেখা করে এসেছি। একটা কমপ্লেনও দিয়ে এসেছি তাঁকে। উনি বলেছেন দেখবেন।

রাজিন্দর হ্যাঁ হুঁ ভাল মন্দ কিছুই বলল না। চুপচাপ শুনছে।

দলজিৎ বলে চলেছে— আমাদের ফ্যামিলির নামে যে ধাব্বাটা লেগে গেল সেটাও তো মোছা দরকার। গুড্ডু বিড্ডুর সামনে গোটা ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে... রোহিলার লোক নয় আমাদের চেনে, বিশ্বাস করে, তবু কলঙ্ক তো একটা রয়ে যাবে... ঝুটমুট...

রাজিন্দর এবার আর দলজিতের কথার অভিমুখটা ঠিক ধরতে পারল না। কোন কথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে দলজিৎ? কোনটা বেশি পীড়া দিচ্ছে তাকে? বাবা মার মৃত্যু, না পারিবারিক সংকটের দুর্ভাবনা? দলজিতের চিন্তাধারা যেন কেমন পরস্পরবিরোধী। এক দিকে আশা করছে মামাজি পঞ্জাব পুলিশের বদমাইশগুলোকে টাইট করে দিক, অন্য দিকে ভাবছে সেই বদমাইশগুলোই তার মুশকিল আসান করে দেবে। নাহ্, দলজিতের এখন মাথার ঠিক নেই।

গায়ে ভাল করে শাল জড়িয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল রাজিন্দর। দলজিতের সঙ্গে কথা বলে একটাই লাভ হয়েছে, মাথার চাপ চাপ বোঝা একটু বুঝি হালকা এখন। বাইরে ডিসেম্বরের রাত। ঝিমোচ্ছে। পাতলা পাতলা কুয়াশা ভাসছে চরাচরে। রাজিন্দরের অন্যমনস্ক চোখ ঘুরতে ঘুরতে ব্যালকনির কোনায়। শূন্য নেয়ারের খাট শূন্যতর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রাজিন্দরের। ফিরে এল অন্দরে, ভেজিয়ে দিচ্ছে ব্যালকনির দরজা।

হঠাৎই ফোন বেজে উঠল। এত জোরে যে ঝিমন্ত ফ্ল্যাট থরথর কেঁপে উঠেছে।

শুধু শব্দটাকে থামানোর জন্যই যেন দৌড়ে গেল রাজিন্দর। যখন ফোন ছাড়ল তখন তার মুখ কাগজের মতো সাদা।

পুট পুট আলো জ্বলে উঠেছে। তিন দরজায় তিন জন। রশ্‌মি কোমল আর কুলদীপ। তিন জনেরই মুখে প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ।

প্রাণপণে গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে রাজিন্দর বলল —পুলিশ দলজিতের কলকাতায় আসার খবর পেয়েছে। কাল একবার ডেকেছে দলজিৎকে। লালবাজারে।

সঙ্গে সঙ্গে দলজিতের চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে —কেন, আমাকে কেন?

—ওই রুটিন জিজ্ঞাসাবাদ করবে আর কী। রাজিন্দর খানিকটা কৈয়িয়ত দেওয়ার মতো করে বলল —এখানকার পুলিশ পঞ্জাব পুলিশের কাজটা ভাল চোখে দেখেনি দলজিৎ। তোমার কাছ থেকে ঠিক ঠিক জেনে নিলে...

—অসম্ভব। আমি কোথ্‌থাও যাব না। দলজিৎ রাজিন্দরকে থামিয়ে দিল। রুক্ষ স্বরে বলল — আপনাদের পুলিশ তলব করলেই অমনি আমাকে ছুটতে হবে? আমার নামে কোনও চার্জ নেই, তারা আমার টিকিও ছুঁতে পারবে না। আজ জলপরোয়াঁ করা হয়ে গেছে, বাবা মার অস্থি আমি নদীতে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছি, কলকাতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ। কালই গুড্ডু আর আমি ফ্লাইট ধরে চলে যাব। তেরো দিনের অখণ্ড পাঠ আমি রোহিলাতেই করব। কলকাতা পুলিশের যদি কিছু জানার থাকে তারা রোহিলায় আসুক।

বিমলার কান্না একটুক্ষণের জন্য থেমেছিল। আবার শুরু হয়েছে। বদ্ধ ফ্ল্যাটে আবহসংগীতের মতো সুরটা ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

আট

দলজিতের চলে যাওয়াটা মোটেই সাদা চোখে দেখল না পুলিশ।

দেখবে যে না, এ আশঙ্কা রাজিন্দরদের ছিলই। তবে তার পরিণাম সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল না। এক সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা পুলিশ সেটাও টের পাইয়ে দিল।

দলজিতের মহানিষ্ক্রমণের পরদিনই বীরবিক্রমে চড়াও পুলিশ। রাজিন্দরদের ওপর। ঘন ঘন ডাক পাঠাচ্ছে দপ্তরে। কখনও লালবাজারের এ ঘরে, কখনও ও ঘরে, কখনও বা থানায়, কিংবা লর্ড সিন্‌হা রোডের অফিসে। একবার এসি জেরা করে তো একবার ডিসি, নয়তো কোনও দুঁদে ইন্সপেক্টর সাবইন্সপেক্টর। একদিন বাপকে ডাকে তো একদিন ছেলেকে, কপাল মন্দ থাকলে এক সঙ্গে দুজনকেই। সকাল বিকেল দুপুর সময় অসময়ের বালাই নেই, তোমাদের কখন কী কাজ আছে জানার প্রয়োজন নেই, যখনই টুসকি বাজাব চলে এসো।

জেরা চলছে। জেরা চলছে। চলছে চলছে চলছে।

জেরার কত যে কায়দা! একদিন সকাল নটায় লালবাজারে হাজিরা দিল রাজিন্দর, সন্ত্রাসবাদী দমন শাখায়, ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরল রাত পৌনে নটায়। মারধোর করেছে? উঁহু। খারাপ ব্যবহার করেছে রাজিন্দরের সঙ্গে? প্রশ্নই ওঠে না। রাজিন্দর তো আর অপরাধী নয়! পুলিশ শুধু তিন দফায় প্রশ্নবাণ হেনেছে মাত্র। একবার সকাল সাড়ে দশটায়, একবার দুপুর পৌনে তিনটেয়, একবার সন্ধে সওয়া সাতটায়। প্রতি বারই মেয়াদ আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিট, বাকি সময়টা রাজিন্দর ঠায় করিডোরে। বসে বসে যে মশা মাছি মারবে তারও উপায় নেই। প্রথমত বসার জায়গা নেই, দ্বিতীয়ত্‌ পুলিশের সদর দপ্তরের করিডোরে মশা মাছি অত সুলভ নয়, তারা ঘরের ভেতরেই ভনভন করতে বেশি ভালবাসে। এদিক ওদিক নড়ার উপায় নেই, কোথ্‌থেকে এক ধুতিবুট পালোয়ান আবির্ভূত হচ্ছে সামনে। যাবেন না, স্যার আপনাকে ওয়েট করতে বলে গেছেন! অতএব কী আর করা, হাঁ করে লোকজন দেখছে রাজিন্দর। অথবা লোকজন হাঁ করে দেখছে রাজিন্দরকে। আশপাশ থেকে হাসিঠাট্টার আওয়াজ ভেসে আসে, কিংবা হুংকার খিস্তিখাস্তা, কিংবা চোরা ফিসফিস— ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে রাজিন্দর। দু বারে মাত্র

ঘণ্টাখানেকের ছুটি মিলেছিল, টিফিন করার জন্যে। আরেক দিন তো এক ভারিক্কি অফিসার রাজিন্দরকে নিয়ে ন' কড়া ছ' কড়া করল! রাজিন্দরকে সামনের চেয়ারে বসিয়ে রেখে একমনে ফাইল ঘাঁটছে তো ঘাঁটছে! উঠে ক্যাবিনেটের কাছে চলে গেল, আলমারি খোলা বন্ধ অভ্যেস করছে, বেয়ারাকে ডেকে জল চাইল, হাই তুলল, রুল দিয়ে সাদা কাগজে কীসব ঘর কাটছে—প্রশ্নও করে না অথচ চাপও বাড়ছে, সে এক মজার ইঁদুর বেড়াল খেলা! বেচারা কুলদীপ তো এমনিই ধন্দ মেরে গেছে। তাকেও একদিন দুই অফিসার মিলে ঝড়ের গতিতে গোটা কুড়ি প্রশ্ন করে একটা ফাঁকা ঘরে বসিয়ে রেখে উধাও হয়ে গেল! আধঘণ্টা পর অন্য দুজন। একই প্রশ্ন করে গেল তারা, একই ভঙ্গিতে। আবার ঘণ্টা খানেক বাদে আগের দুই মূর্তি। একই প্রশ্ন। কুলদীপ সামান্যতম অসহিষ্ণু হয়ে পড়লে অফিসারদের মুখ গোমড়া হয়ে যায়, অথবা তারা হাহা হেসে ওঠে। পরক্ষণে বিনা ভূমিকায় চলে যায় পরের প্রশ্নে। অর্থাৎ পুরনো কাসুন্দি!

তবে হ্যাঁ, প্রশ্নের ধারা আগাগোড়া একই রকম আছে। গুরবচন-রোহিণী সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো কমন। তাঁরা কেন এসেছিলেন, কবে এসেছিলেন, এসে কোথায় কোথায় গেছেন, কারা তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, কেন এত বছর পর তাঁরা কলকাতায় এলেন, তাদের পরিবারের ইতিহাস কী, এই সব। এ ছাড়া রাজিন্দরের জন্য এক সেট প্রশ্ন, কুলদীপের জন্য অন্য এক সেট। রাজিন্দরের পূর্ব ইতিহাস নিয়ে কৌতূহল তাদের, কুলদীপের বর্তমান। দলজিৎকে নিয়েও বার বার জলঘোলা করছে তারা, এমনকী কানাডায় পথদুর্ঘটনায় নিহত মনজিতের সঙ্গে উগ্রপন্থীদের কোনও যোগাযোগ ছিল কি না তাও বোঝার চেষ্টা করছে। কখনও পুলিশ সরাসরি প্রশ্ন করে, কখনও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। বাপ ছেলের জবানবন্দির ফাঁকফোকর খোঁজে বোধহয়। এর সঙ্গে জ্ঞাতিগুষ্ঠি, পরিচিত, অর্ধপরিচিত সকলের ঠিকানা সহ মিনি জীবনপঞ্জিও চাই তাদের। জানলেও মুশকিল, না জানলেও রেহাই নেই।

কদিনেই বাপ ছেলে নাজেহাল, চোখে সর্ষেফুল দেখছে। দুই ঘনিষ্ঠ আত্মজনকে কথা নেই বার্তা নেই দুমদাম মেরে দিয়ে গেল, তাঁদের কথা দু দণ্ড চিন্তা করারও অবকাশ নেই, সারাক্ষণ শুধু কাঁটা হয়ে থাকা।

সাত দিনে বার আষ্টেক বাপ ছেলেকে রগড়ে একটু বুঝি বা রণে ক্ষান্ত দিল পুলিশ। পর পর ক'টা দিন সাড়াশব্দ নেই। হয় জেরা ছুড়ে ছুড়ে নিজেরাই ক্লান্ত, জিরোচ্ছে ! নয় তাড়া তাড়া তথ্য নিয়ে গবেষণায় বসেছে!

রাজিন্দর, কুলদীপ সামান্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

নয়

একটু বেলা করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কুলদীপ। ভার ভার বুকে পা রেখেছিল কলেজবিল্ডিং-এ, ক্লাসরুমের দরজায় এসে ঝপ করে মনটা ভাল হয়ে গেল।

আঃ, সেই চেনা গন্ধ! সেই পরিচিত পরিবেশ!

পরশু থেকে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে শহরে। তার আগের দিন মেঘ করেছিল খুব, ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও হয়েছিল। শ্লেটবরণ আকাশে নীল ফিরতেই কনকনে হাওয়া বইতে শুরু করেছে, রোদমাখা দুপুরেও হাড় কাঁপিয়ে দেয়। সোয়েটার কার্ডিগান শাল চাদরেরা এখন ঝাঁপির বাইরে, কলেজে এখন ফ্যাশনের মেলা।

পি বি স্যারের লেকচার, বোর্ডে মনোযোগ দিয়ে কী যেন লিখছেন স্যার। কুলদীপকে দেখে ক্লাসের সব কটা মুণ্ডু একসঙ্গে দরজার দিকে ঘুরে গেল, একটু যেন মৃদু গুঞ্জনও উঠল।

সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে গেল কুলদীপ, প্রায় নিঃশব্দ পায়ে লাস্ট বেঞ্চে গিয়ে বসেছে। পাশে দেবর্ষি, আড়ে একবার কুলদীপকে দেখে তার চোখ আবার ব্ল্যাকবোর্ডে।

কুলদীপ ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল—কতক্ষণ এসেছেন রে স্যার?

—এই তো।

—রোল কল হয়ে গেছে?

—না।

ছোট ছোট বাক্যবন্ধ, তাতেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। বন্ধুর কণ্ঠস্বর বলেই কি? কুলদীপ আর কথা বলল না, চোখ ঘুরছে ইতিউতি। চেনা চেনা প্রিয় মুখ সব। অয়ন পরে আছে নীলসাদা পুলওভার, ঊর্মির গায়ে কাচ বসানো লাল টুকটুকে জয়পুরি শাল, হরিহরন খয়েরি জ্যাকেট, সুকান্ত সবুজ উইন্ডচিটার, পিয়াল সৌম্যজিৎ চকরাবকরা হাফস্লিভ...। রঙে রঙে যেন ভরে আছে ক্লাসরুমটা। দু-একজনের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায় হঠাৎ, কুলদীপ অপ্রস্তুতভাবে হাসে, বন্ধুদের দৃষ্টিতেই শরীরে ছড়িয়ে যায় বিদ্যুৎ তরঙ্গ।

কুলদীপ ফুসফুস ভরে শ্বাস টানল। এমন সুন্দর এক পৃথিবী ছেড়ে কোন দুঃস্বপ্নের জগতে এতদিন বাস করছিল সে!

স্নায়ুর ফুসফুস অভিঘাত কাটিয়ে কুলদীপ ব্লাকবোর্ডে মন দিল। ডটপেন খুলেছে, খাতাও। ইনডাসট্রিয়াল কেমিস্ট্রির ক্লাস, বোর্ডে ইউরিয়া তৈরির ফ্লো-চার্ট আঁকছেন পি বি, প্রতিটি অংশ ধরে ধরে বোঝাচ্ছেন। ক্ষণিকের জন্য কুলদীপের মনে পড়ল একদিন কীসে যেন ইউরিয়া সার দেওয়ার কথা বলছিলেন গুরবচন! হৃৎপিণ্ডটা শিবশির করে উঠল কুলদীপের। বেচারা বুড়োটা বিদেশ বিভুঁই-এ বেঘোরে প্রাণ হারাল। চোখ পিটপিট করে চিন্তাটাকে মন থেকে সরাল কুলদীপ, খাতার পাতায় খসখস টানছে বোর্ডের ছবি। টানতে টানতে ভাবল, সিলেবাসের আর কটা ফ্লো-চার্ট বাকি! সালফিউরিক অ্যাসিড কি হয়ে গেছে? হতেই পারে। মাঝে কম দিন তো গেল না! পনেরো, না না ষোলো দিন। গত হপ্তাটা শুধুমুদু বাড়িতে বসে রইল! এলেই হত কলেজে। সত্যি সত্যি কি আর তার পিছু পিছু কলেজে আসত পুলিশ! কী যে অহেতুক একটা ভয় কিলবিল করে বেড়াচ্ছিল শরীরে! শুধু কি ভয়? সংকোচ ছিল না? কে কী ভাববে? কে কী বলবে! যাদের বাড়িতে ওরকম একটা খুনখারাবি ঘটনা ঘটে যায় তারাই একমাত্র বোঝে তাদের ভেতরে কী সাংঘাতিক ভূমিকম্প চলে। মিনিংলেস। মৃত্যু দুটো একেবারে মিনিংলেস। পুয়াজি কেন যে তেড়ে গেলেন মোহনের দিকে! মোহন! মোহন! আশ্চর্য, লোকটাকে তো চায়ের দোকানে দেখেই কুলদীপের চিনতে পারা উচিত ছিল! হাওড়া স্টেশনে ফুফ্‌ফরজির পিছন পিছন কামরা থেকে নামল! কিট্‌সব্যাগ কাঁধে কুলদীপের সামনে দিয়ে হনহন চলে গেল! চোখে রোদচশমা ছিল...! লোকটাকে চিনতে পারলেই কি কুলদীপ বিপর্যয়ের আগাম ইঙ্গিত পেয়ে যেত? হয়তো হ্যাঁ। হয়তো না। সন্দেহ একটা মনে জাগত ঠিকই, তবে কুলদীপ সাবধান হত কি? সাবধান হয়েই বা কী হত? লোকটা তো দলবল নিয়ে আসতই।

ধুস, যত সব বাজে চিন্তা। গতস্য শোচনা নাস্তি। কুলদীপ মনকে শাসন করল। বুঝি বা মন ঘোরাতেই দেবর্ষির দিকে ঝুঁকল—টেস্টের রুটিন দিয়ে দিয়েছে?

—হ্যাঁ। চার-পাঁচ।

—মানে ক্রিসমাসের পর কলেজ খুললেই?

দেবর্ষি ছোট্ট করে ঘাড় নাড়ল।

—ফুল সিলেবাস পরীক্ষা হবে?

—না। যে যদ্দূর পড়িয়েছেন।

—ও।

কুলদীপ নতুন করে লেকচারে মন বসানোর চেষ্টা করল। পিবি স্যারের এতক্ষণে চোখ পড়েছে তার ওপর, মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছেন! স্যারের দৃষ্টি কি তির্যক! নাকি এ কুলদীপের মনের ভুল? কিছু প্রশ্ন করে বসবেন নাকি স্যার?

নাহ্, করলেন না। এমনকী রোল কল করার সময়েও না। ক্লাস শেষ হতে দেওয়ালে ডাস্টার ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে গেছেন।

কুলদীপ খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল। একই সঙ্গে নিজেকে প্রস্তুতও করে নিচ্ছিল সে। এবার একে একে সহপাঠীদের কৌতূহলের তীর নিক্ষিপ্ত হবে তার দিকে, শান্ত মুখে উত্তর দিতে হবে।

আশ্চর্য, কেউ কুলদীপের দিকে এগোল না, নিজেদের মধ্যে কথা বলতেই ব্যস্ত বেশি। দেবর্ষিও ভীষণ ব্যগ্র মুখে ঊর্মির কাছে চলে গেল, কী নিয়ে যেন হাসাহাসি চলছে দুজনের।

ধাঁধার মতো লাগছিল কুলদীপের। তার সঙ্গে কি কেউ কথা বলতে চায় না? নিজেই এগিয়ে অয়নের কাছে গেল—কীরে, কী খবর?

অয়ন আলগা হাত ওলটাল—খবর তো তোর।

—যা বলেছিস। কুলদীপ লঘু গলায় বলল—উফ্, কদিন যা ক্রাইসিসটা গেল!

—হ্যাঁ, কাগজে পড়েছি। অয়ন আগ্রহ দেখাল না।

কুলদীপ থতমত খাওয়া মুখে বলল,—পরশু ফাংশনটা হচ্ছে তো?

—না হওয়ার কী আছে!

—কী হচ্ছে শেষ পর্যন্ত? বিসর্জন-ই?

—ও শিওয়।

—অপর্ণা কে করছে? ঊর্মি, না মধুছন্দা?

উত্তর না দিয়ে অয়ন সরে গেল একটু। সুকান্ত দরজা থেকে ডাকছে। সেদিকে তাকিয়ে বলল—যাচ্ছি।

কুলদীপ আবার যেচে প্রশ্ন করল—ক্যান্টিন যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

—এখন প্র্যাকটিক্যাল আছে না?

—হবে না। রিহার্সাল আছে।

—তাই বল। কুলদীপ এর মধ্যেই আড়ষ্ট হয়ে গেছে বেশ। ইতস্তত করে বলল—আমি যাব তোদের সঙ্গে?

অয়ন ভুরু কোঁচকাল—জিজ্ঞেস করার কী আছে! চল!

ক্যান্টিন যথারীতি সরগরম। বেঞ্চিতে বেঞ্চিতে ছেলে মেয়ে চা ঘুগনি ওমলেট। কুলদীপকে দেখে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে কেউ কেউ। মাথা নামিয়ে কী যেন বলাবলি করছে দুটো মেয়ে। হয়তো নিছকই কৌতূহল, তার বেশি কিছু নয়, তবু দৃষ্টিগুলো পিন ফোটাচ্ছিল কুলদীপের গায়ে।

অয়ন সুকান্তরা খেয়ালই করছে না কিছু। চায়ের অর্ডার দিয়ে রিহার্সাল নিয়ে জোর আলোচনায় মেতেছে। মধুছন্দাই অপর্ণা হয়েছে, সুকান্ত রঘুপতি, সৌম্যজিৎ জয়সিংহ। মধুছন্দার সঙ্গে সংলাপ বলতে গিয়ে সৌম্যজিৎ কেমন ভেবলে যাচ্ছে তাই নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছে খুব। মধুছন্দার উচ্চারণে জড়তা আছে, র ড়-এর তফাত করতে পারে না, সেটিও বেশ মুখরোচক বিষয়।

কুলদীপ উশখুশ করছিল। যে বিষয় নিয়ে তার বন্ধুরা মশগুল সেটাই কি এই মুহূর্তে সব চেয়ে জরুরি! সামনে কুলদীপ বসে, অমন এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে তার বাড়িতে, কেউ একটা প্রশ্নও করবে না? কী ঘটেছিল তাও তো মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারে! অনেক অভিমান আছে কুলদীপের বুকে, তার ওই চরম বিপদের সময়ে একটা বন্ধুও তার বাড়িতে খোঁজ নিতে আসেনি। হতে পারে পুলিশ-টুলিশের ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিল তারা। কে না চায়! কুলদীপ হলেও হয়তো এমনটাই করত। কিন্তু একটা ফোন করেও তো খবর নিতে পারত কেউ! নিজে থেকে একজনও কিছু না জানতে চাইলে অভিমানও কি উগরোনো যায়?

মনের অভিব্যক্তি মনেই রেখে মরিয়া হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সঙ্গত করার চেষ্টা করল কুলদীপ। ফস করে বলে উঠল,—মধুছন্দা অপর্ণা করছে? ক্লাসে তো দেখলাম না?

—রিহার্সালের আগে এসে যাবে। দেবর্ষি ঘড়ি দেখল—এখনও রিহার্সালের দেরি আছে। তিনটেয়।

—সাব্‌সক্রিপশন সব উঠে গেছে?

—মোটামুটি।

—আমি কিন্তু এখনও দিইনি। কুলদীপ চোখ ঘোরাল—মেরে দেব?

অয়ন কাঁধ নাচাল। ভাবটা এমন দিলে দিবি, না দিলে দিবি না।

পার্স থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে টেবিলে রাখল কুলদীপ। যে কোনও টাকা হাতে এলেই অয়ন ঝটিতি পকেটে চালান করে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে কাগজে নামও টুকে রাখে। অভ্যাস। তার অতি সাবধানী স্বভাবের জন্য অনেকে তাকে ব্যাঙ্কার বলে ডাকে। এই মুহূর্তে কিন্তু কুলদীপের নোট

টেবিল থেকে তুলল না অয়ন, ফাঁকা চায়ের কাপ দিয়ে চেপে রেখেছে। দৃশ্যটা কুলদীপের নজর এড়াল না।

ক্রমশ অসহ্য লাগছিল কুলদীপের। হ্যাঁ, কুলদীপদের ফ্ল্যাটে পিসি পিসেমশাই এসেছিলেন, উগ্রপন্থী সন্দেহে পুলিশ তাদের খুন করে দেয়, এবং কাগজে বড় বড় করে বেরোয় খবরটা। কিন্তু প্রকৃত ঘটনাটা কী, তা কেউ কুলদীপের কাছে জানতে চাইবে না? পাড়ার লোকরা না, বন্ধুবান্ধবরা না, কেউ না! রবিবার যতীনের দোকানে কিছু মালপত্র কিনতে গিয়ে টোকনের সঙ্গে মুখোমুখি, সে তো প্রায় না দেখার ভান করে সরে পড়ল। কেন? নীচের ফ্ল্যাটের ঘোষ আঙ্কলরা, কুলদীপদের ফ্ল্যাটে তাদের নিত্য আসাযাওয়া, রশ্মির সঙ্গে ঘোষ আঙ্কলের মেয়ে খুকুদিদির কতদিনের পুরনো বন্ধুত্ব, তারা কী ব্যবহারটা করল! বাড়িতে কান্নাকাটি হচ্ছে, রশ্মিদিদি চুন্নিকে একতলায় ওদের কাছে রাখতে গিয়েছিল, আন্টি সোজা বলে দিল তারা এখন বেরোচ্ছে, চুন্নিকে ধরতে পারবে না! অথচ রশ্মিদিদি এলে ওই খুকুদিদি চুন্নিকে টেনে নিয়ে এখানে ঘুরতে যাচ্ছে, ওখানে বেড়াতে যাচ্ছে!

প্রশ্ন না করাটা অনেক সময়ে শরীর নিংড়োনো জেরার থেকেও বেশি বিধ্বস্ত করে দেয় মানুষকে। কুলদীপ অনুভব করতে পারছিল। একটা চোরা অপরাধবোধেও পীড়িত হচ্ছিল সে। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়ে তাদেরই ক্লাসের অরুণোদয়ের এক দাদাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। ডাকাতি আর খুনের চার্জে। অরুণোদয়ের বাড়ির সবাইকে পুলিশ জেরাও করেছিল খুব। খবরটা বিদ্যুৎবেগে কলেজে চাউর হয়ে গিয়েছিল। অরুণোদয় যেদিন এল, তাকে একেবারে ঘিরে ধরেছে বন্ধুরা। এই, কেসটা কী রে! তোরা একটুও টের পাসনি, তোর দাদা গ্যাঙে আছে! সত্যি! তোদের বাড়ি থেকে যে অত গোছা গোছা নোট পাওয়া গেল তোরা আগে কিচ্ছু দেখতে পাসনি! ঢপ্ মারিস না, তোরাও খুচখাচ মাল্লু পেতিস! অরুণোদয় কখনও চটে আগুন হয়ে যাচ্ছে, কখনও হেসে হেসে উত্তর দিচ্ছে, কখনও বা মুখ চুন!...তখনও তো অরুণোদয় কুলদীপের মতো অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়েনি।

কুলদীপ উঠে পড়ল—চলি রে।

—যাচ্ছিস?

—যাই।

ক্যান্টিনের দরজা অবধি গিয়ে একটু দাঁড়াল কুলদীপ। তাকে কি ডাকল অয়নরা? রিহার্সালে থাকার জন্যও বলবে না একবার? পরশু ফাংশানে আসার জন্যও না?

কুলদীপ বেরিয়ে এল। একতলার আলোছায়া মাখা করিডোর ধরে মন্থর পায়ে হাঁটছে। টিপটিপ করছে মাথা। আরও কী কী যেন কাজ ছিল? আরও কী কী কাজ? কাল রাতে প্র্যাকটিকালটা লেখা শেষ করেছে, স্যারকে দিয়ে ল্যাবরেটরি নোটবুকটা সই করিয়ে নিয়ে যাবে? টেস্টের পরে ক্লাস কি হবে আর? ফিজিকাল কেমিস্ট্রির আরও তিনটে এক্সপেরিমেন্ট বাকি, স্যারকে গিয়ে অনুরোধ করবে কটা স্পেশাল ক্লাস যদি পাওয়া যায়? লাইব্রেরি যাবে একবার? শ্রিভের ইনডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রিটা খুব দরকার ছিল। থাক গে, রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরি থেকেই না হয়...। সুকান্তর কাছ থেকে ক্লাসনোটগুলোও আর চাওয়া হল না!

মধুছন্দা। থপাথপ পায়ে ঢুকছে কলেজে। কুলদীপকে পার হয়ে গিয়েছিল, গোঁত খেয়ে ফিরে এল। কুলদীপকে দেখে যেন ভূত দেখেছে এমন স্বরে বলল—ওমা তুই!

ম্লান হাসল কুলদীপ।

করিডোরে প্রচুর ছেলেমেয়ে ঘুরছে, আড্ডা মারছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। চকিতে তাদের দেখে নিয়ে মধুছন্দা গলা নামাল—ছাড়া পেয়ে গেছিস?

কুলদীপের গলা থেকে বিস্ময় ঠিকরে এল—মানে।

—তোকে অ্যারেস্ট করেছিল না?

—কেন, কী করেছি যে অ্যারেস্ট হব?

—না মানে সবাই বলাবলি করছিল...

কুলদীপের আঁতে লেগে গেল কথাটা,—আমাকে কি তোরা চোর ডাকাত খুনি ভাবছিস! নাকি জঙ্গি টঙ্গি?

—তা নয়। মধুছন্দা আমতা আমতা করতে লাগল—ভাবলাম তোদের ব্যাপার তো, সবাই যখন বলছে হতেও পারে।

—আমাদের ব্যাপার মানে!

—তোদের ব্যাপার মানে তোদের ব্যাপার। মধুচন্দা ঠোঁট ওলটাল—তোদের। আই মিন...তোদের।

কুলদীপ আহত বিস্ময়ে লক্ষ করল মধুছন্দার চোখ তার পাগড়িতে ঘোরাফেরা করছে।

ইশারা স্পষ্ট।

মধুছন্দার বোকাসোকা সরল দৃষ্টিটা বর্শা হয়ে বিঁধল কুলদীপকে, পলকে হৃদয়টা বিদীর্ণ হয়ে গেল।

মাথা নিচু করে রাস্তায় নেমে এল কুলদীপ। ফুসফুসে যতটা বাতাস ভরে ক্লাসরুমে ঢুকেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি খালি হয়ে গেছে বুক। ঝকঝকে দুপুর যেন পাঁশুটে মেরে গেল হঠাৎ, সোনালি রোদ্দুর মলিন লাগে। সামনে মিনিবাস থেমে আছে, কন্ডাক্টর যাত্রীদের ওঠার জন্য সাধাসাধি করছে, পারলে হাত ধরে টেনে তুলে নেয়। কুলদীপ সেদিকে গেলই না, ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। ভাঙাচোরা খানাখন্দ ভরা পথ, বারবার হোচট খাচ্ছে, হাঁটছে। শীতের দুপুরেও টিপটিপ ঘাম জমছে কপালে, হাঁটছে। ছোট্ট এক পার্ক পড়ল পথের ধারে, ক্রিকেট খেলছে বাচ্চারা, মাথায় পটকা বাঁধা দুটো পঞ্জাবি বালকও রয়েছে তাদের মাঝে—কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ছেলেগুলোকে দেখল কুলদীপ, আবার হাঁটছে। চক্রবেড়িয়া এত দূর!

পাড়া এল। রানাদের গলির মুখে পৌঁছে কুলদীপ ক্ষণিকের জন্য স্থাণু। সতৃষ্ণ নয়ন পুরনো আমলের দোতলা বাড়িটার দিকে। একতলার জানলা সব বন্ধ। শীতের দুপুরে এমনটা থাকার কথা নয়। মাসিমাও নেই? অথবা ওই বন্ধ জানলা কোনও শীতল নিষেধের ইঙ্গিত! কুলদীপের জন্যে?

....কী দরকার রে কুলদীপ, ফিরে যা। ....

বাড়ি ঢুকে কুলদীপ সোজা নিজের ঘরে। প্যান্ট শার্ট না বদলে শুয়ে পড়েছে বিছানায়। পাগড়িসহ শোওয়ার একটুও অভ্যেস নেই, অস্বস্তি হচ্ছে, তবু খুলল না। বুঝি বা জেদের বশে। ঘরটা বড় বেশি হিম হয়ে আছে, হাত বাড়িয়ে কম্বল খুঁজল। নেই। উপুড় হয়ে মুখ গুঁজল চাদরে।

নিঝুম ফ্ল্যাটময় অস্ফুট এক ধ্বনি। কোমল খুব আস্তে টিভি চালিয়েছে। আজকাল সারা দিন তার বড় খাটুনি যায়, দুর্ঘটনাটার পর দিন থেকে ঠিকে কাজের লোক আসছে না, একা হাতে করতে হয় সবকিছু। বান্নাবান্না, ঘর ঝাড়পোঁছ, কাপড়কাচা, বাসন মাজা সারতে সারতে বেলা গড়ায়। দুপুরের দিকে টিভিটাই যা একটু বিশ্রাম, বাতাসহীন ফ্ল্যাটে একমাত্র সঙ্গীও বটে। আজ কোমলের হাতে উলকাঁটাও আছে। চুন্নির জন্য সোয়েটার বুনছে। টিভি দেখা বা উল বোনা কোনওটাতেই তার অবশ্য মন নেই, দুটো কাজই সে করছে নেহাত যান্ত্রিকভাবে।

বিমলা ব্যালকনির খাটিয়ায়। রোদ পোহাচ্ছেন না, পুঁটলির মতো পড়ে আছেন। রোহিণী গুরবচনের মৃত্যুর তেরো দিন পর গুরদোয়ারায় অখণ্ড পাঠের আয়োজন করেছিল রাজিন্দর, সেখান থেকে ফিরে বিমলার কান্না হঠাৎ থেমে গেছে। সারা দিন ওই পুঁটলি হয়েই পড়ে থাকেন এখন, দশবার ডাকলে একবার সাড়া দেন।

উল বোনা বন্ধ করে ছেলের ঘরের দিকে মিনিট খানেক কান পেতে রইল কোমল, তার পর উঠে এসেছে দরজায়।

— কী রে, এসেই শুয়ে পড়লি যে?

কুলদীপ মুখ তুলল না।

— তুই বলেছিলি না ফিরতে শাম্ হবে, এত তাড়াতাড়ি চলে এলি?

উত্তর নেই।

কোমল বিছানার ধারে এল— তবিয়ত খারাপ? বুখার টুখার এল নাকি? দেখি।

কপাল থেকে মার হাত সরিয়ে দিল কুলদীপ, — কিছু হয়নি। আমি ঠিক আছি।

কোমলের ভুরুতে ভাঁজ, — চা খাবি?

— না।

— কী হয়েছে তোর বল তো! কোমল একটুক্ষণ থমকে থেকে ছেলের দিকে ঝুঁকল, — পুলিশ কি

তোর কলেজেও গেছিল?

— না।

— রাস্তায় ধরেছিল?

— না।

— তা হলে? .... কলেজে কোনও বুরি খবর আছে?

— না।

— কেউ কিছু বলেছে তোকে?

— বলছি তো কিছু হয়নি। কেন বিরক্ত করছ? একটু কি শুয়ে থাকারও উপায় নেই?

কোমলের মুখটা ছোট হয়ে গেল। ছেলের এই আচরণ তার অচেনা। কুলদীপ কক্ষনও বাবা মার সঙ্গে এমন রূঢ়ভাবে কথা বলে না। নতুন করে কী হল ছেলের!

মলিন মুখে সরে আসছিল কোমল, আচমকা তার হাত চেপে ধরেছে কুলদীপ— মাম্মি!

স্থির দাঁড়িয়ে গেল কোমল। ছেলের এই আর্ত স্বরও তার অচেনা।

কুলদীপ সজোরে চোখ চেপে আছে। যেন কান্না আটকানোর চেষ্টা করছে— ওরা আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে কেন?

— কারা বেটা? কে কী করল?

— সব্বাই। কে নয়! কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলছে না, সবাই অ্যাভয়েড করছে ....

— ও, এই কথা! .... এ তো হয়ই বেটা। যাদের বাড়িতে এমন কাণ্ড ঘটে যায়, সবাই তাদের থেকে দূরে দূরেই থাকে।

— কেন? অবিশ্বাস? সন্দেহ?

— হতেই পারে। পুলিশের ঝামেলা চলছে, কে ফালতু তার মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাইবে বল্! এ সব মামলায় মানুষ ভয় পায় বেটা। কোমল খাটে বসল, — ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দ্যাখ্, তুই জানিস তোর পুয়াজি ফুক্‌ফরজি নির্দোষ, বাইরের লোক তো জানে না। তারা তো আমাদের সন্দেহের চোখে দেখবেই।

— কেন দেখবে? আমাদের কেন দেখবে? আমরা কাউকে খুন করিনি। আমরা কোনও কিছুর মধ্যে নেই! কুলদীপ উত্তেজিত হয়ে উঠে বসেছে— আমাদের তারা এতদিন ধরে দেখছে, মিশেছে আমাদের সঙ্গে, চেনে, জানে .... পুয়াজি ফুক্‌ফরজি যদি টেররিস্ট হনও, আমরাও টেররিস্ট হয়ে গেলাম? যদি কারুর মনে সন্দেহও আসে, মুখের ওপর জিজ্ঞেস করে না কেন?

কোমল চুপ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে এক ধূসর বিষণ্ণতায় ছেয়ে যাচ্ছে তার মুখ। ভাবছে কী যেন। আঁকিবুকি কাটছে চাদরে। বেশ খানিকক্ষণ পর স্বগতোক্তির মতো বলে উঠল, — এর জবাব আমার জানা নেই পুত্তর। কে দুজন শিখ প্রধানমন্ত্রীকে মারল, তাদের তোর পাপা চিনত, না জানত! তবু তাকে মার খেয়ে দিল্লি ছাড়তে হল। আমাদের বেরাদরির বাইরে কেউই বোধহয় আমাদের বিশ্বাস করে না রে। ধর্ম আলাদা, তো মানুষও আলাদা। তোর ফুক্‌ফরজি এখানে এসে একটা কথা বলেছিলেন মনে আছে? দাঙ্গা করে গুণ্ডা বদ্‌মাশরা, সাধারণ মানুষেরা নয়। কথাটা ঠিক। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে ঘেন্নার ভাব না থাকলে, দুরিয়াঁ না থাকলে, গুণ্ডাই বল আর নেতাই বল, কেউ তার সুযোগ নিতে পারে না রে।

ঘরে আলো কমে এসেছে। আনাচে কানাচে জমাট বাঁধছে অন্ধকার। ওই কালো কালো ছায়ায় মধুছন্দার চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছিল কুলদীপ। তাকে নয়, তার মুখ, তার পাগড়ি দেখছে মধুছন্দা।

দশ

দেখতে দেখতে নতুন বছর এসে গেল। সাহেবপাড়া ভেসে গেল আলোর রোশনাইয়ে, হোটেলে হোটেলে মদের ফোয়ারা ছুটল, সূচনাক্ষণে প্রতি বারের মতো ভোঁ বাজল বন্দরের জাহাজে। পাড়ায় পাড়ায় বাজিও ফুটল, অবশ্যই শব্দদূষণের মাত্রা মেনে। ক্রিসমাসের দিন থেকে শীত তার পক্ষপুট আরও বিস্তার করতে শুরু করেছে, নিউ ইয়ারস্ ডে-তে থার্মোমিটারের পারা দশ ছুঁয়ে ফেলল। সর্বত্র খুশির মেজাজ। নরম রোদে বেরিয়ে পড়েছে রংবেরঙের মানুষ, মেলায় মেলায় জনস্রোত, চিড়িয়াখানায় লম্বা লাইন

পড়ে গেছে, বোটানিকাল গার্ডেনে পিকনিকের ধুম। দূর দেশ থেকে উড়ে আসা পাখিরাও এখন দারুণ সুখী, এই শহরে তারা স্বদেশের স্বাদ পাচ্ছে।

কুলদীপ কি জানে এ সব! মনে হয় না। সে এখন পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরোয় না, দিনরাত পড়াশুনোতে ডুবে আছে। আকাশের রং কখন গোলাপি হল, কখন ফিরোজা, কখনই বা তুঁতে, তা দেখায় কুলদীপের কণামাত্র আগ্রহ নেই। সে এখন নিজের গুহায় স্বেচ্ছাবন্দি।

কোথায়ই বা যেতে পারে কুলদীপ? কলেজ বন্ধ, খোলা থাকলেও সেখানে যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। মোড়ে বন্ধুদের জটলায় গিয়ে দাঁড়াবে? কিংবা পাড়ার ক্লাবঘরে? হাহ্, সে তো এখন ওসব জায়গায় অবাঞ্ছিত! শুধু তার উপস্থিতির জন্যই হয়তো গুলতানি হঠাৎ থেমে যাবে। টোকন বাচ্চু পল্টু তপারা ভীষণ মনোযোগী হয়ে পড়বে ক্যারাম খেলায়! অথবা এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে টিটি বোর্ডের দিকে! কুলদীপ যেচে কথা বললে হয়তো চমকে চমকে ভাসা ভাসা উত্তর দেবে, যেন কোনও অর্ধপরিচিতের সঙ্গে কথা বলছে! এ কি সহ্য হয় কুলদীপের!

এই বন্ধুদের সঙ্গেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সরস্বতী পুজোর চাঁদা তুলেছে কুলদীপ, দুর্গাপুজোর ভাসানে সিদ্ধি খেয়ে নেচেছে! প্রথম হুইস্কিতে চুমুক, সেও তো কালীপুজোর প্যান্ডেলে— ওদেরই সঙ্গে।

একটা মাত্র ঘটনায় কুলদীপ ওদের থেকে পৃথক হয়ে গেল!

ভাবলেই কুলদীপের বুকটা হুহু করে ওঠে।

ঘটনা তো আরও আছে, সেগুলো তো কারুর মনে পড়ে না!

এই তো সেবারই দুর্গাপুজোর প্রতিমা নিরঞ্জনের সময়ে গঙ্গার ঘাটে পা হড়কে গেল পল্টুর, প্রতিমার নীচে প্রায় চাপা পড়ে যাচ্ছিল, কে তাকে চুলের মুঠি ধরে উদ্ধার করেছিল? গত বছর দোলের দিন মাঝরাতে তপার বাবার হার্ট অ্যাটাক হল, নতুন গাড়িখানা বার করে কুলদীপ তাকে নিয়ে ছুটল হাসপাতালে, সারা রাত ক্যালকাটা হস্‌পিটালের লাউঞ্জে বসে আছে .....। টোকনের মার অপারেশন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঢুঁড়ে দু বোতল 'ও' নেগেটিভ ব্লাড তো জোগাড় করে এনেছিল এই কুলদীপই। আরও আছে, আরও আছে .....। নর্দান পার্কে ক্রিকেট টুরনামেন্ট, বেলতলা স্পোর্টিং-এর সঙ্গে সেমিফাইনাল, মাত্র বারো রানে কুলদীপদের ঝপ ঝপ পাঁচটা উইকেট পড়ে গেল, কে শেষ পর্যন্ত বুক চিতিয়ে ক্রিজে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছিল? আগে এ পাড়ায় এত ছাড়া ছাড়া ভাব ছিল না, প্রতি বছর বিজয়া দশমীর পর ঘরোয়া নাটক ফাংশান নাচ গান— নিজের হাতে কুলদীপ কত বার স্টেজ বেঁধেছে। তখন ক্লাস নাইনে পড়ে, পেরেক পুঁততে গিয়ে আঙুল ফেটে গেল, বুড়ো আঙুলে মোটা ব্যান্ডেজ জড়িয়ে দইঅলা সেজেছে কুলদীপ ....।

বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে পাড়ায় একা একা ঘুরবে কুলদীপ? পারবেই না। এ পাড়ার প্রতিটি বাড়িই তো এক একটা চেনা ছবি, সবার সঙ্গেই প্রায় কুলদীপের ভাল পরিচয়। ফুটবল পেটাপেটি করতে গিয়ে নাটু সেনদের বাড়ির জানলার কাচ ভেঙে গেল, নাটুবাবু কান ধরে ওঠ্-বোস্ করাচ্ছে কুলদীপদের ....। টোকনদের বাড়ির ছাদে ফিস্ট, কুলদীপ মাংসে পুরো একটা প্যাকেট লঙ্কা ঢেলে দিয়েছে, এমন ঝাল যে রাস্তায় ফেলে দেওয়া মাংসের টুকরোয় মুখ ছুঁইয়ে কুকুরগুলো পর্যন্ত দৌড়ে পালাচ্ছে, কুলদীপকে ধরে চাঁটাচ্ছে সবাই, টোকনের পিসিমা কুলদীপকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল ....। বিজয়া দশমী করতে মোড়ের ব্যারিস্টারের বাড়ি গেছে দল বেঁধে, কিপটে ব্যারিস্টারগিন্নির হাতে বানানো কাঁচকলার চপ খেয়ে 'কী সুন্দর মাছের চপ হয়েছে মাসিমা' বলে প্রশংসা ছুড়ছে কুলদীপরা, নিজেরা চোখ টিপে হাসাহাসি করছে .....।

ধুস, এ সব অলীক। এই ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দারাই কেউ কুলদীপদের মরা-বাঁচার খোঁজ রাখে না, তো পাড়া। সামনের ফ্ল্যাটের দেশাই আঙ্কলদের সঙ্গে একই দিনে এই ফ্ল্যাটে পা রেখেছিল তারা, দেশাই আন্টি হর ঘড়ি তাদের ফ্ল্যাটে আসছে, দুধ চাই, চিনি চাই— সেই দেশাই আঙ্কলরা দরজা খুলে মুখোমুখি হলে চকিতে চোখ সরিয়ে নেয়। কে-ই বা যেচে কথা বলে! সব পুরনো সম্পর্ক মিথ্যে হয়ে গেল! মাত্র কদিনেই।

এখন সত্যি শুধু একটাই। হাজার মাইল দূর থেকে গুরবচন সিং-এর কুলদীপদের ফ্ল্যাটে এসে উগ্রপন্থী সন্দেহে খুন হয়ে যাওয়া!

কেউ তাদের কখনও আপন ভাবেনি, মুখে মুখোশ এঁটে রেখেছিল মাত্র! সন্দেহের বিষ মনে ছিলই, ঘটনাটা একটা উপলক্ষ!

ভাল-ভাল। কুলদীপেরও কারুর মুখ দেখার দায় পড়েনি। সে ঘাড় গুঁজে টেস্ট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করছে নিজেকে। মাঝে মাঝে উঠে টিভি দেখে, দু-পাঁচ মিনিট ক্যাসেট শোনে, একটু হয়তো কথা বলল বাবা মার সঙ্গে, আবাব পড়া। টেস্টের রেজাল্টের ওপর কিছুই নির্ভর কবে না, তবু তার একাগ্রতা দেখে মনে হয় সে বুঝি কিছু প্রমাণ করতে চায়।

বেশ আছে কুলদীপ, বেশ আছে তার দমবন্ধ করা গৃহকোণে।

দমবন্ধ করাই তো। এ শহরের আনন্দ উচ্ছ্বাস কলরব সব এখন এই ফ্ল্যাটের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। যেটুকু বাতাস চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢোকে তা শুধু ওই শীতের হাওয়া। হিমমাখা।

ফ্ল্যাটের চার দেওয়ালের মধ্যে থাকতে থাকতে মাঝেমধ্যে বহু দিন আগের একটা ছবি কুলদীপের চোখের সামনে দুলে ওঠে। দিল্লিতে তাদের গীতা কলোনির অ্যাপার্টমেন্ট থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে তিন দিন তিন রাত বাংলা সাহিবে আশ্রয় নিয়েছিল তারা। কত ছোট ছিল সে তখন, তবু স্পষ্ট মনে আছে কী বিশাল সেই গুরদোয়ারা! প্রকাণ্ড চাতালে আর সব বাচ্চাদের সঙ্গে সারাক্ষণ ছোটাছুটি করছে, বাঁধানো তালাও-এর পাড় ধরে বনবন দৌড়, হইহই করে লঙ্গরে খেতে বসে যাচ্ছে, তার মধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। কবে আমরা ঘরে যাব মাম্মি! কেন বেটা, এখানেই তো বেশ আছিস! কিছু ভাল নেই, এখানে তো আমরা আটকে আছি! স্কুল যেতে পারছি না, পার্কে খেলা হচ্ছে না ....!

ওই ছবিটাই যে কেন মনে পড়ে, কে জানে!

এরই মধ্যে বাড়িতে এক নতুন অশান্তি।

সংসারে বিপদ কখনও একা আসে না, একটা বিপদের মধ্যে পরবর্তী বিপদের বীজ লুকিয়ে থাকে। অনেকটা পাড়ে আছড়ে পড়া সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। ফিরতি ঢেউয়ের চোরা টান নিজের অজান্তেই পরের ঢেউকে তৈরি করে দেয়।

এক দুপুরে খড়গ্‌পুর থেকে ফোন এল। রশ্‌মির। সুখবিন্দরের পেট্রল পাম্পে নাকি পুলিশ গিয়েছিল দু দিন, কী সব প্রশ্ন টশ্ন করেছে, সুখবিন্দর চটে আগুন হয়ে গেছে। রশ্‌মির ওপর নাকি খুব চোটপাটও করছে সুখবিন্দর, বহু কষ্টে ফিরে পাওয়া রশ্‌মির দাম্পত্যসুখ প্রায় যায় যায়।

রাজিন্দর দোকান থেকে ফিরে শুনল কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে তেতে গেল, — সুখবিন্দর বহুত মতলববাজ। পুলিশ আমাদের ডাকা বন্ধ করে দিল, সুখবিন্দরের কাছে যাচ্ছে! বাহানা, স্রেফ বাহানা। আবার পায়ে পা লাগিয়ে রশ্‌মিব সঙ্গে ঝগড়া বাধানোর ফিকির খুঁজছে।

কোমল প্রতিবাদ করল, —অমন কথা বলছ কেন! সুখবিন্দরের কথা তো সত্যিও হতে পারে। বিনা দোষে সে কেন ঝঞ্ঝাট পোহাবে?

— আমরা কি দোষ করে ঝঞ্ঝাট পোহাচ্ছি?

— দিমাগ ঠাণ্ডা করে কথা বলো। আমাদের সঙ্গে সুখবিন্দরের তুলনা আসে কী করে? পহেনজি জিজ্ঞাজিরা কি সুখবিন্দরের ফ্ল্যাটে পা রেখেছিলেন? নাকি তাঁদের সঙ্গে সুখবিন্দরের ভাল জানপহেচান ছিল? .... তুমি গুরুজন, কোথায় ছেলেটা ঝামেলায় পড়লে তাকে শলা পরামর্শ দেবে, সাহস দেবে, তা না আগেই তাকে দোষী ঠাউরে তড়পে যাচ্ছ! যদি তার কোনও বদ ফিকির থাকেও, মেয়ের মুখ চেয়ে তোমার তো উচিত তাকে শান্ত করে আসা।

রাজিন্দরের কানে বুঝি জল ঢুকল। কোমল অত্যন্ত শক্ত ধাতের মহিলা, আবেগের থেকেও যুক্তি দিয়ে চলে বেশি। গোটা ঝড়টা বয়ে যাওয়ার সময়ে সে একাই এ বাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে। চোখের সামনে জোড়া খুন হয়ে গেল, ফ্ল্যাট লোকে লোকে ছয়লাপ, পুলিশ, জেরার পর জেরা — চোয়ালে চোয়াল কষে শাশুড়ির শুশ্রূষা করে যাচ্ছে কোমল। পরমিন্দরকে খবর দিল, সমর চ্যাটার্জিকে ফোন করল ....। মর্গের গাড়ি এসে ভোররাতে লাশ দুটো নিয়ে যাওয়ার পর কোমলই অকম্পিত হাতে ধুয়েছে মেঝের রক্ত। স্বামী পুত্রকে আড়ালে রেখে নিজেই যা বলার বলেছে সাংবাদিকদের। কোমলের এই রূপটা রাজিন্দরের পুরোপুরি চেনা ছিল না। ইদানীং কোমলকে সে বেশ সমীহই করে।

কোমলের পরামর্শই শুনল রাজিন্দর। এখন তার পক্ষে কলকাতা ছাড়া সম্ভব নয়, রাতে ফোন করল খড়গ্‌পুরে। অনেকক্ষণ ধরে শান্ত স্বরে কথা বলল সুখবিন্দরের সঙ্গে। বোঝাল।

তবু স্বস্তি নেই। রোজ দুপুরে রশ্‌মির ফোন আসছে। কাঁদছে রশ্‌মি। সুখবিন্দর এখনও তাকে কথা শুনিয়ে চলেছে। রশ্‌মিদের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্যই তার ব্যবসার সুনাম নাকি যেতে বসেছে।

কী করে কী সমাধান হয় ভেবে পাচ্ছে না রাজিন্দর। দোকান থেকে ফিরে ঘাড় ঝুলিয়ে বসে থাকে। খাওয়ায় রুচি নেই, রাতে ঘুম আসে না, বিছানা থেকে উঠে ড্রয়িং স্পেসে ভূতের মতো পায়চারি করে। কী করে হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করা যায়? কী করে তার রশ্‌মির গৃহশান্তি ফেরাবে? দলজিতের কথামতো কেস্ করবে? পরমিন্দরকে সঙ্গে নিয়ে আগে একদিন উকিলের কাছেও গিয়েছিল। মামলা করা যেতেই পারে। পুলিশ যত বেআইনি কাজই করুক, আইন দিয়েই তাকে থামানো যায়। এমনকী পুলিশ ডাকলে সঙ্গে লইয়ারও নিয়ে যেতে পারে রাজিন্দররা। কিন্তু কলকাতা পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে, এর মধ্যে রাজিন্দরদের কোর্টে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

রাজিন্দরকে দেখে ভারী মায়া হয় কুলদীপের। তার তরতাজা, প্রাণবন্ত, অসুরের মতো খাটতে পারা ঊনষাট বছরের জোয়ান পাপা মাত্র কটা দিনেই বুড়ো হয়ে গেল। দাড়ি পেকে গেছে, কপালের চামড়ায় ভাঁজ, চোখের চাহনি কেমন ঘোলাটে। পাপার শার্টগুলো পর্যন্ত গায়ে কেমন ঢলঢল করে।

কেন যে রোহিণী-গুরবচন এখানেই মরতে এসেছিলেন!

এত পড়েও প্রথম দিনের পরীক্ষাটা কুলদীপের খুব জুতের হল না। সহজ একটা অঙ্ক ভুল, কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রির একটা সরল প্রবলেমে দাঁত ফোটাতে পারল না, অন্য একটা কোনও রকমে গোঁজামিল দিয়ে সারল। দ্বিতীয় দিন চুটিয়ে লিখল কুলদীপ। ছটা প্রশ্নেরই উত্তর লিখে সে যখন পরীক্ষার হল থেকে বেরোল তখন তার মগজ একদম ভারশূন্য হয়ে গেছে।

কলেজে এসে কোনও সহপাঠীর সঙ্গে যেচে একটিও কথা বলেনি কুলদীপ। দু দিনের এক দিনও না; অঙ্ক করার সময় দেবর্ষি বকের মতো গলা বাড়াচ্ছিল, কুলদীপ খাতা আড়াল করেনি। সুকান্ত সামনের বেঞ্চে বসেছিল, ঘাড় ঘুরিয়ে ক্যালকুলেটার চাইল, নিঃশব্দে দিয়ে দিল। তার আত্মমর্যাদাবোধ অতি প্রখর, সে নিজেকে ওদের স্তরে টেনে নামাতে পারবে না।

আজ আকাশটা বেশ উঁচুতে উঠে আছে। পাতলা পাতলা সাদা মেঘ ভাসছে আকাশের গায়ে, অনেকটা শরৎ কালের মতো। তেজহীন সূর্য হেলতে হেলতে পশ্চিমের বাড়িগুলোর পিছনে। ঠাণ্ডা বাড়ছে।

কুলদীপ সোজা বকুলবাগানের গ্যারেজে গেল। ছোট গ্যারেজ, গাড়ির কাজ কমই হয়, স্কুটার মোটরসাইকেলের ভিড় বেশি। আজ একটা প্রাচীন ফিয়াট পেটাপেটি করছে দুই চেনা মিস্ত্রি, ছোটেলাল ধারেকাছে নেই।

কুলদীপকে দেখে মিস্ত্রি দুটোর কাজ থেমে গেছে। ড্যাবড্যাব দেখছে কুলদীপকে, যেন কুলদীপ কোনও বাইসন বা গণ্ডার!

কুলদীপ এখন এ দৃষ্টিতে অভ্যস্ত, গায়ে মাখল না। বিনা ভণিতায় প্রশ্ন করল—ছোটেলাল কোথায়?

লম্বা লোকটা কুলদীপের দিকে তাকাতে তাকাতে বাইরে চলে গেল। পায়ে পায়ে কুলদীপ গ্যারেজের একদম ভেতরে। দুটো স্কুটার পাশাপাশি দণ্ডায়মান। রং বদলেছে, তবু নিজেরটা চেনা যায়। কাছে গিয়ে সিটে হাত বোলাল, ধুলো জমে আছে। স্ট্যান্ড থেকে নামিয়ে আলোয় নিয়ে এল। নাহ্, রং মন্দ হয়নি। তবে স্টিল গ্রে তো, আরেকটু ডিপ হলে ভাল খুলত।

ছোটেলাল চেঁচাতে চেঁচাতে ঢুকছে—আরে সর্দারজি, আমি তো ভাবলাম আপনি আর এলেনই না! মুফতসে আমার একটা স্কুটার লাভ হয়ে গেল।

স্বাভাবিক রসিকতা, বহু কাল আগেই স্কুটার নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তবু কেন যেন ঘাড়টা শক্ত হয়ে গেল কুলদীপের। গম্ভীর গলায় বলল—বিল রেডি?

— করে দিচ্ছি। দু মিনিটের তো ব্যাপার।

—চটপট দাও।

কালিঝুলি মাখা খাটো শার্টের পকেট থেকে নোংরা প্যাডের পাতা বার করল ছোটেলাল। সস্তা ডটপেনে চেপে চেপে হিসেব লিখছে। একবার চোখ বুলিয়ে কাগজটা কুলদীপের হাতে ধরিয়ে দিল।

কুলদীপ ভুরু কুঁচকোল—এত কেন? আঠোরোশো? পনেরোশো-এ কথা হয়েছিল না?

—ফেলে রাখার জন্য এক্সট্রা কাজ বেরিয়ে গেল না! ম্যাগনেট ডাউন মেরে গেল ..... সাইলেন্সারও গড়বড় করছিল। পরশু ক্লাচ ব্রেক খুলে আবার তেল মারলাম।

কুলদীপ কথা বাড়াল না। সাতশো দেওয়া ছিল, পার্স খুলে বাকি টাকা বার করছে।

ছোটেলাল হাতে হাত ঘষছে—একটা কথা জিজ্ঞেস করব সর্দারজি?

কুলদীপের টাকা গোনা থেমে গেল—কী?

—আপনাদের ফ্ল্যাটের সেই লোকটা নাকি রাইফেল নিয়ে পুলিশকে অ্যাটাক করেছিল?

গুজব বুঝি এভাবেই পল্লবিত হয়। মধুছন্দাদের কানে এক ভাবে পৌঁছয়, ছোটেলালদের কাছে আরেক ভাবে। এই নিয়ে বিরক্ত হওয়া মূর্খামি। মুহূর্তের জন্য গুরবচনের সন্ন্যাসীপ্রতিম চেহারাটা দেখতে পেল কুলদীপ। ওই মানুষটার কাঁধে রাইফেল মানাত কি? গম পাকলে গুরবচন নাকি দুধের গন্ধ পেতেন।

কুলদীপ ভাবলেশহীন গলায় বলল—হ্যাঁ। যে সে রাইফেল নয়, এ কে ফিফটিসিক্স। তোমার আর কিছু জানার আছে?

— না মানে, উনি কি ওটা পাঞ্জাব থেকেই এনেছিলেন?

—আমাদের ফ্ল্যাটেই ছিল। আরও অনেক কিছু আছে। রিভলবার, স্টেন গান, গ্রেনেড কার্তুজ। যেও একদিন আমাদের বাড়ি, দেখাব।

চল্লিশ ছোঁয়া ছোটেলালের চোখে তীব্র অবিশ্বাস, তবে কুলদীপ তার সঙ্গে পরিহাস করছে কি না নিশ্চিত হতে পারছে না সে। থতমত মুখে নিল টাকা, পকেটে পোরার আগে গুনতেও ভুলে গেছে।

কুলদীপ চাবি নিয়ে স্কুটারে স্টার্ট দিল। অনেক দিন পর একটা বিজাতীয় উল্লাস জাগছে শরীরে। কিছু জ্বালা যেন প্রশমিত হল। বুদ্ধু ছোটেলাল, তুই যে কেন নীরবে ঘৃণা ছোটাতে শিখিসনি!

সিঁড়ি দিয়ে শিস দিতে দিতে উঠছে কুলদীপ। দোতলার ল্যান্ডিংএ কথা বলছে আগরওয়াল গিন্নি ব্যানার্জিগিন্নি, কুলদীপকে দেখেই তাদের বাতচিত্ বন্ধ। অন্য দিন আচরণটা হুল ফোটায়, আজ কুলদীপ দৃকপাতই করল না।

ফ্ল্যাটে বেল বাজিয়েই ভুরু জড়ো হল কুলদীপের। মেয়েলি গলা পাওয়া যায় না? মামাজি এসেছেন নাকি? না রিঙ্কু?

কোমল দরজা খুলেছে। বহুকাল পর তার মুখে টিপটিপ হাসি।

জুতো ছাড়তে গিয়ে কুলদীপ স্ট্যাচু। যা দেখছে তা কি সত্যি, না স্বপ্ন! বড় সোফায় বিমঝিম! পাশে ঝিলিক!

ধক করে হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠেই ধীর লয়ে ফিরে গেছে। এক পা এক পা করে ড্রয়িংস্পেসে এল কুলদীপ। উচ্ছ্বাসহীন গলায় জিজ্ঞাসা করল,—তোমরা হঠাৎ?

ঝিলিক কলকল করে উঠল—বারে, তোমাকে দেখতে আসতে পারি না? কদ্দিন হয়ে গেল তুমি আমাদের বাড়ি যাও না!

..... কদ্দিন নয় রে ঝিলিক, বল কহাজার বছর! .....

কুলদীপ নির্লিপ্ত স্বরে বলল —পরীক্ষা ছিল রে। একটু পড়াশুনো করছিলাম।

কোমল বলে উঠল—কতক্ষণ ধরে ওরা বসে আছে। এত দেরি করলি কেন?

—কাজ ছিল।

—বোস। ওদের সঙ্গে কথা বল। আমাকে তো দু বোনে উঠতেই দিচ্ছে না .....।

কোমল রান্নাঘরে চলে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রিমঝিমের স্বর শুনতে পেল কুলদীপ— কেমন হল তোমার পরীক্ষা?

এতক্ষণে রিমঝিমের দিকে পরিপূর্ণ চোখে তাকাল কুলদীপ। মেরুনের ওপর হলুদ ছাপ সালোয়ার

কামিজ পরে আছে রিমঝিম, গায়ে কালো শাল। কপালে ছোট্ট একটা টিপ পরেছে, ছোট্ট কপালে তারার মতো ফুটে আছে টিপটা। চোখে কি কাজল দিয়েছে রিমঝিম, মণিদুটো অত গাঢ় লাগে কেন!

কুলদীপ চোখ সরিয়ে নিল—হয়েছে মোটামুটি। রানা কেমন আছে?

—দাদাভায়েরও পরীক্ষা চলছে। সেমিস্টার। ঝিলিক উত্তর দিল।

— মাসিমা মেসোমশাই?

—ভাল। বাবার মাঝে একটু জ্বর মতো হয়েছিল। রিমঝিমের গলা ঘন হল— আন্টি বলছিলেন তুমি নাকি একদম বাড়ি থেকে বেরোচ্ছ না?

...আর কী বলেছে মাম্মি? এতক্ষণ কী কথা হচ্ছিল মাম্মির সঙ্গে?

কুলদীপ ছোট সোফায় বসল—বললাম যে পরীক্ষা ছিল।

—আমাদের বাড়ি ক'পা দূর দীপদা?

ঝিলিক অভিযোগ হানল—জানো, তোমার জন্য আমার সর্দার সাজা হয়নি! শেষমেশ পাগল সাজলাম।

—ঠিকই আছে। কুলদীপ আলতো হাসল—সর্দার আর পাগলে কোনও তফাত নেই।

বিমলা ব্যালকনি থেকে উঠে ঘরে যাচ্ছেন। পঁচাশি বছরের শরীর ভাঙা ধনুকের মতো নুয়ে পড়েছে। সাদা ঢোলা সালোয়ার মাটি ছুঁই-ছুঁই। দৃষ্টি অস্বচ্ছ, কিন্তু অদ্ভুত রকমের স্থির। ঘরে যে দুজন অতিথি বসে আছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই তাঁর। এক পা হাঁটছেন, একটু থামছেন, আবার হাঁটছেন এক পা।

রিমঝিম বলে উঠল—উনি পড়ে যাবেন যে! আমি ধরব দাদিজিকে?

—না, উনি ওভাবেই হাঁটেন।

—ইস, কদিনেই দাদিজির অবস্থা কী হয়ে গেছে! আন্টি বলছিলেন আজকাল নাকি ডাকলেও সাড়া দ্যান না?

কুলদীপের স্নায়ু শিকারি বেড়ালের মতো সতর্ক হয়ে গেল। এ সব মমতামাখা শব্দ তার মোটেই ভাল লাগছে না। রিমঝিম কি বোনকে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে এসেছে? মাসিমা পাঠাল? এক মাস পর? মাঝে তো একটি দিনের জন্য ফোনও করতে পারেনি কেউ! তাও রানা আসতে পারল না, সেমিস্টার দেখাচ্ছে!

নির্বোধ এই নারী জানে না ভূমিকম্পে সান্ত্বনা চলে না।

শুকনো গলায় কুলদীপ বলল—মাম্মি বাড়িয়ে বলেছে। দাদিজি ঠিক আছেন। বেশি বুড়ো হলে মানুষের ওরকমই হয়। বলে একটু থামল। গলা আরও শুকনো করে নিয়ে বলল—আমরাও ঠিক আছি।

রিমঝিম নিশ্চুপ। ঝিলিকেরও কথা থেমে গেছে, তাকাচ্ছে এদিক ও দিক।

কোমল পুরি ভেজে এনেছে, সঙ্গে সবজি। রিমঝিম ঝিলিককে দিয়ে কুলদীপের সামনেও রাখল একটা প্লেট।

ঝিলিক গা মোচড়াচ্ছে। রিমঝিম অনিচ্ছার সুরে বলল—এখন এত খেতে পারব না আন্টি। কলেজ থেকে ফিরে খেয়েছি।

কোমল স্নেহের ধমক দিল—এটুকু খেয়ে নাও, কিছু অসুবিধে হবে না। তোমার মা কুলদীপকে কত কী খাওয়ান ..... আমাদের সবজি টেস্ট করে দ্যাখো।

—না আন্টি প্লিজ এত খেতে পারব না।

—খুব পারবে বেটি, খেয়ে নাও। রানা তাও আসে, তোমরা তো আসই না।

—জোর করতে হবে না মাম্মি। কুলদীপ আরও গোমড়া হয়ে গেল,—আমাদের ঘরে সকলের খেতে ভাল নাও লাগতে পারে।

অমনি প্লেট টেনে নিয়েছে রিমঝিম। দেখাদেখি ঝিলিকও। কোমলের সঙ্গে টুকটাক কথা বলতে বলতে খাচ্ছে, প্রশংসা করছে কোমলের রান্নার।

বেশি বেশি করছে! বেশি বেশি করছে!

সন্ধে সন্ধে উঠল দু বোন। যাওয়ার সময়ে রিমঝিম বলল—এবার আসবে তো দীপদা?

কুলদীপ অস্পষ্টভাবে ঘাড় নাড়ল।

মনে মনে বলল, কখনও না, কখনও না। আমি আমার সীমা বুঝে গেছি।

এগারো

ঘুম চোখে খবরের কাগজ খুলেই রাজিন্দর চেঁচিয়ে উঠল—কোমল! কোমল!

কোমল দুধ জ্বাল দিচ্ছিল। রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়াল— কেয়া জি?

—ইথ্‌থে আ যা। জল্‌দি।

তড়িঘড়ি গ্যাস নিবিয়ে সামনে এল কোমল।

রাজিন্দর ফুটছে উত্তেজনায়। কাগজটা বাড়িয়ে বলল— দ্যাখো খবরটা। এই যে, এখানে।

চশমা ছাড়া কোমল পড়তে পারে না, ভাসা ভাসা হেডিং দেখতে পেল শুধু। সঙ্গে সঙ্গে তার গলা থেকে বিচিত্র ধ্বনি ছিটকে এসেছে। স্বামীর গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ে বলল— ও রাব্‌বা! এ যে বিশ্বাস হয় না!

বেশ বড় করেই বেরিয়েছে খবরটা। প্রথম পাতায়।

... গুরবচন সিং কি নির্দোষ! আবার কি তিলজলার ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে গেছে পঞ্জাব পুলিশ! ...

কাগজ টেনে নিয়ে উত্তেজিত রাজিন্দর নিজেই খবরটা পড়তে শুরু করেছে। কাঁপা কাঁপা গলায়। কোমলের চোখ বড় হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। তার বাহান্ন বছরের সরু লম্বাটে মুখে ভাবপরিবর্তন হচ্ছে ঘন ঘন, ঠোঁট নড়ছে। কুলদীপ ইদানীং ভোর ভোর ওঠে, বাথরুমে ঢুকেছিল, ব্রাশ পেস্ট হাতে সেও বেরিয়ে এসেছে। শুনতে শুনতে তার নিষ্প্রভ চোখও জ্বলজ্বল।

... গত পাঁচই ডিসেম্বর চক্রবেড়িয়ায় নিহত শিখ দম্পতির মৃত্যুর তদন্ত করতে কলকাতা পুলিশের একটি বিশেষ দল সম্প্রতি পঞ্জাবে গিয়েছিলেন। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, তাঁরা নাকি কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য সংগ্রহ করে এনেছেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নিহত গুরবচন সিং অথবা রোহিণী কাউর, কারুর বিরুদ্ধেই কোনও রকম উগ্রপন্থী কার্যকলাপের রেকর্ড নেই। তাঁরা নাকি অমৃতসর জেলার রোহিলা গ্রামের নেহাতই নিরীহ সম্পন্ন চাষি মাত্র। অবশ্য অমৃতসর জেলারই রোহিলপুর গ্রামে নিহত গুরবচন সিং-এরই সমবয়সি অন্য এক গুরবচন সিং-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। রোহিলপুরের গুরবচন সিং-কে বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে দীর্ঘ দিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে পঞ্জাব পুলিশ। সম্ভবত পঞ্জাব পুলিশের ইনফরমারেরই ভুল সংবাদের ভিত্তিতে ...

খবরের তলায় সাংবাদিকের নিজস্ব মন্তব্য— এ রকম ভুল বার বার ঘটতে থাকলে সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা কোথায়!

কোমলের চোখে জল। রাজিন্দরও পড়া শেষ করে চোখ মুছছে। হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল— হে বাহে গুরু তেরি জয়। হে সচ্‌ইয়াপাৎশা, তেরি জয়।

কুলদীপ ছুটে এসে আবার পড়ছে খবরটা। আবার। বার বার। চঞ্চল চোখ কালো কালো অক্ষরগুলো থেকে আর সরে না—সব কাগজেই নিশ্চয়ই বেরিয়েছে? বাংলা ইংরিজি সব?

রাজিন্দর শিশুর মতো ঘাড় দোলাল— জরুর। বেরোনো তো উচিতই।

কোমল বলল— পরমিন্দরকে ফোন করি?

—লাগাও, লাইন লাগাও।

রাজিন্দর একবার মুঠো বন্ধ করছে, একবার খুলছে। যেন হঠাৎ খসে পড়া খুশি কোথায় রাখবে ভেবে পাচ্ছে না। পরমিন্দরকে তো ফোন করতেই হবে, সে আগাগোড়া তার পাশে পাশে আছে, বলভরসা জোগাচ্ছে। খড়্গপুরেও এক্ষুনি জানিয়ে দেওয়া দরকার। চ্যাটার্জিকেও একটা ফোন করবে কি?

কোমল রিসিভার বাড়িয়ে উল্লসিত গলায় বলল— পাম্‌মিরা আগেই খবরটা দেখে নিয়েছে। ওরাই

আমাদের ফোন করতে যাচ্ছিল।

রাজিন্দর ফোন নিয়ে আবার বলল— বাহে গুরুকি জয়। সৎ শ্রী অকাল পরমিন্দর।

—সৎ শ্রী অকাল, সৎ শ্রী অকাল। পরমিন্দরের গলাতেও উচ্ছ্বাস— আমি আপনাকে বলেছিলাম না জিজাজি, প্রভুর রাজ্যে দের হ্যায়, অন্ধের নেহি।

—সত্যি তাই। মনে হচ্ছে অন্ধকার রাতটা কেটে গেল।

—এখন কী করবেন কিছু ভাবলেন?

—কী করা যায় বলো তো?

—কেস করে দিন। লইয়ারের সঙ্গে আজকেই কথা বলুন। একটা মানহানির মামলাও করে দেওয়া যায় না?

—হুঁ, ঠিকই বলেছ। ব্যাপারটা ছাড়া উচিত নয়। রাজিন্দর একটু ভাবল,— তার আগে কি একবার পুলিশের সঙ্গে কথা বলে নেব?

—বলুন। ওরা কী বলে সেটাও শুনে নিন।

—আজই যাব বলছ?

—নিশ্চয়ই। দেরি করবেন কেন?

পলকের জন্য লালবাজারের করিডোরটা ভেসে উঠল রাজিন্দরের সামনে। সেই একা দাঁড়িয়ে থাকা। সেই জেরা! সেই হয়রানি!

রাজিন্দর আলগাভাবে বলল— তুমি যাবে আমার সঙ্গে? চলো না।

পরমিন্দর একটুক্ষণ চুপ— গেলে কখন যাবেন?

—বলো তোমার কখন সুবিধে হবে?

—দুটো নাগাদ আমার ধাবায় চলে আসুন।

পরমিন্দরের সঙ্গে কথা বলে আরও যেন জোশ ফিরে পেয়েছে রাজিন্দর। অনেক দিন পর চনমন করছে শরীর। কোমলকে হাঁক দিয়ে মুলোর পরোটা বানানোর অর্ডার দিল। সমর চ্যাটার্জিকে ফোন করে বকবক করল খানিক। খড়্গপুরের লাইন চেষ্টা করল, পাচ্ছে না। বিড়বিড় করে মুণ্ডপাত করল টেলিফোন ব্যবস্থার। তারপর স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে নিজেই রান্নাঘরে ঢুকেছে, নিজের আর ছেলের দুজনেরই ধূমায়িত চায়ের গ্লাস হাতে সোফায় বসল।

কুলদীপ কাগজ পড়ছে। অন্য পাতা।

ছেলের হাঁটুতে স্নেহের চাপড় দিল রাজিন্দর— পী লে পুত্তর, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

কুলদীপ চায়ের গ্লাস ঠোঁটে তুলল। তার মুখ উজ্জ্বল বটে, তবে তেমন আনন্দের প্রকাশ নেই। বরং তাকে যেন সামান্য চিন্তিত লাগে।

রাজিন্দর একবার চোখের কোণ দিয়ে দেখল ছেলেকে, একবার সরাসরি। চোখ বড় করল, চোখ ছোট করল। হাসছে মিটিমিটি। গমগমে গলায় বলল— কিঁউ বেটা, আভি ভি খুশ্ নেহি?

—ও নো পাপা। আমি খুব খুশি। ভীষণ খুশি।

—তো হা হা হাসছ না কেন? গানা গাইছিস না কেন? রাজিন্দর ছেলের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল— এখনও মুখ ভার কেন?

—অন্য কথা ভাবছিলাম পাপা। সামথিং ডিফারেন্ট।

—এ সময়ে অন্য কথা মাথায় আসে! রাজিন্দর গায়ে শাল সাপটে বাবু হয়ে বসল— শুনলি তো, তোর মামাজির সঙ্গে কী কথা হল? কেস করছি এবার। সব শালাকে একদম টাইট দিয়ে ছেড়ে দেব। পাঁচ লাখ টাকার ডিফামেশন স্যুট করব। হিউম্যান রাইট কমিশনে যাব। শালা, আমাদের একটা মানইজ্জত নেই? পুলিশ এল, ঢ্যা ঢ্যা চালিয়ে গেল...,—ভেবেছে কী, হ্যাঁ....?

—দলজিৎ ভাইয়া তো আগেই কেস করার কথা বলেছিল পাপা।

—তখন হালত অন্য রকম ছিল, এখন সব বদলে গেছে। রাজিন্দর থামল, এতদিন যে সে ভয়ে পীড়িত ছিল, সেটা ছেলের চোখে ধরা পড়ে ভেবে একটু বুঝি চটেই গেল। রাগ রাগ গলায় বলল— দলজিতের কথা ছাড়ো। যে নিজের চামড়া বাঁচাতে লেজ তুলে পালায়, তার কথামতো রাজিন্দর সিং

চলে না। আমি মামলা করব আমার জন্য, তোমার জন্য, রশ্‌মির জন্য। যাতে আমরা সবাই আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি। মুখ উঁচু করে ঘুরতে পারি।

—কেস করলেই সেটা পারব পাপা?

—আলবত পারব। আজ কাগজ পড়ে দুনিয়া জেনে গেছে, কাল কেস ঠুকলে লোক বুঝে যাবে রাজিন্দর সিং কত সাচ্চা আদমি।

কুলদীপ কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়াচ্ছে। ভাবটা এমন, হলেই ভাল।

ধুৎ তেরি বলে উঠে পড়ল রাজিন্দর। শালা, বেশি লেখাপড়া শিখলে মানুষ একটু বেশি বুরবক বনে যায়। আজেবাজে চিন্তা মাথায় ঘোরে, কিছুতেই মন থেকে শক যেতে চায় না। আরে বাবা, রাজিন্দরদের যে লোকে বাঁকা চোখে দেখছিল, তার একটা কারণ তো ছিল। কারণটাই যদি মিথ্যে বলে প্রমাণ হয়ে যায়, তা হলে দুনিয়া ভি নরমাল হয়ে যাবে, এ তো সাফ কথা। দিল্লির কথা কি মনে পড়ছে কুলদীপের? আরে বেটা, তুই এত লেখাপড়া শিখছিস, এ বুঝিস না, সে ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম! সেখানে তো অকারণে অত্যাচার হয়েছে রাজিন্দরদের ওপর, এখানকার মতো ভুল করে নয়। সেখানে দিল্ চুরচুর হয়ে গিয়েছিল, এখানে রাজিন্দরের অপমান হয়েছে। রাজিন্দর তো এই অপমান মুছে ফেলবেই, তা বলে আর চিন্তা কী!

রাজিন্দর নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিমলার ঘরে একবার উঁকি দিল। রেজাই মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন বিমলা, এখনও ওঠেননি। আজকাল অনেক বেলা অবধি বিছানায় থাকেন, রোদ গরম না হওয়া পর্যন্ত বেরোন না ঘর থেকে। বিজিকে ডেকে শোনাবে সুসংবাদটা? থাক, উঠলে কোমলই বলবে।

গভীর নিষ্ঠাভরে আজ জপ্‌জি সাহিব পাঠ করল রাজিন্দর। সুখ্‌মণি থেকে গুনগুন দোঁহা গাইছে। চোখ বুজে। দুলে দুলে।

তু ঠাকুরু তুম্ পহি অরদাসি,
জিউ পিনদু সভু তেরি রাসি।
তুম মাত পিতা হম বারিক তেরে
তুমহারি কৃপা মহি সুখ ঘনেরে ...

বিনম্র প্রার্থনায় প্রাণ ভরে গেল। উঠে বাথরুমে গিয়ে গিজার চালিয়ে দিয়ে ব্যালকনিতে এসে পাঁচ-সাত মিনিট দাঁড়িয়ে রইল রাজিন্দর। নবীন সূর্যের উত্তাপ মেখে নিচ্ছে গায়ে। অনেকটা সময় ধরে স্নান করল, দুঃস্বপ্নের একটা মাস যেন ধুয়ে ফেলছে শরীর থেকে। ঘরে এসে ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকোল, পরিপাটি করে দাড়ি বাঁধছে। আয়নায় ঝুঁকে ঝুঁকে বার বার দেখছে মুখমণ্ডল। চোখের নীচে চামড়াটা কেমন ফোলা ফোলা লাগে, সাদা সাদা ছিটেও দেখা যায় যেন। মাথার পিছনটা দপদপ করে মাঝে মাঝে, চ্যাটার্জিবাবু বলছিল হয়তো প্রেশার হয়েছে। এবার একদিন থিতু মনে ডাক্তারের কাছে গিয়ে মাথা থেকে পা চেক্ আপ করাতে হবে।

ডাইনিং টেবিল থেকে ডাক এল— পাপা, তোমার নাস্তা ঠাণ্ডা হচ্ছে।

রাজিন্দর বলল— যাই।

আরও একটুক্ষণ নিজেকে দেখল রাজিন্দর, আয়নার দিকে তাকিয়ে হাসল। এবার সব মালিন্য মেরামত হয়ে যাবে।

ইদানীং রাজিন্দরের খাওয়ার ইচ্ছেটাই চলে গিয়েছিল, আজ দেখতে দেখতে টকদই সহযোগে পাঁচ-পাঁচটা মুলোর পরোটা সাবাড়। ছেলের জন্য আলু গোবির ভাজি বানিয়েছে কোমল, তাও চাখল খানিকটা। কলাও খেল দুখানা। পরিতৃপ্ত মেজাজে ঠিক নটায় বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়ে মনে হল, রশ্‌মিদের ফোনে পাওয়া গেল না, কোমল মনে করে করবে তো!

গ্যারেজে গাড়ি বার করতে গিয়ে ব্যানার্জিবাবুর সঙ্গে দেখা। কালকেও রথীন ব্যানার্জি রাজিন্দরকে দেখে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। রাজিন্দরও নতমস্তকে পার হয়ে গিয়েছিল ভদ্রলোককে। আজ দরাজ গলায় ডাকল,— ব্যানার্জিবাবু, অফিস নেই? এত দেরি করে বাজার থেকে ফিরছেন যে?

রাজিন্দরের থেকে বছর কয়েকের ছোট রথীন মাঝারি প্রাইভেট কোম্পানির উঁচুতলার অফিসার। মুখে তার ঈষৎ অস্বচ্ছন্দ হাসি— এই আর কী... মানে ... আজ একটু দেরিতে বেরোব।

—নিউজপেপার দেখলেন আজ?

—ও হ্যাঁ আপনাদের ব্যাপারটা তো? রিয়েলি সারপ্রাইজিং। পঞ্জাব পুলিশ ইজ গুড ফর নাথিং। ওখানে টেররিজম বন্ধ করতে পারে না, ফালতু আপনাদের গাড্ডায় ফেলে দিল।

—নসিব, নসিব। সবই কপাল।

রথীন সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে— যাক্, আপনারা যে ক্লিন চিট পেয়ে গেলেন, দ্যাটস্ গুড।

অর্থাৎ প্রতিবেশীদের আস্থা অর্জনের জন্য পুলিশের শংসাপত্র জরুরি ছিল।

রাজিন্দর অবশ্য অত শত ভাবল না। কেস করার কথাটাও বলবে বলবে করে বলা হল না। প্রফুল্ল মনে বসেছে ড্রাইভিং সিটে।

অফিসটাইম শুরু হয়েছে, পথে যানস্রোত। কর্মব্যস্ত মানুষ দিকভ্রান্তের মতো ছুটছে। পিতল রং আলোর ছোঁয়া পেয়ে মায়াবী শহর এখন যেন জেগে ওঠা দস্যি খোকা। ঠাণ্ডা কমেছে কিছুটা, তবে তার চোরা কামড় আছে বেশ। আচমকা হাওয়া ছুটে আসে হুহু। গঙ্গাসাগরের হাওয়া। পৌষ সংক্রান্তি এসে গেল।

রাজিন্দরের গাড়ি আজ ছুটছে জোর। গতিটা দিনের সঙ্গে মানানসই।

দোকান থেকে বেরিয়ে পরমিন্দরকে নিয়ে লালবাজার পৌঁছতে তিনটে বেজে গেল।

ডেপুটি কমিশনারের ঘরে জরুরি মিটিং চলছে। স্লিপ পাঠিয়ে শালা-জামাইবাবু করিডোরে অপেক্ষমাণ। পরমিন্দরের চোখ ঘড়ির দিকে, ঘন ঘন। রাজিন্দর বাড়িটাকে দেখছিল। এই বিল্ডিং-এ সে আগে আসেনি, তার আর কুলদীপের জিজ্ঞাসাবাদ হত পাশের বাড়িটায়। ব্রিটিশ আমলের এই হর্ম্যে এখনও বেশ সাহেব সাহেব গন্ধ। উজ্জ্বল ফ্লোরেসেন্ট আলো, ধুলোকণাহীন টানা বারান্দা, প্লাস্টিকপেন্ট দেওয়াল, মোমমসৃণ মেঝে— এখানে সেই গা ছমছম অনুভূতিটাই আসে না।

একি বাড়িটার গুণ! নাকি রাজিন্দরের মন আজ নিঃশঙ্ক বলেই ...!

সাড়ে চারটেয় উপ-নগরকোটালের দর্শন মিলল। মানুষটির বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ, মুখটি ভারী কমনীয়, চেহারায় সামান্য মেদের আভাস, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, দেখে মনে হয় স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই এঁকে মানাত ভাল। তবে চশমার নীচে চোখ দুটো অস্বাভাবিক ধারালো। যেন বাজপাখির দর্শনেন্দ্রিয় উপড়ে বসানো। বসেছেন মোটা গদি আঁটা রিভলভিং চেয়ারে। তাঁকে ঘিরে দেওয়ালময় পূবর্তন নগরকোটালদের ছবি। সেই ব্রিটিশ যুগ থেকে শুরু করে প্রায় অধুনা পর্যন্ত। এসি আছে, তবে চলছে না।

রাজিন্দরদের সঙ্গে ভদ্রলোকের প্রথম কথা— কাগজে খবর দেখেই ছুটে এলেন?

রাজিন্দর সবিনয়ে বলল— হ্যাঁ স্যার।

—খবরটা কিন্তু অফিসিয়াল নয়।

রাজিন্দরের মুখ নিমেষে কালো—সচ্ নয় স্যার?

—আরে না না, ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ও খবর আমিই দিয়েছি। রিভলভিং কেদারা কোনাকুনি ঘুরল— বলুন, আমার কী সেবা চান?

রাজিন্দর গলে গেল— আপনি আমাদের মান বাঁচিয়েছেন স্যার।

—আপনাদের মান রক্ষার জন্য ক্যালকাটা পুলিশ ইন্‌ভেস্টিগেশান চালায়নি মিস্টার সিং। ইটস্ আ ম্যাটার অফ আওয়ার প্রাইড। অ্যান্ড ক্রেডিবিলিটি।

ভারী ইংরিজি শব্দ দুটোর মানে জানে রাজিন্দর, তবে কথাটার অর্থ তার সম্যক বোধগম্য হল না। পুলিশের মান আর বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষার জন্য রাজিন্দরদের সম্মান আর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে টানাটানি করতে হয়!

কী বলবে ঠিক ভেবে পেল না রাজিন্দর।

পরমিন্দর হাল ধরল— আমরা একটা অন্য প্রয়োজনে এসেছিলাম স্যার।

—অনুমান করতে পারছি। পুলিশকে কেউ নিছক ধন্যবাদ দিতে আসে না।

—না, ধন্যবাদ দেওয়াটাও উদ্দেশ্য ছিল ...

—পয়েন্টে আসুন। আমার সময় কম।

— হ্যাঁ, যা বলছিলাম .... আপনাদের ইন্‌ভেস্টিগেশানে এটা তো মোটামুটি ক্লিয়ার যে পঞ্জাব পুলিশ হ্যাজ ডান্ রঙ্? তাদের এই ঘ্যাসট্‌লি ক্রাইমের জন্য আমার জিজাজি, এই মিস্টার রাজিন্দর সিং, তাদের এগেন্‌স্টে কেস লজ্ করতে চান।

— করুন। বাট মাইন্ড ইট, কাগজের বিপোর্ট কিন্তু এখনও আনঅফিসিয়াল। আমরা যে কোনও মুহূর্তে সব ডিনাই করতে পারি।

— তা হলে ....? রাজিন্দর বিড়বিড় করে উঠল — তা হলে কেস করব না স্যার?

— তা তো বলিনি। আপনাদের যদি মনে হয় পুলিশ কোনও ক্রাইম করেছে, আপনারা কোর্টে যেতেই পারেন। ইউ হ্যাভ দ্যাট রাইট। উপ-নগরকোটালের তীক্ষ্ণ চোখ তীক্ষ্ণতর। হাতের ডটপেন বনবন ঘুরছে — ইনফ্যাক্ট, আপনারা আগেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কমপ্লেন ঠুকে দিলে আমাদের অনেক সুবিধে হত। আন্ডার সেক্‌শান ওয়ান ফিফ্‌টি-সিক্স থ্রি অফ সি-আর-পি-সি ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের কাছে রিপোর্ট চাইতেন, আমরাও ইনভেস্টিগেশান আরও জোরদারভাবে করতে পারতাম। আইনের বর্ম নিয়ে। বুঝতে পারলেন কিছু?

বুঝবে না কেন, এ পরামর্শ তো আগেই উকিল দিয়েছিল। কিন্তু রাজিন্দর এ কথা কী করে বোঝায়, কলকাতা পুলিশ যদি অসন্তুষ্ট হয় সেই ভয়েই ....

পরমিন্দর বলল — যা করা হয়নি তা ভেবে আর কী লাভ স্যার? এখন কী করব যদি সাজেশান দ্যান ...

— আপনাদের উকিল কী বলছেন?

— না মানে .... পরমিন্দর বেমালুম মিথ্যে বলল — এখনও স্যার লইয়ারের সঙ্গে সেভাবে কিছু কথা বলা হয়নি। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে আগে আলোচনা করে ...

উপ-নগরকোটাল দৃষ্টির ধার দিয়ে জরিপ করছেন রাজিন্দরদের, হুম্। আপনারা এক বারও লইয়ারের কাছে যাননি? স্ট্রেঞ্জ!

— না স্যার .... এবার যাব।

কোঁচকানো ভুরু স্বাভাবিক হল। অভিভাবকের সুরে ভদ্রলোক বললেন — এক কাজ করুন। পুলিশ বলেই এমন একটা কাণ্ড করে পার পেয়ে যাবে এ তো ঠিক নয়। আমি আপনাদের সাজেস্ট করব আপনারা হিউম্যান রাইট কমিশানে যান।

— গিয়ে?

— ওখানে অভিযোগ জানান। ওরা টেক আপ্ করলে তো ব্যাপারটা সলভ্‌ই হয়ে গেল। পঞ্জাব পুলিশের কাছ থেকে মোটা কমপেন্‌সেশান চাইতে পারেন। মানবাধিকার কমিশানই যা করার করবে।

পরমিন্দর ফস করে বলে বসল— আপনারা কিছু করবেন না স্যার? তিলজলার কেসটা নিয়ে যেমন করেছিলেন?

—আপনারা আপনাদের কেসটা নিয়েই ভাবুন। উপ-নগরকোটালের মুখ সামান্য গম্ভীর— শুনুন, হিউম্যান রাইট কমিশান যদি মনে করে আপনাদের গ্রিভান্সের যথেষ্ট কারণ আছে, তা হলে তারাই গভর্নমেন্টকে কেস করার জন্য নির্দেশ দেবে। এবং তখন আমরা কেস করবও। .... আমরা তো সাংবাদিকদের মতো শুধু জ্ঞান মেরে দায় ঝেড়ে ফেলি না, বিপদে মানুষকে যথাসাধ্য সাহায্য করাই আমাদের ডিউটি।

রাজিন্দরদের সাহায্য করার জন্যই কি রাজিন্দরদের ওইভাবে জেরায় জেরায় জর্জরিত করতে হয়! ওই বিপন্ন সময়ে! পুলিশ বোধহয় সর্বত্রই এক রকম। হৃদয়হীন। দিল্লিতে যখন দোকান পুড়িয়ে দিল, থানায় অভিযোগ দায়ের করতে ছুটেছিল রাজিন্দর, পুলিশ অফিসার অবলীলায় প্রশ্ন করেছিল, গণ্ডগোলের সুযোগ নিয়ে নিজেই আগুন লাগিয়ে ইনসিওরেন্স ক্লেমের ধান্দা করছেন না তো সর্দারজি! লোকটা একবার ভেবেও দেখল না, দাঙ্গায় কোনও ক্ষতি হলে ইনসিওরেন্স এক পয়সাও দেয় না!

যাক গে যাক, এরা তাও তো কিছু করেছে, এতেই রাজিন্দরের তৃপ্ত হওয়া উচিত। রাজিন্দর শান্ত মুখে বলল— ঠিকই বলেছেন স্যার। আপনার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। আপনার এই মেহেরবানি আমি

কখনও ভুলব না।

লালবাজার থেকে বেরিয়ে পরমিন্দর বলল —কী জিজাজি, প্রবলেম মিটল তো?

রাজিন্দরের খুতখুতভাব যাচ্ছিল না। বলল — কোন কমিশান সরকারকে কী অর্ডার দেবে, সরকার কী করবে... আমরা কি সোজা কেস করতে পারি না?

পরমিন্দর মাথা চুলকোল— সে লইয়ার বলতে পারবেন।

— তা হলে কোর্টেই চলো একবার। এখনই বিশ্বাস সাহেবের সঙ্গে কথা বলি।

— পাঁচটা বেজে গেছে। এখন হবে না, আটটার পর চেম্বারে গিয়ে ধরব। ততক্ষণ চলুন, একটু গলা ভিজিয়ে নিই। আপনার এই যে ছুটকারা মিলল, সেটা সেলিব্রেট করব না?

—একবার দোকানে ফেরার দরকার ছিল যে পরমিন্দর। অনেকগুলো গাড়ির কাজ চলছে, দোকানে একা বাদল ....

— কোন বাদল? চ্যাটার্জিবাবুর সেই রিলেটিভ?

— হাঁ। শালা। এ মাস থেকে আসছে রোজ। কিছু কাজ জানে না, শেখারও মন নেই.....

— তা হলে তো হয়েই গেল। পরমিন্দর হো হো হেসে উঠল — শেখাতেই যখন পারবেন না, দোকানে ফিরে লাভ কী! এক দিনে ও আপনার দোকান ওঠাতে পারবে না। তার চেয়ে চলুন দুপেগ চড়িয়ে আমার ধাবায় গিয়ে বসি, সেখান থেকে বিশ্বাস সাহেবের কাছে চলে যাব।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। টানা এক মাসের ওপর রাজিন্দর মদ স্পর্শ করেনি, আজ শরীরও একটু চাঙা হতে চাইছে।

দু পা হাঁটতেই বার। ভেতরে ফিনফিনে অন্ধকার, টুঙটাঙ্ ধ্বনি, মাদক সুরভি, নিচু গ্রামে বাজনা। এই পানশালায় রাজিন্দর কখনও ঢোকেনি, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে পরিবেশ।

পরমিন্দর বলল — আগে কিছু খাবেন তো?

— লাইট কিছু বলো। ফ্রাই টাই ধরনের। ক্ষিধেটা মরে গেছে।

— আর ড্রিঙ্কস্?

— রাম্। কলকব্জায় জঙ্ লেগে গেছে, মরচে ছাড়ুক।

কালচে পানীয় এসে গেল। বড়া পেগ।

পরমিন্দর রাজিন্দরের গ্লাসে গ্লাস ছোঁয়াল — চিয়ার্স ফর দা গুড টাইম।

রাজিন্দর গোঁফ ছাড়িয়ে হাসল — চিয়ার্স ফর দা ফিউচার।

ফ্ল্যাটে পা রাখতেই রশ্মির ফোনের খবর পেল রাজিন্দর। বিকেলের চার পেগ রাম এখনও ক্রিয়া করছে মস্তিষ্কে, ফুরফুরে মেজাজে রাজিন্দর বলল — মেয়ে খুশি?

— বহুৎ খুশ।

— তোমার দামাদের দিমাগ্ ঠাণ্ডা হয়েছে?

— বেশক্। তোমার দিমাগ্ ঠাণ্ডা, তো তোমার দামাদের দিমাগ ভি ঠাণ্ডা।

কোমল বয়স ভুলে খিলখিল হেসে উঠল। আজ অনেক দিন পর একটা জমকালো সালোয়ার কামিজ পরেছে কোমল, রং মিলিয়ে টিপ। এক দিনেই তার বয়স যেন দশ বছর কমে গেছে।

কুলদীপ টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে পড়ছে। তার ঘরে উঁকি দিয়ে হাত নাড়ল রাজিন্দর। চপল ভঙ্গিতে স্ত্রীর কাঁধ জড়িয়ে নিজেদের কামরায় এল। প্যান্ট শার্ট বদলাতে বদলাতে সারা দিনের কহানী শোনাচ্ছে। লালবাজারে কী হল, উকিলবাবু কী বলল, এক্ষুনি কেস মানহানির মামলা করা সঙ্গত হবে না .... কথা আর ফুরোয়ই না।

কাঁধে দোপাট্টা গোছাতে গোছাতে কোমল বলল — ওহ্হো, একটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছি। চ্যাটার্জিবাবুর তোমার সঙ্গে কী দরকার, ফিরলে এক বার ফোন করতে বলেছেন।

পৌনে এগারোটা। এখনও চ্যাটার্জিবাবুকে ফোন করাই যায়, অনেক রাত অবধি জেগে থাকে ওরা। ডায়াল করতে গিয়ে বিমলার ঘরের দিকে চোখ পড়ল রাজিন্দরের। ভেজানো দরজা, সরু আলোর রেখা এসে পড়েছে বাইরে। বিমলা ঘর অন্ধকার করে ঘুমোতে পারেন না।

রাজিন্দর হাত তুলে কোমলকে ডাকল। ফিসফিস করে বলল — বি'জি শুনেছে সব?

—বলেছি তো।

—কী বললেন?

—কিছুই বললেন না। কানে গেল কি না বোঝাই গেল না।

রাজিন্দর মাথা ঝাঁকাল সামান্য। ভুরুতে ঢেউ উঠেও মিলিয়ে গেল।

সমর চ্যাটার্জিই ফোন ধরেছে। ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠস্বর — আপনি হুট করে দুপুরবেলা দোকান থেকে চলে গেলেন?

— হুট করে কোথায়? আমি তো বাদলকে বলে বেরোলাম।

— সকালে আমার সঙ্গে দেখা হল, তখন কিছু বললেন না তো?

— তখন মাধাইকে দিয়ে ফিয়াটের সিলিং-এর কাজটা করাচ্ছিলাম না! .... কেন, কিছু প্রবলেম হয়েছে?

— নইলে আর আপনাকে ফোন করব কেন! সব উলটোপালটা কাজ করে বসে আছে, সন্ধেবেলা কাস্টমার এসে গালাগাল দিচ্ছে আমায়! .... ক্যাশবক্সের চাবিটাও রেখে যাননি, কতক্ষণ দোকান খুলে বসেছিলাম যদি আসেন ....

— সরি সরি। একদম খেয়াল ছিল না। রাজিন্দর লজ্জিতভাবে বলল — যাক গে, আপনি সামলে নিয়েছেন তো?

— বাদলই সামলেছে। সমরের ক্ষোভ প্রশমিত হয়েছে — ওই তো টুপিটাপা দিয়ে ম্যানেজ করল। বলেছিলাম না, ওস্তাদ ছেলে! .... তা আপনাদের লালবাজার অভিযান সার্থক হল?

— মোটামুটি।

সংক্ষেপে সেরে ফোন রাখল রাজিন্দর। মনে মনে হাসল একটু। বাদল নির্ঘাত গড়বড় করেছিল কিছু। পাছে রাজিন্দর কাল গিয়ে রাগারাগি করে, বাদলের হয়ে সাফাই গেয়ে রাখল চ্যাটার্জিবাবু!

কোমল গরম গরম রুটি সেঁকে দিচ্ছে। খাওয়া সেরে বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল রাজিন্দর। আজ বহু কাল পর নিশ্চিন্তে ঘুমোবে।

মাঝরাতে একটা অদ্ভুত আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। কী যেন এক সুর ভেসে আসে না? সুর, নাকি কান্না? কোথ্থেকে আসে?

ধ্বনির উৎস খুঁজতে বাইরে এল রাজিন্দর। এক পা এক পা করে বিমলার দরজায়। ভেজানো দরজা ঠেলতেই নিথর হয়ে গেছে শরীর।

বিছানায় কোলকুঁজো হয়ে বসে দুলে দুলে গান গাইছেন বিমলা! বিয়ের গান!

যুগ যুগ ধরে যে গান গেয়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠায় মা, সেই গান। সুখে থাক মেয়ে, ভাল থাক মেয়ে, তোর খেত ভরে যাক ফসলে, তোর কোল ভরে যাক সন্তানে ....

রাজিন্দর দু হাতে দরজা খামচে ধরল। তীব্র এক ধিক্কারে মুচড়ে উঠছে বুক। কীসের আনন্দে সে কাটিয়েছে দিনটা! নিজে হাঁপ ছাড়তে পারল তাতেই সুখী! পহেনজির শোক সে ভুলে গেল কী করে! ওই কন্যাহারা বুড়ির সামনে নিজের মুক্তিতে নেচে ওঠা তার শোভা পায়!

ছবি ছবি ছবি। রাজিন্দরের চোখের সামনে রং জ্বলে যাওয়া ছবির মিছিল। লাহোরের গুরদোয়ারায় আগুন জ্বলছে, কোন এক দরজা দিয়ে যেন মিলিটারি বার করে নিয়ে যাচ্ছে তাদের। বাবার ঝলসানো দেহ পড়ে আছে, মা কিছুতেই আসবে না, মিলিটারির বেষ্টনী ভেদ করে বার বার ছুটে যাচ্ছে, দিদি মাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরল। ছাগল মুরগির মতো গাদাগাদি হয়ে ট্রেনে উঠল তারা, ট্রেন ছাড়ছে না, দূর থেকে নারকীয় উল্লাস ভেসে আসছে, মা সাপটে ধরল দিদিকে, দিদি ন বছরের রাজিন্দরকে। কোথায় যেন একটা থেমেছে ট্রেন, বোধহয় অমৃতসর, বাইরে প্ল্যাটফর্মে সার সার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ, দিদি রাজিন্দরের চোখ চেপে ধরল, নিজে মুখ গুঁজল মার কোলে। তারপর সেই দিল্লির রিফিউজি ক্যাম্প ..... অনাহার, অর্ধাহার, এক জনের খাবার তিন জন মেপে মেপে ভাগ করে খাওয়া! মা নিজের ভাগ থেকে আধখানা রুটি ছিঁড়ে দিল রাজিন্দরকে, দিদি আধখানা। ..... পা মেশিন চালাতে চালাতে কাঁদছে মা, ফোঁপাচ্ছে, দিদি ঠেলে মাকে উঠিয়ে নিজে সেলাই-এ বসল।

তিনটে প্রাণী মিলে একটা প্রাণ হয়ে ছিল তারা। একটা অঙ্গ ওভাবে চলে গেল, তার পরও উল্লাস এল রাজিন্দরের? রোহিণী বুঝি তবে পর হয়ে গিয়েছিলেন রাজিন্দরের কাছে। হয়তো ঠিক পরও নয়, আটচল্লিশ বছর আগে বিয়ে হয়ে যাওয়া রোহিণী কখন যেন নেহাতই এক বিবাহিত বোন হয়ে গিয়েছিলেন। আত্মীয়। যাঁর ওপর টানটা মনে হয় গভীর, আদতে তত গভীর নয়।

কুনকুন করে গান গেয়েই চলেছেন বিমলা। মৃদুতম ধ্বনি, তবু যেন কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছে রাজিন্দরের।

রাজিন্দর এগিয়ে গিয়ে মাকে থামাতে চাইল, পারছে না। ছুটে সরে যেতে চাইল দরজা ছেড়ে। পারছে না।

দু হাতে নিজের কান চেপে ধরল রাজিন্দর।

বারো

যদুবাজারের উলটো দিকের ক্যাসেটের দোকানটায় ঢুকেছিল কুলদীপ। পুরনো হিন্দি গানের একটা অ্যালবাম বেরিয়েছে, রফি-লতা-কিশোর-আশা-মান্না মিলিয়ে, কিনবে। ফাইনাল পরীক্ষার আর আড়াই মাস মতো বাকি, সারা দিন বাড়িতে বসে পড়তে পড়তে মাথা জ্যাম মেরে যায়, মাঝে মাঝে ওই সুরেলা গানগুলো শুনলে মস্তিষ্ক আবার চাঙা হয়ে ওঠে।

দোকানে খুব ভিড় এখন। ছোট্ট খুপরি জায়গাটুকুর দেওয়াল জুড়ে থরে থরে গান। বছর তিনেক আগে চালু হয়েছে দোকানটা, এর মধ্যে বেশ রমরমিয়ে ব্যবসা করছে, কাউন্টারের দুই তরুণ এখন ক্রেতা সামলাতে সামলাতে হিমশিম। কেউ রশিদ খাঁ ভীমসেন যোশী চায়, কেউ স্পাইস গার্ল, কেউ বা সুবিনয় রায়। অবিরাম টুকরো টুকরো গানের কলি বেজে চলেছে অ্যাম্প্লিফায়ারে, নিজেদের পছন্দের ঝলক শুনে নিচ্ছে ক্রেতারা। বেশ লাগে দেখতে কুলদীপের, শুনতেও। সঙ্গে সঙ্গে মনটাও সামান্য উদাস হয়ে যায়। একসময়ে কুলদীপের সাধ ছিল, বড় হয়ে ক্যাসেটের দোকান দেবে। রসায়ন শাস্ত্রের গবেষক না হয়ে গানের ফেরিঅলা হয়ে জীবন কাটানোই বা কী এমন খারাপ!

পিঠে হঠাৎ কার যেন হাত। কুলদীপ চমকে তাকাল —তুই?

—হ্যাঁ, আমি। তীর্থঙ্কর সান্যাল। অ্যালিয়াস রানা। ভূত দেখলি মনে হচ্ছে?

মাত্র দু মাস দেখা হয়নি, এর মধ্যেই সম্পর্কের উষ্ণতাটা কেমন মরে গেছে। কথা হাতড়াচ্ছে কুলদীপ — তোর আজ কম্পিউটার ক্লাস নেই?

—আজ শনিবার না? আমার তো ফাইভ-ডে উইক।

কলেজ শেষ, এখন সোম থেকে শনির হিসেব থাকে না কুলদীপের। শুধু রোববারটাই চেনে, পাপা বাড়ি থাকে বলে।

বোকা বোকা হেসে বলল —ও হ্যাঁ। তাও তো বটে।

রানা চোখ সরু করল —তোর কী হয়েছে বল তো? এমন ভেবলে গেছিস কেন?

—আমি তো ভ্যাবলাই। কবে আবার স্মার্ট ছিলাম!

বলে কাউন্টারের দিকে ফিরল কুলদীপ। ক্যাসেট পেড়ে দিয়েছে, ঘাড় ঝুঁকিয়ে গানের লিস্ট পড়ল। চালিয়ে দেখল না, দাম মিটিয়ে দিল। চেনা দোকান, খুঁত থাকলে বদলে নেওয়ার কোনও সমস্যা হয় না।

রাস্তায় বেরিয়ে রানা আবার চেপে ধরেছে —তুই একদম ডুমুরের ফুল হয়ে গেছিস।

—সে তো তুইও হয়েছিস। হসনি?

—তা হয়েছি। রানা ঠোঁট ওলটাল—এই সেমিস্টার কম্পিউটার স্টাডি-সার্কল এ সবেই জান নিকলে গেল। বুঝলি? শালা পাড়ার সঙ্গে লিংকটাই যায় যায়। এত্ত খারাপ লাগে...। বলতে বলতে কী যেন ভাবল একটু। আবার চোখ সরু —কেন, রিমঝিমরা যে বলল তোর বাড়িতে গিয়েছিল... তোর খোঁজখবর করে এল... যায়নি?

রানা কায়দা করে সাফাই গাইছে। রিমঝিম অবশ্য আরও দুদিন ফোন করেছিল, তাতে কি রানার

দোষস্খালন হয়?

পাড়ার দিকে হাঁটছে দুজনে। একটু আগেও বিকেল ফুটে ছিল, ধীরে ধীরে আঁধার নামছে। পরশু সরস্বতী পুজো, দু হাত অন্তর রাস্তায় প্যান্ডেল বাঁধছে বাচ্চারা। এখনও বাতাসে বেশ হিম হিম ভাব। একটু একটু যেন কুয়াশাও জমেছে।

কুলদীপের হাত থেকে অ্যালবামটা নিয়ে দেখছিল রানা। তার মধ্যেই একটানা বকবক করে চলেছে। এবার সামার ভেকেশানে পুনায় কী এক কোম্পানিতে যাবে রানা, ট্রেনিং-এর জন্য কোম্পানিটা রানার পছন্দ নয়, কেন নয়, এই সব। ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ-এ কত বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি আসছে, তারও ফিরিস্তি দিল লম্বা।

কুলদীপ শুনছিল শুধু, নীরবে।

হঠাৎ এক সময়ে রানা আবার বলল —তোর কেসটা কী বল তো? কিপিং মাম! অ্যাজ-ইফ থ্রোট প্রবলেম হয়েছে!

—তুই বলছিস তো। শুনছি।...তুই কি চাকরিই করবি? বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করবি না?

—ড্রিবল্ করিস না দীপ। ছোট্টখাট্টো রানা ঘাড় উঁচু করে কুলদীপকে দেখল। অ্যালবামটা কুলদীপের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল —তপারা বলছিল তোর নাকি চোখের ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল লেন্সটা নষ্ট হয়ে গেছে? সিলিন্ড্রিকাল ভিশান ছাড়া কিছু দেখতে পাস না? বন্ধুদের সামনে দিয়ে গটগট হেঁটে চলে যাস...!

এ সব অভিযোগের চাঁছাছোলা জবাব দেওয়াটা কি খুব জরুরি! কুলদীপ কি চিৎকার করে উঠবে, ওদের কাউকে সে আর বন্ধু বলে মনে করে না? এমনকী এই মুহূর্তে পাশে হাঁটা রানাকেও নয়? কুলদীপের গলা দিয়ে আওয়াজই বেরোল না, বড়সড় দীর্ঘনিশ্বাস চাপল শুধু।

যৌবনের অনেক বিচিত্র ধর্ম আছে। বহু মর্মান্তিক আঘাত সে অক্লেশে আত্মস্থ করে নিতে পারে। আবার একটা মাত্র সরল ভূমিকম্পে অনেক সময়ে তার হৃদয় তীব্রভাবে আন্দোলিত হয়, কম্পন থেমে গেলেও সিস্‌মোগ্রাফের কাঁটা নড়ে চলে অনন্তকাল।

—তোর প্রবলেমটা কী হয়েছে জানিস তো? দিনরাত শুধু ওই ইন্সিডেন্টটার কথা ভাবছিস। রানা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতো বলল—মানছি তোদের ওই ইন্সিডেন্টটা খুব স্যাড ছিল। স্যাড কেন, ধরে নিতে পারি ডিজাস্টরাস্। কিন্তু সেটা তো এখন ক্লোজড্ চ্যাপটার। তোকে এখন ট্রমাটা কাটিয়ে উঠতেই হবে। বাক্ আপ ম্যান্, চিয়ার আপ্। এর পর তো তুই মেন্টাল পেশেন্ট বনে যাবি!

কুলদীপ মলিন হাসল —বেশি সারমন্ ঝাড়িস না তো। আমি ঠিকই আছি। তোরও সময় শর্টেজ, কারুর খবর রাখতে পারিস না। আমারও সময় কমে গেছে, কারুর সঙ্গে মিশতে পারি না। তার মধ্যেও তো আমি ক্লাবে গেছিলাম। এই পরশু দিনই।

কথাটা অর্ধ সত্য। ক্লাবে কুলদীপ গিয়েছিল বটে, তবে স্বেচ্ছায় নয়। রাস্তায় দেখা হতে পল্টু হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। তাও কুলদীপ মিনিট পনেরোর বেশি ছিল না। ভাল লাগছিল না। রানা অবশ্য এত খুঁটিনাটি জানে না, কুলদীপ নিশ্চিত।

—গুড। ভেরি গুড। রানা ঘটঘট ঘাড় নাড়ছে —দ্যাটস্ দা স্পিরিট। বলেই একবার অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের দিকে তাকাল। পাড়া এসে গেছে, বাড়ির দিকে বেঁকছিল কুলদীপ, তার হাত ধরে টানল —এখন বাড়ি যাচ্ছিস কী? আমাদের বাড়ি চল।

—আজ থাক রে। কুলদীপের শরীর নতুন করে শক্ত —মাম্মি পাপা আজ গুরদোয়ারা যাবে। দাদিজি একা থাকবে...

এ কথাটাও অর্ধ সত্য। সম্প্রতি পরমিন্দরের স্ত্রী একটি কাজের মেয়ে জোগাড় করে দিয়েছে কোমলকে। বিধবা, মাঝবয়সি, সোনারপুরে বাড়ি। রাতদিনই থাকে কুলদীপদের ফ্ল্যাটে। বিমলার দেখাশুনো সে ভালই করতে পারে।

রানা কুলদীপের বাহানা ফুৎকারে উড়িয়ে দিল —অ্যাই, ঢপ মারিস না। আঙ্কল এখনও দোকান থেকেই ফেরেননি। চল চল, তেমন বুঝলে আমাদের বাড়ি থেকে একটা রিং করে নিস।

কুলদীপ ফাঁপরে পড়ে গেল। দোলাচলেও। যাবে? রিমঝিম ফোনেও বার বার অনুযোগ করেছে,

আসছে না কেন কুলদীপ! রিমঝিমকে দেখে অবাস্তব স্বপ্নটা যদি আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে? দরকার নেই যাওয়ার। রানার জোর করাটাও যে ভাল লাগছে! নয় আধঘন্টাটাক তাইরে নাইরে করে কাটিয়েই এল।

ঝিলিক দরজা খুলে লাফিয়ে উঠেছে —ওয়াও, হোয়াট এ সারপ্রাইজ! ভুল দেখছি, না ঠিক দেখছি? মা মা, শাঁখ বাজাও।

বাড়ি ভর্তি। রিমঝিম তপতী রজতেন্দ্র কে নেই! নিমেষে কুলদীপকে ঘিরে ড্রয়িংরুমে জড়ো সবাই।

কুলদীপ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। চোরা চোখে এক পল দেখে নিল রিমঝিমকে। আজ শাড়ি পরে আছে রিমঝিম, গাঢ় নীল তাঁতের শাড়ি, ফর্সা রং আরও উজ্জ্বল লাগে। কোথাও গিয়েছিল কি রিমঝিম?

রজতেন্দ্র সোফায় বসতে বসতে বলল —তুমি যে একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ কুলদীপ!

সঙ্গে সঙ্গে কুলদীপ রানার দিকে তাকিয়েছে, রানা কুলদীপের দিকে। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল রানা। ছোঁয়াচে সুখের মতো ছড়িয়ে গেল সে হাসি। কারণ না জানা সত্ত্বেও।

কুলদীপ প্রায় স্বচ্ছন্দ হয়ে গেল।

তপতী বলল —তুই কী রোগা হয়ে গেছিস রে দীপ।

ঝিলিক বলল —হ্যাঁ হ্যাঁ দ্যাখো, মাথায় পাগড়িটা ঢলঢল করছে।

আবার এক প্রস্থ হাসির ঢেউ। রানা চাঁটাচ্ছে ঝিলিককে।

রিমঝিম বলল —কফি খাবে দীপদা?

—খেতে পারি।

—শুধু কফি দিস না। কটা ডিমের বড়া ভেজে আন। পারবি?

—না পারার কী আছে! আর কে কে কফি খাবে?

—আমাকে এক কাপ দিস।

—আমাকেও।

—আমাকেও। বেশি দুধ দিয়ে।

কফির নাম শুনে সব শেয়াল একসঙ্গে ডাকতে আরম্ভ করেছে। আরও সহজ হয়ে গেল কুলদীপ। অলস মেজাজে হেলান দিল সোফায়।

তপতী গুছিয়ে বসল —তোর কথা পৌষসংক্রান্তির দিন খুব মনে পড়ছিল রে। তুই এত পিঠে পায়েস ভালবাসিস...জানিস এবার গাদা পাটিসাপটা করেছিলাম।

কুলদীপের কান রান্নাঘরে চলে গেছে। রিমঝিমের পিছন পিছন।

অন্যমনস্ক কুলদীপ বলল —হুঁ।

তপতী বেশ অবাক —কী করে জানলি? রানা বলল বুঝি?

টুং টাং শব্দ হচ্ছে কাপের। রিমঝিম কি কেটলিতে জল ঢালল!

কুলদীপ আনমনে বলল —হুঁ।

রানা ভুরু কুঁচকোল —আমার সঙ্গে তোর এ সব কথা কখন হয়েছে?

রিমঝিম কি গ্যাসে কড়া বসাল? হাত পুড়ে যাবে না তো!

কুলদীপ অস্ফুটে বলল —হুঁ।

রানা তপতী আর রজতেন্দ্র তাকাচ্ছে পরস্পরের দিকে।

ঝিলিক কুলদীপের মুখের সামনে এসে হাত ঝাড়ল —এই যে মিস্টার হুঁ ইজ হুঁ, কোন রাজ্যে বিচরণ করছ গো?

কুলদীপ সংবিতে ফিরল। লজ্জা পেয়েছে —কিছু বলছেন মাসিমা?

—কিছু না বাবা, তুমি আরাম করে বোসো। তপতীর স্নেহে সহানুভূতির মিশেল —যা হয়ে গেছে সব ভুলে যাও তো। এটা তোমার নিজের বাড়ির মতো, এখানে সব টেনশান ঝেড়ে ফেলে দাও।

নিজের বাড়ির মতো কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয় কেন তপতী? নয় বলেই কি?

কুলদীপের সহজভাব ছানা কেটে গেল। হাত জড়ো করে ঝুঁকে বসেছে, অতিথির মতো।

—টেনশন আবার কীসের? সব তো মিটে গেছে। রজতেন্দ্র সিগারেট ধরাল —কুলদীপ, তোমার

বাবা শুনলাম হিউম্যান রাইট কমিশনে যাচ্ছেন?

জনে জনে বলে বেড়াচ্ছে নাকি পাপা! উফ্, পাপাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

কুলদীপ অল্প মাথা নাড়ল —এখনও কিছু ফাইনাল হয়নি। লইয়ারের সঙ্গে পরামর্শ চলছে।

—আমি বলব তোমার বাবার যাওয়াই উচিত। এত বড় একটা অন্যায় আনঅপোজড্ চলে যাবে, একী! তোমার বাবাকে বোলো, তিনি যদি লড়েন আমরা সত্যিই খুব খুশি হব। উই ডু শেয়ার হিজ ফিলিং।

কুলদীপ আলগা স্বরে বলল —বলব।

রিমঝিম কফি আর ডিমের বড়া এনেছে। ট্রে সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল —সেলফ্ হেল্প। যে যার নিয়ে নাও।

তপতী বলল —বড়ায় কাঁচালঙ্কা দিয়েছিস তো? কুচিয়ে?

—ঠেসে দিয়েছি। জিভে দিলে সবাই টের পাবে।

তপতী উঠে কুলদীপকে কাপ বাড়িয়ে দিল। শুধু কুলদীপকেই। ডিমের বড়াও আলাদা প্লেটে তুলে দিয়েছে। এমনটা এ বাড়িতে হয় না, একটু বুঝি পৃথকই হয়ে গিয়েছে কুলদীপ!

হাত চলছে সকলের। সঙ্গে সঙ্গে মুখও। ঝিলিক ভয়ে ভয়ে একটা করে কামড় দিচ্ছে বড়ায়, আর সন্দিগ্ধ চোখে দেখছে দিদিকে। রিমঝিম ছদ্ম ভ্রূকুটি হানল ভুরুতে। রানা দুটো বড়া তুলে লোফালুফি করতে করতে ভেতরে উঠে গেল। আবার ঘুরে এসে বসেছে মার পাশে। শব্দ করে কফিতে চুমুক দিচ্ছে।

আড্ডার মেজাজে রানা প্রশ্ন করল —তোদের পার্ট টুর রুটিন দিয়ে দিয়েছে?

—হ্যাঁ। এপ্রিলের চোদ্দো থেকে শুরু।

—ফর্ম ফিলআপ হয়ে গেছে?

—অনেক দিন।

—তোদের কি হোম সেন্টার?

রিমঝিম কুটুস করে ফোড়ন কাটল —তুই কিচ্ছু খবর রাখিস না দাদাভাই। অনার্সে হোম সেন্টার পড়ে না। তোরা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টরাই শুধু নিজেদের কলেজে নিজেরা পরীক্ষা দিস।

—সো হোয়াট? আমাদের কলেজে কি তোদের কলেজগুলোর মতো টোকাটুকি হয় নাকি?

—সে কী হয় তোরাই জানিস। তোদের যে স্যার যতটুকু পড়ান তার ওপরেই পরীক্ষা নেন, তিনিই কোয়েশ্চেন সেট করেন, তিনিই খাতা দেখেন...এর পর আর টোকাটুকির কী দরকার? তোরা অনেক অ্যাডভান্টেজ পাস রে দাদাভাই।

—এই, মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস্ না তো। অ্যাডভান্টেজ পাই, তার যথেষ্ট কারণ আছে। কত হাজার ছেলের সঙ্গে ফাইট করে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চান্স পাই...

—হ্যাহ্। ওইটেই যা ক্যালি। তারপর তো আখমাড়াই কলের এদিক দিয়ে আখ ঢুকিয়ে দিল, ওদিক দিয়ে রস বেরিয়ে গেল! তোদের ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কেউ সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে গেলে কাগজে তার ছবি বেরোয় না?

রানা এত রেগে গেছে, তার বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে না। কুলদীপ মনে মনে উপভোগ করছিল কথাগুলো। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে বলে রানা সবসময়ে একস্ট্রা এয়ার নিয়ে কথা বলে। রিমঝিম ভাল টাইট দিচ্ছে দাদাকে!

ছেলের মুখচোখ দেখে বুঝি অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা হয়েছে তপতীর। চোখের ইশারায় চুপ করাচ্ছে মেয়েকে। কুলদীপের দিকে ঘুরে বলল—তোর দাদির শরীর নাকি একদম ভেঙে গেছে রে দীপ?

কুলদীপ স্বাভাবিক স্বরে বলে ফেলল — হ্যাঁ, এই বয়সে এত বড় একটা ধাক্কা...

—সত্যি, ভাবি আর শিউরে উঠি। মানুষের কপাল কত খারাপ হলে এই বয়সেও ওরকম আঘাত পেতে হয়!

কুলদীপ হাত ওলটাল —কী আর করা যাবে মাসিমা? একটা স্ট্রে ইন্‌সিডেন্ট ঘটে গেল...

—উঁহু, স্ট্রে বোলো না। রজতেন্দ্র কফি শেষ করে সিগারেট ধরিয়েছে। লম্বা টান দিয়ে বলল—এরকম ঘটনা আরও ঘটতে পারে। ওই পুলিশই ঘটিয়ে বসবে। তোমার বাড়ি না হলেও অন্য কোথাও। কেন বলো তো?

—কেন মেসোমশাই? কুলদীপ বিস্মিত চোখে তাকাল।

—কারণ পুলিশ, একদম ঠিকঠাক বলতে গেলে শুধু পুলিশ নয়, রাষ্ট্রযন্ত্র ইন ইটস্ টোটাল ফর্ম, কখনই চরমপন্থী আন্দোলনের মূলে যেতে চায় না। তুমি ইতিহাস খোঁজো, দেখবে রাশিয়ার নারোদনিক কিংবা নিহিলিস্ট, কিংবা আমাদের পরাধীন ভারতের টেররিস্ট মুভমেন্ট, সব ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা জমেছিল। কেন জমেছিল? নিশ্চয়ই তারা দেশকে যেভাবে দেখতে চায়, সেভাবে পাচ্ছিল না! পরিণাম, বিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষ শক্তি দিয়ে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে, তারাও কাউন্টার ফোর্সের আশ্রয় নিয়েছে। স্বাধীনতাব পরও এখন আবার সেই দশা। অনেকেই এই রিপাবলিকের ছত্রছায়ায় আর থাকতে চাইছে না। ফর দেয়ার ওউন রিজন্। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রিজনগুলো পেটি, রাষ্ট্র একটু কন্‌সিডারেট হলেই বহু প্রবলেম সল্‌ভ হয়ে যায়। আসাম নাগাল্যান্ড মিজোরাম ত্রিপুরা...শিখদের ব্যাপারটা অবশ্য একটু স্বতন্ত্র। অন্যদের ক্ষেত্রে যদি হয় অভাব অবিচার বঞ্চনা শোষণ, শিখদের ক্ষেত্রে সেটা হল প্রাচুর্যের সমস্যা। চাষ থেকে এক্‌সেস টাকা আসছে, অথচ ইনডাস্ট্রির মূল স্রোতে তারা প্রপার পজিশান পাচ্ছে না। এদিকে যারা ইনডাস্ট্রি হোল্ড করে আছে, তারাই পরোক্ষে রাষ্ট্র চালাচ্ছে।...সেই জন্য রিলিজিয়নও একটা ভাইটাল পার্ট প্লে করছে। পঞ্জাবে তো ধর্মস্থানগুলোই বিদ্রোহের এক একটা নার্ভ সেন্টার। বুঝছ কুলদীপ, কী বলছি?

দেশের আর পাঁচটা মানুষ যেমন বোঝে, কুলদীপও সেভাবে বোঝে বইকী। তবে রজতেন্দ্র যেমন ওই সমস্যার অংশীদার নয়, সেও তো নয়! পঞ্জাবের মাটি রজতেন্দ্রর মতোই তার কাছে এক অচিন দেশ। তবু তাদের বাড়ির প্রসঙ্গ তুলে এত কথা ওঠে কেন?

কুলদীপের নজরে পড়ল রিমঝিম একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে, পড়তে চাইছে কী যেন। নিজের থেকেই বলে উঠল —বাবা, তুমি সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ধর্মকে জড়াচ্ছ কেন?

রজতেন্দ্র নির্বিকার মুখে সিগারেট ধরাল—ধর্ম তো জড়িয়েই গেছে। ব্লু স্টার অপারেশানটা কোথায় হল? শিখদের প্রধান ধর্মস্থানে। স্বর্ণমন্দিরে। মিলিটারিদের সঙ্গে লড়ল কারা? লিডার তো একজন সন্তই ছিলেন।

—হতে পারে। কিন্তু কিছু সন্ত-এর সঙ্গে পুরো ধর্মকে জোড়া যায় না। ইন্ডিয়ান মিলিটারির যে অফিসাররা অপারেশানে ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও কিন্তু শিখ ছিল বাবা। রিমঝিম সামান্য উত্তেজিত হয়েছে —তুমি স্ট্যাটিস্‌টিকস্ নিয়ে দ্যাখো, শতকরা পঁচানব্বই জন শিখ টেররিজম্ চায় না।

— মানছি। কিন্তু ব্যাপারটা হল .... কুলদীপ, তুমি বাবা কিছু মাইন্ড কোরো না, তোমাদের শিখ ধর্মের মধ্যেই কোথায় যেন একটা জঙ্গিবাদ লুকিয়ে আছে। গুরু নানকের ভক্তিবাদ গুরু গোবিন্দ্ সিং পর্যন্ত এসে তো আর একভাবে থাকেনি! গুরু গোবিন্দ্ সিং শিখদের একটা অন্য রকম জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। নো কাস্ট্, নো ক্রিড, নো কুসংস্কার, অ্যান্ড এ মিলিটারি রেস্। ওই শেষ আইটেমটার জন্য তোমাদের হয়তো অন্য চোখে দেখা হয়। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিই তোমাদের কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আর তারই সুযোগ নিচ্ছে তোমাদের উগ্রপন্থীরা। গোটা জিনিসটাই কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

কুলদীপ খাড়া হয়েছে এতক্ষণে। অনেক কথাই সে বলতে পারে এখন। গুরু গোবিন্দ্ সিং কখনই আক্রমণের জন্য অস্ত্র ধরতে বলেননি। বিপন্নকে রক্ষা বা আত্মরক্ষা, এই দুটো কারণেই শুধু অস্ত্র ব্যবহার শিখিয়েছেন গুরু। শিখরা মিলিটারি রেস্ বলেই সেনাবাহিনীতে তাদের এত কদর। দেশের জন্যও কম শিখ মরেনি। তার নানাজিও একাত্তরের যুদ্ধে ....

বলতে ইচ্ছে করছে না কিছু। বিষণ্ণতায় ছেয়ে যাচ্ছে বুক। রানার বাবা খালি 'তোমাদের' 'তোমাদের' করেন কেন? তা হলে মধুছন্দার সঙ্গে রজতেন্দ্র সান্যালের তফাতটা কোথায়? সচেতনভাবে তাকে আঘাত করার জন্য রানার বাবা যে বলছেন এ সব তা তো নয়, ভাল মনেই বলছেন। তবে বুঝি অবচেতনায় ওই 'তোমাদের' শব্দটা রয়েই গেছে, খোলামেলাভাবে কথা বলতে গিয়ে হৃদয়ের অন্তঃস্থল

থেকে উঠে আসছে! এত শিক্ষিত, এত জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও।

রানা অনেকক্ষণ চুপচাপ বাবার বক্তৃতা শুনছিল। মুগ্ধ চোখে। হঠাৎ হাত নেড়ে বলে উঠল— এ সব ঝঞ্ঝাট ঝামেলা নাথিং বাবা। সমস্ত প্রভিন্সের সমস্যা মেটাতে গেলে যেটা আগে দরকার, সেটা হল কালচারাল এক্সচেঞ্জ। রুচি বিনিময়। ফুড হ্যাবিট্‌সের বিনিময়। পোশাক আশাক বিনিময়। কুলদীপ ধুতি পরতে শুরু করুক, আমি শেরওয়ানি পরি। গুজরাটিরা আলুপোস্ত খাওয়া শুরু করুক, আসামের লানচে ইড়লি ঢুকিয়ে দাও, কেরালার লোকরা বাজ্‌রার রুটি খাক। ত্রিপুরার মেয়েরা গরবা নাচ প্র্যাক্‌টিস করুক ....

— মানে মিলে সুর তুমহারা হামারা? ঝিলিক খিলখিল হেসে উঠল,—দারুণ আইডিয়া, না দীপদা? এই জন্যই তো আমি সর্দার সাজতে চেয়েছিলাম।

ফাঁপা শব্দের তুফানে অবসন্ন বোধ করছিল কুলদীপ। মনে মনে বলল, সেই জন্যই তো শেষ পর্যন্ত পাগল সেজেছিলি।

মুখে বলল — ভাগ্যিস সাজিসনি। আমার শেখানো ভাংরা নাচলে তোর সান্ত্বনা পুরস্কারও জুটত না রে।

আবার হাসির লহর উঠেছে ঘরে।

কুলদীপের মনে হল মেকি স্বাভাবিকতার নাটক চলছে একটা। কিংবা তার মনের খেদ দূর করার জন্য লোকদেখানো সভা বসেছে!

কেউ বোঝে না ক্লেশ বেড়েই চলে আরও।

ক্যাসেটের অ্যালবামটা হাতে তুলে নিল কুলদীপ—আজ তা হলে চলি মেসোমশাই। মাসিমা, আসি?

— এখনই যাবি?

— হ্যাঁ মাসিমা। কাজ আছে। .... রানা জানে।

— আবার আসিস কিন্তু।

কুলদীপ ঘাড় নাড়ল কি? কুলদীপ জানে না।

রিমঝিম উলটো দিকের ঘরে গেছে। সেখান থেকে বলে উঠল — এক সেকেন্ড দীপদা, আমিও বেরোব।

তপতী গলা ওঠাল — এখন আবার কোথায় বেরোবি?

— বারে, শর্মিষ্ঠার বাড়ি যাব বলেছিলাম না! পাতলা একটা নীল কাচ বসানো চাদর গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে রিমঝিম — আটটার মধ্যেই চলে আসব।

মাঘের সন্ধ্যা ঘন হয়েছে আরও। ধোঁয়াশার ভাব যেন বেশি লাগে। সামনের স্ট্রিট লাইটটা জ্বলছে নিবছে। মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয় পথ, পরক্ষণে অন্ধকার। গা শিরশির করা এক বাতাস বয়ে এল।

কুলদীপ নীরবে হাঁটছে। ধীরে, অতি ধীরে। রিমঝিমের সঙ্গে তাল রেখে।

অশান্ত পথবাতিটা পার হয়ে রিমঝিম বলল — তোমার খুব মন খারাপ হয়ে গেল, তাই না দীপদা?

কুলদীপ তেতো গলায় বলল — নাহ্। মন খারাপ কেন হবে?

— লাই। আমি তোমার মুখ দেখলে বুঝতে পারি। তুমি বাবার কথায় হার্ট হয়েছ।

— মেসোমশাই তাঁর ফিলিং জানিয়েছেন।

— হার্ট হওনি বুঝি? আমাকে ছুঁয়ে বলো।

কুলদীপ ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল। ভীষণ লোভ হচ্ছে ওই মেয়েকে ছুঁয়ে দেখার, ইচ্ছেকে দমন করল। রিমঝিমকে স্পর্শ করে কি মিথ্যে বলা যায়!

অপাঙ্গে রিমঝিমকে দেখে নিয়ে বলল — যার যা মনে আছে তা সোজাসুজি বলে দেওয়া ভাল। চুপ মেরে থাকাটা আরও ভয়ংকর।

রিমঝিম শুনল কিনা বোঝা গেল না। ফুটপাথে পনেরো-ষোলো বছরের কয়েকটা ছেলে জোর ক্যালর ব্যালর জুড়েছে, হাতে সরস্বতী পুজোর চাঁদার বই, সেদিকে তাকিয়ে আছে রিমঝিম। দূরমনস্ক স্বরে বলল — ওই বয়সটার কথা তোমার মনে পড়ে দীপদা?

দীর্ঘশ্বাস গোপন করল কুলদীপ — আমার মেমারি খুব খারাপ হয়ে গেছে রিমঝিম।

— লাই। তুমি জোর করে ভুলে যেতে চাইছ।

— হয়তো তাই। যা মনে রেখে কষ্ট বাড়ে তা মেমারিতে রাখব কেন?

— শুধু নিজের কষ্টের কথাই ভাবলে?

কুলদীপের নিশ্বাস আটকে এল। রিমঝিমের ওই স্বরটুকু শোনার জন্য কবে থেকে হৃদয়ের তার বেঁধেছে, তবু কেন আজ সে সুরে বাজে না।

—কী হল, উত্তর দিচ্ছ না যে?

কুলদীপের গলা কেঁপে গেল — আমি যে তোমাদের সবার থেকে আলাদা রিমঝিম।

—কীসে আলাদা?

—আমার ধর্ম আলাদা।

— আমি মানি না।

— আমি বাঙালি নই।

— কী এসে যায়?

— আমার ভাষা আলাদা। কালচার আলাদা।

— তো?

অসহায়ভাবে হাসার চেষ্টা করল কুলদীপ — তুমি যে ঝিলিকের মতো কথা বলছ! মিলে সুর তুম্হারা হামারা .....

রিমঝিম তীব্র চোখে তাকাল কুলদীপের দিকে। যে চোখে হীর তাকিয়েছিল রন্‌ঝার দিকে। যে চোখে মহুয়া বেদেনি দেখেছিল নদের চাঁদকে। যে চোখে শুধু মেয়েরাই তাকাতে পারে।

ঝাঁঝালো গলায় বলল — যার মনে যা আছে তা সোজাসুজি প্রকাশ করে দেওয়াটাই ভাল দীপদা। চুপ মেরে থাকাটা আরও ভয়ংকর। বলেই হনহন হাঁটা লাগিয়েছে।

কোথ্‌থেকে একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ পাচ্ছিল কুলদীপ। ওই সুরভি কি রিমঝিমই রেখে গেল!

তেরো

রোহিলা থেকে পরশু চিঠি এসেছে দলজিতের। রাজিন্দরের পত্রের জবাব। দলজিৎ সাফ জানিয়ে দিয়েছে পঞ্জাব পুলিশের সঙ্গে সরাসরি মামলা লড়ায় সে আর আগ্রহী নয়। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে কি বিবাদ করা সম্ভব! বরং মামাজির মানবাধিকার কমিশনে যাওয়ার প্রস্তাবটি তার পছন্দ বেশি। সেখানে আবেদন জানালে যদি কলকাতা পুলিশ পঞ্জাব পুলিশের বিরুদ্ধে কেস করতে বাধ্য হয়, সে তো ভাল কথা। এতে সাপও মরবে, অথচ লাঠিও ভাঙবে না। তবে হ্যাঁ, মামাজি যেন তার আবেদনে ক্ষতিপূরণের কথা অবশ্যই উল্লেখ করেন। বাবা মার মূল্যবান জীবনের বিনিময়ে সে যদি কিছুই না পায় .... ! মামাজি নিজে সরাসরি কেসে গেলেও তার আপত্তি নেই। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনে মামাজিকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করতে পারে সে। বাবা মার প্রতি তার একটা নৈতিক কর্তব্য তো রয়েছেই!

চিঠিটা পড়ার পর থেকেই রাজিন্দরের মেজাজ সপ্তমে। দলজিতের সম্পর্কে তার কোনও দিনই তেমন উচ্চ ধারণা ছিল না, কিন্তু তা বলে এত আত্মসর্বস্ব। কল্পনায় দলজিতের মুখটা দেখতে পেল রাজিন্দর, পায়ের ওপর পা তুলে চারপাইতে শুয়ে আছে, চোখ চকচক করছে মোটা ক্ষতিপূরণের লোভে! মনজিৎ খামখেয়ালি ছিল বটে, তবে দাদার থেকে তার হৃদয় অনেক বেশি উদার ছিল। সে বেঁচে থাকলে কক্ষনও এভাবে ভাবতে পারত না। বাবা মার মৃত্যুর আইনি বদলা নেওয়ার মতোও বুকের পাটা যার নেই, তাকে কি জাঠ বলা যায়। ছিঃ ছিঃ। ছেলে হয়ে এমন কথা লিখে রোহিণী গুরবচনকে অপমান করেছে দলজিৎ। এবং রাজিন্দরকেও। ও চিঠির কথা রাজিন্দর লোককে জানাবে কী করে!

পরমিন্দর আর কুলদীপকে নিয়ে পরামর্শে বসল রাজিন্দর। আলোচনা করবে কী, রাগে গরগর করছে। দুটো শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনটে অশ্রাব্য গালাগালি বেরিয়ে আসে মুখ থেকে।

পরমিন্দর তাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করল —দলজিতের ওপর যতই চটাচটি করুন, তার পন্থাটাই শ্রেষ্ঠ। পরিশ্রম বাঁচে, অর্থও বাঁচে। আর তারা যদি সাজা পায় সেটা তো উপরি লাভ।

রাজিন্দর গর্জে উঠল, — চোপ। লাভ আমার, না ওই নালায়েক কুত্তার? উকিলবাবু কী বলল শোনোনি? হিউম্যান রাইট কমিশন পঞ্জাবের ডিজির কাছে রিপোর্ট চাইবে, এখানকার পুলিশের কাছ থেকে কাগজপত্র নেবে, তার পর সবকিছু খতিয়ে দেখে ..... কম সে কম দশ বছরের ধাক্কা।

— কেসও কি কালই ফয়সালা হয়ে যাবে?

—রুপিয়া ঢাললে জরুর হবে।

—উকিলবাবুর চক্করে কেন পড়বেন জিজাজি? আপনি কেস করলে তার লাভ বেশি। দেখছেন না, সামান্য একটা আবেদনের মুসাবিদা করতে বিশ দিন লাগিয়ে দিল! রোজই বলে আপনাদের জন্য দুশো-দুই সি-আর-পি-সিটাই ঠিক ছিল।

কুলদীপ চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎ বলে উঠল, — মামাজি ঠিকই বলেছেন পাপা। উকিলবাবু যা বলছেন, সবই তাঁর রুপিয়া খিঁচবার ধান্দা। পুয়াজির ছেলেই যদি হাত ধুয়ে ফেলে, তুমি কেন একা বোঝা টানতে যাবে? সামান্য কটা টাকা পাঠাবে দলজিৎভাইয়া, সেই ভরসায়?

— ওই টাকায় আমি পিসাব করে দিই। আমি আগে বলেছি, আমি কেস করব তোমাদের জন্য। আমার সম্মানের জন্য। এখন বলছি, আমি কেস করব রোহিণী কাউরের জন্য। সে শুধু দলজিৎ সিং-এর মা নয়, সে আমার পহেনজিও। দিদির মৃত্যুর বদলা ভাই নেবে।

এমন রোখ্ চেপে যাওয়া মানুষের সঙ্গে তর্ক বৃথা। কুলদীপ পরমিন্দর চুপ মেরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উকিলকে ফোন করে কেস ফাইল করতেই নির্দেশ দিল রাজিন্দর। উকিলবাবুও খুশি।

তারপরও রাজিন্দরের মন ভাল নেই। দলজিতের আচরণ ভেতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। দু দিন পরও।

ডেকোরিনার সামনে আজ চারখানা গাড়ি। বসন্তের পদধ্বনি শুনেই গ্রীষ্মের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে, গাড়িতে গাড়িতে এখন এসি সার্ভিসিং-এর ধুম। কারুর ঠাণ্ডা মেশিনে গ্যাস ভরতে হবে, কেউ বা নিছকই নিয়ম মাফিক দুরস্ত্ করে নেবে যন্ত্রপাতি। মাইক্রো ব্যাক অ্যালার্মও লাগাতে হবে একটা গাড়িতে। মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীর গাড়ি, তার অ্যালার্মে আরতির সুর চাই। পুণ্যের রেডিমেড বন্দোবস্ত! এ বাজনাটার এখন মার্কেটে দারুণ চল।

মিস্ত্রিদের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিল রাজিন্দর। শরীরটা সকাল থেকে আজ একটু গড়বড় করছে। মাথা টিপটিপ, সর্দি সর্দি ভাব, গা ম্যাজম্যাজ। ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে, এখন ঘরে ঘরে জ্বর আসার সময়। গত সপ্তাহে বিমলাও খুব ভুগে উঠলেন। একশো দুই-তিন তাপ, সঙ্গে দমছেঁড়া কাশি। অনেকটা ব্রঙ্কোনিমোনিয়ার মতো। ভাবনায় পড়ে গিয়েছিল রাজিন্দর। বিমলার বয়সি রুগিকে ডাক্তাররা সহজে অ্যান্টিবায়োটিক দেন না, তায় আবার বিমলার হার্টও দুর্বল.... । তবু উপায়ান্তর না দেখে তাই দিয়েই সামাল দিতে হল। নির্জীব মানুষটা আরও নিস্তেজ এখন। মড়ার মতো পড়ে থাকেন, ব্যালকনিতে গিয়ে বসার ক্ষমতাটুকুও চলে গেছে। দু বেলা এখন মার ঘরে অনেকটা সময় কাটায় রাজিন্দর। মার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, হাবিজাবি কথা বলে মার সঙ্গে। বিমলা শুনছেন কি শুনছেন না বুঝতে পারে না, তবুও। বিমলার জীবাণুই কি রাজিন্দরকে ধরে ফেলল!

তবে এখন বুখার এলে রাজিন্দরের চলবে না। সমব চ্যাটার্জি দিন সাতেকের জন্য তাঁর দেশের বাড়িতে গেছে। ভাতারে। ভেতর বাইরের সব কাজই এখন দেখতে হচ্ছে রাজিন্দরকে। মামলার জন্য ছোটাছুটিও করতে হবে কিছু। থানা-লালবাজার, কোর্ট, উকিল..... । এখন স্বয়ং যম এলেও তাকে ফিরিয়ে দেবে রাজিন্দর।

কাজে লেগে গেছে মিস্ত্রিরা। দোকানে ঢুকে রাজিন্দর বাদলকে বলল, — আমি একটু বেরোচ্ছি। ফিরতে দেরি হতে পারে।

বাদল নিবিষ্ট মনে বাংলা কাগজ খুলে কী যেন পড়ছে। বোধহয় খেলার খবর। চোখ তুলে কায়দা করে বলল — কাঁহা যা রহেঁ হ্যাঁয় আপ?

রাজিন্দর শুদ্ধ বাংলায় বলল, চাঁদনি যাব আগে। দোকানের জন্য কয়েকটা মাল চাই। তারপর একটু আমার উকিলবাবুর সঙ্গে কথা বলে ফিরব।

— ঠিক হ্যায় জি।

— মিস্ত্রিদের ওপর কিন্তু নজর রেখো। তপনের কাজ শেষ হলে ভাল করে এসিগুলো চালিয়ে দেখে নেবে।

— সব হো যায়গা। আপ বেফিকির রহিয়ে।

ওফ্, কী অসহ্য হিন্দি! কেন যে ছেলেটা তার সঙ্গে হিন্দিতেই কথা বলে! রাজিন্দর মনে মনে বলল, তুমি যখন আছ রাজিন্দর তো বেফিকর্ থাকবেই।

আকাশ সম্পূর্ণ মেঘহীন আজ। ফাল্গুন পড়তে না পড়তে রোদের তেজ প্রখরতর। হঠাৎ হঠাৎ বাতাস ঘূর্ণি দিয়ে ওঠে, ধুলো ওড়ায়। ব্যস্ত পথের ধারে মুমূর্ষু কৃষ্ণচূড়ায় রক্তিম আভা। যান্ত্রিক শহরে লাল প্রতিবাদের মতো।

লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে লম্বা মিছিল চলেছে। ফল, যথারীতি যানজট। বিশ মিনিটের রাস্তা পার হতে রাজিন্দরের একটি ঘণ্টা লেগে গেল।

চাঁদনিতে তিনটে দোকানে রাজিন্দরের বেশি যাতায়াত। সেন কোম্পানি, গুপ্তা ব্রাদার্স, আর অটো মার্কেট। গাড়িতে ব্যবহার্য হরেক রকম শৌখিন জিনিসের স্টকিস্ট এরা। বেশির ভাগই দিল্লি মুম্বাইতে তৈরি মাল। চোরা পথে আসা বিদেশি জিনিস নিয়ে এরা বিশেষ কারবার করে না। ডেকোরিনার মালিক হিসেবে তিন দোকানেই রাজিন্দরের বেশ খাতির।

প্রথমে সেন কোম্পানিতেই ঢুকল রাজিন্দর। সেন কোম্পানি এ অঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন দোকান, বিশালও বটে। হলঘরের মতো জায়গাটায় স্বচ্ছন্দে বাচ্চারা ক্রিকেট প্র্যাকটিস করতে পারে। এটা নেহাতই অফিস কাম শোরুম, এদের আসল গুদাম কলুটোলায়। একদা স্পেয়ার পার্টসের ব্যবসায়ী সেন কোম্পানি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকও করে নিয়েছে দোকানটাকে। পিছন দিকে কয়েকটি চেয়ার টেবিল, টাইপিস্ট কেরানিদের। কাচ লাগানো সেক্রেটারিয়েট টেবিলও আছে একটা, ছোট মালিক অনুপ সেনের। দোকানের সর্বময় কর্তা গোবর্ধন সেনের বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে, তিনি বসেন আরও পিছনে, স্বতন্ত্র ঘরে। এই বয়সেও রোদ জল ঝড় বৃষ্টি সব উপেক্ষা করে তিনি আসেন দোকানে নিয়মিত। ঘড়ির কাঁটা মেপে। বারো মাস।

অনুপ সেন আজ নেই। গোবর্ধনের ঘরে উঁকি দিল রাজিন্দর — নমস্তে সেনবাবু।

— আরে, আসুন আসুন। নমস্তে। ভারী চেহারার ধুতি শার্ট গোবর্ধন সেন মুড়ি বাতাসা শশা মেখে টিফিন সারছিলেন। উঠে দাঁড়িয়েই বসে পড়লেন — আজ আপনি যে বড়? আপনার জুড়িদার কোথায়?

রাজিন্দর বলল — কী সব জমি জমার ব্যাপারে দেশে গেছে।

— অ। জমি বেচছে?

— তা ঠিক বলতে পারব না। রাজিন্দর হেসে ফেলল — আপনার শরীর কেমন?

— কেমন দেখছেন?

—বহুৎ আচ্ছা। আপনার উমর তো বাড়েই না সেনবাবু!

— হা হা হা। এর জন্য কত সাধনা দরকার জানেন? মেপে খাওয়া, মেপে ঘুম, নিয়ম করে প্রতিদিন যোগাসন, উদ্বেগকে প্রশ্রয় না দেওয়া .....

বহু বার শোনা কথা। তবু গোবর্ধন সেনের মুখে বার বার শুনতে খারাপ লাগে না। মানুষটার ওপর শ্রদ্ধাই আছে রাজিন্দরের। যখন ডেকোরিনা খোলা হল, এই সেনবাবু এক কথায় তিরিশ হাজার টাকার মাল দিয়ে দিয়েছিলেন। ধারে। কোনও সিকিউরিটি ছাড়া। প্রায় না চিনেই। কে বিজনেসম্যান, কে জোচ্চোর, আমি দেখে বুঝি সর্দারজি! এই শহরে আপনি দাঁড়াতে এসেছেন, মাত্র তিরিশ হাজার টাকার জন্য আপনি নিজের পায়ে কুড়ুল মারবেন!

কথার মাঝে মুড়ির পাত্র এগিয়ে দিয়েছেন গোবর্ধন, কুণ্ঠিত মুখে খাচ্ছে রাজিন্দর। কর্মচারীকে ডেকে রাজিন্দরের মালের লিস্ট ধরিয়ে দিলেন গোবর্ধন, চা আনালেন। কাজের কথা চলছে, কাজের বাইরের

কথাও। রাজিন্দরের পারিবারিক দুর্যোগের কাহিনী গোবর্ধন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন, সংক্ষেপে রাজিন্দর শোনাল তার পরবর্তী পদক্ষেপের কথা।

গোবর্ধন সান্ত্বনা দিয়ে বললেন — চিন্তা করবেন না সর্দারজি, সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা বীরের জাত, বীরের মতোই সমস্যার মোকাবিলা করুন।

রাজিন্দর উদ্দীপিত মুখে বলল — সেই চেষ্টাই তো করছি। সব্বাইকে দেখিয়ে দিতে চাই আমরা কী।

— আপনারা কী আমরা জানি না সর্দারজি? একটা সময় গেছে যখন বাড়ির মেয়েছেলেদের সর্দারজির ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম, ব্যস নিশ্চিন্ত। দিন হোক, রাত হোক, পথে ডাকাত আসুক, গুণ্ডা আসুক, ঠিক জানতাম কোনও বিপদ নেই। আপনাদের মতো সাচ্চা জাত আর কটা আছে! .... আজকাল তো রাস্তায় সর্দারজি ট্যাক্সি ড্রাইভার টর্চ নিয়ে খুঁজতে হয়।

ট্যাক্সি ড্রাইভারের উদাহরণে হীনম্মন্যতা বোধ করল না রাজিন্দর। বরং গর্বে বুক ফুলে উঠল। হাসছে মিটিমিটি।

গোবর্ধন চেয়ারে হেলান দিলেন — তারপর আপনাদের নতুন ব্যবসা কদ্দূর? এই গরমেই শুরু করছেন?

রাজিন্দরের হাসি হোঁচট খেল — কীসের ব্যবসা?

— চ্যাটার্জি যে বলল এসি মেশিন সার্ভিসিংএর বিরাট কনট্র্যাক্ট পেয়েছে? দুটো বড় বড় কোম্পানির ..... একশো কুড়ি না দেড়শো গাড়ির?

— আমি তো কিছু জানি না!

— আশ্চর্য! চ্যাটার্জি যে বলে গেল বড় গ্যারেজও একটা জোগাড় হয়ে গেছে? ..... পার গাড়ি দু হাজার? ..... ফেলে ছড়িয়ে বছরে লাখ দুয়েক ঘরে আসবে?

রাজিন্দরের বুকটা ফাঁকা হয়ে গেল। ঘরে বাতাস কমে গেল কি? গোবর্ধন সেন বাজে কথা বলার মানুষ নন। তলে তলে তবে এই মতলবে আছে চ্যাটার্জি? বাজারে গুজব তা হলে মিথ্যে রটেনি? রাজিন্দরকে বলল না কেন? চ্যাটার্জি পৃথক আরেকটা ব্যবসা করলে রাজিন্দর কি বাধা দিত! এসি মেশিনের কাজ ডেকোরিনার ব্যবসার অনেকখানি, হয়তো কিছুটা মার খেত ডেকোরিনা, তবে ঠিক সামলে নিত রাজিন্দর। কেন এমন কাজ করল চ্যাটার্জি!

গোবর্ধন বোধহয় বুঝেছেন ব্যাপারটা। গুম। তাঁকে আরও কৌতূহলী হওয়ার সুযোগ না দিয়ে রাজিন্দর উঠে পড়ল। মালপত্র বুঝে তুলে নিল গাড়িতে। অবসন্ন হাতে ধরল স্টিয়ারিং। মাথার টিপটিপ ভাব প্রকট সহসা। ছড়িয়ে পড়ছে ঘাড়ে কাঁধে। শুকনো টাগরা জ্বলে গেল।

গাড়ি গতি নিচ্ছে না। আহত সরীসৃপের মতো চলেছে মন্থর। সরীসৃপ, না অবিশ্বাস? সরীসৃপ, না সংশয়? সরীসৃপ, না অভিমান?

আলিপুর কোর্টে না গিয়ে দোকানে ফিরে এল রাজিন্দর। অবাক হয়ে দেখল সকালের চারটে গাড়িই দাঁড়িয়ে আছে পর পর, মিস্ত্রিরা কেউ ধারে কাছে নেই! কাউন্টারে দুটো চ্যাংড়া মতো ছেলের সঙ্গে গুলতানি করছে বাদল।

দোকানে ঢুকেই রাজিন্দর প্রশ্ন করল — তপন মাধাইয়া সব কোথায়?

বাদল দায়সারাভাবে বলল — উধার হি তো থা। নেই হ্যায়? টিফিন মে গয়া হোগা।

রাজিন্দর দাঁতে দাঁত চাপল — কটা গাড়ির কাজ ফিনিশ হয়েছে?

— এই তো একটা হয়ে এল। তপন বলছিল টাইম লাগে গা।

— এতক্ষণে একটা গাড়ি? রাজিন্দর আর বিরক্তি চাপতে পারল না, — তোমাকে এত বার করে বলে গেলাম ..... !

— হো যায়গা। নেই হোনে সে কাল হোগা। বন্ধুদের সামনে যেন নিজের ওজন দেখাচ্ছে বাদল — মাথা খারাপ করবেন না তো।

ঠাস ঠাস করে চড়াতে ইচ্ছে করছে বাদলকে, কোনও ক্রমে নিজেকে সামলাল রাজিন্দর। স্ফুরিত নাসারন্ধ্রে আগুন চেপে বেরিয়ে আসছিল, তখনই শুনতে পেল — এই বাঁধাকপিটাই তোদের পার্টনার?

কলকাতায় আসার পর ওই বিশেষ শব্দটা বহু বার বহু জনের মুখে শুনেছে রাজিন্দর, কখনও এত বিশ্রীভাবে গায়ে লাগেনি।

রাজিন্দর সটান ঘুরে দাঁড়াল —কী বললে? কে বললে?

দুই সাগরেদই চুপ। উদাস।

বাদল তড়িঘড়ি বলল — আপনাকে কিছু বলেনি।

এক পা এক পা করে রাজিন্দর কাউন্টারের সামনে গেল — তোমাদের তো দেখে ভদ্রলোকের বাচ্চা বলে মনে হয়, বয়স্ক মানুষের সম্পর্কে এমন ইতরের মতো কথা বলতে শিখলে কোথ্থেকে?

বাদল ঝটাং উঠে দাঁড়িয়েছে। আঙুল নেড়ে বলল — আমার বন্ধুদের মিছিমিছি অপমান করছেন কেন? আপনাকে কিছু বলা হয়নি।

— হাজার বার বলেছ। লক্ষ বার বলেছ। রাজিন্দর হুংকার দিয়ে উঠল — জানো তোমাদের তিনটেকেই আমি দোকান থেকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারি?

— ইল্লি রে। একি আপনার বাপের দোকান?

একটা বন্ধু বলে উঠল — ছেড়ে দে বাদল। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।

— কেন ছাড়ব? কথায় কথায় আমার ওপর রং দেখানো, অ্যাঁ? আমি কি ওর হুকুমের চাকর আছি? বলেই বাদল বুকে বুড়ো আঙুল ঠুকছে — এই দোকানে ওই পাইয়ার যত শেয়ার আছে, আমাদেরও ততটা। আমাদের দোকানে বসে আমাদেরই ছুড়ে ফেলে দেবে! এত বড় আস্পর্ধা!

রাজিন্দর চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না! কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না! চিড়িং চিড়িং বিদ্যুৎ তরঙ্গ লাফাচ্ছে মাথায়, ঝিনঝিন করে উঠল হাত পা।

ছেলে দুটো আরও ভয়ানক কিছু ঘটার আশঙ্কায় গুটিয়ে গেছে। একজন টুল ছেড়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিল, বাদল তার কাঁধ ধরে চেপে বসিয়ে দিল — যাচ্ছিস কোথায়? বোস। কোথ্থাও যাবি না। কোথ্থেকে উড়ে এসে সব জুড়ে বসেছে, আমাদের এখানে করে যাচ্ছে, আর আমাদেরই শাসায়! .... কফি খাবি? ..... সঙ্গে আর কিছু?

রাজিন্দর কেন যে কাউন্টারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না, তা শুধু সেই জানে। বিবশ হয়ে গেল কেমন। বাক্‌রোধ হয়ে গেছে।

টলতে টলতে দোকান থেকে বেরিয়ে আবার গাড়িতে উঠল রাজিন্দর। কোথায় চলেছে জানে না। দু দিকের ঘর-বাড়ি দোকানপাট উল্কার গতিতে উলটো দিকে ধাবমান। একটু থামতে হলেই হর্ন বাজিয়ে চলেছে অশান্ত হাত।

সন্ত্ কুটিয়া গুরদোয়ারার সামনে এসে একসঙ্গে ক্লাচ ব্রেক চাপল রাজিন্দর।

ভরদুপুরে বিনা নোটিসে রশ্‌মি এসে উপস্থিত। সুখবিন্দরের হাত ধরে, চুন্নিকে ট্যাঁকে নিয়ে, নিখুঁত সুখী পরিবারের বিজ্ঞাপনের মতো। বউ মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি নামিয়ে তেল কোম্পানির অফিসে কাজে গেল সুখবিন্দর, রাতে এখানেই থাকবে, ভোরের ইস্পাত এক্সপ্রেসে ফিরে যাবে খড়গ্‌পুর। বাবা মা দাদির জন্য নাকি ভীষণ মন কেমন করছিল রশ্‌মির, সে এখন দিন সাতেক পিতৃগৃহেই অধিষ্ঠান করবে।

কুলদীপ যতটা মৃদুভাষী, রশ্‌মি ততটাই মুখর। তার হাসি কান্না দুইই মাত্রা ছাড়া। অতি তুচ্ছ আনন্দে সে বাড়ি মাতিয়ে রাখতে পারে, আবার সামান্যতম বিষাদে কেঁদেকেটে একশা হয়। এসেই সে বিম্‌লার ঘরে ঢুকে গেল। দাদিজিকে জড়িয়ে ধরে ফোঁচ ফোঁচ চোখের জল ফেলল খানিক। পরক্ষণেই চুন্নিকে বিম্‌লার ঘরে ছেড়ে এসে কোমলের সঙ্গে গল্প জুড়েছে। চুন্নি লাফাচ্ছে বিম্‌লার বিছানায়, কলকল কথা বলছে, নাচছে। দীর্ঘ আড়াই মাস পর বিম্‌লার শীর্ণ মুখমণ্ডলে বুঝি হাসির আভাস ফুটল। হাসি নয়, চেরাপুঞ্জির আকাশে যেন সরু সূর্যের রেখা।

কোমল মহা আহ্লাদিত। অনেক কাল পর সে মনের প্রাণের কথা বলার সঙ্গী পেয়েছে। কুলদীপেরও লেখাপড়া ডকে, রশ্‌মি এলে যেমনটা হয়।

এক লহমায় ফ্ল্যাটটা আনন্দের নির্ঝরিণী হয়ে গেছে।

মার সঙ্গে কিচির মিচির করছিল রশ্‌মি। হঠাৎ হাঁক পাড়ল — কুল্লু, কুল্লু ....

কুলদীপ বিমলার ঘরে ঢুকেছিল। ভাগনিকে পাকড়াও করতে। ডাক শুনে বেরিয়ে এল — কীই?

— ইধার আ না। জব্বর খবর আছে।

— তোর জন্যও একটা খবর আছে। বলেই রাজিন্দরের ঘর থেকে দলজিতের চিঠিটা এনে রশ্মির হাতে ধরিয়ে দিল কুলদীপ — পড়, পড়ে দ্যাখ।

তুরন্ত চিঠিতে চোখ বোলাল রশ্মি। ভাবান্তর হল না বিশেষ। ফেরত দিয়ে দিল।

কুলদীপ বলল —পাপা কিন্তু ডাইরেক্ট কেস করছে। কমিশন টমিশনে যাচ্ছে না। বুঝলি?

— খুব ভাল। খুব ভাল। রশ্মির ও সব নগণ্য জাগতিক ব্যাপারে উৎসাহ নেই। সে দ্রুত নিজের কথার জগতে ঢুকে পড়ল। হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করল — বি এস্ সির পর তুই কী করবি রে কুল্লু?

কুলদীপ ভুরু কুঁচকোল — কেন বল তো?

— বল না কী করবি?

— এম এস সি পড়ব।

— তারপর?

— রিসার্চ করব।

— তারপর?

— একি রেকারিং ডেসিমেলের অঙ্ক নাকি, যে তারপর তারপর করে যাচ্ছিস? অত আমি বলতে পারব না।

ছদ্ম বিরক্তি দেখিয়ে গটগট চলে যাচ্ছিল কুলদীপ, হিড়হিড় করে তাকে টেনে আনল রশ্মি। রহস্যময়ীর মতো চোখ ঘুরিয়ে বলল — তোর ফরেন যেতে ইচ্ছে করে না?

প্রশ্নতেই আঁশটে গন্ধ। কুলদীপ ছুঁচোলো চোখে রশ্মির দিকে তাকিয়েছে,—ঝেড়ে কাশ্ তো। কী বলতে চাইছিস্?

হিন্দি সংলাপের মাঝে 'ঝেড়ে কাশ্ তো' বাক্যবন্ধটি বাংলায় বলা। রশ্মি ঝিরঝির হেসে উঠল। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করছে কোমলের সঙ্গে। দুলে দুলে বলল — বি এস সির পরেই আমি যদি তোর বিদেশ যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিই?

— জিজাজি জাল নোট ছাপানোর ফ্যাক্টরি খুলেছে বুঝি? নাকি তোর শ্বশুরবাড়ির উঠোনে তেল পাওয়া যাচ্ছে?

— ধর তাই। যাবি?

— না। আমার নিজের দেশই ভাল। কুলদীপ এক কথায় নাকচ করে দিল।

নিবতে গিয়েও নিবল না রশ্মি — বিশ্বাস হচ্ছে না তো? সুখবিন্দরের এক তাউজি আছেন, কটকে থাকেন, খুব বড় ট্রান্সপোর্টের বিজনেস ..... তিনি তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্য ভাল একটা ছেলে খুঁজছেন। ভাল মানে, লেখাপড়ায় ভাল হবে, দেখতে শুনতে ভাল হবে, এবং অবশ্যই জাঠ।

— তো? কুলদীপ কূট চোখে তাকাল।

— উনি আমাকে ভীষণ স্নেহ করেন। খড়গ্পুরে এসেছিলেন, তোর কথা বলেছিলাম, উনি দারুণ আগ্রহী। তুই যদি চাস, বি এস সির পরেই তোকে বাইরে পাঠিয়ে দেবেন। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইংল্যান্ড, যেখানে তুই বলবি। কী, কেমন?

কোমল নাতনিকে আঙুর খাওয়াতে বসেছে। লঘু গলায় বলে উঠল, — ওর আবার বিয়ে কী রে? এই বয়সে?

— তোমার ছেলের কী এমন কম বয়স! জুনেই তো বাইশ হয়ে যাবে। আমার ননদাইয়ের তো ওই বয়সেই লামাফেরে হয়েছিল।

কুলদীপ ফিকফিক হাসছে — তা বিয়ের শর্তটা কী? স্টেটস্ থেকে পি এইচ ডি করে এসে ট্রান্সপোর্টের বিজনেস দেখতে হবে, এই তো?

— সে তোর যা ইচ্ছে। তাউজির কোনও জোরাজুরি নেই।

কুলদীপের হাসি আরও চওড়া হল — মেয়ে কানা না খোঁড়া?

— মোটেই না। কনভেন্টে পড়ছে মেয়ে। ক্লাস টুয়েলভ্। রীতিমতো সুন্দরী। বলতে বলতে দৌড়ে ঘর থেকে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে এল রশ্মি। ফস করে একটা ছবি বার করে দোলাচ্ছে — একবার দ্যাখ। দেখলেই পছন্দ হয়ে যাবে।

কুলদীপ ছবিটা দেখল। নাহ্, নাক মুখ চোখ সবই নিখুঁত। ফটো তোলার কারসাজি না থাকলে একে নিঃসন্দেহে রূপসী বলা চলে। একটাই শুধু ত্রুটি। মেয়েটা রিমঝিম নয়।

অসীম ঔদাসীন্যে ছবিটা বোনের ব্যাগে ঢুকিয়ে দিল কুলদীপ — নারে, বাতিল।

— ইশ্, বাতিল বললেই হল! পাপা আসুক, পাপাকে আমি ঠিক মত করাব। দেখি তারপর তুই কী করে না বলিস!

— পাপার মত নিয়ে কী হবে? পাপা বিয়ে করবে?

ব্যস্, ভাই বোনে খুনসুটি বেধে গেছে। কুলদীপ ছোট ছোট টিপ্পনী কাটে, তিড়িং বিড়িং লাফাতে থাকে রশ্মি, কোমল হেসে কুটিপাটি। চুন্নিও ভারী মজা পেয়েছে, ঘুরে ঘুরে তালি বাজাচ্ছে। কখন যে দুপুরটা গড়াতে গড়াতে বিকেল হয়ে গেল কেউ জানতেও পারল না।

বিকেল হতেই রশ্মির নতুন বায়না। চাইনিজ খাবে!

কোমল বলল—পাপাকে ফোন করে দে। আসার সময়ে বড় দোকান থেকে নিয়ে আসবে।

রশ্মি দৌড়ল ফোন করতে। মুখ ভেটকে ঘুরে এল — পাপা নেই। বেরিয়ে গেছে।

অগত্যা কুলদীপই ভরসা।

কাছে একটা নতুন দোকান হয়েছে, ল্যান্সডাউনের দিকটায়। দাম একটু বেশি বটে, খাবার ভাল বানায়। ট্যাংরার মতো।

চিনে দোকানের একটাই ফ্যাচাং। বড় বেশি অপেক্ষা করতে হয়। সম্ভবত এই কারণেই চিনদেশের লোকেরা এত ধৈর্যশীল। অথবা তারা ধৈর্যশীল বলেই তাদের খাবার দেরিতে আসে। স্কুটারে গিয়েও কুলদীপের এক ঘন্টার ওপর লেগে গেল।

পাড়ায় ঢুকে স্কুটারের গতি কমে গেছে। সন্ধের আলোছায়া মাখা পথে তৃষিত চাতকের মতো ঘুরছে দুই চোখ। যদি রিমঝিমের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। হল না। পৃথিবীতে চান্স ফ্যাক্টর বড় কমে গেছে এখন।

স্কুটার রেখে সিঁড়িতে ওঠার মুখে কুলদীপের চোখ বড় বড়। একতলার ঘোষ আঙ্কলদের দরজা খোলা, ভেতরে খুকুদিদির কোলে চুন্নিকে দেখা যায়! পাশে দাঁড়ানো আন্টি আপ্লুত মুখে আদর করছে চুন্নিকে! আহ্লাদিপনা!

মুহূর্তের জন্য তীব্র রাগ ফুঁসে উঠেছিল শরীরে, মুহূর্তে নিজেকে সংযত করল কুলদীপ। ছি, তারও কি মন ছোট হয়ে গেল?

কুলদীপ টুক করে সরে এল। সিঁড়ি ভাঙছে। রশ্মিদিদি কি চুন্নিকে রেখে বেরোল কোথাও? তা কী করে হয়, ফ্ল্যাটে তো মাম্মিই আছে। ওরাই নিয়ে গেছে? চুন্নি একা একা নেমে যায়নি তো? খুকুদিদিকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

ফ্ল্যাটে ঢুকে ভাবনাটা উবে গেল। কুলদীপ দেখল, পাপা ফিরে এসেছে। অসময়ে। বিছানায় শুয়ে পড়েছে। তার মাথায় আইসব্যাগ দিচ্ছে রশ্মিদিদি আর মাম্মি।

কী যেন বিড়বিড় করছে রাজিন্দর! চোখ দুটো তার টকটকে লাল।

চোদ্দো

টানা তিন দিন প্রবল জ্বরে প্রায় বেহুঁশ পড়ে রইল রাজিন্দর। প্রায় বেহুঁশ, সর্বাঙ্গ বেহুঁশ নয়। বোজা চোখেই টের পাচ্ছিল কোমল মাথার পাশে বসছে বার বার, কুলদীপ আর রশ্মি উদ্বিগ্ন স্বরে তাকে নিয়েই কথা বলছে, ডাক্তার এল গেল, ফোন বাজছে, পরমিন্দররাও দেখতে এসেছে তাকে। সবই কেমন অলীক। ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াশার আড়ালে যেন কোনও দূরের জগৎ। রাজিন্দরের বুকে শুধু একটা কথাই ঢং ঢং বেজে চলেছে। হেস্তনেস্ত করতে হবে, হেস্তনেস্ত করতে হবে।

চতুর্থ দিন জ্বরের প্রকোপ কমল কিছুটা। রাজিন্দর বিছানা ছেড়ে উঠল, অল্পস্বল্প হাঁটাচলা করছে। দু

পা চললেই মাথা টলে যায়, তবুও। সর্বক্ষণ কী যেন ভাবে, ঘন ঘন ফোনের দিকে চোখ। বার কয়েক দূরভাষের কাছে গিয়েও ফিরে এল।

শেষে বিকেলের দিকে ডাকল কোমলকে —দোকানের লাইনটা একটু ধরো তো।

কোমল ভুরু কুঁচকোল —এক্ষুনি দোকানের চিন্তা মাথায় আনতে হবে না।

—আহ্! চ্যাটার্জিবাবু দেশ থেকে ফিরেছে কি না দ্যাখো।

—ওমা, উনি তো এসে গেছেন। পরশু রাতে ফোন করেছিলেন। আমি বলে দিয়েছি তোমার বুখার। প্রেশার জাদা আছে, ডাক্তার কিছু দিন রেস্ট নিতে বলেছে।

—ও।

রাজিন্দর চুপ হয়ে গেল। পরশু ফিরেছে চ্যাটার্জি, শুনল রাজিন্দর বিমার, তবু এক বার দেখতে এল না! কেন এল না? নিজের ভেতরে গলদ এসে গেছে বলেই কি?

চুন্নি নানাজি নানাজি করে হাত ধরে টানছে। রাজিন্দর অন্যমনস্ক মুখে তার সঙ্গে খেলা করল খানিক। তারপর হঠাৎই প্যান্টশার্ট পরে মাথায় দস্তার চড়াল।

রশ্‌মি দৌড়ে এল —কোথায় যাচ্ছ পাপা?

—একবার দুকান যাব।

—এখন?... তোমার ফিভার এখনও রেমিশান হয়নি পাপা!

—কিছু হবে না পুত্তর। যাব, আর আসব।

কোমল উড়ে এল —অচানক দোকান দোকান করে খেপে গেলে কেন?

—জরুরি কাজ আছে।

—কী কাজ শুনি?

—ও তুমি বুঝবে না।

—আমি তো কিছুই বুঝি না। কোমল রেগে গেল —এসিতে গিয়ে বসে থেকে ফির বুখার ডেকে আনো...! কাল সুবাহ্ গেলে কী হয়?

কারুর কথা না শুনে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাজিন্দর।

বাইরে আমাল দামাল বাতাস বইছে একটা। গা শিরশির করা বাতাস। শুকনো পাতা উড়ছে পথে, খচমচ ভাঙছে গাড়ির চাকায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল।

রাজিন্দর যা ভেবেছিল, তাই। সমর চ্যাটার্জি দোকানেই রয়েছে, পাশে বাদল।

সমরের মুখে অকৃত্রিম হাসি —আরে সিংজি যে! আসুন আসুন। শরীর ফিট্?

—মোটামুটি।...দেশে আপনার কাজ হল?

—হল আর কী।...বসুন না। সমর নিজের চেয়ার ছেড়ে দিল।

বসল না রাজিন্দর। ভূমিকা না বাড়িয়ে বলল —আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—বলুন। বলে ফেলুন।

রাজিন্দর আড়চোখে বাদলকে দেখল —প্রাইভেট্‌লি বলব।

ইঙ্গিত বুঝে, রাটি না কেড়ে, বাদল বাইরে গেল।

এতক্ষণে বসল রাজিন্দর। কাউন্টারের এপারে টুল টেনে। গলা ঝেড়ে বলল —আমার ডেকোরিনার শেয়ার আমি বেচে দিতে চাই চ্যাটার্জিবাবু।

—হঠাৎ?

—ইচ্ছে। আমি আর ডেকোরিনায় থাকব না। আপনার সঙ্গে আমার পার্টনারশিপ খতম।

সমর হোহো করে হেসে উঠল —আরেব্বাস, ইত্না গুস্‌সা? একটা বাচ্চা ছেলে জোশের মাথায় কী বলেছে না বলেছে...আমি ওকে খুব বকে দিয়েছি। বাদল আপনার কাছে মাপ চেয়ে নেবে।

রাজিন্দর বুঝি জানতই এমন কিছু বলবে সমর চ্যাটার্জি। যেন পথে ঘাটে দুটো ছেলের ঝগড়া হয়েছে, সমর অভিভাবক হয়ে মিটমাট করে দিচ্ছে, এমনই হাবভাব।

রাজিন্দর গোমড়া মুখে বলল — বাদলের কথা উঠছে না চ্যাটার্জিবাবু। আমার মনে হয় আমাদের রিলেশান আরও খারাপ হওয়ার আগে আমার সরে যাওয়া ভাল।

— সম্পর্ক খারাপের প্রশ্ন আসে কোথ্থেকে?

—ব্যবসা করতে গেলে পার্টনারদের মধ্যে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা দরকার, এটা তো আপনি মানেন চ্যাটার্জিবাবু?

—মানি বইকী। আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো আমাদের মধ্যে আছেই। চিরকাল আছে।

—ছিল। এখন নেই।

— কী হয়েছে বলুন তো? সমরের কপালে ভাঁজ —ব্যাপারটা কী?

—নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন।

সমর সহসা চুপ। স্থির চোখে দেখছে রাজিন্দরকে। মাথা নামাল। আবার তুলেছে। চোখ কুঁচকে বলল —আপনি কি চাঁদনি থেকে কিছু শুনে এসেছেন?

—কোথায় কী শুনেছি তা জানা কি খুব জরুরি চ্যাটার্জিবাবু? যা শুনেছি তা সচ্, না ঝুট?

—নাহ্, ভুল কেন হবে! সমর খাড়া হয়ে বসল —ডেকোরিনায় আপনার পার্টনার বলে কি আমি অন্য ধান্দা করতে পারব না?

—জরুর পারবেন। লেকিন খবরটা আমাকে বাইরে থেকে শুনতে হল কেন?

—সময় হলেই আপনাকে জানাতাম।

—কেন ঝুট বলছেন চ্যাটার্জিবাবু? আমি না জেনে গেলে আপনি আমায় জানাতেন না। আমাদের মধ্যে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে।

নন্দ দোকানে ঢুকেছে। কালি মাখা হাত মুছতে মুছতে বলল —কাল আমার আসতে একটু দেরি হবে চ্যাটার্জিবাবু।

—আমায় কেন বলছ? সমর চমকে মুখ তুলল —সিংজিকে বলে যাও।

রাজিন্দর ভার গলায় বলল —আমি কাল আসব কিনা ঠিক নেই।

—আহ্ সিংজি, ছাড়ুন না। না না, সিংজি কাল আসবেন নন্দ।

—না নন্দ। তুমি যা বলার চ্যাটার্জিবাবুকেই বলো।

নন্দর ঘাড় পেন্ডুলামের মতো ঘুরছে দুজনের দিকে। সামান্য হতভম্ব হয়েই দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সমরও উঠল। দরজায় গিয়ে বাইরেটা উঁকি দিয়ে দেখে নিল। কাউন্টারে ফিরতে ফিরতে আহত স্বরে বলল, —আপনি মিছিমিছি তিলকে তাল করছেন সিংজি। এ কিন্তু একদম ভাল নয়। কেন নতুন ব্যবসা করতে চাইছি তা কি ভেবে দেখেছেন কখনও?

—আমার ভাবার দরকার নেই চ্যাটার্জিবাবু। আমি সব বুঝে গেছি। বহুৎ শিক্ষা হয়েছে আমার।

—ফের এক কথা! সমর এতক্ষণে ধৈর্য হারাল —শুনুন সিংজি, ও ধান্দা আমি নিজের জন্য করছি না। করছি, ওই শালার জন্য। বাড়িতে মিসেস সারাক্ষণ কানের পোকা খাচ্ছে। ভায়ের জন্য কিছু করো, ভায়ের জন্য কিছু করো। তো, একটা কিছু তো করতেই হয়, না কি? আমি গাড়ি হাঁকাচ্ছি, আমার শালা বেকার বসে আছে, এটা কোনও কাজের কথা?

দুঃখের মধ্যেও পেট গুলিয়ে হাসি উঠে এল রাজিন্দরের। কী হাস্যকর সাফাই গাওয়ার চেষ্টা!

সমর আত্মগতভাবে বলে চলেছে —ডায়মন্ড ইন্ডিয়ার মোটা অর্ডারটা নিয়ে অনেক দিন ধরেই কথা চালাচ্ছি।...ভেবেছিলাম কাজটা হাতে নিয়ে আপনাকে চমকে দেব। এর মধ্যে বাদলের প্রবলেমটা এসে গেল...। আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে নতুন ব্যবসার জন্য টাকা আমি পেলাম কোথায়? তাই তো? কিছু আমার শ্বশুরমশাই দিয়েছেন, বাকি জোগাড় করতে হয়েছে।...এই তো দেশে গিয়ে জমি বেচে এলাম।... জানি, অর্ডারটা ডেকোরিনার ব্যানারে এলে ডেকোরিনা চড়চড়িয়ে আরও ওপরে উঠে যেত। কিন্তু উপায় নেই, গৃহশান্তি তো বজায় রাখতে হবে।... এ ব্যবসার যেটুকু ক্ষতি হবে, তা আমি প্রাণপণে পুষিয়ে দেব।

রাজিন্দর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। নিজেরই হাসি ঝনঝন বাজছে নিজের দুর্বল মস্তিষ্কে, তবু হাসছে। তির্যক স্বরে বলল —এত কথা কেন বলছেন চ্যাটার্জিবাবু? আমি শুনতে চেয়েছি? আমি কি বলেছি, আপনি আপনার বাদলের কথা ভাববেন না?

সমর চ্যাটার্জি হঠাৎ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল —ভাববই তো। একশো বার ভাবব। লক্ষ বার ভাবব। আপনি যদি একটু অন্য ধরনের মানুষ হতেন, তা হলে আমায় বাদলকে নিয়ে চিন্তায় পড়তে হত না। প্রথম দিন থেকে আপনি ওকে সহ্য করতে পারছেন না। কেন, বাদল কি চোর জোচ্চোর? জাস্ট্ কাজে মন নেই। সে তো অনেকেরই থাকে না। বসতে বসতে, থাকতে থাকতে অভ্যেস তৈরি হয়ে যায়। ছেলেটাকে আপনি সে সুযোগ দিলেন কোথায়!...অথচ আপনিই নিজের ছেলেকে এনে দোকানে বসিয়েছিলেন।...ছেলেকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন সমর চ্যাটার্জি তার সঙ্গে কী ব্যবহারটা করেছিল, আর আপনি...! বাদলে আপনার কেন আপত্তি সিংজি? আমার লোক হয়ে সারাদিন দোকানে বসে থাকে বলে?

রাজিন্দরের মাথার পিছনে দপদপানি শুরু হয়েছে। ক্রোধে, না বিরক্তিতে, না অপমানে, রাজিন্দর বুঝতে পারছিল না। দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বলল —হ্যাঁ, আপনার এখন অনেক বুলি ফুটেছে। যখন টাকার মুরোদ ছিল না, তখন এই রাজিন্দর সিং আপনার কাছে দেবতা ছিল। রাজিন্দর সিং না থাকলে তো এখনও অফিসে অফিসে হাত কচলে জীবন কাটত!

—আর এই সমর চ্যাটার্জি না থাকলে বালিগঞ্জের ওই দোকানে লাল বাতি জ্বেলে এতদিনে ফুটপাথে বসে থাকতেন।

ক্রমশ তিক্ত থেকে তিক্ততর হচ্ছে সংলাপ। মনের গরল গলগল উঠে এল রাজিন্দরের। সমরেরও। যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ যেন ঘৃণার বিষ ছিটিয়ে মেরে ফেলবে দুজনকে। রাজিন্দর আফসোস করছে এক পথের ভিখিরিকে অর্ধেক অংশীদারি দিয়ে দেওয়ার জন্য। সমর চ্যাটার্জি কপাল চাপড়াচ্ছে এক ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধার করার পর সেই মানুষ তাকে অকৃতজ্ঞ বেইমান ভাবে, এই আক্ষেপে।

এক সময়ে রাজিন্দর বলল —বাত্ বাড়ানো আমার পসন্দ্ হচ্ছে না চ্যাটার্জিবাবু। আপনার সঙ্গে কথায় আমি পারব না। আমি আপনার সঙ্গে আর বিজনেস করব না, এই আমার সাফ্ কথা। আমার আধা হিস্যা আমি বেচে দেব। আপনি পার্টনার, আপনি কিনতে হলে কিনে নিন।

—বেচবেনই তা হলে? সমর চ্যাটার্জির ভাঙা ভাঙা মুখের পেশি শক্ত হয়ে গেছে। দৃষ্টি তীরের ফলার মতো করে বলল, —আমার এখন টাকা পয়সা নেই। বড় জোর হাজার পঞ্চাশ দিতে পারি।

—মাত্র পঞ্চাশ! দশ বছর আগে আমি তিন লাখ ইনভেস্ট্ করেছিলাম।

—করতে পারেন। এখন আমি ওই দিতে পারব। বড় জোর আর হাজার দশ-বিশ।

—তা হলে আমি অন্য পার্টি দেখি।

—তা তো হয় না সিংজি। আমি কেন এক অজানা অচেনা ভুঁইফোড়কে আমার পার্টনার বলে মেনে নেব?

—আশ্চর্য! বেচতেও দেবেন না, কিনবেনও না, আপনার মতলব কী বলুন তো? দোকান পুরো গাপ্ করে ফেলতে চান?

—আপনারই বা বেচার জন্য উতলা হয়ে ওঠার পেছনে মতলবটা কী?

—আমার আবার কী মতলব?

—যে মানুষ এমন জমজমাট ব্যবসা বেচে দিতে চায়, সে হয় পাগল, নয় তার অন্য কোনও গোলমাল আছে। আপনার কেসটা কী, অ্যাঁ? পালাতে চান?

—পালাতে চাই মানে? রাজিন্দরের মুখ লাল।

—নিশ্চয়ই পেছনে কোনও ঘা ফা আছে। সমর চ্যাটার্জি কথা চিবোচ্ছে —আমাদের কাছে যতটা সাধুপুরুষ সেজে থাকেন, ততটা ভোলাভালা তা হলে আপনি নন! আমারই বোঝা উচিত ছিল, অত দিন দিল্লিতে থেকেও যে লোক এক কথায় সব ছেড়ে ছুড়ে আরেক জায়গায় এসে ডেরা বাঁধে, তার ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কিছু মিস্টিরিয়াস হবেই।...আমার গিন্নি ঠিকই বলেছিল। সিংজিকে তোমার পুরো বিশ্বাস করা উচিত নয়। কলকাতায় তো অনেক সর্দারের বাড়িতে সর্দার আত্মীয় স্বজন আসে, কজনের বাড়িতে পুলিশ চড়াও হয়!

রাগের মাথায় যা খুশি তাই বলে যাচ্ছে সমর। সবকিছু জেনেও। কিংবা হয়তো রাগ নয়, ভাবনাগুলো মনে মনে ছিলই, পরিস্থিতি আগল খুলতে গলগল বেরিয়ে এল।

রাজিন্দরের আর কথা ফুটছিল না। সমরের প্রতিটি বাক্য বুলেটের মতো বিঁধছে তাকে। তবে গুরবচন সিং হয়ে কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল না রাজিন্দর, দেওয়াল ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘুরন্ত পৃথিবীকে সামাল দিতে টাল খাচ্ছে। বেতালা পায়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে শেষ বারের মতো সমরের স্বর শুনতে পেল, —উফ্, মাথামোটা বটে! এত বেশি জেদ বলেই তো কোথ্থাও আপনার জায়গা হয় না! যাবি যদি তো যা! ওই পঞ্চাশ হাজার নিয়ে যেখানে খুশি ভাগ। বেশি টেন্ডাই ম্যান্ডাই করলে ওটুকুও জুটবে না!

নেশাগ্রস্তের মতো গাড়ি চালাচ্ছে রাজিন্দর। অন্ধ ক্রোধে ঝাঁ ঝাঁ করছে কান, তীব্র যন্ত্রণায় ঝাপসা হয়ে আসে চোখ। দুপাশের বাড়িঘর দোকানপাট যেন ধেয়ে আসছে রাজিন্দরের দিকে, এক্ষুনি বুঝি আছড়ে পড়বে গায়ে।

গুরবচন সিং বলেছিলেন, এ শহর নাকি এক জঙ্গল! বাড়িঘরগুলো সব গাছ! একদিন এই গাছ চাপা পড়েই মৃত্যু হবে রাজিন্দরের! আজই কি সেই দিন?

ভাবতে ভাবতেই হৃৎপিণ্ডে এক তীব্র নখের আঁচড়। বাঁ হাতে বুক খামচে ধরল রাজিন্দর। কোনও রকমে যখন বাড়ি এসে পৌঁছল, তখন অবশ হয়ে এসেছে শরীর। গলগল ঘামছে। গাড়ি গ্যারেজ করার ক্ষমতাও নেই আর। গেট খুলে নামারই শক্তি নেই। স্টিয়ারিং-এ পড়ে থাকা হাতের চাপে হর্ন বেজে চলেছে অবিরাম। সাইরেনের মতো।

আবছা কোলাহল যেন শোনা যায়! কারা যেন ছুটে আসছে! কে ডাকে পাপা পাপা বলে?

রাজিন্দর জ্ঞান হারাল।

পনেরো

দুপুরে বইখাতা নিয়ে বসেছিল কুলদীপ। এখনও মন বসে না পড়ায়, কিছুতেই না। তার পরীক্ষার আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি, মাঝে কটা দিন পড়াশুনোর সঙ্গে প্রায় সম্পর্কই ছিল না, নিজের তৈরি করা শিডিউল থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে সে, তবুও।

কী করবে কুলদীপ, বই খুললেই যে চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক আর্ত মুখ! গাড়ির সিটে নেতিয়ে পড়ে আছে তার পাপা! গোঙাচ্ছে! মুখ বিকৃত হয়ে গেছে যন্ত্রণায়! যদি মরে যেত পাপা! যদি মরে যেত!

কুলদীপের এই দুর্ভাবনার অবশ্য কোনও জাগতিক কারণ নেই। রাজিন্দর এখন মোটামুটি সুস্থ, এগারো দিন নার্সিংহোমে কাটিয়ে গত সপ্তাহে সে বাড়ি ফিরে এসেছে। তার হৃৎপিণ্ডের চোট যত সাংঘাতিক ভাবা গিয়েছিল, বাস্তবে তত মারাত্মক কিছু হয়নি। ই সি জি রিপোর্ট মোতাবেক তার হৃদয়ে একটা ছোটখাটো ভূমিকম্প হয়ে গেছে বটে, তবে তার দেওয়াল এখনও অটুট।

এ রোগের রীতিমাফিক প্রথম আটচল্লিশ ঘন্টা নার্সিংহোমের ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে ছিল রাজিন্দর। কড়া সিডেটিভ স্নায়ুকে অসাড় রেখে রেখে তার ব্যথাকে ক্রমে প্রশমিত করে দিয়েছে, বাকি দিনগুলোতে রক্তচাপও আর কোনও বেচালপনা করেনি। তবু নার্সিংহোম ছাড়ার সময়ে ডাক্তারের কড়া নির্দেশ—ভারী কাজ বন্ধ, সিঁড়ি ভাঙা চলবে না, টেনশান থেকে পুরোপুরি মুক্ত রাখতে হবে নিজেকে। এবং পূর্ণ বিশ্রাম, অন্তত আরও এক মাস। তারপর আবার রাজিন্দরকে পরীক্ষা করবে ডাক্তার, তখন বাইরে বেরোনোর অনুমতি মিললেও মিলতে পারে।

সবই কুলদীপের জানা। তবু তার ভেতরের ছটফটানিটা যায় না কিছুতেই। বুকের গোপন কন্দরে হঠাৎ হঠাৎ শকুনের ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পায় কুলদীপ। যদি পাপা মরে যেত! যদি পাপা...!

অস্থির হাতে কয়েক বার ডটপেন খোলা বন্ধ করল কুলদীপ। উঠে পড়েছে চেয়ার ছেড়ে। ড্রয়িং ডাইনিং স্পেস বড় শুনশান এখন। কালও রশ্মি চুন্নি ছিল, তাও যা হোক প্রাণের সাড়া ছিল বাড়িতে, আজ সকালে তারা চলে যেতে চতুর্দিক খাঁ খাঁ।

খানিক আগে কোমল কী সব খুটখাট করছিল রান্নাঘরে, এবার বুঝি বিমলার কাছে গেছে। দিনরাত শুয়ে থেকে থেকে শয্যাক্ষত দেখা দিয়েছে বিমলার, এ সময়টায় কোমল তাঁর পিঠ কোমরে মলম

লাগায়। বিমলা এখন আরও জড়ভরত। এই যে ছেলে অসুস্থ হল, নার্সিংহোমে পড়ে রইল, এত উদ্বেগ, এত ছোটাছুটি, কিছুই তাঁর মস্তিষ্কে সেভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না! ছোট্ট চুন্নি শুধু তাঁর সঙ্গে বাস্তবের একমাত্র সাঁকো। চুন্নি হাসলে তাঁর মাড়ি দেখা যায়, চুন্নি কাঁদলে তাঁর চোখে ছায়া ঘনায়। বুঝি বা সারা জীবনের শোক তাপ মুছে ফেলে বিমলা এখন ফিরে গেছেন সেই শৈশবে।

বিমলার ঘর টপকে রাজিন্দরের দরজায় এল কুলদীপ। আস্তে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল ভেতরে। ঘরটা কেমন গুহার মতো! নবীন চৈত্রের বাতাস এখনও তত গরম নয়, তবু এ ঘর ঠাণ্ডা রাখতে বেলা বাড়লে সব জানলা বন্ধ করে দেয় কোমল, ছায়া ছায়া অন্ধকারে কিছুই তেমন স্পষ্ট প্রতিভাত নয়। তারই মধ্যে রাজিন্দরের অবয়ব দেখতে পাচ্ছিল কুলদীপ। চোখের ওপর আড়াআড়ি হাত, শুয়ে আছে রাজিন্দর। ঘুমোচ্ছে কি? কুলদীপ কি ডাকবে পাপাকে?

দ্বিধাগ্রস্তভাবে পর্দা ছেড়ে দিল কুলদীপ। ফিরতে যাচ্ছিল, রাজিন্দরের গলা শুনে ঘুরে দাঁড়াল।

—চলে যাচ্ছিস কেন পুত্তর? আ, অন্দর আ।

—তুমি জেগে আছ পাপা?

—কাজের মানুষের কি দিনের বেলা ঘুম আসে বেটা? শুয়ে থাকতে হয় বলেই শুয়ে থাকা।

—ঠিক আছে। রেস্ট নাও।

—কত আর রেস্ট নেব! তু আ মেরে পাস্। আ না।

সামান্য ইতস্তত করে আলো আঁধারে ঢুকল কুলদীপ। বিছানার ধার ঘেঁষে বসেছে। আবছায়ায় চোখ সয়ে যাওয়া দৃষ্টি রাজিন্দরে স্থির। কী রোগা হয়ে গেছে পাপা! আশঙ্কা আর দুশ্চিন্তায় আগেই বেশ বুড়োটে মেরে গিয়েছিল মানুষটা, আকস্মিক হৃদরোগ তাকে আরও শীর্ণ করে দিল। আগের তুলনায় চামড়া অনেক শিথিল, হাতের শিরা উপশিরা পরিষ্কার দেখা যায়।

রাজিন্দর ছেলের হাতে হাত রাখল —কী ভাবছিস রে? কিছু বলবি মনে হচ্ছে?

বলবে বলেই তো এল কুলদীপ, কিন্তু কী ভাবে যে শুরু করে! কদিন ধরে মনে মনে গড়ে তোলা সিদ্ধান্ত হঠাৎ কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কুলদীপ কি ভয় পাচ্ছে? পাপার নতুন টেনশান শুরু হবে ভেবে?

কিন্তু সত্যের মুখোমুখি তো হতেই হবে কুলদীপকে। হয় আজ, নয় কাল। তার পিসি পিসেমশাই-এর মৃত্যু তাকে হতচকিত করে দিয়েছিল, পরবর্তী ঘটনাবলি তাকে আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছে, শেষে রাজিন্দরের এই ভগ্নদশা বড় প্রবীণ করে দিল তাকে। কুলদীপ এখন পরিপূর্ণ নির্মোহ চোখে দেখতে শিখেছে দুনিয়াকে। এবং এও বোঝে, রাজিন্দর তার যতখানি আশ্রয়, সেও এখন রাজিন্দরের ততটাই আশ্রয়। তার মুখ থেকে প্রস্তাবটা পেলে রাজিন্দর হয়তো স্বস্তিও পেতে পারে!

দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলল কুলদীপ। তবে সরাসরি প্রসঙ্গে ঢুকল না। আলগাভাবে বলল —শরীর এখন কেমন বুঝছ?

—ভালই তো। ঠিকই আছি।

—ওঠা হাঁটা করতে অসুবিধে হচ্ছে?

—নাহ্। একটু শুধু দুর্বল লাগে, এই যা।

রাজিন্দরের হাতে মৃদু চাপ দিল কুলদীপ —পুরো ফিট হয়ে গেলে কী করবে কিছু ঠিক করলে?

—হুঁউ, ভাবছি। রাজিন্দর চোখ বুজল —ব্যবসাই করব। যেমন করছিলাম।

—চ্যাটার্জিবাবুর সঙ্গে?

রাজিন্দর চুপ। কুলদীপের স্বরে বুঝি কিছু আঁচ করেছে।

—কী, বললে না? আবার ওই চ্যাটার্জিবাবুর সঙ্গে...

—তুই কি শুনেছিস কিছু?

—কানে ঠিক উড়ে আসে পাপা। তুমি লুকিয়ে রাখতে চাইলেও। কুলদীপ শুকনো হাসল —নন্দ কিছু কিছু বলেছে।

—ও।

—আমি একদম নির্বোধ নই পাপা। একটু একটু আমি অনুমানও করতে পারি। চ্যাটার্জিবাবু

নার্সিংহোমে এলেন, তোমার সঙ্গে দেখা করতে ঢুকলেন না...আমাকে দেখে কুঁকড়ে যাচ্ছিলেন, আমতা আমতা করছিলেন...ওই ভদ্রলোকের মন আর পরিষ্কার নেই পাপা।

রাজিন্দর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল —মানুষ চেনায় আমার ভুল হয়েছিল পুত্তর।

কুলদীপের বলতে ইচ্ছে হল, মানুষ চেনায় তোমার ভুল হয়নি পাপা, মানুষ এরকমই। সামান্যতম সুযোগ পেলে তুচ্ছতম কারণে আমাদের সঙ্গে এই সুলুকই করা হবে। এটাই দস্তুর। তোমার এ কথা আগেই বোঝা উচিত ছিল।

কিছুই বলল না কুলদীপ। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, —আমাদের এই ফ্ল্যাট কিন্তু এবার ছাড়তে হবে পাপা।

রাজিন্দর যেন চমকে উঠল —কেন?

—কেন আবার কী! রোজ তুমি আটচল্লিশটা সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামা করবে নাকি! অসম্ভব।

—হুম্, তাও তো বটে।

—তুমি নিশ্চয়ই আশা করছ না, আমাদের একতলার কেউ তোমার অসুবিধের কথা ভেবে আমাদের সঙ্গে ফ্ল্যাট এক্সচেঞ্জ করবে?

—সে আবার কেউ করে নাকি!

—কেউ করে কিনা জানি না, তবে আমাদের জন্য যে কেউ করবে না এটা আমি নিশ্চিতভাবেই জানি।

—কী আর করা যাবে! রাজিন্দর আলগা হাসল —অন্য ফ্ল্যাট ঢুঁড়ে নেব।

—এক যুগ ব্যবহার করা চারতলার এই ফ্ল্যাট বেচে এ চত্বরে আর একটা কিনতে পারবে পাপা? আমাদের সরে যেতে হবে সেই যাদবপুর সন্তোষপুর গড়িয়া বাঘাযতীনের দিকে। একদম অচেনা পরিবেশ।

রাজিন্দর বিচলিত চোখে কুলদীপের দিকে তাকাল।

কুলদীপ একটুক্ষণ নীরব। ভেন্টিলেটার দিয়ে ছোট ছোট আলোর গুচ্ছ অনুপ্রবেশ করেছে ঘরে, দেওয়ালে ছবি রচনা করেছে। সাদা কালো ছবি। কুলদীপ ছবিগুলো দেখছিল। ঘুরন্ত পাখার হাওয়ায় তিরতির কাঁপে ছবি, বদলে যায় ঘন ঘন, আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে!

হাওয়ায় কি ছবি কাঁপে? নাকি কাঁপে মানুষের মন? কুলদীপ বুঝতে পারছিল না।

আত্মগতভাবে কুলদীপ বলে উঠল —কেন আমরা এখান থেকে দু-পাঁচ মাইল সরব পাপা? যেতেই যদি হয়, চলো না হাজার দুহাজার মাইল দূরে চলে যাই। অন্য কোনও শহরে।

—সেকী! কেন? এ শহর কী দোষ করল?

—শহরের দোষ নয় পাপা, দোষটা আমাদের। আমরা মাইনরিটি হয়ে জন্মেছি, সেটাই আমাদের অপরাধ। কুলদীপের গলা কঠিন হল —কী দোষে তোমাদের লাহোর ছাড়তে হয়েছিল পাপা? কোন অপরাধে তুমি দিল্লি ছেড়েছিলে? পুয়াজি ফুক্করজির ওরকম মৃত্যু, সেটাও ধরে নাও আমাদেরই কোনও অপরাধ! তুমি কোর্টেই যাও, কি হিউম্যান রাইট কমিশনেই যাও, মানুষের চোখ তুমি বদলাতে পারবে না পাপা।

প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করছে কুলদীপ, বিদীর্ণ হচ্ছে বুক। লক্ষ লক্ষ স্মৃতি পাকে পাকে পেঁচিয়ে ধরছে কুলদীপকে, চেনা পৃথিবীর মায়াময় গন্ধ তাকে আবিষ্ট করে ফেলছে। ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে এক নারীর মুখ। সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে রিমঝিম তার পাশে থাকতে চেয়েছিল। রিমঝিম ধর্ম মানে না, জাত মানে না...! ধুস্, তাই কি কখনও হয়? রিমঝিমের ধমনীতে কি এতটুকু রজতেন্দ্র সান্যাল নেই? অথবা প্রতিবেশীরা? অথবা বন্ধুবান্ধব? সহপাঠীরা? নাহ্, যা অলীক, যা অবাস্তব, তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই বিধেয়।

হায় রে, শিকড় ছেঁড়ার কল্পনাতেই যদি এত কষ্ট, সত্যি সত্যি শিকড় ছিঁড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা তবে কতখানি!

কুলদীপ প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলাল। ভাবলেশহীন গলায় বলল —নতুন জায়গায় আমরা আবার নতুন করে জিন্দেগি শুরু করব পাপা। কালই তো আর যাচ্ছি না, এগজাম্ হয়ে যাক, ডিগ্রি পেয়ে

যাই...তুমি এর মধ্যে ফ্ল্যাট বিজনেস সব বেচে টাকাকড়ি যা পাও হাসিল করে নাও, তারপর আমরা অন্য কোথাও নয় সেটল্ করি...। আমি একটা নোকরি খুঁজে নেব, তুমিও চাইলে ছোটামোটা বিজনেস করতে পারো।

রাজিন্দর উঠে বসছে। ধীরে ধীরে, সাবধানে। বালিশ জড়ো করে পিঠ হেলান দিল —তুই কোথায় যেতে চাস?

—আপাতত মুম্বই-এ চাচাজির কাছে যেতে পারি। কিংবা ধরো এলাহাবাদে...ওখানে তো মাম্মির এক প্রাজি আছেন। উনি তো শুনি খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক!

রাজিন্দর নিরুত্তাপ স্বরে বলল —অন্য কোনও শহরে গেলেই কি সমস্যা মিটে যাবে পুতুতর? আমরা মাইনরিটি থেকে মেজরিটি বনে যাব? দিল্লিতে তো আমরা কম তাকতদার ছিলাম না পুতুতর, তাতে কি আমাদের বিপদ কেটেছিল?

—তা হলে পঞ্জাব চলো। ফুফফরজি তো তোমাকে খেতিবাড়ি করার বুদ্ধি দিয়েইছিলেন। দলজিৎ ভাইয়াকে লিখে দাও আমাদের জন্য জমি দেখতে। বলতে বলতে রাজিন্দরকে এক ঝলক দেখল কুলদীপ—চাষবাস না করো, ব্যবসাও করতে পারো। আমি ওখানেও পড়াশুনো চালাতে পারব।

—কোন পঞ্জাবে যাবি পুতুতর। যে পঞ্জাব থেকে পুলিশ এসে আমার পহেনজি জিজাজিকে মেরে দিয়ে যায়?

রাজিন্দরের কম্পিত স্বরে থমকাল কুলদীপ।

রাজিন্দর বলল—শুন পুতুতর, পঞ্জাবেও তোর নিজেকে আজনবি লাগবে। বুকে হাত দিয়ে বল তো, তুই এখন কতটা পঞ্জাবি আছিস? মানুষ যেখানে বড় হয়, সেটাই তার মাটি রে। সেটাই তার মুলুক। ঠিক কি না?

কুলদীপ চলজলদি জবাব দিতে পারল না। ওই প্রশ্ন তো সে নিজেই নিজেকে করে চলেছে অনুক্ষণ। তার ধর্ম তাকে একভাবে সংখ্যালঘু করেছে, বাসভূমি আরেকভাবে। শিক্ষাদীক্ষা, বেড়ে ওঠা আরও একভাবে। এখন সত্যি কোথায় গেলে যে স্বচ্ছন্দ হয় কুলদীপ!

তবু কুলদীপ তর্ক করতে ছাড়ল না। খানিকটা অনুযোগের সুরে বলল—তোমার মুখে এ কথা মানায় না পাপা। তুমি কিন্তু সাঁইত্রিশ বছর দিল্লিতে থেকেও এখানে চলে এসেছিলে!

—সেই জন্যই তো আমি দুখটা বুঝি পুতুতর। এখানে তো কত সাল হয়ে গেল, এখনও কি আমি কলকাত্তাওয়ালা বনতে পেরেছি? চোখ বুজলে এখনও আমি আমাদের সেই দিল্লির বাড়িটা দেখতে পাই বেটা। ইয়ারদোস্তদের মুখ মনে পড়ে। সেই স্কুলে পড়তে পড়তে যাদের সঙ্গে খেলকুদ করতাম, তাদের। তোরও আমার দশা হোক তা আমি চাই না পুতুতর।

রাজিন্দরের স্বরে বিষণ্ণতা নেমেছে। কুলদীপ মাথা নামিয়ে বলল—আমিও তোমার কথা ভেবেই বলছিলাম পাপা।

বিষাদের মেঘ সরে চওড়া হাসি ফুটল রাজিন্দরের মুখে। কুলদীপের বাজুতে হালকা টোকা দিয়ে বলল—আরে বাহ্, তুই দেখছি সচমুচ আমার গার্জেন বনে গেছিস! এর মধ্যে কবে এত বড় হয়ে গেলি?...শুন বেটা, তুই যেমন ভাবছিস, আমিও অনেক ভেবেছি। নার্সিংহোমে শুয়ে ভেবেছি, ঘরে ফিরে ভেবেছি...। না পুতুতর না, আমরা আর কোথ্থাও যাব না। চ্যাটার্জিবাবুর সঙ্গে না পোষায়, আমি আলাদা ব্যবসা করব। হার্ট অ্যাটাকই তো হয়েছে একটা, মরে তো যাইনি। ষাট বছর বয়সেও মানুষ আবার শুরু করতে পারে। এ ফ্ল্যাট ভি আমি বেচব না বেটা। দুমাস রেস্ট নেব, চার মাস বিছানায় শুয়ে থাকব। কিন্তু তারপর আবার এক পা এক পা করে সিঁড়ি ভাঙব আমি। ভাঙবই। সমঝে মেরি বাত?

রাজিন্দরের অনাবিল হাসি কুলকুল বয়ে যাচ্ছে ঘরে। দরজা পেরিয়ে ফ্লাটময় ছড়িয়ে গেল। উদ্বিগ্ন মুখে ছুটে এল কোমল, থতমত চোখে দেখছে ছেলে বাপকে। ফটাস করে জ্বেলে দিয়েছে টিউব লাইট, ফ্যাটফ্যাটে আলোয় মিলিয়ে গেল দেওয়ালের সাদা কালো ছবি।

কুলদীপ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। চুপচাপ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। হাজার হাজার প্রশ্ন ভিড় করে মাথায়। শুধু তার কথা ভেবেই কি এ শহরে রয়ে যেতে চায় পাপা? সমর কি পাপার সঙ্গে শুধুই বেইমানি করে। আবার সেই সমরই তো...? সমর চ্যাটার্জিই পাপাকে দেখতে কাচুমাচু মুখে ছুটে আসে

নার্সিংহোমে! চুন্নিকে রাখবে না বলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয় খুকুদিদিরা, তারাই আবার আপ্লুত মুখে চুন্নিকে আদর করে। কেন? কোন ছবিটা সত্যি? সমর চ্যাটার্জির বেইমানি করা, না পাপাকে দেখতে আসা? কোনটাই বা খুকুদিদিদের আসল মুখ? নাকি সব কটা ছবিই সত্যি? মানুষ এরকমই? কুলদীপ চাইলেও অত সহজ সরল হিসেবে ফেলতে পারবে না মানুষকে?

কোন নিক্তিতে তবে মাপা যায় এদের? ধর্মের? জাতের? মনুষ্যত্বের?

ব্যালকনির নীচেই এক ঝাঁকড়া কৃষ্ণচূড়া। আনমনে বেড়ে উঠেছে ফুটপাথে। ডালপালা লকলকিয়ে উঠে এসেছে অনেকটাই। গাছ ভরা লাল ফুল ঝুমঝুম দুলছে হাওয়ায়। হাতছানি দিয়ে ডাকছে কুলদীপকে। বুঝি বা চাইলেই ওদের ছোঁয়া যায়।

দুরুদুরু বুকে হাত বাড়াল কুলদীপ। চোখ বুজে।

গ্রন্থ-পরিচয়

আমি রাইকিশোরী। অঞ্জলি প্রকাশনী, কলিকাতা-৮৪।
প্রথম সংস্করণ: অক্টোবর ১৯৯৭, পৃ. ১১২, মূল্য: ৪০.০০
প্রচ্ছদ: সুব্রত চৌধুরী
উৎসর্গ: মাসিমা, মেসোমশাই/শ্রীমতী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়/শ্রীনৃপেনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভাঙনকাল। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯।
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ১৪৮, মূল্য ৫০.০০
প্রচ্ছদ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
উৎসর্গ: শ্রদ্ধেয়া মাসিমা/শ্রীমতী উমা বাগচীকে
প্রথম সংস্করণ: নভেম্বর ১৯৯৬। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

হলুদ গাঁদার বনে। মডার্ন কলাম, কলকাতা-৯।
প্রথম প্রকাশ: ১ বৈশাখ ১৪০৫, এপ্রিল ১৯৯৭, পৃ. ৫-৭৩, মূল্য: ৩২.০০
প্রচ্ছদ: গৌতম রায়
উৎসর্গ: প্রিয় একটা পিসি/স্বর্গীয়া আভা ভট্টাচার্যকে।

ধূসর বিষাদ। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩।
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ভাদ্র ১৪০৫, পৃ. ৮৮, মূল্য: ৩০.০০
প্রচ্ছদ: সুব্রত চৌধুরী
উৎসর্গ: প্রিয় দিদি/করবী বসুকে
প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৪০৪

গভীর অসুখ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯।
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১২৪, মূল্য : ৪৫.০০
প্রচ্ছদ: নির্মলেন্দু মণ্ডল
উৎসর্গ: পার্থসারথি ভট্টাচার্য/ও/পিয়ালি ভট্টাচার্য/স্নেহাস্পদেষু

ফিরে দেখা। অঞ্জলি প্রকাশনী, কলিকাতা-৮৪।
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৯৬, মূল্য ৪০.০০
প্রচ্ছদ : সুনীল শীল।
উৎসর্গ: কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়/স্নেহভাজনেষু

হেমন্তের পাখি। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯।
দ্বিতীয় মুদ্রণ: জুলাই ১৯৯৯, পৃ. ১৩৪, মূল্য ৫০.০০
প্রচ্ছদ: সুব্রত চৌধুরী
উৎসর্গ: অগ্রজপ্রতিম লেখক প্রলয় সেন/ও জয়তী বউদিকে
প্রথম সংস্করণ: এপ্রিল ১৯৯৭। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ঢেউ আসে ঢেউ যায়। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৭৩।
প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৪০৫, পৃ. ৮৮, মূল্য ৩৫.০০
প্রচ্ছদ. অনুপ রায়
উৎসর্গ : শ্রীপ্রদোষকুমার পাল/শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভাল মেয়ে, খারাপ মেয়ে।
'হলুদ গাঁদার বনে' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
'হলুদ গাঁদার বনে' গ্রন্থের গ্রন্থ-পরিচয় দ্রষ্টব্য।

পরবাস। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯।
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ১১০, মূল্য ৪৫.০০
প্রচ্ছদ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
উৎসর্গ: আমার প্রিয় ভাই/দেবকুমার ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশে।
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৯। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।